

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA  
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KIMLGK 2000	Place of Publication	৬৬, হুসিয়ার লেন, কলকাতা
Collection: KIMLGK	Publisher	কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন
Title	Size	৭" x ৭.৫" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: 2/25-48	Year of Publication	২৬ জানু, ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৬ ৫ (১৯৬৬), ১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৮
	Condition: Brittle	Good
Editor:	Remarks:	কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন

C.D. Roll No. KIMLGK



৮-১১  
নবযুগ

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ  
শেষার্ধ

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
৯০/এম, টাওয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘ (১৩৩২) হইতে আষাঢ় (১৩৩৩)

২৫-৪৮ সংখ্যা

নবযুগ কার্যালয়

৮৩, চণ্ডীচরণ মিত্র স্ট্রীট,

বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা ]

[ হিমালী প্রেসে মুদ্রিত ]

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
অ		
অর্থা ( কবিতা )	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার	১১৩
অনাদৃত কুহুম ( কবিতা )	শ্রীপ্রমথনাথ বহু	১০৫৩
অনাহুত ( কবিতা )	বন্দে আলি মিল্লা	১৫৪৫
অপরাধ ( কবিতা )	শ্রীলীলা দেবী	১১২২
অপরাধী ( কবিতা )	"	১৪৪২
অপূর্ণ মিলন ( গল্প )	শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত	১৫৫৫
অভয়াশ্রম	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫৭
অভিনয়ে শাম্ভুশ্র	শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম-এ,	১২২১, ১৩১৮
অভিনয়ে যুত্ব	"	১১২৫
অভিনেতার আকৃতি	"	১০৬৫
অমরালয়ে মুক্তা ( কবিতা )	শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	২০৪
অবসান ( গল্প )	শ্রীমতী অমৃতপা দেবী	১৫১২
অশ্রু	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী	১৫০৩
অশ্রু দেখা ( কবিতা )	শ্রীমতী মঞ্জুরী দেবী	১৫৫২
অশ্রু সাধনা আমার ( কবিতা )	শ্রীজিতেন বসু	১৬৪
আ		
আকাজকা ( কবিতা )	শ্রীবিমলা দেবী	১২৫২
আচ্ছা অম্ব	শ্রীঅশোক রায়	১৫০৩
আজকে রাতে ( কবিতা )	বন্দে আলি মিল্লা	২১২
আত্মদান ( গল্প )	শ্রীমতী পূর্ণশ্রী দেবী	২৪৫
আধার ( কবিতা )	শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫৪৭
আরামের জীবন ( গল্প )	শ্রীপ্রবালনা ভট্টাচার্য, বি-এল,	২২৭
আরেক ফাটনে ( গল্প )	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস	১০৪০
আশা ( কবিতা )	শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০২৫
আশা কি ? ( কবিতা )	শ্রীশ্রীলাল গুপ্ত	১৪০৮
আশ্রয়	শ্রীহরিশ্রী গুহ	১৫৫৫
ই		
ইয়া ইতিহাস পত্রিকার সার সংকলন	৮৬৫, ৯০৩, ৯২২, ৯৪১, ৯৮৮, ১০২৩, ১০৫৪, ১০৮৫, ১১২০, ১১৬৬, ১২০৭, ১২৪৪, ১৩০৫, ১৩৪২, ১৩৬৫, ১৩৭৭, ১৪৩৩, ১৪৬২, ১৫০৫, ১৫৩১, ১৫৫৭, ১৫৯৩	
উপরি পাঠনা ( গল্প )	"শ্রীকৃষ্ণ"	১৪৫৬



বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
ওরাণ্ডের কথা	শ্রীবিখনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সি.	১৩৩৭
কয়েকটা কথা	শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ	২১১
কবিকা (গল্প)	শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী	১৪৩৫
কয়টা তারিখ	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	
	এম-এ, সি-আই-ই,	১০২৭
কল্পনার রাক্ষ্য (গল্প)	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বি-এল,	৮৭৮
কবির চুখ (গল্প)	শ্রীশরৎচন্দ্র বিশ্বাস	১০১০
কংগ্রেসের চিঠি	শ্রীসরসীবালা বসু	৮৮২, ২০২
কালের কথা	৮৬৭, ২০১, ২৩৫, ২৬৬, ২২৭, ১০২২, ১০৫৭, ১০২১, ১১২৩, ১১৫৮, ১১৮৪, ১২১৮, ১২৪৭, ১২৮২, ১৩০২, ১৩৪২, ১৩৭৫, ১৪৮৮, ১৪৭২, ১৫১১, ১৫৩৬, ১৫৭১, ১৫৯৬	
কানাইলা	শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৮৪৮
কামিনী (কবিতা)	শ্রীসত্যিনন্দন ঠাকুর	২০০
কালনিমে (কবিতা)	শ্রীমুণ্ডালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮৪১
কালাপাহাড়ী	শ্রীউমাগপ মুখোপাধ্যায়	১৪৪৬
কিশোর দিনের কথা (কবিতা)	শ্রীহরীশকুমার রায়	১৩৩৬
কুড়ান ভায়েক	শ্রীঅশোক রায়	১৪৬০
কুড়ের বাঁশা	শ্রীকুড়েরাম শর্মা	১২৪০, ১২৭৭
কেবল জ্বরে কত লোক মরে	দেবশব্দু পরীসংস্কার সমিতি	৮৬৩
কাজের প্রভাব		
খেয়া (গল্প)	শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৩৪০
খেলা খেলা (গল্প)	রায় বাহাদুর শ্রীলীলেশচন্দ্র সেন ডি-লিট	১৩১৬
খোকা (কবিতা)	শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ	১২২২
পান	শ্রীবীণাপাণি রায়	১৪৮৮
পান	"	১০৬২
গিরিশ চন্দ্র	শ্রীঅপর্ণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮২৩
গিরিশ চন্দ্র	শ্রীলেন্সেজ চৌধুরী	৮২৭
গিরিশচন্দ্র স্বরণে (কবিতা)	শ্রীসত্যনারায়ণ সরকার	১০৪০
গৃহশক্তি	শ্রীমোহনরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	১০১৫
গোলাপ ও শিশির বিন্দু	শ্রীমতী পূর্ণশর্মা দেবী	১১৬৮

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
গ্রন্থ সমালোচনা	...	১০৬২, ১৪৮০
গ্রন্থ পরিচয়	...	১১৮২
গ্রীষ্ম ও বর্ষা (কবিতা)	শ্রীমুণ্ডালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২৬২
গ্রীষ্মের ছুপুরে (কবিতা)	শ্রীউমাগপ মুখোপাধ্যায়	১৩২১
ঘুম পাহাড়	শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী	৮৭৪
চরম	...	৮৬২
চায়ের অভিযোগ	শ্রীপাচুলাল ঘোষ	১৪৮২
চিত্ত-চন্দ্রিকা	শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু	১৫২০
চোর (গল্প)	শ্রীবীণাপাণি রায়	১৫৫৮
ছবি (গল্প)	শ্রীলীলা দেবী	১২২৭
ছন্দ:	শ্রীহরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	১৪০২
ছয়ছাড়া (গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস	১৪০৪
জগতের নিয়ম	শ্রীঅশোক রায়	১৫৮২
জয় যাত্রা (কবিতা)	শ্রীমতী বীণাপাণি রায়	১২২৪
জলপাইগুড়িতে নাট্যমন্দির	বাসুদেব দর্শক	১৪৪৮
জাগরণ (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী	১০৩৩
জাতীয় উন্নতি	শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ	১৫৫৪
জীবন কাব্য	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র বি-এ,	২৫৮
ঝঙ্কা (কবিতা)	শ্রীমুরারীমোহন দাস	১৫৮৫
ঝড়ো হাওয়া (গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস	২১৩
টান (কবিতা)	শ্রীকটকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮
ঠানদিদি (গল্প)	রায় শ্রীমুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর	১১২৪
তদ্রূপ (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস বি-এল,	১১২০
তালা চালক (গল্প)	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ বি-এল,	১০৭০
তুমি (কবিতা)	শ্রীসিদ্ধিকান্ত মুখোপাধ্যায়	৮৫৮
তোমাদের দেবী/কতকাল (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী	১১২০



বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
বার্ড মাস্টার (গল্প)	শ্রীপোপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বি-এস-সি,	১০৪৫
দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীকৃষ্ণ তর্কবাগীশ	১১৬৩
দাশা প্রসঙ্গ		১১৬৪
দাশা—দ্বিতীয় সংস্করণ		১২৪৩
দ্বাবীর জের	শ্রীমদ্রুপ রায় বি-এ,	১১৬৩
দুহ	শ্রীচৈতন্যকিশোর ঘোষ	১১১৭
দুজেন্দ্র (কবিতা)	শ্রীসরস্বতী বাহ	১৪৬১
দেবী ব্যাক	...	১১৫৪
দেবতার দান (গল্প)	শ্রীহরীচন্দ্র বসু	১১১৮
দেবতার দান (কবিতা)	শ্রীকুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাজন	১১৫৩
ধরা পড়া (কবিতা)	শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়	২০৮
ধর্মবুদ্ধির ভিত্তি	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি-এল,	১০৫৩
নবকথা	শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু	১১৪৬
নবযুগের আশ্রান (কবিতা)	শ্রীপাচুগোপাল মিত্র	৮০৫
নবযুগ	রায় সাহেব শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১২২৫
নবযুগ	শ্রীঐবজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২৮
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২৩
নামরাগ (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস বি-এল	১১৮২
নারী	শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৪০১
নিদায়ে সিদ্ধুতরে (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	১৮৫৫
নিয়তির দেখা (গল্প)	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস	১৪৪৮
নির্বোধ	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	১১০২
নৃতন ভূগোল	শ্রীবিমলচন্দ্র চৌধুরী	১০২৬
পঠন ও পাঠ্য	শ্রীঅবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১৩
পঞ্চপ্রদীপ	শ্রীঅবোধচন্দ্র বসু বি-এ,	১১৫৭
পঞ্জিকা লাহনা	"উলাসী"	৮৫৩
পতিতার দান (গল্প)	শ্রীমতী পূর্ণদশী দেবী	১০২৮
পতী-প্রেম (কবিতা)	শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী	২৪০
পত্র	শ্রীলীলা দেবী	১০৫৫
পথযাত্রা (গল্প)	শ্রীনলিনাক সিংহ	১২৬৭

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
পরলোকে রায় মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী	...	১১৫৭
পরিশ্রান্ত (কবিতা)	শ্রীবীণাপানি রায়	১২৮৩
পরীক্ষার পর	দেশবন্ধু পরীক্ষাকার সমিতি	১০০২
পাগল	শ্রীবিজ্ঞিতোৎপন্ন মজুমদার	১১২৫
পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রাচ্য-ভাব	অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ	২০৮
পার্বনাথ (কবিতা)	শ্রীরাধাধারণী দত্ত	৮১৩
পীর সাহেব	শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি-এস-সি	১৪২৩
পুত্র শোক (গল্প) (সচিত্র)	রায় শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ মজুমদার বাহাদুর	১০৪৪
পুত্রস্বায় (গল্প)	শ্রীবিক্রমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৬১
পুরাতন স্মৃতি	শ্রীদলকা দেবী	১২০০
পুস্তক সমালোচনা	...	২০৪
প্রলিপাত (কবিতা)	শ্রীমণিময় মুখোপাধ্যায়	১২৫৫
প্রতীক্ষা	শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী	১১০৩
প্রাচীন ভারতের গ্রাম	"পাগল"	৮৪২
প্রাচীন ভারতের নারী	"	৮১৩
প্রাচীন ভারতের কৃষিকা	"	২৭০
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ	"	১০৮১
প্রাচীন ভারতের যুগ নির্ণয়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহন ঘোষ, এম এ	২৮০
প্রাচীন কালে কৃষি	শ্রীআনন্দ গোপাল ঘোষ	১২৭২
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৩
প্রিয়দাস গান (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দাস	৮৭৭
প্রিয়া (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণ কিশোর দাস, বি, এল	১১০৮
প্রেমিত পদ	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত	১৪৮০
ফাগুন বালিকা (কবিতা)	বন্দে আলি মিল্লা	২৫২
ফাগুনে ফাগুনা	শ্রীউদ্যাপ মুখোপাধ্যায়	২০৮
ফাগুন এলো	শ্রীশক্তিদানন্দ ঠাকুর	১০৮৮
ফাগুনে	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	১০৭৮
ফুলের বাখা	শ্রীঅশোক রায়	১২৬৬
ভগ্ন বক (কবিতা)	শ্রীশক্তিদানন্দ ঠাকুর	২২৪
ভারত ইতিহাসে বিহারের স্থান	"পাগল"	১০৬৩
ভারতে ইসলাম	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বি, এল	১৪৮২
ভালবাসার অভিনয় (সচিত্র)	...	১০৭৮



বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
ভাব সপ্তক	ঐশ্বশেষ চন্দ্র বসু, বি. এ	১৪৫০
ভাবার ভোর	শ্রীমতী সরলা দেবী	১১৪১
ভিটের মায়া (গল্প)	শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র	৮৮৭
ভুল (কবিতা)	শ্রীমতী নলিনী দেবী	১১১৩
ভুল ভাষা	শ্রীজয়ন্তী দেবী	১৪৮৬
মর্দন উৎসব (কবিতা)	শ্রীহুমায়ুনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৭
মধুসূদনের প্রহসন	কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্র নাথ গোস্বামী	১০৬৬
মরণের পর	শ্রীজিতেন্দ্র কুমার রায়	১৪১৮
মহাপুরুষের জ্যোতিষ জীবন	শ্রীস্ববোধ বিদ্যাস, এম. এ	১২৬৪
মাসিক (গল্প)	শ্রীবিদ্যাল কান্তি মুখোপাধ্যায়	৮৪২
মানব ধর্মী জঙ্ঘ	ঐশ্বশেষ চন্দ্র বসু, বি. এ	১৮৭
মালা (কবিতা)	শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী	১৪২২
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৮৭১, ২২২, ২৬০, ২৯০, ১০৫২, ১০৮৭, ১১৮৬, ১২৮৭, ১৪৭৪, ১৫০৪, ১৫৭৩, ১৫৪২	১০৮২
মৃত্যু বরণ (গল্প)	শ্রীগত্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত	১৮০২
মোঙ্গলমানের বাঙ্গালা সাহিত্য	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি	১৮৬৬
মোহন মুরলী	শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫২
যাত্রী (কবিতা)	শ্রীলীলা দেবী—	২০৭
রক্তজবা (গল্প)	শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—	১২০২
রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র	শ্রীগ্রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৫৭৭
রত্নালয়	১৮৬, ২৬৮, ১০০০, ১০৫২, ১০০৩	১৫৪২, ১১২১, ১৪১৪, ১৪৪৩, ১৫৭৫
রত্নপতি	শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৪৮০
রেশ	শ্রীঅশোক কুমার সেন	১৪৬২
রোজা বা উপবাস ব্রত	এ এক মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	১১৪৮
বকিম স্বতি তর্পণ	শ্রীপাচুলাল ঘোষ	১১২৬
বৎসর শেষে (কবিতা)	শ্রীপাণেন্দ্রনাথ রায়	১৫২১
বসন্ত ঋতুগণ (কবিতা)	"পাগল"	২৪৩
বসন্তে (কবিতা)	শ্রীবিমলা দেবী	২৭২
বসন্ত	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬৭

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
বঙ্গ কৃষি-শিক্ষা	...	১৫৬৪
বাঙ্গালার গীর কাহিনী	ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অহুসন্ধান বিশারদ	১১৩৪, ১১৫০
বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষা	শ্রীনিবার চন্দ্র চক্রবর্তী	১২৬০
বাঙ্গালার উন্নতি	এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বাশাঠী	১৩২২
বাচ্য ও প্রজ্ঞা (কবিতা)	শ্রীমতী বেহমতী বহুদায়া	১৩৫০
বামলে (কবিতা)	শ্রীমতী মঞ্জুরী দেবী	১৫৩৩
বানন বাখা (কবিতা)	শ্রীলীলা দেবী	১৪২৬
বাসনা (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণ কিশোর দাস বি-এল	১২১১
বাসনার নির্দোষ (গল্প)	শ্রীবেদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩২
বাসন্তী গান (কবিতা)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়	১১৮১
বাসন্তী গান	"	১০৬৫
বাংলার জীবন সমগ্র	১০০৩, ১০৪২, ১২০০	১০৬৫
বিকাশ (কবিতা)	শ্রীমুরারী মোহন দাস	৮৮১
বিগত যৌবন (কবিতা)	শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী	১৪১৭
বিহার ঋণে	শ্রীপ্রদুর্ন কুমার দাস গুপ্ত	১০১৭
বিরহিণী (কবিতা)	শ্রীমুরারী মোহন দাস	১০০২
বৃক্ষের ভাষা (গল্প)	শ্রীপ্রদুর্ন কুমার দাস	২৭৪
বেইমান (গল্প)	শ্রীকেশব লাল রায়	১৪২৫
বেদনা পেয়ালা	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দৈব বি-এ	১৫২২
বেদনা (কবিতা)	শ্রীমতী নলিনী দেবী	১১৩৬
বেঙ্গলী যুবক সমিতি হইতে প্রীতিকা কামিনী রাধকে প্রদত্ত অভিনন্দন	...	১৫৫৪
বৌদিহি (গল্প)	শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৪৭৬
বাধার দান (কবিতা)	শ্রীকেশব লাল রায়	১৪২৮
বাংপত্তি না বিপত্তি	...	১৫২২
ব্রাহ্মণ (কবিতা)	সোহানী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন চৌধুরী	১২৫৬
শরীরঃ ব্যাধি মন্দিরঃ	...	১৩৬৭
শিকার প্রসার	শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ	১০৭৪
শিকার আদর্শ	অধ্যাপক শ্রীগণেশ নাথ মিত্র এম, এ	১২২৬
শিশুদিগের বাজ	...	১৫৮২
শৈতের নিঃশব্দ (গল্প)	শ্রীপ্রদুর্ন কুমার দাস	১২০০
শ্রীক-পত্ন	...	১৫৬৬
শ্রীকৃষ্ণ লক্ষী (কবিতা)	শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু বি, এ	২৮৭
শ্রীশ্রীরাঙ্গ রাধেশ্বরী মাতার শোভাযাত্রা	...	১৪১৩
শান্তরী বউ	শ্রীমতী রমা দেবী	১১২২
শব্দ ময়	ঐশ্বশেষ চন্দ্র বসু বি-এ	১২২৬
সঙ্ঘঃ স্নাতা (কবিতা)	...	১০২২
সনেট	শ্রীকৃষ্ণ কিশোর দাস বি-এল	১৫৪৪
সন্ধ্যার যাত্রী	শ্রীমতী মঞ্জুরী দেবী	১০৫১
সপ্তদশ সাহিত্য সম্মিলন	সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ অমৃতলাল বসু স্বচেনা বচনের সংক্ষেপসার	১৩৭৭



বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
সংস্কারক (গল্প) ...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুমার	১৪৮৯
সার্বভূতা (কবিতা) ...	শ্রীশচন্দ্র চন্দ্র	১২৫৫
" ...	শ্রীকৃষ্ণ মধব বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮১
সাম্য ...	শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়	১১০৭
সাংস্কারিক ধর্ম ...	শ্রীজিতেন্দ্র কুমার রায়	১৫১৪
সাহিত্য সম্মিলন ...	শ্রীকৃষ্ণ নাথ ঠাকুর	১২১৪
সাহিত্যে চুরি (কবিতা) ...	শ্রীকৃষ্ণ কিশোর দাস বি-এল	১৩৭৭
স্বপ্নের আশ্রয় (কবিতা) ...	শ্রীমতী শ্বেতমতী বসুজায়া	১৩৭৪
সোণার কাঠি (গল্প) ...	শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়	১৩৩১
সৌন্দর্য ও স্বামী (কবিতা) ...	শ্রী অমলা বসু	১৫৩৫
স্বপ্নের দেশ (কবিতা) ...	শ্রীমুগাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪৮১
স্বপ্নে (কবিতা) ...	শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সরকার	১৩২০
স্মৃতি-সেখা (উপন্যাস) ...	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮৫২, ৮২৮, ২৩০, ২৫৩, ২৩৩, ১০২৫, ১০৪৮, ১০৮৮, ১১১৪, ১১৭৮, ১২১১, ১২৩৬, ১২৮৪, ১৩১৩, ১৪৪১, ১৪৪৪, ১৪৮৭, ১৫৩৮, ১৫৩০
হাসির মূলা ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন	১৩১১
হাসি ও কান্না ...	শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়	১৫৩৮
হিন্দু সভা ...	লালা লালপত্নী রায়	১৫১১

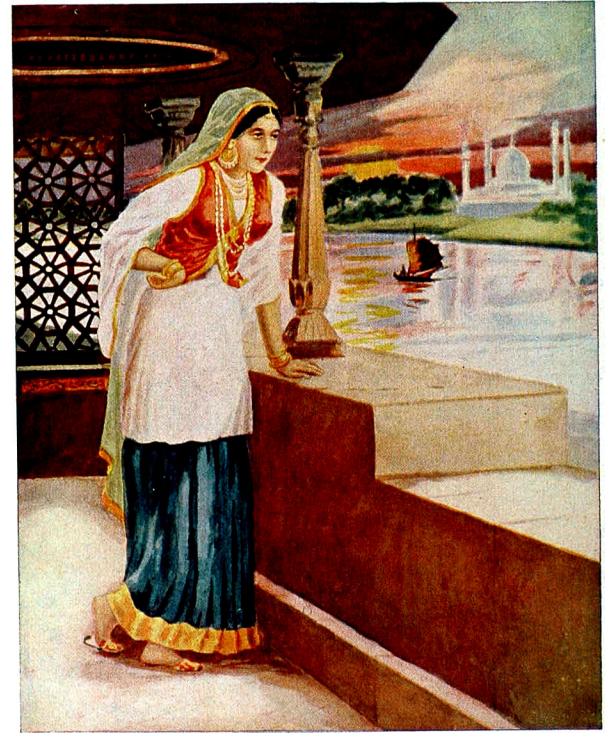
## চিত্র-সূচী

নাম	শিল্পী	পৃষ্ঠা
উদ্বোধনের পথ	শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়	৮৪১
মাসী পানে চেয়ে কেন বও	শ্রীবিদ্যকৃষ্ণ বসু	২০৫
শ্রীগোরাধ (শ্রীশ্রীগোরাধ সাধন সম্বলিত শ্রীগোরাধের সৌভাগ্য)	২৩৭	
বন্যস্তর বন্যেবী এক, ছে, ফোর্ড অস্তিত্ব হইতে	২৩৯	
"গানোমে" জি, নুদীর অস্তিত্ব চিত্র হইতে	১০০১	
"প্রদীপ নিভেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি হোরের কোকিল রবে"	১০০৩	
রবীন্দ্রনাথ "শ্রীচাক সেন"	১০০৩	
"রোমিও জুলিয়েট"	১০০৭	
সানার্বিনী	১১২৯	
ধ্বংস হাওয়া, শ্রীচাক সেন	১১৩১	
জল ভরণে	শ্রীচৈতন্য দেব চট্টোপাধ্যায়	১১৩৩
ময়াজি ও কৃষ্ণা মধ্য রহা	আরব্য উপন্যাস হইতে	
জটনক ইংরেজ শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত	১২৫৭	
জলের মাঝে খুঁজিছ কি একাকিনী	১২৮৯	
জলকতা	শ্রীকৃষ্ণের সেন	১৩২১
ধূপ আগনার গন্ধ—	শ্রীচাকচন্দ্র সেন	১৩৫৩
আপনি বিলাতে চাহে		

দ্বিতীয় বর্ষ]

নবমুখ

[ ২৫শ সংখ্যা



'উদ্বোধনের পথ'

শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়।





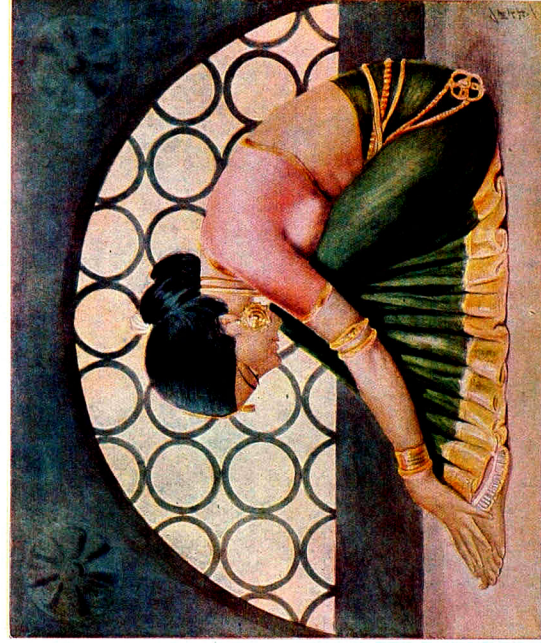
‘অভিমানের অশ্রু বহা’

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু ।

দ্বিতীয় বর্ষ]

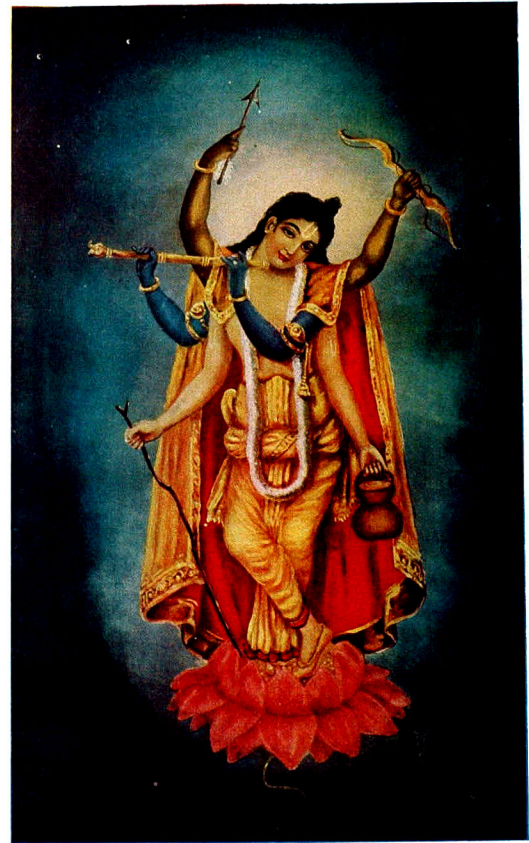
নবযুগ

[ ২৭শ সংখ্যা



‘মাতী পানে ডেয়ে কেনে বড়’

শিল্পী—ঈবিনকৃষ্ণ বসু।



শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ





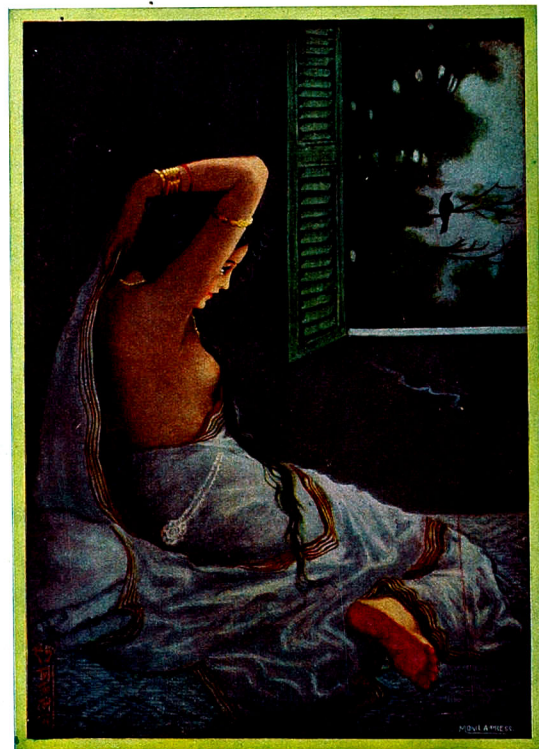
বসন্তের বনদেবী

[ এক, জে, ফোর্ড আঁকিত হইতে।



“সালোমন”

[ জি, বৃগীরে অঙ্কিত চিত্র হইতে । ]



“ \* \* \* প্রদীপ নিভেছে সবে,  
জাগিছা উঠেছি ভোরের কোকিল রবে।”

রবীন্দ্রনাথ—

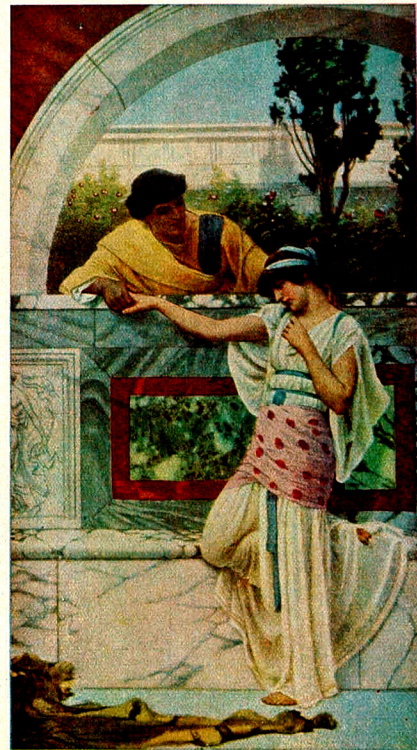
শিল্পী—চাক সেন।





‘পাশী-সুন্দরী’

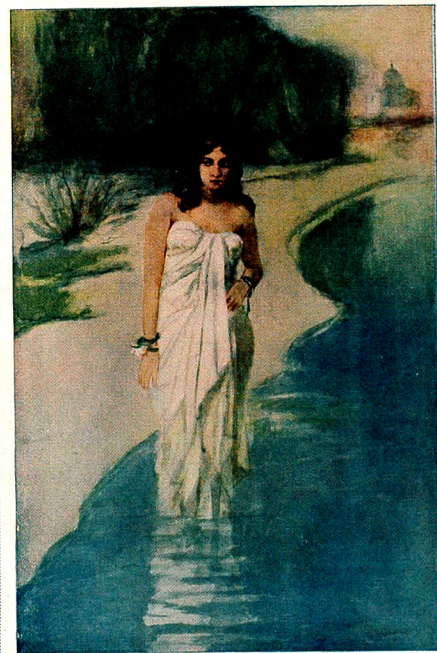




‘রোমিও-জুলিয়েট’








প্রানার্থিনী

শিল্পী—হেমেন্দ্রপ্রসাদ



কিছু অন্তর্ভুক্তি ইচ্ছা করিলে  
 প্রকাশনা করুন  প্রকাশনা করুন

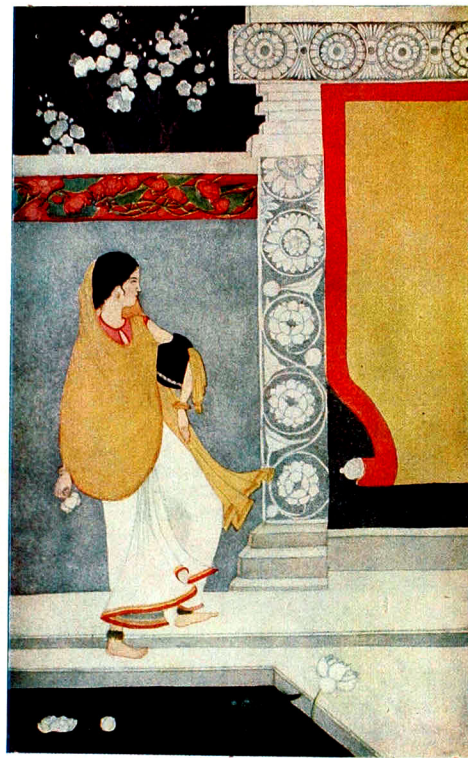


‘বীথন হারা’

শিল্পী—শ্রীচ্যক্ৰ সেনগুপ্ত ।







"জল ভরণে"

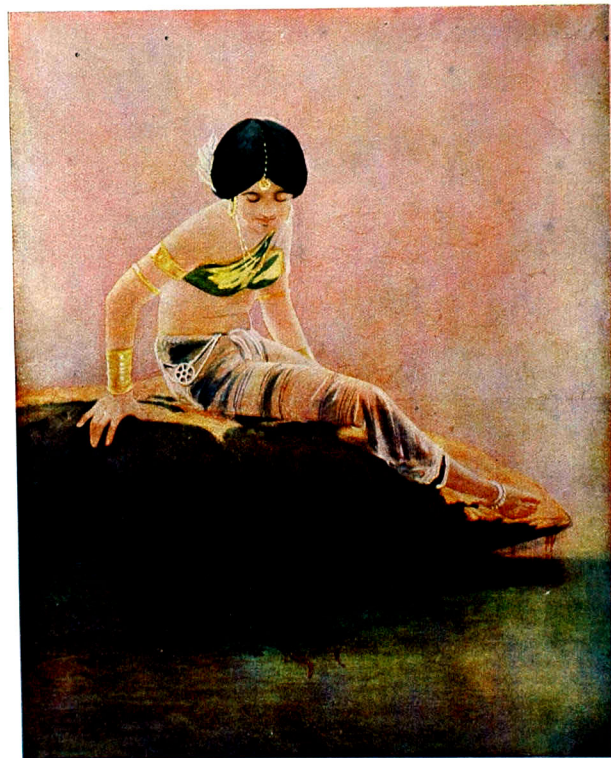
শিল্পী—শ্রী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ।





মরজিনা ও কৃষ্ণা মথাসু দহা ।  
[ আরব্য উপদ্রাস হইতে জনৈক ইংরাজ শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত ]





“জলের মাঝে খুঁজিছ কি ?  
একাকিনী”





'অল-কড়া'

শিল্পী—শ্রীকিত্তীজনাথ মজুমদার।

[ চিত্রাধিকারী শ্রীমুকুন্দ চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্মে ]







“দুপ আপনার গন্ধ—  
আপনি বিলাতে চাহে।”

শিল্পী—শ্রী চাক্র চন্দ্র সেনগুপ্ত।





‘বিদেশিনী’







"দুখি রে আমার দুঃখের নাহিক গর"





দেশবন্ধুর জ্যোতির্গম্য মূর্তি





"ফলগুয়ালী"





বিরক্তি ও বিষয়







( বিলাতী চিত্র হইতে )





( বিলাতী চিত্র হইতে )





দ্বিতীয় বর্ষ [ ২০শে মাঘ শনিবার, ১৩৩২, ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ ] ২৫শে সংখ্যা

### কালনিমে

শ্রীমুণ্ডালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিভীষিক।	'প্রবেশিকা'	ছেলে যদি পাশ হয়,	৪		
তবে তার	দু'হাজার	দাম হবে—মন্দ নয়;	পূর্ণগ্রাশ	অভিলাষ	করে যদি M.A. পাশ
এই বর	সত্তা দর	বুঝিবে মেয়ের বাপ	রমারম	একদম	করি তার সন্ধান।
করে জারি	নিতে পারি	আরো, যদি দিই চাপ।	কার ? তাহা	তাও হা হা	বলে দিতে হবে ফের ?
			কচ্ছাদায়ে	ধরে পায়ে	কাণিবে যে, সে জনের।
তার পর	I.A. বর	সাধিবে বহু লোক,			
জরাসাব	সম রব	কেবলি গিলিব ঢোক।	'ল' এ কোঁক	হ'ব জৌক	ভারি যদি পাই দিন
অগস্ত্য	অতি দীর	কেবা শুনে কথা কার!	বিধিমতে	কেজা কতে	হয়ে যাব আলাদীন;
এক কথা	বধা তথা	"দিতে পার ক' হাজার ?"	হেসে হেসে	কেশে কেশে	ঝিল ধরে যাবে পেটে,
			অচিন্ত্য	হুনিয়ায়	অগ্রে নিশি যাবে কেটে।
B.A. পাশ	যেই, বাস	আমি আর আমি নই,	ভগবান	দয়াদান	কর যদি এক বিদু
রাতারাতি	হাতাহাতি	ধনী হব অবশ্যই—	নিপিকারে	যাই পারে	সাঁতারি আশার সিদ্ধ।
সগরবে	কব সব	বিকট তাহার দাম	এক স্বাকা	লব টাকা	তার কমে 'কভি নেহি'
বুঝাইব	ছুটাইব	'বরপণে' কাল দাম।	পিটি ঢাক	তুলি হাক	খালি ঘেছি ঘেছি মেহি।



## প্রাচীন ভারতের গ্রাম

“পাণ্ডুল”

কোন অতীতযুগে ভারতে প্রথম গ্রামের সৃষ্টি হয়, তাহা আর পর্যন্ত কেহ নির্ধারণ করতে পারে নাই। আর্ধ্যগণ এদেশে আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে এই দেশ অধিম অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। বর্তমানে যাহাকে ব্রাহ্মি-জাতি বলা হয়, তাহারা এই অতীতকালে এক প্রকার উন্নত সভ্যতার আনাকে আনোক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনেক অস্থমান করেন; এই অস্থমান বিখ্যাত নহে। অনেকে ইহাও মনে করেন যে, আর্ধ্যগণ এদেশে আসিবার পূর্বেও এদেশে গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালের অধিম অধিবাসিগণ যে সম্ভবস্থ হইয়া ভিন্ন পর্যাতে বা তদনিকটবর্তী সমতল ভূমিতে বাস করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “It is a common error, vitiating all conclusions as to the early history of India, to suppose that the tribes with whom the Aryans, in their gradual Conquest of India, came into contact, were savages. Some were so. There were hill tribes, gypsies, bands of hunters in the woods But there were also settled communities with highly developed social organisation, wealthy enough to excite the cupidity of the invaders and in many cases too much addicted to the activities of peace to be able to offer, whenever it came to a fight, a prolonged resistance.” Rhys Davids এর এই বাক্যে কয়টি হইতে মনে হয়, অধিম অধিবাসীগণ সম্ভবস্থ হইতে জানিত। হম সাহেব (author of the History of ancient near east) লিখিয়াছেন যে, অর্ধ মহা-কৃতি এবং অর্ধ মনস্কাকৃতি এক দেবতা পারন্ত সাগর

পার হইয়া সভ্যতার আশোক হস্তে ব্যাবিশনিয়াতে পৌছেন। এই সভ্যতা ব্রাহ্মি সভ্যতা বলিয়া তিনি অস্থমান করেন এবং ইহা ভারত হইতে আরম্ভ হইয়া আন্তে আন্তে ব্যাবিলনিয়া, সিরিয়া হেতিত, পারস্ত প্রভৃতিস্থানে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে সিন্ধুদেশের মহেশ্রাও ও হারাপ্পা নামক স্থানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বয়ানার্মি যে সমস্ত অতীতকালের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। অনেকের মতে এই সমস্ত ভ্রম ব্রাহ্মি সভ্যতার নিদর্শন। আর্ধ্যগণ এদেশে আসিবার পূর্বে এদেশে যে এক প্রকার সভ্যতা ছিল, তাহা আবিষ্কার করিবার উপায় বড় দেখা যায় না; হস্তগত তথ্য যে এদেশে গ্রামের সৃষ্টি হইবে তাহা আর বিচিৎ কি।

প্রাচীনকালে যে গ্রাম নির্মিত হইতে সে সম্বন্ধে নানা পুস্তকে নানাপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। মাধবের ভাবই সম্ভবস্থ হইয়া বাস করা। তাহারা একা একা জীবন যাপন করিতে পারে না; এই জন্তই সমাজের সৃষ্টি। এক একটা সমাজ এক একটি নিদিষ্টস্থানে বাস করিতে ভাল বাসিত বলিয়াই গ্রামের সৃষ্টি। কতকগুলি লোক একত্রে বাস করিলে নানা প্রকার অসুবিধা হয় স্বতঃস্বেয়া সামাজিক প্রচার সৃষ্টি হয়। এক একটা সমাজ নিজের স্ববিধার জন্য পাহাড়ের নিকটবর্তী নদী প্রবাহিত হস্তর ও উর্বরা স্থানে গ্রাম নির্মাণ করিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে; —“Boundaries (of villages) should be denoted by a river, a mountain, forests, babbous plants (grishiti), canes, artificial buildings (Setubandha) or by trees such as Salmali (silk Cotton tree) Sami (Acacia sama) and Kshiravriksha (milky trees).” দেশের লোক-

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং দেশকে বিদেশী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দলপতির পদ সৃষ্ট হইল। এই-রূপে যিনি বহু দলপতির নায়ক হইতেন তাহাকে রাজা বলা হইত; সাধারণ লোকেই রাজা পছন্দ করিয়া লইত রাজার ছেলে রাজা হইবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তবে রাজার উপযুক্ত পুত্রকেই সাধারণতঃ নির্বাচন করা হইত। অনেক সময় তিনি প্রজা পালনে অক্ষম হইলে, প্রজাধারা পদচ্যুত হইতেন। প্রজাধা অর্থাৎ সাধারণ লোকই ছিল রাজ্যরক্ষার কর্তা, রাজা তাহাদের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন এবং তাহার পরিবর্তে প্রজাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর পাইতেন মাত্র। যখন এই সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, তখন বিদেশ হইতে লোক আসিলে রাজা নিজ ব্যয়ে তাহাদের বস-বাসের জন্য নূতন গ্রাম নির্মাণ করিয়া দিতেন। হেডেল সাহেবও অর্থশাস্ত্র বর্ণিত গ্রামের বিবরণ দিয়াছেন। তবে এটাই আদর্শ মতের অনেকটা আছে।

নানা পুস্তকে নানাপ্রকার গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রামের বিবরণ সম্বন্ধে মনসার শিল্পশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। তাহাতেও নানাপ্রকার গ্রামের বর্ণনা আছে। নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেকস্থানা গ্রাম পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত থাকিবে। পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত থাকিলে ভোরে উঠিয়াই স্ব্যালোক পাইতে পারে এবং সমস্তদিন গ্রামস্থানা বোজ পাইয়া থাকে। ভারতে সাধারণ উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে হাওয়া প্রবাহিত হয় স্বতঃস্বেয়া গ্রামবাসিগণ সমস্ত বৎসর মুক্ত বায়ু শ্বেনন করিতে পারে।

প্রতি গ্রামেই অনেকগুলি রাস্তা ছিল। গ্রামের মাধবল বিয়া যে রাস্তাটি পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত থাকিত তাহাকে “রাজপথ” বলিত। অল্প একটা রাস্তা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া রাজপথের উপর দিয়া উত্তর প্রান্তে গিয়া পৌছিয়াছে, উহার নাম “বাসন পথ”। এই “বাসনপথের” উপর দিয়া “রাজপথের” সমস্তরাস্তাভায়ে পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত অনেকগুলি ছোট রাস্তা থাকিত। কোন কোন গ্রামে “বাসনপথের” সমস্তরাস্তাভায়ে রাজপথের উপর দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত অনেকগুলি রাস্তা থাকিত। এই সকল রাস্তার পার্শ্বে গ্রামবাসিগণ গৃহ নির্মাণ করিত।

নানাপ্রকার বাধানিধিও আপদ বিপদ হইতে গ্রামকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রাম প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিবার নিয়ম ছিল। কাঠদ্বারা গ্রামস্থানাকে বেষ্টিত করা হইত; কখনও কখনও পাথর বা ইটক দ্বারা প্রাচীর নির্মিত হইত। প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীরের বাহিরে একটি বড় রাস্তা ছিল এবং ভিতরেও একটি প্রশস্ত রাস্তা ছিল। এই ভিতরের রাস্তার নাম ছিল—“প্রদক্ষিণ পথ”, বিশেষ বিশেষ কারণে গ্রামবাসিগণ মিছিল বাহির করিয়া এই রাস্তার চারিদিক ঘুরিত। প্রত্যেক গ্রামের বড় ছুটি রাস্তার চারি মাথায চারিটা তোরণ বা গ্রাম-প্রবেশ দ্বার ছিল। আবার কোন কোন গ্রামে চারি কোণে আরও চারিটা অধিক ছোট ছোট রাস্তা হইত। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে “রাজপথ” ও “বাসনপথ” একত্র মিলিত হয়। এই কেন্দ্রস্থলে গ্রামবাসিগণ একটা বটগুচ্ছ রোপণ করে অথবা সকলে মিলিয়া একস্থানা গৃহ নির্মাণ করে। এই গৃহকে সাধারণাণ্যরূপে, গ্রামের পঞ্চায়তি বিচার এখানে হয়। আবার কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে গ্রামবাসিগণ এখানে একত্রিত হয়। প্রত্যেক গ্রামে একটি দেবমন্দির থাকিবেই থাকিবে এবং তাহার নিকট একটি ধর্মশালা থাকে। এই মন্দির হয় গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অথবা পূর্বাধারের নিকটে। গ্রামবাসিগণের দানের উপর নির্ভর করিয়া এই মন্দির ও ধর্মশালা পরিচালিত হইত। বুদ্ধ-বুদ্ধি এই মন্দির হইতে দেয়তর প্রসাদ লাভ করিত এবং বিশ্রামের জন্য ধর্মশালায় আশ্রয় লইত, প্রতি গ্রামে দুইটি পুরুষী থাকিত বলিয়া অস্থমান হয়—একটি উত্তর পূর্বকোণে অল্পটা দক্ষিণ পশ্চিমে কাঁঠে। এই গৃহের ভিন্ন প্রতি গৃহেই একটি করিয়া কূপ ছিল। গ্রামের একে অঙ্গের অভাব মোচনের জন্য প্রত্যেকদিন তাহারা নিদিষ্ট স্থানে ভ্রম্য সামগ্রী লইয়া একত্রিত হইত। যাহার যে বস্তুর অভাব সে তাহার নিজের কোন ভ্রম্য বস্তুর দ্বারা সে অভাব পূরণ করিত। এই স্থানকে বাজার বলে। সাধারণতঃ ছোট গ্রামে “বাসনপথের” দক্ষিণ মাথায প্রাচীরের বাহিরে বাজার বসিত। কোন কোন বড় গ্রামে চারটি পর্যন্ত বাজার থাকিত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,



প্রত্যেকখানি গ্রাম লম্বা এককোণের উপর ছিল এবং উহাতে অল্পতঃ এককত্বের গৃহস্থ বাস করিত। মোটের উপর প্রত্যেকখানি গ্রামে এক হাজারের অধিক লোক ছিল।

ভারতের অতীতযুগে যখন জাতিবিভাগের সৃষ্টি হয় নাই; তখন সামাজিক রীতিনীতি খুব কমই ছিল। প্রত্যেক গ্রামের সন্নিকটে বহু পতিত জমি থাকিত। এই জমিতে সকলেই সমান অধিকার ছিল। পতিত জমির অর্ধেক গোপালনের জন্ত ব্যবহৃত হইত, দ্বিতীয়ার্দ্ধ জমি সকলে মিলিয়া চাষ করিত। তাহাতে যেসকল উৎপন্ন হইত তাহা সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইত; অথবা জমি চাষ করিবার পূর্বে সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইত। সেই অতীত যুগের ভাতিবাসিগণ পক্ষে এত ভালবাসিত এবং আদর করিত যে, ফসল উৎপন্ন জমির অর্ধেক গোপালনের জন্ত থাকিত। সেখানে—শ্রামল দূর্ধ্বা ও কতি যাস জমিত। গরু বাছুর মেষাদিবে চড়িয়া বেড়াইত। সকল জীবের ভিতরই ভগবান অবস্থিত এবং তাহাদের প্রতি দয়াই ইন্দ্রকে ভজনা করা—ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের সভ্যতা (He who loves His creatures is loved by Him) ইহা ছিল তাহাদের একটি মূল মন্ত্র। গ্রামস্থ বন্যের যে জমিতে চাষাবাস হইত সেই জমিতে ভাল বাস জন্মিবে হৃতবারা বিত্তীয় বন্যের তাহা গোপালনের জন্ত রাখা হইত এবং পতিত জমি গ্রামবাসিগণ চাষ করিত।

জাতি বিভাগ সৃষ্টি হইবার পর যখন নৃতন গ্রামের সৃষ্টি হইত, তখন গ্রামের স্রষ্টা ও ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্টরূপে পারিতেন, বহু ও অল্প আত্মা হান লাভ করিত। বাহিরের জমি সমান ভাগে পারিবারের লোক অল্পপাতে সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইত, ইহার পরবর্তীকালে ধোপা, নাপিত, রাশ্মণ প্রভৃতি লোক গ্রামের বাহিরে জমির অধিকারী হইত না। ব্রাহ্মণ লোকের মূল্যের জন্ত বহু পুরাতন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গৃহস্থের বাড়ীতে শাস্ত্র শ্রবণ করিতেন। গ্রামবাসী তাঁহাদের আহার্য্য বোপাইত। অস্বাভ্য প্রণীত লোক তাহাদের জমি থাকিত না, তাহারা গ্রামে কাড়কুৎ করিয়া যাহা পাইত,

তাহাতেই তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ একই গ্রামে শান্তিতে বাস করিত, তাহাদের ভিতর ঝগড়া কলহ ছিল না বলিলেই চলে।

গ্রামবাসিগণ আপন আপন নির্দিষ্ট জায়গা গৃহ নির্মাণ করিত। বাশ, কাঠ, ইট, পাথর প্রভৃতি ছিল তাহাদের গৃহ নির্মাণের উপকরণ এবং ঐ সমস্ত জিনিষ দ্বারা গৃহের দেওয়াল নির্মাণ করা হইত। উৎরে ইট বা পাথরের পাতা দ্বারা ছাউনি দিত। তাহাদের আপন আপন কতি অস্থায়ের গৃহ নির্মাণ করিত। সমস্ত শিল্পশাস্ত্রে নথ তাল্লা গৃহের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তিন তাল্লা গৃহ যে ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকে একতাল্লা গৃহই নির্মাণ করিত। আমাদের বর্তমান বহুদেশের গ্রামের সহিত প্রাচীনভারতের গ্রামের কোনই সাম্য নাই। গ্রামের বাড়ীগুলি সলঙ্গ কিছু ছোট ছোট রাই বা গলিবার বিচ্ছিন্ন করিত। সাধারণ লোকের বাড়ীতে তিনটি অংশ থাকিত—বাহিরের মহল অন্মর মহল ও রান্না মহল, অন্মর মহল জ্বলোকবিধের জন্ত ব্যবহৃত হইত এবং শ্রমসাধার বসিয়া কথিত হইত। বাহিরের মহলে লোকজনের বিবাহের গৃহ এবং গো-মহিষাদির থাকিবার ও আহারের গৃহ থাকিত। ধনী লোকেরা প্রায়ই বাগান তৈরী করিত। সাধারণ গৃহস্থ বাগান তৈরী করিতে পারিত না বলিয়া ছুই চারটি ফল ফুলের গাছ এদিক ওদিক রোপণ করিত।

গ্রামের ছেলপিলেদের নৈতিক) চরিত্রগঠন ও বিদ্যা শিক্ষার জন্ত গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে হইত। গ্রামের যে অংশে লোকসম বাস করিত সেই অংশে অথবা দেবমন্দিরের নিকটে গুরুগৃহ নির্মিত হইত। কোন কোন গ্রামের প্রাচীরের বাহিরে পূর্বদিকে গুরুগৃহ থাকিত। এইখানে গুরু তাহার শিষ্য লইয়া বাস করিতেন। গ্রামের লোকের হানে এই বিদ্যালয়ের ও ছাত্রগণের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইত।

যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “...ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা য়েছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রবণত্ব সহরে নয়, বনে।...প্রাচীন ভারতবর্ষে

দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মাছবের বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া বরফ তাহাকে এমন একটি শক্তি দান করিয়াছিল যে, সেই অরণ্যবাসিন্দেস্ত সভ্যতার দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অধিকৃত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রথাই বহু হয়ে যায়নি। “এই সভ্যতার দ্বারা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী—তাঁরা বিরল বনস তপসী।”

অধিকাংশ গ্রামের উত্তর দিকে হয় বন না হয় পাহাড় থাকিত। এই বনের নির্জনস্থানে বা পর্তুগীজ গুহার তপস্বীগণ সাধনা করিতেন। এই সাধনা দ্বারাই তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতেন। এই মুক্তিলাভই ছিল ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ। আর বন জঙ্গলই ছিল সেই সাধনা ক্ষেত্র। গ্রামের পার্শ্ববর্তী বন গ্রামবাসিগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁহারা বন হইতে জালানী কাঠ, গৃহ নির্মাণের জন্ত কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করিত। বনের উপর সকলেরই সমান অধিকার ছিল।

কোন জায়গা গ্রাম নির্মাণের জন্ত নির্দিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া এক যজ্ঞ করিতেন। এই যজ্ঞ শেষ হইলে সমস্ত জমি চাষ করা হইত। চাষ করার দশম সমস্ত উৎকর্ষী ভূমি সমস্তল ক্ষেত্রে পরিণত হইত। একত্রেই হস্তর বলদ দ্বারা জমি চাষ করার নিয়ম ছিল। বলদ দুইটি একই রংএর না হইলে চলিত না। যদি বলদ দুইটির রংএর একই সমুদ্রে দুই পদে সাধা রেখা থাকিত তাহা হইলে গ্রামবাসিগণ অতিশয় সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিত এবং গ্রামবাসি যে সর্গভিষয়ে উন্নতশীল হইবে তাহা নিঃসন্দেহচিন্তে বিশ্বাস করিত।

সমস্ত স্থানের চাষ সমাপ্ত হইলে সেই কর্তৃত্ব হানে রেখা দ্বারা গ্রামের নক্সা চিত্রিত হইত; এবং সেই নক্সা অস্থায়ী বাড়ী ঘর, রাস্তা, প্রাচীর প্রভৃতি নির্মিত হইত। গ্রামের নক্সা প্রস্তুত হইলে যেখানে যে বৃক্ষ রোপণ করা যাবতকাল তাহা যথারীতি সম্পন্ন হইত। এইরূপে একটি জনহীন প্রান্তর একখানা হস্তর গ্রামে পরিণত হইত। আত্মকাল এইরূপ গ্রাম খুব কমই দেখা যায়। কিছুদিন হইল আমতা বনয়ন পরজন্ম গয়া হইতে গ্রাম বিশ মাইল দূরে তপোবন পাহাড়ে গিয়া-

ছিলাম, তখন এই পাহাড়ের নিকট বহুধর নামে একখানা গ্রাম দেখিয়া প্রাচীন ভারতের গ্রামের কথা মনে হইয়াছিল, অর্থাৎ এই গ্রামখানার সহিত প্রাচীন ভারতের গ্রামের খুব সৌসাদৃশ্য ছিল।

আত্মকাল ভারতবর্ষে বর্তমান গ্রাম আছে, প্রাচীন ভারতে এত গ্রাম ছিল না। আত্মকাল ভারতের এক একখানা গ্রাম যেন এক একটি রাক্ষসী সৃষ্টি—একটিকে দারিদ্র্যের কবচমুষ্টি ও ম্যানেজারের ভীষণ আক্রমণ অল্প শিক্ষার অভাবে দুর্বল এবং গর্ভবর্তন দ্বারা উপেক্ষিত; কিন্তু প্রাচীন ভারতের এক একখানা গ্রাম এক একটি সমৃদ্ধিশালী ছোট প্রজাতন্ত্র বাধীন রাজ্য ছিল, “...The ancient Indo Aryan village was essentially a self governing community...”

আত্মকাল প্রজাতন্ত্র রাজ্যের জন্ত এগিয়া, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকের মধ্যে যে আমোলান চলিতেছে, ইহার মূল সৃষ্টিতে গোল, আমাগিগকে প্রাচীন যুগের একখানা গ্রামে গিয়া পৌছিতে হইবে। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে এক বড় একটা ভারের উৎপত্তি। অশ্বিন ভারতের দুই একটি গ্রাম এখনও এমন হৃৎস্পন্দার সহিত চলিতেছে, যাহা হইতে বড় বড় শাসনতন্ত্রের নামকরণ অনেক কিছু শিথিতে পারেন। প্রাচীন যুগে এক একখানি গ্রাম এমন স্বন্দর ভাবে তাহার স্বাভাবিক পরিচালিত, যাহা বর্তমান ভারতের বর্ণপেশারের পরিচালিত না। ঐ সমস্ত বিষয় শিথিতে হইলে নির্দলকর লোকে পরিপূর্ণ প্রাচীন ভারতের গ্রামের ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি আলোচনা করিতে হইবে।

গ্রামের শাসন সম্বন্ধে রাজার কোন হাত ছিল না। তবে গ্রামের দলপতি বা পাকারজি সভ্য সভাপতিত্ব সহিত রাজার সম্বন্ধ ছিল। দলপতিই রাজার প্রতিনিধি। রাজার সহিত প্রজার কোন সম্বন্ধ ছিল না অর্থাৎ তিনি প্রজাবাদের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামের সাধারণ লোকই দলপতি নির্বাচন করিত। যদি দলপতি কোন কারণে অক্ষম হইত, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর ব্যক্তিকে নির্বাচন করিত। দলপতির মৃত্যুর পর তাহার



পূজকেই দলপতি নির্বাচন করা হইত; কিন্তু সে যদি সে ক্ষেত্রে অযোগ্য হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইতেন। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চায়তি সভাই গ্রাম শাসন করিত। কখনও কখনও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক গ্রামবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত কার্য্য-ভার গ্রহণ করিতেন। এই পঞ্চায়তি কাজে ভ্রোলাকরণও অংশ লইত। আমরা এখানে স্বরূপিত শ্রীকৃষ্ণ বিনয়-স্বায়ম্বরসকল লিখিত "The Political institutions and theories of the Hindus" হইতে কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করিলাম—"It can legitimately be generalized from over a dozen Chola inscriptions bearing on a Tamil village near Conjeeveram that the village Sabhas had in their hands, full responsibility for the entire administration of the rural areas."

"They (the appointed or elected officials of the rural commune)" received deposits of money and grants of land for charitable purposes, and administered the trust by a board of commissioners specially appointed for the purpose from year to year." They received all the taxes and had the right to render villages tax-free, and if necessary could grant to landholders an exemption from customary dues."

"This co-operation in communal politics was not however the monopoly of men. Women also, were proud to be partners in works of public utility."

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যিক। V. A. Smith লিখিয়াছেন যে, ভারতের জমি রাজার সম্পত্তি ছিল। প্রজার তাহাতে কোন অধিকার ছিল না; সে মাত্র জমি চাষ করিতে পারিত, অল্প কাহাকে দান বা বিক্রয় করিতে পারিত না। আমরা শ্রদ্ধা সাধনের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের মতে

রাজা মাত্র রাজ্য রক্ষক ছিলেন। ভূসম্পত্তি সমস্ত প্রজার ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহা বিক্রয় করিতে পারিত এবং অল্প কাহাকে দান করিতে পারিত। লাল্লা লাজপত রাঘু আমাদের মত সমর্থন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিনয়স্বায়ম্বরসকল লিখিয়াছেন—

"The South Indian Panchayats were absolute proprietors of the village lands, with rights of ownership over newly cleared lands."

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রামের লোক যেমন দলপতি মনোনীত করিত, রাজাও তেমনি দেশের লোকদের দ্বারা মনোনীত হইতেন। রাজা অস্থায়িক হইলে তাহাকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা প্রজাদের ছিল। রাজা দশমধ ধ্বন রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তখন তাহাকে প্রজামণ্ডলীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অনেক দূতান্ত হইতে দেখা যায় যে, রাজা প্রজামণ্ডলীদ্বারা পদচ্যুত হইতেন। রাজা শাসনও গ্রহণ করিবার সময় প্রজাদের নিকট কতকগুলি শপথ করিতেন। বিনয় সরকার লিখিয়াছেন:—"A specimen of the Pratijna, promise vow or oath made by kings to the people is thus worded in the Aitareya Brahman: "Between the night I was born and the night I die, whatever good I might have done, my heaven, my life and my progeny may I be deprived of, if I oppress you."

গ্রামপতি গ্রামের প্রধান লোক। গ্রামের শাসন বিষয় লইয়া রাজার সহিত যদি কিছু আলোচনা করিতে হইত, তাহা তিনিই করিতেন। কোন কোন গ্রামে একাদিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া গ্রামপতির কাজ করিত। গ্রাম রক্ষা, কর তোলা, কর দাখ্য করা প্রভৃতি দলপতির কাজ ছিল। গ্রামের জন্ম আইন কাহান গ্রামের লোকই করিত। বিচার আচার তাহারাই করিত। তবে ছোট-পাট বিচার দলপতিই করিতেন। রাজার যদি কখনও সৈন্তের আবশ্যক হইত দলপতি নিজগ্রাম হইতে বাহিয়া

বাহিয়া সৈন্ত পাঠাইতেন। এই আইন কাহান সকলেই মানিতে বাধ্য হইত। কেহ আইনের বিরুদ্ধচরণ করিলে শাস্তি পাইত। গ্রামের বড় দুইটা রাস্তার মিলন স্থলে এই পঞ্চায়তি সভা বসিত। কখনও কখনও দলপতির বাড়ীতেও সভা বসিত।

গ্রামবাসিগণ দ্বারা প্রকৃত নানা প্রকার আইন দ্বারা অপরাধিগণ শাস্তি পাইত। কেহ যদি জমি চাষ না করিত তাহা হইলে সে সে-জমি হইতে বঞ্চিত হইত। যদি কেহ ভিন বৎসর কর না দিত, তাহা হইলে গ্রামের পঞ্চায়ত তাহার জমি দখল করিয়া লইত। চুরি, ডাকাতি ও কাহার উপর অস্ত্রায় ব্যবহার করিলে, তাহাকে জরিমানা দিবার উদ্দেশ্যে গুরুতর অপরাধ করিলে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইত।

কোন পরিবারের আত্মগণ পৃথক হইতে চাহিলে তাহাদের স্বায়র অঙ্গাবর সমস্ত সম্পত্তি সমান ভাবে বিভক্ত করা হইত। নিম্নাংশদ্বারা বড় ছেলে কিছু অধিক অংশ লাভ করিত। কখনও কখনও কনিষ্ঠ পুত্রও এক অতিরিক্ত অংশ লাভ করিত। স্বামী বর্ধক প্রবৃত্ত বা তাঁহার পিতা বর্ধক প্রবৃত্ত জিনিষের উপর স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার ছিল, মাতার মৃত্যুর পর কন্যাই মাতার সম্পত্তির অধিকারিণী হইত।

সমাজে নানাপ্রকার বিবাহ পদ্ধতি ছিল। সমাজের প্রথাব্যবহার সকলেই সকলের মধ্যে বিবাহ করিতে পারিত। পরবর্তীকালে একবর্ষ অল্প বয়সে কন্যা বিবাহ করিতে পারিত না; করিলে সমাজচ্যুত হইত, এই বিবাহের পুস্তকটি বর্ণনাকর হইত, তাহা হইতেই ভারতে এই বর্ণনাকরজাতির নৃপতি। বাল্য বিবাহ ছিল না বলিয়াই মনে হয়, অধিকাংশ রাজস্বস্বারীই যৌবনে বিবাহ করিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই। কোটিলোর অংশদ্বয়ে Book IIIতে যে নিয়ম দেখা যায় তাহাতে মনে হয় বাল্য বিবাহ ছিল না। পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই প্রায় সকল বিবাহ হইয়া হইত। আপন ভ্রাতা ভগ্নি ভিন্ন একবংশে বিবাহ হইতে পারিত। বিবাহ বিবাহের অনেক প্রণয় পাওয়া যায়। কোন স্ত্রী নিকট সময়ের মধ্যে স্বামী সহবাস করিতে না পারিলে পুনরায় বিবাহ করিতে

পারিত। স্বামী বর্ধমানের অল্প কোন পুঙ্খের সহিত মিলিত হইলে স্ত্রীগণ শাস্তি প্রাপ্ত হইত।

পূর্ণা পদ্ধতি ছিল না। স্ত্রী স্বামীর সহিত কাছ করিতে পারিত। জাতকে দেখিতে পাই স্ত্রী পুঙ্খের সমান অধিকার লাভ করিতে পারিত। হিন্দুশাস্ত্রাধ্যায়ী স্ত্রী স্বামীর অঙ্গাঙ্গ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া ক্রিয়া বর্ধ, যাজ্ঞযজ্ঞ করিতে হইত।

গ্রামবাসিগণ নানাপ্রকার সহায়তান দ্বারা গ্রামের উন্নতি করিত। বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করিত, এক গ্রামের সহিত অল্প গ্রামের নানাপ্রকার প্রতিযোগিতা চলিত। বর্ধমানের বাহকে "গ্রাওটাক রোড" বলা হয়, অনেকের মতে উহা সেরশাহের নির্মিত, আমরা সে মতের পক্ষপাতী নই। এই রাস্তা তাহার বহু পূর্বেও ছিল, সেরশাহ মাত্র তাহার পুনর্নির্মাণ করেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রামবাসীস্বায়ের নিজ ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে ঐ রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আরও অনেক রাস্তা তৎকালে নির্মিত হইয়াছিল।

এক একখানা গ্রাম একখানা স্বায়ীন রাজ্য। সে গ্রামকে কোন কিছুই জন্ম কাহার নিকট হইতে পারিতে হইত না। কাপড় বুন, হুতা কাটা, চাষ করা, অর্থ সামগ্রী প্রভৃতি তৈরী করা, তাহারাই করিত। আশ্ব-কাল ত্রপণ, কাষধ্বংস হাল চাষ করেন না, বিশেষতঃ বর্ধদেশের ভজমহোৎসব; কিন্তু প্রাচীনকালে সকলেই হাল চাষ করিত যাহারা তাহা না করিত তাহারা দাস বলিয়া পরিচিত ছিল। বর্ধমানকালেও বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশের ব্রাহ্মণ ক্রিয় ক্রিয় ক্রিয় হাল চাষ করিয়া থাকেন।

আজকালকার একখানা গ্রামের সহিত প্রাচীনকালের একখানা গ্রামের তুলনা করিলে কি মনে হয়—হুগ্গে অপমানের বুক কাটিয়া যায় না কি? আজকাল যাহারা সভা বলিয়া পরিচয় দেন ও গ্রামকে গ্রামা বলেন, তাহারা প্রাচীন ভারতের গ্রামকে ও গ্রামবাসিগণকে কি মনে করেন—তাহাদিগকে অধিক সভা মনে করেন না আশ্বনাগণকে অধিক সভা মনে করেন?



3



নীরবতা ভ্রু করিলেন কমলের মাতা,—কোন কাশেই তিনি বজ্রার খাম-খোয়ানী স্বভাব গল্ফ করিতেন না, তিনি সে দিনের ঘটনার অস্তিত্ব বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই স্বামী উত্তর দিবার পূর্বেই বলিলেন, “তোমার সবই এক রকম, আমার যেন মত গিলুম কিন্তু জামাই শুনে কি বলবেন? তার চেয়ে কিছু টাকা দিয়ে না হয় ছেলেরা কাউকে দিয়ে সে।”

মা'র কথা কিন্তু কমলার মনমত হইল না, সবধে মাথা নাড়িয়া বলিল,—“না-না, আর কেউ যদি একে মাছব করবে তবে এত জারগা ধাক্কে আমাদের বাড়ীর কাছেই ফেলেন গেল কেন?”

কমলার কব্জার নিকট হৃৎ তর্ক বে সবই নিম্বল পিতা তাহা জানিতেন, তাই বলিলেন,—“ঠিক বলেছি মা, কিন্তু জামাই যদি রাগ করেন?” কন্ডা এবার হাসি মুখে উত্তর দিল,—“সে আমি বুঝ'বন।” মনে মনে বলিল,—“তিনি কবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কয়ছেন!”

এইধরম হুড়ান ছেলে কমলার আশ্রয় পাইয়াছিল। পিতা নাম রাখিলেন—কল্লিপাথর, অজ্ঞাত সকলে বলিত ‘কালোভূত’ বলে, কমলা সমস্ত নাম অপছন্দ করিয়া বলিল,—“ও আমার হৃদয়ে পাওয়া মাণিক, ওকে মাণিক বলেই ডাকব।”

সকলে মন করিয়াছিল, বড় হইয়া মাণিক আশ্রিত অচুপতের মত কমলার ছেলেরের মন যোগাইয়া চলিবে, কিন্তু কলে বনন উটী দেখা গেল, তখন পথের হুহুরের রাজ্যদ্ব প্রাশ্রিত তুলনা দিয়া সকলে উপহাস করিতে লাগিল না। সকলের হৃৎ তর্ক শুনিয়া কমলা বৃষিতে পারিত না, যাহাকে লক্ষ্যবস্তু হইতে নিজের সন্তানের মত মাছব করিতেছে—সামান্য অশ্বন-বসনে নিজের ছেলেরের সঙ্গে কি করিয়া তাহাকে তৎকা করা যায়। প্রথমে যাহাকে মাছু-সেই ঠাই দিয়াছে, পরে তাহাকে আদ্যপরে লুপে সরাইয়া দিলে, তাহার শিশু ধ্বংস যে কি আশাত লাগে তাহা কল্পনা করিয়া কমলা শিহরিয়া উঠিত, তাই অপরের শাসনে তাহার মন কোনমতেই সাধ দিত না।

এমনি আদর ও অনাদরে মাণিকের স্বভাবটা অজুত ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কমলা ভিন্ন সে কাহাকেও দেখিতে পারিত না। কাহাকে কিরূপে জালাতন করিতে হয়, তাহা সে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল। তাহার চোখ ছুটি দেখিলে শব্দতানের লীলাভূমি বলিয়া মনে হইত, সকল রকম দুঃখনি তাহার মাথার খেলিত, কেবল কমলা নিকটে আসিলে সে একেবারে ভাল মাহাষ হইয়া পড়াইত। এজন্য সে সকলের নিকট সে ‘মিট মিটে ডান’ উপাধি পাইয়াছিল।

### ছাই

সে দিন সকালে কমলা ধাবার তৈরী করিতেছিল, মাণিক ছুটিয়া রাগা ঘরে আসিল, বলিল,—“মা পায়েল করছ বুঝি?—মিষ্ট হ'ল কি না দেখব?”

ধাবারের নামে মাণিক আনন্দে নাচিল, কমলা কিছু করিলেই সে কেমন করিয়া তারে পাইত এবং আসিয়া উপস্থিত হইত। কমলাও এই পৌটুক ছেলেকে খাণ্ডা-ইয়া হুপ্ত হইত, এজন্য ছেলেরা পৃথগ্ন অহুযোগ করিত, “ওকে আগে না খাণ্ডায়ে মার তৃপ্তি হয় না।” কমলা হাসিয়া উত্তর দিত,—“জাহা ওয়ে ছুটে আসে।”

উষা ভাঁড়ার ঘরে কি করিতেছিল, মাণিকের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—“ঐ গো দিদি, গছ পেয়েছে, আগে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করে তবে ছেলেরের জন্ত বাটী মাঝিহো।”

সেই দিনই প্রভাতে শূভ্রার ফুল নষ্ট করার অপরাধে গিন্দাভাঁড়ার নিকট মাণিকের জন্ত কথা শুনিতে হওয়ার কমলার মন একেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উষার বিরূপে জলিয়া উঠিয়া মাণিককে বলিল,—“খেতে পাওনা মুখপোড়া? সকলের আগে যে ছুটে আসি'গ? চলে যা, সেব না।”

মাণিক রান মুখে ঘোরে শীঘ্র বাহির হইয়া গেল। সেই দিন দুই জায়ে আহারের বসিয়া, কমলা বনন পায়েলের বাটী পাতে তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, তখন উষা জিজ্ঞাসা করিল,—“খান্ধ না যে দিদি, ভাল হয় নি?”

কমলা বলিল,—“কি জানি,—মিষ্ট আর ভাল লাগে না।”

উষা হাসিয়া কহিল,—“তা নয়, মাণিককে না খাইয়ে তোমার মুখে উঠবে না সে আমি জানি, তার জন্ত এক বাটী রেখে তবে আমাদের নিয়েছি, তুমি খাও দিদি।”

কমলা এবার হাসিয়া বলিল,—“তোমার বুদ্ধি আছে উষা, কিন্তু বড় জালাতন করি'!”

উষাও হাসি মুখে কহিল,—“বুদ্ধি আমার একটুও নেই দিদি, তা'হলে আর তোমাদের বাড়ী হুটনো হুটতে আসি।”

### তিন

উষাই মাণিকের প্রধান শত্রু ইহা সে বেশ বুঝিয়া-ছিল। কখনও যত্ন ত দেখে করিয়া লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু, উষার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িয়া অশেষ হাস্য বিজ্ঞপ সহিতে হইত, ফলে সেও বুদ্ধি পাইলে তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিত।

রাত্রি আটটা। ছেলের দল পড়া শেষ করিয়া খেলায় মাত্ৰিয়াছিল, মাঝখানে লুতার ছক্ বিছাইয়া কয়েক-জন খেলায় মত্ত, কেহ কেহ আশে পাশে সুকিয়া খেলা দেখিতেছিল, শিশু হুলভ করলরে ঘূষানি পূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় বড় থোকা সে ঘরে আসিয়া সকলকে তাড়া দিয়া বলিল,—“এই তোরা এখানে বৈ বৈ করছিস, ছোট মা যে ভেঙে ভেঙে সারা হচ্ছে!” সঙ্গে সঙ্গে ‘ওরে কাশে যায় না তোদের?’—বলিতে বলিতে উষাও প্রবেশ করিল।

মাণিক এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে খেলা দেখিতেছিল, উষার সাড়া পাইয়াই সে শুইয়া পড়িয়া ঘুমের ভাগ করিল। উষা সকলকে উঠাইয়া দিয়া মাণিককে এক স্বাকানি দিয়া কহিল,—“সন্ধ্যা বেলাই ঘুম,—খেতে হবে না?” উষার মধ্যে গুরুত্বাণী বিলম্বিত করিয়া হাসিয়া বলিল,—“ও ঘুমোর নি মা, তোমাকে দেখেই শুয়ে পড়ছে, রকম দেখ না—যেন কত খুশি আছে!”

উষা মাণিকের হাত টানিয়া বলিল,—“ওঠ না।—”

মাণিক এক খটকার হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল,—“ধরেনা তুমি, হাতে লাগে না যেন।”

“গরজ যেন আমারই,—বলি ভাত খেতে হবে না?” মাণিক পূর্ববৎ কণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, আমার জন্তে তোমায় ভাবতে হবে না।”

ক্রুদ্ধা উষা বড় থোকার দিকে চাহিয়া কহিল,—“ওরে চুনি, তোরা কেউ দিদির ছেলে নেইস, তোদের যা হুদী বলতে পারি, কিন্তু ওকে ভয় করে চলতে হবে আমার! স্বাকারী হয়েছ,—যাই দিদিকে বলি।”

উষা চলিয়া যাইবার একটু পরেই—“কই সে হতভাগা” বলিতে বলিতে কমলা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাগাকে দেখেই মাণিক শান্ত শিঙের মত উঠিয়া বলিল,—“আমায় ডাকলেই হ'ত মা।”

“ডাকার কিছু করার হয়েছে?—ছোট মাঝে কিরিয়ে দিলি যে? গ্রাছ কর না তাকে এত বড় নবাব তুমি।”

মাণিক বলিল,—“ও কেন বকতে আসে।”

“ও কিরে ছোট মা যে তোমার গুরুজন, কের এরি কথা বললে মুখ ভেঙে ফেলব। কুই দিন দিন কি হচ্ছিল মাণিক, তোমার জন্ত আমার উঠতে বসতে একটুও ব্যতি নেই।” বলিতে বলিতে কমলা তাহাকে টানিয়া হইয়া গেল।

বাইতে বসিয়া মাণিক উষার দিকে কইমট্ করিয়া চাহিতে লাগিল, তার জন্তই ত মা এত রাগ করে। উষা সে চাহনি লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“বোঁদেছ দিদি কেমন করে তাকাচ্ছে,—যেন গিলে খাবে।”

শ্রান্তকণ্ঠে কমলা এবার বলিল, “জামাকে আর বলিয়ে উষা, এবার তোরাই ওকে যেমন করে পারিল শাসন কর।”

### চান্দ

লেখা পড়া দেখা মাণিকের নিকট সর্বাঙ্গেক্ষা বড় সাধ্য ছিল, বর্ণপরিচয়, সংখ্যা গণনা বাহা অন্ত ছেলেরা একদিনে শিখিয়াছিল, কমলার পাঁচ দিনের চেষ্টাও



তাহা মণিকের মাথায় চুকিত না; তবু তাহাকে স্থলে দেওয়া হইয়াছিল। কল বাড়ীর অশান্তি একটি কমিয়ারি বটে, কিন্তু অধিরের অভিযোগ খুবই বাড়িয়াছিল। হয় কাহারও বই ছিড়িয়াছে কিবা কমন ভাষিয়াছে নয় ত স্থল হইতে পালাইয়াছে, নিতা এমন অভিযোগ শুনিতে শুনিতে কমলার কাণ ঝালাপালা হইয়াছিল।

সোমিন ভবেশ একটি স্ত্রী ভাবেই বলিল,—“মিথো তোমার ওকে পড়বার সাধ, পাখা কখনও ঘোড়া হয়।” কমলা ব্যক্তি বলত কহিল,—“দেখ, আর যে বা-বলুক, তুমি কিছু বলা না, জান ত মায়ায় পড়ে ওকে নিয়ে-ছিলাম, তখন ভবিষ্যৎ কি হবে তা ভবেশ দেখিনি, তার জ্ঞত এখন প্রাতি মূহুর্তে অসুতাপ কছি। এখন ওকে যেন মাক পথে ছেড়ে না দি, এ সাহায্য তুমি আমায় কর।”

ভবেশ বলিল,—“কখন তো কিছু বলিনে তোমায় কমলা। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় অসহ্য হয়, নিজের ছেলেদের জ্ঞত করো কাছে মাথা ঠেট হয় নি, কিন্তু ওর জ্ঞত প্রাণই তন্তে হয়। আজও হেড মাস্টার বলে গেলেন, লেখাপড়ায় মোটেই মন নেই, একেবারে শাশনের বহির্ভূত। আর অজ ছেলেরও ওর দলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, এতে আমাদেরও সন্দেহ দোষ দেয়।”

কথাটা ঠিক, কমলা চুপ করিয়া রহিল। মাহুত ত জব্দ দেখে না, কমলার আহারে একটা ছোট লোকের ছেলে পাঁচজনের সমকক্ষ হইয়া চলিলে,—এ অন্তায় সকলেরই অসহ্য।

উত্তরে এক কোণে মণিক ছেলেদের খেলার জ্ঞত একটি খানি বাগান তৈরী করিয়াছিল, তাহাতে সত্যের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া আদু, মটর, পেয়ারা ইত্যাদি লাগাইয়াছিল এবং বাগানের মাঝে মালির খাকিবার ঘর, ফুয়া, একধারে শাকো শুষ্ক একটি নদী পর্যন্ত করিয়াছিল। তাহার নির্ধাণ কোঁসলে শিশুর দল ত মুহূর্তেই বই, বুকেরা পর্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ভবেশ দেখিয়া বলিল,—“হতভাগ্যর এসে ত বেশ মাথা খেলে,—কিছা বড়ি একটি মন দিত।”

ছোটভাই পীমেশ কহিল,—“এদিকে বুকটাই ওর

ঝাড়াবিক, ওর পূর্ণপুষ্ক হ'ত এই করে কাটিয়েছে। লেখাপড়া হবে না ওর—তা বৌদি বত চেষ্টাই করুন।”

কমলা নীরবেই রহিল। মণিকের হাতের নিপুণতা দর্শনে মূহুর্ত পূর্ণের আনন্দটুকু নিম্নেই নিবিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে শ্রিধরকে ছেলেমেয়েদের জামা সেলাই করিয়া কমলা দুমাইয়া পড়িয়াছিল। যুগ যখন ভার্জিল-বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, উদয়িাই সে কৃত্তিত ভাবে রামায়ণের দিকে চলিল। উভা তখন সূতি ভার্জিতেছিল, কমলা বলিল,—“পাও উয়া,—বেলে দি।” তাহাকে দেখিয়া উভা বলিল,—“জুনেছ দিদি, মণিকের কাণ্ড! স্থলে নাকি সে জ্বাংবি দিয়ে এসেছে, আর পড়তে না।”

অতিথ্য বিরক্তভাবে কমলা বলিল,—“কেন, কি হল আবার?”

“কি জানি, ছেলেরা নাকি ওর সঙ্গে খেলতে চায়নি, ওকে শুধু বল ছুড়িয়ে দিতে বলেছিল। তাই ঝগড়া করেছে, মাস্টারদের উপর নাকি ঝাল ঝাড়তে গেছেল, তার শাস্তিও পেয়েছে।”

কমলা বলিল,—“কোথায় সে?”

উভা বলিল,—“এই ত সত্যায় বসে নিজের পায়ে দুপো দিচ্ছিল, ‘ও কি হচ্ছে’ বলতেই আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে গিয়ে চুপল।”

জুহুর্তে কমলা বলিল,—“আজ তারই একদিন কি আমরাই একদিন।”

মণিক নিজের অপরাধ বৃত্তিতে পারিয়া বাইরের ঘরে বসিয়া কাদিতেছিল, কমলাকে দেখিয়া মার খাইবার ভয়ে ঘরের কোণে গিয়া ঝাঁপাইল। কমলা জুহুর্তে কহিল,—“পালিয়ে বাচবে মনে করছে? হতভাগা, আবার ঝগড়া করে এসেছ।”

মণিক কাদিতে কাদিতে বলিল,—“ওরা কেন আমায় কেলোভুত, ছোটলোক বলে?”

কমলা বলিল,—“তা মাস্টারের কাছে বলতে হ'ত, তাদের সঙ্গেই বা ঝগড়া করতে গেছি কেন?”

মণিক হাতের উন্টা পিটে চোখ মুছিতে মুছিতে

বলিল,—“শুধু কি তাই, ওরা আমাকে কাছে বেতে দেয় না, আমি যে বেকে বসি সে বেকে কেউ বসে না।” মণিক আবার কোন্‌দায় কাদিয়া উঠিল।

ইহার পর আর শাসন করা সম্ভব হইল না, বেদনায় কমলার বুক ভরিয়া উঠিল। সে শুধু মাতৃস্নেহ দিতে পারে, কিন্তু বাইরের জুগুতি ও অশমানের হাত হইতে বাহাইতে পারে না। একবিদ্য কল্যাণও সহায়-ভূতির অভাবে কেমন করিয়া একটি কোমল শিশু-হৃদয় আহত হয়, তাহা ভাবিয়া সে নির্ভীক হইল।

মণিককে মুখ হাতা ধুইতে বলিয়া কমলা নিজকে গিয়া প্রবেশ করিল। ভবেশ তখন কোট হইতে কিরিয়া জলযোগের পর সবে মাত্র খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় পড়ার পদক্ষেপে মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল মুখ তাহার মোখাচ্ছন্ন, চোখ দুটিতে সজ খবরের আভাসও রহিয়াছে। স্থলের ঘটনা সে শুনিয়াছিল, কাজেই বৃষ্টি ব্যাপার কি। মনে মনে একটি প্রমাদ গণিয়া সে আবার কাগজে মন দিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা বলিল,—“ওগো ভদ্রজ!”

ভবেশ বলিল,—“কি?”

কমলা কুন্দের ঘটনার সঙ্গে মণিকের কথাটুকুও বলিল, সমস্ত শুনিয়া ভবেশ বলিল,—“আজ্ঞা, আমি হেড মাস্টার মশায়কে বলে সকলকে সাবধান করে দেব, কেউ যেন ওকে একরকম না বলে।”—কমলা মাথা নাড়িয়া বলিল,—“না ওকে আর স্থলে পড়াব না। ঠাকুরপোর সঙ্গে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, সেখানে কোন কারখানার চুকে নিবের পেট চালাবার মত একটা কিছু শিখতে পারে যাক, সেই ব্যবস্থা তুমি কর।”

পড়ার মুখে চুপ প্রতিজ্ঞার ভাব দেখিয়া ভবেশ বিস্মিত হইল, তবুও পরহাস্য করিয়া বলিল,—“কিন্তু তুমি কুলে যাচ্ছ যে, সেখানে ওর না নেই, শেষে যদি ওর সঙ্গে ওর মাকেও পাঠাতে হয়,—তা হলে এদিকে—”

অতদিন এ বিজ্ঞপ্ত কমলা রাগিয়া উঠিত; কিন্তু আজ সে শাস্তকর্তে কহিল,—“মা পায়ে কোথায় হতভাগা? মাকে ত জ্বাচ্ছে খেয়েছে, আমি কি ওর মা, তা'হলে

ওর এমন দুর্গতি হবে কেন।” বলিতে বলিতে ছুঁকটো জল তাহার গও রহিয়া গড়াইয়া পড়িল, অকলে প্রান্তে চোখ মুছিয়া কমলা আবার বলিল,—“না, তুমি আর বাগা দিও না, আমি মনস্থির করেছি।”

ভবেশ ভারি গলায় বলিল,—“ধাক্কাতে পারবে ত?” কমলা কহিল,—“ধাক্কাতে হবেই। আজ ওকে বাইরের লোকে তুচ্ছ করছে, কিন্তু কাল যদি আমার ছেলেরাই অবজ্ঞা করে? তার চেয়ে এখন ওর পথ দেখুক।”

### পাঁচ

মণিক যখন শুনিল যে তাহাকে কলিকাতা পাঠান হইবে, তখন সে শিত হুলত আনন্দে জ্বীর হইয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“হ্যাঁ মা, তুমি যাবে ত? কবে যাব আমরা? আমার কিন্তু এবার অনেক টাকা চাই মা, সেবার তুমি আম'খ কিছু কিনতে গাওনি, এবার সব কিনে আনব।”

কমলা মণিকের কাপড় চোপড় গুছাইতেছিল, উপযুক্ত পরি প্রদেয় একটি হাসিয়া বলিল,—“পাল ছেলে, আমি কোথায় যাব? এমন বড় হয়েছি একাই যাবি। তার-পর কাঙ্ক্ষ শিখে যখন টাকা আনবি, তখন আমরা একবার নিয়ে যাস মণিক।” বলিয়া সে বাস্তবের উপর মুকিয়া পড়িল। মা বাইবে না শুনিয়া মণিক একটু বিষণ্ণ হইল আবার কলিকাতার বৃত্তনথের কথা ভাবিয়া মূহুর্ত মধ্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কমলা থাকে থাকে সার্ট, গেজি, ধুতি, বই, খাতা, স্নেট ও নানা রকম খেলার সরঞ্জাম লাগাইয়া রাখিতেছিল, একমনে কতকগুলি তাই দেখিয়া মণিক বলিল,—“হ্যাঁ মা, এসব কি আমার?”

কমলা বলিল,—“হ্যাঁ বাবা, তোমারই সব। ভাল হয়ে থেক মণিক, কত জিনিস পাঠাব তোমায়।”

“কিন্তু মা তুমি না থাকলে আমার মন কেমন করবে যে, ওদের ছোট্টা ধাক্কা, তুমি আমার সঙ্গে চা।”

পাগল। লোকে হাসবে যে, ছেলেরা বড় হয়ে বিদেশে যাব, মা কি সঙ্গে যাব? বলিয়া কমলা তাহাকে প্রবেশ



দিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর হায় হায় করিয়া উঠিল।  
মাণিক জানে না, তার মা কত অক্ষম, একটি কাঁড়াল  
ছেলেকে বেহাংলেক এতটুকু আশ্রয় দিবার শক্তিও তার  
নাই।

বাহিরার সময় মাণিক যখন অশ্রু ছল ছল চোখে  
বলিল,—“আমি কেন যাব মা? বড়দা, মেজদা’ত এখানে  
ধাকবে, আমিও ধাকবে। আর কখন দুই’মি করব না।”  
তখন কমলা প্রাণপণে আশ্বাসদ্রব্য করিয়া রহিল। দীপেশ  
আগিয়া বলিল,—“তা’হলে মাণিককে এবার বিদায় দাও  
বৌদি।” জোর করিয়া হাসিয়া কহিল,—“পরীক্ষা করছ  
ঠাকুরপো?”

তারপর এই যাত্রী দুটিকে লইয়া পাড়ী যখন দুটির  
বাহির হইয়া গেল, তখন কমলা আর থাকিতে পারিল  
না। এতক্ষণের অবরুদ্ধ অশ্রুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য  
ছুটিয়া গিয়া নিজ কক্ষে লুকাইল।

### ছদ্ম

মাণিক চলিয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর অশান্তি  
উপজন্মও ঘুর হইয়াছে। আর কাহারও জ্ঞত নিত্য নালিস  
ভনিতে হয় না, কোন গোলমালই নাই। এমন কি  
ছেলে মেয়েবাও অসম্ভব রকমের শান্ত হইয়া উঠিয়াছে,  
তাহাদের বাতাবিক চঞ্চলতাও যেন মাণিকের সঙ্গে  
গিয়াছে।

সব চেয়ে মুকিলে পড়িয়াছিল উষা। একেবারে চূপ-  
চাপ থাকিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন  
যখন ছেলেরা নিশ্চিন্তাবে ঘাড় গুঁজিয়া আহার শেষ করিয়া  
উঠিল তখন উষা বলিল,—“তোদের হল কি রে? একে-  
বারে যে কথাবার্তা নেই?”

বড় খোকা উঠিয়া বলিল,—“কি কথা বলব ছোট মা,  
কিছু মনে আসে না।”

মুহুরাগী বলিল,—“এখন আর কাকে কেপিয়ে গোল  
করবো মাণিকই যে নেই!”

স্বস্ত মধ্যাহ্ন। উঠানের আমগাছটার দুইটা পাতা  
কিচমিচ করিতেছিল, বারান্দার এক কোণে বসিয়া কমলা  
তাহারই দিকে চাহিয়াছিল। সকালে মাণিকের চিঠি  
আসিয়াছিল। চিঠিখানার সন্দেহই মাণিক লিখিয়াছিল,—  
আমার এখানে ভাল লাগে না মা, মন দিয়ে পড়া শুন-  
না করব, তোমার কাছে গিয়ে থাকতে দাও।” সমস্ত চিঠি-  
টার মেহের নীড় বিচ্ছিন্ন বালকের মর্ষবেদনা এইরূপে  
ছুটিয়া উঠিয়াছিল। কমলার ব্যথাতুর চিত্ত কেবল তাহাই  
ভাবিতেছিল। এমন সময় উষা আসিয়া পাড়াইল,  
কমলা জ্বাংর মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিল,—“কিছু  
ভাল লাগে না দিদি, মাণিক যেন বাড়ীটাকে শুল্ক করে  
গেছে।” কমলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি নির্মোখের  
মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। উষা আবার বলিল,—  
“তাকে ফিরিয়ে আনাও দিদি।”

কমলা মুহূর্তে কহিল, “কিন্তু বড্ড আলাতন  
করে যে!”

উষা বলিল,—“তা হোক, এবে একেবারেই অসহ্য  
হয়ে উঠেছে। আমাদেরই এমন লাগছে, তুমি কি করে  
আছ? তোমার মুখের দিকে যে চাওয়া যায় না  
দিদি।”

কমলা কোন কথা বলিতে পারিল না। এতদিন  
যে বেদনা জন্মট বাধিয়া বৃকে ভার হইয়াছিল মুহূ সহ্য-  
ভূতির স্পর্শে তাহা তরল হইয়া আত্ম অশ্রুরূপে গলিয়া  
পড়িল।

রোগিনী—ভক্তারবায়ু, আমি ঝাঁটবোনা মনে করেই আপনাকে ডাকিযোছি।

শরী—হীতৈছরর সেন।





## পঞ্জিকার লাজ্জনা

“উদাসী”

হে সমাগত স্বাধীনমণ্ডলী, হে বাঙ্গলার বাঙ্গালী আজ এই পরম মিলনের দিনে প্রবাসী কান্টাবাসী বাঙ্গালীর সাধন অনিন্দন গ্রহণ করুন। আজ আমাদেবের কি অর্থা দিয়ে শুভা জানাবো তাহা স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। আমাদেবের অনেকেই তত্ত্বাযেবী, কিন্তু আমার ভ্রাতৃ অনেকেই তত্ত্বাযেবী নহে, কারণ আমরা ‘তত্ত্ব-বেদিনি’ পড়ি না। রসতত্ত্ব, রসুনন্দনের অষ্টবিংশতি-তত্ত্ব বা কুলশাখার তত্ত্ব কোন্টীতে আপনাদা স্থবী হবেন বৃত্ততে পাচ্ছি না। শুনেছি আপনাদা গবেষণা বড় ভাল বাসেন, কালিকুলমে বাঙ্গালী প্রমাণ কোত্তে আপনাদা উঠে পড়ে লেগেছেন। ‘সেইকল্পে আমার ইচ্ছা সেই স্থরে স্থর মিলাই, হয়ত জন্মতে পারে। গব্যমাজই পবিত্র, সেটা গবেষণাই হউক বা গোরচনাই হউক। অতএব হে সমাগত ভ্রমহোদরগণ আপনাদা অবধিত চিত্তে মুক্তিতনয়নে হরীতকী হস্তে আমাদা এই গবেষণা গলাধঃকরণ করিত্তে সচেষ্ট হউন।

“বর্তমানের যুগের আঙ্গব্যাক্য ধবরের কাগজ” সেই ধবরের কাগজের স্টেটসম্যান, কারণ উভা ভারতের পরম বক্তা। সেই পরে সেদিন পড়ছিলাম যে Mars মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর যুব নিকটে এসে পৌছেছে—এবং কোন এক আর্দ্রান ভ্যোতিকর্দ্বিৎ হুপগিত্তি Rudolph Von Heilohoper Waserman মঙ্গলগ্রহের লোকবদের সন্কে আলাপ পরিচয় কোচ্ছেন। শুনলাম সেখানকার মাহুধ খুবই অশা, কিন্তু ওজন খুব কম মাত্র ১৬ সের, কারণ মঙ্গলগ্রহে বায়ুর চাপ খুব কম কিনা। ঝারও অনেক তত্ত্ব অশুধাবন কোরে স্থির কোজ্জাম বাগবাভারের মহিমা এগনও নই হইনি, তবে সেটা হানস্ভর হ’য়েছে।

এই সমস্ত গবেষণায় বিশেষ বিব্রত হ’য়ে গঙ্গার তীরে বেড়াতে গেলাম। রাত্রি তখন ১১টা। নির্দিষ্ট নগা-তীরে মঙ্গলগ্রহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ সেবি মঙ্গলগ্রহ হ’তে একটা হাউই (Rocket) ছুটে

এসে পড়লো আমাদা পায়ের কাছে। ফট কোরে সেটা ফেটে গেল। গায়ে আঙন হিটকে পড়লো কিন্তু পুড়লো না। মঙ্গলগ্রহের আগুনের খণ্ড গোড়ানি নয়, সীতল করা। সেবি একতাত্তা কাগজ পড়ে আছে। যুলে দেখি বাঙ্গলার লেখা। আমাদে লাকিয়ে উঠলাম। সেই প্রবন্ধ আজ আপনাদেবের শোনাতে এসেছি। এটা Genuine কি না যদি বিশ্বাস না হয় আমি Facsimile ছাপিয়ে দেবো।

ব্যাপারটা এই ‘বাঙ্গলার এক প্রসিদ্ধ কবি সঞ্জতি মঙ্গলগ্রহে নির্দাসিত হ’য়েছেন। তাঁর পাপ, তিনি পঞ্জিকার অপমান কোরেছিলেন। বড়ই গভীর দুঃখে তিনি এই প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের পরে পরে ছাড়ে ছাড়ে তাঁর গভীর গবেষণার ও অস্থ বিবেচনায় শক্তির পরিচয় পাবেন—

অথবাতে প্রবন্ধাভ্যন্তঃ

পঞ্জিকার লাজ্জনা—

“এতদিন পৃথিবীতে বাস কোরে এলাম কিন্তু আমাদা এমনই দুর্ভাগ্য সানাতন পঞ্জিকার মধ্যমা বুঝলাম না। সেই পাগে আজ মঙ্গলগ্রহে নির্দাসিত। বিদ্যাতার আদেশ—বেদিনি আমাদা এই প্রবন্ধ মহালোকে পঠিত হ’বে—সেদিন আমি মুক্তি পাবো। আমি জন্মে অন্ধ হ’য়ে লিখেছিলাম—

“হিন্দু যখন সিদ্ধপারে করলে দখল নবীপ কোথায় ছিল ভগ্নপটী, কোথায় ছিল নবীপ তাঁদের ধারা লুপ্ত হ’বে থাক্বে শুণু পঞ্জিকা। ধানের আবার তুলে দিয়ে যখন হ’বে পঞ্জিকা।”

কি অজ্ঞায়ই কোরেছিলাম ছন্দের অঘরোপে পঞ্জিকার সন্কে পঞ্জিকার মিল কোরে।

ধানের আবার না হোলো ক্ষতি নাই—কারণ বাসের বীতি, রামরানাকা লাভু, বা ছাত্তু খেয়েও মাহুধ এই ভোঁতুক দেহ রক্ষা কোত্তে পারে। কিন্তু পঞ্জিকা লুপ্ত

দ্বিতীয় বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা]

পঞ্জিকার লাজ্জনা

৮৫৭

হোলো নগরীর প্রাধাত্য লুপ্ত হ’বে, সরকারের আয় কমে যাবে। ব্রিহত্তানন্দেবের অভাব হোলো আমাদেবের আধ্যাত্মিক জীবন একবারে দড়কতা ঘেয়ে যাবে, সাধন ভজন হ’বে না ভারতের চুদায় লক্ষ সাধন ভজন চ তথা ভোজন প্রদ্রাসী আয়েসীর দল তুরীর আনন্দ হ’তে বঞ্চিত হ’বে। অল্পে স্থপ নাই, স্থপ কেবল কুমায়, এই কুমার যুল হোল ব্রিহত্তানন্দ। আমি মৃত্ত তাই এমন বস্তকে ঠাট্টা কোরেছিল।

পঞ্জিকা মাহাত্ম্য যে বিশ্বাস না করে নরকেও তার স্থান হ’বে না। পঞ্জিকার ফল হাতে হাতে। ‘এই দেখুন না—এবার দেবীর আগমবস্তু গজ—কলং কলং। এবার জলের চোটে শান্তিপুত্র ভূব ভূব, নদে ভেসে যায়। শুক্লা চাখের অভিশপ্ত দেশ ভুবেছিল তার চালা পানিন হ’য়েছে, পলক ভুবেছিল, দিল্লী ভুবেছে। কানপুর যাহ যায়, কান্ধিতেও আজ বান ডেকেছে, জলের চোটে ভারতের Olympus আলো জলে নাই, ধবর পৌছায় নাই।

এখন দ্বিতীয় লাভু বেতে হোলো আগ্রার পাথর ও ময়ূরার পৌড়া খেয়ে তবে যেতে হ’বে।

অচ্যোরহীন শিক্তি বাঙ্গালী পাজি দেখে বাড়ীর বাহির হন না কারণ তাঁদের মঙ্গল Dietz লর্ডনের দ্বিবি আঁকা Calendar, কাজেই তাঁদের এই দুর্দশা। এমন বিজ্ঞায়ার দিন, বেদিনি দশাধমে হ’তে কোরাখাত পট্য প্রজ্ঞাপতি ও প্রজ্ঞাপতীর (?) টেটে লেগে যায়, সেই দশাধমে ও কোরাখাতে বসার স্থান নাই। পাজি দেখে কান্ধী এলে কখনও এ শা হোলো না।

বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী এসেছেন বায়ুপরিবর্তন—কান্ধীর বায়ু বিতক্ত কিনা যে বিষয়ে খোরতর সন্দেহ আছে। তবে বুদ্ধাশ্রমের ও গৈরীর জল, আটার মালোমে লুটি, কচুড়ীগুলির রাবড়ী ও মালাই তাঁদের বাজা ফিরিয়ে দেয়। অশুপুত্রাক্রিগাণ তাঁদের প্রদার পাবেন,—খোলা রাত্তায় হেটে বেড়াবেন আবার অসুপূর্ণা ও বিঘনাধ দর্শন কোবুয়েন—ভাইতে কতকটা Balance রক্ষা হয়। কিন্তু বেড়াবার কি ছাই রাত্তা আছে—হে সব মটরেব উপজব।

Rousseau বলেছেন Go back to nature, আমি মঙ্গলগ্রহ হ’তে তোমাদেবের উপদেশ দিচ্ছি Go back to Panjika—তাঁর ফল অনন্ড—যে শোনে বা শোনায সে পরম পুণ্যবান। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলছেন “এই যে নববীপ ও উইগরীতে যে পঞ্জিকা তৈরী হয়, কই—সেবানে ত ‘কলং কলং’ হোল না; অথচ দেবীর গড়ে আগমন। বাঙ্গলা দেশ—আমাদেবের বড় ও আমাদেবের বান্দেব দেশ—এবারে খটখটে।—পাজীর ফলটা শুভ দেশে ফললো কেন? কারণ তারা দেবী পুন্ডা-কবি না—তাইই শান্তি।

জগতের নিয়মই এই রাম দেয় কড়ি জাম খায় হই, আমাদা দিই Tax লটেরা ধাওরান থান, অথচ আমাদেবের নিমন্ত্রণ হয় না। এ সমস্ত তত্ত্ব নিহিতঃ ওয়ায়—বুধ মন যে জান সন্ধান। ক্ষুরধা ধারা—নিশ্চিতঃ দুরভ্যাস। কায নাই আলোচনা কোরে। বাঙ্গলার এ বছরের ফল ফলেছে, হু’বছর আগে আজকের বক্তা। বিক্রম সখং antedate করা, সরকার বেতন মেন Retrospective effect দিয়ে, মূল্যমান ভায়ারা তাল্লাক মেন antedate কোরে, গজ আগমনের ফলটা সেইসব Retrospective effect হ’য়ে গেছে। এ সব তত্ত্ব ত লোকে বাবে না, কারণ তাঁদের বুদ্ধি একটী মোটা; আমি মঙ্গললোকে, তাই এ রহস্তের মর্থোন্ধান কোত্তে পেরেছি।

অতএব হে কলির বাঙ্গালী—এখনও সাবধান হও, পঞ্জিকার লাজ্জনা কোরো না, পরে পড়ে লাগত হ’বে। নবমীতে অলাবু ও জ্যোতীশীতে বাবুতু ভুগ্ন কোরো না। কলং ভীষণ অব্যক্ত। তবে অনেকেই অলাবু ও বাবুতুর অর্থ বোঝে না। এ বিষয়ে শব্দকল্পম তোমাদেবের সাহায্য কোরে। প্রতি মাসের প্রথমই পাজি যুলে শিখা-বস্ত্রসমর্ষিত ব্রাহ্মণ মুন্ডির হাতে পায় যা ধন্যয়ে হাত দিয়ে বাসের ফলাফল বিচার কোরে।

বৃহস্পতিবারে বাজা কোরো না। যেহেতু জ্ঞানটা তোমাদেবের হাতে নহ—নতুবা বিশ্বাস্যবায়ের বারবোলা তোমাদেবের অজ্ঞাতেও বার কোরতাম। তবে বৃহস্পতি-বারে বিলাত যাত্রা প্রাপ্ত, যেহেতু ঐ দিন বিলাতী



মেল ছাড়ে। প্রায় এ পর্যন্ত P. & O. কোম্পানীর কোন জাহাজই ভোঝে নাই। অল্পেমা মধ্যও বাচান চাই, দিবশে লক্ষ্য রেখে নতুবা দিগ্ভ্রম হবে। জাহাঙ্গীর জুলেই আঁতকে উঠবে। কারণ এসব তথিতে টেমে কলিশন হয়, মোটরের টায়ার কাটে, পথিককে সাপে কাটে।

কলিতে পাঁচাই সত্যই। অতএব মুচ বাঙ্গালীগণ—  
‘পাঁজার বচনে সবা হবে আশাবান’ ঘেহেতু কলো নাভের গতিরত্নবা।

হে অমৃতত পুরাঃ—বিজাতীয় ভাব বন্ধন করে,

## তুমি

### ঐগিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায়

উষার সলাজ আঁধার ঘোমটা ফুলি,  
নবীন আলোক কাগিছে নয়ন মেলি;  
আপণ বাগে তুষ্প বাছী ফুলি,  
বুকতে ভড়িয়ে অভিদার স্মৃতি গুলি  
আঁধার তখন বিদায় নিয়েছে যবে  
তরুর ধংশে জীবন কাগিছে সবে;  
স্বপ্ন রত্নী মুজিত আঁখি দুটি  
পূর্বে অচলে তাহার উল্লিঙ্গ ফুটি।  
প্রথম আলোর পরশ-মুগ্ধ প্রাণে  
বাখা কশিত হস্ত আসিল নানি,  
চিরচেনা তারে মোর বেহ মন জানে—  
ওগো প্রিয়তম সে যে তুমি সেই তুমি।

তুমি নিশাসে গুমরি উঠিছে ধরা  
কাহার কষ্ট আঁখির অনল করা  
তুমি বাতাস বন্ধি-বেদনা হানে  
সকল লোকের সব বিরহের গানে;  
তুমি কাতর হৃদয়কার সেই বাণী  
ধরণীর শুভ উপাড়ি ফেলিছে টানি।  
মক্ নিরাশ্রম তুফা আঁধার মাঝে  
মধুর সরস স্রোত মহিমার সাগরে,  
আমার নয়নে গগনে কাগিছে রানি  
প্রেম উৎপল স্রিষ্ট অধর চুমি,  
ছায়াটিসুও আনি আমি তার আনি  
ওগো প্রিয়তম সে যে তুমি সেই তুমি।

Midle, Bentham Huxley, Haeckel বিদ্যাক্ষিমাণও  
গণ্য ছিলে, কেনো গুপ্তপ্রেস, পাণ্ড প্রাণ ভরি—

“স্বদেশে নিধনঃ প্রাণঃ পরমর্শ ভাববহঃ”

এইখানেই কবির প্রবন্ধের সমাপ্তি। মনে হয় মঙ্গল-  
গ্রহে বায়ুর প্রকোপ একটু বেশী নতুবা পাণ্ডি-বিষেবী  
কবির মুখ হ’তে এরূপ পাণ্ডি প্রশস্তি পোনা যেতো না।  
হে আমার সখিযু শ্রোতব্রহ্ম! এই গভীর গবেষণার  
চাকা টিপ্তনীর ভার আপনাদের উপর দিয়ে দেববাসের  
বিক্রাম হউক এবং কাশীর পণ্ডিতগণের প্রতি সন্তুষ্টি  
নিবেদন রইল—

পরিস্রব বিজ্ঞানিতঃ ন পরমার্থেন গৃহ্যতাং বচঃ।



### ঐকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## কৃতি

আজ প্রায় দশ বার দিন হইতে চলিল, লতিকারা  
এখানে আসিয়াছে। এরই মধ্যে লতিকা সারা নয়নপুর  
একরূপ খুরিয়া বেড়াইয়া দেখা শেষ করিয়া আসিয়াছে।  
পাথার সময় বা নিশ্চিন্ত হইয়া একবার থায় তা ছাড়া  
দিন রাত উমেশের সহিত নৃতন জায়গা, গ্রাম দেখিবার—  
পর্যায় চলিতেছে। কোন কোন দিন প্রবেশ ও বিপিন  
তাহাদের সঙ্গী হয়। কিন্তু, বিপিনের যেন এসব বিষয়ে  
উৎসাহ অত্যন্ত কম। সে একে উমেশকে দেখিতে পায়না,  
তাহার উপর বেড়াইতে যাইবার প্রধান সঙ্গী ও কাণ্ডারী  
হইতেছে লতিকার উমেশ। সঙ্গে বাইতে বাইতে লতিকা  
প্রায় সকল প্রশ্ন উমেশকেই করিয়া থাকে; কারণ বিপিন  
এখানকার লতিকার মতই নৃতন লোক। এটা যেন  
বিপিনের পক্ষে যেরূপের অপজ্ঞিকর; অপমান মনে  
হইলেও, প্রকাশ করিয়া প্রতিকার করিবার পথ তাহার  
মুক্ত নাই। কারণ সে ত আর সেই সকল অজানা স্থানের  
বিষয় কিছু বলিতে পারে না। এজন্য অনেক সময়  
বিপিন ইচ্ছা করিয়া লতিকার সঙ্গী হইতে রাগি  
হয় না।

সেদিন খুব একটা দূরে পাহাড়ের উপর যাইবার ব্যবস্থা

হইয়াছিল, দু-বানা গো-পাড়ী ঠিক করা হইয়াছে।  
সেখানে গিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়া দাওয়া হইবে।  
লতিকা মহা-সমারোহ করিয়া সাধিবার আসবাবপত্র  
গুছাইয়া পাড়িতে তুলিতেছে। প্রবেশ কেবলই বলি-  
তেছে—লতি রাত্তিতে পারলে ত থাওয়া হবে। সে  
আশা খুব কম। পাথার দাবার সঙ্গে না নিলে আমি  
যাছি না; শেষে কি কিদের আলায় মরব। সেখানে  
তুনেছি কিছু পাওয়া যায় না। বালি স্বরবার জল।  
বিপিনও আপত্তি করিয়া বলিল “আমার ত মোটেই  
যাবার ইচ্ছা নাই। শেষে কি বাঘের মুখে প্রাণটা তুলে  
দিয়া আসব।”

উমেশ খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়া জিনিস-পত্র  
তুলিতেছিল। সে বলিল “ওহে সে জায়গাটা দেখলে  
সত্যিই বলছি মুগ্ধ হয়ে যাবে। প্রবেশের এক কথা,  
লতিকা রাত্তিতে পারবে না। কেন পারবে না? যদি না  
পারে আমি তোমাকে রেখে থাকওয়া তা হলেই ত হলো।  
সেখানে কলশামরী ঝাঁড়াইয়া কড়ার নৃতন অভিজানের  
ব্যবসি গুছাইয়া তুলিয়া দিতেছিলেন। উমেশ জিজ্ঞাস্য  
দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিবারাজ তিনি  
বলিলেন, “প্রবেশ মনে করে সে নিজে যেমন সশাসনের  
কোন কাজ করতে পারে না, বা জানে না, তার



বোনটিও ঠিক তার মতই সব কাজে অক্ষম। তানর উমেশ, লতিকা খুব ভাল রাধতে পারে। আমি বলছি ও যখন লম্বাঝাড় গিয়ে রাধবে, তখন ওর রাধা খেয়ে লোকে ধরি ধরি করবে।" লতিকা অননীর প্রশংসাবাদে মাথা নীচু করিয়া মুক্তিকার দিকে লম্বাঘা চাহিয়া বহিল।

করুণাময়ী গভ রাগিতে ঘরে ঢুচি, পানতুয়া, আলু বন প্রভৃতি খাবার তাহাদের জন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে সব গাড়ীতে হাসিতে হাসিতে প্রবেশের জিহ্বা তুলিয়া দিলেন।

গাড়ীর ভিতর খড় দিয়া হুন্দর বিছানা করা হইয়াছিল। করুণাময়ী তাড়াতাড়ি একটা হারিকেন লঠন আনিয়া দিলেন। যদি রাগি হইয়া যায় সঙ্গে একটা আলো থাকা খুব প্রয়োজন। প্রবেশ গাড়ীতে উঠিয়া তাহার বন্দুক, কার্টিজ ইত্যাদি ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাস্তবী অকাল মৃত্যু কল্পনা করিয়া আচ্ছাদন করিতেছিল।

সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। বিপিন ঘাইবে না বলিয়াই দিচ্ছিল। কারণ সে দেখিল, একখানি গাড়ীতে গিয়া উমেশ বসিয়াছে। আর একখানিতে প্রবেশ উঠিয়াছে। যে গাড়ীতে উমেশ উঠিয়াছিল, তাহাতেই গিয়া কিনা লতিকা অস্বাভাবিক আচরণ করিল। লতিকার ইচ্ছা উমেশ-দ্বারা এসব জানা পথ; তাহাকে সে সব দেখাইতে দেখাইতে লইয়া ঘাইবে। বিপিন যে কোথায় উঠিবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। প্রবেশের সহিত গিয়া তাহার কোন লাভ নাই। আর কোথায় গিয়া লতিকার গাড়ীতে উঠিতে তাহার মন সুরিল না। সেজন্য সে মনে মনে উমেশের উপর অত্যন্ত চট্টিয়াছিল। তাগপর লতিকা যখন তাহাদের গাড়ীতে উঠিবার জন্ত বিপিনকে একবারও ডাকিল না, তখন বিপিনের অত্যন্ত অপমান বোধ হইল। তার মনে হইল কলিকাতা হইতে সারা পথ রেল গাড়ীতে লোকের সঙ্গে বিবাহ করিয়া কাহাকেও তাহাদের গাড়ীতে উঠিতে দিই নাই। পাছে ভিড়ে লতিকার কোন প্রকার রহ হই, তখন উমেশ কোথায় ছিল? আর আজ

কিনা, উমেশ অনায়াসে লতিকাকে নিজের গাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইল। তার উচিত ছিল, প্রবেশের গাড়ীতে যাওয়া। এই নির্ধন ব্যবহার বিপিনের মনে অত্যন্ত বেদনা দিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে কোন একটা অজিলা করিয়া কলিকাতা চলিয়া যাইবে। উমেশের এতখানি অজ্ঞান অবিপত্তা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। লতিকার ব্যবহারে বিপিন মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

করুণাময়ী দেখিলেন, বিপিন নিশ্চয় অভিমান করিয়া বাইতেছে না। তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে বিপিনের মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, দেখ বিপিন, সবাই যখন আঘাত করে যাচ্ছে তখন তুমি না গেলে লতিকার বড় ভাব হবে। ঐ দেখ তুমি যাবে না বলায় লতিকা মুখখানি চুপ করে বসে রয়েছে। ও রাধবে, তোমরা সবাই আল্লাহ করে থাক, এই নাও তার আনন্দ। বাও বাবা গাড়ীতে গিয়া উঠ।

প্রবেশ বলিল, বিপিন। তুমি আমার গাড়ীতে এসো, আসল জিনিষ রসদ, সে আমার গাড়ীতে। খিদে পাবামাত্র বুকে, মুখ চলেবে।

উমেশ কি বলিতে বাইতেছিল, লতিকা বাধা দিয়া বলিল, "বিপিন-না, কিন্তু সব বিষয়ে একটুতেই রেগে যান। আজ আমার রাগা খেয়ে দেখবেন চলুন আপনাদের ঘরের বামনাটাদের চেয়ে ভাল কি না? আপনি না গেলে সত্যি বলচি আমি বড় রাগ করব।"

প্রবেশের গাড়ী সমুখে ছিল, কারণ তাহার নিকট বন্দুক—সেই পথ প্রদর্শকের আসন জুড়িয়া রাখিয়াছে। সে পুনরায় বলিল, "এখনও সময় আছে, ভাল চাও ত আমার গাড়ীতে এস। বিপিন কি করিবে ভাবিয়া বিপিন করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় উমেশ বলিল, আমি অই গাড়ীতে বাই কারণ প্রবেশ পথ চেনেনা, কোন পথে যেতে কোন পথে যাবে, বলিয়া লতিকাকে কিছু বলিতে দিবার পূর্বেই লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া গিয়া প্রবেশের গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "গাড়ী চালাও।"

প্রবেশ একপাল হাসিয়া বলিল, "উমেশ তুমি দেখছি

খুব ভুখোড় লোক, খাবার আমার গাড়ীতে আছে শোন—বামাঙ্গ ছুটে এসেছ। এই ত বুদ্ধিমানের কাহ।

লতিকা তখন মনে মনে বিপিনের উপর খুবই চট্টিয়াছিল। কিন্তু, সমস্তটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "বিপিন-না, তুমিও কি খাবার লোভে দাদার গাড়ীতে গিয়া উঠে পড়বে নাকি?"

বিপিন যে অকূল সমুদ্রে একটা ধরিবার মত তৃণ পাইয়া বলিল, "না, আমার অত লোভ নাই—যে এগাড়ী সেগাড়ী ছুটাছুটি করব। বলিয়া সে লতিকার গাড়ীতে আসিয়া উঠিল; গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

করুণাময়ী বলিলেন, সন্ধ্যার পূর্বেই কিংরে এসো; সেখানে বেশে বিশ্রাম করো না। দুইজন রেলের স্ট্রী ও একটা চাকর তাহাদের সঙ্গে চলিল।

ষ্টেশন পার হইবার পর গাড়ী যে পথ ধরিল; সেই পথের উপর মহাশয়ের পর্ব হুটীর। ইতিমধ্যে একরিন লতিকা উমেশের সহিত এই পথে বেড়াইতে আসিয়াছিল এবং মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া গিয়াছিল। কিছুদূর হইতে মহাশয় হুটীরখানি দেখা যাইতেছিল। লতিকা বলিল, "বিপিন-না, ঐ ঘরখানি কার বনু দেখি?"

বিপিন তখন মনে মনে ভাবিতেছিল, উমেশ কি সত্যি খাবার লোভে লতিকার গাড়ী হইতে নামিয়া প্রবেশের গাড়ীতে গিয়া উঠিল। লোকটা কিন্তু খুব পটুক। লতিকা নিশ্চয় তার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়াছে। নতুবা সে কোন প্রকার আপত্তি করিল না ত। এ-কালটা উমেশের করা খুবই অজ্ঞান হইয়াছে। লতিকা তা নিশ্চয় বুদ্ধিতে পারিয়াছে। সেজন্য এতটা পথ মনে মনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছে, বলিয়া আমার পক্ষেও কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিয়াছে। এটা লতিকাকে খুবই অপমান করা হইয়াছে।

লতিকা এতটা পথ বিপিনের সঙ্গে কোন কথাই বলে নাই। সে নীরবে বসিয়াছিল বিপিনও তাহার সহিত কোন কথা বলিতে সাহস পাইতেছিল না। বিপিন দখিল লতিকার মনটা যেন একটা কিংবদন্তি কিস্তি নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনের উপর একটা

বিষয়টা স্ফুটয়া উঠিয়াছে। যতরাং উভয়েই মৌন হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সমুখের গাড়ী হইতে প্রায়ই অনাবিল হাসির রবে নীরব পল্লী পথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। পশ্চাতের গাড়ীর মধ্যে দুইটি প্রাণী নীরব। নির্বাক। কেবল গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শ্রুত হইতেছিল। মহাশয় হুটীরখানি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া লতিকা পুনরায় বলিল, "বলুন দেখি ঐ হুটীরখানি কার?" বিপিন এবার যেন অস্থূল স্থল পাইয়া। সে হাসিয়া বলিল, কলিকাতা বড় বড় বাড়া দেখিয়া ত কোন দিন জিজ্ঞাসা কর নাই বাড়া কার? আজ সহসা ঐ নামাত্র কুঁড়ে ঘরখানির উপর নজর পড়ল কেন? লতিকা বলিল, "বেশ করে দেখ, দেখবার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানি। কিনা? ঐ হুন্দর ভাবে ঘরখানি নিকিয়েছে। সিঁচা? দিবেও অমন বন্ধুকে করা যায় না। উঠানটিতে শিশুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। আমার এই সা ঘর বড় পছন্দ হয়; কেন তা জানি না।

বিপিন লতিকার এই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া ত আশ্চর্য হইয়া গেল। সে বলিল, "ঘরখানি অতি ক্ষুদ্র এবং পাতার—এর মধ্যে এমন কি সৌন্দর্য্য দেখতে পেলো, যার জন্য এইরূপ ঘরে বাস করতে ইচ্ছা হয়। ঐ কুঁড়ে হয় ত কোন সাঁওতালের হবে।"

"কলকাতার বড় বড় বাড়ীগুলো দেখে মনে হয় তাহা যেন পরশুরক হিংসা করছে। কে তাহা দেখতে পারে সেইভাবে গায়ে পা দিয়ে বেড়ে উঠেছে। এ দেখ, দিকি, আশে পাশে কারো বাড়ী ঘর নাই, একলা, তার স্বত্বকে কেন্দ্র মনান করে রেখেছে। অপ্রতিষেধী হয়ে সে যেন এক নির্জন মাঠের মাঝখানে শাখির দিকে ছায়া বিতরণ করছে। সত্যি বলচি, বিপিন-না আমার মনে হয় এখন কুঁড়ে ঘরের মধ্যে থাকার যেন একটা আনন্দও পাশ্চি আছে।"

"এস খুবই নূতন। লোকে বড় বড় বাড়ী, গাড়ী, মোড়াল, গহনাপত্র সব খুঁজে থাকে। তার জন্ত মাহুঘ, কি কষ্ট না স্বীকার করছে। আর তুমি কিনা অস্বাভাবিক বদনে বলতে পারছ যে, এমন ঘরে থাকতে হোলো



তোমার স্বপ্ন ও আনন্দ হয়। ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকতে থাকতে হয় ত বাহ্যের এমন একটা অবসাদ এসে পড়ে, যে তখন তার সেসব আর ভাল লাগে না। সংসারের বাইরে আসবার জ্ঞান, এমনি ধারা কুঁড়ের মধ্যে বাস করার বন্ধন। হয় ত স্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তোমার পক্ষে তা আর ওপর আত্মগুণি—আকাজ্ঞা কোন-বিক দিয়া শোভা পায় না। তোমার জীবন এখন ত আরম্ভ হয় নাই? তবে লভিকা তুমি কেন, কোন চুখে এই পর্বটুর পছন্দ করছো?”

আজ অবসর পাইয়া কথার গিঠে বিপিন খুব বড়গোছের একটা লেকচার দিয়া ফেলিল। সে যে লভিকাকে কোন-দিন এমন করিয়া বলিবার অবসর পাইবে তা ভাবে নাই। তারা যে বড় মাহুৰ এবং বিপিনও যে বড় লোকের ছেলে এই দুটো কথাই আজ লভিকাকে সে স্বপ্ন করাইয়া দিল। আসল কথা ছিল বিপিনের, যদি তাহার সহিত লভিকার বিবাহ হয় তাহা হইলে, তাহারের পঞ্জাগ্রামে বাড়ী হইলেও তাহা পাতার কুঁড়ে ঘর নয়। তাহা বড় বড় আটালিকার মতই বড় বাড়ী।

লভিকা বিপিনের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিল না। তারপর বলিল, “দেখুন বিপিন-দা, সকল মাহুৰের ভিন্ন ভিন্ন কণি, ভিন্ন ভিন্ন বন্ধন। একজনের মতের সঙ্গে যে আর একজনের মত সব দিক থেকে মিলবে তার কোন মানে নেই। আমার মনে হয়; মনের উপর কর্তৃত্ব করা বড় সোজা কাজ নয়। কুঁড়ে ঘরের ভিতর বাস করার মধ্যে হয় ত আমি যে স্বপ্নের বন্ধন করছি, তুমি হয় ত তা দেখতে বা ভাবতে পারছ না। মাহুৰের দেখে দেখেই তার সভ্যতা; বড় মাহুৰী বেসে চলেছে—সেটা যে ঠিক রাখার চলেছে; তা কেউ বলতে পারে না। একদিন হয় ত সেটা যে মন্ত সন্মার ও ভুল বন্ধে পথ বদলাতে হবে না, তা কোন যুক্তি দিয়ে না বলা যায় না পবিত্রবর্নই হচ্ছে জগতের নিয়ম। তা তুমি বেশ জান। কুঁড়ে ঘর থেকেই মাহুৰ আটালিকায় গিয়েছে; স্বপ্নের আলয়ে, কিন্তু বন্ধন বৃদ্ধিতে পারবে, যে কুঁড়ে ঘরেই যে আনন্দ ও শান্তি ছিল, তা আটালিকায় নাই, তখন আবার হয়তো কুঁড়েতেই ফিরতে হবে।”

“বিপিন বলিল, সেটা যে আরও সমুখের দিকে এগিয়ে না গিয়ে গেছন দিকেই ফিরবে তার কোন মানে নাই।”

“মানে নিশ্চর আছে। আত্মপ্রেম চিকিৎসা একসময় এদেশের প্রধান চিকিৎসা ছিল। কিন্তু, কালের ব্রোতে সে থেমে গিয়েছিল। নানারূপ চিকিৎসা এসে তার স্থান অধিকার করে বসেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আবার দেশের লোকে সে দিকেই ফিরে চলেছে। তার উন্নতির জ্ঞান বড় বড় শিক্ষিত লোক উঠে পড়ে লেগেছে। এমনি ধারা সকল বিষয়। বন্দর প্রচারও কি তাই নয়? চাকরী চাকরী করে দেশ এক প্রকার পাগল হয়ে উঠেছিল। এখন দেখছে ব্যবসা রুচি ছাড়া দেশ বা জাতির উন্নতি নাই। হস্তরাং পথ বদলাতেই হবে। আচ্ছা তুমি বল দেখি একখানি সুন্দর বাড়ী দেখাও প্রথমে কার প্রশংসা করে থাক?”

বিপিন বলিল মিস্ট্রী।

এই যে কুঁড়ে ঘরখানি দেখছ, এর সৌন্দর্য দেখে কার হৃদয়টি করতে ইচ্ছা করে। যে পুংখামিনী নিজ হাতে, নিজ পরিশ্রম দিয়া এই কুঁড়েখানি এমন সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘরখানি দেখিলেই তার প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয় না কি! আগে একদিন এই ঘরের মালিকের সম্বন্ধ দেখা করতে গেলোলাম। এই কুঁড়ে হচ্ছে মমুয়ার, যে নীহারদিককে বাচিয়েছে। এই সময় প্রবোধ সহসা বন্ধকের আঘাত করিল।

সকলেই সে শব্দে সমুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কিছু দেখিতে পাইল না। অস্বাভাবিক বন্ধক ছুড়িবার উদ্দেশ্যে বিপিন বা কেহই বৃথিতে পারিল না। উমেশ তখন প্রবোধকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছিল, পথের মাঝে শুষ্ক শুষ্ক যদি এমন করিয়া বন্ধক ছোড় তা হলে তোমার গাড়ী থেকে নেমে যাব।”

প্রবোধ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, “বুকেছি উমেশ-দা ভয় পেয়েছে। অস্বাভাবিক ছুড়িনি হে, সেই বেসে ঘাটার ঘর সমুখে দেখতে পারছ না। তাকে বণ্ড দেবার জ্ঞান বৃদ্ধ।”

“এখন বৃদ্ধমান বন্ধকের আঘাত শুনে যদি তার

নাটনীটে তড়াতাড়ি কিশোর আঘাত মনে করে রাগ্তার এসে পাড়ায়। “অমনি চারি চকুর মিলন হয়ে যাবে।”

“তাকে তারি বা লাভ কি, আর আমারই বা কি? বেল পাশের লোকের কি? কাকে—আশার চৌকর।”

এই প্রকার গল্প করিতে করিতে তাহার মমুয়ার কুঁড়ে ঘরখানি পক্ষান্তে ফেলিয়া চলিল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় সেদিন বন্ধকের আঘাত শুনিয়া অতগুলি লোকের আনন্দোচ্ছ্বাস শুনিয়াও কিন্তু কুঁড়ে ঘরখানি হইতে অনেক দূর হইল না।

লভিকা অনেক দূর হইতেই মুখ বাহির করিয়া এক-দুটে কুঁড়ের বানির দিকে তাকাইয়া ছিল যদি মমুয়ার দেখা পায়। কিন্তু দেখা পাওয়া ত দূরের কথা কুঁড়ের মধ্যে যে মাহুৰ আছে তাহার আস্তাসও পাওয়া গেল না।

উমেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই কুঁড়ের দিকে তাকাইয়া শেষে বলিল “প্রবোধ পাখী উড়ে গিয়েছে। শূণ্য খাঁচা পড়ে রয়েছে।”

প্রবোধ অত্যন্ত উদ্ভীর্ণ হয়ে উত্তর করিল, তা হ'লে দেখছি বেসে ব্যাটা মরে পড়েছে বল?

“সে মরে পড়েছে কি তার নাতনী মরে পড়েছে তা এখন কেমন করে বলব বল?”

লভিকা একবার গরুর গাড়ী মমুয়ার বাড়ীর নিকট ধাঁড় করাইবে মনে করিয়াছিল। আবার কি ভাবিয়া করিল না। তবে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে ঘরের মধ্যে কেহই নাই।

নলী পার হইয়া অনেক দূর গিয়া তাহার পাাহাড়ে

উঠিল। তখন বেলা আনন্দ ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। একখানা প্রকাণ্ড শিলাগুহের উপর গিয়া তাহার আস্তানা গাড়িল।

গাড়ী হইতে জিনিষ পত্র সব সেখানে আনা হইল। প্রথমেই অত বেলা হইলেও ঠোঁড় আলিয়া চা প্রস্তুত হইল। তারপর কল্পামন্যী প্রদত্ত জলযোগ। প্রবোধ পথেই তার সন্ধ্যাবহার করিতে করিতে আসিয়াছিল এখন বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সে বন্ধক লইয়া শিকারের চেষ্টায় চলিল। চাকর দুইটা পাাহাড় হইতে শুক কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কি রাগা হইবে তাহা লইয়া গোল বাধিয়া গেল। শেষে স্থির হইল বেলা অধিক হইয়া গিয়াছে খিচুড়ী আর একটা তরকারী হইক। বেলা প্রায় দুইটায় মধ্যেই রাগা শেষ হইল। প্রবোধ “দুইটা পরগোল মাছিয়া বিষয়গর্ভে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সকলে আহারের বসিল। লভিকা পরিবেশন করিয়া তাহার রাগা ও পরিবেশনের কৃতিত্ব দেখাইয়া দিল। খিচুড়ী অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছিল। প্রবোধ প্রভৃতি সকলেই চাহিয়া হইল। লভিকা কেমন রাগিত্তে পারে সেদিন তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। চাকর বাকর সকলকে খাওয়াইয়া শেষে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা লভিকা মহা আনন্দে আহার করিল। বেলা আনন্দ ৪টার সময় তাহার গাড়ী ছাড়িল। ঠিক সেই সময় উমেশ দেখিল পাাহাড়ের উপর হইতে মমুয়া ও সমীর নামিয়া আসিতেছে।

(ক্রমশঃ)

## কেবল জুরে কত লোক মরে !!

দেশ-বন্ধু-পল্লী সংস্কার সমিতি

বৃটিশ ভারতে জুর রোগে মৃত্যুর হার—হাজার কয়।

বৃটিশ ভারত	১৯১৭	১৯২১	মধ্য প্রদেশ	১৯২৬	২০২৭
মাদ্রাজ	১৯১১	১৯১৭	আসাম	১৯১৮	১৯১৭
বোম্বাই	৮০	৭৭			
বাল্লা	১৯২৭	১১৮০			
যুক্ত প্রদেশ	১৯১৬	২০০			
পাঞ্জাব	২৭০৫	৩০০১			
বিহার উড়িষ্যা	২৬৪২	২০৬২			
	২২৪২	২২৬০			

যত লোক জুর রোগে প্রাণ হারায় তাহা অপেক্ষা বহুগুণ লোক জুর ভোগ করে। পীড়িত জাতির ভিতর হইতে তাই দীরে দীরে বল, বীণা, উৎসাহ, আনন্দ কমিয়া বাইতেছে। এ জীবদ্য ত জাতি আর কত কাল বাচিবে?



## অশ্রুর সাধনা আমার

অজিতেন বক্সী

হে হৃদয়,  
অশ্রু-সাধনা আমার  
চিরদিন,  
নিভৃত জীবনে  
তোমার চরণ-পদ্ম-তলে।  
আরতি বরিকা তব  
আত্মার স্তিমিত-শ্রবণ  
বেদনায় রক্ত-পুষ্পাঘ্নে  
থালি পূর্ণ  
তোমার সম্মুখে।

নাহি স্বপ্ন নাহি শান্তি  
অবিশ্রান্ত  
দুঃখের কল্যাণ,  
চিন্তা-সিন্ধু তট, মম  
বাধা-দীর্ঘ, কাণ্ডে উচ্ছ্বাস,  
আশা মম,  
ব্যগ্র হ'য়ে জীর্ণ ভিক্ষু মম  
ভিক্ষা মাগি ফেরে  
শুভ্র হস্ত-প্রসাদিয়া  
বিশ্বের-পন্থায়,  
রিক্ত, আতঁনাদ করি।  
বার্খ বাসনা বত,  
মধু-গন্ধে লুপ্ত-ভ্রম মম  
গুণরিয়া খোরে, উদাসীন  
অদৃষ্ট  
প্রেমের কোন রক্ত-পদলাগি  
স্বরভিত্তে-ভরা।  
ঘরে চাই  
পাইনাক তারে  
তৃপ্ত বন্ধের-নীড় মাঝে;  
আসে যারা  
চিনিনা তাদের;  
অযাচিত-আঙ্গুষ্ঠ মন্দের ছুরারে হাত,  
রচেনো আসন,  
চিরদিন।  
সঙ্গী-পাণ-জন,  
চিন্তের দৈত্যতা হেরি

উপহাস ভরে চাঞ্চ, করেনো ইহিত,  
পাত্রে দেয় ধূলি;

অশ্রু  
ছাপি পড়ে, ভরি মোর আঁধি।  
ওগো ঘোরে  
ডাকি কেহ নাহি লয়  
আপনার বনি'  
আপন-আলসে;  
তবু-দেয় অবজার রাশি  
কটক-মুহূর্ত পায়া  
মত্তকে পরায়ে।  
শোনে নাক কেহ

মম, স্মৃতিমুখ-নীতি;  
ভূবে কশে তারা হীন এবিশ্বের  
ছন্দহীন কোলাহল তলে  
অশ্রুট ধরিতে!  
জানি ওগো জানি  
মম নিভৃত দেউলে  
রয়েছে তোমার হেম-সিংহাসন থানি  
হৃদয় আমার।  
দুঃখ পাই, পাই ঘৃণা  
নাহি ক্ষতি  
এই মোর স্বপ্ন  
জীবনের সকল রাগিণী  
নিঃশব্দে শোন গো তুমি  
স্মিত আনন্দে  
নিরালা ভগতে যোরে;  
লও তুমি বার্ষ-বেদনায়  
রঙ-পদ্ম মালা সখ্যে বসন্তে জড়ায়;  
লও মম  
অশ্রু নীলকান্ত মণি মম  
বন্ধেতে ছুলায়ে  
চাহিনাক কিছু  
আর  
হে হৃদয়!  
রহ মম জীবন ঘেরিয়া  
লহ মম অর্থা-নিবেদন  
সার্থক হউক মম, দুঃখের-সাধনা,  
অশ্রু আরাধনা।



মহানাগরী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পদিকার  
সার সঞ্চলন

সত্যের পরীক্ষা

ঐশীচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আমি। আমার মনের তৎকালীন অবস্থা  
বর্ণনা করা দুঃস্বপ্ন। একদিকে সংস্কারের উৎসাহ, অন্-  
দিকে গুরুত্বের অজ্ঞাতে কার্য্য করা ও তৎক্ষণাত লক্ষ্য।  
নদীরধারে নির্জন প্রান্তে একটা জায়গায় আমরা গেলাম,  
সেখানে জীবনে এই প্রথম মাংস ও পাউরুটি দেখিলাম।  
দুইটীর কোনটাই আমার কাছে কঠিনের বলিয়া বোধ  
হইল না। মাংস প্রায় চামড়ার মত শক্ত,—বিতৃষ্ণায়  
মন ভরিয়া উঠিল, হুতরাং আর বাওয়া হইল না।

রাজে ঘুমাইতে পারিলাম না—কেবলই মনে হইতে  
লাগিল একটা জীঘ্র ছাগল আমার পেটের ভিতর  
ডাকিতেছে—অস্বস্তাপে মন ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ  
নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম—মাংসভোজন সকলের  
কর্তব্য হুতরাং দোষ নাই। আমার বন্ধুগণ সহজ  
ছাড়িবার পাখ ছিলনা। সে আজকাল নিজের হাতে  
নানাবিধ মাংসের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং  
আমরা এক্ষণে আর নির্জন জায়গা হ'জিতে বাইতাম না,  
রাজকীয় ভোজনাগারে গিয়া আহার করিতাম; আমার  
বন্ধু এখানকার কার্য্যাদায়কের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিল।  
কন্দিটা খাটিয়াছিল ভাল; মাংসাহারে আমার বিতৃষ্ণা  
জন্মে দূর হইল; ছাগলের প্রতি যে ঘৃণাটুকু ছিল, তাহাও  
বীরে বীরে উধাও হইল; মাংস-ব্যঞ্জন আর আমি বিশেষ  
ভক্ত হইয়া পড়িলাম। এইরূপে প্রায় একবৎসর কাটিল;  
তদুপায়ে প্রায় ছয়বার আমরা এইখানে ভোজন করিয়া-  
ছিলাম কারণ এ ভোজনাপাণ্ডে প্রতাহ বাওয়া সম্ভব

ছিলনা, এবং স্বাস্থ্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে খরচ পড়িতও  
অনেক বেশী—আমি নিজে অর্থ-সাহায্য করিতে পারিতাম  
না, হুতরাং আমার বন্ধুই এই ব্যয়ভার বহন করিত।  
কোথা হইতে সে অর্থ-সংগ্রহ করিত তাহা জানি না, তবে  
আমাকে মাংসভোজী করিবার উদ্দেশ্যে যেমন করিয়াই  
হউক সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত।

যেদিন এইরূপ মাংস ভোজন করিতাম সেদিন আর  
বাটা আশিয়া কিছু থাকিত পারিতাম না। মাঝিলাসা  
করিলে বলিতাম—“ভাল হজম হয় নাই, ক্ষুধা নাই।”  
মাতা প্রত্যক্ষ দেখী—সেই মায়ের কাছেও মিথ্যা বলিতে  
হইল, কেননা জানিতাম সত্য কারণটা জানিতে পারিলে  
তিনি পক্ষে সত্যের অধিক যত্নগা পাটবেন। এ সমস্ত  
চিন্তা আমার অন্তরকে অত্যন্ত পীড়িত করিত। হুতরাং  
মনে মনে স্থির করিলাম—“মাংসভোজন অপরিহার্য্য,  
সমস্ত দেশে এই বাত-সংস্কার প্রচলন করা উচিত, মাংস  
ভোজন না করিলে দেশের প্রতি কর্তব্যের যে জটা করি,  
মাংসভোজন করিয়া, পিতামাতার নিকট মিথ্যা বলিয়া  
তাহা অপেক্ষা বেশী বোধ করি; হুতরাং তাহাদের জীবন  
কালে মাংসভোজন অসম্ভব। তাহারা এ পুণ্ডরী হইতে  
বিদায় গ্রহণ করিলে আমি স্বাধীন হইব, তখন প্রকৃত  
ভাবে মাংসভোজন করিব। যতদিন তাহারা বাঁচিয়া  
থাকেন, ততদিন উহা আর স্পর্শ করিব না।” বন্ধুকেও  
এই বুদ্ধি জানাইলাম। ইহার পর আর কখনও মাংস  
স্পর্শ করি নাই।



মাংস পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু বন্ধু পরিত্যাগ করি নাই। সন্ধ্যারের উত্তেজনাই যে আমার কাঁল হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

এই বন্ধুই একদিন আমায় বেতালয়ে লইয়া যায়—অর্ধাঙ্গির বিষয় সে পূর্ন হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পরে আমাকে যথাবিহিত উপদেশ (?) দিয়া পাঠাইয়া দিল। আমি পাপের প্রোক্তে ভাগিনাম, কিন্তু করুণায়ের অশেষ করুণায় দেখাতা বাঁচিয়া গেলাম! পাপের গন্ধের প্রবেশ করিয়া আমি কিংকর্ষণবিষয় হইলাম, জীলোকটির শব্দায় তাহার পাশে নির্লক্ষ্য হইয়া বসিয়া রহিলাম; সে স্বভাবতই খৈর্যাহারা হইয়া গালি দিয়া আমাকে পুছ হইতে বিহ্বলত করিয়া দিল। আমার মস্তক আর ধূলয় লুটাইল—লক্ষ্যের শির ভূ-নুগীত হইল।

আমার জীবনে এইরূপ আরও চারিটা ঘটনা আমার মনে পড়ে—প্রত্যেকবারেই আমার নিজের আন্তরিক চেষ্টার চেয়ে ভাগ্যগুণে বাঁচিয়া গিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ধর্মের স্বয়ং তুল্যবৎ বিচার করিলে প্রত্যেকবারেই আমি নীতিভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—পাপবাসনা ও পাপজিহ্বা ধর্মের চক্রে সমপোষ দেখি—তবে সাধারণ মানুষের চক্রে কিয়ার অস্বাভাবিক অবস্থামনে বাসনা নিষ্পাপ বলিয়া মনে হয়।

আমার ভাগ্যে আরও অনেক দুঃখ সঞ্চিত ছিল, সেই দ্রষ্ট এ সমস্ত ঘটনাতো আমার চক্ষু ফুটল না—পরে এই বন্ধুর পাপের অস্বাভাবিকের চরমক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনে তবে বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার সহিত বন্ধুত্ব করা কতদূর পণ্ডিত কার্য হইয়াছে।

এই বন্ধুর সহিত বন্ধুতার ফলে আমার পত্নীর সহিত মনোমালিন্য ঘটে। আমি জীব প্রতি অস্বস্তিক কিন্তু সন্ধিগঠিত হিলাম, এই বন্ধুই আমার মনে সন্দেহের আগুন জ্বালাইয়া দেয়—আমিও বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া জীকে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহা কোনদিন বিস্মৃত হই নাই এবং নিজেকে কমাও করি নাই। একমাত্র হিন্দু-সংস্কৃতি ব্যতীত এ সমস্ত দুঃখাবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ কাহারও দ্বারা সম্ভব নয় এবং সেই ভুলই অস্বাভাবিক জীভাতিক সহিষ্ণুতার অবতার বলিয়া মনে করি। তৃত্বকে সন্দেহ করিলে সে কথ পরিত্যাগ করিতে পারে—পুত্রকে সন্দেহ করিলে সে পিতার সহিত পৃথক হইতে পারে—বন্ধুকে সন্দেহ করিলে সে বন্ধু ছিন্ন করিতে পারে—কিন্তু জী যদি স্বামীকে সন্দেহ করে তবে সে চূপ করিয়া সম্ব করে—আর স্বামী যদি জীকে সন্দেহ করে তবে তাহার সর্বনাশ। হিন্দুবৃত্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে না—সমাজ তাহাকে সাহায্য করিতে পারে না। যখন অংহিয়ার মাহাত্ম্য বুলিলাম, তখনই জীব প্রতি এ সন্দেহের ছায়া পড়ায় আমার মন হইতে অপসারিত হইল। ব্রহ্মচর্যের অলৌকিক মহিমার গুণে তখন জানিলাম সংস্কৃতি স্বামীর দাসী নহেন, তিনি স্বমিনী ও সংস্কৃতি—স্বামীর স্বয়ং দুঃখে তিনি সমভাগী—এবং স্বামীর দ্বার স্বীয় কর্তব্যবিচারে সন্ধিগঠিত তিনিও স্বামিনী। যখনই সেই দুর্দিনের কথা আমার মনে হয়, তখনই আমার বৃদ্ধর প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসের জ্ঞান এবং আমার নির্লক্ষ্যতার জ্ঞান আশ্রয়স্থান মন ভরিয়া উঠে।



চোরে চোর

কলিকাতায় ভারতবাসীদের ব্যবসায়ের স্ববিধা বাড়াইবার জন্ত কোন কার্যকর প্রতিষ্ঠান ছিল না। চাণনাল চেম্বার অফ কমার্স নামক যে একটি বণিক সংঘ ছিল তাহা তেমন কার্যকরী নহে; ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইলেও একমাত্র উহার কর্তাদের সাহায্যে অভাবই উঠা এবাং ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন উপকারে আসে নাই। সম্ভ্রান্ত হুপ্রসিদ্ধ গৌহ ব্যবসায়ী আনন্দজী হরিদাস এও কোরে শ্রীমৎ আনন্দজী হরিদাস কর্তৃক ভারতীয় বাণিজ্য নিকেতন (Indian chamber of commerce) নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই সভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় মিঃ আনন্দজী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বৃহৎকার অর্থবিধা ও উন্নয়ন করণে কলি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিদেশী বণিকগণ যেরূপ নিষ্পন্নভাবে ভারতের ব্যবসায়গলিকে আয়ত্ত করিয়াছেন তাহার প্রতিকার এখন হইতে করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও পথ অচিরেই যে নষ্ট হইয়া যাইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এরূপ কার্যে কোন বাণালী ব্যবসায়ীকে উত্তেজা দেবিলে আমার পরম আশ্বস্ত হইতাম—যাহা হউক একজন ভারতবাসী যে এই দুঃস্থ কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সত্যই আমদের বিষয়। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবন কামনা করি ও ইচ্ছা করি সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী ইহাতে যোগদান করিয়া ইহাকে এমন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করন যাহাতে ইহার বাণী রাজসকালে তাহার গুরুত্ব জানাইতে সমর্থ হয়।

সহায়ত্ব প্রদায় না অধিকতর সর্বদাই তাহাদের নিন্দা করে। অভিযোগটির বিরুদ্ধে সাধারণের অনেক কথা বলিবার আছে। পুলিশ ভাল কাজ করিলে সাধারণ পক্ষে তাহার প্রশংসা বাহির হয় এবং সাধারণে তাহাদের সাহায্য করে কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ তাহাদের কর্তব্য করে কি? পুলিশ জানে সাহেব লোকগিকে সেলাম করিলে ও তাহাদের মন ভোগাইয়া চলিলেই তাহাদের কর্তব্য সমাপ্ত হইল। যে দেশের অধিবাসীর প্রদত্ত অর্থে তাহারা জীবনধারণ করে তাহাদের তাহারা গ্রাসের মধ্যেই আনে না। রাষ্ট্রীয় ভীড় হইলে প্রাইই পেরিতে পাওয়া যায়, সাহেব মেমের মোটরের পথ আগে সাক করিয়া দেওয়া হয়, দেশীয় লোকদের অবজ্ঞার সহিত 'পাড়া' করিয়া রাখা হয়। সাহেব কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে পুলিশ আত্মী নত হইয়া সেলাম করিয়া বিনীতভাবে উত্তর দেয়—দেশীয় লোকের জ্ঞান তাহাদের কর্তের এমন একটি উক্ত পরমা ও বাধাবুলি তৈয়ার থাকে যাহাতে যে কোন আশ্রয়দায়ী সম্পন্ন দেশীয় ব্যক্তি নিজেকে অবমানিত বিবেচনা করেন। সাহেবের ঘরে চুরি হইলে থানাভুক্ত সেখানে গিয়া হাঙ্গির হয়—দেশীয়ের ঘরে চুরি হইলে থানায় সমস্তদিন হত্যা দিয়া থাকিতে হয়; তারপর হতত একজন জমাদার আশিকনে—গাড়ীভাড়া করিয়া তাঁহাকে আন, তাঁহাকে ঘোড়প উৎসারে পূজা দেও; তারপর ফল বা হয় তাহাতো কাহারও অবিরুদ্ধ নাই। ফল চোরের চেয়ে দার বাড়ী চুরি হয় তাহাকে বেশী লালনা ও উপগ্রহ সম্ব করিতে হয়। এ সমস্ত জানা কথা—বেশী বলিয়া কেবল শুন নষ্ট করা বই ত নয়—নতুবা আরও অনেক কথা বলা যাইত।

সোমবারের ইংলিসমান পক্ষে 'পুলিশ' সম্বন্ধে একটি অস্বস্তি রচনা বাহির হইয়াছে। সাধারণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তাহাতে আছে যে জনসাধারণ পুলিশের সহিত

সম্ভ্রান্ত চট্রায়ে দুইটা দাঙ্গাহারাম্যর মামলার তথাকার বাজিট্রেট পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে বা মন্তব্য





দিয়াছেন তাহা শুনিতে পুলিশের উপর কাহার লজ্জা হয়? তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন যে স্থানীয় জমীদারদের প্রেরচনায় পুলিশ এই মিথ্যা মামলা দুটা সাফাইয়াছিল। ক্ষমতাশালী পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ১৮১৪ জন দরিদ্র গ্রামবাসীকে যে এই অথবা উৎপীড়ন করিল—অকারণ অর্থহান্য করাইল তাহাতে তাহাদের মনে বা কোন ভারতবাসীর মনে কি তাহাদের উপর কোন প্রকার আস্থা জন্মিতে পারে? ইংলিসমানের সাহেব লেখক কখন পুলিশের আচরণ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পান নাই তাই তিনি বাংলা লিখিয়াছেন তাহাকে অসম্ভবতার কল বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি। এই সেদিন ফরিদপুরে প্রকাশ্য ক্রীড়াক্ষেত্রে সামান্য পুলিশ কনেষ্টবলগণ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে, তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ছাড়াগিগের প্রতি মারপিট করিয়া যে বর্করোচিত আচরণ করিয়াছিল অল্প কোন সভ্য বা বাণীন দেশ হইলে তখনই সেই সমস্ত পুলিশ নামধারী গুণ্ডাদের দেহ, উত্তেজিত জনতার পদে পিষ্ট হইয়া যাইত কিন্তু বাঙ্গালদেশে বলিয়াই তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। এসব ধরনের অবস্থা সহযোগী ইংলিশমানের অবদিত নাই, কিন্তু সে সমস্ত তাহাদের কোন সম্ভাব্য জন্য যার না কেন? সভ্য এমন জিনিষ যে তাহা স্বার্থের বিরোধী হইলে কষ্ট রুদ্ধ করিয়া দেয়।

একলা ইতিহাস সমাজের অন্ততম দলপতি কর্ণেল সিক্টরী ব্রিগেডে গিয়াছিলেন, তাঁহার সহপাঠ্যদের হুখ হুখিয়ার একটা কাহেনী বর্ণনাবৃত করিতে—সেখানে তিনি কতদূর কি করিতে পারিয়াছেন আমরা জানি না; কিন্তু অমুহুর্তে বোধ হয় বিতর্ক বেতন্ত্বধারীগণ তাহাদের এই দূর-সম্পর্কীয় বংশধরগণের জন্ত তখন যেহ প্রকাশ করেন নাই—কল কর্ণেল সাহেব তাহার সম্ভ্রান্ত্যদের সহযোগিতা ভারতবাসীর সঙ্গে যোগদান করিয়া তাহারা বাহাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা ঠিক করিয়া লইতে পারে সেজন্ত উপদেশ দিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা সত্যই আনন্দিত হইয়াছি, কারণ আমরা চাই যে সমস্ত

প্রকৃত ভারতবাসী—তাহাদের ধর্ম, ভাষা বা বংশ বাহাই হউক না কেন—রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একত্রিত হন, সংঘবদ্ধ হন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও বিশিষ্টতায় স্বরাঙ্কের পথে বত তীক্ষ্ণ ও তীব্র কটক হুগি করিয়া থাকে এমন কি আর কিছুতেই পারেন না। বাস্তবিকই এগুলো ইতিহাসগত বৈদেশী নহেন—তাহারা এই দেশে জন্মিয়াছেন—এই দেশের জলবায়ু ও অগ্রে পুট—তাহাদের স্বার্থ এই দেশের প্রকৃত অধিবাসীগণের সঙ্গে সংমিশ্রিত না হইয়া কেবল একধর্মীয় বলিয়া বৈদেশী ইংরাজ বিকল্পগণের সঙ্গে এক হইতে পারে না। আজ যদি তাহারা এই চরম ও পরম সভ্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন তবে তাহারা মত ভ্রমসংবাদ আর আমাদের কাছে কি আছে? কর্ণেল গিডনীর এই সংসাহদের সহিত নিজের ভ্রম সংশোধন করিবার প্রয়াসের জন্ত আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বরোয়ার মহারাজ গায়কোবাড়ের রাজ্যে জুবিলী উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্বলপক্ষে কীষ্টিমন্দির নামক এক বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও তাহার প্রজাবর্ণের জন্ত কিছু কিছু সুব্যবস্থাও করিয়াছেন। ভারতীয় রাজতন্ত্রের মধ্যে জাতিগঠন, শিখাগ্রচারণ, ভীত-ভীত, বিধবা-বিধবা প্রভৃতি, অসন্ত জাতির উন্নতি করণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তিনি একদিন অগ্রণী ছিলেন কিন্তু ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অতীতের এই মহান আদর্শের গতি সহসা মল হইয়া গিয়াছে—মহীশূর, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি রাজা আজ তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মহারাজ গায়কোবাড় রাজ্যচালনা ব্যাপারে প্রথম প্রজাবৃত্তকে বড়তরু অধিকার গিয়াছিলেন তাহার পর আর তাহা বাড়াইবার কোন চেষ্টা করেন নাই—কিন্তু মহীশূর, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি রাজা বহল পরমাণে উন্নত ও সফল হইয়াছে। উন্নতির অগ্রণী হইলেও আজ যে তিনি পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, এই আনন্দ উৎসবের নান্দেও সন্দেহা স্বরণ করিয়া আমাদের সত্যই বড় হইয়াছে। তবে এই উৎসব উপলক্ষে তিনি বড়লাট রেভিঃ বাহাদুরের নিকট ভারতীয় রাজ্য সমূহের জন্ত যে সদ্গত

স্বাধীনতার দাবীর কথা জানাইয়াছেন তজ্জন্ত তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা তাঁহাকে স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী বলিয়াই জানি—যে তো বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপে তিনি নিজের ইচ্ছামত রাজ্যের উন্নতি করিতে পারিতেছেন না। তবে চতুর লর্ড রেভিঃ বাহাদুর “আজ্ঞা দেখা যাইবে, বিবেচনা করিব” প্রভৃতি আপাতঃমধুর শব্দক বাক্য দেওয়া ছাড়া বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন নাই।

আগামী ২৫শে মাঘ গোমবার দিনার্ভা রথযাত্রা স্বর্গীয় নট, নটিকা এবং অধ্যক্ষ গিরিন্দ্রের বার্ষিক দ্বিতীয়ার্থ অধিবেশন হইবে। স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

## চরন

আকাশে একটুখানি কাল মেঘ দেখিয়া কোন মতেই মনে হয় না যে এই মেঘখণ্ডের সমস্ত আকাশ আবৃত করিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আছে। কাল-বৈশাখীর দিনে কিন্তু এই বকবাই দেখা যায়। জগতের বড় বড় ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে এইরূপ একটা পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। রণপীড়িত আর্ন্ত-জগৎ ও জাতি সমূহ আজ নৈতিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই শাস্তি চাহিতেছে। বিঘাতা জানেন এ শাস্তির দূত পৃথিবীর কোন অংশে কখন সংসা আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু এখন হইতেই তাহার আগমনের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

সামাজিক রীতিনীতির সাম্য, পরস্পর মনোভাব বিনিময়, নৈতিক স্বাণন করিয়া একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অপূর্ণ ভাবের উন্মেষে জগতের সকল বড় বড় ধর্মমণ্ডল নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই ভারতেই তাহার স্বরূপাত হইয়াছে। হিন্দু-ধর্মের ভিতর দিয়া মহাত্মা গান্ধী জগতের নিকট শাস্তি ও মিলনের বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। আজ পৃথিবীর

সকল শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রমুখ লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ঠার বিয়েটোরের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অপ্পেশচন্দ্র সুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। উক্ত প্রবন্ধ আগামী সপ্তাহের নবযুগে প্রকাশিত করিবার জন্ত আমরা বিশেষ সচেষ্ট থাকিব।

এতদিন পরে গুরুবারের ব্যাপারের হেতু নষ্ট হইল। আকালী শিখগণ মুক্তলাভ করিয়াছেন, আরও পূর্বেই যতই তাহারা মুক্তি পাইতেন, কিন্তু এতদিন সরকারী “গ্রেট্রিজ” বোধ হয় প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। সরকার বাহাদুরের জয় হোক।

সকল ধর্মই মহাত্মার এই বাণী নতশিরে মানিয়া লইয়াছে এবং—ইহা তাহাদের মধ্যে বহুবিধরূপে ফলপ্রসূ হইয়াছে।

খুব বেশীদিনের কথা নহে বৌদ্ধধর্মের বিগ্রহ স্বরূপ তিস্তাকের লামা চীনদেশে গমন করিয়া শাস্তি প্রচার করণে ও বাসে তাহারা ধর্ম দ্বারা রণপীড়িত, মুহূঃ জগতকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। কয়েকমাস পূর্বে মুসলমান ধর্ম মহাসভায় প্রচারিত হইয়াছিল যে অধিকার লইয়া বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মল, জগতের উন্নতি ও জাতির স্বায়িত্বের সম্পূর্ণ পরিণতি। এ বিষয়ে প্রাচ্য প্রাচ্যতা, কোথাও কোন মতভেদ নাই।

সকল জাতিই একপন চেষ্টা হইতেছে প্রত্যেকের জাতীয় জীবনকে দৃঢ়, স্থগতিত দীর্ঘকালী ও উন্নত করা। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আপদ দোষ, স্বপরিচালিত পথে চলা, মুক্তি, হুবিচার ও পরস্পর পরস্পরের প্রতিনিধি হওয়া ভিন্ন ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেদিন



শীঘ্রই আসিবে; নিম্নলিখিত ধর্ম প্রবাহে জগতের বৃত্তি সেমিন পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

মিঃ টাকাহুইং ইং ইং নামক পত্রিকায় ভারতের নিকট জাপানের স্বপ্ন সম্বন্ধে যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি অস্ত্রাভি বিষয়ের মধ্যে বলিয়াছেন, বরশিল প্রবর্তনে ভারতই জাপানের গুরু। এ সম্বন্ধে তিনি জাপানের দুবাকালীন ইতিহাস হইতে একটি বিষয়কর কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন অতি পুরাকালেই বরশিল উপলক্ষ্যে জাপান ও ভারতের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ১২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সামান্য বন পরিত্যক্ত একটি বিদেশী ব্যক্তিকে একখানি সামান্য নৌকায় চড়িয়া জাপানের কিম্বদন্তি উপকূলে ভাসিয়া আসিতে দেখা যায়। তাহার মাকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরে স্থলির মত একটি বুলি ছিল। তাহার ভাষা বৃত্তিতে না পারায় সে কোন দেশের লোক তাহা স্থির হয় নাই; কিন্তু একজন চীনাধ্যক্ষ সে সময় তাহাকে মালয়ের সুয়েনল্যান প্রদেশের লোক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। লোকটি কিছুদিনের মধ্যে জাপানী ভাষা শিখা করিয়া প্রকাশ করে যে সে তেনজিই হইতে আসিতেছে। সে সময় ভারত, জাপানের নিকট উক্ত নামে পরিচিত ছিল। তাহার নিকট বীজের মত কতকগুলি দ্রব্য ছিল। ইহা হইতেই পরে তুলার চারা উৎপাদিত হইয়াছিল। লোকটি পরে ধর্ম-মন্দিরে আশ্রয় লইয়া তাহার সমুদ্র সম্পত্তি সাধারণকে দান করে। তুলার বীজগুলিই তাহার মধ্যে প্রধান। এই সময়ই জাপানের তুলার চাষ ও বরশিলের হস্তশিল্প হয় বলিয়া জাপানের ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

অনিষ্টা রোগের প্রাবল্য আঙ্গকাল ক্রমশঃ বাড়িয়া

চলিয়াছে। অনেক ইহা তুচ্ছ ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক পীড়া, অনেক সময় ইহার প্রভাবে মস্তিষ্কে স্থায়ীরোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ হজমের ব্যতিক্রম হইতেই অনিষ্টার উদ্ভব হইয়া থাকে। স্বপ্নাচ্ছন্ন নিদ্রা, ঘুমাইতে অনিচ্ছা, অতি সামান্য শব্দেই জাগিয়া উঠা, সর্পিদা ওজার ভাব প্রভৃতি এই অবস্থার লক্ষণ। পাণ্ডা দাওয়া সম্বন্ধে একটু ধাক্কাটাকা করিলে, পাকস্থলী সঞ্চয়ী শোণমালা দূর্ব হইলেই অনিষ্টার হাত হইতে সহজে অব্যাহতি পায় না। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার কতকগুলি ব্যবস্থা দিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :—

(১) খাদ্য-বিচার নিরীহীনতা রোগের একটি প্রধান ঔষধ। যে সকল খাদ্যে অন্ন ও উদরে বায়ু বৃদ্ধি হয়, তাহা সর্বদা পরিত্যজ্য।

(২) আহারের পরিমাণ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রাগেরে খাবার নিষিদ্ধ। বাইবার অন্ততঃ ৩০টা পূর্বে থাইতে হইবে। আহারাদি করিয়াই শয্যাগ্রহণ করিলে হজমের গোলমাল অপরিহার্য।

(৩) আপন রোগের কথা ভাবিয়া কখন উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে। ইহাতে রোগের বৃত্তি ভিন্ন কিছুমাত্র উপশম হয় না। অনেকের অভ্যাস আছ—বিধানীয় ভরসা হত রক্তের ভাঙ্গনা চিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করা, ইহাতে মাথাঘর রক্ত উঠিয়া অনিষ্টা হইয়া থাকে। ‘কিছুই হয় নাই’, ভাবিয়া চকল মনকে সখ্যত করিয়া স্থির ও প্রশান্তভাবে শয্যাগ্রহণ করিলে শীঘ্রই নিদ্রা আসিয়া থাকে।

(৪) গুরুভার ও দুশপাচা খাদ্য রাজ্যে পাওয়া উচিত নহে। শুভিতে থাইবার পূর্বে অল্প ব্যায়াম করা নিরীহীনতা রোগ আবেগের প্রকট উপায়।

ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩২ ঃ—“নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টি কর্তা” এই শীঘ্রক দার্শনিক প্রবন্ধে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যমিত্রের সমতত্ত্ব উদ্ভূত করিয়া, ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও সৃষ্টি কর্তৃত্ব সম্ভবপর ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির সার মর্ম এই, শক্তির ভারতবর্ষ অস্থান্যে বর্তার কার্যকারিতা সম্ভব হয়। তাহা হইলে সর্ব-শক্তি-মান পরমেশ্বর যে অবয়ব নিরপেক্ষ হইয়া, ইচ্ছামাত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, ইহা অসম্ভব। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রুতিগ্রন্থাৎ এবং শাস্ত্রব্যাক্য সকলের সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বরের প্রাকৃতিক দেহাতি নাই; কিন্তু দিবা প্রাকৃতিক দেহ আছে। অবশ্য যাহারা ভাবুক ভক্ত তাঁহার এই ভাবের তর্কের নীরস ধূলী অঞ্জলি ভরিয়া ললাটকণ্ঠ করিবেন না, তাঁহারাই বলিবেন,—“সাকার কি নিরাকার ভেবে মরুক ভ্রান্ত যারা, রসেতে রসেছে আমার মধুমত্ত মন-ময়রা।”

“শরীর পালন-বিধি”—ভাকার নিবারণ চক্র মিজ এম-বি মহাশয়ের প্রবন্ধ। নামেই বিষয়ের পরিচয়। স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ প্রবন্ধের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আশা করি লেখক এ বিষয়ে আলোচনা অসমাপ্ত রাখিবেন না। “মাছু-মঙ্গল” বিভাগে জীমাতী বিন্দলা দেবী মহাশয়া বিরচিত “পুংস্বামী” এই শ্রেণীর আর একটি জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ স্থলিখিত প্রবন্ধ। সেকালের গৃহীতগণের জ্ঞান-ভাগ্যেরে অভিজ্ঞতা লব্ধ অনেক রত্ন সঞ্চিত থাকিত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায়। “গায়ত্রীর ব্যাখ্যান” সত্য ভূষণ ধর্মগীর শর্মা বিরচিত প্রবন্ধ। লেখক হিন্দুর পরম পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই, তাঁহার পূর্বগামী মনীষিগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত করিয়াছেন।

“দক্ষিণাপথ” সম্পাদকের সরগ ভগ্ন বৃত্তান্ত গ্রন্থের চিত্র বিশ্লেষিত। “মোটরে কাশীর যাত্রা” সৌরীজ বাবুর কাশীর অবধি মোটর-যানে “লখা পাড়ির” কাহিনী হস্তান্তর কাহিনীও যে দীর্ঘ হইবে এবং “ভারতবর্ষের” অনেকখানি স্থান

অধিকার করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সৌরীজ বাবুর এ অভিযান বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন এবং চমকপ্রদও বটে।

ছোট গল্পের দিক দিয়া সমালোচনা করিলে মনে হয় “ভারতবর্ষ” ক্রমশঃ পক্ষান্তরে হাটতেছেন। এ সংখ্যায় যে বয়সী ছোট গল্প বাহির হইয়াছে, তাহার একটিরও আমরা স্বগাতি করিতে পারিলাম না।

সম্পাদক মহাশয় নিজে কলম ধরেন না কেন?

“বৃদ্ধ ধাত্রীর রোগ নামচা” খুব রোমাঞ্চিক হইয়াছে! বাঙ্গালী মেয়ের বিমান চালকের সহিত প্রেমোন্মত্তির (Miration) এবং তাহার সঙ্গে ব্যোমগণ বিহার এবং বিজ্ঞান ঘোঁষে অবতরণ ও অগ্রভাষ্যিত ভাবে উদ্ধার ইত্যাদি রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করিয়া লেখক মহাশয় এক শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন সমর্থ হইয়াছেন। লেখক লেখার স্থানে স্থানে ইংরাজী কবিতার বাঙ্গালী ভাষান্তরিত করিয়াছেন। অহুবাগলি-বেশ হইয়াছে।

কবিতাগুলির মধ্যে কুমুদ-রঞ্জন “মোমাছি” একে-বারে কাব্যগন্ধ হীন। ইহাতে কবি অল্পত রসময়ের দার্শনিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ philosophising কাব্য রসের পরিবর্তে হাস্য-রসের সৃষ্টি করে।

শ্রীমন্ত্রে দেবের “সমুদ্র শব্দ” একটি স্বরীধ কবিতা নয়রঙ্গ বাবুর এই শ্রেণীর রচনা (বার্ঘতা series ৭) যেন “এক খেরে” হইয়া আসিতেছে। কবিতার শেষাংশে রক্ত বৈশাখের ছবি অসংলগ্ন হইয়াছে মনে হয়।

নরেন্দ্র বাবুর এ কবিতার স্থানে স্থানে কবিত্ব এবং স্থানীয়ভিত শব্দ বোঝনা দ্বারা স্বন্দর দৃশ্য অর্থ প্রকাশ উৎকোচ হইয়াছে। কবিশৈল্যের কালিদাস রায়ের “অরণ্যের অস্থান” কবিতাটিতে শব্দ সমাবেশের মাধ্যমে বাস্তবিক ভাবে দিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে।

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩২—এ মাসের “প্রবাসী” প্রবন্ধ সৌরভ, বিষয় নির্ভরগত অতি স্থপাঠ্য হইয়াছে। “উদ্ভিদের জংশন” আচার্য জগদীশচন্দ্র বহুর নবাবিকৃত উদ্ভিদ জীবনে গৃহত বসন্তীয় ইংরাজী বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ। আচার্য বহুর বিষয়-





কর আবিষ্কারের বিষয় সম্ভাব্য হইতে পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই সমস্ত বিষয় চিত্র সাহায্যে বিশদরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। “পৃথিবীর রাসায়নিক ইতিহাসিকতা” অধ্যাপক অমৃতলাল শীলের ঐতিহাসিক গবেষণাশ্রম প্রবন্ধ। লেখক মহাশয় বিবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পৃথিবীর রাসায়নিক ক্রিয়াসমূহ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই সমস্ত গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের পাঠে শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সাংবাদিকের ভাষা” হস্ত রসের অবতারণা করিয়া বৈচিত্র্য আনিয়াছে। প্রাণী বিজ্ঞানের তথ্যসম্বল কেন্দ্র সহস্র করিয়া বলা যাইতে পারে তাহার উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ বসুজী লাল দায়ের লিখিত “জানুয়ারীর জীবন কথা”। লেখক অতি মনোজ্ঞ ভাষায় নিজস্ব লিখনশৈলীতে ভ্রমকের জীবন-যাত্রা নির্বাহী প্রাণী, খাদ্য-সংগ্রহ, স্তন্য উৎপাদন, স্তন্য গালন প্রভৃতি বৃত্তান্ত বলিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে আমরা প্রাণী-বৃত্তান্ত বিষয়ক নীরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িতেছি। আমরা লেখককে অন্তরের সহিত সম্বন্ধন করিতেছি।

“প্রবাসী” মাসকে জানেন্স-বাবু বহুদিন হইতে প্রবাসী বাঙালীর কাঁড়ি ও প্রতিভার পতিত দিতেছেন এবং এই আশ্রয়-বিমুক্ত জাতিকে তাহার অতীত-গৌরব-কাহিনী শুনাইতেছেন। তাহার কলে “বাকালার বাহিরে বাঙালী” নামক অপূর্ণ উপাদেশ এক গ্রন্থ বহু-সাহিত্যিক সমুদ্র এবং সমুদ্র সঙ্গ আমাদের জাতীয় চেতনাকে উদ্ভুদ্ধ করিয়াছে। আমরা সর্বাত্মকরূপে জানেন্স বাবুর উত্তমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

“ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ” স্বামী চন্দ্রসেনব্রহ্মণ্য লিখিত সমযোগ্যগৌরী প্রবন্ধ। প্রবন্ধের সারমর্ম এই যে অধিগত অসহযোগ নীতি চিত্রাঙ্কনগত নূতন নৈবেদ্য; মহাত্মা-গান্ধী একেই কলিউট-উল্লসের মতক প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাত্মাজী মতবাদ উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু এই মত অবলম্বনে জাতির মুক্তি হইবে কিনা সন্দেহ। বৌদ্ধধর্ম ভারতে অধিগত নীতি চালিয়া দেশের সর্বসাধারণ সাধন করিয়াছিলেন। লেখক দেবদ্বীপে চাটনে জাতি-ধর্মের কাজভাবের স্মরণ ও পুণ্ড্র প্রয়োজন অধিগত ব্রহ্মণ্যভাবের স্থান রাখ-নীতিতে নাই।

“কথা কথা” শ্রীতাত্ত্বিক দাসের লিখিত প্রবন্ধ। লেখক কবি-প্রতিভা, কবিতা কবিতা ব্যক্তি, পাঠকের সহিত কবিতা এবং কবিতার সম্বন্ধ প্রকৃতি বিষয় বেশ বিশদ-রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের স্বাধীন চিন্তা এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য।

“বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসের দিগদর্শন” শ্রীকৃষ্ণ লেখক শ্রীকৃষ্ণনাথ বসু ইন্ডো-ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গবেষণার সাহায্য লইয়া এশিয়া মহাদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম বিস্তারের একটি ধারা-বাহিক ইতিহাস আনন্দিকগণে তুলিয়াছেন। রচনাটি বেশ সুগঠন হইয়াছে। এই সমস্ত গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের পাঠে শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সাংবাদিকের ভাষা” হস্ত রসের অবতারণা করিয়া বৈচিত্র্য আনিয়াছে। প্রাণী বিজ্ঞানের তথ্যসম্বল কেন্দ্র সহস্র করিয়া বলা যাইতে পারে তাহার উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ বসুজী লাল দায়ের লিখিত “জানুয়ারীর জীবন কথা”। লেখক অতি মনোজ্ঞ ভাষায় নিজস্ব লিখনশৈলীতে ভ্রমকের জীবন-যাত্রা নির্বাহী প্রাণী, খাদ্য-সংগ্রহ, স্তন্য উৎপাদন, স্তন্য গালন প্রভৃতি বৃত্তান্ত বলিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে আমরা প্রাণী-বৃত্তান্ত বিষয়ক নীরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িতেছি। আমরা লেখককে অন্তরের সহিত সম্বন্ধন করিতেছি।

সর্গভাষী সত্যনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞেন্দ্রনাথ পাল এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের সংগৃহীত প্রবন্ধ। লেখক কোন নূতন কথা শুনাইতে পারেন নাই। “ভারতবর্ষের অর্থের কথা” প্রবন্ধ লেখক আড়াই পাতার মধ্যে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতনকাল পর্যন্ত সময়ের মুদ্রা ও বিনিময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন—লেখকের বোধোদয়ী আছে।

এই সংখ্যার দুইটি ছোট গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণ সজনী কান্ত দাসের “গল্প” মূল্যায়ন পরিচয় পাই; লেখক গল্পের নায়ককে একটি day dreamer রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। দেবদ্বীপ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পশ্চিমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীধীরকুমার রায়চৌধুরী “অপারী” একটি চলন-সুই গল্প।

আলোচ্য সংখ্যায় একজন নূতন “কবির” পরিচয় পাইলাম। ইহার নাম হুমায়ুন কবির। ইনি কবির না হুমায়ুন। এই উক্ত নামধারী “সত্য-মহা” রচনা করিয়াছেন। কবি দেখিতেছেন—“কবি পশ্চিমের কাণে চন্দ্রমার কী রশ্মি কাটিছে গগনে।” আবার পরকণ্ঠেই দেখিলেন “পূর্ণচন্দ্র দ্বীপে দীপে উঠে উজ্জ্বলিত”—চন্দ্রের সমুদ্র-রূপে বরাহাবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের স্বাধীন চিন্তা এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS, 83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.



বিত্যয় বর্ষ]

১লা ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩২, ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

[ ২৬শ সংখ্যা

পার্সনাথ

শ্রীরাধাধারী দত্ত

হৈমন্তিক বৌদ্ধ-মতঃসূত্রী সিদ্ধ শ্রামধর্ম

পার্সনাথ গিরি।

আমার নয়ন-নয়ন মোহিয়াছে যাবারী স্বরূপ

স্বপ্নজালে গিরি।

বিরাট গম্ভীর অই মহানু উদার রূপছবি,

শব্দহীন কবে বীণা, শুধু করে কলকণ্ঠ-কবি;

ভুলে যাই ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র কণ্ঠ ক্ষুদ্র কথা সব-ই

—হে বৃহৎ! মহত্ত্ব তোমার,

সাক্ষীতা ভুলি প্রাণ কণকাল লভে সম্প্রদায়।

লজ্জা মেঘ যোম্যপথে উজ্জলিত করে পানে চাহি

করে অশ্রুজল?

উপাত্তের মন্ত্র কাণে আকাশ এনে কি দেখে রাহি

প্রেম-পরিমল?

পেয়েছে ইন্দ্রি কল্প? কিছ্র হাসি শোভা গদ গদ গান?

অনাহত বীণাধারি, অশরীর মরুত-ধার?

উৎস-রূপে করে আঁখি কী পূলকে প্রাণ পল্লবমান

হে তাপস! হে গোপনচাহি!

ল'ভেছ কি প্রার্থিতের সপ্নে-বারতা ব্যাধাহারী!

মধ্যাহ্ন-গগনতলে উচ্চশিরে আছে ঈড়াইয়া

মন্দির-কাঁটিতি!

কী হৃদয়! কী মহান! নয়ন সার্বক নেহারি

হৃদয়ী শ্রীতি!

নীলতরু লীলায়িত কবি দেবে নীলাকাশ পটে,

হৃৎসমের-মালা গলে বন্ধন বোধিহা কলি-তটে,

হে সন্ধ্যাগি! হে উদাগি! অপ্রেমিক নহ ভূমি বটে

বৃষ্টিমাছি কতক অভাস,

নিবিড় শালেরবনে গঠে ভব হা দীর্ঘবাস।

তীর্থকর-পুত অধি শিরে ধরি গিরি-তীর্থ হ'লে

ওঁরই নাম লভি,

বিরাট মূর্তি তব আঁকে এক ঢল ছবি-তলে

অচঞ্চল ছবি!

নিমে মহিষের দল ভ্রমে অকি ভুজ মহা প্রায়,

হেমন্ত-বাতাস কাণে কি জানি কি বারতা জনায়

লেগেছে আবেশ অই মধুর “মধুরন” ছায়

—পার্সনাথ-হৃদয়ে কোটে ভাষা।

“ওগো পাখ! তব লিখি পথপ্রদর্শক বাঁধিয়াছি বাসা!”

আকাশ বাতাস ভাকে, নদী, গিরি, তরুলতা, ফুল

“আর পাখ আর,”

‘মধুরন’ মধুর ভাকে “ওরে মরণ-ব্যাখুল

পথপ্রদর্শক হায়!

আর যের অগমন-দেবালয় পবিত্র অঙ্গনে,

পাখি তৃপ্তি; কিবা কাজ গিরিধরী পর্বত লজ্জনে,

উৎস ভাকে ইন্সারায়,—“পথপ্রদর্শক! তোরা সব নৈন”

মুখ আমি তব চেয়ে থাকি,

হা হা হা শীতবায়ু কহে কাণে—“পাখ মূখ আঁখি”





ঘুম পাহাড়

শ্রীনিবার্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ছোটবেলা উপকথায় "সোণার পাহাড়" "রূপার পাহাড়" "কড়ির পাহাড়" প্রভৃতি পাহাড়ের নাম পাঠ করিয়া বর্ণিত হইলেও মনে ভাবিতাম সোণা, রূপা, প্রভৃতি থনিজ দ্রব্যই সকল পাহাড়ের নামকরণের কারণ হইবে। পাঠকরাও পারিত। কিন্তু বাস্তব জগতে যুম পাহাড়ের নাম শুনিয়া ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলাম; তখনও জানিতাম না যে কখনও এই যুম পাহাড়ের যুম্ম দূশ দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার ঘটবে। কিন্তু ভগবানের নিয়তিচক্রে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দারজিলিং-হিমালয়-বিলে-কোশালীর দূর পাহাড়ের দোরগোজ করিয়া যখন 'লন্ডিন বনানী' পৰ্য্যট-রাশি' ১৯০৭ সাত হাজার চারিশত সাত ফিট উচ্চ পৰ্ব্বতের শিখর প্রদেশে আসিয়া পাহাড়িত হইলাম তখন ঐশ্বরের গণ্ডে বড় অক্ষরে "যুম" নামটি খোদিত দেখিয়া বিশয় বিস্ময়জনিত মনে চাটিয়া ছিলাম। তখন মনে হইল একদিন উপকথার পাঠ করিয়াছিলাম, কোন রাগপূর্ণ পাতালে প্রবেশ করিয়া এক যুম্ম রাজ্যে উপস্থিত হইয়া-ছিলাম, এবং সেই রাজ্যের রাজপ্রাসাদ হইতে অশ্বশালা পর্যন্ত সমুদ্র জীব-জন্তুগণকে নিম্নিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। আর আশা করি আমি পাতালের পরিবর্তে জ্বনম-উল্লিকের উটিতে উটিতে বাহ্য জগতের যুম পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মরি! রাজপুত্রের মত এখানে আমাকে জন প্রাণিগণের নিম্নিত অবস্থার ভয়াবহ দূশ দর্শন করিতেও হয় নাই, কিন্তু এখানকার প্রকৃতির রাজ্যে সকলকেই নিম্নিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম।

ঘুম দারজিলিং হিমালয়ান রেলের একটি প্রধান  
 ষ্টেশন। ঘুম ষ্টেশনের অব্যবহিত পরেই দারজিলিং।  
 দারজিলিং বাইতে হইলে ঘুম ষ্টেশন অতিক্রম না করিয়া  
 বাইপাস উপায় নাই। দারজিলিং হিমালয়ান রেলের

অন্তর্গত মতগুলি ঠেঁশন আছে, তদ্বারা ঘূমের উচ্চতা সর্বাংগে অধিক। সাগর সমতল হইতে সাধারণতঃ পার্শ্বতা প্রদেশের উচ্চতা গণনা করা হয়ই থাকে; সেই হিসাবে দরজিলিঙ্গের উচ্চতা ৬৮১২ আর ঘূমের উচ্চতা ৭৪০৭ ফিট।

যুম পাহাড়কে দারজিলিংয়ের উপনগর বলা যাইতে পারে। দারজিলিং হইতে যুম প্রায় চারি মাইল দক্ষিণ পূর্বে কোণে অবস্থিত। রেলগাড়ীতে ঊর্ধ্ব ঘণ্টার ও পদযাত্রণে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। দারজিলিং হইতে যুম পাহাড়গতের ভিত্তি দৃশ্য আছে। স্ক্‌ড রেলগাড়ীতে যুম সপ্তে সমান্তর একটা হ্রদ্বাং পথ—দারজিলিং হইতে শিলিগুড়ী পর্যন্ত গিয়াছে, ইহা কাট রোড নামে পরিচিত, এই পথে যোড়েক ও যাত্রায়ত করা যায়। আর একটা পথ জলাপাহাড়, কাটা পাহাড় ডেরি কনিয়া যুমে উঠিয়াছে। এই পথে যাত্রাত্যক্ত করিতে অনেক চড়াই আদিয়া অতিক্রম করিতে হয় তাহাতে শারীরিক কষ্টই অসহনীয়। এতদ্ব্যতীত আর একটা হ্রদ্বর হ্রদ্বাং পথ অকল্যাণ্ড রোড দারজিলিং হইতে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যুম আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই পথে যাইতে একটু শ্রমিক সময় দরকার হয়। সাধারণতঃ কার্ট রোড দিয়া যাত্রাকালেই করিয়া লওয়া হয়।

বুঝে দারজিহত সহর অপেক্ষা অধিক শীত। অতি উষ্ণে দারজিহত বন্য। এছাড়া সর্বদাই কুয়াশা ও মেঘে আচ্ছাদিত থাকে। এখানে হৃদ্যালোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে হৃদয় একপ্রকার যেনের আড়ালেই লুক্কায়িত থাকেন। শীতকালে এ প্রদেশ সর্বদাই গভীর কুয়াশা আচ্ছাদিত থাকে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে কখন কখন ঘোষ উঠিয়া থাকে। এ হাশের প্রান্তিক দিক দৃশ্যে প্রতি দৃষ্টপট করিলে মনে

হে বাস্তবিকই যেন এ নগর দুখযোরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।  
এ যোনের লোকসংখ্যা অতি অল্প, চারিদিকে পল্লতমালা  
কিহই নেই, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন গভীর হুয়ারা দরঙ্গ  
দিক্বিই দুপুণ্যের হয় না। এখানে স্বর্গরাজি যেন নীরব  
পূর্ণবাতায় বিরাজমান, চতুষ্কিমে বতর দুটি ঢেলে কেবল  
গগনভেদী পল্লতশ্রেণী গভীর বনানী বক্ষে ধারণ করিয়া  
দণ্ডায়মান—তন্ময় আবার কাহারও কাহারও শীতের  
সুখ ত্বয়ার হুইট শোভা পাইছেই। বনজুমি নীরব  
নিমন্ত, পক্ষিগণ কলব নাই, পাত্ত চাঁচকর আওয়াজ  
এখানে শান্তিভঙ্গ করবে না। পল্লতশিখরে গাড়াইয়া  
নিবিষ্টমানে কাণ পাছিয়া থাকিলে দূরে স্বরণার জলের  
হয়পুর কলপনি তনিত পাওয়া যায়। প্রকৃতিসঙ্গী  
এখানে বাস্তবিকই তিনি-নিজায় অভিভূত। কবির ভাষায়  
বলিত হইলে এখানে,—

“ঘুম যায় তরুলতা ঘুম যায় ফুল,  
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।”

যুগে বাঙালীর সংখ্যা অতি অল্প। এদেশীয় পাড়াহাড়া অধিবাসীই অধিক। ইউরোপীয়ও যথেষ্ট আছে। ইউরোপের প্রায় সকল দেশের লোকই এখানে আছেন। ইউরোপীয়ানদের অনেকের এখানে ব্যবসা বাণিজ্যও আছে। ইউরোপীয়ানদের বাসোপযোগী দুইটা পুর-হোটেল এখানে অবস্থিত। বনভাগের হাওয়া স্বরূপ-বর্ষের সময়—এখানে বিস্তৃত সাহেবের সমাগম হয়ই থাকে। এখানে চা-বাগানের সখ্যও যথেষ্ট আছে। এডওয়ার্ড কেভেট্টার এও কোং লিমিটেডের একটি ডায়েরী ফার্ম এখানে আছে। নাড়োয়ারী ব্যবসায়ীও এখানে অনেক।

প্রাতিষ্ঠানিক শোভা দর্শনাভিলাষে এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। থাকে। এই অসহ শীতের সময়ও ইউরোপীয়ান পর্যটকগণ দলে দলে এখানে গৌন্দা-ছা পান করিতে আসিয়া থাকেন। শীতের সময় এখানে ছই ফিট্‌ আড়াই ফিট্‌ পরিমাণ জ্বারাধাপাত হয়, সেই জ্বারাধাপাতের নমনানিবারম দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বলা যায় না।

এখানে থাক্জব্যাদি বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

দারজিলিং হইতে খান্দামগ্রী আমদানী করিতে হয়।  
পাহাড়ীদের একমাত্র খাদ্য চা ও রুটীর দোকান এখানে  
বিস্তর আছে।

দারজিলিং বাইবার পথে যুবের নিকটবর্তী বাতালিয়া  
 লুপটি একটি দেবদারু বনিয়া - এখানে রেলপথ বে  
 কেমন সর্পাকৃতি হইয়া গোলাকার ভাবে ঘুরিয়া কিরিয়া  
 উঠিয়াছে হালা দেখিলে বিশ্বাস হইতে হয়।  
 দারজিলিং হইয়া যখন রেলপথটি সমুদ্র ইছানিয়ার  
 শিল্প নৈপুণ্যের অদ্ভুত প্রকাশ। প্রদর্শন করিতেছে। এই  
 বাতালিয়া লুপের উপর যখন রেলগাড়ী চক্কাগরে ঝাঁকা  
 বাঁকা হইয়া উঠিতে থাকে তখন দেখিলে অবাক হইতে  
 হয়। যখনও শব্দের নিকট হইয়া সৌন্দর্য অনেক।  
 নবাব নরসিংদেবের সেতু নামে একটি স্থান আছে।

সেকালের দ্রুত প্রসিদ্ধি। এখানে পূর্নত গায়ে একটী হ্রদ আছে, তেঁগলির সজ্জা অধুনারে ইহায়ে ঠিক হ্রদ বলা চলে ন। চারিধিরে অতুচ্চ পূর্নতগলীর মধাশল টুই হুহং জগাশ অর্থবিত। চারিধিরে পূর্নতগলের স্বরণার জল সূহং প্রবলবেগে নাতিয়া আশিয়া এই তড়াগে সগুহীত হইতেছে। ইহায়ে হ্রদ না বলিয়া বংগ 'রিকার্ভ ট্যাং' বলা যাইতে পারে। হ্রদার নিরলে প্রস্তর বানান। এই হ্রদের পশ্চাৎ পৰ্বেশ ঘাটা দারজিগ, জগাশাহাঙ্ক, ঘুং ও তরিকবন্তজী বানাসুদে সববরাহ হইতেছে। ইহাশনে জল সারকণেরে জুত মিউনিসিপালিটার হুম্বর বন্মোবন্ত রহিয়াছে। বানাদী ঘুং নিক্শন, চারিধির গভীর বনে সমাচ্ছন্ন। স্বরণার জলেরে ভীষণ গর্জননকশন এখানে নিবৃত্তকতা জুত করিতেছে।

ইহার নিচেই 'টাইগার হিল' নামে একটা খুব উচ্চ পর্বত আছে। এখান হইতে সূর্যোদয়ের দৃশ্য অতি মনোরম। বসন্ত ও শরৎকালে সূর্য্যোদয় মনন করিতে এখান অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। 'টাইগার হিল' উচ্চতা প্রায় ৮০১২ ফিট। অতএব এখানের শীতের পরিমাণ সর্বত্রই অল্পমাত্র। এত উচ্চ বসিয়াই এইস্থান হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতে বড়ই মনোরম। এখান হইতে গৌরীশঙ্কর বা 'মাউন্ট এভারেস্ট' দৃশ্য দৃষ্টোপযোগী হইয়া থাকে।



যুম হইতে একটা হুণীয়া বাতা হুকিয়া শোধবী নামক স্থান পর্যন্ত গিয়াছে। হুকিয়া শোধবীর পরই বাবীন বাতা নোলা। এইখানে রীতীশ পৰ্ণমন্ডের ও নেপালাবিপতির সীমানা প্রতিষ্ঠিত আছে। হুকিয়া রোডের একপাশে যুম হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল দূরে 'যুম রক' অবস্থিত। এখানে একটা পূর্বত পার্শ্ব একটা অত্যুচ্চ লিলাকার প্রস্তর শিলা সোজাভাবে বর্তমান, ইহা 'যুম রক' বলিয়া পরিচিত। এখানে চারিদিকে গভীর বন—তাহার ভিতর দিয়া 'যুম রকের' শীর্ষদেশে আরোহণ করিবার পথ। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে 'যুম রকের' উপর ঠাকুইয়া বহুদূর পর্যন্ত নগরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানটি অত্যন্ত নিম্ন। এই যুম রক সম্বন্ধে একটা হৃদয়ের গল্প শুনা যায়, অনেক এই গল্পটি শুনা মনে করিয়াছেন, গল্পটি আমরা আর এখানে পুনরুল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এখানে নাকি কত বৎসর পূর্বে, জানা যায় না এক পার্শ্বতা দম্পতী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আভাবিক গভীর প্রণয় ছিল যে একজনের বিরহে অপরজন এই অত্যুচ্চ রক হইতে লাকাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর পরেই অপর ব্যক্তি আদিয়া এই ঘটনা জানিতে পারিয়া সেও প্রণয়ীর পথ অনুসরণ পূর্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

যুমে নাকি এবটী 'যুম বুড়ী' বা 'যুম ভাইনী' বাস করিত এই প্রকারও জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।  
এস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে নেপালী ও ভূটিয়াই অধিক, অন্ত্যাহাড়া জাতিও আছে। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অগ্রিও ইহারা বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তির অর্জনা করিয়া সেই অপরাজীত কালের পবিত্র ভূতরক্ষা করিতেছে। এখানে একটা পর্বতশিখরে একটা বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি কাঠ নির্মিত অতি সুন্দর কারুকার্যে গঠিত ও বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। ইহা দেখিয়া এদেশীয়দের শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অন্ত্যাহার বুদ্ধদেবের একটা প্রাণ্ড অতিমূর্তি বিরাজিত, তাহার চতুর্দিকে অসংখ্য দেব দেবীর প্রতিমূর্তি সকল

সুন্দরভাবে সজ্জিত। বুদ্ধদেবের মূর্তিটি এত কমনীয় ও সুন্দর যে মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় ইদম ভক্তিবশে আশ্রুত হইয়া যায়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনঃপঞ্চায়ে সাধিত হইয়াছে। এবার বড়লতা বাহাদুর দারজিলিঙে আগমন করিয়া এই মঠটি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এই মন্দিরের রক্ষনাবেক্ষণের ভার স্থানীয় লোকের উপরই হস্ত রাখিয়াছে। দর্শকগণ বিনা দর্শনোক্ত ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পারেন। হিন্দু দেবমন্দিরে বা তীর্থে প্রবেশের মত এখানে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র বেগু পাইতে হয় না, মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের পবিত্র প্রশস্ত মূর্তি বিরাজিত, ইহার আশে পাশে পার্শ্বত্বদের উপাস্ত বেব দেবীর অনেক প্রতিমূর্তি শোভা পাইতেছে। বুদ্ধদেবের মূর্তির সম্মুখভাগে দুইদিক দুইটি প্রকাণ্ড দীপাধারে প্রায় পাঁচ সেতু যুক্তের প্রদীপ দিবানিদি জলিতেছে। আর অপরপূর প্রত্যেক মূর্তির সম্মুখে অসংখ্য ছোট ছোট পিত্তলের দীপদানী যুক্তে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে, রাজিতে বধন মন্দিরভাঙের সমুদয় দীপগুলি জলিতে থাকে তখন দেখিতে অতি মনোহর। প্রত্যেক মূর্তির সম্মুখেই পিত্তলের বড় বড় বাটী পরিষ্কার জলপূর্ণ রাখিয়াছে। আমাদের পূজোপকরণের মত ইহাদেরও সমুদয় পূজার অবসাদি অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত রাখিয়াছে, এক সময়ে সমগ্র ভগত ব্যাপিয়াই বৌদ্ধধর্মের জগৎপাতা উজ্জীর্ণ হইয়াছিল। তিস্তেতে এই ধর্ম বিশেষভাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আজিও তিস্তেতাদের ভিতর খাটি বৌদ্ধ হেথিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে তিস্তেতের ধর্মগুরু দলাই লামার একটা প্রতিমূর্তিও আছে। মন্দিরের সেবকগণ ভিক্ষুর মতই জীবনধারণ করেন, ইহারা সর্বদাই ইহাদের ধর্মচক্র হতে লইয়া অবিরত ঘুরাইয়া 'মনি-পদ্মাহম্' মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, এই মন্দিরের স্বায়ংগণ্য করেনকী পার্শ্বতা-ভক্তকে নাটিতে পড়িয়া নাট্যে প্রণয়ন করিতে দেখিয়াছি। এস্থান দর্শন করিলে নাটিকেরও মনে বোধ হয় দেবভক্তির উদ্বেগ না হইয়া যায় না।

এই বৌদ্ধ মন্দিরটি এদেশীয়দের ভাষায় 'যুম গুম্ফা'

নামে পরিচিত। মন্দিরের ভিতর দুইদিকে দুইটা বৃহৎ আলমারীর ভিতর অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। পুঁথিগুলি হতলিপিত, আকারে খুব লম্বা। প্রায় সবই পালী ও তিস্ততী ভাষায় লিপিত। প্রত্যেক থানা পুঁথি লাল রঙিন বস্ত্রদ্বারা আবৃত ও প্রত্যেক থানা পুঁথির স্তম্ভ আলমারীতে পৃথক পৃথক কোঠা রাখিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সকল অমূল্য প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। এই সকল পুঁথি স্থানান্তরিত করিবার নিয়ম নাই। মন্দিরে বসিয়া দর্শন করার অধমতি পাওয়া যায়। আমাদের ভূর্তাগ্য আমরা পার্শ্বতা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া এই সকল অমূল্য দ্রব্যাদি রত্ন হাতে পাইয়াও ইহার মর্শোদঘাটন করিতে সমর্থ হই নাই।

যুমে একটা "কিনল্যাও মিশন" নামে সাহেবদের মিশন আছে। একটা মিডল ইংলিশস্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে একটা পুলিশ থানা একটা বড় শাখা পাঠ অফিস আছে। মাজেয়ারী ও অন্ত্যাহার ব্যবসায়ীদের ইহা একটা প্রধান আড্ডা।

এই স্থানের স্বাস্থ্য দারজিলিং হইতে কোন অংশেই নিকট নহে। স্বাস্থ্যরাজ্যের আশ্রয় বহু ইউরোপীয়ান পর্যটক এখানে আগমন করিয়া থাকেন। স্থানীয় স্বভাব সৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্য দারুন শীতের সময়ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে অসংখ্য পর্যটক এখানে আসিয়া থাকেন।

যুম যুমস্তাঙ্গা হইলেও এখানে দেখিবার ভ্রমিষ অনেক আছে।

## প্রিয়ার গান

শ্রীমতেন্দ্রকুমার দাস

তোমার চলার পথে তাকিয়ে থাকি

আলু হুটি আঁধি দিয়া,

গুণে আমার চিরন্তনী—

গুণে আমার অচিন্ত প্রিয়া!

নিত্য সকাল সন্ধ্যা,

তোমার চল, স্বপ্নে ঘোর বাজে,

নাম-হাফা কোন গোপন স্থরে

ভরে ওঠে দিয়া।

বৃকের মাঝে নাচন জাগে

একটি আঁখির দানে,

চুমি যখন ছল করে চাঁও

আমার মুখের পানে!

তোমার চপল চোখের তারা

স্বপ্ন-তলে জাগায় শাড়া,

যা যে বুকে কোন কথাটির

স্পষ্ট ছাপ দিয়া!

দুস ছুটিতে ঘোহল পোলন

দখিন হাওয়ার তালে,

জয় এসে চুমেছে যেন

পদ্মগীরি গালে!

বক্ষে তোমার ছন্দ-ছাপে,

অলকে ফুল গন্ধ লাগে;

তুলালে যে সব তুলালে—

গুণে আমার প্রিয়া!

বক্ষ শোণিত চপল হ'ল

তোমার রূপের দোলায়,

স্বপ্নে ঘোর গান জেগেছে

তোমার চলার বেলায়

তোমার পায়ের আলতা পরি

পথটি হ'ল দখল, মরি!

কবে সে ঘোর বক্ষ ভরি'

কব্বে শীতল দিয়া।



## কম্পনার রাজ্যে

(ড. লেখক লুই কুপারস্ হইতে)

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি-এল

চৈতন্যদেবের এক সন্ধ্যায় তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ।  
নাইলু নগরীতে নদীরপাশে একখানি বেঞ্চে বসিয়া সন্ধ্যা-  
সোভা দেখিতেছি, এমন সময়ে লোকটি আসিয়া চুপি চুপি  
আমার পাশে বসিল। ওপরে কাবুখানার ম্যানেজারের  
হৃদয় বৃত্তিখানি বিজ্ঞানীর আলোকমালা কর্তে ধারণ করিয়া  
মান সন্ধ্যালোকে হাসিতেছে। ছোটর উপরের উজ্জল  
আলোটা নদীর মাঝখান পর্যন্ত আলোকিত করিয়া  
জলিতেছে। নদীজলে তাহার তীর প্রতিচ্ছায়া তরল-  
ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া শত চাঁদের সৃষ্টি করিতেছে।  
লোকটি আসিয়া বসিতেই আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল,  
তাহার দিকে তাকাইলাম, দেখিবা ভাবেরে বসিয়া  
বোধ হইল; তালি দেওয়া কোট; পায়জামা ছোট ছোট  
কাছে ছেঁড়া; এক পায়ের বুটের আগার দিকটার পাশ  
দিয়া মোজাত্তর বুড়া আঙ্গুলটা বাহির হইয়াছে।  
লোকটিকে দেখিয়া মনটা যে বড় খুসী হইল ইহা বলিতে  
পারি না। মনে হইতেছিল, বেকি ছাড়িয়া অস্ত্র জায়াগয়া  
হাই, এমন সময় লোকটা নিজেই কথাবার্তা আরম্ভ  
করিল—

“আপনি কে তা জানি মশাই; আপনি একজন  
কবি—মত কবি—অর্থাৎ বুঝ উদ্ভূতের কবি—”

লোকটির মুখের দিকে তাকাইলাম; তাহার সেই  
দমকীম মুখের হাসিটুকু আমার ভাল লাগিল।  
আমি ত্যাগ করিয়া মনে উঠা হইল কঠিন।

আমি উত্তর করিলাম,—“হ্যাঁ, আমি একজন গ্রন্থকার;  
ঔপন্যাসিক; আপনি কি আমার জানেন?”

—“হ্যাঁ, জানি বই কি; আপনি একজন কবি; মত  
অর্থাৎ উদ্ভূতের কবি।” বুকের ডানহাতটি আকস্মিক  
রিকের উচ্চ হইল। যেন কবির খ্যাতির উচ্ছ্বাস  
বেশাইবার অস্ত্র এই ভাবের অভিযুক্তি। তাহার পর  
একটু নির অথচ মোলায়েম স্বরে সে কহিল,—“আমিও  
একজন কবি।” এই বলিয়া বুক যেন কবিত্বাতার প্রতি

কবির সহানুভূতির প্রত্যাশার সোহৃদকনেজে আমার  
দিকে চাহিল।

বুলিলাম বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। এইবার হুদীর্ণ  
কল্প-কাহিনী আরম্ভ হইবে। সারিত্রা-পীড়িত জীবন,  
কবি-প্রতিভার প্রতি জন-নাশায়ণের আশার ও উপেক্ষা  
এই সকল মামুলী কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিয়া  
আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করিবে। মনের অস্থিতি  
গোপন করিয়া প্রকাশ্যে কহিলাম—“সত্য—আপনি কবিতা  
লেখেন না কি?”

বুঝ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—“না—না,  
মশাই। আমি কখন লিখি না; কখনকালে ছই ছড়ও  
কবিতা লিখি নাই। তবু আমি একজন কবি। আমি  
নিজে বৃত্তিতে পারিতেছি আমি কবি; আমি কল্পনা-  
লোকের কবিতা-রাজ্যের অধিবাসী।”

সবিস্ময়ে আমার তাহার দিকে তাকাইলাম।  
লোকটির মাঝার কোন গোহালায় আছে নাকি?

বুঝ আবার বলিল,—“আজ্ঞে আমি—নিরব কবি;  
কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী।” এই বলিয়া সে অর্ধপূর্ণ  
দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল,—যেন ব্যাপারটি  
সব আমি বৃত্তিতে পারিয়াছি কিনা, জানিয়া লইবার  
জ্ঞ।

আমি এ ইহাযলীর অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া  
নিরীক্বে মত শুধু চাহিয়া রহিলাম। মনে মনে  
আপশোষ হইতে লাগিল, কেন আমি আসন ছাড়িয়া  
লোকটার সদ ত্যাগ করি নাই। প্রকাশ্যে কিছু না  
বলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া  
রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল,—“কল্পনা-রাজ্যে বাস করা বড়ই  
হৃদয়ের। বাস্তবিক আমি বড়ই হুদীর্ণ।”

লোকটা একটা অর্ধদণ্ড সিঁদুর পকেট হইতে বাহির  
করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পরম আরায়ে

টানিতে আরম্ভ করিল। আমি নীরব। কি বলিব,  
পাছে লোকটার মনে আঘাত লাগে এই ভাবিয়া শুধু  
চাহিয়া রহিলাম।

“হ্যাঁ জগতে আমিই হুদী! কি বলেন, মশাই।”

আমি তথাপি নীরব।

মন মন ফুৎফুৎ গিয়ায় হইতে নির্গত ধূম-রাশি  
বুকের মতক, পাশে, সমুখে কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল।

নিজ মত সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ পরম বিজ্ঞের  
মত বলিয়া মাইতে লাগিল—“জগতে হুদী কেউ  
নহ। কিন্তু আমি—আমি হুদী। কথাটা বৃকতে  
আপনার বিশদ হচ্ছে দেখছি। তা'র কারণ আর কিছুই  
নহ—আপনি সহজ দৃষ্টিতে—আপনি এবং আর পাঁচজন  
আমায় যে দৃষ্টিতে দেখেন, সেই দৃষ্টিতে দেখছেন বলে।  
কিন্তু আমি আমাকে যে দৃষ্টিতে দেখছি, সেই দৃষ্টিতে  
আপনি আমার দেখুন লেখি—সব পরিষ্কার বৃকতে  
পারেন। আমি যিনি চিত্রকর, হৃদয়, তা'হলে আমার  
স্বরূপ আপনাকে নিখুঁত ভাবে একে দেখাতুম। এই  
ধকন না কেন,—যদিও আমি মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছি  
না—তবু আমি গরীব নই। অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে টাকা  
নিখে ছিলাম-মিনি না খেললেও আমার আর্থিক অবস্থা  
বেশ ভাল। আপনার যেমন গোলাক, আমারও সেইরূপ;  
—এই দেখুন না হাতে কেমন একখানি পান্না-বসানো  
আংটি—একটা বন্ধুর প্রদত্ত স্মৃতি-চিহ্ন।”

কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী কবিমহাশয় তাহার অতী  
শূচ অতীত আমার নাসিকার উপর ঘুরাইলেন—যেন  
তাঁহার কল্পিত পান্না-বসানো আংটিটি চক্ষুলালকে স্মলম  
করিয়া উঠে, এই ইচ্ছা।

—“আমি হুদীর ভিতরে থাকি—দেখলে আপনাই  
লোভ হবে। আর সেখানে আমি একা বাস করি  
না—”

বুঝ এক হুহুহুয়াত চুপ করিয়া পুনরায় আরম্ভ  
করিল—

“সেখানে আমার জীবনগণি—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা  
রূপী।”

যদিও মনে মনে সন্দেহ ছিল, প্রত্যুত্তর করিয়া তাহার

মনে আঘাত দিব না, তথাপি একটু স্নেহমিশ্রিত স্বরে  
বলিলাম—“সেই ভিলা, আর সেই হুদী কি তোমার  
হাতের ঐ পান্না-বসানো আংটিটির মত হুদীর?”

লোকটা চটিল না; ঈষৎ ঘাড় কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল  
—“কি? হুদীর নয়? আমার কল্পনা-রাজ্যে প্রকৃত  
নয়? আমি আগেই বলেছি, মশাই। আমি কবি—  
ভাবরাজ্যের অধিবাসী। অগ্রহণ করে বৃকবার চেষ্টা  
করুন। আমি কোন কিছু কল্পনা করি না। আমি  
আমার কল্পনার মধ্যে বাস করি। এই কল্পনাগ্রন্থত  
জীবন ছাড়া—আমার কাছে আর কিছুই অস্তিত্ব নাই।  
আমার জিনার অস্তিত্ব আছে—আমি নিখুঁতভাবে তার  
বর্ণনা দিতে পারি। আমার বসবার ঘর নানা দেশের  
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষে ভরা। আমি যে কালকের  
রাতিটা একটা হোটেলের গাড়ীবারাণ্ডার একটা বড়  
হুল্লুধীতে ঝাঁটিয়েছি; পরন্তু যে একটা রাত্তার সঁকার  
নীচে রাজিবাশ করিয়েছি, তা'তে কি এসে যায়। আম  
এটা—কাল সেটা। রেজি, রেজি পরিবর্তন। কিন্তু  
আমার কল্পনার কাননাবাস—তার কখন পরিবর্তন নাই।  
এখন বলুন তে, মশাই, কোনটা বাস্তব?—আমার কাছে  
ঐ কল্পিত কাননাবাসই সত্য আর অজস্রমত রাত-কাটাবার  
জায়াগ মিথ্যা? ভিলার কথাটা বিবাস হচ্ছেন না?  
দেখতে পাচ্ছেন না, সেই অজ? নাই বিবাস কল্পন?  
আমার দৃষ্টিতে—এই দেখুন,—হাতের পান্না-বসানো  
আংটিটি জোয়াংখা জলুছে। আর সেই কানন-ভবন,—  
তা'—পীতে স্বপ্নোচ্চ, গ্রীয়ে—হুদী-শত। আর আমার  
পত্নী—?”

লোকটি আমার কাছে গিয়া আসিল—পিছাইয়া  
হাইতে আমার ভরসা হইল না।

—“জিনি কুশাণী এবং হুদীর, তত্ত্ব-বসনে হুদীর  
দেহলতা বিবর্তিত—তবকে তবকে কুদমজ্ঞের মত—  
সোলাগি কেশগুচ্ছ তাঁর অংশে, গতে, উরসে বিলম্বিত।  
তাঁর চোখকুটি যেন নীল-নাগরের নীলিমার অঙ্গন  
বিলেপিত, আমার সাগ্রহ চুহনে মালগা। তাঁর  
নিবিড় আলিঙ্গনে আমি স্বর্ণ-স্বপ্নের অহুহুতি লাভ  
করি; তাঁর প্রেমে আমাকে স্বপ্নের সমুদ্র-অর্ধে রাজ্যাকি-

বুঝ এক হুহুহুয়াত চুপ করিয়া পুনরায় আরম্ভ  
করিল—

“সেখানে আমার জীবনগণি—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা  
রূপী।”

যদিও মনে মনে সন্দেহ ছিল, প্রত্যুত্তর করিয়া তাহার

বুঝ এক হুহুহুয়াত চুপ করিয়া পুনরায় আরম্ভ  
করিল—



মিষ্ণু করে। মাছের ভাঙে অত স্বচ্ছ কদাচিৎ ঘটে না।  
কিন্তু—কিন্তু একটা বড় ভীষণ ব্যাপার—

এই পর্দাশ্রম বলিয়া লোকটা খামিল।

আমার কৌতূহলপূর্ণ ভাব জাগরিত হইল। সাগ্রহে বলিলাম—“কি ভীষণ ব্যাপার?”

—“তার বিস্ময়াবতত্ব।—অবিস্বাসিনী নারী আমার পদে পদে প্রত্যাবর্তিত করে!”

বিষয়ে কলিলাম—“প্রত্যাবর্তিত করে? আপনাকে! কিন্তু, মশাই, তার প্রতিবিধান তো আপনারই হাতে! আমি বলি, আপনি আপনার কল্পনা-শক্তির বলে, সে প্রতিবাহার কাঁধে আমলেই স্থানবেন না।”

লোকটা আমার প্রতি হস্তশাস্ত্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল,—“আহ—হা, কল্পনা-রাজ্যে বাস করা ব্যাপারটা যে, কি, তা’ বুঝলেন না মশাই। আপনি কি মনে করেন, বা’ বুঝী তাই কল্পনা কর্তৃপক্ষ পায়। তুল বুঝলেন মশাই। আমাদের মানস স্রষ্ট্রিমাত্রই যে অদৃষ্টের অধীন। অদৃষ্টে আমার আছে যে, আমার কল্পনা রাজ্যের প্রেরণী অবিস্বাসিনী হবে; ঘটেছেও তাই। কি মনোবৃত্তি যে আছে, তা কি জানেন? হাতে হাতে ধরে ফেলি,—অস্বীকার করে, এমন একটা গর বানিয়ে বৈকিৎক দেবে যে, সত্য ন’লেন মনে হয়, প্রেরণী আমার যাদু জানে,—মোহিনী হাসির সঙ্গে তার হুল্ললিত বাহু দৃষ্টি বধন আমার কণ্ঠগত হয়,—তখন আমার রাগ জল হয়ে যায়, বধন অতিস্থ বধন বা অতিদ্রুত এই দুই-এর মাঝখানে পড়ে আমি ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছি। আমি জানি সে আমার প্রতারণার কব্জি। আমি জানি তার অন্তরটা অতি জঘন্য। কিন্তু বধনই আমাদের নির্জন শয়ন-ঘরে দু’জনে একত্র হই, আর তার কোমল বাহুগলির স্পর্শ-স্বপ্ন বধন আমার দেহের চারিদিকে অশ্রুভব করি—তখনই আমি যেন কেমন হ’য়ে যাই। সব রাগ, সব বিবেচন ভুলে যাই—তিরস্কারের কথা বুঁজে পাই না। সে আমাকে যেন যাদু করেছে। বধন আমার স্বর্গে তুলে ধরে—কখন বা গভীর নরকে ফেলে দেয়। আপনারা বাস্তবজগতের জীব, রক্ত-মাংসে গড়া দেহধারী জী-পুং নিয়ে থর করেন,—আপনারা স্থলের কারবারী—

ভাষ্যজগতের স্বপ্ন-স্থানের এককথাও আপনারা অশ্রুভব কর্তে পারেন না।”

বুদ্ধের কোটরপ্রবীষ্ট চক্ষুখর দ্বিধা অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। বুদ্ধ ভাবাবেশে তাহার উচ্চ হস্তের অশ্লিষ্ঠলি মোচড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার মস্তিষ্কে যেন একটা মতলব আসিল এই ভাব দেখাইয়া বুদ্ধ বলিতে লাগিল—“এক প্রতীকার আছে! আমিও কেন তার প্রতি অবিস্বাসী হই না? অনেক সহ করেছে, আর না। আমিও আশ রাত্রে সহরের নামজাদা হুমকী জ্বালোকের বাকী দিয়ে হুবা আর ক্ষুধার প্রোত বহা’ব—বিশ্ব—”

এই বলিয়া বুদ্ধ তাহার ছেঁড়া কোটীর পকেটে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—“ওঃ! বড় ভুল হ’য়েছে! আজ রাত্রে দেখছি যে ক্ষুধার যোগাড় করা হ’ল না। জামা বদলাবার সময় ব্যাকের চেকবহিটা নিতে ভুলে গেছি। হু’জাজার ফ্রাঙ্কের কয়ে তো খরচ ক্লাপে না।”

আমিও একটা কথার-কথা বলিলাম—“এদিক হু’জাজারে হয়, তবে আমি আপনাকে সাহায্য কর্তে পারি। আপনার বৈজ্ঞানিক মানসিক অবস্থা, তাতে একটু আত্মদেহ আক্লাবের মাঝে ভুলে থাকা দরকার। তা’ আমি আপনাকে পাঁচজাজার ফ্রাঙ্ক দিচ্ছি, অগ্রগ্রহ করে দ্যায় স্বত্ব গ্রহণ করুন। বধন আপনার সময় হ’বে শোধ করুন।” এই বলিয়া পকেট হইতে পাঁচ ফ্রাঙ্ক বাহির করিয়া তাহাকে দিয়ার জন্ত হাত তুলিলাম।

লোকটি একটু ইতঃপ্তত করিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং আভ্রস্থরে কহিল,—“খুববার মহাশয়! আপনি দেখছি আর পাঁচজনের মত নিরোধে এবং কল্পনাশক্তিনী মহেন। আপনিও চেষ্টা করুন আমার মত কল্পনা-রাজ্যে বাস কর্তে পারেন। সত্য বুদ্ধি, মশাই, এই একঘেয়ে পৃথিবীতে একঘেয়ে নীরস লোকগুলাকে নিয়ে এই নিরানন্দ বাতর-জীবন যাপন করার চেয়ে কল্পনা-রাজ্যে বন্দনায় জীবনযাত্রা শতগুণে ভাল। আপনি আমাকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিলেন না—এ পাঁচজাজার ফ্রাঙ্ক ধার দেওয়া হ’ল! এই সাধু ব্যাধিটি করে আপনি স্বর্গের পথে এই প্রথম পা বাড়াবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে গভীর নরকের

গরুরও এক ধাপ নামলেন। কল্পনা আপনার চোখের সামনে নরকের খার থুলে ধরুক বা স্বর্গেরই পথ দেখুক—দুঃখ করুন না। এই যে এতগুলো লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—এদের বাঁচা, না বাঁচারই সারিল—.....”

একটু যুগ্মার হাসি হাসিয়া লোকটি উঠিল.....“আমরাই

শুধু মাছের মত বেঁচে আছি—আমরা অর্থাৎ কবিতা—এই বলিয়া জীর্ণ টুপিট মাথায় তুলিয়া দিয়া পরিত্যক্ত পদক্ষেপে লোকটা চলিয়া গেল। আমি শুধু বিস্মিতভাবে তার দিকে যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ চাইয়া রহিলাম।

## ‘বিকাশ’

শ্রীমুরারিমোহন দাস

চাঁপার কলি ভাবছে বসে

সারা সকাল বেলা,—

“আলোর সাথে আমার সে যে

কত কালের খেলা!

যেদিন আমার কুসুম জনম

আমায় বেলে ডালে

প্রাণের কথা কইল কত

তরুণ অরুণ আলো!

আজ কেন সে ছুঁছে বধন

চাইল আমার মুখে

সকল হিয়া উঠল কেঁপে

কেমন সরম হয়ে!”

“মর নেকি তুই”—বলে শিশুল

রক্ত-রাঙা লোকে,—

“যেবনের রঙিন বেশা

জাগছে যে তোর মাঝে।”

## সার্থকতা

শ্রীইন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কান পেতে রই আকাশ পথে—

—দুপুর জনমিতে

—হঠাৎ আমার লগল কাঁপন

বুকের শোণিতে!

সরল মধুর আঁধার আলো

বলিল হাসি “বাগিগো ভালো”

ধরণী বাতাস সরম হ’ল

পরশ মণিতে;

আঁধার রাত কাটিয়া গেল

বুকের খনিতে।

জীৱিত ধূনী আলায়ে জাগি,

জীবন সারা যাহার লারি

সেই তারকার নিবিড় পরশ

শ্রবণ খানিতে;

শিরায় শিরায় শোণিত নাচে

পাই গো জনিতে।







## কংগ্রেসের চিঠি

ত্রিসরনীবালা বহু

মেহের হেমাধিনি!

কংগ্রেসে এসেই এখানে কেমন দেখছি, কেমন আছি! সব সংসার জানাবার জ্ঞত বার বার করে বলে দিয়েছিলে, কিন্তু এমন ভীতের মধ্যে পড়ে গেছি যে লিখবার জ্ঞত দশমিনিট সময়ও পাই না। রাজি দশটা পর্যন্ত মিটিং চলছে, বন্ধুসংসারের অশ্ব নাই, কোনটা দেখি, কোনটা শুনি, এখন রাত দশটার সময় কাগজ কলম নিয়ে বসেছি, কেননা বেশ জানি, খবরের কাগজ পাঁচখানা পড়লেও আমার এখানে এসে কেমন লাগছে, কেমন দেখছি এবং জানবার জ্ঞত তোমাদের কৌতুহল খুব বেশী এই শীতে আজ দোয়াত কলম নিয়ে বললাম, জানিনা আজ শেষ কর্তে পারবো কি না, তবে তোমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি হয়ে এসেছিলাম সেটা হতে অব্যাহতি পাব।

কাল বেলা দুটার সময় Camp ৫ এসে পৌঁছেছি, রাতার বিবরণ উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই, নানাকারণে আসা যে হইবেই না এটাই ঠিক হয়েছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে এই শীতে বর-করা ফেলে ছোট ছোট শিশু নিয়ে কিসের জন্মে যে কংগ্রেস দেখতে যাচ্ছে এর অর্থ পুঙ্খ নারী অনেকেই বুঝতে পারেন নাই, অনর্থক টাকার শাঁকটাকেও অনেক বাড়াবাড়ি করেই উল্লেখ করেছিলেন এবং কংগ্রেসকে বরি প্রছাদি করা হয় তাহলে সেটাকে দূর থেকেই নমস্কার করে বসে বসে শ্রমশী জিনিষ ব্যবহার করাকেই প্রেম বলে উদ্দেশ্য দিয়েছিলেন, আরও অনেক বাধা উপস্থিত হ'য়েছিল, হস্তাং এই সব প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার অভিপ্রায় বলে না মেনেও মন খনন আমার ঐ মহাত্মার ছুটে যেতে চেয়েছিল তখন সেটাকে বিবেকের বাণী বলেই আমার মনে হ'য়েছিল, তারপর যাত্রাপথে যদিও বার হতে পেরেছি, আর শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ এসে পৌঁছেওছি

এখনও কিছু মন স্থির হচ্ছে না, মাথো মাথো আশঙ্কা হচ্ছে যে নির্বিবাদে এখন তীব্রতা শোষ করে বাড়ী পৌঁছেতে পারলে হয়—অনেক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছি, কারও অভিসম্পাত না লাগে।

কংগ্রেসকে আমি মহাত্মী বলেছিলাম বলে কেউ কেউ মূর্খটপে হেসেছিলেন—যদিও সে হাসির সর্থ নাই—যে স্থানে সমবেত হাজার হাজার লোকের শ্রদ্ধাপূর্ণ মন জাতীয় কলঙ্কের মূর্তিসাধনার কামনার নিম্নুক্ত, গত চল্লিশ বৎসর হইতে বাস যথো বর্গীয় মহামনা শ্রমশ্রেণীকর্মীদের ঐকান্তিক সাধনার বীজ উৎপন্ন হয়ে চলেছে, মহাত্মা তিলক, মহাত্মা তিলকের মনস্কি মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র সাধনা যার শিষ্য শিষ্য অসংখ্য, সেই জাতীয়-সমিতি যদি ভারতের মহাত্মী না হয় তবে কো ভাংতে আর তাঁরই নাই—এ তাঁরই অশুভ্রতার তল নাই, জাতিভেদের ব্যবধান নাই, ধর্ম ধর্ম সংঘাত নাই, মহামিলনের অন্তরায় নাই। শ্রদ্ধাভাজন লাল লালপং রায় তিলক নগরের সমুখে যেখানে খেজা-সেবকদের জন্ম তাঁর পড়ে আছে তার সমুখে চরকা-অমিত স্বাধীন-পতাকা উড্ডীন করেছেন, রায়ে সেই পতাকা যখন বিদ্রোহালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন কাপপূরের সমস্ত স্থান হতেই তা দেখা যায়—অতিপ্রভায়ে বিউপুল বেজে উঠে যামাঝ সমস্ত খেজা-সেবক থাকী বন্ধরের স্বাউট ড্রেস পরে মাথার গান্ধী টুপি লাগিয়ে দলে দলে সেই পতাকার নীচে সমবেত হয়, ওরিকে গেরু-বসনা নারী খেজা-সেবিকাগণও একপাশে জোড়াহাতে এসে দাঁড়ায়, তখন বন্দনা-সঙ্গীত স্বর করে—প্রভাতের সে গানটি সমবরে গীত হ'বার পর ব্যাঙের রাজনা হ'তে থাকে, দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই মনোরম। খেজাসেবকদের মধ্যে বাল-বৃদ্ধ, যুবা এবং সকল জাতই জড়ি হয়েছে, দীনত দীন, আর ধনী সকলেই সানন্দে এ

বিভীত বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা]

কংগ্রেসের চিঠি

৮৮৩

ব্রত গ্রহণ করে সমস্ত আইন কাহন মেনে নিম্নমুহুরিত্তার পরিচয় দিচ্ছেন, প্রাচীন বাঙ্গালীদের ব্যোজান ছেলেও এর মধ্যে আছে, লক্ষী ভাভাতীর পর একটা বেজায় রকম ধরপাকড় চলেছে বলে অনেক বাঙ্গালী বাপ-মা সাহস করে তাহাদের ছেলেদের ভর্তি হতে নেননি, যদিও সেটা গৌরবের কথা নয়, তবে এই ব্যোজান বাঙ্গালীর ছেলের কৃতিত্ব এই এক হাজার হিন্দুস্থানী, গুজরাতি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি খেজা-সেবকদের হাপিয়ে উঠেছে, বাঙ্গালী ছেলেরা বিনয়-নয়, মিষ্টভাষী, আর সত্যত কর্তব্যপরায়ণ—অদূর প্রবাসে এদের এই ব্যবহার দেখে খুশী হ'লাম। তা'ছাড়া Camp ৫এ আরও দুই তিনটি বাঙ্গালী ছেলের যে অমায়িক ব্যবহার পাছিত তা উল্লেখযোগ্য—এরা কমিটি হইতে নিরুক্ত হইনি, হস্তাং ডানটিগারের পোশাক নেই, ব্যাজ নেই, খেজাং এরা বাঙ্গালী ডেলিগেটদের দেবার জন্ম বৈশল কাপ্পে দেখা তনা করছে, সন্মানের মত এরা দেবা-তৎপর।

আজ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হ'লো, কাগজে এসব পড়ে গেছে—স্বয়ং মণ্ডপটিতে পাঠসম্ভার আড়ার নেই—তদুপে দেখা গেছে কয়েকটি মূল্যবান বাণী টাঙ্গান হয়েছে—সেগুলি এই—করা নহে—কাজ—সাধু হও—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—একতাই বল ইত্যাদি—

দেলবধ, তিলক, মহাত্মা প্রভৃতির ফটো টাঙ্গান রয়েছে—এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় শুধু এই যে, হাজার হাজার নরনারীর সমাগণেও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নাই, গোলাম নাই।

দর্শক মহিলা অনেক ছিলেন, বাঙ্গালী মহিলা ডেলিগেটের সংখ্যা বেশী নয়, আরও হওয়া উচিত ছিল, বাঙ্গালীকে শিক্ষিতা মহিলা অনেক আছে, কংগ্রেসে যোগদান কি কারও বাঙ্গালী নয়? শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, মোহিনী দেবীর অস্থগণ কি কেউ করবেন না?

আজ আমরা বাঙ্গালার নারী-গৌরব ও আনন্দ অমুভব করি—কেননা আজ এই প্রথম বাঙ্গালার নারী স্বাধীন-পতাকা হাতে নিয়ে এত বড় বিরাট সাধনার পথের নেত্রী হয়ে চলেছেন।

সমস্ত বাঙ্গালার মেয়ে আজ আমরা তাঁকে অন্তরের সহিত অধিনন্দন করি।

সভানেত্রীর অভিজ্ঞানের কয়েকটি কথা তোমায় আমি এখানে তুলে দিচ্ছি এগুলি মনের মধ্যে গঁথে নাও—

“আমায় আপনারা আজ অধিনায়িকার পথ দিয়ে যে নৃতন একটা প্রথা প্রবর্তিত করেছেন তা নয়, ভারতের নারীদের প্রতি যে সন্মান এবং জাতির সামগ্রিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনার নারীর যে বিশিষ্টত অধিকার আছে সেই নিয়মটাই পালন করেছেন, আমাদের দেশের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে নারীর যে স্থান ছিল আপনারা আজ তাকে সেই স্থানেই পুনঃস্থাপিত করেছেন, এই দেশে নারী একদিন গার্লপত ও আইনমৌল দখিনারি এই তিন অধির প্রতীক এবং অধিষ্ঠাত্রী ছিল, যুগযুগান্ত ধরে এই মহিড়ী নারীদের জ্ঞান, ভক্তি এবং ত্যাগের যে স্বম্পন্ন পরিচয় কীর্ষি কথায় আমাদের ইতিহাস ও গল্প গাথা পরিপূর্ণ আমার মধ্যে তাহা প্রকাশ কর্তে আমি অযোগ্য, একথা আমি জানি তবু আমার বিশ্বাস যে—যে সময় বিশ্বাস, মহারথো নিরীক্ষাচিত্তা রাগপাত ও আইনমৌল দখিনারি আলো দেখিয়েছিল এবং অবিচলিতা সাবিত্রীকে মৃত্যুর শার পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গিয়েছিল, আপনারা আজ আমার উপর যে গুরু-কর্তব্য-ভার অর্পণ করেছেন তাহা সঙ্গার করবার জন্ম সেই অলন্ত বিশ্বাস আমার কিছুও সাহায্য করবে।

ভগবানব্রহ্মের হস্তির মধ্যে নারীর আসন নবের এতটুকুও নীচে নয় তা আমরা জানি ও মানি, তবে সমাজ যখন হস্তি হ'য়েছিল সেই সময় থেকে পুঙ্খ নারীকে বিশিষ্টত সর্ব অধিকার থেকে তিলে তিলে যে বঞ্চিত করেনি একথা তো মানতে পারি না, জাতির ইতিহাসে এ সভা বস্তুত ধরা যায়, তবে একথা ঠিক, অধীনতার চরমরূপে নর নিজেই যখন অবনতির চরমে এসে পৌঁছেতে তখন তার সাহিত্য কর্তব্য শূন্য নারীর উপর প্রতিশোধ নিতে নিতেই তাকে দুর্গতির সীমায় ঠেলে দিয়েছে এ ভিন্ন আর কিছু বিশেষ কারণ নেই।

যাক—সভানেত্রীর অভিজ্ঞানের পর অনেকের অনেক বক্তৃতা ও হাততালির পালা লুপ্তো, এইখানে এখানকার



বাঙ্গালী ছেলের বিষয় একটু বলে নিই, তারা আজ 'বন্দে মাতরম্' গানটি করে সকলকেই চমৎকৃত করলে—কয়েকটি ছেলের বয়স অতি হুতুমার হ'লেও গান বড় ক্রমের পেয়েছিল, নানা ধন্দের জামা ও ধুতি, মাথায় পাখী টুপি, জোড়হাতে অতি উজ্জ ও মধুর কণ্ঠে সঙ্গীতটি শীর্ষভাবে গেয়ে গেল, শুনে বড় আনন্দ হোলো। বাঙ্গালার গৌরব বাঙালী মনোবি বন্ধিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানের আর তুলনা নাই, এ গান সমস্ত জগতের সকল দেশপ্রেমিকেরই দেশমাতৃকার বন্দনা।

আজ সন্ধ্যার আগেই কংগ্রেস ডাব্বিল, একটু পরেই সাবজেক্ট কমিটির মিটিং বসবে, প্রতিনিমিষা একটু জলযোগ কর্তে গেলেন, এদিকে হঠাৎ সংসার এলো, কাগপূর প্রবাসী বাঙালীরা বাংলাদেশ হ'তে আগত ডেলিগেটদের অভ্যর্থনা করার জন্ত একটা আয়োজন করেছেন, সেখানে বাওরা দরকার—আবার সন্ধ্যা সেখানে ছুটলাম—গিয়ে দেখি ভরানক ভীড়, বাঙালীর মুষ্টিমেয় সংখ্যা হাজার হাজার পশ্চিমবাসীদের মাঝে লুপ্ত প্রায়, ভীড় ভেলে মেহেরের স্থানে গিয়ে বঙ্গদাম, সেরাজিনী দেবী দেখানো বসেছিলেন, হেমপ্রভা মজুমদার, মোহিনী দেবীও উপস্থিত হয়েছেন, বাঙ্গালী মহিলা ডেলিগেট মাত্র চার পাচনের উপস্থিত, পরে শুনিলাম, ঠিক সময় খবর পান নাই বলে তারা উপস্থিত হ'তে পারেন নাই, স্থানীয় ডাক্তার সেন মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, তিনি ও ডাক্তার শর্টল্যান্ড যোগ মহাশয় প্রধান কর্মকর্তা ও উদ্যোগী—তাদের পক্ষ হ'তে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হ'লো, ছুঃখের বিষয় মহিলাদের বাদ দিয়ে অভ্যর্থনাটা মহিলাদের উদ্দেশ্য করেই লেখা হ'য়েছিল, পাঠ শেষ হ'লে ছুঃখের সহিত এ জটীটা সভার মধ্যে দাড়িয়ে উল্লেখ করলাম—ভূমি হেসে, বলবে—যেতে মান

—কৈদে সেহাগ আর কি—তা ভূমি মাই বল, মহাত্মা জীষ্টের সেই কথাটি—প্রার্থনা কর, পাইবেই—আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, পাওনা পণ্ডা যুগে যুগে আদায় করে না নিলে বন্ধিতই থেকে যেতে হয়। মাই হোক ডাক্তার সেন অতি অমায়িক সরল-প্রকৃতি—তিনি অকপটে সভার মাঝে দাড়িয়ে শব্দকার করলেন অভিনন্দন পত্রে মহিলাদের উল্লেখ না করাটা তাঁরই একটা মন্ত বড় ভুল হ'য়ে গেছে, আর এতবড় ভুলটার জন্ত তিনি লজ্জা বোধ করেছেন, আমি বললাম তাঁর মত প্রাচীরের ভুল মার্জিনীয় কিন্তু নবীন ধারা কর্ণধার তাদেরই এটা জটী—তিনি বলিলেন, “নবীনরা যখন তাঁর ছাত্র তখন এ ভুল বা জটী তাঁরই—এর পর কথা চলে না, আগামী দিনে মহিলাদের মধ্যে মহিলা ডেলিগেটদেরই তিনি বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবেন বলছেন, আমাদেরও ক্ষোভ রইল না—ক্ষোভের কারণ একটু ঘটেছিল, পুস্তকসো সকলেই এসেছিলেন কিন্তু নারীর সেখানে যোগ ছিল না, একমাত্র ডাক্তার যোগ মহাশয়ের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, প্রদোষা ভগিনী হেমপ্রভা মজুমদার তাই সবেদে বসলেন—আজকার এ অভ্যর্থনা কি তাহ'লে শুধু পুরুষ জনের অভিব্যক্তি, নারী প্রাণের মাধুর্য কি এর মধ্যে বেশি? আমাদের মা বোনরা আজ কই?

বলা ভাল মিষ্টমুখের প্রচুর আয়োজন হয়েছিল, গন্ধিমের বাগদাম, পেতা প্রভৃতিও বাদ পড়েনি, তার উপর চার উপসর্গ তো আছেই।

আজ কিন্তু এই পর্যন্ত, দুখ পাচ্ছে, শীতেও হাত পা জমে আসচে—তবু এবারে মোটা ধন্দের তাঁবু গড়েছে, নইলে আরও মুশ্লিল হোতো, আমি তো মশারী টাঙিয়ে তার উপর একটা কঞ্চল ফেলে দিয়েছি, যদি কিছু শীত নিবারণ হয়—আমি এখন।



দরিদ্র, দুর্বল আর নগণ্য হইয়া  
কি ফল হইবে বল, জগতে বাচিয়া

ভীমসেন মত শক্তি লভিতে পারিলে  
হুই হাতে ভেঙে ফেলি বুক অবহেলে।







## ভিটের মায়া

শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র

বিশ্ব-জননীর শান্তি-নীড় হইতে মাছুষ যখন বিচ্ছিন্ন  
অধিষ্ঠিত লইয়া লতাগুহ পশুপক্ষী ও তাহার সঙ্গসমীর  
মাঝে নামিয়া পড়িল, তখন তাহার দেহাঙ্গব্যবস্থার সঙ্গে  
মর্মে মর্মে জড়াইয়া গেল এক সুবিশীর্ণ চাকচিক্য  
মায়াজাল। ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার মত আত্মতত্ত্বও  
ঐ আপন-হতে-আলোকেরা, অজ্ঞাতনামের বিপ্লবিত মায়ার  
নিপুণ কৌশলময় ক্রমে ইতিপূর্বেই পড়িয়াছিল; তাহা  
ভের করিবার অতি অল্পমাত্র ক্ষমতাও তিনি আমাদের  
দেখনি। হয়ত বা মঙ্গলময় ক'রে প্রত্যাবর্তনের পথ সহজ-  
সাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। বতদিন না জলের মত বাষ্প  
হইয়া তাহার কোলে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি,  
ততদিন আমাদের ঐ নদীর মতই হাসিতে হইবে, নাচিতে  
হইবে আবার বহিয়াও যাইতে হইবে; ততদিন পর্যন্ত ঐ  
মায়াজালে মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণয়ের বন্ধি বেগা চলিতে থাকিবে।  
পিতামাতা, ভাইবোন সকলই এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। দেশ,  
ভিত্তি এ-ও তাহার একটা ক্ষুদ্রতম অংশ ভিন্ন আর কিছুই  
নয়।

মদিপুরের একটা ছোট্ট মাঘার কাহিনী। স্বর্ঘ্যকান্ত  
রায়ের পৈতৃক ভিত্তি বিশ্বর সেনার দ্বারা নিশাম হইবে।  
স্বর্ঘ্যকান্তবাবু বংশের অক্ষয়ধর; অটুট রাখিতে গিয়া নিঃস

হইয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে নিরুপায় হইয়া ক্রমশঃ নিরুৎসাহ  
হইয়া পড়িতেছিলেন।

বহুকালের গরু, হারাইয়া মরিয়া ভিনটীতে চৈকিয়া-  
ছিল। স্বামীর চুপেখের দিনে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর হইতে  
তাহাদের সেবা যত্ন নিঃসহায়ে করায় আজ তাহারা  
মৃণালের পরম শ্রিয়। এই আত্মীয়তার যে কি নিষ্ঠুর,  
স্বর্গছাড়া পরিণাম, সেটা আজ স্বর্ঘ্যকান্তের প্রত্যবেশে মৃণালের  
চোখের জলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া গেল। স্বামী বলিয়া-  
ছেন, নিশামে বিক্রিয়ে যেতে না দিয়ে মুক্ত গোয়ালিনীকে  
দিয়ে গিলে সে নাম ক'রে।

গোয়াল ঘরে একাধিকবার আনা-গোনা করিয়া,  
গরুগুলির পানে অনেকবার কারণ কাতর নেয়ে দেখিয়া  
সে স্বামীকে বলিল, রেখ তোমার নীলুর জন্তে পক্ষিকে  
চুনি রেখে দাও। আহা, আমরা কতকষ্টে গুকে মাছুষ  
করেছি,—ওর জন্তে আমার জারি কষ্ট হচ্ছে। 'কি বদ'  
হাংবে না? মৃণাল কানিল; কত অনাটন, কত বেদনা,  
যে আজ তাহার স্বামীকে বিক্রিয়া পাড়াইয়াছে সে তাহা  
বুঝিলেও, পক্ষিকে বিলাইয়া দিতে তাহার প্রাণ যেন  
ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

স্বর্ঘ্যকান্ত সান্দ্রা দিয়া কহিল, তা যে হয় না মৃণাল

আমার গুদের জন্তে প্রাণ কেমন করে না, এতটুকু কষ্ট হয়  
না? কি করব বল, সবই যখন যেতে বসেছে, তাই  
কগায়ের হাতে না দিয়ে, কোন হিন্দুকে বলিয়ে দেওয়াই  
ভাল নয় কি?

মৃণাল আর কিছু না বলিয়া গোয়াল ঘরে চলিয়া  
গেল।

সেখানে সে তার মনের পূর্ণ আবেগ, যত ক্ষুদ্র  
আকাঙ্ক্ষা উজাড় করিয়া বসনাফলে তাহদের দেহে মুছিয়া  
দিতে লাগিল। এ হীন শারিত্রাতার কথা একান্তে বলিল,  
দেখ মা, তোদের আবার নিয়ে আসব। তোরা  
আশীর্বাদ কর, যেন তোদের বাবু এ বাড়ী উজাড় করে  
পারেন। তোদের আবার এমন ভালবাসব' এমন যত্ন  
করব'।

মৃণাল ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে মান করাইয়া,  
মনের মত করিয়া খাওয়াইয়া সে আজ গরু গুলিকে বিদায়  
দিবে।

আন্তে আন্তে, অতি কষ্টে, অনেক সাধুসাধি করিয়া  
গরু গুলিকে জলে নামাইল। পাশেই পাকা ঘাটে কেলোর  
মা আন করিতেছিল। মৃণাল কথায় কথায় ভিটে ত্যাগের  
অনিষ্টকর ও অসহনীয় পরিণামের কথা কেলোর মাকে  
উপলব্ধি করাইতে যখন ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ একটা  
প্রকাণ্ড আঘাতে মৃণাল পড়িয়া গেল। কেলোর মা চীৎকার  
করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই  
করিল না। অল্প সময় হইলে হয়ত ঘাট লোকে  
লোকচান্য হইয়া যাইত, কিন্তু ছুপুরবেলা! মৃণালদের  
মত নিত্যন্ত দুর্ভাগ্য ব্যতীত সকলেই আহার্যাদি কার্যে  
ব্যস্ত। মৃণাল যেখানে পড়িয়াছে সেখানে এক হাত  
বা খেড় হাত ব্যতীত যে কখনই অধিক জল হইতে  
পারে না, এ বিষয়ে যখন কেলোর মা স্থির নিশ্চয় হইয়া,  
নিজের পরোপকারিতা সৎক্ষে অনেক বক্তৃতা দিতে দিতে  
সে মৃণালকে উঠাইল। মৃণাল হাঁপাইতেছিল, নিজের  
অসমর্থতায় সে বিষম লজ্জিত হইয়া, রান মুখেও ঈষৎ  
হাসিয়া ফেলিল। কেলোর মা তাহার বেহায়াপ্রসন্ন দেখিয়া  
ভৎসনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মাগী হাসিও আসছে  
মুখে? যেমন পক্ষু পক্ষু করে মরিঙ্গু তোর পক্ষুই তো

আজ সিং দিয়ে নিয়ে বাচ্ছিল, জলে ভাগিয়া ভাল বে  
আমি ছিলুম। সত্যি মা তাই; কি করব বল রূপাসে  
দুঃখু না থাকলে কি!—বলিয়া মৃণাল নিজের কাছে মন  
দিল। কেলোর মা অল্প কথা পাড়িলেন,—আচ্ছা স্থিতি  
বাহুকে বলনা, একবার রক্ত শাণের হাতে পায়ে ধর্তে।  
বাহুত তনতে পাই খুবই ভাল, তবে গমস্তা মিন্বে সে কি  
করে, ও সেবার পার্শ্বতীর বাড়ীতে কি কেলোয়ারীটা  
না কর্শ। বউটা ছিল সতী স্ত্রী তাকে কিনা—মৃণাল  
বাধা দিয়া বলিল, থাক্বে না, পরচর্চার কাজ নেই।  
নিজেরেই ভিটে যার।

প্রত্যুত্তরে কেলোর মা বলিলেন, আহা আর চপের  
জল ফেলিস নে মা, কি করবি বল। আহা, ভিটে বলে  
ভিটে গা, জেন রাজপুত্রী! সপ্তসহিয়া নারায়ণ আছেন  
এর ল গুদের ভূগুহতেই হবে। আন সমাপ্ত করিয়া  
বেশ গভীরভাবে বলিলেন, দেখ, আমি যদি সতী হই,  
এই বাসি মুখে জল দিই নি, ঠিক বলছি এর ফল শুকে  
ভোগ করতেই হবে নতুন বো। ভূই দেখিস তখন।  
আরো কত কি বলিতে বলিতে ও বহু জীবন রক্ষার  
অক্ষয় কাহিনী শত বর্ষে রক্ষিত করিয়া সহস্র মুখে  
প্রকাশ করিতে করিতে তিনি উঠিয়া গেলেন। রক্তের  
ঝিলেই সময় মাছ হুইতে ঘাটে নামিল, পিছন পিছন  
আসিলেন সে বাড়ীর গোমস্তা সামান্য বাবু। মাঘের  
চুপড়ি জলে নামাইয়াছে আর শিব বাবু কহিলেন  
আচ্ছা তোমার পিছু পিছু ঘুরে যদি সমস্ত দিন কাটাও  
তবে অল্প কাজ কিছু আর হয় কি করে। যা  
বেশতো বা, আবার কি মাছ এলো। ঝি ছ'একবার  
মৃণালের বেদনা কাতর মুখানির পানে তাকাইল কিন্তু  
গোমস্তার জেনচক্ষু সে অভাগীর প্রতি দ্রুত দেখিয়া  
সে মৌন ভাবেই উঠিয়া গেল, এবং ভাল করিয়া বুঝিয়া  
গেল, যে মৃণাল যখন ঘাটে আছে হুতরাং গোমস্তার  
দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই বেরী হইবে, ইত্যবসরে সে বাড়ী হইতে  
পান লোকা গালে দিয়া হেলিয়া ছলিয়া গরু করিতে  
করিতে কার্য্যান্তরে যাইতে পারিবে।

গোমস্তা মৃণালের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সেই  
দুপুরে যখন হুইতে মনোনিবেশ করিলেন। সাত দিনের







এই লোকটির অস্বাভাবিক আকার ইঙ্গিত বুঝিয়া পান নানা। তাহারই কর্তব্যের মধ্যে একটা বিবেচনা করিয়া ছুটিয়া পান আনিতে গেল। অবিরলভাবে পান আনিতে দেখিয়া গোমতা স্বমীর আনন্দে কহিলেন—বাস, তুমি সিংহদ্বার।

নীলু কহিল, না মা সেজেছে মশাই। এটা যে গোমতার নিকট অধিকতর আনন্দজনক, তাহা নিজে প্রকাশ না করিয়া তিনি কহিলেন—তোমার মা কোথায় মুকী? নীলু উত্তর কহিল, মা ছোটগরে। আজ মা কাঁদছিল, বাবা আমাদের ছুটো গরু সেই কাকে দিয়ে দিলে। গোমতা আশ্চর্যচিত হইয়া কহিলেন, কিং, পাগল হলে তুমি? তোমার সব বাড়াবাড়ি দেখছি, বললুম কোন ভা নেই। যাকগে আনলেই হবে কা। কৈহে রাত অনেক হ'ল, একবার ভাক আলাপ, টালাপ করা যাক। কিছু ভেনোনা, হে।

“হঃ আনন্দ!” বলিয়া স্বর্যকান্ত রক্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মৃণাল বাহিরেই ছিল, সে স্বামীর দ্যস্ত-ধারা জানিত। স্বর্যকান্ত বাহিরে যাইতেই, তাহার হাত ধরিয়া মৃণাল ভিতরবাটীর সব চেয়ে ন্যূনান যে অন্ধকার ঘর সেখানে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ মৌনভাবে কাটিবার পর মৃণাল স্বামীর হাত ছুটি ধরিয়া বলিল—বল, প্রতিক্রিয়া দাও যে আমার জ্ঞত কাঁদবে না, এতটুকু ভাববে না আর।” কিংউ উত্তেজিত কর্তে, স্বর্যকান্ত উত্তর করিলেন—না, না মৃণাল সে কিছুতেই হবে না, ও পাগলওর হাতে কিছুতেই তোমার বিদগ্ধন দেব না। মৃণাল এতটু দাঁড়াও, হা হবার হবে—গুরু মুন করে, তোমার পায়ের নীচে ওর মূণ্ড এনে দিই—মৃণাল ছাড়া, কথা রাখ—স্বর্যকান্ত ছুটিয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু মৃণাল তাহার পদময় জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া বলিল,—ওকি অত অধির তুমি? এতটুকু একটা তুচ্ছ কাজের জন্ত তুমির বলদ মাথায় নিতে যাবে। তোমার স্ত্রী তোমার মান কখনও প্রাণ থাকতে ভোবাবে না। কোন মতেই আমি আমাতে কলহ স্পর্শ করতে দেবো না। কিন্তু জীবন-প্রসঙ্গ ত সেইদিনই বন্ধ হয়ে গেছে, যেদিন, দুদিন অনাহারের পর ভিক্ষা করে আমাদের অন্ন

সংস্থান হয়েছিল। তারপর তুমিও নীলু এই অট্টালিকা ছেড়ে যেদিন পাছতলা আশ্রয় নেবে, সে অবস্থাও কি আমার দেখতে হবে। না না, পায়ের পড়ি আর না। বল একশ' হাতে আমার ভার আমার ওপর দিলে, বল!”

স্বর্যকান্ত দীর্ঘ ও শান্ত কর্তে কহিল—মৃণাল! আজ একথাও বলতে হল। বলতে হল তোমার আজ বিদগ্ধন দিলাম, বলতে হল তোমার ভার সম্পূর্ণ তোমার উপর দ্রুত করলাম। আরো কি বলতে হল জান? বলতে হল, আমাতে শক্তি-পুরুষের বল কিছু নেই; আমি হীন, কাপুরুষ।—স্বর্যকান্ত কান্নিতে লাগিলেন। মৃণাল অতি কষ্টে জন্মন শরণ্য করিয়া চুপে চুপে কহিল, তবে যাও, এমন পোষণে, আবার দেখা হবে। একটা কথা। কিছু ভেনোনা যুগ্মেওগে যাও জানলে—

মৃণাল হাঁদারের শোয়াইয়া দেখিল যখন ঘুমাইয়াছে তখন বাহিরের ঘরে গোমতার কাজ সিঁচা বাসিল। গোমতা ভাবিলেন তাহার কি সৌভাগ্য, তাহার কতকালের আশা আজ ফলবর্তী হইতে বসিয়াছে, আবার মৃণাল ভাবিল তাহার আজ পরম সৌভাগ্য আজ কৌশলে সে তাহার স্বামীর ভিত্তি ও পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করিবে। গোমতা দশাশিব প্রথমদেই লাল-লম্বার মাথায় কুটারায়ত করিয়া কহিলেন, দ্বন্দ্ববান মৃণাল—তোমার শরীর কেমন এখন?

“উপস্থিত ত কোন অসুস্থতার লক্ষণই দেখছি না গমতা মশাই।”

“ভাল। ও আজ কতদিন পরে দেখা হল, না?”

“হঁ, প্রায় এগার বৎসর হবে। আমার বিয়ে হয়েছে ঠিক পনের বৎসর বয়সে, আর এই বিয়ের পর ছ' বৎসর কাটল।”

“তা হল বৈকি, তোমার প্রায় দশ বৎসর বয়স অবধি তোমার সঙ্গে দেখাভাণ, গান-বাঞ্ছনা করছি, ও সে সব কি দিনই গেছে না ভাই।”

“তা ঠিক। আমার বিয়ের ছ' পাঁচ দিন আগে পর্যন্ত আমাদের বাড়ীর আশপাশে আপনাবকে বিনা কাজে ঘুরতে দেখিছি। বিয়ের দিনই সকালে আমরা আপনার

সঙ্গে বিয়ে না হলে আক্ষিণে খেয়ে মরবার অসুযোগ পড়, দিক্‌জি না করিয়া সই করিলেন। মৃণালও একটা কি লিখিয়া, দুইখানি কাগজ একত্রে গোমতার অজ্ঞাতসারে ভেঙের মধ্যে রাখিয়া দিল। তারপর দীর্ঘদ্বয়নে ও দুটকর্তে কহিল, “আজ তুমি যে বল, আমার ভালবাস না? কিন্তু আজ যদি এখনই তুমি আমার আশা ত্যাগ করে, আমার এ বাতী হতে বেরিয়ে যাও তাঁলেই খুব ভালবাসার কাজ হবে। ভেবেছি কি গমতা, স্বর্যকান্ত রায়ের স্ত্রী একজন পরপুরুষের কাছে ভালবাসা জানাতে এসেছে? হুবা কত লোকের কত সর্গশাপ করেছ তুমি। এই দেখছ এখানি কি বল। সেবি, কৈ কথা কও, প্রমোদলাপ কর।”

“ওগানা—ওগানা, মাপ কর মৃণাল, গরীবকে বাচতে দাও। ওগানা, হুত বিধ মাখান আছে, একমাত্র ছুরি—দোহাই মা তোমার—”

“বল তবে, কেন আমার স্বামীর ভিটে নিলাম হয়?”

“এলব আমার চক্কাৎ মৃণাল—তোমায় বড় ভাল-বাসি।”

“আমিও তোমায় বড় ভালবাসি। গোমতা, আমার স্বামী অসচ্চরিত্র তোমায় বলল কে, লোকেরই বা জানুল কি করে?”

“বলছি, সেও তোমার পাবার জন্তে আমার বড়-যত্ন।”

“হঁ—আহা সবার সামনে এ কথাগুলো বলে বড় ভাল হত, ঐ একটা সাধ। স্বামী—”

“মৃণাল এই বার—আহা সোণার তুমি, কি হুম্বর তুমি মৃণাল। তাই ত আমি তোমার সঙ্গে আশ্রয় পাগল।”

গোমতার নেশা চরমে আসিয়াছে। সে টলিতে টলিতে মৃণালের দেহ স্পর্শ করিতেই, তাহার সর্বদেহ রক্ত স্রাবিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—“মৃণাল—মৃণাল।”

তখন সেই জীবনশূন্য অবলম্বনহীন দেহখানি কুণ্ডলিত হইল। গমতা লাকাইয়া বাহিরে পলাইতে গিয়া দেখিল সমস্ত দরদারজন্তে ভালাবন্ধ, একটীরও চিহ্ন নাই। পুনরায় ডাকিল, “মৃণাল—মৃণাল, বাঁচাও আমার।” কিন্তু কে বাঁচাইবে, মৃণাল যে নাই, ইতিপূর্বেই তৎকাইয়া গিয়াছে।

মদের বোঁকে ভালবাসা উত্তাল তরল বোথ হয় বেশি খরবেগেই শিবাবুর প্রাণে বহিতেছিল। তখন



নিলামের দিন বেলা দশটা। স্বর্ধ্যাকান্ত কোটের লোকের হাকাধাকিতে উঠিয়া দেখেন উঠানে জনতা, তাঁহার বিবাহ দিনের চেয়ে অধিক।

নীলু তাহার থাকে না দেখিয়া, কান্ডিতে কান্ডিতে স্বর্ধ্যাকান্তকে কহিল, “মা কোথায় বাবা?”

তিনিও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, মৃগাল কোথায়, তথাপিও সাধনার জন্ত কহিলেন, “পাড়া না, মা এই যে এলো বলে, তোর যুব বিবে পেয়েছে না।”

“হঁ, ভানাক, ভূমি ভানকা—একবার। আচ্ছা বাবা এত লোক কেন আমাদের বাড়ীতে?”

এদিকে একটা একটা করিয়া বাটার ভিতরের সমস্ত ব্রিহিষ পাড়া বোকাই হইয়া গেল।

এইবার বাহিরের ঘর। একজন দেবিয়া আসিয়া বলিল তাহা তাল্য বন্ধ। স্বর্ধ্যাকান্ত শুনিয়া বলিল, “কৈ তাল্য দেওয়া ছিলনা? ত’লুন দেখি একবার।”

স্বর্ধ্যাকান্তের অন্তর একটু কাঁপিল, কিন্তু জমিদারের লোকের তড়ায়, নীলুকে কোলে লইয়া সে দরজার নিকটে গাইল। “কিছুতেই কিছু হইল না দেবিয়া, দরজা ভাঙিয়া ফেলা হইল। খুন—খুন, এই সব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, পুলিশ গমত্তার হাতে হাতকড়ি পরাইল। ইহা দেবিয়া স্বর্ধ্যাকান্তের সর্পশরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের আঘাত যেন বন্ধ হইতে চাহিল। অচেতন হইয়া সেইখানেই পড়িয়া মাইতেছিল। কেহো তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তাহারে বাড়ী লইয়া লইয়াবাহির জন্ত অহরোহ করিল।

প্রথমে অহরহ বিনয়েও স্বর্ধ্যাকান্ত কিছুতেই ঘাইতে চাহেন নাই, মা তখন বাঁখিয়ে ছিলেন—

ফেলো চীৎকারে বাড়ী কাটাওয়া বলিল, “মা, ঈগির নীলুকে রাইয়ে রে।” তারপর স্বর্ধ্যাকান্তকে সোধেন

করিয়া কহিল, “তল হুঘি-না, ঘরে একটু শোবে—দেখছ ছ’মসেসে জুই গাছটা কি রকম ঝাঁকিয়ে উঠেছে, আর কি রকম ফুল হয়েছে দেখেছ? এ গাঁয়ের ভিতর কারো বাগানে এরকম হৃদয় ফুলভরা গাছ দেখতে পাবে না।”

বৈকালে যখন স্বর্ধ্যাকান্ত, কেহো ও তাহার মাতার একান্ত অহরোহে কোন প্রকারে কিছু খাইয়া উঠাঘরে রোয়াকের উপর শুইয়া ছিলেন তখন কেহো কোথা হইতে ইপাইতে ইপাইতে আসিয়া বলিল, “ভানুলে স্বঘি-না, গৌমত্তার হাতের লেখা পাওয়া গেছে, সমস্ত টাকা হস্তগত হইই আনিব সে তোমার কাছ হতে সুখে পেয়েছে। আর মৃগাল মামীর একখান চিঠিও তার সঙ্গে ছিল। সে তোমার বলে গেছে নীলির নাম যেন সীতা রাখা হয়, এই যে সে চিঠি।” স্বর্ধ্যাকান্ত চিঠি লইয়া পড়িলেন, “গঙ্গো এখনও মরণ ঘটনের আশার ঠিক নেই, বেহেতু কীবন্ত অবস্থাতেই এ চিঠি লিখি। মাহুদ যতক্ষণ না মরে, সে আর ঠিক কি করে বলবে, যে আজ এখনই আমি মরব। ওটা তা ভগবানের সশুর হাত জানি।

যাহ’ক বেঁচে থাকলে, তোমায় ছেড়ে এক দণ্ডও কোথায় থাকতে পারব না, দেখা হবে। যদি নাই থাকি, হুখ কহো না, আমার জন্ম হুখবী নীলামার নাম রেখো সীতা—ইতি—”

সেদিন বৈকালে কেলোর মার কাছে বিধায় লইয়া স্বর্ধ্যাকান্ত ও সীতা যে কোথায় চলিয়া গেল তাহা কেহই জানিলেন না। মৃগালের কি হইল! গ্রামের লোকে বলিল, ভিতরের সাক্ষা না কাটাইতে পারিয়া, সে আজও প্রেত হইয়া ঐ পড়োবাড়ীয়া বাস করে।



## গিরিশচন্দ্র

### শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হইয়াছে। রঙ্গালয়ের দর্শক এবং দেশের কয়েকজন নাট্যাঙ্গহুগী ধনী এই মর্ম্মরমূর্তি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কলিকাতার বর্তমান করপোরেশন এই নগরীর মধ্যে একটি পার্ক গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে “গিরিশ-পার্ক” নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে মহাপ্রাণের ঐকান্তিকী চেষ্টায় ও আন্তরিক ইচ্ছায় গিরিশ-পার্কের নামকরণ হইয়াছে—আজ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিসভায় সকল আলোচনার পূর্বে, তাঁহারই সৌমা শাস্ত্রমূর্তি মানসচক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। দুইবৎসর পূর্বে গিরিশ-স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আজ সে বাদালার প্রাণ—না—সমস্ত ভারতের প্রাণ—চিত্তরঞ্জন—শেষবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই। তাঁর তিরোভাবে কয়েকমাস পূর্বে এই গিরিশ-পার্ক ও মর্ম্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমাদের শেষ কথা হয়। একবল—অবশ্য তাহারেই স্মৃতি মূর্তিমেয়—গিরিশ-পার্কের নামকরণে বাধা উপস্থিত করেন। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু আক্ষেপ করিয়া বলেন, “গিরিশবাবুকে বাঙ্গালা চিনে নাই, এখনো তিনিবার বিলম্ব আছে; মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ইংলণ্ড যেমন শেক্সপীয়ারের আদর হইয়াছিল—তেমনি একদিন আসিবে,—তেমনি এদেশ, গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে, তাঁহাকে আদর করিবে, তাঁহার গুণকীর্তনে গর্ব্ব অহত্ব করিয়া ধন হইবে।” সেবারে গিরিশ-স্মৃতিসভায় সভাপতির আসন হইতে তিনি মুল্লুকে বসিয়াছিলেন—“গিরিশ-চন্দ্রের গান, গিরিশচন্দ্রের কবিতা, গিরিশচন্দ্রের নাটক যাচাই করিবার জন্ত সাগরে পাড়ি দিতে হইবে না; পশ্চিম হইতে বিদেশীয় শিক্ষার্থী আসিয়া নতজাহ হইয়া দিবিয়া যাইবে—গিরিশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য্য।” হায়, আজ সে চিত্তরঞ্জন

কোথায়! অমরা হইতে আজ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি এই দীন নটের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন—ইহাই আমাদের ভিক্ষা—আমাদের কামনা। গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিসভার অহুষ্ঠান পূর্ণ হ’ক—বিদেশীর পূর্বে বাঙ্গালী নতজাহ হইয়া গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পূজা করিতে শিখুক!

গিরিশচন্দ্র শব্দেছ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা আমার মনে আছে। আমি তাঁহাকে প্রথম নটরূপে দেখি “পলাশী মুখে” রাইভের ভূমিকায়। তাঁহার নাটকের প্রথম অভিনয় দেখি—“বিষমঙ্গল।” এই স্বদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর—বাঙ্গালদেশের, জনসাধারণ নহে—বিজ্ঞতার গভীতে আবদ্ধ সাহিত্যিক এবং পাতিত্যাভিমাত্রী নমালোচকের দল তাঁহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—এবং এই চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি তাঁহার নটজীবন আশ্রয় করেন, তখনই বা কি ভাবে ইহার তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—কারণে কহিলে তাহার যৌন পরিচয় পাইয়াছি, তাহারই সন্নিপাত চিত্র আপনাদের সমুপে ধরিবার চেষ্টা করিব।

প্রতিভা নৃতনের সৃষ্টি করে, এবং নৃতনের সৃষ্টি করে বলিয়াই প্রথমে সে আদর পায় না। অপরিচিতকে সহজে আদর করিতে কে চায়? সকল দেশে সকল প্রতিভাই প্রথম জীবনের এমন কি কীবিত্তকালের দুর্দশা প্রায়ই সমান। এ দেশেও, মাইকেল প্রথমে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার নৃতন দ্বন্দ্ব, তাঁহার নৃতন লিখনভঙ্গী, তাঁহার নৃতন ভাব সম্প্রদায়—বিজ্ঞানহীন ও ঈশ্বরগুপ্তের জ্ঞান আগের প্রথমে বড়ই বেহুয়া লাগিয়াছিল। জনকদেব নবরঙ্গপ্রদানী তরুণ, সে সময়ে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলে “ছদ্মনরী বন” কোথায় দুর্গন্ধ তখনকার সাধারণের—তখনকার সাধারণ অর্থে তৎকালিক বিজ্ঞ সাধারণের—মনোবৃত্তির



প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাক্, আজ আর সেদিন নাই। আজ মাইকেল বাগদাদীর মহাকবি। সাহিত্য-সম্রাট বহিন্ময়কেও যে কিছু হুজুগে তুগিতে হয় নাই, তাহা নহে। উহার ‘‘হর্গেশনন্দিনী’’ প্রকাশের পর তাঁকেও তৎকালিক ‘‘বিজ্ঞপত্র’’ সমালোচনার খোঁচা অস্থির হইতে হইয়াছিল। একজন বড় বৈয়াকরণিক পণ্ডিত, হর্গেশনন্দিনীর প্রথম পরিচ্ছেদে উনিশটি ব্যাকরণের ভুল এবং তেথটিটা অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া পরম শাস্তিলাভ করেন। তবে বহিন্ময় নাকি বড়ই দৃষ্টিশীল ছিলেন, তাই সত্যসত্যি তাহ খাওবদন দানেন করিয়া দুষ্ট সমালোচককল্পি আগাছার দল পোড়াইয়া অন্ধারে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রাণ্য সম্মান ও রাজকর দেশের লোকের নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লয়েন; তাঁহার সঞ্চয় বৃত্ত কখা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও তাঁহার দেশে কম লাহনা ভোগ করিতে হয় নাই এবং এখনও যে না হইতেছে তাহা নহে। ব্যাক্তব্য, রসকল্পে যখননাট্য, মাসিক অমাসিক রসিক ও অরসিকের হাতে তাঁহাকে যত ব্যাক্তবিজ্ঞপূর্ণ সমালোচনার লণ্ডড়াভাষ্য সঞ্চ করিতে হইয়াছে—এমনটা আমাদের জীবনে আর কাহাকেও সম্ব করিতে দেখি নাই বলিলেও কিছুমাত্র বাড়াইয়া বলা হয় না। গিরিশ-চন্দ্রও এ লাহনা হইতে নিম্হিত পান নাই, এবং এখনো সময়ে সময়ে তৎকালিক বিজ্ঞ হইতে দৃষ্টপোষ্য বাদক পর্য্যন্ত, বাগে পাইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা কহেন না। আজ সেই কথাই বলিব।

এদেশে নাটক রচনার যে বর্তমান পদ্ধতি, তাহার প্রথম প্রবর্তক মাইকেল যমুদ্বন্দন দত্ত। তাঁহার পর হইতেই ইংরাজী ছাচে বাঙ্গালা নাটকে ঢালাই আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজী ছাচে ঢালাই করা যায়, গিরিশচন্দ্র তাহারই পরিপূর্তি সাধন ও চরমোৎকর্ষ বিধান করেন। মাইকেল মাক্ ছই একখানি নাটক লেখেন, গিরিশচন্দ্র প্রায় শতাধিক নাটক ও ষ্টিটনাটক প্রণয়ন করিয়া নাট্য সাহিত্যের সর্বসৌষ্ঠব সম্পাদন করেন—তাহাকে অপরূপ রূপ দেন। মাইকেল মাক্ দীনবন্ধুর সববে নাটকের ভাষা কিছু টিক কইরা হয় নাই। নীলদর্পণের নবীনমাধবের

মুখের ভাষা বা কৃষ্ণহুমারীতে ভীমসিংহের ভাষা টিক সহজ মায়ের ভাষা নয়। উহা পণ্ডিতের ভাষা, অনেক স্থানে সংস্কৃত গদ্য ভাষা। উহা আড়ম্ব—প্রাণহীন। মাইকেল মাক্ দীনবন্ধুর নাটকে, রসে পাক ধরিয়াছে মাক্, কিন্তু উহা গাঢ় হইয়া দানা বাধে নাই। এই সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নাটকের ভাষা রসের পরিপাকের ক্রমশঃ দানা রাখে। বিভিন্ন চরিত্রেরপযোগী বিভিন্ন ভাষা—কথ্য ভাষা—প্রকৃতপক্ষে নাটকের ভাষা যা হওয়া উচিত—ধরিতে গেলে, তিনিই তাহার সৃষ্টি করিয়া যান; এবং কালে তাহার সম্যক পরিপূর্তি বিধান করেন, তাই তাঁহার ভাষা অভিনয়কালে যেমন সহজ সরল ও গজবিনী, তেমনই প্রাণপূর্ণ। তাঁহার গজভাষা অপেক্ষা নাটকোক্ত পণ্ডের ভাষা কিন্তু এক সম্পূর্ণ নূতন পদ অবতরণ করে। মাইকেলের অমিতাক্ষর ছন্দের পর এই ভাষা ছন্দের প্রথম প্রচলন তিনি না করিলেও, তাহার সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকারী যে তিনি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গিরিশ-চন্দ্রের লগ্ন বর্জনের প্রকল্পপূর্ণায় বগীয় কালীপ্রসঙ্গের লিখিত ভাষা অমিতাক্ষর ছন্দের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত আছে, যথা:—

হে সম্ভবন।

শব্দের হুনির্শল পটে—

রহস্ত-রসের রসে,

চিহ্নিহ চিহ্নিহ দেবী বরষতী বরে।

স্বপ্নাচক্ষে হের একবার

—ইত্যাদি।

গিরিশবাবুর মনেই অনিচ্ছা, এই ছন্দ হইতেই তিনি ভাষা অমিতাক্ষর ছন্দের প্রেরণা লাভ করেন, এবং এই ছন্দই নাটকের ব্যবহার উপযোগী বলিয়াই তিনি তাঁহার অধিকাংশ নাটকে—বিশেষতঃ দৃষ্টকাব্যে ইহার প্রচলন করেন। তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভার শক্তিতে এই ভাষা অমিতাক্ষর ছন্দই আজ ‘‘ইংরাজী-ছন্দ’’ বলিয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে সর্বদা আপনায় স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। এই নূতন ছন্দের প্রচলন, এই নূতন ভাবে নাটকের আকার দান এবং সব চেয়ে বড় দৃষ্ট-

বিদ্যারক ব্যাধার—জনসাধারণের মধ্যে সেই সব নাটকের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা বিবেচ্য সমালোচক ও পুরাতন পদী-বিগকে অস্তিত্ব করিয়া তোলে। কাজেই তাঁহার সময়যোগে সমালোচনার নান্দনা-কল্যা সাহিত্যের—বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যে আসরে—উদীয়মান গিরিশচন্দ্রকে ব্যতিক্রম্য করিয়া তোলেন।

আকাশে যেমন চন্দ্রমণ্ডল—বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে পূর্ণমণ্ডলে তেমন আমরা ‘‘বহিন্ময় মণ্ডলী’’ দেখিয়াছি। সেই বহিন্ময় মণ্ডলী জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে এক আচর্য অক্ষয়চন্দ্র এবং কবি নবীনচন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও যে গিরিশ-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে দেখিয়াছি তাহা মনে হয় না। জানিনা কেন বহিন্ময় এবং তাঁহার পরিচয়পত্র জাতীয় নাট্যশালাকে উপেক্ষা করিয়া নাট্যসাহিত্যের আলোচনার কৃষ্ণভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। নাট্যশালায় প্রভা, নাট্যশালায় সহিত সংসর্গ বলিয়াই কি, অপারোক্ষে গিরিশচন্দ্র বহিন্ময় মণ্ডলী হইতে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন? যাহাই হউক, এক ‘‘বদধর্মন’’ ভিন্ন তখনকার প্রায় অনেক মাসিকপত্রই নাট্যশালা ও গিরিশসাহিত্যের সমালোচনা বাহির হইত। কিন্তু সে সব সমালোচনা সর্বদাই যে বিশেষ ব্যাধারক হইত, তাহা নহে। তাহাতে বিশেষের বহির উত্থাপ, জানিনা কি কারণে, বহাই ক্ষুটিয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। ১২৮৮ সালে ‘‘আর্যদর্শন’’ পত্রের পৃষ্ঠায় কোন সমালোচক আত্মগোপন করিয়া গিরিশচন্দ্রের ‘‘অভিনয়’’ যে তীত্র সমালোচনা করেন, তাহা পাঠ করিলে, তখনকার শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতের বিজ্ঞতার পরিচয় কথঞ্চিৎ আপনায় পাইবেন। সমালোচক গিরিশচন্দ্রের ভাবের নিম্না করিয়াছেন, ছন্দের নিম্না করিয়াছেন; তাঁহার যে অম্মন অপরূপ সঙ্গীত, তাহাকেও যার করিয়া লিখিয়াছেন—‘‘তোল তান গ্রন্থিনী গান’’—গ্রন্থিনীই বটে! আর প্রতি ছত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের তীত্র বাগে তাঁহাকে নাশানানুদ্ব করিয়াছেন। এবং প্রায় ৭৮ পৃষ্ঠাভাগী পালিধর্মের পর বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহার Case-Sum-up করিয়াছেন এই বলিয়া—‘‘... আমরা আর ছই একটা কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। আমরা গিরিশবাবুর প্রণীত পুথকাদিতে দেখিতে পাই,

তিনি কিছু অদ্বুত ও অলৌকিক কল্পনা ভালবাসেন। তাঁহার গ্রন্থাবলিতে কথিত ও নাটকীয় বহ না থাকে, কেবল অদ্বুত দৃষ্ট পরিপূর্ণ। তিনি সং সাহায্যইতে ও অভিনয়ে সং আনিতেন অত্যন্ত ভালবাসেন। ... এখনকার রসকল্পি যেমন স্থলের ছায়ে পরিপূর্ণ, গিরিশবাবু যেমনি তাহা বুদ্ধিমা নাটক লেখেন। ... প্রাচীন পল্লীগ্রন্থ যদি কেহ অধিনয় দেখিতে যান, তাঁহার হাসিয়া উঠিয়া আসেন। যেন মনে কহেন, যেমন শ্রোতা তেমনই কবি ক্ষুটিয়াছেন।’’ ইত্যাদি—ইত্যাদি। বাহ্যলো-নাম্। ইহা হইতেই আপনায় বুদ্ধিবৈশিষ্ট্য, সমালোচকের যত রাগ, গিরিশচন্দ্রের নাটক তখনকার তরুণদের চিত্ত আকর্ষণ করে বলিয়া। গিরিশচন্দ্র তরুণ, রসবাহু ও তরুণ; তরুণের হৃদয়তরঙ্গের যে সম্মোহন বহ, তাহা বিজ্ঞ পণ্ডিতের দৃষ্টিতে বহুদূর বাজে বলিয়াই বোধ হয় তখনকার পাকা সাহিত্যিকেরা তথা প্রাচীনরা তাহা সম্ব করিতে পায়েন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই—বহিন্ময় মণ্ডলী হুজুগে তিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ছাড়া আর একজন পরম পণ্ডিত কবি ও দার্শনিক অধ্যাপক বিজ্ঞানশ্রী ঠাকুর মহাশয়—হায় আজ তিনি আমাদের পরিচয় করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।—এই তরুণ গিরিশচন্দ্রের নব-মুহুরিত নাট্যমঙ্গলীতে ভাবের যুগল ও রসের মাধুর্য অদ্বুত করিয়া তাঁহার সম্প্রতি ‘‘ভারতীতে’’ গিরিশচন্দ্রের কৃষ্ণী প্রশংসা করেন। হে প্রোবদধ! আপনায় তাহারও একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। এই অভিনয় বহ এবং সেই বহে রাবণ বধের সমালোচনায় ঐ ১২৮৮ সালের ভারতীতে লিখিত হইয়াছে—

‘‘কি তাঁহার অভিনয় বহ, কি তাঁহার রাবণ বহ, এই উভয় নাটকে তিনি মহাভারত ও রামায়ণের নায়ক ও উপনায়কদিগের চরিত্র অতি হৃদয়রূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন—ইহা সম্যাক স্থখাতির কথা নহে। একও কলার মধ্যে তো হৃদয়ের আলোক প্রবেশই করিতে পাবে না, কিন্তু একখণ্ড ক্ষতিক, শুদ্ধ যে হৃদয় কিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়—আবার ক্ষাটিকা গুণে সেই কিরণ



সহস্রবর্ণে প্রতিকলিত হইয়া স্বর্গার মহিমা ও ক্ষত্রিকের  
স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীকৃষ্ণ গিরিশবাবুর বয়স সেই  
ক্ষত্রিক বৎ, এবং তাঁহার অভিমত্যা বৎ ও রাবণ বৎ প্রকৃত  
সামান্য ও মহাভারতের প্রতিকলিত রশ্মিপুং। তাঁহার  
আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকী আছে। তাঁহার  
কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ  
করিতেছি। স্বপ্ন ও তদীয় সন্নিদ্যগণের গানে আমরা  
মুগ্ধ হইয়াছি—ইত্যাদি। এইবার স্বপ্নসন্নিদ্যদের সেই  
“কোন্ তান প্রব্রীণান গান”-বিচার করিয়া আপনারা  
সেখনি আর্দ্রাধর্মেণ সমালোচকের মতে ইহার গ্রন্থের  
কতখানি শিথিলতা হইয়াছে!

ভারতী পুনরায় বলিতেছেন, “আমরা গিরিশচন্দ্রের  
নূতন ধরণের অমিতাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী।  
ইহাই বর্ষার অমিতাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ  
স্বাধীনতা ও ছন্দের মিত্রতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি  
মিতাক্ষর কি অমিতাক্ষর, অলঙ্কার শাস্ত্রকে ছন্দ না  
বাঁধিয়া, ছব্বয়ের ছন্দ প্রচলিত হয় ইহাই আমাদের একান্ত  
বাসনা। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে  
আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।”

চন্দ্র ও প্রাচীনের এই গ্রন্থ ও ত্যাগ, এই স্নেহ ও  
বিরাগের মধ্যে আমরা দেখি, সর্ববিধের উন্নতির অগ্রণী-  
ষ্ঠার বাজী হইতেই গিরিশচন্দ্র প্রথম উৎসাহের অভিনন্দন  
লাভ করেন। এ সময়ে মাত্র গিরিশবাবুর ৫৬ বানি নাটক  
বাহির হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিনের ব্যবধানের  
পরে আজও এই দুঃখের ছন্দ তখনকার প্রবীণদের মত এখন  
কার নবীন প্রবীণ অনেকেই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।  
তখনকার পণ্ডিতদের সমাজে বলিতে শুনিয়াছি, ‘গিরিশ-  
চন্দ্রের ও ভাষা ছন্দ, ছন্দই না। সেটে গদ্য লিখিয়া  
তাঁহার চুইকি দুছিয়া দাও, দেখিবে ‘গৈরিশী ছন্দ’  
হইয়াছে।’ কথা আর বাড়াইব না; তখনকার দিনের  
সাহিত্যাত্মিকানী অভিজাতেরা গিরিশচন্দ্রকে যে তাঁহার  
সমাক আদর, সম্যক সম্মান দেন নাই, তাঁহার আর একটা  
দৃষ্টান্ত দিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অতবড় যে সাহিত্য পরিষদ—যাহা বাঙ্গালার জাতীয়  
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান বলিয়া এ সারকুলার রোডে আপনার

ইত্বনির্দিষ্ট বস্তু বিচার করিয়া পুরাতন পুঁথির পক্ষোদ্ধার  
করিতেছে, সেই পরিষদ গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহাকে  
একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই। গিরিশচন্দ্রের  
জীবিতকালে আমরা বহু সাহিত্য সম্মিলন দেখিয়াছি—  
কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন্‌দের বিষয়, লঙ্কার বিষয়—সে সব  
সাহিত্য সম্মিলনে গিরিশচন্দ্র একধানি বেঁধে কুশালও  
পান নাই। হয়নিও বেবার সাহিত্য সম্মিলন হয়,  
আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র, ভূনিয়াছি গিরিশচন্দ্রকে সাহিত্য শাখার  
সভাপতি করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সাহিত্য সম্মিলনের  
হস্তাভ্যাস তাঁহার সে প্রস্তাব অগ্রহোদন করিতে স্তুভাবোধ  
করিয়াছিলেন। বাই হ’ক, গত বৎসরের পূর্ণ বৎসর  
বৈহাটীতে যে সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতেও  
আজিকার পরম শ্রদ্ধাশ্রম সভাপতি মহামহোপাধ্যায়  
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়, গিরিশচন্দ্রের মামুষিয়া  
নাট্যাচার্য্য অমৃতলালকে সাহিত্যশাখার সভাপতিত্বে বরণ  
করিয়া সাহিত্য পরিষদের এই জানকৃত অঙ্গপ্রাণের  
প্রাথমিক করেন। এই সেদিনও—দুঃখের বিষয়—  
আমাদেরই মধ্যে একজন হরপ্রসাদ কথা-সাহিত্যিককে  
টার রকমক হইতে বলিতে শুনিয়াছি :—‘পঞ্চাশ বৎসরের  
মধ্যে বাঙ্গলায়, কথা-সাহিত্যে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে  
বহু উন্নতি দেখিলাম, কিন্তু নাট্য সাহিত্যে কোন উন্নতি  
দেখিলাম না।’ তিনি যদি না দেখেন সে ঘোষ গিরিশ-  
চন্দ্রের কি তাঁহার, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু তাঁহারই  
মত, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর আর একজন সাহিত্য-  
রবীক বলিতে শুনিয়াছিলাম ‘গিরিশচন্দ্র বলিয়া একজন  
ছিলেন ভূনিয়াছি কিন্তু তাঁহার কোন নাটক আমি পড়ি  
নাই।’ অপরূপ দেশ—অপরূপ প্রতিভাও আর! এখনও  
এমন অনেক নবীন আছেন, বাঁধার বলিতে চান গিরিশ-  
চন্দ্র পুরাতন হইয়াছেন; তাঁহার যে ক’টা আসন ছিল,  
নবীপেরা তাহা দখল করিয়া লইয়াছে। তাই দেখি  
মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে পুতুলনাচের বাজীকরের সমপাণ্ডে  
টানিয়া আনিয়া অনেক সূর্য আত্মপ্রদান অহতব করিয়া  
দিতো। কিন্তু মহাদেয়গণ, জিজ্ঞাস্ত এই—সত্যই কি  
তাই? শেক্সপীয়ার কি কখনো পুরাতন হন? ভিক্টর  
হিউগো কি কখনো পুরাতন হন? কালিদাস কি কখনো

পুরাতন হন? প্রকৃত রস সাহিত্যের স্রষ্টা যিনি, তিনি কি  
কখনো পুরাতন হন?

আর এই নূতন ও পুরাতনের স্বার্থের, এই বিবেচ-  
ভাবের কারণও যে কি তাহাও তো বুদ্ধিগুণেই পারি  
না। অনেক প্রাচীন নূতনকে কিছু করিতে দেখিলেই বলিয়া  
থাকেন—“বাপু, তোমরা কাগলের ছেলে, তোমরা কি  
বুঝ,”—আর তরুণেরা পাটো জবাবে ভনাইয়া দেন,  
“তোমরা শুকনো পাতার রাশ,—তোমাদের রসকু নাই  
—তোমরা কথা কহিও না; আমরা সবুজের দল—  
যাহা করি—নিউমিট করিয়া চাহিয়া দেখ।” এই সবুজ  
ও হরিদ্রার ঝগড়া—৪০ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি, সম-  
ভাবেই চলিয়া আসিতেছে; তুল ছুই দলই করিয়া  
আসিতেছেন;—প্রাচীন অর্থাৎ শুক পক্ষ যাহারা—তাঁহারা  
চিরদিনই তুলিয়া আসিতেছেন—যে সবুজকে তিনি আমল  
মিতে চাহেন না,—তাঁহা তাঁহাদেরই ঔরসে জন্মগ্রহণ  
করিয়া তাঁহাদেরকেই বাড়াইয়া রাখিয়াছে; আর সবুজের  
দলও বিবৃত হ’ন যে, ঐ প্রাচীন শুক পক্ষ—করিয়া  
পড়িয়াই রৌদ্রের উত্তাপে, বর্ষার জলে,—আপনাকে

শুকাইয়া পড়াইয়াই তাহারই জীর্ণ অস্থির সারে সবুজের  
অল্পরোদনের কারণ হইয়াছে।

কিন্তু দিন বয়লাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কালের  
কট্টপাথরে বসিয়া যশিয়া, নানা বিশেষপূর্ণ সমালোচনার  
মধ্যে বিরুদ্ধবাদীরা গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকেই উজ্জ্বল  
করিয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন—তাই ৪০:৪০ বৎসরের  
পূর্বের “নোটো গিরিশ” আজ মহাকবি গিরিশচন্দ্র!  
তাই, আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখিতেছি—অন্যদের  
ভদ্রর কটকবেটনীকে তুচ্ছ করিয়া কি ভাবে ঐ বিরাট  
মহীকহ তাহার মতক উত্তোলন করিয়া পাড়াইয়াছে!  
আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার নাটক পঠিত হয়।  
তাই দেখিতেছি—

“Those who came to scoff, remained to pray!”  
কিন্তু ইহাতেও আশ্চর্য্যবৃত্ত জ্ঞাতের প্রায়চিত্তের  
শেষ হয় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিজের মৃত্যি নিজে  
প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেও আমাদের কর্তব্য এখনো বাকী  
আছে। তাঁহার মর্ম্মরমুষ্টি নির্মিত হইয়াছে, তাঁহার নামে  
‘পার্ক’ হইয়াছে—কিন্তু সে মর্ম্মরমুষ্টি প্রতিষ্ঠার উত্তোপ  
কই?

## গিরিশচন্দ্র

### ক্রীশলেন্স চৌধুরী

স্মিগি সর্বট ভেদ করি ওগো বহালে রস-গঙ্গা!  
স্মীতিরে ভাঙ্গিয়া দানিলে গো তুমি নাট্যকারের সংজ্ঞা।  
শক্তিমানী গো মান অগমান বিকল না দেখিলে চাহিগো!  
চও-রশ্মি কিরণে আজিকে যার, স্কন্ধ নিম্মা দহি গো।  
নট-গুরু, কবি, নটচর্য্যায় জীবন করিলে গান।  
জীবিত-মানব, সহি সব ওগো দেশকে দানিলে মান।  
স্নোষক, পালক, পিতা তুমি ওগো, স্থাপক আলয় রস।  
স্বপ্নও তুমি স্বর্গে, তোমা নতি করে আজ বস!





### শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

#### প্রবন্ধ

এবার বিপিন আদেশ প্রচার করিল যে, যে গাড়ীতে আসিয়াছে তাহাকে সেই গাড়ী করিয়া ফিরিতে হইবে। উমেশ বা লতিকা বিপিনের এই অনর্থক হুকুমের কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না। ধীরে ধীরে গরুরগাড়ী চলিতে শুরু করিল। উমেশ যে মহাশা ও সমীরকে পাঠাডের উপর হইতে নামিতে দেখিয়াছে, সেখান সে কিছু প্রকাশ করিল না। সে মনে করিল প্রবোধ নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবে, চুপ করিয়া আছে কেবল আমি কিছু বলি কিনা দেখিবার জ্ঞ। লতিকা নিশ্চয় দেখে নাই। সেদিনে গাড়ী থামাইয়া মহম্মার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোন মতেই সে বাড়ী ফিরিবার মেয়ে নয়।

গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইলে উমেশ বলিল, "সত্যই আজকার দিনটা বড়ই আনন্দে কাটিল। মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা অভিব্যক্তি, একঘেয়ে জীবনে নবীনত্ব ও উৎসাহ এনে দেয়। এবার আর একটা স্মিক যোগ্যতার ব্যবস্থা করা যাবে কি বল বে? তুমি যে দেখছি ছুটা পরগোশ শিকার করে ইপিথে গিয়েছ। মুখে কথা নেই?"

প্রবোধ হো হো করিয়া এমন জোরে হাসিয়া উঠিল,

যে পশ্চাত্তরে গাড়ী হইতে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? বিনা মেয়ে বহুযাত্র কেন?"

উমেশ বলিল, "আমার উত্তর শোনবার ভয়ে বাবু মনে করেছেন, একচোট জোরে হেসে আমার কথাটা চাপা দেবেন। তা' হচ্ছে না বন্ধু, তা' হচ্ছে না। তুমি যে কেন 'মিইবে' গেছো তা জানতে আর আমার বাকী নেই। তাবলি অকথ্য। সত্যিই খাচার পাখীটা ঝাঁক দিয়ে উড়ে গেল। এমন ভাবনা অনেকেই ভাবে, তুমি মনে করো না, একাজ তুমি আজ একা নৃতন করছ।"

কথাগুলি উমেশ হাসিতে হাসিতে বেশ জোরে গলায় রসাল করিয়া বলিয়াছিল। হুতরাং বিপিন ও লতিকা গরুরগাড়ীর ক্যাম্ব কোচ শব্দের মধ্যে ও প্লষ্ট তনিত পাইল। লতিকা উমেশ-দার কটাক্ষ বুঝিতে পারিল; কিন্তু উমেশের খাচার পাখীর ইঙ্গিত বিপিন ধরিতে পারিল না। হুতরাং সে কোন জবাব দিবার পথ পরিকার না দেখিয়া বিমূঢ়ের মত লতিকার মুখের প্রতি জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে ভুগু চাহিয়া রহিল। লতিকা যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। মনে মনে বিপিনের বিপর ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল।

প্রবোধ কথাটা চাপা দিবার উদ্দেশে বলিল, "কি

বিপিন তুমি যে একবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেলে দেখছি। খাচার পাখীর আশঙ্কা কি তোমারও আছে?"

প্রবোধের প্রশ্নে বিপিন এবার আরো মুস্থিলে পড়িল। কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, "আশঙ্কা জিনিষটা হচ্ছে (Common) সাধারণ স্বতরাং না থাকবার তো কোন কারণ দেখি না।"

বিপিন বাহা ভারিয়া উত্তর দিক, লতিকা কিন্তু দেখিল, বিপিন মিথ্যা কথা বলে নাই, সে তার নিজের ব্যথার উপর হাত দিয়েই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

প্রবোধ বলিল, "আশঙ্কা জিনিষটা খুবই সাধারণ, তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির।"

উমেশ বলিল, "ধনুবাণ ব্যাখ্যাকার। মহাশয়ের আপনা কোন জাতীয়? জাগরণ না, বেদে, না খুঁটান।"

লতিকা উমেশের কথায় মনে মনে খেপেই রসাত্তভব করিতেছিল। বিপিন কি উত্তর দেয় তনিবার জ্ঞত সে উদ্গ্রীব হইল। কিন্তু বিপিন কোন কথা বলিল না, নীরবে বসিয়া রহিল।

প্রবোধ বলিল, "দেখ উমেশ-দা, তুমি যা নিয়ে বিক্রপ করছ, তাতে আমার বা কারও কোন ক্ষতি বুঝি নাই। কিন্তু খাচার পাখি যে খইচ্ছায় উড়েছে একখাটা আমার কেন বিবাস হয় না? নিশ্চয় কেউ তাকে উড়িয়ে দিয়েছে।"

উমেশ বলিল, "আজকাল গীতার প্রচার যেমন একদিকে খুব বেড়ে গেছে, অতদিকে তেমনি নিকাম-ধর্ম ও কর্ম পাশ্চাত্ত মেলের মত জুটগতিতে ছুটে চলেছে। নইলে, যাতে তোমার কোন প্রকার ক্ষতি বুঝি নাই, তেমন সমস্যাটার উপর এতখানি আগ্রহ, এতখানি আশঙ্কা, কেবল গীতার নিকাম-ধর্ম প্রচার মাত্র, তা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। নইলে অকারণ বিবাস অবিবাস তোমার মনের দরবারে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে বসত না।"

প্রবোধ বলিল, "উমেশ-দা, তর্কে বহুদূর?"

"স্টো তোমার—আমার, না উড়ো পাখীটার না, সেই বেদে ব্যাটার; তা ঠিক করে ভবে দেখেছ কি?"

এই সময় লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ উমেশ-দা, আমরা আসবার সময় ত মহম্মার ঘর খালি পড়ে আছে দেখে এলাম। তারা যে কেউ আছে এমন ধারা কোন লক্ষণ ত দেখা গেল না।"

প্রবোধ বলিল, "বগি কেহ থাকত, তা'হলে বন্দুকের আগুয়ান পাবার মাত্র কেউ না কেউ ছুটে বেরিয়ে আসত।"

উমেশ বলিল, "চ'লে গেলে কুড়ি ভেঙে নিয়ে যেতো। তখন হয়ত কোথাও গিয়েছিল। সেজ্ঞত দেখতে পাওয়া যায়নি।"

লতিকা বলিল, "মহম্মার দায়ুর ইচ্ছা নয় যে এখানে তারা থাকে। মহম্মার কিন্তু খুব ইচ্ছা এখানে আমাদের সঙ্গে মেলে মেশে।"

এই সময় দুইখানি গাড়ী পাশ পাশ চলিতেছিল। তখন হৃদ্যদের পশ্চিম গণপথপ্রান্তে অন্তর্মিত হইয়াছেন। তার হৃদ্য-জোড়ি কাল মেঘের অন্তরায় হইতে এক অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল। সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে ধরগীবন্ধে আদিবার জ্ঞত আয়োজন করিতেছিলেন। সহসা দিবস সন্ধ্যাকে অপূর্ণ আলিঙ্গনে আশ্রয়-সমার্পণ করিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

উমেশ বলিল, "তোমরা যা ভাবছ তা' নয়। তাহারা এখানেই আছে। কোথাও যাবনি।"

প্রবোধ তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি কেমন ক'রে জানলে?"

উমেশ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি আজ তাদের দেখেছি।"

প্রবোধকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর মাত্র না দিয়া লতিকা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি উমেশ-দা। আজ আপনি মহম্মাকে কি দেখেছেন?"

উমেশ অল্প হাসিয়া বলিল, "দেখছি, ভাই বোনের মহম্মার গুণের সমান টান। তাকে আর বেদে থাকতে দিবেনা দেখছি।"

প্রবোধ বলিল, "তুমি কি তাকে একলাই দেখতে গেলে, আর আমার সব অঙ্গ হয়ে রইলাম।"



“তোমরা যদি দেখতে না পাও তাহলে এমন কোন কথা নেই, যে পৃথিবী স্বত্ব লোক তোমাদের মত অন্ধ হ’য়ে থাকতে হবে। আমি বলছি তাদের দুঃগনকে দেখতে পেরেছি। তবে যদি আমার এই বড় বড় চতুষ্ককে অবিশ্বাস করতে বল, তাহলে নাচার।”

লতিকা অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে বলিল, “উমেশ-না আমি ত কোন দিন তোমার কথার অবিশ্বাস করিনি, তবে কেন একথা বলছ। যাবার সময় বৃত্তি ঘরের ভিতর ছিল। আমাদের হাঙ্গামা দেখে বোধ হয় বাইরে আসেনি?”

উমেশ বলিল, “না, সেখানে সত্যই তারা ছিল না।”

“তবে কোথায় দেখলেন?”

“আমরা যখন বাড়ী ফিরবার জন্ত গাড়ীতে উঠছিলাম, তখন—সহসা আমার দৃষ্টি পড়ল পাহাড়ের দিকে। দেখি মহা আর তার দাড় ছুঁকেন পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে।”

লতিকা অত্যন্ত বিশ্বাসহংকারে জিজ্ঞাসা করিল, “বল

কি উমেশ-না। তাহলে আমরা যে পাহাড়ে ছিলাম, তারাও সেই পাহাড়ের ওপর ছিল বল?”

“তাই ত দেখছি, জানি না তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল। আমি দেখতে পেয়ে মনে করেছিলাম তোমাদের দেখার। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যা হ’য়ে আসছে, বিদেশ, তার ওপর সন্ধ্যার লোকটার মনে নিশ্চয়ই কিছু ছিল নইলে সে আমাদের সঙ্গ নেবে কেন? আমার মনে মনে ভয় হ’লো তাই তোমাদের কিছু না বলে তড়াতাড়ি গাড়ী ছেড়ে দিলাম।”

প্রবোধ বলিল, “সাধ করে কি আর বন্দুক এনেছি? উমেশ-না তুমি যদি একবার আমাকে বলতে, তাহলে এক গুলিতে মাঝাড়।”

লতিকা প্রবোধের কথার মহা আপত্তি করিয়া বলিল, “তোমার ঐ এক কথা! তাদের কি কোন কাজ খাবতে নেই। তারা হ’লো বেলে। পাহাড়ই হ’লো তাদের আড়া।”

(কম্বাঃ)

## কামিনী

শ্রীশচন্দ্রানন্দ ঠাকুর

ওগো ললনা

কোন হস্তাশনে আহুতি দিয়াছ

বলনা!

কোন যজ্ঞের বিকৃতি মাখিয়া

এসেছো চপল চরণে বাকিয়া

কামিনী,

লোহিত নয়নে, জাগিয়াছ কত

যামিনী?

সারা কপালে

দাগ দিয়া গেছে লেলিহান শিখা,

অবলে!

সরসের হালী করিয়াছ খালি,

কোন বেরী তলে দেহে দিলে জালি

অরুণি?

কি ফল পেয়েছ, বল হলে কার

যরণী?

ওগো ললনা,

কেন ব্যথাযুগ্ম? কে গিয়াছে কবি

ছলনা?

সকল আহুতি যখন কি সখি?

জলেনি অরুণি? গিয়াছে চমকি

যামিনী?

অশনি আহতা তাই কাদি মর

কামিনী?



নটর গিরিশচন্দ্রের চতুর্দশ বার্ষিক জন্মদিবার শব্দবর্ণন হইয়া গিয়াছে। মানুষী বক্তৃতাও যথেষ্ট শুনা গিয়াছে, এমন কি জন্মদিবার মধ্যে কবির বিশ্বমঙ্গল হইতে একটি অশুকী হাস্যোদীপক আরতিও আমরা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তদুপরী বীরসরের ভাবাবিব্যক্তি সম্বলিত একটি বক্তৃতাও শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী দিয়াছিলেন। আবার তন্মধ্যে মিনার্ভার ‘আম-দর্শনের’ বেশ একটা লগ্না প্রশংসাপত্রও ছিল। সেইটাই হইয়াছিল সবচেয়ে উপাদেয়—কারণ সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বক্তুর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। উপসংহারে এইরাজ শুনিয়াছি যে গিরিশ পার্কে শীত্রই বঙ্গের গ্যারিক গিরিশচন্দ্রের মঞ্চর মুক্তি স্থাপিত হইবে। হইলেই ভাল কারণ কর্তাদের চতুর্দশবর্ষ ব্যাপী দীর্ঘস্বভাবতার পর যদি কিছু কাজ হয় সেটা অনেকটা সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তারা ডেক্সাল খাচ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্ত কোমর বাঁধিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। খাচ পত্রীকদের মধ্যে কেহ কেহ খাবারের ফেরিওলাদের নাম ধাম রেজেক্ট করাইবার জন্ত আইন প্রবর্তন করিতে বলিয়াছেন। প্রস্তাব অবশ্য সাধু; কিন্তু আইন হইলেই যে বিভক্ত খাচ খাওয়া যাইবে তাহার যাবীক কে লইবেন? ডেক্সাল দুই, তৃত ও তৈলাদি বিক্রয়ের সম্বন্ধে আইন আছে কিন্তু তাহাতে সাধারণের কি উপকার হইতেছে? কলিকাতায় ঘৃত, তৈল ও দুগ্ধ বাহা বিক্রয় হয় তাহার পনের আনা তিন পাই রকমই ডেক্সাল—আইনে কি তাহা বিস্মৃদ্ধ করা হইতে পারিয়াছে। আইনে কেবল ঘৃণা লইবার রাস্তা তৈয়ার করে—আইনে পাপ বা দোষ দমন করিতে পারে না; তা যদি পারিত তাহা হইলে কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক বোকাইনে ডেক্সাল জিনিস বিক্রয় হইত না। যদি এইরূপ কোন আইন পাশ হয়

তাহা হইলে ঘৃণার রাস্তা আরও প্রশস্ত হইবে নাজ। কাবলীমর্দ, পাপর ভাঙ্গা প্রভৃতি বাহারা বেচিয়া বেড়ায় তাহাদের কাছ হইতেও পত্রীকদের পান বাইবার জন্ত কিছু পাইবেন আর কর্পোরেশনও আইন বাবদ কিছু জরিমানা পাইবেন—তাহাতে সহরবাসীর কি হুবিহা হইবে? আমরা জানিতে চাই যে জরিমানা আদায় করা ছাড়া আর কোন উপকার—কর্পোরেশনের কর্তারা দেখাইতে পারিবেন কি না?

আমালতের অবমাননা সম্বন্ধীয় আইনটা ভোটাধিক্যে পাশ হইয়াছে। স্বতন্ত্রদের মুকলিগণ ইহাতে বিশেষ দোষ দেখিতে পান নাট, কারণ আমলকাল স্বতন্ত্র ও নরম-পয়গীণের মত অনেকটা মিলিত হইয়া আসিতেছে। স্বরাঙ্গীর্ণগণও ইহাতে খুব গরমাজী নহেন—তাহারাও এই বিলের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টাই করেন নাই। বাঙ্গালার তার আদায় রহিমের বিরুদ্ধে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান না করা ইয়া স্বরাঙ্গীর্ণদের কর্তারা যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার পর পুনরায় এইরূপ একটি দেশবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধ বিলের প্রতিবাদ না করিয়া তাহারা যে দিন দিন হীনবল ও অস্বাধীন হইতেছেন তাহা ই বুঝা যাইতেছে। এরপরও কি তাহার দেশবাসীর নিকট কাউলিল বা কর্পোরেশনের দখল করিবার জন্ত সাহায্য আশা করেন? দেশবন্ধুর মহা-প্রাণের পর স্বরাঙ্গীর্ণ নিজে দোষে কম্বাশই যে অন্যসাধারণের সাহায্যের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রাউলপিণ্ডির জেলাজজ ও ডেপুটি কমিশনার সাহেব সম্মতি একটি মোকদ্দমার কাগজপত্র সরাইয়া আমলতের ঘেঁরুপ অবমাননা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে সংবাদ-



পক্ষে সহৃদয়তা লিপিত কোন মন্তব্যই তেমন ইচ্ছাকৃত অবমাননা-সূচক নহে। সাহোদর হাইকোর্টের জাষ্টিস কিরাডে এ সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই আশ্চর্যজনক। তবে এ সকল অপরাধী 'ট্রাল স্কেমের' অংশ স্বরণ বলিয়াই বোধহয়—সহজে পার পাইয়া যায় নতুবা ব্যাপার কোথায় গিয়া ধাঁড়াইত তাহা অস্বাভাবিক বলা কঠিন নহে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্তা সম্বন্ধে বড়লাট রেভিং মোহোদ এসেখলীর সভাপতিগণের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও লাল লালপতরায়েক নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় সহযোগী সার্ভেট মহাকিঞ্চ হইয়া উঠিয়াছেন। সহযোগী স্বরাষ্ট্রবিভাগের সকল কার্যেরই নিষ্পত্তি করিয়া যে বিবদ আশ্রয়প্রাপ্ত লাভ করেন তাহা আর গোপন নাই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভেটুশটশনের মনোভাব যখন এইরূপ আচরণের অস্বাভাবিক এবং কেবল বাস্তব তাহার তীব্রপ্রতিবাদ করিয়া যখন কোন স্থল পাইবার আশা নাই তখন এরূপ কার্যে আমরা বিশেষ নিশ্চিন্ত কিছু দেখি না।

ভারতীয় নৌবাহিনী বাপনা করিবার আভাস লর্ড রেভিং দিচ্ছেন; এ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের লহ-যোগিতা আবশ্যক। হযত এখন প্রথম অতি নিম্নতম পদে ভারতবাসীগণকে নিযুক্ত হইতে হইবে তথাপিও ইহা অনেকটা আশ্রয় বলিয়া মনে হয় কারণ তথ্যজ্ঞে বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ব্যক্তিগণ এই ক্ষুদ্র পথের সাহায্যে উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিবেন। এ হযোগ উপেক্ষা করিবার নয়—এবং বাহাতে এই উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হয় তজ্জন প্রত্যেক ভারতবাসীর সচেষ্ট হওয়া উচিত।

মাননী ও মর্যাদাপূর্ণ মায় সাখা মহারাজ জগদীশনাথ রায়ের স্মৃতি-পুস্তা সংস্করণে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহাতে স্বীকৃত রবীন্দ্রনাথ হইতে বাঙ্গালার সমস্ত রুচী সাহিত্যিকবৃন্দ—মহারাজের উদ্দেশ্যে স্মৃতি-পুস্তাগুলি প্রদান করিয়াছেন। নাট্যের মহারাজের ভবন ও শিবমন্দির প্রভৃতি শতাধিক চিত্রে এই সংখ্যা বিস্তৃত হইয়াছে। অর্ধশতাব্দীর রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজের গুণাবলী সর্বজন বিদিত। আমরা আশা করি তাঁহার স্মৃতিপুত্র এই সংখ্যাখানি দেশবাসীগণের নিকট সম্যক আদৃত হইবে।

আমেরিকার ডাক্তার ক্রক জর আরোগ্যের একটি অতি সহজ অথচ অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিছু পরিমাণ ঔষধক লবণ একটা নুতন পাত্রে, কাঠের আগুনে উত্তমরূপে ভাজিয়া বা সেকিয়া জলের বিরাম অবস্থায় গরম জলের সহিত পাইতে হয়। ঔষধ সেবনের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর বা অপর কোন আহার্য্য গ্রহণ করা একেবারে নিষেধ। অতি শোচনীয় রকমের ম্যালেরিয়া রোগী নাকি এই ঔষধে নিরাময় হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার পরীক্ষা হওয়া উচিত। ডাক্তার ক্রক নাকি বলিয়াছেন ইহা ফুইনাইন অপেক্ষা সহজও শ্রেষ্ঠ।

'ভেলিমেল' প্রচার করিয়াছেন গত বায়ের আরম্ভ-স্থানান্তে জানা গিয়াছে, যে জাপানের লোকসাখ্য বৎসরে সাড়ে সাত লক্ষ হিসাবে বাড়িয়া যাইতেছে। কোয়ান্টা এবং অপর কয়েকটা সীমান্তগত স্থান ভিন্ন জাপানের মোট জনসাখ্য ছয় কোটি। প্রতি বর্ষমাইলে চারিশত লোক বাস করে। জাপানের প্রায় অর্ধেক স্থান পর্বত ও হ্রদে সমাচ্ছন্ন। কৃষি ও শ্রমশিল্পে প্রতি বর্গমাইলে ১২০ জনের মাত্র সংখ্যা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনসাখ্য বৃদ্ধিতে দুর্নিবাগ জাপানের পক্ষে একটি সমস্তা স্বরণ হইয়া ধাঁড়াইয়াছে। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে জাপানী রূপকদের আবাদ করিবার আশা নাই। সাইবেরিয়া, মালুরিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এখনও তাহারা চাষের জমি পাইতে পারে।



রবীন্দ্রনাথ গদ্য

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চলন

## সত্যের পরীক্ষা

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমার বয়স বোলা বৎসর। আমার পিতা নানী-থা রোগে সে সময় শয্যাশায়ী ছিলেন। মায়ের সহিত মিলিয়া আমি তাঁহার পরিচর্যা করিতাম। আমাকে তাঁহার কত খোঁচ করিয়া ঔষধ দিতে হইত এবং কখন কখন ঔষধ বাড়ীতেও প্রস্তুত করিতে হইত। প্রতিদিন রাতে আমি তাঁহার পা টিপিয়া দিতাম। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে অথবা বিশ্রাম করিতে বলিলে আমি হুইতে যাইতাম। এ সকল কাজ আমার বড়ই প্রিয় ছিল। দিবা রাত্রির সমস্ত সময় আমি আমার লেখাপড়া এবং পিতার সেবা, যাপন করিতাম। তিনি কোনদিন হুই থাকিলে অথবা অস্বস্তি করিলে আমি সান্না-দ্রমে যাইতাম।

এই সময়ে আমার ঋঁর সন্তান সন্তান্য হইয়াছিল। ইহা যে আমার পক্ষে তখন কতবড় লজ্জার বিষয় হইয়াছিল, তাহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। আমি তখনও ছাত্র। ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য ব্রতচর্যা রক্ষা করিতে পারি নাই। ইহা ভিন্ন বাসনা অন্তরঙ্গপে আমার সর্বনাশ করিয়াছিল। ইহার জরাজীর্ণ বৃষ্টি—আমি পিতামাতার প্রতি অনেক কর্তব্যের অবহেলা করিয়াছিলাম। রাতে পিতার পা টিপিতে বলিলেও আমার মন সর্বদাই শমন গৃহে পড়িয়া থাকিত। এমন অশময়ে বাসনার উদ্বেগ, চিন্তাশাশ্রব বা মাংসের সান্নাধ্য বৃত্তিতেও অস্বপ্নান করে না। প্রতি মাসের পক্ষেই ইহা দারুণ লজ্জা ও অসংযমের পরিচয়। পিতার পা টিপিতে টিপিতে আমি শয়ন গৃহে বাইবার জন্ত

বাস্ত হইতাম। ইহাতে যে পিতার সেবায় অবহেলা হইবে, সে কথা আমার মনে হইত না। পিতার অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হইতেছিল। আয়ুর্ষেদ, হাকিমী, হানীরা হাতুড়োগণের চিকিৎসা এবং বিলাতি শাস্ত্রের চিকিৎসাও তেমন কিছু উপকার হয় নাই। শেষে শরক্রিয়া ক্রমান্বয়ে স্থির হইল। কিন্তু আমাদের গৃহ-চিকিৎসক, এত অধিক বয়সে শরোগ্রাচীর বিপজ্জনক বলিয়া তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি সে সময়ের একজন বিজ্ঞ ও হুচিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার উপদেশে শরক্রিয়ার সক্ষম পরিভাগ করিয়া নানারূপ ঔষধের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল শরক্রিয়া হইলে রোগ আরোগ্য হইয়া পিতা বাঁচিয়া যাইতাম। ভগবানের অভিপ্রায় অন্তরঙ্গ। তাঁহার বিধান তার সাধ্য উল্লেখন করে।—ইহাই যে পিতার মৃত্যুর উপলক্ষ্যরূপে অব্যাহিত হইয়াছে—কে তাহা অস্বাভাবিক করিতে পারিয়াছিল? পিতা দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, অবশেষে—যদিও তাঁহার রহিল না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও বিস্তৃতজ্ঞান তাঁহার অধিক পরিমাণেই ছিল। শেষ দিন পর্যন্তও তিনি মলমূত্র পরিভাগ করিতে শয্যাভাঙের জন্ত বেঁধে রাখিয়াছিলেন।

এইবার সেই রাত্রির কথা বলিব, যে রাতে পিতা আমাদের ত্যাগ করিয়া অনন্তলাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, আমার নিকটে তাহা তিরস্করণীয় হইয়া রহিয়াছে।



আমার কাকা যে সময় রাঙ্ককোট ছিলেন। অস্পষ্টরূপে মনে পড়িতেছে জাতার পীড়ার সংবাদে বিচলিত হইয়া তিনি বাড়ীতে আসেন। তাঁহাদের জাতার প্রতি জাতার যে নিবিড় টান ছিল, তাহা দস্তারের দেখিতে পাই না। কাকা সকলকে বিশ্রামের অবসর দিয়া অবিশ্রান্তভাবে দিবারাত্রি—পিতার পরিচর্যা করিতেন। সেদিন রাত্রি এগারটার সময় কাকা আমাকে ভুইতে বাইতে বলিলেন। আমি পিতার পদসেবা করিতেছিলাম, আনন্দের সহিত মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া—সরাসর শব্দগুহের দিকে চলিলাম। আমার পত্নী নিম্নাভিভূতা হইয়াছিল, তাহাকে জাগাইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভূতা আসিয়া জানাইল, পিতৃদেব আর নাই।

আমি পিতার কক্ষের দিকে ছুটিয়া গেলাম। শেষ সময়ে আমি যে তাঁহার পদসেবা করিতে পাইলাম না—একতর আমায় স্বপ্নে দারুণ বস্মা হইতে লাগিল। কাকাই

ধৃত—জাতার গভীর স্নেহপূর্ণ নিবিড় বাহুরেই জাতা দেহতাগ করিয়াছেন। এ দৃশ্য বড়ই মহান! আমি যদি বাসনায অধীর না হইতাম তাহা হইলে সে সময় কখনই পিতার পদপাশ পরিত্যাগ করিয়া শয়নগৃহে বাইতে চাহিতাম না। ইহা যে আমার পক্ষে একান্ত পাণের, অসংখ্যের এবং নৈতিক অবনতির পরিচায়ক হইয়াছিল তাহা আমি অস্বপ্নভাবে সর্বদা স্বীকার করিব। এই ঘটনায় অল্পতপ হইয়া আমার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। এ বিষয়ে আমি সংযত, পরিমিত ও উদার হইতে পারিছিলাম।

যথা সময়ে আমার স্ত্রী সন্তান গ্রহণ করেন; কিন্তু তিন চার দিনের অধিক সে অজাগা ধরণীর আলোক দেখিতে পায় নাই। আমি আশা করি আমার দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা হইতে সকল বিবাহিত দম্পতী শিক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

## পুস্তক সমালোচনা

**ভক্তিশ্রী—**নবরত্নের মহারাণী যুগাক দেবী কর্তৃক তাঁহার পুত্রগোপাল পিতৃদেব ব্রহ্মানন্দ দেশবাস্তব সেন মহোদয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। গ্রন্থখানিতে নববিধানা-চার্য দেশবাস্তবের বায়্যাবিবরণ করেকখানি স্বরচিত চিত্র আছে। চিত্রগুলি মহারাণীর স্বহস্তে অঙ্কিত বলিয়াই বোধ হয়, কারণ মহারাণী নিজে একজন উচ্চশ্রেণীর চিত্রশিল্পী। যদিও তিনি কেবল খোস খোয়ালেই এই স্বকৃত্যের শিল্পের চর্চা করেন; তথাপি তাঁহার তুলিকার

ফল সাধারণ শ্রেণীর নহে। ছবিগুলির ছাপা ও কাগজ যে খুব উচ্চশ্রেণীর হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে বাধাইটী তেমন পরিপাটী হয় নাই, সেটা অবশ্য আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ বিপুল অর্থব্যয় করিয়াও মহারাণী পুস্তকখানিকে দাফতাবীর অন্ত্যচার হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পুস্তকখানি উপহার পাইয়া আমরা মহারাণীকে আন্তরিক ধন্যবার জ্ঞাপন করিতেছি।

চলিতকা লিঙ্গ মাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র

১৮/এম, ট্যামার পেন, কলকাতা-৭০০০০৯



বিতায় বর্ষ ] ০২ ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩০২, ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ [ ২৭শ সংখ্যা ]

## নবযুগের আহ্বান

### প্রীতগোপাল মিত্র

এস	স্বপ্ন পথের মাত্র, সার গৃহ কাল, লও পথ সাধ, যন্যয়ে এসেছে রাত্রি। পড়িয়া গিয়াছে যাত্রার সাড়া, তবু ভয়ে আছা ? ওরে সব-হারা, দিনের আলোক চ'লে যাবে এল ভাঙ্কিছে বিধ খাতি—	ভেঙ্গে দাও সব বাধা হীনতার, মিলনের পরে চির আনন্দ, লভিবে অসীম শান্তি; এস মিলনের নবপরি ! ৪ এস নিখিল বিশ্বধর্মি, মরমে মরমে মিলে যাও ওগো এস গো কে আহ মশী। সাহিত্যে হইবে মহান বর্ধ, নাহি ভেদভেদ জাতি বা ধর্ম, সমীচের মাঝে অসীমের কাজ তুমি যে তাহার কর্মী, এস নিখিল বিশ্ব-ধর্মি ! ৫ এস মিলন-তীর্থ-মাত্রি, যাত্রার দিন বাগে গেল ওগো, আসিছে তামসী রাত্রি। অনেক দেখেছ, অনেক শ'য়েছ, পথ তুলে গিয়ে তিমিরে র'য়েছ; এবার এসেছে উজল আলোক, ভর্মিছে মোক্ষমাত্রা। এস মিলনের নবপরি ! ৬ এস মিলনের নবপরি ! মহা মিলনের উজ্জ্বল বাজাও তুলে যাও বুধা জাতি। মিলনের নদে এসেছে জোয়ার
----	--	---



## মোসলমানের বাংলা সাহিত্য

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

সংপ্রতি সংবাদপত্রে পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, আমাদের যুবক কবী সন্তানরা আবার কৰ্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন এবং মৃত-প্রায় "বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সমিতি"কে খাড়াইয়া তুলিয়া, শক্তিশালী করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। এ সংবাদ আমার পক্ষে যে কত বড় উৎসাহ ও আনন্দদায়ক, সে কথা অপর বুদ্ধিবে না; কেন বুদ্ধিবে না তাহা বলিতেছি।

অতীত যুগের এক স্বর্ণযুগ সন্ধানর কথা মনে পড়ে। সেদিন আমরা জন-বন্ধ্যের লোক কলিকাতায় আটনি-বাগান লেনে বন্ধুর শ্রীকৃষ্ণ মৌলবী আশ্বর রহমান খান সাহেবের বৈঠকখানায় বসিয়া, "বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সমিতি"র প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, সেই ঐতিহাসিক সভায়, বাঙ্গালী মোসলমানদিগের সাহিত্য-ওষ্ঠা স্খীয় নীর মোশাহর হোসেন, আশ্বক, সাহিত্য কবিবর দাদ আলী, সাহিত্য-রত্ন মুনশী আশ্বর রহিম, সাহিত্যচাৰ্য্য মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, মৌলবী মুজিব রহমান, মৌলবী সৈয়দ আব্দুল হুসুফ রহীম, মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আমিন উদ্দিন, মৌলবী আশ্বর রহমান খান, মুনশী মোহাম্মদ হক কাব্য-কর্তা, মুনশী রওশন আলী চৌধুরী, মৌলবী মণির-উল্লাহ, মুনশী মোহাম্মদ রেজা উদ্দিন আহমদ, মৌলবী মদেন উদ্দিন হোসেন ও ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী (আমি) প্রভৃতি প্রায় ২০ জন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, প্রকৃতি নির্ধারিত হইয়াছিলেন; যদিও আমি সমিতির স্হরকারী সম্পাদক নির্ধারিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আফিসের সম্পূর্ণ কার্যভারই আমার উপর তত ছিল।

যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম "বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সমিতির বর্তমান কর্তৃপক্ষ সে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করিয়াছেন কিনা জানি না। তখনকার উদ্দেশ্যাবলী মধ্যে ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

যে, "সাহিত্যের ভিতর দিয়া এলামের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে এবং এলামের ভিতর দিয়া সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।" কিন্তু সভা কথা বলিত কি, তখন আমরা কেহই জানিলাম না যে, আমাদের এই প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, এলামের বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং এলামের ভিতর দিয়া সাহিত্যকে গড়িয়া তোলার বহু চেষ্টা আমাদের পূর্বপুরুষেরা করিয়া গিয়াছেন।

বটুতলার পুঁথি সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা, বাংলায় এলামের বৈশিষ্ট্য রক্ষা, যে ভাবে ও যে পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন ধরষই তখন আমরা রাখিতাম না। এমন কি "পুঁথি" এই নামটি তুলিলেই ঘৃণা ভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের জ্ঞান, আভ্যুদিশত বংশধরের চেষ্টায়, দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বিরাট সাহিত্য সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; সভ্যতা তাহার তুলনা নাই।

যখন "বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সমিতি" প্রথমে স্থাপিত হয়, সেই সময় কোন এক দিন আমার "বেশেষতী ওয়ালেদ" য়নাব মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী মরহুম মানুফুর কেরলার সহিত আমার এই সাহিত্য-বলিষ্ঠ সখ্যে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি আমাকে সমীচীনভাবে, "তোমরা নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিও না, পুরাতনের আদর্শে কৰ্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইও। বটুতলার বাজারে সবই আছে। সেই বুনিনাদের উপর তোমরা সাহিত্য সৌধ রচনা করিও। নূতন বুনিনাদ কিছু করিলে, মোসলমানদের জ্ঞান তাহা উপগুচ্ছ হইবে না, মোসলমানদের ধাতুতে তাহা গাথ থাকিবে না।" তাহার এ কথা তখন আমার ভাল লাগে নাই। কিন্তু এখন বুঝিছি যে, সে যুগের সাহিত্যিকরা আভ্যুদিশত বংশধরের চেষ্টায় যাঁহা করিয়াছিলেন, আমরা সহস্র বংশধরও তাহার এক চতুর্থাংশ করিতে পারিব না।

[ দ্বিতীয় বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা ]

মোসলমানের বাংলা সাহিত্য

৮০৭

বঙ্গীয় পিতৃদেবের কথা কখন আমার ভাল না লাগিলেও, তাহার কথা মত কাব্য করিয়া, তাহার কথা সত্যতার যাচাই করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, এবং গত ১৩২০ সালে আমি প্রথম "পুঁথি" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। গত ১৩২০, ১৩২১ এবং ১৩২২ এই তিন বৎসর কাল পুঁথি সংগ্রহ এবং পুঁথি পাঠ করিয়া, বিগত ১৩২৩ বৎসরে যশোর শহরের নবাব বকরী সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখায়, "মুসলমান ও বকরী সাহিত্য" ইতি শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ১৩২৩ সালে যখন আমি উক্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম, তখন পর্যন্ত আমি অহুস্মানে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভিন্ন ভিন্ন মোসলমান কবি "মোসলমানী বাংলা ভাষায়" মোট ৮০২২ বাণি পুস্তক রচনা করিয়া বংশী হইয়া গিয়াছেন ও ভবিষ্যত বংশধরদিগের জ্ঞান, অতুলনীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সেই সময় অহুস্মানের ফলে আমি আরও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, উক্ত ৮০২২ সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে ৪৪৪৬ বাণি পুস্তক মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের বাজারে বিক্রয় হইতেছে। ২০৮২ বাণি পুস্তকের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ১৭৬ বাণি পুস্তক স্বাধিকারী দিগের মধ্যে আত্ম কলহের ফলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় না এবং ১০২ বাণি গ্রন্থের প্রচার পর্বেষ্টের আইনানুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যশোর বকরী সাহিত্য সম্মেলনে আমার প্রবন্ধ পঠিত হওয়ার পর, এটিকে বকরী সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যদিগের দৃষ্টি পতিত হয় এবং সাহিত্য পরিষদের কাৰ্য্য নির্বাহক সমিতি মোসলমানী বাংলা সাহিত্যের পুঁথি ও ইতিহাস সংগ্রহ করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করেন। যশোর বকরী সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখায় আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, সেই প্রবন্ধ মধ্যে আমি মোসলমানী বাংলা সাহিত্যকে ঘাষণ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম। সন্ধ্যয় পাঠক-পাঠিকা দিগের অবগতির জ্ঞান নিয়ে পুনরায় তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১। আবার ও ফার্সী ভাষায় লিখিত এলামসম্বন্ধ

সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার বাংলা সটীক অল্পবান। (ক) শরিয়াৎ—গার্বহা খুশ্ব এবং (খ) মাদারিফ—সম্মান স্বর্ধ।

২। জোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক। (ক) তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার বিষয়ক পুস্তক। (খ) গণনা প্রণালী ও স্বপ্ন বিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক।

৩। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক—পুস্তক চিকিৎসা ও মানবচিকিৎসা। (ক) আয়ুর্বেদ, (খ) পেতে, (গ) হাকিমী, (ঘ) অববৌতিক।

৪। পোষা, এসেম, তাবিল ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক। (ক) কেতাৰী, (খ) ফার্সী।

৫। দেহতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক। (ক) বেদসার হকিমী, (খ) বাউল কবিতা, (গ) দরবেশী, (ঘ) সতীয়া কবিতা, (ঙ) উত্তরবঙ্গ কবিতা, (চ) কায়েরীয়া কবিতা, (ছ) চিশতিয়া কবিতা—গান, ছড়া, কবিতা, কবী, অল্পবত্ব।

৬। সাধনা প্রণালী ও সিদ্ধান্তের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক।

৭। মিলনাত্মক ও বিরোধাত্মক উপদ্রাণ ও নবজ্ঞান (প্রেমগান)।

৮। নাসিক, প্রহসন ও গীতাভিনয়। (ক) তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক। (খ) কাহিনী।

৯। সমাজজি, নসারাজি ও চাবুক।

১০। ইতিহাস ও ইতিহাসের ছায়া।

১১। জীবনচরিত ও জীবন কাহিনী।

১২। বিবিধ উপদেশ।

বকরী-সাহিত্য-পরিষৎ আমার উপর যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি আশ্রিৎ বাশক্তি সেই কাৰ্য্য করিতেছি। এ পর্যন্ত অহুস্মানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, মোসলমান কবি ও পদকর্তৃদিগের যারা এ পর্যন্ত মোট ১০৬৬৬ বাণি পুস্তক পুথিকা মোসলমানী বাংলা ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উক্তায় কটক নিবাসী মৌলবী ও হাজী আবদুল মালিক কুলা মরহুমের নাম এবং উক্তায় বালেশ্বর নিবাসী মৌলবী সৈয়দ আব্দার কাদের মরহুমের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাহার উক্তায় উক্তা ইহাও যে



বাংলার বাঙ্গালীর করণীয় কার্য করিয়া গিয়াছেন এ জ্ঞত বাঙ্গালী জাতি চিরদিন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মোলবী ও হাজী আশ্বার মজিদ জুফা সাহেব মরহুম মোসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় মোট ২৭ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দান হাত্যানে আশীর হামজা, তেলমুসমে হোশরোবা, কেসুসায়ে আকরসিখাব, এবং রংবাহার নামক গ্রন্থগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম তিন খানি বিরাট গ্রন্থ। মোসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় সত্যই তাহা অতুলনীয়।

মোলবীর সৈয়দ আশ্বার কাদের সাহেব মরহুম মোসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় ৬ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এক দিকে অবাস্তবী এবং অপর দিকে তিনি উক্তপন্থ রাজকন্ঠ-চারী—প্রথম শ্রেণীর ভেণুটি—ম্যাজিটেট ছিলেন। এ নৈবে ব্যক্তির দান কেমন ভাবে মাথায করিয়া লইতে হইবে, তাহা বাঙ্গালী মোসলমানের অবিস্মৃত নাই। সৈয়দ সাহেবের দান ব-কারবালা মাতেম হোসেন, সায়ফুল-নেসা, বিবি জোলেখা, সিতামে হামাম নামক চারিখানি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাজী জুফা সাহেব এবং মোলবী সৈয়দ সাহেব আমাদের পুত্রের জায় সেহ করিতেন। আমি তাহা-লিপের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ

পাইয়াছিলাম, পাঠকবর্গ আগ্রহ করিলে বারাহরে তাহা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

এইস্থানে আমি পাঠক-পাঠিকাসিগকে আর একটি কথা বলিতেছি। কোন কোন নামের পুস্তক দুই তিন চারি জনে দুই তিন চারি রকমে শাহরী করিয়াছেন। বিষয় এক, নাম এক, কিন্তু রচনার ভাষা ও ভঙ্গী ভিন্ন। যেমন গোলবকাওলী, ফয়সল আহকাম নিযেত নামা, আসগার উম সালাত, এযাম যাত্রা, গাজী কাহ ও চম্পাবতী, ফায়দা নামা, কাসাসোল আবিদা, খোলাসাতুন আবিদা, জুফা খয়বর, খয়বরের জুফানাং প্রভৃতি গ্রন্থ। এই সমস্ত পুস্তকের সমষ্টি করিলে মোট পুস্তকের সংখ্যা ১১০০ হয়।

উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে, যদিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমার উপর এই বিরাট কার্য সমাধা করিবার গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত কার্য সমাধা করা আমার জীবনে তুলাইবে কি না, বলিতে পারি না। রোগে এবং উপযুগপরি দশটি পুত্রশোকে আমার স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমার আত্ম কার্যের প্রতি বাংলার মোসলিম যুব-লিপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে স্বল্পেই শান্তি পাইব। যদি এ দিকে “বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য-সমিতির” কৃতবিষ্ণু-গণের আগ্রহ দেখিয়া মুক্তাশ্রয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে মুক্তা যন্ত্রণাও আমার নিকট তুচ্ছ বিবেচিত হইবে।

## ধরা পড়া

### ঐবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

কার তরে যে গাঁথো মালা—জানি তাহা জানি,  
নিঃসন্দেহে বপুতে পারি—সে অধম এই আমি;  
মিথ্যা বৃষ্টি?—তবে কেন অগ্নি হবে হাঙ্গো,  
ঐ হাদিতে ধরা পড়ে—কত ভাল বাসো!



## কংগ্রেসের চিঠি

### শ্রীসরসীবালা বসু

( ২ )

মেহের হোমানী!

কাল আর লেখা হয়নি, সময় করে উঠতে পারি নাই এমন গল্পখান সেহের ছ'কলম লিপিতে বঙ্গীয়, যা পারি লিখে ফেলি। গঙ্গার জ-বনে বরফ-গলা, প্রথম পা দিয়েই মনে হয় জমে গেলাম, কিন্তু মাথা ভোবাবার পর আর ভয় থাকে না, তবে তিনটের পর চারটে ভুব দেওয়া আমার ধাতের লোকের সাধ্য না—স্বানের পর বেশ আরাধ—সর্পশরীর মিল্ক হয়ে গেল, Camp থেকে এক মাইল দূরে গঙ্গা, জলে বেশ ঘোত আছে কেননা নিরাভিমুখি গতি—তবে গঙ্গাকে দেখে দুঃখ হয়, লীর্ণা লীনা মূর্তি, দুইল শ্রাবনী কলকলনাদিনী তরল ভগ্নময়ী মূর্তি মোটেই নয়, সগরিগলি ঘাটে গঙ্গার যে হৃদয় বিরাট মূর্তি দেখেছি এমনটি আর কোথাও চোখে পড়ে না, হাড়াডতেও তো গঙ্গার শুল্কিতা মূর্তি, তুল্যাম কানপুরে গঙ্গা থেকে ইচ্ছামত খাল কেটে নেওয়ার জ্ঞান এ শোচনীয় অস্বাস্থ্য।

আজ এখনি একটি মেমের সঙ্গে আলাপ হোলো তিনি আমেরিকান মহিলা—ছয় মাস হোলো ভারতবর্ষে এসেছেন, এর পূর্বেও দু'তিন বৎসর ছিলেন, বঙ্গলেন। ঐতিহাস উৎসব কালে রেখে ভারতবাসীর জাতীয় উৎসবে আনন্দেব সঙ্গে প্রত্যহ যোগ দিচ্ছেন দেখে আমি তাঁকে গল্পবাহ জানালাম, তিনি খুশী হয়ে বঙ্গলেন “ভারতবাসীকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা যে মুক্তির সাধনা করছে এর সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ আছে, সহ্যস্বীকৃতি আছে।”

কাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়ে গেল, আমরা শেষ পর্যন্ত ছিলাম না, বেলা তিনটার সময় আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে মহিলা সভায় গিয়েছিলাম, স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সভা আয়োজন করা হয়েছিল, স্থলের বিজ্ঞাতি

ভারী হৃদয়, নোতালায় শিশুরিডীদের বাসস্থান, নীচে স্থল বনে, ডাক্তার হুরেন্দ্রনাথ সেন, মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থলটি প্রতিষ্ঠিত, এতটা বড় হৃদয় স্থলত্বন অনেক বড় বড় কলমেজের নাই, স্থানীয় হিন্দুস্থানী মহাশয়দের নিকট হতে ডাক্তার সেন বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে এর জ্ঞত ব্যয় করেছেন, ছাত্রী সংখ্যাও অনেক। বাঙ্গালী অপেক্ষা ঐ দেশবাসী মেয়েই খেলী, এখানে বাঙলা স্থল বলিতে ইটিই একমাত্র।

সভায় উদ্ভিলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, মোহিনী দেবী মেয়েদের চরকা কাটবার ও খন্দর ব্যবহার করবার কথা অনেক বক্তন, হুংখের বিষয় কানপুরবাসিনী মহিলায় খন্দর ব্যবহার করেন না, তবে কালকার সভায় অনেকেই খন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মেয়েরা না হ'লে মেয়েদের বোঝার কে?

আমার প্রতিও যখন কিছু বলাবার আদেশ হোলো, আমি ভেবে পেলাম না-কি বলি, আদ্যমুগের মহাশয় দ্বিতী় সম্বন্ধে সফ-লেখা একটি কবিতা পাঠ করে মহিলাদের ইন্দানে একটি সমিতি স্থাপন করে অবসর সময়ে সাহিত্যের-বিষয় আলোচনা করবার প্রস্তাব করে অধ্যাহতি নিলাম।

তাঁরা আমায়ের যথেষ্ট আদর যত করেছিলেন, মিষ্ট-মুখেরও বন্দোবস্ত ছিল, হুরুর প্রবাসে বাঙ্গালী ভগ্নগণের এ আদর যত ও অভ্যর্থনা আমাদের কাছে আনন্দের হিরোলা তুলেছিল—কবির সেই গানের ছত্রটি বার বার মনে পড়ছিল—

যেখার থাকি যে যেখানে,

বঁধন আছে প্রাণে প্রাণে

প্রাণের টানে টেনে আসে,

প্রাণের বঁধন মানে না কে?

এখন আর না, তাড়া এলো, আজ বারোটা



কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন, ছুটি এখন, কাল চিঠি শেষ করবো। ইতি—

২০শে জিসেখর,  
১৯২২

এখন চিঠি শেষ করতে বসলাম, সারাদিনের পর সন্ধ্যার সময় ছুটোখিনাম প্রার্থনী দেখতে আর কিছু কেনাকাটা কর্তে, রাতি আটটার কিরে এসে আহারাদি সেরে খুকীদের ঘুম পাড়িয়ে তবে চিঠি শেষ কর্তে বসলাম, প্রদর্শনীর কথা পরে লিখব, আজ সারাদিনের ব্যাপার গুলোর একটি আভাস দিই, প্রাতে আজ খেচ্ছা-সেবকদের মার্চ বা ফুটকাওখাং হোলো, স্বরাজ পতাকাতেল আজ বিরাট জনতা, সমস্ত খেচ্ছা-সেবক, জেনারেল, প্রধান কর্মচারী প্রভৃতি সকলেই আজ উপস্থিত, সরোজিনী দেবী, মুন্সীলাল, লাল লাজপৎ রায়, মংঘদ আলি প্রভৃতি অনেকেই এসে মিলিত হ'লেন, মার্জটা তেমন হুবিবে হোলো না, বেরনা সকলে তেমন শিক্ষা পায়নি, সেজন্তে খেচ্ছা-সেবকদের দস্তবার দেবার সময় মিঠার জয়কর তার উল্লেখ করে একটু হেসেছিলেন, বললেন—কংগ্রেস যেমন এখন দু'পাদের তাল রেখে চলতে পাচ্ছে না তার ভলাচাইয়েরও তাই দশা, পরে কিন্তু এ দোষ শুধরাইবে।

সরোজিনী দেবীর গঙ্গা ভেঙে গিয়েছিল বলে তাঁর হয়ে মুন্সীলালই উৎসাহ বাণী প্রচার করলেন, পরে মংঘদ আলী প্রভৃতি নেতারা কিছু কিছু বলে শেষ করলেন, মহিলা খেচ্ছা-সেবিকারাও এসে যোগ দিয়েছিলেন, শ্রীমতী দম্ভাজী তাঁদের কথা উল্লেখ করে বেশ আনন্দ প্রকাশ করলেন। বেলা দশটার পর এসব শেষ হোলো, আমরা স্নানাহার সারতে ক্যাম্পে ছুটলাম, সেসব সারতে বেলা বারোটা বেজে গেল, আর্থী-নারী সভায় আজ আস্থান আছে, সেখানে গেলাম, বাঙালী মহিলা ভেলিপেটের আর আর্থী-নারী সমাজ আস্থান করেছে, বানীয় মহিলাদের কিছু বদ্বার জন্ত—গিয়ে দেখি বড় বিশৃঙ্খলা, ভীড় না জমুক বিশৃঙ্খলতার জন্তে গোলমালের মাত্রা খুব বেশী।

খেচ্ছা-সেবিকার দল একজনও নাই, যে দেখানে

সেই থানেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মায়েদের সঙ্গে শিশুদের গতি অনিবার্য, অনেক মহিলা হয়েও এটাকে অস্বীকার করে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন অর্থাৎ যিনি সঙ্গে ছেলেমেয়ে আনেননি তিনি বলছিলেন—ছেলেমেয়ের যারা সঙ্গে যোকা নিয়ে বক্তৃতা শুনে এসেছে না গোলমাল করতে এসেছে। খেচ্ছা-সেবিকার দল কংগ্রেস মণ্ডপে কিছু কাজ করেছিলেন বটে যদিও কতকগুলি খেচ্ছা-সেবিকার ব্যবহার মোটেই ভাল হয়নি, এর মধ্যে বাঙালী মহিলা তিনজন খেচ্ছা-সেবিকা ছিলেন, তাঁদের কাজ ভালই হয়েছিল, তবে সন্তোর বাতির বলেই হয় কতকগুলি অসব্যবস্থা খেচ্ছা-সেবিকার দল দর্শক মহিলাদের সঙ্গে মোটেই সম্ব্যবহার করেনি; যা হোক এ সভায় তারা অল্পপস্থিত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে অনুলাম আর্থী-নারী সভার কতীর সঙ্গে তাদের নেত্রীর কি একটি বিরোধ আছে, ফলে খেচ্ছা সেবিকার দল এখানে সাহায্য কর্তে যোগে, বেশ যা হোক, গু'লিনের কাছেও আবার দলদলি, আজকার দিনে একটুটুই না করলেই হোতো খেচ্ছায় যারা সেবার তার নিয়েছে তাদের এ অভিমান সাজে না, হয় অভাগা দেশ।

উর্ধ্বালা দেবীর উপরই বলবার ভায় ছিল, তিনি আবার ভাল হিলি জানেন না স্বতরাং ইংরাজীতেই একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন বললেন, একজন হিন্দুস্থানী মহিলা তজ্জবার ভায় নিলেন, মিসেস মংঘদ আলিও উপস্থিত ছিলেন উর্ধ্বাল দেবী বন্ধর সম্বন্ধ বলবেন বলে মিসেস মংঘদ আলীকে আমি বললাম, আপনি নারী-শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলবার ভায় নিন্ তিনি বললেন, সেখান বলাতে রাজী আছি, তার সঙ্গে বন্ধর ও চরকা ও জী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় মিশিয়ে থিচুড়ী বৈতরী করে দেব, আমি বললাম, একে প্রবল শীত, তায় বিদেশ, গরম থিচুড়ী অতি উপায়েই হবে আপনি সাবধানে পরিবেশন করুন।

সভায় অনেকগুলি বাঙালী মহিলাও এসেছিলেন, তাঁরা আজ অনেকেই দেশী কাপড় পরে এসেছিলেন পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী মহিলাদের কিন্তু অনেক বিলাতী বস্ত্রের বাহাল—হায় বন্ধর, কবে তুমি তোমার আসন

সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবে, উর্ধ্বালা দেবী তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করবার পর সেটি হিন্দীতে বুঝিয়ে দেখা হলে, একে একে আরও দৃষ্টিভঙ্গন মহিলা বললেন, আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমিও যাব পড়লাম না, কিন্তু আমার মংঘদ আলী তাঁর বিপুল বণু নিয়ে প্রশ্ন কর্তে যে অসুখ থিচুড়ী পরিবেশন করলেন বাস্তবিক তা উপভোগ্য, সবার মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ শিরণ খেলে গেল। হায় পুরুষ। তুমি তোমার নারীকে অশুভের কারাগারে বদ্ধ রেখে নিজেরা উদার হয়ে নারীকে জাগো জাগো বলে বতই চেতনায় প্রবৃত্ত কর্তে চাও না বুঝা চেষ্টা—নারী কর্তের মনোচ্ছাচার ছাড়া নারীর জাগরণ সম্ভব নয়, আর নারী-শক্তি বতকণ না আপনি মহিমায় আপনি না উৎকৃষ্ট হবে ততকণসম্বন্ধের বন্ধন ঘূচবে না, জাতির দাম্যয মুক্তি হবে না এ যে ক্রম সনৈ।

সভা ভঙ্গ হলে একবার প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলাম, কী ভীষণ ভীড়! হিন্দু-খৃষ্ণ সভার অধিবেশন হাছিল, মনে করলাম একটু শুনে যাই, কিন্তু কী ভীষণ ব্যাপার, আজ আর টিকিটের বালাই নাই, খেচ্ছাসেবকদের পাংরা নাই, অবাধ্যতা পেয়ে হাজার হাজার শ্রোতা নারী দর্শক সেই বিস্তৃত মণ্ডপ পরিপূর্ণ করে ফেলেছে তার উপর দুলার বিপুল সমারোহ, সভয়ে পাগিয়ে এলাম। ক্যাম্পে কিরে এসেই আবার প্রদর্শনী দেখতে রওনা হ'লাম, কাল সন্দের যাত্রা করব, ডাক্তার ঘোষ নিমন্ত্রণ করেছে, বাড়ীর জন্তেও নব অস্থির হয়েছে, পরন্তু রওনা হতে চাই, প্রদর্শনীর খবর আজ আর লিখতে পারছি

না, বিশেষ দ্রষ্টব্য তেমন তো কিছু চোখে পড়ল না, তবে মনে করে এর পর সব লিখবো, কংগ্রেসের পূর্বো খবর তো সব কাগজেই পাছে, আগামী অধিবেশন আসামে হবে ত্রিকু হয়ে গেল, বক্তৃতা আর তর্ক বিতর্কের খবর দিতে চাই না, তোমার তা শোনবারও ইচ্ছে নেই, খবরের কাগজ তার বাহন মজুত রয়েছে, তবে আমার এদে খুব ভালো লাগল, কত নূতন নূতন পরিচয়ের আনন্দ পেলাম, একজন বাঙালী মহিলা বলছিলেন—এটা একটা বেশ বড় রকম পোয়েলা হচ্ছে, রাজনীতির নাম দিতে চাও দিতে পার, না দাও ক্ষতি নেই।

সন্দের লোক আজ কাল গার্ডেন পার্টি করে, tea party করে, পোয়েলা নাম তারা মানে না, কিন্তু গুটি বাঙালী দেশের খাতি মাল, যে হিসাবে একে পোয়েলা বলল ক্ষতি নেই, কত জাতীয় মহিলার সাধের আদান প্রদান হলো, হিন্দুর মহা-ঊর্ধ্বগলি এক মহা মিলনের পুণ্য ক্ষেত্র, তবে সেখানে আবার সব জাতির প্রবেশাধিকার নাই, এখানে কিন্তু সবার অব্যবহিত দ্বার—আজ এখানে হতে যে পবিত্র ভাব-মন্ডাকিনীর স্বিধ দ্বারা প্রবাহিত হচ্ছে, সমগ্র ভারতের নব-নারীর প্রাণে তাহা অমৃতের পরশ দিচ্—আমরা আশা করি স্বত্বকারে অব-সানে উদার আগমন অনিবার্য—সেজন্তে ঘোড় হাতে উচ্চ মুখে প্রার্থনাও করি—

অসত্যো না সত্যমহি,  
তমসো না জ্যোতির্মহি—

## কয়েকটি কথা

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

নবযুগ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাবর্গের নিকট কয়েকটি কথা বলিবার জন্ত আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমরা দেশের জ্ঞত কি ক্রিতেছি? এবং আমরা দেশের জ্ঞত কি ক্রিতে পারি? এই কথা দুইটা সভাই যদি

আমরা সকলে এক একবার একান্ত আগ্রহে মনে ক্রিয়া দেখি ও দেশের কাজ করিবার সূহা যদি সভাই আমাদের মনে জাগে, তাহলে ঘরে বসিয়া ও আমরা সেজন্ত অনেক কিছুই ক্রিতে পারি। ১৯২০ সালে



রাষ্ট্র রাষ্ট্রের ঘুরিয়া দোকানে দোকানে শিক্কেটা কয়িয়া দেশের কত ছেলে আনন্দের সঙ্গে কারাবরণ করিয়াছিল; বিদেশী অথবা বহুত পরিবার জন্ত দেশ-নাথকরণের দীপ্ত বাণী শুনিয়া দেশে তুলিল আন্দোলন উঠিয়াছিল, সর্বজন পূজ্য মহাত্মা বিদেশী অথবা পরিত্যাগ করিবার জন্ত এবং খন্দর, চরকা ও দেশী জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্ত দেশবাসীকে পানী পড়ানর জায় অবিশ্রান্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই বিশেষ জাত অথবা দরিদ্র পরিভাগ্য করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই তাহাই আমাদের বক্তব্য। একথা বলা চলে যে উপযুক্ত কোনো বিষয়ই দেশ মহিলাদিগের নিকট হইতে বিশেষ সহায়ত্ব পাই; শুধু আমরা এই বাংলার মেয়েরা যদি এখনও মাধ্যমত বিদেশী বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে বহুগুরুক হই, তাহলে ভারতের স্বাভাবিক প্রদেশ আমাদের আদর্শ গ্রহণ করিবে একদম বিশ্বাস করা যাইতে পারে। বিদেশী সৌন্দর্য বহু ও অথবা আমাদের দেশের মেয়েরা যতটা বেশী ব্যবহার করেন এবং ছোট ছেলে মেয়েদের ব্যবহার করান, বহু: পুরুষেরা সাধারণতঃ সে অঙ্গপাতে অনেক কম ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাজেই সেই মেয়েরাই যদি বিদেশী অথবা দরিদ্র পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন এবং ছেলে মেয়েদের

দেশী অথবা দরিদ্র পরিত্যাগের পোষাক ইত্যাদির দিকে মন আকর্ষণ করেন, তাহলে সভ্যতার হারা দেশের অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আমরা যতটা দেশী জিনিষ ব্যবহার করিবার ও চরকা কাটিবার সুবিধা পাই, পুরুষেরা ইচ্ছা থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই সে সুবিধা পান না। যে মহাপুরুষের অভাবনীয় ত্যাগের মাত্র অঙ্গপ্রাণিত হইয়া পাক্ষাত্য সভ্যদেশের সুশিক্ষিতা মহিলা কুমারীসেতু তাঁহার শ্রিয় পরিত্যাগ ও বাস্তুমিত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বমতী আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই একান্ত শ্রিয় জন্মভূমির কথা হইয়া এবং অল্পকণ তাঁহার জ্ঞানোদীপ্ত মনঃ ত্যাগের বাণী শুনিবার যোগ্যতা পাইয়াও যদি আমরা সামান্য আশ্রয় স্বীকার করিয়া তাঁহার সে বাণীর উপযুক্ত সম্মান দিতে না পারি, তাহা হইলে হৃদয় বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইলেও মনের সূচীভাও আমাদের জন্ত আমরা যে কোনো দাবী দেশের মহিলাদের জায় যোগ্যতালভ্য করিতে পারিব না। শুধু নিজস্বের অবরোধ প্রচার দোহাই দিয়া নিজেদের ভাবে বদলা থাকিলে কোনই কাজ হইবে না। দেশের কাজ করিবার যে ক্ষমতা আমাদের আছে, তাহারই সদ্যব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য নহি কি? আশা করি “নবযুগের” পাঠিকগণের নিকট আমার এই সামান্য কথাটা উপেক্ষিত হইবে না।

## আজকে রাতে

বন্দে আলী

বাঘল ঘেরা আজকে রাতে এসো ভূমি শরনে  
আজকে ফুলে ঘেরের কবীতাজি আঁকা নয়নে।  
বাতাস যবে বাইবে বেগে  
ছাদার খুলি তোমার লেগে  
সাতাটি বার হইব জেগে  
সপন-ভাল বরনে।  
এসো ভূমি নিশ্চয় যবে শ্রুত আমার শরনে।

বিজ্ঞানীর সে চমক খায়ে পথটি নাহি হারায়ো  
আমারি এই ঘরের রাতে চরণ তোমার বাড়ায়ো।  
আজকে যদি তোমার মনে  
পথের দেশা আগুন বোনে  
যাবার বেলায় আকারণে  
শরৎক তরে পাড়ায়ো।  
বিরহী মোর বৃক্কের পদে নিজেকে আজ হারায়ো।



## ঝড়ো হাওয়া

শ্রীমতী প্রমুখতার দাস

শেষবারের জন্ত ভেপুটা পরীক্ষা দিয়ে স্বপ্নান্ত বন্দন  
তাহার বিপুল বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়টি নিয়ে মেসে  
কিরে এল, তখন তার মূখের চেহারা একবারের বদলে  
গিয়েছিল। সে জানে, এই তার শেষ পরীক্ষা—এ পরীক্ষার  
উত্তীর্ণ হতে না পারলে, জীবনেরও তার শেষ পরীক্ষার  
দিন বনিয়ে এসেছে বুঝতে হবে। বার বার ভিনবার!—  
শুভের টাকা আর কত ধরস করা যায়!

শ্রুতমন্ত স্বপ্নান্ত একটা ছিন্ন পাছুকা পড়ে মেস  
থেকে বেরিয়ে পড়ল পথের মাঝে। মেসের পছলোয়া  
তার পানে চেয়ে একটু মৃচ্চি হারনে—কেউবা বিজ্ঞের  
ইঙ্গিত করলে। একজন আঙে আঙে বললে, 'ভেপুটা-  
বার সাদ্ধা-স্বপ্নে বেরোলেন।'

কথাটা স্বপ্নান্তর কাণে অতি তীব্রভাবে বেজে  
উঠল। দৃশ্যটা যেন তার ভেতরে ঢুকে গেছে চাইছিলো।  
ও! আজ সে সবার বিজ্ঞের পাজ। সবাই যেন  
জানে, সে চিরকাল এই মেস থেকে কেবল ভেপুটা  
পরীক্ষা দিয়ে!.....

বেছুরার খায়ে সে দীর্ঘ দীর্ঘে একখানা বেকির উপর  
বসে পড়ল। সন্ধ্যা তখন হয়ে গেছে। পোষ্টের মাধ্যম  
মাধ্যম লাইটগুলো জলে উঠেছে।

আজ তার হৃদয়ে কত কথাই না আন্দোলন করছে।

জীবন-প্রভাতে সেই ভেপুটা হবার প্রবল ইচ্ছা, দারিদ্র্যের  
সঙ্গে—সত্যার সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম—সব কথাই আজ  
একটির পর একটি করে দীর্ঘ দীর্ঘে তার মানস-পটে  
জেগে উঠছে। সন্ধ্যার আধারের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হ'তে  
এই আবির্ভাবের বজা এসে তাকে আঘাত করছে। ভাসিয়ে নিয়ে  
চলল।—

মনে হ'ল—তার বেহেমতী বৃদ্ধাচার্য-সুশীলতা পরী-  
ক্ষণীয় কথা, তার পথ-বাটের কথা—তার প্রত্যেকটি  
বিশেষত্বের কথা। তার মা, তার দী, তার ছোট ভাই—  
সবার কথা তার মনে হ'ল।

—নির্দালা তখন পিজালয়ে থাকে। থাকবেই বা না  
কেন? আশ্রয় সেইস্থলখণ্ডে বসিতা সে, এ ঘরের  
দারিদ্র্য আর পরীক্ষার স্যাংগেতে কুটীর তার সবই কেন?  
মনে হ'ল, আশ্রয় দিন নির্দালা তার সঙ্গে একটি  
কথাও বলে নি। বলবে কেন?—সে যে তার স্বামী  
যোগ্যতা ভাল করেই জানে। চার চারটা পাশ করে  
যে একটি ক্ষুদ্র পরিবার পোষণ করতে পারে না, সে  
আবার মাছ?—তার সঙ্গে আবার কথা?—এই বোধ  
হয় সে ভেবেছিল। 'বোধ হয়' কেন, নিশ্চয়।

উদাস দুটিতে সে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল  
ভাবছিল। বাইরের জগৎ যেন তার নিকট একটা



অশ্লীল রহস্তের দ্বারা ছায়ায় হয়ে উঠেছিল, বিবেক-কণ্ঠকোলাহল যেন তার কণ্ঠে ঝলঝল করে অশ্লীল কল-যন্ত্রের মত ভেসে আসছিল।

সে ভাবছিল, সন্ধ্যায় আছে কি?—কেবল চাঁদর আদর বই ত নয়? আজ সে দরিদ্র বনেই কি তার এ অবস্থান? ওই যে ‘পম্পহ’ পাত্রে সিকের চাঁদর ও পাঞ্জাবী গায়ে, চন্দা চোখে যুবকটি তার পা ছাটীর গরিত আচ্ছাদে সন্ধ্যার বুক ঝুঁকে চলে গেল, সে আশ ‘বড়’ লোক—তার আশ সন্ধ্যায় প্রতীতি। সে পথ দিয়ে চললে পথিকেরা সম্মুখে তার পথ ছেড়ে দেয়, আজ তার কত মোসাহেব—তা’ তার ভেতরে কিছু থাকে আর নাই থাকে। কেবল বাইরের ‘বড়টাই’ যে তার ভেতরের ‘ছোটকে’ ঢেকে ফেলেছে। মাহমুদের আশ আর ভেতরকে দেখবার শক্তি নেই, বাইরেটাকে চিনেই সে তৃপ্ত—তা’ দিয়েই সে মাহমুদের জীবনের মূল্য টিক করে।

কয়েকটা লোক তাকে একেবারে মাড়িয়েই চলে গেল। সে বিহ্বল হলো। সে জানে যে, পৃথিবীর কাছ থেকে সে এর বেশী পড়ে পারে না। সে বিশ্ব-বিজ্ঞানের চারটে পাশ কয়েকে বটে, কিন্তু তাকে দেখে কে তা বিশ্বাস করবে? তার যে বাইরের ছাপ নেই।—

একটা মর্মস্বন্দ দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছেঁড়া ভবিতার কাঁধে ফেলে উঠে ঠাড়ালো। পথ?—পথ ত উত্তরী পড়ে রয়েছে পৃথিবীতে। ওগো, তাকে চিনিয়ে দেবে—কোন পথে তাকে চলতে হবে?—

সে জানে, কেউ তাকে দেখিয়ে দেবে না। পৃথিবীর কাছ থেকে তার পাওনা কেবল ঘৃণা, লজ্জা, অপমান। আর সন্ধ্যায় পরের স্বপ্ন-দুঃখের হিসাব কেই বা রাখে? কোথার সন্ধ্যায় নির্জন গৃহ-কোণে তার বন্ধুর উচ্চ পোষিতাশি অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল, কবে কোন হতভাগ্য অদৃষ্ট দেবতার চরণতলে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে বসলো, দিন দিন মর্মস্বন্দ দীর্ঘ নিশ্বাসে কে কোথায় দীর্ঘ দীর্ঘ তার দুর্দৈব জীবনটুকু নিঃশেষ করে দিলে—এ সবল অপরিজ্ঞাত তুচ্ছ ইতিহাসের ছিন্ন-স্বক কে যোগনা করে?

—দীর্ঘ দীর্ঘ সে মেসের পথ ধরলো। পা এগোচ্ছিল না মোটেই। মেসে থাকতে তার একদণ্ডও ভাল লাগতো না। একঘেয়ে বিদ্রূপ, হারি সইতে সইতে তার ভেতরটা এতটা তেতো হয়ে গিয়েছিল যে, এর চেয়ে বেশী কিছু হলে মাহুম আত্মহত্যা করে বসতো।—

তবু তাকে যেতে হল। না গিয়ে তার উপায় নেই যে!—

টেবিলের উপর দু’খানা পত্র পড়ে ছিল। একখানা বাড়ী থেকে তার মা লিখেছে, আর একখানা কে লিখেছে বুঝতে পারল না। মার পত্রখানা সে খুলে ফেললো! তাতে লেখা ছিল,—

‘দু’দিন ধ’রে অমিয়ের খুব বেশী জ্বর হচ্ছে। আশ ছুপুরে সে কত খাবোলা তাবোলা বসলো। সবটা’তেই কেবল বৌদির কথা। আহা, বাছা আমার তোর বোকে কি ভালবাসাই বেসেছে। হুঁ, হুঁ একবার তোর শব্দের বাসায় বাস। বৌমাকে বলিস একথা—দেখি তবু যদি সে আসে। হোর পরীক্ষা হয়ে গেছে বোধ হয়, খুব সকালে বাড়ী চলে আসিস। হাতে একটি পয়সা নেই, বাছাকে আমার একজন ডাক্তার ভেঁকে দেওয়াতে পারলুম না। দারিত্র্য আমাদের এত কষ্ট দিলে, তবু তার আশা মিটলো না, এখন আমার আমার দুঃখের বাছার এক কোঁটা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।’

পত্রখানা পড়ে স্বাধস্তর দুঃখের চোখটা একটুও বদলালো না। সে যেন জানে—এ রকম হবেই। নিহুরের সকল আঘাত সহ করতে করতে বুক তার পাগল হয়ে গিয়েছিল, আবিমান চোখের জল ফেলতে ফেলতে চোখ তার মজ্জুনি হয়ে গিয়েছিল—তাই পত্রের ভেতরকার এত বড় আঘাতটা তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারলো না। তবে, সে ঠিক করলো, নির্দলকে একবার জানানো দরকার—মা যখন লিখেছে—

না খেয়ে না দেয়ে তবনি আবার স্বাধস্তর শব্দর বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

স্বাধস্তর বহিষ্কৃতিতে পা দিয়েই দেখলো, তার শব্দর

একখানা ইজি চেয়ারে বসে আছেন। সে দীর্ঘ দীর্ঘ গিরে তাকে নমস্কার করলো। ‘শব্দর কিন্তু তেমনি দীর্ঘ বসে রইলেন। স্বাধস্তর চেয়ে দেখলে তার মুখপানি বড় গম্ভীর। তার মনে হ’ল যেন সেই স্থির পাণ্ডুরাধার পঙ্কাজে কি একটা ঘোর স্বপ্ন বাহু আশনার প্রবল বেগ অভিভূত করণ করে রেখেছে।

সেইদিনই স্বাধস্তর শব্দর তার কোনও একজন বন্ধুর নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছেন—স্বাধস্তর এবারও কৃতকার্য হতে পারেনি। তাই তার মুখ আশ্রয় পঙ্কীয়। হায় হতভাগ্য স্বাধস্তর, তোমার অদৃষ্ট-কল তুমি ভিন্ন কারু জানতে আর বাকি নেই!

—শব্দর-ককে প্রবেশ করে দেখলো, নির্দল নির্নি-বাসে বসেছে। তার মনে মুখপানি বড় ককণ-ব্যাধ-বড় শুষ্ক। নির্দলার চেহারা এতটা বারপা হয়ে গেছে কেন?—কে জানে কেন?—এই ‘কেন’র বেশী আর স্বাধস্তর ভেবে দেখল না। যদি দেখত, তা হলে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত যে নির্দলার এই অবস্থা শুধু স্বাধস্তর জগেই।

স্বাধস্তর নির্দলকে জাগালে না। জাগতে তার সাহস হ’ল না। সবাই ত তার আগমনে কালমুখ করে বসে আছে, শেষে কি নির্দলারও সেই মুখ দেখতে হবে?—সে তা পারবে না। সে তার মস্তকের কাছে চুপটি কর’রে বসে তার দীর্ঘ বিশ্রান্ত মনিত তলুখানির স্পন্দন নিরীক্ষণ করতে লাগল। কিছুকাল পরে স্বাধস্তর তনিত পাইল, পাশের ককে থেকে যেন বলছে—

‘চুপ—চুপ করো।’

‘চুপ কর’রে কেন? বড় যে লেখাপড়া জানা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলো। লেখা-পড়ার ত সব হ’ল, আমার মেয়েই এমন খেতে পায় না। কোনরকমে যদি তেপুটীগিরি পরীক্ষাটা পাশ করতে পারতো, তবু এক কথা। ‘এই ত তিনবার গেল।’

—আরও অনেক কথা হচ্ছিল, কিন্তু আর কিছু স্বাধস্তর কাণে এলো না।—

তার মনে হচ্ছিল, পরের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন

সরে বাসে, গৃহের চারিগাশের দেয়ালগুলো যেন সরে এসে তাকে চেপে ধরছে।

‘শব্দার দিকে চাইতেই একটা ভীত বেদনার আঘাতে তার ভেতরটা হাফাকার ক’রে উঠলো—একটা বিরাট লজ্জা যেন তাকে জীবন্ত মাটির ভেতর ‘দুঁতে’ ফেলছিল। বার বার তিনবার!—আবার নির্দলকে মূখ দেখানো?—‘বড় শাস্তড়কে, মাতাকে, মেসের ছেলগুলোকে—বিশ্ব-সাগরকে তার কালমুখ আবার দেখানো সে?—

—তার ভেতরটা কেবল ছুটকট করে আতঁনাশ করছে। সে ভাবছে—এই যে চারিগাশের কারা-প্রাচীর, এর ভেতর থেকে সে কি কর’রে বেরোবে?

স্বাধস্তর কাণে সেই নিশ্চল রাস্তাটা যেন একটা বিরাট কোলাহলপূর্ণ বিপণী বলে বোধ হ’ল, বাইরের ‘ব্লি’ব্লি’ পোকাবি কিম্বিশ্ব শব্দ তার কাণে যেন একটা অতি বড় কর্ণ স্বাক্ষরে মত বাজছিল।

—বুটী তার লজ্জায় দুখার দুঃখে অপমানে ভরে উঠলো। তার মনে হ’ল, পাঁচ বছর আগেকার কথা। যখন তার পিতা বস্ত্রমান ছিলেন। ছাত্র-জীবন সবে মাত্র শেষ হয়েছে। তখন কত আশা, কত উজ্জ্বল, কত স্বপ্নভরা অভাবনীয় কল্পনা! তারপরে হঠাৎ পিতা তার শোকান্তরের ডাকে চলে গেলেন; মাতা ও ছোট, তাইতির কর্ণ বেদনা-ভরা মুখ, তার এখনো মনে পড়ছে।—

স্বাধস্তর আর ভাবতে পারলো না। সব ওসিয়ে গেল। আহা, বর্তমানটা যদি অতীতও হত, তা’হলেও এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল তার কাছে।

—মায়ের পত্রখানার কথা মনে হ’ল। ভায়ের মৃত্যু মাত্র কর্ণ পাণ্ডুর মুখপানি চোখের সামনে ভেসে উঠল।—

—বুকের মাঝে আবার একটা বড় ধাক্কা লাগলো।—  
সে উঠে ঠাড়াল। দীর্ঘ দীর্ঘ দরজা খুলে ফেললে। তরল রক্ত-ধারার মত স্রোতস্রা এসে ঘরের ভেতর ঢুকল। স্বাধস্তর অতি সর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো—বতবুধ বেগা বায়, কেবল স্রোতস্রার মাঝন, কিন্তু আশ্রিত বিবের কোনো সৌমর্ধ্যই তার মনকে আকর্ষণ



করতে পারলে না। মনের যে নিভৃত প্রদেশে যে, প্রেম, কল্পনা প্রভৃতি স্বপ্নমার স্রুতিগুলোর বসতি, যার নিকটমস্থ স্বপ্নের আলোকে জীবনের সকল সৌন্দর্য্য সন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠে—সেই সন্ধানপান আনন্দ রাতের ঘরে জগদ্বন্দ্ব পাষণ চাপা পড়লে, সকল শোভা প্রতিহত হয়, সকল সৌন্দর্য্যের আলোক নির্ভীকতা হ'য়ে যায়। লীলাময়ী প্রকৃতির লাভ্যশ্রী শুধু ছবি মত চক্কর সমুখ দিয়ে তলে চলে যায়—মনের ভেতর কোনই অজুহুতির সাদা জাগিয়ে তোলে না। স্বধাংস্তরও আঁজ সেই অবস্থা।

—স্বধাংস্ত কয়েক পা বাইরে এগিয়ে আবার কিরে এসে নির্মলার শয্যা-পার্শ্বে ধাঁড়ালে। জানালা দিয়ে বৃষ্টি ফুলের অশ্রুত স্রুতিগার মত ক্যোৎসা এসে নির্মলার মুখে, গায়ে পড়ছিল। স্বধাংস্তর চোখে তাকে বড় হৃদয় লাগল। সে দেখলে, নির্মলা যেন গভীর অবস্থানে আপন সৌন্দর্য্যবাসির মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায়ও নির্মলার চোখে, মুখে, ঠোঁটে যেন একটি হাসির রেখা অঙ্কিত রয়েছে। স্বধাংস্তর মনে হ'ল, হাসি বোধ হয় কখনো হৃদয় মাছকে ছেড়ে যেতেই চায় না।—

স্বধাংস্ত একবার ভাবলে, মার আদেশ পালন করা হ'ল না—একবার ভাকি। কিন্তু পরক্ষণেই তার কৃত্তিত হলে লজ্জা, অপমান এই সঙ্কল হ'তে মনকে কিরিয়ে দিয়েছিল।

সে ঘরে ঘরে মার পত্রখানি নির্মলার বালিসের নীচে রেখে দিলে।—তারপর আর একবার তার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।—

সকালবেলা মেরের সবাই উঠে দেখলে, স্বধাংস্ত দালানের বাইরের কোঠায় একটা বেঞ্চির উপর পড়ে রয়েছে। একটা বিরাট হুতুপুতু পড়ে গেল। সবাই এসে সেখানে জড় হ'ল।

একজন বললে, ডেপুটী বাবুর একি দশা? সম্ভার পরেই না তিনি রাগ করে না খেয়ে না দেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারর এখানে এলেন কখন? কেউ বললেন, আরে সম্ভার পর আর ঘায়ে কোথাখি—

বুঝতে পাছ না?—বলে একটা বিস্মী ইঙ্গিত করে সবাইকে তার বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিলে। একজন পরিত্যাহই বললে, তারপর মধ্যমে হুঁচোখ রাড়া করে নেপার চোটে এখানে এসে আসন লাভ করেছেন। ইত্যাদি।

ছেলের দল জড় হবার একটু পরেই স্বধাংস্ত ছেলে-ছিল। এর মধ্যে তার আর উঠতে শাস্ক হল না।... কিন্তু এবার আর সে চূর্ণ করে থাকতে পারলে না। সয়ে সয়ে তার বুক পূর্ণত হয়ে গিয়েছিল। এবার তার ভেতর থেকে 'ভিশ্ববিসেস'র মত আশ্রয় উপাঙ্গ আরম্ভ হবার উপক্রম হ'ল।

মাছয়ের ঐধেরে ব'ধ যতটুকু তার চেয়ে সে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আর পারলে না। সে লাক গিয়ে উঠেই, শেষের কথাগুলো যে বলেছিল, তার কর্ণমূল লম্বা করে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করলে। সে বেচোরা চোখে সারয়ে ছল দেখতে দেখতে মাটিতে পড়ে গেল।

—সারয়ে এক তন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, কার মুখ দিয়ে একটি কথা পর্যন্ত বয়োলো না। সবাই অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইল। এমন নিরীহ শাস্তিষ্ট লোকটির ভেতর যে এতটা আগুনের ঘোঁরাচ আছে, তা কেউ আগে কখনো ভাবতেও পারেনি।—

স্বধাংস্ত ঘরে ঘরে বাইরে চলে গেল।

রাত্রি প্রায় দু'টোর সময় স্বধাংস্ত ঘরে ঘরে মেসে ফিরলে। সবাই ঘুমিয়েছিল। সে এক লাফে পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঘরের দরজা তার ডেওয়ানো ছিল। অতি সতর্কণে ঘরে ঢুকে সে একটি আলো জ্বালিল। তারপর ঘরের দরজাটি বশ করে বন্ধ করে দিলে।—

সে গবাক্ষের কাছে এসে বাইরের দিকে তাকাল। কি হৃদয় পৃথিবী। দাক্ষতে যুগই হচ্ছে হচ্ছে—এর গাছ-পালা এর ফুলফলের মধ্যে; কিন্তু তাকে যে এসব ছেড়ে যেতেই হবে। উঃ, কি ভীষণ ব্যথা তার বুকে! এবে মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি তার।—

দাক্ষ—তা তবো আর কি হবে? কিন্তু না তবো নে পারবে কই? আবার তার মনে হল, এই ত জীবন!

এই ত তার পরিণাম! এত চেষ্টা, এত উত্তম, এত আশা-আকাঙ্ক্ষার এই ত পরিণতি! তবে কিসের জ্ঞান জীবন? শূন্য-গর্ভ অকর্ম্মা জীবন পৃথিবীর কি কাজে আসে? চিরদিন জগতের সিংহদ্বারে ভিক্ষুর বেশে রূপার প্রত্যাশায় থেকেই বা কি ফল? কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হও, সবাই তোমার যশ গান করে তোমার বিজ্ঞ-সৌরভের অশ্রু প্রবাহ করবে, আর পরাভূত হও, তোমাকে একাই পরাভব-দুঃখ ভোগ করতে হবে—কেউ তোমার মুখের পানে একবার কল্পনার চোখে চেয়েও দেখবে না। স্বার্থপর জগৎ!

জয়-পরাজয়ের এই সিসৃশ পার্থক্য চিন্তা করে স্বধাংস্ত একটু হারান। সে ত হাসি নয়, যেন বিদ্রোহের ক্ষুব্ধ, সে যেন মাছয়ের হাসি নয়—আগুণের হাসি!

—পুনরায় সেই ব্রহ্মময়ী স্রুতিগুলো স্বধাংস্তর মানস-পটে বেগে উঠলো। সে গবাক্ষের কাছে থেকে সরে এসে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। তার মনে হল, নির্মলা এখন কি করছে? কি আর করছে? হয়ত তার হস্তভাগ্য বান্দীর পরাভব স্মরণ করে তাকে ও তার নারীজীবনকে শতবার বিচার দিচ্ছে। অপদার্থ পুঙ্খ কি কখনো নারীর রেহ অথবা রূপ আকর্ষণ করতে পারে?—ভালবাসা ত বহু দূরের কথা!

—পরে তার পূর্বজীবনের জয়পতাকা স্বরূপ সেই 'ইউনিভারসিটির ডিপ্লোমারেলোর উপর চোখ পড়লো। এই গুলিই ত বত সব অনর্থের মূল—এই গুলিই তার সর্বশাস্ত্য করবে। এবার তার উচ্চাভিলাষের উদ্দীপক, কিন্তু তারা সাধনের উপায় বলে দেয়নি; এবারি আত্মা-ভান বলে একটা মনোবৃত্তির পরিণামের করেছে, কিন্তু তা' চরিতার্থ করার কোনো উপায় বলে দেয়নি; এবারি আশা দিয়েছিল, কিন্তু নৈরাশ্রকে বাধা দিতে পারেনি, এবারি ভবিষ্যৎজীবনে একটা অতি ভাস্ক ছবি প্রদান ক'রে তার সোণার শৈশবকে উদ্বোধিত করেছে, কিন্তু বাস্তব-জীবনের কঠিন সময়ে যৌববার উপযোগী স্বপ্নে বল দেয়নি, মনে শ্রদ্ধা দেয়নি—পরীয়ে তেজ দেয়নি।

এই ত তার পরিণাম! এত চেষ্টা, এত উত্তম, এত আশা-আকাঙ্ক্ষার এই ত পরিণতি! তবে কিসের জ্ঞান জীবন? শূন্য-গর্ভ অকর্ম্মা জীবন পৃথিবীর কি কাজে আসে? চিরদিন জগতের সিংহদ্বারে ভিক্ষুর বেশে রূপার প্রত্যাশায় থেকেই বা কি ফল? কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হও, সবাই তোমার যশ গান করে তোমার বিজ্ঞ-সৌরভের অশ্রু প্রবাহ করবে, আর পরাভূত হও, তোমাকে একাই পরাভব-দুঃখ ভোগ করতে হবে—কেউ তোমার মুখের পানে একবার কল্পনার চোখে চেয়েও দেখবে না। স্বার্থপর জগৎ!

—স্বধাংস্ত একবার সেই নির্দিষ্টোদী শিশিটার গায়ে হাত দিয়ে তার শীতল স্পর্শ অহুতব করলে, একটু ভাবলে, পরক্ষণেই তা' মুখের উপর তুলে দরলে। কিন্তু মনে পড়লো—নির্মলার সঙ্গে দেখা করে এদেছি, কথা বলে আসিনি, ছুটো শেষ কথা লিখে রেখে যাই। সে একখানা কাগজে কলিত হতে গোটা কতক কথা লিখলো। তারপরে আলোর সামনে কাগজখানি পড়তে গিয়াই সে তা একেবারে টুকো-টুকো করে ছিড়ে ফেললে। সে ভাবলে—কেন?—কি জন্তে লিখে রেখে যাব? সাগরের স্বপ্ন-দুঃখের বাধন কাটিয়ে যে চলে গেল, তার আবার লিখে যাওয়া কেন?—মৃত্যুর আবার কৈফিয়ত কি? এই যে সাগরের আঘাতে অনির্দিষ্ট পথে জীবন আমার হেলে চলছিল বাধার সাগরের উপর দিয়ে—পৃথিবীর একটা মেহ-হস্তও কি আমাকে ধরে তুলে নিলে? তবে আর কৈফিয়ত কেন?

—উঠে বাইরের দিকে একবার সে চাইলো। দেখলে, টান পড়িয়ে চলে পড়েছে। কানন-ভূমি পাভুর, ফুলের বকে রান-কোণায় মুচ্ছিত হয়ে পড়েছে।—

—ঘীরে ঘীরে আসে নিকের শিশিটা তুলে মুখের মধ্যে সমস্ত "ওহু" টুকু ঢেলে দিলে। বায়ু এইখানেই শেষ!

—স্বধাংস্ত শয্যার উপর উঠে শুয়ে পড়লো—শেষ শোওয়া!

চাঁদের পাভুর আলো গবাক্ষ দিয়ে এসে ঘরের মেঝেতে লুটোঁচ্ছিল। রাত্রি শেষের শীতল বায়ু এসে তার শরীরে মেহ-হস্ত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এক সঙ্গে তার চোখের উপর ভেসে উঠলো তিনটি মুখ—মৃত্যুপথ-যাত্রী ছোট বাঁটি, শোকোন্মাদিনী মা, আর ঐধবাবোশি নির্মলা। তারপরে সব গুলিয়ে গেল।

—সে আর ভাবতে পারলে না। ঐধ ঘীরে উঠে



পরদিন প্রাতঃকালে ডাকওয়াল দুই বানি পত্র দিয়ে গেল। একখানা এসেছিল গবর্ণরের আফিস থেকে, তাতে স্বাধীন ভেদপুত্র মনোনীত হয়েছে—এই সংবাদ ছিল। স্বাধীনতার শব্দ তার বন্ধুর কাছ থেকে তুল সংবাদ পেয়েছিলেন।—

আর একখানি পত্র লিখেছিল নিখিলা। তাতে লেখা ছিল—

প্রিয়তম!

তোমার পায়ে কি এমন অপরূপ করেছি, যে সেদিন এসে অমনি করে চলে গেল? আমার কাল-নিষ্ঠা পেয়েছিল, আমাকে তুমি জাগালে না কেন? বাবার কাছে তখনছি, তুমি এবারও উত্তীর্ণ হতে পার নি,—তাতে বাবা মা ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন, তোমার কতই না নিন্দা করছেন। আমি এ'নব আর সইতে পারিনে। আমরা দরিদ্র, চির দরিদ্রই—কিন্তু তোমার লালনা,

তোমার অপরূপ আমি আর কিছুতেই স্মনতে পারি নে। তোমার অপরূপ আমার কাছে যেন তপ্ত শিশি টেলে দেয়। পরীক্ষা—বিশেষতঃ ভেদপুত্র পরীক্ষা অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করে। এতে তুমি মধ্যস্থত হয়ে না। মায়াব না চিহ্নক—আমি ত তোমাকে চিনি। দেখ, আর আমি এ পাণ-পুরীতে থাকতে চাইনে। তোমার নিন্দা অপরূপ দেখানে, তা' পাণ-পুরী বই আর কি বলে আখ্যা দেব? হোক না সে বাপের বাড়ী,—তুমি যে আমার সব চেয়ে বড় দেবতা। তুমি আমাকে সখ্য তোমার কাছে নিয়ে যাও। অমিরর জন্ত আমার প্রাণ কাঁদছে। কতদিনে তাকে দেখব? আমি এখানে থেকে এখন যেতে পারলেই বাচি। তোমার কাছে সহস্র দুঃখের মাঝেও স্থখ থাকবে। এস—তুমি অবশ্য একবার এসো। তোমার পায়ে পড়ি। ইতি—

তোমার নিখিলা।

## টান

### শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অজানার টানে নদী ছুটেছে কোথায়—  
বাতাস, আন্দানে কার হ'তেছে আতুল  
কার অন্তরের টানে অনিন্দ্য শোভায়—  
বিশ্বশিখে বনতল উজলিয়া ফুল।  
চারিদিকে ডাকাডাকি এই ধরঙ্গীর,—  
নীরবে সকলে যেন ছুটাছুটি করে—  
মিটাইতে আশা যেন হইয়া অধীর।  
শেষ সার্বকতা লভে ধরঙ্গীর পরে।  
তুমিও ত সন্ধ্যা মোরে ডাকিছ আড়ালে  
ছুটাছুটি চারিদিকে করি সেই টানে  
অধরে সুকায়ে আছ কোথা মায়াজালে।  
চুপকের মত মোরে সেই পথে আনে।  
সারাটা জীবন ধ'রে বহে এই টান—  
শেষ সার্বকতা পেয়ে তোমার সন্ধান।



## প্রাচীন ভারতের নারী

“পাগল”

‘দ্বী স্বামী অর্দ্ধাস্বিনী’—এই সমভাব ছিল, প্রাচীন কালের নারী পুরুষের মিলন-মন্ত্র। এই সমভাব লইয়া তাহারা প্রেমের নন্দন-কানন সৃষ্টি করিত। মহাভগবৎ বৃষ্ণিহা ছিলেন যে, যথানে সমতা নাই, সেখানে স্থখ নাই, সেখানে আশান প্রদান চলে না। সমতা না হইলে যেমন প্রেম জন্মে না, তেমনি প্রেমের আবির্ভাব না হইলে ভগবানকে পুত্ররূপে কোলের ভিতর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দেখিয়া স্ত্রী, তাহারা নারী-পুরুষকে সমান অধিকার দান করিলেন। কিন্তু সেই উজ্জল ভারতের সভ্যতা আস্তে আস্তে লোপ পাইতে লাগিল,—শব্দ, চন, মদোল, তাহার প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা হইতে বিকৃত হইতে লাগিল, গৃহই তাহাদের জগৎরূপে পরিণত হইল,—কলে, তাহারা পুরুষের ভোগের সামগ্রী রূপে রূপে জীবন কাটাইতে লাগিল। নারী-জাতি সাধারণতঃ দুর্বল, কাজেই তাহাদিগকে অধীনে আনিতে পুরুষের বেশী কষ্ট হয় নাই। নারীজাতির উপর পুরুষের অত্যাচারের জটাই সমাজের আজ এত কু-প্রথা দেখা যায়। বহুবিবাহ, পরস্পর-দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস-বিবাহ না দেওয়া, প্রভৃতি অত্যাচার সমাজে স্থান পাইল; ইহার কারণ নারীজাতি দুর্বল, তাহারা ইহার প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারে নাই। একদিন একজন শিক্ষিতা নারী আমাকে বলিয়াছিলেন, “পুরুষেরা শাস্ত্র হ'তে বচন আওড়ায় আবাদিগকে অধীনে রাখে, অত্যাচার করে এবং আমরা তা মাথা পেতে মেনে লই, এই শাস্ত্র পুরুষদ্বারা লেখা হ'য়েছিল। যদি পুরুষদের মত মেয়েরা শাস্ত্র লিখিত; তা হ'লে মেয়েরাও শাস্ত্রে পুরুষ সমত্ব অনেক কঠোর আইন লিখতে পারত; অস্ত্রতঃ তাহারা মেয়েদের সমত্ব এত কঠোর আইন লিপিত পারত না।” কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই

ভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ যে, নারী-জাতির উপর কষ্ট অত্যাচার করে, তাহার ইয়ত্তা নাই, বর্তমান নারী-জাতির সহিত যদি প্রাচীন কালের নারী জাতির তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, জগতের কোন দিক দিয়াও তাহারা স্বাধীন নহে। আজকাল যে একদল লোক নারীকে পুরুষের “লক্ষী” বলিয়া চাঁৎকার করে, তাহারা কেবল নারী-জাতির মন ভুলানোর জন্ত “লক্ষী” শব্দের অপব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুরুষের দাসী এবং তাহাদের বস্ত্র ভিন্ন কিছুই নহে। মহাত্মা গান্ধী প্রথম জীবনে তাঁর স্ত্রীর প্রতি যে অজ্ঞান ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং সেই অজ্ঞানের বাহন অসুভব করিয়াছেন, তার কলে তিনি বাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার কথটা লাইন উদ্ধৃত করিলাম, “I understood the glory of Brahmacharya and realised that the wife is not the husband's bondslave but his companion and his helpmate, and an equal partner in all his joys and sorrows—as free as the husband to choose her path.”—(Young India—January 28, 1926).

প্রাচীনকালের নারীদের সহিত বর্তমান কালের নারীজাতির তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এখানে কেবল প্রাচীনকালের নারী সমত্ব দুই একটা কথা বলিবার মাত্র।

মিশর, বাবিলনিয়া, ভারতবর্ষ এখন সভ্যতার আলোকে আলোকিত, তখন অজ্ঞান দেশ বর্ষভায়া পূর্ণ, এই ভিনটা দেশ ঠিক একই সময়ে সভ্যতার আলোক লাভ করে, (অনেকে এই মতের সমর্থন করেন না) এবং তাহাদের ভিতর স্থলপথে ও জলপথে ব্যবহার-বানিজ্য চলিত; তাদের আদান প্রদানও যথেষ্ট ছিল। এই



সকল দেশের সভ্যতা ঠিক একই প্রকারের ছিল। সেই সভ্যতায়ুগে মিশর, ব্যাবিলনিয়া প্রভৃতি দেশের নারীজাতি স্বাধীন ছিল। অনেকাংশে তাহারা পুরুষের চেয়ে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। মিশরের মেয়েরা ছিল, সম্পত্তির অধিকারী। এই সম্পত্তির অধিকার হইতে বাহ্যতে ছেলেরা বঞ্চিত না হয়, তাহার জ্ঞত তাহারা আপন ভগ্নিকে বিবাহ করিত। জ্ঞাজাতি সম্পত্তির অধিকারী ছিল বলিয়া তাহারা অনেক সময় জ্বর স্বাধীন হইয়া চলিত। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে আজকালও জ্ঞাজাতি পুরুষের উপর আধিপত্য করে; আপন আপন স্বামী বাছিয়া লয়। ব্যাবিলনিয়া তো মিশরের অধিকরণ করিয়া আসিয়াছে। মিশরের মত ভারতের নারীজাতিও সেই যুগে স্বাধীন ছিল। মেয়েরা শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে অংশ লইত। বৌদ্ধ যুগে অনেক নারী-সম্মত বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়া দৃষ্ট হইয়াছেন। বৈদিকযুগে নারীগণ সকল কক্ষেই সমানভাবে কাজ করিতেন। যাপন্য প্রভৃতিতে স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাজ করিতেন, "Women also were proud to be partners in work, of public utility."

অতীতকালে আমাদের দেশে নানা ভাবে বিবাহ হইত। প্রথাগত, ব্রাহ্ম, দৈব, গন্ধর্ব প্রভৃতি বিবাহের প্রচলন ছিল, বালা-বিবাহ যে ছিল না, তাহা নহে, তবে অধিকাংশ মেয়েই—বার বৎসরের পর বিবাহ হইত। গন্ধর্ব-বিবাহের প্রচলনও বঞ্চিত ছিল। ইহা হইতে মনে হয়, বালা-বিবাহ খুব কম হইত। বর এবং কস্তার ভালবাসার জ্ঞত যে বিবাহ হইত, তাহাকে গন্ধর্ব-বিবাহ বলিত। ছেলে মেয়ে উপযুক্ত বয়সের না হইলে এই প্রকার ভালবাসা জন্মিতে পারে না; স্বতন্ত্রাৎ মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ হইত, ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজপুত্রই বয়স্কা কস্তা বিবাহ করিয়াছেন এবং রাজকুমারীগণ অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছেন।

স্ত্রী স্বামীর নিকট এবং তাহার পিতার নিকট হইতে যে সমস্ত বস্তু লাভ করে তাহাকে "স্বীয়" বলে, স্ত্রী স্বীয় ইচ্ছামুতরাং এই ধন ব্যয় করিতে পারে। যদি তার

স্বামী তাহাকে লালন-পালন করিতে অক্ষম হয়; তাহা হইলে সে এই সম্পত্তি হইতে নিজ ভরণ-পোষণ চালাইতে পারে। এই স্ত্রী-ধনের কোন গীমা ছিল না। স্বামী জীবিতাবস্থায় স্ত্রীকে কোন কিছু দিতে চাহিয়া, না দিতে পারিলে, স্বামীর মৃত্যুর পর যদি সে স্ত্রী ব্রহ্মচারিণীর ভ্রাতৃ জীবন অতিবাহিত করিত, তাহা হইলে সে সেই ভ্রাতৃবর অশ্রুস্রব্দ শুন্য পায়। যদি কোন বিধবা বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে সে স্বামী এবং পিতৃদত্ত বস্তু হইতে বঞ্চিত হইত। স্বামীর মৃত্যুর পর কোন স্ত্রী তাহার সম্পত্তির অধিকারিণী হইত না; কিন্তু ধর্মকাণ্ড তীর্থদর্শন প্রভৃতি কাজ করিবার জ্ঞত স্বামীর সম্পত্তি হইতে টাকা পাইত। যদি কোন বিধবা জ্ঞাতদেহের কাহাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে সে "স্ত্রী-দান" হইতে বঞ্চিত হইত না।

যদিও আজকাল কিছু কমিয়াছে, কিছুদিন পূর্বে—আমাদের দেশে বহবিবাহের অবাধ প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের পর বহবিবাহের প্রচলন আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশে কোলিঙ্গপ্রথা সৃষ্টি হইবার পর বহবিবাহের বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়। প্রাচীন ভারতে বহু-বিবাহ রাজ্যস্বা ভিন্ন সাধারণ লোকের ভিতর ছিল না। সাধারণ লোকে বহুবিবাহ করিলে আইনামুখ্যায় দণ্ডিত হইত; তবে এই আইনের অনেক সময় নানা কারণে ব্যতিক্রম ঘটিত। বিবাহের নিষিদ্ধ কয়েক বৎসরের মধ্যে যদি তাহার স্ত্রী কোন সন্তান না হইত এবং যদি সে সন্তানলাভের ইচ্ছা করিত, তবে সে বিবাহ করিতে পারিত। কোন নারী বার বার মৃত সন্তান প্রসব করিলে তাহার ঋতু বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত না। কোন স্ত্রী স্ত্রী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইলে স্বামী পুনরায় বিবাহ করিত। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে স্বামী পুনরায় বিবাহের অধিকারী হইত।

পুরুষের যেমন নানা কারণে অনেক স্ত্রী-সংহাস করিবার ব্যবস্থা ছিল, স্ত্রীলোকদিগেরও তেমন নানা কারণে অনেক স্বামী সংহাস করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু আইন অমান্য করিলে দণ্ডিত হইতে হইত।

নানা কারণে স্ত্রী স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সখ্যা অবস্থায় বিবাহ করিতে পারিত। "শূদ্র, বৈশ্য, ক্রিয়" ও ব্রাহ্ম জ্ঞাতীর স্ত্রীগণ এবং বাহাদের কোন সন্তান হয় নাই, তাহারা বিদেশগত স্বামীর জ্ঞত একবৎসর অপেক্ষা করিলে। কিন্তু তাহারা যদি কোন সন্তান প্রসব করিয়া থাকে তাহা হইলে এক বৎসরের অধিক সময় অপেক্ষা করিলে। যদি তাহারা জীবিকানির্ভারের জ্ঞত ধন পায়, তাহা হইলে এই মাত্র (উপরে) উল্লিখিত সময়ের বিশ্রাম সময় অপেক্ষা করিলে।" ইহার পর যদি তাহারা জ্ঞতি দ্বারা লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করিতে পারে। জ্ঞতিবর্গ পরিত্যাগ করিলে, বিবাহ করিতে পারে। যদি কোন যুবতী নারীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয় তবে সে পঞ্চম ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিতে পারে এবং যে যুবতীর স্বামী নিরুদ্দেশ কিন্তু জীবিত আছে বলিয়া শুনা যায়, এইতপ অবস্থায় যুবতী সপ্তম ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে। বিধবাব্য ইচ্ছামুখ্যায় বিবাহ করিতে পারিত। যদি কেহ বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচারিণীর মত থাকিত, তাহা হইলে স্বামীর সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণের জ্ঞত ভাতা পাইত।

কোন স্ত্রী স্বামীকে যুগা করিলে এবং জ্ঞত কোন পুরুষের প্রেমে মজিলে সে তাহার "স্বীয়" তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইত এবং সে স্বামী জ্ঞত এক রমণীকে বিবাহ করিত। স্বামী-স্ত্রী দুইজনের ইচ্ছায়

বিবাহ বন্ধন ছেদ হইতে পারে; কিন্তু একজনের ইচ্ছায় বন্ধন ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারিত না।

অতি প্রাচীনকালে যখন লিখন আরম্ভ হয় নাই, তখন মুখে মুখে মেয়েদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহা ভিন্ন গৃহ-কর্ম, সন্তান-পালন, পশু-পক্ষী, গৃহ-পালিত জীবজন্তু প্রভৃতির যত্ন করা শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই শিক্ষার প্রভাবেই আমরা, সীতা, রম্যসী, সাবিত্রী, ভোগদী, হৃত্তী, অহল্যা, রাজসী প্রভৃতি প্রাতঃসংগীয়া রমণীগণের পুণ্য-কাহিনী ভনিয়া দৃষ্ট হই।

স্ত্রীলোক বাহিরের অনেক কাজেই যোগ দিত, কিন্তু গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করাই তাহার প্রধান কাজ ছিল। এক একটা সংসার এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের সর্বময় কর্তা বাড়ীর গিন্নী। বাড়ীর ছোট বড় সকলেই তাহাকে মানিয়া চলিত এবং তাহার উপদেশ মত কাজ করিত। অম্বর মহলের কোন কার্যেই পুরুষ লোক হাত দিতে পারিত না। এই গিন্নীর বন্দোবস্তের জ্ঞতই প্রত্যেক সংসারে শাস্তি বিরাজ করিত। আমরা এখন প্রাচীন ভারতের ছোট-বড় সকল নারীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখ যে, অতীত ভারতের অতীত গৌরব আর নাই; এখন কেবল সেই সভ্যতার যত্নসহ বর্তমান নারীজাতির বৃদ্ধির উপর দাঁড় দাঁড় করিয়া জলিতেছে, আর বর্তমান গভীকৃত নিষ্ঠুর সমাজ তার ইচ্ছা যোগাইতেছে।







মহাভাগবত

# ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চলন

## মতের পরীক্ষা

ছয় সাত বৎসর বয়সে বিদ্যাত্মাদের জন্ম হুলে প্রবেশ করিয়া আমি যোল বৎসর বয়স পর্যন্ত তথায় ছিলাম। বিদ্যালয়ে সঙ্গল রিখয়েই শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ধর্ম-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষকের নিকট হইতে আমি জানাচ্ছিনে কোন বিশেষ সহায়তা লাভ করি নাই। তাঁহাদের শিক্ষার ভার আমাকে গুরুতর-রূপেই আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমার পারিপার্শ্বিক অনেক ঘটনা হইতেই আমি আমার জীবনের বহু শিক্ষা ও স্মৃতিজ্ঞাতা সঞ্চয় করিয়াছি। ধর্মের প্রধান সাক্ষ্য আমার নিকট ইংই মনে হয় যে ইহাতে আত্ম সংকে জ্ঞান জন্মে, ইহা মানবকে তাহার জাতিবিশিষ্টতায় আত্মবৎ হইতে শিক্ষা দিয়া থাকে।

আমরা দৈনন্দন ছিলাম এবং সর্বদাই বিদ্যুর-মন্দিরে গমন করিতাম। কিন্তু ইহাতে আমার অন্তরের কোন টানই ছিল না। পুস্তার আড়ম্বর ও উৎসব আমার তেমন ভাল লাগিত না। আমি স্মৃতিতায় তথ্য নানা রূপে নানা প্রক্ৰিয়া সাধনে অমর হওয়া যায়। এক সন্ধ্যা আমি মোটেই বিশ্রাম করিতে পারি নাই।

ধর্মমন্দিরে গিয়া আমি যে মহাসত্যের গন্ধান পাই নাই—তাঁহা পাইয়াছিলাম আমাদের পরিবারের একজন পুরাতন বৃদ্ধ দাসীর নিকট হইতে। সে আমাকে শৈশবে মাহুৎ করিয়াছিল। আমি পুর্ন্থই বলিয়াছি স্মৃত প্রেক্তে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ও ভর ছিল। সেই দাসী আমাকে এই ভর হইতে ষাঁচাইবার জ্ঞান রাম নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। তাহার উপর আমার বড়ই বিশ্বাস

ও মাহা ছিল। তাহার প্রবোচনায় সেই তরুণ বয়সে আমি রাম নাম উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিলাম। শৈশবে আমার অন্তরে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা কালে হুলল প্রসব করিয়াছে। আমার বর্তমান জীবনেও আমি রামনাম উচ্চারণের মাহাত্ম্য স্মৃতিতে পারি নাই।

এই সময় আমার এক আত্মীয় ভ্রাতা আমাদের ছুই ভায়ের জন্ম 'রামায়ণ' পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আমরা তাঁহা মুখস্থ করিতাম এবং প্রতিনিয় প্রভাতে যানের পর আবৃত্তি করিতাম। আমরা রাজ্যকাটে যাওয়ার পরও সকল প্রথা উঠিয়া যায়। কারণ আমার ইহাতে ততটা আসক্তি ছিল না। ভ্রাতার কথা মামিতে এবং রামায়ণের স্নোক বিস্তৃত ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতামি এই আমাকেই আমি অধ্যান করিতাম।

কিন্তু একটা বয়ে রামায়ণ পাঠের প্রতি আমার অন্তর প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমার পিতা অল্প বয়সের সময় প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সপুত্রে রামায়ণ-গান হইত। ইহার পাঠক ছিলেন শ্রীমারজ্যের অকপট ওজ্জ্বল বিশ্বের মন্দিরের মহাবীজ্ঞ। তাঁহার হুই রোগ ছিল। তিনি বলিতেন যে নানারূপ ঔষধাদিতে বিফল হইয়া তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে বিয়হের নিকট উৎসর্গীকৃত বিশ্বপণের প্রলেপ দিয়া এবং রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহার রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা ইহা অবিশ্বাস করিতাম না; হৃদয় ইহা সহ্য হইতে পারি। মহাবীজ্ঞ যখন রামায়ণ পাঠ করিতেন তখন তাঁহার দেহে যে কোনকালে সুষ্ট রোগের কোন চিহ্নও

ছিল তাহা মনে হইত না। তিনি তাঁহার সপুত্রের কণ্ঠে পোহার গভীর তবণুণ ব্যাধা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। আমরা বয়স তখনো তেরো বৎসর। এই ঘটনাতেই রামায়ণের প্রতি আমার গভীর আস্থা জন্মে। আজিও হুলগীদানের রামায়ণকে আমি সকল ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে করি।

ইহার কিছু দিন পরেই আমার রাজ্যকাটে আমি। তথায় রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা হইয়া গেল। প্রতি একা-দশী দিন ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি প্রায়ই তাহার শ্রোতা থাকিতাম। কিন্তু ইহার পাঠক হুলল ছিলেন না। আমি ওজ্জ্বল ভাষায় মনোযোগের সহিত ভাগবত পাঠ করিয়াছি। আমার একুশদিনব্যাপী উপাধাের সময় পিত্ত মননমোহন মাদব্য মধ্যম ভাগ-বতের কোন কোন অংশ আমার নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনিয়াছিলাম; আমার মনে হয় শৈশবে তাঁহার মত অণাটকের কণ্ঠে ভাগবত অবর্ণের হুমোগ হইলে আমি ইহার প্রতি যথেষ্ট অমরজ হইতে পারিতাম। কারণ শৈশবেই যে কোন হৃদয়নাবৃত্তি অন্তরে দুল্লভে প্রোথিত হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের সনকরূপ নীতি এবং অপরূপ ধর্ম সঙ্কে এই নানারূপ তথ্য লইবার হুমোগ খটাইয়াছিল আমার রাজ্যকাটে থাকিবার সময়। আমার পিতা-ভ্রাতা সে সময় মধ্য-নির্দার দর্শন করিয়া কেউইহেমন এবং আত্ম-বিগলকে সঙ্গে লইতেন অথবা স্বতন্ত্র ভাবেও পঠাইয়া দিতেন। বৈদ্য সন্ধ্যাঙ্গীরা প্রায়ই পিতার কাছে আসিতেন এবং ধর্ম সঙ্কে আলোচনা করিতেন। ধর্ম বিগহিত হইলেও তাঁহার আমাদের হাতে বাজ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ইহা ভিন্ন পিতার অনেক মুসলমান ও পার্শ্ব বদ্ধ ছিলেন। তাঁহার আপন আপন ধর্ম সঙ্কে পিতার সহিত আলোচনা করিতেন। পিতা শ্রদ্ধা ও আত্মহের সহিত তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিতেন। পিতার সেবা করিতে যথেষ্ট হুমোগ পাইতাম। ইহা হইতেই সনক ধর্মের সঙ্কেই একটা মোটামুটি রকমের ধারণা আমার জন্মিয়াছিল।

কেবল ঐষ্টানধর্ম সঙ্কে কোন জ্ঞান লাভের হুমোগ তখন পাই নাই। ইহার প্রতি আমার সাধারণতই বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। ইহার কারণও ছিল। সে সময় ঐষ্টান মিশনারীগণ হাই স্কুলের নিকট ঝাড়াইয়া বাহ বিদ্যুত করিয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতি যুগ্ম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অলম্ব্য প্রচার করিবার প্রয়াস পাইতেন। আমি ইহা সহ্য করিতে পারিতাম না। এই সময় একজন যুগ্মরচিত হিন্দু ঐষ্টান ধর্ম গ্রন্থ করেন। ইহাতে নগরে প্রবল জনবহু-রটে যে যুগ্মন হইতে হইলে গোমাংস আহার ও মতগান অপরিস্থা। ইহা ভিন্ন তাহাকে জাতীয় পরিচ্ছদ পরিভাগ করিয়া ইউরোপীয় গোষাক পরিতে হইবে এবং মাধব টুপি বিতে হইবে; ইহাতে এই ধর্মগ্রন্থ প্রতি আমার পদ আঘাত করিতে হইয়া পড়ে। আমি ভাবিয়াছিল যে ধর্ম মত পান করাতেই গোমাংস থাইতে এবং জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করে সে ধর্ম কখনই ধর্ম পদবাচ্য নহে। আমি আরও শুনিয়াছিলাম নব-নীকিত যুগ্মগান তাহাদের পুর্কর্তন ধর্ম, দেশ ও আচার ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সকল ঘটনাতেই যুগ্মনধর্মের প্রতি আমার অন্তর বিমোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সঙ্কে আমার কোন ঝির ধারণা ছিল না। এই সময়, পিতার সংগৃহীত পুস্তক রানির মধ্যে হইতে মহানবহিতা থানি পাঠ করি। ইহার দৃষ্টবাদ এবং এই জাতীয় অপরূপ বিষয় পাঠ করিয়া আমার মন ক্রমে নাত্তিকতার বন্ধীভূত হইয়া পড়ে। আমার একজন শিক্ষিত জাতি ভ্রাতাকে আমি একথকে প্রদ্র করিয়াছিলাম। তাহাকে আমি যথেষ্ট তক্তি করিতাম। তিনি ইহার কোন জ্ঞাবহ না দিয়া আমাকে বলিলেন— তুমি বড় হইয়া ইহা জানিতে পারিবে; তোমার মত অকালপঙ্কের জন্মও সকল তথ্য রচিত হয় নাই। স্কুল হইয়া তাঁহার কথা জ্ঞাবহ হই নাই। কিন্তু যথেষ্ট বিচার ভেদ এবং মহানবহিতার এই সকল তথ্য সর্বাঙ্গই আমার চিত্ত আলোড়িত করিত। আমি ভাবিলাম জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া ইহা ক্রমশঃ জানিতে পারিব।







"বহুদূর সম্ভব কম খাটিব, আর বহুদূর সম্ভব বেশী আরামে থাকিব,"—এই ছিল গ্যাভেনিনোর জীবনের মূল নীতি। তাহার বাপ রেল আপিসের সামান্য বেতনকেই কেরানী। তিনি চারিটি ছেলে মেয়ে মাছধ করিয়া ছোট ছেলে গ্যাভেনিনোকে বেশী কিছু লেখা পড়া শিখাইতে পারেন নাই। গ্রামের ছুটটা ঘড়টুকু বিজ্ঞান দান করিতে পারে ততটুকু বিজ্ঞান অল্প করিয়াই গ্যাভেনিনো বাড়ীতে শিকড় গাড়িয়া বসিলেন। "অতীত" ভাই বোনরা, কেহ দক্ষীর দোকানে, কেহ টেলিফোন আফিসে চাকরী করিয়া দরিদ্র পিতার সংসার যাক্সা নির্বাহে সাহায্য করিত। গ্যাভেনিনো চালাক ছেলে,—বিনা পরিশ্রমে ধন্যসম্ভব হুণ ভোগ করা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। গ্রামের স্থলের শেষ গরীকাটার জন্ত প্রস্তুত হইতে গ্যাভেনিনোর শরীর অধৈর্য্য হইয়া গিয়াছে। বাড়ী বসিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া শরীরটাকে সে মোহামত করিতে লাগিল।

গ্যাভেনিনোর আশ্রয়টা খুব উচ্চ ছিল বটে; কিন্তু সে আশ্রয় অস্থায়ী চলা-চল তেমন সহজ নয়। বাপ মা মাঝে মাঝে পুত্রকে কাছের চেষ্টা দেখিতে বসেন। ছেলে বলেন,—সবুর কর, কিছুদিন বাড়ী বসিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া লই; তাহার পর কাজে লাগিব।

গ্যাভেনিনোর সহায়-সম্পত্তির মধ্যে ছিল,—সু-চেহারা। সে ভাবিত এই সময়েই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বাপ-ভাই-বোনের রক্তচিহ্নিত অন্ন ধন্য করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার চেহারাটা আরও উজ্জ্বল ও ঝট-পুট হইয়া উঠিল। কিন্তু শরীর খারাপ; বিশ্রামের দরকার। হুতরাং গ্যাভেনিনো বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন, কাজ-কৰ্ম্মে চেষ্টা আর করা হইল না। বাপ মাযের ছোট ছেলে—একটু বেশী আত্মত্ব, ভাল জিনিষটি খাইব, ভাল পোষাকটি পরিব—ছেলের এসব আশ্বাস যে পূরণ হইত, এ কথা বলাই বাহুল্য।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করিয়া, খগড়া

করিয়া বড় ভাইকে লুকাইয়া লুকাইয়া নড়ল পড়িয়া, সন্ধ্যার সময় চার পাঁচ জন বন্ধুর সঙ্গে সহরের নিম্নমাতে গিয়া, গ্যাভেনিনো দিনগুলি বেশ সহজ ভাবে কাটাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু শরীর আর সেরে না। বহুসং বহুর হুড়ি হইতে চলিল, পোক জোড়াটি চাড়া দিবার মত বড় হইয়া উঠিল—শরীরের রক্তটাও বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সকালে সন্ধ্যায় সে ভাল পোষাক পরিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ও শিশু দিতে দিতে বেড়াইতে যাহ,— কিন্তু গ্যাভেনিনোর শরীর আর ভাল হইল না।

তাহার হাতেও দু-পাঁচ টাকা আসিয়া পড়ে। কিন্তু রোগধার হয় কি করিয়া ইহাও বাড়ীর ও পাড়ার লোকের নিকট একটা মন্ত বহুস্ত। ক্রমশঃ দুই অঙ্গুলিতে দুইটি আঙুলিও হইল। বেশী দায়ের একটা চুপিও মাথায় উঠিল। কিন্তু টাকা আসে কোথা হইতে? গ্যাভেনিনো—হাসে আর মনে মনে ভাবে এইবার একটু একটু করিয়া আমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে—বহুদূর সম্ভব কম খাটিয়া বহুদূর বেশী স্বখভোগ করিতেছি।

সহরের অগ্নি-গলি সমস্তই তাহার যেমন জানা শুনা আছে—এমনটি তাহার সমবয়সী আর কেউ জানে না। সে এখন পরোপকারে মন দিয়াছে। সহরে যে সকল বিদেশী আসে, সে তাহাদের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। হোটেলের হোটেলের গিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া তাহা-বিগকে সঙ্গে লইয়া সহরের ঐশ্বর্য্য হানগুলি দেখাইয়া, তাহাদের খরচায় ভাল ভাল স্ফুটীয়া ও মটর চড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। এই তঁ, গেলি, বিদেশের কাজ। আবার সন্ধ্যার পর সহরের পল্লী বিশেষে লইয়া যাইবার জন্ত বদৌলী ও বিদেশীয় অনেকেই গ্যাভেনিনোর সাহায্য লইত,—কেমনা সহরের সেই পল্লীর সমস্ত পল্লী-বাসিনীর সম্মান গ্যাভেনিনো রাখিত।

উপকারীর প্রত্যাশার কথা সভ্য-সামাজ্যের নিয়ম; হুতরাং পরোপকারবৃত্তি গ্যাভেনিনোর পকেটও বেশ ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—অমন স্বন্দর চেহারা;

মোলায়েম ব্যবহার ও কথাবার্তা সকলের মনোহরণের পক্ষে যথেষ্ট। গ্যাভেনিনো তাহার স্বন্দর চেহারার জন্ত বিশ্বাসকে কখন কখন ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ করিত। গ্যাভেনিনো সেই সঙ্গে তাহার পিতা মাতার স্বপ্ন ও কেবল ধন্যবাদ দিয়াই শোধ করিত।

গ্যাভেনিনোর পুশার জমিয়া উঠিয়াছে। বেশ রোগধার হইতেছে—ব্যাকে একটা হিসাবও ঘুলিয়াছে—মোটরভর্য্য এক দশও চলে না। স্বপ্নাধারের সঙ্গে মাল আরম্ভ এমন সময়ে গ্যাভেনিনোর ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল। সে মোটর গাড়ী চাপা পড়িল। কেমন করিয়া যে ছুটীঘাটা ঘটিল; কাহার দোষে যে ঘটিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু গ্যাভেনিনো যে মটর চাপা পড়িয়াছে এবং হাসপাতালে গিয়াছে—ইহা স্বস্মৃতি। আঘাত গুরুতর। কিন্তু মরে নাই; তবে হাসপাতালের সার্জনদের মত যে তাহার বা পায়ের হাঁটু পর্যন্ত এবং বা হাতের কহই পর্যন্ত কাটিয়া বাদ দিতে হইবে।

ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া গ্যাভেনিনোর মুখটা খানিক "খাঁ" হইয়া রহিল, তাহার পর অধর ও ওষ্ঠ দ্বীয়ে দীয়ে সম্মিলিত হইল। সেই সঙ্গে তাহার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আনন্দাশ্রু! হ্যা; আনন্দাশ্রু বর্ড—কেনে না—গ্যাভেনিনোর প্রাণের আনন্দ চক্ষে মুখে ছুটিয়া উঠিতেছিল। তবে কি গ্যাভেনিনো তাহার জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত পা বাড়াইতেছেন!

অস্ত্রোপচারের দিন টেবিলের চতুর্দিকে গ্যাভেনিনোর পিতা, মাতা, ভাতা ও ভদ্রী সকলে একত্র দাঁড়াইয়া অশ্রুই মোচন করিতে লাগিলেন এবং সহরের সমস্ত মোটর গাড়ীর মালিক ও চালকদের অভিমুখ্য হইতে লাগিল গ্যাভেনিনোর সেজ ভাই দুই হাত মুঠা করিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিয়া রোষ-রক্ত নয়নে অপর্যায়ী মোটর চালকের উপর প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল।

এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে গ্যাভেনিনো কিন্তু অচল অটল—নির্ভীক। শয্যা পার্শ্বের রঙাধারন পিতাকে ইঙ্গিত করিয়া আরও কাছে আসিতে বলিল। তাহার পর পিতার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি

বলিল, "বাবা! মোটর গাড়ীর নম্বরটা" দেখিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছি। নম্বরটা—"

নম্বরটা বলিয়াই মুচ্ছা,—অস্ত্রোপচারের ভয়ে নয়,—এমন যে স্বন্দর চেহারাটি তাহার,—ছুটি আস্তরের অভাবে কি বিশ্রী দেখাইবে এই ভবিষ্যৎ ভাবনায়। সার্জন বা হাত ও বা পাটার খানিকটা কাটিয়া বাদ দিল। কিছুক্ষণ পরে গ্যাভেনিনোর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। প্রথমে সে বুদ্ধিতে পারিল না, যে তাহার কি হইয়াছে। তাহার পর যখন, তাহার ভান হাতটো বাম হাতের সম্মানে এবং ডান পাটি বাম পায়েব সম্মানে পাশের দিকে ফিরিল তখন সে বুদ্ধিতে পারিল,—নাই, সে অঙ্গহতী যথ্যে নাই।

গ্যাভেনিনো বিছানায় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। স্বন্দর চক্ষু দুটি জ্বলে এবং মন আত্মকে পূর্ণ। পরদিন বৈকালে গ্যাভেনিনো পিতা-মাতা গ্যাভেনিনোকে দেখিতে আসিলেন। পুত্রের অসুখ দেখিয়া পিতার চক্ষু আর্দ্র হইল; মাতা শোকারেণ দমন করিতে না পারিয়া কাঁধিয়া উঠিলেন।

গ্যাভেনিনো পিতামাতাকে দেখিয়া অন্যাত হাত ধানি ঈষৎ তুলিয়া ধরিলেন, যেন তাহার শোকারুল মাতা বুদ্ধিতে পারেন যে তিনি এখনও পুত্রহীনা হন নাই। সহাতে বলিলেন,—"না কেনো না। আমি বেঁচে আছি; মরি নাই। এইবার মোটরের মালিক শা—কে দেখে নের।"

গ্যাভেনিনোর পিতা গভীরভাবে বলিলেন, "আমি কি সাধ করিয়া সোশিয়ালিষ্টিক মতের সমর্থন করি। যত দিন না মনী ও পরিষদের মধ্যে ব্যাধান লোপ হয় তত দিন পুত্র, আমাদের সংগ্রাম শেষ হ'বে না।"

গ্যাভেনিনো পিতাকে বলিল, "বাবা, আমি ওসব বড় বড় কথা বুঝি না; একটা সোজা কথা বলি, তুমি সলিসিটর (Solicitor) টুলোডেনোকে একবার ডেকে দিতে পার ?" আইনজ্ঞ টুলোডেনোকে ডাকিয়া পাঠাইবার কারণ গ্যাভেনিনোর পিতা ভালস্কর অস্থায়ন করিতে পারিলেন না, একবার তাহার মনে উদ্র হইল, পুত্র তবো কি মৃত্যু আসা জানিয়া উইল করিবে।



টুলোভোনা কে টেলিফোনে ডাক। হইল তিনি স্বয়ং আশিয়া উপস্থিত হইলেন। টুলোভোনার সহিত গ্যাভেনিনোর অনেকক্ষণ চুপি চুপি পরমেশ চলিল। অপরূপে টুলোভোনা সেখানেই বলিয়া উঠিলেন, “বাহবা ছেলে! বেশ পরিচয় তোমার মাথা!”

গ্যাভেনিনো পরিবার-সদস্যবলে মোটর গাড়ীর মালিকের ব্যাটেতে উপস্থিত হইল। তিনি বিপদ যে আসন্ন তাহা ভাল রূপেই বুঝিলেন। গ্যাভেনিনোর মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন—“হ্যাঁগা মহাশয় তুমি আমাদের সর্বনাশ করিতে আমার ছেলেকে মাঝে। গ্যাভেনিনোর পিতা চক্রে ক্রমাল দিলেন। তাঁহার পাতা ভগিনীরা “কোরসে” কাঁদিয়া উঠিলেন। মোটর গাড়ীর মালিক প্রবাহ গণিলেন। সবিশেষ বলিয়া উঠিলেন। আমি—আমি এই ত খবর সেলুন, বোম্বী বৈতে আছে। তবে কি—এরই মধ্যে—” সলিসিটর টুলোভোনা বেশ গাভীর সঙ্গে উত্তর দিলেন, “বহাশ, বোম্বিক সহ্য-ভুক্তি দেখিয়ে আপনি জগৎকে প্রভাবিত কর্তে পারেন, করেওছেন,—কিন্তু আইনকে প্রভাবিত কর্তে পারেন না। কিছুতেই নয়—আপনার অগাধ ঈর্ষ্যা সত্ত্বেও নয়—”

মোটরের মালিক অবাধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন— টুলোভোনা আবার গাড়ীর তাবে আরও কহিলেন,— “বড়ই দুঃসের বিষয়, ব্যাপারটার গুরুত্ব আপনি উপলব্ধি কর্তেন না।” মোটরের মালিক কহিলেন, “আপনি কি বদ্বছেন, বৃত্ততে পাচ্ছ না।”

টুলোভোনা প্রেম-মিশ্রিত স্বরে—কহিল, “আপনি যে পুরুষ মানবের অধিকারী, তার সিল্কের সিল্কিও যদি আপনারই গন্ধি গন্ধাক্ত, তা হ'লে ব্যাপারটা বৃত্ততে আপনার এত বিলম্ব হ'ত না। স্বতরাং আমিই খুলিয়া বলি; দেখুন, এই পরিবারের একমাত্র অবলম্বন সেই যুবক, যাঁকে আপনি বৃত্ত্যুর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েছেন। আরও যুবক যদি প্রাণে বাঁচে, জীবনটা তার বাহ্য হয়ে যাবে—অন্ততঃ আমি আমার মঞ্চকলের পক্ষ হইতে আপনাকে নোদাখি দিচ্ছি যে যদি চলিল খটখট মধ্যে আমার মঞ্চকলের এই গুরুতর কতি পূরণ সৎক্ষে আপনি স্ববন্দোবস্ত না করেন, তাহা হ'লে আমার মঞ্চকল-গণ

আপনার বিরুদ্ধে আদালতে ৫০,০০০০ ফ্রাঙ্কের হাবিতে কতিপুর্ণের নালিশ কর্তে বাধ্য হ'বেন।”

মোটরের মালিক দেখিলেন মহা বিপদ। শেষে একটা রকম করিতে বাধ্য হইলেন। গ্যাভেনিনো এবং তাহার পিতা যুব মোটর রকম টাকা কতি পূরণ পাইলেন, অধিকন্তু গ্যাভেনিনোর একটা মোটা মাসহাবার বন্দোবস্ত হইল। আইনের জয় হইল। গ্যাভেনিনো তথা আইনজ্ঞ টুলোভোনা তথা মোটরের মালিকের মুখে হাসি দেখা দিল। গ্যাভেনিনোর নিকট আনুকোয়া কব্বরে দশহাজার ফ্রাঙ্কের নোট এবং একখানি মাসহাবার চুক্তি পত্র আসিয়া পৌঁছাইল। গ্যাভেনিনোর মুখেও হাসি দেখা দিল। স্বহস্তি দার্শনিকের মত গ্যাভেনিনো বলিলেন—“দ্বৈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি বাহা করেন, সব মঙ্গলের জন্ম। এই যে তিনি আমার একটা হাত ও একটা পা কেড়ে নিলেন, তার বদলে তিনি আমার—”

গ্যাভেনিনোর কাঠের হাত কাঠের পা হইল; পোষাকের উন্নতি হইল। যখন সে সহরের বড় বড় হোটেল হইতে থানা বাইরা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহিরে আশিয়া পাঁড়ায় তখন সে মনে মনে ভাবে, পরমেশ্বর বর্ধাধী মঙ্গলময়।

গ্যাভেনিনো বাপ-মাকে বলিল, আমি আর অলস ভাবে বসে থাকতে পারি না। আমি কাঁচ চাই; আমার মত যুবক, যদিও অসহীদ, ব'সে ব'সে কাটালে ভগবানের দয়ার অপর্যায়ের করা হবে। তিনি আমাকে হুমকি চেহারা দিয়েছেন কি জন্ম? হাত পা দিয়েছেন (যদিও তার অর্ধেকটা তিনি কেড়ে নিয়েছেন) কি জন্ম? আমি তার সাধ্যবান কর্তন কেন?

পিতা-মাতার নিষেধ না শুনিয়া কর্তব্য-পরায়ণ যুবক গ্যাভেনিনো কাছে লাগিয়া গেলেন। সহরের প্রধান বন্ধের “কুপাথে” ঐ যে ছিন্ন পোষাক পরা পাশে ক্রস লাঠি, স্বপ্নের গন্ধ যুবক একটা আতপ-তাপিত স্থান বাহিয়া লইয়া বসিয়া আসে। ঐ যে হালাকে ধনী নির্দহ মাথাবিত্ত ঘরের পুঙ্খ ও নারীরা শেখ এক কানী, কেহ দুই ত্রাক ভিক্সা দিতেছে এবং তাহার দূর্ব্যগোর জন্ম সহ্যহৃদিত হাঙ্গি হাঙ্গিয়া আধ্যাতিক করিতেছে আর

হুম্বর্ণন গন্ধ যুবকটি হাসি মুখে নভমন্তকে দাড়াগণকে অভ্যাসন করিতেছে আর মাঝে মাঝে পার্থবন্ধিনী হুম্বরী যুবতী মূলগায়ালীর সঙ্গে রমিকতা করিতেছে,—পাঠক উৎসাহে চিনিত প্যারিতেছেন কি! উনিই আমাদের পরিচিত গ্যাভেনিনো! সে এই মূর্তন কাছে লাগিয়া প্রতিদিন বেশ ছ'দুপায়া রোজগার করিতেছে। কিন্তু

সম্ভার পর তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে দেখিলেন যে হুম্বক মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হুম্বর একটা যুবক কাঠের পায়ে ভর দিয়া মোটরে উঠিতেছে। গ্যাভেনিনোর জীবনের মূল নীতি ছিল “বহুদূর সম্ভব কম ব্যাটব আর বহুদূর সম্ভব বেশী আয়ামে থাকিবা” সে সেই নীতি অনুসারে বরাবর জীবন যাপন করিতেছে।

## পুস্তক সমালোচনা

ভারতবর্ষ, মাস ১৩৩২ ৩—“বিভাগপতি” শ্রীহরিশচন্দ্র ঘটক এম-এ রচিত। ইহাকে কাব্যসমালোচনা বলিব, কি বিভাগপতির বাণ্য। বলিব, কি বিভাগপতির গুণকীর্তন (appreciation) বলিব, তাহা ঠিক কথিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অথবা ইহা কাব্য সমালোচনা, বাণ্য। (লৌকিক এবং আধ্যাতিক, ও গুণ্যহুকীর্তন এই তিনের মিশ্রুটি।) যন বিদ্বত্ত “কোটেদন” কটক-অভিক্রম করিয়া লেখার রসমাধুর্য উপভোগ করা যথেষ্ট সাপেক্ষ। শ্রীচাক্রচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্নী-এট-ল “বিবাহ ও সমাজ প্রসঙ্গ” প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিবাহ ও সমাজ নারীর হান সৎক্ষে পাশ্চাত্য ও প্রভূতী উভয় মতবাদ হনিপুণ ভাবে বিশ্লেষিত করিয়াছেন এবং যুক্তি বলে প্রভূতী মতের সমর্থন করিয়াছেন। আরো প্রবন্ধটি পড়িয়া ভ্রূপ হইয়াছি; এই প্রবন্ধটিই আলোচ্য সংখ্যার একমাত্র সাধারণ প্রবন্ধ। ইহার পর শ্রীমলিনী-মোহন মাস্তাল ভাষ্যভট্টরচয়িতার লিখিত “ঐবিক্ত সাহিত্যের কাল” উল্লেখ যোগ্য। লেখক মহাশয় নিজে এ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই বটে, কিন্তু যথেষ্ট কাল নির্ণয় সৎক্ষে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত যে সমস্ত আলোচনা বাহির হইয়াছে; তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন।

“শরীর-পাশন বিবি” ভক্তার নিবারণচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লিখিত ভাষ্যভাষ্য বিষয়ক প্রস্তাব। সাধারণের সুপরিচিত পীড়া সকলের নিদান, লক্ষণ, শুদ্ধতা, পথ্য, ঔষধ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, অবাস্তব কথার অবতারণা না করিয়া অতি সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন। পাঠক মাত্রই এ প্রবন্ধ পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীপ্রসন্নদেবী দেবীর রচিত “আত্মভোগ” (দেশভক্ত স্রাব এ, চৌধুরীর জীবন বৃত্তান্ত বেশ হইতেছে। লেখিকার নিকট আমাদের এই অভিযোগ যে মনের এই

স্বভাবটি তিনি প্রতিবারে অতি অল্প পরিমাণে পরিবেশন করিতেছেন; ইহাতে পাঠকের তৃষ্ণা হ'ত না।

মিনন—পূর্ণিমা, মনের পরশ, হাই-কেন, দম্ব, কোম্পার ফলাফল, দক্ষিণপথ, মোটরে কাম্বার যাত্রা, এই কয়টি লেখ্যকল্প: চলিতেছে, “জানিনি পথের কোথায় শেষ?” এবার “দক্ষিণপথে” সম্পাদক মহাশয় কাব্যসমালোচকের বিবরণ দিয়াছেন, লেখার মাধুর্যে “দক্ষিণপথ” স্ব-পাঠ্য হইতেছে।

নরেন্দ্র দেব বাবুর “ত্রিপিণ্ড আক্রিমা” সম্বন্ধে একটা বিষয় সম্পাদকের দৃষ্টিপথে আনিতে ইচ্ছা করি—লেখার সহিত চিত্রগুলি ভাল রাখিয়া বাইতে পারিতেছে না। কয়েক সংখ্যা হইতে লক্ষ্য করিতেছি, বর্ণিত বিষয়ের সহিত প্রকাশিত চিত্রের কোন সম্বন্ধই নাই, কতকগুলি ছবি ছাপিয়া কাগজের “গুরুত্ব” বর্ধন যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সতর্ক করা।

গল্প লেখক মালিক ভট্টাচার্যের “অরিত্ত্ব” নামে বড় গল্পটি এই সংখ্যায় শেষ হইল। আমরা গল্পটি পড়িয়া ভ্রূপ হইতে পারি নাই হইয়া দুঃখের সহিত নীকার করিতেছি। লেখার কোথাও মাসিক বাবুর লেখার বিশেষণ পাইলাম না। শ্রীমলা বহুর “কালের প্রবাহ” চমকসহি গল্প—সম্ভাব্য এবং দল বিশেষের উপর কটাক্ষ আছে, এমন গল্প না লিখিলেই ভাল হইত।

“রথ-চক্র” মঙ্গল রায় এম-এ রচিত একাধ নাটিকা। লেখার গৃহ বেবেশ ও Ghost-এর ছায়া পড়িয়াছে। Dramatic effect সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা সৎক্ষেও লেখাটি অন্তর পূর্ণ করে না। কেবল “রথ-চক্রের” বর্ধর নির্ণায়ক করণতের পীড়া উপদান করিল। কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রসন্ন মোহের “নির্দোষ” এবং শ্রীভূক্ত প্রবোধ-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বারানদী-বিদার” উল্লেখযোগ্য।





### শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাইশ

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। লতিকার পাছা হইতে এখনও ফিরিল না কেন? করুণাময়ীর মনে নানান চিন্তা উঠিতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—এতদূর ত তারাদের আগা উচিত ছিল। বার বার বলিয়া দিয়াছি সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিবে, তবে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? স্নেহময়ী জননী! নানা প্রকার অশ্রদ্ধ চিন্তা করিয়া যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এই সময় বিমল সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এরা কি এখনও আসিয়া পৌছায় নাই?”

“না, বাবা বিমল এখনও আসে নাই। সবাই ছেলে মাছ, পাছা ছল জায়গা, কি জানি কি হলো? মনে হচ্ছে নিজে ছুটে যাই। এত পেরি হবার ত কথা নাই।”

বিমল সাধনা দিয়া বলিল, “কোন চিন্তার কারণ নাই, সমস্ত তাহাদের দুজন লোক আছে। উমেশ বাবু এখন আসছেন তখন না আপনি কিছু ভাববেন না। রাত্তায় হয় ত সব ঠেই কই করতে করতে আসছে—সে জন্ত দেরি হবার খুব সম্ভাবনা।” নয়ত সব মহম্মাদের হুটিয়ে নেমে তার সঙ্গে গল্প কহে।”

“একথা বা বলো, তা মনে হয়। মহম্মা মেয়েটি কিন্তু বড় লম্বা। কে বলবে, যে বেদের খয়ের মেয়ে। রূপে গুণে, কথাবার্তা, লম্বায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে আছে। ওকে ত বাবা, আমার বেদের মেয়ে মনে করতে কোন দিক থেকেই ছোঁয়া হয় না। হাজারে এমন স্বন্দরী একটা মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি কথাগুলি মিষ্ট কি বল বিমল?” “বিমল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “মা, ওর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। আমি যে এ জীবনে মহম্মার ধর পণিশোধ করতে পারব না। আপনি ত সব শুনেছেন। এমন সরল, উদার প্রাণ আজ কাল বড় দেখতে পাওয়া যায় না। পরের জন্ত ওর প্রাণ সর্বদা কাতর। আমার কিন্তু মা জানি না কেন মনে হয় ও যেন বেদের মেয়ে নয়। দেখেছেন ত কি স্বন্দর বাবুলায় কথা বলে।”

“আমার কেবল তাই সম্ভেদ হয়। আঃ! কোন অভাগীর বুকের ধন হয় ত চুরী করে এনেছে। শুনেছি ওর সেই বুড়া ভাড়াটী নাকি ভারি বজ্জা, আমাদের বাড়ী আসতে দিতেও পছন্দ করে না। যেহেতুকে যেন কয়েদ করে রেখেছে। প্রায় পনের বোল বঙ্গর বয়স হয়েছে, কিন্তু কেমন ছেলোমাছের মত সরল—সমসারের কোন ভাল মন্দ বোঝে না।” বিমল বলিল, দেখুন না, এইখানে একজন

[দ্বিতীয় বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা]

স্মৃতি-রেখা

৯৩১

বেশ ভাল জ্যোতিষী আছেন। লোকটা এদেশীয় হ'লে কি হয়; খুব ভাল গুণতে পারে। হাত দেখে এমন বলতে পারে যে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। আমার মনে হয় তাকে নিয়ে একবার মহম্মার হাত দেখালে হয় না। তা'হলে হয় ত অনেক কথা বেরিয়ে পড়তে পারে?” করুণাময়ী একথা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে গিয়া যেন নিরাশ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, “এখানে এমন ভাল জ্যোতিষী আছে এতদিন একথা ত বলনি। উনি তা শুনে মহা আনন্দিত হ'বেন। তুমি যে কথা বললে খুব সত্যিকার কাজের কথা। মহম্মা সম্মত হ'লেও সেই সখী ব্যাটা একবার যদি আমাদের অভিপ্রায় জানতে পারে, তা'হলে কি আর কোন দিন মহম্মাকে এখানে আসতে দেবে?”

এই সময় হরেন্দ্র বাবু বেড়াইয়া ফিরিলেন। করুণাময়ী ও বিমলকে যাবের নিকট ঠাড়াইয়া গল্প করিতে বৈথিয়া বলিলেন, “দম্ভা হয়ে গিয়াছে। এখানে পাড়িয়ে কেন? ঠাণ্ডা লাগতে পারে। খয়ের মধ্যে এসো বিমল।” স্বামীর কথায়, করুণাময়ী বলিলেন, “ছেলেরা এখনও ফিরে নাই, সেই জন্ত এখানে পাড়িয়ে ভাবছি এত দেরী হবার কারণ কি?”

হরেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, “তা'দের গাড়ী রাত্তায় বেধে এসেছে—এসে পড়ল বলে কোন চিন্তার কারণ নাই। গরুর গাড়ী চোত পা, পা, করে চলবে।” তার পর বিমলের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৌমা বেশ ভাল আছেন ত? ক'দিন তাঁকে দেখতে পাইনি কেন? বিমল মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “রোজই ত মার কাছে আসে।” করুণাময়ী বলিলেন, “ওর পান আর তামাক গেলেই হল, দুনিয়া সব খবরই ত রাখে। নাওয়া খাওয়াই মনে থাকে না, তা কেউ এলো আর গেলে।” করুণাময়ীর কথায় হরেন্দ্র বাবু যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কথাটা আর বেশীদূর বাড়াইতে না দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিমল তোমার কি এখন কোন কাজ আছে?”

বিমল বলিল, “আজ্ঞে না।”

তবে এসো। একটু গল্প করা যাক্গে। তারপর

করুণাময়ীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “তুমি আমাদের জন্ত চাও জলখাবারের ব্যবস্থা কর।

এই সময় গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শ্রুত হইল। সকলে ঠেই ঠেই করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল।

করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের খাওয়া পাওয়া হয়েছে ত?”

উমেশ বলিল, “লতিকা বা যিছুড়ী রে'পেছিল—অতি উপদেষ্টা হয়েছিল।” লতিকা কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে প্রবোধ তুই ত আগে থেকেই আপত্তি করেছিলি যে লতিকা রাখতে পারবে না। এখন দেখিলি লতিকা রাখতে পারে কি না?”

প্রবোধ উত্তর করিল, “এখন অবজ্ঞা স্বীকার করতে হবে যে, লতিকা রাখতে জানে।”

বিপিন বলিল “কেবল রাখতে জানে নয়, বেশ ভাল জানে।” বলিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—লতিকা সেখানে নাই।

করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাছাও কি শিকার করে আনিল?”

উমেশ বলিল, “হুটি নিরীহ শিক খরগোশ।” প্রবোধ বলিল, “অন্ত কিছু না থাকলে আর কি করিব?”

করুণাময়ী বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, “আমি কোথায় ভাবছি, একটা বাঘ বা হরিণ যদি মেরে আনে, তা হ'লে ছাল খামার আমার একটা পুখারি বদস্যার স্বন্দর আসন হবে।”

তখন সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। করুণাময়ী চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন।

চা পাইতে পাইতে হরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এইমাত্র বাড়ীর মধ্যে শুনিলাম তোমার পরিচিত এখানে নাকি একজন বড় মেয়ে জ্যোতিষী আছেন?”

বিমল বলিল, “একজন এ দেশীয় জ্যোতিষী আছেন, তবে বড় দেরির কি, তাজ না, তা বলতে পারি না। তবে সে হাত দেখে থাকে বা বলে তা প্রায়ই ঠিক নিবে।”



হয়েছে বাবু অত্যন্ত আগ্রহ ও বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বিভা সকলের জ্ঞাত। সে জ্ঞাত বা ছোট বড় যানো না। যিনি তার চর্চা বা সাধনা করবেন, তিনিই তাকে কাল করবেন এর আর বিচিৎ কি? আজি বিমল তুমি স্বপ্নও তাঁকে হাত দেবিয়েছে? লক্ষ্য করে না। এই সব বিভা আমাদের দেশ থেকে একরূপ লোপ পাবার মত হয়ে পাড়িয়েছে। একদিন ছিল যেদিন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যে অসাধ্য সাধন হয়েছে।”

বিমল ধীরে ধীরে উত্তর করিল, একথা ঐক্য সভা যে জ্যোতিষের মত প্রত্যক্ষ বিভা আর কিছু আছে তা না জানি না। তবে আজ কাল বড় একটা খাঁটি লোক দেখতে পাওয়া যায় না। সবই ব্যবসায়ী। ফাঁকি দিয়ে পয়সা উপায়ের এটা মেনে হুজু একটা সহজ রাস্তা।”

হয়েছে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যার কথা বলছ এ লোকটি কি পয়সা কিছু কিছু নেয় না?”

“এ লোক জ্যোতিষের ব্যবসা করে না। জ্যোতিষের আরামনা করে। কাহারও শিকট হ’তে কোন দিন একটা পয়সাও নেয় না। খুব সাধাসিধে ধরনের লোক। আমি তাকে হাত দেবিয়েছি।”

“জোয়ার হাত দেবে তিনি বা বলেছিলেন,—তা, কি মিলেছিল?”

“প্রত্যেক কথাটি বর্ষে বর্ষে মিলেছে। আমি তার অস্তু শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়াছি।”

বিমলের কথা শুনিয়া হয়েছ বাবু যেন আনন্দে উৎফুর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যেন একটা লুপ্ত আশা পূর্ণ দিক দিয়া জাগিয়া উঠাকে এক প্রকার উদ্ভাত করিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন, বিমল আমাকে তাঁহার নিকট নিয়ে যেতে হবে।”

“বলেন ত আমি তাঁকে এখানে আনতে পারি।”

“তিনি কি এতটা অগ্রহ করবেন! না, না, বিমল আমি তাঁর কাছে নিজেই যাব। আমার যখন প্রয়োজন তখন আমারই যাওয়া দরকার।”

“তুমি ত বললে তিনি পয়সা কিছু নেয় না। তা হ’লে ভেদে আনার অপেক্ষা আমাদের যাওয়াই হচ্ছে শোভন। আর দেখ বিমল, যারা সত্যিকার বড়, অবশ্য টাকার বড়র কথা বলছি না, তারা কোন দিনেই নিজেরদের বড় মনে করে না এটা খুব খাটি কথা।”

“তা হলে কালই তাঁর কাছে যাওয়া যাবে।”

হয়েছে বাবু বলিলেন, “আমাদের এমন সময় যেতে হবে, যখন গেলে তাঁর কাছ-কর্মে কোন প্রকার না অস্ব-বিধা হয়।

“সকাল বেলাই ভাল। সেই সময় নাকি তাঁর হাত দেবার পক্ষে সুবিধা।

“বেশ কথা। কাল একটু সকাল সকাল চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কি বল। কতদূরে তাঁর বাসা?”

“বেশি দূর নয় ঠেগনের পাশেই যে ছোট গ্রামখানি দেখতে পাওয়া যায় ঐ গ্রামে তাঁর বাড়ী। লোকটার সঙ্গে আলাপ করে আপনি খুব সহজ হবেন। এমন নিরহঙ্কার আদ্যিক লোক দেখতে পাই না।”

হয়েছে বাবু অনেকক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। এক একবার তাঁর মূখের উপর যেন কি একটা আশা আকাঙ্ক্ষার আনন্দ আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা হয়েছ বাবুকে গম্ভীর ভাবে ভিত্তা পড়িতে দেখিয়া বিমল নিকটে যে একখানা সংবাদপত্র পরিচয় করিয়া, তাহা তুলিয়া লইয়া পড়িবার জন্ত চোটা করিতে লাগিল।

বিমলের কেবলই মনে হইতে লাগিল কি জ্ঞান অকস্মাৎ একদল গম্ভীর হইয়া গেলেন। তবে কি আমার কথাগুলি তিনি মনে মনে বিচার করিয়া অবিশ্বাস করিতেছেন? এতদূর তিনি যে আমার কথা এত আগ্রহ সহকারে ভনিতাইলেন, তাহা শুধু জ্যোতিষীর উপর আমার অল্প বিশ্বাসের পরিমাণ জানিবার জ্ঞাত।

নিচয় তাই হইবে। উনি হইতেছেন কলিকাতার মধ্যে একজন নামজাদা বড় ডাক্তার। বড়লোক, ইংরাজি-শিক্ষিত লোক। উনি কি এমন কথা বিশ্বাস করিতে পারেন। বিমলের মনে বড় দুঃখ হইল। কেন সে জ্যোতিষীর কথা তুলিতে গেল। বিমলের নিজের জ্ঞান বস্তু বেশি দুঃখ হইতেছিল না, তাহার অধিক কষ্ট হইত—

ছিল, সেই নিরীহ জ্যোতিষীর জ্ঞান। কেন আমি উহাকে এমন করিয়া অপদস্থ করিলাম।

এই সময় গৃহের নিস্তরঙ্গতা অপসারিত করিয়া হয়েছ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বিমল কাল সকালে তোমার আপিস আছে। বিমলকে কোন উত্তর বিবারণ অবকাশ না দিয়াই তিনি পুনরায় বলিলেন, “যে কোন উপায়ে কাল সকাল বেলায় জ্ঞান তোমাকে ছুটি নিতেই হবে। তুমি আশ্রয় রাত্রিতে গিয়া তাহার বন্দোবস্ত করবে বুঝলে। ভাবছিলাম, আজই তোমাকে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি। কিন্তু রাত্রিতে এসব কাজের বড় সুবিধা হয় না।”

বিমল হয়েছ বাবুর কথা শুনিয়া এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “কাল সকালে আমার ডিউট নাই, ছুটা আছে। এই সময় কলকামারী লতিকার হাতে জলখাবার ও চা পাঠিয়ে দিলেন। লতিকা আনিয়া বলিল, “বিমল-না চা নিন। বিমল হাত বাড়াইয়া লতিকার হাত হইতে চাহের পেয়ালা গ্রহণ করিলে, লতিকা জলখাবার রেকাবীখানি রাখিয়া পিতার জ্ঞাত তখনই চা ও জলখাবার আনিয়া দিল।

হয়েছে বাবু চা পাইতে বাইতে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, “দেখা বাক ভগবান কি করেন! হুজু এতদিন পরে সময় হয়ে এনেছে। বন্ধু উকীল হ’লেও বড় ঘোর করে কোপ্তাখানি আমাকে দিয়া বলেছিল, সব মিথ্যা হতে পারে কিন্তু জ্যোতিষের কথা কোন দিন মিথ্যা হবার নয়। তাঁর এই অশ্রদ্ধা বিশ্বাস কি ব্যর্থ হতে পারে? যতদূর শেষ দিন পর্যন্ত সে, যির সিদ্ধান্ত করে দিয়াছে যে, তাঁর কথা মনে নাই। কীভাবে আছে। এবং কোরীকর কম অম্বাধারী ১৬ বৎসর বয়সের সময় উপযুক্ত সংপাতে বিবাহ হবে। মাছর বা ভাবে তা কি ঠিক সব সময় হয়? তা হ’লে এসসার স্বর্গ হয়ে যেতে।” কিন্তু আমার মনে সর্বদাই মনে হয় তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। শূণ্য হবে।”

বিমল মনে করিল বৃষ্টি এসব কথা তাহাকে তদাইয়া বলিতেছেন। সে কিছু বৃষ্টিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন।”

হয়েছে বাবু নিজের অন্তরমনঃ ভাবে আপনা আপনি এতগুলি কথা বলার যেন অল্প অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “এখন যদি তোমাকে উদ্দেশ করিয়া একথাগুলি বলি নাই—তবে কাল সকালে এসব অত্যন্ত গোপনীয় কথা হয় ত বলতেই হবে।”

বিমল আর কোন কথা বলিল না। নীরবে বাইতে লাগিল।

এই সময় লতিকা ও উম্মেদ সেখানে আনিয়া উপস্থিত হইল। লতিকা অত্যন্ত সমারোহ করিয়া জানাইল যে আজ তাহাদের অভিয়ান খুব স্বন্দর হইয়াছে। পাহাড়টি বড় না হলেও ভীষণ জঙ্গলে ভরা। আমার স্কিন্ত বাবা ভাল করে জঙ্গল দেখা হ’লো না। দাদা ও বিপিন-না দুজনে শিকার করতে চলে গেলেন। ভাগিয়া উম্মেদ-না ছিল, নইলে আমি একলা জঙ্গলের মধ্যে বসে কি রাস্তা করতে পারি।

হয়েছে বাবু বলিল “কেন চাকরগুলো কোথায় গিয়াছিল।

“তারা কাঠ কেটে আনছিল।”

“বাই হোক আর একদিন না হয় সবাই মিলে পাহাড় দেখে আসা যাবে। তখন তোকে আর রাখতে হবে না।” তারপর উম্মেদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “লতিকা রাস্তার সারটিকিটকে পেতে পারে কি না।”

এই প্রশ্নে লতিকা মুখ নীচু করিয়া রাখিল, তাহার কথাতে যেন বাধা পড়িয়া গেল। উম্মেদ হাসিতে হাসিতে বলিল আমি ত আর একা সারটিকিটকি দিলে মিলবে হবে না—বিপিন বাবু প্রবোধ প্রভৃতির অভিমত নিয়ে তবে অবিশ্বাসী অভিমত পেতে পারেন। আমার মতে প্রথম জ্যোতির প্রশংসাপত্র দেওয়া উচিত।”

লতিকার মনে একবার উম্মেদের কথার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু লক্ষ্য তাহা পারিল না।

বিমল বলিল, “লতিকা ত বেশ রাখতে পারে। আমিও একদিন গুর রাস্তা দেখেছি।”

হয়েছে বাবু বলিলেন, “বটে বটে তা হ’লে আর কারও মত নেবার প্রয়োজন নাই। এর জন্ত লতিকা তুমি একটা পুষ্কার পেতে পার।



“হ্যারে প্রবোধ কি শিকার করে আনলে। বাঘটায় বাইবার সময় হরেন্দ্র বাবু বিমলকে সশোধন করিয়া দেখতে পেয়েছিল। উমেশ বলিল বাঘ ত দূরের কথা—বলিলেন, “সকালেই আসিতে চাও—এখানে এসে চা খাবে বুঝলে।”

তারপর নানা রূপ গল্প চলিতে লাগিল। আহারের বিবল বাড় নাড়িয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া সময় হইলে সকলে বাড়ীর ভিত্তর চলিয়া গেলেন।

(কমনা)

## অমরালয়ে মৃত্যু

ঐশ্বর্যসুন্দর ঘোষ

ক্রিসপ্টি বর্ষ গত, অমর আলয়ে  
করিয়াদিলাম আমি কেমনে মরণে,  
অস্তিম শয্যার পরে নিভায়া স্বপনে  
তনিসীম।—মৃত আমি দিল ঘোরে ক'য়ে।

স্বপ্নপূর্ব বিদ্যা পাত্র হাতে ধরি ল'য়ে,  
মুখে দিতে, গেল পড়ি হস্তের কল্পনে।—  
চৌদিকে আঁধার আমি দেখিছ নয়নে।—  
পড়িলাম দিব্যধামে অচেতন হ'য়ে।

চেতনা হইল যবে, দেখিলাম চাহি—  
অজ ধরাতলে আমি রয়েছি পড়িয়া।—  
চৌদিকে অজ্ঞাতা বালি, দিবা শোভা নাহি।—

কঠিন শূন্যে মায়া বিদ্যছে বেড়িয়া।—  
রোদনে বিকৃত পদে আঁকি পরিআহি।  
শূল শশনামে গেল দগল বিদারিয়া।



কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরের জন্ত সুবিধা-  
জনক রেলভাড়ার প্রবর্তন করা যথক্ষে সংবাদপত্রে লেখা-  
লেখি হইয়াছিল কিন্তু সে বিষয় লইয়া কোন রকম  
চেষ্টা করিতে ব্যবস্থাপক সভার কোন বাড়ালী সভাকে  
দেখিতেছি না। এ বিষয়টি যে ওকতর তাহা বোধ হয়  
কাহারও মনে হয় নাই। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের কাজ  
যে অনেকটা হয় ইহা অস্বীকার করা চলে না; এবং  
এ দেশের সংবাদপত্রের মধ্যে ২১ খানি ছাড়া প্রায় সকল  
গুলির অস্বাভাবিক হিমায়ে খচ্ছল নয়—তাহার  
ওঁতারা জানেন। অথচ দরিদ্র সংবাদপত্রসেবীদের জন্ত  
সামান্য একটু অস্বাভাবিক করিতে উহারারা উদ্যোগী  
কিন্তু গরম হইলে অনেক মালসীকেই সংবাদপত্রের  
সাহায্য ভিক্ষা করিতে হয়। উপরে উঠিতে পারিলে  
সিঁড়ি ফেলিয়া দিতে বাহারারা কুজিত হয় না, তাহারদের  
নিকট কোনরকম সাহায্যের প্রত্যাশা নিফল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ বাড়ীভাড়া  
আইনটী তুলিয়া দিবার জন্ত খুব সচেষ্ট হইয়াছেন—ইহাতে  
আশঙ্ক্য হইবার কোন কারণ নাই; কারণ তাহারদের  
মধ্যে অধিকাংশই বাড়ীভাড়ার উপপত্তে মোটর চড়েন।  
এ সমস্ত সহরবাসী কি কর্তব্য তাহা স্থির করিয়া এই  
সাধারণের প্রতিনিধিরের ছদ্মবেশ কাড়িয়া লওয়া আবশ্যক  
হইয়াছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে এই কার্যের প্রতিবাদ করিয়া  
সভা করা আবশ্যক। নতুবা এই সব স্বার্থপর কাউন্সিলার-  
দের কৌশলে দরিদ্র ভাড়াটীদারগণকে আবার বাড়ী-  
ওয়ালার নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে।  
কলিকাতাবাসীগণ এই সময় উত্তোষী হইয়া নিজেরের স্বার্থ  
নিরোধে রক্ষা না করিলে পরিণামে দীনকে অত্যাচারে  
সহ্য ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইবেন তাহা যেন অস্ব-  
পাকে।

নাগপুরের নির্বাচনে কংগ্রেস তথা স্বরাজ্যদলের  
প্রতিনিধিই জয়লাভ করিয়াছেন। রেসপন্সিভের প্রতি-  
নিধি পরাজিত হইয়াছেন স্বতরাং দেশের মধ্যে এখনও  
স্বরাজ্যদলের প্রতিক্রিয়া যে দৃঢ় আছে তাহা বুঝা যাইতেছে  
কিন্তু স্বরাজ্যদল নিজেরদের ভবিষ্যৎ আচরণ যথক্ষে এখনও  
সাধারণত্যা অবলম্বন না করিলে ভবিষ্যতে যে কি হইবে  
তাহা বলা যায় না।

লড়াইয়ের অজ্ঞাতে অনেক জিনিষের দাম চড়িয়া  
গিয়াছিল—আবার পরে প্রায় সব জিনিষের দামই কমিয়া  
নিযছে। তাহার কারণ সে সময় বালের জোগান কম-  
কিন্তু চাহিদা ছিল বেশী। ঐ সময়ে বায় পোর্টকার্ড  
প্রভৃতির দাম চড়িয়া যায়—সেজন্য উহার চাহিদাও কমে  
কিন্তু সাধারণ খুদাহসারে চাহিদা কমিলেও উহার দাম  
কমে নাই। গরীবের পক্ষে এই বর্ধিত মূল্য বড়ই কষ্টকর  
হইয়াছে কিন্তু রাজা যদি প্রজার বৈদ্যনা অহতব না করেন  
তবে প্রজার রোদন, অরণ্যে রোদনের মতই নিফল হয়।  
এই বন্দর কোন সভা কি একজ কিছু ‘কৌশল’  
করবেন?

সম্প্রতি পিং পং বেলায় বালিঙ্গ ইংরাজ পরাজিত  
হইয়াছে। সেজন্য ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গোষ্ঠে প্রচুর আক্ষেপ  
করিয়া বলিয়াছেন যে কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সময় নীতি  
লইয়া ব্যস্ত থাকিলে ইংরাজ যুদ্ধবরণ ক্রীড়া-কৌশল ও  
ব্যায়াম প্রভৃতিতে জগতের চক্ষে ষাটো হইয়া পড়িবেন  
অতঃপর তাহারদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।  
কথটা সত্যই ওকতর কেবল পিং পং নয় কিন্তু  
ইংরাজ আজ অষ্ট্রেলিয়ার নিকট পরাজিত। লন টেনিস,  
মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতিতেও ইংরাজ আজ আর অগ্রগী নহে।  
ওলিম্পিয়ান ক্রীড়া প্রদর্শনীতেও ইংরাজ বিধম পরাজিত  
হইয়াছে—ইহার মূলে পররাষ্ট্র-লোলুপতা যে অনেকটা  
আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।





মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'মোহশেন' অভিনীত হইতেছে। মোহশেন শিক্ষামূলক সীতিনাট্য—অনেকে শিক্ষামূলক অভিনয়ের পক্ষপাতী নহেন—আমরা কিন্তু ইহাতে আনন্দিতকিছু দেখি না। মিনার্ভার কর্তৃত্ব এই ক্ষুদ্র পুস্তক অভিনয়েও যথেষ্ট প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্রবাবুর পুরস্কৃত ভূমিকার অভিনয় বেশ চমৎকার হইয়াছে—পুরস্কৃতির মাতালম্বের দৃশ্য স্বাভাবিক হইয়াছিল। নাট্যগানগুলিও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

কুপেন্সনের 'বাহালী' শ্রীষ্টই অভিনীত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। কুপেন্স বাবুর নাটক ভালই হইবে বলিয়া মনে হয় এবং মিনার্ভা সম্প্রদায় চিরদিনই তাঁহার নাটক অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন হুতরাং আশা করা যায় যে 'বাহালী' বাহালীদের আনন্দ দিতে পারিবে। বাহালী অভিনয়ের ক্ষমতা সম্প্রদায় যথেষ্ট অভিনব আয়োজন করিতেছেন—তাঁহাদের এ চেষ্টা সার্থক হইবে। বলিয়াই মনে হয়।

ঠার থিয়েটার শ্রীষ্ট 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিবেন। সোৎসাহে মঞ্চা চলিতেছে। ভীষ্মের ভূমিকায় দানীয়াব, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় তিনকড়ি বাবু, দুর্য়োধনের ভূমিকায় অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি স্থবিখ্যাত অভিনেতাদের সমন্বয় যে সত্যই এই নাটকের অভিনয়কে অষ্টরঞ্জ সম্মিলনের শক্তি দান করিবে তাহা পূর্বেই বলা চলে। দৃশ্যপট বেশ-

ভূবার পারিকল্পনার দাবীর লইয়াছেন শিল্পী চাকর; হুতরাং প্রয়োগ নৈপুণ্যে শ্রীকৃষ্ণ অভিনব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিবে। অপরেশ বাবুর কর্ণার্দন কিছু দিন পূর্বে বঙ্গ রঙ্গালয়ের নষ্ট প্রতিষ্ঠা কিরাইয়া দিয়াছিল আজ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সে প্রতিপত্তি আরও বহিষ্ঠ করুক ইহাই আমাদের কামনা।

'মিত্র থিয়েটার' নামক একটা নূতন থিয়েটারের প্রাচীর বিজ্ঞাপনী বাহির হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে এত বিভিন্ন রকম অনুরব শুনা যাইতেছে যে সঠিক কিছু নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন। সহযোগী বাৎসল্য লিখিয়াছেন যে সচিত্র শিশিরের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ শিশিরকুমার মিত্র ইহার অন্ততম উত্তোক্ত। বহিষ্ঠ সম্পাদকীয় মধ্যমা অক্ষর বাধিবার ক্ষমতা তাঁহারা প্রকাশে ইহাতে নাম দিবেন না। মিত্র মহাশয়ের পিতা প্রায় এক বৎসর কাল মিনার্ভার অধিকারী ছিলেন হুতরাং সেই হিসাবে শিশির বাবুর থিয়েটার চালাইবার যত্নও কতকটা দাবী আছে। যাহা হউক আমরা সম্প্রদায়ের সাফল্য কামনা করি।

ভাত্তরী সম্প্রদায়ের সংবাদ কি? নাট্যবরেও যে আর কিছু পাওয়া যায় না—এদিকে নাট্যমন্দিরের বাজীর সংস্কার কার্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। যদি স্থানাভাবে ভাত্তরী সম্প্রদায়কে অভিনয় বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় তবে সেটা বাৎসল্য নাট্যমোহী দর্শকবৃন্দের পক্ষে বড় মনো-কঠোর কারণ হইবে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন শাইবেরি  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯



[দ্বিতীয় বর্ষ] ১৫ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩২, ইং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ [২৮শ সংখ্যা]

## যাত্রী শ্রীলীলাদেবী

তোল তোল তব বিছানো শয্যা  
তোলগো গোছানো ঘর  
পাহ! করগো পথের সঙ্কল  
পথ আজ চরাচর!  
ঘর নাই তব ঘর নাই আর  
ভুবনে  
পরবাসী আজ পথিক ভূমি যে  
জীবনে  
নাহিক আপন পর!  
তোলগো গোছানো ঘর!

ভোল ভোল তব স্বপ্নের তিয়ার  
ভোলগো প্রাণের আশ  
ঘর হ'য়ে গেছে পথ প্রান্তর  
দেশ আজি পরবাস!  
মন নাই তব মন নাই, নাই  
ভাবনা  
হে উলসি! শেষ হাসা কাঁদা আর  
যাতনা!  
নাহি কাজ অবসর!  
তোলগো গোছানো ঘর!

খোল খোল তব সাধের মালিকা  
নিভাও গন্ধ-নীপ!  
শয়ন সেজের হৃদয় মালিকা  
ভরা বরণার নীপ!  
মাথ নাই আর মাথ নাই তব  
জগতে  
নিখাদ ছায় ধরার পরতে  
পরতে  
জীবনে উঠেছে স্বপ্ন।  
তোলগো গোছানো ঘর!

তোল তোল তব বিছানো শয্যা  
ভাঙ্গ এ গোছানো পুর!  
খোল খোল তব মিলন-সঙ্কল—  
আপার কেহন চুচ!  
স্বপ্ন নাই তব দৃঢ় নাই আর  
জীবনে  
পরবাসী চির পথিক ভূমি যে  
ভুবনে!  
পথ এ যে চরাচর  
তোলগো গোছানো ঘর!





## পাশ্চাত্য-সাহিত্যে প্রাচ্য ভাব

অধ্যাপক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, এম-এ

হুইনবর্গের Songs before Sunrise পড়িতেছিলাম। তাব, ভাষায় ও ছন্দে অশ্রুপম এই কাব্য-গ্রন্থখানির অপূর্ণ মাধুর্য্যযোতে যখন ভাসিয়া চলিয়াছিলাম, তখন সংসা একটা কবিতার কাণ্ডে আসিয়া আমার মনের গতি মূর্তন পথে প্রধাবিত হইল। রবীন্দ্র কল্পনার হাফা পালট নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল; এবং জটিল তথ্যের সূত্রাবলি পড়িয়া আমার মানসী তত্ত্বাধীন যুগপৎ বাইতে দািল। যে কবিতাটি অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার মনের মধ্যে এই প্রলয় কাণ্ডের সূচনা করিয়া দিল, তাহার নাম হইতেছে Genesis, ইহাতে বাইবেলের Genesis কিম্বা গুপ্ত-ধর্ম্মাধ্যমিত সৃষ্টি-রহস্তের কথা নাই। ইহা কবির নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত এমন একটা নূতনতর সৃষ্টিতত্ত্ব, যাহা বোধ হয় কোন ধর্ম্ম-সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। সে যাহাই হউক, কবিতাটির এই স্বয়ং ছয় আমাকে একটা ভাববায়ী তুলিল :—

For the great labour of growth,  
being many, is one ;  
One thing the white death  
and the ruddy birth ;  
The invisible air and the  
all beholden sun,  
The barren water and many  
childled earth.

এ কি! পাশ্চাত্য কবির কাব্যে এমন অগুপ্তান ভাব আসিল কোথা হইতে! শুধু অগুপ্তান নয়, সম্পূর্ণ গুপ্ত-ধর্ম্ম বিরোধী বলিলেই বোধ হয় টিকি হয়। সম্যকমরপী পাপ ও অশ্লবের সঙ্গে সর্বমঙ্গলসাধার ভগবানের চিত্রসন্ম বিরোধই যে ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বলিলেই হয়, সে ধর্ম্মের সঙ্গে মঙ্গলমঙ্গলের অভিন্নতা জাপক উক্ত কবিতার

ভাব যে একবারেই ষাপ যায় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথম মানব কর্তৃক জ্ঞানরূপের ফল ভক্ষণের ফলে জগতে কিরূপে পাপ ও মৃত্যুর জন্ম হইল তাহা মহাকবি হিউনসন সবিস্তারে তাহার 'প্যারাডাইসলস্টে', বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্বতরাং One thing the white death and ruddy birth এ কথা কোন গুপ্তানের মুখ হইতে বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে না। তা' ছাড়া, উক্ত ত কথাটি ছত্তে যে আরও একটি ভাব রহিয়াছে—জগতের যাহা কিছু বাহ্যতঃ অনেক হইলেও মূলতঃ এক,—এই ভাবটিও ঠিক গুপ্ত-ধর্ম্মের অধ্যমাদিত নহে।

'পাশ্চাত্য পাঠকের মনে ইংরাজ-কবির এইরূপ কবিতা কিরূপ ভাবের উদ্ভেক করে তাহা জানি না; কিন্তু হিউনসন মাত্রই এই সকল ক্ষেত্রে তাহার কবি প্রচারিত চিত্রসন্ম আদর্শ ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া বিম্বিত ও পুলকিত হইবে। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে স্বাবরজস্বন, জীবজন্তু যাহা কিছু আছে, তাহা অসংখ্য হইলেও যে একেরই বিচিত্ররূপ, ইহাই হইতেছে আমাদের ধর্ম্মের মূলশিক্ষা, হিউনসন ধর্ম্মের পক্ষে এই বিশাল বৈচিত্র্য একে পরিণত হয়। 'ইহৈকং জগৎ কুংযং পশ্যাত্ সচরাচরম্।' এই দিব্যবাক্যী তাহার স্বয়ং নিরন্তর ধনিত হইতেছে। স্বতরাং জন্ম মৃত্যুও একই জগৎ ব্যাপারের বৈতরূপ মাত্র। মৃত্যুকে একটা অমঙ্গল বলিব কেন! কবির কথায়—

জন্ম মৃত্যু ধৌহে মিলি জীবনের খেলা,  
যেমন চন্ডার অশ পা-তোলা পা-ফেলা!  
আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই হিউনসন গীতা ও উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বনুহ যুরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছে। এমার্সন গীতার চূষক লইয়া Brahma শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ

If the red slayer think he slays  
Or if the slain thinks he's slain,  
They know not well the feeble ways  
I keep, and pass, and turn again,

স্বতরাং হুইনবর্গের কবিতায় হিউনসন দেখিয়া বিম্বিত হইবার কারণ নাই। হইতে পারে ইহা তাহার আত্মোপলব্ধ, যেমন গুডার্ডসওয়ার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গুডার্ডসওয়ার্থের কাব্যে—হিউনসন কোন কোন চিত্রসন্ম ভাব ও আদর্শ অতি পরিষ্কার রূপে প্রকটিত দেখিতে পাই। তিনি Tintern Abbey কবিতায় 'A motion and a spirit, that impels All thinking things, all objects of all thought And rolls through all things' বলিয়া যে বিশ্বব্যাপিনী সত্তার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উপনিষদজ্ঞ পুরুষের অস্বরূপ বলিয়া হিউনসন মাত্রই মনে প্রতীয়মান হইবে। তাহার Ode on the intimations of immortality নামক কবিতায় মানবাত্মার প্রাক্কন অতিস্বয়ং কথা আছে। ইহা গুপ্তধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী মত। বাইবেলের মতে মানবাত্মা অনন্ত হইলেও অনাদি নহে। প্রত্যেক মানুষের জন্মের সময় তাহার আত্মা স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হয়। গুডার্ডসওয়ার্থ দার্শনিক প্লেটোর অস্বরূপ করিয়া (ইহা তিনি নিজেই কবিতায় ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন) বলিতেছেন—

Our birth is but a sleep  
and a forgetting ;  
The soul that rises with us,  
Our life's Star,  
Cometh from afar.

স্বতরাং 'গীতা'র ভাষায় বলিতে গেলে ইহা 'অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ।' কোন গৌড়া জীবন আত্মা সংক্ষেপে এ কথা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু ইহা হিউনসনের সার কথা।

গুডার্ডসওয়ার্থ যে হিউনসনের তত্ত্ব অবগত ছিলেন এমন কথা আমরা বলিতেছি না। তাহার কবি-স্বয়ং যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই তিনি

কাব্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিকের নিকট তিনি ঋণশীকার করিলেও তাহাকে সত্যব্রতী বলিব; কারণ তিনি প্লেটোর দর্শনে উক্ত মতের আভাস মাত্র পাইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, এই ইংরাজকবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হিউনসন তত্ত্বকথায় পূর্ণ।

টেনিসন গৌড়া জীবন ছিলেন। সাধারণতঃ তাহার কাব্যে হিউনসন কোন বিশিষ্ট ভাবের সহিত সাক্ষাৎলাভ করি না। শুধু তাহার Higher Pantheism নামক ক্ষুদ্র কবিতাটিতে প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশরূপ হিউনসন মতটির সহিত খুঁজি মত-বাদের একটা সম্মুখের চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু ব্রাউনিংয়ের মধ্যে গুপ্তানি গৌড়ামি একেবারে নাই। ফলে তাহার কাব্যে অগুপ্তান ভাব অনেক পাই। দুগ্ধস্ত স্বরূপ Rabbi Ben Ezra হইতে কয়েক ছন্দ উদ্ধৃত করিতেছি :—

—All that is at all,  
Lasts ever, past recall ;  
Earth changes, but thy soul  
and God stand sure ;  
What entered into thee,  
That was, is and shall be.

এখানেও আত্মার অনাদিষ সৃষ্টি হইয়াছে। গীতার ভাষায় 'নামোতা বিম্বিতে ভাবো নাকালো বিম্বতে মতঃ।' গুপ্তান আত্মা সংক্ষেপে 'is, and shall be' বলিবে, কিন্তু 'that was',—ইহা জন্মের পূর্বেও ছিল, এমন কথা তাহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ম্যাথু আনন্ড ভূম্যবাসী কবি ছিলেন। তিনি বলেন মানুষের একমাত্র স্বপ্নের আশা নিঃস্বয় মনের মধ্যে, বাহিরে নয়। তিনি বলিতেছেন,

Once read thy own breast right,  
And thou hast done with fears,  
Man gets no other light,  
Search he a thousand years.  
Sink in thyself ! then ask  
Whyt alts thee, at that shrine,



বাইরের কোলাহলে ঝালাপালা হইয়া কবি শান্তির  
দেবতাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

Calm soul of all things! make it mine

To feel, amid the city's jar,

That there abides a peace of thine,

Man did not make, and cannot mar.

পাশ্চাত্যের বহিমুখী সভ্যতা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া  
দেয়। এখানে আনন্দ নাই, শান্তি নাই, এই নব সভ্যতা  
মাছুষকে স্বস্থ থাকিতে দেয় না।—

This strangle disease of modern life,

With its sick hurry, its divided aims,

Its head o'er taxed, its palsied hearts &c.

তিনি তাঁহার Scholar gipsyকে এই সভ্যতা থেকে দূরে  
ধাক্কিতে বলিতেছেন। কারণ এই সভ্যতাকৃষ্ণী মানুষের  
সর্বনাশ করে।

Fly hence, our contact fear?

Still fly, plunge deeper in the  
bowering wood!

For strong the infection of our  
mental strife.

মহাত্মা গান্ধিও পাশ্চাত্য সভ্যতার বোধ হয় এত  
নিন্দা করেন নাই। এই যে চিত্তকে বিস্ত হইতে উক্ত  
স্থান দেখিয়া এই যে বিষয় হইতেমনকে সরাইয়া আনিয়া  
নিজের মধ্যে সংঘত করা, ইহা হিন্দুরই একটা বিশিষ্ট  
মনোভাব নহে কি?

বারান্তরে অস্ত্রাভ কবি, বিশেষতঃ দেটারলিঙ্ক সপ্তদে  
আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আজ বিষয়টির  
অবতারণা করিলাম মাত্র।

## পত্নী-শ্রেম

### তীনরেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রথম—ছাত্রাবস্থা

নিদ্রুটাই তোমার এক কি আপন

আমি কি কিছুই নয়?

বল নয় আমি পাছে সরে যাই

এতই যদি গো ভয়।

ছোঁছোঁয়া ভরা মধুর রজনী

সোহাগেতে ভরা প্রাণ

আসুল তুলায় রয়েছে চাটখা

শুনিতে তোমার গান,

তুমি যদি প্রিয়ে নিষেধের পরবে

গরবিনী এত হও

শত শত কথা শুনে গেলে, নিজে

একটিও নাহি কও

কি কাজ তা হ'লে বিধায়েতে ঘোর

তপু ডেকে আনা কই

এ ব্যথা জুড়োতে যাব কোন দেশে

বলে রাখি তোমা স্পষ্ট।

দ্বিতীয়—চাকুরে অবস্থা

কি কর কি কর জাননাকি রাত

দশটা বাজিয়া গেছে।

আক্ষিপের সেই সাতটা ঘণ্টা

কাব্য চুম্বিয়া নেছে

পরান হইতে নিড়াড়ি নিড়াড়ি

ছিঁবিড়া করিয়া দেহ

এত রাতে কতু প্রণয়ের কথা

কহিতে পারি কি কেহ!

তিন দিন বাপে হবে শনিবার,

তখন রজনী হ'লে

তোমার চরণে উজাড় করিব

আমার কথার পলে,

এই কটা রাত ছুটি কথাতই

হও গো প্রেমিণি পুণী,

ভালবাসা নেই আমার স্বপ্নে

ভেবে উঠানাকো কথি।



মহাত্মা গান্ধী

ইমং ইন্দ্রিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চালন

## সত্যের পরীক্ষা

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া-  
ছিলাম। সে সময় বোম্বাই ও আহমদাবাদ পরীক্ষার  
কেন্দ্র ছিল। রাজকোটে হইতে জীবনে এই আমি প্রথম  
সঙ্গীহীন অবস্থায় আহমদাবাদে আসি।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর আমার ছোট  
জাতাগণ আমাকে কলেজে পড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ  
করেন। ভাবনগর ও বোম্বায়ে কলেজ ছিল। ভাবনগরে  
অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় হইবে জানিয়া আমি তৎকালকার  
শ্রামল্লাস কলেজে ভর্তি হই। কলেজে গিয়া আমি অসু-  
পাধারে পড়িলাম। প্রফেসরগণের বক্তৃতায় একটুই হুও  
মনসংযোগ করিতে পারিলাম না। সকল বিষয়ই  
আমার নিকট চুরীখোঁচা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহার  
জ্ঞাত প্রফেসরদের আমি দোষ দিই না। তাঁহাদের  
অসুপাধা প্রথম শ্রেণীর ছিল। আমি ছিলাম একান্ত  
নির্দোষ। কয়মাস পড়ার পর ছুটি হইলে আমি বাড়ীতে  
আসি।

মাজিঙ্গী দেব ছিলেন আমাদের পরিবারের একজন  
পুরাতন বন্ধুও স্বয়ং হুংমের সঙ্গী। তিনি ভৃত্যচাকরী ও  
শাস্ত্রজ্ঞান রাখেন। আমার পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি  
আমাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। ছুটিতে যখন  
আমি বাড়ীতে ছিলাম সেই সময় তিনি একদিন আমাদের  
বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন। আমার মাতা ও জ্ঞাত-  
গণের সহিত কথা প্রসঙ্গে আমার কথা উঠে। আমি  
শ্রামল্লাস কলেজে অধ্যয়ন করিতেছি শুনিয়া তিনি বলেন  
—“সময়ের অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটতেছে। এ সময়

ভালরূপ শিক্ষিত হইতে না পারিলে তোমরা কেহই পিতার  
মত উচ্চ আসন লাভ করিতে পারিবে না।” ইহার পর তিনি  
আমার ভ্রাতাকে বলেন যে আমি যখন অধ্যয়ন নিযুক্ত  
আছি তখন পিতার আসন লাভ করিবার মত উপযুক্ত  
শিক্ষা আমাকে লাভ করিতে হইবে। বি-এ পাশ করিতে  
চার পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে, কিন্তু তাহাতে ষাট টাকা  
বেতনের কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছু মিলিবে না।  
দেওয়ানীপদ লাভের উপযুক্ত শিক্ষা তাহাতে হইবে না।  
তিনি বলেন এ জ্ঞাত আমার আইন অধ্যয়ন করাই প্রকৃষ্ট  
পথ। তাহাতে সময় একটু বেশী লাগিবে বটে কিন্তু—  
দেওয়ানের উচ্চপদ লাভ সহজ হইবে, পিতার গৌরবও  
রক্ষা হইবে। তাঁহার পুত্র কেবলরাম তখন ইংলণ্ডে  
আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। তিনি আমাকেও ব্যারিষ্টার  
হইবার জ্ঞাত বলিতে পাঠাইবার পরামর্শ করেন। ইহাতে  
তিন বৎসর মাত্র সময় লাগিবে—এব্য চার পাঁচ হাজার  
টাকার অধিক খরচও হইবে না। কিন্তু ইহার বিনিময়ে  
দেওয়ান হইবার যথেষ্ট যোগ্যতা আমি লাভ করিব।  
ইংলণ্ডে কেবলরামের অনেক বন্ধু আছে। তাহাদের  
সহিত পরিচিত হইয়া, তাহাদের সাহচর্য্যে আমার বিদেশে  
থাকিবার কোন অসুবিধাই হইবে না।

মাজিঙ্গীকে আমরা বেশীকি বলিয়া ডাকিতাম।  
আমার জ্ঞাতার সহিত এই সকল কথা কহিয়া তিনি  
আমার অভিমত জানিতে চাহিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন আমি ইংলণ্ডে বাইতে রাজী আছি কি না!  
আমার কাছে ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের সবাদ আর



কি হইতে পারে। পড়ার চাপে আমি ক্রমশঃ বিরত হইয়া পড়িতেছিলাম। সোশালস্বে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া আমি বিলাত যাইতে রাজি হইলাম। কহিলাম এখানে পরীক্ষার পাশ করা একান্ত সহজ নহে। আমি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্তও যাইতে পারি।

আমার ভ্রাতা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে পিতা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের বিরোধী ছিলেন। ইহাতে শরবাথচ্ছের ইতাদি করিতে হয়, যাঁহা আমাদের বৈশ্ববর্ষ সম্মত নহে। পিতাও নাকি আমাকে আইন পড়াইতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কোম্পানী বলিলেন আমার কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে কোন আপত্তি নাই। আমাদের শাস্ত্র ইহা নিষেধ করে না। কিন্তু ইহাতে দেওদানকীর যোগ্য শিক্ষা হইবে না। তোমাকে দেওদান বা ঐ খেণ্ডীর কোন উচ্চপদ লাভ করিতে হইবে। নতুবা তুমি তোমাদের বৃহৎ পরিবারের ভার বহন করিতে সক্ষম হইবে না। জীবনযাপন দিন দিন ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। এ ক্ষেত্রে ব্যারিষ্টার হইতে পারিলে সকল দিকেই সুবিধা। ইহার পর তিনি বিদায় লইলেন এবং আমার ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত বিলাত যাওয়ার বিষয়টা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অগ্রসর করিলেন।

কোম্পানী চলিয়া গেলে আমি মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য ভিত্তি অঙ্কিত করিয়া শুভ্র তামের প্রদীপ নির্ধারণ করিতে লাগিলাম। কথাটা ষোড়শ ভাতার মনে লাগিয়াছিল। কিন্তু আমাকে বিলাতে পাঠাইবার মত সঙ্গতি পরিবারের নাই। সর্বোপরি এই অল্প বয়সে আমি একা কিরূপে বিলাতে যাইতে পারিব।

ইহাতে সন্দেহপূর্ণ অতিভূতা হইয়াছিলেন আমার জননী। তিনি আমাকে বিদায় দিবার কথা শ্রবণে ভাবিতে পারেন নাই। তিনি এই প্রস্তাবে বাধা দিয়া কহিলেন—আমার কাকার পরামর্শ ব্যতীত ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। প্রথমে কাকার সম্মতি লওয়া কর্তব্য।

আমার ষোড়শ ভ্রাতা বলিলেন—পোরবন্দর স্টেটে আমাদের একটা সাধারণ দাবী আছে। সে লেডি সেবানের সর্বস্বস্ব। কাকার সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বতা

আছে। কাকার সাহায্যে তাঁহার সহিত পরিচিতি হইয়া ইংলেণ্ডে পড়ার জন্ত কোনরূপ স্টেটশিপ পাওয়ার সুবিধা করা যাইতে পারে।

ইহাতে সকলের মত হইল। আমি পোরবন্দর যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সে সময় রেল হয় নাই। আমাকে পাঁচদিন গরুর গাড়ীতে যাইতে হইবে। আমি স্বীকার করিয়াছি যে সাধারণতঃ আমি একান্ত ভীক প্রকৃতির লিলাম। কিন্তু ইংলেণ্ড যাত্রার আনন্দে আমার ভীকৃত্য প্রশমিত হইয়াছিল। রতকটা পথ গরুর গাড়ীতে এবং রতকটা পথ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত স্থানে উপনীত হইলাম। ইহাই আমার জীবনে প্রথম উষ্ট্র-আরোহণ।

কাকার নিকট গিয়া আমি সকল কথা বলিলাম। কাকা কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—দুখ বাচাইয়া যে তুমি বিলাতে জীবন যাপন করিতে পারিবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বড় বড় ব্যারিষ্টারদের দেখিয়া আমার মনে হয় ইষ্টেরোগিয়ানদের সহিত তাহাদের কোন বিষয়ে প্রভেদ নাই। তাহার। খাজরস্বয়র কোন বিচারের চাল, চলন, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সবই বিলাতী হিটে ঢালা। এই সকল বিষয়ে অভ্যস্ত হইলে আমাদের পরিবারের গৌরব কখনই বর্ধিত হইবে না। কিন্তু আমি তোমাকে বাধা দিতেও চাহি না। আমারও বয়স হইয়াছে। হৃদয় বেশীদিন বাঁচিবও না। শীঘ্রই তীর্থযাত্রা করিব মনস্ত করিয়াছি। এ অবস্থায় তোমায় ছাড়িয়া দিতে মন সরিতেছে না। কিন্তু আমার কোন আপত্তি নাই। তোমার জননীর অস্থায়ী সন্মোদন প্রয়োজনীয়। তিনি সম্মতি দিলে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। আমরা প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিব।

আমি কাকার নিকট মিঃ লেমির নামে পরিচয় পত্র চাহিলে তিনি বলিলেন—ইহাতে আমার কোন হাত নাই। কিন্তু সাহেব খুব ভাল লোক। তুমি তোমার অবস্থা বর্ণনা তাঁহার কাছে একখানা দরখাস্ত কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিবেন।

বাকা যে কোন আশায় পরিচয় পত্র দিতে চাহিলেন না তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তবে আমার মনে হয়—আমার ইংলেণ্ড যাত্রার সহায়তার উপলক্ষ্য হইতে হইবে বলিয়াই তিনি ইহাতে বিরত হইলেন। এ প্রস্তাব তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল।

আমি মিঃ লেমিক পত্র লিখিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে তাঁহার বাগডবনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিলেন। সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্ত আমি বিশেষ রকমে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি সে সময় গির্জা বাহিয়া দোতালার উঠিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—বি, এ পাশ করিয়া আমার নিকট আসিও। এখন কোন সাহায্যই পাইবে না। বলিতে বলিতে তিনি গির্জা বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সাহেবের সম্মুখীন হইলে কি করিব পূর্ন হইতেই আমি তাঁহার রিসার্চের দিয়াছিলাম এবং কথা কহিবার জন্ত সযত্নে কয়েকটা লাইন মুখস্থ করিতেছিলাম। অধিকন্তু দুইহাতে আমি তাঁহারকে অভিবাদন করিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল।

রাজকোটে ফিরিয়া আসিয়া জাতার নিকট সকল কথা বলিলাম। আমি আমার স্ত্রীর অলসারগুলির কথা ভাবিতেছিলাম। তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। যোশীজী টাকা ধার করিতেও পরামর্শ দিলেন না। আমি অলসারের কথা বলিলাম। তাহা হইতে তিন সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইতে পারে। দাদা বলিলেন—অল্প উপায়ে টানা বোগাড়ের চেষ্টা করিয়া দেখি।

আমার মা তখনও আমাকে যাইতে দিতে সম্মত ছিলেন না। ইহার জন্ত তিনি অনেক বোঝাবার লইয়াছিলেন। কে নাকি তাহাকে বলিয়াছিল অল্পবয়স ছেলেরা ইংলেণ্ডে হারাইয়া যায়। কাহারও কাছে তিনি জনিয়াছিলেন তথায় মাংস খাইতে হয় এবং মদ না খাইলে মানুষ বাঁচে না। তাহাকে একান্ত সন্দেহাকুল দেখিয়া আমি বলিলাম—তুমি কি আমার বিবাস করিবে না মা? আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিব না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি ঐ সকল ভ্রম সম্পন্ন করিব না। এ সকল উপসর্গের ভর থাকিলে কি যোশীজী সম্মতি দিতেন।

মা বলিলেন—তোমার আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু দুঃশেষে কি হইবে কে বলিতে পারে। তোমাকে শপথ এবং করিতে হইবে। আমি চিঠিয়া স্বামীকে ভাকাই-তেছি। যোগিজীর মত চিরার্থী স্বামীও আমাদের পরিবারের মঙ্গলকামী ছিলেন। তিনি জৈন সন্ন্যাসী। তাঁহার নিকট শপথ গ্রহণ করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে বিশেষ মত, মাংস এবং জীলোক সম্পন্ন করিব না।

রাজকোটের কোন বৃদ্ধ এ পর্যন্ত ইংলেণ্ড যাত্রার পৌতাগ লাভ করে নাই। হাইস্কুলের ছাত্রেরা আমাকে বিপুল সম্মানের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন। কোঠা লাভাগণের পদ্মলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া আমি বোখাই যাত্রা করিলাম। রাজকোট হইতে বোখাই যাত্রা এই আমার জীবনে প্রথম। বড়লাদা আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সকল শুভকাঙ্ক্ষাই নানা বাধা বিঘ্ন অপরিহার্য। বোখায়ে আসিয়া আমাদের এইরূপ অবস্থা পড়িতে হইয়াছিল।

## বসন্ত জাগরণ

“পাগল”

আজ বিশ্বের বুকে কার একখানা কোমল হস্তের পরশের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কে এমন করে হাঁস বিশ্বের বুকে নবজাগরণের প্রথম সাড়া দিয়ে গেল, হাঁস বিশ্ব অমনি তার অশ্রুত সৃষ্টির পানে চেয়ে র’ল;—তিনি

নারী না পুরুষ, গন্ধর্ব না কিম্বদী, দেবতা না দেবী, তা’ যে বসন্তে পারছি না। নারী হ’লে তাঁর স্বয়ং যে মায়ের অশ্রুর মেঘে ভরা, বেশ বৃষ্টিতে পারছি। পুরুষ হ’লে, তিনি যে নব প্রেমিকার অস্থসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,



তার একটা নিদর্শন ধরিত্রীর প্রতি অগুর ভিত্তর দেখছি।  
কে আজ কোকিল পাখিগণের বহুমুখ অশ্রুতীর মোহনমুখপে  
খুলে দিয়ে গেল, আর তারা তার অদর্শনে পাগলের মত  
তাকে ডাকতে লাগল; তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎবাসীকেও  
পাগল করে ফেলল; কিন্তু কই, এত প্রাণখোলা ডাকের  
তো সে সাড়া দিচ্ছে না। কে সে মায়াবিনী! কে সে  
গুরবিলী, কে সে প্রণয়কাজ্জলী!—বেই হোক, সে নিঃস্ব,  
নিঃস্ব, কে আজ হঠাৎ এমন করে বহুমতীকে একধালা  
সোনালী রংগর সাড়ী পরিয়ে দিয়ে গেল, যা' দেশে  
ভগবৎবাসী আনন্দে মেতে উঠল। যে গুদার বক্ষে শত  
সংস ভীষণ উর্মিমালা অনবরত খেলা করত, মানব ভয়ে  
মূরে শ'রে যেত; আজ দূর হ'তে কে তাকে চোখের  
ইসারায় গোপন কথা ব'লে গেল; আর অমনি তার  
তরবারিত বুক সেই অজানার মিলনের লাগি শান্ত ও  
স্বন্দর হ'য়ে উঠল। কে যেন আজ তার মিলনাছরাগি  
বুকে বাপিয়ে পড়বে, তার প্রতীক্ষায় সে বসে আছে।

এই যে জাগরণের সাড়া, মিলনের তৃপ্তা জগতে দেখতে  
পাচ্ছি; তার একটা সাড়া যে আমার কঠিন প্রাণে লাগেনি  
—তা নয়। এই অক্ষপ্রাণ তাই আজ যেন কেমন উত্তলা  
হয়ে উঠছে—কে যেন বহুদূর হ'তে আমার হাতের ইসারায়  
ডাকছে—তার বুকে কাঁপিয়ে পড়বার জ্ঞান। কই আমি  
তো জীবনে কাউকে ভালবাসতে পারিনি—আমি নিঃস্ব!  
কেউ তো আমার কোনদিন ভালবাসেনি, সোহাগ-ভরে  
ডাকেনি—আমি মূর্খ—আমি হুংসি! তবে কে আমার  
অজানা রাজ্য হ'তে ডাকছে। কই, তাকে তো আমি  
দেখতে পাচ্ছি না—এ যে অদৃশ্যবাপী!

তুনিছ বসন্তদেবী যখন ধরায় এসে আসন পেতে  
বসেন, তখন সবাই শোক ভুলে স্বপ্নে স্বপ্নে আসন পেতে  
উঠে, ফুলের হাসিতে ধরা পূর্ণ হ'য়ে উঠে, ফুলের ভায়ে বুক  
হুয়ে পড়ে, চাঁদের হাসিতে প্রেমিক প্রেমিকা বাসর শয়া  
রচনা করে; তবে কি বসন্তদেবী আজ পৃথিবীর বুক  
নেমে এসেছেন!—কই, না—এ ভ্রান্তি। তিনি যদি  
আসবেন, তবে আজ ভারতের শত শত নরনারী অনাহারে  
ধূলার গড়াগড়ি লাগছে কেন, বহুদীন মায়ের জাতি ভাঙ্গা-  
রয়ের আপালে সুকিয়ে কেন, বুকের ছেলে হুয়ের অতাবে

মৃত্যুকে আদর্শন করছে কেন, চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা  
পাশবিক অত্যাচারের ধরিত্রীর বুক কলচিৎ হাচ্ছে কেন,  
রোগ, শোক, জ্বর, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, অত্যাচারের তার  
সন্তানগণ মায়ের বুক থেকে নরকে চলে যাচ্ছে কেন?—  
তবে তিনি আসেন নি!

দেবী, তুমি বহুদূর, বর্ণের রক্ত সিংহাসনে; আমার  
নরকের কীট, তোমায় দেখতে পাচ্ছি না; তবু তোমার  
উদ্দেশ্যে নরনারী করছি। তুমি নাকি প্রতি বৎসর এমন  
সময় এসে ধরিত্রীকে স্বর্ণ করে তোল; তবে আজ আমা-  
দের প্রতি বিমুখ কেন? দেখছনা না, আজ শত শত  
নরনারী অনাহারে—এরা যে তোমারই বুকের সন্তান।  
এস দেবী, আজ তোমার সন্তানের মুখে দু'মুঠা অন্ন দিয়ে  
তাহাদিকে পুষাও। ঐ চেয়ে দেখ, পল্লীর গৃহকাণে  
কত সরলা অথবা একগুণ বস্ত্রাভাবে গৃহের বাঁর হতে  
পারছে না; আজ তাদের একগুণ বস্ত্র দিয়ে তাদের লজ্জা  
নিবারণ কর। ঐ দেখ তোমার রেহের সন্তানগণ আজ  
সব ভুলে, মিয়া জড়তা, আলস, প্রতারার ভিতর তিল  
তিল করে বুড়েছে; এল না আজ হ'তে নিয়ে তাহারিগকে  
ভুলে ধর, সন্তানের পথ হ'তে ফিরিয়ে সন্তার পথ  
দেখায়ে দাও। এত কষ্ট, এত অপমান, তুমি সহ্যেতে  
পার? তুমি কি পাখাগী! তুনিছ, রাক্ষসরা  
রাধের ঘরে তুমি বাঁধা ছিলে; যা যদি রাক্ষসের প্রতি  
প্রণাম করে, তবে তোমার সন্তানের প্রতি বিমুখ কেন?  
প্রণাম, রাধা তোমার পূজা করত, ভক্তি করত—  
তাই তাকে কোলে ভুলে নিয়েছিলে; আর আমার  
তোমায় চাই না, পূজা করি না, ভক্তি করি না—তাই  
তুমি আস না।

এত ভারতবাসী, এস, আজ ভারতের হিন্দু-মুসলমান  
ঐক্য-জীবন তেজিখকোটা নরনারী, আমার সমুখের মাকে  
ডাকি! এ যে সময় হয়েছে, এখন ডাকলেই তিনি  
আসবেন। একবার সবাই মিলে, সব ভুলে প্রাণ খুলে  
ডাকি, “মা, মা, মা!”—এস, আমাদের ভিতরে এস, সব  
দুঃখ, সব ভয় মুচাও, প্রাণে শান্তি দাও, পরনে বস্ত্র দাও,  
দেখে বল দাও, ধরবে ভক্তি দাও। “মা, মা, মা,” ওঁ,  
নমঃ।



## আত্মদান

শ্রীমতী পূর্ণশী দেবী

১  
“অরুণকে তোমার কেমন লাগল মায়া?” মায়া  
উজ্জ্বল বাতায়নের দিকে মুখ করিয়া অস্বপ্নে কি ভাবিতে-  
ছিল, পিতার প্রস্তুত হবার পাশে আশিরা সে বলিল “কার”  
কথা বলছ বাবা?” “এই আমাদের অরুণেন্দুর কথা,  
ছেলেটা দিখি, নয়? দেখতে শুনেতে সকল রকমে—  
“চমককার! পুরুষের যেমন হওয়া উচিত।”

কন্ডার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া  
পিতা রযনাথ রায় পুনরায় বলিলেন “শুধু কি তাই?

কেমন বিনীত, নয়, শিষ্ট স্বভাব বল দেখি? এদিকেও  
আবার বেশ কৃতী, বাপের ঊগৃহকৃৎ হুসন্তান। এই  
অল্প দিনের মধ্যেই কলকাতা সহরে খুব প্র্যাক্টিস  
জমিয়ে নিয়েছে, সেখানে ওর কত রূনাং! যুৎ যুৎ  
হাতে পিতার বাক্যে সর্ধন করিয়া মায়া একবার তাহার  
সমুখস্থ টেবিলের উপর রাখা ক্ষুদ্র কোটার পানে চকিতে  
চাহিয়া দেখিল, বহুদিনের তোলা সেই কোটোখানি  
কতকটা বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মায়া  
মনে হইল, তাহার দৃষ্টিপটে অন্ধিত উহারই প্রতিকৃতি-  
খানি নুহি আজ ইংগোলা ও অশ্পট মলিনতর হইয়া  
গিয়াছে। সে ছবি মায়াব বাগদত্ত স্বামী স্বখাণ্ড হুয়া-  
য়ের। প্রাণের ভিতর কেমন একটা অশান্তি ও বেদনা  
অহুতব করিয়া মায়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল “অরুণেন্দু  
বাবু শীঘ্রই ফিরে যাবেন, না বাবা?” “হ্যাঁ মা! কাল  
পরন্তর মধ্যেই অরুণ চলে যেতে যায়। কিন্তু যেমন  
করেই হ'ক, তাকে আরও দিন কতক ধরে রাখতে হ'বে  
বুঝলে মা? আমিও এই সঙ্গে দেশে যাব মনে করছি—  
দেশে সখ্যছে মায়াব কোনও অভিজ্ঞতাও ছিল না, প্রবাসেই  
তাহার প্রথম জানোয়ে, প্রবাসেই সে বড় হইয়াছে,  
তাই এই হুদুর পার্শ্বতা প্রদেখকেই সে তাহাদের দেশ  
বিশিয়া জানিত।

এতকাল পরে পিতার এই বশেষ জীবিতর পরিচয়  
পাইয়া মায়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “এতদিন পরে  
হঠাৎ দেশে যাবার ইচ্ছে কেন হ'ল বাবা? তোমার  
মুখেই শুনেছি সেখানে আমাদের আগনার জন কেউ  
নেই, তবে—” “একটা কাজ আছে মা!” একটা দীর্ঘ-  
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রায় মহাশয় পাচ ঘরে বলিলেন  
“তোমার মা তো তা'র মনের অপূর্ণ সাধ নিজেই চলে গেল  
মায়া, আবার কোনদিন হঠাৎ আমারও ডাক পড়বে,  
তখন তোকে কার কাছে রেখে যাব? তাই ভাবছি,  
সময় থাকতে এই বেলা তোর একটা ব্যবস্থা করে ফেলি  
—এই যে অরুণ! এস বাবা এস, এতকাল তোমারই  
কথা হচ্ছিল।” রায় মহাশয়ের পার্শ্বে আসন গ্রহণ



করিয়া অকণ্ঠে শ্রীতি প্রদ্বন্দ্ব মুখে বলিল “আমার কথা? আপনাদের বাড়ীতে এসে কত বে উপভব করছি—”

“বিলম্ব!” এই আত্মীয়-স্বজন শ্রুত প্রবাসে তোমাকে পেয়ে যে কত আনন্দ লাভ করছি, তা বলে জানাবার নয়। কিন্তু বাবা, এ তোমার ভারি সত্যায় আমাদের এমন কতক, মাঝার বান্দনে বেঁধে তুমি এত শীঘ্র গিরি পালাতে চাও, আর ছুটো দিন থেকে গেলে কি এত কতি হবে? মাঝার মুখে তো তোমার প্রশংসা আর ধরে না, তুমি চলে গেলে সেও বড় দুঃখিত হবে।”

মাঝা তাহার মনোগত বাসনা পিতার মুখে ব্যক্ত হইতে শুনিয়া সে লজ্জার আরক্ত হইয়া উঠিল। অকণ্ঠে সেই লজ্জাকর স্বন্দর মুখখানির পানে অগাধে চাহিয়া বিনীত হাতে বলিল “আপনাদের ঘেঁহের তুলনা নেই! আমার কত বড় সৌভাগ্য, যে একই ঘর বিদেশে এসে, অগ্রভাষিত ভাবে আপনাদের মত স্বন্দর লাভ করে গেলাম, আমি যেখানেই থাকি, আপনাদের স্নেহ দ্বন্দ্ব কখনই ছুটিতে পারি না।”

“সেকি কথা বাবা; তুমি কি আমার পর? আমার নবীন দাদার ছেলে তুমি! আমাদের দুজনের মধ্যে যে কি রকম বন্ধুত্ব ছিল, তা তো তুমি জান না! অশ্রু! এক বলে এক মন, এক প্রাণ। আমাদের দেখা হয়; যে কত কালের কথা। তুমি তখন নেহাৎ ছেলে ছায়াহ। আচ্ছা নবীন-বা’ এত ভাড়াভাড়ি চলে গেলেন, এমন সোনার টার ছেলে নিয়ে ছাড়া দিনও সংসারের স্থখ ভোগ করতে পেলেন না? প্রভু হে! সবকি তোমারি ইচ্ছা।”

বিসম্বৃত্ত ভাবে মাথায হাত বুলাইতে বুলাইতে রায় মহাশয় আবার বলিলেন “যাক সে সব কথা, এখন তুমি বিয়ে করে সংসারী হও না বাবা, বাড়ীতে তোমার মা এরা, তিনিও তো কিছু ভিরিলন থাকবেন না, এই বেলার বেঁধে শুনে—ওকি মা! তুমি চলে যাচ্ছ কেন? বস একটু, আমি একবার ঘুরে আসি।” গমনোচ্ছত্না মাঝা ক্রিয়া বলিল “আজ এমি মাঝে মাঝে বাবা? এখানে তো বেলার চের রয়েছে।” “হ্যাঁ মা, আজ একবার স্থানান্তরে দেখে আসতে হবে, সে যে অনেকদিন আসে

নি, কি জানি অস্থব করছে না কি। বখনও তো এমন হয় না—”

মাঝার বুকের ভিতর ধক্ক করিয়া উঠিল। গতাই তো, কখনও তো এমন হয় না। রমানাথ চলিয়া গেলেন। মাঝা সেই বানেই বিবর্ণ মান মুখে স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে তখন ভাবিতছিল তাহার মনের এই আশ্চর্য্য অভাবনীয় পরিবর্তনের কথা, যে স্থানান্তর পূর্বে একদিন না আসিলে মাঝার ব্যাকুলতার অন্ত থাকিত না, সেই স্থানান্তর এতদিন অস্থবস্থিত, কিন্তু সে স্তম্ভ মাঝা এমন কি উৎকর্ষা বা অভাব অস্থবত্ব করিয়াছে? তাহার এই উপেক্ষা তাহার চির প্রিয় হৃদয়ের প্রেমায় বিস্তৃত হৃদয়ে যে কতখানি আঘাত করিতে পারে, তাহা মনে করিয়া মাঝার কোমল চিত্ত বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মাঝাকে বিমর্ষ, নির্মলক দেখিয়া অকণ্ঠে মূঢ় কোমল স্বরে বলিল “মাঝা! দাঁড়িয়ে কেন? বস।” মাঝা নীরবে একখানা চোয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। অকণ্ঠে সন্ধ্যাকরে সহিত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া মাঝা। কথাটা কি সত্যি? সত্যি কি আমি চলে গেলে তুমি দুঃখিত হবে? সে প্রশ্নের উত্তর মাঝা নিতে পারিল না, মনের আবেগ কষ্টে সত্যত্ব করিয়া সে মান মুখে স্তম্ভিত স্বরে বলিল “আপনি আমার কত দিন পরে আসবেন?”

“বলতে পারি না মাঝা, আর কখনও আমি মাঝে মাঝে কি না। তবে তোমার বিরাম সময় যদি সময় ভর খবর পাই, তাহলে একবার আসতে নিশ্চয় চেষ্টা করব।”

বলিতে বলিতে অকণ্ঠে একটা গভীর বীণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বৈশিদিন নয়, মাজ চুই সপ্তাহ সে মাঝার ঘরে বাড়ী অতিথি হইয়াছে, কিন্তু এই অত্যন্ত সময়ের মধ্যে স্বন্দরী তরুণী মাঝা, যেন কোন ঐশ্বর্য্যালিঙ্গকের প্রভাব তাহার সমস্ত মন প্রাণ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু অকণ্ঠে জানিত মাঝা স্থানান্তর বাসনতা, তাই মাঝার স্বয়ম প্রিয়-সঙ্গীত অত্যন্ত লোভনীয় হইলেও সে তাহা ছাড়িবার ক্ষমতা এত ব্যস্ত হইয়াছিল।

মাঝার নীরব বিমূঢ় মুখ খানির পানে চাহিয়া অকণ্ঠে আবার বলিল “আর আসা হয় না হয়, এই দেখাই যদি শেষ দেখা হয়, তবুও মাঝা, তোমাদের কথা আমি চির-

দিন, চিরজীবন স্মরণ করে রাখব, মাঝা—” উজ্জ্বলিত জ্বরবলে অকণ্ঠের কণ্ঠের গাঢ় হইয়া আসিল। মাঝার মুখে এককণ্ঠে কথা ফুটিল, সে মুহূর্ত্ত কালিত কঠোর বলিল বদ্য করে আর দিন কতক থেকে যান যদি তাহলে—“না মাঝা। আর আমাকে থাকতে অস্থবত্ব করে না, আমাকে যেতে দাও, আমার এ ছুদিনের স্বপ্ন একটু তুলবার অবকাশ মাঝা মাঝা।”

সেই ব্যথা ভরা কক্ষণ স্বরে মাঝার অধীর চিত্ত আরও বিপর্য্যস্ত, ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আজ সে এখন জানিতে পারিল, তাহার অব্যাহত অবশ মন সেই ছুটি দিনের পরিচিত অকণ্ঠে মনে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, এবং তাহাকে কেমন মনে অন্তর্য্যব। কিন্তু হায়! যেন জানিয়া শুনিয়া এই নিফল প্রেমকে সে কোন দ্বয়ে স্থান দিল? এ প্রেমের পরিণাম সে পূর্বে কেন ভাবিয়া দেখিল না, এখন মাঝার বুক ভরা আশা ভালবাসার বৃষ্টি ঐ বানেই অবসান। এই দেখাই শেষ দেখা। তাহার ব্যক্তিভেদ এই ছুটি দিনের আনন্দময় মূহুর্ত্তিতেই বৃষ্টি মাঝার জীবনের চিরসপন হইয়া রহিল। ইহার অধিক আর কিছুই সে পাইবে না।

উৎফলিত হৃদয়ে যেন দামে অসমর্থ হইয়া মাঝা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাড়াভাড়ি দেখান হইতে উঠিয়া গেল।

২

রায় মহাশয় বহুকাল নেপাল প্রবাসী। স্থানীয় রাষ্ট্রপরিবারে তিনি একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াও একমাত্র অবলম্বন মাঝাকে লইয়া সেই আত্মীয়-স্বজন-বর্জিত স্থান প্রবাসে অমনাচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাহার কারণ মাঝা হইয়া মহাশয় অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক, এবং দেশে তাহার এমন কোনও আকর্ষণ ছিল না, যাহার জ্ঞাত এই বাস্তব সম্পদ পূর্ণ পার্শ্বতা প্রদেশের মাঝা কাটাছায়া দেখানো গিয়া বসবাস করিতে পারেন।

স্থানান্তরকার্য্যে বিভাগে কাজ পাইয়া নেপালে আসিয়াছিল, সে প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা। এমন সে কর্মস্থল্য্য করিয়া কাঠের কণ্ঠীক্টিয়া করিয়া বেশ দুঃখসা

উপার্জন করিতেছে। এই পিতৃমাতৃহীন সচ্চরিত্র সরল স্বভাব যুবকটিকে রাষ্ট্রপরিবারে সন্নিবেশ ঘেঁহের চক্ষে দেখিতেন, এবং তাহার বাসী দ্রুই জনেই স্থানান্তরে জামাতরূপে বরণ করিতেন স্থির সন্দেহ হইয়াছিল, এতদিন বিবাহ হইয়া বাইত, কিন্তু মাঝার জননীর আকর্ষণ মৃত্যুতে ব্যাধ হইয়া শুভবর্ত্ত অস্থিত রাখিতে হইয়াছিল।

মুহূর্ত্ত স্থানান্তর তাহার চিরবাসিতা মাঝাকে পাইবার আশায় আশান্বিত হইয়া, তাহার আত্মীয় স্বজনহীন শ্রুত সংসারে তাহার উপাত্তদেবীকে কল্যাণী গৃহলক্ষ্যরূপে অধিষ্ঠিত করিয়া এতদিন করনায় স্বয়ম স্বর্ণরাজ্য রচনা করিয়াছিল, সে স্বর্গের স্বপ্ন সফলপ্রায়, এমন সময় সন্ধ্যা অকণ্ঠে একদিন কোথা হইতে আসিয়া স্থানান্তর ভাগ্য গগণের ধূমকুতুরূপে তাহার এতদিনের স্বয়মচিত্ত পুষ্পিত আশা কাননে আশান্ত্রিত্য দাবানল জ্বালিয়া দিল।

রায় মহাশয় ব্রাহ্মসম্মেলনী, তাহার গৃহে অবস্থায় প্রথা ছিল না, বিশেষতঃ অকণ্ঠে তাহার বন্ধুত্বপূর্ণ। তথাপি সেই অপরিচিত অস্থিত বৃদ্ধের সহিত স্ত্রীমারী মাঝার এতটা অসংকোচ ঘনিষ্ঠতা স্থানান্তর চক্রে পূর্ণাবস্থায় ভাল লাগে নাই। অকণ্ঠে আশিবার পর তাহারেই দুইজনের মাঝখানে এমন একটা দ্বন্দ্ব ও ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাঁহা অতিক্রম করিয়া মাঝার কাছে গিয়া তাহার মনের ভাব সে অসংকোচ মুহূর্ত্তিয়া বলিতে পারিতেছিল না, বলিতে বৃষ্টি প্রস্তুতও ছিল না। কিন্তু স্থানান্তর নিজের মনে স্থির বুদ্ধিতেছিল যে তাহার জীবনের প্রবর্ত্তা, অন্তর্য্যব দন মাঝা, তাহার নিকট হইতে ক্রমেই দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া বাইতেছে, তাহাকে কিরিয়া পাইবার আশা, এখন হারাশ।

সে দিন অপর্য্যাক্ষে মাঝা তাহারের গৃহ সংলগ্ন উজানে জন্ম করিতেছিল। এবং দূরে, যেখানে ঘন সন্নিবেশিত অত্যন্ত নীলাময়ান পুসর ভূষণ সৌন্দর্য্যের অন্তরালে, অশ্রুচল-গামী লোহিত তপন লিঙ্গিগণে সোপানর রং ফলাইয়া ধীরে ধীরে কম্পনঃ ভূবিয়া বাইতেছিল, সেই দিক চাহিয়া চাহিয়া অকণ্ঠে মাঝা তাহাকে ভাবিতছিল। এমন সময় স্থানান্তর ভাবিল “মাঝা!” স্থানান্তর সেই বিরস বিষম মুখশ্রী, ও ব্যাভাষা মান চক্ষুহীন উদাস দৃষ্টি দেখিয়া



তাহার কুল প্রর কবিত্তে মায়ার প্রবৃত্তি হইল না। সে লক্ষ লক্ষোত্তে ধীরে ধীরে বলিল “এতদিন একবারও কি আসতে নেই?”

“আমার আসবার আর কি এখন দরকার আছে মায়? হৃৎযান্ত্র সেই কথাগুলি মায়ার অহুতপ্ত হৃদয়ে যেন তীব্র কণাধাত করিল। আহত ব্যথিত চিত্তে মায় তাহার অস্তরের নিহিত হৃদে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সেখানটা কেবল নবাবিত অরুণের তরুণ দীপ্তরাগে গুরুপূর্ণ—উদাসিত হইয়া আছে, তাহার কাছে স্বাধীনতার অহুতপ্তের বিহীন ভাঙিটুকু একশ্রেণী বিলয়মান, অস্তহিত-প্রায়।

লক্ষ্য ক্ষোভে ত্রিমাণ হইয়া মায় মুখখানি সন্ধ্যাতে অমনত করিয়া, বুদ্ধিত অপর্যায়ী মত বলিল “আমায় ক্ষমা কর্ণে আমি সত্যই অপরাধী।”

হৃৎযান্ত্র জানিত যে মায়ার হৃদয়ে তাহার আর স্থান নাই, কিন্তু অত্যাচার তাহার নিজের মুখে এই স্পষ্ট স্বীকার্যে ক্রিয়া তাহাকে বার বার নাই ব্যথিত ও মর্মান্বিত করিয়া তুলিল। হৃৎযান্ত্র আবেগভরা উজ্জ্বলিত স্বরে বলিল তবে কি মায়! সত্যিই তুমি আর আমার হবে না? এতদিন মনে মনে বুঝাই দুরাশা পোষণ করছি?—বেশ, তাই হ’ক। আমি জানি অরুণেন্দু তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, সে ভালবাসায় তুমি স্বহী হবে নিশ্চয়, কিন্তু মায়, তোমার চেয়ে প্রিয়, তোমার চেয়ে আপন্যার, আমার আর কেউ নাই, সেই তোমার সন্ধ্যাতে আজ আমি বড় পক্ষী করে বসছি, আমার মত নিঃস্বার্থ—একনিষ্ঠভাবে, প্রাণমন দিয়ে তোমাকে আর কেউ কখনও ভালবাসতে পারবে না।”

“তোমার এ ভালবাসার আমি অগোচর, ক্ষম্যারও বোধহয় অগোচর, কিন্তু তুমি তো জান না, আমার গোড়া মনের এই অস্বাভাব্য আমি দিনরাত কি অশান্তি, কি অহুতপ্তের জালা ভোগ করছি! আমি সত্যিই বড় অসভ্যনি!

উজ্জ্বলিত অশ্রুজলে মায়ার কণ্ঠের কণ্ঠিত রুদ্ধ হইয়া গেল, ব্যথিত বেসমান হৃদয়ে সে অকস্মে মুখ দুকাইল।

রায় মহাশয়ের উপরোখে পড়িয়া অরুণেন্দু আর এক সন্ধ্যা সন্দেশে থাকিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি রায় মহাশয় একটা বিষম সমস্যা পড়িয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতেছিলেন যে তাঁহার বহুপুত্র অরুণ মায়ার প্রতি একান্ত অহরুত হইয়া উঠিয়াছে, কস্তার মনোভাবও তাঁহার অবদিত ছিল না।

রূপে গুণে, ধনে, মানে সর্বপ্রাণেই অরুণেন্দু স্বাধীন অগোচর স্পষ্ট ও বরদী, কিন্তু রায় মহাশয়ের পরম বেহেতাভন, এবং তাঁহার পরলোকগতা প্রিয়তমা পত্নীর নির্দোষিত পাত্র স্বাধীন, তাহারাই বা বিমুগ্ধ করেন কিরূপে? সে যে মায়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে!

এদিকে পিতা হইয়া একবারে বেহেত, আদরিণী দুহিতাকে জন্মের মত অস্বহী করেনই বা কোন প্রাণে? অনেক ভাবিয়াও রায় মহাশয় তাঁহার কণ্ঠব্য নিরুপণ করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু আর সময় নেই, এ বিষয় শীঘ্রই একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে, আজ প্রভাতে একাকী বসিয়া তিনি বোধ হয় সেই কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মায় অরুণেন্দু এবং হৃৎযান্ত্রের সহিত আসিয়া হাসিমুখে কহিল “আর শুনেছ বাবা?—আজ এরা দুজনে বাঁধি রেখে পাছোড় উঠাবেন, আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে।”

কস্তার উৎসাহবীর হাসিভরা মুখখানির পানে মেহ-লিত মনে মায়িয়া রায় মহাশয় সহযোগে কহিলেন “দুটি নাকি? তা আমাকে আর টানিস না? তোর বাবার কি আর সে শক্তি আছে!” “না বাবা, তাহলে আমিও যাব না।”

অরুণেন্দু সনির্বন্ধে বলিল “আপনাকে একটু কষ্ট করতেই হবে নইলে যে, মায়ার যাওয়া হয় না।” রায় মহাশয় বলিলেন “বা! তা কেন? মায় তোমাদের সঙ্গে যখন যাক না, তোমার দৃষ্টি দূর করে রেখে, তখন ডাক কি বাবা? হৃৎযান্ত্র তো পাছোড় উঠতে খুঁচি পটু। আমার মায়ও বড় কম মায় না। কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে গেলে উঠবে অরুণ?”

অরুণেন্দু স্মিত মুখে হাসিয়া “বলতে পারি না,

তবে বাবা বেঁচে থাকতে আমার অনেক দিন দাঙ্কিলিয়ে ছিলাম, তাই পাছোড় উঠা আমার অনেকটা অভ্যাস আছে। তাহলে মায়! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো!” রায় মহাশয় বেহেত হাসি হাসিয়া বলিলেন “মায় যাবে না আবার! দেখছো না, পাছোড় ওঠার নামেও কি রকম খুঁচি হয়েছে! তাহলে তোমরা এই বেলা সকাল সকাল বেগিয়ে পড় বাবা, নইলে রোগ বাড়লে কষ্ট হবে।”

৪

এই যোগ শোক, পাপ তাপ পূর্ণ বিশ্বাসসারের বাহিরে সে যেন এক নুতন লোক, অপার্থিব আনন্দময় নিবিড় শান্তির রাজ্য। নিহৃত বিজ্ঞান পূর্ণত মালার অপর্যায়ী নুতন নুতন শোভা দেখিতে সেই তিনটা তরুণ তরুণী মুগ্ধ আনন্দ ভরা চিত্তে পাশাপাশি চলিতেছিল। পূর্ণতের কোনও স্থানে না। দীর্ঘ বসন্তভা ওলু পুষ্পিত হইয়া কোমলমল শোভায় রঞ্জিতের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিয়া গিতেছিল। ঝোপাও বা বেত ধূসর কৃষ্ণাভ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের উপলরাশির মাঝখান দিয়া হৃদয়লব্ধ নিরুপী, শুভ স্বচ্ছ বারিকণা বিকীর্ণ করিতে করিতে রম্যময়ী চক্ৰা বালিকার মত যুগ্ম কল্লোল তুলিয়া ক্ষিপ্ত-বহিতে চক্ৰা চলিয়াছে। দূরে, স্থানী আকাশপাশে চিত্রিত করা ঘন তুলায়চ্ছ উন্নত শুভ গিরিচূড়াগুলি, প্রভাতের তরুণ অরুণকিরণে উজ্জ্বলিত হইয়া যেন পালিশ করা রৌপ্যপাত্রে মত উজ্জ্বল বস্তুক করিতেছিল।

সেই অনৈসর্গিক শোভাময় বিজ্ঞান পার্শ্বত পথে চলিতে চলিতে মায়া পাশমুখা হুরগিণীর মত দ্রুত অথবা গতিতে এক একবার ছুটিয়া কল্লোল আগু গিয়া পড়িতেছিল। সেই শুভ নিহৃত গিরিবন্ধে, স্বভাব স্বন্দরী তরুণী মায়ার সৌন্দর্য্যময়ী মুগ্ধ মুখখানি যেন সন্ধ্যা বনদেবীর মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য তাহার সঙ্গী যুবক হইটীর প্রেমমুগ্ধ তরুণ প্রাণে এমন উমোহের সঙ্গার করিয়াছিল, যে তাহারো তখন অস্বাভাব্য হইয়া দেখিতেছিল শুধু মায়াকে, তাহারের আরাধ্যাদেবী, মায়ার অপকল্প রূপরাশি দেখিতে দেখিতে তমস্ব চিত্তে, স্থান কাশা বিশ্বত হইয়া তাহারো অনেক দূরে গিয়া পড়িল।

সমুখে একটা তরুলতা ঝিল, কৃষ্ণবর্ণ শিখাও আবৃত অনতি উচ্চ পাছোড়। ঈষৎ তরুণ বকসিত হৃদ্যা-লোকে, সেই তীব্র দর্শন পাছোড়টা তাহার প্রকাণ্ড পাশাধমর বেহেতানি মেলায়া যেন বিপুলকায় বিকট দানবের মত আরামে ঘুমায়া আছে। সেইখানে আসি হৃৎযান্ত্র সহসা ধমকিয়া ঠাড়াইয়া বলিল, “একি? আমরা যে খুঁচি পাছোড় এসে পড়লাম!—আর এগিয়ে কাজ নাই, মায় কিরে চল,—আহুন অরুণবাবা!” “খুঁচি পাছোড়! সেকি?” অরুণেন্দু গতিরোধ করিয়া তাহাকে দ্বিজ্ঞাপ করিল “পাছোড়! দেখতে বড় ভয়ানক, তাই বুঝি এই অদ্ভুত নামকরণ হয়েছে?” “শুধু তাই নয়,—এ পাছোড়টার সহজে অনেক রকম প্রকার শোনা যায়। এ অরুণের লোকেরা খুঁচি পাছোড়কে সন্ধ্যা বনালয়ের তুলা ভয়াবহ ও বিপজ্জনক মনে করে থাকে।”

অরুণ অধিকতর চমকিত হইয়া বিস্মিত নয়নে মায়ার পানে চাহিল। মায়ও হৃৎযান্ত্রের স্বাধীন গায় দিয়া বলিল, সত্য মিথ্যা বলতে পারি না, তবে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, এই রাস্তা পাছোড় উঠে অনেক লোক, আর নাকি ফিরে আসতে পারেনি, তাদের লাশ পণ্ডিত খুঁজে পাওয়া যায় নি,—একবারেই মেনোমল অস্বপ্ননি।

এই আশ্চর্য জনরব অরুণেন্দু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না, বরং সেই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ খুঁচি পাছোড়ের উপর গিয়া একবার আত্মোপাস্ত দেখিবার জ্ঞান তাহার যৌবনের বলদৃষ্ট নিতীক হৃদয়ে একটা আশ্রয় ও কোঁতুল অদম্য আস্থা উঠিল। অরুণ সন্ধ্যোভূকে হাসিয়া বলিল, “বা! বেশ তো, এ যে সেই আরব্য রজনীর মায়! পূর্ণত দেখছি। হৃৎযান্ত্রবা, আপনি যদি দয়া করেন মায়ার কাছে একটু থাকেন, তাহলে আমি একবার পাছোড়টার উপর ঘুরে আসি, কি জানি সেখানে যদি কোনও নুতন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়,—চাইকি এক আশ্চর্য মায়াবিনী রাঙ্গনীও বধ করে আসতে পারি!”

অরুণেন্দু পরম উৎসাহে অরুণের হাঁসি। হৃৎযান্ত্র দেখিল মায় প্রাণসমান উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অগ্রগামী অরুণের পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার মনস্ত শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া যেন চন্দন করিয়া উঠিল। অরুণেন্দু



আজ পাহাড়ে উঠিয়া বাহারী দেখাইয়া মায়ার কাছে বাহবা লইতে, এবং স্বাধাংকে অপমানিত করিতে চায়।

কিন্তু কেন সে নিতান্ত শক্তিশীল কাপুরুষের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই হীনতা ও পরাজয় স্বীকার করিবে? স্বাধাং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “যামুন, আমিও বাবা।”

কিন্তু সেই জনপ্রাপ্তি মুহূর্ত্তে স্থানে মাথাকে একাকিনী রাখিয়াই বা যাওয়া যায় কি প্রকারে? অনেক তরু-বিকীরকও তাহা স্থির করা গেল না। মায়ার বাহাদুরীর মেয়ে হইলেও সেই পার্শ্বদেশে আবাল্য বসবাস করায় তবু কাহাকে বলে জাতি নহা, স্থানীয় জলবায়ুর গুণে স্বাস্থ্য অনুরূপ এবং শরীরে সামর্থ্যও বেশ ছিল। বিশেষতঃ এই আশ্চর্য্য বুনী পাহাড় দেখিবার জন্ত তাহার পূর্ব্ণ-আগ্রহ আশ্রয় জন্মিয়ছিল, এক্ষণে যেরূপ পাহায়া সে তাহার সঙ্গীদের ধরিয়া বসিল, সেও তাহাদের সঙ্গে পাহাড়ে উঠিলে।

স্বাধাং শব্দিত চিত্তে বলিল “না থাক, তা’হলে কারও গিয়ে কাজ নেই, বেলাও হয়েছে, চল এইবার ফেরা যাক। কোন ভুলে সাধ করে বিপদের সম্ভবী হইল হওয়া বৃক্ষমানের—”

স্বাধাংর কথায় বাণা দিয়া অরুণেন্দু অবজ্ঞাজরে হাসিয়া বলিল “বলেন কি স্বাধাং বাবু! দিনে দুপুরে, একটা সাধারণ পাহাড়ের ওপর এমন কি বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে? বার বার এক ভয় পাচ্ছেন, দেশের অসভ্য পাহাড়ী গুলোর মধ্যে ভুতের ভয় যেমন প্রবল দেখছি, তাতে একরকম সব অস্বস্ত জনরবের স্রষ্টা হওয়া কিছই আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু আপনিও কি বিশ্বাস করতেন পাসেন স্বাধাং বাবু, এই বিশপ শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও সেই পুরাকালের মত ভুত প্রেত দৈত্য দাঁমনের অতিভয় থাকতে পারে? মায়ী! তুমি কি বল?”

মায়ী অরুণেন্দুর উত্তেজিত উৎসাহশীল মুখের দিকে সঙ্গোরে চাহিয়া যু মুখের হাসিয়া বলিল “আমার কোনও কালেই ওসবের বিশ্বাস নেই—”

স্বাধাং দেখিল বুঝা চেষ্টা, তাহার নিবেদ্য ব্যাখ্যাকেই মানিবে না। তখন সে প্রজ্ঞত হইয়া ওভার কোর্টের পকেট হইতে একপাছা পল্লভোম নিখিত স্বরূপ দীর্ঘ রজ্জু, বাহির করিল। সেইরূপ রজ্জু, কোদেশের অবিবাসনীয় দুর্গম বিশদসঙ্কুল পার্শ্বতাপণে চলিবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বাধাং সে রজ্জু এক প্রান্তে নিষ্পন্ন, অত্র প্রান্তে অরুণেন্দুর, এবং মধ্যভাগে মায়ার কটাশে আলগা করিয়া রাখিল। তাহার পর প্রথমে স্বাধাং, মাঝখানে মায়ী, পশ্চাতে অরুণেন্দু এই ত্রায়ে সারি রাখিয়া তিনজনে সতর্পণে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গন্তব্য পথ ক্রমেই হঠকর, দুর্গম হইয়া আসিতেছিল।

অনেক খানি “চড়াই” ভাসিয়া তাহারা তিন জনে প্রান্ত হইয়া একটু খানি বিশ্রাম লইবার জন্ত থাড়াইয়াছে, এমন সময় স্বাধাংর মনে হইল, তাহার পদতলে যেন ভূমিকম্প হইতেছে। একটা সম্মানিত অনুভব আশঙ্কায় সাহসী স্বাধাংর নীচী স্বয় শিহরিয়া উঠিল। একি তাহার মনের ভয়, না বাবর ঘটনা? ব্যাপার কি ঘটিতে না পারিয়া বিম্বিত শব্দিত স্বাধাং, সে স্থানে হইতে লাগাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার পা ছুঁলিবার পূর্ব্ণক্কে সেখানকার জমীটা নহা না সজোরে দুলিয়া উঠিল, তারপর চক্ষের নিম্নে, একটা ভয়ঙ্কর ঘন কবিতা, কিংকর্তব্য বিমুঢ় স্বাধাংকে লইয়া কি জানি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

একটা গভীর অন্ধকারময় প্রকাণ্ড গরুরে নিষ্কপ্ত হইয়া স্বাধাং দড়ীর সাহায্যে শূন্য স্থানিতে লাগিল। সেই দড়ীতে মায়ারও কোমর বেঁধা ছিল, স্বরাং স্বাধাংর গমনবশে, আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে না পারিয়া সেও অচিরেই স্বাধাংর দশা প্রাপ্ত হইল। অরুণেন্দু সকলের শেষে, এবং তাহার শরীরে বলও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, তাই পতনোন্মুখ হইয়াও সে কতীক্লম রজ্জুই হাতে ধুলা কেশিকা কোনরকমে আঁকড়াশা করিতে পারিল। এই অভাবনীয় আকস্মিক বিপদে অরুণেন্দু মূর্ছার জন্ত হতবুদ্ধি ও বিমুঢ় হইয়া পড়িল, পরকণ্ঠেই তাহার কন্ঠব্য স্থির করিয়া সেই থানে চাপিয়া বসিয়া মায়ী ও স্বাধাংকে

উপরে ছুঁলিবার জন্ত প্রাণপণ শক্তিতে সতলে রজ্জু আকণ্ঠ করিতে লাগিল; কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। তাহারা তখন ঘুরে অনেক নীচে গিয়া পরিয়াছে, অরুণ যতই বলিষ্ঠ হউক, তবু সে একা, শুধু একপাছা দড়ীর সাহায্যে সেই গভীর গিরি-গরুর হইতে দুইজনকে টানিয়া তোলা একে-বারেই অসম্ভব। তখন অন্যত্ৰোপায় হইয়া অরুণেন্দু অসীম বৈরাগ্য সহকারে সেই থানে সেই ভাবে দড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল। স্বাধাং ও মায়ী দুইজনেই লম্বাখন রজ্জু অবলম্বনে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ গরুরে স্থানিতে লাগিল।

উপর হইতে একটু খানি সচরাঁ দিবালোক প্রবিষ্ট হওয়ায় গরুরের উপরিভাগ কিয়দংশ দৃষ্টি পোের হইতেছিল, কিন্তু নিম্ন ভাগ একেবারেই অন্ধকার, শুধুই অবিচ্ছিন্ন মসীক্লম ঘোর অন্ধকার রাশি সেখানে নিবিড় জমাট রাখিয়া আছে। মায়ী ও স্বাধাং সত্বে তাহাদের বিব্রল ব্যাঘুল দৃষ্টি আনমিত করিয়া সেই ভয়াবহ গিরি-গরুর গভীরতা দেখিবার জন্ত প্রাণাণ চেষ্টায় চাহিয়া রহিল, কিন্তু সেই যতীভেদ গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। হায় রে অদৃষ্ট! তবে কি এই অতল স্পর্শ অভ্যন্ত ভিমির হৃদয়ের মধ্যেই বিঘাতা তাহাদের মরণ-পন্থন পাতিয়া রাখিয়াছেন? জীবন্ত সমাধি! উঃ সে যে কি ভয়াবহ, কি শৈশবীয় যত্ন! হতাশায়, আতঙ্কে, দুইজনেই আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল।

স্বাধাং নিষ্পন্ন জন্ত উদ্বিগ্ন হইলেও তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব মায়ার এই দৃষ্টে সে অত্যন্ত অধীর ও মুহমান হইয়া পড়িল কিন্তু কেমন করিয়া যে মাথাকে এই আসন্ন নিশ্চিন্ত মৃত্যুর প্রায় হইতে রক্ষা করিবে, তাহা সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না।

একটু চেষ্টা করিলেই সে দড়ী ধরিয়া মায়ার নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে সামলাইতে পারিত, কিন্তু একেই তো দুই দিককার আকর্ণণের মধ্যে পড়িয়া মায়ার গণিণ কটি যেন ভাসিয়া পরিত্যক্ত, সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত, নিশ্বাস প্রাশাস যেন ক্লম হইয়া আসিতেছিল। তাহার উপর স্বাধাং উঠিতে গেলে দড়ীতে আরও টান পড়িয়া হয় তো সেই মূর্ছারই মায়ার জীবনান্ত ঘটিতে পারে।

এদিকে বাহিরের অরুণেন্দু তখনও সেই এতই ভাবে বসিয়া দিলে অতিরিক্ত গুরুভারে তাহার হাত দুখানি ক্রমশঃ অবসন্ন, শরীর যথাক্রম শক্তিশীল হইয়া আসিতেছিল, সে একাকী আর কতক্ষণ ঘুরিতে পারিবে। আজ বৃদ্ধি এই তিনটা প্রাণীর মরণ ভগবান একই হৃদয়ে রাখিয়াছেন।

জীবনের আশ্রয় জ্ঞানবিলি স্বাধাং মায়ার অসম্ভাব্য কার্য বিবরণ পাঠ্যমুখ্যখানির পানে ব্যাঘুল উদ্ভাস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া গভীর বেধে, উচ্ছ্বসিত আন্তরিকভাবে “মায়ী! মায়ী আমার।” কিন্তু মায়ার তখন কথা বলিবারও শক্তি ছিল না, সে মান নিমীলিত প্রায় চক্ষু হৃদয় কষ্টে পিষ্টিয়া একবার আশ্রানকারীর পানে চাহিল না। ভীষণ আতঙ্কে, দুর্ল্লিঙ্গ যন্ত্রণা মায়ার অবসন্ন বক্ষমান বেগলতা, নিরাশ তাপিত কোমল বস্ত্রীর মত যেন ক্রমেই এলাইয়া পড়িতেছিল।

হৃৎপে, ক্ষোভে হতাশায় স্বাধাং এবার যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে আর একবার নীচের দিকে চাহিল, দেখিল সেই প্রগাঢ় তমসাজ্জম গভীর আবর্ত, যেন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্তই ভীষণ কালান্তক রাক্ষসের মত মুখ-ব্যাহান করিয়া আছে। নিবেশের জন্ত স্বাধাংর বৃক্ষ কাপিয়া উঠিল, পরকণ্ঠেই সে তাঁর জীবনামিকা মাথাকে রক্ষা করিবার একটা অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বাম হাতে দড়ী ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের পকেটের ভিতর হইতে একটা কলম কাটা ছুরি বাহির করিয়া স্বাধাং পাঁচ দিয়া সেই ছুরিটির তীক্ষ্ণতার ফলা খুঁলিও লইল।

তাহার পর সেই ক্ষুদ্র ছুরি দুই মুঠিতে ধরিয়া দড়ীর যে অংশ তাহার কোমর পরে স্থান ছিল, তাহারই উপর সজোরে কিপ্র হস্তে ঘসিতে আরম্ভ করিল। ঘন ঘন যথেষ্ট দড়িট ঘন ঘন কাপিতে লাগিল। বাহিরে থাকিয়া অরুণেন্দু ভিতরের কাণে কিছুই শ্রুতিতে পারিল না, সে যতদূর সম্ভব চীৎকার করিয়া স্বাধাং ও মাথাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু মায়ী তখন প্রায় অচেতন, অরুণেন্দু উত্তেজনা স্বাধাংর ব্যাঘজ্ঞান রহিত, সে আশ্রান কেহই ভুলিতে পাইল না, শুধু প্রতীক্ষানি করিয়া আসিল।

এদিকে উপরূপরি ঘণ্টণের যবে দড়িট শীঘ্রই কাটিয়া



আসিল, আর একটুখানি বাকি। হৃদাংগে তাহার আকুল উচ্চৈঃস্বরী ভুলিয়া আর একবার মাথাকে, তাহার কামনার নিধি, সাধনার ধন মাথাকে জন্মের মত শেষ দেখা দেখিয়া লইল। তারপর অবরুদ্ধ কর্তে স্থলিত আকুল স্বরে “মায়া! বিদায়! জন্মের মত বিদায়! ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন—” বলিতে বলিতে সেই ভীষণ ঘনানমান নিবিড় তমিস্রাশির মধ্যে হতভাগ্য হৃদাংগে চিরদিনের জড়ই বিলীন হইয়া গেল।

স্বতঃপরিণত গভীরতম প্রদেশ হইতে শুধু একবার অশ্রুত ওগুণপূর্ণ ধ্বনি উভিত হইল। তারপর আবার সমস্ত নীরব নিরুদ্ধ। এবার বোঝা হালুকা হইয়া যাওয়ায় অকণ্ঠেই মনে আসিলেই মাথাকে উপরে টানিয়া তুলিল, কিন্তু দৃষ্টি মুখে ছুরির কাটা দাগ ভিন্ন হৃদাংগের আর কোনই নির্দশ পাওয়া গেল না।

অচেন্ত মাথাকে অকণ্ঠেই অপেক্ষাকৃত নিয়োগ দ্বানে লইয়া গিয়া তাহার স্তম্ভিত করিতে লাগিল।

অল্পকণের মধ্যেই মায়া সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সমুদ্রে অকণ্ঠেই বিমর্ষ হ্রাস মুখে শুভিত হইয়া বসিয়া আছে, দেখিয়া সে সবিষ্ময়ে উদ্বেগ ভরে ভিজ্ঞান করিল “আগনি একা যে? হৃদাংগে কোথায়?

অকণ্ঠেই সজল নয়নে আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল।

## ফাল্গুন-বালিকা

বন্দে আলী

ফাগুন আসে আকুল ভুবনে  
পেরিয়ে এলো হিম পারাবার  
ভেঙ্গে গহন মনের দুয়ার  
রঙিন পবনে।  
কুহেলীর এ আবহা মায়ায়  
ফুল সূচিছে পাতার ছায়ায়  
সংগোপনে।

তখন পূর্ণাপর সমস্ত ঘটনা মায়ায় মনে চকিতে স্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিল। তাহার চিরদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী যথার্থ হৃদয়, আজ শুধু তাহাকে বাঁচাইবার জড়ই বীর অমূল্য জীবন খেঁজায় বিসর্জন করিতেছে? মায়ায় মনে পড়িল হৃদাংগে একদিন বড় গুরু করিয়া তাহার সমুদ্রে বলিয়াছিল “আমার মত প্রাণ দিয়ে তোমাকে আর কেউ ভালবাসতে পারবে না।” তাহার সেই প্রেমময় পঙ্খিত বাণীর সত্যতা, সে এত শীঘ্র, এমন নিষ্ঠুর ভাবে প্রমাণিত করিয়া দিল!—তাহার পরম স্নেহের পাত্রী মায়াই শেষে তাহার জীবনহারা হইল? হা ভগবান!

অত্যাশঙ্কিত হৃদয়ে পূর্ণ হইয়া, অসহ্য তীব্র মর্মে বেদনায় বৈরাগ্যহারা হইয়া মায়াছিন্নকর্ত বিহগীর মত সেই পাশাপাশি কঠিন পিরিবিকে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্বস্ত অকণ্ঠেই মুখে মাথাকে সাধনা দিবার মত একটাও কথা আসিতেছিল না, সে কেবল চক্ষু মুছিতে মুছিতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভরকণ্ঠে বলিল “আর এখন বুঝা অশুশোচনীয় ফল কি মায়া? হৃদাংগে যথার্থই নিঃস্বার্থ প্রেমিক, পবিত্র প্রেমের মন্দিরে আজ নিঃস্বার্থ আত্মদান করিয়া তিনি চির অমরত্ব লাভ করছেন, এসো, আমরা ভক্তি ভরে সেই দেবতার, সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে নমস্কার করি।”

পরিবে দিয়ে যুঁহের মালিকা  
কপালে বেজে অশ্রু কাদনে  
বাণিলে হায় কিসের বাঁধনে  
অচুট বালিকা।  
নাই যে-কথা তোমার অধরে  
নয়নে তায় রাখলে কি ঘরে  
পড়লো না লিখা!



শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তেইশ

আহা! তাহার পর হরেন্দ্রবাবু শুইয়া শুইয়া চুপট টানিতেছিলেন, আর মনে মনে জ্যোতিষীর বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় বিনি বন্ধু, এলাহাবাদের উভয় ছিলেন, তাহারও জ্যোতিষের উপর কি অসম্ভব বিশ্বাসই না ছিল। কুস্তুর মেলার সময় যখন তাঁর বড় আদরের একমাত্র পঞ্চম বয়ীয়া কন্ডাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, মেয়েটির অন্বেষণ করিতে তিনি সাধার কিছুই বাকি রাখেন নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া যখন কোথাও মেয়ের সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন তিনি একজন কাজকর্ম পরিচালক করিয়া নানাবিধ সম্ভব-অসম্ভব উপায় অবলম্বন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেন নাই। শেষে তিনি জ্যোতিষীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে যে দেশে ভাল জ্যোতিষীর সংবাদ একবার তার কাণে আসিয়াছে, বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে আনাইয়া মেয়ের কোন্ডা দেখাইতে অবলো বা অমনোযোগ কোনদিন করেন নাই। জ্যোতিষের উপর এমন আশ্রয়ক বিশ্বাস ও প্রাণত ভক্তি আজকালকার দিনে বড় একটা কাহারও দেখা যায় না। বড় বড় বিচক্ষণ জ্যোতিষীরগণ একবাঁকো বলিয়াছিলেন,

“আপনার কন্ডা মারা যায় নাই—জীবিত আছে—তাঁহার বিবাহ যোগ আছে, যোল বৎসর বয়ঃকালের সময়। সং-পাক্তে বিশেষ গৌরবের সহিত এই কন্ডার পরিণয় কার্য হস্তসম্পন্ন হইবে। এই বিবাহ যোগই খুব প্রবল, যে নামাত্র মৃত্যু-যোগ আছে তাহা গ্রহ-সমিবেশ বিচার করিলে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।” কত কথাই আজ বিমলের মুখে জ্যোতিষীর সংবাদ পাইয়া হরেন্দ্রবাবুর মনে আসিতেছিল। স্বত বন্ধুর প্রতি তাঁহারও যে একটা কর্তব্য আছে। সে কথা মনে করিতে তাঁহার নয়ন-অশ্রু সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। জোর করিয়া যেন চুপটট একবার টানিলেন, তারপর একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ভাগ্য করিয়া ফিলিলেন “ভগবান মেয়েটির সন্ধান করে দাও। বন্ধুর অতুল আকাঙ্ক্ষার শাস্তি হোক।” শয্যা পার্শ্বেই একটা ‘টীপ’ ছিল, তাহার উপর অর্ধদণ্ড চুপট-টা রাখিয়া দিয়া নিশ্রা যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনৈকগুণ পর্যন্ত নিশ্রা আসিল না।

তখন রাহিরে কল্যাণমণ্ডীর সহিত ক্রিহের একটুখানি বকাবাকি হইতেছিল।

ঝি অস্বস্ত দেবশীঘ্র—অত্যন্ত বোকা মানুষ। সেজন্য সহজ কথাটাও সে খুব বড় এবং গুরুতর করিয়া ভাবে।



সেই জ্ঞান মাঝে মাঝে কল্পনাময়ী মত অসম্মিক লোকের সহিতও কথা কাটাকাটি করিয়া থাকে।

কল্পনাময়ী বলিতেছিলেন “দেখ লখিমার মা, আমি ত তোমাকে কোন অজ্ঞায় কথা বলিনি বাছা—তোমার আসতে প্রতিদিন নাটটা সাড়ে নাটটা বেজে যায়—ছেলেদের চা খাবার বড় দেখী হয় বলে তোমাকে একটু সকাল সকাল আসতে বলছি—এর জ্ঞান তোমার এত রাগ।”

লখিমার মা তখন ভয়কর রাগিয়া গিয়াছিল। এমন কি, ‘এমন কাজের তার অভাব নাই’ এই অশ্রুত মতটো প্রকাশ করিতে একটু হুইত ততঃ করে নাই। সে বলিল “রাগের কথা শুনেই সবাই রাগ করে থাকে। আমি দাসীবৃত্তি করিতে এসেছি বলে কি আমার রাগ করবার জো নাই। রাগের কথা বললে মরা—মায়েদেরও রাগ হয়—আর আমি ত জ্যাভ মায়ে বটে। তুমি অত বড়-মায়েদের বৌ, তুমি কি না বললে, যদি সকালে আসতে নিতান্ত বোঁ পারিস ত এই রাতে বাসন ধুয়ে দিয়ে তবে বাড়ী গিয়েতে পারবি। কেন? আমি কি তোমাদের কাছে মাথা বিকী করছি, যে বাড়ী যেতে পারবো না। আমার কাছে স্পষ্ট কথা, তোমরা লোক দেখে নিয়ে। আমার এত মাগের চাকরীতে দরকার নেই।”

কল্পনাময়ী এই নির্দোষ মেয়েটির অস্বাভাব উত্তেজনা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত হাসিতেছিলেন ও হৃদয় পাইতেছিলেন। এই সব কথা বলার ভিতর যে কতখানি অজ্ঞায় নিহিত রহিয়াছে; এই অশিক্ষিতা মেয়েটি যদি তা অশুদ্ধকর করিতে পারিত, তাহা হইলে ইহার মুখ হইতে যে এইপ্রকার একটা বর্ণও বাহির হইত না, তাহা অসম্ভব সত্য। কাহাকে কি বলিতে হয়—এসে সে বলিবার গুরুত্ব যে কতখানি, মেয়েটির মোটেই গণ্যমান নাই। সকলেই কি এই সব কথা মূল্য নাই ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। আজ যদি ইহাকে জবাব দেওয়া যায়, কাল কি থাকিবে তাহার সম্ভাব্য ইহা নাই। এতটা বুদ্ধিবার মত শক্তি থাকিলে সে এই সব তর্ক করিতে সাহস পাইত না। কল্পনাময়ী অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বলিলেন, “আমি ত তোমাকে সব বাসন যাচ্ছিলে বলি নাই।

কেবল চায়ের বাসন গুলো খুঁতে বলছিলাম। তা যদি তোমার এখন করতে কষ্ট হয় কাল একটু সকালে এসে পরিকার করব দিও। এখন যাও।”

যি গল্প গল্প করিতে করিতে চায়ের বাসন খুঁইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কল্পনাময়ী শয়ন করিতে আসিলে হরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “কিসের জ্ঞান যি চোঁড়াছিল?”

কল্পনাময়ী উত্তর করিলেন—“ওকে কাল একটু সকাল সকাল আসতে বলেছিলাম এতই—ওর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভাগবে বলে ডুব দেখাচ্ছিল।”

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন “মন্দ আশ্বাসের নয়—এর মধ্যেও দেখছি স্বাধীনতার স্বাক্ষর আছে?”

“তুমিও যেমন, সে সব বুঝলেও বাঁচতেম। এঁদের অশ্বমেধের কোন অর্থ হয় না। ভাল করে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলেই এরা তার উকীল মনে করে রেগে ওঠে। সেই চায়ের বাসন ধুয়ে আজই দিয়ে গেল কিন্তু কাল সকালে এসে করতে বলায় চাকরীতে জবাব দেবার জ্ঞান প্রস্তুত।”

তারপর নানা কথা হইল। শেষে কল্পনাময়ী বলিলেন “ঠাকুরস্বি বলছিলেন, লতিকার বিবাহ না দেওয়া আর ভাল দেখাচ্ছে না। তোমরা যে কেনম কর’ চুপ করে বসে আছ, তা বুঝতে পারছি না?” কথা যা বলছেন তা ঠিক। আমি ত তোমাকে অনেক দিন থেকে একথা বলে আসছি। ছেলেদেরও কলেক্স খোলবার সময় প্রায় হ’য়ে এলো। আর ত এখানে বেশীদিন থাকলে চলবে না? এবার কলিকাতায় গিয়ে লতিকার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেই হবে।”

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “সে ঠিক কথাই বলেছেন। আমি যে কেনম চুপ করে বসে আছি তা যে তুমি জান না, তা নয়। পাত্রও আমাদের হাতের মধ্যেই আছে। অশ্বমেধ করবার কোন প্রয়োজন নাই, একটা দিন স্থির করে বিবাহের ব্যবস্থাটা করিলেই হবে।”

কল্পনাময়ী বলিলেন, সে কথাও আমার ঠাকুরস্বির সঙ্গে সেদিন হয়েছিল। আমি বলিলাম, “বিপিন ভাস্করী

গড়ছে। পাশটা করিলে ওর সঙ্গে লতিকার বিবাহ হয় তোমার দাদার এমন একটা সংকল্প মনে মনে অনেক দিন হ’তে আছে। জানি না, তোমাকে সে কথা তিনি বলেছেন কি না?”

ঠাকুরস্বি বলিলেন, “না দাদা আমাকে সে কথা বলেন নাই। হয় ত পরে বলিবেন। তবে আমার বড়টা মনে হয় লতিকা কি বিপিনকে পছন্দ করবে?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “বাস্তাব্যের মধ্যে-ছেলে, তারা কি নিজেরা পছন্দ করে কোন দিন বিবাহ করছে! যে আজ তাহার পছন্দে উপর বাপামাকে নির্ভর করে কাজ করছে হবে?”

এবার ঠাকুরস্বি হাসিয়া বলিলেন, “আগে ত এমন ভিল না, আজকাল নাকি এসব নুতন নিয়ম আইন সমাজে হ’চ্ছে। কোথাও কোথাও এমন কথাও শুনেছি, “সেদের মা নাকি ছেলের মায়ের নিকট পাঁচ সাত দিন মেয়ে নিয়ে বিয়ের পূর্বস্ব ক’রে এসেছেন।”

আমি বলিলাম, “এর মানে—

তিনি হাসিয়া বলিলেন “তোমরা সভ্যতার রাষ্ট্র-ধনীতে বাস কর, আর এই সামাজ্য কথাটার অর্থ বুঝতে পারলে না বো? বাস্তবী নির্দোষ করার জ্ঞান।” আমি বলিলাম “হা ভগবান! এতদূর পর্যন্ত শেষে গতিচ্ছে?”

তারপর ঠাকুরস্বি বেশ গভীর ভাবে উত্তর করিলেন “নির্দোষ জিনিসটা খুবই ভাল। তখনকার দিনে যে স্বয়ম্বা হতো। তোমার আমার সময় এ কথা শুনিতে লজ্জায় মরে যেতেন।” এখন এক একবার মনে হয় নির্দোষ করার অধিকার থাকলে, তোমার নন্দাইটি যে সে সময় পাশ হ’তে পারতেন তা ভাই বলতে পারি না।”

“তোমার এক কথা ঠাকুরস্বি। আমার নন্দাই যাই ছিল.....

আমার মনের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি উত্তর করিলেন “তাই আমার মত মেকি চলিয়া গেল কেনম?”

“ঠাকুরস্বি, ছি ভাই! আমি কি তোমাকে তাই বল-তাম? তুমি আমার উপর রাগ করলে?”

“রাগ করার কেন ভাই।”

“সত্যি কথা বলতে কি, আমার নন্দাইএর মত এমন সাদা সিনে মাছই আজকালের দিনে খুব বিরল।

“সে কথা ত আমি অস্বীকার করিনি।”

“খাই হোক ভাই, বাজে কথা ছেড়ে দাও। লতিকার

বয়স হয়েছে। সে আর এখন ছেলে মাছটো নেই।

তারপর লেখাপড়াও শিখেছে। ভাল মন্দ বিচার বুদ্ধি তার হয়েছে—একথা ভুললে চলবে না। এক্ষেত্রে চারিদিক চেয়ে, বিবেচনা করে, কাজ করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য ও প্রয়োজন। তাকে এখন পছন্দ করবার কতকটা অধিকার ছেড়ে দিতে হবে। এই ছেড়ে দেওয়াই তার সারা জীবনের গতিকে শান্তি প্রদান করবে?”

ঠাকুরস্বির কথায় বড়টা বুঝলাম, তাতে আমার মনে হয় লতিকা বিপিনকে বিবাহ করতে রাজি নয়। যদিও মুখে সে কোন দিন তেমন ভাব প্রকাশ করে নাই।

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “কেবল পছন্দ অথবা পছন্দ নিয়ে কাজ করতে গেলে সংসার চল না। তুমি ত জান বিপিন যদি ভাস্করী পাশ করে এবং লতিকার সহিত তার বিবাহ হয়, তা’হলে বিপিনের পসার হ’তে বেশী সময় লাগবে না। আমি তাকে নিজেই কাছে রেখে সমস্ত শিথিয়ে ঠিকেরী করে নিতে পারব? তারপর তাদের অবস্থা ভাল। এর চেয়ে স্থপাতি আর কোথায় পাবে বল?”

কল্পনাময়ী বলিলেন, সে কথা একশো বায় ঠিক। কিন্তু লতিকা যদি রাজি না হয়। আর যদি বা মনোভাব গোপন করে সমস্তি ধরে তা’হলে কি সে কোন দিন স্বামী হ’তে পারবে?

কেন পারবে না! স্ত্রীলোক যা চায় তার কোনটাইর অভাব হবে না। বিধান স্বামী, বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর

বস্তুর বাস্তবী কোন কিছু অভাব থাকবে না।”

কল্পনাময়ী এবার একটু অভিমানপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন “তোমরা পুরুষ মায়ে, কেবলই মনে কর, মেয়ে মায়ে-গুলো তুচ্ছপত্র বা খেলার গুঁড়ুল বিষয়। তাদের বোম্বার মত অশ্বকরণ বা প্রাণ নাই। তোমাদের নান্দর্শে তা’হাদের শক্তি ও প্রয়োজন বিকশিত হ’য়ে উঠে। তোমরা মনে কর নারী বিলাসের সামগ্রী। ইহাদের



সংসারে কোন কর্তব্য নাই, কেবল ঐশ্বর্য্যে মোহে ইহাদের বশীভূত করে রাখাই হচ্ছে পুরুষের একমাত্র কর্তব্য।

হরেন্দ্রবাবু অভিমানিনী জীয় হাতখানি অত্যন্ত স্নেহ-ভরে নিজ হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া ব্যথিত কর্তে বলিলেন, “তুমি আজ আমার কথায় রাগ করলে। জীলোক ভিন্ন পুরুষ যে এক পা সংসারে চলিতে পারে না তা কি আমি জানি না।” “তা যদি জানতে, তা হ'লে এটাও জানতে—বাড়ী ঘর টাকা কড়ি দিয়ে তাদের জুলিয়ে রাখা চলে না। তারা অনায়াসে সামান্য কুঁড়ে ঘরে থেকে একবেলা খেয়েও যুগে, হাসি মুখে দিন কাটিয়ে দেবে, একমাত্র স্বামীর পরিপূর্ণ ভালবাসার বিনিময়ে। স্বামীর একটুকু কষ্ট যে তারা কোন দিন বরাদ্দ করতে পারেন না—অন্যদ্বারে দিনের পর দিন হাসি মুখে কাটিয়ে দেবে তথাপি স্বামীকে কষ্টের কথা জানিয়ে কোন দিন কষ্ট দিতে পারবে না।

হরেন্দ্র বাবু দেখিলেন, করুণাময়ী আজ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হুতরাং তিনি বলিলেন, “যদি লতিকা বিশিষ্টক অমানোচিত করে—তুমি জানলে পার সে কথা আমাকে বলবে। আমি অস্ত্র পাজ দেখব। ছোঁর করে বিপিনের সঙ্গে যে লতিকার বিবাহ দোষ না, একথা কি তুমি বিশ্বাস করতে পার না?”

স্বামীর কথায় করুণাময়ী নয়ন অশ্রুগিক্ত হইয়া আসিল। সে স্বামীর বকে, তাঁর সারা জীবনের একমাত্র শাস্তির স্বানে, মুখ রাখিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে অপ-স্বামীর মত ভয়-বিজড়িত করুণকণ্ঠে উত্তর করিলেন “না প্রসিদ্ধা! অস্ত্রায় বলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি যদি তোমাকে বিশ্বাস করিতে না পারি, তবে কাহাকে বিশ্বাস করব? যে দিন তোমাতে বিশ্বাস হারাব, সে দিন যেন আমার মৃত্যু হয়।

হরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত স্নেহভরে দুইহাছের মধ্যে স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “এবার কলকাতা ফিরে গিয়ে লতিকার বিবাহের ব্যবস্থা করা যাবে। তুমিও লতিকার মনের ভাব বিমল বাবুর স্ত্রীকে দিয়ে বুঝতে পারবে। করুণাময়ী তুমি আমার কথা কোন দিন অবিশ্বাস বর

নাই আজ কেন করবে। আজিগীর্দ করি লতিকা যেন তোমার সমস্ত গুণের অধিকারিণী হয়।”

করুণাময়ী স্বামীর কথায় শাশ্বনা লাভ করিয়া বলিলেন “তুমি এ বিষয় ঠাকুর জামাই ও ঠাকুরম্বির সঙ্গে একসার কথা পেড়। তাদের কি মত জানা দরকার।”

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “নিশ্চয়! তাদের না জানিয়ে কি কোন কাজ করতে পারি।”

এই সময় অদূরবর্তী একটি রেলওয়ে কোয়ার্টার হইতে বামা কষ্টের সঙ্গীত শ্রুত হইল। তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ঠেগন হইতে আর কোোনো মালগাড়ীর সন্টিং শোনা যাইতেছিল না। সারা নয়নপুর একটি ধ্বংসাত্মক শান্তির মধ্যে বিশ্রাম-নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে। নিশ্চয় রজনী সহসা মুখবিত হইয়া উঠিল, বামাবাহু নিঃশব্দ সঙ্গীত স্থা-ধারায়।

করুণাময়ী বলিলেন “কি স্বপ্নের কর্তব্য? কি মধুর শোনাচ্ছে! একদিনও ত তাঁর গান শুনতে পাইনি? কোন্ বাড়ীতে গাইতেছে বল দেখি?”

হরেন্দ্রবাবু এককণ উৎকর্ষ হইয়া কোন্ দিক হইতে এই সঙ্গীত ধারা, হ্রস্ব ভাল-মান-লয় লইয়া অপূর্ণ উজ্জ্বাস নীরস নিশিথিনীর বস্ত্রের উপর লীলাবিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই ভনিতাইছিল।

করুণাময়ীর প্রস্নে তাঁহার একাগ্রতা ভাঙিয়া গেল। তিনি বলিলেন, “আহা! কি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত! ইহার পূর্বে এ সঙ্গীত আমিও আর এখানে শুনি নাই। আমার যতদূর মনে হয় “এই যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, হেরের বড় বাবু আমাদের বাড়ীর সমুদ্রের রাস্তার ওপারে থাকেন, তাঁরই বাড়ীতে কেউ গাইছে।”

করুণাময়ী বলিলেন, “ঠিক হয়েছে, দুপুর বেলায় কোন কোন দিন ওবাড়ী হতে হারমোনিয়াম বাজতে শুনতে পাই। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি বলে হয় ত গান শুনতে পাই না। কাল একবার ওদের বাড়ী বেড়াতে গেলে সব জানতে পারব! মনে পড়ে গেছে, ঠাকুরম্বির একদিন বলেছিলেন বটে, তোমাকে বো একদিন খুব ভাল গান শোনাবো। বোধ হয় তা হ'লে তাঁরই গান হবে।”

হরেন্দ্রবাবু উত্তর করলেন, “আমি জানি মহারাষ্ট্রের

অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয়। তাঁদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা খুব বেশী।”

তারপর উভয়ে নীরবে অনেককণ পর্যন্ত শুইয়া শুইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ গান বামিয়া গেল। তাহাদের মনে হইল একটুখানি বিশ্রাম করিয়া আবার হয় ত গান গাইবে। অনেককণ অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া রহিল। কিন্তু গান আর হইল না। তখন হরেন্দ্রবাবু ভাবিলেন “তুমি কি ঘুমিয়ে পড়ছ?”

করুণাময়ী উত্তর করিল “না, জাগিয়া আছি। খুব আসছে না।”

আমি বলিতেছিলাম কি বন্ধুর মেয়েটির সন্ধান না করে নিজে মেয়ের বিয়ে দিতে যেন কোন ক্ষেমন হচ্ছে। তুমি ত জান মরি। সে মরবার সময় মেয়ের কোজীখানি আমার হাতে দিয়ে বলে গিয়েছে—ভাই মরেও আমার স্থান নাই। আমার একান্ত কর্তব্য পড়িয়া রহিল। আমার আত্মা কিছুতেই শান্তি পাবে না, যত দিন না, আমার মেয়ের উদ্ধার ও বিবাহ হয়। তুমি ভাই আমার অসমাপ্ত কাজটি সম্পূর্ণ করে, বন্ধুর কাঁধ, ভাইয়ের কাঁধ, মাছের কাঁধ করে আমার অস্থতরু আত্মাকে তোমার প্রণব-তর্পণ দিতে কৃপণতা করো না।”

“তা ত জানি। খোঁজবার ত কষ্ট করছ না। যা বায় তা কি আর ফিরে আসে?” বলিয়া করুণাময়ী একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

“যা যায়, তা যে আর আসে না, এ সত্য সিদ্ধান্ত করে নিলে এ সংসার এতদিন অচল হয়ে যেতো। সময় সময়

তা যে ফিরে আসে না, এ কথা বলতে পারা যায় না। আমার ক্ষেমন বিশ্বাস নন্দিনী নিশ্চয় ফিরে আসবে। তার আসবার দিন খুব এগিয়ে এসেছে সে বিষয় আমার একটুখানি সন্দেহ নাই।”

“আচ্ছা তোমার কথা যেন সত্য হয়। নন্দিনী যেন পরিপূর্ণ গৌরবেই ফিরে আসে। তখনই যেন নিকট কার্যমদ্যাবোকা প্রার্থনা করছি, সে যেন শীঘ্রই আমাদের মধ্যে ফিরে আসে।”

“তোমাকে একটি কথা বলতে চুলে গিয়েছি মরি” হরেন্দ্র বাবু আদর করিয়া করুণাময়ীকে “মরি” বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

“কি কথা?”

“নন্দিনীর ভাই অবশ্যই এখানে আসবার লক্ষ টেলিগ্রাম করেছে।”

“কেন?”

কাল সকালে আগে নন্দিনীর কোজীখানি দেখিয়ে আদি। তারপর—বলিয়া হরেন্দ্রবাবু নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন “তার পর কি?”

(ক্রমশঃ)

## মদনোৎসব

### শ্রীকুমারেশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাক্ষরণ

দোলের দিনে রাতের খেলা

মোলায়মান চিত্ত,

অতীত কোন্ স্বপ্নের মোহে

পরায়ণ করে সূতা!

পুরুষ নারী পাগল হয়ে

খেলছে যুগে যুগে,

বরষ পরে সঙ্গীত হ'ল

কাণ্ডর অস্থগাণ!

কোথায় কাল, কোথায় রাগ,

কোথায় বৃন্দাবন?

কোথা হুলায় হোল পাখি

স্বপ্নাশ্রয়নাগণ?

দেই যমুনা বহে কি আশ

তেননি ভাবে ঠিক?

কদম পাছে ফোটে কি ফুল

তমালে বসে পিক?

প্রাণের নিশি, তোমার খেলা

প্রাণেই আছে আঁকা;

তাই এ দিনে কটিন বড়

নীলব হয়ে থাকা!

যুগ ধরমে সবই গেছে

সমান দিবারাতি,

তোমায় স্মরি তবুও আল

মদনোৎসবে মাতি।



## জীবন-কাব্য

প্রাণোদগম মৈত্রি বি-এ

জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে, হরে, ছন্দে, রূপে, গানে। এই অনাবিল স্বচ্ছ ধারার মাঝে, কার যেন এক অবাক মধুর স্পর্শ থেকে জেগে উঠে। অরুণ! তোমার আমি প্রণাম করি, তোমার মঙ্গলময় স্পর্শই তো এ আঁধার পথে আমার জীবনকে সজীব করেছে, তাকে স্বর দিয়েছে, তাকে ভাষা দিয়েছে।

ভাষা নাই, বাণী নাই, নীরব নীরব অন্ধকার। আমার এ জীবন-তরীধানি বয়ে চলেছে, কোথার এর পরিণতি কে জানে? কোথায় এর অন্ত কেউ বলতে পারে না। বয়ে চলেছে অনন্ত, অশান্ত গুরু গতিতে, কোন হৃদয়ের বাঁশী একে ঘর-ছাড়া করেছে, কোন অচিন্ত দেশের ডাকের সাড়ায়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। সামনে বয়ে যাচ্ছে অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত কাল। কালের স্রোত ধামে না, এর গতি তির্যক-বাহ্যময়। শুধু চলা আর চলা—এ চলার কি আর বিস্ময় নেই?

মনে পড়ে—কোন হৃদয়ের এক সোণালী প্রভাতে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। অতীতের সেই আশ-আলো, আশ অন্ধকার এখনও বে আমার সামনে ভেসে উঠছে। কত হৃদ চেয়ে গেছে, যুগান্তের শেষ রশ্মিটা রঙালী হ'য়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি কিরি নাই, কিন্তু পাঁচি নাই।

যুগে যুগে মানব আত্মা মুক্তি খুঁজছে, সন্ধান পায় নাই। এ মুক্তিপথের মহা অভিসারে, আবার কত আত্মা নিজেকে হারিয়ে কেলেছে। আমার এ বৃহৎ মুক্তিকামী আত্মা, হাফাকার করে উঠেছে, কোথায় কতদূর—

এই যে দারার খেলা, এ জগৎটা মাছব কেন নিজের বলে ভাবে! এটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে আশ্চর্য, পথ চলতে চলতে পাশপাশীটিকে আগনার বলে ভাবা, সেটাই হ'চ্ছে ছনীরার মত বড় ঠাকী। এই কুল বিশ্ব-

সংসার জুড়ে রয়েছে। সব তুচ্ছ, কিছু নাই, কেবল প্রতারণা, জগৎটাই একটা মত বড় প্রতারণা।

মুম্বু আত্মার এ করুণ আর্তনাদ, এ দুর্গম মুক্তি পথে বাবে বাবে আনাগোনা এই মানব প্রকৃতির আসল কথা। মানবের অন্তরাত্মা আজ মর্মে মর্মে নিশীড়িত হয়েছে, মুক্তি চাই? আর শিক্ত হটাৎ নয়, এবারে আগে বেতে হবে।

কিন্তু, কে জানে কোথায় আছে মুক্তি! এই যে ব্যাকুলতা, এ ব্যথা, এ বুকভাঙ্গা কান্না, একি ধামবে না, তবে বিশ্ব সৃষ্টির এই কি চির-রহস্ত যে মানব যুগে যুগে শুধু কাঁদবে?

অব্যক্তের সেই মধুর স্পর্শ, হৃদয়ের সেই বাঁশীর স্বর, অচিন্ত দেশের সেই হাতছানি, এই হ'চ্ছে মানব আত্মার একমাত্র সাধনা। আকাশে, বাতাসে সেই রূপের হাওয়া লেগে রয়েছে, তাই আকাশ, বাতাস এক হ্রদর। জোছনার হাসিতে অরুণের রূপের বান ডেকেছে, পাণিয়ার হরে অচিন্ত দেশের বাণী ভেসে এসেছে।

জীবন-মৃত্যুর স্বপ্ন, আলো-আঁধারের লুকোচুরি, এই নিয়েই তো জীবনের ছন্দ, কিন্তু, সেই ছন্দ যখন ছিঁড়ে যায়, যুগের বাঁশীর তার যখন কেটে যায়, তখন মাছব বাঁচে কি করে?

দিন চলে যায়, কত বর্ষা এল তার কালমেঘের বেগী ছলিয়ে, কত শরত এল তার করুণ হাসিটা নিয়ে, আবার বসন্ত এল তার রূপের বানে জগৎ ডাসিয়ে, কিন্তু ঠেক শান্তি তো এল না?

শান্তি চাই, ওগো আমার দেবতা, আজ জীবন পেয়ালা ভরে দাও—মৃত্যু হরে, মৃত্যু ভায়ায়। আমার এ জীবন, ভরে যাক মৃত্যু গানে। তা না হলে এ বাঁশীর ছিন্ন তারে আর যে গান হয় না? ভয় ছন্দে জীবনের কাব্য যে আর মিল যায় না। এ মাশপথে থামা গান, এ বাণীর দান, এ জীবন আর কত দিন এমনি ভাবে বয়ে যাবে?

## মোহন মুরলী

(প্রফেসর টি-এল, ভাষানীর বক্তৃতা অবলম্বনে)

শ্রীকটকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ব্রহ্মবিদ্যা মানি। এই এক ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া একটা তত্ত্বকে বিভিন্ন গুণের মত জগতের বিভিন্ন ধর্মমত গঠিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু-ধর্ম বহুর উপর এই একবকের প্রভাব বীক্যার করিয়া আসি-তেছে। এই হিন্দুধর্মের কেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অপূর্ণ, নবীন উত্তেজনার ইহার উদ্যোজন করিয়াছিলেন।

প্রতি উপাসক-সম্প্রদায় উপাসনার এক একটা বিগ্রহ কল্পনা করিয়া লইয়া থাকে। তাহা হইতেই তাহার সকল তেজ, প্রেরণা পাইয়া থাকে। খৃষ্টানধর্মের বিগ্রহ জেশু। ইহা আত্মত্যাগের অনন্ত নিদর্শন রূপ হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন জাতির অরি উপাসনার পরিকল্পনা এই যে, অরির দেবতা তাহাদের সকল কলঙ্ক দূর করিয়া দিবে। ইহাতে পাপ দূর হইয়া তাহাদের অন্তরাত্মা নিরল হইবে। হিন্দু এই বিগ্রহ বোধ হয় জগতের মধ্যে স্মরণতম ও মধুরতম। তাহা শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাণী। সেই বাণীর তাল তালে মতিয়া অন্তরাত্মা জ্ঞানী লোকের উপদেশে চলিয়া যায়। পরমাত্মা হুহ্মার ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

সেই মোহন বাণীর পরিচয় কে দিতে পারে!—একদিন ভারতের গগন, পবন তাহার মধুর রবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এক অজানা আত্মল ডাকে সে বাণী জগতকে কোন মহামিলনে কেন্দ্রে আস্থান করিয়াছিল। নরনারী সকল ভুলিয়া ছুটিয়াছিল তাহার নিকট ধরা দিতে। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, হীন ভেদজ্ঞান মোহনবাণী শিয়ার নাই। তাহা আবেগের সহিত শিখাইয়াছিল—প্রাণ দাও, মান দাও, আপনাকে অপরের কাছে নিঃস্ব করিয়া তুমি বিধে জলাভ কর। তখনই হইবে তোমাদের প্রকৃত মিলন। বাণীর এই প্রাণমাতাডো ডাকে ঐতিহ্য, যুগ্মাধ গৃহত্যাগ করিয়া আত্মল আবেগে নর পদে, নর দেহে পথে পথে কিরিয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। বাগদার সে এক

নবযুগের দিন গিয়াছে, যখন দলে দলে লোক তাহার নিকট কৃষ্ণময় গ্রন্থ করিয়া ধর হইবার জন্ম তাহাদের পাছে পাছে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল।—সেদিন বাণী যে মধুর বরে বাজিয়া ভক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, আজও তাহা বাজিতেছে। তাহার বাণী আমাদের দুর্বল অংগে আজ আসিতেছে না। আমাদের অস্বকরণ প্রদ, পরাধীন, জড়জ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছি; হিন্দুধর্মের আদর্শ হইতে এখন আমরা অনেক দূরে।

বাণী কি গাইয়াছিল—তাহার সেই উদার বাণীটা কি!—শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন “রাব-যোগ”। ইহা সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। যেহে লাভ করিয়া রাবায়িরাজের নিকট হওবার পথ এই রাজ যোগ। এ যোগের সাধনা একদিন এই দেশে ছিল। বাহারা ইহার স্মারক ছিলেন তাহারা আমাদেরই পূর্ব-পুরুষ রূপে এই সাধনা দ্বারা ধর্ম হইয়া গিয়াছেন। তাহারা দুর্বল, অসংগত ছিলেন না। মহাত্মা বীতশ্রী ইহাদিগকে বলিয়া-ছিলেন—দেবতা তোমরাই, মাছবের ভিতরেই দেবতার আসন প্রস্থান ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। হিন্দুধর্মের একটা অতি প্রাচীন কল্পনার আত্মিক বীতশ্রী করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম বলেন তোমার অন্তরের যথাকোঠায়—তোমার দেবতার আসন রহিয়াছে। তিনিই তোমার প্রস্থান শক্তি। তাহাকে জাগরিত করিতে হইবে।

যোগের তিন শ্রেণী—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও বুদ্ধি যোগ। ইহাদের মধ্যে শাখা-শ্রেণী বিভাগ আছে; দান, যজ্ঞ ও তপস্কা।

এই তিনটা ব্যবস্থা হইতেই জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্তব্যের শিখা লাভ হইয়া থাকে। দানের দ্বারা দুঃস্থের প্রতি মেহ ও সহায়ত্ব প্রতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু নিজের জয়-চক্কা নিন্দিত করিয়া আপনাকে প্রচারের জন্ম যে অর্থ বিতরণ, তাহা সার্থক দান নহে। প্রকৃত ও পুণ্যময়



দান হইবে নিঃস্বার্থ। যজ্ঞাহুষ্ঠান ঈশ্বর লাভের প্রকৃত উপায়। প্রার্থনা ও পূজার অন্তরে অটু শক্তি ও ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। হোমযুগ আজ ভারতের গগনকে পাত্তর করে না। গভীর বেদমন্ত্র এক্ষণে আর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। ভারত অবনতির চরমে নামিয়াছে। তপস্বী বিনা আত্মসংযম কখনই সম্ভব হয় না। ত্রি-যোগের সমাহারী এই ধর্মযোগে আজ আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য হইতে হইবে। আমাদের কর্তব্যের পথ মুক্ত করিতে হইবে। দেবতা জাগ্রিয়েন,—জাতির পুনরায় উন্নতি হইবে।—

বংশীর এই ঘোনে বাণী কেহ বুঝে নাই। আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া আজ বৃষি তাহা ধামিয়া গিয়াছে। রক্ষ এখন কোথায়। পরভাবজঙ্ঘর আমাদের আত্মায় তাহার

আভাস আজ পাই না। কিন্তু কখন যেন দিকে দিকে তাহার সাদা পাই। তখন আমাদের সকলি পূর্ণ হইয়া উঠে। প্রাণের গোপনতম প্রদেশে কে যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরহে কাঁদিয়া উঠে।

তুমি এলো। হে রক্ষ। হুঃখ, দৈন্ত-পীড়িত ভারত আজ তোমাকে আহ্বান কর্তে ডাকিতেছে। দুর্ভাগ্যের গোবর্ধন তুমি বিনা আর কে ধারণ করিবে। নূতন সম্ভাতি তামনে, নূতন রূপে আজি তুমি আসিয়া ভারতের পথ নির্দেশ কর। সমাজ, সভ্যতা, আচার, রাজনীতি,— জীবনের পরতে পরতে তোমার মঙ্গল স্পর্শ দান করিয়া মুমূর্ষু স্রষ্টা জাতিকে জাগাইবার জন্ত, হে ভগবান! তোমার আসিতেই হইবে।

## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

**ভারতী মাস, ১৩০২**—শ্রীমতী সরলা দেবীর সম্পাদন "ভারতী" ক্ষত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছিলি। মাস, ভারতী সেরিকার মে-হস্তের সেবায ভারতীর পূর্ব-শ্রী, পূর্ব গরিমা সীতাই কিরিয়া আসিবে। অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া "ভারতী" বঙ্গ সাহিত্য মন্দিরে রূপপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীর পূর্ব-গরিমা-ছুটায় এক কালে বাণী-মন্দির আলোকিত ছিল। মধ্যে কিছু দিন ধরিয়া ভারতীর দুর্দিন গিয়াছিল। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় "তখন ভারতীর পবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে ছুঁচার কর্তন হইতেছিল, মন্দির-গায়ে গোবর-“নেদি” দেওয়া হইতেছিল।” এখন ভারতীর স্বর্দিন আনিয়াছে। ইহা আমাদের বিশ্বাস সন্দেহ নাই।

ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের “গেটে” কবি-দার্শনিক ঐজিৎকেশব ঠাকুরের দ্বিতীয় তর্পণ স্বপ্ন আলোচ্য সংখ্যাকে “বিজ্ঞেয় সংখ্যা” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। “বিজ্ঞেয় সংখ্যা” স্বর্গীয় সাহিত্যিকের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে

আত্মীয় অনাত্মীয় গুণাহুবাণী লেখক-লেখিকার প্রদত্ত শ্রদ্ধাভাজিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া দ্বিঃস্বস্ত-চরিত্রের গুণকীর্তন করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাও এ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে।

অজ্ঞাত প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত কুপেন্দ্রনাথ দত্তের লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ “আমেরিকান সমাজ” প্রবন্ধে লেখক উক্ত সমাজের অনেক দ্বয়ের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। লেখকের ভাষার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে দু’একটা কথা—শ্রীজগন্নাথ আচার্য্যের একটি স্থলিখিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধে পবিত্র পাইলাম লেখক মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিভাভূষণের পূজ। লেখকের ভাষাটি বেশ খজ। লেখকের বোধ হয় সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন আভ্য-প্রকাশ। আশা করি তিনি পিতৃ-পরাঙ্ক অমূল্য করিয়া কীর্তি অর্জনে অক্ষম হইবেন না।



## পুরস্কার

### ত্ৰিবন্ধিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

“ওগো একটু জল দাও।”

রত্নপুর ঠেপনের নিকটে দুইখানি ঠেপের সখ্য (Colligation) হইয়াছে। দুইখানি এলিন এবং সমুখের তিন চারি খানি গাড়ী একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। বহু যাতায়াত হত ও আহত হইয়াছে, চারিখানের জন্মনের রোল এবং আহতদের আর্দ্রনাশ নৈশ অন্ধকারের মর্খ বিস্তরিত হইতেছে, বাহ্যার জীবিত আছে তাহার আত্মীয় স্বজনদের অহুস্ধান করিতেছে। কিন্তু সেই হতীভক্ত অন্ধকারে আপনার জন চিনিয়া লইতে বড় কষ্ট হইতেছে। রেল-পথচারীর দল ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেই যাত্রীদের সাহায্যের পরিবর্তে অর্থ, গহনা ও অজ্ঞাত অব্যবহিত সংগ্রহ করিয়া লইতেছে, ঠেপনের কুলীয়া বাজ, পেটেরা যাত্রা পাইতেছে, লুণ্ঠন করিতেছে। মরণের বিতীর্ষকার মধ্যেও যাত্রের লেলিহান জিহ্বা লক্ষ্য করিতেছে—এ দৃশ্য বর্ণনার অতীত। টিকিট কলেক্টর নিবারণচন্দ্র ঘটনা স্থলে আসিয়া গহনা ও অর্থের লোভ স্বরণ করিতে না পারিয়া এক আহত রমণীর বস্ত্র হইতে হার এবং হাত হইতে চুড়ি কাড়িয়া লইল। উপরোক্ত ঠেপনের কিছু দূরে দয়াল ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সেদিন এক স্বধামানের বাতী হইতে কি একটা কাজ সারিয়া অধিক রাতে তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন, সবে মাত্র শয়নের চেষ্টা করিতেছেন—এমন সময় একটা ভীষণ শব্দ শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তেই অসংখ্য নুন-নারীর জন্মনের রোল উঠিল শুনিয়া বৃত্তিতে পারিলেন যে নিজের টেপে কে যখন হইয়াছে। একমাত্র কষ্টা উদ্ভাব্য কাহিনী তিনি কহিলেন, “না একটু যোগ্যত আমি এখনি আসছি।” তার পর একটা লুণ্ঠন লইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া মাঠের দিকে ছুটিয়া গেলেন। লাইনের অনতিদূরে একটা

রমণীর করণ অর্দ্রনাশ শুনিয়া কিরিয়া দেখিলেন একটা আহত যাত্রী অশ্রুত কণ্ঠে হাত বাড়িয়া একটু জল চাহিতেছে। একে রমণী—তত্পরি নিপিয়া, রমনাম্মুরী দেখিয়া দয়াল ঠাকুরের অন্তরটা ছাৎ করিয়া উঠিল; তাহাকে সাশ্রনা দিয়া কহিল, এখানে জল পাওয়া বড় কঠিন, চল তোমাকে আমি বাড়ী নিয়ে যাই—আমায় লক্ষ্য করোন না, আমি তোমার পিতৃভৃত্য, নিশ্চয়ই তোমায় রক্ষা করব। তুমি আমার মেয়ের মত, আমার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে পারবে। লক্ষ্যারক্ত মুখে খাদ্য নাড়িয়া মেয়েটা সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

রমণীকে লইয়া দয়াল আপনার কুঠীতে গেল। উমাকে ডাকিয়া কহিল, একে একটু জল দাও আর বাতাস কর আমি একজন ডাক্তারের চেষ্টা দেখি।

২

পূর্বোক্ত রেলভট্টনার দুইদিন পরে এক মাসের ছুটি লইয়া টিকিট কলেক্টর নিবারণচন্দ্র মেপে ফিরিতেছিল। প্রাণে আজ তাহার বড় আনন্দ—কত দিন পরে দেশে বাইতেছেন। দীর্ঘ বিরহজ্বরের অবসান সম্ভাবনার প্রাণে আনন্দমগ্ন হ্রোত বহিতেছে, দুই তিনি খানি কাপড়, দুইটা সোজা একটা ডলি, জামা, গজ, খাবান প্রভৃতি কত কি সে কিনিয়াছে—সেগুলি জীর হাতে দিবার অন্ত তাহার প্রাণ ছটকট করিতেছিল। তাহার পা গজ দিয়াছেন যে তাহার তাই বউমাকে আনিত গিয়াছে সে যেন ছুটি লইয়াই চলিয়া আসে। সমস্ত দিন গাড়ীতে বসিয়া তাহার মাথাটা ধরিয়াছিল। যখন সে গাড়ী হইতে নামিল, তখন স্বর্গ্য ভূমিয়া গিয়াছে। যে গাড়ী হইতে নামিয়া মেয়েটা রাস্তা ধরিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। সে যখন তাহাদের বাড়ীর নিকটবর্তী হইল তখন তাহার



মাথার উপর একটা পেচক কর্ণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—  
সে মনে ভাবিল এ সব কি অসম্ভব দেখিতেছি।

দূর হইতে তাহাকে বাতীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া  
তাহার জননী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গুর নিবারণ-  
রে আমাদের কি সন্দেহ হইবে?—নিবারণ কিংকর্তব্য-  
বিমুত হইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মা,—

এই টেলিগ্রাম এসেছে দেখে বাপ—তোমার শত্রু  
লিখেছে সেদিন রেলের যে দুর্ঘটনা হয়—সেই গাড়ীতেই  
অবিনাশ বউমাকে নিয়ে আসছিল—

এ—বল কি? সে যে আমাদের ঠেপনের কাছে।  
তারা এ গাড়ীতে আসছিল—তা যদি আমি জানতে  
পারতুম—রেল দুর্ঘটনার পর আরোহীদের কি পরিণাম  
হয় তাহার জ্ঞে তা জানিতে পারি ছিল না। সত্যই যদি  
তাহারা সেই গাড়ীতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে—সে  
আর ভাবিতে পারিল না—তাহার মাথার ভিত্তর বোঁ  
করিয়া যেন একটা চকী ঘুরিয়া গেল। ও ভগবান—  
বলিয়া সে মাথার হাত দিয়া মাথার পদলে বসিয়া  
পড়িল—হাতের বা-গট টিকাইয়া ধানিকটা তক্তাতে  
পড়িল।

৩

দয়ালের ঘরে মনোরমা সারিখা উঠিল। উমার আর  
আনন্দের সীমা নাই। সগোপনা স্নোভা ভগিনীর মত  
মনোরমার সেবা করিয়া সে যেন কত হুসী হইল।  
মনোরমা সারিখা উঠিলে একদিন দয়াল কহিল, মা তুমি  
এখন কোথা যাবে বল, আমি তোমার পাঠাবার বন্দোবস্ত  
করি। জননাম তুমি শত্রুরাডী বাজিলে তা সেইখানেই  
কেন চলে না।

উমা মনোরমার হাত ধরিয়া পিতাকে কহিল, না বাবা  
দিকির এখন যাওয়া হইবে না।

সময়ে কতক মন্তক হাত বুলাইয়া সাধনাপূর্ণ বাক্যে  
দয়াল কহিল, তা কি হয় মা। উনি পরের মেয়ে—  
পরের বউ—ওকে কি আব্বা বরেশ্বিন এখানে রাখতে  
পারি। গুর ঘর সংসার আছে, বিশেষতঃ শত্রুরাডী  
হয়েছে। যেয়েছেলের বার চেয়ে আর মহাভাগী নই—

সে পবিত্র স্থান ছেড়ে কি অন্ধ কোথাও থাকতে আছে।  
বাপ মা এত আপনাবসে, সেও পরে দূর হয়ে পড়ে।  
ওর স্বামী আছে—আমার মত ওর সেইখানেই যাওয়া  
কর্তব্য। ওর স্বামীয়ে মনে করেছেন উনি মায়া  
গেছেন—এখন এ অবস্থায় দেখলে তাঁরা কত হুসী হবেন  
বল দেখি।

মনোরমাকে হুসু শরীরে তার স্বামীয়ের নিকট  
পঠাইতে পারিবে এই ভাবিয়া আনন্দে দয়ালের সমস্ত  
মন ভরিয়া উঠিল। উমা ছেলে মাছুর, অতশত সুখিল  
না, মনোরমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে ভাবিয়া তার প্রাণ  
কিছু কাদিয়া উঠিল। মনোরমা তাহাকে হুকুর মধ্যে  
টানিয়া লইয়া নিষ্ঠ বাক্যে কহিল, কেণো না বোন, তোমা-  
দের দম্পত্যেই আমি প্রাণ পেয়েছি—তোমাদের স্বপ্ননা  
ভুলবো না। আমি তোমার টিকানা লিখে দিচ্ছি—  
যখন দরকার হবে খবর দিও—আমি সহস্র কাজ ফেলে  
ছুটে আসবো।

দয়াল অবিনাশের বিষয় ভাবিতেছিল আদ্য দেও  
যদি কোন রকমে বেঁচে থাকে—তাহলে কতই আনন্দের  
বিষয় হইত। মনোরমার মুখে ভনিয়াছিল ছেলেরা বড়  
ভাল, কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়ে। ভগবানের নিকট  
দয়াল তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিল। তারপর  
মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার স্বামী কোথায় কাজ  
করেন মা?

মনোরমা কহিল রত্নপুর ষ্টেশনের টিকিট কলেক্টর।  
এ্যা—এ যে আমাদের ইষ্টপুত্রের। আঃ বাঁচলুম আর  
তাহলে বেশী কষ্ট কর্তে হবে না। আমি যদি আগে  
জানতাম যে তিনি এখানে আছে—তার নাম কি মা?

মনোরমা হিন্দুর জী, তাহাকে স্বামীর নাম করিতে  
নাই, তাই একটু কাগজে তাহার নাম লিখিয়া দিল।

“গুর ও উমা, এ যে আমাদের নিবারণ বাবু।”

“নিবারণ বাবু? তিনি যে কত দিন এখানে এসে-  
ছেন। বাবার সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ আছে। বাবা  
তুমি এখন তাকে ডেকে নিয়ে এস।”

দয়াল চলিয়া গেল মনোরমা উমাকে জিজ্ঞাসা করিল,  
“সত্যি তিনি এখানে আসেন নাকি।”

“আমি কি মিথ্যা বলছি—বেশ লোক তিনি, সকলেই  
তাকে এখানে ভালবাসে।”

সতী রমণীর নিকট স্বামীর প্রশংসা কত মূল্যবান  
তাহা সত্যই বুঝে। স্বামীর প্রশংসায় চন্দ্রাবরে জলধির  
মত মনোরমার জ্বর পুঙ্গব স্তব্ধ হইল; কিন্তু অর্ধ-  
ঘণ্টা পরে যখন দয়াল বিষয় মুখে একাধী বাটা ফিরিল  
তখন তাহাকে দেখিয়া মনোরমার স্ব-শ্রুণ্ড ভাঙিয়া গেল।  
দয়াল কহিল, নিবারণ বাবু আজ চারদিন হ'ল বাড়ী  
চলে গেছেন। এখন আমাদেরই তোমায় দেখানো যেনে  
আসতে হবে।

উমা কহিল, “তোদের কেন চিঠি লিখে দাও না।”  
“তাই না হয় বলি। যদি চিঠি পেয়ে আসে ভালই, নইলে  
আমাকেই যেতে হবে।”

পত্র লেখা হইল বটে, কিন্তু তাহার কোন উত্তর আসিল  
না, বা কেহ মনোরমাকে লইতে আসিল না। মনোরমা  
তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। দয়াল কহিল, “লম্বা আছই  
হাট। উমার কাছে হেঁচবার নাকে রেখে যাব—আর  
ভুক্তির দিনের মধ্যেই ত' ফিরছি।” মনোরমাকে বিবরণ  
দিবার সময় উমার চক্ষে জলধারা বহিল, তাহাকে  
জড়াইয়া ধরিয়া কানিতে কানিতে নে কহিল, দিদি সত্যিই  
তুমি চলে। আর কি তোমার দেখা পাব।”

“পাবে বই কি। তুমি আমার ছোট বোনের মত—  
তোমার দিকির সময় খবর দিও—আসবো বৈকি।  
তোমাদের বেহ-বড় কি ভুলবার।” উভয়ে অনেক  
কাদিল—এ কখন এক সঙ্গে থাকিয়া উঠবার মধ্যে যে  
ভালবাসা ও প্রাণ জন্মিয়াছে তাহা ভগ্ন করা স্বপ্নটন।  
মায়া হউক, সেই রাতেই উমার মৃত্যুচুম্বন করিয়া দয়ালের  
সহিত মনোরমা যাত্রা করিল।

৪

সেদিন সকালে নিবারণ যখন জননীকে ট্রেণ-সংঘর্ষের  
সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ  
অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতাকে দেখিতে  
পাইয়া নিবারণ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, কহিল—  
“অবিনাশ! তুই কোথা থেকে এলি।” জননী হায়া-  
নিমিত্ত দেখিতে পাইয়া বকে জড়াইয়া ধরিলেন—দয়-

বিপ্লবিত্যরে আনন্দপ্রাপ্ত পড়িতে লাগিল। হায় বউ-  
মাটাকে যদি আজ পাওয়া যাইত! অবিনাশ সমস্ত ঘটনা  
বহিল। ট্রেণ-সংঘর্ষের পরে সে মাঠের একধারে একটা  
কোণের পাশে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। একটা চাষার  
বাড়ীতে এ কথ মনি ছিল। অর্ধের জ্ঞান দিতে পারে  
নাই। সে বড়কে দেখিয়াছে—অনেক লোককে গাড়ীতে  
বোঝাই দিয়া রেল-কোম্পানী কোথায় সরাইয়া দিয়াছে।  
সে বউদিগকে খুঁজিতে যাইতেছিল কিন্তু বেল কখনো  
ও কলীদেব প্রচার দেখিয়া অগ্রগণ্য হইতে পারে নাই।  
নিবারণ নিজে রেল-কর্ণগারী—সে সমস্ত জানিত তাই  
চূপ করিয়া রহিল—পত্নীকে যে ইচ্ছাযেনে আর দেখিতে  
পাইবে না মনে মনে তাহাঃস্থির করিয়া লইল।

আহাঃস্থির পর নিবারণ অবিনাশকে তাহার হাত  
বাগটা আনিতে বলিল। অবিনাশ তাহা লইয়া আসিলে  
নিবারণ তাহা খুলিল—তাহার ভিতর অনেক টাকাবার গহনা  
দেখিয়া অবিনাশ বিস্মিত হইল, হঠাৎ দুইখানি  
উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে চীৎকার করিয়া কহিল, “লাদা  
এ যে বউদিগের—”

“এ্যা—”

“এই যে হাতের সেই লকেট—দেখ দেখি খুলে, তোমার  
নাম লেখা আছে কি না। লকেট খুলিয়া নিবারণ কহিল,  
সত্যি ভ। গুর অবিনাশ! কি সন্দেহ করছি, শেষে  
তোমার বউদিগের গা থেকে—সে আর বলিতে পারিল  
না, নিজের জ্বর বেহ থেকে গহনা কাড়িয়া লইয়াছে,  
নিষ্টুর মহাপাতকী সে, তাই এ কার্য্য করিয়াছে। শিরে  
করাখাত করিয়া নিবারণ চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল।

জননী অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সাধনা মিলেন।  
অবিনাশও দাদার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহার চিত্ত শান্ত  
করিতে লাগিল। চাকরি পালি হইলে আফিসে যেরূপ  
দখখাণ্ডের ভিত্তি হইতে যিল্প হয় না, এক সপ্তাহ বাইতে  
না যাইতে নিবারণ বিপত্নীক হইয়াছে ভনিয়া কল্যাণ-  
গ্রন্থ ব্যক্তিগণ তাহাদের বাড়ীতে বাতাব্যত আশঙ্ক  
করিল। দেশে প্রচার হইল নিবারণ নাকি অনেক টাকা  
লইয়া দেশে ফিরিয়াছে—একদিনের পর তার মার মৃত্যু  
খুঁটিল। নিবারণ কিছুতেই বিবাহে বীকৃত হইল না।



প্রাণী প্রতিবাদীরা ভাষ্যকৃষ্ণের ধূমরাশি ধারা বৃত্তিকে ধূমাক্সিত করিয়া নিরাবরণকে বুঝাইতে ছিলেন এ ভগবানের মাত, তাই এই দুর্ঘটনা, আর তোমার অর বহন, এ বসন্ত কল লোকের একটা বিচ্ছেদ হয় না।

জননী মানবাণ্ড পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, চক্ষু মুছিয়া করিলেন, “গরবী অদৃষ্টে করে, নইলে এমন সত্যী লক্ষীর অপঘাতে মৃত্যু হয়। কত গুণ ছিল তার,— হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে—সব কাজ কর্তৃ। যা হবার তা হো হেছে। তবে আমার এই অশ্রুযোতা রাখ বারা—গোবিন্দ মৃণ্মথের মেয়েটিকে ঘরে আন। আহা তারা বড় গরীব, এ-বাজারে পরদা না হলে মেয়ে পায় হয় না। একটা সংকাজ কর, আমার ইচ্ছে মেয়েটিকে অরি নিয়ে আসি।”

বৌদির আহারে অনিচ্ছাপ্রকাশের মত নিরাবরণ বিবাহে ঈকান্ত হইল বটে কিন্তু পূর্বে পতীর প্রেমময়ী ছবি মনে করিয়া অস্থমণ শত বৃত্তিকের জালা সহিতে লাগিল। কত ব্যথা তার বৃকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, নিশ্চল অশ্রুবর্ণ ছাড়া স্বপ্নের বিঘ্ন তার লম্বু হইল না। বিবাহের তিন চারি দিন পূর্বে একদিন ভোরষায়ে সে এক স্বপ্ন দেখিল। দেবিন তাহার স্ত্রী যেন কিরিয়া আসিয়াছে। সে রমণীয় সৌন্দর্য আর তাহার নাই। আশু-লারিকুল্লনা বকুনোরা তাহার প্রতি বোম্বকায়িত পুষ্ট নিবন্ধ করিয়া জলগম্ভীরযে যেন তাকে শাসাই-তেছে—হিঃ তুমি এত নিষ্ঠুর! আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীর উপর গোবিন্দ তায় ব্যবহার করেছে। তুমার সময় এক কোটা বল দিতে পার নাই—আবার বিবাহে উদ্বৃত্ত হয়েছ! কিরমণ পোঁ পোঁ শব্দ করিয়া ভয়ে নিরাবরণ চক্ষু বজ্রিয়া পড়িয়া রহিল। অপঘাত মৃত্যুর জ্ঞাত তব কি তাহার স্ত্রী প্রেক্তিনী হইয়া তাহাকে স্তিরঙ্গার করিতে আদিয়াছে।

আত্মদানি ও তিরস্কার আদিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে দ্বাতপ্রতিভাত ভুলিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল নিশ্চয় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সূত্রিত গহনা সব-বিক্রম করিয়া দীনমন্দিরের মধ্যে বিতরণ করিবে। জননীকে ওকালীধামে পাঠাইয়া দিবে সে ত্রস্ত্রস্ত পালন

করিবে—আর সে বিবাহ করিবে না। বিদ্বানবিকারের মত হঠাৎ একটা আশার আলো তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল,—সত্যি কি তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে! যদি সে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে—আর যদি তাহার গৃহে পুনরায় কিরিয়া—তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

একি! কে তাহার পদস্পর্শ করিয়া রোমন করিতেছে—চক্ষের জলে যে তার পা ভিজিয়া গেল। একোমল করণজলের স্পর্শ সে যে চিনিত। তবে কি সত্যই মনো কিরিয়া আসিয়াছে! সে উদ্ভূতের মত বলিয়া উঠিল,—মনো—মনো! সত্যি কি তুমি বেঁচে আছ! বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিরাবরণ দেখিল সত্যিই যে মনোমারমা। মনো—মনো—প্রিয়তমে—সে মনোমরমাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া তাহার কোড়ে মুছিত হইয়া পড়িল।

তখন সবমাত্র প্রভাত হইয়াছে। অকণ করণ-পূরীকালে বক্তিবাদী ছড়াইয়া প্রকৃতির কানে যেন বিরাগমনের শুভবাহী জানাইয়া দিতেছে। স্বপ্নপ্রাপ্তি বিহরণো কলরব করিতে করিতে আহারাধোনে বহির্গত হইতেছে। দয়াল অবিদ্যার সহিত বাহিরে আসিয়া কণ্ঠবাহী করিতেছিল। সমস্ত কথা শেষ হইলে বিরাগ প্রার্থনা করিল। অবিশ্বাস কহিয়া, দাধার নড়ে যেন না করে! যাওয়ার ভাল হয় না। আপনি যে কাজ করে—ছেন এতদ্ব ব্যর্থত্যাগ করজন কর্তে পারে! এ স্বপ্ন পরিণামে হবার নয়।

দয়াল মুহ হাসিয়া কহিল, “বাবা—ভগবান আমার মাকে রক্ষা করছেন। মাছর উলঙ্গ মাজ, তিনিই সব।”

“আমি এখন চন্ডাম, এখানে অপেক্ষা কর্তে গেলে প্রথম ষ্ট্রিটা ফেল হয়ে যাব। সেখানে মেয়েটা একলা আছে। তোমাদের জিনিস তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইব।” তারপর তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নিরাবরণের জননী প্রভূতবে পুণ-বধূকে পাইয়া বিশ্বম্বে ও আনন্দে আগ্রত হইলেন। অবিশ্বাসের মুখে মনো-রমার উদ্ধার এবং দয়ালের সেবার তৃপ্তি আশ্রয়ক

অনেকগুলি আশীর্বাদ করিলেন। নিরাবরণ অস্থ হইয়া জননীর কাছে গিয়া চুপে চুপে কহিল, তোমার বউএর কাছে আমার বিয়ের কোন কথা বলো না; বরং তুমি গোবিন্দ মৃণ্মথকে কিছু সাহায্য কর—সে অজ্ঞর কন্ডার বিবাহের চেষ্টা করুক। এ শুভসংবাদ গ্রামটীতে রবি-বিবরণের মত ব্যাপ হইয়া পড়িল। প্রতিবেশীরা সকলেই আনন্দিত হইল—নিরাবরণের বাটীতে রমার মা, কিরণ শশী, যত্নর গিসি, জ্ঞানের বউপ্রভৃতি সকলে পদার্পণ করিল। কেং কেং বা সহৃদয়ত্বিত জ্ঞাপন করিয়া কহিল, আহা বেঁচে থাক, এমন লক্ষী বউ তো প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। মনোমরমা সকলকে গিলি মুখ করাইতে ভুলিল না। মানবা নিরাবরণের কণামত গোবিন্দ মৃণ্মথকে কিছু সাহায্য করিয়া সমষ্ট করিল।

মনোমরমা স্বামীকে পাইয়া উমার কথা ভুলে নাই। স্বামীর নিকটে তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম সেবা-যত্নের কথা প্রায়ই বলিত। একদিন রাজ্যে স্বামীকে কহিল, দেখ দয়ালবাবু ও উমা আমার জন্ম যা করছে তাই মৃত্যু নেই। পাছে তুমি তাকে কিছু দাও সেই জন্ম আমাকে পৌঁছে দিয়ে অমনি চলে গেল। মেয়েটার বিয়ের সময় কিছু দিতে হবে। আহা আমাকে উমা একদণ্ড কাছছাড়া করে থাকতে পারছে না, দরি বলতে অজ্ঞান হইছ।

নিরাবরণ কহিল, দয়াল বাবুর স্বপ্ন পরিশোধ হবার নয়। একটা জীবনের মূল্য লক্ষ্যকার চেয়েও বেশী। তবে তাঁর কন্ডার বিবাহের সময় যথাসাধ্য তাকে সাহায্য কর্তে চেষ্টা করি।

কিছু দিন পরে নিরাবরণ উমার বিবাহের পত্র পাইল। মনোমরমা আনন্দের নীয়া নাই—স্বামীকে কহিল, আমার সন্তানসন্তাই সেখানে যাওয়া কর্তব্য। ঠাকুরপোকেও সঙ্গে নিতে করণ, তার লোকের অভাব। ও গেলে অনেক বিয়ে তাকে সাহায্য কর্তে পারি। অবিশ্বাসকে লইয়া নিরাবরণ ও মনোমরমা উমার বিবাহে যোগদান করিতে যাত্রা করিল।

দয়াল বাটীতে কিরিয়া দেখিল উমার আর সে আনন্দ নাই—কুল যেন শুকাইতে বসিয়াছে, তাহার বৃত্তিতে রহিল না যে মনোমরমা অদূরে সে কাজ হইয়াছে। কন্ডাকে সাধনা দিয়া কহিল, “কাদিসনি উমা—মনোর জন্ম কেন মিছামিছ মন খারাপ করিয়া। লোকের সঙ্গে

ভালবাসা হইলে তার বিচ্ছেদে প্রাণ কাতর হয় বটে, তবে সেই কথা দিবারাত্রি ভেবে কি কাঁপতে হবে!”

বথবা কন্ডার বিবাহের জন্ম দয়াল বড়ই ব্যত হইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে একটা পাত্র ঠিক হইল তবে তাহাকে স্বধ বিয়া জন্ম বিক্রম করিতে হইল। বিনা অর্থকে কে কন্ডা লইবে? কন্ডা পাত্রহী হইলে তাহার নিজের জন্ম ভাবিবার কিছু নাই তাই সমাজের শাসন হইতে বকা পাইবার জন্ম সে জন্ম বিক্রম করিল।

বিবাহের দিন উমা মনোরমার জন্ম ছুটুকটুক করিতে লাগিল। কষ্ট দিদি তা এলেন না। দয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা তুমি কি চিঠি দাওনি?

পাঠিয়েছি মা—তাঁরা কেন এলেন না তার কারণ তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল বর আসিল কিন্তু কষ্ট উমার দিদি ত আসিল না। উমার চক্ষের কোণে ছুঁকোঁটা অশ্রু দেখা দিল।

বিবাহের কিছু পূর্বে বরকন্ডার সহিত টাকা কড়ি লইয়া দয়ালের বিবাহ হইল। দয়াল বিনীত ভাবে বর-কন্ডারের নিকট কহিল, প্রতিবেশীরা অনেক মিনতি করিল কিন্তু ‘চোরা না শুনে ঘরখের কাড়ি’, বরকন্ডা চো-কার কহিয়া কহিলেন এতদ্ব ছোটলোকের ঘরের সঙ্গে আমার জলের বিয়ে দেব না। ওহে পরমাণিক বর উঠাইয়া লও। দয়াল চারিদিক অন্ধকার দেখিল,— তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সত্যই যখন বর চলিয়া গেল, কিরণবার দাখিক পরোপকারী ব্রাহ্মণ দয়াল একমনে তখন বিপদভঞ্জন মধুঘনকে জাকিত লাগিলেন। যে ঠাকুর—যে অন্তর্ধ্যামি—আমার জাত-জল যায়—আমাকে কি রক্ষা করিবে না!—

নিরাবরণ, মনোমরমা ও অবিশ্বাস ঠিক সেই মুহুর্তে আসিয়া পহঁছিল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নিরাবরণ দয়ালকে কহিল, “আপনি তার জন্মে কাজে হবেন না—

আপনার কন্ডার বিবাহ কিছুতেই আটকাবে না।

দয়াল আনন্দে কাদিয়া কহিল। নিরাবরণের ছুটা হাত ধরিয়া কহিল, “তবে এ বিবাদের উপায় হবে!”

“নিশ্চয় হবে।” অবিশ্বাস—

অবিশ্বাস দ্বিকি না করিয়া বরের পিড়িতে গিয়া বসিল। মনোমরমা যোগমতার মধ্য হইতে উল্লসন দিলেন।





বাংলার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সহিত কয়েকজন সভ্যের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, ফলে তাঁহার্য সদনে কাউন্সিল ভাগ্য করিয়া আসেন, এ সংবাদ কলিকাতা বাসীর অজ্ঞাত নাই। এই দলের মধ্যে কেবল স্বরাষ্ট্রা দলের সভ্যরাই ছিলেন এমন নহে, শ্রীযুক্ত অখিল-চন্দ্র দত্ত, মিঃ এ, সি য়ানাক্সি প্রভৃতিও ছিলেন। প্রেসিডেন্টের পদের অনেক কমতা আছে, এবং নূতন প্রেসিডেন্ট সেগুলি স্বাধিকার করিতে বাইরাই এই বিবাদ ঘটিয়াছে। অপর পক্ষেরও সহিষ্ণুতার অভাব যথেষ্ট ছিল। যাহা হউক এই ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়াইবার হস্ত চেষ্টা হইতেছে শুনিলাম—এরূপ তুচ্ছ ব্যাপার আপোষে মিটিয়া যাওয়াই ভাল কারণ ইহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে টলাটলির চূড়ান্ত হইবে।

এই ঘটনা লইয়া সহযোগী সার্জেট স্বরাষ্ট্র্যবলের প্রতি একটা লম্বা চৌড়া বক্তৃতা বর্ণন করিয়া গায়ের আল মিটিয়াছেন। সহযোগী কুলিয়া গিয়াছেন যে তালি কখনও এক হাতে বাজে না, তবে মহারাজা, রাজা, রাজকুমার বা ধনীকে প্রতি এই পরম অহিংস সহযোগীর একটা গাঢ় আন্তরিক প্রস্তাব এরূপ পরিচয় প্রায়ই আমরা পাইয়া থাকি যে, প্রেসিডেন্ট কুমার-বাহাদুরের জন্ত তাঁহাদের কালী কলম গরজে আবার মোটেই বিশিষ্ট হই নাই কিন্তু দেশের লোকে এরকম ফাঁকা উপদেশ দেওয়ার আসল কারণটা যে উত্তররূপে বৃত্তিতে পারে তাহাই আমাদের বিশ্বাস।

ব্রহ্মদেশের মাণ্ডলের কারাগারে অন্তরিত বাদালী বন্দীর প্রায়োগবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই দুঃখিত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। পারদীয়া ও সরস্বতী পুন্ডার সময় তাঁহার জেলে যে পুন্ডা করিয়াছিলেন তাহার

বায় বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট প্রদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে এই উপবাস ত্রয়ের আরম্ভ। শুনা যায় আলীপুর জেলের খুঁটান কয়েকীদের জন্ত ১২০০ টাকা ব্যয় করা হয় কিন্তু হিন্দুদের বিশেষতঃ খাওয়ার কোনরূপ প্রকাজ বা নীচ অপরাধে অভিযুক্ত নহেন তাঁহাদের দ্বন্দ্ব চর্চার জন্ত এই ব্যয় কেন যে বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট করিতে চাহেন না তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এ সংক্ষেপে কাউন্সিলে উপযুক্ত আলোচন হওয়া উচিত।

কিছুদিন পূর্বে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন দ্বন্দ্বিত একটা নন্দ্যাদা পরিষ্কার করিবার সময় দুইটি গ্যাস আশ্রয় করিয়া দম বন্ধ হইয়া যায়। ব্যয় এ সংবাদ অনেকই জানেন। এসমক্ষে এতদিন অস্থস্থান হইতেছিল। সম্মতি চেয়ারম্যান জানাইয়াছেন যে এই দুইটি গ্যাস মিউনিসিপ্যালিটির নন্দ্যাদায় জন্মে নাই, উহা গুরিয়াটাল গ্যাস কোম্পানীর কারখানার পরিত্যক্ত দুইটি পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ঐ সময় পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির নন্দ্যাদায় ফেলিবার উহাদের কোন অধিকার নাই বা তাঁহার্য তজ্জন্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কোনরূপ অস্থমতি লয়ন নাই। মিউনিসিপ্যালিটির বড় কর্তা মিউনিসিপ্যালিটির দোষ তো কাটাইলেন কিন্তু একটা কথা এই যে, তাঁহাদের গুডারনিয়ার বা জমাখার প্রভৃতি পরিদর্শক কর্তৃকগীর্ণ কি এত দিন ইহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই? যাহাদের অন্যান্যোপাধিকার কলে এইরূপ কাণ্ড ঘটিতে পারে তাহারা কি দণ্ডার্থ নহে? উপরন্তু গুরিয়াটাল গ্যাস কোম্পানীর এই বে-আইনী কার্যের তাহারা কি প্রতিবন্ধন করিবেন। পূর্বী দ্বন্দ্বিত মরিয়াছে বলিয়া ব্যাপারটা যদি এই পানেই চাপা

পড়িয়া যায় তবে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের কলম রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।

রোটারী ক্লাবের সভায় মিঃ কিড্ এইরূপ জানাইয়া ছিলেন।

আমাদের কার্যালয়ের পার্শ্বের বাটিতে একটা হুতা রং করিবার কারখানা হইয়াছে। যে সব পদার্থের সহযোগে হুতা রং করা হয় তাহার গন্ধটা অনেকটা কৃত্ত তড়াইবার মত। আমাদের ছাপাখানার ভূতেরা হেঁ পরিচায়ি ডাক ছাড়িতেছে। আশপাশের বাসিন্দাদেরও এই গন্ধে প্রাণ কঠাপা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার্য ইহার প্রতি-কার্য করণাবেশে দরখাস্তও করিয়াছিলেন কিন্তু ফলে কিছু হয় নাই। কলেরা প্রভৃতি মহামারীর যত্নসম্মিত্তেছে এমন সময় ভ্রম পঞ্জীর মধ্যে এইরূপ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিতে দেওয়ার দায়িত্ব যে কত গুরুতর তাহা কি কর্পোরেশন জানেন না! আমরা আশাকরি কর্পোরেশনের হেল্প অফিসার মহোদয় এ সংক্ষেপে অস্থ-স্থান করিয়া স্থানীয় ভল্লোক দিগকে এই অগম্য উপ-দ্রবের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

মিঃ যমুনালাল মেটার রেলওয়ের গরজ নামকর করিবার প্রস্তাবটা ভোটিংবোক্ষ পাশ হইয়া গিয়াছে। রেল-কোম্পানী এ যাবৎ ভূতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্ত কোন লুপ সুবিধার ব্যবস্থা করেন নাই এই অস্থহাতে তাহাদের গরজ বন্ধ করা হইয়াছে তবে ইহা কত দূর কার্যে লাড়াইবে তাহা বলা যায় না কারণ 'ভেটো' যে এখনও বলবৎ।

কান্দীরের সিংহাসনে বেনাবেল স্ত্রীর হিঙ্গিসয়ের অভিযেক উপলক্ষে রাজতিলক উৎসব আয়োজ হইয়া গিয়াছে। আমোদ প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইন্দোলের মহারাজ তাঁহার সংক্ষেপ গতি তদন্ত কমিশন বীকার করিতে সম্মতি লানাইয়াছেন।

কলিকাতার বর্তমান ট্যাগি ডাফা কমাইবার অস্থ গবর্ণমেন্টের নিকট একটা প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে;

ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের সমস্ত এলো-ইতিয়ান ও ডোমিনায়ন্ট ইউরোপীয়ানদিগকে সম্মত করিবার উদ্দেশে একটা সভা আহ্বান করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা কিন্তু দিন দিন নূতন দল গঠন করিতেই ব্যস্ত, সম্মত হওয়াটা যেন আমাদের প্রভৃতির বিরুদ্ধ—পার্থক্য এই থাকে।

ইতিপেগুট দলেও ভাষণ লাগিয়াছে। মালয়াজ, মিঃ রদাচারিয়ার প্রভৃতি সভাপণ উক্ত দলের সভাপণ ত্যাপ করিবেন বলিয়া পত্র মিথ্যাছেন—অশ্রুত তাহা এখনও দল হইতে মঞ্জুর করা হয় নাই। শুনা বাইতেছে যে ইহার্য 'জাতীয়দল' গঠন করিবেন। ইতিপেগুট দলের দলপতি মিঃ জিন্নার অব্যবহিতচিত্ততাই বোধ হয় এক সভার কারণ। মিঃ জিন্নার মত অত্যন্ত চকল বলিয়াই তাঁহার দল এ যাবৎ বিশেষ কিছু কাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে নিত্য নূতন দল গঠনটা আমাদের রাজ্য নৈতিক জীবনে ছুট ব্যাধির নূতন উপসর্গের আবির্ভাব বলিয়াই মনে হয়। সাম্প্রদায়িকতাই এই ব্যাধির মূল—সাম্প্রদায়িকতার লোভ সংবরণ করিতে না পারিলে রাজনৈতিক জীবন সবল হইতে পারা কার্যকর হইবে না।

পতিভরতে শ্রীশ্যামল সংক্ষেপ সম্মতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা বড়ই কষ্টকর। তাঁহাকে তথ্য এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে—কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহাকে চৌক পুরুষের পরিচয় দিতে হয় এবং টীপ সহি মিথ্যাও নিশ্চিত নাই—সম্পূর্ণ হাতের ছাপ্তও দিতে হয়। এরূপ বর্কর বিধান, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার উপলক্ষ ফরাঙ্গী গভর্নমেন্টের পক্ষে কেবল কলঙ্কের কথা নহে—তাঁহাদের ঐ সব বুলি গুলি যে একান্ত ভ্রূহা ও অদ্যার তাহা বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দেয়।



মিঃ থিয়েটারের আরও ৪৫ খানি প্রাচীর বিজ্ঞাপনী ব্যতির হইয়াছে। তদ্বারা জানা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ তারাস্বন্দরী, কৃষ্ণ কুমারী প্রমুখ অভিনেত্রীগণ এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছেন। অভিনেতার মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নিখলেন্দু নাহিড়ীর নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—তদা যাইতেছে কয়েকটা শক্তমান নৃতন অভিনেতাও সাংগৃহীত হইতেছে। অবশ্য অভিনয় না হওয়া পর্যন্তে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কিছু বলা চলে না।

শ্রীদুর্গা নামক একখানি পৌরাণিক নাটক ইহার প্রথমে অভিনয় করিবেন। প্রত্য়কার কে তাহা এখনও বিজ্ঞাপিত হয় নাই—হস্তান্তর নাটক সম্বন্ধেও কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

বাঙ্গালার দর্শক বৃন্দ প্রায় কাছাকাছি সময়েই মধ্যে তিনখানি নৃতন নাটকের অভিনয় দেখিতে পাইবেন—আর্ট থিয়েটারে শ্রীকৃষ্ণ মিনার্ভার বাঙ্গালী আর মিঃ থিয়েটারে শ্রীদুর্গা। ইহার মধ্যে প্রথম ও শেষ খানি পৌরাণিক মধ্যের খানি সামাজিক নাটক। কর্ণাজ্জ পৌরাণিক নাটক বলিয়া দৃষ্টপট ও সারসংক্ষেপে জ্ঞাতকর্মকে একদিন আসন্ন মাংস করিয়াছিল, তদবধি থিয়েটারওয়ালাদের পৌরাণিক নাটকেই কোঁক পড়িয়া যায়, ফলে নাট্যসন্ধিরে সীতা ও মিনার্ভার পৌরাণিক সাজসজ্জায় পৌরষায়িত আত্মপ্রকাশের অভিনয় হয়। মিঃ থিয়েটার ও গতাহ-গতিক প্রথা অনুসরণে শ্রীদুর্গা কাহিয়াছেন, এখন মা দুর্গা তাঁহাদের রক্ষা মুখ করিলেই আমরা আনন্দিত হইব।

তবে কে যে আগে নৃতন নাটক অভিনয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা এখনও নির্ধারণ করা যায় নাই। অহমান হয় মিনার্ভার প্রথমে 'বাঙ্গালী' অভিনয় করিতে পারিবেন কারণ পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা সামাজিক নাটকের হালধা অনেক কম। দর্শকেরাও বোধহয় পুরাণের ঠেলায় আঁহি আঁহি ভাক ছাড়িতেছেন—সেই দৃষ্টান্ত

মালা আর অরগতির পোষাক চোখে যেন বিরক্তি জাগাইয়া দেয়, এই সময় মিনার্ভা সম্প্রদায় সামাজিক নাটকের আয়োজন করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন—মধ্যে মধ্যে একটু মুখ বদলাইবার অবসর দেওয়া উচিত। পৌরাণিক নাটকে দর্শকের সাধা বেশী হয় বলিয়াই কঠোপনিষদের পঞ্চম টানটানি করিলে চলিবে কেন?

মিনার্ভার স্থবিখ্যাত গায়িকা স্বাসিনীর সত্যভামা চরিত্র অভিনয়ে তিনি যে একজন সুঅভিনেত্রী, সে পরিচয় দর্শকবৃন্দ পাইয়াছেন। সত্যভামা চরিত্রের দর্পটুকু তিনি এমন দৃষ্টান্তে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—আবার সেই সঙ্গ, নিঃশব্দ ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া অহুতাপের যে কোমল করুণ ছবি দেখাইয়াছিলেন তাহা যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর যোগ্য। তাঁরে থাকিতে বিশ্বক নাটকে হীরার কুমিকায় তাঁহার অভিনয় ও ভাবাত্মকতার মাধুর্য্য আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। আমাদের মনে হয় কেবল সঙ্গীত বহন কুমিকায় তাঁহাকে নিযুক্ত না রাখিয়া মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অজ্ঞাত নামিকা চরিত্রে অবতীর্ণ হইতে দিলে ভালই করিবেন। অন্তঃ বাঙ্গালী নাটকে একদম একটা কুমিকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

আর্ট থিয়েটার ও শ্রীকৃষ্ণ অভিনয় করিবার জন্ত উল্লিখিত পড়িয়া গিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নাটকের অভিনয় ঘোষিত হইবে। এ নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বালা লীসার কোন ঘটনা থাকিবে না। শিশুপালবধ, কলসরধ প্রভৃতি ঘটনা হইতে কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী ইহাতে থাকিবে—হস্তান্তর এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা যোদ্ধা ও রাজনৈতিকের চরিত্রে দেখিতে পাইব। বাঁশির স্বরের পরিবর্তে অসির বনং-কার শব্দেই পাতা পাতা হইবে। অলস, কাঁচাঝিষ বাঙ্গালীর প্রাণে যদি তাহাতে একটুও সাড়া পড়ে তাহা হইলে নাট্যকারের প্রয়াস সফল হইবে।



বিত্তীয় বর্ষ]

২২শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩২, ইং ৬ই মার্চ ১৯২৬

[ ২৯শ সংখ্যা

## প্রার্থনা

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর, আমার প্রাণের ঠাকুর, জানাই নমন জলে  
অক্ষিকনের এই নিবেদন তোমার চরণতলে,  
আমার মনে গোপন আসন পাতি  
থেকো হে মাথ, সেখায় দিবস-রাত্রি  
আমার মুখে তোমার মধুর ভাতি  
সদাই যেন জলে  
তুমি আমার জীবন-পথের সান্নিধ্য  
সদাই যেন বলে।

ঠাকুর, আমার প্রাণের ঠাকুর, পাই যেন হে দেখা  
বৃষ্টি যেন এ সংসারে নই' আমি একা,—  
চিত্ত-বীণা আমার সকল কাছে  
তোমার হাতেই নিভা যেন বাজে,  
থাকে যেন বৃকের ভাজে ভাজে—  
নামটি তোমার লেখা,  
শান্তি আছে শুধু তোমার মাঝে  
হয় যেন মোর শেখা।

ঠাকুর, আমার প্রাণের ঠাকুর, মাই না যেন তুলে  
তুমিই আছ আমার প্রাণের সকল গানের মূলে,  
তুবন গেছে তোমার পানে চেয়ে,  
সবাই আছে তোমার পানে চেয়ে,  
আমি যেন সেই সাথে যাই গেয়ে  
প্রাণের কবচ ফুলে,  
হৃদয়-নদী তোমার জ্যোতি পেয়ে  
উঠুক প্রেমে ফুলে।

ঠাকুর, আমার প্রাণের ঠাকুর, সদাই থেকো প্রাণে,  
আমার হৃদে, আমার হৃদে, আমার অভিমানে,  
থেকো আমার গেছে, আমার বনে,  
থেকো আমার হাতেই নিভা যেন বাজে,  
থেকো বাঁধা মেয়ে আমার মনে  
সবাই যেন জানে  
ওই চরণে মিলব হৃদয়নে  
তোমার প্রেমের টানে।





## প্রাচীন ভারতের কৃষিকার্য

“পাণ্ডুল”

বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে—“ক্ষেতের সোণা আর বাগিচায়ের সোণা।” বাগিচা করিলে যেমন সোণা পাওয়া যায় তেমনি ক্ষেত চাষ করিলেও সোণা পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে ক্ষেত এবং সোণা দুইই সমান। প্রাচীন ভারতের মানবজাতি ক্ষেতকেই চিরস্থায়ী সম্পদরূপে বিবেচনা করিত। বাগিচায়ের জন্ত এককল লোক থাকিলেও, সকলের উদ্দেশ্য ছিল কৃষিকার্য করা; এবং জাতিভেদ নির্বিশেষে ভ্রাশ্রম, কলিষ, বৈশ্বা, ও শূদ্র সকলেই কৃষিকার্য করিত। ভারতের ভূমি ছিল উর্বরা; এখানে অল্প পরিশ্রমে যথেষ্ট আহার্য ব্রণ্য পাওয়া যাইত। এই ক্ষেতের উর্বরতাই প্রাচীন ভারতের লোককে ধর্মের পথে টানিয়া লইয়াছিল; এই উর্বরতাই প্রাচীন ভারতকে উচ্ছল সভ্যতার আদ্যকো-আলোকিত করিয়াছিল, এই উর্বরতাই ভারতবাসিকে জগতের আসনে শ্রেষ্ঠ স্থানে বিদ্যাহে; এই উর্বরতাই ভারতীয় সভ্যতাকে বহিঃস্বর্গী না করিয়া অন্তঃস্বর্গী বরিয়াছিল এবং সেই কারণেই বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত সভ্যতার পীঠস্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল। যাহারা কৃষিকার্য করিত, তাহারাও আবার অবসর সময় নানা কাজ করিয়া সমাজে দৃঢ় হইত। কেহ কেহ ভগবানের উদ্দেশ্যে বন জঙ্গল, পাহাড়পর্বতে পাণ্ডলের মত ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহার কলেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের স্রষ্টা। কেহ কেহ শিল্পকলায় এত অধিক নৈপুণ্য লাভ করিত যে তাহাদের শিল্পকলা দেখিয়া বর্তমান সমাজ অবাক হইয়া যায়। সেই সকল শিল্পীগণের পরিজ্ঞানেই অজ্ঞতা প্রভৃতি পাহারের এবং অজ্ঞাত স্বানের স্বন্দর স্বন্দর গুণা নির্মিত হইয়াছিল এবং নানা প্রকার মূর্তিতে সৌন্দর্য, কমনীয়তা এবং স্বর্গীয়ভাব পূর্ণবাহার্য মূর্তিও উদ্ভূত। বর্তমান জগতের মানব উপজাতি লিখিতা চিত্র আঁকিয়া থাকে। ভাষার লালিত্য মানুষের মনকে

এক নূতন রাজ্যে লইয়া যায়। প্রাচীন ভারতের মানব কালী কলম দ্বারা উপজাতি লিখে নাই। তাহারা চিত্র-দ্বারা উপজাতি রচনা করিয়াছেন—সমস্তব্যবহিরিগ্ধা আশ্রম ও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই চিত্রোপজাতির কোন ব্যাখ্যা আবশ্যক করে না। চিত্র হইতেই সমস্ত ভাবগুলি এবং ঘটনাগুলি উপলব্ধি করা যায়। মধ্য যুগের পর যখন ইউরোপে নূতন যুগ (Renaissance) আরম্ভ হয়, তখন যেমন শিল্পকলায় জ্ঞান মানব-সমাজে একটা নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল; প্রাচীন ভারতের শিল্পীগণও তেমনি শিল্পকলায় সাহায্যে একটা যুগান্তর আনিয়াছিল। এই কলা-কৌশল প্রাচীন ভারতীয় লোকের একচেটিয়া ছিল।

প্রাচীনকালে যে রাজ্যে যত অধিক কৃষিকার্য হইত, সে রাজ্যে তাত্ত্বিক উন্নত হইত এবং প্রজাবংশী স্বধে বাস করিত। দেশের রাজা এই জন্ত রীতিমত যত্ন লইতেন এবং বাহাতে কৃষিকার্যের বিন দিন উন্নতি হয় তাহার উপায় করিতেন। অনেক সময় দেশে বৃষ্টি হইত না। রাজগণ নানা প্রকার যোগজ্ঞ করিয়া বৃষ্টির ব্যবস্থা করিতেন। যজ্ঞের ধুম হইতে মেঘের সঞ্চার হইত এবং তাহা হইতে বৃষ্টি হইয়া সমস্ত দেশে কৃষিকার্যোপযোগী হইত, ইহা ভিন্ন রাজগণ রাজস্বের হইতে অতিরিক্ত অর্থ বায় করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন এবং কৃষিকার্যে পর্যবেক্ষণের জন্ত অনেক কন্দ্ভট্টারী নিযুক্ত লইতেন। কৃষিকার্যের জন্ত রাজগণ যে বিশেষ যত্ন লইতেন, তাহা আমরা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই, রামাশ্রম তাহার জাতা ভরতকে বলিতেছেন, “Arc all the arable and cattle farmers of the realm pleased with thee? It is true my child, that on the success of farming depends the happiness of the people.” আবার মহাভারতের

সভাপর্ষে দেখিতে পাই,—নারদমুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—“My child, is agriculture and trade efficiently carried on in thy realm, by honest people? Agriculture (and trade) my child, is the source of happiness to the people.” এই রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে জানা যায় যে, রাজগণ কৃষিকার্যের উন্নতির জন্ত যথেষ্ট যত্ন লইতেন। অনেক সময় প্রজামণ্ডলীকে গো, মহিষ প্রভৃতি দ্বারা সাহায্যও করিতেন। প্রজারা রাজার হৃদয়সনে ও বন্দোবস্তে স্বধে বাস করিত। জমিও যথেষ্ট ছিল, যাহার যত ইচ্ছা, ভূমি চাষ করিতে পারিত।

রাজা যেমন প্রজামণ্ডলীর স্বধে স্থিতিয়ার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন এবং কৃষির উন্নতির জন্ত যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন, প্রজারাও তেমনি মনযোগের সহিত কৃষিকার্য করিত। বাহাতে ক্ষেতের ফসল ভাল হয়, তাহার জন্ত শারীরিক পরিশ্রম তো করিতই ইহা ছাড়া কৃষির এবং ফসলের উন্নতির জন্ত অনেক দেবদেবীর পূজা করিত। দেশের মঙ্গলের জন্ত এবং শস্তের উন্নতির জন্ত যে দেব-দেবীর পূজা উহা ভারতের নিম্ন নহে। উহা সমস্ত আর্ঘ্যজ্ঞাতীর পূজা। আর্ঘ্যগণ কেবল ভারতে আসে নাই। তাহারা, আদিম সভ্যতার কেন্দ্র, মধ্য এশিয়া হইতে এশিয়ার ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, পারস্য তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে হইউরোপের ইটালী, গ্রীস, আর্গাণ্ডী প্রভৃতি দেশে গমন করে। এই সমস্ত দেশের লোকেরা সকলেই এই সময় ধন-সম্পত্তি এবং শস্তাদি আর্ঘ্য বস্ত্র লাভের জন্ত নানা দেবদেবীর উপাসনা করিত। ভারতীয় আর্ঘ্যগণের এই দেবতার নাম লক্ষ্মী (Goddess of wealth) গ্রীসবাসিগণ আমাদের লক্ষ্মীকে ডেমিটার (Demeter) এবং রোমবাসিগণ সেরেস (Ceres) বলিত।

কৃষকগণের চাষের উপকরণ হইল,—গরু, মহিষ, লাশল, জোয়ালা, ঘেঁ, কাতে প্রভৃতি। গরু, মহিষ না হইলে চাষ-আবাদ চলেন না বলিলেই হয়; হস্তব্যাং গো-রক্ষার জন্ত তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিত। তাহারা গো-আজিক দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। বাহাতে দধ শক্তিশালী হয় এবং ভালরূপে কাজ করিতে পারে, তাহার

চেষ্টা করিত। যাহার গরু যত বলবান তাহার ক্ষেত তত ভাল চাষ হয়, এবং ক্ষেতে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালের হিন্দুগণ এই বিষয়টা ভালরূপে বুঝিয়া ছিলেন। গো-রক্ষার জন্ত প্রতি গ্রামের নিকটেই কিছু জমি ব্যতিত থাকিত। কোন কোন স্থানে চার পাঁচ মাইল ব্যাপিয়া গো-চারণ মাঠ থাকিত। এই সকল মাঠে গোমাল কচি খাস জমিত। গরু, মহিষ, ভেড়া, হাল প্রভৃতি পশু চরিয়া বেড়াইত এবং তাহারা ঘৃহ ও সবল হইত। বাড়িতে পুংকর্মা গরুর বাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহার জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। গোমালার প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় পরিষ্কার করিয়া দুগ দুগ দিবার ব্যবস্থা ছিল।

আজকাল হিন্দুগণ গো-হত্যা নিবারণের জন্ত নানা প্রকার বক্তৃতা দিতেছেন এবং সভাসমিতি স্থাপন করিতেছেন। কখন কখন মুসলমানদের সহিত গো-হত্যা লইয়া হিন্দুগণ দাশা-হাশামা করিতেছে। তাহার ফলে, রক্তপাত অপমৃত্যু প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহারা গো-হত্যাকে অজ্ঞান মনে করেন। (আমরাও গো-হত্যার ঘোর বিরোধী) এবং তাহার জন্ত সভাসমিতি করিতেছেন, তাহারা গো-রক্ষার জন্ত কতখানি পরিশ্রম ও স্বার্থভ্যাগ করিতে প্রস্তুত। না শুধু বক্তৃতা পঠিয়া তাহাদের গো-রক্ষার শেষ সীমা। আজ বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা দেশে কেন, সমস্ত ভারতে কতখানি জমি গো-চারণের জন্ত রাখা হইয়াছে। ঐ সকল বাক্য এবং সভা-সমিতির সভ্যদের বাড়ীতে কয়টা গরু ঘৃহ সবল দেহ লইয়া জীবিত আছে। আজকাল করজেন পুংকর্মা গো-শাখায় দিয়া গোমালঘর পরিষ্কার করেন?—অধিকাংশ ভদ্রব্যবসায়ের মেয়েরা গোমালঘরের নাম শুনিবোই নাক সিটকান। যাহাদের বাড়ীতে দুই চারটা গাভী আছে, তাহারা শুধু দুধের লোভে উহা পালন করেন। এই সকল ভদ্রব্যবসায়ী গাভী দেখিলে কাজেই না দ্ব্যং হয়। হাছ ভিন্ন মানুষ তাহাদের শরীরে বড় দেখা যায় না। ছোট ছোট বাছুর-টীও বেগা। সে গৃহস্থের রূপপাতা এবং তাহার প্রতি তাকিলে রক্তপাত রীতিমত দুঃখ পায় না। যেটা কথা, যাহারা গো-হত্যা পাপ মনে করেন, তাহারাও প্রত্যহ



শত শত গরু হত্যা করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছেন।

লাঙ্গল, মই, কাণ্ডে প্রভৃতি যাবতীয় কৃষিকার্যের উপকরণগুলি তাহারা যত করিয়া রাখিত এবং বৎসরের কোন এক সময় ঐগুলির পূজা করিত। আজকালও পল্লীগ্রামে যে সকল হিন্দুগণ চাষাবাদ করে, তাহারাও উহার পূজা করিয়া থাকে।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় কৃষিবিভাগ নামে একটি বিভাগ ছিল। একজন প্রধান কৰ্মচারী এই বিভাগের সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সাধারণতঃ প্রজারাই জমি চাষাবাদ করিত। ইহা ভিন্ন রাজ্যব্যয়ে অত্রান্ত অনেক জমি রাজার কৰ্মচারী দ্বারা চাষ করান হইত। প্রধান কৰ্মচারীর অধীনে অনেক সহকৰ্মচারী ছিল। তাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদের অভাবাভিযোগ লক্ষ্য করিত এবং নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা কৃষিকার্যের উন্নতির জন্ত তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। যাহারা বীজ অভাবে কৃষিকৰ্ম করিতে পারিত না, তাহাদিগকে রাজ্যব্যয়ে বীজ প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন্ কোন্ সময় কোন্ বীজ বপন করিলে ভাল ফসল জন্মে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিত। অনেক কৰ্মচারী নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করিবার জন্ত গবেষণা করিত।

কৃষিকার্যের সুবিধার জন্ত জল-সেচন বিভাগ (Irrigation department) নামে একটি বিভাগ ছিল। দেশের সকলস্থানে রীতিমত সময় বুটী হইত না। বুটীর অভাবে যাহাতে কৃষিকার্য বন্ধ না হয় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ বেধা না দেয়; তাহার জন্তই জল-সেচন বিভাগের সৃষ্টি। যে স্থানে সময় মত বুটী হইত না, সে স্থানে এই বিভাগ রাজ্যব্যয়ে নিকটবর্তী নদী হইতে নালা কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিত। নিকটে কোন নদী না

থাকিলে দীর্ঘি কাটাঁইয়া দিত। ইহা ভিন্ন কৃষকগণ কৃপ হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিত। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ এখন পর্যন্তও কৃপ হইতে জল সরবরাহ করিয়া চাষ করিতেছে।

আজকাল ভারতের এক শ্রেণীর লোক খাইতে পায় না—তাহার একটি কারণ ভারতের শত বিশেষে রপ্তানি হয়; দ্বিতীয় কারণ কৃষিকার্যে অবহেলা। কৃষিকার্যের জন্ত রীতিমত চেষ্টা হইতেছে না, সুতরাং ফসলও ভাল জন্মে না। যাহা জন্মে তাহা বিদেশী বণিকগণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া লয়; শ্মাখারণ গরীব লোক বেশী টাকা দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। তাহার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং নানা প্রকার সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

কৃষিকার্যের মন্দগতির কারণ—ভারতের ভূমির উর্বরতা দিন দিন কমিতেছে। নূতন উপায়ে উর্বরতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে না। এই চেষ্টা কে করে? যাহাদিগের দ্বারা এই চেষ্টা সম্ভব, তাহারা আপনাদের, স্বথ-সুবিধা, ও আয়োদ্য-প্রায়োদ্য লইয়াই মত্ত। দ্বিতীয় কারণ, তথাকথিত ভক্তলোকগণ কৃষিকার্যকে হেয় জ্ঞান করেন; বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভক্তলোকগণ। চাহুরী করিয়া না খাইয়া মরিবে, তবু গ্রামে গিয়া লাঙ্গল ধরিতে না। লাঙ্গল ধরিলে তাহাদের অপমান হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বি-এ, পাশ করিয়াও বিশ টাকা মাহিনার সাহেবের হুকুম তামিল করিতে লজ্জা বোধ হয় না। পল্লীগ্রামের মাঠের ভিতর যে স্বর্ণখনি রহিয়াছে, কেবল একটু কষ্ট করিয়া লাঙ্গল দ্বারা মাটি খুঁড়িলেই তাহা পাওয়া যায়। এই সরল কথাটা যে কোন লোক বুঝিয়াও বোঝে না, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না—বোধ্যবৎ ইহা বস্তুমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কৃৎসল।

সব সাধ যদি মিটিত ধরায়—



এখ রচি লাভ কিবা অন্ন নাহি জোটে  
সমজদার পাঠক দেশে নাহি মোটে  
তার চেয়ে অক্ষয়্য পেলো রে এখন

সাঁত কলসী মোহব কিংবা গুলুধন  
আশা মোর মিটিত রে খুদী হত প্রাণ  
প্রাণ ভরে করিতাম ভাগ্য-জয়গান।







## বুকের ভাষা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস

বিবিবার।...

কোনো কাজ কর্বে নেই। জানালা দিয়ে শুধু বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা সান্না মেঘ ধীরে ধীরে কালো হয়ে এলো, তারপর কোথাকার একটা ঝড়ো হাওয়ায় মুখে সেটা ছুঁতে ছুঁতে আকাশের গায়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হোল, আমাদের জীবনটাও এক-রকম লক্ষ্যহীন গতির বেগে ছুটে চলেছে তার অনিচ্ছিত যাত্রায়।...

হুনীল এসে উপস্থিত।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললুম, “পুতী থেকে কবে কিসে হে?”

“আজ সকালে।”

“কেনম লাগল?”

হুনীল একটু ব্যস্ত হ’য়ে বললে, “চমৎকার। সে এখন পরে শুনে। চিন্ময় আর মোহিত এখনো আসেনি যে। ‘রাস্কেন’ ছুটোকে কত ক’রে সকালে বলে এনেছি, ছুপুরে স্বাক্ষরদের গুদানে একটু আড্ডা দিতে হবে, তা এখন পর্যন্ত তাদের পাতাই পাওয়া যাচ্ছে না।”

“কেন ব্যাপারখানা কি হে?”

একটু হেসে সে বললে, “ব্যাপার এখন বলচিনে। সবাই না আসা পর্যন্ত আমাকে চুপ কোরেই থাকতে

হবে। তবে এইটুকু জেনে রাখতে পারবে—ব্যাপারখানা ডারি মন্ডার।”

আমি হর করে বললুম—আহা প্রাণ জড়িয়ে গেল এইটুকু শুনে।

চিন্ময় আর মোহিত এলে খবাসন্তব মধুর সন্তাষণে তাদের আপ্যায়িত করে হুনীল তার পকেটের ভেতর থেকে দু’খানা ছোট ছোট বাতা বের করলে। আমরা সবাই আগ্রহের সহিত সেদিকে চেয়ে রইলুম।

হুনীল আগে যে একটু ভূমিকা করলে, তাতে বুঝা গেল, পুরীতে তারা যে বাড়ীখানা ভাড়া করেছিল, এ খাতা দু’খানা সে বাড়ীরই একটা পরিত্যক্ত আল-মাতীর ভিতর সে আবিষ্কার করেছে এবং বর্তমানে এটা একমাত্র তারই সম্পত্তি। খাতা দু’খানা দু’জনের দু’খানা জায়েরী।

হুনীল গড়তে আরম্ভ করলে। আমরা সবাই উৎকর্ষ হ’য়ে শুনতে লাগলুম।—

নিম্নলিখনের ডায়েরী থেকে—

...বৈশাখের আশা-আশিঙেই এবার কলঙ্ক বন্ধ হয়ে গেল। এবার বাড়ী যাবার পালা। মনটা এতদিন খুবই কাঁদছিল বাড়ীর জগে। বলতে কি, কোলকাতার সহরটা

আমার কাছে মোটেই ভালো লাগে না। দিন নেই, রাত নেই, পাড়ী ঘোড়ার ঘ্যান্ ঘ্যান্ খড় খড়, রেল-ষ্ট্রামের বিকট চাঁৎকার, মাছখণ্ডনের হাঁকডাক—এইসব একসঙ্গে হ্রস্ব শব্দে শব্দে প্রাণটা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই গল্পী-জননী “ছায়া” হুমিবিড় শান্তির নীড়ে” ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রাণটা ভারি ‘আহুলি বিকুলি’ করছিলো। এবার সে সমস্তটা অস্ত্রাঙ্ক বছর থেকে একটু এগিয়ে আসাতে মনটা ভারি আনন্দিত হল।...

বাড়ী এসে দেখলুম, একজন নতুন অতিথি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির ভেতর স্থান পেয়েছে। মাকে বললুম, মেয়েটি কে মা? একে তো আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। মা যা উত্তর দিলেন, তাতে বুঝা গেল যে, মেয়েটিকে এর আগে আমি বাস্তবিকই দেখিনি, আর সে যে চৈরদিনের জন্ম আমাদের পরিবারের একজন হ’য়ে দাঁড়িয়েছে, তারও আভাস পাওয়া গেল। মেয়েটির মার সঙ্গে নাকি আমার মার ‘বেলফুল’ সখদ্ব ছিল।—যাক—মার বেলফুলের মেয়ে হ’ল আমার ভারী—অন্ততঃ মার কথায় ত সেইরকমই একটা আভাস পাওয়া গেল। তা হ’লে ত মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার! দেখা যাক—কি হয়।...

যাক—এতদিনে মেয়েটির সঙ্গে একটু ভাব হয়েছে। বাপকে, যা লাগুক। আমি বাড়ী আসবার পর থেকে সে কেবল পালিয়ে পালিয়েই কাটিয়েছে। আমাকে দেখে তার পালাবাবার কারণ কি? আমার বোধ হচ্ছে, যা তাকে কিছু বলেছে।...

অনেক কষ্টে আজ তার দেখা পেয়েছি। ছুপুরে মা যখন নদীতে স্নান করত পেছনে, গড়ার ঘর থেকে চুপে চুপে বেরিয়ে আমাদের বাড়ার ঘরের এক কোণ থেকে তাকে অতি কষ্টে আবিষ্কার করলুম। প্রথমটা সে আমাকে দেখে ভারি খতমত খেয়ে গেল। আমি, যখন বুকিয়ে বললুম যে, আমি বাণও নই ভান্ধকও নই, শুধু রক্তে বাসে গড়া একটা সাধারণ মাছই এবং তার কাছে আসা শুধু দ্রুতি চারটা কথা বলার জন্তে, তখন

সে একটু হাসলে। ভাবলুম, যাক—একবারে বোকা নয়।

পাড়ার ঘরে তাকে নিয়ে এলুম। একটা চেয়ার টেনে তাকে বসতে বললুম। সে বললে না—বোধ হয় মেয়েদের চেয়ারে বসতে নেই বলে। পাড়ারগেয়ে মেয়েদের কুশাস্থার দেখলে হাসি পায়।

কিন্তু যা হোক—দেখবার মত জিনিষ বটে সে একটা। এমন নিরুত্ত সৌন্দর্যের প্রতিমা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। সব চেয়ে সুন্দর তার চোখ দুটো। চেয়ে মনে হোল—যেন সিদ্ধুর মত অতল-ম্পর্শ।

খুব নরম স্বরে বললুম, তোমার নামটি কি? সে খুব ধীরে ধীরে মিটি করে উত্তর দিলে, “নীলিমা।”

...বেশী কথা আর হোল না। মা এসে পড়লেন কিনা। কিন্তু যেটুকু পরিচয় তার আজ পেলুম, তা নিয়েই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন স্বপ্নজাল বুনতে আরম্ভ ক’রে দিলুম।...

উষার আলো তখন সবে মাত্র ধরার বকে নেমে আসছে। প্রভাতের শুকসারাটি তখনো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে দীপ্তনয়নে।

...বাইরে এসে দাঁড়ালুম পূর্ব দিকের কয়েকখানি মেঘ বলাকার মতো উষাদেবীর তোরণ-ঘরের দিকে চেয়ে আছে চুপ করে।...

পূর্বাকাশ লাল হয়ে আসছে, মেঘগুলো ধীরে ধীরে উষাদেবীর সোপার ধান মাথা ঘুলে নিলে, অমনি চারিদিক রাঙা রাঙা হয়ে এলো।...

বাগানে অনেকক্ষণ পাইচারা করে, ধীরে ধীরে আবার শয়নকক্ষে ফিরে গেলুম। কক্ষের ভেতরে প্রবেশ ক’রে দেখলুম, কে আমার বিছানা-পরাধি এই মধ্যে উঠিয়ে রেখে গেছে। বুঝতে আর বাকী রইল না যে, এ নীলাই করেছে।...

পাড়ার ঘরে প্রবেশ করেই দেখলুম, টেবিলের উপর-কার গত রাজের ইন্ততঃ বিস্মৃতি পুস্তকগুলি কে



নিপুণ হাতে গুছিয়ে রেখেছে। নীলা আমার জন্ত এত করেছে?—একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

এমনি সময়ে নীলা কতগুলি ফুল নিয়ে সে কক্ষে প্রবেশ করলে। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে একটি ঝাঁড়াতেই সেদিকে আমার চোখ পড়ে গেল। নীলা—আমার সকল কাজে নীলা?...

প্রভাতের শিথল মধুর বাতাসের হোঁচল লেগে অলকগুলো তার টেউয়ের মত ছুঁচ্ছে। কচি খাসের রংএর শাড়ীখানা তাকে হৃদয় মানিয়েছিল। লক্ষ্যের আভাস ফুলের মতো মুখখানি তার হস্তস্থিত গোলাপ ফুলের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে।...বৃষ্ণতে আর বাকী রইল না, বোঝে সকালে কে আমার পড়ার ঘরে এমন করে সব কোটা ফুলের সৌরভ রেখে যায়।

নীলা টেবিলের উপর ধীরে ধীরে ফুলগুলো রেখে চলে যাচ্ছিল, কি একটা খেয়াল চেপে বসলো আজ খণ ক'রে আমি তার একখানা হাত ধ'রে ফেলুলাম। কোমল স্বরে বললাম, নীলা, ঝাঁড়াও একটু।

প্রথমটা আমার হস্তস্পর্শে সে শিউরে উঠলো। রক্তিম মুখখানি একবার আমার দিকে তুলে ধরলো, আবার ধীরে ধীরে মাথা নত ক'রে ফেললো। কি হৃদয় তার সেই সলজ্জ দুটিটুই? তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, যেন সখির প্রথম আপনার স্পর্শ পেয়ে দূটে উঠেছে—হুটি নীলোগাধন—অসুল পাখার জলের ভেতর। তার দেহের দিকে চেয়ে মনে হোল মনে অমরার স্কন্ধবনের গন্ধ মনে মস্তো নেমে এসেছে কোনো স্বর্গীয় দেবী-প্রতিমা!

ভেতুনি ক'রে তার হাতখানি ধরে রেখে বললাম, নীলা, আমার সব কাজই দেখছি আজকাল তুমি করে থাকো, দাঁচীচাকরগুলো যে একবারে কুঁড়ে হয়ে গেল। আর তুমিই বা কেন আমার জন্তে এত করবে? নীলা, কথা কও—উত্তর দাও।

প্রভাতের সে একবার আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে। সে দুটির মধ্যে কি উত্তর নিহিত ছিল, তা আর আমার বৃষ্ণতে বাকী রইল না।...

সব চেয়ে বড় ছুঁখ আমার মনে—নীলিমা এখানে

আমার সঙ্গে মনে খুলে কথা বললে না। আমাকে দেখলে কেন সে এতটা লজ্জা পেয়ে থাকে, তা আমি আজো বুঝতে পারছিলাম। সে জানে, দুদিন পরে আমাকেই তার সব চেয়ে আপনার বলে মনে নিতে হবে, সমস্ত লজ্জা তখন তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে—অথচ আজও সে বাইরের ব্যবহারে আমাকে যেন অনেক দূরে বেলে রেখেছে। এক একবার আমার বেশে একটু নন্দহ হ'য়, বোধ হয় নীলা আমাকে চায় না, হয় তা বা—

সকালে নদীর তীর থেকে বেড়িয়ে এসে তনুসুম ভাড়াতে গাড়িয়ে নীলা যাকে বলতে—মা, তুমি, এতুনি বিকিয়ে বলে দাও, আলমারা থেকে গুঁর বইগুলো বের ক'রে রন্ধের দিতে। উনি বার বার বলে গেছেন। বিন্দিটা আমার কথা মোটেই ভুলে না।...

মা হেসে বলেন, 'উনিট' কে রে নীলি? নীলিমার মুখখানা তখন কি রকমটি দেখতে হ'য়েছিল, তা দেখতে ভারি ইচ্ছে করছিল। খুব সম্ভব লক্ষ্যের আভাস প্রথমটা তার গান হ'লে গাটা হয়ে উঠেছিল, আফিম ফুলের মতো তার পাতলা রক্তকণ্ট্রিটো ছ'খানিতে হয় ত একবার কণিকের তরে স্রোতস্রা-মুটে সেঁই শর-তের শিশির ভেজা শেকাবী ফুলের মতো একটু কৈপে উঠেছিল প্রভাতের শিথল মধুর বাতাসের হোঁচল পেয়ে, তার বৃষ্ণ চেপে ছুটো হ'য় তা বেন হ'য়ে গেলো।

মার কথায় নীলিমার বা উত্তর বেরোল, আমি কিন্তু তা মোটেই আশা করিনি। সে বললে, ভারি নেকামো হ'চ্ছে, জানেন না যেন। যাও, আমিও জানিনি তবে। কিন্তু যা বলে রাখটি, সে কাজটি না হলেই দেখাবো এখন। বাড়ী শুদ্ধ একটা হলুদুল বাঁধিয়ে বাবু। বলে সে বগন্তের দক্ষিণা হাওয়ার মতো তার শাড়ীর নিশান উড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

...ভারি মিষ্টি লগ্নে কিশোরীর এই সরলতা মাখানো ভালবাসার গান!

...সকালে বাগানে গিয়ে দেখি, নীলা একমনে হৃদয় হৃদয় ফুল তুলে—বোধ হয় আমার পড়ার ঘরে রাখবার

জন্তে। প্রভাতের আনীর-রাজ প্রথম আলো তার মুখের পড়ে' তাকে বড়ই হৃদয় করে তুলেছে। বসন্তের প্রথম সন্নিগর স্পর্শে ফুল যেমন আর নিজে থেকে সামলে রাখতে পারে না, তার স্বরূপ ক্ষুদ্রিয়ে তুলে বাইরের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়, নীলিমার সৌন্দর্যও সেই রকম আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারছিল না—বাইরে ধরা বেরার আনন্দে তার গাটা দেহে লাগবোনে চেঁট তুলে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছিল।

আমি এগিয়ে আসতেই তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। এরকম ভাবে সে বোধ হয়, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ত প্রস্তুত ছিল না, তাই লক্ষ্যের তার মুখখানা একেবারে লাল টকটকে হ'য়ে উঠলো।

ধীরে ধীরে নীলার কাছে এগিয়ে তার একখানা হাত ধ'রে বললাম, দেখ নীলা, তুমি এরকম করে আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও কেন? এমন ফুল তোলা রেখে একবার উত্তর দাও।

নীলিমা একবার চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরোনা। আমার মনে আবার সেই কথাটা উঠলো—নীলা আমাকে চায় তো?...

একবারে লক্ষ্যের মাথা থেকে জিজ্ঞেস করলাম, আজো ভুলে চাইনে আমার উত্তর, কিন্তু একটা কথা তুমি শুধু বল, আমাকে পেনে তুমি স্বামী হয়ে কি না?

নীলিমার মাথা এইবার একেবারে নত হ'য়ে পড়লো। একটা লজ্জাও সে করতে পারলো না।

আমি অধীর আগ্রহে আবার বললাম, 'বলনা নীলা, এত লজ্জার কি এতে?' এইবার সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলো। পরকণ্ঠেই আবার মাথা নত ক'রে ফেললে।

আমার সাহস এবার বেড়ে গেল নীলার সেই হাসি-টুকতে। আমি ছ'খানি তার মুখখানা তুলে ধ'রে বললাম, 'এই একটু হাসলেই বৃষ্টি আমি বুঝব? তা হবে না, মুখ হুটে বসো নীলা!'

কোনো কথা সে বললো না। আমার হাত ছ'খানি সরিয়েও দিলো না। আমার মনে ভয় হ'ল, কি জানি

নীলা হয় ত বাস্তবিকই আমাকে চায় না, তা না হ'লে একটা মুখের কথা বলতে এত লজ্জা কেন!

আমি হাত ছেড়ে দিয়ে একটু অভিমানে স্বরে বললাম, আজো, বলবে না নীলা। বাক—ভুলতে চাইনে।...

সে এবার ভাড়াভাড়ি মুখখানি তুলে বললে, কি বলবে?

কি বলবে তা আমি জানি বৃষ্টি নীলা? তুমি নিজে বুঝতে পারছ না?

সে আবার চুপ ক'রে রইল। কি যেন একবার বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে তার বেরোনা। কেবল টেঁট ছ'খানি একবার কৈপে উঠে থেমে গেল।

এর পরে আর কথা চলে না। আমারও লজ্জা করছিল। সে আমাকে চায় না, তার কাছে স্বপ্নের এতটা দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছি বলে ভেতরটা আমার রাগে জলে যাচ্ছিল।

ঘরে গিয়ে আবার বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরেই নীলা চায়ের পেছালা নিয়ে ঘেঁঘরে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখেই আমার রাগে গা জলে গেল। বললাম—কি?

চা এনেছিলুম আপনার জন্ত। কে তোমার কাছে চা চেয়েছে? যাও—দরকার নেই। বলে আমি পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। কতক্ষণ পরে পাশ ফিরে চেয়ে দেখি, নীলা সেখানে নেই।...

আবার কোলুকাভার চলে এগেচি। এবারকার পরমের ছুটিটা যেন খুব ভাড়াভাড়ি ফুরিয়ে গেল।

আমদার দিন ইচ্ছে সবেও ইচ্ছে করে নীলিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসিনি। বাড়ীর ছয়ার থেকে কিছুদূর এগিয়ে গেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম—বিতলের এক-খানি জানালার কাছে সে গাড়িয়ে আছে। চোখ দুটো যেন চিক্ চিক্ করছিল বলে বোধ হল। ভেবেছিলুম, নীলিমায়ে আঘাত দিয়ে আমি শাস্তি পাব; কিন্তু তা হলো না। মনটা বার বারই বিস্ময়ের হাতে উঠেছে। কেন তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসিনি।



হু'মাস পরে আবার ছুটে বাড়ী আসতে হল। মার অস্থির, না এসে কি পারি?

জাক্সের পরামর্শ দিলেন, পুরী-চুইর দিকে যাওয়া দরকার।

আমার মোটেই আপত্তি ছিল না। এ অবসরে নাগর-ভীরের বেশটা যে দেখে আসা যাবে, এটা কি আমার মতো ভাব প্রবণের কাছে কম আনন্দের কথা?

...নিকিট দিনে তল্লি-তল্লা বেঁধে রওনা হওয়া গেল। বাড়ীর ভার আমাদের বিশ্বস্ত বেহারীর উপর রইল।

এবার হুনীলের একথানা খাতা শেষ হ'ল। আমরা সবাই এত তন্ময় হ'য়ে তার পড়া শুনছিলাম যে, তার পড়া শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে কথা কটোঁটনি। এবার চিন্না লাগিয়ে উঠে বসল, "ওর আর দেবী করিসনে, আমাদের আর তবু সইছে না—বাঁকী খাতাখানা তাড়াতাড়ি ক'রে প'ড়ে ফ্যাল।"

হুনীল আবার আরম্ভ করলে।

নীলিমাঝ ভায়েরী থেকে,—

...ভায়েরী লেখার ব্যতিক্রম আমার কোনো দিনেই নেই। পাড়াপেরে যেয়ে, লিখতেও তেমন জানিনে। তবু কিন্তু আজকের দিনে কিছু না লিখে থাকতে পারছিলাম।

দুপুর বেলা 'ওর' টেবিলের ড্রয়ার থেকে যে খাতা থানা চুরি করে এনেছি, সেইটেই আমাকে আজ লিখতে বাধ্য করলে। 'তার' ভায়েরীখানা দুপুর বেলা ঘরের ড্রয়ার বন্ধ করে একদমে পড়ে ফেলা গেছে! জীবনে বোধ হয়, এত স্থপ আমি কোনো উপভ্রাস বা কাব্য পড়ে পাইনি। উপভ্রাস যে উপভ্রাস বই আর কিছু নয়, এ আমার সব সময়েই মনে থাকত; কিন্তু এ যে সত্য উপভ্রাস!...বিকৃত হিয়ার অন্তরালে এতখানি সেনা-পানার হিসাব-নিকাশ হ'য়ে গেছে—এ আমি কোন দিন ধ্রুপেও ভাবতে পারিনি। কি বোকা আমি! একটা মুন্ডের কথার ভ্রান্ত—আমার জীবনের সব শক্তি, সব কিছু হেলায় বোঝাতে বসেছি।

বিশ্ব-গুণো আমার প্রিয়তম! তুমিও কি শেষে বোকা বনলে? জানো না,—আমরা যে নারী, বুক ফেটে গেলেও মুখে কথা বলতে পারিনে। আর কি ধোলাভোমার! তুমি কি অন্ধ গো? সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত আমার প্রত্যেকটি কাজের ভেতর দিয়ে আমার অন্তরের পূজা নিবেদন কার তরে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে, তাও কি চোখ তুলে দেখতে পারোনি একদিন? যাক—আর নয়, এরকম করে জলে জলে নিষেকের আর তোমার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে চাইনে। এর একটা নীমাশা ক'রে ফেলাই ভালো।

...মা ভালো হয়ে উঠেছেন। এখন মাঝে মাঝে চাকরকে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করত-ও গিয়ে থাকেন।—আজও গেছেন।

আমি বসে বসে চা তৈরী করছি, এমন সময় পেছন থেকে ব্যস্ত হ'য়ে তিনি এসে বসলেন, আমার টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর থেকে, একথানা খাতা চুরী গেছে, চোরকে ধরতে এসেছি। আমি জানতে চাই—আমার খাতাখানা সে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দেবে কি না? তা' হলে অন্তত: শান্তিটা দেওয়া রেহাই কর্ত্তে পারি।

মুখে আসছিল, আমি তোমার কাছে রেহাই চাই না গো, দাও তোমার শান্তি। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারবুম না।

শুধু একটু হেসে বললুম, বা রে, তা' আমার কাছে কি?

আশায় যে এই কথাটুকুর ভেতর দিয়েই ইচ্ছে ক'রে নিজেকে ধরা দিয়ে গিলে, একথা যুক্ততে বোধ হয় এবার বাইর আর দেবী হ'ল না।

আমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে বসলেন, তোমার কাছে যে কি, তা আমি জানি নীলা; একদিন শুধু ভুল করে এসেছি। এবার আর সেটি হচ্ছে না।

...আমার ভারি লজ্জা করছিল এসব কথা শুনে। কিন্তু মনও লাগছিল না। আমার পক্ষ থেকেও যাতে এবার ভুল না হয়, তার জন্য ভগবানের কাছ থেকে কথা কইবার মতো শক্তি চাইছিলাম। মনে মনে বসুছিলাম

আমার বুক যে ভাষা আজ গুনের মূর্ছে—তা যেন প্রকাশের আলোয় রঙীন হয়ে ওঠে প্রভু!

...তিনি পেয়ালা রেখে আমার একটা হাত ধ'রে তাঁর পাশে বসিয়ে বসলেন,—এবার বোধ হয় তুমিও তৈরী হয়েছ নীলা। আমি জানি,—তবু তুমি সেই কথাটি আমায় একবার বলো। তোমার মধ্যে শুনতে আমার ভারি ভালো লাগবে। আর আমার বুক যে সেইদিন থেকে একটা পাখান ভার চেপে রয়েছে, তার হাত থেকেও নিকুতি পাব।—বল নীলা।

কি খোলা! এত উপভ্রাস কি মাছের সইতে পারে? কিন্তু কি করি? দায়ে ঠেকেছি, তাই মাথা নীচু ক'রে বললুম,—কি বলবে?

তিনি একটু হেসে আমার কাঁধে একথানা হাত রেখে বসলেন, এমন কিছুই নয়, শুধু বলা, আমাকে পেয়ে তুমি স্বরী হবে তো?—আমাকে ভালোবাসবে তো?

অনেক বটে খুব ছোট করে বলে ফেললুম—'হাঁ'। কথাটা মুখ দিয়ে বেরোতেই আমার মাথাটা লজ্জায় একে-বারে 'তার' কোলের উপর ডেঙে পড়তে চাইছিলো।

## “বসন্তে”

### ক্রীষ্মলাদেবী

বসন্ত আজি ছায়ারে তোমার ঈড়ায়

গুণো নারী উন্নয়ন

ভাকি লহ তারে আজি ছই বাহু বাড়ায়ে

আজি তারে কিরাওনা।

শীতের শাসন বাখিয়া গিয়াছে গুরে

নামিয়া এসেছে বিশ্বের ঘোবন

বরণ করিয়া লহ আজি ফাগু যে রে

কিরাওনা তারে গুণো নারী উন্নয়ন।

আনমনে আজি বসিয়া থেক না যারে

কাজ ফেল আজ উঠে এস তুমি নারী

এই বানাই হুনীল থেমে তার খাতা হু'মানকে পকেটের ভেতরে পুরলে। চিন্না আর মোহিত তো তার কাণু দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো! এরকম ক'রে যে হুনীল তাদের রসভব করবে—এ যেন তারা ভাবতেই পারেনি।

মোহিত টেঁচিয়ে বসলে “মনসেপ, খাতা বন্ধ কর্বলি যে?”

চিন্না বসলে, তারপরে কি হলো বললেন? হুনীল একটু হেসে বসলে, অত চটোমেচি কর্বছিস কেন? যা হবার তা ত হ'য়েই গেলো।

মোহিত মুখ বিচিয়ে বসলে—হাঁ হ'য়েই গেল। তাদের বিয়ে হল না, কিছু না—হ'য়ে গেল কি করে?

আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম, এবার গুনের অবস্থা দেখে বললুম—তোরা একেবারে নিরেট খুঁ। এর পরে তাদের কাছে তাদের বয়স-সংসার, ছেলে-পুলে, সন্ত-গোষ্ঠীর খবর দিতে বসবে কি না?...

চিন্না একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসলে, তবু যদি দাম্পত্য বিরাগে লটা একটু থাকতো—

বসন্তে আজি লহ গো বরণ করে

ভরে নিয়ে এন পবিত্র হেম কারি।

বিশ্বের 'পরে এসেছে ফাগুন নামি'

বসে, বসে লুটে অক্ষল তার

পিকের কর্তে হু'রিত বনকুমি

ভালা ভরিয়াছে ভুলি নব সজার।

লোল অঞ্চল বার বার আন্দোলি'

বসন্ত তোমা' ভাকে উন্নয়ন নারী

ফলে ফলে আজ ভবে নাও অঞ্চল

মুছে ফেল আজ বেদনার আঁখি বারি।



## প্রাচীন ভারতে যুগ-নির্ণয়

অধ্যাপক শ্রীযাত্রীমোহন ঘোষ এম্ এ,

(১)

সূচনা

যদি অতীতে প্রাচ্যে যে কয়টি প্রাচীন জাতি প্রায় একই সময়ে সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক ভাষাতত্ত্ব ছাড়া তাহাদের সকলগুলিরই অতীত কাহিনী অসম্ভব পরমাণে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। Egypt বা মিসর, Chaldaea, Syria, Persia, China, সকলেরই প্রাচীন কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কতক বা উপকথা, কতক বা “পাপুশ্বে” প্রমাণের সাহায্যে সকলেরই অতীতের গৌরব-কথা পুথকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। Egypt এর hieroglyphics, Chaldaea's clay-bricks, China's bamboo books পাঠ করিয়া অনেক অতীত কথা পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগঃ যুগঃ ছয়শত বৎসরের পূর্বকার কোন কাহিনীই (অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে) ইতিহাস নামে আখ্যাত হইতে পারে না। ইহার অনেক-কারণও নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,

(১) প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ লেখকগণের (বাহায়া এক প্রকার custodians of learning ছিলেন) ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি ছিল না এবং ক্ষত্রিয়-রাজগণ কর্তৃক যে সব ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশ প্রথমতঃ অসংখ্য রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিতীয়তঃ দেশের জলাধার প্রকোপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি বা কাট-পট হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

(২) ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন-ভারতের লেখকগণ তাহা বুঝিতেন না। অতএব মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-গ্রন্থনিচয় ঠিক ইতিহাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

(৩) পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে যে সব প্রাচীন রাজবংশের তালিকা আছে সেগুলি, অনেক ক্ষেত্রে, পরস্পর বিরোধী। অধিকন্তু ছয় শত খৃষ্ট পূর্বের আগেকার রাজগণের তালিকাগুলির উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।

(৪) অতীত ভারতে কোন কালেই একজন একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন না বলিলেই হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য লইয়া ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্র একটি প্রবল জাতির ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষের একতা বহিমুখী একতা নহে, অন্তর্মুখী একতা (Dr. Radhakumud Mukherjee ইহাকে Fundamental unity নামে আখ্যাত করিয়াছেন)। অতএব কোন paramount power প্রাচীন ভারতে কখনও না থাকতে সন্দেহ প্রাচীন ভারতের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা অসম্ভব ছিল।

(৫) ভারতবর্ষ নানা রাজ্যে বিভক্ত হওয়ার জন্ম এখানে নারায়ণ অশ্ব (Era) প্রচলিত ছিল। একটি Era সহিত আর একটির সম্বন্ধ নির্ণয় না করিতে পারিলে ষণ্ড ষণ্ড ইতিহাসগুলি কোন ঐতিহাসিক উপায়েই সংযোজিত করা অসম্ভব।

(৬) প্রাচীন ভারতের Chronology বড় “Extravagant ও Fabulous”; বিশেষতঃ রামায়ণে ও পুরাণে উল্লিখিত প্রাচীন রাজগণের ও ধর্মবিদগণের যেরূপ পরমায়ুর উল্লেখ আছে তাহার উপর কোন বিবেচক ব্যক্তিই (sane man) আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। (মহা-ভারতের chronology ও জয়সিংহের পরবর্তী মণ্ডলের রাজগণের যে chronology কিছুপুরাণে আছে তাহা কিন্তু অনেক স্থানে “Fabulous বা “Extravagant” নহে)।

(৭) হস্তিনাপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন কালের কোন চিহ্ন ও কোন ঐতিহাসিক সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই সব কারণে অধিকাংশ পাক্ষাত্য পণ্ডিতের মতে যুগঃ যুগঃ ছয়শত বৎসরের পূর্বকার ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্যতা পুষ্টতা মাত্র। মহাখ্যা Elphinstone যে সময় ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তখনকার দিনে ইহাতে আল পণ্ডিত যে সব গবেষণা (Research) হইয়াছে তাহার ফলে ৩২৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দেবের আগে অনেক তারিখ (Date) আমরা নির্দেশ করিতে পারিলে (অধিকাংশ পাক্ষাত্য পণ্ডিতের মতে) যুগঃ যুগঃ ৬০০ বৎসরের সময় হইতে এমন একটা গভী টানিয়া দিতে আমরা বাধ্য হই যে যে গভী ডিভাইতে যাওয়া আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

উপরি লিখিত কারণগুলির মধ্যে কিছু কিছু যে সত্য নাই তাহা নহে, তবে সে গুলি অকাটা নহে, প্রত্যেক কারণটাই যুক্তির সাহায্যে কণ্টন করা যায়। আমরা উপস্থিত সে চেষ্টা না করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব কোন উপায়ে লক্ষণের গভীর দ্বারা ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দেবের গভী টপকাইলে একেবারেই from light to darkness এ পড়ি কিনা ও অন্ধকারে পড়িয়া একেবারে পথ হারায়া ফেলি কিনা; অপিত, মহাভারত, রামায়ণ ও ঋগ্বেদে উল্লিখিত ঘটনাগুলির সময় নির্ধারণ করা—যুক্তির সাহায্যে, ভারতীয় chronology সাহায্যে, সম্ভবপর কি না। এসম্বন্ধে এ প্রবন্ধ লেখার বহু পূর্ব হইতে চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। বহু প্রকারের মনীষা এসম্বন্ধে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। Asiatic Researches, Journal of the Asiatic Society প্রভৃতি ইংরাজ আমলের পুরাতন পত্রিকাগুলির পরে পরে এ প্রচেষ্টা লক্ষিত হইবে। Maxmuller, Monier Williams, Wilson, Prinsep, Elphinstone, Cowell, Pargiter, Buhler ইহাতে আশ্চর্য্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ধারোন্ধান-টনের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। যাহার আখ্যাত পাইয়া যে কেহ যাহার অন্তরালস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যেটুকু সাজা, সত্যই হউক বা কালনিকই হউক, পাইরাছেন,

তাহাই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ও লিপিবদ্ধ করিয়া নিজেরা ধৃত হইয়াছেন, আমাদেরও ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এতগুলি মনীষি যে কার্য সাধন করিতে পারেন নাই, যে সাধনার সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার চেষ্টা করিয়া বুঝা সময় ও কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে একথা বলিতে পারা যায় যে, সম্ভবতঃনর সময় ক্ষুদ্র কাঠবিড়াল্য যেরূপ যৎকিঞ্চ সাহায্য করিয়া ধৃত হইয়াছিল, সেইরূপ আমরাও এই গবেষণারূপ সত্যের আরাধনা করিয়া নিজকে কিয়ৎপরিমাণে ধৃত জ্ঞান করিতেছি। হইতে পারে আমাদের এ চেষ্টা বুঝা হইবে, হইতে পারে যে সব কথা আজ বলিব, তাহাদের সবগুলিই যে ত পূর্ণে ফল না কেহ বলিয়াছেন, হইতে পারে একগু প্রবন্ধের দ্বারা দশের কোনও উপকারই হইবে না; তথাপি একটু আশ্বস্তি হইবে! পাক্ষাত্য পণ্ডিতগণ যদি ঋগ্বেদের রচনা কাল ২০০০ হইতে ২৫০০ যুগঃ যুগঃ স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে কি জ্ঞান বর্ধনে যাহা নীচু করিয়া তাহাই মানিয়া লইতে হইবে? একটু ক্ষুদ্র চেষ্টা করিয়া, কোনরূপ অন্তিরজন না করিয়া, ভারতীয় উপাদান হইতেই যদি দেখান যায়, সুপ্রসিদ্ধ টিলক মহোদয়ের দ্বারা (টিলক প্রণীত Orion গ্রন্থ অষ্টম)। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য না লইয়াই যদি প্রমাণ করা যায়, ৩০০০ B. C. এর পূর্বে বৈমিক যুগ আরম্ভ হইতেই পারে না, তাহা হইলে কি সে চেষ্টা করিব না? ৩০০০ B. C. নাগাদ China's রাজ্য Fuhai রাজ্য করিয়াছিলেন। Egypt এর আদি রাজগণের প্রায় ঐ সময় রাজ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য কালের ঘটনাগুলি seriously ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা কি China's Fuhai, Huangti বা Egypt এর Snefru, Cheops, Chephren এর ও পরবর্তী? যখন এই সব ইতিহাসো-ল্লিখিত রাজত্বগণ রাজ্য করিতেছিলেন তখনও কি ভারতের আর্ঘ্য অধিবাসিগণ জয় গ্রহণ করেন নাই বা ভারতের আর্ঘ্য স্বধিগণ সভ্যতার আলোক দেখিয়া নিজেরা ধৃত হইয়া সভ্যতার আলোক, গমতে না হউক, অন্ততঃ ভারতে বিস্তার করেন নাই? এইরূপ কতকগুলি প্রশ্নের







এই স্থলে বেশের traditionকে উপেক্ষা করিলে চল না। Literary tradition মানিয়া লইতে গেলে বলিতে হয়, রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী। আর মহাভারত-গ্রন্থের পাতা উটাইয়া গেলেও তৎবিষয়ে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়। রামায়ণের সমগ্র পঞ্চটি মহাভারতের মধ্যে উল্লিখিত আছে, কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের কোনও উল্লেখই বাসীকীর বিদ্যমান নাই। ইহা হইতেই বোধ হয় উভয় গ্রন্থের মধ্যে কোনটা প্রাচীনতর তাহা বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে, এখন রামছন্দ্রের সমগাময়িক কবি-গণের মধ্যে গৌতম, বিখামিজ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেকই বৈদিক যুগের লোক, অথচ যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক অবিকার্ষণ পুত্রের নামই কথ্যে নাই, তখন রামায়ণই মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর।

এ বিষয় এখন এক কথায় বীমাংসা সম্ভব, তখন ইহা উপস্থিতি ছাড়া বিয়া মহাভারতের তারিখ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Astronomical groundএ বেস বসি আলোচনা হইয়াছে, সেগুলির এখানে উল্লেখ করিব না; কারণ, Astronomyতে বিশেষ ব্যাপ্তি নাই থাকিলে তাহা বুঝা ও বুঝান উভয়েই খুব কঠিন। সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে, পৌরাণিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া, এ প্রবন্ধে আমরা প্রমাণ বলিতে চেষ্টা করিব যে, মহাভারতে উল্লিখিত যুদ্ধ ঘটনার তারিখ ১৪০০ খৃঃ পূঃ বা ঐরূপ কোন সময়। এ সম্বন্ধে Elphinstone (*History of India*, Book III, Chap. 3 ষ্ট্রথ) যাহা লিখিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে হয়। তাঁহার যুক্তিপ্রণালী খুব সঠীক। তিনি বিভিন্ন পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশের তালিকা সন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জরাসন্ধ-পুত্র সহস্রবৎ হইতে আরম্ভ করিয়া নব পঞ্চম কব বংশী চলিষ্ জন রাজা সমগ্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন (কোন পুরাণকারের মতে ৪১ জন, কাহারও কাহারও মতে তাহার কিছু কম) ও তাঁহারের সকলের রাজত্বকালের পরিমাণ এক হাজার বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। দুইখানি পুরাণের মতে নব হইতে সহস্রবৎ পর্যন্ত সময় কালের

ব্যবধান মাত্র ১০৫০ বৎসর। ইহা সত্য হইলে নব হইতে জরাসন্ধের ব্যবধান ১০০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হয় অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধ (৪৫০+১০০০ খৃঃ পূঃ ১৪৫০ নাগাদ ঘটাইয়াছিল বলা যাইতে পারে। আবার আমরা সাধারণতঃ এক পুরুষের অস্তিত্ব (duration) ২৫ বৎসর ধরিয়া লইতে পারি। নব হইতে জরাসন্ধের মধ্যে যদি ৪০ জন রাজা ছিলেন বলা যায়, তাহা হইলে এই উক্ত নরপতির মধ্যে ব্যবধান ৪০ × ২৫ বা ১০০০ বৎসর পাড়ায়। দুইখানি পুরাণেও প্রায় ঐরূপ ব্যবধানের উল্লেখ আছে। অতএব মহাভারতের তারিখ নব হইতে ১০০০ বৎসর পূর্বে বলা যাইতে পারে? অর্থাৎ ইহার তারিখ ১৪৫০ খৃঃ পূঃ বা তাহার কাছাকাছি।

ব্যোতিত শাস্ত্রের সাহায্য ইয়াও মহাভারতের তারিখ স্থির করা যায় একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এ প্রবন্ধে কিংবা astronomical groundsএর কোন কথাই বলিব না। মহাভারতের আত্মমায়িক তারিখ, অজ্ঞাত উপায়েও স্থির করা যাইতে পারে। এখানে একটি মাত্র উপায়ের কথা বলিব। Lecture on the Vedas নামক প্রবন্ধে (*Chips from a German workshop*, vol. I) Max-müller একস্থলে বলিয়াছেন যে ৬০০ খৃঃ পূর্বাব্দে পূর্বে বেদের প্রত্যেক অক্ষর গণিত হইয়া গিয়াছিল। তৎপূর্বে অন্ততঃ ৪০০ বৎসর নিম্নহই অতীত হইয়াছিল যখন কথ-বৈয়াকরণীয় সমগ্র সাহিত্যগুলিকে সঙ্গের ও বিভাগ করিয়া-ছিলেন। অতএব অন্ততঃ ১২০০ খৃঃ পূর্বাব্দের পরে কিছুতেই মহাভারতের যুদ্ধ ঘটতে পারে না, কারণ ব্যাস ঐ সময় জীবিত ও পাণ্ডবগণের উপদেষ্টা স্বরূপ বর্তমান ছিলেন। অধ্যাপক Wilson's Introduction to the Rigveda Samhitā, vol. I একস্থলে অনেকটা (যদিও মহাভারতের তারিখ সম্বন্ধে নহে) ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "We cannot place Manu lower than the fifth or the sixth century B. C. at least; beyond which, we have the whole body of philosophical literature which would carry us, for the age of the Brahmana, to the seventh or the eighth at the least; and we

cannot allow less than four or five centuries for the composition and currency of the hymns. This will bring us to ... about twelve or thirteen centuries B. C."

### (৩) রামায়ণের যুগ

মহাভারতের যুদ্ধের কাল যদি ১৪৫০ খৃঃ পূর্ব বা উহার কাছাকাছি কোন সময় স্থির বলিয়া ধাৰ্য্য করি তাহা হইলে আরও অন্ততঃ ৩০০ বৎসরের পূর্বতন ইতিহাসে আমরা মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যতদূর স্মরণ আছে, বুদ্ধকল্পের যুদ্ধের সময় ব্যাসের বয়স ২৫০ বৎসর হইয়াছিল। ভীষ্ম ও ব্যাস প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। শান্তদ্বার তারিখ তাহা হইলে (১৪৫০+৩০০) প্রায় ১৭৫০ খৃঃ পূর্ব ও তৎপিতা প্রতাপের প্রায় ১৬০০ খৃঃ পূঃ হইয়া পাড়ায়। এখন দেখা যাক রামায়ণের রামচন্দ্র মহাভারতের শান্তদ্বার কত বৎসর পূর্বের লোক।

পুরাণ ও মহাভারত হইতে রামায়ণের chronological evidenceএর মধ্যে একটি পার্থক্য এই যে, রামায়ণের chronology বড় অতিরিক্ত ও অজৈবিক। ইহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। রামায়ণের উল্লিখিত কবিগণের ও রাজাসিংগের পরমায়ু সহস্র সহস্র বৎসর বলিয়া বর্ণিত আছে। অতএব শুধু রামায়ণ হইতে কোন তারিখ সন্ধান করা সম্ভব। তবে common-sense apply করিলে, তারিখ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য আমরা রামায়ণ হইতেও প্রাপ্ত হইতে পারি।

ব্যাস মহাভারতীয় যুগের প্রধান রাজা। তিনিই বর্ধ-মাত্যাজ্য ও হুহু হুহু দার্শনিক, রামচন্দ্রনৈতিক ও সামাজিক প্রণের সমাধান-কর্তা। যখনই কোন জটিল বা কূট প্রশ্ন উঠে, তখনই সকলে ব্যাসের নিকট যান। রামায়ণে কিন্তু ব্যাসের প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। তাঁহার নামও আমরা বোধ হয় উক্ত গ্রন্থে পাই না। ব্যাস রামচন্দ্রের সময় জ্ঞানী নাই, ইহা নিশ্চয় কবির মনে হয় না। কিন্তু ব্যাসের পিতা পরাশর রামের পূর্ব-বর্তী লোক। পরাশর বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির আত্মজ।

বিখ্যাত বশিষ্ঠের প্রতি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যখন কল্যাণপাদের দ্বারা কৌশলে (রাজা কল্যাণপাণ্ডকে রাজসোচিত শক্তি প্রদান করিয়া,—মহাভারত আদিপর্বে ও বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ ভাগ ষ্ট্রথ) প্রাণবৎ করেন তখন পরাশর সন্তোষাভিত শিশু মাত্র। কল্যাণপাদ রামের পূর্ববর্তী লোক (মূল রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণের dynastic list ষ্ট্রথ) অতএব রামচন্দ্র ব্যাস ও পরাশরের মধ্যবর্তী। তাঁহার তারিখ, তাহা হইলে, প্রায় ২০০০ খৃঃ পূর্ব আনন্দ পাড়ায় (ব্যাস যখন অন্ততঃ ৩০০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন তখন তাঁহার পিতাও কোন্‌ না ৩০০ বৎসর জীবিত ছিলেন?)। আবার, মহাভারতে যেমন ব্যাসের প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়, রামায়ণে যখন ব্যাসের প্রতিপত্তি বশিষ্ঠের প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়, তখন রামের তারিখ হইতে মহাভারতের তারিখের ব্যবধান ৫০০০ বা ২০০০০ বৎসর ধরিলে বোধ হয় কিছু অজ্ঞাত হয় না। এখন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সমগ্র রাজগণের তালিকা রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে প্রদত্ত আছে। রামায়ণের মতে ব্রহ্ম হইতে রামের ব্যবধান ৪০ পুরুষ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে ৫৫ পুরুষ। অতএব ইক্ষ্বাকু (যিনি রাম হইতে রামায়ণের মতে ৩৪ পুরুষ উর্দ্ধতন ও বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রায় ৫০ পুরুষ উর্দ্ধতন) হইতে রামের ব্যবধান সাধারণ বুদ্ধি হারা বিচার করিলে খুব কম করিয়া অন্ততঃ ৪০০ × ২৫ = ১০০০ এক হাজার বৎসর পাড়ায়। এসম্বন্ধে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজগণের যে কীষ্টি কলাপ আমরা রামায়ণ ও পুরাণাদি হইতে পাই (কোনও কোনও নরপতি, যথা যম্যতি, নহম, শত্ৰুপর্ণ, বিষয় মহাভারতেও উল্লেখ আছে) তাহা হইলে রাম হইতে ইক্ষ্বাকু পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত একটি একটানা ইতিহাস আমরা পাই এবং কবিগণের অন্তরঙ্গন ছাড়া বিদ্যে, তাহার মধ্যে বেশী অবিস্মৃত কিছুই নাই। মহাভারতেও যুধিষ্ঠিরের পূর্বপুরুষগণের যে dynastic list আছে তাহা হইতেও যুধিষ্ঠির হইতে বৈদিক যুগের ব্যবধান ১০০০ বৎসরের কম পাড়ায় নাই। (অবশ্য এখানে মহাক্বে বৈদিক যুগের লোক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।)



## বৈদিক যুগ

ইক্ষাকুর তারিখ যদি ৩০০০ খৃঃ পূঃ বা তাহার কাছাকাছি কিছু হয় (কি আশ্চর্যের বিষয়, চীনের ও মিসরের আদি রাজগণও ঠিক এই সময় রাজত্ব করিতেছিলেন। ভারত, চীন ও মিসরের Kingship প্রায় একই সময় প্রাপ্ত হইয়াছিল দেখিতেছি।) তাহা হইলে বৈদিক যুগ ইহারও পূর্ববর্তী সম্ভব নাই। যদিও ইক্ষাকু-বংশীয় অনেক রাজার কথা ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, তথাপি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ যে ইক্ষাকুর বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহার সম্ভব নাই। ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, বৈদিক যুগের প্রারম্ভে রাষ্ট্র ছিল না। তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠি-পতিগণ নরপতিদের স্থান অধিকার করিতেন। অজ্ঞাত দেশের দ্বারা ভারতেও “war begat the king”, বিদ্যমান; আমরা বলিতে পারি যে, ইক্ষাকু-বংশীয় রাজগণ যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন জাতিভেদ-প্রথা উত্তরোত্তর বেশ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ঋগ্বেদে জাতির উল্লেখ থাকিলেও জাতিভেদ-প্রথা এই যুগে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বোধ হয়, মাতৃস্বত্ব-জীবিকা (occupation) নির্দেশ করিত মাত্র। বংশ পরিচয় নির্দেশ করিত না। বর্গাশ্রম-ধর্ম ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগের কথা। তৃতীয়তঃ একথা বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্বেদে যেতদ অনেক ইক্ষাকু-বংশীয় রাজার উল্লেখ আছে বিষ্ণুপুরাণে ও রামায়ণে সেইরূপ অনেক ও ইক্ষাকু-বংশীয় রাজগণকে ও তৎকালীন ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বৈদিক যুগের পূর্বে বর্তমান ছিল ইহা নিশ্চিত। সম্ভবতঃ এই কথা মানিয়া লইলে বোধ হয়

অজ্ঞাত হইবে না যে, ঋগ্বেদের অধিকাংশ যুক্ত ইক্ষাকুর পূর্ববর্তী, যদিও ইক্ষাকুর পরবর্তী কালেও কতকগুলি যুক্ত রচিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, বৈদিক যুগে সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা আমরা পাই Epic Age-এ আমরা তাহা পাই না। অতএব ঋগ্বেদের অধিকাংশ যুক্ত নিশ্চয়ই খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মসম্বন্ধীয় পরিবর্তন ঘটিতে অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর লাগিয়াছিল, অতএব বৈদিক যুগের হুচনা ৩৪০০ খৃঃ পূঃ পরে কিছুতেই হইতে পারে না। অতএব বোধ হয়, ৩৫০০—৪০০০ খৃঃ পূঃ বৈদিক যুগের সময় বলিয়া নির্দেশ করিলে বিশেষ অজ্ঞাত হইবে না। লোকমাত্র টিলক astronomical grounds-এ দেখাইয়াছেন (টিলক-প্রণীত Orion chapter VIII শ্রবণ) যে, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে অদিতি যুগ (Pre-Orion Period) ৬০০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূর্বে পর্যন্ত বিস্তৃত ও Orion Period (যে সময় বৈদিক hymns প্রস্তুতি রচিত হইয়াছিল), ৪০০০ হইতে ২৫০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। ২৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত ‘তৈত্তিরীয় সাংহিত্য’ ও ‘ব্রাহ্মণ’ রচনার যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং ১৫০০ হইতে ৫০০ খৃঃ পূঃ ‘হজ’ রচনা ও ধর্মালিঙ্গ এক রচনার যুগ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। টিলক যাহা astronomical ground-এ প্রমাণ করিয়াছেন আমরা মাত্র রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত তথ্য-কথিত উপকথা অবলম্বনে তার ঠিক সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে, পরে বলিবারও ইচ্ছা রহিল, উপস্থিত এই পর্যন্ত বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।



## শ্রীশ্রী অঙ্কলক্ষ্মী

## প্রীপ্রভাতকিরণ বহু বি-এ

১  
দমিত্য আমার, পত্নী আমার,  
আমার অঙ্ক-হিয়া।  
সুধবর্ষিণী, সজনী আমার,  
প্রেমদী, প্রেমিকা, প্রিয়া।  
স্বপ্নচারিণী মানসী আমার,  
হে মোহিনী কবি-কল্পনাতার,  
মধুর স্তম্ভি তুমি বিদ্যাতার  
মধুর বৃত্তি দিয়া;  
সুধবর্ষিণী, সজনী আমার,  
প্রেমদী প্রেমিকা প্রিয়া।

২  
মনে কর কত গুরু-নিশীথে  
এসেছ আমার পাশে,  
কি দেখেছ চোরে, কি বলেছ বাণী,  
মনে কি সে কথা আসে?  
মনে কর কত নিতৃত প্রভাত,  
চলিয়াছি আমি তব পাশে লাগি,  
হৃদয় বীণায় সে কি প্রতিবাত  
নিঃশব্দে নিঃশব্দে।  
কি করেছ প্রিয়া, কি বলেছ বাণী,  
মনে কি সে কথা আসে?

৩  
মনে কর কবে কর-পল্লবে  
গেঁথেছ মঞ্জুমালা;  
দখিন বাতাসে নিচে-বাওয়া দীপ  
বারে বারে উঠে জ্বালা;  
তব অখরের মৃদুল হ্রদাস,  
অমরকণ্ঠ চাক্র কেশপাশ,  
সহসা সেদিন করিল উদাস  
কাহারে পল্লীবালা?  
পর্যাহা বিলে করপল্লবে  
কাহারে মঞ্জুমালা?

৪  
তোমার সকলি আমারে দিয়েছ  
আমার সকলি নিয়ে,  
সেবিকা আমার, বন্ধু আমার,  
‘ওগো’ ‘এরা’ আর ‘ইয়ে’।  
আমারি কলহ, প্রীতি, অভিমান,  
লাগনা মম, তৃষ্ণাবিধান,  
কলহগাথা, যশোভগণান,  
ভিগ্নী আমার ‘বি-এ’!  
সেবিকা আমার, বন্ধু আমার,  
‘ওগো’ ‘এরা’ আর ‘ইয়ে’।

৫  
আমি করি নাই ছলনা প্রেমসি,  
আমি ত দিয়েছি ধরা;  
তুমিও সঁপেছ পরাণ তোমার  
পতীর অশ্রু ভরা।  
তুমি চাহিয়াছ, আমি চাহিয়াছি,  
ভালোবাসিয়াছ, ভালোবাসিয়াছি,  
যাখা দিয়ে ফিরে যাখা পাইয়াছি—  
এমনি আপন করা।  
তুমি কর নাই ছলনা প্রেমদী,  
তুমিও দিয়েছ ধরা।

৬  
ভৃত্য এসেছে স্বপ্নেরধরী,  
নিতাপ্তদার ছলে,  
করিতে সে চায় অর্জুনা তব  
কাব্যকুসুমদলে;  
অশ্বনা মোর, সখিনী মম,  
সংসারপথে ছায়াখানি মম,  
করিয়াছ ভালো স্বপ্নময়ম  
প্রিয়তম করে বলে।—  
আজি করিল সে অর্জুনা তব  
কাব্যকুসুমদলে ॥





মহাত্মা গান্ধী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চলন

## সত্যের পরীক্ষা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতার অমৃতমতি ও আশীর্বাদের লইয়া উৎসূর্ণ হৃদয়ে বোঝাই যাত্রা করিলাম। গ্রীও কয়েকমাসের শিশু-সন্তানকে ছাড়িয়া চলিলাম। বোঝায়ে আসিয়া তুলিলাম যে জুন, জুলাই মাসে ভারত মহাসাগর বড়ই বিপজ্জনক স্তরায় নভেম্বরের পূর্বে আর আমার বিলাত যাত্রা সম্ভব হইবে না। লোক পরস্পরায় শোনা গেল সম্ভ্রান্তি এক বানি জাহাজ ডুবি হইয়া গিয়াছে। আমার অগ্রজ আমাকে এরূপ বিপদের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি এক আত্মীয়ের নিকট আমার রাহা-ধরচের টাকা গুজিত রাখিয়া রাজকোটে করিয়া গেলেন। বোঝায়ে আমার সময় অতি অস্বস্তিতে কাটিতেছিল কারণ বিলাত গমনের আমায় অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা ছিল।

ইতিমধ্যে আমার বিলাত গমন-সংকল্প স্বজাতীয়-গণের মধ্যে তুলু আন্দোলন চলিতেছিল—আমার স্বজাতীয়ের কেহ এপর্যন্ত বিলাতে গমন করেন নাই হুতরায় আমি যদি সে নিয়ম ভঙ্গ করি, তবে আমি দণ্ডনীয় হইব। একটা জাতীয় সভা গঠন করিয়া আমাকে তথায় উপস্থিত হইতে বলা হয়। আমি উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত সাহস আমি কোথায় পাইলাম তাহা জানি না। শেঠ বা দলের মাতঙ্গর আমারই এক পিতৃবন্ধু। তিনি আমার বলিলেন—“জাতির চক্ষে বিলাত গমন সহিত ইহা সম্পূর্ণ ধর্মবিরুদ্ধ আমরা জানি বিলাতে গিয়া আমাদের ধর্ম মানিয়া চলা

অসম্ভব। ইউরোপীয়দের সহিত আমার বিহার করিতে সবলেই বাধ্য হইব।”

ইহার উত্তরে আমি বলিলাম—সমুদ্রযাত্রা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ নয় আমি শিক্ষার জন্য যাইতেছি আপনারা যাহা আশঙ্কা করিতেছেন আমি সেই সমস্ত বিষয়ে বিরত থাকিব বলিয়া মাতার নিকট প্রতিক্রান্ত আছি—এবং সে প্রতিক্রান্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব।”

শেঠ বলিলেন—“কিন্তু আমরা বলিতেছি বিলাতে আমাদের ধর্মরক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়, আমি তোমার হিতকাজী অতএব আমার মুক্তি গ্রহণ কর” —“আপনি হিতকাজী তাহাও জানি আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মানি কিন্তু আমি আমার সন্তান পরিত্যাগ করিব না উপরন্তু আমার পিতার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার প্রস্তাবের অগ্রমোহন করিয়াছেন এবং আমার মাতার ও অগ্রজের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্মতি আছে।”

“তাহা হইলে তুমি জাতির আদেশ অমান্য করিতে চাও?”

“এ বিষয়ে আমি কিছুই করিতে পারি না। জাতির এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক কি?”

শেঠ উত্তর তুলিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন—গালি দিলেন আমি তথাপি অটল—শেঠ আদেশ জারি করিলেন “এই বালক আজ হইতে জাতিচ্যুত হইল। যে ইহাকে সাহায্য করিবে বা বিদায় দিতে জাহাজে যাইবে তাহার পাঁচ সিকা অর্থ দণ্ড হইবে।”

দ্বিতীয় বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা]

ফাগুনে-ফাগুয়া

৯৮৯

আদেশ তুলিয়াও আমি কিছু মাত্র বিচলিত হই নাই। আমার ভ্রাতাও গরুে জাহাজলেন যে শেঠের আদেশ সম্বন্ধে বিলাত যাত্রার তাহার সন্মতি আছে।

এই ঘটনার সত্তর বিলাত যাত্রা করিতে আমি বাধ্য হইলাম কারণ কখন কি হয় কিছু বলা যায় না। যদি অগ্রজের মত বলাইয়া যায়। এই সময়ে তুলিলাম জুনাগড়ের এক উকিল, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবেন। আমি অগ্রজের পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহারা বলিলেন এরূপ যোগ্য সংক্ষেপে ছাড়া উচিত নয়; স্বকী পাওয়া সকলের ভাগ্যে হয় না। সময় অল্পই ছিল অতঃপর অগ্রজকে তারে জানাইলাম—তিনি সন্মতি দিলেন। তৎপরে যে জাতির নিকট টাকা গুজিত ছিল তাহার নিকট গেলাম। তিনি শেঠের আদেশ উল্লেখ করিয়া

টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অল্প এক বন্ধু টাকা কর্ত্ত দিলেন এবং আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিলেন। এই টাকায় আমি জাহাজের টিকিট ও অল্পাত্ত আবশ্যকীয় অগাদি ক্রয় করিলাম। বিলাত গোষাক আমার বিশেষ ভাল লাগিল না কিন্তু মাইবার উৎসাহে ঐ বিষয়ের সোধে গণ বিচারের সময় ছিল না। জুনাগড়ের উকিল বাবু ত্রিখরায় মন্তব্যবাদের সহিত এক কামদায় আমার যোগ্য স্থির হইল—আমার বন্ধুরা তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইনি অভিজ্ঞ ও সংসারী ব্যক্তি আর আমি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সংসারে অনভিজ্ঞ যুবক—ইনি আমার বন্ধুদের আবৃত্ত করিলেন এবং আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে ঠাঠা সেপ্টেম্বর আমি বিলাত যাত্রা করিলাম।

## ফাগুনে-ফাগুয়া

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

১  
ঘুমার বুক কাল জল কই;  
নাচেনি'ত টলমল।  
খিবু খিবু করি বয়ে যায় ওই—  
কোথায়? কি হেতু বসু?

২  
তমালের বনে গাহেনি'ত পাখি,  
মধুর, মধুরী সাধে—  
ধরেনি পেখম, কাঁদে মোরা আঁখি  
আঁজি এ ফাগুয়া রাতে ॥

৩  
হু' হু' কই; পড়ে নাহি আজ  
লালে লাল আঁখিরে—  
হ' নাই পথ, কোথা 'রসরাজ'!  
নিধুনে নাহি রে ॥

৪  
করমেরি মূলে, গিয়েছি'ছ তুলে,  
দেখিছ শুকায় গেছে।  
অতীতের কথা স্মরণে আনিলে  
ভাবি আর কিবা আছে! ॥

৫  
ফাগুনে ফাগুয়া কি ছিল তখন,  
কি হয়েছে আজ বসু!  
আঁখিরে গুলানে মিশে'না এমন  
( শুধু ) তেল, কালি আর জল ॥

( ভাল ) রং রাখি ভিড়ে, ঘেরে পিচ্কারি,  
বদ'রং বত গুলে—  
করে উৎপাত, এ'কি খেলে 'হো'রি'!  
বাংলার সব ছেলে ॥

৬  
ভারতের এই হোরি উৎসব  
শুধু কিসে ছেলে খেলা?  
শুধু কি মেলা! শুধু কি মরব!  
শুধু কি সন্দেরে ভেলা! ॥

৭  
রঙে রং গেরে মিশেছে কেমন;  
ভেবে দেখে এই দিনে।  
জমিল 'দোরাজ', গাখি কী এমন—  
ফাগুয়া রজনী বিনে? ॥

৮  
আগল ফেলিয়া নকলে তুলিলে  
এমন দশাই—হয়।  
সোণা ফেলে দিয়ে রাংতা হুড়ালে  
লাভ নাই সুনিষ্ঠর ॥

৯  
মিছে কেন তোর এত হাসি রাশি,  
( যদি ) অন্তরে দখ নাহি  
অতীতের সেই স্মৃতি কি রে আমি  
করে বিচলিত ভাই? ॥



বহুজনতী, পৌষ, ১৩৩২—“মহাভারত ও ইতিহাস” শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল) বিরচিত প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিত। তাঁহার “Dying Race” শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বঙ্গদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে “বেঙ্গলী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া দেশের অধঃপতিত অবস্থার দিকে প্রত্যেক দেশভক্তের এবং শিক্ষিত দেশ-বাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন হৃৎকাতা মহা-ভারত ও ইতিহাস প্রবন্ধে লেখকের নিকট অনেক মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার আশা করি। আলোচ্য প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্যের ভূমিকা মাত্র হইলেও ইহাতে তিনি বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিকের “শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ ও জাতিগঠন” প্রবন্ধ এই সংখ্যায় শেষ হইল। প্রথমটি সমগ্রোপযোগী এবং স্থলিখিত। জাতীয়-জীবন-গঠন-কাণ্ডে স্বর্ণগীর্ষা খামিজী কি করিয়াছিলেন, তাহা লেখক হৃদয়গতভাবে দেখাইয়াছেন। খামিজীর বীর-বাহী খামিজীর ভাবনী এই অধঃপতিত দেশে যত আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। কবি গুয়াডালুয়ার্স মিটন সখেচ্ছ বাহা লিখিয়াছিলেন শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ সখেচ্ছ তাহাই আজ বলা চলে—Thou shouldst be living at this hour; India hath need of thee.”

“খোন নির্দোষ ও সৌন্দর্যবুদ্ধি” শ্রীযুক্ত উমাপতি বাজপেয়ী লিখিত বেনে-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। প্রবন্ধকার বিশেষ নুতন তথ্য দান করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক সাহিত্য-পত্রিকায় চক্রসেখর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শশধর রায় পরিচয় আলোচনা করিয়াছিলেন। বাজপেয়ী মহাশয়ের নিকট আমরা তদতিরিক্ত কিছুই আশা করি।

“খেছুরী বন্দর” উক্ত নামধের একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থানের পরিচয়। এই ক্রমশঃ প্রকান্ত প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কবির। তাঁহার তথ্যসম্ভান-প্রকট প্রকাশনায়। যদ্যপি এখন এই প্রাচীন স্থানটিকে বঙ্গের “ব্রাইটনে” পরিণত করিবার জন্য এক সময়ে কোন ইংরাজ লেখক “ইংলিশমান” পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

“কলিকাতা ও সহরতলী”—৪৪ বৎসর পূর্বের আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত পুরাতন-কলিকাতা প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ বঙ্কিত। প্রবন্ধের শেষে আচাধ্য মহাশয় সাহায্য গাইয়া-ছেন,—“আমি যখন মঞ্চস্থ হই, তখন বলিয়া থাকি, —মডোয়েয়ারী Conquest of Bengal ইত্যাদি। একজন অনেক মডোয়ারী আমার উপর বিরক্ত হইবেন। কিন্তু আমি নিদান্যর জন্ত বলি না, স্বজাতিকে উত্তোজিত হইতে বলিয়া থাকি।” আচাধ্যের এ কথিৎৎ একান্ত নিশ্চয়-জন—তাঁহার মত লোকের উদ্বেগের উপর কেহই সম্মত হইতে পারেন না। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয় আলোচনা “ভক্তি ও মুক্তি” এই সংখ্যায় শেষ হইল। তর্কভূষণ মহাশয়ের বক্তব্য এই যে মধুর রসাত্মক প্রেম-ভক্তির সহিত ‘মুক্তির’ তুলনা হইতে পারে না। মুক্তি অত্যাশঙ্ক্য; ভক্তি ভাবময়;—যেখানে মনোবৃত্তি নিত্যের আত্যন্তিক ধ্বংস; সে অবস্থায় সকল কর্তব্যের উচ্ছিন্ন হয় জ্ঞান, জ্যেজ্ঞ জ্ঞাতা কিছুই থাকে না—মহৎ সত্তার উচ্ছিন্ন হইবার স্বরূপ। এই নির্দোষ রসতত্ত্ববিদ ভক্তের কৃতি হইবে না। তর্কভূষণ মহাশয়ের আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যের গুরুভাবে ভাব চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আলোচ্য প্রবন্ধ তর্কভূষণ মহাশয়ের মনীষার অজ্ঞাতমুখ পরিচয়।

বিগত কংগ্রেস বিবরণী ও রাজমাতা আলেকজান্ডারের গতিজীবনী এবারকার বহুভাষী অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে।

“জ্যোতস্মী” সম্পাদক মহাশয়ের রচিত একটি ছোট গল্প। একটি পাহাড়ী তরুণীর বাসানী যুবকের প্রেমে পড়ার এবং তাহার জীবন রক্ষার জন্য তরুণীর স্বাভাবিক-বিসম্মদনের কাহিনী। বস্তুর অভাব ভাবার গাঠীর্ঘ্যে পূর্ণ হইবার নহে।

আলোচ্য সংখ্যার কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীপ্রমথনাথ বসুর “রঙী” কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। রস-রাজ অমৃতদলের “গল্প-ব-ভঙ্গ” (সঙ্গ নন্দনা) ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। প্রণবী শিল্পী—তাঁহার নিপুণ

তুলিকা এক টানেই আধুনিক যুগের আর্ট-বিশালী বাবুজিরের যে out line আঁকিয়াছেন রং ফলাইলে, না-জানি তাহাতে কি বাহারই খুলিবে। গত কাহিনিকের সংখ্যায় গল্পের বাবু ওগুয়ে গল্পের পরিচয়ে বলিয়াছেন—ইনি জাতিতে বাঙ্গালী, পরিচ্ছদে কিরীকী, পুছা পার্কেই হিন্দু, প্রণামী দেবার সময় তাক্স, আগারের জীকান, ধন-লিখায় জৈন, মুষ্টিযুদ্ধের সমুখে বৌদ্ধ—ইত্যাদি। গল্পকে চিনিতে পাঠকের বিলম্ব-হইবে।—রসালয়ের প্রেম যুগে ও সঙ্কট যুগে, সম্পাদকের জয় সাহিত্যিক মজলিসে, সিনেমা প্যালেসে, সভাসমিতিতে, মাসিকের পৃষ্ঠায় গল্পের বেধা পাইবেন। অমরা গল্পের উজ্জ্বল বেশ উপভোগ করিতেছি।

অমৃত বাবু “মাসিক বহনমতী” ও গজাঙ্কুরে ইত্যদ্যঃ বিক্ষিপ্ত তাঁহার সদয়-রচনাগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন না কেন?

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩২—৪—মাঘের “প্রবাসী” আমাদের “পরসুতাম” “কচি-সংসদের” পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য এখানেও “নারদ” তাঁহার রেখা-কণ-নিপুণ তুলিকা “সংসদের” রূপ ফুটিয়াছেন—সেই সঙ্গে স্বয়ং পরসুতামও বাদ যান নাই; এবার কলহ-জ্বিয় নারদ মহাশয় এক চিলে ছুই পানী মারিলেন কিনা, কে জানে? “কচি-সংসদ” পরসুতাম-যুগে দাম্পত্য কাব্যের স্বষ্টি করিয়াছে কিনা জানি না; আমরা কিন্তু “কচি-সংসদের” সরস প্রসঙ্গে মন খুলিয়া হাসিয়াছি। “কচি-সংসদের” পরিবর্তে “সমুদ্রের দল” এই নাম-কল্প হইলেই ভাল হইত; কেন না ‘সমুদ্র’ সকলেরই পরিচিত। পক্ষে, ঘাটে, ট্রায়ে, “বসু”-এ ‘বাহ্যোপে’ থিথিতে, সভা-সমিতিতে ও মজলিসে সমুদ্রের অভাব নাই। তবে লেখক যদি সম্ভবায় বিশেষের বিবক্তির ভয়ে, “লালল”কে ‘কোজ-কর্ণ-বদ্র’ বলিয়া পরিচয় দেন সে স্বতঃ কথ্য। রস-রচনার অভাবে বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্য ক্ষেত্র যেন উৎসবের স্রায় নীরস-হইয়া পড়িয়াছে। শব্দ-সম্বন্ধ কবিত্বহীন কবিতা, শব্দকগতি, কৈন্যচিত্ত ক্রমশঃ প্রকান্ত উপহাস, বৈচিত্রহীন ছোট-গল্প আর “মোটরলিফী” নাটকের ভাব-বস্তুর স্রায় গুরুগাভীর প্রবন্ধ;—এই সমস্ত

পাঠকের মস্তিষ্কে ভারাক্রান্ত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। মধ্যে মধ্যে এই সব নির্বিচ্ছিন্ন রচনা শ্রেণীর ঠাঁকে ঠাঁকে ছুই একটি লঘু-রচনা হাসির লহরী তুলিয়া বৈচিত্র্য আনয়ন করে, মাসিক সাহিত্যকে উপভোগ্য করে। “কচি-সংসদ” পরসুতামের যশোভাতি আনান রাখিয়াছে। এই নক্সা-টিকে একটু পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিয়া নাটকের রূপ দিলে, হুম্বর একটি drawing room play কিংবা after piece হইতে পারে।

“বানপুরের জাতীয় সপ্তাহ” শ্রীপ্রভাত সাত্তাল বিরচিত কংগ্রেস সপ্তাহের মোটামুটি বিবরণ; সঙ্গে সঙ্গে বানপুরের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ থাকায় লেখাটি সুপাঠ্য হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীমতলাল শীল মহাশয় এখানেও তাঁহার লিখিত “বন্যাই” মহাকবি চন্দ্রের মহাকাব্য পুণ্ড্রীক রসায়ের ঐতিহাসিকতা” প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিত্তিতে উক্ত কাব্যের “অনৈতিহাসিকতা” সত্যাত্ত করিবার জন্য প্রমাণ-প্রমাণে উল্লিখিত করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের পরিচয় প্রশংসনীয়।—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—এই সচিব প্রবন্ধের লেখক সম্বন্ধীকৃত দাস মহাশয় লোক প্রসিদ্ধা শ্রীমতী সরোজিনীর সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন—সেই সঙ্গে মহিলা-কবির কাব্য প্রতিভাদ্বয়নের ইতিহাস ও কাব্য-পরিচয়ই বাহ্যতে প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

“সুত-রোগ-সংসদ ও সমাধান” শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত সমগ্রোপযোগী এবং অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথোগতি কি দেশ হইতাহী ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ গরবেটে ও দেশের ধর্মিরদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ে? “ভারতবর্ষের দার্মিক সমাজের সভাপতির অভিভাষণ” ঐ বিষয়ক মূল ইংরাজী প্রবন্ধের অম্বাধ; একাধারে দার্মিক ও কবির সমন্বয়; হৃৎকাতা স্থানে স্থানে বুদ্ধিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ কটিন; অভিভাষণের প্রথম কথাটি এই—“ভারতবর্ষে কাব্যের মধ্যেই দেশ দার্মিক তত্ত্বগুলি স্থাপ্য পাইয়াছে—এমন কি এ দেশের প্রচলিত বাউল সন্যাসী প্রভৃতিতেও গভীর দার্মিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।”

“মোটরলিফী” নাটকের ভাববস্তু শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়







সে দেখিল। মহয়ার আঁজ একি অপূর্ণ দেবী যুতি। তাহাকে কোন কথা প্রায় করিতে যেন তাহার সাহস হইল না।

সমীরকে নীরব দেখিয়া মহয়া ভাবিল দাছ !

কি বলঙ্গি মহয়া ?

তুই কি আমার উপর রাগ করেছিল দাছ !

বাস করব কেন মহয়া ! তুই ত কোন অজ্ঞার করিস নি। তবে এ কথা জিজ্ঞাসা করছিল কেন ?

তুই দু-বার শিকার করতে গেলি। আর দু-বারই আমি যে তোকে বাধা দিয়েছি।

“বাধা দিয়ে ত ভালই করেছিল মহয়া। তুই বাধা না দিলে আমি হয় ত মাহুইই যেয়ে বসতাম।

একথা বলিয়া সমীর যেন একটু শানি গভীর ভাব ধারণ করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। মহয়া মনে মনে ভাবিল—দাছর সত্যই একটা বড় শিকার ফস্কে গেছে। যার জন্ত আঁজ কত দিন ধরে ভিতরে ভিতরে সে কত কষ্টে আঁটছিল, সেও লজ্জা আঁজ আমাকে সবে করে পাহাড়ে আসা, সেই প্রত্যাশিত শিকার আঁজ বড়ার ভীতের মুখে এসে আপন ধরা দিয়েছিল। কেউ জানিতে পার্থক্য পারিত না। এতাব্দে কত নয় যে আঁজকে হইবে ? নীরবে পোক-চতুর অন্তরে, সকলের অজ্ঞাতে চিরদিনের জন্ত নিস্ত্রিত হইত। কেবল তাহার লাবণ্য পাইত না। কে এ কাজ করিয়াছে, কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। কিছুদিন পরে কাঠুরিয়াগণ যখন কাঠ কাটিতে আসিয়া এ সংবাদ প্রকাশ করিত তখন হিলে লজ্জাগণের উপর এই অশাল সূচ্যার সমস্ত অভিযোগ নির্দিষ্টভাবে আরোপিত হইত। এ বংশভেদ আর কোন সময়, কোন দিন কেহ উল্লেখিত করিতে সমর্থ হইত না। মহয়ার মনটা আঁজ সারাদিন যেন একটা নিগাঞ্জন আশ্রয় পশিত হইয়াছিল। সে কেবলই মনে করিয়াছে, আঁজ এখানে কিম্বদন্তি প্রবোধেরা আসিল ? তাহারা কি আমার এ পাহাড়ে আসিয়াছি একথা জানিয়া আসিয়াছিল। না, তাহা হইতে পারে না। তাহারা যদি লব্ধিকা আঁজ আমার সহিত

দেখা না করিয়া থাকিতে পারিত না। আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহারা নিশ্চয় উহা জানিতে পারে নাই।

আমি যে তাহাদের দেখিতে পাইয়াছি তাহা দাছ কি জানিতে পারিয়াছে ? বোধ হয় পারিয়াছে, যদিই পারিয়া থাকে তবে সমস্ত দিন ধরিয়া তাহা এমন বেমালুমভাবে গোপন করিয়া রাখার অত্যন্ত বাহাদুরী আছে।

জঙ্গলের ভিতর প্রবোধ যখন শিকারের অন্বেষণে ফিরিতেছিল, তখন দাছ ঠিক তাকে লক্ষ্য করেছিল।

দাছর চোখ ছুটি যেন আগুনের গোলার মত ভাষণ ভাবে ঘুরিতেছিল ? পাছে প্রবোধখাবুর দিকে আমার

দৃষ্টি পড়ে সেজন্য আমাকে অস্বস্তিক্স করিবার জ্ঞান কি অপূর্ণ কৌশল, জাল বিস্তার করিয়া আমাকে সেখানে

হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা। আমি তখন যদি একবার বলিতাম ঐ প্রবোধখাবু আসিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়

দাছর হাতের তীর কেড়ে নিতে পারিতাম না। শব্দটা, আঁজ ভূমি মা তার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। ভাগ্যিস আমি সন্ধ্যা হারিয়ে চাঁদকার করিয়া উঠি নাই। হাত

থেকে তীরটা যদি কেড়ে নিতে ইতস্ততঃ করিতাম, তাহলে আঁজ কি সর্বনাশই না হইত। কি করে আমি

লব্ধিকার কাছে যুব দেখাইতাম ? এ কথা ভাবিতে ভাবিতে মহয়ার বড় বড় দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু

গড়াইয়া পড়িল। শেষে সে ভাবিল সারা দিনের চেষ্টা সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে এখানেই আর একটু হইলেই

বিফল হইয়াছিল আর কি ? আঁজ যে প্রবোধের জীবনের একটা গুরুতর ঝড় কাটিয়া গেল—এই ভাবিয়া মহয়া

মনে মনে দেবতার চরণ উদ্দেশ্যে বারবার নমস্কার করিল। এ ভক্তি নিবেদনের মধ্যে যে মহয়ার কতখানি প্রাণ ছিল,

তাহা মহয়ার অন্তরের দেবতার অপোচর ছিল না। মহয়ার জীবনে পরের জন্ত প্রার্থনা করিয়া এতখানি

আত্মপ্রসঙ্গ সে কোনদিন এমন করিয়া উপলব্ধি করিবার অবসর পায় নাই।

আঁজ মহয়ার মনে পড়িল, সেদিনের কথা, যেদিন প্রবোধ আসিয়া তার জননীর প্রস্তুত উপহার মহয়াকে

দিয়া যায়। কি আশ্চর্যভর, কি যথের সহিত সে তাহা বহিয়া আসিয়াছিল। তারপর দাছকে আগিতে দেখিয়া

তাহাকে জোর করিয়া চলিয়া যাইতে অহরোধ করা। প্রবোধ যখন সেভাবে লুকাইয়া পলাইয়া যাইতে অস্বীকার

করিল, তখন মহয়া তাহাকে একরূপ জোর করিয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। যখন সমীর কিরিয়া আসিয়া

সেই সমস্ত তথ্য দেখিল, এবং কোথা হইতে এসব জিনিষ আসিল জিজ্ঞাসা করিল—সে কথাও আঁজ মহয়ার

বহর হইল। আমি যখন দাছকে জানাইলাম, যে প্রবোধ দাছর মা কলিকাতা হইতে আমার জন্ত উঠা আসিয়া-

ছেন। এ কথা শুনিবামাত্র দাছ কি ভীষণ সন্দেহ-দৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিল—সে দৃষ্টি যেন আমার

সর্বাপেক্ষে অস্বস্তিক্স করিল। আমি দাছর মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। সে যেন আমার আপা-ম

দ্রবক বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অনেককণ পর্তাৎ আমার সহিত বাক্যলাপ করিল না। সে নীরবে

মাথা হাত দিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার ভরসা হইল না। এদিকে এমন

চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে বড়ই যত্নবাহক হইয়া উঠিল। আমি যে কি করিব কিছু ভাবিয়া

পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন এমন হীনভাবে পাণীর

মত নীরবে থাকিয়া কষ্ট পাই। দাছ অজ্ঞার রাগ করিতে পারে, তাতে আমার কি ? আমি কেন অকারণি মথ্যা

চিন্তায় নিযুক্ত পীড়িত করি ? আমার মনে যে আশঙ্কা হইল, যদি প্রবোধ বাবু নিকটে কোথাও অশোকা

করিয়া আমার এই উপহার লইয়া কি হয় দেখিবার জ্ঞান থাকেন এবং এখানে আসিয়া পড়েন ? তাহা হইলে

দাছর বেতন অবশ্য না জানি সে কি করিয়া বসিবে ? হতাশা ভাড়াভাড়ি নিজেই উঠিয়া গিয়া তার দাছর

হাত ধরিয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “দাছ এমন করে বসে রইলি যে ? তোর কি অসুখ করেছে ?

এ কাণড়খানা কেনমত দেখে দেবে ? বলিয়া যখন তার হাতে বসে কাণড়খানা উঠিয়ে দিলাম, মনে হইল বেশ

যত্নে পড়েছিল। দাছর হাতের উপর যেন অস্বস্তি আঁদুল ভুলে দিয়েছি। তার হাত কেঁপে উঠেছিল, মাথার চুল-গুলা সব দাঁড়িয়ে উঠেছিল। তার খুব জোরে জোরে নিশ্বাস

বেশ অস্বস্তি করেছিল। কোন প্রকারে সেদিন সে বস্ত্রখানা একবার মাত্র দেখে তখন নামিয়ে বেখে

দিয়েছিল ? আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, দাছ তোর পছন্দ হয় ? সে আমার মুখের উপর তার জিজ্ঞাসা নয়

স্থাপন করিয়া তখনই কি ভাবিয়া অপসারিত করিয়া উত্তর করিয়াছিল “আমি বেগে আমাদের মা হোক একটা কিছু

হলেই হলো। ভাল মন্দ বিচার করবার ভার তাদের হাজার অর্থ থাকে, ঐশ্বর্য থাকে, যারা বড় মাংস, স্হরে

বাস করে।”

আমি এবার যেন একটুখানি সাহস ও অবসর পাইয়া খুব হতজ করিয়া বলিলাম “এটা তোর ঠিক উত্তর হলো না দাছ ?

আমার কথাই দাছ চমকিয়া উঠিল। আমার দিকে চাহিয়া বলিল “কেন হলো না রে মহয়া ?”

“হলো নাই ভ। তুই কি না বললি যে, ভাল মন্দ বিচার করার ভার কিনা বড়লোকদের। তাদের যদি

সে শক্তি থাকে, আমাদের নাই কেন ?”

দাছ গভীরভাবেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল “এই সহজ কথাটা আর বুঝতে পারলি না মহয়া !

তুই দেখেচি আঁজ কাল.....তারপর বড় চুপ করিয়া লে দেবিয়া আমি ভাড়াভাড়ি বলিমা উঠিলাম “দাছ !

আজ কাল দেখছি তুই আমাকে আর তেমন ভাল-বাসিস না। সব কথাই আঁখানিা বলে খেয়ে বাস, কেন

বল দেখি ? তোর হয়েছে কি ?” সে এবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “আমার ত কিছু

হয় নি, তোর মনের খেপে হয় কোনকণ পরিবর্তন হয়েছে।”

তোর ভুল ধারণা। ভাল মন্দ বিচার কেবল বড় লোকের একচেটে সম্পত্তি নয় দাছ। বড় লোক যদি

অন্ধ হয় তথাপি তার কি সে শক্তি থাকতে পারে ? বড় লোকেরও যেমন ছুটি চোখ আছে ভগবান পরীকষের

তেননি ছুটি চোখ ঐ একই কাজের জন্ত দিয়েছেন। ‘তার মধ্যে তিনি কিছুমাত্র পার্থক্য রাখেন না।’



তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহার অস্ত্রের মধ্যে কি ভয়ানক দৃশ্যই না চলিতেছে। বেদের কঠিন অস্ত্র বোধ হয় সে বেদনা, আর সংখ্যের নিবিড় বেটেনে বাধিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সে যে কি করিবে, কোনপথে চলিবে তাহার কিছুই নির্দেশ করিতে পারিতেছিল না। রাহুর এই বেদনা-ভার-পীড়িত নিরুপায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া অশ্রুস্রবণ করিতে পারিলাম না। তার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিলাম, “রাহু! অমন হত্যা ভাবে কি ভাবছিস? আমার মৃত্যু না হলে দেখছি তোর বুক বগসে শান্তি নাই। বলিছা আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। এবার রাহুর ঘেরায় বাধ বেহের পীড়নে ভর হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইল। ধীরে ধীরে আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। অত্যন্ত স্নেহভরে ডাকিল “মহা! তুই আমাকে সত্য সত্যই জয়হীন জন্ম মনে করছিস? আমি বেহের হ'লেও যে তোরা অন্যাবিল বেহের নিকট বাধা পড়ে আছি তাকি তুই বুকতে পারিস নি? তোর শুভ চেষ্টাই ত আমাকে বেদের গড়ের সীমানা থেকে টেনে বাহিরে এনে ফেলেছে। নইলে এমন কেউ আছে—যে সমীরের এই ক্ষুদ্র হুতীরের মধ্যে গা দিতে সাহস করে? এখানে এর চেয়ে বড় দুঃখ তোরা রাহুর আশ্রয় কি হতে পারে মহা?”

আমি বলিলাম “রাহু! আমাকে বুঝিয়ে দাও যদি এমন কোন কাজ করে থাকি যাতে করে তোমার অপমান হয়েছে।

রাহু, আমার কথা শুনে যেন বোধ হইল অনেকটা প্রকৃতি হইল। তারপর আমার হাত দুখানি তার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল “দেখ মহা! আমরা গরীব লোক! হুঁড়ে ঘরে বাস করি। আমাদের ঘরে যদি বড়লোকের ছেলেরা আসা যাওয়া করে, সেটা কি বাহির হুঁতে ভাল দেখায়। আমি পদাহত। কনিষ্ঠের মত লাফাইয়া উঠিলাম। উত্তর করিলাম,—রাহু—তুই কি বলিস? তোরা কি মাথা ব্যাগণ হয়ে গিয়েছে? যদি বড় লোকের প্রয়োজন থাকে তা'হ'লে সে পরীষের বাড়ী আসতে পারবে না। এ তোরা কেমন কথা ছি। তুই কি মনে করছিস? ছি।

রাহু সেদিন কোনপ্রকারে যদিও সামলাইয়া লইয়া-

ছিল। কিন্তু তাহার অন্তরাকাশ নিবিড় কালমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। বাহিরে সে আর কোন প্রতিবাদ করিল না। বুঝিলাম, ফল ভাল হইল না। তার মনে যে সন্দেহ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে তাহা সে নিশ্চয় একদিন না একদিন—সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার স্বযোগ অস্বপ্নান করিবে।

আজ এই পাহাড়ে তার সে স্বযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার জন্ত তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে কিন্তু জানিতে পারে নাই, যে আমি জানিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছি।

রাহু আজ আমাকে গোটা কতক গাছ চিনাইয়া দিবার জন্ত লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু প্রবেশেরা যে এখানে আসিবে তাহা কি সে পূর্বে হইতে অবগত ছিল। কিই বা বুঝিতে পারিতেছি না! সে কি কোন প্রকার কৌশল করিয়া ইহাদের এখানে আনাইয়াছিল? মহা! নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিল। সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া আজ লতিকাসের নিকট হইতে আত্ম-গোপন করিয়াছে। কিন্তু এই আত্ম-গোপন করিতে তাহার জয় যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা সে ভিন্ন আর কেহ বোধ হয় জানিতে পারিল না।

কিছু দূর আসিয়া সমীর জিজ্ঞাসা করিল “মহা! তোরা মনটা যেন আজ খুব ভারী বলে মনে হচ্ছে।”

তখন প্রবেশদের গাড়ী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। মহা! বলিল কৈ না। তুই যে নৃতন ছুটা গুণ্ডু শিথিয়ে দিলি তাই ভাবছি। আর রাহু মাছ মরে গেলেও এই গাছের রস দিলে বেঁচে উঠবে?”

“নিশ্চয়। পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করিস, আমি তোকে দেখিয়ে দেবো।”

আজ রাহু আজ ছু—ছুবার তোর শিকার ব্যর্থ করে দিয়েছি। সেজন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে—কিছু মনে করিসনি।

সমীর একথা শুনিয়া মনে মনে প্রসন্ন হইল, ভাবিল তবে মহা! প্রবেশদের বিধর কিছু জানতে পারে নাই। তারপর সেটা যে ব্যর্থ হইল, শিকার হাতের ভিতর হইতে পলাইল সেজন্য একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে গৃহে ফিরিল।

( ক্রমশঃ )



গত রবিবার ‘হরতাল’ নিরুপদ্রবে অস্বস্তি হইয়াছিল সমস্ত বাস-অধিকারীগণ ঐ দিন বাস চালানো বন্ধ রাখায় হরতালের ব্যাপকত্ব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ড্রাম অবশ্য চলিয়াছিল, এবং ঐ দিনেই ট্রামের অপেক্ষে ভাড়া কমিবার বিজ্ঞাপন দেখা গেল কিন্তু বাস না চলা সত্ত্বেও ট্রামের আরোহীর সংখ্যা বেশী ছিল না। দোকান পাট অধিকাংশই বন্ধ ছিল তবে হিন্দুস্থানীদের পান-সরবতের দোকান ও কয়েকটা মূলমানের জুতাঝামার দোকান খোলা ছিল। এ শ্রেণীর অর্থালোপুণ পণের নিকট এ সব ব্যাপারে সহ্যসহ্যুত না পাইবারই কথা। তার উপর আজকাল যে সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন কার্যে ঐক্যতা প্রদর্শন করা ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিবে। এতৎসত্ত্বেও এই হরতাল দ্বারা অধিকাংশ কলিকাতা বাসীর মনোভাব যে প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তরুণ-কথা-সাহিত্যিক ত্রৈলোক্য হুসুমার ভাড়ুরী অকাল মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। নবযুগের পটীকবর্ণের তাহার রচনা পাঠের স্বযোগ কয়েকবার হইয়াছিল। এই শাস্ত্র স্বপ্নন তরুণ-সাহিত্য-সেবী, বিনয় মন মধুর ব্যংগহারে অনেকেরই প্রিয় ছিলেন। জীবিত থাকিলে কালে তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

ইন্দোরেয়ার মহারাষ্ট্রা গোষ্ঠার বাহাদুর গরী ত্যাগ করাই সাব্যস্ত করিয়াছেন; কমিশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। একদিক বিদ্যা ইহা অনেকটা ভাল হইল কারণ অস্বপ্নান সমিতির কার্য চলিলে কত

কি রহস্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িত তাহা কে বলিতে পারে!”

সিমলা হুলী হত্যার মামলার রাহু বাহির হইয়াছে আসামী এচ ম্যানেসল প্রেডেল সাহেবের প্রতি ১৮ মাসের কারাবন্ড এবং চার হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। তদ্বশে দুই হাজার টাকার উপসহ্য হুলীর বিবরণ পত্নী পাইবে। আখ্যায়িক সেশন জজ লে: কর্বেল নলিস সাহেবের এই নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা আমরা তাহাকে ধর্ম-বাদ রিতেছি। ভারতে বৃষ্টি জাতীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা রাখিবার একমাত্র উপায়—অনুগত বিচার। দেশে যে অশান্তি ও কোলাহল উঠে তাহার মূল কারণ স্ববিচারের অভাব। আশা করি অপরূপ ইংল্যান্ড বিচারকগণ নলিস সাহেবের বিচারের এই অত্যাশ্চর্য আদর্শ গ্রহণে অতঃপর বিচার-কার্য সমাধা করিবেন—তাহা হইলে ভারতবাসীর মনও যে তাহাদের প্রতি অধরুহ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথম আমরা অনেকটা আশাবিত হইয়াছিলাম কিন্তু এখন উহার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আশার সে কণি রশ্মি টুহুও নিবিয়া যায় দেখিতেছি। নৌ-বাহিনীর লব্ধ হইবে ভারতবাসী—সে তো হইবেই—কারণ এত সস্তায় শালা লব্ধ পাওয়া যাইবে না। বৎসরে মাত্র একজন ভারত-বাসী (তাঁহাও যদি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়) সামরিক বিভাগে শিক্ষানবিশী করিবার স্বযোগ পাইবেন—তাহা হইলে ভারতবাসীর টাকার শ্রাব্য কতিপয় এ বাহিনী স্বল্পনে লাভ কি? লাভ অবশ্য আছে, তবে সেটা ভারতবাসীর নহে—ভারতীয় অর্থে যে তাহা প্রতিপালন নামক মহা



পূণ্যার্থ সাধিত হইবে আর হইবে বুটেনের ঐকান্তিক কামনা "সিঁপাপুর নৌ-কেন্দ্রের" পুষ্টি সাধনা। পরের মাধ্যম কেমন করিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে হয় সে বিষয় বুটিন জাতি চিরদিনই উত্তমরূপে জ্ঞানেন। তবে 'ভারতীয়' এই নামটা থাকিবে এবং বুটেনের স্বেত পতাকা এই নৌ বাহিনী উড়াইতে পারিবে—কিন্তু ইহাতে ভারত-বাসীর কি লাভ?

নুতন বড়লাটের সঙ্গে সঙ্গে এবার ভারতে এক কুব্জ কমিশনও আসিতেছে। ভারতের টাকার যে মোটা বরস করিয়া কয়েকবার কয়েকটি কমিশন বসানো হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের বার্ষিক দিকে তাঁহারা অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কোন কমিশনের উপরেই এই কারণে এক্ষণে ভারতীয়েরা আর আশা স্থাপন করিতে পারে না। ইহাতে কয়েকজন স্বেচ্ছা সিভিলিয়ানের বড় বড় চাকরি মিলিবে, অনেক এন্ট্রিমেট ইত্যাদি হইবে, তাহার পর—অপরূপ কমিশনের যে দশা তাহাই ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অবশ্য একটি কুব্জকমিশনের আবশ্যকতা এদেশে আছে। কিন্তু তাহার জ্ঞান গোঁয়ার প্রভৃদের মুখপানে চাহিয়া থাকিলে ইহা কোনকালেই উত্তর কার্যকরী হইবে না। কুব্জকমিশন স্থাপিত হইলে যাহাতে তাহার ভিতর দেশের লোকের প্রভাব থাকে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আগামী গ্রীষ্মে ফরাসীরা নাকি একবার গৌরী-শবর শূণ্য আরোহণের চেষ্টা করিবেন। গত দুইবারে ইংল্যান্ডের হিমালয় শূণ্য অভিযান করিয়া বিফলমনোবর হইয়াছেন। শূণ্য আরোহণ করিতে পারিলে এবার তথায় ফরাসী পতাকা স্থাপন করা হইবে। বিশেষীরা বায়ব্যার বিফলমনোবর হইয়াও যে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতেছেন না, তাহাদের দৃষ্টান্তেই অসুপ্রাপ্ত হইয়া একবার দেশীয়েরাই সে বিষয়ে উদ্বেগী হউন না কেন—এ সে অভিযান হয়তো সফল হইতেও পারে, অন্ততঃ এই অসমসাহসের কথাটাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্নপ্রদেশের জীৱনদের লইয়া একটি ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল। ইহার আলোচনার বিষয় ছিল প্রাচ্যদেশে পুরাণে জীৱৎ প্রচারা করা। জগতের বিভিন্ন দেশে কিরূপ পণ্ডিতে জীৱৎ প্রচার হইয়াছে, তাহার বিবরণী ইহাতে পঠিত হইয়াছে এবং অর্থ-সাধ্যা পাইলে উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ভারতীয় জীৱনদের সংখ্যা বর্তমানে চারিলাক পঞ্চাশ হাজার। ইহাদের শতভাগ আশিজন পূর্বে হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল। কি কারণে তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর এ দেশের ধর্মনেতাদের আছে কি? এ বিষয়ে লালা লারপত রায় সম্প্রতি আলিগড়ে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা প্রশ্রিয়নযোগ্য। কতজন দেশীয় লোক জীৱৎ গ্রহণ করিল তাহার হিসাব বিতরণ হইয়া গেল কিন্তু কতজন ভিন্নধর্মাবলম্বী হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হইয়াছে তাহার মোট হিসাব আজ পর্য্যন্ত কি পাওয়া গিয়াছে? ইহার জ্ঞান বন্ধও বিরাটভাবে চেষ্টাও হয় নাই। নেতা-গণ তাহাদের অগণ্ড বিরাট ধর্মের স্বায়িত্ব সংরক্ষণ নিশ্চিত হইয়া নিভা যাইতেছেন। এ ভাঙনের সবাব উত্তার বড় একটা রাখেন না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁহারা দেখে খুলিয়া দেখিবেন কি সর্বনাশই না হইয়া গিয়াছে! তখন যাইতেছে বাকী শ্রদ্ধাশ্রম এই কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! তাঁহার চেষ্টা সফল হউক।

লণ্ডনের পোষ্ট অফিস সমূহ হইতে চিঠিপত্র ও পার্সেল চলাচলের জ্ঞান আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে মাস্টার নৌতে একটি টিউব রেলপথে স্থাপিত হইতেছে। নয় মিট ব্যাস-বিশিষ্ট একটি স্বল্পবোর ভিতর এই রেল বসানো থাকিবে, ইহার সহিত লণ্ডনের সমস্ত পোষ্ট অফিসের যোগাযোগ থাকিবে। ট্রেণগুলি আপনা আপনি চলিবে এবং তাহাদের গতি হইবে প্রতি ঘণ্টা ৩৫ মাইল। ইহার জ্ঞান ১৩ ফিট ৯ ইঞ্চ লম্বা ২০ বার্নি নির্মিত হইবে। ইহা সমাপ্ত হইলে লণ্ডনের সর্বত্র সড়ক ডাকবিলির যথেষ্ট সুবিধা হইবে। আর এদেশের ডাক বিভাগের কর্তারা বিভাগীয় বায় বাড়াইতেছেন অথচ তাহাদের কোন সুবিধা দেখা যাইতেছে না।

এখেন হইতে একটি ববর পাওয়া গিয়াছে যে সেখানে চতুর্দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বিবাহিত, সুমারী—সকল মেয়েদেরই পোষাকের মূল নিয়ন্ত্রিত করিবার জ্ঞান একটা আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। ইহার ফলে নারীদের পরিহিত ব্রাসের উচ্চতা ভূমি হইতে পনেরো ইঞ্চির অধিক হইতে পারিবে না।—ইহার জ্ঞান দুইজন নারী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন—আইন অমাত্যের শাস্তিও একটু বিচিত্র রকমের; কৃত্রিম অপরূপের জ্ঞান পিতা দারী, এবং ক্রুর অপরূপের জ্ঞান বামীকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

ঘিঘেটোর হইতে এবার যে প্রমোদকর আদায় হইল আগামী ১লা এপ্রিল হইতে দুই বৎসরের জ্ঞান উত্তর স্থগিত রহিল। সিনেমা প্রভৃতির কর পূর্ববৎ রহিয়া গেল। সিনেমা অপেক্ষা ঘিঘেটোরের পরিচালন ব্যয় অনেক বেশী বলিয়া ও উহাতে লাভ অপেক্ষাকৃত কম হয়। তজ্জন্তই বোধ হয় কেবল ঘিঘেটোরওয়ালারা হেঁচাই পাইলেন—কিন্তু কর বাস্তবিক কে বেধে? সিনেমার কর্তৃপক্ষেরা ত উহা দর্শকের নিকট হইতে আদায় করেন স্বতরাং এ কর থাকা না থাকায়, তাহাদের কি সত্যই বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে। বোধ হয় না—হিসাব মত মেয় কর সিনেমা কর্তৃপক্ষেরই দেওয়া উচিত—দর্শকবৃন্দ কি এ সংঘর্ষে সিনেমা কোম্পানীদের বাধ্য করিতে পারেন না।

যাহা হউক এই কর স্থগিত করািবার জ্ঞান কাউন্সিলের যে সকল সভ্যরা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারা যে নাট্যমোদীরা মাঝেই ধর্মব্রত ভাঙন তাহাতে সন্দেহ নাই, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের ত বটেই। আর গণমেটও যে সাধারণের এই ভ্রান্ত সত্য দাবী গ্রাহ্য করিয়া কর্মস্রাজ, ক্ষুণ্ণকান্তর বাঙালীদের নির্ভাব্যায় একটু আশ্রয় প্রদান উপভোগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন সে জ্ঞানও গণমেটকে আমরা বাঙালার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ ও নাট্যমোদী দর্শক-

বৃন্দের তরফ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা আশা করি যে ইহার পুনঃ প্রবর্তন যেন আর করিতে না হয়, কারণ মৃত্তিকা এই আনন্দের মাঝেও দুই বৎসরের জ্ঞান কথাটি আবার একটা বিভীষিকার আবছায়া রাখিয়াছে।

বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান প্রথাটা শ্রম আবরত রহিবেন পছন্দ নহে—না ইহারাই কথা তাহার ঘাড়ে যে সাম্প্রদায়িকতার ভুড়তি চাপিয়া আছে সে কিছুতেই ইহা বরাদ্দ করিতে পারিবে না। এ দিকে গুরু যে শ্রম আবরতই নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভাইল চ্যামেলার। আমাদের আশা হয়, শ্রম আন্তরিকতার প্রাপণ ব্যাপী প্রমোদের কলপাছে এই মেদিনী পুরের নাইটের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্রম আশ্বাস ভুলিয়া গিয়াছেন যে ধর্ম তিনি বাহাই হউন তিনি বাঙালী। বাংলার মুসলমান, খ্রিস্টান বা হিন্দু সকলেরই ভাষা বাংলা—সেই বাংলা ভাষাকে খাটো করিবার চেষ্টা করিলে তাহার মহজ্বলও খাটো হইয়া যাইবে। সাম্প্রদায়িকতা মাঝের দূরদৃষ্টিকে আশ্রয় রকমে ব্যাহত করে!

এবার বাঙালী ঘাটতি নাই—তথাপি ব্যয় বৃদ্ধির অজু-হাতে থাম পোষ্টকার্ড প্রভৃতি দরিদ্রের অপরিস্রব পার্শ্ব গুলির দাম কমান হইল না। পোষ্টকিন্সের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু তাহার কার্যপ্রণালী পূর্ণাঙ্গপেক্ষা যে অনেকটা অবনত হইয়া গিয়াছে একথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি স্বতরাং এ অথবা ব্যয় বাহুল্যের কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা চলে না এবং তজ্জন্ত অনসাধারণ যে কেন চিরদিন উচ্চমূল্য দিতে বাধ্য হইবে তাহারও কারণ বোঝা যায় না। বিলাতের পোষ্টকিন্সের খরচ এখনকার হিসাবে কম নহে—বরং বেশী, সেখানে যদি পোষ্টমেনের মূল্য কমান সম্ভব হইয়া থাকে তবে এদেশে তাহা হইবে না কেন?



# বঙ্গালয়

মিনার্ভা সম্প্রদায় রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের রচিত একখানি পৌরাণিক নাটক ও একখানি প্রহসন অভিনয় করিবার স্বল্প সংগ্রহ করিয়াছেন; এ উদ্ভোগ যে বিশেষরূপ প্রশংসনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। পৌরাণিক নাটকখানির নাম "বাজসেনী" আর প্রহসন-খানির নাম "বাপিকা-বিদ্যা"। বহুদিন পরে অমৃতলালের নাটক ও প্রহসন যে বাঙ্গালী দর্শকেরা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। হাস্যরসের পর ভূপেনবাবুর জোর-বরং ও রুস্তান্তের বহুদর্শন ছাড়া কোন ভাল প্রহসন অভিনীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মিনার্ভা সম্প্রদায়ের বর্তমান অভিনেতৃগণ প্রহসন ও গীতিনাট্য প্রভৃতির অভিনয়ে যে হুনিপূর্ণ তাহাও স্ববিদিত—সুতরাং এই নাটক ও প্রহসনের অভিনয়ে সাফল্য যে হুনিপূর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

হাস্যরসি অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীর পরলোকগমন সংবাদ শুনে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। হাস্যরসের অভিনয়ে তাহার যথেষ্ট স্থান ছিল, এবং এককালে বাঙ্গালার দর্শক-বৃন্দ তাহার অভিনয় যথেষ্ট উপভোগ করিতেন। শেষ জীবনে তিনি ম্যাভান কোম্পানীর চলচ্চিত্র অভিনয় করিতেন এবং তাহাতেও যথেষ্ট রুচিকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন এই চিত্রাভিনয়েই তাহার শেষ স্মৃতি বিজ্ঞান রহিল। আমরা তাহার পরলোকে আত্মার শান্তি কামনা করি।

মিঃ-থিয়েটার কোম্পানী বহু নূতন নূতন অভিনেতার নামে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—তন্মধ্যে অনেকেই সৌখীন সম্প্রদায়ে এতদিন অভিনয় করিতছিলেন। নামজাদা অভিনয় অল্প রকমের হইতে ভাঙ্গিয়া লগ্ন্যর চেয়ে এইভাবে নূতন অভিনেতাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা মিঃ থিয়েটারের উদ্ভোক্তাদের এই সাধু আয়াসের জন্য প্রশংসা করি। বিজ্ঞাপনের দিক দিয়াও তাহাদের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ।

বিগত বৃহস্পতিবার (২৫শে ফেব্রুয়ারী) অ্যালফ্রেড রসমকে বীরভূমের অতুল শিবরায় বর্দক চিরজুয়ার সভার অভিনয় দেখিতে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। মঞ্চস্থলের একটি সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে কলিকাতায় আনিয়া সাধারণ রসমকে অভিনয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—তবে ইহাদের কল্যাণ নির্মলশিব বাবু একজন নাট্যকার, এবং নাট্য রসিক; নাটক ও অভিনয়ের প্রতি ইহার অস্বাভাব্য অপরিণীম; তত্ত্বগরি তিনি একজন ধনী জমীদার কাছেই এই অর্থটন সংগৃহীত হইয়াছিল।

অভিনয় মোটামুটি ভাল হইয়াছিল এবং সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে মন্দ হয় নাই। তন্মধ্যে নূতনত্ব দেখিলাম বিনিমের ভূমিকার সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ে। নির্মলশিব বাবু নিজে চন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—অভিনয়ও বেশ হইয়াছিল তবে বিশেষ নূতনত্ব কিছু ছিল না—এবং অশীল বাবুর চন্দ্রের ভূমিকা অভিনয়ের পর তাহা হওয়াও একপ্রকার অসম্ভব।

সুখীন পুর চট্টার চরিত্র যখন অভিনেতাধর সাধারণ রসমকের আদর্শ হইতে একটু বৈচিত্র্য ছিল এবং সেটুকু উপভোগ্য হইয়াছিল। অক্ষয় চরিত্রের অভিনেতা, চরিত্রের মধ্যমা অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়াছিলেন; তিনি হাস্যরস বেশী মাত্রায় ফুটাইতে গিয়া তাহাকে অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রী ভূমিকায় প্রশংসাযোগ্য কিছু দেখিলাম না—বিশেষতঃ পুরবালা ও তাহার মাতা—এ দুই ভূমিকাকে মানানের দিকিয়া একবারে জ্বাই করা হইয়াছিল। নীরবালার গানগুলি মন্দ হয় নাই। তবে ইহার মধ্যে ২১ জন অভিনেতা কলিকাতার অবধারী এবং 'চেনা-মুখ' বহিরা যোগ্য হইল।



বিতীয় বর্ষ ] ২৮শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩২, ইং ১৩ই মার্চ ১৯২৬ [ ৩০শ সংখ্যা

## বিরহিণী

মুরারীমোহন দাস

গগো বিরহিণী,—

কহ এই ফাল্গুনের বেলা  
একান্তে একেলা

সীমাহীন—শব্দহীন প্রান্তরের পরে

কর তরে—

বসে থাক ছড়াইয়া কঠোর বিশ্বয়—  
স্বপ্নময় ?

সহসা চমকি উঠি—ভ্রাম্যকল হানি

বক্ষ্যাপরে দাও টানি !

তার পর শিমুলের গুঁড়ার পুটে

ধীরে—ধীরে ফুটে উঠে

প্রজ্বর কি হাসির উল্লাস ;

সরমের কলিত নিশাস—

আলোড়িয়া তুলে বুক অশোক কাননে,

শুধু অকারণে

চেয়ে থাক দিগন্তের পানে

যেইখানে—

মুছে যায় দিনান্তের আশ্র শেখ লেখা

স্পর্শহীন স্বর্ণের রেখা !

অতৃপ্ত নয়নে—

নিমেষে উছলি উঠে চপল স্পন্দনে

যৌবনের উদ্ভাস হিলোল,

আছাড়ি আছাড়ি পড়ে

অশ্রু তটে তটে ফেনারিত রূপের কল্লোল !

তারপর, ভেঙে যায় দোণার স্বপন !

নিঃশিয়া গুলে ফেল ফুল আভরণ,

দূর কর করবীর মঞ্জরী বিলাস,

কঁধে ওঠে সাগরের বিফল উল্লাস ;

উড়ে পড়ে কাশ বনে রক্ত চুলগুলি,

জালি বহি—গায়ে মাখি ধূলি—

ওই দূরে, চক্ৰবাল পরে

গিয়ে বস মহা মৌন অবসার ভরে

—কঠোর যোগিনী,

কেন বল যে মোনোমহিনি ?

তারপর—কেবা জানে কিসের কারণ

কোণা যায় কঠোরতা—সে তপঃসাধন ;

বেদনায় সিক্তছায়া ঘনাইয়া আসে—

আননে—নয়নে—তারিগাশে ;  
উদ্বেল—অধীর !



দ্বীপে টুটে অভিমান !

বিধুর নয়ন হের অবসান !

ভেসে যেতে আলোকের সনে,—

স্নাত্ত নয়ন কোণে

বৃষ্টি পড়ে ধরা অসীম সোহাগ ভরা

দহিতের একটা ইঙ্গিত ;—

পিংহরিয়া ফুটে উঠে অমৃত সঙ্গীত ;

বেগে গুঠে বাঁগা—

আন্তহীনী !

তন্ময় আলোকের মাঝে নিতুই নিশায়

কার প্রতীক্ষায়

বসে থাক নিরন্তর ধারে শিলা তলে

দু'পাশের তরলতা দলে

বয়ে যায় মর্মরিয়া প্রভাত সন্ধ্যা ;—

মুচুকি চাহিয়া রেখ সংসমে অধীর ;

জাগরণ-স্নাত্ত আঁখি—দ্রুত কেশভার ;

বল—সে গো কার অভিসার ?

দিনে দিনে দেখি চাক সন্কেচের মায়া ;—

ঢাক ওই যৌবনের পরিপুষ্ট কায়া

শিশির-ধূসর বাসে ;

তার পর আসে—

একদিন,

পড়ে থাক এক কোণে অচল, অটল,—স্পন্দহীন,

প্রথম প্রণয়াযাতে কিশোরীর মত

লজ্জা-নিত !

কোন সেই স্বপ্ননের আদি যুগ হ'তে

এমনি বল না—

মিলনের অশান্ত বাসনা

গুমরি মরিছে বৃকে

বার্ণভার দুখে ?

কতু কি গো হবে অবসান এই অভিসার ?

পাবে কারো দরশন—

হবে তৃপ্তি—অনন্ত তৃষার ?

থেকে যাবে সব হাসি

বেধনার অক্ষ রাশি

ঘটাইবে অনন্ত গ্লান,

স্নানিয়ায় ছেয়ে যাবে দূর দিগন্ত,

মুছে যাবে আলোকের মুগ্ধ স্রিত রেখা

—সেই দিন হবে দেখা !

নাহি হবে কালের শাসন,

থেকে যাবে সকল স্পন্দন,

বৃকে বৃকে—মুখে মুখে—নয়নে নয়নে—

ঘিরে যবে শুভ চির নিবিড় মিলন !

## পরীক্ষার পর

এই লম্বা ছুটিতে কি করবেন ?

নিজের গ্রামে যান, গিয়ে—মাতুলদেরকে সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রামের উন্নতির জন্য পল্লী-সংস্কার কাজ আরম্ভ করে দিন, চার মাস ত ছুটি ? এ চার মাস অন্তত—

(১) এটা পুস্তক পরিকার করে পানীয়জলের অভাব দূর করুন। (২) এটা দেশ ও দিবা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করুন। (৩) এটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করুন। (৪) চরকা ও খন্দর প্রচলন করুন। (৫) একটা ব্রতীদল সংগঠন করুন। (৬) ঘন ঘন সভা সমিতি এবং দেশশোভা করে সম্বন্ধভাবে কাজ করার প্রবৃত্তি এবং আত্মশুদ্ধিতে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করুন।

(৭) ধর্মগোলা স্থাপন করুন। (৮) দেশী জিনিষের দোকান খুলে গ্রামে দেশী প্রচলনের চেষ্টা করুন। গ্রামই জাতির দেহকণ্ড—গ্রামকে বাচানই জাতিকে বাচান। নিজের গ্রাম নিজেরই গড় ভুলতে হবে। বিদেশী ভরসার থাকলে চলবে না। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য কর্তৃতে প্রস্তুত আছি।

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার ধনভাণ্ডার

এনং সমবায় ম্যানসন, কলিকাতা।

## বাংলার জীবন সমস্ত।

বাংলাদেশে জাতিভেদের সমস্ত, আন্তর্জাতিক বিবাহ সমস্ত, বিধবা-বিবাহ সমস্ত, শিক্ষা-সমস্ত, নারী সমস্ত প্রভৃতি বহিঃ সমস্ত লইয়াই সকলে মাথা ঘামাইতেছেন—তদুপরী জাতীয় স্বাধীনতা বনাম রাজনৈতিক সমস্ত তে। আছে—কিন্তু আসল সমস্তার দিকে মনোযোগ দিয়ার মত মনের সন্ধান যে পাওয়া যাইতেছে না—সে দিকে কিন্তু কাহারও লক্ষ্য নাই।

কুশল প্রদ্বের উত্তরে লোকে পরিহাস করিয়া যে বলে “আছি তো ভাল তবে যা দুঃখ অমরতের” কথাটা পরিসারের আবরণে মর্মান্তিক ছাপেরই কথা। বাস্তবিক বাঙালীর জীবনে আর সমস্তা ছাড়া আর সমস্তা নাই। তাই তাই—তাহা কেহই ভাবেন না—ইচ্ছা করিয়াই ভাবেন না কারণ এ সমস্তার সমাধান আছে কৃষি কার্খ। আর এই কৃষিকর্ম করিতে আন্তর্জাতিক বাঙালী একান্ত পরাশ্রয়। যে কার্খ ৫০ বৎসর পূর্বেও বাঙালীর আত্মমানে আঘাত করে নাই আজ সে কাজ করিতে বাঙালী সক্ষম। বাঙালীর মনের এ পরিবর্তনের কারণ কি ? হঠাৎ কি কারণে ‘কৃষি’ আজ এত অপমান জনক কার্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। আমার বোধ হয় বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশীয় জাতীর ব্যবহারের অশুভ্রণ করিতে গিয়া বাঙালীর মনের ধারা এইভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সাহেবেরা এ দেশে যেমন ফিটকাট থাকে, আমরাও সেইরূপ থাকিতে চাই ; তাহার কারণ এ দেশে সব কাজই চাকর-বাকরের দ্বারা করা হয়। লম্বা আমরাও তেমনি করা ইয়া লইতে চাই,—সেই লজ্জাই আমরা নিজেরা হাতে কাজ করা একবারে ছাড়িয়া দিয়াছি ; ফলে উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আমাদের বাঙালীর সংসারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সাহেবেরা আঁকাখাশি এ দেশে ব্যবসা করেন আমরা তাহা করি না—এবং মূল্যবোধের অভাবই তাহার মূল কারণ বলিয়া পরকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করি এবং নিজেকেও বোকা বোকাইয়া রাখি। কারণ ব্যবসা

করিতে যাইলেও আমরা একবারে তাহাদের মতন আঁকি সাঝাইয়া বসিতে চাই। মারবাজী বা ভাটয়া ব্যবসারীরা ব্যবসার ক্ষমতা আরম্ভ হইতে বিত্তি চক্ষের উপর নিতা দেখিলেও সেদিকে আমরা দেখি না—কারণ সে ব্যবসারে কষ্ট-সহিষ্ণুতার আবশ্যক, তাহাতে বিলাসিতার কোন স্থান নাই। আমরা বাবু সাজিয়া নিম্নলিখিত মোটা লাভ পাইলে ব্যবসা করিতে পারি। মোটা কথা বাবুদানা ও বিলাসিতার বিষ আমাদের পরীয়ে এমন ভাবে মিশিয়াছে—সজ্জার সহিত এমন নিবিড় ভাবে সঞ্চিত হইয়াছে যে এ সব ভাগ করিয়া আমরা স্বর্গে যাইতেও প্রস্তুত নহি। অধিঃ অসহযোগ আন্দোলন ভারতে যে হারী হইল না তাহার মূল কারণও এই বিলাসিতা। বিলাসী বাবু চরকা ঘুঁরাইয়া তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে পারেন না—বিলাসীর কোমল কোমরে কণ খন্দর পীড়া দেয়—আর তাগ, সে তো বিলাস-নীতির ধারা বিগলিত। বিনা ভাগে, বিনা আদ্যে কেবল বক্তৃতার দ্বারা যদি স্বরাজ পাওয়া যাইত তবে অবশ্য সকলেই স্বরাজ চাহিতেন—কিন্তু বাবুদানা ছাড়িয়া, বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া—কোন বিষয়ে—তাহা দেশের লজ্জাই হউক বা দেশের লজ্জাই হউক—স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যদি স্বরাজ লইতে হয় তবে সে স্বরাজ লইবার প্রাণী বুজিয়া পাওয়া সম্ভব হইবে।

যে কোন জাতিকে বাঁচিতে হইলে তাহার কৃষি ও শিল্পকে উন্নত করিতে হইবে—না করিলে সে জাতির ক্ষণে অনিবার্য। জগৎ পতিশীল, প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়ী ; তাহার মাঝে মানবও নিকট থাকিতে পারে না—হয় তাহারকে যুগের গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে আর নয় পিছাইয়া ক্ষণের অন্ধকার গলরে পড়িয়া যাইতে হইবে—বাহু দুটির মত জগতের পতিপথে কোথাও কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে গাঁড়াইয়া থাকিবার আর স্থান নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের ও ধর্মের নোহাই দিয়া আমরা এতদিন যে ভাবে বাঁচিয়া আসিতেছি



তাহা প্রকৃত বাচ্য নহে তাহা সমস্ত জাতিটার ক্ষয় রোগে মৃত্যুর মত।

বাচিতে হইলে বাঙালীকে তাহার জীবনপথ নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশেষ শিক্ষা ও সভ্যতার যে টুকু আমরা লইয়াছি তাহা যে একান্ত ভুল ও অসার তাহা বৃত্তিতে হইবে সেটুকু দূরে পরিহার করিয়া তাহাদের সভ্যতার শিক্ষা, সভ্যতার জ্ঞান ও সভ্যতার সভ্যতা শিখিতে হইবে; তাহাকে ভারতীয় শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতার বহু পথে ঘনিষ্ঠ উভয়ের সংমিশ্রণে নতুন কর্তব্য, নতুন জীবনযাত্রা গড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমান যুগ ভৈরব কণ্ঠে হাকিতেছে "সম্ভবতঃ হও—নতুবা মর" জগতে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে—সকল জাতিই চেষ্টা করিতেছে অজ্ঞ জাতিকে ধনে মানে সাময়িক উপকরণে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানে ছাড়াইয়া যাইতে কিন্তু আমরা কি করিতেছি—দশভাষা পাঠ্যের আশ্রয় করিতেছি—বাংলাদেশে বা খিড়োয়ার দেখিতেছি, হ'ল বা তরুণের ছ'এক বাজী তাস পাশা ইত্যাদি।

এ ভাবে চলিলে বাঙালীর কাম্যনার ধন 'স্বর্গ' যথেষ্ট হইয়া যাইবে—কাউলিলে তোমার টেবিল-বিলীপকারী বক্তৃতা কেবল সংবাদপত্রের অঙ্গ শোভা বর্ধন করিবে, তোমার মন্ত্রী স্বাধীনতার কোলাহল জগতের উপাধানের অধঃস্থ চাপা পড়িবে—তোমার শ্রমিক আন্দোলন যে কেবল কয়েকজন চতুরের মূখ্য কোপাইয়া কাউলিলে ঢুকিবার পথ করিবার চেষ্টা তাহা সকলেই জানিতে পারিবে। ধার্মাঙ্গীর দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন যদি সভ্যতার কাজ কিছু করিতে পারত তবে সামনে আসিয়া পাড়া ও নতুবা গলা ফাটাইয়া বক্তৃতা দিবার ও সাংবাদিকের বাহবা লইবার উদ্দেশ্যে যদি আইস তবে থাক—মানে মানে সরিয়া পড়।

জাতিকে বাচিতে হইলে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে—কথায় নহে কাজে, আবার লাঙ্গল ধরিতে হইবে—পারিবে কি বাঙালী? যদি পার তবে আবার তোমরা সত্যই সাক্ষ্য হইবে; নতুবা সাহেবের পরাধাত, চাকরী করিতে গিয়া যাগা বরাদ্দে সাধারণতঃ জুটে তাহাই বহু ভাগ্য মনে করি। চাকরী করিতে মানের লাগব

হয় না কিন্তু চাষ করিতে অপমান বোধ হয়—এমন বিচিত্র মান-অপমান জ্ঞান পৃথিবীর আর কোন জাতির নাই। অজুত স্থান-জ্ঞান, এই অজুত বাঙালী জাতির। পেটে কয়েকটা ইংরাজী হরক ঢুকিলে মস্তিষ্ক এতদূর গমন হইয়া পড়ে যে মানের চেষ্টাতে পা দিতেও কুন্তিত হন।

আমাদের জাতির বর্তমানে এই কয়েকটা প্রবল দোষ পাড়াইয়াছে।

(১) শ্রম-বিমুখতা। প্রকৃত বাঙালী শ্রমিক আজ-কাল আর বড় একটা নাই—পরিশ্রম করিবার কাজের জ্ঞান বাঙালী পাওয়া যায় না। এমন কি বাঙালী স্টিচাচার পর্যন্ত ভুল হইয়া আসিতেছে।

(২) বিলাসিতা—বাঙালীর মত বিলাসপ্রিয় জাতি জগতে আর আছে বলিয়া মনে হয় না।

(৩) উন্নতির চেষ্টার অভাব—একবেলা খাইতে পাইলে বাঙালী ছই বেলো খাইবার জ্ঞান পরিশ্রম করিতে চাহে না। কৃষি কার্যের উন্নতির কোন চেষ্টা হইতেছে না—কে করিবে? শিক্ত ভ্রম লোকের কৃষিকার্যের নামে শিহরিয়া উঠেন আর মূখ্য নিয়মের ক্রম সেই সনাতন পদ্ধতিতে যোগ পাবে চাষ করে—কল চাকরের মূল্য আজ দশ টাকা আর পাড়াইয়াছে—এই ভাবে কৃষিকার্যের যথি দিন দিন অবনতি ঘটে তবে আর দশ বিশ বছর পরে চাউল ১১ টাকা সের কিনিতে হইবে কিন্তু বৈদেশী টাকা কুড়িটা নিদিবার সভ্যবনা খুব বেশী। তথাপি ম্যাস্ট্রিক পাশ করিয়া "আই হ্যাভ মি অনার টু বি সার" লিখিতে শিখিতে হইবে।

অল্প বিজ্ঞা যে সভ্যই ভয়ঙ্করী তাহা আমাদের দেশে যেমন নিত্য দেখা যায় এমন একটা আর কোথাও নহে। পৃথিবীর মধ্যে কৃষি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উন্নতি করিয়াছে ডেনমার্ক কিন্তু সেই ডেনমার্কের কৃষিবিধিগণ সকলেই স্বশিক্ষিত। এ সম্বন্ধে শ্রী: Shaw Desmond বলেন "The Danish peasant is not a peasant in the English sense. He is an educated man. I have seen the works of the best English writers in the hands of diarymen and land

workers, in translation or in the original. It is the high average intelligence of the Danish land worker which has made him what he is—able to compete the World out of existence.\*

একজন দিনেমার চাষার সম্মুখে পাড়াইবার মত যোগ্যতা এ দেশের সমস্যায়া এই—এ-সি মহাশয়েরও আছে কি না সম্ভেহ! চমচা, পাম্পাশ, লতা ফুলের পাত্রাণী আর কৃষি-সুখিত কৌশল মধ্যে জাতি-পঠনের কোন বস্তু নাই। জীবন সংগ্রামে ডেনমার্ক আজ জাতিগতভাবে পরাজিত করিয়াছে—ইংরাজ তো দূরের কথা! অর্ধ পৃথিবীর অধীকার প্রবল-প্রতাপাধিত বৃটিশ জাতির মধ্যে আজ যে দুই লক্ষ বেস্কার দেখা দিয়াছে তাহার কাণ ও কৃষ্ণির প্রতি অগোষ্ঠিত। ইংরাজ ভাবিত কেবল শিল্পভাত বাণিজ্য করিয়া জগতের ধন শূন্য করিয়া আনিব—দেশকে সমৃদ্ধ করিব জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া থাকিব কিন্তু সেদিন চলিয়া গিয়াছে—ইংরাজ জাতি আজ বৃত্তিতে পরিয়াছে যে কৃষিক অবজ্ঞা করিয়া এক পারে ভর দিয়া পাড়াইতে হইয়া তাহারা কি ভুল করিয়াছে।

সেলসপের কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে "On each hundred acres of cultivated land the British farmer feeds from 45 to 50 persons. The German farmer feeds from 70 to 75 persons. The British farmer grows 11 tons of Potatoes the German farmer 35 tons. The British farmer produces 1½ tons of milk, the German farmer 28 tons." অর্থাৎ প্রত্যেক ১০০ একর জমী আবাদ করিয়া বৃটিশ কৃষক উহার উৎপন্ন দ্রব্যে গড়পড়তা ৪৫১০ জন লোকের খাদ্য উৎপন্ন করে কিন্তু এ জমিতে জার্মান চাষা ৭৫ জনের খাদ্য সংস্থান করে। বৃটিশ চাষা যেখানে ১১ টন আলু জমাাইতে পারে সেখানে জার্মান কৃষক ৩৫ টন উৎপন্ন করে। বৃটিশ চাষার যেখানে ১৭০ টন দুধ

\* London Magazine p. 385 (Vol. LV No. 180) (October 1925.)

পায় সেখানে জার্মান চাষা ২৮ টন পায়।" এ পার্থক্য টুকু বড় সোপান নয় এবং বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই সকল সম্ভব যোগ্যতা সম্ভবপর হইয়াছে কিন্তু উন্নতির চক্র তার পরেও আবার ক্রমত আবর্তিত হইয়াছে, কলে আমেরিকান চাষা আবার জার্মান চাষাকে হঠাৎই দিয়াছে কিন্তু শেষটা দিনেমার চাষাই সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। Shaw Desmond পূর্বোক্তিত প্রবন্ধের একঙ্গে লিখিয়াছেন "When I was in Denmark, leading Americans Germans, and Russians are learning from the Dane the two things in which he is admitted to lead the world: how to apply science and co-operation to the cultivation of the land, and how to build babies by securing food that is absolutely pure."

If the scientific working of the soil has been for the Dane a matter of raising the standard of life, it is for Britain a matter of life and death.

আমি যখন ডেনমার্ক ছিলাম তখন নেহু স্থানীয় আমেরিকান, জার্মান ও রাশিয়ানগণ দিনেমারদিগের নিষ্ঠে যে দুটা বিষয়ে তাহারা বর্তমান জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সে দুইটা বিষয় শিক্ষা করিতেছিলেন কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞান ও পারস্পরিক সহায়কৃতির সাহায্যে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধান করা যায় ও (৩) দেশে করিয়া কৃষিক বিষয়ক বাস্তবসরবরাহ দ্বারা স্বয়ং ও সবল শ্রম গঠন করা যায়।

কলে ডেনমার্ক কোনরূপ ভেজাল খাদ্য নাই—এ গরু বোধ হয় পৃথিবীর খুব কম সভ্য জাতিই করিতে পারে কলে ভেজালের সৃষ্টিকর্তা হইতেছে আধুনিক সভ্যতা। কৃষি, জাতির জীবনধারণের উপায়; আর স্ব স্ব সর্ব শ্রম-জাতির ভবিষ্যৎকে অনুরূপ রাবিবার উপায়। সুতরাং ডেনমার্ক রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের এই দুইটা মর্মস্থান সম্বন্ধে রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিয়া তাহাদের জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন আর বিজয়-গর্ভিত, ধন-গর্ভিত বৃটিশ জাতি পরধনে ধনী হইয়া নিজেদের



জীবনধারণের একমাত্র উপায় স্বরূপ কৃত্তিক উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে অবনতির পথে চলিতেছে। ইহা আমাদের কথা নহে, বর্তমান যুগের চিন্তাশীল ইংরাজ মাঝেই তাঁহাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ পথের উপর ধ্বংসের এই ছায়া লক্ষ্য করিয়াছেন।

খ্রিস্ট হুগুপটকীন তাঁহার সময়ে একজন কৃষিবিজ্ঞান-বিশারদ ছিলেন এবং তাঁহার মতামত সে সময় বহু মূল্যবান বলিয়া সম্মানিত হইত, তিনি বলিয়াছেন "With all waste lands and foreshores reclaimed, and with the present soil scientifically organised, England could support 100,000,000 of peoples" কিত্ত কৃষি অপেক্ষা শিল্পদ্বারা প্রযোজ্য লাভের হার অধিক বলিয়া অলোপুপ বৃষ্টিপ জাতি কৃষির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শিল্পের প্রসার করিয়াছে কিত্ত জগতে আজ, তাহার পুণ্যের চাহিদা করিয়া যাইতেছে; চীনে কমিয়াছে, ভারতে কমিয়াছে, আর অস্কাট সভ্য দেশের তো কথাই নাই—এতদিন কাকুন মূল্য কাঁচ বেচিয়া বৃষ্টিপ জাতি ভারত, রাশিয়া, ডেনমার্ক ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিত; আজ খাচ্ছে মূল্য বাড়িয়াছে এলেক তাহার শিল্পও প্রেমিকদের অথবা আবদারের চোটে মরিতে বসিয়াছে—ভারতের বাসার তাহাদের স্বাধীনতাকে ভাঙি এমনও তাহার শিল্প দূর হুঁক করিতেছে। নতুবা সমস্ত জাতিটাই আজ বেকার হইয়া পড়িত। প্রতি বৎসরে বেকার-প্রতিপাদন জন্ম ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ইংলণ্ডের রাজ কোষ হইতে যায় করিতে হইতেছে কিত্ত কতদিন এভাবে চলিতে পারে! চতুর্থ ইংরাজ কৃষিকর্ত্তব্য আজ পল্লভ করিতে হয় ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া তাহা ভ্যাগ করিয়া যাহাতে অল্প পরিশ্রমে অত্যধিক লাভ করা যায় সেই সব বিলাস প্রযোজ্য-উৎপাদকরা শিল্পের উন্নতি করিয়া নিজেও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে আজ ইংরাজ চাষার সমাজসভ্যগণও চাষকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—এই বিলাসী ইংরাজের মস্ত-শিল্প বাড়ানী যে তাহা সহজেই শিখিবে, বিশ্বব্দের আর কি আছে।

ইংরাজ প্রমিক ও আজ বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে তাহারও কম সমস্ত কাজ করিয়া বেশী পণ্য চাহে কারণ

তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মস্তপ। এই মস্তপান প্রথা থাকার রাজ-কোষে প্রচুর অর্থগণন হয়; সে জন্ম ইংরাজ গর্ভবন্মট তাহাতে বড় একটা বাধা দেন না কিত্ত ফলে ইংরাজের জাতীয় জীবন হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঠিক এই সব উপসর্গ আমাদের দেশের শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা যাইতেছে এবং অধুনা কয়েকজন হুতর হুবিবাবারী ব্রিগেলেস ব্যারিষ্টার শরদের কামিষের, ব্যাবারী লেকচর ও ভাড়াটে বক্তা শ্রেণীর লোকে দু'পাশা বোজগারের লোভে শ্রমিকদের উন্নতি করিবার অজিলায় শ্রমিকদের পেপাইতেছেন—ফলে হয়তো তাঁহাদের নিজেদের কিছু কিছু উন্নতি হইতেছে কিত্ত শ্রমিকদিগের সত্যই কোন উন্নতি হয় নাই। শ্রমিকগণ এই সকল নেতারদ্বারা ছদ্মবেশী স্বার্থপর বক্তাগণের প্রলোভনে পড়িয়া ধ্বংসট করিয়া বোজ বাড়িয়া লইতেছে কিত্ত তাহাদের কাজ করিবার শক্তি কতটুকু উন্নত হইয়াছে? তাহারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কিছু লাভ করিতে পারিয়াছে কি? তাহাদের বুদ্ধি কি মাম্বিত হইয়াছে—তাহারা কি সভ্যসংস্কৃতিতে কথাবার্তা আচার ব্যবহার শিখিয়াছে—কিছু কিছু লক্ষ্যপূতা শিখিয়াছে কি? কিছুই নহে; বং বেশী বোজ পাইয়া তাহারা ব্যয়কে সয়া জ্ঞান করিতে শিখিয়াছে অসমর্থ ও উত্তম হইয়াছে, অধিক পরিমাণে মস্তপান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, দিন দিন নৈতিক জগৎপন্থের চরম সীমায় যাইতেছে—ঠেক তাহাদের অঘাতিত নেতাগণ এবং বিশ্দের কি করিতেছেন—তাঁহারা কেবল শ্রমিকদের বক্তিত আয়ের কিছু অংশ টায়া হিসাবে আদায় করিয়া তাহা হইতে কিছু করা যায় কি না সেই চিন্তা করিতেছেন। যাহাকে Skilled labour বলে তাহা এ দেশে অতি দূর—এ দেশের শ্রমিকদের অধিকাংশই অঙ্গল, কৃষিহীন অথচ অধিক বেতন প্রার্থী। অধিক বেতনের দাবী অবশ্য সঙ্গত কিত্ত সেই সুখে নিজেদের কার্য শক্তির উন্নতিও যে দরকার নে কথটা তাহারা ভাবিয়া দেখে না কেন?—সেট কথা ভেত লোকেরা এই সব হাতের কাষের উপর রাখিয়া বলিয়াই এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা তাহা বুঝিয়াই একরূপ পাইয়া বসিয়াছে তবে এসব অজ্ঞায় সংশোধনের কোন চেষ্টাই হইতেছে না—কারণ শ্রমিকদিগের নিয়োগ কর্ত্তারা

অধিকাংশই (অন্ততঃ বহুদেশে) বিদেশী; সেই জন্মই এ দেশের অনস্বাধীন ও সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন আছে কিত্ত আজ যদি সত্যই স্বাধীনগণের দায়িত্ব এই জাতির উপর অর্পিত হয় তখন এই অশিক্ষিত, অকর্ম্মণ্য, অসং-বিশ্ব, মস্তপারী অসকরিত শ্রমিকদিগকে অধিক বেতন দিতে হইলে সমগ্র জাতির শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া যাবে তাহা নেতাগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আর ব্যক্তিগত লাভের লোভে কয়েকটা নেতা ইহাদের মাধ্যম তুলিয়া দিতেছেন জানি কিত্ত তাহা কত দিন টিকিবে। পরিশ্রমের কাজে বাড়ানী শ্রমিক দিন দিন হ্রাসী যাইতেছে এমন কি কোরাগিরিতেও আজ কঠিন পরি-শ্রমী, অল্প-সম্ভব মাত্রাভী আশিয়া তাহাকে জমাগুত থাকা মারিতেছে।

এখন বাঙালীকে যদি সত্যই বাচিতে হয়—জাতি হিসাবে ভবিষ্যতে আবার মাথা তুলিয়া পড়াইতে হয় তবে তাহাকে কৃষিকার্যে করিয়া যাইতে হইবে। দেশ যখন কৃষি-প্রধান ছিল, তখন আহার্য্য অথ্য হলে ছিল এবং বিত্তক অবস্থায় পাওয়া যাইত তখন অল্প লোকেই কোরাগিরি কার্যে করিতে যাইত, সে জন্ম তখন কোরাগিরি করিয়া খেতে মান, সময় এবং অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল—এই লোভে পড়িয়া সময়ও জাতিটাই যদি কোরাগিরি হইতে ছোটে এবং সকল কার্যই ছোট মনে করিয়া হাত ছুটাইতে থাকে তবে হাতের কাজের দাম বাড়িবে এবং খাজদ্রব্য যে ঘুঁরুনা হইবে ইহা স্বাভাবিক। ঘুঁরুলাভ্যতা সঙ্গে স্বে ভোজনের আবির্ভাব হয়। হুতরাং কৃষি কার্যে প্রত্যা-বর্তন না করিলে ঘুঁরুলাভ্যতা ঘৃণিবে না এবং ডেনমার্ক খাজ বহু না হইলে শিল্পের কখনও সম্ভব ও হুই হইবে না। শিল্পগণ ক্রয় ও দুর্বল হইলে তাহাদের দৈনিক ও মানসিক শক্তির অপহরণ ঘটে ফলে সমগ্র জাতির জাতীয় জীবন দুর্বল, বিখাল হইয়া পড়ে। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে তাহা বেশ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

কৃষি কার্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্তন আবশ্যক কারণ ভারতের লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে হুতরাং অল্প জমীতে বেশী লোকের খাজ উৎপন্ন করা আবশ্যক হইয়াছে ভারতের জমীর স্বাভাবিক অবস্থা ইলও ডেনমার্ক প্রভৃতি

দেশের জমীর স্বাভাবিক অবস্থা হইতে স্বাধীন নয় বহু ভাল; হুতরাং এসব জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার দিলে ও বীজ প্রভৃতি পটীকা করিয়া বপন করিলে এ দেশের জমীতে উৎপন্ন শক্তের পরিমাণ অস্কাট দেশের চেয়ে বেশী হওয়াই সম্ভব। এদেশের গর্ভবন্মটের কৃষি বিভাগ আছে কিত্ত তাহার কৃষির বিস্তৃতি ঘটে নাই—সে কেবল ছাপা কাগজে গিরাট প্রচার করিতেছে; কৃষি প্রণালীতে দর্শক জুটে না কিত্ত নাচ গান তামাসার লোক যথেষ্ট জুটে। এ দেশে শিল্প প্রবর্তনী হইতেছে কিত্ত কি খাইনা শিল্প সম্ভব বা হুই হইবে সে জন্ম এক মুহূর্ত্তও কেহ চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিতে দ্বিষ্ট নহে। গাছকে তরুণ না করিলে তাহার শল যখন বড় ও সৌন্দর্য পূর্ণ হয় না তখন এই অস্বাভাব-পীড়িত ভরখাষা, বোম্বে-জঙ্ঘরিত দেশে প্রবর্তনীতে দেখাইবার মত শিল্প কটা আনা সম্ভব। শিল্প পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া শিল্প প্রবর্তনী খোলা কি কেবল কীকা আওয়াজ করা নয়।

কৃষির উন্নতি বিধান কৃতকার্য হইয়াছে বলিয়া ডেন-মার্ক রাজ্য আজ বেকার-সমস্তায় বাহ্য-সমস্ত হয় নাই কারণ প্রত্যেক কর্ম্মকর্ম্ম এবং কর্ম্মকরণেজু পুরুষ ও স্ত্রীর কার্যের শত সহস্র পথ তাহাদের দেশে উন্মুক্ত রহিয়াছে। কৃষির কল্যাণে আজ ডেনমার্ক শত-সম্পদে ও ঐবাধে সমৃদ্ধ। ডেনমার্কের শ্রমিকদের অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের শ্রমিকদের অবস্থার তুলনা করা কোনক্রমেই চলে না—ভারতবর্ষের তো কথাই নাই—কৃষিকার্যে প্রধান দেশে বেকারের অস্তিত্ব বড় একটা দেখা যায় না—পূর্বে ভারত-বর্ষেও অতি সভ্যতার ফল স্বরূপ 'বেকার' নামক জটিল সমস্যা বন্ধনও ছিল না এবং কৃষিকার্যে প্রত্যাবর্তন করিলে অতি সহজেই আজ সে সমস্তার সমাধি হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কৃষিকার্যের আর একটা স্থবিধা আছে সেটা জাতির নৈতিক উন্নতি। কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিলে সদাসদর্দী কাঁচা পণ্য হাতে থাকে না তৎক্ষণ মস্তপানীয় সভ্যতা-ভ্রাত উপসর্গ কৃষি-শ্রমিক দিলে অধিক আকর্ষণ করে না হুতরাং মস্তপানের সহজাত চরিত্রহীনতা প্রভৃতি ঘটাবার অবকাশ অস্কাট ঘটে। শিল্প-শ্রমিকগণ অল্প সময় পরিশ্রম



করে এবং অতিরিক্ত অর্থ পায় বলিয়া তাহাদের মধ্যে মত্থ পানের প্রবৃত্তি খুব বেশী ও এই শ্রেণীর অধিকগণ স্বীয় পরিবারবর্গ হইতে দূরে থাকে সেজন্তও সহজেই তাহারা চরিত্র হারায়। তদ্বিন্ন রুবি কার্ধ্য বাগমজ্ঞ দেবতাদির পূজা—ঈশ্বরে নির্ভর ও বিবাহ প্রভৃতিও আবশ্যক হয় সেজন্তও নীতির দিক দিয়াও রুবি কার্ধ্য জাতিতে অনেকটা উন্নত রাখে। শিল্প অধিকগণের মধ্যে নীতি বা চরিত্র বক্ষার কোন সহজ উপায় নাই বরং ঐগুলি নষ্ট হইবার সহজ উপায় যথেষ্ট দেখা যায়।

বিশুদ্ধ খাদ্য পানীয় দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া দিনেমার বালকগণ সহিষ্ণু, কর্ণঠ ও সত্যকার কাজের লোক হয়; আর আমাদের দেশের লোকেরা বাস্তবায়ী হন ও ছোটখাটো লাভ করেন। সেখানকার খাদ্য সম্বন্ধে ভেদসমস্ত সাহেব বলেন “Not a scrap of food passes the Danish mouth that is not absolutely pure. The milk is minus microbes, the meat is

inspected and stamped and Denmark has the finest bread in the world.

অর্থাৎ “এমন একটুকরা খাবারও দিনেমারগণ গলাধঃকরণ করে না যাহা বিশুদ্ধ নহে। দুই বীজাবৃদ্ধিত, মাংস পরীক্ষিত ও মুদ্রাঙ্কিত আর দেশমার্কের রুটী জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট” আর আমাদের দেশের দুই দুই নামক কোন গুণ বিদ্যমান নাই আর মূল্যও তেমন উচ্চ—মাংসে ট্যাম্প মারা দেখা যায় বটে কিন্তু শিল্প হইবার সময় ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি যায়, আর ময়দাতে প্রচুর পরিমাণে কেওলিনের গুঁড়া মিশান থাকে, সরিষার তৈলে পাকড়া-বীজের এমন কি বিনজ তৈল পর্য্যন্ত মিশিত থাকে এবং যত বলিয়া আমরা যাহা কিনি তাহা ভো সেই ভেজি-টেবল ‘খো’। আর এ দেশের গভর্ণমেণ্ট এই সব ভেজাল নিবারণের জন্ত মাজ জরিমানার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। জরিমানার কি পাপ ধন্য হয়? যে ব্যক্তি লোক ঠকাইয়া সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জন করে সে দুই এক শত টাকা অর্থদণ্ড দিতে কাতর হইবে কেন? (ক্রমশঃ)

## “ফাল্গুন এলো”

শ্রীসদ্ধিানন্দ ঠাকুর

ফাল্গুন এলরে ফাল্গুন এলরে, এলরে ফাল্গুন এলো,  
মলয় সমীর ক’য়ে যায় কথা খোল খোল যার খোলে।  
অমরা গুহে গুহে গুহে গুহে মর মালতীর কাণে কাণে।  
সুখিনী রাণী উদাস পরাণী চাহি চাঁদুয়ার পানে।  
বেছ পাল রাখি রাখাল বালক খেলিছে গাছের তলে।  
বনে বনে কত কাঁড়িয়া মেয়ে গান করি করি চলে।  
সুহ ডাক শুনি কোনো বিরহিণী চমকি নয়ন তুলে।  
যেন কোন কথা পড়ে তার মনে এত দিন ছিল তুলে।

গোধূলি বেলায় কত পুরনারী কলসি করিয়া কাকে।

জল দেচিবার আসে হুতুহলে পিছনে তাহারে ভাকে।  
চলেছে যাকী গান গেয়ে গেয়ে পাশের সরণী ঘরি।  
তারকার পাতি হাসিয়া উঠিল সাঝাটা গগন ভরি।  
নদীর কিনারে শুধু ছুটি প্রাণী কহিছে নয়ন কথা।  
মলয় বাতাসে ঝরে পড়ে গায়ে নব মাখবীর লতা।  
চাঁপের কিরণে ভোর হ’ল বলি অমনি উঠিল ডাকি।  
বনের ভিতর ঘুমেছিল ওগো যত লাখে লাখে পাবি।  
কাণ্ডা মেখেছে যত গাছপালা জিহ্বন রাভা হোলে।  
শুধু গুহনে জ্বলনে গছে এলরে ফাল্গুন এলো।

## সব সাধ যদি মিটিত ধরায়—



অর্থ হল, আশা কিন্তু মিটিল না হার।  
মান সম্মান না হলে যে বুক কেটে যায়—

তাগ্য বলে—তাই লও—করই আরাধ  
পথেতে বাইতে দেখি ছায়ে সেলাম।





## কবির দুঃখ

শ্রীশরৎচন্দ্র খিয়ার

ডাক্তার নরেশ দাস সন্ধ্যা হইতে নিবিলাদের মজলিসে  
বিমর্ষভাবে বসিয়া ছিল।

সকলে চলিয়া গেলে নিবিলা জিজ্ঞাসা করিল, তারপর,  
ডাক্তার কেমন আছ? মরহম কি রকম?  
আর ভাই! লোকে বুঝছে, ডাক্তার রোগীকে যত  
ঈর্ষ্য দেখে রোগকে তা দিতে পারে না।

হুনীল বলিল, ভাতকে বড় শুধনে দেখাচ্ছে। ব্যাপার  
কি? কাল আমাদের এক বেলার নেমস্তম্ব করুন।

তিনজন সতীর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু। হুনীলের বাপ বড়  
লোক। সে এন্-এ পাশ করিয়া কবিতা ও গল্প লিখি-  
তেছে। নিবিলা নতুন উকিল।

হুনীল উত্তর না পাইয়া বলিল, কি স্থির করলে হে?  
নরেশ হস্তান্তরভাবে বলিল, নেমস্তম্ব। হ্যাঁ, তাই  
করবার সময়ই বটে! হুনীল, আমার বাড়ীতে আমি  
নিজেই টিকিতে পাচ্ছি না।

মুখ দেখে সেই রকম কিছু অসুস্থান হয়। কিন্তু,  
কেন? এটা জানুবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই  
আছে। আমি ভাবি, তোমার আর নিবিলাদের কিছু গোল-  
মাল আছে বললে তোদের ছেলে মেয়ে হ'চ্ছে না।

নরেশ ক্ষুব্ধবলে বলিল, বিয়ে দিয়েই যে পুত্র বাঞ্ছিত,

আর ছেলেমেয়েতে কান্ন নেই। নিজে ত' করলি না,  
কেবল নেমস্তম্ব খেয়ে মিলনাগ্ন গল্প লিখিছ। তোমার  
আর কি!

নিবিলা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে,  
নরেশ?

সব বলছি। তোরা আমাকে একটা সহ্যুক্তি দে।  
আমার সর্গনাশ হ'য়ে যাচ্ছে—আমি আর পারি না!

হুনীল ব্যস্ত হইয়া বলিল, অত অস্থির হ'লে চলবে  
কেন! ব্যাপারটা কি আগে ভাবি?

নরেশ গম্ভীর স্বরে বলিল, আজ একমাস উৎপলা  
আমার সঙ্গে কথা কয় না।

বন্ধুবান্ধব ও তরুণী স্ত্রী উৎপলা ছাড়া নরেশের  
ত্রিমূলে যাহারা ছিল তাহারা টাকা কর্ত্তর দরকার বা  
অস্থখ-বিস্থখ হইলে তাহার কাছে আসিত।

নিবিলা হুনীলকে চোখ টিপিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।  
নরেশ চটিয়া বলিল, আমি খনে প্রাণে মারা যেতে  
বসেছি আর তোদের হাসি আসছে? ছিঃ, এই বন্ধু!

নিবিলা বলিল, এস সব বিষয়ে আমি তোমার হৃৎকরের  
'সিনিয়র'। দিন কতক চুপচাপ থাক খেঁচি কোথা  
থেকে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এরকম দুচার দিন কথা বন্ধ  
হওয়া বিবাহিত জীবনে নতুন কিছু নয়।

হুনীল জিজ্ঞাসা করিল, বৌয়ের সঙ্গে কথা নেই বলে  
খনে প্রাণে মরতে যাবি কেন?

আমার আশ্রয় কতদূর পড়িয়েছে—তা' না ভনৈই  
উপদেশ দিচ্ছ! আগে সব পোনা।  
আহা, রাগিস কেন ভাই! আচ্ছা, গোড়াকেকেই  
বল।

তাই ত বলচি; শোন,—বলিয়া নরেশ গলা পরি-  
হার করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, একদিন উৎপলা  
আমাকে বললে তার এক মাসভূত বোনের বিয়ে  
হ'চ্ছে সেজন্য তাকে বাপের বাড়ী যেতে হ'বে। আমার  
হাতে তখন অনেক গুলা রোগী। আমি বললাম, তার  
চেয়ে তিন রাত উপরি উপরি খিচোরি রেখতে চাও  
তাতে রাক্ষি আছি কিন্তু এ সময়টা তুমি কোথাও গেলে  
চলবে না।

হুনীল মুচকিয়া হাসিল। নিবিলা ক্রমাল মুখে চাপিয়া  
হাসি চাপিবার জন্ত মাথা নিচু করিল।

নরেশ সরোয়ে বলিল, যাক্ আমি তা'হলে উঠনুম।  
অনেক কাহুতি-মিনতির পর হুইজন আর কথাও  
হাসিবে না প্রতিজ্ঞা করায় নরেশ হতাশভাবে বসিয়া

বলিল, আর যাবই বা কোন চুলোয়! শান্তি কি কোথাও  
আছে! হ্যাঁ, তারপর,—কোনখানটা বলছিলাম হে?

নিবিলা তাহার মুখখানি যথাসম্ভব শাভাবিক করিয়া  
বলিল, তুমি গেলে চলবে না।

হুনীল মানসমন্ড্রে করুণা করিতে লাগিল কোনও  
এক অপরিচিতা তরুণীর কাল চোখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া  
সে প্রকবার একটা পদ লিখিয়াছিল সেইজন্য মৃত্যুর পর  
তাহার মুখে অনবরত জলন্ত হোঁহার ভাঙ্গু পড়িতেছে।

নরেশ বলিল, শেষে যা হয় তাই হলো আমাকে তিন  
দিনের জন্ত ছুটি দিতে রাজী হ'তে হ'ল। উৎপলা তার  
ভায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী গেল। আমাকেও যাবার  
জন্তে অনেক বললে কিন্তু রোগী ছেড়ে যাই কি করে?

নরেশ থামিয়া নিশ্বাস ফেলিতেই নিবিলা বলিল,  
সেতো ঠিক কথা। কষ্টব্য আগে।

হুনীল তাহাকে একটা চিমটা দিয়া নিরীহ ভাবে  
কহিল, উভয় সঙ্কট বটে! তারপর?

তাহার মুখের প্রতি স্বীকৃতি দৃষ্টিপাত করিয়া নরেশ  
বলিতে লাগিল, পাঁচ দিন পরে সে কি করে এল। আমার  
খুব রাগ হ'য়েছিল; সে বললে, রমনার স্বামীটা বেশ  
হয়েছে,—আমি বাধা দিয়ে বললাম, দেখ, এরপর তুমি  
আমার সঙ্গে একেবারে কথা না কইলেই স্বামী হ'ব।

সে জিজ্ঞাসা করলে, অপরাধ?  
আমি তার কথা গ্রাহ্য না করে বললাম, আর আজ  
থেকে তোমাকে আলাবা ঘরে থাকতে হ'বে। হিন্দুতে  
একবার যখন বিয়ে করেছি তখন আর উপায় নেই কিন্তু  
তোমাকে সাক বলে রাখছি তুমি আমার কোনো কাজে  
বা কথায় থাকতে হোয়ো না। নিজের মান নিজের হাতে,  
সেইটাই মনে রেখে চলো।

সে বললে, বুঝেছি, আচ্ছা তাই হ'বে।  
সেই দিন থেকে সে আমার সঙ্গে আলাপ কর'রে না।

সাধলও না। এবার একটা কি সঙ্গে এসেছে; দিনরাত  
তার কাছে গল্প হ'চ্ছে আর পোনা বিলিতি হ'ইর হুটীকে  
খাওয়াচ্ছে, আদর করছে। বেড়ে যুখে আছে কিন্তু—

হুনীল গম্ভীর ভাবে বলিল, তিন দিনের জন্তে গিয়ে  
কেন পাঁচ দিন হোলো! তা না জিজ্ঞাসা করে একটা  
শিক্ষিতা মেয়েকে, সে তোমার স্ত্রী বলে এমন অপমান করা  
তোমার কোন মতে উচিত হয় নি! গাড়ীর গোলমালে  
কি হঠাৎ শরীর অস্থস্থ হওয়াতেও তরো হ'তে পারে।  
এটা বিশ শতাব্দী, সেই আদিম-যুগ নয় যে মেয়েরা নীরবে  
পুরুষের অভ্যাসের সহ্য কর'রে যাবে।

নরেশ অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল। নিবিলা বলিল,  
যা' হোক, আর মাস খানেক চুপ করে থাক।  
নরেশ হতাশভাবে স্তম্ভকণ্ঠে বলিল, আরও একমাস  
চুপ কোরে থাকা আমার পক্ষে যে কি অসম্ভব তা' তোরা  
বুঝতে পারছিস না। উৎপলা আর রামায়ণও বায় না।

হুনীল বলিল, বেশ ত রাগুনী রাখ। আজকাল  
সাধারণ লোকেই স্ত্রীর রামা খেতে কষ্ট বোধ করে; তা  
তোমার ত অস্বাভাবিক।

নরেশ বলিতে লাগিল, সেতো রাখতে বাধ্য হ'য়েছি,  
এবং একমাসে তিনটা বদল হ'ল। হতভাগারা যত রকম  
অজ্ঞান থাকিয়ে মানুষের সম্মান কিছু না কিছু চূড়ান দিয়ে



যায়। সকালে আটটা নটা পর্যন্ত ভিস্পেশারীর যোগী দেখে বাইরের 'কলে' বাই তারপদ 'ছুটো' ভিন্তুর সময় কিংবে, নেবে খেয়ে বাজারের হিসেব দেখেবা না কাগজখানা গুলো পড়ব। একজন সরকারও রেখেছিলাম কিন্তু কেউ দেখেবা নেই বুঝে কি, সরকার, রাধুনী ভিন্ত জন্মেই ছুঁতে লুটেছে। আমাদের ছুঁজনের মাসে আশ মখ চাল লাগত এখন এক মাসেই তিন মন চাল খরচ হয়েছে। বাজার বরডা একশ থেকে দু'শ বাড়িয়ে। খণ্ড, ওত খরচ করেও না খেতে পেয়ে কি হ'য়ে পড়েছি তা তো তারা বেশিহি। বামন বেটায়া রাঁখতে জানে কিন্তু ভাল খাবার করতে গেলে বে কি, তেল চুরি হয় না। পান, চা বাগানটা একটা সন্দের ছিল তা ছুঁনি পাচনের মত চা আর প্রচুর চূপে, সন্নিভ পান খেয়ে তাও ছাড়তে বাধ্য হ'য়েছি। এত বাগানটানীর পর এসব আর সহ হয় না। একেবারে খনপ্রাণে মারা গেলাম ভাই!

২

খাকমনি উৎপলার বাগের বাড়ীর পুরাণি ষি। স্বামী-স্ত্রী কলহ তুলিয়া সে গালে হাত দিয়া উৎপলাকে বলিল, ছুঁশাচ দিন কোন মেয়ে না বাগের বাড়ী যায়? সে জেজ্ঞ এত অশ্রমান্তি। না বাছা, এরকম আলস্য ভাব কিছু ভাল নয়। আর তাও বলি তুমিই বা কেমন মেয়ে সোমারীয়া এত রোজগার, হুঁশ খানা ভাতি ভাতি গমন গতিয়ে নেবে তানহ গায়ে বেশ জল সেবে বলে রয়েছে। একটু চালাক-চতুর, রাশভারি না-হ'লে পুরুষ মাছ খে। এরকম উড়ন চড়ে হ'বেই।

উৎপলা প্রাণে খাকমনির কথা নিজেই দুঃখ অভি-মাল যথার্থই হইয়াছে ভাবিয়া মনকে সাফা দিয়া রাখিয়া-ছিল। কিন্তু, একমাস চলিয়া গেল অশচ স্বামী যে জায় কোন আত্রে প্রকাশ করিলেন না উপলব্ধি করিয়া তাহার ক্ষয় হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল বাগের বাড়ী হইতে ফিরিতে দেবী করিয়া ফিরিয়া প্রাণে স্বামীর কুশল সংবাদ না জিজ্ঞাসা করাটা তাহার মত কুল হইয়াছে। কিন্তু অনেক দিনের ব্যবধানে মন অশ্লোচানায় বসত ভিত্তিও কিন্তু-প্রাণী হইক না কেন লক্ষ্য যে উত্তরোত্তর

বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিশেষতঃ, খাকমনির মিথ্যা প্রবেশ তাহার আর একটুই ভাল না লাগিলেও সে যে তাহাকে গায়ে-পড়া মেয়ে মনে করিবে এই চিন্তাও উৎপলার অস্থায় হইয়া উঠিয়াছিল।

পৌষ মাস। রাত প্রায় নয়টা বাজে। একখানি মোটাবু ধীরে ধীরে নারকেলডালার এক প্রান্তে নরেশ ডাক্তারের দিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সরকার কড়া নড়িয়া উঠিল।

টিকা শি, রাধুনী, সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল ডাক্তারবাবু সরকারটিকে চুরির জন্ত তাড়াইয়া দিয়াছেন। তিন চার বার কড়া নড়িলে খাকমনি নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

বাহির হইতে ভাষা হিমিতে কে একজন বলিল, আমরা কালীঘাট থেকে আসছি। ডাক্তার বাবুকে খবর দাও যে কালীঘাট থেকে ভবানন্দ স্বামীজী এসেছেন।

‘স্বামীজী’ এইকথা শুনিয়া খাকমনি দরদা বুখিয়া বলিল, বাবু তো বাড়ী নেই। তা’ আপনারা ভিতরে বসবেন কি বাবা?

সাবু সন্মুখের কী জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, কিছুক্ষণ বসতে পারি।

সাবুবা ভিতরে প্রবেশ করিলে খাকমনি সম্মুখে তাহাদের পায়ের স্থলা মাখায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যে শূন্য তাহার চোখে পড়িল তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর আড়ত হইয়া গেল।

সাবুজীর হোসা ঘরের আলোয় চিক চিক করিতেছে। তাহার চেলা বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া খাকমনির পিছনে একখানি মাখা ছোরা বাহির করিয়া তাহার বর্ধ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটা অশুচ শব্দ খাক-মনির গলা হইতে বাহির হইতেই যে কর্শ শব্দে বলিল, খবরদার! কথা কইলেই মরবি? টাকা ধারের আমরা কাউকে প্রাণে মাঝব না, সে চল উপরে নিয়ে চল।

উৎপলার কপোল চূশন করিয়া নরেশ বলিলেন, দেখলে ত’! ভূমি আরও গমনা গমনা কর, আমি কুণ্ডল মলে ঠাঁটা ব’স।

সরকারকে যে এ মাসের টাকাটা সেদিন ব্যাংকে জমা দিয়ে এসেছিলাম। সামান্য উপর দিয়েই কাঁড়াটা কেটে গেল।

উৎপলা অস্থযোগ করিয়া বলিল, তুমি কেন এত দেবী কোরে এলে?

আমি আজ কদিনই তো এমনি সময়ে আসছি। ভূমি মিথ্যা রাগ কোরে রইলে; আমি একা একা কি করে বাড়ী বসে থাকি। আগেকার কথা মনে কর দেখি।

উৎপলার চোখ দুটা চক চক করিয়া উঠিল; সে হাসিয়া বলিল, টাকার জন্তে আমার মোটে দুখ হ’লে না। আমি ভাবছিলাম শীগগিরই এমনি একটা কিছু ঘটবে।

কদিনই আমার মন এত খারাপ ছিল!

সত্যি বলচ, বলিয়া নরেশ তাহার অশ্রু মুছাইয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

সত্যি, বলিয়া উৎপলা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর বুকে মুখ সুইল এবং কিছুক্ষণ পরে মুখ না তুলিয়া অন্ধনয়ের হরে বলিল, আচ্ছা, কোনও উপায়ে ইঁদুর ছুটো পাওয়া যাবে না?

নরেশ তাহাকে সাফা দিয়া বলিল, বন্দুখ ত’, তোমার ইঁদুরের জন্ত মত টাকা খরচ হোক, গোয়েন্দা লাগিয়ে দেব। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

৩

পরদিন সকালে প্রাইভেট ডিক্টেট্ট সলিল বাবু আসিলেন যথারীতি প্রদত্ত এবং জেরা করিয়া তিনি খাকমনি ও ক্ষুতপূর্ণ সরকারকে সম্মেহ করিলেন।

নরেশ বলিল, কেমনটা আপনার হাতে লিলাম। আপনি যেমন করে পারেন ইঁদুর ছুটো আখায় এনে দিন। অনেক দিনের গোখা ইঁদুর। এই নিম্ন, আপনাকে উপহিত, বলিয়া সে উঁহার হাতের ভিতর ছই থানি দশ টাকার নোট গুঁথিয়া দিল।

সলিল বাবু বলিলেন, আমি আপনার কথা দিচ্ছি, ছুঁ এক দিনের মধ্যে আপনারা ইঁদুর নিশ্চয় আনবেন। আর কেমনটা মোটামুটি বেশ বোকা যাচ্ছে ওসব খসেই দলটল কিছু না। আগে থেকে খাকমনি ও আপনার

পদচ্যুত সরকারের সঙ্গে ওদের একটা বোকাপড়া ছিল। খাকমনি কদিন কালীঘাট গিয়ে সাধুদের সঙ্গে আলাপ করছে বস্তুলে, শুধু মনে না?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, কিন্তু, ও অনেকদিন আমার শস্তর বাড়ীতে আছে। ওকে আমার অবিখান হয় না।

সলিল বাবু মাথা নাড়িয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, আপনার এই ধারণাটা মানব-চরিত্রের দুর্ভ-লতার একটা দিক! অনেক দিনের পুরাণ বন্ধ বা চাকর জানে কি অজ্ঞানে কখনও আমাদের কোনো অনিষ্ট করুতে পারে না—এ বিশ্বাস বড় কুল। একটু ভেবে দেখলে আমার কথাটা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন। আচ্ছা আমি তা’হলে এখন চললাম। নমস্কার!

কপোরে আড়ালে দাঁড়াইয়া উৎপলা সব তনিতৈছিল সলিল বাবুর স্বাখায়, খাকমনি একটু একটু করিয়া তাহাকে কি ভাবে স্বামী হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিত-ছিল তাহা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তৎকাল সে নরেশকে বলিল, ভূমি কোনো উপায়ে আজই খাকমনিকে বাড়ী পাঠাইতে পার?

নরেশ বলিল, সে আর শক্ত কথা কি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

খাকমনিও আড়ি পাতিয়া গোয়েন্দা বাবুর স্বাখা শুনিয়াছিল। উৎপলার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সে বলিল, হাঁ, হিরিমি, ভূমি দাদাবাবুকে বন ভিনি একজন সেরা টিক করে আজই আমাকে মেন মেনে পাঠিয়ে দিন। সকলে ত’ তোমার মত যে সরল নয়, পোড়ামুখোরা এমনি করে ভাল মানুষের মনে কষ্ট দেয়। চিত্তের আশ্রন জলে উঠে না পা তাদের বুকে।

৪

উৎপলা ঘরে কিরিয়া বসিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরেশ আসিয়া বলিল, ভূমি চলে এলে কিন্তু ওয়া ভূমি নিজহাতে না দিলে কিছু খাবেনা বলছে যে—

উৎপলা মাথা নাড়িয়া কহিল, না খায় না খাবে। তা’ বলে বড় চোর ডাকাত গোয়েন্দাদের সামনে আমি বেকতে পারব না। তাহের পরিবেশনও করতে পারব না।



নশের তাহার সামনে বসিয়া নিম্নের মুঠার মধ্যে তাহার হাত দুইখানি লইয়া তাহার অভ্যন্তর কপিত কঠোর চূষন করিয়া বলিল, উৎপলা, কেন যে ওদের এই সব কাজে রাঙ্কি কে'রছিলাম তা' না বুঝে তুমি রাগ কোরচ?

তাহার সামনের চুলগুলো ঠিক করিতে করিতে উৎপলা হাসিয়া বলিল, দূর! আবার রাগ! কিন্তু বড় লজ্জা করে যে; তুমিই বা কি মনে করো?

ইস!

ভেঙ্কন ধোরে টোকা মারিয়া হুদীল বলিল, তোমাদের কি আর এক পাল্লা মানভঞ্জন আরম্ভ হ'ল নাকি হে? ব্যবহার মন্দ নয়! এ দিকে অতিথিরা অভূক্ত বসে রয়েছেন! বৌদির রকম সধম, আর আচার ব্যবহার দেখেই ত' আমার বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। তা' নইলে,—

## গৃহশক্তি

(ইহারাজী হইতে অনুবাদ)

শ্রীমনোহরপ্রভু গঙ্গোপাধ্যায়

"যে বেগমহী স্রোতঃস্রোতঃ বৃহৎ যত্র চালনা করিয়া সমগ্র পৃথিবীর গোলক ঘুরাইয়া দেয় তাহা কোন নিভৃত স্থানেই উপর হয়"—হেম্পস।

ম্যামাক ক্যামপেনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন, "পুত্রাতন শিক্ষাপ্রণালী ওলির কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।" বর্থাৎ সৌক-শিক্ষার কি অভাব বর্তমান রহিয়াছে? ক্যামপেন উত্তর করিলেন, "মাতা"। উত্তরটি সম্রাটের মন সম্পন্ন করিল; তিনি বলিলেন হাঁ, এক কথাই বলিতে গেলে ইহাই বর্থাৎ শিক্ষা-পদ্ধতি। এখন হইতে আপনি মাতা-দ্বিগকে একত্র শিক্ষা দিন যে তাহার্য্য যেন তদীর সন্তান-দ্বিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে।"—এম্ম মার্টিন।

গৃহই চরিত্র শিক্ষার প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় স্থান। এই স্থানেই প্রত্যেক মহত্ব সর্বাঙ্গকৃষ্টে কিংবা সর্বাঙ্গকৃষ্টে নৈতিক শিক্ষা লাভ করে; কারণ এই স্থানেই সে যাহা, তাহাকে মহত্বের পথে লইয়া যাইবে এবং মৃত্যুর সহিত লয়-প্রাপ্ত হইবে, সেই সকল ব্যবহারের মূলতত্ত্ব শিক্ষা করে।

একটি সাধারণ প্রবাস-বাক্য আছে যে 'ব্যবহারই মানুষ সৃষ্টি করে'; আর একটি বাক্য আছে যে 'জন্ম

মানুষ সৃষ্টি করে' কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর সত্য তৃতীয় এক বাক্য আছে,—"গৃহই মানুষ সৃষ্টি করে"; কারণ গৃহশিক্ষা দ্বারা কেবলমাত্র ব্যবহার ও জন্ম শিক্ষা বুঝায় না, চরিত্র শিক্ষা বুঝায়। প্রখ্যাত: গৃহেই জন্ম প্রসারতা প্রাপ্ত হয়, অভ্যাস উঠায়। হৃদয়, বুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং চরিত্র ভাল কিংবা মন্দরূপে গঠিত হয়।

এই উৎপত্তি স্থান পবিত্র বা অপবিত্র যাহাই হউক না কেন এই স্থান হইতেই ভবিষ্যৎ সমাজ-শাসনকারী মূলতত্ত্ব ও নীতিবাক্য-নিষ্কৃত জন্মলাভ করে। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধি গৃহের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। গার্হস্থ্য-জীবনে বালকবালিকাগণের অশ্লব্যকরণে যে ক্ষুদ্র মত উৎপন্ন হয় তাহা ভবিষ্যৎজীবনে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়া সর্বসাধারণের মধ্যে পরিণত হয়; কারণ স্বতিকাগার হইতেই জাতি গঠিত হয় এবং যাহারা শিশুদের হাত ধরিয়া হাঁটিতে শিখায় তাহার্য্য শাসনব্যবস্থা পরিচালকদের চেয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে।

স্বাভাবিক নিয়মে গার্হস্থ্য-জীবন, সামাজিক গৃহ ও সভ্যতা জীবনকে প্রস্তুত করে এবং জন্ম ও চরিত্র সর্বাঙ্গ-প্রাথম গৃহেই গঠিত হয়। এই স্থানেই ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনকারী ব্যক্তিগণ সর্বাঙ্গের পরীক্ষিত হন, গৃহের ক্ষুদ্র

জীবন হইতে তাহার্য্য সংসারে প্রবেশ করে এবং বালক হইতে নাগরিকের পদে উন্নীত হয়। এইরূপে গৃহসভ্যতার সর্বাঙ্গোপেক্ষা। সমস্তাংশী বিভালায়রূপে পরিণতি হইয়া কারণ সভ্যতা প্রধানত: ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর নির্ভর করে, এবং বাক্যকমে সমাজের সভাগণ যৌবনে যেরূপ সং-কিছা অসং-শিক্ষালাভ করিবে তদ্বারা গঠিত সমগ্রাঙ্গণও সেইরূপ অধিক কিংবা অল্প স্বদয়বান ও সভ্য হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা, সে যতই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী হউক না কেন তাহার বাল্যকালীন পারিপার্শ্বিক নৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেই হইবে। সে অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে আসে এবং তাহার শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির জন্য তাহার নিকটবর্তী ব্যক্তিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে মুহূর্ত্তে সে প্রথম নিখাস গ্রহণ করে—সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। জনৈক মাতা কোন ধর্ম-বাক্যকে ক্রিষ্টাঙ্গা করিয়াছিলেন যে তাহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্রের শিক্ষা কখন আরম্ভ করা উচিত; ধর্মবাক্য উত্তর করিলেন, "মাতাঃ উহা যদি আপনি পূর্বেই আরম্ভ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই চারি বৎসর আপনি বুঝা নষ্ট করিয়াছেন।" যখন শিশুর পণ্ডদেশে প্রথম হাসি প্রকটিত হয় তখন হইতে শিক্ষাদানের সুযোগ আরম্ভ হইয়াছে জানিবেন।

একটি আরবদেশীয় প্রবাস বাক্য আছে যে, 'একটি ভূমধ্য সাগর জাহাজ একটী ভূমধ্য সাগরকে দেখিতে দেখিতে ফলবান হয়।' শিশুদের পক্ষেও সেইরূপ। মৃদুভূমি তাহাদের প্রথম ও প্রধান উপায়ে।

শিশু-চরিত্র গঠনকারী প্রভাবগুলি যতই সামান্য বলিয়া বোধ হউক না কেন ইহার্য্য জীবনব্যয়ি কাঙ্ক্ষার বাক্য। শিশু-চরিত্র মহত্ব-চরিত্রের যৌবন পর্যন্ত। পরবর্তী শিক্ষা-গুলি ক্রমোন্নতি মাত্র। যুতরাং 'শিশুই মহত্বের জনক' এই কবিতাকটি কিংবা ইহার মিটন লিখিত ভাষ্যস্বত্ব যথা—'প্রভাতকাল যেরূপ দিবসের নির্ধারণ করে, শৈশব-কালও সেইরূপ মহত্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে' এই কথা অসম্ভবপর সত্য। ঐ সকল আচরণ যাহা বালক যারী ও স্বদয়ে দুটনিকর হয় প্রায় আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। সেই সময়ই আত্মীয় চরিত্র নির্ধারণ

পূণ্যের কিংবা পাপের, মনোভাব যৌবন মনোবৃত্তি সমুদয়ের মধ্যে প্রোথিত হয়।

শিশুকে যেন কোন অভিনব জগতের সীমায়োপে নিষ্ক্ষেপ করা হয় এবং সে নৃতন ও অদ্বিত বস্তু-সমূহ দেখিতে আরম্ভ করে। সর্গপ্রথমে তাহার পক্ষে দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে দেখিতে, লক্ষ্য করিতে, তুলনা করিতে, শিথিতে ও সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে এবং জ্ঞানী অভিব্যক্তির অধীনে থাকিলে আশ্চর্যরূপ উন্নতি লাভ করে। লর্ড ব্রাউহাম বলিয়াছেন যে আঠার হইতে ত্রিশ মাসের মধ্যে একটি শিশু জড়ভ্রমণ, যৌবনজ্ঞ, অজ্ঞাত ব্যক্তির স্বভাব, এমন কি নিজেদের ও অপরদের স্বদয় স্বত্বকে জীবনের অবশিষ্ট কালে যাহা শিখে তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করে। শিশু এই সময় যে জ্ঞান অর্জন করে এবং তাহার অশ্লব্যকরণে যে ভাবগুলি অস্বৃত্ত হয় তাহা এরূপ আবিস্করীয় যে যদি আমাদের যৌবন যৌবন লই যে ইহা পূরে বিলুপ্ত হইবে তাহাণি কেশ্বিক বিখ্যিতা-লয়ের একজন বড় ব্যাঙ্গ্যলয়ের অথবা অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্রের সমস্ত বিজ্ঞা একত্র করিলেও ইহার তুলনায় কিছুই নহে।

শৈশব কালেই মন সর্বাঙ্গোপেক্ষা অধিক ধারণক্ষম থাকে গৃহপ্রভাব এবং অধিকৃপা সাংযোগে প্রথম ইহা জলিয়া উঠে। তখন ভাবগুলি সবার গৃহীত হয় ও মৌলিকাল যারী হয়। কথিত আছে এইরূপে ষ্ট্রী পড়িতে শিখিবার পূর্বে তাহার মাতা ও মাতামহ কর্তৃক আত্মিক প্রথম করিয়া গীতিকাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শৈশবকাল দর্পণে প্রায়; পরবর্তী জীবনেও ইহাতে প্রথম জীবনের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। শিশুর জীবনের প্রথম ঘটনা চিরকাল থাকিয়া যায়। প্রথম আনন্দ, প্রথম দুঃখ, প্রথম কৃতকাঙ্ক্ষতা, প্রথম বিফলতা, প্রথম সাহসিক কার্য্য এবং প্রথম দুর্ঘটনা তাহার জীবনের শোষণশেখক ও প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে।

এই সময় সমগ্র হইতেই চরিত্র বিশেষত: মেজাজ, ইচ্ছা ও অভ্যাস প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তির উপর মহত্বের পরজীবনের স্বত্ব থাক্ক্ষা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে সেগুলি ক্রমশ: উন্নত হইতে থাকে। একজন উচ্চ স্বদয়



দার্শনিককে দৈনিক অধ্যয়ন, দুর্নীতি ও ভ্রমভ্রাতা  
মধ্যে থাকিতে হাও সে অজ্ঞাতসারে গন্তব্যের দিকে চলিতে  
থাকিবে। এইরূপে পার্থক্য প্রভাবের মধ্যে দার্শনিক  
অসহায় শিশুর কত অধিক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে  
পারে। অসত্যতা, অসচ্ছন্দতা ও অসংযমিত্বের মধ্যে  
পরিভ্রমণ, অজ্ঞাতের প্রতি বিরোধী বা দ্ব্যর্থ-ভাব দঠ  
করা স্বপ্নও সম্ভব নহে।

এইরূপে শিঙাপা যে স্থান হইতে ব্যাপ্তপ্রাপ্ত হইয়া  
ভবিষ্যত হ্রী পুরুষের পরিতত এইক ভাবান্বিত সেই লালন  
প্রকারেই পুণ্ডর প্রভাবাহারী তাহার। ভাল বা মন্দ  
হইতে বাধ্য। যে গৃহে প্রেম ও কর্তব্য বিরাজমান  
কোনো ব্যক্তিগণের গায়ে কাষমান্যবাধে। শাসন  
সহ কথো—যেখানে দৈনিক জীবন মন ও ধর্মনিষ্ঠ  
পুণ্ডর শিঙা পুণ্ডরজ্ঞ শক্তিলাভের সঙ্গে মন পিতামাতার  
পদাঙ্ক অম্বরণ করিবে, সরলভাবে চলিবে, বুদ্ধিমানের  
স্বাধ নিয়মের সমস্ত রাশিবে এবং তত্প্রসার্য ব্যক্তি-  
গণের হিতসাধন করিবে। এইরূপেই আমরা স্বরূপ,  
প্রয়োজনীয় ও স্বাধী ব্যক্তিগণের উত্তর আশা করিতে  
পারি।

অতীকে বসি তাহারা মূৰ্ত্তা, রূপা ও স্বর্ণপদতা  
 দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় তাহা হইলে তাহারা অজ্ঞাতদ্বারে  
 ঐকপ চরিত্র লাভ করিবে এবং সভ্যজীবনের বহুবিধ  
 প্রোচননের মধ্যে পড়িয়া যোগোপাধিব্যব করণ স্বভাব,  
 অশিক্ষিত ও সমাজের শত্রুত্ব হইয়া পাড়াইবে। খ্রীস্টদেবীর  
 একটি প্রাচীন ব্যক্তি বিখ্যাতনামের "বসি তোমার শিশু-  
 সমাজকে একটি ক্রীতদাস দ্বারা। শিশুকে বর তাহা"  
 হইলে তুমি একটি কৃতদাসের পরিবর্তে দুইটি পাইবে।"

শিত্ত বাহা দেখে তাহার অহঙ্করণ না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তই তাহার নিকট রীতি, ভাবভঙ্গী, বাক্য, অভাস ও চরিত্রের আদর্শরূপ। হিচটার বলেন, “শিত্তর পক্ষে শৈশবকালই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাল।

আদর্শসমূহ শিশুর চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, এবং হুম্মর চরিত্র গঠন করিতে হইলে হুম্মর আদর্শ তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। মাতাই শিশুর চক্ষুর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা স্থির আদর্শ।

অর্থ হারবার্ট বলিয়াছেন, “একজন হুমতারা দুইভা-  
 ঞ্জের শক্তি মূল্য একতরফে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের  
 সমান। গৃহমধ্যে সে সকল দ্বয়ের স্পর্শনি ও প্রবর্তা।  
 স্বাৰ্গ্যক”। দুইভা উপদেশ অলপা অনেক উত্তম। ইহা  
 কার্যকরী উপদেশ। ইহা বাস্তব জীবনের শিক্ষাশাল এবং  
 জিহা যে পরিমাণে শিক্ষা দিতে পারে তদপেক্ষা অধিক  
 শিক্ষামূলক। অদুর্ভাগ্য প্রদর্শন অদুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ  
 প্রতিদ্বন্দ্বি; উপদেশের মূল্য অতি অল্প। দুইভাই বেশী  
 অসহ্য হইবে উপদেশ নহে। বাস্তবিক উপদেশ ও অভ্যাসের  
 মধ্যে পার্থক্য ইহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া  
 পড়ার কারণ ইহা সকল প্রকার পাণের মধ্যে কপটতাবাদ  
 কাঙ্ক্ষাবোধিত পাপ শিক্ষা দেয়। শিতগণ নামকদেরও  
 বিচারক; যে পিতামাতা বাবা-একজন কার্যে ঠিক  
 তাহার বিপরীত ভাৱের উপদেশের অসার শীঘ্রই ধরা  
 পড়ে।

কার্যের অসুচার্য হারা চরিত্র বীরের বীরে অজ্ঞাতসারে।  
অথচ দুর্ভাগ্যে গঠিত হয়। কতগুলি কার্য সামান্য  
লিখা যোগে হইতে পারে কিন্তু যেদিন জীবনের  
কার্যাবলীও ঐক্য তুমার কথিকার ভায় ক্রমাকারে অসু-  
স্থার পেড়ে কিছু প্রত্যেক কথিকা যখন স্থপতির সহিত  
লিখিত হয় তখন কোন ইচ্ছায় স্বপ্নের বিবর্তন সাধিত  
ন না; তথাপি এই তুমার কথিকাগুলি এক শ্রেণীভূত  
হয়। বিশাল তুমার স্থপতি নির্মাণ করে। এইরূপে  
সামান্যের তুল্য কথিকাগুলি একত্রের পর অষ্টটি সশেষাধিত  
হয়। অসংখ্যে অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং মস্তকের  
কার্যের ভাষা যখন নির্ণয় করে, এবং এক কথায় বলিতে  
হয় চরিত্র গঠিত করে।

শিল্পের কার্য ও আচরণের উপর মাতা, পিতা অপেক্ষা  
নেক অধিক প্রভাব বিস্তার করেন বলিয়া গৃহে তাঁহার  
দৃষ্টান্ত অতি অধিক প্রয়োজনীয়। কেন এইরূপ হয় ইহা  
সহজ। গৃহ, নারীর সম্পত্তি—তাঁহার রাজ্য। সে

দ্বিতীয় বর্ষ ৩০শ সংখ্যা।

विनाय-भूट

স্থানে তিনি পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করেন। সে রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রজাবৃন্দের উপর তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত। তাহার প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তিনি তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে হির দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্বরূপ বাহা। তাহারা অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য ও অমুচক্য করে।

কাউলি শেশবকালীন দৃষ্টান্তের প্রভাব এবং অন্তর্নিহিত  
ধারণা-নিচয় সম্বন্ধে বলিবার সময় তাহা দিগকে বয়োপ্রাপ্ত  
সংপ্রসন্নমান বৃদ্ধকে ফোঁদিত অক্ষরের সহিত তুলনা

করিয়াছেন। তখন যে সংস্কারগুলি দ্বয়ে নিবদ্ধ হয় তাহা সামান্য হইলেও কনও লুপ্ত হয় না। তৎকালীন ধর্মের নিহিত ভাবগুলি ক্ষুদ্রিত পতিত বীর্যের দ্বারা কখনও নিসৃত থাকিরা অক্ষুত হইয় এবং পরে কার্য, ক্রিয়া ও অভ্যাসে পরিণত হইয়া পল্লবিত হয়। তাহার অজ্ঞাত-সাধে বহীয রীতি, বাক্য, আচরণ এবং জীবনযাত্রা প্রাণী অস্থায়ের নিম্নেদের গঠিত করে। তাহার অভ্যাস তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহার চরিত্র প্রত্যক্ষ-ভাবে তাহাদের উপর বর্ষায়।

বিদায়-স্বপ্নে

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস গুপ্ত

গভীর রাত প্রশান্ত গভীর। শ্রিত্ত স্রোতংখর স্রুত  
মান আলোর স্রোতে পৃথিবী তার দেহ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে  
আছে—নীরব, নিশ্চল এমন নিস্ততিতে মাঠের ধারে,  
একতলা ঘরের ছোট একটি কামরায় কথা হচ্ছে—বাসীরা  
জীতে। ঘরের এক কোণে মোমবাতির স্রুত রেখাটি  
আকাশের স্রুত কণী তারাটির মত কেবলই কাঁপছে।  
তার মাঝার পার্শ্বে মুক্ত দূত হাড়া নিশান হাতে  
দাঁড়িয়ে।

সহসা ক্ষীণ হুয়ে, জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে দ্বী বল্লে—আচ্ছা, ডাক্তার কি বল্লে, আর ঝাচঝো না, না....?

—ধেং, ওসব কথা মুখে আনতে নেই ... .. হাঁ করে।  
দেখি অম্বাটা ঢেলে দি ... ..

—কেন আর এ সব? মিছিমিছি ... .. তুমি  
বলছেন না।

...আমি কিন্তু বেশ বুঝছি ... ..

—कि ?

—মরণ আমার ছুয়ারে দাঁড়িয়ে।

—কের বলছে। ওসব ছাই ভাষা !... .. নাও লক্ষ্মীটি  
চুপটি করে ঘুমোবার চেষ্টা কর একটু ।

—না, আমার চোখ বন্ধে ভাল লাগছে না। ...  
মোটাই হচ্ছে নেই। হয় তো এই ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়বো।  
আর সে ঘুম কখনো ভাঙবে না—এ ভীষনে... ...সব  
ফুরিয়ে যাবে এক মুহূর্তে। তার চাইতে যতক্ষণ পারি  
কথা কয়েনি। ... ... ওকি, কান্দচো ?

—দূর !.....কাঁদবো কেন ?

—তবে ?

—তবে কি ?

—आलोत आमान चेत हिलाम कि ना सेवे काम

ହସ୍ତ ତୋ ... ..

—ওহ ! ... .. আরো কিছু । ... .. কী সহজে তুমি  
সব উটে নাও । ... .. কৈ, দেখি তোমার হাতখানা ?

—ଏହି ନାମ

—এত ঠাণ্ডা কেন তোমার হাত ! ... ... ঔঃ !

... .. সব মনে আছে তোমার !



—কি কথা।

—বিয়ের দিন রাত্তিরে ... সেই যে। ... মা  
শো ... কি লক্ষ্য হিতে পারো তুমি ... যনে হ'লে  
এখনও সারা গা শিউরে ওঠে ... আচ্ছা, বল তো  
কেন এমন হয়?

—ওম্বব কথার উত্তর দেওয়া শক্ত। ... ওকি!  
অমন ক'রে জানে কেন। ... ভয় পেয়েছো?

—ভুলে না, হুসুরটা কি রকম করে ডেকে  
উঠলো—

—ভয় কি? এই তো তোমার ঘরে রেখেছি।

—কত কাল কত রকমে তোমার হাতখানা ধরবার  
সৌভাগ্য পেয়েছি, কিন্তু আজ এই বিদায়ের সময় কি মনে  
হচ্ছে জানো। ... কেবলই মনে হ'চ্ছে ... একান্ত  
এমন করে তোমার হাতখানা কখনও ধরতে পাই নি—  
কোন দিনও ...

... এই স্পর্শবৃষ্টির আমার সকল অহুত্ব  
অতিক্রম করে রক্তের কণিকার কণিকার মিশে যাচ্ছে। ...

—কিসের গন্ধ।

—হাসনা হেনার।

—ভুলেছো!

—কি।

—অলক্ষ্যে পেঁচাটার কি বিকট আওয়াজ। ...

কি বিস্তী ... বেজায় ভয় করছে আমার ... ঐ  
আবার বোধ হয় এবার ঘরের কোণে নিজের ডাল থেকে  
... তাড়িয়ে দাওনা পাখীটাকে? ...

... ঐ!

—কি।

—আজ কি তিথি?

—গুরুদী।

—ঐ ঠাক দিয়ে ছোয়াংসার আলো দেখা যাচ্ছে  
... কি হৃদয়র একটু গুলে দেবে জানালাটা। ...  
মুক্ত আবেগের মূখ অনেকদিন দেখিনি ... দাওনা  
গুলে একটি বার। ...

—না, না হিম লাগবে। তা কি হয়। ... ডাক্তার  
বারণ করছে ...

—ডাক্তার বলেছে নুবি হিম লাগলে খায়াণ হবে?

... আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে এ সব শুনে।

—কেন!

—ডাক্তার জানেন না, এখনো কিছু বোঝেনি। ...

আজ্ঞা শুভসূত্রির সময় তুমি অমনো করেছিলে কেন?

—কি রকম?

—ওমা! ... কি ভীষণ ভার ভার মূখ চোখ!

... আজ তুমি একটি কথার উত্তর দেবে সত্যি করে!

—কেন অস্থিভাঙ্গ হচ্ছে!

—যাও। ... আমি কি সে কথা বলছি। ...

বলো দেবে!

—হী!

—তুমি স্থবী হয়েছো!

—কি সে!

—আমায় নিয়ে ...

—খুব! আজ হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করবার অর্থ?

—কি জানি। ... এ সব কথা কেবলই মনে

হচ্ছে ...

... দেবে!

—কি।

—একটি ...

—আধুর?

—না, গো না ...

—যাও! বলবো না ...

... ঐ! ... এত

শীগগির মোটেই কিছু মড়তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না আমার ...

... খোকা কেঁদে উঠলো কেন? ... কে আছে ওর

কাছে?

—বিনি।

—ওথরে যা মশা। ... মনে বড় ব্যথা হইল, ওকে

আর একটু বড় করে রেখে যেতে পারলাম না, ... দেখো

আমার অভাবে ওর যেন একটুও কষ্ট না হয়। যদি

পারো একটি কাজ করো—দীর্ঘকাল কাছে পাঠিয়ে দিয়ে।

ভগবান তাকে একটিও ভেননি ... বেচাটী একেবারে রিক্ত।

আমি বেশ জোর করে বলতে পারি মটকে সে আমার

চাইতেও মের বড় করবে। সামান্য অভাবটুকুও আমার

মাণিককে অহুত্ব করতে হবে না। ... আর একটি  
কথা, ... তুমি একলা থেকে না ... মনে বেশী খায়াণ হবে।  
আমার বড় দিদির নন্দন সবিতাকে দেখেছো—বেশ মেয়েটি  
কিন্—

—কি যে সব বলো তুমি? ...

—না, গো না দেখো, আমি বলছি তুমি স্থবী হবে।

... ঐ আবার ... স্পষ্ট ভুলটি দরজায় কে কড়া

নাড়তে ... পাছো! ভুলতে ... বলে দাওনা গো আর একটু

পরে আসতে ... আর একটু অপেক্ষা করতে ... ঐ ...

ঐ ঘরে এলো— ... না, না আমি যাচো না—বেতে চাই

না ... গটগো আমার ঘরো তুমি—যেমনি করে তোমার

হাতখানা চেপে ধরেছি তেমনি শক্ত করে চেপে ...

খুব শক্ত করে ধরো ...

জীর মূখ দিয়ে এক বলক রক্ত উললে বেরিয়ে এলো

—বাশিণ বিছানা রক্তে রাঙা। হতভাগ্য শামী বৃকলে

কিসের এ ছায়া ঘনিয়ে আসতে তার প্রিয়তার মূখের উপর

অল্পে অল্পে ...

—উ! জলে যাচ্ছে ... আর যে পারি না সহিতে।

—কি?

—বৃকখানা। কি কষ্ট মাগো! ... একটু হাত বলিয়ে

দাও না। ... মনে থাকবে?

—কি কথা?

—এই যা বলে গেলাম। ... মটকে নিয়ে এসো না

...

তার চৈতন্ত হল—পাশের ঘরে থাকা বখন চীৎকার

করে উঠল।

একটিবার ... একটি আদর করে নি—অঙ্গের শোভ দেখেনি  
... না, না থাক ... সে রক্ত দেখে ভয় পাবে ও ...  
পরকাল মানো?

—যানি বৈকি!

—ভারী মজার না? ... মন্ত এ পৃথিবীতে ঘুরতে ঘুরতে

শেষে তোমায় আমার দেখা—কি বৈচিত্র্য ভরা। আমার

জন্ত জীবনে তুমি অনেক ব্যথা বেদনা পেয়েছো—আমার

চিহ্ন খোঁজতে হইলই—দেখি তোমার পায়ের একটু ...

তার কথা আটকে গেল। বজ্রার মত রক্তস্রোত

বলকে বলকে ছুটে বেরুতে লাগল—তার নাক মূখ

বিলে। তারপর বেগতে বেগতে সব হিম, শীতল, প্রাণ-

হীন, স্পন্দহীন। অতি নির্ধর্মের মত বিভাতাপুঙ্খ বৃষ্টির

তিরস্কারময় যবনিকা টেনে নিয়ে পৃথিবীর এ চেনা

মহল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেলেন। পুরুষের মূখ

হৃৎকের একান্ত আপনার সঙ্গিনীটিকে—যবনের আলো,

প্রাণের আশা-উৎস ছিল যে।

বিগাট মহা শুষ্ক নিশীথের বৃক চিরে শোব দৃষ্টি এক

ভাগ্যহীনের বিচ্ছেদ-কাতর আর্দ্রনাথ বাতালের কশ্মলে

কশ্মলে ঘুরে বেড়াতে লাগল—সারাক্ষণ স্নানহীন।

...

তার চৈতন্ত হল—পাশের ঘরে থাকা বখন চীৎকার

করে উঠল।

## পঠন ও পাঠ্য\*

### প্রিয়বোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি প্রবাহে যা ভাঙ্গান দিয়া আমরা বেধানে আসিয়া  
পড়িয়াছি, সেটি আবর্জ বিশেষ। আমরা এই আবর্জ  
বিশৃঙ্খিত হইতেছি, তবে আশা আছে যে এক সময়ে  
বর্ধমান আপন ঘুচিয়া যাবে, এবং আর একটা প্রবাহ

অবলম্বন করিয়া আমরা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে  
পারিব।

এমন এক দিন ছিল বখন আত্মরতির জন্ত আমাদের  
চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে হইত। শাজে সেই



চারিটি উপায়ে নাম ধর্মন, শ্রবণ, মনন ও নিবিধ্যাসন। দ্বিতীয়টির জ্ঞত শুধু শ্রোতা থাকিলেই চলে না, ভদ্রাইবার লোকও আবশ্যক হয়। জ্ঞত কার্যগুলি একের ঘাটাই সম্ভব। অশ্রবণের জ্ঞত আমরা উপযুক্ত ভুক্ত ও কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের সাহায্যে অগণনা করি। এখন গুরুর আবশ্যকতা নাই বলিলেই চলে—মুন্ডাক্য দেশবিশেষের গুরুকে অমর করিয়া আমাদের পুস্তকাগারে একত্র করিয়া দিয়াছে।

এখন বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-প্রকৃতির কোলে চিরশিশুর মত নিত্য নূতন উপহারে সচলিত হইয়া আমরা অন্তরে অন্তরে যে সমস্ততার আবাহনের জ্ঞত চিরসময় হৃৎপদে অজ্ঞাতে প্রসারিত করিলাম, তখন যে আনন্দ, যে ভালবাসা প্রতি অল্প পরস্পরকে আমরাই স্বয়ং এক অর্থও নতুন বাসিয়া দিত, তাহা মুন্ডাক্য নির্মিত নীরস মসীলিঙ্গ কাগজ-পত্রের স্তূপে অহুসন্ধান করিলে বার্ষজ্য হওয়াই স্বাভাবিক। তখন যাহা সত্য; শিব ও হৃদয়ে তাহা আপন-আপনি অন্তরে প্রতিভাত হইত, আমরা ধ্রুত হইতাম। তখন বিজ্ঞা ছিল কঠোর সাধনার জিনিষ, বিজ্ঞা লাভ করিতে হইত 'প্রণিপাতেন' পরিপ্রশ্নে 'সেবা', তখন বিচারের জ্ঞত কঠোর সংযম ব্রত গ্রহণ করিতে হইত; তখন বিচার দান ছিল বিদ্যে এবং সত্যক উপলব্ধি ছিল তাহার প্রমাণ। এখন আর সে দিন নাই। এখন বিজ্ঞা অর্থ সাহায্যে সহজেই লাভ করিতে পারে যাহা যাহ, কাহারও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন নাই। পূর্বের ছাত্র-শিক্ষক সমুদয় এখন ভাবিয়া গিয়াছে, এখন অসংযম ও উজ্জ্বলতা বিচারের অন্তরায় নয়, এখন বিচার দান অস্বাভাবিক এবং কোন মতে পরীক্ষার নির্দিষ্ট সংখ্যা লাভ করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে বিবাহিলায়ের একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিচার যথেষ্ট প্রমাণ বিতে পারা যায়।

বিচারের জ্ঞতই আমাদের আধুনিক পাঠাগারগুলি স্থাপিত হইয়াছে, এবং বাহ্যেই ইহার সংখ্যা বাড়িয়া উঠে তাহার জ্ঞত দেশবিশেষে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। সকলেরই বিশ্বাস ইহাতে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে ও হইবে।

পাঠাগার আলোক নিভাত প্রয়োজনীয়। অতীত ইহার সংখ্যা যত বাড়িয়া উঠে ততই মন্দ। কিন্তু পুস্তক সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

পূর্বে প্রতি গৃহ এক একটি শিক্ষাগার ছিল। পিতামাতা বালকবালিকাশের নানা প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই। এ শিক্ষা পুথিতে ছিল না। ছেলে মেয়েরা কুগোল, ইতিহাস নিদান না শিখিলেও পিতামাতার শাসনে সভ্যতা, ভদ্রতা আচার ব্যবহার, বাসনীতি বংশের মর্যাদা ও ধর্মশাস্ত্র কতক পরিমাণে শিক্ষা করিতে পারিত। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অনেক গৃহেই বৃদ্ধিয়া পাওয়া যায়। বর্ষদীর্ঘ গৃহীকালের মধ্যেও নীতিশাস্ত্রের প্রোকাশ শুনিতে পাইতাম। এখন যে কারণেই হোক গৃহের সে শ্রী আর নাই। এখন ছেলে-মেয়েরা বেচ্ছাচারী; আর তাহারা গুরুজনকে মানিতে চায় না; গুরুজনরাই এখন তাহাদের মানিয়া চলে। সারা দিন জীবিকার জ্ঞত পরিচয়ের পর তাহারা বিজ্ঞান-মোহু হইয়া পড়েন। ছেলে মেয়েদের তার প্রায়ই দারিদ্র্য হীন বাধ্যবোধী শিক্ষক ছেলেদের উপর দ্রুত থাকে। তাহারা লিখিতে পড়িতে, অক্ষ কবিত্তে কুগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান কতক পরিমাণে আলোচনা করিতে শিক্ষা করে। এমন উপায়ে এ শিক্ষা তাহাদের দান করা হয় যাহা তাহারা লাভ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এ শিক্ষা তাহাদের শরীর ও মনের উপর একটা নির্যাস আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়, কোন মতেই তাহার জীবনতরুকে নয় ও পল্লবিত করিতে পারে না। স্রুতায় শিক্ষার আনন্দ আর নাই বলিলেই চলে। বোঝানো করিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে ছেলের দল বিব্রোহী হইয়া উঠে। এই জ্ঞতই ঘরে ঘরে আব্যাহ্যতা ও মিথর শাসন। পূর্বে যে শিক্ষারূপে স্বাভাবিক ও সরল ছিল তাহাও লুপ্ত হইয়াছে। কোন গৃহে আর রামায়ণ, মহাভারত কেবল স্থর করিয়া পড়ে না। বশমতাদীর্ঘ্যের কথা—আধুনিক ছাত্রেরা অনেকে পিতামহের নামও বলিতে পারে না। গৃহদেবতাগুলি বাহারা পূর্বে নিত্য ঐকান্তিক ভক্তি ও যত্নে পূজিত হইয়া সকল গৃহস্থানীর

অন্তরে ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিতেছেন, আজ তাহারা গৃহের একটি নিভৃত কোণে নীরবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ছেলের দল—দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি বাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে তাহারা উদাসীন কণ্ঠিক আনন্দের জ্ঞত লালায়িত। অভিভাবকেরা তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত। এ অবস্থায় দেশের মধ্যে সহজেই এমন একটি শ্রেণীর উৎপত্তি অসম্ভব নয় যাহার পরমার্থ শুধু আহার ও বিহার। এখনই সে দলের স্রুচনা হইয়াছে এবং সে দল সংখ্যায় কম নয়।

ছেলের দল শিক্ষার আশ্রয় পাইল না। প্রাপের প্রেরণায় তাহারা নব নব আনন্দের আবেগে ছুটিতে লাগিল। মুন্ডাক্য এইবার শরীরে কল্পিত রূপ ধারণ করিল। যাহা যাহা হইতে কতি মুন্ডাক্য তাহাই আশ্রয় দেয়। অপরিকল্পিত অসংযত চিত্তের স্বাভাবিক পরিমাণে যত সাহায্যে উৎপন্ন হইল। যে গ্রন্থ জ্ঞান বুদ্ধির কারণ তাহা কখন তৃত্যের মত কণিক মনোরঞ্জন প্রবৃত্ত হইল। তারপর সাহিত্যের ব্যবসায়; গ্রন্থকর্তা ব্যবসায় বুদ্ধির প্রভাবে কর্তব্য বুদ্ধি জ্বলিয়া গেলেন। তারপর পুস্তক, চিত্র, রঙ্গমঞ্চ শুধু সাময়িক আনন্দ বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়া বলিল।

যে গ্রন্থে দূরদর্শন ও পরিপক্ক বুদ্ধির আভাস আছে, যাহা পাঠকের চিত্ত বৃত্তিকে শুধু কণিক ভাবে নয়, ভাবের অন্তর্নিহিত স্থায়ী রসে আকর্ষণ করে, তাহার সংখ্যা খুবই কম। এই শ্রেণীর গ্রন্থও কয়েকটি রচিত হয় না এমন কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে ইহার সংখ্যা যে কমিয়া আসিতেছে এবং পুস্তকাগারে এ সব গ্রন্থের আয়ত্ত ও যে কম তাহা কাহারও অবিরচিত নয়। এগুলি অমর, যতই লালিত ও বিবৃতি হোক না কেন—“কালো-দ্রব্য নিরবধি বিপুল চ পৃষ্ঠী”—ইহাদের আদর দান বিশেষে নিশ্চয়ই থাকিবে। এ সব গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অপর কিছু নাই।

প্রত্যহ সকালে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অসংখ্য যুবক ও যুব আকস্মিক কণ্ঠের অসঙ্গতিপূর্ণ কাটিয়াবার জ্ঞত এক একখানি অশুদ্ধ গ্রন্থ হাতে করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্রদের গ্রন্থ অহুসন্ধান করিলে তাহার

মধ্যেও এ সব গ্রন্থ প্রায়ই বৃদ্ধিয়া পাওয়া যায়। এই সব গ্রন্থ গৃহস্থানীরও আলোক সাহায্য সংগ্রহ করেন। মাসিক-পত্র ও রঙ্গমঞ্চের চিত্রে তরুণ মতি যুবক যুবতীর অমার্জিত কটিক প্রেরণ দিবার বশোভব যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

প্রতিবাদীর কথা আমরা শুনিয়াছি। সাহিত্য ও শিক্ষায় পশ্চাত্তর সম্বন্ধ নাই এ কথাও অনেকের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তর্ক যে কথা বলিয়া দেয়, অন্তর কিন্তু সব সময়ে তাহা মানিতে চায় না। আমরা দেশের বিশ্বাস যাহা মাথায়কে উন্নত করিতে পারে না, স্থায়ী আনন্দ বাহাতে নাই এবং যাহা কোন না কোন উপায়ে শিক্ষা বিস্তার সাহায্য করে না তাহা সাহিত্য নয়।

প্রতিবাদীরা আর্টের দোহাই দিয়াও অনেক কথা বলিয়া থাকেন—তাঁহারা বলেন আর্ট পবিত্র জিনিষ, শিক্ষা ইহার উদ্বেগ নয়। কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চুরি করাতেও আর্ট আছে; আর্ট হিসাবে চুরি করা মন জিনিস নয়, কিন্তু চুরি করা কার্য্যতঃ পাপ। সাহিত্যে আর্ট বিকশিত হোক কিন্তু সেই আর্ট যদি সাধারণের অন্তরকে পাপের দিকে আকর্ষণ করে, আর্টের প্রভাবে যদি নীচ চিত্তবৃত্তি প্রবল হয় তাহা হইলে তখন গ্রন্থকার দায়ী।

মাসিক সাহিত্যে অসংখ্য গ্রন্থের কত চিত্র কত কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ লেখক যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে চিরন্তন রসের সন্ধান পান নাই তিনি কল্পিত নায়ক-নারিকার মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে আপনাদের রচিত ও চরিত্রের পরিচয় দিয়া সমভাবাপন্ন পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। সম্পাদক গ্রন্থের সংখ্যা বাড়াইবার জ্ঞত সাধারণের অমার্জিত চিত্তকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে কুচিৎ পূর্ণ, কৃত্য বাস্তব চিত্রে মাসিকপত্র শোভিত করিতেছেন। কত সমাজের কত দেশবিশেষের পাণ্ডা-ভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার অলংকৃত অবাধে তরুণ মনের উপর কলমপাত করিয়া চলিয়াছে। সাহিত্য-মন্দিরের দ্বার আজ উন্মুক্ত। সকলেই ইহার মধ্যে কিছু বলিতে চাহিলেই প্রবেশ করিতে পারেন। এই জন-তন্ময়ের দিনে কাহাকেও বাধা দেওয়া কঠিন। সেই জ্ঞত



ইহার মধ্যে তত্ত্ব, প্রবীণ, মূর্খ, বিদ্বান, অজ্ঞত, অনাহত, সাধু, চরিত্র, রাজা, ভিত্তিয়ার, শিক্ষক, ছাত্র সকলেই ভিড় করিয়া বসিয়াছেন। আমরা সকলকেই আদরান করি, কিন্তু অন্য সাহিত্য আটের দোহাই দিয়া ঢালাইতে গেলে তাঁহাদের সাহিত্য রচনা একটা অত্যাচার বসিয়া পরিস্ফুট হইবে।

কাল হিলের উক্তি মনে পড়ে—The University of our days is a collection of books, অর্থাৎ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখন কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি মাত্র। কাল হিলের পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন দেখা যায় পুস্তক সমষ্টি শুধু বিদ্যালয়ের সম্পত্তি নয়, এখন ইহা সকলের সম্পত্তি। যিনি ধনী তাঁহার একটি পুস্তকাগার চাই—তিনি নিজে মূর্খ হইতে পারেন কিন্তু পুস্তক আশ্রয় স্বরূপ কতকগুলি স্বল্প পুস্তক তাঁহার আবশ্যক। এখন পুস্তক বিদ্যালয়ের ও শিক্ষার গভীর বাহিরে। বাহ্যের সমস্ত কাটে না, পুস্তক তাঁহাদের নিকট ভাস-পাশার কাজ করে। পুস্তক এখন বিলাসের সামগ্রী, উপহারের জিনিস, ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশ্য করিবার উপায়। গ্রন্থ প্রকাশের মূখ্য উদ্দেশ্য এক, গোপন উদ্দেশ্য নানা প্রকার। গ্রন্থের আদর করিতে গিয়া আমরা এই বহুল প্রচারের দিনে মূখ্য উদ্দেশ্যটিকে নোনা কুসিয়া যাই।

সেই ভ্রম আত্মজ্ঞান কোন্ গ্রন্থ পাঠ্য ও কোন্টি পরিভ্রাণ্য ভাষা, ভাষিয়া আটের উচিত। নানা পণ্ডিত নানা প্রকারে পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়াই আমরা বলিতে চাই কতকগুলি গ্রন্থ মূল, অন্তর্গত তাহাদের শাখা-প্রশাখা ও ছায়া। মূল গ্রন্থের সংখ্যা অল্প—যদি মূল গ্রন্থগুলিকে ভাল করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে অল্প গ্রন্থ পাঠ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে না। রামায়ণ মহাভারত পড়িলে অনেক গ্রন্থ অপূর্ণ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব কবির পদাবলী পাঠ করিলে অনেক আধুনিক কবির রচনা পাঠ আবশ্যক। গ্রন্থ সংখ্যা বহন দিন দিন বাড়িতেছে তখন নির্দোষ ও সমালোচনার অধিকতর প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু শুধু ইহার উপর

নির্ভর করিলে চলিবে না। যে শিখিতে চায় দেহভা তাহার শিক্ষকতা করেন। চেলা থাকিলে, বে-সে গুরুর কাজ করিতে পারে। যে প্রকৃত শিক্ষার্থী অচেতন পার্শ্বও তাহার নিকট কথা কয়।

বিজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য ইহাটতে পার্থক্য আছে। আজ-কাল যিনি দশ বিশ ধানি বিদেশী বা অসাধারণ গ্রন্থের নাম না করিতে পারেন তিনি বিজ্ঞালাভ করিয়াছেন এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না কিন্তু পল্লীর নিভৃত কোণে এমন অনেক সরল নিরক্ষর লোক দেখিতে পাওয়া যায় বাহ্যের শিক্ষার ভ্রম গ্রন্থের শরণাপন্ন হন নাই। আধুনিক অনেক পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট জ্ঞানে নিকটে। কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব ইংরাজী জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রকৃতি ইংহাদের শিক্ষারী। রামকৃষ্ণের কথা সকলেই জানেন; কেনন করিয়া এই অপণ্ডিত মহাত্মা ধর্মভ্রমে যুগান্তর আনিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে গেলে গ্রন্থের প্রতি আরা কমিয়া যায়। পণ্ডিত সাধারণতঃ অভিমতী। তিনি হয়ত আপনার আসনে আপনাকে একা দেখিয়া অপরকে হীন মনে করিতে পারেন। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে বাহ্যের সাধারণ বুদ্ধিতে ও উন্নত জ্ঞানে তাঁহাদের সমকক্ষ বা তাঁহাদের অপেক্ষাও উন্নত। ব্যবহারজীবীরা অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের গর্ব করেন, কিন্তু অনেক নিরক্ষর গ্রাম্য মাথলাবাজ যে ব্যবহার বুদ্ধিতে পরিণত তাহা অনেকেরই অবগত আছেন। স্বতরাং শুধু গ্রন্থই যে শিক্ষার একমাত্র উপায়, এ ধারণা সকল সময়ে সত্য এ কথা আমরা বলিতে পারিলাম না।

আধুনিক শিক্ষা, মুদ্রা যন্ত্রের প্রচার ও সাহিত্য নাম দিয়া ব্যবসায়ী ও অপেশাদার গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সংখ্যা আলোচনা করিতে গেলে মনে হয় দেশের মধ্যে একটা গুরুতর সমস্যা—আদিয়া পাড়াইয়াছে। এবং এ দিকে বকীর সাহিত্য পরিষদের দৃষ্টিও আমরা আকর্ষণ করিতে চাই।

লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষদিগেরও দায়িত্ব আছে। গ্রন্থের মধ্যে যখন এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত তখন গ্রন্থ বিতরণের সময় তাঁহাদেরও সতর্কতা আবশ্যক। এই শ্রেণীর লাইব্রেরীগুলির প্রকৃত শিক্ষার কার্যে সহায়তা করুক ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।



মহাত্মা গান্ধী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সারি সংকলন

## সত্যের পরীক্ষা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সমুদ্রসীড়ায় কোন কষ্ট পাই নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই আমার মানসিক অস্থিতি বাড়িতে লাগিল—জাহাজের প্রধান খানসামার সহিত কথা বলিতে আমার বাধ বাধ চৈকিত। ইংরাজীতে কথাবার্তা বলা একেবারেই অভ্যাস ছিল না এবং মজুমদার মহাশয় ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী সকলেই ইংরাজ—তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে পারিতাম না; তাহারা বলিলে কিছু বুঝিতে পারিতাম না, আর বুঝিলেও তাহার জবাব মুখে জোপাইত না। টেবিলে থাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ ছুরী কাটা ধরিতে জানিতাম না। দ্বিতীয়তঃ কোন্ বাজনে মাংস আছে কোন্‌টাতে নাই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইত না—স্বতরাং কাঁদায়া কিছু মিষ্টান্ন ও ফল ইত্যাদি খাইতাম। মজুমদার মহাশয় সকলের সকেই মিশিতে আমাকেও মিশিতে বলিতেন; বলিতেন—“আইন ব্যবসারীদের কথায় দৃঢ় হওয়া আগে দরকার—ইংরাজী বলিতে গিয়া কুলচুক হয় ক্ষতি নাই কারণ বিজাতীয় ভাষা ব্যবহারে কুল হওয়া খুবই সম্ভব—ত’ বলিয়া চুপ করিয়া থাকা ঠিক নয়”—ইত্যাদি। আমার জড়গড় ভাব কিন্তু কিছুতেই গেল না।

একজন ইংরাজ যাত্রী দায়ারণশ হইয়া আমাকে জম্জম কথা কহাইতে চেষ্টা করিলেন—আমি কে, আমি কি পাই, কোথায় যাইতেছি, এত বেশী লালুক কেন,—

ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও আমাকে টেবিলে বাঁধতে উপদেশ দিলেন—নিরামিষ ভোজ্যানের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“এতদিন বেশ চলিয়াছে (পোট দৈনন্দ পৌঁছিয়াবার পূর্বে) কিন্তু বিশেষ উপসাগরে পড়িলে তোমায়া মত বহলাইতে হইবে। আর বিলাতে যেক্ষণ ঠাণ্ডা, তাহাতে নিরামিষ খাইয়া মাংস যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এমন ত মনে হয় না।”

“কিন্তু আমি শুনিয়াছি সেখানে মাংস না খাইয়াও লোক বাঁচিতে পারে।”

“হে! ওসব একেবারেই বাজে কথা। আমি এমন লোক খেঁচি নাই যে মাংস খায় না। দেখছ না, আমি তোমাকে মজ্ঞান করিতে অমরোষ করি নাই—কিন্তু মাংসের কথা আলাদা, ওটা ছাড়া বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব।”

“আপনার উপদেশের ভ্রম ভ্রমবার কিন্তু আমি মাতার সমক্ষে শপথ করিয়াছি যে প্রবাসে কখনও মজ্ঞামাংস স্পর্শ করিব না স্বতরাং ঐ সমস্ত খাইবার কথা মনে হওয়াও পাপ। মাংস বিনা জীবন ধারণ করা যখন অসম্ভব মনে হইবে তখন মাংস গ্রহণ করা অপেক্ষা স্বদেশে প্রত্যাপনন করিব।”

আমরা বিধে উপসাগরে পড়িলাম। মজ্ঞামাংস অভাবে কোন কষ্ট বোধ করিলাম না। আমি নিরামিষাশী এই মর্মে আমার এই ইংরাজ বন্ধুর নিকট এক পত্র গ্রহণ



করিলাম। সবচেয়ে এই গজখানি সংগ্রহ করিলাম কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম মাংস ভোজন করা সম্ভব এইরূপ গজ সংগ্রহ করা যায়—সুতরাং উহার মূল্য কতটুকু? আর আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তবে পজ কি করিবে?

যাহা হউক এইভাবে আমার সাধামুটনে পৌছিয়া। সেদিন ছিল শনিবার। জাহাঞ্জে আমি একটা কাল পোষাক পরিয়াছিলাম—আমার সঙ্গে সাদা স্ক্যানেলের একটা পোষাক ছিল, আমি মনে করিলাম জাহাজ হইতে নামিবার সময় উহা পরিলে ভাল দেখাইবে, সুতরাং তাহাই করিলাম। তখন সেপ্টেম্বরের শেষভাগ—আমি দেখিলাম যে আমিই এককাল সাদা পোষাক পরিয়াছি। গ্রিগলে কোম্পানীর কর্মচারীর নিকট আমার সমস্ত জিনিসপত্র এমন কি চাবি স্তম্ভ সব রাখিয়া চলিলাম।

আমার নিকট ডাক্তার মেহতা, দলপতরাম স্ত্র, রাজসুয়ার রহিম সিংহী এবং দাদাভাই নোরজীর নামে পরিচয় পত্র ছিল। জাহাঞ্জে কোন লোক আমাদের ভিক্টোরিয়া হোটেলের পাশ লইতে বলে আমি ও জঙ্গদার মহাশয় তাহাই করিলাম। স্ক্যানেল পোষাক পরিধানের জন্ত বস্ত্রই লক্ষ্য করিতেছিল তার উপর যখন শুনিলাম, পরদিন আমাদের পোষাক ইত্যাদি পাওয়া যাইবে না কারণ রবিবার তখন একেবারে হতশ হইয়া পড়িলাম।

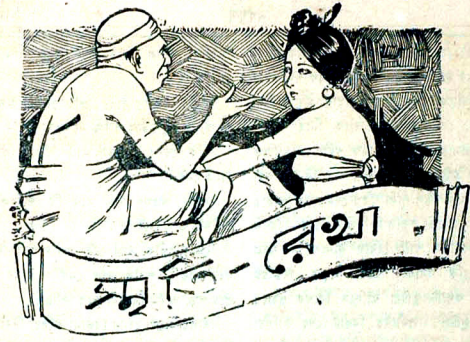
সাদামুটনে পৌছিয়াই ডাক্তার মেহতাকে তার করিয়াছিলাম, তিনি সেদিন সন্ধ্যার বেলা করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়া সাদার অভ্যর্থনা করিলেন। আমার স্ক্যানেলের পোষাক দেখিয়া দীর্ঘ হাস্য করিলেন। কথায় কথায় আমি তাঁহার টুপিটা তুলিয়া নাড়া চাড়া করিতেছিলাম—হাত বুলাইতে গিয়া টুপির উপরের লোমগুলি সমস্ত অবিশ্রুত হওয়ায় তিনি একটু বিরক্ত হইলেন। এই ঘটনা হইতে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে শিক্ষা করিলাম—ইউরোপীর আবহবায়নার এই প্রথম শিক্ষা—ভা:

মেহতা বলিলেন—“অপরের জিনিসে হাত দিও না। প্রথম পরিচয়ে কোন প্রশ্ন করিও না; জোরে কথা কহিও না—কাহারও সহিত কথা বলিবার সময় “Sir” বলিয়া সম্বোধন করিও না এদেশে ভূত্যেরা প্রত্যেক এইরূপ সম্বোধন করে।” ইত্যাদি, ইত্যাদি—তিনি বলিলেন হোটেলের থাকিলে বরজ বেকী গড়ে, কোন গৃহস্থের সহিত বাস করাই সুবিধা।

মঙ্গদার মহাশয়ের ও আমার উভয়েই হোটেলের থাকি অসম্মত হইতে লাগিল। মাষ্টার এক সিদ্ধি ভ্রম-লোকের সহিত মঙ্গদার মহাশয়ের আলাপ হয়, তাঁহার কাছে লগুন একেবারে অপরিচিত নয়—তিনি আমাদের বাসা বুঝিবার ভার গ্রহণ করিলেন। পোমবারে আমরা জিনিসপত্র পাইবামাত্র হোটেলের বিল চুকাইয়া নুতন বাসায় চলিলাম। আমার বিল হইয়াছিল তিন পাউণ্ডের। আমি ত অবাক! অথচ এই দুই দিন ত একরূপ উপবাসে কাটিয়াছে বলিলেই হয়।

নুতন বাসায় আসিবার আমার অস্বস্তি গেল না। কেবলই দেশের কথা, বাড়ীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। মাতার স্নেহের কথা মনে পড়িয়া রাগে চক্ষের বলে বালিশ ভিজিয়া যাইত কোনমতেই ঘুমাইতে পারিতাম না। এ ছুঃখের কথা কাহাকেও বলা যায় না। এখানে সবই নুতন ও অজ্ঞত, এদেশের লোকেরের চাল চলন এমন কি তাহাদের বাসগৃহটী পর্য্যন্ত যেন কিরূপ ঠিকিতে লাগিল। তাহাদের আদরকাহায় সম্বন্ধে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। নিরামিষ ভোজনের প্রতিজ্ঞার জন্ত আরও অস্বিধা ভোগ করিতে হইত। যাহা খাইতাম তাহাতেই কোন স্বাদ পাইতাম না। আমি উভয় সপক্ষে পড়িলাম। ইংলও আমার নিকট অসম্মত, আবার বসন্তে প্রত্যাগমন করাও অসম্ভব। যখন এডমুর আসিয়াছি তখন যেমন করিয়াই হউক তিন বৎসর কাটিইতেই হইবে।

(ক্রমশঃ)



শ্রীকবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### পঁচিশ

সমীর আজ কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল মহুয়ার মনের ভিতর একটা গভীর চিন্তা অত্যন্ত গোপনে বাসা বাঁধিয়াছে। মহুয়া সে জ্ঞাত অনেক সময় অজ্ঞানমনে থাকে। বাহিরে সে ভাব একেবারে অপ্রকাশ রাখিবার প্রয়াস পাইলেও তার স্বপ্নের টানাটানা নিঃশব্দক মনে তাগা প্রতীবিরহিত হইতে দেখা যায়। আজকাল সবচেয়েই মহুয়া যেন উত্তেজিত হইয়া পড়ে—এমন স্বভাব তার কোন দিন ছিল না। তবে কেন সে এমন হইল! সারা জীবন ধরিয়া সে তার দায়কে ছাড়া ত ছুনিয়ায় আর কাহাকেও চিনিত না ও জানিত না! ভাবনা কাহাকে বলে কোন দিনই জানিত না। সমীর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া অনেক অতীত কথাই মরণ করিতেছিল। অনেক পুরাতন স্মৃতি আজ বুকের বাখিত অস্তরের নিকট আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করিতেছিল। তার এত আদরের, এত স্নেহের, এত সোহাগের মহুয়া—যে পৃথিবীতে তার দায়ের অসীম শক্তির নিকট সর্বদা বিশ্বাসে নির্ভর্য, নত মস্তকে তস্তিত হইয়া অন্তরে বিপুল আনন্দ অহুত্ব করিত, সেই মহুয়া কিনা আজ এমন হইয়া গেল? কেউ কি তাকে তার অতীত জীবনের ইতিহাস বলিয়া দিয়াছে?

কেউ কি তার মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করিয়া দিয়াছে! সেও আজকাল—আমার উপর যেন দীরে দীরে শ্রদ্ধা, ভালবাসা হারাইতে বসিয়াছে। অবশ্য উহার একটা গুঢ় কারণ আছে! কোন শরতীন এ কাজ করিল! আমি যদি মহুয়াকে পাকা বদে না করিতে পারি তাহা হইলে আমার বেদে হওয়াই বার্থ। সমীর মনে মনে যে সন্দেহ করিয়াছিল, দিন দিন তাহাই তাহার অন্তরের ভিতর ভালপালা শিবড় গজাইয়া বহুমূল হইয়া আসিয়াছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, মহুয়া এই বাঙ্গালীর ছেলে প্রবেশকে ভালবাসিয়াছে। সমীর নিজে নিজেই বলিয়া উঠিল এত বড় অজ্ঞার কেন সে করিল। যাহা হইবার নয়, যাহা স্বপ্ননার সীমারও অনেক দূরে—তেনমন আশা কেন সে করিল! ভারিতে ভারিতে সমীরের চক্রে জল আসিল। সে মনে মনে বলিল, মহুয়া, দিদি, তোর সত্যিকার প্রেম-পিপাসা মিটাইতে তোর বেদে দায়ের সত্যাত্য। তবে তুই কেন এমন অসম্ভব আশার সাগরে ঝাঁপ দিলি? এবার সমীরের প্রাপটা যেন বালকের মত কোমল হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ মহুয়ার শিশু জীবনের কথা তার স্মৃতিগটে ভাসিয়া উঠিল। একটা পঞ্চম বয়ীয়া স্বপ্নের ফুট ফুটে মেঘে, হাতে একখানি চিঠি, তাঁহার কি তাকে তার অতীত জীবনের ইতিহাস বলিয়া দিয়াছে? পরিচানে



একখানি নীলাধরী ভূরে কাপড়—কঠে সুক্ণ সেপাচার বিছা-  
হার—নিখিল মনের মধ্যে স্বর্ণের আনন্দ বিকশিত হইয়া  
পড়ে চোখে ও সর্বাঙ্গে যেন কল্যাণ ধারার মত করিয়া  
মুগ্ধতা দেখাইতে, সেইদিন, মহাশয় তাকে নিয়ে আসে।  
এ কথা শ্রবণ হইবামাত্র সমীরের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত  
ও কঁকরিত হইয়া উঠিল। সে আপনা আপনি চমকিয়া  
উঠিল। তাহার মনে হইল সারা বিধ যেন আজ তাহার  
পূর্বের কর্তব্য তার সহায়তা করার নিমিত্ত সমীরের বিরুদ্ধে  
বিসেঁকা হইয়া তাহাকে শান্তি দিবার মানসে ক্রুদ্ধ-স্বল্প  
হইয়াছে। এই বুদ্ধি সমীরের তার নিভৃত অন্তরের  
অন্তঃস্থল লুকান কথটি ছুটিয়া বাহিরে বিধের দ্বার  
প্রচার করিতে ছুটিল। সমীরের বিরাট বেগ কাঁপিয়া  
উঠিল। তাহার মনের বল সংঘম যেন মুহূর্তের চিন্তায়  
শিথিল হইয়া পড়িল। তার কেবলই মনে হইতেছিল  
ভাগ্যি মহা এখানে উপস্থিত নাই, তাহা হইলে ত সে  
আজ ধরা পড়িয়া যাইত। সমীর আর বসিয়া থাকিতে  
পারিল না, উঠিয়া পাড়াইল। পাপলের মত চারিদিকে  
শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন কি খুঁজিতে লাগিল, তারপর  
ছুটিয়া ছুটিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। টাশান খুলিটা  
একবার নামাইল কিন্তু কি ভাবিয়া কল্পিত হস্তে পুনরায়  
যথা স্থানে রাখিয়া দিল। সমীর যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত  
হইয়া পড়িল। তারপর সে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে  
আসিয়া স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে  
লাগিল। তাহার মনে হইল এটা মহাশয় অপরাধ নয়—  
এটা তার বৌবনের দখল। বৌবনে কখন সাহসই  
এমন দ্বারা একই অন্তরময় হইয়া পড়ে। সেই সত্ত্ব সে  
আজকাল নামাত্র ব্যাপারে একটু খানি উত্তেজিত হইয়া  
উঠে। যাহা হোক এমন ভাবে এখানে আর বেশীদিন  
থাকা চলিবে না। মহাশয়কে একটা বেদের সঙ্গীর  
মুখে বিবাহ দিতেই হইবে নতুবা তাকে আর খরীদা রাখা  
সম্ভবপর হইবে না। তার মনও চকল হইয়াছে—সে  
সেখানে তার নয়, তার বয়সের। এই সময় মহাশয় নদী  
হইতে জল লইয়া ফিরিল, তাহাকে দেখিয়া সমীর নিজেকে  
সামলইয়া লইল। হাড়কে চুষ করিয়া বসিয়া থাকিতে  
দেখিয়া মহাশয় জলের কলসী নামাইয়া নিকটে গিয়া

জিজ্ঞাসা করিল “দাছ এমন করে আজ বসে আছিস  
যে।”

সমীর মহাশয় মুখের প্রতি চাহিয়া উত্তর করিল “কি  
যে কবি কিছু ভেবে পাচ্ছি না মহাশয়।”

“কি ভেবে পাচ্ছিস না? কোন কাজ কি তোমার  
হাতে নেই।”

সমীর অল্পকণ মনে মনে কি ভাবিল পরে বলিল,  
শরীরটা ভাল নেই রে।”

তোমার শরীর ভাল নেই শুনে আমার যে বড় ভয়  
করে দাছ। শরীর ভাল নেই ত ঘরের ভিতর গিয়ে  
শয়ে পড়, আমি বিছানা করে দিচ্ছি।

বলিয়া মহাশয় যেমন বিছানা করিয়া দিবার জন্ত উঠিয়া  
পাড়াইল, অমনই সমীর মহাশয় হাত ধরিয়া বলিল “না,  
তোমার খারাপ হয় নাই যে, শুয়ে পড়তে হবে। তুই একটু  
আমার কাছে বস।”

মহাশয় সমীরের নিকটে বসিয়া তাহার পায়ে হাত  
বুলাইয়া দিতে লাগিল। উভয়ে অনেককণ নীরবে  
বসিয়া রহিল। নিতুন্মত্তা ভঙ্গ করিয়া মহাশয় মুখ ও ঘেঁহ-  
পূর্ব কর্তৃক অহযোগ্য করিল “তুই কিন্তু দাছ কত করে  
আমি খুশিগিন। আমি একটু ঘুম আনি, তুই থা—তাহলে  
অনেকটা বল পাবি।”

সমীর বলিল “দুখের দরকার নেই।” মনে মনে  
বলিল “দুখে আমার অন্তরের দুর্বলতা দুই বার নয়।”

“এ নয়, ও নয়, তবে তোমার হয়েছে কি বলে বল  
তো।”

এবার সমীর বলিল, “তুই কিন্তু ঠিক অস্থান করেছিস  
আমার মনের অস্থব যে একেবারে নাই, সে কথা বলা চলে  
না, বিশেষ তোমার কাছে মহাশয়।”

সহসা সমীরের মনে হইল, মহাশয়কে তার শিশু  
জীবনের সঙ্গল কথা খুলিয়া বলে, এবং তাহাকে স্নেহ  
করিয়া একবার প্রবেশের পিতার নিকট গিয়া অকপটে  
বলিবে, যে আমার নাতনী তোমার ছেলেকে ভাল  
বাসিয়াছে। স্ততঃপ্রাণ তাহার ছেলের সহিত মহাশয়  
বিবাহ দিতে হইবে। প্রবেশের পিতা এ প্রস্তাব শুনিয়া  
যদি বিবাহ দিতে অস্বীকার করে? তারপর মেয়ে চোর

বলিয়া পুলিশে ধরাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সর্বস্বান  
হইবে। হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মহাশয়কে যে  
সারা জীবন কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া অপমানের  
নির্ধম আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে হইবে। তবে কি  
উপায়ে সে সমস্যার মহাশয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি?  
বেদের স্নেহ মহাশয় বিবাহ দিতে পারি, কিন্তু মহাশয় কি  
সেটা অন্তরের স্নেহে পছন্দ করবে? এতদিন ধরিয়া  
তাহাকে মাঘ্য করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—সে নিষ্ঠুরের  
মত আচরণ কি করিয়া করিব? ইহা ভিন্ন অন্য পথ  
নাই? আর একটা পথ আছে—মহাশয় আশা-আকাঙ্ক্ষার  
স্থল প্রবেশকে এই অগত হইতে চিরদিনের জন্ত অপসারিত  
করিয়া দিতে পারি। তাহা হইলে মহাশয় বেদে জীবন  
পূর্ণ হইতে পারে। আমি বেদে আমার ধর্ম মহাশয়কে  
—বেদের ভিতর বিবাহ দেওয়া—আমার যেহে মায়া, এ  
সব কথা ভাবিল চলিবে না। আমার জন্ত ত কেহ  
কোন দিন ভাবে নাই। না, আর কিছু নয় প্রবেশকে  
সহ্যাইতেই হইবে। তবে কোশলে। সে কাজ কিছু আমার  
পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু এই সময় মহাশয় বলিল, “দাছ  
চুষ করে রইলি যে? তোমার মনের অস্থবের কথা বলে  
বল।”

সমীর উত্তর করিল “আমি বুড়া হয়েছি, কবে আছি  
কবে নেই, তোমার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার  
মরণও স্থান নাই মহাশয়।”

“এই তোমার ভাবনা! তা একপক্ষ বললে হইত। এই  
সামাত্র একটা চিন্তা নিয়ে তুই দিন রাত্রি ভেবে মরছিস?  
কি মজা! বলিয়া মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া লুটা-  
পুটা বাইতে লাগিল। সমীর মহাশয় এই অস্বস্ত আচরণ  
দেখিয়া নির্ভীক হইয়া একদৃষ্টিতে মহাশয় মুখের প্রতি  
চাহিয়া রহিল। মহাশয় কোন কথা বলিতে পারিল না।

মহাশয় কথার স্রোত অন্ধ দিকে স্রিয়াইবার নিমিত্ত  
অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল, “তুই সেদিন যে  
গুণ্ণটা আমাকে শিখিয়েছিলি, আমি তা, একটা কুহকের  
উপর পরীক্ষা করে দেখছি।”

সমীর মহাশয় কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা  
করিল “তুই এরই মধ্যে পরীক্ষা করেছিস।”

“হ্যা, করেছি।”

“দেখিসু! দিদি জীবন থাকতে আর কোন দিন যেন  
এ গুণ্ণ পরীক্ষা করিসনি। কি জানি কখন কেউ লুকিয়ে  
মেখে নেয়।”

এবার সমীর একটুখানি উৎসাহ প্রকাশ করে বলিল  
“ভাব কি জানিস মহাশয়—তোমার বিবাহের কথা।”

মহাশয় মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া গেল। সে, সঙ্গল  
কথার উত্তর দিবার মত একবার কোন উত্তর দিতে  
পারিল না, মুক্তিবার দিকে চাহিয়া, নীরব হইয়া  
রহিল।

“তোমার বিবাহের ব্যয় হ'য়েছে—এখন বিবাহ করতে  
হবে—একটা বেদের সর্দার মনের মত মনে করতে পারছি  
না। আজ প্রায় দু'বৎসরের উপর হয়ে গেল, নির্ভাগিনের  
মত এই এক জায়গায় ঘর বেঁধে রয়েছে কি না? এদিকে  
আমার শরীর যে আর বড় বেশী দিন টিকবে তা আর  
বিধাস হয় না মহাশয়।” বলিয়া সমীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস  
ত্যাগ করিল।

মহাশয় বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত চকল  
হইয়া পড়িয়াছিল। কি উপায়ে উপস্থিত বিবাহের  
কথা স্থগিত রাখিতে পারা যায় তাহা চিন্তা করিতেছিল।  
বেদে জীবনের উপর তাহার অত্যন্ত ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল।  
যে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, যত দিন দাছ আছে তত  
দিন কোন প্রকারে তাহাকে থাকিতে হইবে। তাহার  
পর সে কোন একটা আশ্রয়ের সেবা কার্য লইয়া সারা  
জীবন কাটাইয়া দিবে। চিরকুমারী ব্রত হইবে তাহার  
জীবনের লক্ষ্য। সে অনেক চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছিল,  
নিজের স্বার্থ বিসর্জন ভিন্ন অস্ত্রের সেবা করা অসম্ভব।  
মহাশয় মনে মনে কত ক্রন্দনই করিত। এরই মধ্যে  
প্রবেশ আসিয়া তাহার চিন্তার পথে কেমন করিয়া ঘীরে  
ঘীরে যে নিজের জন্ত শানিকটা স্থান অধিকার করিয়া  
বসিল, তাহা সত্য মহাশয় ধরিতে পারিল না। মহাশয়  
চিন্তাকালে কখন যে কাণ্ডন আসিয়া আঙন আলিয়া দিয়া  
গেল—চূত আসিয়া মুহূর্তের মধ্যে কখন যে মোমাছির গুজন  
আরম্ভ হইল, কখন যে মনের মত আসিয়া আসিয়াছে যাহুক-  
করা বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তাহা, মহাশয় সারা জীবন



কুমারী থাকিবার সম্বন্ধকে কোন অনিচ্ছিত পথে কখন যে অজ্ঞাতে ভাগাইয়া লইয়া গিয়াছিল; তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। মাহুষের সকল বুদ্ধির অজ্ঞাতে যে দেবতাটি চিরদিন এই অভিনব কাজটি করিয়া আসিতেছে, তাহাকে বেশ, কাল, পাত্র পাঞ্জী কোন বিচার কোন দিন করিতে কেহই দেখিল না। কল্পনাভীত কাণ্ডোই এই বসন্তের দেবতাটির চিরদিনই পরম আনন্দ। মহম্মার শত সতর্কতা ও সংযম স্বত্বেও তাহার অনেক উপর এক পোঁচ রং ধরিয়া গিয়াছিল।

সমীর সে রংয়ের কতকটা যে দেখিতে পায় নাই, তাহা নয়, সেই জন্তই তার বর্তমান প্রস্তাব মহম্মার বিবাহের। সেই জন্তই সে এত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

মহম্মা বলিল “দাছ বিবাহের জন্ত তুমি এত ভাবছ কেন। আমার মনে হয় আমাদের মত লোকের বিবাহ না করাই উচিত। এই একটা কথা বলিতে মহম্মাকে যে কতখানি চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।”

মহম্মার কথা শুনিয়া সমীর যেন অবাক হইয়া গেল। সে প্রথমটা কোন উত্তর দিল না। তার বড় বড় গোল গোল চক্ষু চুষ্টা লাগি হইয়া উঠিল। সে একবার মহম্মার মুখের দিকে তাকাইয়া অভ্যস্ত গভীর ভাবে চক্ষু ফিরাইয়া লইল। তাহার মনের ভিতর যেন সহসা একটা বড় বিপুল বিরুদ্ধে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়া গেল।

মহম্মার এতখানি উজ্জ্বল ভাব, এতখানি স্বাধীনতা সে যেন বরণাণ্ড করিতে কিছুতেই পারিতেছিল না।

সামান্য অশিক্ষিত বেনের মেয়ের মুখে এত বড় কথা কোথা হইতে আসিল। সে অনায়াসে বলিল কি না “আমাদের মত লোকের বিবাহ না করাই ভাল।” সত্যই কি মহম্মার অন্তর হইতে এ কথা আসিয়াছে। সত্যই কি মহম্মা তাহার অবস্থা বুঝিয়া বিবাহ করিতে রাজী নয়। এতগুলি কথা সে ত কোনদিন আমার সম্মুখে বলিতে ভরসা করিবে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। তবে কোন সাহসে সে বিবাহ করিবে না বলিতে পারে। তারপর সমীর বলিল “সেখ মহম্মা বিবাহ না করিলে কেমন করে থাকবি বল। কে তোর ভার গ্রহণ করবে, আমি ত তোর জন্ত অমর হয়ে পাহারা দিবে বলে থাকতে পারব না। এ সব বড় কথা আমাদের মত দুঃখীদের জন্ত নয়।”

দাছ তুমি বেধেপরবশ হয়ে যে কথা বলছিস, তা ঠিক নয়। আমরা বেদে। কাহারও অধীন নই। তবে বিবাহ করে কেন বেজ্ঞাব অস্ত্রের অধীন হব বল। না, না, মহম্মা তা কিছুতেই হতে পারেনা। বিবাহ না করে, তুমি কি তোর সারা জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে চাও, তা হবে না মহম্মা তোর দাছ থাকতে হবে না।

কেন হবে না দাছ!

এ তোর অন্তস্তব প্রস্তাব!

(ক্রমাৎ)



চোলের চোলা

গত সপ্তাহের নবযুগে জাপ। হইতেছে এমন সময় শুনা গেল যে মিঃ হার্মিয়ান বোয়ে ক্রনিকেলের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সহিত মতানৈক্য এই পদত্যাগের কারণ। আমাদের মনে হয় হার্মিয়ান সাহেবের মত একজন ভারত হিতৈষী বন্ধুকে ছাড়িয়া ক্রনিকেলের বোর্ড হরুদ্বির পরিচয় মিলেন না। তবে এখনও আগোষে অষ্টকো মিটারবার চেষ্টা হইতেছে—এবং তাহা সফল হইলে সফল দিক দিয়াই ভাল হয়।

মধ্য জিরাফুরের থেনুগাছুর নামক স্থানের ৩০ জন পুত্রো (এত দিন পর্যন্ত বাহারা অশ্লুত বলিয়া পরিগণিত হইত) মন্দিরের পার্শ্ববর্তী বাতা দিয়া নিরীখে বাইতে পারিয়াছে। স্থানীয় হিন্দুনেতাপণ তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মন্দিরে লইয়া যায় ও তাহাদের প্রান্ত ফল ও কৃত দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। অশ্লুততা এই ভাবে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়।

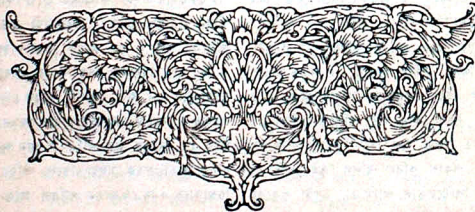
বিশেষ হইতে আনন্ড উদ্ভিক্ত যুগের উপর উক্ত হারে আমদানী তত্ত্ব বসাইবার জন্ত একটা প্রস্তাব কাউন্সিল অব ট্রেটে উঠে কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় উহা পাশ হয় নাই। উদ্ভিক্ত যুগ যে মদীর দোকানে আসিয়া বিতক্ত যুগ বলিয়া বিক্রীত হয় তাহা গভর্ণমেণ্ট জানেন এবং তাহার নিবারণ করণে যে অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহার ভয়ে যে ভোগাল খাজ ভ্রম্য বিক্রয় বন্ধ করা যায় না, এসব জানিয়া শুনিয়াও যদি সরকার বাহাদুর অকারণে প্রস্তাব অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ না করেন তবে আর উপায় কি?

মৌলানা শওকত আলীর অল্পবয়সে মান্দালের অন্তরিত বন্দীপণ প্রায়োপবেশন ব্রত ত্যাগ করিয়াছেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় মৌলানার অহরোধ রক্ষা করিয়া উহারায় হরুদ্বির পরিচয় দিয়াছেন।

“রাঙলার” বার্ষিক সংখ্যা পাইয়া আমরা বড় আনন্দিত হইয়াছি। চিত্রে প্রবক্তে বাঙলার এই বিশিষ্ট সংখ্যাটি বেশ নোভা হইয়াছে—বিভ্যাচল ভ্রমণ নামক প্রবন্ধটি তদাধো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আকার ও সৌভব হিসাবে মূল্য স্থলভই হইয়াছে। সংবার সাহিত্যে বাংলা নিজেদের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বেঙ্গলী আবার হস্তান্তরিত হইল। শূর্য্যার কারসাজী যে আর বাঙলা দেশে চলিল না ইহাতেই বুঝা গেল যে ভ্রমিক বিভাগে অবস্থানালীকে স্থান দিতে বাধ্য হইলেও বাঙলাদেশ এ সময় ব্যাপারের এখনও অবস্থানালী কর্তৃক স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। এবারে স্বতন্ত্র দলের কর্ত্তা মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী বেঙ্গলীর কর্ণধার হইলেন। ইতিপূর্বে অনেকই বেঙ্গলীর কর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাহাকে এ পর্যন্ত খাড়া রাখিতে পারেন নাই, দেখা যাক এবার কি হয়। বেঙ্গলীর আবহাওয়ার মধ্যে মজীরের একই সম্পর্ক অহত্ব করা যায়, স্বতন্ত্র মলগতি বেঙ্গলীর প্রেমের মজিরা শেষে মজীর নিগঢ় পারিয়া বলিবেন না তো।

তুরঙ্গ বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কণ্ঠচাটারীদেয় মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক তুরঙ্গ বাসী নিযুক্ত করিতে হইবে এই মধ্যে তুরঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এক ইত্যাহার দিয়াছেন। মৃত্যাক





কেমলের হাতে পড়িয়া তুরকের মাটা এখন বেশ কঠিন হইয়াছে, এখন সে মাটা শেভার বিশেষণণ আর পূর্বের মত সহজে ঝাঁড়াইতে পারেন না। তুরকবাসী বর্ষাচাঁর সাহায্যে প্রকৃতির গুলির কাণ্ডও বেশ চলিয়া যাইতেছে। ভারতবাসীরা বুদ্ধি বিজ্ঞা বা কোন প্রকার শক্তিতে তুরকবাসী অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু দেশের রাজা চালাইবার জ্ঞান শৈলের কাঁচামোর আবশ্যক হয় এবং সরকারী উক্ত পদ খালি হইলে যোগ্য ভারতবাসী প্রায় দৃষ্টিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝা যায় যে বুদ্ধি বা বিজ্ঞার অভাব ভারতবাসীর অযোগ্যতার মূল কারণ নহে আসল কারণ তাহারা বিজিত পরাধীন এবং তারা নিয়ন্তৃত্বাধীন যোগ্যতা তাহারা কোন কালে অর্জন করিতে পারিবে না ইহা হুনির্শিত।

কলিকাতায় গুণ্ডার উপজব আবার স্বহু হইয়াছে— কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটা গুণ্ডার অভ্যাসচারের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—হঠাৎ গুণ্ডাদের আবার মাথা চাড়া দিবার কি কারণ বলি? টেগার্ট সাহেবের আমলটা আমরা শুধু নয়নের জন্তই স্বরখি মনে করিতাম। কিন্তু টেগার্ট সাহেব স্ত্রীর হইয়া থানা বাইতে ও অভিনন্দন লইতে যাত আসেন দেখিয়া বোধ হয় গুণ্ডারা যোগ্য বুদ্ধিয়া কোপ মারিতেছে।

কলিকাতার মধ্যে চুরির সংখ্যাও আবার বাড়িয়াছে—সংগ্ৰতি আমাদের কাঞ্চালয়ের নিকটস্থ গল্লাংয়ে দুই একটি চুরি তো হইয়াছে উপরন্তু চোরদের উপজবের কথাও শুনা যাইতেছে। পুলিশ প্রচুরা বোধ হয় বড় কড়ার উপাধি লাভের জন্ত দৃষ্টি করিতে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু গ্রামীণ সহরবাসীর প্রাণ যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে।

অজ্ঞাত ব্যয়ের চেয়ে এবার মাত্ৰিক পরীক্ষারীর সংখ্যা ছিল অল্প—কারণ কি? চাকরীর বাজারে মাত্ৰিক আর কলিকা পাইতেছে না বলিয়াই বোধ হয় বালকদের অভিভাবকবৃত্ত মাত্ৰিক মাকালের উপর নারাজ হইয়াছেন। বাক, পাশের প্রলোভনটা পরিত্যাগ করার মত শক্তি যদি বাঙালীর হইয়া থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট!

স্বরাজ্য দলের দলপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সন্দর্ভে আইন-সভা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—ফলে আইন-সভা, বিবরণ আইন অঙ্গনে বৈরুপ-প্রতিনিধিত্ব মূলক হওয়া আবশ্যক সেইরূপ না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যাটেল সেদিনকার মত সভার অধিবেশন স্থগিত রাখেন। কারণ এই অবস্থায় সভা চালান মাঝে শাসন বিভাগের স্বত্ব ক্ষেত্র হকুম সাহেব ওয়া দাঁড়ায়।

স্বরাজ্য দলের এই কার্যের ফল ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এখন বলা বড় কঠিন। ভারতের আন্তরিক কল্যানকামী (?) মতিলাল সাহেব ইহাতে বিশেষ দৃষ্টি বুদ্ধি নাই মনে করেন। চৌরঙ্গীর চাপকা বলেন একটা স্বরাজ্যদলের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, স্বতন্ত্রদলের পাণ্ডারাও মনে তাহাই করেন যদিও মুখে ততটা বলেন না। বাহা হউক, এই কার্যের মধ্যে জাতীয় জীবনের একটা জীবন্ত অগ্রিমূল্য দেখা যাইতেছে—তাহা বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্ভবধারী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেশের জন্ত সম্মত হইয়া কার্যের চেষ্টাও তাহাতে সাফল্য। স্বরাজ্য-দল যদি আজ ছড়ন্ত হইয়া যায় বা কোন কারণে তাহা নষ্ট (ধ্বংস না করুন) হইয়া যায় তথাপি, মাত্র জীবনের এই একটা স্পন্দন প্রদর্শনের জন্তও ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাহাদের কার্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং জগৎ জানিবে যে, এই সম্মতবক্তার প্রেরণার উৎস ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

“অসুতৌরক মায়েন শকরী ফরকায়তে”—এইবার কাউন্সিলের অল্পজলে স্বতন্ত্র পুঁটার ঝাঁক লাকালমি করিবে—কিন্তু এই পুঁটার ঝাঁকের দৌড় যে মিলাটারি সোপানের পাদদেশ পর্যন্ত তাহা দেশের লোক অনেক দিন বৃষ্টিতে পারিয়াছে। স্ববিধাবাদের দ্বারা কখনও জাতির কার্য বা দেশের কার্য করা যায় না।

পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেড স্টেটসেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে “আইনসজী” (কুমকী মালাই) বিক্রীত হয় এবং আইনসজী খাওয়ার মাঝা দিন দিনই বাড়িতেছে।

১৯২৪ সালে যে পরিমাণ আইনসজী খরচ হইয়াছিল ১৯২৫ সালে তাহার ছয় গুণ অধিক হইয়াছে। একা নিউইয়র্ক সহরেই ৬০,০০০,০০০ কোয়ার্ট আইনসজী খরচ হয়—হিসাব করিলে প্রত্যেক অধিবাসীর অংশ ১০ কোয়ার্ট আইনসজী পড়ে। এ দেশের আইনসজীয়ে বৈরুপ ভেজাল চলে—নিউইয়র্ক সেইরূপ ভেজাল চলিলে পেটের অস্থির অধিকাংশ অধিবাসীই বৃষ্ট পাইতেন।

লওন বন্দরকে সামুদ্রিক বন্দরের মত কার্যোপযোগী করিবার জন্ত চেষ্টা হইতেছে। টিলবরীতে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ‘ডক’ তৈয়ার হইতেছে এই ডকের জলরাশির আয়তন ৬,০০০ ফিট লম্বা ২৫০ ফিট চওড়া হইবে এবং ইহার প্রবেশ দ্বার দৈর্ঘ্য ১১৫০ ফিট ও প্রস্থ ১৩০ ফিট হইবে।

ইজিপ্টের কায়রো সহরে ঐ আয়তনের পৃথিবীর অস্ত্র যে কোন সহরের চেয়ে বেশী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক আলোকের সাহায্যে শাক-সবজি ও ফল প্রভৃতির উৎপাদনে প্রভূত সাহায্য হইতে পারে পরীক্ষায় এইরূপ নিদ্বারিত হইয়াছে। একটা লেটুসের ক্ষেত্রে উপর সন্ধ্যার পর হইতে ছয় ঘণ্টা কাল এটা বৈজ্ঞানিক আলোক কুলাইয়া রাখা হয়; ১২ দিন পরে দেখা যায় উহার পার্শ্ববর্তী অস্ত্র লেটুস গাছের চেয়ে বৈজ্ঞানিক আলোক প্রাপ্ত লেটুস পাছগুলির পাতা ২০ গুণ বেশী বাড়িয়াছে। মোটের উপর স্বাভাবিক পরিপত্তি হইতে যে সময় লাগে বৈজ্ঞানিক আলোর সাহায্যে তাহার অর্ধেক সময়ইে উদ্ভিদ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তবে বায়ু হিসাবই ইং কৃষির উপযোগী কি না তাহা বির কথা আবশ্যক।

আমাদের স্থাবরিক দেশসেবী—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দি ইন্ডিয়ান লেক্সিকলগিট এ্যাসসোসিয়ে নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার মূল্য হইয়াছে ৪০ আনা। এই পুস্তকে তিনি জানাইতে চাহিয়াছেন যে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন কালীন নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট যে প্রতিক্রিয়া দিয়াছিলেন তাহা যথাযথ পালন করিয়াছেন। তবে তাহার নির্বাচন সময়ে তিনি যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন উহার একটা প্রতিলিপি এই পুস্তকে থাকিলে তাহার প্রতিক্রিয়া পালনের যথার্থ মূল্য নির্ধারণের সুবিধা হইত। আর একটা কথা, নির্বাচকগণের সকলেই ৪০ আনা বায় করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন কি?—

জ্ঞান ভালোটেইল চিরোলের নাম ভারতে কে না জানেন! তিনি যে ভারতের জ্ঞান এখনও বিলাতে বসিয়া মুক্তি বায় করেন তাহাও অনেকে জানেন। সম্ভ্রতি তাহাতে তিনি এডিনবর রিভিউ পরে এক প্রবন্ধে শ্বেত চন্দ্রধারীদের তাহারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ণণা ভবিষ্যতে যে কিরূপ বিশ্লেহের যত্ন করিতেছে সেই বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য যে সাধু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—তবে সমস্ত শ্বেতচন্দ্রধারীগণ তাহার মত জ্ঞত হইয়া পড়িতেছেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়!

বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ ধনী—মিঃ সাহেনের স্বকৃত্যেও ইন্ডিয়ান ডেলি মেলের ভূতপূর্ব পরিচালক মিঃ হলসিং ফোর্সের অধিনায়কতায় “মহিৎ পোষ্ট অব ইন্ডিয়া” নামক একধাণি ইংরাজী দৈনিক পর প্রকাশিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বোম্বাই সহর সংবাদ পত্রের ব্যবসায় কলিকাতাকে ছড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে—কেন?



# বঙ্গালয়

সংযোগী আত্মশক্তি গত সপ্তাহে লিখেছেন,—  
“মিঃ থিয়েটার যে ভাবে প্রাচীর পতাকা লাগাতে শুরু করেছেন তা’তে মনে হয় থিয়েটার খুলবার আগেই তারা একটা কিছুই জুড়ানী করে বসেবন। “ঐত্বগার” মহলা শুরু হয়েছে বটে তবে তা আসলে নামাতে নামাতে বৈশাখ এসে পড়বে। চৈত্র মাসটাও হিন্দুশ্রদ্ধ মতে শুভকর্মে পরিভ্রম্য। কাজেই বাকী সোয়া এক মাসে যে অস্থাতে “মিঃ থিয়েটারের প্রাকার্ড পড়ছে হিসেব করে দেখলে ঠাড়াবে অন্তঃ—উনপঞ্চাশট! অবশ্য শেষোক্ত যে এ-গতি accelerated হ’বে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।” জুড়ানীটা তাহলে প্রাচীর পতাকাই হবে!

“প্রিয়দর্শন, জনপ্রিয়” ইত্যাদি বিলাতী লাঙ্গুল বিশিষ্ট যে সব অভিনেতৃগণের আবির্ভাবের সজাবনার আমরা নিত্য উৎফুল্ল হয়ে উঠি, তা’দের অনেকেরই পরিচয় আমরা জানি না। তবে তখন আশপ্ত হ’লাব, এদের কেউ কেউ অল্প-পরমাণু নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আবার কেউ কেউ কাণে যত্ন-বিশেষ দিয়ে অভিনয় করার স্বত্বত্ব প্রদান করেন! এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে—এদের রসজ্ঞান অতিস্থ!”

মিঃ থিয়েটারের শ্রীত্বা সপ্তকে সংযোগী “নাচঘর লিখিয়াছেন,—“আমরা, শ্রীত্বা নাটকের কোনো কোনো ক্রিয়াকাল্পির সপক্ষে যে জনরব শুননু তা নীচে লিপিবদ্ধ করুন” :—

- শ্রীত্বা—শ্রীমতী তারাস্বরূপী।
- কামকলা—শ্রীমতী কুমুমসুন্দরী।
- মহিষাশুর—শ্রীনিখিলেন্দু সাহিত্যী।
- ইন্দ্র—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখারী।
- আশাপ্রদ বটে!”

কিন্তু আমাদের মনে হয়—নির্দল বাবুর চেহারাটা মরিচ বা অশুর কোনটার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রাখতে পারবে না কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক মহাপুরুষ আছে—বিনি ও ছইটার মধ্যদা রাখতে পারতেন—তার উপর এক বড় অবিচার কেন করা হল?

রসরাজ অমৃত লাল লিখিয়াছিলেন “বেহাঙ্গা বাধিতে পারে অপেরার গান”—অজ্ঞকালের দিনে সেটা সত্য হয়ে পড়াত্তে। চারিদিকে যখন রাম ঠাকুরের নামে প্রাচীর-বিজ্ঞাপনী পড়তে লাগল তখন হঠাৎ তার মাঝে “প্রাচ ও প্রাচীণ বিশদতকারী তামাসু সজ্জাকর কালু বেহাঙ্গার” নামেও এক প্রাকার্ড দেখা গেল আমরা ভাবিয়াছিলাম এটা কোন রঙ্গালয়ের প্রতিপক্ষ রঙ্গালয়ে ব’ড়ের চালে মাং করিবার চেষ্টা। ব্যাপারটার মধ্যে যেটুকু রসিকতা আছে সেটুকু সহরবাসীরা বেশ উপভোগ করিয়াছেন।

আগামী ২০শে মার্চ তারিখে মিনার্ভা সম্প্রদায় ‘বাহাদুরী’ নাটকের প্রথম অভিনয় করিবেন বলিয়া জনা বাইতেছে। সম্ভবতঃ পর সপ্তাহেই মিঃ থিয়েটারে ‘ঐত্বগার’ নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইবে—তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় এপ্রিল মাসে হওয়াই সম্ভব। তিনটি থিয়েটারে তিনবার নাটক এ প্রতিযোগিতায় কে হারে কে জিতে দেখা যাক।

‘নটরাজ’ নামে একখানি রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পত্রিকা দেখিলাম। কেবল রঙ্গালয় সম্বন্ধে পত্রিকা লিখিবার মত দিন এবেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। থিয়েটার তো বর্তমানে দুইটা চলিতেছে—আর একটা ঈজই খুলিবার সজাবনা আছে—তাহাতে দুইখানি কেবল রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় পত্রিকা চলিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।



ব্রিটিশ বর্ষ]

৬ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩২, ইং ২০শে মার্চ ১৯২৬

[ ৩১শ সংখ্যা ]

## জাগরণ

ঐশ্বর্যদ্বন্দ্ব দেবী

হৃৎপ বনানী জাগরণ বাণী আকাশ করেনি উচ্চারণ,  
নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শুদ্ধ এক পাশে, ধাঁড়িয়ে রয়েছে সমীরণ!  
তরুণাবলী, আর বাবলি বরেনা মনের কথা,  
আতুল শাখার, অচল আকার, যেহান মগন নীরবতা!  
কুমুম ফুটিয়া, হেসে নীলিমায় মেলে নাই মুদিত নয়ন,  
পর্ণশয্যা পাকি, ফুটাইছে রাক্তি, বচক চাক জোছনা শয়ান  
তার দশদিকে জাগে অনিমিষে উদয়ের গণিমা লগন,  
অধগ লারখী, চেতন ভারতী, বহি লয়ে আসিবে কখন!

পূরবে হৃদয়ে, ধলজার শিঁদুরে, মুছে দিল তিমির কালিমা,  
তরুণ আলোকে বিভাসিত চোখে, দিকে দিকে জাগিল নীলিমা,  
বনের অন্তরে মুছ মৃন্ময় জাগো জাগো বলে সমীরণ,  
বিহঙ্গমুল্যে পরশ ব্লায়ে গীতলিপি করে বিভবন।  
বাতাসে ইসারা মূল বেগ সাড়া, জেগে উঠে বিলায় হুরতি,  
পলাশ পাকল, ঘুফিা বহুল, কুবনয় চম্পক কররী!  
দিয়ার ছায়া খুলে যায় আর পড়ে থমে ঘোমটা মাঝার  
রবিকর লেখা, চোখে দেখে দেখা, বসে গিয়ে মরম মাঝার।





## বাংলার পীর কাহিনী\*

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

১

বাংলাদেশে যে সকল পীর—আউলিয়া গণ্ড, কোতব, আব্দাল, দরবেশ প্রভৃতি পীর সাহেব ও পীর সাহাবানী-দিগের মক্কা বা দর্গাহ (রওজাহ) বিজ্ঞান থাকিয়া আকিও মূল্যমান জাতির স্বাভাবিক জীবনের অতীত-গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে, সেই সকল সমাধি মন্দিরে সমাহিত পীর সাহেবদিগের সংখ্যা যে কত, সে কথা বলা কঠিন। অমূল্যমান বত্বের জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার অসুখ্যমান হয়, বর্তমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই চারিটি বিভাগ এবং ঐশ্বর্য্যেজ্ঞা সহ অর্ধেক আসাম—এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে মোস্তেসম্ আউলিয়া আল্লাহের সংখ্যা নিতান্ত কম হইলেও বিশেষ সহস্র হইবে। ইহাদের মধ্যে আব্ব, পারশ, ইমদ, আদন, আফগানি-স্তান, তাতার, বোখার, বাগদাদ, সমরখন্দ, চীন ও মঙ্গোল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত দরবেশ সাহেব-দিগের সংখ্যা পাঁচ সহস্রের কম নহে।

উপরোক্ত বিশেষ সহস্র দরবেশ সাহেবদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক আউলিয়া আল্লাহের জীবন-কাহিনী গ্রন্থাকারে সাময়িক পথে ও সংগ্রহ পক্ষে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন বিদেশী ও বঙ্গদেশী লেখক, আপনাপন পুস্তকে ও প্রবন্ধে, এই সকল মূল্যমান দরবেশ সাহেবদিগকে, অশাস্ত্রিয় স্মৃতিকর্তা এবং অত্যাচারী বলিয়া উল্লেখ করিতেও স্মৃতিত হইয়েন নাই। ইহারা আউলিয়া ও দরবেশ সাহেবদিগকে অত্যাচারী ও অশাস্ত্রিয় স্মৃতিকর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের উক্তি যে অসত্য, একটু চিন্তা করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

\* গত ১৫ মার্চ তারিখে "রাষ্ট্রপতির জন্মদিন" বিশেষ আধিবেশনে লোক কল্লিক গঠিত।

যে সকল লেখক বাংলা দেশের পীর, দরবেশ, এবং আউলিয়া আল্লাহদিগকে, অশাস্ত্রিয় স্মৃতিকর্তা ও অত্যাচারী বলিয়া উল্লেখ করিতে স্মৃতিত হইয়েন নাই, তাহারা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে সহজেই জ্ঞানবশত করিতে পারিতেন যে, এই সকল সাধু পুরুষেরাই সাধনা ও শক্তিবলে এদেশে এল্লামের পবিত্র শাস্তি আনয়ন করিয়াছেন। মোস্তেসম রাজগণ কষ্টে বাংলা-দেশ অধিকৃত হওয়ার বহু পূর্বেই যে, আউলিয়া আল্লাহ এবং দরবেশ সাহেবগণ বাঙ্গালী জাতিকে এল্লামের পবিত্র ও শাস্তিময় আলোক প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলাদেশে প্রায় বিংশ সহস্র আউলিয়া—আল্লাহ, দরবেশ, গণ্ড, কোতব, এবং আব্দাল সাহেবদিগের পবিত্র সমাধি-মন্দির বর্তমান আছে। কিন্তু পীরের দর্গাহের সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় বাই সহস্র হইবে। প্রকৃত মাজার শরিফকে বাংলাদেশে চলিত কথায় "হাফেয়া" বলা হয়। হাফেয়া—মাজার শরিফগুলি আসলি এবং অবশিষ্ট মাজার নামক দর্গাগুলি নকলি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পীর গোরাটাদ সাহেবের দর্গাহের কথা বলা যাইতে পারে। পীর গোরাটাদ সাহেব ওরফে বৈদ্যে আকাস্ম আলী সাহেবের হাফেয়া—মাজার শরিফ শিশিরহাট মহকুমার বালাগা পরগণার ভার্গবপুর গ্রামে (১)। কিন্তু তাহার অপ্রকৃত মাজার ঐশ্বর্য্যেজ্ঞা একটি, বর্তমান জেলার রাইগ্রামে একটি, ডায়মণ্ড হারবার মহ-

(১) ভার্গবপুর বগিলে এখন আর কেহ বৃষ্টিতে পায় না। হাফেয়া বগিলে সকলেই বৃষ্টিতে পায়। হাফেয়ায় বগিলে বা বালাগা বগিলে বাংলার প্রায় সকল স্থানের লোকেরই বৃষ্টিতে পায় যে, পীর গোরাটাদ সাহেবের বগিলে।

বিত্তীয় বর্ষ, ১৩১৫ সংখ্যা]

আশা

১০৩৫

মুমার একটি, বারশত (বারাসত) মহকুমায় চারিটি, বারাকপুর মহকুমায় একটি, বশিরহাট মহকুমায় ত্রয়োদশটি, এখানে তাহার অপ্রকৃত মাজার এক্ষুণি।

পীরসাহেবদিগের প্রকৃত মাজার সন্দেশ বাহা বর্ণনা করিয়াছি, বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। এক্ষণে অপ্রকৃত মাজার সন্দেশ ছই চারিটি কথা বলিতেছি। প্রকৃত মাজার বা হাফেয়া মাজার ব্যতীত, বঙ্গদেশে অপ্রকৃত মাজারের মধ্যে এক শ্রেণীর মাজার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে "পীরসাহেবদিগের নজ্-গাহ" বলা হইয়া থাকে। আউলিয়া আল্লাহ, গণ্ড, কোতব, আব্দাল দরবেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দর্গার (শ্রেণীর) পীরসাহেবের মজ্জার পূর্বে যে যে স্থানে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন, সেই সেই স্থানকে সেই পীরের "নজ্-গাহ" বলা হয় এবং স্থানীয় লোকে সেই স্থানে দর্গাহ প্রস্তুত করিয়া, পীরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন

করিয়াছেন (১)। ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর দর্গাহ বাংলা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বাধীন লোকে স্বাধীন সিদ্ধি মানসে নিখ্যা করিয়া রচনা করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আউলিয়া গ্রামে "বড় পীরের দর্গা" এবং শিক্কা গ্রামের গোবাটাদের দর্গার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলা দেশের ইতিহাস রচনা করিবার সময় হইয়াছে কি হয় নাই, সে কথার আলোচনা করিবার অবসর আমাদের নাই। কিন্তু এক কথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে বাংলা দেশের পীরসাহেবদিগের জীবন-কাহিনী বাংলার ইতিহাসের একটি পরিচ্ছন্ন দখল করিয়া আছে। পীর কাহিনী বাদ দিয়া বাংলার ইতিহাস রচনা করিলে, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং আমার মনে হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখকেরই উচিত, যথা শক্তি এই কার্যে অগ্রসর হওয়া।

(ক্রমশঃ)

আশা

## ত্রিগুণাচর চট্টোপাধ্যায়

আর কি উঠিবে পুনঃ ভুবনের চাঁদ!  
প্রকাশি বিমল ভাতি,  
উজলি তামসী রাত্রি,  
প্রীতির মূর্তি হেরি হরিবে বিয়াধ!  
রূপ হৃদ্য করি গান  
জুড়ায়ে তুমিহিত প্রাণ  
মিটিবে বাহিত হেরি নয়নের সাধ!  
আর কি আসিবে কিরি দুঃখানন্দ ন?  
রাখালের গলা ধরি'  
প্রেরণেরে নৃত্য করি'  
খেই ল'য়ে যাবে গোষ্ঠে মনোদা জীবন!  
গোপাশ্রয় নাচমনে,  
অভিবে একান্ত মনে,  
আনন্দ মুগ্ধ হয়ে সকল ভুবন।

আর কি স্বপ্নের শ্রাম ফিরিবে গোহুলে!  
সুলাইতে ব্রজবাসিনী,  
অগ্নে ধরিয়া হানি,  
মদন-মোহন বেশে—কালিন্দীর কুলে।

সাজি স্নেহ বন ফুলে,  
রূপের তরঙ্গ তুলে,  
পাড়ায়ে বকিম ঠামে কদম্বের কুলে।

আর কি বাজিবে বাঁশী সন্ধ্যা সমাগমে?  
মুখ মুরলী তান,  
আহুল করিবে প্রাণ;  
অঙ্গুরাগে পিকবর গাথিবে পঙ্কজ!  
কৌমুদী বসন পরা,  
উজ্জ্বলে মাজিবে দরা,  
কমল মেলিবে আঁধি দিগন্ত বিজয়ে।

আর কি জামেরে বাঁশী শুনায়ে সে গান?  
'যেই গানে চিত্ত হয়—  
শ্রামময়, প্রেমময়,  
ভেসে যায় লক্ষ্য, ডা, ভাতি, কুলমান,'  
তনি যে সখীত ধানি,  
জনম সফল মানি,'  
চিরকুণ্ড হ'বে সবে, পলিবে পাশাণ।







ভয় হইতে কিছু বিভিন্ন। এই ভয়ের সঙ্গে একটা সমান, একটা শ্রদ্ধার ভাব বিজড়িত আছে, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় awe বলিতে পারা যায়। এই Fear এবং Awe কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি। সভ্যতার আদিম অবস্থায় Fear বা শক্তির ভয় মানুষকে তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতিগুলিকে সংবৃত্ত করিতে যেরূপ কার্য করিয়াছিল সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় এই সমান-শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় (Awe) ও ঠিক সেইরূপ কার্য করিয়াছিল। ঐ দৈবী শক্তির যোষোৎপাদনের ভয়েই মানুষ তাহার স্বভাব প্রকৃতিগুলিকে অস্বাভাবিকতা না দিয়া আপনাকে পদে পদে সংবৃত্ত করিয়া এবং ইচ্ছা-ইচ্ছা চলিতে লাগিল। সমাজের বা সমাজের ব্যক্তি বিশেষের কোন বিপর্যয় হইলে, তখনই তাহার মনে হইবে যে, কোন অপরাধ জনক কার্য দ্বারা কোন দেবতার ক্রোধকে কব্দা হইয়াছে। এই সমস্ত অদৃশ্য দৈবী শক্তির বিরাগ ভাজন হইবার ভয়ে তখন মানব সামাজিক এবং শারীরিক আচারগুলি দৃঢ় ভাবে পালন করিতে মনোনিবেশ করে। এবং আচার ব্যবহারের নব নব বিধিনিষেধের সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশাচার ও পারিবারিক বিধি নিষেধের মূলে সেই শক্তি—অদৃশ্য দৈবী শক্তির বিরাগ উৎপাদন এবং তজ্জনিত শক্তির ভয়।

জীবন-সংগ্রাম ক্ষেত্রে এই সকল সামাজিক ও পারিবারিক বিধি নিষেধের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। জাতিগত এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে কর্মসূত্রটি অবলম্বন করিতে হইবে। কর্ম বা কৃষ্যের বেহের চতুর্দিকে কঠিন আবরণ যেমন তাহাকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে, সামাজিক বা পারিবারিক আচার ব্যবহারের কঠিন আবরণ তেমনি জাতিকে বৈদেশিক শক্তির সংঘর্ষ হইতে রক্ষা করে, জাতিকে প্রবলতর জাতির মধ্যে অস্তিত্ব হারাতে দেয় না। হিন্দু জাতি যে এই শত শত বৎসরব্যাপী বৈদেশিক জাতির দাসদাসীনে থাকিয়াও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, এই কর্মসূত্রই তাহার প্রধান কারণ।

অবশ্য সকল আচার, সকল প্রথা-ই যে কারণ দ্বিধা পাওয়া যায় তাহা নয়? কিন্তু একথা মানিয়া লইতে হইবে যে, যে সকল জাতি এখনও সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা এবং যে সকল জাতি সভ্য জাতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, তাহারাও সমভাবে জাতিগত সমাজগত ও ব্যক্তিগত আচার দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকে।

মানব সভ্যতার শৈশবাবস্থায় মানুষের ধর্মবৃত্তি “ভয়ের”ই নামান্তর ছিল; তাহার পর সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম প্রকৃতি একটি জটিল মনোবৃত্তি রূপে রূপান্তরিত হয়—আদি মানব-সমাজ অনেক বিপদ আপদ, অনেক আদিমৈবিক আধিভৌতিক অনিষ্টগত সহ্য করিতে করিতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের ধারণায় তাহাদের দেবতাও রক্তরূপে কল্পিত, সভ্য মানব সমাজে দেবতা মঙ্গলময় স্থল; ধর্ম আর ভয়ের ‘নামান্তর’ নয়; সভ্যতার উন্নত স্তরে যেরূপ, দৃঢ়তা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, সধন প্রভৃতি লক্ষ উজ্জতর বৃত্তির সংমিশ্রণে ধর্ম-ভাব গঠিত। বাহ্যকে সর্ব-বর্ধ নিহতা ঈশ্বর বা দেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, সভ্য মানবের মন উঁহাতে নিহৃত ও নৃশংসতার আরোপ করিতে বা তাহাকে সর্ব প্রকার বিপর্যাসের মূল বলিয়া মানিয়া লইতে একান্ত নারাজ। লোকের বা সমাজের আধিভৌতিক ও আধিভৌতিক বিপদ-সমূহ সভ্য মানব-মন, আত্মপ্রাণ যুদ্ধের ফল বলিয়া ধরিয়া লয়। যেরূপ জয় এবং অধর্মের ক্ষয় এই নীতি মানব নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লয়। কোন অব্যব প্রকৃতি লোকের জাগতিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দেখিয়াও “অধর্মের জয়” ইহা মন মানিয়া লইবেনা। তাহার জন্ত পেরকালে এবং পরলোকে উপযুক্ত শাস্তির বিধান আছে ইহা সশযে ধারণা করিয়া লয়।

বাহ্যে এবং বিশেষ বিশেষরূপে জানিতে গায়ে, গুহায় R. R. Marretta এর Threshold of Religion নামক পুস্তকখানি গড়িতে গায়ে। William McDougall সাহেব রচিত Social Psychology নামক গ্রন্থের সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল।

## সব সাধ যদি গিটিত ধরায়—



বাড়ীতে আসিয়া ফিরে রাস্তা অতিশয়  
ঢেলে দিল শান্ত তহু কোমল শয্যা

তৃত্য আসি পাখা করে পরসেবে দাসী  
আলঝোলা নল মুখে তুলে ধরে আসি



## আরেক ফাল্গুনে

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস

সে আরেক ফাল্গুনের কথা।...

...জীবনে কুড়িট ফাল্গুন এল গেল—কত স্বপ্নে, কত ছন্দে, কত গানে। কত জমিটা করা বৃক্কের রক্তের ইতিহাস—কত হারাণো দিনের স্বপ্ন-স্মৃতি বয়ে নিয়ে এল তারা; তার এক একটি স্বপ্নকণের টুকরোর দাম এক এগুটি তাজবাহল, তার এক একটি অশ্রুকাণার দাম মাতীর এই গোটা পৃথিবীটা।...

...কিন্তু জীবনের একটি ফাল্গুনের কথাই শুধু আজকের দিনে আমার মনে হচ্ছে থেকে থেকে।...

...বাইরে আজ নিম্নলিখ-স্টার প্রাণ-রক্ত, আনন্দের—জাগরণের লীলাছন্দ। প্রকৃত রাজ্যও যেন, মাহুয়ের অন্তর রাজ্যও তেমনি। কিন্তু আমার মতো যারা পৃথিবীতে এসেছিল পৃথিবীর বাইরের মাহুয়ের অন্তর নিয়ে—তারাও শুধু হতভাগ্য হয়ে রইল, তাহাদের চির চুপের বোকার ভাব আর লায়ব হ'ল না কোনোদিন—

...আমার সেই পেছনে রেখে আসা ফাল্গুনের পাতার পাতায়ও এমন ছিল রঙের হাসি—এমন ছিল ছন্দ-স্বপ্নে ভরা গানের জালি।...

আজ যেমন ঘরে শুয়ে শুয়ে বুঝতে পাচ্ছি পৃথিবীতে ফাল্গুন এসেছে, সে দিনও তেমনি বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু প্রভেদ ছিল এইখানে—সেদিনা আজকের মতো একবাক্যে চিরদিনের জন্তে বিছানার গুণীর মধ্যে বন্ধী হয়ে যাইনি।...

আজ বিছানায় পড়ে থেকে থেকে জীবনের উপর দিকার এসে গেছে বটে; কিন্তু আমার সেই হারাণো ফাল্গুন-দিনের জীবনটি ছিল—রঙে রঙে রঙীন, ফুল-ফলে ভরা।...

...মনে পড়ে স্বপ্নদানের বাড়ী থেকে একদিন ফিরে আসবার পথে অসীম আমাকে হেসে বলেছিল, ভাই মানস, এবার বসন্ত-বনের সবগুলো ফুল হুড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট দেবতাটি যে তার ফুলের ধূধানি তোর উপরেই কেন

বাগিয়ে ধরলো—আমি তার কোনো মানে বুঝে পান্ধিনে।...

তাকে কি উত্তর দিয়েছিলুম সেদিন তা মনে নেই আজ; কিন্তু বসন্তের পিক ও মৃদু-মলয় জীবনের যুগ্মত্ব হুঁচিকে যে সহসা ফুল করে ফুটিয়ে তুলতে পারে—তা সেদিন আমি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলুম।...

...সমস্ত অন্তরটা কেবলি ব্যথার-কঁদে কঁদে উঠছে আজ। অতীতের সেই সহস্র স্বপ্ন-স্মৃতি জড়ানো দিন-গুলো কি আর ফিরে আসে না গো?

জীবনকে তো ফুরিয়ে ফেলবার পথে চলেছি; কিন্তু তবু বেঁচে থাকার এই অসংখ্য যন্ত্রণার মাঝেও মনটা কেবলি পেছন ফিরে তাকিয়ে থাকতে চায়। কি যে রেখে এসেছি সেখানে—তা ভেবেও যেন তার কত শক্তি।...

...মনে পড়ে, এমনি একটি আলো-ভরা সকালে স্বপ্নাক্ষে নিয়ে তাদের রিডিং-রুমে বসে তাকে ছবি-আঁকা শেখাচ্ছিলুম। সেদিন স্বপ্না এসেছিল একটু নতুন হয়ে অজ্ঞানের চেয়ে—তাই তার দিকে একটু তাকিয়ে ছিলাম। সে তাতে হেসে বলেছিল—কবি যারা, আর চিত্রকর যারা, তারা বোধ হয় মাঝে মাঝে একটু আনন্দনা হয়ে যায় কাজের মাঝে—না মাতীর মশাই?...

ভারি অপ্রতিভ হয়েছিলুম সেদিন, মুখানাও হয়তো একটু অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছিল।...

...সব চেয়ে সেই দিনের কথাটাই মনকে ছাপিয়ে উঠছে আজ। এখানে সে কথাটা মনে হলে বৃক্কের মাঝে একটা আনন্দের শিরহরৎ খেলো যার—যেমন সেদিন খেলছিল।...

এই স্বপ্না—কতদিন ধরেই তো তার কাছে কাছে থেকেছি, কিন্তু তার ভেতরে যে এমন একটি সরল

কিশোরী রয়েছিল, তা সেদিনের আগে আমার কাছে কোনো রকমেই ধরা পড়েনি।...

...সে দিনটা ছিল একটা অকাল বাদ্গার দিন। সকাল থেকেই টিপ টিপ করে জল বরষছিল। আকাশ ছিল কাজল আঁকা—পৃথিবীর রংটাও যেন বদলে গেছিল ঘোলাটে হয়ে।...

ভানুসুম, এই বাদ্গার দিনে আজ আর গিয়ে কাজ নেই স্বপ্নাকে শেখাতে। কিন্তু এই না-বাগাটা চিন্তা করতেই কোথায় যেন একটু ব্যথা বেজে উঠলো বৃক্কের মাঝে।...বৃক্কসুম, না গিয়ে আমি পারিনি।...

...স্বপ্না দাড়িয়েছিল জান্না ধরে—হয় তো বা কারো প্রতীক্ষা করেই। ... আমি যেতে সে যেন একটু স্বপ্নাই হলো।...

কিন্তু স্বপ্নাকে যেন আজ আর সেই রকমটি দেখলুম না। মুখনিম্ন তার অস্বাভাবিক রকম লাল,—কেবলও সে আমার মুখের দিকে তাকাতো পাচ্ছে না চোখ তুলে।...

আমার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, এই ফাল্গুন-শেষের অকাল বাদ্গার তার মনটা ভিজে ভিজে ক্লদন হয়ে গেছে। সে যেন আজ এই ফুল-ফলে ভরা শ্রামল পৃথিবীর বৃক্ক বেঁচে থাকবার জন্ত একটা কিছু অবলম্বন চায়।...

অনেকক্ষণ পরে বললুম—আজ আর ছবি আঁকার ইচ্ছে নেই বৃক্কি?...

এবার যেন স্বপ্নার বেশার বোর কেটে গেল। সে একটু মান হাসি হেসে বললে—আমি ভেবেছিলুম, আজ বৃক্কি আপনি আসবেন না এই বাগ্গার। তা এগুয়ে, বেশ হয়েছে, কালকে আমার দেশে চলে যাব্বি, কোল্-কাতার বাস উঠিয়ে। আজকের দিনটাও ছুটিতেই কাটুক—কি বালু?...

একটা সামান্য কথাই এতটা আঘাত লাগতে পারে কারো—তা জানতুম না।...

...বাসায় ফিরে আসবার সময় স্বপ্নাকে যেন আমার খুব কাছের একজন বলে মনে হল। সে যখন রক্তিম মুখে আমার হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে নমস্কার করে চলে গেল—তখন মনে হল, সে বা দিয়ে গেল, তা যেন আমার চিরকালের চাওড়া একটা জিনিষ। কিন্তু চলে গেল কেন? উত্তর তো আমি তাকে দিতেই পারতুম।...

...বাসায় এসে স্বপ্নার দেওয়া কাগজটুকু খুলে পড়লুম। কিন্তু মনে হল, এ যেন নতুন কিছু নয়। স্বপ্নার কাছ থেকে এ যেন আমি কতকাল ধরে পাচ্ছি।...কিন্তু আমার দিক থেকে তার জন্তে কি রয়েছে? ... কিছুই না।

...স্বপ্নাকে বুঝে নেওয়া জীবনে আমার বড় দরকার হয়ে পড়েছিল। তাকে ছাড়া আমার চলবে না—চলতে পারবে না, এইটাই ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই বৃক্কি ভগবান টিক তার উটোটি করে রাখলেন আমার জন্তে। ... একদিন সকালবেলা ড্রাকগুলা একখানা রঙীন খাম দিয়ে গেল। অসীম লিখেছে—আমার বিয়ে মানস, তোর স্বপ্নার সঙ্গে। আসুবি তো?

...অসীম চিরদিনই আমার সঙ্গে কাজমানি করুতে ভালো থাকতো। আমাদের বাপাটারকে হয়তো সে একটা কিছু নয় বলেই ধরে নিয়েছে;—তাই পত্রটাও খেলার স্বপ্নেই লিখেছে। কিন্তু একজনর বেলা কেমন করে আর একজনের প্রাণপাতা হয়ে পাড়ার—সে কথাটা সে ভাবে নি।...

...বিছানায় পড়ে পড়ে আর ভালো লাগে না। চাইনে জীবন—না এমন করে আগুন হয়ে জলে পড়ে। বেঁচে থাকবার সব স্বপ্ন মিটেছে, এবার স্বপ্নার বাদ নিতে দাও।...

কিন্তু আজো ফাল্গুন শেষ হয়ে যায় নি তো। আর ছুটো দিন আছে।—তারপরে আমায় সেই মূল্যবান রাজ্যের আরেক ফাল্গুনে নিয়ে পৌঁছে দাও। পৃথিবীর ফাল্গুনের মাঝে আর জীবন কাটাতে চাইনে কাল গুণে।...



দিনেমার বালক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে করিতেই সে ভবিষ্যতে কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া লয়। সে দেশে অল্পষ্ট টেকনিক্যাল স্কুল আছে; তাহার যে কোনটিতে সে ইচ্ছামুসারে ভর্তি হইতে পারে। শিল্প বা কৃষি বাহাই তাহার শিক্ষণীয় বিষয় হউক না কেন—সমস্ত বিষয়েই সে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধ শিক্ষা পাইবার সুযোগ পায়। কেবল পুস্তকশূ শিক্ষা নহে—সব বিষয়েই হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিবার জ্ঞত তাহাকে কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পমন্দিরে শিক্ষনবীশি করিতে দেওয়া হয়। সেমনার্কের অর্থ নৈতিক ব্যাপার এমনি স্থপরিচালিত ও শিখাইবার বন্দোবস্ত এমন স্থানবৎ, যে, অতি দ্রুতই দিনেমার বালকও শিক্ষা পাইতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ করে না। তার উপর এই সব ছাত্রদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দিবার নানান রকম ব্যবস্থা আছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান ও পুষ্টি করিয়া কৃষিবার উপায় আছে। দিনেমারেরা কাজকে অস্তরের সহিত ভালবাসে, কোন কাজই তাহাদের চক্ষে ঘৃণ্য নয় এবং আমদের সঙ্গে তাহাদের বিম্ব পার্থক্য ঐ থাকেই। অনেক কাজকেই আমরা ছোট কাজ মনে করি ফলে সে কাজ আমাদের নিম্নেয়ত করিই না পরন্তু বাহারা করে তাহাদের মনে মনে ছোট ভাবিয়া ঘৃণা করি। ফলে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আসিতই পারে না—হুতরাং গণতন্ত্রের প্রকৃত মূল্য আমরা অবগত হইয়ছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা যে গণতন্ত্রের ভাবটী বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকি তাহা অস্তরের নহে—নেহায়া পোষাকী। চাষাভূষা বলিয়া কৃষককে মনে মনে ঘৃণা করি, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে চাষাভূষা না থাকিলে থাকিগেটে লখা মেচো ফুলাইয়া বেড়ান বা সভাসমিতিতে বহুতা দেওয়া প্রভৃতি কার্য সম্ভবপর হইত না। বহুতার সময় পতিত জাতিকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করি কিন্তু তাহাদের কেহ যদি অদৃষ্টের ফলে আমাদের বাড়ীতে চাকরী করিতে আসে তখন সেই 'প্রমিক ভাতা'র অদৃষ্টে 'পাকী হারান-জাদা' ভিন্ন অন্য সম্ভাবন বড় একটা জুটিয়া উঠে না;

হুতরাং আমাদের কাছে গণতন্ত্রতার প্রকৃত মূল্য যে কিছুই নহে তাহা বৃহিতে বা বৃদ্ধাইতে কোন কষ্ট নাই। তাহা এখানে একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। কাজ করিতে হইলে, কাজ করিবার মত শক্তি সামর্থ্য চাই নতুবা কাজে উৎসাহ জন্মান বা আনন্দ হওয়ার পক্ষে অসম্ভব হইতে সম্ভব। বিস্তৃত খাজে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর বন্দোবস্তের মধ্যে প্রতিপালিত—দিনেমার বালকের সঙ্গে বাঙালী বালকের পার্থক্য এইখানেই বড় বেশী। বাঙালী বালকেরা পুষ্টির পাখ অভাবে সাধারণতঃ দুর্বল, তার পর তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিলাসিতায় পরিপূর্ণ বলিয়া কার্যে আসক্তি জন্মান তাহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। বিদ্যালয়ে পাঠকালীন দিনেমার বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এই জ্ঞত দিনেমারগণ ব্যায়াম ও তৎসংক্রান্ত ক্রীড়া কোতুক প্রভৃতিতেও ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমান যুগের শিল্পই হউক বা কৃষিই হউক সকল কার্যেই সুগতিত শরীর ও পূর্ণ স্বাস্থ্যের আবশ্যকতা আছে। বাঙালী সব কার্যেই বাহির হইতে ব্যায়ামবিধি দেখিতে ভালবাসে—মুঠবলের ম্যাচে দর্শকের সংখ্যা দেখিলে বলা যায় যে এসব ব্যাপারে ক্রীড়কের চেয়ে দর্শক সংখ্যা বেশী। বাঙালী সব কার্যেই দর্শকের, সমালোচকের কাজ করিতেই ভালবাসে কিন্তু এই তামাসা-দেখা প্রস্তুতির মধ্যে কার্যে আত্মরক্তির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষ সময়ে তোহমাগণও এই দর্শক-সমালোচক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া তাহাদের ভুবন বিখ্যাত শৌর্য-বীর্যে জলাঞ্জলি দিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়া গিয়াছিল।

বাঙলার মত কৃষি প্রধান দেশে, যেখানে কৃষি জীবন হিসেবে মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহারা যে জীবন সংগ্রামে জরী হইতে পারে না তাহাতে কোন বিম্বয়ের কারণ নাই। পূর্বে এদেশের ভূমি উর্বরা ছিল, দেশের অধিবাসীর সংখ্যা অল্প ছিল, এবং এই দেশ হইতে তখন পাখ শস্ত বিদেশে রপ্তানী হইত না—তখনকার দিনে

যে ভাবে কৃষিকার্য্য করিলে দেশের সম্যক অভাব মোচন হইত এখন তাহা হওয়া অসম্ভব। সে দিনকাল চলিয়া গিয়াছে—বর্তমান যুগ ভীষণ প্রতিযোগিতার যুগ। জগতের সমস্ত জাতি পরস্পরকে ভীষণ বন্দ যুদ্ধে আত্মন করিতেছে—এ যুদ্ধের ফলে যোগ্যতম জাতি টিকিবে আর অযোগ্যদের বিলুপ্ততাদের দাসত্ব (রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক) করিতে হইবে। ভারতের এই দাসত্ব উল্লাচনের মূল বৃহত্তর স্তরকটী এই কৃষি সমস্যার মধ্যেও নিহিত আছে। যুগোপযোগী হইতে হইলে ভারত তথা বাংলাকে কৃষি কার্যের উন্নতি সাধনে মন দিতে হইবে—কৃষিকর্মীবিদিশের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং শিল্পিত দিগের তাহাদের সহিত আন্তরিকতার সহিত, খোলাখুলি ভাবে বিশিষ্ট হইবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে শিক্ষাজনিত একটা অনর্থক গর্ষের যে স্রুত ব্যবধান আছে তাহা ভাদিয়া ফেলিতে হইবে। পুরাতন কৃষি পদ্ধতির সহিত বর্তমান উন্নত কৃষি বিজ্ঞার সম্মিশ্রণে বর্তমানের আবশ্যকসাহায্য, দেশ কাল ও পাখ বিচার করিয়া উভয় পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিয়া বাঙলার সর্বোত্তমভাবে উপযোগী এক নূতন কৃষি পদ্ধতি স্থির করিয়া লইতে হইবে। এই পথেই জাতি উন্নতি করিবে—দেশ সমৃদ্ধ হইবে—তখন কৃষি হইতেও দুঃস্থাপা হইবে না। আমাদের দেশে কৃষি বিদ্যা শিখাইবার যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে তাহা এমনি ইংরেজী চালে চালিত যে তথ্যরা চাষাভূষার ছেলেরদের ঢুকিতেই ভয় করে—আর তারপর সে সব জারগার ছেলেরদের পড়াইবার মত আর্থিক অবস্থা আমরা দেশের দেশের কৃষি দিগের নাই সেখানে ধনী সমাজেরা পুস্তকশূ কৃষি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ভিত্তি পাইতে পারেন পরে হয় ত কলেজে কৃষি বিজ্ঞার অধ্যাপনা করিতে পারেন কিন্তু সে বিজ্ঞার দ্বারা দেশের বস্তস্তঃ কোন উন্নতি ঘটিতে পারে না।

জেনমার্কের একটা কৃষি বিদ্যালয় লখডে Shaw Desmond বলেন "জটলায়ের লেডলও নাক কৃষি বিদ্যালয় আমি দেখিয়াছি। সেখানে অস্তরের স্তায় বল-শালী ২২-৩০ বৎসর কৃষি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে। কৃষি বিদ্যা অর্থ কৃষি কার্যের বৈজ্ঞানিক প্রথা, সমায়ন এমন

কি পণ্ড পালন ও পণ্ড প্রজ্ঞান বিদ্যা পর্যন্ত শিখান হইয়া থাকে। ছাত্রেরা সকলেই কৃষিকর্মীবিদিশের পুত্র এবং ইহারাই ভবিষ্যতে দেশমার্ককে গৌরবায়িত করিবে।"

ফুল গৃহটী দেখিতে রাজ প্রাসাদের মত দেখা তাহার মধ্যে এমন রাসায়নিক গরীকার্য্য এবং প্রদর্শনী (museum) আছে যথার শিক্ষার্থীদের জ্ঞত গত ৩০০ বৎসর ধরিয়া কৃষি কার্য্য বিকল্প ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখিবার উপাদান সমূহ সম্বলিত আছে। বুটেনের আজ-কালকার কৃষকও তাহার পিতামহের অবলম্বিত পন্থায় কাজ করে কিন্তু দিনেমার চাষাদের কার্য্যশক্তির সঙ্গে বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের পূর্ণশক্তি নিয়োজিত থাকার গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা পূর্বাপেক্ষা শত করা ২৫ ভাগ বেশী শস্ত উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে।

এখনকার সমস্ত কাজই হাতে-হেতড়ে শেখান হয়—মুখ-বিদ্যা শিখা করা হয় না। খাজে জোলা ও গ্রিষ নির্ধারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, পণ্ড চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়, জমীতে সার দেওয়া, বীজ পরীক্ষা করা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এখানকার তিনজন ছাত্র ৩০টা পাখী, ১০০টা শূকর ও ১০টা বাঘুরের রক্ষাব্যবস্থাপন করে এমন কি ছদ্মবোনে কাটাও করে।

শিক্ষার ব্যয় ছাত্রেরাই বহন করে, গর্জনফেট ও সাহায্য করেন তবে তাহা খুব সামান্য। ৫ মাসে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়; এই পাঁচ মাসের ব্যয় মায় খোরাকী ও থাকিবার খরচ আসাবাবির ভাড়াহয় মাত্র সাড়ে সতর পাউণ্ড। কৃষি শিক্ষার হুঁক শিক্ষা লইতে হইলে খরচও চার মাস পাঠের আবশ্যক তন্মত অতিরিক্ত দশ পাউণ্ড লাগে। Dairy কার্য্য (দুগ্ধোৎপাদন অধ্যায় প্রকৃত) শিখিতে ৬ মাস পাড়িতে হয় ও তন্মত ৩০ পাউণ্ড খরচ পড়ে।

দিনেমারেরা অদৃষ্টের ভরসা কিছু ফেলিয়া রাখে না তাহারা সত্যই উৎসাহী। পশুদের পাখ দিবার পূর্বে উহা বিস্তৃত কি না পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হয়—খাতের পরিমাণ ও গুণন করিয়া ঠিক করা হয়। পালিত পাখীদের নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এমন কি প্রত্যেক পালিত পশুর



যেহা কাঁ বাঁদ কত খরচ পড়ে তাহার হিসাব পণ্ডিত সঙ্গ সঙ্গ করা হয়।

বিনোদ্যোগ উপদেশের চেয়ে দুষ্টান্ত বেশী পঙ্কম করেন, তঁহারই বলেন যে, যে বিদ্যা পুঁথিগত অর্থব্যয় যা কেবল মুগ্ধ করিতে হয় এবং যার দ্বারা হাতে-হাতে মাছখে কাজ না করে পাঠের সে বিদ্যা বিদ্যা নয়। এই জ্ঞান, কৃষি কার্য করিতে হইলে বাহা কিছু কাজ করিতে হইবে সে সমস্ত কাজই বিদ্যালয়ে তাহাদের নিজের হস্তে করিতে হয়—এমন কি পণ্ডরের খাবার দোতা পণ্ডিত। এই সব বিদ্যালয়ের কাজগুলি গ্রিক ব্যবসায়ের মত চালিত হয় অর্থাৎ লাভ লোকসান বুঝাইয়া দেখা হয়—ছাত্রদের দ্বারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানেও লাভ হয় এবং অনেক ছাত্র কাজ করার জন্ত বেতনও পাইয়া থাকে। কলেজের জমীগুলিও নানা রকম ভাড়া করা—ইহার মধ্যে কানার মত মাটি, বেলে মাটি, জাঁটাল মাটি ঘোঁষালী প্রভৃতি বহুবিধ মাটি আছে, উদ্ভেদ এই যে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীগণ যাহাতে যে কোন রকম মাটিতে সেই মাটির উপযুক্ত চাষ করিতে সক্ষম হয়। শিক্ষাদান হিসাবে এ ব্যবস্থা যে খুব দূরদর্শিতার পরিচয় তাহা বলা বাহুল্য। এই জ্ঞান আজ ভেনমার্কের কোন জমীই চাষের অযোগ্য বলিয়া পড়িয়া নাই। ভেনমার্কের প্রায় বার আনা রকম জমীতেই চাষ হইতেছে সমুদ্রের ধার, নদীর ধার, জল প্রভৃতির পুনরুদ্ধার করিয়া প্রায় ১০০ শত কোয়ার্টার মাইল জমী চাষের জন্ত গারিসন হইয়াছে। Dairy বা দুগ্ধ সরবরাহ বিজ্ঞান শিক্ষাও গ্রিক ব্যবসার হিসাবে চালান হয়—উৎপন্ন দুগ্ধ বাজারে বিক্রয় করা হয় এবং চাহেতা তাহাদের কার্যের জন্ত গারিসন হইয়াছে। Dairy বা দুগ্ধ সরবরাহ বিজ্ঞান শিক্ষাও গ্রিক ব্যবসার হিসাবে চালান হয়—উৎপন্ন দুগ্ধ বাজারে বিক্রয় করা হয় এবং চাহেতা তাহাদের কার্যের জন্ত গারিসন হইয়াছে। Dairy বা দুগ্ধ সরবরাহ বিজ্ঞান শিক্ষাও গ্রিক ব্যবসার হিসাবে চালান হয়—উৎপন্ন দুগ্ধ বাজারে বিক্রয় করা হয় এবং চাহেতা তাহাদের কার্যের জন্ত গারিসন হইয়াছে।

নৃত্রির অভাবেই বাঙ্গার কৃষকগণ উন্নতি করিতে পারে না। তাহাদের চাষ করা অনেকটা—  
“জাকতে হয় তাই জাকি  
আবার বিষয় নিয়ে থাকি”  
এর মত—অর্থাৎ চাষ করিতে হয় তাই করা। চাষে ফসল ভাল না হইলে দেবকোটে গালি পাড়ে—তা অতি-বুড়ির জ্ঞানই হউক বা আনাবুড়ির জ্ঞানই হউক। লাভ-লোকসানের দায়িত্ব বহিবার জন্ত অন্তঃস্থদের স্বয়ং আছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের সুভিক্ষা সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান নাই—অর্থাৎ সফল কৃষি যে সমান নয়—এবং যে কোন জমীতে যে কোন সার যে দেওয়া যায় না বা যে কোন

রকম চাষ ইচ্ছামুসারে যে করা চলে না তাহা তাহার ভাবে না। তারপর আমাদের দেশের একমাত্র স্থল গুরু—তাহারও উপযুক্ত যত লওয়া হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয় না, কাজের সময় তাহাদের খোঁজ পড়ে, কাজ করিবার পর তাহাদের চাহিয়া খাইতে উপবেশ দেওয়া হয়—সে খাইতে পাইল কিনা সে ধর কৃষক নয় না। সে কেবল কাজ চাষ কিন্তু এই অবস্থার ফলে গরুগুলি দিন দিন রুগ দুর্বল ও কণ্ঠে অশক্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাদের যে কোন মূল্যে কশাইকে বিক্রয় করা হয়—খুব ক্ষয়বান কৃষক বড় ছোঁর হয় ত সেটাকে পিজ্জারাপোলে পাঠাইয়া দেয়। এদিক গো-রক্ষার কথা উঠিলে আমাদের গো-ভক্তি উল্লিয়া উঠে এবং মুসলমানেরা গো-ধাষক বলিয়া তাহাদের নিন্দা করি বস্তুতঃ আমরা গোমাংস ভক্ষণ না করিলেও গোহত্যাের জন্ত মুসলমানদের চেয়ে কম দায়ী নহি—তবে সেটা প্রকৃত্তে স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হয় এই বা। শাক শস্জী ফল প্রভৃতির চাষ আবাদও জন্মঃ বাঙ্গার বন্ধ হইতে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং এমন কি মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি দেশ হইতে মাগগাড়ী ভরিয়া আমাদের টুকরী আসে বাঙালী কিনিয়া আম যায়—বাঙালার ভাল ভাল আম এখন দুর্ভর—তাহাদের শত সহস্র বিভিন্ন নাম এখন রপকথায় রূপান্তরিত। এখন বোম্বাই, ল্যাংকা, ফল্গুনী ও বিশ্বভাণ্ডারের নামই শুনা যায়—গোপালে বোম্বা, বিশ্বনাথ চাটুর্ঘ্যে, গোলাপ বাস, মোগল মাঝী প্রভৃতি বাঙালার বিশিষ্ট আম জন্মঃ চুপায়া হইতেছে। এখন শিম বেগুণও বাহির হইতে আমদানী হইতেছে—বাঙালার চাষা—যাহা এখনও আছে—পাটের লোতে সবই ছাড়িয়া দিয়াছে আর পাটের পরসার পরসে ছেলেরের ‘লোমপাড়া’ শিখায়া কসারী বনাইতে চেষ্টা করিতেছে। যেদটির উপর বাঙালার কায়দা উন্নতি হওয়া দুয়ে থাঙ্কুর দিন নাই তাহার যে ধোর অনেকটা হইতেছে এ কথা কোন রকমেই অস্বীকার করা চলে না। এখনকার দিনে চাষ করিতে হইলে Chemistry of the Soil, Geology, Bacteriology, Cattle Breeding, Dairy, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞানের আবশ্যক। এ সম্বন্ধে খুব সহজ বাঙালার বই হওয়া আবশ্যক এবং চাষাষের মধ্যে অন্ততঃ কিছু কিছু বাঙাল পড়িতে দেখাযও দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

( ক্রমশঃ )



## হার্ড মাস্টার

ক্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বোষ বি-এস-সি

( ক )

মহেশ বি, এ পাশ করিবার পর অসহযোগীর দলে নাম লিখিয়া বসিল। সেখা পড়া ছাড়িয়া দেশের কাজে মাতিয়া উঠিল। মাতৃ-পিতৃহীন সে, কাকার নিকট কত ধমক খাইল, কাকীয়া তাহাকে কত বুঝাইলেন; কিন্তু কেহই তাহাকে তাহার স্বপ্ন হইতে এতটুকু হটাঁইতে পারিল না। রাষ্ট্র-কর্মচারীর আখ্যায়ের বৃষ্টি বেশে সেবা করিবার অধিকার নাই, তাই তাহার কাকা তাহাকে ডাকিয়া একদিন সন্ধ্যাকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—“খয়ের খেয়ে বনের মোঘ চরান হবে না, এটা তোমায় স্পষ্ট কথা জানিয়ে দিলাম আজ ...।” তাহার কথার উপস্থিত বন্ধুয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, গরীবের ছেলের এ হাতি-রোগ কেন? কো-অপারেশন ভিন্ন বাহ্যার এতটুকু উপায় নাই, তাহার আবার নন্দু-কো-অপারেশন কেন? মহেশ কোন উত্তর করিল না, কেবল নীরবে বাক্যইয়া রহিল। মহেশ চিন্তা করিয়া দেখিল যে পথ সে ধরিয়াছে, সে পথ সে ছাড়িতে পারে না। এতটুকু বুঝিবার মত তাহার বদশ ও জ্ঞান হইয়াছে। যত বড় বাধা বিপত্তি তাহার সম্মুখে অস্বক, সে ধরিত্রীর মত তাহা অক্লেশে সম্ব করিতে পারিবে। মহেশের আর এতটুকু দুঃসং নাই। সমস্ত দিন তাহার দেশের কাজে আর রাত্রির অধিকাংশ সময়-

টুকু কংগ্রেস আফিসে চরকা ঘোরাইতে অতিবাহিত হয়। সে কদাচিত্ অল্প সময়ের জন্ত তাহার কাকার অধঃপতিত কালে বাজী ফিরে আর কাকীয়ার নিকট হইতে ধরতের মত কিছু লইয়া যায়। সে রোজ পিকিটিং-এ বাহির হইতে লাগিল। একদিন পুলিশ স্থপারিন্টেন্ডেন্ট তাহাদের দলটিকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। অস্বাধ্য মহেশের পূর্বে গোয়ার চারুকর দাগ অঙ্কিত হইল। আফিস ফেরত বামীর মুখে মহেশের কাকীয়া সমস্ত সখাদ শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামীকে অস্বরোধ করিলেন তিনি যেন তাঁহার ভাতৃপুত্রটির মুক্তির যোগাচিৎ ব্যবস্থা করেন। বিচারের দিন মহেশের কাকা কোর্টে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন যেন সে বিচারকের সম্মুখে তাহার অপরাধ স্বীকার করে আর একপ কাজ স্বপ্নও না করে একপ বলে। বিচারক যখন মহেশকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে বলিলেন, তখন মহেশ একবার চক্ষু মুদ্রিয়া তাহার দেশমাতার ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত কবালসার রুপ দেহবানি আর রুগ্ন অশ্রুশ্রাবা মুখবানি দেখিয়া লইল। তাহার চক্ষু ছিট মুহূর্ত মধ্যে প্রদীপ্ত শিখার স্তায় জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, অপরাধ সে করে নাই, দেশের কাজ করাকে যদি অপরাধ করা বলে ধরে লওয়া হয়, তা হলে সে এ অপরাধ চির জীবন ভরিয়া করিবে।



দেশাতার চরণে সে নিজেই বলি স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছে। অপরাধ সে করে নাই এবং তাহার জন্ত সে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য নহে। মহেশের স্বেল হইয়া গেল। এক কংসের মতোই মহেশের এই অভিজ্ঞতা। জ্বলি যে, হুনিয়ার সমস্ত শ্রবণের সঙ্গেই নুন-কো-অপারেশন করা চলে, কেবল চলে না পেটের সঙ্গে। আর এটাও সে বুঝিল যে দেশ বর্তমান না বাবীন হইতেছে, ততদিন এ ভারত-বাসী পোষ্টের ক্ষুধাও মিটবে না। অনেক চিন্তার পর সে এক আশাধার উপনীত হইল। সে নিজের পেটের সমস্ত একটা কিছু সংস্থান করিয়া দেশ সেবা করিবে। অনেক অসুস্থতার পর সে একদিন একটি সংবাদ পড়ে দেখিল, বর্ডমান জেলার কোনও এক গুণগ্রামের একটি ইংরাজি স্থলে একজন তৃতীয় শিক্ষকের প্রয়োজন। সে আবেশন না করিয়াই তাহার কাকিমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রওনা হইয়া পড়িল। স্থল কর্তৃপক্ষ তাহাকে রিক টাকার বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। গ্রামের একটি ভদ্রলোক তাহার বাস করিবার জন্ত একটি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। স্থলের একটি চাপরাশি তাহার নিকট থাকিয়া স্বহস্তের কার্য করিতে লাগিল। সে কলিকাতা হইতে একটি চরকা আনিয়াছিল, এবং এখানে আনিয়া তাড়িতের নিকট হইতে একটি পুরাতন তাঁত কিনিয়া তাহার ঘরে বসাইল। ১০টা-৪টা স্থলে শিক্ষকতা করিয়া বাকি সময়টুকু চরকা কাটা, তাঁত বোনা, গ্রামের বন কাটা, জল নিকাশের পথ খনন করিয়া দেওয়া, পুকরীতে পানি তোলা ইত্যাদি কর্ণে অতিবাহিত করিত। ক্রমে সে গ্রামের সবলেই যেরের পাখ হইল। উঠিল এবং দু'একজন তাহার সহকর্মীও জুটিল। কিন্তু স্থলের সময়টুকু তাহার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতে লাগিল, কারণ তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রেরা তাহার সহিত এরূপ অস্বাভাব্য করিত যে, সময়ে সময়ে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিত। প্রথম যে দিন সে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করে, সে দিন সমস্ত ছাত্রেরা তাহাকে 'অল বয়স ও ভাল মনুষ্য দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল এবং কেহ কেহও নাকি তাহার বদল কত বিজ্ঞান করিয়াছিল। যখন মহেশ একাগ্রতার সহিত ছাত্রদের পাঠ বলিয়া দেখে তখন বেঞ্চি

ভাঙ্গিয়া পড়ে। কখনও পাঠ বিজ্ঞান করিবার সময় জানালা দিয়া ঢিল আসিয়া পড়ে। কখনও কাগজের টুকরা আসিয়া তাহার মাথায় পড়ে। কখনও পাথর দড়ি তাহার গলায় লাগিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করে। একদিন সে টিকিনের পর ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল একদশ চিনা বাগানের গোলা তাহার সমুখস্থ টেবিলের উপর পোতা পাইতেছে। অপর একদিন দেখিল বোর্ডে আঁকা গাধার উপর খার্ড মাস্তারকে চাপাইয়া দিয়া হুলাস বাতাস দিয়া বিদায় করা হইতেছে। কিন্তু সভ্যতারের অপরাধকে ধরিতে না পারিয়া কোন দিনই সে কাহাকেও শাস্তি দিতে পারিল না। তবে সে দমন নীতির পরিবর্তে আত্মিক শক্তি ব্যবহার করাই শেষ মনে করিত।

( ৪ )

মাস কয়েক পরে একদিন সে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া বোর্ডে দুটি অঙ্ক ছাত্রদের করিবার জন্ত লিখিয়া দিয়া বেই চেয়ারে বসিতে যাইবে, অমনি চেয়ারের পা খসিয়া ঘাওয়া মেকের উপর চিং হইয়া পড়িয়া গেল। মন্তকের পশ্চাত্তাপ কাটিয়া গিয়া ফিল্মি বিয়া বক্ত জুটিল। বক্তের প্রার্থনাত্মক দর্শনে ও জ্ঞানার আশ্রয়ে তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। সমগ্র ছাত্রগণ চাঁৎকার করিয়া ছুটিয়া তাহার নিকটে গেল। স্বরেন্দ্র বলিয়া একটি ছাত্র জল আনিতে বাহির হইয়া গেল। স্বরেন্দ্র কাপড়ের গোঁচা ভিজাইয়া জল আনিয়া দেখিল ঘরে ভীড় জমিয়া গিয়াছে। কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ রক্ত বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ মুখে জল গিঠেছে। স্বরেন্দ্রকে দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় চাঁৎকার করিয়া উঠিলেন—“স্বরেন্দ্র এক কাজ তোরাই, টিপড় কোথাকার! মাষ্টারকে মারার সাঙ্গা আজ সকলকে জানিয়ে দেবো।” স্বরেন্দ্রের কাণ ধরে তিনি হুড় হুড় করিয়া অগ্নি ঘরে লইয়া গিয়া বেতের উপর বেত ঢালাইতে লাগিলেন। সমস্ত শরীর হইতে রক্ত করিয়াও যখন তাহার চক্ষু ছুটি হইতে এক ফোঁটাও অশ্রু পড়িল না তখন হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাকে রৌদ্রের মাঝে ছই হাতে ছুটি ইট দিয়া

নিলভাউন করিয়া রাখিলেন। মুছা ভেঙ্গে একটি শিক্ষক ও অপর দুইজন ছাত্রের সাহায্যে মহেশকে একটি গরুর-গাড়ীর দ্বারা বাড়ী পাঠান হইল। গ্রামের ডাক্তার 'থান্স' ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। অবশ্যই এ নাম তাহার গ্রাম বাসীর দেওয়া। কখন যে সমস্ত গ্রামবাসীর চক্ষে ধূলি দিয়া এই ডাক্তারটি ক্যাথল স্থলে তিন বৎসর পড়িয়া আসিল ত; আজও গ্রামবাসীর নিকট প্রহেলিকার মত রহিয়া গেল। অদৃষ্টবাদী গ্রামবাসীর অবস্থা ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না তবে শিকিত ও অস্বস্থ্যপূর্ণ গ্রামবাসীর দল বাহায়া আজকাল সহরে বাস করেন এবং কখন কখনও ছুটির দিনে বাগান পাটের মত ছুটার দিনের জন্ত গ্রামে ক্ষুধি করিতে আসেন তাঁহারা ঐ ডাক্তারের হাতে অস্বস্থ্য আত্মীয়দের চিকিৎসার ভার না দিয়া বিনা ঔষধে রাখাই শেষ মনে করিতেন। একদিন দুপুর শেষে ছইয়া থাকিতে থাকিতে ঘার পাশে স্বরেন্দ্রকে লাঠায়ে বন্ধ থাকিতে দেখিয়া মহেশ বলিল—“ওখানে লাঠায়ে কেন স্বরেন্দ্র, ভিতরে আর বোস্। তুই স্থলে বাসনি?” “হেডমাষ্টার মহাশয় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আর বলছেন—.....” “কি বলছেন রে—” “হার যাতে কোন স্থলে ভর্তি হতে না পার, তারও করবেন।” “হঁ” “সাময় ক্ষমা করুন মাষ্টার মহাশয়, আমি এমন কাজ আর কখন করব না। এবারকার মত আমার ক্ষমা করুন, তা নইলে যে আমার লেখা পড়া হ'বে না; আমাকে যে মূর্খ হ'য়ে থাকতে হবে।” বলিয়া স্বরেন্দ্র কাঁদিয়া মহেশের পা জড়াইয়া ধরিল। মহেশ তখনও সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতে পারে না। অনেক কষ্টে উঠিয়া স্বরেন্দ্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। স্বরেন্দ্রের চক্ষু ছুটি হইতে অঙ্গ দ্বারা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় হেডমাষ্টার মহাশয় আসিয়া ডাকিলেন—“কেমন আছেন মহেশ বাবু? একি স্থরেন্দ্র যে!”

“ভাল আছি। আপনি একে স্থল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?”

“শাস্তি দিয়েছি মাত্র।”

“শাস্তিটা যে ওর অপরাধ অপেক্ষা অনেক বেশী হয়েছে হেডমাষ্টার মহাশয়। এ শাস্তি ওকে ত যাবজ্জীবন ভোগ করতে হবেই উপরন্তু ওর ভবিষ্যত বংশধরগণকেও এর ভাগ নিতে হবে। এবারকার মত স্বরেন্দ্রকে ক্ষমা করুন।”

“ক্ষমা করবেন মহেশ বাবু, আমার দ্বারা তা হবে না।”

“তবে আমাকেও আজ হতে মুক্তি দিন—”

“আপনি বলেছিলেন, আপনি গরীব না?”

“সত্যই আমি অতি গরীব। এই স্থলের দেওয়া ত্রিশটি মুঠাই আমার একমাত্র উপজীবিকা। কিন্তু যেখানে সামান্য অপরাধ—”

“সামান্য অপরাধ! ও কত বড় ছুট—”

“তা জানি। কিন্তু সাদি দিলে অপরাধীর চরিত্রের

পরিবর্তন ঘটে না কেবল অজ্ঞাত অপরাধীর ক্রিয় শিষ্টা দেওয়া হয় মাত্র। সং ছাত্রত আপনিই তাহার পথ বেছে নেবে হেডমাষ্টার মহাশয়। এই স্থরেন্দ্রের মত দুট ছেলেদের গড়ে তোলাই আমাদের—”

হেডমাষ্টার মহাশয় স্বরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—

“বাড়ী যাও। কাল স্থলে যেও, তোমার আবার ভর্তি

করে ল'ব।”

স্বরেন্দ্র চলিয়া গেল।

“গাড়িয়ে রইলেন যে হেডমাষ্টার মহাশয়, বহুন।

কি ভাবছেন?”—মহেশ বলিল।

“খার্ড মাষ্টার মহাশয় আপনিই শিক্ষক হ'বার উপযুক্ত,

যা আমি এম-এ, বি-টি আর দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ

করেও হতে পারিনি।”—বলিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় মহেশের

পাশে বসিয়া তাহার মাথার ঘা পরীক্ষা করিতে

লাগিলেন।





### শ্রীকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

#### ছানিবন্দন

সেদিন, অতি প্রত্যুষেই হরেন্দ্রাবুর উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পাড়াইলেন। তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ষ্টেশন হইতে একখানি মালগাড়ি এই মাত্র ছাড়িয়া গিয়াছে। হস্তরতা ফুলীরে চীৎকার তখনও নিশেষ হইয়া থাকিয়া যায় নাই। গত রাত্রিতে হরেন্দ্রাবুর বেশ গাঢ় নিশা হয় নাই। কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন মনের মধ্যে আসিয়া তাঁহার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। শেষ রাতে তিনি তাঁহার বন্ধু মহেন্দ্রাবুরক ধরে দেখিয়াছেন। সেই কথাই তখনও তাঁহার মস্তিষ্কে জল করিতেছিল। কি গভীর বিষাদ-ভারে মহেন্দ্রাবুর শরীর নত হইয়া পড়িয়াছে। চিন্তাসিঁই মুখানি, বেদনা-কাতর করুণা-ভরা নয়ন দুটি তুলিয়া যেন বার বার বলিতেছিল “ভাই, বন্ধুত্বের দাবী রক্ষা করিতে যেন তুলিও না।” সে কি করুণ প্রার্থনা। তারপর যেরূপ ধীরে ধীরে সে আমার নিকটে আসিয়া আমার হাত ধুনি তার দুয়ার শীতল হিম হস্তের উপর অত্যন্ত স্নিহিত ও আশ্রয় ভরে যেন তার সারা অন্তরের মধু-বেদনা নিয়া চাপিয়া ধরিল। তাঁহার কন্ঠার অশ্রুসন্ধান করিতে যেন অবহেলা না হয়। সে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথা বলিল, “হরেন্দ্র, আমাকে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হ’ও

না—আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি এবং কোন দিন যে এমন ভাবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এমন ইচ্ছাও ছিল না। মাহুয় পৃথিবী ত্যাগ করে চলে এলেও কি ভীষণ যে তার সংস্কার তা তোমাকে বোঝাতে পারবে বলে মনে হয় না। শরীর যায়, কিন্তু আসক্তি আকাজ্ঞা যায় না। আমার কন্ঠার বিবাদের জ্ঞাত আমার মন সর্বদা ব্যাকুল হয়ে আছে। নন্দিনীকে না পাওয়া ও বিবাহ না দেওয়া পর্বাৎ আমার আত্মার শাস্তি নাই—বিশ্রাম নাই। তাই আজ—কি কষ্টে যে দেখা করতে এসেছি তা বলতে পারি না।” তাঁর কাতরতা ও অশ্রুয় দেখিয়া চক্ষের জল স্রবণ করিতে পারিলাম না। আমাকে অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখিয়া মহেন্দ্র বলিল “ধাঁও না ভাই হরেন্দ্র। ইহাতে আমাকে আরও অধিক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি আমার শেষ অহরোখটি রক্ষা করো।”

আমি বলিলাম, “নিশ্চয় রক্ষা করব কিন্তু যদি নন্দিনীর সন্ধান না পাই।”

“আমি তোমাকে সেই সংবাদই দিতে এসেছি হরেন্দ্র।”

“নন্দিনী মরে নাই, সে বেঁচে আছে। ভাল আছে। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ মহেন্দ্র আমার হাত ছাড়িয়া দিল।—অমর অঙ্গে সে যেন শূঁতে মিশিয়া গেল। আমি

অত্যন্ত উত্তেজিত কষ্টে ডাকিলাম, মহেন্দ্র, মহেন্দ্র, বলে যাও সে কোথায় আছে।”

এই কথা বলিবামাত্র হরেন্দ্রাবুর নিশা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল চাহিয়া দেখেন, করুণাময়ী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন। সকাল হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিতে করিতে, বাহিরে আসিয়া পাড়াইলেন। আজ তাঁহার মানসপটে অতীত দিনের কত স্মৃতিই ভাসিয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে ডাক্তারী করিতে গিয়া মহেন্দ্রাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়, তারপর তাঁহাদের দুইটা সংসার স্নিহিত, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বন্ধনে এক হইয়া যাওয়া। দুই বন্ধুতে মিশিয়া কতদিন কতকম আলোচনা হইত। হরেন্দ্রাবুর মনে হইতেছিল সেসব ঘটনা যেন সেদিনের কথা। নন্দিনী যেদিন হারাইয়া যায়, সেদিন, কি ভীষণ বিপদের দিন। আহা! নন্দিনী পরিত্যাগ করিয়া সেই কুন্তের মেসার অদৃষ্টব জনতার মধ্যে তখন তখন করিয়া নন্দিনীর অশ্রুসন্ধান—আজ বহুদিন পরে মৃত বন্ধুর ধরে দেখিয়া হরেন্দ্রাবুর প্রাণ সত্যই নন্দিনীর জ্ঞাত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কি উপায়ে নন্দিনীর সন্ধান পাওয়া যায়, কি করিলে স্বর্গীয় বন্ধুর ব্যথিত আত্মার সন্তোষ বিধান করা যায় তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। বন্ধু ত বলিয়াছেন “নন্দিনী মরে নাই, বাঁচিয়া আছে।” তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বাঁচিয়া আছে। আহা! আর একটু অপেক্ষা করিলে তাঁহার নিকট হইতে সন্ধ্যা কাটা যানিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু, তাহার পূর্বেই যে সে চলিয়া গেল। দেখা যাক বিমল বাবুর জ্যোতিষীর নিকট হইতে কতখানি সংবাদ জানা যায়।

এই সময় করুণাময়ী আসিয়া সংবাদ দিলেন, “চা তৈয়ারী। মৃত্যুক ধূয়ে নাও—এখন বিমল বাবু এসে পড়বেন।”

করুণাময়ীর আনন্দে হরেন্দ্রাবুর চিন্তার স্রোত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি করুণাময়ীর দিকে কিরিয়া বলিলেন, “এখন মুখ ধুয়ে নিচ্ছি। দেখ ভোরের দিকে মহেন্দ্রকে ধরে দেখলাম—সে কি ভীষণ রোগী হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে আমার কাণা এলো।” সে কি

বলেন জান—নন্দিনী বেঁচে আছে। নন্দিনীর বিবাহ দেবার জন্ত কি যত্নপরী? কাতর অহরোধ, করুণাময়ী, সেই দুঃস্থ হৃদয়বিদায়ক! সে আমার হাত ধরে এমন ভাবে তার অন্তরের বেদনা বার বার জানালে যে, সে কথা শ্রবণ করিতে এখন আমার সর্ব শরীর কাঁপে।” করুণাময়ী একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “নন্দিনীকে তিনি অসম্ভব বেহে করিলেন। সেজন্ত জীবনের পরপারে গিয়েও সে বন্ধন আজও ছিন্ন করতে পারেন না। আমার কোন মনে মনে বিশ্বাস হচ্ছে খুব শীঘ্রই নন্দিনীকে পাওয়া যাবে। ভোরের স্বপ্ন বড় একটা মিথ্যা হয় না।”

হরেন্দ্রাবু বলিলেন, “কিন্তু এতদিনের ভিতর আমি ত এক দিনের জন্তও মহেন্দ্রকে ধরে দেখি নাই।” করুণাময়ী উত্তর করিলেন, “গত রাত্রিতে অনেককম পর্বাৎ তাঁহাদের কথাই হয়েছিল কি না? সেই জন্তই স্বপ্নে দেখেছি।” তারপর তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “তুমি যে বললে অবশ্যকি এখানে আসবার নিমিত্ত টেলিগ্রাম করছে। কই সে এলো না ত?”

“বোধ হয় আজ দশটার গাড়িতে আসতে পারে, নয় ত কাল নিশ্চয় আসবে।” “আমার মনে হয়—মহেন্দ্রাবু পুজুর হাতের জল অনেক দিন পান নাই, তাই এমন বিষণ্ণ ও শুভ চেহারা দেখা দিয়েছেন। অবশ্যী এলে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে এখন?”

হরেন্দ্রাবু খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া লইলেন। যথা সময় বিমল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন করুণাময়ী চা ও জলপানার আনিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে উমেশ, বিপিন ও প্রবোধ আসিয়া চায়ে যোগদান করিল।

বিপিন চা পাইতে খাইতে হরেন্দ্রাবুরক বলিল, “আমাদের কলেজ খোলবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, কলকাতা যাবার কি আপনাদের কিছু ঠিক হয়েছে?”



এই সময় লতিকা এক রাশ পাণর ভাড়া আনিয়া হাজির করিল।

ললিকাতা বাইবার প্রভাব স্ত্রিয়া ললিকা বলিয়া উঠিল, “বাবা আমাদের, এখনও কিন্তু সব দেখা হয়নি। তুমি ত বলেছ আমাদের ‘নন্দা ফল’ দেখিয়ে আনবে!”  
হরেন্দ্রাবু বজ্রার কথা স্ত্রিয়া বলিলেন “এখন পর্যন্ত কি এমন কথা বলেছি যে নন্দা ফল দেখিয়ে আনব না। বিপিনের কলেজ শীগগির খুলবে কি না, তাই বিপিন—ব্রজা কলিঙ্গ কবে নাগাদ আমাদের হাওয়া হবে—জিজ্ঞাসা।”

লতিকা বলিল, “হুঁ পাচ দিন বলি হ’লে যদি বিপিন—দাব পারসেটের কম পড়ে তা’হলে অবশ্য ওকে আটকে রাখা উচিত হবে না। কি বল বিপিন—দা।”

লতিকার কথা বিপিন উত্তর করিল, “সে ত খুব ঠিক কথা। কর্তব্য ছেড়ে হাওয়া খেয়ে আমাদের করবার জ্ঞান আর কেউ হয় ত আসতে পারেন; আমি কিন্তু তা পারি না।” বলিয়া বিপিন, উমেশের হিকে তীর কাটা কষ্টপাট করিল। লতিকা তাহা দেখিতে পাইল। সে যে খোঁচা মিয়াছে; তাহা বিপিনকে যে বিধিয়াছে, জানিয়া মনে অন্যতর বৃথা হইল এবং যথেষ্ট আনন্দ অস্থির করিল। বিপিন যে নিজেই পথ, আপন কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া বন্ধ করিল, তাহা আনিয়া এবং সেটাকে আরো পরিষ্কার করিয়া সর্ব সমুদয় খরিবার জ্ঞান অত্যাধিক তাহেই উত্তর করিল, বিপিন—দাব ও কর্তব্য—বোধ কেহই স্বীকার্য্য করিতে পারিবে না।

উমেশ এ সব কথাগুণের মধ্যে বড় মন দিল না। সে তখন আপন মনে গরম পুরম পাণরের সন্ধ্যাবহার করিতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে অভিনিবিষ্ট ছিল।

প্রবোধ মাখনাম হইতে উত্তর করিল “রৈখে দাও তোমার পারসেটের আর কর্তব্য জ্ঞান। ও সব বড় বড় কথা, বাহ্য বক্তব্য সম্বল বললে শোভা পায়। পারসেটের কম পড়লে সে ত শোভা বস্ত্র রতন সূত্র প্রয়োজন। ‘অমর, অক্ষয়’ হয়ে চিরদিন বেঁচে থাক কোরগি বাবু। পারসেটের অভাব কি।”

প্রবোধকে এতখানি স্বাধীন ভাবে কথা বলিতে স্ত্রিয়া

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, হরেন্দ্রাবু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছেন।

বিপিন বলিল, “ওহে প্রবোধ ও উপায়টা যে কেবল তোমার জানা আছে তা নয়, সকলেই জানে। তবে কি জান জুয়াচোরা—চিরদিন জুয়াচোরী ভিন্ন আর কিছু নয়। অকারণ সে কাজটা না করাই উচিত।”

প্রবোধ বলিল “তা’হলে তোমার, মতে, যথেষ্ট কারণ থাকলেও কথা যেতে পারে। তবে এ কথা স্বীকার করবে যে কারণ না থাকলে আর প্রবোধের হয় না। স্বতরাং যখন প্রয়োজন হয় তখন তোমার হিসাবে কারণ আছেই, অতএব সেটা জুয়াচোরীর গুণীর বাহিরে এসে পড়ল কি নয়?”

লতিকা বলিল, বিপিন—দা, তুমি পাণর খেলে না। তুমি তর্ক করে চলেছ, আর ওরা বৃদ্ধারদের মত বেশ খেতে চলছেন।”

বিপিন তখন মনে মনে একটু চট্যাছিল। সে উত্তর করিল “পাণর কিছু একটা এমন উপায়ে জ্বিনিস নয় যে, না খেলেও দুঃখ করবার মত কারণ থাকতে পারে। ডাক্তারেরা ওটার চিরদিনই বিরোধী।”  
কিন্তু পূর্ব নীরব থাকিয়া উমেশ এবার যত্ন হাসিয়া বলিল, “ডাক্তারগণ অনেক জ্বিনিসের বিরোধী কিন্তু তাই বলে মনে করেন না, সেটা তাদের সৌভাগ্য। বরং দুর্ভাগ্যই বলা যেতে পারে।”

উমেশের কথা শুনিয়া বিপিন আরো রাগিয়া গেল। উমেশকে একটুখানি আঘাত দিবার জ্ঞান সে, বলিল “ও হে উমেশ কখনো সময় সৌভাগ্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জ্ঞান দুর্ভাগ্য ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে হয় সে কথাটা মনে রেখো।”

এ কথার উত্তর দিতে গিয়া উমেশ কি ভাবিয়া যেন ধামিয়া গেল। লতিকা আর কোন কথা না বলিয়া সেখানে হইতে অন্ধরে চলিয়া গেল। এই সময় হরেন্দ্রাবু আসিয়া বিমলকে সোধেদন করিয়া বলিল, কোম্পানী খুলিতে বড় রেহি হয়ে গেল, চল যাওয়া যাক। আজ ত তোমার সকালে ডিউটি নাই?”

বিমল বলিল “আজ্ঞে, না।”

তখন দুইজনে মিলিয়া জ্যোতিষীর বাড়ী যাত্রা করিল।

প্রবোধ বলিল “চল হে বিপিন, ষ্টেশন থেকে ঘুরে আসা যাক। হরেন্দ্রাবু কদিন ধরে বলছে—আমার এখানে বড় একটা আসেন না। আমার জ্ঞানে ত আমার বাড়ী চাকরী, চল্লিশ ঘণ্টাই কাজ।”

উমেশ বলিল “তবে দাঁড়াও, আমি একথানা চিঠি লিখনি ‘অমনি ভাঙে ছেলে আসব।’

প্রবোধ বলিল, “চিঠি লেখা সে তখন পরে হবে। এখন উঠে পড়।”

বিপিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং বলিল “চল।” তাহার উদ্দেশ্য তাহা হইলে উমেশের চিঠি লেখার আর সুবিধা হইবে না। ইহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও অনেক সময় একটা নগণ্য কার্য্যে বাধা দিয়াও মাছের তার থিলাবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করে। ইহাতে উমেশের বড় একটা কিছু আসিয়া না যাইলেও বিপিন যে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে, সে আনন্দে তার মন প্রস্তুতিত হইয়া উঠিল।

উমেশ আর কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া তিন বন্ধুতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে যাইতে যাইতে হরেন্দ্রাবু বিমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যোতিষী-ঠাকুর—গণনার কাজ ছাড়া অন্য কিছু করেন কি?”

বিমল উত্তর করিল “আমার মনে হয় গণনা কার্য্য করে এখানে তাহার সংসার চলা অসম্ভব। নিশ্চয়ই অন্য কিছু করেন।”

তোমার সঙ্গে কত দিনের পরিচয়?”

প্রায় পাঁচ বৎসরের—আমি যত দিন এখানে এসেছি। খুব নিষ্ঠাবান স্বাধীন—আশ্চর্য্য গুণতে পারেন। গেলেই যত্নতে পারবেন।”

আমরা যত দিন আসিয়াছি কৈ একদিনও ত তাঁকে দেখিনি। এদিকে কে বড়াতে আসেন না।

“ঐশেনে মাঝে মাঝে আসেন, সেও খুব কম বললেই হয়। বেশী জাক-জমক করে নিজেই প্রচার করতে বড় রাজি নই।”

হরেন্দ্রাবু যত অধিক করিয়া জ্যোতিষীর বিষয় অবগত হইতেছিলেন, ততই বেশী করিয়া তাহার বিশদ ও শ্রদ্ধা জ্যোতিষীর উপর বাড়িয়া চলিয়াছিল। মনে হইতেছিল, আর যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। নান্দী নীচুই জীবিতা আছে। এই ব্যক্তির গণনার দ্বারাই সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যাইবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নামান্ত পথ তাহার অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া অসম্ভব হইতেছিল। মনে হইতেছিল, তিনি যেন অনেককণ গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন। অত্যন্ত স্বাধীন ও অসহিষ্ণুতা হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কত দূর যেতে হবে।”

“আমরা ত বেশী পথ আসি নি। ষ্টেশনের পূর্ব—দিকে ঐ যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে ঐ গ্রামে তিনি থাকেন।”

হরেন্দ্রাবু যখন দাঁড়িয়ে, সত্যই ত বেশী দূর আসেন নাই। এখনও ষ্টেশন পার হন নাই। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আমারই ভুল হয়েছে দেখছি। ভাল কথা তিনি ত কোথাও চলিয়া যাবেন না? তাহাকে নিশ্চয় বলিয়া আসিয়াছে যে আমরা আস আসব।”

“বলবার জ্ঞান গিয়েছিল। তিনি বাড়ী ছিলেন না।”

দেখা হয় নাই। বাড়ীতে বলে এসেছি।

এ কথা শুনিয়া হরেন্দ্রাবুর প্রস্তুতিত মনটা সহসা যেন অবসর হইয়া পড়িল। তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন। এবং দ্রুত পদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া নিজে নিজেই বলিলেন, “অশুভ দেখা হ’লে হয়।”

বাড়ীর দরজায়ই জ্যোতিষী ঠাকুর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতে দিগন্ত তাহাকে দেখিতে পাইয়া দোহসাহে বলিয়া উঠিল ‘ঐ যে তিনি বাড়ীতে আছেন।’

হরেন্দ্রাবু দূর হইতে জ্যোতিষীকে লক্ষ্য করিয়া মনে আনন্দিত হইলেন। দিবা সোয়ায় ষোল, গৌর কান্তি, মুখের উপর একটা অস্বাভাবিক প্রসন্নতার স্মৃতি বিদ্যমান। স্বপ্ন দেখে, বলিষ্ঠকার দীর্ঘ পুরুষ। দেখিবারাম আপন হইতে কেমন একটা শ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে।

তাহাদের দেখিবার মাত্র তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া



প্রথম আমলে তাঁহারিগকে জাহান করিলেন। স্থল জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার জ্যোতিষীকে ভক্তিপূরক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। নবপরিতীতা পত্নীকে প্রথম সস্তায়ণ করিতে অগ্রসরের মধ্যে আনন্দ যেমন আকুল হইয়া মনোনিীত সমুদ্র কথাকে অসহ্য ও বিশৃঙ্খল ভাবে অর্থহীন করিয়া তোলে সজ্জিত ও হরেন্দ্রবাবুর মনের মধ্যে তাঁহার জিজ্ঞাস্ত নকল প্রদর্শনের অবস্থা কি একটা অজানা আনন্দের কল্পনায় পথ হারাইয়া ঘুরিতে লাগিল।

জ্যোতিষী মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বিমলাকে অত্যন্ত ক্রীতজবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুনিলাম কাল আপনি এসেছিলেন। হরেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন “একে ত কোন দিন দেখি নাই? কতদিন এসেছেন?”

বিমল উত্তর দিবার পূর্বেই হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আজ্ঞে আমি আজ প্রায় একমাস হ’লে এসেছি—বাবু পরিত্রেনে নিমিত্ত।”

“বেশ! বেশ! এতদিন খুবই স্বাস্থ্যকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিছু উপকার পেয়েছেন বোধ হয়!” “যেবে উপকার হয়েছে। সে কথা স্বীকার করা যায় না।”

“একা এসেছেন নাকি!”

বিমল বলিল “উনি নবপরিতীয়ে এসেছেন।” হরেন্দ্রবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “তা হলে আরো কিছু দিন বাহন একটু দীর্ঘ দিন না থাকলে স্বাস্থ্য উপকার পাওয়া সম্ভবপর নয়।”

বিমল বলিল “ওর থাকা বড় শক্ত, এই যে একমাস আছেন, এতেই ওর যথেষ্ট টাকা লোকসান হয়েছে। উনি হচ্ছেন কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার। ওঁদের থাকা পোষার না।”

“এতদিন এসেছেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই—আমার অদৃষ্ট! আমি ত অনেক দিন তোমাদের ও অকলে বাইতে পারি নাই। তা’ টাকা লোকসান হ’লে বিষয়ী লোকের পক্ষে থাকা কঠিন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”

হরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃত্তিত হইয়া বলিলেন, “আপনার

সহিত এতদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আপনার মত লোকের দর্শন পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে ও রকম করে কথা বলেন, তা’ হলে বড়ই লজ্জা দেওয়া হয়।”

“না, না, আমি সে ভাবে কোন কথাই বলি নাই। টাকা, সংসার করিতে হ’লে যেমন প্রয়োজন, স্বাস্থ্যও ঠিক তেমন ভাবেই আবশ্যক—একটাকে ছেড়ে একটাকে ভোগ করা অসাধ্য।”

“এ কথা একশোবার ঠিক।” আমি আরো কিছুদিন থাকব ইচ্ছা আছে। তিনি এবার বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি প্রয়োজন বলুন ত। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন। আজ্ঞা আপনাকে যে বলিয়া গিয়াছিল, এই মাসে বেতন বৃদ্ধি হবে তার কোন আভাষ পাইয়াছেন কি।”

বিমল বলিল “আজ পর্যন্ত কোন সংবাদ পাইনি।” বিমলের কথা শুনিয়া জ্যোতিষী ঠাকুর মনে মনে কিছুকণ কি বিচার করিলেন, তারপর বলিলেন, “আজ বা কাল নিশ্চয় জানতে পারবেন।”

এতখানি ঘোরের সহিত কোন জ্যোতিষীকে হরেন্দ্রবাবু কথা বলিতে কোনদিকই শোনেন নাই। তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা আশার উজ্জ্বল আলোক জলিয়া উঠিল। তাহার সর্বশরীর জ্যোতিষীর দৃঢ়তা অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি বড় আশায় আপনার নিকট এসেছি। এখন আপনার অগ্রহ হ’লে আমার আশা পূর্ণ হয়।”

“আমাকে অত করে বলবার প্রয়োজন নাই। কি করতে হবে আদেশ করুন। আমার দ্বারা মাহা হবে, আমি প্রাণ দিয়ে তা করতে প্রস্তুত আছি।”

“এ আপনার মত সাধু ব্যক্তির উপযুক্ত কথা। এখন আপনার দয়া।”

“জানি আমি আপনাকে এরূপ অগ্রহে প্রবৃত্ত করা সম্ভব নয় কিন্তু আমার স্ত্র জ্ঞান উপায় নাই। আমার অপব্যয় গ্রহণ করবেন না।”

জ্যোতিষী ঠাকুর এবার হরেন্দ্রবাবুর মস্তকে হাত দিয়া

আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “এখন বলুন আমাকে বহন। তারপর তিনি উঠিয়া একটা সমুদ্র পাড়িলেন কি করিতে হয়। সবই নির্ভর করে ওর কৃপার এবং অত্যন্ত মনঃসংযোগসহকারে কোমল বিচার আশ্রয় করিলেন। একবার আগাগোড়া কোমলিই চক্ষু বুলাইয়া লইলেন। তাঁর ললাটে র চর্ম যেন কৃত্তিত হইল। সহসা তার মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি একবার চক্ষু তুলিয়া হরেন্দ্র বাবুকে কি জানি কেন ভাল করিয়া দেখিলেন।

হরেন্দ্রবাবু পকেট হইতে কোমলিখানি কল্পিত হস্তে বাহির করিয়া জ্যোতিষী ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “এইখানি গণনা করে দিতে হবে।”

জ্যোতিষী ঠাকুর মনে মনে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। বেশ, আমি দেখে দিচ্ছি, আপনারা একটু

(ক্রমশঃ)

## অনাদৃতা কুসুম

### ত্রীপ্রমথনাথ বসু

তুলিতে আসিয়া ফুল

কেন তুমি কিরে গেলে!

ফুলটি কি পায়ে কাটা

বুকেতে কি ব্যথা গেলো?

কটকিত ফুল বনে

ছিঁড়িতে ফুলের বোটা।

বিষধ দেখি কি গো

শিহরিল গায়ে কাটা।

সে ফুল তুলিতে তুমি

যদি গো কাতর হলে।

সমূলে সে ফুলতর,

উপাড়িয়া দাও ফেলে।

যদি নাহি হ’ল তায়

দেবতা চরণ পূজা।

মিছে তার ফুটে থাকা

বুখাই কানন সাজা।

কি হুখে চলিবে ভালো

আকুল সমীরে আর।

অনাদরে শুধায়েছে

স্ব’রে গেছে পাতা তার।

ধরাসনে ধূলি বুকে

লুটায় পড়িল দুখে।

পথ পানে চাহি কার

রহিল বলিল মুখে।

বড় আশা ছিল মনে

প্রাণের দেবতা পূজি।

মনস্বা পুরাইবে

মরণ লইবে মুখি।

সে মাখ মিটল ঠিক

মরিল যে সে সুরমে।

মরমের ব্যথা যত

রহিয়া গেল মরমে।

লহ সখা তুমি তারে

তোমার চরণ মূলে

হবে নাকি পূজা তব

ধূলি মাথা বসি ফুলে?





মহারাণী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পরিচয়  
সার সঞ্চলন

সত্যের পরীক্ষা

আমার পছন্দ

সোমবার দিন ডাঃ মেটা জিকোরিয়া হোটেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখিলেন যে আমরা সেখানে ভাগ করিয়া গিয়াছি। আমাদের নুতন টিকানা সেখানে হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদের নুতন বাসায় আসিয়া দেখা করিলেন। বাটো আসিবার সময় নিজের বোকার্মীর জুই আমি হজুরাণে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। দ্বানের জুই ও হাত মুখ দুইবার জুই এ সময় আমাদের সমুদ্রের জল ব্যবহার করিতে হইত—সমুদ্রের লোণা জলে সাবান ভাল গলে না, কিন্তু সাবান মাখাটা সভ্যতার একটা অঙ্গ মনে ধারণা থাকায়, আমি সাবান ব্যবহার করিতাম। লোণা জলে সাবান ব্যবহারের ফলে গাভ চক্ষু পরিষ্কার না হইয়া বরং চটুটে হইতে, লাগিল এবং তাহা হইতেই নজরপাশের স্বরূপ হইত। ডাঃ মেটাকে আমি দেখুকা বলিলাম এবং তিনি এসিকট এ্যান্ড নামক ঔষধ ব্যবহার করিতে বলিলেন। এসিকট লাগাইলে এমন জ্বালা করিত যে আমি ক্ষণের কাঁড়ি কেলিভাম—সেকথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে।

ডাঃ মেটা আমার ধরখানি দেখে সম্বন্ধের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া বলিলেন “না এ চলবে না।” বুলিলাম আমাদের ঘরটা তাঁর পছন্দসই হয় নাই। তিনি বলিলেন “আমরা যে কেবল পড়াশুনা করিবার জুই এ দেশে আসি তাই নয়—ইংরাজদের আচার ব্যবহার

চালচলন ও তাহাদের সংসার যাত্রার ব্যাপারগুলিও দেখা চাই—তা থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করা চাই। এই জুই কোন্ একটা গৃহস্থ পরিবারের সঙ্গে থাকা তোমার আবশ্যক। কিন্তু তার আগে তোমার তাহাদের হালচাল সব শিখে নিতে হবে—এজুত একটু শিক্ষানবিশি করিতে হইবে। আমি তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাটাই আগে করিতে চাই।” আমি কুতজচিত্তে তাঁহার কথামত কাজ করিতে বীকার করিলাম। তিনি একটা বন্ধুর কাছে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি দয়া ও যত্নের অবতার বলিলেই চলে, এবং আমার ঠিক নিজের ভায়েক মত ভালবাসিতেন। তিনি আমাকে ইংরাজী আদব কাযদা দুহুত করাইতে লাগিলেন, ইংরাজীতে কথাবার্তা করিতে শিখাইলেন; কিন্তু গোল বাধিল আমার গাওদাওদার ব্যাপার লইয়া—খালী নিয়ে সিদ্ধ করা না হইলে কোন তরকারী আমি খাইতে পারিতাম না। কাজেই বাজীওয়ালী আমার জুই কি রাখিবেন তাই ভাবিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। প্রাতঃরাশের সময় আমার Oatmeal Porridge খাইতাম—তাতে বেশ পেট ভরিত কিন্তু লোকের ও ভিনারের সময় আমাকে এক প্রকার উপবাসই করিতে হইত। বন্ধুটি আমাকে মাংস খাওয়াইবার জুই অনেক বুঝাইতেন কিন্তু আমি মাতার নিকট আমার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিতাম ও নীরব থাকিতাম। লাগ ও ভিনারের

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা]

ইয়ং ইন্ডিয়া

১০৫৫

আমরা কটা, জাম ও স্পিনাক খাইতাম। আমি বেশ খাইতে পারিতাম এবং আমার উদরটাও বেশ আয়তন-বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু ২৩ টুকুরা বৈশী কটা চাহিতে আমার লজ্জাবোধ হইত, মনে হইত সেটা বৃষ্টি সভ্যতা-রীতির বহিষ্কৃত। তার উপর লোকে ও ভিনারের দুই পাওয়া হইত না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বন্ধুটি বিড় বিড় হইতেন এবং একদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন “দেখ তুমি যদি আমার আশ্রয় ভাই হইতে তাহা হইলে আমি তোমায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া পাঠাইতাম। অশিক্ষিতা মাতার কাছে একটা কথা না হয় বলিও এসেছ কিন্তু তা যে অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্তে হবে তার কোন মানে নাই আর তাছাড়া সে কথাটা দেবার সময় এ দেশের অবস্থার সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলে; হিসাব মত তোমার তখনকার কথাটাকে প্রতিজ্ঞা বলে ধরা যেতে পারে না—আইনমতও সেটা অবশ্য পালনীয় নয়—এরকম প্রতিজ্ঞা পালন করা কেবল মাত্র কুসংসারের পরিভ্রম আর এটাও জেনে রেখো যে তোমার ঐ রকম একজুয়েমীর জুই তোমার এখানে কিছু হবে না। নেনে তুমি বলছ যে তুমি পূর্বে আমি দেখেছি এবং তা থেকেও তোমার ভাল লাগতো। অথচ সে সময় তোমার মাংস খাবার কোন দরকারই ছিল না তখন মাংস খেতে পেয়েছ আর এখন মাংস বাওঘাটা নেহাই দরকার তখন কিছুতেই মাংস খাবে না। খুব ব্যাবেক!”

আমি কিন্তু অচল অটল।

প্রায় রোজই আমার বন্ধু মাংস পাওয়া নিয়ে দ্রুতি তরু মুখে রিতেন কিন্তু তাঁর সকল তরুর শেষে আমার একটা চিরস্থান না দেখা দিত। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতেন, আমি ততই বিকটিয়া বিসতায়। আমি ভগবানের কাছে নিত্য মনের জোর তিকা করিতাম এবং পাইতামও। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার যে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল তা নয় তবে ভক্তি ছিল অগ্রমুখে এবং তাতেই কাজ হইত যথেষ্ট। এই ভক্তির বীজ আমার খাটী রক্তা শৈশবে আমার জুয়ে বদন করিয়া গিয়াছিল।

কিছুতেই এখন কিছু হল না তখন বন্ধুর একদিন বেহাঘের Theory of utility নামক পুস্তক লইয়া আমার পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। আমি ততো মনে ভাবাচাকা যেতে গেলুম। পুস্তকখানির ভাষা বৃষ্টিবার মত—সামর্থ্য আমার ছিল না। তিনি এখন আমার টীকা টিঙ্গনী করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমার বলিতে হল “আমায় মাফ করবেন—এই সব কিছুতে জিনিসগুলি আমার সম্বন্ধে চুকিবেন না। আমি বীকার করি যে মাংস খাবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে কিন্তু আমি সভ্যতাপ্র করিতে পারি না এ সম্বন্ধে আমি তরু করিতে চাই না কারণ তরুর আপনাকে আমি হারাতে পারবো না; আমাকে বোকা বা একজুয়ে এমন একটা কিছু ভেবে অব্যাহতি দিন।” আপনি যে আমার মজলা-কাজনী তা আমি বিশেষরূপে জানি এবং এ রিকাকাজার মূল্য যে কটা তাও আমি উত্তররূপে জানি। আমার কষ্ট হয়ে উঠে। ভেবেই যে আপনি বার বার আমার পীড়াপীড়ি কর্তেন তাও আমি জানি, কিন্তু আমি একান্ত নিরুপায়। সভ্যতা আমার কাছে চিরদিনই সভ্যতা—তা নষ্ট কর্তে আমি অক্ষম।” তাঁর কথার ফলস্বরূপ বন্ধুটি বিস্মিতমনে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বইখানি মুড়ে রেখে বলেন “ভাল, আর আমি তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করি না” আমি যেন বাচলুম। পরে আর কখনও তিনি এ প্রসঙ্গ তুলেন নাই। তবে আমার জুই মাথা বসাতে তাঁর কোন কষ্টর ছিল না তিনি নিজে মজদান করিতেন, দুখপান করিতেন কিন্তু আমার একদিনের জুই সে সব করিতে অস্বহাধ্য করেন নাই; বরঞ্চ এই ছুটি অভ্যাস হইতে দূরে থাকিবেই তিনি পরামর্শ দিলেন। তাঁর কেবল এই ভাবনা হইত যে পাণ্ডে মাংস না খাইয়া আমি দুর্দল হইয়া পড়ি ও ইংলণ্ডে থাকিতে আমার কষ্টবোধ হয়।

এমনি করিয়া একমাস কাল শিক্ষানবিশি করিয়াছিলাম। বন্ধুটির বাড়ী ছিল রিচমণ্ডে—সেখানে হইতে লণ্ডন যাওয়া যাবে একবার কি দুইবার খটা সম্ভব হইত। ডাঃ মেটা ও মিস লগনতরাম চুচীসেলজ আমায় কোন গৃহস্থের সঙ্গে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যির



করিলেন। ওয়েষ্ট কেনসিংটনের এক এংলো ইণ্ডিয়ানের কথা মি: স্ক্রার মনে পড়িল তিনি আমাকে সেখানে রাখিয়া আসিলেন। গৃহশাসিনী বিধবা ছিলেন, আমি তাঁহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা সমস্ত বলিলাম। বৃদ্ধা আমার সহজে উপলব্ধি বৃত্ত লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন ও আমি তথায় বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখানেও আমার প্রায় উপবাসেই কাটাইতে হইত। আমি বাড়ী হইতে নিঃসৃত ও অত্যন্ত খাজত্ব চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু সে সমস্ত তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। বাড়ীর ঘৃণী প্রায়েই জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাগ্যা বাগ্যা আমার ভাল লাগিতেছে কি না—কিন্তু তিনি কি করিলেন? আমি তখনও পর্যন্ত লজ্জা ত্যাগ করিতে পারি নাই, স্বতরাং আমার সামনে যা ধরিয়া দেওয়া হইত, তার উপর কিছু চাহিয়া লইতে পারিতাম না। গৃহকর্তার ছুটি মেয়ে ছিল, তারা আমার দ্বি এক টুকরা কুটী বেশী লইবার জন্য পীড়িত করিত কিন্তু তাহারা তো জানিত না, যে দ্বি এক টুকরা আমার কিছু হইবে না আমার পেট ভরাইতে একখানি আতু কটীর দরকার।

এইবার আমার ডান। বেরিয়েছিল অর্থাৎ আমি ইচ্ছামত বাহিরে বেরুতে আরম্ভ করেছিলাম তখনও আমি নিরামিহ লেখাপড়া ছক করি নাই। মি: স্ক্রার মৌলভে সংবাদপত্র পড়া আমার অভ্যাস হইয়াছিল—ভারতবর্ষে আমি কখনও পত্রের কাগজ পড়িতাম না। কিন্তু এখানে নিরামিহ সংবাদপত্র পড়া আরম্ভ করে তার উপর একটা আগ্রহ জন্মিয়া গেল। ভেলী নিউস, ভেলী টেলিগ্রাফ ও গলমল-গেজেট—এইগুলি নিত্যই পড়িতাম এতে বড়ো ধানকে সময় লাগতো কাজেই আমাকে বেড়াইয়া সময় কাটাইতে হইত। নিরামিহ ভোজনের জন্য কোন রেস্তোরাঁর খোঁজে ঘুরিতাম কারণ আমার

গৃহকর্তা বলিয়াছিলেন নিরামিহ রেস্তোরাঁর আছে সত্যম রেস্তোরাঁর সিংহ একপেট কুটী খাইবার জন্য আমি ১০১২ মাইল পর্যন্ত হাটখা গিয়াছি কিন্তু এত করিয়াও একদিনও ভোজনের আনন্দ পাই নাই। এইরকম ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ক্যারিডজন ষ্ট্রীটে একটা নিরামিহ রেস্তোরাঁর সন্ধান পাইলাম। শিত্তরা যেমন বান্ধিত স্রব্য পাইলে আনন্দিত হয় আমার মনটাও সেইরকম এই রেস্তোরাঁর দর্শনে আনন্দে ভরিয়া উঠিল। প্রবেশ ঘরের পশ্চিৎ একটা কাচের জানলায় নানাবিধ পুষ্প বিজ্ঞপ্তি সজ্জিত ছিল তন্মধ্যে স্ট্র সাহেবের "নিরামিহ ভোজনের কারণ" নামক একখানি বই দিল। এক শিলিং মূল্যে ঐ বইখানি বরির করিয়া আমি রেস্তোরাঁর প্রবেশ করিলাম। ইলঙে আসিবার পর আজ প্রথম পেট ভরিয়া বাইরা তৃপ্তি হইল। এতদিনে ঈশ্বর আমার সাহায্য করিলেন।

স্ট্র সাহেবের বইখানি আগা-গোড়া বেশ করিয়া পড়িলাম এবং পড়িয়া বেশ আনন্দ পাইলাম। এইবার আমি নিরামিহ ভোজনটা অন্তরের সহিত বরণ করিয়া লইলাম এবং যেদিন যার কাছে নিরামিহ ভোজনের মন্ত্র প্রতীকি করি সেই দিনটা কীবনের পুণ্য দিন বলিয়া মনে করিলাম। এতদিন পর্যন্ত কেবল সত্যভঙ্গের আশঙ্কায় আমি মাংস খাইতাম না কিন্তু মনে মনে আমি ইচ্ছা করিতাম যে প্রত্যেক ভারতবাসীই মাংসভোজন করুক, এমন কি একদিন নিজেও প্রকৃত্তে মাংসভোজী হইব এবং অপরকে মাংসভোজনে উৎসাহিত করিব—এ সব ধারণাও মনে ছিল। কিন্তু এই পুণ্ডক পাঠের পর আমি নিরামিহ ভোজন পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইলাম এবং পরে এই নিরামিহ ভোজনের প্রচার আমার জীবনের একটা ব্রত হইয়া পাড়াইলাম। (কম্পনঃ)



চৈত্র চৈত্র

বাংলা কাউন্সিল হইতেও স্বরাজ্যদল বাহির হইয়া আসিয়াছেন—ইহা যে স্বরাজ্যদলের মনখিতার চিহ্ন তাহা আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু তখনও হু-মন্ত্রী ও তাঁর যাতটি গ্রহ উপগ্রহ টিম্ করিতেছিলেন। আশা হুকিনী—সে যাহার মন একবার অধিকার করে সে ব্যক্তি অসম্ভবকণ্ডে সম্ভব মনে করিয়া থাকে এবং আশার আশায় সে করিতে পারে না এমন কোন কাজই নাই।

স্বরাজ্যদল আগামী নভেম্বরে আবার দলে পুঙ্ক হইয়া কাউন্সিলে ঢুকিবেন কিন্তু আবার এই অন্তঃসার-শূন্য কাউন্সিলে যাইরা হইবে কি? ভোটের জোরে তাহার বাধা দিবেন আর ভোটের জোরে লাটসাহেব কাজ চালাইবেন। স্বতরাং তাহাতে ফল যুব স্ববিধাঙ্গনক হইবে না, তার চেয়ে তাঁরা যদি পল্লীগঠন কার্যে সত্যাই একটু মন দিয়ে লাগেন তাহা দেশের সভ্যকার মঙ্গল হয় তের বেশী। কারণ আজকাল 'দল' বলিলে যাহা কিছু বুঝায় তাহা এই স্বরাজ্যদলেই দেখা যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই কাজ করিবার মত শক্তি আছে, অভাব শুধু প্রযুক্তি।

শ্রার আবদার রহিম হাইকোর্টে একজন মুসলমান মুক্কাতি বা মৌলবী নিয়োগের জন্য এক নতুন আবদার ধরিয়াছেন—হাইকোর্টে মুসলমান জজের সংখ্যা তেমন উপযুক্ত (!) নাই বলিয়াই এ বন্দোবস্তের কথা তিনি তুলিয়াছেন। এতকাল যদি মৌলবী না থাকিতো ও মুসলমানদের স্ববিচার পাওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধা না হইয়া থাকে তবে আজ তাহার যে কোন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এমন মনে করা যায় না।

সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জিনিগটা বড় ভয়ানক—ইহার প্রভাবে মাঝে মাঝে কণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া বসে তাই যা ভয়!

বঙ্গদেশের ও আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য হালিডে পার্কে সম্প্রতি যে সভা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার শ্রার আবদারের আলিগড়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে বঙ্গ ও আসামের মুসলমানদের বাবলা ভাবাই মাত্ৰভারা স্বত্বের বঙ্গভারা সাহায্যে শিকারানের বিরুদ্ধে শ্রার আবদার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহারও তাহারও অহুমোদন করেন না। আমাদের মুসলমান ভাইদের এই সংসাহস কেবল প্রশংসনীয় নহে ইহা তাহাদের মনের যথেষ্ট বলের পরিচায়কও বটে।

মেদিনীপুরের নাইট অন্তঃসার সাম্প্রদায়িকতার রূপের জন্ম কি কি মনে পড়া বাহির করেন তাহা দেখিবার জন্য আমার উদ্গীৰ্ণ রহিলাম।

Indianization বা ভারতীয় সরকারের কাজে অধিক পরিমাণে ভারতবাসীর নিয়োগ সংবাদটা বিলাতের লোকের যে বর্ণন্থ উপাদান করে নাই তাহা 'ট্রিগ' নামক কাগজের মন্তব্য পাঠ করিলে বেশ দৃষ্টি যায়। Prospects in the Indian Police—অর্থাৎ পুলিশের চাকরীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া এক ইংরাজ লিখিয়াছেন যে তিনি ইংলণ্ডের শিক্ষকদের নিকট শুনিয়াছেন এতদিন ভারতীয় পুলিশের যে সমস্ত উচ্চ পদের জ্ঞা ইংলণ্ডের বিদ্যালয় সমূহ হইতে লোক লওয়া হইত অতঃপর ঐ সমস্ত পদের ভারতবাসীগণ নিযুক্ত হইবে। এই সংবাদ শ্রবণে সেখানকার লোকেরা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। পূজাপ্রেরক মহাশয় তাহাদের আশাস দিয়া জানাইয়াছেন যে ইহা সত্য নহে—বৃটিশভগ্নমেট সংস্থা এভাবে নীতি পরিবর্তন





করিবেন না। অতএব ভোঃ ভোঃ উমেশ্বরবৃন্দ ! তোমরা আশ্বস্ত হও। রুটিশ মনোবৃত্তির একুশ স্পষ্ট নমুনার পর 'ইতিহাসনিবেশন' যে কতদিনে কার্যে পরিণত হইবে তাহা কি আর বুঝিয়া দিতে হইবে !

গত শনিবার (১৩ই মার্চ) রাণী-ভবানী স্থলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্ধ-বৃহৎসপ্তা রাণী-ভবানীর বর্তমান বংশধর, মহারাজ বংশীধর নারায়ণ সমুদ্রক উপস্থিত ছিলেন। ভাণ্ডারপতি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিচারপতি শ্রী সি, সি, ঘোষ, কে.টি, পারিতোষিক বণ্টন করিয়াছিলেন, স্বকৃষি প্রিয়দর্শনা দেবী। সম্ভ্রান্ত মন্ত্রণা মহোদয়গণ ও বহু ভক্ত মহিলায় আগমনে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। স্থলের সেক্রেটারী অধ্যাপক গণেশনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়কে এই আয়োজনের জন্য আদার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এবারেও লবণ-ভুজ কমিল না। শুক কমাইবার পক্ষে মাত্র ১২ জন ভোট দিয়াছেন—বিপক্ষে ৪৩ জন। সরকারী ভরক হইতে আর বৈশিষ্ট্য স্বত্বের এই প্রত্যাবর্তীকে ভোট সংগ্রহের পথ্য বলিয়া একটু কৌতুক উপভোগ করিয়াছেন।

এবার বজ্রটেও বাম পোটকার্ডের দাম কমিল না। ডাকবিভাগে যথেষ্ট লাভ হইলেও টেলিগ্রাফ বিভাগে প্রচুর লোকসান হইয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফ ধনী ও ব্যবসায়ীদের বৈশিষ্ট্য আনন্দকরী, তাহাদের সুবিধার জন্য দ্রবির প্রকাদের যে কেন হই পলয় পোটকার্ড কিনিতে হইবে তাহা আমরা বৃত্তিতে পারিলাম না।

গত সোমবার অপরাহ্নে গলায় ভীষণ বাসে। ইহাতে অনেক কষ্ট হইয়াছে। আহা! টোলা ঘাটেই কত পরিমাণ সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক। কলিকাতা ইমেনজি-গেশন কোম্পানীর ইমারতের পটুনটি একবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। 'পোট কমিশনারের ফেরী ইমারতের পটুনটির

অবস্থাও ঐক্লপ। রামকৃষ্ণপুর ঘাটের ফেরী ইমারতের পটুনটি ভাঙিয়া গিয়াছে। আহা! টোলা ঘাটে তিন থানা ডিকি ডুবিয়া গিয়াছিল। একথানা ডিকিও চারজন লোক ছিল। ইহারো জখম হইয়াছে। ইহাঙ্গিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। নিমন্তল ঘাটে নাথ মোল্লা নামক একজন মাষি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গেল।

বঙ্গ-সাহিত্যের স্বপ্রতিষ্ঠিতা লেখিকা সরোজকুমারী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। গল্প ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহার রচিত ছোট গল্প ও সমগ্র এক সময়ে সাহিত্য-সমাজে খুবই আদৃত হইয়াছিল। অশোক, বঙ্গদল, কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের ইনি রচয়িত্রী। স্বপলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীকৃষ্ণ জে, এন, সেনের ইনি সহধর্মিণী ও স্বপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক লেখক শ্রীকৃষ্ণ নগেশনাথ গুপ্তের ভগ্নী।

২৯ সংখ্যা নবযুগে প্রকাশিত এইচ, জে, কোর্ড অঙ্কিত 'বসন্তের বন্দোব' নামক চিত্রখানি, যাহার সম্বন্ধে—Connoisseurs এর সমালোচক লিখিয়াছেন—“It speaks more of Divinity in Humanity than Nudity” সমালোচনা করিতে যাইয়া চিত্রখানির সম্বন্ধে এক বিচিত্র-বিশারদ কতকগুলি আবেল তাবোল বকিয়াছেন। কিন্তু বড়দিনের সময় অপর একখানি ছবি আমার সামগ্রিক বদন একখানি নয় ফ্রেম-কার্ডের প্রতিচ্ছবি এই ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধের পুরোভাগে মূলিত করে তখন তাহার পুতিগন্ধ ইহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই কারণ ঐ ছাপাখানার অগ্রগ্রহেই ইহাকে অর-সংস্থান করিতে হয়। এ শ্রেণীর লোকেরা তুলিয়া যায় যে সমালোচকের আসনে স্বার্থপর চাটুকারদের কোন দাবী নাই। সময়ের ফেরে যে হিন্দু ইহাও হিন্দুদের গালি দিয়াছিল তাহার সমস্ত কথাই আমরা জানি এবং আবশ্যক হইলে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, ফালগুন, ১৩০২ ঃ—  
সম্পাদক মহাশয় প্রথমেই গীতাযুত রসাদেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভাল কথা; প্রাপ্তে ভাগবৎ এসদের আলোচনা সমীচীন। রায় প্রগননাগ্রাঘ চৌধুরী বাহাদুর গীতার সার প্রোঙ্গার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। এসদের একজন বিখ্যাত কণ্ঠস্বর ও মনীষিকে কোন উচ্চ পদস্থ কণ্ঠস্বরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “শ্রী, আপনি স্বার্থে হইতে অবসর লইয়া কি করিবেন?” তিনি তৎক্ষণাত উত্তর দিলেন, “গুরু, গীতা, এবং বারাগণী আশ্রয় করিব।” তিনি হিন্দুর অন্তরের আকাজ্জাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকও তাহার ওকালতী কণ্ঠস্বরবনের অবসরে বে গীতা অবলম্বন করিয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়। “সর্বদেখানি পরিভ্রাম্যাম্যেবং শরণং ব্রহ্ম” এই শ্লোক লেখক “সর্বদেখানি” শব্দের যে ব্যাখ্যার সমর্থন করেন তাহা নূতন না হইলেও সাধারণের অপরিস্রব ছিল বটে।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের মিলন-পূর্ণিমায়, “চকোর চকোরীর মিলন-পূর্ণিমা আগিয়া পৌছিয়াছে” দেখিতেছি। কেননা গীতারের নির্মল আশ্রয়দেয় নায়ক-নায়িকার চিত্রাকাজিত মিলন ঘটাইয়া “বাহু বেটন” ও “গভীর চুখনের” “আনন্দ শিখরপের” চটুল-চিত্রটি লেখক নির্মল ভঙ্গীতে আঁকিয়াছেন। নরেশ বাবুর স্ত্রী নায়িকা বিদ্যুৎ রেখা যখন তাহার মস্তার ব্যবহারে দ্বষ্ট হইয়া মাতাকে সযোজন করিয়া বলিতেছেন—.....শোন মা, যখন তুমি আমার স্বামীকে (তখনও বিবাহ হয় নাই; তবে যজ্ঞ-পড়া বিবাহ অনাবশ্যক) এ বাড়ী থেকে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তখনই আমি স্থির করেছি, তোমার ঘরে আর আমি একদিনও বাস করিতে পারি না।.....যাকে তুমি আজ অপমান কর'ছে.....তুমি হাওতায় আমার ঘরের হুদীর তার পা-প্রোঙ্গান্নাভায়ে প্রোঙ্গা পড়ও। তোমার সেই হুদীর—যার কাছে অদমান ও লান্না পেয়েও তোমার আশ মেটেনি,—আবার তার পা চাটুতে গি'ছেছিলে—তাকে জিজ্ঞাসা

করো—সে বলবে যে, তাকে মে তুলিয়েছেছিল সে তোমার নাক, তুমি।” পাঠক, তত্ত্বিত হইবেন না। ইহাই আশ্চর্য্যের আর্ট। ইহাই অভিনব চরিত্র-সৃষ্টি!

“শিক্ষার শিশুর স্থান” অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, টি, লিখিত। শিশু শিক্ষাদান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য যে সমস্ত শিক্ষাদান প্রণালী পরীক্ষাধীন আছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শিক্ষক এবং শিক্ষারূপিত অবলম্বনে বি-টি ছাত্রগণ এই প্রবন্ধ অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাইবেন।

“মহাত্মা গান্ধী” এবং “ব্রহ্ম প্রবাসের চিত্র” এই সচিত্র প্রবন্ধ দুইটি ভারতবর্ষের আয়তন বৃদ্ধিকল্পে সাহায্য করিয়াছে।

“ভারতবর্ষের রাজ্য ব্যবস্থা” কোন গুপ্তনামা লেখক লিখিত গভর্নমেন্টের সাময়িক ব্যয় সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা দেশীয় সংবাদ-পত্র তুলে এবং জাতীয় মহাসভার বক্তৃতা মধ্বে আলোচিত হয়, তাহারই পুনরাবলোচনা। “বিবাদের, বিষয়ে, হর্ষে.....পুনরুক্তি ন দোষায়!”

শ্রীকৃষ্ণ নরীণোপাধ্যায় নামধার লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ “রাজগৃহ” একাধারে ভ্রমণ-কাহিনী ও ইতিহাস। নূতন কথা লেখক কিছু বলেন নাই। “লক্ষণ-সেনের নবাবিকৃত ভ্রমণশাসন” অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিজ্ঞানকুমার মহাশয় লিখিত—২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত ভ্রমণশাসন খানির পরিচয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানকুমার মহাশয় লক্ষণ-সেনের অপর তিন খানি ভ্রমণশাসনের কথা বলিয়াছেন।

এ মাসের “ভারতবর্ষে” প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ আভ্যন্তরীণ সমালোচক “জড়লা” গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। একটা ঘোটকের প্রতি বৃদ্ধ শকট চালকের পূর্ববৎ স্বেহের কলম চিত্রটি লেখক দ্রষ্টব্য দেখা অস্বিকৃত করিলাম। স্বদীর্ঘজ্ঞান ঠাকুরের রচিত “কাশিমের মুগুণী” নামক গল্পের পর এই গল্পটি সমাদর পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নি-পরীক্ষা গল্পটি



মন্দ নয়। প্রভুলের ভাষা পরিবর্তন আলাদিনের আশ্বখ্য।  
প্রদীপের মত বিষয়কর; লেখকের ভাষায় "বর্ণের ভেতর  
আর একটি অসুস্থ বস্তু।"

ময়মনাথ রায় এম-এ লিখিত একাদিকি নাটিকা  
"কাল-রাত্রি" পড়িয়া পাঠক হৃদয় লাভ করিবেন। তাহার  
অঙ্কিত ওদ, শিশু, সতী, স্বন্দর ভাবে চুটিয়াছে। "ওদর"  
চরিত্রটি ও তাহার কথা-বাণী রবি বাবুর "বিস্ময়নের"  
"রথুশিখরে" স্বরণ করাইয়া দেয়।

আলোচ্য সংখ্যায় বিবিধ-প্রসঙ্গ বিভাগে অনেক  
জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষর ভট্টাচার্য্যের আরা-  
কান প্রসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ গদ্যধর সিংহ রায়চিহ্নিত "অতীতের  
স্মৃতি" ঐতিহাসিক কাহিনীতে পূর্ণ। ভক্তার জে, এম,  
যোষ লিখিত "স্বপ্না-রোগ" ও তাহার প্রতীকার প্রবন্ধে  
লেখক স্বপ্না-রোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়  
নির্ণয় করিয়াছেন; এরূপ প্রবন্ধের উপযোগিতায়  
কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অনেকগুলি কবিতা এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে।  
শ্রীকৃষ্ণ যোগেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের "বিক্রমচন্দ্র" কবিতা বর্ণীয়  
বিশ্লেষণালের অঙ্গসমূহে লিখিত। স্থানে স্থানে কবিত্ব  
চুটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ গিরিশশেখর বহু "মায়াজাল" রচিয়াছেন। এ  
জালে ভাব-পার্থী ধরা পড়িয়াছে কি না তাহা কবিই  
জানেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব রচিত "বিক্ষণ-বস্ত্র" হৃদয় কবিতা;  
এইবার কি তাহার বিকলতা ও বার্ষতার পালা শেষ  
হইল! নরেন্দ্র বাবুর এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলি সব  
ভাল না হইলেও তাহার মধ্যে কয়েকটি কাব্যরসে পূর্ণ।  
আমরা সমালোচনা কালে যথা স্থানে সে গুলির উল্লেখ  
করিয়াছি। অতীর্ণীভাবের জন্ত কোন কোন কবিতার  
ভাব ধনীভূত হয় নাই কোন কোনটির অন্তর্নিহিত ভাবের  
আভোপাঙ্গ সঙ্গতি নাই কোনটি বা বদলিত শব্দময়ী  
বৈজ্ঞান্য-মীমাংসা। কিন্তু এক কথা স্বীকার করিতে হইবে  
যে নরেন্দ্র বাবু pen-picture স্বন্দেহে স্বনিপুণ এবং  
শব্দের উপর তাহার অধিকার যুব বৈশী। শ্রীকৃষ্ণ গিরিজা-  
সুন্দর বহুর "কালন্দে" কবিতায় নব বসন্তের প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য অপেক্ষা নখলীলাটাই অধিক প্রকট হইয়াছে।  
কবিশেখর কালিদাসের "মরণের অর্ঘ্য" কবিতাটি কাহার  
উদ্দেশ্যে রচিত বুঝিতে পারিলাম না—কে সেই "জীব-  
জগতের ত্রাতা রক্তজ্ঞানী" স্ববি, সার্কোজীম চক্রবর্তী?  
লোকনাথ মল্ল্য বাহার সংহারে অক্ষম হইয়া তাহার গল-  
দেশে "নহামানবের অস্থি বিরচিত মহাশব্দ" হার কখন  
"ভাগ্যীত পক্ষীর অস্থি নিরমিত রক্তাক্তের হার," কখন  
"আলিঙ্গন-স্বপ্নে গাধা ডুলারী কব্জলের হার কখন বা  
"বাশীর চরণ-পথ বীজে রক্ত হার" উপহার দিতেছেন?  
ভাবের গভীরতা ও কল্পনার নবীনতায় রচিত "কবি" কবিতাটিও  
বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই অনন্ত কাল-প্রবাহের  
চিরপরিবর্তনমূলতার মধ্যে কবি ক্রমশঃ ঘের্ক শেখ-কাল-  
অবস্থায় অপরিস্তীর্ণ, চির-সরল, চির-নবীন, তাহা লেখক  
পরিস্ফুট ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রবাসী, ফালগুন, ১৩০২ ৪—  
বিশ্লেষণার্থ ঠাকুরের প্রতিভার শেষ দান শীঘ্র ধারণ  
করিয়া ফাটনের প্রবাসী বর্ণীয় সাহিত্যিকের স্বতির  
সন্ধান রক্ষা এবং তৎসঙ্গে নিম্নের গৌরব অর্জন  
করিয়াছেন। "বিক্রমচন্দ্র" কবিতার শেষ  
চরণ কয়টি এই :—

কাজ নাই তপতা আমার আনন্দ আমি চাই।  
হেরিলে তোমার আনন্দ রূপ কখন না স্থপ চাই।  
তোমার আনন্দে কি প্রব-তাড়া ভাসাই তখণী  
হৃদিকে পাইলে ভয়ে, তুমি মোর হও দিনমণি।  
নাথ্য করি লব, যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।  
মরণে সে ডরে না কত, রহে যে ধরি চরণ।  
মরণের পূর্ণকণে মনের অবসার কি সরল এবং স্বন্দর  
অভিব্যক্তি!

"ভাগ্যচক্র" শ্রীশ্রীরা দেবী লিখিত একটি গল্পাঙ্কন।  
অস্কার ওয়াইল্ডএর এই হৃদয়বাত মনোহর গল্পটির  
অনুবাদ বা ভাবানুবাদ সাময়িক পরে একাদিকবার  
বাহির হইয়াছে। লেখিকার লেখায় কোথাও আড়ষ্ট-  
তাব অনুবাদের ছাপ নাই। আমরা গল্পটি পড়িয়া শ্রীত

হইয়াছি। "কালের কোণ" আর একটি ছোট গল্প;  
লেখক শ্রীগোপাল হালদার। লেখার মুখ্যমানার আধিক্যে  
আলস বস্তু চাপা পড়িয়াছে।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাত সুমার মুখোপাধ্যায়ের  
"চীনে ভারতীয় সাহিত্য," শ্রীকৃষ্ণ হেমেন্দ্র জাল রায়ের  
"ব্রহ্মশিল্পের হাতিয়ার" এবং শ্রীকৃষ্ণ সত্যেন্দ্র দাসের  
"কাব্যকথা" সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং চীন ভাষায়  
বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের কি স্বরূপ আরম্ভ হইল এবং কোন্ কোন্  
বৌদ্ধধর্ম চীন-ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে প্রভাতবাবু  
তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। লেখকের  
সংগ্রহ ও পাঠ্যস্বরূপ প্রশংসনীয়। "ব্রহ্মশিল্পের" হাতিয়ার  
প্রবন্ধে লেখক মিল বনাম চরকা এই বিষয়াদি লেখক  
চরকার অসুস্থলে যুক্তিপূর্ণ রায় দিয়াছেন। লেখকের  
তথ্যসংগ্রহ স্বত্বাতির যোগ্য। আমরা এই প্রবন্ধটির  
প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

সত্যেন্দ্র দাস মহাশয়ের কাব্যকথা এই সংখ্যায়  
শেষ হইল। কবিত্ব ও কবিত্বের কি তাহা ইংরাজী ও  
বাংলা উভয় কাব্য-সাহিত্য হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত  
করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বহুদিন আমরা এইরূপ  
চিন্তাপ্রসূত সারগ্রন্থ প্রবন্ধ পড়ি নাই।

"পাট চারীদের সমবায়"—শ্রীচাক্রক দাস গুপ্ত রচিত  
প্রবন্ধ। লেখক একটি কাজের কথা কহিয়াছেন।  
গায়ের রক্ত জল করিয়া, যৌগে পুড়িয়া, বর্ষায় ভিজিয়া,  
পড়া জলে ডুবিয়া এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া চারী পাট  
উৎপাদ করিতেছে; কিন্তু তাহার এই পরিশ্রমের ফলে  
ধনী হইতেছে কতকগুলি মধ্যবর্তী ক্রেতা-বিক্রেতা,  
চারীর যে ছুপ সেই ছুপ। এই বৈষম্য দূর করিবার  
জন্ত লেখক একটি সমবায়-প্রণালী উপস্থাপিত করিয়াছেন।  
এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষ হইলে মঙ্গল।

"হস্ত তরঙ্গদার" সচিত্র রস-রচনায় "হুজুরাম"  
রচিত এবং শ্রীরাঘব চিত্রিত। "হুজুরাম" কে?  
ইনি কি "পরশরামের" (মাসতুত) ভাই? লেখকের  
হাস্য-রস স্তম্ভির প্রচেষ্টা,—ভৌতা হুজুর দিয়া তরু কাঠ  
কাটিবার প্রয়াসের মত। ইহা যতঃ উজ্জ্বলিত আনন্দ-  
রসের কোথারা নহে—কতদিন আবরণে আবৃত রস-কণ্ড।  
অদস্তের পক্ষে অলভ্য বা দুর্লভ।

শ্রীশ্রীশ্রী মুখোপাধ্যায় রচিত কৃষক কবিতাটি  
দীর্ঘ হইলেও কোথাও রসহানি ঘটে নাই। লেখকের  
শব্দবোজনা মধুর, উপমা প্রয়োগ হৃদয়, কল্পনা স্বলম্বত।  
"এই চিঠিখানি" শ্রীপ্রবন্ধা দেবীরা লিখিত একটি  
ছোট কবিতা; ছোট হইলেও শোকাঞ্চ বিদুর মত কল্প  
ও কোমল; "নিভুতে" আর একটি ছোট কবিতা।  
লেখক জাহাঙ্গীর বকীল। কবি ছদ্মনামে আত্মগোপন  
করিয়াছেন নাকি! ইহা সত্যাকার কবিতা না বাহ-  
কবিতা? ভাষা দুরীভা, কল্পনা উদ্ভট। ইহা আধুনিক  
কালের কবিতা লেখকগণের প্রতি প্রচেষ্টা বিজ্ঞপ্ত নহে?  
নমুনা স্বরণ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

(তব) নয়ন-পল্লব হ'তে কোন অভিনব  
অজানা বিহু মোর চিত্ত আকাশের  
স্থির নীলিমার মাঝে বলসিল তার  
মিরোজা পাখুর ডানা!

"বিদায়ের ক্ষণে" শ্রীপ্রেমশ্রী চৌধুরী—রচিত কবিতা।  
ধরার নিকট শীতকরুর বিদায়-কাহিনী। বিদায়ের ব্যথা  
কবিতার ভাষায় স্বন্দররূপে চুটিয়াছে—

বন্ধু মোর, বিদায়ের ব্যথা-ভরা আঁখি সন্ধিকণে  
কহিতে প্রাণের কথা ফাটে বুক, রোদন উজ্জল  
হৃদয়। ছুঁঘের সান্নিধ্যের তব বরণে বন্ধু মনে,  
বিশীর্ণ গোলাপ-মলে মিও একবিন্দু আঁখিজল।



সত্যের সন্ধান প্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য এও সন্য; ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্য কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিত্যমাত্র অপরিত্রিত নহেন। ভারতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি মাসিকে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধগুলি অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। যোগেশবাবু পূর্বেবঙ্গের কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাহা কালীন এই পুস্তকখানি লিখিয়া বহুপন্থের বিরোধভাজন হন; কলে তাহার চাকুরী যায়। সংবাদপত্র তন্ত্বে এই ঘটনা লইয়া একটু আলোচন ও হয়য়াছিল। বাহা হউক, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কতকগুলি দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধেই লেখকের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি, বিচারশক্তি ও তর্ক পটুতার পরিচয় পাই। আমরা প্রবন্ধগুলি পাঠে প্রীত হইয়াছি। কবিতা ও উপভাস প্রাতিত মূলে “সত্যের সন্ধানের” স্বাধীন চিন্তা-প্রবৃত্ত পুস্তক আদর পাইবে কিনা জানি না। আত্মিক ও নাত্মিক, নির্বাণ ও জন্মান্তর, বাদ, নিয়তি বা বিবাহ,

বংশ-বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, সত্যীক-আসল ও মেকী হুংখ বাহ সত্যের সন্ধান প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখক যথেষ্ট পাকিতা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের কোন কোন মতের সহিত জন-সাধারণের মতের মিল না থাকিতে পারে, স্থলবিশেষে গ্রন্থকার সত্যের সন্ধান করিতে যাইয়া সংশয় ও অবিবাহের বর্ণিবর্জিত নিশা-হারা হইয়াছেন; ইহা স্বাভাবিক। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ অবধি কত কত মহাশক্তি, মহা মনোহি সত্যের সন্ধানে ফিরিয়াছেন কিন্তু অনেকেরই প্রচেষ্টা “নেতি, নেতি”-তে পর্যাবসিত হইয়াছে। স্বতরাং এই সংশয়-ভাব অপর্যাপ্ত নহে। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাজ্ঞল এবং শক্তিশালী। উক্ত দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া নাড়া চাড়া করিয়াছেন, অথচ লেখকের ভাষার বৈজ্ঞে ভাবপ্রকাশ অক্ষমতা কোথাও লক্ষ্য হয় না। স্বর্গীয় রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদীর “জিজ্ঞাসা” পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর “সত্যের সন্ধানের” মত এই শ্রেণীর দ্বিতীয় পুস্তক পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আশা করি স্বাধীন-সমাজে এই গ্রন্থের আদর হইবে।

## গান

### শ্রীমতী বীণাপাণি রায়

ভৈরবী—একতাল।

কখন রজনী-শেয়ে—

মুহায়া আঁখি

মুখে মুখ রাখি

পশন ক'রেছ অশ্রু

কখন আমার তোমারে ডাকিল

সেই ভাকু তব দ্বন্দ্বদে পশিল

অমনি তোমারে আনিয়া ফেলিল

আমার দুয়ার ঘেসে।

তুমি ফুল পরাইলে যেনে

আমি মালা দিখ গলে হেসে

গেল ভেঙে খুব চমকিয়া চাই

র'য়েছি একেলা—তুমি নাই—নাই!

শূন্য শয্যা দেখিবারে পাই

গেছে আঁখি জলে ভেসে।



## অভিনেতার আকৃতি

### শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম-এ

সেক্সপীয়ারের হৃদয়ের ইচ্ছা “সাইলসের” ভূমিকায় ইলেক্টর বিখ্যাত অভিনেতা কনের অভিনয় দেখিয়া রস-গ্রাহী দর্শক লিখিয়াছিলেন:—

This is the Jew

That shakespeare drew!

অর্থাৎ সেক্সপীয়ারের অঙ্কিত ইচ্ছা এই ত ঠিক বটে! পুস্তক পাঠ করিয়া মনে ইহদীর কাল্পনিক মূর্তি যাহা জাগিয়া উঠে, তাহাই প্রাণ লইয়া হুবহু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হাবভাব ভঙ্গী, আকৃতি, কিছুতেই কাল্পনিক ও বাস্তবের প্রভেদ নাই। যে অভিনেতা এইরূপে দর্শকের চক্ষুর সমক্ষে অবিকল চরিত্রটি সজীব করিয়া পরিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে কয়টি নাটকে সজীব চরিত্র সযত্নে একরূপ উক্তি ধাটে? অথবা “চিরকুমার সত্য”র “চন্দ্রবাবু” এইরূপ একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে দর্শকের পূর্ণ কর্তব্য চিত্র মূর্তিমান হইয়া, সজীব হইয়া, সৃষ্টিগোচ্রে। একরূপ একটি চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইলে ‘make-up’ অর্থাৎ কৃত্রিম চুল, দাড়ি, রং ইত্যাদি ত চাই-ই, কিন্তু তাহার মূলে অভিনেতার স্বীয় চরিত্রের অবয়ব। আকৃতি যদি অভিনীত ভূমিকার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে অভিনয় সাক্ষ্য মণ্ডিত হইবে না। “অভিনয়” বলিতে হাব ভাব উক্তি ইত্যাদি যাহা বুদ্ধায়, তাহা ব্যতীত অভিনেতার স্বীয় আকৃতির উপরেও যে অভিনয় সাক্ষ্য নির্ভর করে, ইহাই উপগতি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অভিনীত নাটকে যে সকল চরিত্র থাকে, তাহার অধিকাংশের সযত্নে দর্শকের মনে পূর্বে কোন ধারণা থাকে না, অভিনেতা তাহাকে যেরূপ মূর্তিতেই দেখান, দর্শক তাহাই মানিয়া লয়। ধরুন, “মহাভারত বেগম” নাটকে নবাব হুজাউদ্দৌলার ভূমিকায় একজন দীর্ঘকায় অভিনেতা উপযোগী make-up ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, হয় ত বাস্তবিক নবাব হুজাউদ্দৌলার ধরুণায় ব্যক্তি ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সে কথা দর্শকের মনে উদয় হইতেই পারে না। “বিষমঙ্গল নাটক”র প্রথমেই দেখা যায় বিষমঙ্গল ভিক্টরকে চিত্রাঙ্গির বাটাতে যাইতে বলিতেছে; “—এখানে যাও।”

ভিক্ষু—আজ্ঞে কোন বাড়ী?

বিষ—ওই—ওই বাড়ী। দেখতে এমন কি?

চিন্মুড় ছুঁড়িপানা; তবে আমার নজরে পড়েছিল তাই।

আমি একবার উক্ত নাটক অভিনীত হইতে দেখি, তখন যে অভিনেতা চিত্রাঙ্গির ভূমিকা অভিনয় করিয়া ছিলেন তাহাকে কোন জন্মেই “চিন্মুড় ছুঁড়িপানা” বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। স্বতরাং বাধা হইয়াই এই স্থলে বিষমঙ্গলের উক্তি পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইয়াছিল “দেখতে এমন কি। ধুমুসী মোটাপানা” ইত্যাদি। কিন্তু ইহাতে নাট্যরীতি সৌন্দর্যের কোন ক্ষতি হয় নাই।





কিন্তু যে সকল নাটক লোকপ্রিয় উপভাস্যবানী হইতে নাট্যাকাবের পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হয়, সে ক্ষেত্রে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে পুস্তকগুলি প্রায় সকলেই পাঠ করিয়াছেন। দর্শকের মনে চরিত্রগুলি সম্বন্ধে একটি পূর্বকল্পিত ধারণা থাকে, কারণ উক্ত পুস্তকবর্ণিত চরিত্রের প্রকৃতি ভিন্ন আকৃতিরও যথেষ্ট বর্ণনা বা নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সকল নাটকের চরিত্র অভিনয় করিতে হইলে অভিনেতা দ্বীয় কল্পনাসম্পন্ন ইচ্ছাছরুপ বিস্তার করিতে পারেন না, পুস্তকে বর্ণিত নিদর্শনের সীমা অতিক্রম করিলে, অথবা তাঁহার আকৃতি উক্ত বর্ণনার বিরোধী নহিলে, তাহা দর্শকের চক্ষে অস্বীকৃতকর হয় এবং অভিনয় সাফল্যের বিরোধী হয়। হুই একটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। চন্দ্রশেখর নাটকের “প্রতাপ” বন্ধিন বাবুর অঙ্কিত “প্রতাপ”—গাভীর্য্যপূর্ণ, বলিষ্ঠ ও তেজস্বী পুরুষ। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে মিনার্ভা থিয়েটারে যে অভিনেতা দ্বারা উক্ত চরিত্র অভিনীত হইতে দেখিয়াছি, এবং অধুনা ঠাট্টে যিনি উক্ত চরিত্র অভিনয় করেন, তাঁহাদের কাহারও আকৃতির সহিত দর্শকের পূর্বকল্পিত সেই বন্ধিনের প্রতাপের মিল নাই, সে জন্ম তাহা দর্শকের মনে আঘাত করে। বাঙালী দর্শকের মনে যে প্রতাপের চিত্র আছে তাহার উপযোগী অভিনেতার আকৃতি বরং সেকালে ঠাট্টে অসম্বন্ধালী হুয়ার বা অমরেন্দ্র-নাথ মল্লের ছিল, বাহারা তাঁহাদের এই ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। ইংলণ্ডে অভিনেতা সম্প্রদায়ে একটা কথা চলিত আছে যে, যেমন সকল অভিনেতারই আকাঙ্ক্ষার চরম “হায়-লেট” অভিনয় করা, তেমনি সকল অভিনেতাইই আকাঙ্ক্ষা “জুলিয়েট” অভিনয় করা। কিন্তু তবী কিশোরী জুলিয়েট অভিনয় উপযোগী আকৃতি পরিণত বয়স্ক অভিনেত্রীরা থাকে না বলিয়া তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই দুঃখান্বিত পরিত্যক্ত হয়। চন্দ্রশেখর নাটকের “রলনী” তুবনমোহিনী সুন্দরী, কিন্তু উক্ত নাটকে দলনী দ্বারা গের যে সৌন্দর্য

যোজনা করা হইয়াছে (বিশেষতঃ “আজু কাঁহা মেরি হুয় কি রাজা”) সেই গান গাহিবার মত স্বকল্পী অভিনেত্রী ভিন্ন অপর কাহাকেও উক্ত ভূমিকা দেওয়া হয় না, ইহাতে দর্শকের কণ্ঠ তুলিলাত করে বটে কিন্তু চক্ষু অত্যন্ত লীড়িত হয়, কারণ যে সকল অভিনেত্রী দ্বারা নানাদেশজাত উক্ত ভূমিকা অভিনীত হইতে দেখা গিয়াছে বা যা, তাঁহাদের কাহারও আকৃতি আদৌ দলনীর উপযোগী নহে। “চন্দ্রশেখর” নাটকে চাণক্যের আকৃতির বর্ণনা হইতে যতটুকু কল্পনা করা যায়—তাঁহার মুষ্টি শীর্ণ, অনাহার-ক্রান্ত ছিল। কিন্তু বঙ্গরঙ্গমধ্যে যে হুইজন অভিনেতা এই ভূমিকার বিশেষ প্রচেষ্টা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের একজনেরও আকৃতি অনাহার-ক্রান্ত বা শীর্ণ নহে। এই যে অসামঞ্জস্য, স্বাঘাটিকা হইলেই সে দলনী ভূমিকার উপযোগী হইবে ইত্যাদি, ইহাই বঙ্গ-রঙ্গমধ্যে দুর্ভাগ্য। ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা সার হেনরি আর্ভিং একবার কোন নাটকে “নেপোলিয়ান” ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘাকার “পাংলা” গঠনের ছিল, এবং ইহা সকলেই জানেন যে নেপোলিয়ান বর্ষাকার ও স্থলাকৃতি ছিলেন। এতদ্বলে make-up-এর সাহায্যে, পোষাকে “প্যাভি” দিয়া শীর্ণ আকৃতিতে স্থল দেধান বিশেষ কঠিন নহে, একটু “কুঁকো” ভাবে, স্বচ্ছের উপর বাড়ী নীচু করিয়া চলা-কোঁরা করিলে বর্ষভার আরো বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তথাপিও অত্যন্ত অসামঞ্জস্য থাকে। আর্ভিং অনেক চিন্তা করিয়া শেষে এই বাধা জয় করিলেন, স্বকপোল কল্পিত বিশেষ ভাবে অঙ্কিত মুগ্ধপটের দ্বারা। যে সকল দৃষ্ট নেপোলিয়ান-রূপে তাঁহার আবির্ভাব হইল, সে দৃষ্টগলিতে জানালা, দরজা, খাম প্রভৃতি সমস্তই বুঝ বেশী দূর ও উচ্চ করিয়া অঙ্কিত থাকতে, তুলনায় দীর্ঘাকার আর্ভিংকেও বর্ষ দেখাইতে লাগিল, তাঁহার দৈর্ঘ্য আর দর্শকের চোখে ঠেকিল না। কবে আমাদের দেশে এইরূপ সর্ববিধক সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিনয় দেখিব!

বিত্তীয় বর্ষ]

১৩ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩২, ইং ২৭শে মার্চ ১৯২৬

[ ৩২শ সংখ্যা ]

## বাসন্তী গান

শ্রীহেমেন্দ্রসুন্দরায় রায়

১

বাসন্তিকার বীণায় আমি কিংস্তকেরি মঞ্জরী,—  
অকালেতে ডুড়িয়ে পরায়, গম্ভ-মায়া সফরি!

আজ এসেছি মন ছলিতে,  
রঙ্গ-রূপের অঙ্গলিতে;  
অঙ্গ-লীলায় চঞ্চলিয়া নয়ন-কান্দে প্রাণ ধরি!

২

মিলনের লগ্ন যে আজ, মগ্ন পড়ে মগ্ন-হাওয়া,  
বধনী সব ভুলে আজ কেবল প্রেমের গাওনা গাওয়া।  
জগন্মের তক্তা-রবে,  
ছুটি প্রাণ একটি হবে,  
চোখে চোখ মিলিয়ে দিলেই, হাত বাড়িয়ে চানকে পাওয়া!

৩

মকরকেতু ডুড়িয়ে দেব ফাগুন-হাওয়াতে,  
মিঠি চাঁদের সাধ-জাগানো চোখের চাক্ষুযতে!  
অশোক, শিমুল, ও মাধবী!  
আমের মূল্য, লাল করবী!  
নাচের লীলায় সবাই জাগো বাঁশীর গাওয়াতে!

৪—হোরী

বৃন্দাবনের বনে বনে  
আবীর ঢালো, আবীর ঢালো!  
লাল ওলালে শ্রাম-ছালালে  
হইবে না আর বরণ কালো!  
রাজা-ঠোঁটের রাঙিমাতে,  
রং গুলে নে' আপন হাতে,  
ভাগ্য আখির দোললীলাতে  
ফাগুন-আগুন আজকে আলো!  
—আবীর ঢালো, আবীর ঢালো!

৫—হোরী

আঁচল ভরে রং এনেচি, এনেচি রং ভালিমূল্যি!  
হুম্‌হুমেতে থুম ভুলে শই, হিম্মোলে আয় মোছল ছুলি!  
নিম্ন-বনের মধুর লীলায় আয় ছুটে আয় রংদিয়াসী,  
পিচ্‌করাঈ ঐ জামের হাতে, তাই বাজেনা বাঁশের বাঁশী,—  
লাজের মানা মানুবনাকো, আজ মিলনের কোলাহুলি!  
—এনেচি রং ভালিমূল্যি!



## মধুসূদনের প্রহসন

কবিশ্বশর—শ্রীমদেবজ্ঞাননাথ সোম কবিভূষণ

মহাকাব্য মধুসূদন যেমন বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য-সাহিত্যে, নাট্য-সাহিত্যে ও চতুর্দশ-শতাব্দীর কবিতায় যুগ-প্রবর্তক ছিলেন, তেমনি প্রহসন-সাহিত্যেও তাহাকে যুগ-প্রবর্তক বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে মধুসূদনের প্রহসন রচনা করিবার পূর্বে আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়যোগ্য যেমন উৎকৃষ্ট ক্রীতিপ্রব প্রহসন ছিল না। প্রকৃত প্রভাবে যে গ্রন্থকে প্রকৃত প্রহসন বলা যায় তাহাতে পায় তেমন কোন গ্রন্থের বিষয় আমরা অবগত নহি। মধুসূদনের জীবনীকার লিখিয়াছেন “তাঁহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায়” “নব-বাবু-বিলাস,” “নব-বিবি-বিলাস,” “আলালের ঘরের দুলাল,” এবং “কুলীন-কুল-সর্গর্ষ” প্রভৃতি ছুই চারি খানি ব্যঙ্গাঙ্গক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাঞ্জীতে যাহাকে Farce বলে, অভিনয়যোগ্য সেইরূপ কোন নাটক তখন শ্রীতি হয় নাই!” কবিরবের জীবনীকার যে চারিখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি ব্যঙ্গাঙ্গক হইলেও প্রহসনের কোন লক্ষণ তৎসমুদয়ে বর্তমান ছিল না। বট-তলায়, তখনকার দিনে, মধ্যে মধ্যে কৌতুকাবহ হুজ হুজ ব্যঙ্গসঙ্গীত নাটিকা সেকালের কাগজে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইত বটে কিন্তু তন্মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য নহে। যাহার বেশ পালায় শেষে যে কৌতুকভাবের হইত তাহাকে লোকে প্রহসন না বলিয়া ‘সং’ আখ্যায় অভিহিত করিত। কাজেই সকল দিকে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বঙ্গসাহিত্যের অত্যাুক্ত বিভাগের ভ্রাতা প্রহসন বিভাগেও মধুসূদনই প্রথম প্রবর্তক, এবং রচয়িতা।

একদা তাঁহার রচিত প্রহসনখয়ের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা এই প্রবন্ধে বলিব। বেলাগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য বহন মধুসূদনের শিখি নাটকের আখ্যে

জন ও মহলা চলিতেছিল, তখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ নাটকের সঙ্গে সঙ্গে প্রহসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, অধীর হইয়া মধুসূদনকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, “I am thinking of some domestic farce to follow immediately after the first representation of the ‘Sharmistha’ and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.

Please let me know the day and hour that you intend to call.”

উপরোক্ত পত্রাংশ পাঠে অস্মিত হয় যে, প্রহসনের নিমিত্ত কিরূপ আগ্রহের সহিত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদনকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং শিখি নাটকের অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই একখানি প্রহসন অভিনয়ের নিমিত্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথার বাসনাই মধুসূদনকে প্রহসন রচনায় প্রথম প্ররোচিত করে। এবং সেই বেতুই আমরা মধুসূদনকে কবি-নাম গ্রহণের পূর্বে বঙ্গভাষায় প্রহসনকার-রূপে দেখিতে পাই।

শিখি নাটকের রচনা শেষ করিয়া মধুসূদন প্রহসন রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। প্রথমে তিনি ‘একই কি বলে সভ্যতা’ নামক প্রহসনখানি রচনাকল্পে মনোযোগী হন। এই প্রহসনখানি পরম উপাদেয়। এই গ্রন্থে তৎকালিক শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়—বাংলাদিগকে সে সময়ে লোকে ইংরেজবল বলিত—ইংরাঞ্জী শিক্ষার প্রভাবে শুল্কীয় হিন্দু-আচার-ব্যবহার, জীবন-বাগন-প্রণালী একেবারে বিসর্জন দিয়া, বৈদেশিক সভ্যতার নামে নিজেরের যত্নের বিবর্তিত, উচ্ছ্বাস, পাশোপাশ্রিত, নিষিদ্ধ বাস ও

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা]

মধুসূদনের প্রহসন

১০৬৭

যাত্রাভঙ্গী করিয়া ফেলিতেন তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। একেই কি বলে ‘সভ্যতা’ গ্রন্থের নামক নবস্বাভার কলিকাতার এক প্রাচীনতন্ত্রাবস্থায় ধনী বৈষ্ণবের সন্তান ছিল। তাঁহার পিতৃদেব সর্দারাই হরিনাম জপ করিতেন। অর্থাৎ সেকালের গোড়া বৈষ্ণবের কণ-কণাংগ যাহা কিছু ছিল, নবস্বাভার বাবুর শিতা ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত তাহার প্রত্যেকটির অমুঠান করিতেন। বঙ্গবাসের অধিকাংশ সময় তিনি বৈষ্ণবদিগের মহোষ্ঠী শ্রীমদ্বাচন নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার ইংরাঞ্জী শিক্ষিত পুত্র নবস্বাভার পিতার অমুপস্থিতির সম্পূর্ণ হযোগ ও হুবিধা গ্রহণ করিয়া উদ্যোগবানী হইয়াছিল। সে কলিকাতার শিক্ষারপাড়া স্ট্রীটে ‘জান-তরিনী’ নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিল। সেখানে প্রতি শনিবার সভার পরে নবস্বাভার এবং তাঁহার সহধর্মী সম্মিলিত হইয়া কুসংস্কার বর্জন, শ্রী-বাহিনীতা, idolatry, Social Reformation, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানা নব্যোদয়িক বিষয়ে বক্তৃতা পরিসমাপ্তি করিয়া পরিশেষে মণ্ডপান, বারবিলাসিনীর নৃত্যগীত শ্রবণ, উইলসনের হোটেল হইতে আনিত পাখানি ভোজন এবং বরফনিষিত সোভা সেমেন্ড পানে পরিচরিত হইয়া যে যাহার গৃহে প্রত্যাগত হইত। এই নু-আচরণের ফল তাহাদের স্বপ্নবিহারবর্ণকেও ভোগ করিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা একেই কি বলে সভ্যতা হইতে শেষ অঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিলাম। এই দৃষ্টে জান-তরিনী সভাভঙ্গের পর নবস্বাভার প্রমত্ত অবস্থায় বাটী প্রত্যাগত হইয়া ভদ্রীর কপোলে বিলাতী সভ্যতার অহু-করণে চূষন, পতীর সহিত বারবণিতার ভ্রাতা ব্যবহার, এবং অজ্ঞাত পুত্রমহিলাদিগের সহিত নানা ইতর ব্যবহার করিতেছেন, এমন সময়ে বাটার গৃহিণী অর্থাৎ নবস্বাভারের জননী (সেকালের জীলোক) নবস্বাভারের সন্তের মত অবস্থায় দেখিয়া ভীত হইয়া, নবস্বাভারকে কেহ বিধ বাগাওয়াইয়া উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছে এরূপ ভাবিয়া ক্রমাৎ প্রহসনময়ীরা গর্ভাঙ্কে ভাঙিয়া পাঠাইলেন। কণ্ডা প্রসঙ্গের সহিত ‘আমি’ পুত্রের অবস্থা দেখিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাই নিম্নে প্রস্তত হইতেছে:—

(প্রহসনময়ীর সহিত কণ্ডার প্রবেশ)

কণ্ডা। এক কি?  
গৃহিণী। এই দেখ, আমার নবস্বাভার কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা! আমার কি হয়ে?  
কণ্ডা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্শনাশ! রাগেলুম! হা ছরচারা! হা নরানাম! হা কুলদ্বার! গৃহিণী। (সরোষে) এক কি? বুড়া হলে লোক পাগল হয় না কি? বাও, ভূমি আমার সোপার নবোকে এমন করে বক্তা কেন?  
কণ্ডা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ, ওকে স্বধন প্রসব করেছিলে, মূগ খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি?  
নব। হিয়ার—হিয়ার—হুয়ে!  
গৃহিণী। ও মা, আমার কি হলো! এমন এলো-লেনো বক্কে কেন? ও মা ছেলোটিকে তো ভুতে টুতে পায় নি?  
কণ্ডা। (সরোষে) তোমার! কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?  
ভূমি খেতে পাচ্চ না যে, ও লক্ষীছাড়া! মাতাল হয়েছে?  
নব। হিয়ার—হিয়ার!  
কণ্ডা। (সরোষে) চূপ, বেহায়া! তোর কি কিছু মাজ লজ্জা নেই?  
নব। ভামু লজ্জা, মদ ল্যাও?  
কণ্ডা। শুভে তো?  
গৃহিণী। ও মা, আমার এ দুপের বাজাকে কে এমন শেখালে কণ্ডা?  
কণ্ডা। আর শেখাবে কে? এ কলকাতা মদ পাগল নগর, কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?  
গৃহিণী। ও মা, তাইতো, এত কে জানে মা?  
কণ্ডা। ক্রমাৎ তাইই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমদ্বাচনে যাচ্চা করবো। এ লক্ষীছাড়া! আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বামনটা একটু ঘুমুক!  
নব। হিয়ার! আই সেকেন্ড দি রেজোলুশন!  
কণ্ডা। হায়! আমার বংশেও এমন কুলদ্বার জন্মেছিল!



‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনখানি আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে, কেবল মাত্র দু’এক স্থলের উদ্ধৃতিমাত্র পাঠ করিয়া ইহার সম্যক সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।

সে কালের হিউয়েনত্সাং-দিগের মধ্যে কাহার কাহারও চরিত্র উপরিউক্ত বর্ণনাই অপর ছিল। মধুসূদনের বঙ্গ ভাস্কর্য্য রম্যেজ্জ্বলাল মিত্র এবং প্রহসনের সমালোচনা প্রবন্ধ তাঁহার সমাপ্তি বিবরণ সমগ্রদে লিখিয়াছিলেন “ইংরাজের অকথিত—নব্য বাবুদিগের দোষোন্মাদনই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং তাহা যে অবিকল, হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদাহারই আমাদের জ্ঞানিত কোন না কোন নব্য বাবুর দ্বারা আচরিত হইয়াছে।”

এই প্রহসনের সমস্ত চরিত্রই অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। মধুসূদনের চরিত্রকার ইহার চরিত্র-চিত্রকর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন “বাস্তবিকই ইহার প্রত্যেক চরিত্র ও প্রত্যেক ঘটনাই যেন স্থপরিচিত ও দৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। ইহার হোটেলের বাত্বাহক মুটিয়া হইতে আদর্শ ইংরাজ নবযুগের পর্য্যাপ্ত অনেকই যেন মুর্ত্তমান, এবং ক্রিষ্টাঙ্গী। নবযুগের মধ্যশীলতা পত্নী, মেষপ্রহর-সুন্দরী মাতা এবং বধূক্‌ নিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা প্রত্যেকেরই চিত্র অতি সুন্দর ও বাস্তবিক হইয়াছে। ইহার অন্তঃপুরবিশেষের তালিকা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন গ্রন্থকার, গোপনে বসিয়া, ক্রীড়াশীলা মহিলাগণের কথা-বার্ত্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহা গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। বক্সীর অনেক সমালোচকের মতে “একেই কি বলে সভ্যতা” বঙ্গভাষার সর্বোচ্চ প্রহসন, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা এই শ্রেণীর প্রহসনের আদর্শ থাকিবে। বগীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহারই আদর্শে তাঁহার ‘সববার একাধিক’ রচনা করিয়াছিলেন। মজাপানের অপকরিতা প্রহসনের অজ এ পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক বা প্রহসন রচিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই, প্রতিপাত্ত বিষয় সম্বন্ধে, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ হইতে পুরাণিক উপকরণ লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ সমাজ-

চিরকালের নিকট ইহা এক রহস্য-ভাণ্ডার উন্মোচিত করিতে। সাহিত্য-ওষধ বন্ধিসম্রাজ ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ পাঠে পুলকিত হইয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্র মজ্ঞকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। তবে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার একটি কথা এস্থলে প্রকটিত হইল

‘This little work, therefore, independently of its being in itself one of the two best farces in the language, gains additional importance from the large number of other books written after its model.’

একেই কি বলে সভ্যতা সম্বন্ধে আর অধিক কথা নিম্নয়োজন। এক্ষণে আমরা মধুসূদনের অপর প্রহসন ‘বড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

‘বড়ো’ শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ মধুসূদনের অসমত প্রহসন। আমরা ভূনিয়াছি ইহার আখ্যান বঙ্গ ভাষারই বৃহদশীল কোন আত্মীয়ের চরিত্র অবলম্বনে গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম দৃষ্টের ঘটনাগুলি ‘পুষ্করীণী টাটে বাগামতলা’ তাঁহারই স্বদেশ-ভ্রমণের নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং উক্ত পুষ্করীণী এবং বাগাম বৃক্ষ অত্যাশি বিখ্যমান আছে।

‘বড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ সে কালের একজন ভণ্ড-বৈষ্ণব, লম্পট বৃদ্ধ ভূ-স্বামীর চরিত্র অবলম্বনে বিবর্তিত হইয়াছে। এই ভূ-স্বামীর নাম ভক্তপ্রসাদবাবু। আমরা ভূনিয়াছি, সেকালের বহিষ্ঠ জমিদার শ্রেণীর মধ্যে অনেকে তাদৃশ নীতি-পরায়ণ ছিলেন না। বাহিরে হিন্দুধর্ম্মীয়-মোহিত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ইহারা বিশেষরূপে বজায় রাখিয়া সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পণ্যনীয় হইতেন। সামাজিক অহুতাশেও ইহাদের পসার প্রতিপত্তি বড় অল্প ছিল না; কিন্তু ইহাদের নৈতিক দুর্বলতা এতদূর প্রবল ছিল যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়ে ইহারা একবারে ধর্ম্মাধিক বিশ্বজ্ঞিত ছিলেন। লাম্পট্যে অভিভূত হইলে যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মের স্মৃতি ইহাদের চিত্ত হইতে একেবারে মুছিয়া যাইত। তখন তাঁহাদিগকে

ইতর পক্ষ অপেক্ষা হীন শ্রেণীর জীবদিগের সহিত তুলনা করিলেও প্রত্যাবার ঘটত না। বৃদ্ধ-শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনের নামক ভক্তপ্রসাদ উপরিউক্ত শ্রেণীর অস্বভূক্ত একটি জীব ছিলেন। ভক্তবিটেল হইয়া, নিরন্তর হরিনামের মালা জপ করিয়া এবং মুখে ‘হরি হে তুমারি ইচ্ছা, বলিয়া লাম্পট্য আচরণ করিতে করিতে বান্ধ্যকৃত উপনীত হইলেও তিনি চিরাচরিত ছুই, দুইটিপূর্ণ, যুগিতি, কদম্ব শব্দাবের সংশোধন করিতে পারেন নাই। বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্ব্বলিত সমধিক বৃদ্ধিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার হানিক-পাক্সী নামক কোন দরিদ্র মূল্যমান প্রকার দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী পক্ষের রূপের কথা অবগত হইয়া তাহার সর্পনাশ-সাধনে কৃতশঙ্কর হইলেন। কিন্তু ঐ মূল্যমান রমণীর শব্দাব ভাল ছিল। সে থাকিলে ঐ কথা বলিয়া দিলে তাহার স্বামী হানিক, পক্ষমান বাচপ্পতি নামক কোন ব্রাহ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সাহায্যে ভক্তপ্রসাদকে ছদ্মবেশে বিষম মূর্খ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পাপ সঙ্করের চিরাবাসন করিল। ভক্তপ্রসাদ বাচপ্পতির ব্রহ্ম-ভূমি হরণ করিয়াছিলেন আক্ষেপ সোমসী স্বরূপ তাহা কিরাইয়া দিলেন। হানিককে দুইশত টাকা দিয়া নিজে পাপ-অভিলাষের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এবং তৎপরি তাহার যুগ-চরিত্র সংশোধিত হইয়া গেল।

আমরা বড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁর শেষ অঙ্কের শেষের একটি পঙ্কি এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

“বাচপ্পতি। (অগ্রসর হইয়া) কর্ত্তা বাবু, আপনি হানিককে দুটিশত টাকা দিন, তা হ’লেই সব গোল মিটে যাক।

ভক্তপ্রসাদ। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে খনে গ্রামে গেলাম। বাচপ্পাৎ দাদা, কিছু কম জন্ম কি হয় না?

বাচপ্পতি। আজ্ঞা না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্তপ্রসাদ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখেলেম যে এ কদম্ব দক্ষিণাত্য এই রূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই,

তোমাদের হতে আমি আজ বিলম্ব উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করুবা। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিকারও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্দ্দতি যেন আমার কখন না ঘটে।

বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্মযোযা। পুণ্য পান্ডার জন্ম শূভ, ভগ্নামিত চারটি গোরা। শিকা হিলে কিলের চোটে, হাড় গুড়িয়ে খোয়ের মোহা। যেমন কর্ত্তা কল্পলো বর্ধ, “বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।”

ইহাই হইল এই প্রহসনের প্রাপ্তপাণ্ড বিষয়। ইহার মধ্যে আরও কয়েকটি চরিত্র অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রাম্য রমণী, গ্রাম্য মুসলমান, গ্রাম্য যুবতী প্রভৃতির ভাষার স্বচ্ছন্দগণিত দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি বাস্তবিকই বঙ্গভাষার অপরূপ সৌন্দর্য। গ্রন্থ দুইখানি এতদূর মনোহর ও চিত্তাকর্ষক যে পাঠ করিতে বসিলে কিছুতেই শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যায় না। চন্দ্রের কলকের ভাষা তাঁহার প্রহসনে কিছু অনীলতা দোষ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মটপ ও লম্পটের চরিত্রাঙ্কনে তাহা না থাকিয়া বাইত যেন না। যুগোপের প্রশিক্ষিত প্রহসনও অনীলতা বর্ত্তমান আছে। রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থ গোড়া ব্রাহ্ম লিখিয়াছেন “প্রহসন মধ্যে যাইলেক মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ সর্ব-শ্রেষ্ঠ।” অপর একজন স্থখিতাত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মাচার্য্য ও প্রচারক তাঁহার ‘ধর্ম্ম-ক্লিষ্টাঙ্গা’ নামক বিপুল গ্রন্থে—পূর্ণ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থে মহাকবি মধুসূদনের প্রহসন হইতে ধর্ম্মের ভাণের একটি সুন্দর বাস্তব-চিত্র উপাধরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালার বহু মনীষি ও পণ্ডিতবর্গ এই প্রহসনদ্বয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসায় নিম্নেরের জ্বয়ের কবচী সুলীয়া দিয়াছেন। সময়ের পরিবর্ত্তন এবং কালের ভিত্তিতত্ত্ব ইহাদের অভিন্ন অপ্রলয়িত হইলেও আমরা বিপুল সাহসের সহিত বলিতে পারি যে মধুসূদনের প্রহসন, চিরদিন বাঙ্গালার সর্ব-প্রহসনের অগ্রদূত, অগ্রগণ্য সর্ব-শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিবে। \*

\* সাহিত্য-পরিষদের মধুসূদনের বিখ্যাত বার্ষিক দৃষ্টি-সমার্য পঠিত।





## তান্দ্রা-চালক

ত্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল,

১  
মহাসময়ের পর যত প্রকার অপরাধ পরার্থের সৃষ্টি হইছে তাহাদের মধ্যে শতাব্দী দীর্ঘ তান্দ্রা আর কলিকাতার বিদ্যুৎ। দীর্ঘ তান্দ্রা ত দীর্ঘ লাভের মত—শতাব্দী ইহার ব্যবহারেও যেমন অব্যবহারেও তেমন। আমাদের বাস্তব সময় পশ্চিমে যেগিনী ছিল। তাই কপাল গুণে যে তাড়াতাড়ি কপাল গোপাল জুটিয়াছিল তাহাতে প্রায় অতি হইয়া উঠিয়াছিল। একে তো কলিকাতা হইতে ভ্রমণের যে শাখাটিকে লইয়া গিয়াছিল। সেটি আশু পাগল—তর্ক চূড়ামণি।

তান্দ্রাচালক লোকটা বাস্তবিক অসাধারণ। সে যে বাস্তব জ্ঞানিত সে কথা আমি প্রথম দিকেই বুঝিয়া-ছিলাম। সামান্য তান্দ্রাচালক বটে কিন্তু সে যখন আমাদিগকে দীর্ঘ ঐতিহাসিক কবর ও টিপিচাপাগুলির প্রত্যক্ষ বুঝাইত—তাহার উদ্ভূত সত্যকল্পে না বুঝিলেও আমরা উপলব্ধি করিতাম, যে সে গাড়োল-কুলে জন্মায় নাই। কালের কুটিল গতিতে তাহাকে এই অসুখ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাহার সহিত তাহার অয়ের একটা মধুর স্পর্শ ছিল। তার পক্ষে সে ঘোড়া খুব উচ্চ বংশীয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ক্ষিপ্ৰপ্রাণী। চালকের ও এই উচ্চবংশীয় পরম্পরের বোধগম্য একটা ভাষাও ছিল।

আমি ওকলার বাঘের ধারে অর্ধশায়িত অবস্থায় সিগারেটের ধূমে শ্বশ্বে চক্ৰ রচনা করিতে করিতে হেমেন্দ্রকে বলিলাম “হুমুনকে যে কাঠের খুঁটিগুলি দিয়ে বেঁধেছে সে গুলা কম জোর।”

হেমেন্দ্র তর্ক জুড়িল। জলের চাপ, কাঠের প্রতি-রোধিনী শক্তি প্রভৃতি নানা কথা সহিত গণিত শাস্ত্রের উদ্ভূত জগৎ-শিচুড়ি রচনা করিয়া সে সেই রম্য বাস্তবিক পোলিমিথী করিয়া তুলিল। বাঘের নীচে যমুনার বাঁধন কাঠের উপর দিয়া জল উছলিয়া যমুনার বাদে পড়িতেছিল। সেই খরছলে অবস্থা শকরী বদ্বন্দ্ব করিতেছিল—পরন্তু রৌদ্রের আলোক জলের ভিতর দিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র মেহকে বড় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আমার দৃষ্টি ছিল সেই দিকে, কণ্ঠ ছিল হেমেন্দ্রের আলো-চনার প্রতি। হঠাৎ একবার পিছনে চাহিয়া দেখিলাম তান্দ্রাচালক জ-জুকন করিয়া হেমেন্দ্রের শ্রীমুখ নিঃশব্দ বাক্য স্বা পান করিতেছে।

আমি বলিলাম—বাবা তান্দ্রাওয়ালা কেন আর বাঘেরের সঙ্গে ছলনা কর? সাফ বলে ফেলতো বাবা তুমি বাস্তবী কি না।

সে একটু লমতম রাইখা বলিল—কেয়া ফরমাতো হৈ? আমি বলিলাম—কেন বাবা কাঠগোড়ার দেশে সেইখা

মেইখা করছ? ছুটা বাস্তবী বাত বল শুনে তাপিত প্রাণ ষীতল হ'ক।

লোকটা নীরব হইল। আমি বলিলাম—হয়েছে বাবা নারখি। তোমার কপালের কি'কে কি'কে লেখা রয়েছে তুমি বাস্তবী।

সে এবার একটু মুহূ হাসিয়া বলিল—তাই যদি হয়? আমি বলিলাম—ভালই হয়। তবে কেন বাবা ভিনটে দিন উদ্ভূত মাটি করলে।

লোকটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। একটা মন বড় পুরাণো বিষয়ের ছাপ তাহার মুখের উপর পড়িল। লোকটা সুখুসু—বিস্তৃত ললাট, বাঁশরী নাসা, ভাবে-ভরা চক্ষু। তাহার রৌদ্রবদ্ব কক্ষবর্ণ মুখে অভিজাত্যের লক্ষণ দেহীপ্যমান।

হেমেন্দ্র বলিল—মহাশয়ের জাতীয়তা গোপন করার মূলে একটা তুঘল রহস্ত লুকানো আছে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ। আর এই ব্যবসারটা নীচে। হেমেন্দ্র তাকিল। সে তো ছাড়িবার পাজ নয়। সে বলিল—আজ-গোপনের পক্ষে গাড়োয়ানের ব্যবসায় ভাল। বিশেষ তান্দ্রার গাড়োয়ান। নানা রকম লোককে গাড়ীতে চাপান যায়; তাদের কাছে বসে তাদের নাজী-নকশের খবর পাওয়া যায়।

লোকটি বেনে একটু বিরক্ত হইল। আমি বলিলাম—কি ফুলের মত বন্ধ?

হেমেন্দ্র বলিল—এর ভিতর ফুল-ফলের কোনও কথা নেই। সাধা ছায় শান্ত।

সে উঠিয়া বলিল। দৃঢ় দৃষ্টিতে তান্দ্রাচালকের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের সমুখে তর্জনী তুলিয়া বলিল—তখন মশায়; স্পষ্ট কথা বলি। গরবমুন্ডের খাওয়া যে বাস্তবী মাঝেই বিম্ববাবী এনারকিষ্ট। তাদের মনের কথা বোকাবর জন্তে আপনি ছদ্মবেশী টিক্‌টিকী।

সে একটু তীব্রবরে বলিল—কমা করবেন মশায় আমি এমন যা হই—জমা আমার উচ্চকূলে। শিক্ষাও কিছু পেয়েছিলাম। টিক্‌টিকি গিরিসিটি আমি নই।

আমি বলিলাম—কমা করবেন। দেখেছেন তো তিনিদিন একসঙ্গে ঘুরে। ও একটা ইটপিড়ি। বরং এ

কথা যদি বলত যে আপনি গাড়োয়ানের ছদ্মবেশ করেছেন জানাবার জন্তে যে, যে বাস্তবী আসে সে টিক্‌টিকি কি না; তা হলে ও কথাটা সন্তোষ রস খেঁষে যেত।

লোকটা ঈষৎ হাস্ত করিল। আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—দেখুন আমার ধারণার স্বপক্ষে একটা বড় কথা আছে। প্রথম আপনি আমাদের গাড়ীতে চড়ার জন্য খুব বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। চুই নম্বর আপনার দামও কিছু সস্তা আর তিন নম্বর—

হেমেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—কোনও গাড়োয়ান ঘোড়া গাড়ি কেলে বাঘের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না। বহু দিন পরে হেমেন্দ্রে মুখে একটা বিচার সহ যুক্তি শুনে আশু হইলাম।

তান্দ্রাবালা বলিল—মশায়রা এমন ভাবে কথা কইছেন যেন এক একজন শারলঙ্ক হোয়াস।

আমি বলিলাম—খোঁজে না। আমরা বা আমাদের বংশে কেহ গোয়েন্দা নাই।

হেমেন্দ্র বলিল—তা বলতে পারি না। আমার মামাতো ভাইয়ের শস্তরের শালার—  
আমি বলিলাম—মেশোর ভাগনের দৌহিড় গোয়েন্দা পুলিশের পাশের বাড়ীতে পাশা খেলতে যায়। এখন গুট।  
স্বর্ঘ্য ভূবলা।

ওকলার বাগানের দিকে যাইতে যাইতে খালের পোল পার হইবার সময় তান্দ্রাচালককে বলিলাম—মশায়ের গোপন কথাটা কি জানাবেন না? সে বলিল—কাল বলব।

২  
“শুধু ডেবেছিলাম এই পাপটা কেবল বাস্তবী দেশের মধ্যে আবদ্ধ। পরে দেখেছি দোকাটা ভারত-বাসী।”

আমি তিক্‌তা চালকের ভাষা গল্পটা বলিতেছি না। কাগজ তাহার বাস্তবী উদ্ভূতমিত্র।  
আমি বলিলাম—“কান পাপটা?”

সে বলিল—“পাখের নামে ব্যাক্তি। আমাদের দেশের মেয়েরা ধর্মপ্রাণ, ভাবপ্রবণ, অশিক্ষিত। বাবুয়া



নিজের নানা রকম উন্নতির সরঞ্জাম করেন কিন্তু অন্যর মালের সঙ্গে তাহারের সশর্ক বড় নীচ। কেবল নীচ না বড় স্বার্থপর। মহিলাদের জীবনে যে কোনও প্রকার আমোদ উপভোগ করবার স্থান আছে সেটা তারা ভাবতে পারে না। ঘরি তারা আপনারা একটা আমোদে তাদের নিয়োজিত করতে পারে, বাঙ্গালী বাবু ভাবে কাঁধের উপর থেকে একটা বড় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের বোঝা নেমে গেল। দেখে না, আমোদটা কি ?

আমি বলিলাম—আগনি কি কথা বলছেন ? বাজা খিচোরীর কথা—

সে জ্বলন্ত করিল। চক্ষে একটা কঠোর ভাব আসিল। লোকটা কলেবর যেন একটু বর্ধিত হইল। একটা নিষ্ঠুর বিজ্ঞপের স্বরে বলিল—“খিচোরী খাওয়া না, ধর্ম—ধর্ম—ওকসেলা।”

আমি একটু বিম্বিত হইলাম। সে বলিল—“গনৈরো বছর বাঙ্গাল দেশের মাটি মাড়াইনি। বাঙ্গালী কথাও বড় একটা কইনা। তবু মনে আছে—অণ্ডগমলাকার মাথা মুগে তইম শ্রীগুরব নমঃ। ছিড়ে কেলগে সে বই যে বইয়েতে এমন কথা থাকে।”

এবার সে অকথ্য ভাষায় গালি আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম—“তবে গাল বন্ধ করুন। কবে একটা কোন ভণ্ড দেখে আগনি এক শ্রেণীর লোকের নিন্দা করবেন, এ দৃষ্টান্ত আমি স্মরণ করব না।

তাহার কঠে তখন স্বরশক্তি রূপা করিয়াছেন। সে আমার মত একটা শ্রোতাকে স্তম্ভ সহজে হাতছাড়া করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে বলিল—“কথা করবেন ভাষার জগে। ছোট কাজ করি, ছোটর কথা থাকি, বৃহৎনে ত। আমিও একদিন ধাধিকি ছিলাম। গায়ের ধূলা নিরেছি, শাশয়, গায়ের ধূলা নিরেছি। এই হাতে—নিরে, এই মাথায় রেখেছি।”

সে হাত ছুইটা লম্বা করিয়া আমার পদদর্শন করিয়া উত্তেজিত ভাবে নিশ-শিরশ্পর্শ করিল। আমি একটু পিছাইয়া বসিলাম।

সে বলিল—যে কথা বলছিলাম। আমরা দেখি না কি কাণে দ্রী লোকেরা আমোদ পায়।

আগড়ম্ব বাগড়ম্ব নানা কথা বকিয়া লোকটা নিজের কাহিনী বিবৃত করিল। মাঝে মাঝে গুরু নিন্দা, ধর্মের নিন্দা, ধাধিকের প্রতি গালি প্রণাম। আমি আমার বৃদ্ধ হৃদয়গুরু পরাবিন্দ স্বরণ করিয়া লোকটার প্রণালভ-তার স্রোতে বাধা দিতেছিলাম।

আমরা বসিয়াছিলাম দ্বিতীয় দরিদ্রাগঞ্জে যমুনার ধারে। আমাদের সম্মুখে ঝলসোতা ধূনা বহিয়া যাইতেছিল স্তোত্রাংগর আলোকে নাচিতে নাচিতে। সেই দরিদ্রাগঞ্জেই কোথায় লোকটার বাসা। সে আমাদের এখানে বসিয়াছিল। আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম বাম দিকে চাহিলে রেলের পোল, দ্বিতীয় কেল্লা প্রভৃতি হৃদয় শিশ-সৌখ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমাদের পিছনে কিছুদূর বালির চর, তাহার পিছনে কলী-মন্সার জঙ্গল, তাহার পিছনে অনতিউচ্চ এলোমেলো গাছের কোণ—তাহার পশ্চাতে বাধাশ্রী আমলের দ্বিতীয় পরিধার উপরিবৃত সৌধশ্রেণী।

ভ্রমলোক জমিবারে বংশে জন্মিয়াছিল। জীর নাম মুন্সী। তাপাচালকের বর্তমান নাম আমীর। আমীর শিকার খেলিত, নৌকার ঠাণ্ড টানিত; গান-বাজনা শিখা করিত, রাজে মুন্সীর সঙ্গে প্রেমোলাপ করিত। মুন্সীর দিন রাত সাধু সন্তা করিত, বয়সপ্রাপ্তির সহিত রসতা-লাপ করিত, বয়সোচ্চাটারের নিকট অর্ধ-অবগুণ্ডনে বসিয়া ডাল বাছিত, স্থপারি কাটিত, ধর্মের কথা ভনিত, শব্দের প্রাচীন বংশের গৌরব কথা ভনিত। আবার এক একবার নভেল পড়িত। কিন্তু প্রাণের মধ্যে কত ভাব, কত ভাষা গুমরিয়া মরিচিছিল, অপরাধবিনিমিত ভাষাধার্য নৌকে কত বহিমুখী শক্তি বহু আড়ষ্ট থাকিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্ত বিদ্রোহ করিতেছিল। সেগুলোকে কোন প্রাণালীর ভিতর দিয়া বহাইবে যুগ্তী তাহার সন্ধান বৃদ্ধিতেছিল। সে অজানা বৃত্তিগুলার ইঙ্গিত সে বৃদ্ধিত না এমন নয়। সাধারণ হিন্দু মহিলা যে দরিদ্রায় বাসনা রাশির নৌকা ভাষায় হৃদয়ী মুন্সী তাহার দূর নৌকা বহাই গাড়েই লইয়া গিয়াছিল। সারাদিন খণ্ডা গণিত, মুহূর্ত গণিত, স্বর্ঘ্যের দিকে চাহিয়া তাহার উজ্জল বল-সানো মৃষ্টিকে মনে মনে পূজা করিত কিন্তু দেখিত তাহার

আকাশে একগধে ছই স্বর্ঘ্য দেখা দেয় না। তাহার প্রাচীন বসিয়াই শব্দ-বংশের নিয়ম বড় কঠোর—দিনের বেশা জোয়ান ছেলের অঙ্গপূরে জীর বৃহৎ প্রবেশাধিকার ছিল না। যুগতী জীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সে বংশে গুরুজন-বের মধ্যকার হানি হইত, তাহারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রশংসা করা হইত। তাই হৃদয়ী মুন্সী, আমীর সোহাগামি-লামিহী তৃষিতা মুন্সী বৃদ্ধিত, ফিরিত, মুক্তের মুখ দেখিত, স্বর্ঘ্যের দিকে চাহিত আর বলিত—“স্বর্ঘ্য, তুমি বাড়ী যাও, টানকে পাঠিয়ে দাও, টান এলে সে আসে।”

মুন্সী এক একবার সিঁড়ি ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া আশাবলের দিকে চাহিত যদি ‘আমীরকে’ দেখিতে পায় যে বেহু অশপালাটা আমীরের বড় রহস্যমান ছিল।

সে বলিল—“সে সমস্ত দিনের হিসাব দিত আমায়, বৃত্তিমাটি, ছাইপাশ। সব স্তন্যতাম কিন্তু নবরতী পায়ত তার চাপনান মুখপানার গুণর। সেটা ভাল লাগত না মুন্সীর। সে বলত—তুমি আমায় কেন পুতুল ভাব। আমি তাকে বলি নিম্নে বলতাম—“তুমি যে মোমের পুতুল, মেহু।” সে আগিদনের বাহিরে নিয়ে যেত নিজের দেহ থানা। চোখ রাঙিয়ে বলত—“না আমি পুতুল না।”

“এক একদিন তাকে জমিবারীর কথা বোঝাবার চেষ্টা করতাম পরীক্ষা করবার জগে—দেখতাম তাহার পক্ষে সেটা মরফিয়া—ঘুমের দাবাই। শিকারের গণ্ডে তাহার মহত্ব পরীক্ষা করে দেখেছি—ওরে বাবা! সে কাণে আল দিত।”

স্বিলিাম—সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ঘরে প্রেমের যে কাহিনী, প্রাণের প্রেমের আধ্যাত্মিক সেই অধ্যাত্মে বিভক্ত। হায়ে পতিভক্তি, পত্নীর প্রতি অহে, ঘেরের আদর। কিন্তু প্রেমের যে প্রধান ভিত্তি—দুই জনের মনোবৃত্তি সাধ অভিলাষ অভাব-অভিযোগের সাম্য—সেটার অভাব দিন দিন বেশ মাথা তুলিতে লাগিল। মুন্সী তাহাকে ভালবাসা কর্তব্য বোধে, স্বামী জানিয়া, আমীর বলিা না। তাই তাহাদের ভালবাসা বৃদ্ধ হওয়ার উজ্জ্বলমূলক প্রেমের আকার ধারণ না করিয়া পবিত্রতাকে অবলম্বন করিতে যত্নমান হইল। স্বামীসন্তা

বাসনার পূরণ বলিয়া বৃদ্ধিতে পারিল না। সে সেটাকে বর্তব্যপালন, দেবপূজার সামিল করিয়া ফেলিল। তাহার স্বামী সেবার আভিষেঘে আমীর হাসে। কিন্তু তাহার যৌবন, তাহার নবীন প্রাণের মধ্যে যে সব চেটে তোল, সে সব তরঙ্গ সাড়া পায় না অনিন্দ্যহৃদয়ী মুন্সীর পাখার বাতাসে, পানের অঙ্গে গোলাপফুলের পাঁপড়ি মোড়ার, মানের জলে বিলাতী গন্ধতরকার স্বাসনে। যে প্রসঙ্গ তাহার আত্মরক্তি সে প্রসঙ্গ মুন্সীর নিস্তা আকর্ষণ করে; মুন্সীর যে প্রসঙ্গ প্রিয় সে প্রসঙ্গ উদ্বেক করে তাহার হাসি। হস্তরাত শত করা নিরানব্বইটা বাঙ্গালী দম্পতির ঘা। হুম—ইহাদেরও তাহাই হইল। প্রেম, কষ্ট নদীর মত অঙ্গসলিলা হইল—সে প্রথম ধ্বংস করিয়া, কর্তব্য বৃত্তিকে কেন্দ্র করিল, ব্যক্তিগত জড়াইয়া ধরিয়া বিকশিত হইল না।

আমীর বলিল—“বন্ধি একটু অধিক। তার এক সই ছিল। তার মুন্সীর মত হাত মুখ চোখ নাকের বাহার ছিল না। কিন্তু তার চোখে মুখের তাহার ভাঙা ছিল। সে ভাঙাটা অব্যক্ত, সে ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার প্রভেদ ছিল। সে প্রণালী রবিকা। আমার সঙ্গে রবরস করিবার জন্ত মাঝে মাঝে মুন্সী অমিয়াকে আমার সামনে এগিয়ে দিত। বাঁকে কথা।”

অমিয়ার স্বামী কয়লায় ব্যবসা করিত। ব্যবসায়ী লোক সাধারণতঃ ভাগ্য লইয়া খেলা করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ভাগ্যকে অহঙ্কুল করিবার জন্ত দৈবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই দৈবশক্তিকে আশ্রয় করিবার জন্ত ইহার শক্তিবান পুরুষের অহুসন্ধান করে, সন্ন্যাসী, যক্ষিক, ভক্ত, সাধক বৃদ্ধিতে থাকে, তাহাদের প্রায়শ করে, তাহাদের ঐশ-শক্তির সাহচর্যে উন্নতির লোভে। কয়লার পক্ষে রত্ন লভিবার মানসে অমিয়ার স্বামী এই শ্রেণীর একটা সাধক আত্মদানী করিয়াছিল। অমিয়া ছিল শক্তির উপাসক—অতিমায়া বা অসাধারণ শক্তি উহার রক্তনাকে বাঁধিত, তাহার প্রভাকে আকর্ষণ করিত। তাহার রহস্ত-ময় চক্ষে এই কথাটাই যেন লিখিত ছিল।

আমীরের জীর চরিত্রের মূলে ছিল ধর্ম। সে বর্ষায়দী-



বের মধ্যে থাকিত। তাহাদের রামায়ণ পড়াইয়া শুনাইত, মহাভারত পড়িত মুনী-ঋষিদের করনায় দিন কাটাইত। অমিয়ার শিলায় আর অমীরের বস্ত্রগুণ কলিকাতার পাশাপাশি। অমিয়ার স্বামী দৈবশক্তি সম্পন্ন একটা সন্ন্যাসী আবিষ্কার করিয়া, তাহাকে স্ত্রীর সর নবনী ভোজন করাইয়া কলার ব্যবসয়ে কিছু লাভ করিল। সাধুটিকে গৃহে আনিব, নিজের অননীর দ্বারা তাহার পায়পদ স্নেহ করাইল, সপরিবারে উজ্জিষ্ট ভোজন করিল। অমিয়া তাহার ভাবাবেশ দেখিল, নৃত্যের উল্লসনে নৃত্যস্থ উপলব্ধি করিল, কথ্য কহিবার সময় অর্ধ নিমীলিত নেজের উর্ধ্ব বিবরণ দেখিয়া তাহাকে অসামান্য অভিমান্য বলিয়া চিনিব। সকল কথা নৃতন ভাবে, সাধারণ লোক হইতে সে যেন ভিন্ন হইবে গড়া। যেমন ভাবে কথা বলিতে সাধারণ লোকের লক্ষ্যই মরিয়া যাওয়া উচিত, সেইটাই তাহার লক্ষ্য ভাষ্য-পাণ্ডিত্য। সাধারণ পার্থিব প্রসঙ্গের ভিতর সে দৈবের কথা, শ্রীহরি, শ্রীরাধিকার প্রেমের কথা চানিয়া আনে। সে হঠাৎ পাড়াইয়া উঠে, ঘাড় নাড়িয়া গান গায়, খেই খেই করিয়া নাচে, অমিয়ার স্বামীর গলা জড়াইয়া কানে, অমিয়ার স্বামীর করানী-পাড়া-মণ্ডিত মুখে চুষন করিল। ভবিষ্যতের এক একটা কথা কয়, এক একটা নিদ্রায়ও যায়।

এরকম একটা অপকৃত্ত চরিত্র অমিয়াকে মুগ্ধ করিল কারণ সে অতিরাষ্ট্রের সমানেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। স্বামীয়ের ভাষায় বলি, “থিরো গুয়ারসিপ গুন নয়, একটা বৃত্তি। বড় বড় অবতার বা পঞ্চমহাবীর বড় কর্তব্যে এই বৃত্তিগুণা লোক। বাক্য। অমিয়া ভাব্য-বাস্তব মুগ্ধরীকে। বিশেষ সে জ্ঞানত যে তার সখী মিহ্ন বর্ধপ্রাণ। এরকম একটা লোক; অথচ অপকৃত্ত এই চরিত্রটা আগাগোড়া ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—এ পদার্থ মিছাকে না দেখিবে আমি থাকতে পার্শ্ব না। পুরা সময় যখন মিহ্ন বাপের বাড়ী এল তখন বড় অমিয়ার রূপায় সে এই সাধু দর্শন করে দখ হল। আমি কালী-পূজার সময় বস্ত্রব্যাধী গোলাম। এর ব্যাপার কিছু জানতেন না। রাতে প্রথম মিলনে মিহ্ন বলিল—এ-বার বড় শুভক্ষণে বাজা করেছিল।

আমি তাকে বৃক্কের মধ্যে টেনে নিয়ে চিবুক ধরে বললাম, “বাপের বাড়ী যাত্রার ক্ষণটা সকল দিনই শুভ।” সে বলিল—না, পরিহাস না। তোমাকে দেখতে হবে। ঠাট্টা করতে পার্শ্ব না।

“আমি তাকে আরও আদর করলাম। বললাম—তোমার যা দেখলে আশোব হয় মিহ্ন আমি তাতে ঠাট্টা করব কেন। সে হ’ক বেড়াল ছানো—”

মিহ্ন আমার মুখ টিপিয়া ধরিল। কৃত্রিম কোণ দেখাইয়া বলিল—স্বীয়েন কোনদিন কি গভীর হতে পার্শ্ব না। হিঃ অপরাধ হবে।

“অপরাধ হবে? ব্যাপারটা কি? বেড়ালের না, তোমার বন্ধু অমিয়ার—” সে-বাধা দিয়া বলিল—তোমার পায়ে পড়ি। এ কথা নিয়ে ঠাট্টা কর না। বড় ভক্ত! বড় প্রেমিক! বিতার সাধু। যেমন নাম, তেমন কাজ।

স্বামীর বলিল—সাধু! তাই ভাল। কে সাধু! “মাতোয়ারা বাবা” মাতোয়ারা বাবা! কি বৃক্করী নাম! মাতোয়ারা বাবা। স্বামীর আবার হাসিল। মুগ্ধরী অমিয়ার তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল, চরণ ধরিল, শেষে নিশ্চিন্ত হইল।

পরদিন অমীর অমিয়ার বাড়ী গিয়া মাতোয়ারা বাবাকে দেখিল। বৃক্কি বৃক্কক এবং পাগল। কি করে! স্ত্রীর মস্তকটির জ্ঞান তাহার পদ্যুলি লইল। মহিলায় বাজা শুনে, থিয়েটার দেখে, ভালুক নাচ দেখে আনন্দ পায়, তাহার সখ্যদ্বন্দ্বী যদি এই লোকটার ধর্মের নামে নাচেন কোন দেখিয়া লোক পাগ তাহাতে ক্ষতি কি? লোকটা বেশী বাজে কথা বলে তাহার মধ্যে ছিঁ চারিটা শায়ের কথাও করে। সে আপত্তি করিল না। স্বামীর আপত্তি শীকার করে, বোড়ায় চড়ে, তাগ খেলে, পাগনা খেলে আরও কত রকম কাজে দিবারাত্র আনানাকে নিবৃত্ত রাখিয়া কত আনন্দ পায় কিন্তু তাহার অস্থগতা ধর্মদ্রষ্টা, যে ইষ্টদেবতার মত তাহাকে ভালবাসে—তাহার তো দৈনিক কোন আনন্দের ব্যবস্থা সে করিতে পারে নাই। এ চিন্তাটা মাঝে মাঝে তাহার আক্ষেপের কারণ হইত—তুহু তাহার কেন নবীন ভারতের অনেকেরই মন সে

আক্ষেপে আলোড়িত হয়। হুতরাং যখন মাতোয়ারা বাবার অশান্ত্রীয় শত্রু আলোচনা ও কল্যাণীন নৃত্যকলার মুগ্ধরী আনন্দ লাভ করিল তখন তাহার ঘাড়ের যেন একটা বোঝা নামিল।

৪

অগ্রহায়ণ মাসে মুগ্ধরী দেশে ফিরিল। তাহার পূর্ণ যৌবনে অল্প দেখে কেনে পালিশ মরিয়া দিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে সন্তোষের স্থিরতা আসিয়াছে। অশ্বদানী স্বামীয়ের ভাষায় তাহার “পতিভক্তি কিছু ঘটয়া একটু যেন ত্রোতাগুণের দিকে এগিয়েছে।” সে প্রভাতে উঠিয়া স্বামীর চরণ-রেণু মাথায় দেয়, রাতে স্বামীকে নিত্য প্রণাম ও তাঁহার মুখদুর্শনে তৃপ্ত করে, ধর্মের কথা বলে, প্রেমের সন্ধান ভনিতো ভনিতো তৃপ্ত হইয়া শ্রীগৌরার প্রেমের কথা কয়। মাতোয়ারা বাবার কথা নিত্য উঠে। স্বামীর তনে, কোনও দিন পরিহাস করে, কোনও দিন নীরবে ভনিবার ভাগ করে কিন্তু মনে মনে ভাবে আর কতটুকু পূর্ণে রাইফেলের ঘোড়া টিপিলে হাতের শীকার স্থায়ীতা পলাইতে পারিত না।

একদিন স্বামীয়ের কৌকড়া চুলের ভিতর দিয়া নিজের চাপার কলির মত আল্প ছুটীকে সাতার শিখাতে শিখাতে মুগ্ধরী বলিল, “আজ পরমহংসদেবের ছবি দেখে আমার ঠাকুরের আসন কেমন মানিয়েছে একবার দেখলে না।”

স্বামীর তখন ঠাঁটতেছিল করিমারী কাছারীর জানালার বাহিরে জাগলহানা বাধিয়া চিতাবাঘ মারিবার ক্ষমি। সে বলিল—“সুনিমা কাল না পরত।

মুগ্ধরী বর্ণ হাতে পাইল। সে বলিল—পরত। দেখে গুরুদেবের আদেশ মত সে দিন বায়ো জন কাপালকে নিজের হাতে রেখে ভাত খাওয়া, মাকে বলে দেবে।

স্বামীরও বর্ণ হাতে পাইল। শীকারের জ্ঞান বাহিরে রাত কাটাইবার প্রস্তাবে মিহ্ন বড় খান খান করিত। সে বলিল—বেশ ত মাকে বলে দ’ব। আর বিশেষ সে দিন আমাকেও মন্থল তরকারি কর্তে—

মিহ্ন একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—বাঘ মারতে না বুনা অমার খোঁজতে?

সে হাসিয়া বলিল—এমন কিছু না মিহ্ন, চিতাবাঘ। আর শোন, তোমার গুরুদেবকে বাঘের আসন দ’ব বলেছি। এবারকার চিতাবাঘের ছাট্টা দেখেই—

“স্বাভার।”

“অর্থাৎ মাতোয়ারা বাবার।”

ইদানীং এই রকম যুগের ব্যবস্থা বেশ চলিতেছিল। একটু বেগতিক দেখিলেই স্বামীর গুরুদেবের নামে কিছু উৎসাহের প্রস্তাব করিত। তাহারও গুরু দেবার জ্ঞান কিছু আবশ্যক হইলেই মুগ্ধরী স্বামীরকে শীকার করিবার জ্ঞান ছুটি দিত।

মুগ্ধরী ঠাকুরের এক বেদী পাতিয়াছিল। একপানা জল-চৌকীর উপর নিজের হাতের শিল্প, একপানা রেশমী বস্তার কাজ করা আতপন। তাহার উপর পৌর-নিতিভয়ের ছোট ছবি। ছই পার্শ্বে পরমহংস দেব ও বিবেকানন্দ, সমুখে মাতোয়ারা বাবার ফটোগ্রাফ—নিবন্ধ, হাত-পা ধষ্টারের রোগের মত শক্ত, বাহিরে তেল। ইহা ব্যতীত মাজাজী ধূপকাটা রাধিবার পিঠ-কোড়া পিতলের ময়ূর, পাড়াছী ছাগলের গলায় ঘেমন বাধা রাখে তেমন ছোট ঘটা, ঘনটা, সাধা ঘোড়ার ঘাড়ের রায়ে, বেনারসী লাল কালা রঙের হাতলবুক চামর ইত্যাদি। একবার একটা ছোট রূপার বাটি দিয়া স্বামীর ছই রাহির জ্ঞান অবসর লাভ করিয়াছিল, মুগ্ধরী তাহাতে রোজ বেত চন্দন ঘসিয়া স্বামীর নিহত সঙ্গার একটা কাঁটা দিয়া ছবিগুলির কাছে উপর নানা প্রকারে ফোটা কাটিয়া একাধারে চাক শিল্পের প্রশংসা ও গুরু মস্তির সন্ম। করিত।

বড় দিনের ছুটিতে স্বামীর কলিকাতায় ঘোড়দৌড়, সার্কাস, বায়স্কোপ, বাহুদের পশুপক্ষীর ঘর, আলিপুর চিড়িয়াখানায় বানরের ঘর ব্যতীত বাকী সকল ঘর দেখিবার জ্ঞান কলিকাতায় আসিল। মুগ্ধরী তাহার সহিত আসিল। সে ঘোড়দৌড় দেখিল না, সার্কাসে বসিয়া অমিয়ার লিহিত গুরুদেবের গল্প করিল, বাহুদের পশুপক্ষীর ঘরে নানা প্রকারে কাগজ দিয়া একপ্রকার চক্ষু মুদ্রা চলিল, আলিপুরে বানরের ঘর বিশেষ আনন্দের সহিত



দেখিল, শাপের ঘরে সে অঙ্গুর দেখিল, অমিয়া কেউটে গোখরা, আমীর দেখিল কুমারী। আমীর খন খিচোরে গণীদের নাচ দেখে 'এনকোর' 'এনকোর' বলিয়া চাংকার করে মুন্সরী তখন গুরুদেবের ভাবাবেশ দেখে, অঙ্গুর গুলিয়া যায়। ভাবে বিভোর হইয়া গুরুদেব তাহাকে আশ্বিন করিয়া বলে "হরিবন্দ", "হরিবন্দ" "হরিবন্দ"—সে বড় ভক্তিতে বড় অঙ্গুর হরি বলে। অমিয়া তত ভক্তিতে হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। এদব কথা আমীর তখন জানিত না পরে শুনিয়া-ছিল।

তাহারা কিরিয়া গেল। ছইজনের রুচির খায়া বেশ পশরিতবে ছইমুখী হইয়া বহিতে লাগিল। দেলখায়ার সপ্তাহেক পূর্বে অমিয়া ও তাহার কন্যা-বাবাখারী বামী নদেরটাবাবু আমীরের দেশে আসিল। নদেরটাবাবু সহিত মুন্সরীর পাক্ষং হয় না কিন্তু অন্যরে প্রবেশ করিয়া আমীর অমিয়াকে দেখিতে পায়। অমিয়া মনোযোগ দিয়া তাহার শিকারের গল্প শুনিল। তাহার বহুতনিতব বক্তব্যবাদের একশত ছয়টা দাঁত দেখিয়া যুবতী অমিয়ার বোমাকন হইল। তেরটা বাথের চামড়া দেখিয়া তাহার ভাবে-ভরা চক্ষু ছইটাই স্পষ্ট প্রশংসার ভাষা ফুটিয়া উঠিল। যখন সে উনিশটা কুমীরের ছাল দেখিল—প্রত্যেকটার পিঠে ছোট ছোটের সন্ধিবৎ—সে হাততালি বিয়া উঠিল। মোটের উপর অমিয়া যে আমীরকে অতিমাহুদ বলিয়া চিনিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। রাজে যখন তাহার মুন্সরীর নিকট অমিয়ার রুচির প্রশংসা করিল তখন যুগ্মী রক্তজ্ঞাত্য ভরিয়া বলিল—আমার ভারী ভয় হইবেছিল, পাছে আমি'র অস্ত হই। সেও বেশ ক্ষুণ্ণিতে আছে। তোমার স্ব্যাত্যি আর তার মুখে ধরে না।

৬

বোলপূর্ণিয়ার দুইদিন পূর্বে তাহারা চারিজন কলিকাতায় আসিল।

কলিকাতায় উপকণ্ঠে মাতোয়ারা বাবা একটা বাগানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নদেরটাব আমীরটাকে নিমন্ত্রণ করিল আশ্রমে হোলি উৎসব দেখিবার জন্ম।

অনেক ভক্তমহিলা মেলায় যোগদান করে। পুঙ্খ শিষ্ট-দের সহিত মহিলাদের কোনও সঙ্গ্রহ থাকে না। গুরুদেব ত্রীপুরকুশের আশ্রম প্রভেদ মনেন না তবে তিনি দেশাচার মনেন। আমীর কন্যা প্রার্থনা করিল। অগত্যা যুবতী দুইটাকে লইয়া নদেরটাব আশ্রমের উৎসবে যোগদান করিবার জন্ম বাজা করিলেন।

যখন রাত্রি আটটা তখন আমীরটাব কলিকাতার একটি বন্ধুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছিল। অনেক প্রসঙ্গের পর আমীরটাব গুলি ধর্ষের নামে ব্যক্তিভারের কথা। অনেকে নেড়ানোড়ির উল্লেখ করিল। একজন মাতোয়ারা বাবার কথা বলিল। সে বলিল—নেড়ানোড়ি কেন? ভক্তমহল শিকিত ঘরে, ভক্তের পরা মহিলাদের ঘরে এ পাণ চুকিছে কে'বেটা। ত্রাভুপা মহিলাদের ভণ্ড। আমার বাগানবাড়ীর পাশে যে অভিনয় হয় কি বলব? মাতোয়ারা বাবা সেখানে একটা আশ্রম খুলেছে। মেয়েদের কি লোব? তারা ভাবে এটা বৃষ্টি ধর্ম। আরে ছায়া ছায়া! কি ব্যভিচার! মেয়েবা অনেকদূর পৌছে আর কলহের কথা বাড়িকে বলতে পারে না। কিন্তু চাংকানো উচিত তাদের অভিভাবকদের। আমি দেখেছি ছই একটা লোকের সামনে লোকটা তাদের জ্বীনের আলিঙ্গন করে।

আমীরের মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ সন্দেহ তো এতদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই। বাগান-খোলা ভক্তলোক-হাসিয়া বলিল, "একটা ফরাসী লাড়িওথাল লোক আছে। ইন্ডিগটের মত চেহারা। কিন্তু চক্ক নীচ লোভী ঘটিকারের চাহনী। বৃদ্ধকানন্দ বাবা নাচতে নাচতে একবার তার গালে চুমু পায়, একবার তার জ্বীর গালে চুমো পায়। জ্বীট বুঝ প্রবৃত্তি বলি মনে হয়। কিন্তু ফরাসী-লাড়ি এ ব্যবহারে নিজেই ধমক মনে করে।"

আমীরের ভাষায় বলি। "ভূগোলে পড়েছিলাম মশাই যে পৃথিবী থাকে। সেটা উপলব্ধি করলাম। নিজেই যোগ পাণী" মনে করলাম মুন্সরীর সরল গণিত মুখখানা মনে হ'ল। কি সর্গদান! ভাবতে পারলাম না। কৌশল টিকানা জেনে নিলাম। কৌশলে বন্ধুরে

কাছ থেকে বিদায় নিলাম। একধানা বাইসিকেল নিয়ে ছইলাম। টালার গোলকে কাছ একটা পাহারওয়ান চাং-কুর করে বল্লে—"আত্তে বাবু।" কে তার হৃদয় শোনে। "বাগানবাটী সেইট।" বাহিরে রাস্তার দিকে একটা ঘরে নদেরটাব আর ছই চারিটা বাবু পাশের ছোট একটা ঘরে পৌর-নিভাইয়ের বিগ্রহ। সেই দুখানা ঘর বাহিরের দিকে। তারপর একটা দরজা। বড় দরজা। দরজার পিছনে বাগান।

চাঁদের আলোতে গাছের মাথাগুলো বেশ মৌগু ক'রে ছলছিল—নেবু ফুলের গন্ধে। একটা মাত্র কোকিলের গান। কাকও দেখা দিলাম না। পাশের বাগানে চুকিলাম। ছুটা বাগানের মধ্যে প্রাচীর প্রায় দশ ফুট উঁচু। আমার রাশি চক্ষু। আমি চিরদিন টাককে ভাল-বাসি। কিন্তু সে রাস্তার চাঁদের জোআর আমি প্রাণ-ভরে নিন্দা করেছিলাম। একটু লুকাবার স্থান নাই—

আম্মগোপন করবার কোনও উপায় নাই—চোয়ের মত আবতালে স্বপ্নে রাগে নিঃশব্দ ঘুরে, শেষে একটা আমগাছের তলায় এলাম। গাছের একটা বড় ভাল প্রাচীর পার হয়ে আশ্রমের ভিতর গিয়েছে। তিন লাফে সেই গাছের মাথায় উঠে বসলাম। জ্যোত্স্নাত্য আশ্রমের বাগানের একটা শক্ত আমগাছের শাখা হতে হু'গাছা কাছি দাড়ি বুল্ছিল। সর্গদান, এ যে দেলুনা! দেলনার বসে সেই শাখা—মাতোয়ারা বাবা—কোড়ে একটা যুবতী। তাহাকে বিরিয়া পাচ মাতটী হুন্দরী, পরিধান বর্ণপে সাবা। শাড়ী, মায়ে মায়ে আরীরের লাল রঙে রানোনে। তারা হাসছিল, ঘুরছিল, হু হু দেলুনটাকে দোলা-ছিল। ছুটি যুবতী রূপার পিচকারী হতে বোহ হয় সেই প্রেমিক-প্রেমিকার গায়ে গোলাপজল বরষিতছিল। শাখা মায়ে মায়ে কোড়ের জ্বীলোকটাকে চুদন করিতে-ছিল। এক একবার নীচের এক একটা মহিলা'র হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাদেরও রক্তিম অংগের সেই আশীর্বাদী চুদন বর্ণ কর্ছিল।

"আমি বাবা একটু অগ্রসর হলাম। একজন পিচ-কারী দারিণীকে ঘরে উপর দিকে মুখ তুলে পাণিট চুদন কর্লে। সর্গদান! অমিয়া!"

আমারও বুক ছুক ছুক করিতেছিল। এই পঞ্চদশ বৎসর পূর্বের কোথাকার এক নির্জন কুশের ঘটনা। আমার ত যেন বকের রক্তকে জমাট বাঁধাইতেছিল। আমি ঠাড়াইয়া উঠিলাম।

আমীর আমার হাত ধরিয়া বসাইল। তাহার হস্তে অশ্রুর বল, আর হস্ত জলিতেছিল যেন তপ্ত লৌহ শলা-কার মত। আমি বলিলাম।

সে বলিল, "ভুদন। আমি আরও অগ্রসর হলাম—কোলের পৌরীটিকে রেখবার জন্ম। সে শাখুর আলিঙ্গ-নের মধ্যে, তার কোড়কে পবিত্র ভেবে, বেশ স্থপে বসে-ছিল। পাণিট তার মুখ তুলে চুদন কর্লে। আমি চুলুলাম। হরিণের পায়ে সিংহ পড়ল যেমন কুরান্দীরা চারিদিকে গালায় সখিয়া তেমনি ছুটে পালাল আমি তার গলা টিপে ঘরে বুল্লাম—লম্পট, পিশাচ, ভণ্ড—এই নাও।

"এত জোরে তার বুক ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলাম যে ছুরির ডগাটা পিঠি দিয়ে বার হয়ে স্থ্মিত্তে বিধে গিয়েছিল। কোয়ারার মত রক্ত উঠল। দেখলাম ছুটি জ্বীলোক ছু'দিকে। আমি বুল্লাম—মিহু দোখ তোমার নহ—তোমার সত্যিঘর মূল—

"সে পাগলের মত চোখ রাড়িয়ে বুল্লে—'করু'লে কি নিহু'র। খু'দ নহরতা! ও! বাবা! গুরুদেব!—সে ভণ্ডের বকের উপর পড়ল।

আমি বুল্লাম—পাণিঘনি এতদূর এসিয়েছে? তবে তুমিও নাও।"

"ঠিক ছুটিটা তাকে বেঁধবার আগে অমিয়া আমার ধরলে। 'ছিং! ও মারী! ওর কি দোষ! আমার বামী জানত যে লোকটা আমাদের সর্গদান কর্লে।"

"আমি তার মুখের দিকে চাইলাম। সে বল্লে, 'এই শোন' লোক আস্ছে—পালাও পালাও—"

"আমি পিছনে চাইলাম। মিহু কো'ন সময় আমার ছুরিখানা তুলে নিয়েছে। সে বল্লে—'বামী!—বেহতা।"

পালাও পালাও—ও কেন আগে বুল্খি? তোমার জানী হবে? ন! না! বেশ করছে। কি অমূল্য জিনিষ স্বর্ণের লোভ দেখিয়ে ও!—



“সে নিজের বকে ছুরি বিধিল। ধরতে পারলাম না, বাঁচাতেও পারলাম না, বুঝতে-সময় পেলাম না। আমিও আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললাম। পিছনে গোল গুলতে পাচ্ছি। সে পিছনের দরজা জানত। অগ্নিগলিমা সন্ধান রাখত।”

“কোথা গিয়ে নিয়ে গিয়ে সে আমার একথানা নৌকায় বসাল। মাঝিরের বললে—“বাবা, বালীর ঘাটে পৌঁছে দিলে এই বালাগাছা উপহার দিব। আমাদের ছেলের বড় ব্যারাম।” এর আগে সে আমার নাইয়ে নিয়েছিল। গায়ে রক্তের দাগ ছিল না।”

ঐশ্বর্য বধন বর্ধমান পার হয়েছে তখন আমার হাঁস হল। আমি বললাম কোথা বাছ?

“সে বললে পৃথিবী মত বড়। দুজনে ছদ্মবেশে একমুঠো”—

“দুজনে? কেন সে বামীর কাছে কিংবদন্তি না?

“বামী! যে নিজের জ্বর সতীর্থ চোরের হাতে তুলে দেয়? আমিতো পতিভা। তোমরা তো বেঙ্গা রাধ। মনে কর, আমি তোমার রক্তিতা।”

৩  
গল্পের শেষে তিন মিনিট স্থির হইয়া রহিলাম। সে বলিল, আমিয়ার সঙ্গে দেখা করবে না?

আমিয়ার সঙ্গে দেখা করুন না। বিচ্ছিন্ন সে আমিহা।

কেন? আমিহা আমার কে?

আমিহা তোমাদের পাড়ার মেয়ে, তার বামীর নাম নদেরচাঁদ না—কান্তি মুখু—

“আঁ, সে তো জলে ডুবে মরছে বলে কান্তি সটিয়েছিল আমার মুসরী। ও—ভুগুর বাবুর—”

“হ্যাঁ, তার কি হয়েছিল।”

“দুজনে দক্ষিণেশ্বরে গেল ডুবে মরেছিল। ও—”

“বাক্, আমার একটা বোম্বা নাম্। তাহলে কান্তি পুলিশকে পদমা দিয়ে ব্যাপারটাকে চেপে দিয়েছিল।

আহা! সরল! নির্দল আত্মা! তার কি লেব? জোড়া খুন করেছি আমি।”

আমি কোনকম মতামত দিলাম না। সে বলিল—

জগি যাই নি, পাছে তার স্বভিতে কলঙ্ক হয়। কলঙ্ক তার নামের সম্মত জড়ায়নি। যাই, অমিকে বলি গে।”

আমি বিষয়ে এই অপকণ চরিত্র তাৎপাওয়ালার দিকে চাইয়া রহিলাম।

## ফাল্গুনে

### ঐশ্বর্যব্রাম চক্রবর্তী

সন্ধ্যায় কেন আলো জ্বলো, যবি স্বপ্নের নাই ঘরে?  
বলো দেবদারা মন্দিরে দীপ কার আরতির তরে?  
রোক্ত দীপহীন আঁধার এ গেহ বসে থাকে। চুপচাপ—  
পথে যেতে আজ ঘরে হারিয়েছে তারে ভাব অন্তরে।

একটুকুণের চোখোচোখি,—তার একটি দিনের স্বভি,  
সেই স্বপ্নের মুখানি—তার না পাওয়া প্রাণের ক্রীতি।—  
অন্যে পথের-পথিক তারে ত'আর পথে মিলিবে না,  
তারে ভালোবাসি আঁধারে একাকী গাও বিরহের গীতি।

যদি কোনোদিন পথের বন্ধ পথ তুলে আসে ঘরে,  
সারারাত দীপ নিভায়োনা চেয়ে থেকো আঁধারপরে।  
অনাগত যারা স্বপ্নেরে পারে স্বপনের বেশে গেল  
তাদেরে সেদিন নবীরে মাঝে নিয়ে গো বরণ করে।

সেদিন প্রাণীপ আলানোয় দিন যেদিন বন্ধ আসে।  
সেদিন একটি দীপে ছুবনের সকল দেয়ালী হাসে—  
হাস গো, বন্ধ না এলো যদি তো ফাল্গুন কেন এল।  
ফাল্গুন যদি এলো ত বন্ধ কেনে নৈ বাছ পাশে।

## শিক্ষার প্রসার

### ক্রীমতী কনকলতা ঘোষ

জী-শিক্ষা ও শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে আজকাল অনেক সভা-সমিতিতে এবং নানা সাময়িক পত্রে খুব আলোচনা চলিতেছে, কাজেই আমাদের ত্রায় সাধারণের সে বিষয় কিছু নূতন কথা শোনান সম্ভব নয়। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হওয়ার অহুকূলে আমাদের সামাজ্য অভিজ্ঞতার ও বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ আতঙ্ক দেওয়াই উদ্দেশ্য। এখনও অনেক জী-শিক্ষা বা অধিক শিক্ষার প্রয়োজন শুনিলে শিহরিয়া উঠেন, বলেন কালে কালে হল কি? আবার হয় ত কেহ কেহ মনে করেন আজকাল শিক্ষা দীক্ষা নামের শুধু ছেজো-চারিভাই প্রশংসাইতেছে। মেয়েদের শিক্ষা মানে তাহারা শুধু বাহির, লইয়া মাতিয়া থাকিবে ঘরকন্নার কাজ তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না ইত্যাদি। ষাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া বোধ হয় কারণ লেখাপড়া শিখিলেই যে মেয়েরা বাবু বনে যায় এমন কথা আজ আর বলা চলে না। এমন অনেক মেয়ে আছে যারা রীতিমত শিক্ষিতা হইয়াও গৃহকর্মে হ্রসিগুণা এবং ব্রহ্মপী। আবার অনেকে হয়ত অতি সামান্য পড়াশুনা করিয়াও নাটক নভেল লইয়া থাকিতেই ভাল বাসেন এবং গৃহকর্মেও বিশেষ অভ্যস্ত না। আর নিরক্ষর নরনারীর ভিতর করপ্রিয়তা ঘটটা দেখা যায়, কিছু পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর মধ্যে তার চাইতে সেটা অনেক কম। সেই রকম অনেককি মিথ্যে ভাবিয়া দেখিলে শিক্ষার উপকারিতাই অধিক পরিমাণে নজরে পড়ে। তবে অপরকার যে একেবারে হয় না সে কথা কেহই বলিতে পারেন না। তবে সকল বিষয়েরই ভাল মনে যে আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কেহ হয় ত বলিতে পারেন সে কালে অপরকার মত এত শিক্ষার টেউ ছিল না অথচ সকলোই প্রায় (জী-পুস্তক) আবৃত্তক মত লেখাপড়া শিখিত এবং নানাকল্প প্রমাণ্য কাজ করিয়া অল্পে দিন গুজারণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে সেই সঙ্গে এ কথাও মনে করা বোধ হয় অসম্ভব নয় যে তখনকার দিনে সাধারণতই মানুষের জীবন যাত্রা সহজ সরল ছিল এখনকার মত প্রতি পদক্ষেপে তাহা এমন জটিল সমস্তা পূর্ণ ছিল না। কাজেই বলা যায়, যে, যে যুগের তাই তা কিছু নরনারী মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এখনকার অধিকাংশ গৃহমাতা-

লোকের মধ্যে, জী-শিক্ষা এবং জাতি ধর্ম নিরীক্ষেণে শিক্ষার প্রসার এ কালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং আবশ্যকীয়। তবে এমন কথাও কেহ বলেন না যে শুধু পুণ্ডিত বিভাি আবৃত্তক। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলোই আপন আপন অবস্থা বুদ্ধিতে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে শিখে, ইহাই সকলে ইচ্ছা করেন। আমরা সেই শিক্ষার আবশ্যকতাই অগ্রহণ করিতেছি। আমাদের মনে হয় মাহুষের চক্ষু যেমন মনের দর্পণ স্বরূপ, তেমনি শিক্ষাও মাহুষের স্বভাবের দর্পণ স্বরূপ। কেননা যে বালাকালে যেমন প্রকৃতির মাছ্য থাকে, পরিপূর্ণ বয়সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার সেইরূপ প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হইতে দেখা যায়। এবং সেই সঙ্গে নানারূপ শিক্ষাধারা মনের স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিকশিত হয়।

যে ব্যক্তি (জী বা পুরুষ) বালাকাল হইতে উচ্চমনা হয়, আপনার অন্তরনিহিত জ্ঞানই ভবিষ্যতে তাহাকে সহ্য ও উন্নত হইবার পক্ষে প্রধান সহায়তা করে। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পিতা মাতার শিক্ষার প্রভাবও সামান্য নহে। যে জনের বলে মাহুষ উচ্চ আদর্শ ও সহ্য চরিত্র অহসরণ করিবার মত ক্ষমতা পায় এবং স্বহৃদান ক্ষমাগুণের অধিকৃতি হইতে পারে সে জ্ঞান ও শিক্ষার দ্বারাই অর্জন করা যায়। ছ' চারখানি বই পড়া অপেক্ষা সেই জ্ঞানই মাহুষের জীবনে অধিক লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু নিরক্ষরতার মধ্য দিয়া সে আত্মজ্ঞান লাভ করা বোধ হয় সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। সামান্য কার্য্যে বাসে হাশ্বল্য ও বিরোধ বিসম্বাদ, অশিক্ষিত লোকের দ্বারাই অধিকাংশস্থলে ঘটিতে দেখা যায়। বোধ হয় তাহারা ক্ষমা আপোষ এবং আত্মসম্মানের মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারাতে ঐরূপ ঘটয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে ষাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই শিক্ষার উপকারিতা অগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতাত্মবলী হইয়া কয়েকজন সন্মত ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের প্রচার কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা সর্বাঙ্গসম্পন্ন তাঁহাদের কার্য্যের আন্তরিক সাহায্য কামনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম।



## গিরিশচন্দ্র স্মরণে\*

শ্রীসত্যনায়ায় সরকার

আজিকে তোমারে বিবির বলিয়া  
সাজায়ে এনেছি বরণ-ডালা,  
রতন-কুশল নাহি আমাদের  
পাখিয়া এনেছি কুহুম মালা !

শতক পরায় উঠেছে আকুলি  
এ মহা মিলনে তোমায় স্মরি,  
দানিতে এসেছে প্রাণের অর্ঘ্য  
শ্রুতিটা তোমার বক্ষে ধরি।

বাণী-মন্দিরের সাধক প্রবর,  
তোমার বরণে কি দিব হায়,—  
সাজাইলে তুমি নানা আভরণে  
তাবা জননীর মঞ্জু সায়।

সম্ভা নাহিক লজ্জা কি তাহে ?  
কিছু নাই যদি করিতে দান,  
তবুও ত আছে প্রাণের অর্ঘ্য—  
লহ স্বপ্নের ভক্তি-গান !

এসেছিলে তুমি অপোবন-মাঝে  
ধর্মের জয় ঘোষণা করি,  
এসেছিলে তুমি রণ-প্রাঙ্গণে  
নির্দোষিত করি সমর-ভেরী।

মঞ্জু বৃদ্ধ বিতান-মাঝারে  
ধরেছিলে তুমি প্রেমের গান,

মঞ্জরী-মালা-গুণন মাঝে  
উঠেছিল তব মধুর তান।

“অমিয় নিমাই সন্ন্যাসে” তব  
ভগবৎ-প্রীতি উটিল ফুটি,  
সন্দাকিনীর পুতখারা তুমি  
অমরা হইতে আনিলে নুটি।

“প্রসূরে” তব উঠেছিল ফুটি  
নারীর মাধুরী—কি শোভা তার !  
তোমার হঠ “রঙ্গলাল” যে—  
পুঙ্কবের মাঝে রত্ন-সার।

রত্নমণ্ডে তব অভিনয়—  
হেরি ভগবান পরমহংস,  
প্রেমালিঙ্গনে বন্দী করিয়া  
অন্তর-গানি করিয়া ধ্বংস।

চ’লে গেছে তুমি দিয়ে গেছে দেহে  
সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ দান,  
তাই শ্রুতি তব বক্ষে ধরিয়া  
দেশবাগী তব ফুল প্রাণ।

ধর্মের বাণী ঘোষিল রকে  
কর তোমার জীমূত মন্ত্র,  
ধরু হে কার, সাধক প্রবর,  
নটরুল-রবি গিরিশচন্দ্র !

## প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের উপকরণ

“পাগল”

রাজা-রাজভ্রাতার জীবনী, তাঁহাদের শাসন, যুদ্ধ প্রভৃতি  
যাযাতীয়া রাজ সংক্রান্ত ব্যাপারই ইতিহাস নহে। একজন  
রাজার পর একজন রাজা হইলেন। তিনি প্রাণত্যাগ  
করিবার পর তাঁহার পুত্র রাজা হইলেন। এক রাজার  
সহিত অল্প রাজার যুদ্ধ হইল; যুদ্ধ কে জয়ী হইলেন কার  
করজন সৈন্য মরিল। এই সমস্তই যদি ইতিহাস হইত,  
তাহা হইলে মানব-সমাজে ইতিহাসের বিশেষ কোন স্থান  
ধাক্কিত কি না সম্ভেদ। যদি অশোকের সময়ের অস্ত্রাঙ্ক  
অংশগুলি বাধ দিয়া আমরা তাঁহার শাসনকাল, যুদ্ধ বিগ্রহ-  
কেই ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতাম, তাহা হইলে  
তাহাকে জগতের সিংহাসনে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া অসম্ভব  
হইত। অশোকের সন্ন্যাস, ধর্মাহরণ, অহিংসভাব,  
শিলালিপি প্রভৃতি যদি বাধ দেই, তাহা হইলে তাহাকে  
সামান্য একজন রাজা হইতে বড় ভাবিতে পারি না। ঐ  
সমস্ত কার্য ও গুণাবলি, তাহাকে জগতের সিংহাসনে  
শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে। অনেকে মনে করেন রাজা ভিন্ন  
ইতিহাস হইতে পারে না।

ইতিহাস সভ্যতার একটা শ্রুতি। এই শ্রুতি মানব-  
সভ্যতার নানা ফলকে রাখিয়া রাখিয়াছে। এই মানব  
যুগ হইল, দিন মাস, বৎসর শতাব্দী প্রভৃতি। কোন  
অতীত যুগে এই মালা রাখা আবশ্য হইয়াছে তাহা নির্ধারণ  
করা যায় না। যতদূর সম্ভব পৃথিবীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই  
ইতিহাসের স্রষ্টি। ইতিহাস অতীত জগতের প্রধান  
ঘটনাগুলি আমাদের কাছে জানাইয়া দেয়। এই ইতিহাস,  
অতীত যুগের সভ্যতা, শিক্ষা-নীতি, শিল্পকলা, সামাজিক  
নীতিনীতি প্রভৃতি আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয়। মানব-  
মন ঐ সকল উপকরণ পাইলে পড়িয়া আনন্দে নাচিয়া  
উঠে। এই ইতিহাস মানবকে হাজার হাজার বৎসর  
পূর্বের রামরাজ্যে লইয়া যায়। ইতিহাস হাজার বৎসর  
পূর্বের একজন রাজকুমারিকে যোদ্ধাবীর্য্য যুবাভিরাট  
মানবের সম্মুখে আনিয়া দেয়। এই পুরাণকে নৃতন  
করিবার ক্ষমতা ইতিহাসের আছে; তাই ইতিহাসের এত  
আদর। ইতিহাস, অতীত সভ্যতা ও একটা জাতির

গুণাবলী, তাহার কার্যকলাপ জগতের সমুদ্রে সত্য বলিয়া  
প্রমাণ করিয়া দেয়। ইতিহাস দ্বারাই দেশের, জাতির,  
শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় হয়।

জগতে একটা জাতি হিসাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে  
তাহার ইতিহাস আবশ্যক। কোন জাতি বা দেশের  
ইতিহাস না থাকিলে সে জাতি, জাতি হিসাবে জগৎ-  
সভায় স্থান পাইতে পারে না। জাতি হিসাবে বাচিতে  
হইলে দেশের এবং জাতির বাধীনতা আবশ্যক। একটা  
জাতি বা দেশের ইতিহাস তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমেই  
আবশ্যক, সেই দেশের এবং জাতির বাধীনতা। বাধীনতা  
ভিন্ন একটা জাতি, জাতি বলিয়া পরিচয়ই দিতে পারে  
না। যে জাতির বাধীনতা নাই, তার আবার ইতিহাস  
কি? আজ ভারত পরাধীন। জাতি হিসাবে জগৎ-  
সভায় তার স্থান নাই; তাই বর্তমান ভারতের কোন  
ইতিহাস হইতে পারে না। আজ ভারতের প্রধান প্রধান  
ঘটনা, তার সভ্যতা, তার শিক্ষা-নীতি, ধর্ম, বর্তমান  
ভারতের প্রকৃত ইতিহাস হইবে না। ইহা সমস্ত বৃটিশ  
সাম্রাজ্যের ইতিহাসের একটা অংশ মাত্র।

যদি ভারতবাসী জাতি হিসাবে কোন দিন জীবনলাভ  
করিতে চায়, যদি জগতের সমুদ্রে কোন দিন একটা জাতি  
বলিয়া পরিচয় দিবার আশা করে, তাহা হইলে তাহাকে,  
ভারতীয় সভ্যতার গোড়া হইতে ইতিহাস রচনা আরম্ভ  
করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে ভারতবর্ষের কোন  
ধারাবাহিক ইতিহাস আছে কিনা। কিন্তু আমরা  
ভারতের সমস্ত লাইব্রেরীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও  
একথাটা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পাইব না। মুসলমান  
রাজবংশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাই।  
বর্তমান বৃটিশ ভারতের কোন ইতিহাস হইতে পারে না।  
যদিও অনেকে বৃটিশ ভারতের ইতিহাস হইতে পারে  
বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমাদের মতে পরাধীন  
দেশের ইতিহাস হইতে পারে না। তবে বৃটিশ ভারতের  
একটা ধারাবাহিক বিবরণ আমরা পাই। কিন্তু অতীত  
ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তবে আশ-

\* বিপ্লব কালীন স্ত্রীস্বত্বাধিকার বর্ধননে যেদ্বারা অন্তর্গত দেবপ্রদে মধ্যকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি-উৎসব-সভায় পঠিত।



কাল অনেক আলেকজেন্ডারের আক্রমণের সময় হইতে একটা সাধারণ ইতিহাস তৈয়ার করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। ভারতবর্ষ ধর্মের তীর্থক্ষেত্র। কত জাতীয়া লোক আসিয়া এই তীর্থক্ষেত্রে মিলিত হইয়া ধর্ম হইয়াছে—তাহার সংবাদ রাখে কে? এত জাতি, এত প্রকার লোক ভারতে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু কেহ তাহার বৈশিষ্ট্য রাখা করিতে পারে নাই। সকলেই ভারতীয় আদর্শে অণুপ্রাণিত হইয়া, একই উদ্দেশ্যে গা ঢালিয়া দিয়াছে। কেহই ভারতের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করে নাই। তাহাদের শিক্ষা-নীতি, সভ্যতা প্রভৃতির দ্বারা বহিস্থ হইয়া নাই। অশ্বমুখী হইয়াছিল। অশ্বমুখী সভ্যতাই ভারতের প্রধান বিশিষ্টতা। বাহিরের জগতের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না। বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বতে বসিয়া তাহারা জগতটাকে মনের ভিতর দেখিতে পাইত। তাহারা ছিল পশল, ঐহিক স্বপ্নকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কারণ ইহা কপিক। পারমিতিক স্বপ্নের জন্ত তাহারা নিষ্কর্মে বাস করিত—ইহা কেবল আনন্দময়। এই সচ্চিদানন্দ লাভের জন্যই ব্রহ্ম, প্রজ্ঞা, বাসিনী, ব্যাস, বুদ্ধ প্রভৃতি পাপলোক আমরা আদ্য আদ্যরূপে দেখিতে পাই। এই পারমিতিক স্বপ্নের জন্ত ব্রহ্ম, বিদ্যাশিখা প্রভৃতি রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অশোক রাজস্বয় পরিভ্রমণ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন। সত্য ছিল তাহাদের জীবন, এই সত্য পালনের জন্ত রামচন্দ্র, যুগিষ্ঠির প্রভৃতি অসীম স্পেহ সহ্য করিয়াছিলেন, এই সত্যের জন্ত বেদ, পুরাণ, ঐশ্বর্য, ভক্তি, ভগবৎ উদ্ভাবনের স্রষ্টা। তাহাদের নিকট ইতিহাসের কোন আবশ্যকতা লক্ষিত হয় নাই। ধর্ম ভিন্ন তাহাদের অস্ত কোন লক্ষ্যই ছিল না। মহারাজ অশোক, একটা ইতিহাস, না হয়, তাহার নিজের রাজস্ব সন্নিবেশ অনেক কিছু লিখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে দিকে লক্ষ্য না দিয়া পাহাড়পর্বতে, জুপে ধর্মের বাণী লিখিয়া গেলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতের বিশিষ্টতা রাখা করিতে হইবে এবং ভারতবর্ষ একটা দেশ, ইহা জগতের

নিকট উচ্চ পলায় বলিতে গেলে, ভারতবাসীর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তৈয়ার না করিয়া উপায় নাই। এই ইতিহাস রচনা করিতে হইলে ভারতবাসীকে অনেক কষ্ট করিতে হইবে। তাহারিগকে, যাঁহে মাঠে; বন-জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে; দুর্ভেদ্য পাহাড় হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে; নদ-নদীর অতলগর্ভে সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু ইহা করে কে? প্রথমতঃ ভারতবাসী পরাধীন, ইচ্ছামত কোন কাজ করিবার উপায় নাই; দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীর এ সংস্কৃতি রুচি নাই। কেবল এইটুকু করিলেই, ভারত-ইতিহাস হইবে না। আমাদিগকে যাইতে হইবে হিমালয়ের হিমশিখরে, বিষ্ণুপ্রদেশের বাগ-পদ-জল বনের ভিতর, মেগালয়ের জুয়ারাজ্য উপত্যকা, চীনের বৌদ্ধমঠে, আরবের ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীষ্মের প্রাচীন সমুদ্রে, মিশরের কুফা, সাসা, মেন্ফিস প্রভৃতি রাজ্যের নির্মিত পিরামিডে, লঙ্কার পর্বতময় বিষম অরণ্যে, নালান্দার মঠে, অজন্তার গিরিগুহায়। আমাদিগকে ছুঁব দিতে হইবে গদা সিদ্ধ নদীর ভিতর, আরব, পারস্য, বঙ্গোপসাগরের অতলগর্ভে। আমাদিগকে শিখিতে হইবে ভারতের সমস্ত ভাষা—পুরাণে ও নূতন এবং পড়িতে হইবে ইং সল ভাষার পুস্তক, শিলালিপি প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন চীন, মিশর, গ্রীষ্মের ভাষা লিখিতে হইবে এবং পড়িতে হইবে ইং সল ভাষায় লিখিত পুস্তকাবলী। এত কষ্ট করিলে হয় ত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তৈয়ার হইতে পারে।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস আলোচনার একটা অঙ্গ হইল, মিউজিয়াম। এই বিরাট ভারতবর্ষ একটা বিরাট মিউজিয়াম এখানে মিউজিয়ামের উপকরণের অভাব নাই। চারিদিকে বনে জঙ্গলে এখানে সেখানে যে সকল প্রাচীন কালের বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা সকলেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মাথায় করিয়া ধাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের লক্ষ্য গ্রহণ করিলে, তাহারা অনেক কিছু বলিবে। ঐ সকল বস্তু প্রাচীন ভারত ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। মিউজিয়াম যে কি অমূল্য বস্তু, ভারতবাসী আজও তাহা বুঝিতে পারে নাই। ইউরোপ মিউজিয়ামকে অমূল্য বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে।

এইজ্ঞত ইউরোপের সমস্ত জাতিই স্ব স্ব মিউজিয়ামকে বড় করিবার চেষ্টা করিলেন। ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাণকে মিউজিয়ামে লইয়া গিয়া অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়। যাহারা প্রযত্ন সহ্য করে মিউজিয়াম ভিন্ন তাহারা সে বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহারা ইতিহাস পড়ে তাহারিগকে মিউজিয়ামে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। মিউজিয়ামে এখন অনেকগুলি বস্তু আছে যাহা নাইবিলে ইতিহাসের, একটা দিক অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ত্রাঙ্গ দার্শনিক প্রকৃতি দেশের ছাত্রাণ যাহারা প্রাচীন মিশরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে, তাহাদের মিশরের ইতিহাস পড়া সমাপ্ত করিবার জন্ত নীতের সময় প্রবেশরূপণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যবে তাহারিগকে লইয়া মিশরের প্রধান মিউজিয়ামে আসেন। ভারতে এই প্রকার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের কোন ছাত্রকে প্রাচীন ভারতের কোন একটা মুদ্রিকে দেখাইয়া যদি বলা হয়, "বলত এটা কোন যুগের আর্ট?" সে হয় ত হাঁ করিয়া থাকিবে। তাহার আর্ট সংক্ষেপে কোন জ্ঞান নাই। আর্ট শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই বলিলেই চলে। ভারত-ইতিহাস তৈয়ার করিতে হইলে মিউজিয়ামের যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ভারতে যে কত মিউজিয়াম হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় মিউজিয়াম করিবার আবশ্যক করে না। বরাবর পাহাড়ে আপনি একটা প্রাকও মিউজিয়াম হইয়া রহিয়াছে। তদুপায় পাহাড়ের নিকটে বিহা নামক একখানা গ্রাম একটা মিউজিয়াম। এদ্রক পক্ষে মিউজিয়াম যে ভারতে আপনা হইতে হইয়াছে, তাহার খোজ রাখে কে? এই সমস্ত স্থান হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি।

আজ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের একখানা খাটি ইতিহাস রচিত হয় নাই। এ সংক্ষেপে যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই ইংরেজ। তাহারা অনেকেই নানা উপকরণ লইয়া ঘটাব্যাপী করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কেহই রুচিকার্য হইতে পানেন নাই। যতই দিন যাইতেছে,

ততই নূতন নূতন উপকরণ আবিষ্কার হইতেছে, ততই দিন দিন ইতিহাস বদলাইতেছে। এই সকল লেখকদের ইতিহাস সম্পূর্ণ নাই হইলেও যতদূর হইয়াছে তাহাও কম কথা নহে। তাহাদের অজ্ঞাত পরিচয় যে খাটি জিনিষটুকু বাহির হইয়াছে, তাহার জ্ঞান ভারতবাসিগণ তাহাদের নিকট চির-স্থায়ী নহে। আজকাল অনেকেই ইং সল ইংরেজ লেখক গণের পুস্তকের সাহায্যে নূতন নূতন পুস্তক লিখিতেছেন। যে সকল ইংরেজ লেখক প্রাচীন ভারত সংক্ষেপে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাদের নাম করিতে হইলে সর্গদেব রিস-ভেজিভের নাম করিতে হয়। তাহার পর শাহারা পুস্তক গ্রন্থন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ভেজিভ সাহেবের সাহায্য লইয়াছেন।

ভারতের ইতিহাস লিখিতে অনেক কষ্ট, অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। পরাধীন ভারতের পক্ষে বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে। এত অর্থবিদ্যা সংঘে আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ আমাদের সমুখে মস্তক দেখিতে পাই এবং যে সকল উপকরণ দ্বারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা চলিতেছে, আমরা এখন তাহারই একটু আলোচনা করিব। সে সকল উপকরণ আমরা পাই, সেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ চারি ভাগে ভাগ করিতে পারি:—

- ১। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও অজ্ঞাত পুস্তকাবলী।
- ২। শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা।
- ৩। বৈদেশিক আগন্তুকগণের লিখিত বিবরণ।
- ৪। বৈদেশিক শিল্পকলার সহিত ভারতীয় শিল্পকলার সামঞ্জস্য ও বৈদেশিক ইতিহাস।
- ৫। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আরম্ভ করিতে হইলে, আধ্যাত্মের ভারত আমান হাওয়াইয়া যাইতে হয়। আধ্যাত্ম এ দেশে আসিবার পূর্বে এ দেশে নানা জাতীয় অসভ্য লোকের বাস ছিল এবং আদিজ জাতি নামক এক প্রকার সভ্য লোকের বাসও ছিল। এই আদিজ জাতির সভ্যতা অনেক উন্নত ধরণের ছিল। অনেকে মতে এই আদিজ সভ্যতাই পুখিরি আদি সভ্যতা। আমরা আদিজ সভ্যতার কথা অনেক স্থানে দেখিতে পাই; কিন্তু ইতিহাস লিখিবার মত উপকরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।



আবিষ্কৃত্যভার পরই আমরা আৰ্যসভ্যতা ভারত-  
রক্ষকে দেখিতে পাই। আৰ্যগণ মধ্য এশিয়া-হইতে  
ভারতে প্রবেশ করে। তাহারা প্রথম সিদ্ধুদের ভূরে  
বসবাস আরম্ভ করে এবং এই স্থানই আৰ্যসভ্যতার  
কেন্দ্রস্থান। ভারতীয় প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ এখানেই  
রচনা হয়। ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ, সর্ব ভারতের  
আদি গ্রন্থ। এই বেদের ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃতই ভার-  
তের আদি ভাষা ধরিতে হইবে। সংস্কৃতের পরই বোধ  
হয়, সংস্কৃতের গর্ভে প্রাকৃতিক ভাষার জন্ম। প্রাকৃতিক  
ভাষার খুব কম পুস্তকই আছে। এই ভাষা সাধারণতঃ  
কথাবার্তার জন্য ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃতের পরই আমরা  
বেধিতে পাই পালী ভাষা। পালী ভাষার উৎপত্তি কিরূপে  
হইল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। বর্তমান সময় নানা-  
জাতীয় লোকের সমাগমের জন্য এই ভাষার ব্যুৎপত্তি হইয়া-  
ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস  
জানিতে হইলে, প্রাচীন যুগের নানা ভাষার সাহিত্য এবং  
অস্তিত্ব পুস্তকাবলী পড়িতে হইবে। এই সকল পুস্তক  
পড়িতে হইলে, সংস্কৃত, প্রাকৃতিক ভাষা এবং পালী ভাষা  
উপকরণ শিলালিপি পড়িবার জন্য সংস্কৃত ও পালী ভাষা  
শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক।

প্রাচীন যুগের ভাষাকে যেমন তিন ভাগে ভাগ করা  
যায়; ঐ সকল ভাষার লিখিত সাহিত্য এবং অস্তিত্ব পুস্তক-  
বলীও তেমনি তিন ভাগে ভাগ করা যায়:—হিন্দু সাহিত্য,  
বৌদ্ধ সাহিত্য এবং জৈন সাহিত্য। ঐ সকল সাহিত্যের  
প্রত্যেক গ্রন্থই কিছু না কিছু উপকরণ আদ্যাদিকে  
দিতোছে।

বেদ পুণ্ডরীক আদি গ্রন্থ। এই ধর্ম গ্রন্থের সম্যকমাত্রিক  
পুণ্ডরীক কোন ইতিহাসিক পুস্তক পাওয়া যায় না। এই

বেদে আমরা ইতিহাসের উপকরণ পাই। কৌটিল্যের  
মতে, বেদের এক অংশের নাম, ইতিহাস ভেদ। তিনি  
তাঁহার লিখিত অর্থশাস্ত্রে বেদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, “শাস-  
ন, শ্লোক এবং যজুর্বেদের রিবেদ বলা হয়। অর্থশাস্ত্র এবং  
ইতিহাস বেদের সহিত ইহাদের একত্র সংযোজন বেদ  
নামে অভিহিত।”—(কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—প্রথম খণ্ড;  
—তৃতীয় অধ্যায়)। বেদ হইতে আমরা প্রাচীন যুগের  
আচার-ব্যবহার, বিবাহাদি প্রভৃতি সামাজিক, অর্থ-  
নৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক বিষয় জানিতে পারি।  
এই সময় বিদ্যুৎ ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। ইহা ভিন্ন  
বেদে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ আছে তাহাও ইতিহাসের  
সহিত সংশ্লিষ্ট।

বেদের পরই পুরাণকে আমরা স্থান দিতে চাই।  
পুরাণ কোন যুগে রচনা হয়, তাহার সময় আর পণ্ডিত  
নির্ণয় হয় নাই। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন গুপ্তরাজ-  
কালে পুরাণ রচনা হয়। কিন্তু উহা ঠিক সিদ্ধান্ত নহে।  
কোন কোন পুরাণ গুপ্তরাজ্য কালে বা তাহার পরে  
লিখিত হইতে পারে, কিন্তু অনেক পুরাণই চন্দ্রগুপ্তের  
পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন।  
তিনি তাঁহার অর্থশাস্ত্রে পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন।  
পুরাণের বিষয়গুলি যে ইতিহাসিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট,  
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কৌটিল্যের মতে  
পুরাণই ইতিহাস। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের প্রথম  
খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, “পুরাণ ইতিবৃত্ত,  
আখ্যায়িকা, উল্লাসগণ, ধর্মশাস্ত্র, এবং অর্থশাস্ত্র ইতিহাস  
নামে কথিত হয়।” কৌটিল্যের লেখা হইতে আমরা  
ইহা বুঝিতে পারি যে, পুরাণ, আখ্যায়িকা, ইতিবৃত্ত সমস্তই  
ইতিহাস; ইতিহাস না হউক ইতিহাসিক ভিত্তির উপর  
প্রতিষ্ঠিত। (কমন্স:)



মহাত্মা গান্ধী

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চালন

## সত্যের পরীক্ষা

আমার সাহেবানার কথা

নিরামিষ ভোজনের প্রতি আমার আস্থা দিন দিন  
বর্ধিত হইয়াছে। সত্য সাহেবের পুস্তক পাঠে খাণ্ডিত  
স্বচ্ছন্দ অস্তিত্ব পুস্তক পড়িবার সুখ জন্মিল। নিরামিষ  
ভোজনে সখ্যকৃত যত বই পাওয়া যাইল আমি যে সময়ই  
পড়িয়া ফেলিলাম। তদন্থে Howard Williams  
(হাউয়ার্ড উইলিয়াম্) প্রণীত The Ethics of Diet  
(খাদ্য-নীতি) অস্তিত্ব। ইহা আদিস যুগ হইতে  
আধুনিককাল পর্যন্ত মানব জাতির ব্যক্তি সখ্যকৃত  
গবেষণামূলক তথ্যে পূর্ণ ছিল। পিথাগোরাস হইতে  
বীত এমন কি আধুনিককালের মহাত্মা গান্ধী সকলেই যে  
নিরামিষাশী ছিলেন তাহা ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে।  
ডাঃ মিলেদ এ্যানা কিংসফোর্ডের “খাদ্য সখ্যকৃত প্রকৃষ্ট  
পন্থা” নামক পুস্তকখানিও বেশ আনন্দপ্রদ। ডাঃ এলিন-  
সনের “বাস্য ও শরীরতত্ত্ব” স্বচ্ছন্দ রচনাটীও বেশ  
শিক্ষাপ্রদ। রোগীদের পথ্যাপান নিয়ন্ত্রণ করিয়া রোগ  
মুক্তির পন্থাও ইনি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। নিজে  
নিরামিষাশী বলিয়া তিনি রোগীদের জন্যও নিরামিষের  
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব পড়িয়া শুনিয়া এই ফল  
হইল যে, নিজের উপরে খাদ্যাদির পরীক্ষা করণ। আমার  
একটা দরকারী কাণ্ডের মধ্যে পাড়াইয়া গেল। প্রথমটা  
এই সকলের লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যের উন্নতি—কিন্তু উত্তর-  
কালে ইহা ধর্মমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু আমার সেই বন্ধু আমার সখ্যকৃত একবারেই

হাল ছাড়িয়া দেন নাই। আমার প্রতি গভীর মেহ,  
তাঁহাকে সর্বদাই মনে করাইয়া দিত যে আমি যদি  
বরাবরই মাংস খাইতে অস্বীকার করি তাহা হইলে  
কেবল যে আমি শারীরিক দুর্বলতায় কষ্ট পাইব তাহা  
নহে উপরন্তু আমি একেবারে একেজো ইহা গড়িব  
এবং ইংলণ্ডের সমাজে আমি হযত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে  
পারিব না। তাইপরে তিনি যখন তুলিলেন যে নিরামিষ  
ভোজনে সখ্যকৃত পুস্তকখানি আমি পাঠ করিতেছি তখন তাঁহার  
ভর হইল যে পাছে এই সব পড়িয়া শুনিয়া আমার মাথা  
খারাপ হইয়া যায় এবং নিজের পড়া-শুনা ছাড়িয়া আমি  
এইসব ব্যাপারে মাথা-পাগলার মত মতিভ্রান্তি উঠি।  
আমাকে বন্ধা করিবার জন্য তিনি একবার শেষ চেষ্টা  
করিতে কৃতসম্বল হইয়া আমাকে একদিন খিচরী  
দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থির হইল যে হবদ্র  
রেস্তোরাহ—জিষ্টোরিয়া হোটেল ছাড়িবার পর তাহা  
আমার চক্ষে প্রাসাদোপম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজনালয়  
বলিয়া বোধ হইয়াছিল—উভয়ে ভোজন সমাধা  
করিয়া অভিনয় দেখিতে যাই। জিষ্টোরিয়া  
হোটেল যে সামান্য কয়দিন ছিলাম তাহাতে আমি  
বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই কারণ  
সে সময় শিবিয়ার মত আমার মনও বুদ্ধি সত্যক ছিল  
না। বন্ধুর একটু চালাকী করিয়া এই বড় রেস্তোরাহ  
আমায় লইয়া গিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ ছিলেন যে আমি





লজ্জার সেখানে ঝাওয়ার সম্বন্ধ কোন আপত্তি তুলিতে পারিব না। একটা টেবলের দুই পাশে দুইজনে বসিলে, প্রথমে স্থপ (খোলা) বিয়া গেল; আমি মহা কাঁপরে পড়িলাম। স্থপটি যে কিসের স্থপ তাহা আমি জানিতাম না; সেইজন্য ভূতাকে (Waiter) ডাকিলাম—বন্ধুর ব্যাপার বুঝিয়া দাশন্য চটিয়া গিয়া বলিলেন “কি হয়েছে কি?” আমি আমার সন্ধেহের কথা বলিলে তিনি বলিলেন “তুমি ভুল সমাজের একান্ত অযোগ্য—যদি তোমার এখানে ঝাওয়া না পোয়ায় তুমি অল্প কোথাও ঘাইয়া আসিয়া হোটেলের বাহিরে আমার ভ্রত অপেক্ষা করিও” রাগ না লক্ষ্য; আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলাম কারণ নিকটেই একটা নিরাশ্রিত রেষ্টোরা ছিল বলিয়া আমি জানিতাম; কিন্তু এমন বরাত যে তাহা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাছে কাঁকেই সে সাজিত। আমায় উপবাসেই কাটাতে হইল। বন্ধুর সঙ্গে আমি খিচুইতে যাইলাম, কিন্তু খিচুই হোটেলের ব্যাপার লইয়া কোন কথা তুলেন নাই—আর আমারও কিছু বলিবার মুখ ছিল না। বন্ধুরের মধ্যে বিরোধের সন্ধান আমাদের এইবারই শেষ কিন্তু ভ্রত আমাদের বন্ধুত্বের পরে কোন বাধা জন্মায় নাই। আমাদের চিঠি ও কাগজের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে স্বেচ্ছা করিতাম কারণ আমি বুঝিয়াছিলাম এসকল সংঘর্ষের মূল ছিল আমার প্রতি তাহার অপরিসীম স্নেহ। সেই ভ্রতই আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে মনস্থ করিলাম এবং আমার নিরাশ্রিত ভোজন জনিত অস্বথ্যটুকু দূর করিবার জন্য সত্য সমাজোপযোগী অন্নাত্র ভৎসংকল্প লাভ করিয়া আমার জড়তা দূর করিব ইহা তাঁহাকে জানাইলাম। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আমি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম এবং পুরাদল্লের সাহেব হইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলাম। বোম্বাইয়ের প্রস্তুত পোষাক যাহা এতদিন আমি পরিত্যাগ করিয়া তাহা ইয়ারক সমাজের অঙ্গসমূহ ভাষিয়া আমি আশ্রিত নৈতিক হোরে হইতে নতুন পোষাক কিনিলাম এবং তখনকার দিনে যাহা উচ্চ মূল্য ছিল তাহা অর্থাৎ ১২ শিলিং ব্যয় করিয়া এক চিমনি-পটুপী বস্ত্র কিনিলাম। ইহাতেও প্রাণ তৃপ্তি হইল না; বসি টাউনের এক দোকান হইতে

দশ পাউন্ড রামের একছট সন্ধ্যা পোষাক কিনিয়া ফেলিলাম তখনকার দিনে বড় স্ট্রিট ফাসনের পীঠা স্থান ছিল। তারপর আমার মহৎ এবং উদার-দৃষ্টি ভ্রতাকে পোষাক একছড়া ডবল সেন পাঠাইতে লিখিলাম। তৈয়ার করা ‘টাই’ পরাটা সভ্য নীতি-বিগলিত ছিল বলিয়া আমি নিজে ‘টাই’ বাধিতে শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ঘেঁষে থাকিতে কেবল ঘোর কাগেরে দিনই আঘনা ব্যবহার করিতে পাইতাম কিন্তু এখন এখানে আসিয়া প্রত্যহ দর্পণের সমুখে পাড়াইয়া টাই বাধিতে ও টেরী কাটিতে দশ মিনিট সময় কাটাইয়া নিত্যম।

আমার চুল ছিল কড়া, হুতরাং সেই চুলকে ট্রিক কাধা মত বসাইয়া রাখিতে প্রত্যহ আমার নীতিমত লড়াই করিতে হইত। প্রত্যেকবার টুপী দ্বারা এবং পোষাকের সঙ্গে স্নেহই হাত বানি যেন কলে উঠিয়া চুলগুলিকে বিস্তৃত করিয়া দিত। এ ছাড়া সভ্য সমাজের উপযোগী অন্নাত্র বিবিধ অভ্যাসের হাত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। এতেও দুই না হইয়া পুরা ইংরাজ সাজিবার পক্ষে আবশ্যকীয় অন্নাত্র খুঁটিনাটির দিকেও মনোনিবেশ করিলাম। আমি জানিলাম যে এসকল ছাড়া, বৃত্ত শিক্ষা, আবৃত্তি শিক্ষা ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। ফরাসী ভাষা কেবল ফরাসী দেশের ভাষা নহে পরন্তু ইহা সমগ্র ইউরোপের সার্বজনীন ভাষা এবং সমস্ত ইউরোপ বেড়াইবার সখটীও আমান মনে খুব প্রবল ছিল। নাট শিবিবার ভ্রত আমি তিন পাউন্ড ব্যয় করিয়া এক নৃত্য শিক্ষালয়ের যোগদান করিলাম এবং ৩ সপ্তাহের মধ্যে ছয়টি শিক্ষা লইয়াছিলাম। কিন্তু পিয়ানোর বাজনার অঙ্গসমূহ করা বা লীলারিত হ্রস্ব ও গতি লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল কারণ তালের কোন জ্ঞান আমার ছিল না। খালি ভাবিতাম তাইত কি? ছেলেবেলায় উপকথায় শুনিয়াছিলাম যে এক সন্ন্যাসী ইউরোপ ভ্রমণের বরকত হইয়া একটা বিড়াল পুষিয়াছিলেন কিন্তু বিড়ালের দোকান কোথাইবার ভ্রত তাহাকে একটা গাভী পালন করিতে হইয়াছিল তৎপরে গাভীর লালন পালন ভ্রত তাহাকে লোক নিযুক্ত

করিতে হইয়াছিল। আমার উচ্চাশাও এই সন্ন্যাসীর সম্ভারের মত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মোটামুটি জ্ঞানলাভের জন্য আমার বেহালা বাঁধাইতে শিখা আবশ্যক, হুতরাং আমাকে বেহালা কিনিতে ৩ পাউন্ড ও শিবিবার ভ্রত আরও কিছু ব্যয় করিতে হইল। আবৃত্তি শিখাইবার জন্য আর একটা শিশিক খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং তাহাকেও এক গিনি দিতে হইল। তিনি বেলের Standard Elocutionist নামক পুস্তকখানি আমার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করিলেন এবং আমাকে উহা ক্রয় করিতে হইল। আমি পীঠের এক বক্তৃতা লইয়া আবৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করিলাম।

বেল সাহেব কিন্তু আমার কাগের গোড়ায় সাবধানতা-যুক্ত বিপদের ঘটা বাড়াইয়া দিলেন এবং আমিও যেন সজাগ হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম আমি তো ইংলণ্ডে আশ্রীত থাকিব না—হুতরাং আবৃত্তি শিবিবার কি আবশ্যক। আর তা’ছাড়া নাচাতে শিখিলেই যে আমি ভ্রত হইব তাহারই বা মানে কি? বেহালা যদি শিখিতেই হয়, ভারতবর্ষেও তো শিখা যাইতে পারে। আমি ছাত্র, আমার কর্তব্য পাড়াশুনা করা। বিচারালয়ের Inn-এ

যোগদান করিবার মত যোগ্যতা লাভ করাই আমার উচিত। যদি আমার চরিত্র আমাকে ভুললোক বলিয়া গণ্য করাইতে পারে ভালই, নতুবা আমার ভ্রত সাজিবার দুরাকাজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবে। এই সমস্তও অন্নাত্র আরও এই ধরণের ভাবনা আমার মাথায় বা চুকিয়াছিল সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমার আবৃত্তি-শিক্ষকের এক পত্র দিলাম ও তাহার নিকট অঙ্গসমূহ নৃত্তন। নৃত্য-শিক্ষকেরও ঐ মধ্যে এক পত্র দিলাম কিন্তু বেহালা-শিক্ষকটির সহিত নিজে যাইয়া সাক্ষাৎ করিলাম ও আমার বেহালাখানি যে কোন মূল্যে বেচিয়া দিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি আমার বন্ধুর মত খেতিতেন, সেইজন্য আমি কেমন খুশিলাম যে আমি ত্রাস্ত আদর্শের অঙ্গসমূহ চলিতেছিলাম সে সব কথা তাহাকে খুশিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে এই পরিবর্তন ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। এই সব ব্যতিক্রম উপভব মাস তিনেক ছিল, কিন্তু পোষাকের খুঁটিনাটি আরও কয়েক বৎসর ছিল কিন্তু অঙ্গসমূহ আমি ‘ছাত্র’ হইলাম অর্থাৎ পাঠে মন দিলাম।

(কম্পনঃ)

## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

লেখা, চৈত্র ১৩০২—আমরা এই নবীন সহযোগীকে সাহিত্যক্ষেত্রে সাগরে অভ্যর্থনা করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীশূলক্স মিত্র এ-এ, মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। লেখার প্রাণিস্থান—৪৩৩ দি ম্যাল অথবা ১৫৩৬ গোবিন্দ বোখাল লেন ভবানীপুর। বার্ষিক মূল্য ডাক মাস্তুলসহ ৩০ টাকা। আমরা ছুটি সংখ্যার পত্রিকা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে সহযোগীর ভবিষ্যৎ আশাশ্রয়। ছাপা ও কাগজ উত্তম মলাটের পরিকল্পনা বৈচিত্র্যময় এবং

চারু-কলা-জ্ঞানের পরিচায়ক। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধ-গুলি সু-নির্মীত। বৈদেশিক সাহিত্য হইতে অঙ্গসমূহ সাহায্যে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করা সহযোগীর অত্যন্ত উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সার্থক হইতেছে বলিয়াই মনে হইল। আধুনিক নাট্যশালার অভিনয় ও অভিনীত নাটকের সমালোচনা প্রচলিত মাসিকগুলির মধ্যে একমাত্র ইহারাই করিতেছেন। আমরা সহযোগীর সাক্ষ্য ও নীতিবান কান্দা করি।





### শ্রীকরিকর চট্টোপাধ্যায়

#### সভাশ

হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষীর হাতে কোটিধানি প্রদান করিয়া পূর্ণাত্ম অনিমেষ নান্দে তাঁহার শ্বশুর প্রতি চাহিয়া ছিলেন। জ্যোতিষীকে চিন্তাবিহীন দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আশঙ্কা হইল; পাছে এমন কিছু বদেন, যাহা শুনিতে তিনি সেখানে আসেন নাই। এই কথা মনে হইবার মাত্র, কল্পনা বায়ু গতিতে এমন সব কথা আনিয়া হাজির করিল যাহা শুনিতে তিনি কোন বিন প্রস্তুত ছিলেন না। কামির মকদ্দমার আসামী যেমন হাকিমের রায় শুনিবার সময় উদ্বেগ, উৎকর্ষা, আশঙ্কাপূর্ণ অন্তরে অপেক্ষা করিয়া থাকে, তিনিও জ্যোতিষীর মুখের কথা শুনিবার জন্ত তেমনই আগ্রহে তেমনই ব্যাবুল ভাবে, তেমন শক্তিত অন্তরে নিমিষ গুণিতে ছিলেন। হরেন্দ্র বাবু শত শত রোগীর গৃহের নিম্নরক্তা অশ্রুত করিয়াছেন, কিন্তু আত্মিকার নিম্নরক্তা কি ভীষণ! কি নিষ্ঠুর! সকলের দ্বন্দ্বের স্পন্দন যেন বাহিরের নিতুজতা বায়ুস্তরে প্রতিফলিত হইতেছিল।

এবার জ্যোতিষী তাঁকুর কাগজ কলম লইয়া আপন মনে অক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখে কোন কথা নাই। হরেন্দ্রবাবু বিমল যে সেখানে উপস্থিত

আছেন, তাহার অস্তিত্বও যেন তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। মত সময় ঘাইতে লাগিল হরেন্দ্রবাবুর উৎকর্ষা বাহুল্যতা যেন তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে জ্যোতিষী তাঁকুর নিঃশাস ফেলিয়া বলিলেন, “এখনি দেখছি বাঙ্গালীর মেয়ের কোটী। কিন্তু বাড়লায় লেখা না হইয়া সংস্কৃতে লেখা কেন!”

তখন আমার পক্ষিমে থাক্তাম সেজ্ঞ সংস্কৃতে রচিত বলিয়া হরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আগ্রহে ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার দেখা কি শেষ হইয়াছে?”

“হ্যাঁ, হয়েছে। অশ্রুত আমার দাম্য মত এবং জ্ঞান” বৃদ্ধি মত।”

“কেন দেখলেন?”

জ্যোতিষী তাঁকুর উত্তর করিলেন “এমন বিচির কোটী আর একখানিও দেখেছি বলে ত আমার স্বরণ হয় না। “আপনি কি জানতে চান বলুন।”

এইবার হরেন্দ্রবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি মনে মনে কত প্রশ্ন গুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, সে গুলি রেল-গাড়ীর বাজীর মত অগ্রে প্রবেশ করিবার আশার কেবল ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া কাহারও গাড়ীতে উঠা যেন অসম্ভব করিয়া তোলে। একেজেও তাহা হই ঘটিল, মনের দ্বারে বহু প্রশ্ন আগিল, কোন প্রশ্নটি যে আগে করিবেন, কোনটি

যে তারপর করিবেন তাহা ভাবিয়া তিনি অর্ধঘণ্টা হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতিষী বলিলেন “কি জানতে চান প্রশ্ন করুন?”

হরেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন “মেয়েটির পরমাণু কি রূপ দেখছেন?”

“পূর্বে বলেছি, এ রকম কোটী আমি আর কোন দেখি নাই। মেয়েটি নীর্ণায়া।

হরেন্দ্রবাবু “নীর্ণায়া” শুনিয়া দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিস্তার পাইলেন। এবং একটা স্বস্তির নিঃশাস ত্যাগ করিলেন। এবার কি জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন, দেখিয়া জ্যোতিষী তাঁকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়েটি কি আপনার কেউ হন?”

হরেন্দ্রবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বললেন এমন কোটী পূর্বে কখনও দেখেন নাই, এ কথার অর্থ কি?

জ্যোতিষী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “এই কল্পার গ্রহ সমাবেশ এমন আশ্চর্য জনক যে, পাঁচ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যুযোগ রহিয়াছে; কিন্তু তাহার ষোল বৎসর বয়সে স্থপাণ্ডে বিবাহ যোগ স্থানিত, কেহ তাহা যোগ করিতে পারিবে না। অপরূপ নয় কি?”

“উপস্থিত মেয়েটির বয়স কত হইল?”

“পূর্ণ ষোল। সামনের অগ্রহাষণ মাসে নিশ্চয় বিবাহ হবে।”

“মেয়েটি যদি পঞ্চম বর্ষে মারা গিয়া থাকে, তাহা হ’লে বিবাহ কেমন করে হতে পারে?” জিজ্ঞাসা করিয়া হরেন্দ্রবাবু জ্যোতিষীর মুখের প্রতি চাহিলেন।

এবার জ্যোতিষী তাঁকুর দৃষ্টিতে হরেন্দ্রবাবু মুখের প্রতি চাহিলেন। বলিলেন, “আমার সঙ্গে অগ্রহাষণ করে প্রতারণা করবেন না। কথা দ্বন্দ্ব শরীরে জীবিতা আছেন।”

দেখুন যদি আমার পরীক্ষা করা আপনার উদ্দেশ্য হয় সে স্বতন্ত্র কথা। আর সত্যই মেয়েটির বিষয় অরপত হওয়া আপনার প্রয়োজন হয় তা হ’লে আমার নিষ্ঠুর কোন কথাই গোপন করবেন না। এই কথাটির সম্বন্ধে জানিবার কোনোই দ্বন্দ্ব হইলে আমার বাড়ি নাই, সে কথা বলিতে পারি না।”

হরেন্দ্রবাবু জ্যোতিষীর কথার বাধ্য হইয়া বলিলেন, “আপনি কি বলছেন। সত্যই অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে আপনায় শরণাপন্ন হ’য়েছি।”

আমাকে আশ্বাস করবেন না!”

জ্যোতিষী হির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার আকৃতি দেখিয়া আর মেয়েটির কোটী দেখিলে, এই কল্পার পিতা যে আপনার নন, এমন কথাই মনে হইতেছে।”

এবার জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া হরেন্দ্রবাবু নির্ভীক বিশ্বাসে তত্ত্বিত হইয়া গেলেন। একটা আশাতীত আনন্দে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। নিবিড় ঘন অন্ধকার পথে দেবতার আলীন্দ্রের তায় আলো হস্তে কেহ আসিলে যেমন অবাক উজ্জ্বল সারা মন উজ্জ্বলিত হইয়া পড়ে তেমনই আজ এই কথা যে তাহার নয় এ কথা শুনিবার একটা অসম্ভব সত্যের আবিষ্কার যে আমার তাহা বুঝিয়া হরেন্দ্রবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি উত্তর করিলেন “এ কথা আমার নয়।”

জ্যোতিষীও বিপুল আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করে বলিলেন “এখন আমি আপনাকে সাহায্য করে কথা বিতে পারি যে, এই কল্পার কোটী ঠিক আছে। গণনাও আশা করি সব ঠিক হবে।”

“দেখুন পাঁচ বৎসরের সময় মেয়েটির মৃত্যুযোগ থাকে সন্দেহ এমন সুন্দর গ্রহতারা সমাবেশ হয়েছে যে মৃত্যুর মত সব হবে কিন্তু মরিবে না। নোকে মনে করিবে মারা গিয়াছে। কল্পাতি অত্যন্ত ভাগ্যবতী ও রূপবতী। শাস্ত্র-স্বীকৃত, ধর্মপারায়ণা বিদ্যুৎ হবে। মেয়েটির উপর এরূপ দম্ভা বড় একটা জন্মিতে দেখা যায় না। এই কল্পার যাহার সজিত বিবাহ হবে তিনি নিশ্চয় সৌভাগ্যবান এ কথা জোর করে বলতে পারি।”

হরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “এই মেয়েটি এখন কোথায়? বিবাহ হ’য়েছে কি না?”

জ্যোতিষী কি জানি মুহু হাসিয়া উত্তর করিলেন “মেয়েটির পাঁচ বৎসরের সময় যে মৃত্যু হ’য়েছে তাহা হ’তে এখন ছই সত্ত্বেও বিলম্ব আছে, লোকতন্ত্র মণ্ডলে মৃত্যু স্বপ্ন অজ্ঞাতস্বরূপ ছিন্ন করে প্রকাশ হ’তে।”

এবার হরেন্দ্রবাবু বিশ্বাস বিমুদ দৃষ্টিতে নির্ভীক হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ



হইতে আর একটিও কথা নিঃসৃত হইল না। তাহার স্বর্গীয় বন্ধু মহেন্দ্রাবাবু কেন যে জ্যোতিষের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তাহা বৃত্তিতে হরেন্দ্রাবাবু কিছু বাকি রহিল না। ইহা যে অদৃষ্ট দর্শনের উজ্জল দর্পণ বিশেষ, তাহা চিন্তা করিতে হর্ষে তাহার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া পদচুর্চি গ্রহণ করিলেন। তারপর আগা-গোড়া সমস্ত ঘটনা, জ্যোতিষীকে বলিলেন। তিনি হির হইয়া সকল কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। এক একবার কোণী বানির সঙ্গেও মিলাইয়া দেখিতে ছিলেন। শেষে বলিলেন “আপনার বন্ধু শ্রীতি সত্যই এ যুগে প্রশংসনীয়! ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।”

নিজ প্রশংসা শুনিয়া তিনি লজ্জায় মত্তক নত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা হলে মেয়েটিকে পাওয়া যাবে। বন্ধুর আকাজ্ঞা পূর্ণ হবে। জ্যোতিষে বিশ্বাসের ফল তিনি পাবেন।

“আজ হইতে পনের দিনের ভিতর এ কন্ডার সম্ভাবন পাবেন। তত দিন যদি এখানে থেকে যান তা হলে আমি অত্যন্ত শ্রীত হব। আর একটি অহরোপ, আমার অত্যন্ত ইচ্ছা এই কন্ডার বিবাহে আমি উপস্থিত থাকি। যাদের মেয়ে তাদের কাছে আমার এ প্রার্থনা জানাতে স্মরণ হবে না।”

“আশীর্বাদ করুন তেমন সৌভাগ্য যেন আমার হয়।”  
আমিবার সময় হরেন্দ্রাবাবু ২৫ টাকা দিয়া প্রণাম করিতে জ্যোতিষী কোন মতে টাকা নিতে রাজি হইল না। হরেন্দ্রাবাবু বলিলেন এ টাকা আপনার কাছে নয় মূল্য হিসাবে আমি দিচ্ছি না। এ আমার শ্রদ্ধার দান না গ্রহণ করলে, আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগবে। বলিতে বলিতে হরেন্দ্রাবাবু চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

জ্যোতিষী আর বাধা দিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন, শ্রদ্ধার দান কেবল দিব্যর মত ক্ষমতা আমার নাই। একটা কথা বলছিলাম, এ কোণী খানি যদি উপস্থিত রেখে যেতে আপত্তি না থাকে তা হলে আমার নিকট থাক। আর একটি ভাল করে দেখবার মত একটা জিনিষ আছে। এই মেয়ের বাহার সহিত বিবাহ হবে, তার প্রণয়ন করা হবে বিবাহের পূর্বে মেয়েটি। অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। এ সব বিষয় একটি ভাল করে দেখতে সময় লাগবে।”

“বেশ আপনি কোণী রেখে যান। আপনার দেখা হয়ে গেলে আমি এসে নিয়ে যাব’খন।”

তিনি বললেন, “আপনি বললেন মেয়েটির ভাই আজ বা কাল আসবে—যদি আসে তাকে একবার সঙ্গ করে নিয়ে আসবেন।”

“নিশ্চয় নিয়ে আসব। আজ আপনি আমাকে যেন নতুন জীবন দান করিলেন। এ ঋণ কোন দিন পরিশোধ করতে পারব না।”

“আগে মেয়েটিকে উদ্ধার কর তারপর ঋণের কথা। ঋণ আমার কাছে নয়, হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিকট—এ কথা ভুলবেন হবেন না।”

হরেন্দ্রাবাবু বলিলেন, “আপনি আজ আমার নতুন বেশ ফুটিয়ে দিলেন। আপনাকে কি বলে যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব খুঁজে পাচ্ছি না।”

“আমাকে যদি সত্যই আপনার কৃতজ্ঞতা জানাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে আমি অত্যন্ত স্বাধী ও আনন্দিত হব, শাস্ত্রের প্রতি যদি আপনার ঋণও বিশ্বাস থাকে—এর বেশী আশীর্বাদ করতে জানি না।”

তারপর বিয়ল ও হরেন্দ্রাবাবু অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সে দিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)



“কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের অসুস্থ সংবাদ অবশেষে বঙ্গবাসী মাঝেই বিতর্কিত হইয়াছেন। উপস্থিত তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ আছেন হৃদয়গ্রহণে কোন কারণ নাই। বিশ্বের চক্ষে ভারতবাসী আজ যে সামান্য একটু মর্ধ্যাণা পাইয়াছে তাহার মূল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাবই যে অধিক যে কথা আজ না বলিলেও চলে। ভগবান তাঁহাকে আরও কিছু কাল সুস্থ সল ও কর্মক্ষম রাখুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মেডিকেল কলেজের অন্ত্রোপচার বিভাগ হইতে কয়েকটা অল্প অপকৃত হওয়ায় বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ চৌধ্যপরাধের জ্ঞাত ছাত্রবৃন্দকে দারী করিয়া তাহাদের মনোহর ও আশ্চর্যমর্যাদা যে ভাবে স্মরণ করিয়াছেন তাহাতে কেবল হঠকাক্রান্ত ও অর্ধাঙ্গীনভার পরিত্যক্ত পাওয়া গিয়াছে। ছয় শত মর্ধ্যাহত ছাত্র একত্র কলেজের কার্যে যোগদান করা স্থগিত রাখিয়াছিলেন। ইহাতে রোগীদের অসহ্য অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ অপমান বিনা প্রতিবাদে পকেট করিতে আমরা বলিতে পারি না। শুনিলাম ছাত্রবৃন্দ এই ব্যাপারের প্রতিকারের আশায় নদীয়ার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যে উপদেশ বিনামূল্যে দান করিয়াছেন তাহা কোন আশ্চর্যমান-জ্ঞান-সম্পন্ন লোকে গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বিনা সর্ভে ছাত্রগণকে ঘাড় নীচু করিয়া কার্যে যোগ দান করিতে বলেন ও যথা সময়ে তাহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে এমন আশ্বাসও দেন। উক্ত পরে তিনি প্রতিজ্ঞিত, তিনি ধনী; হৃদয়গ্রহণের যে আশ্চর্যমর্যাদা থাকিতে পারে এবং তাহাতে আশ্রয় লাগিলে মর্ধ্যাহন যে বিস্তৃত হয় এ কথা উপলব্ধি করিতে তিনি পাবেন

না। উচ্চশিক্ষিত সমাজ যুবক মণ্ডলীর লগতে এক অজ্ঞানিত ব্যক্তির অপরাধের জ্ঞাত চৌধ্যপরাধের কলক কালিমা লেপিয়া দিয়া তাহাদিগকে কণ্ঠে যোগদান করিতে বলা কি কল হানে লবণ নিষেকের মত নহে। শুনিলাম কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বামন দাস মুখার্জির অহরোপে কতকগুলি ছাত্র গত মঙ্গলবার রাত্রে কার্যে যোগদান করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাক গভরমেন্ট এ সম্বন্ধে কি করেন!

এ না হয় সাহেবের অত্যাচার, তাহা তো বাঙালীকে মাফুই ভাবে না; তাদের যে আখ্যার আশ্রয়-সন্ধান জান আছে তা বলনাও করিতে পারে না কিন্তু এই মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের ভক্তার কে, যোগ নামক এক বাঙালী, অত্র এক চিকিৎসার্থী বাঙালীর উপর যে ব্যবহার করিয়াছেন তদা যাইতেছে তাহা মনে করিলেও লজ্জায় যুগ্ম মত্তক অবনত হইয়া পড়ে। চিকিৎসার্থীর নাম শ্রীকৃষ্ণ শৈলেন্দ্রনাথ চৌধ্যপাধ্যায়—ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের আলোক বিভাগের একজন পরীক্ষক কর্মচারী। গত ১ই মার্চ তারিখের রাত্রে তিনি পেটুল এট্রিনিউয়ে ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া আহত হন। ট্যাক্সির নং টি ৩০৪ সেই আহত অবস্থায় তিনি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার্থী উপনীত হন। তদা যথ্য যে ভক্তার বাব তখন কর্মচারী ও ছাত্রদের সহিত খোদগল্ল বস্তু ছিলেন। ভক্তলোকটি ক্ষমায় কাতর হইয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করায় তিনি তাঁহাকে মুদীপালের চাপারগা বসিয়া ব্যস্ত করেন ও শেষে একজন ছাত্র তাঁহাকে এই অবস্থার উপর মুদীপাঘাত করিয়া বিতাড়িত করেন। তিনি নিরুপায় হইয়া খ্রিস্টিয়ানের সাহায্য লয়েন। এক্ষণে খ্রিস্টিয়ানের ব্যবহার যে বাঙালী ভক্তার বা ছাত্রের ব্যবহারের চেয়ে



অনেক ভাল তাহা অধীকার করিবার উপায় নাই। সরকারী উক্ত পদ পাইলে বাঙ্গালীরা যদি স্বজাতীয়দের এইরূপ অবজ্ঞা করেন। তবে উক্ত পরামিতিত বিশেষণেরা যে বাঙ্গালীদের উপেক্ষা করিবেন তাহাতে চমৎকৃত হইবার কারণ নাই। এক্ষণে এই ঘটনা কতদূর সত্য ও সত্য হইলে এই ভাঙার ও সেই ছাত্রতীর প্রতী বাহাতে যোগ্য দত্ত বিধান হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ভাঙার বাবু সাধারণের পরমা বাইয়া সাধারণের উপর মেজাজ ধোঁয়াইতে যে সাহস করেন তাহার কারণ কি ?

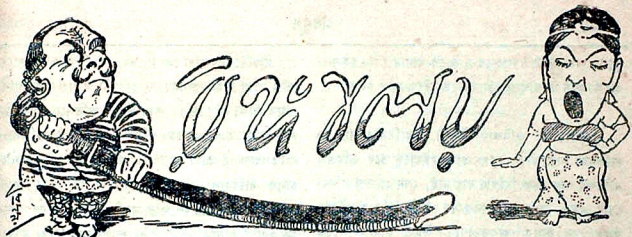
সে দিন মিঃ ক্যাম্পবেল ফরেষ্টারের বক্তৃতার সময় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত বাংলা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কুমার বাহাদুর সরকারী সভা মিঃ জেনারেলের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। একি হইল ? সে দিন যে সর্বশক্তিমান মহাপুরুষ নিজের পদমধ্যদা অশ্রু রাখিবার জন্ত স্বরাষ্ট্রদলের সহিত রীতিমত বাক্যুদ্ধ করিলেন—আজ তাঁহার সে শৌর্য অস্তরিত হইল কেন। সভাস্থলে তিনিই যে হস্তী কর্তা সেটা ফরেষ্টার সাহেবকে নিজে বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না কেন। বোধ হয় যেত চর্যের প্রভাবে তাঁহার সেই অকৃত্যেতা সাহস লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি জানিতেন যে সরকারী ও মনোনিীত সভায়ের সাহায্যে তিনি স্বরাষ্ট্রদলের পরাজিত করিয়াছিলেন এ ক্ষেত্রে সে সাহায্য চূড় হইবে। হুমার বৃদ্ধিমান তাই 'ক্ষেত্রে কথ' বিধীয়েত' নীতি অমর্যপ করিয়াছেন।

অন্তঃপ্রবর চক্রবর্তী মহাশয় বেঙ্গলীর শূত্র সিংহাসনের অবিসম্বাদী সম্রাট (বহুমতীর সৌভাগ্যে) ইয়াই উরুপত্তে বরাজ্য দলের বিকল্পে বিদ্যোদয়ীকরণ করিতেছেন। উত্তম। পূর্বে পূর্বে যে সব মহাপুরুষেরা মজীহ লাভ করিয়াছিলেন সকলেই স্বরাষ্ট্রদলের অঙ্গবিস্তার পালি পাড়িতেন এই লক্ষণ দেখিয়া আমাদের এক হোমিওপ্যাথিক বন্ধু বলিলেন যে এবার নির্ধাৎ মজীহ। হোমিওপ্যাথেরা রোগক্ষণ দেখিয়াই চিকিৎসা করেন বলিয়া সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা সত্য হইলে মনে হয় আমরা

শীঘ্র বেঙ্গলী-নারকে মজীহরূপে "হেরিয়া মনন করিব পার্থক্য।"

কোমাগাটা মাক ব্যাপারের নায়ক বাবা গুরদিত সিং কলিকাতায় আসিয়াছেন। স্থানিজে পার্কে তাঁহার সম্বন্ধনা হইয়া গিয়াছে। কার্যে দেশ সেবার পরিচয় তিনি যথেষ্ট বিদ্যাছেন এবং অবশিষ্ট জীবনটুকুও দেশের কাজেই তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন।

সহযোগী সন্ধ্যা (৮ই চৈত্র) লিখিয়াছেন সম্প্রতি মার্কিনকতলা অঞ্চলে এক নতুন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে। ইনি গৈরিকধারী নহেন; তাহা হইলে কি হয়—নির্মজ্জলা তন্ত্র পথের পথিক। সাধুর ক্ষমতাও অসাধারণ। কেহ তাঁহার কাছে যাইলে বলেন,—“এর সব বুঝি; তোকে আর কিছু বলতে হবে না।” তবে তিনি যে কি বুলিলেন তাহা আর কাহাকে বুঝাইতে বা ব্যক্ত করিতে চান না। শুনিতেছি, বড় বড় এটনি, বড় বড় ভাঙার ও কবিরাষ্ট্রদের ঘরের মেয়েরা এবং তাঁহাদের অল্পভক্ত স্বামীরাও সাধুকে স্বামী বা গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সাধুটির আরও একটা বিশেষত্ব এই,—কেহ ইহার কাছে যাইলে মজ না লইয়া তাঁহার আর কিরিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ যদি তিনি জীলোক হন বা স্ত্রী প্রকৃতি হন, তাহা হইলে ত কথাই নাই—তাঁহাকে মজ দিবেনই। আচ্ছা ইনিই কি এক বড় কবিরাষ্ট্রের বাবী হইতে বিভাজিত হইয়াছিলেন? যদি কেহ এই সাধুর বিবরণ দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাহা কাগজে ছাপাইয়া দিব। আজ্ঞাকাল হরেক রকম সাধু এবং স্বামী আনন্দ ইত্যাদি উপাধিধারী নিতুই নব সম্রাটের আবির্ভাব হইতেছে। ইহারের কীটিকাহিনী বুধের সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। নহিলে স্থল-মান বজায় রাখা বা টিকা ভায়া। আমাদের এই সংখ্যায় প্রকাশিত স্বপ্রসিদ্ধ উকীল ও সাহিত্যিক শ্রীমুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এম মহাপারের রচিত “তাপাচালক” নামক গল্পটা পাঠ করিলে অস্তুত সাধুদের লীলা কতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পারে তাহা বুঝা যাইবে। টীকা অনাবশ্যক।



গত শনিবার আমরা মিনার্ভার 'বাসাদী' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ে ও প্রোগ্রাম নৈপুণ্যে সম্প্রদায় মিনার্ভা তাঁহাদের পূর্ব-গৌরব অশ্রু রাখিতে পারিয়াছেন সেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রথম রাষ্ট্রের অভিনয়ে সাধারণতঃ যেমন অনেক দোষ ত্রুটি দেখা যায় ইহারদের অভিনয়ে তেমন দোষ ছিল না—যাহা ছিল তাহা স্বর এবং বিতীরা রজনীতে সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

উপকথায় হারাধনের দশটি ছেলের কথা শুনা যায় কিন্তু বাঙ্গালী নাটকের নায়ক নীনদাসের সাতটি ছেলে এবং সাতটি স্রবতার বিশেষ। প্রথমটি কোরাণী—দ্ব্যন্তে বাবুর আদর্শ, একটু আর্থট পান করেন—অভাব পড়িলে আকগান ব্যাক (কাবলীওয়ালা) হইতে টাকা ধার করিয়া কাপেরী করেন। দ্বিতীয়টি পালেওয়ানী বিজ্ঞা শিখিয়া গুণামী অবলম্বন করিয়াছে। তৃতীয়টি সর্দার সাধনার ময়—মজ্জিকা পানে স্থনিপুণ, গানে একেবারে তানসেন বলিলেই হয়। চতুর্থটি কবি—সংসারের দুঃখ পারিষ্যের অনেক উপরে বাসা, বাধিয়া থাকেন, বাজার হাইতে নারাজ, বৃদ্ধ বাগের স্বচ্ছ আরোহণ করিয়া আহারাদি করেন এবং সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া কাব্যমুগ্ধ রসসাধন করেন পঞ্চমটি অভিনেতা—হাত পা নাড়িতেই অভ্যস্ত, মুখে সর্দঙ্গী চুকট লাগিয়া আছে। ষষ্ঠী একাধারে গুণাস্তিক ও নাট্যকার আর কনিষ্ঠটি স্থল পালাইয়া এমোচার ক্রায়ে বন্ধিনা সান্ধিবার চেষ্টায় আছেন ও নাচের পা সান্ধিতেছেন—

এই সাতটি স্রবের ভরণ পোষণের জন্ত বৃদ্ধ নীনদাসকে বৃদ্ধবয়সেও ১০টার হাঙ্কিরা বজায় রাখিতে না খাইয়া অকিমে চুটিতে হয়। এ চিত্র বাড়লার ঘরে ঘরেই দেখা যায়। স্রবরাং আশা করা যায় বাঙালী রমক ইহা হইতে চিন্তার অনেক উপাধান সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

পুতক সখছে আপাততঃ আমরা কিছু বলিব না কারণ সে সখছে পতঙ্গ আলোচনা করাই আমাদের অভিপ্রায়। পুতকখানিকে মানিয়া লইলে অভিনয়ের দিকটা ভালই বলা চলে। স্বচ্ছবাবুর নীনদাস, তুলসীবাবুর কিরণ, অমিতী আশমানদের 'পদ্মরাগী' প্রভৃতি কয়েকটি ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল্পয়ের ভূমিকা যে ডর লোকটি অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহার অভিনয়ও আশাশ্রয়। 'রুক্ম'র ভূমিকার বিশেষ কিছু না থাকিলেও অভিনেত্রী তাহাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে পারিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কের শেষে যেখানে পদ্মার অভিনয় দর্শকের মঞ্চ স্পর্শ করিল—আত্মমধ্য্যার গৌরব-স্রোতে দর্শকের মন ভরিয়া গেল তখনই যবনিকা পড়িলেই ভাল হইত—কিন্তু সেখানে আবার ভিয়ারীকীর প্রবেশ ও 'কাদালী' করিয়া বাঙ্গালীকে কেন" ইত্যাদি সর্দার অত্যন্ত বেখাপ লাগিল। এ গানটি বাদ দিলে কোন ক্ষতি হইত বলিয়া বোধ হয় না।

অল্পয় চরিত্রের অভিনয় ভাল হইয়াছে বলা যাইতে পারে তবে অত খন্দর-প্রিয় ও প্রকৃত দেশহিতৈষীর পক্ষে



চুলের অমন ছুট ও বাহারের ছড়ি বে-মানান বোধ হইল—  
একে একটু উত্তেজিতো ভাবে দেখাইলে ভাল হইত।

ভিখারিগির ভূমিকায় শ্রীমতী স্বাধীনীর গান ও  
অভিনয় আশাতীত রকম ভাল হইয়াছে তবে চরিত্রটী  
নাটকের সবে ভাল মিশিয়া যায় নাই, যেন প্রকৃষ্ট বলিয়া  
বোধ হয়। দর্শককে, গানকে মিলি গান শুনাইবার  
জুই যেন ইহার অবতারণা। উন্নত সমাজ চিত্রে  
এককম চরিত্রের স্থান একালে আর নাই—তবে এ  
দেশের দর্শক স্বাধীনীর গান না শুনিতে পাইলে পথমা  
নিতো রাজী হইবে না। বলিয়াই যেন এ ব্যবস্থা হইয়াছে।  
গানের ভাব বা বাণীর মধ্যে প্রশংসার মত ছিল না  
থাকিলেও গায়িকার কণ্ঠ-মাধুর্যে সেগুলি যে খুবই  
স্বন্দর হইয়াছিল এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না।

যশেপ সেবিকা-গণকে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায়  
পাশ-প্রাচীরের সমুদায়ন হইতে দেওঘাটা কর্তৃপক্ষের স্থিতি-  
চনার কার্য হয় নাই; ওঁদের একটু চুপকান করিয়া দিলেই  
ভাল হইত কারণ এঁদের স্বরূপ দর্শককে বিরক্ত করিবার  
মতই বোধ হইল।

রামলোচনের অভিনয়ে কাঙ্ক্ষিত বাবু কৃতকার্য হইলেও  
কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই কারণ প্রকারের এ  
চরিত্রটিকে বেশ উজ্জল করিয়া তুলিতে পারেন নাই।  
নতুবা ইনি নূতন কিছু দেখাইতে পারিতেন বলিয়াই  
আমাদের বিবাস।

স্বন্দরদের ভূমিকায় ইছাবাবুর অভিনয় আমাদের  
ভাল লাগে নাই—এ অভিনয়ের মাঝে ইছাবাবুর ব্যক্তিত্বই  
বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়াছিল এবং তিনি যে স্বন্দরদের চরিত্রের  
মূলসুড়ুইয় ধরিতে পারেন নাই বা পরিবার চেষ্টা করেন  
নাই এমনটাই বোধ হইল। স্বন্দরদের জুরপ্রকৃতিও  
অর্থনৈতিকতার কিছুই তিনি দেখাইতে পারেন নাই তবে  
দৌড় খাপ করিয়াছিলেন বিস্তর, যেমন হাজারপাতিয়-  
কালে তিনি করিয়া থাকেন।

জীচরিত্রের মধ্যে লবলবতার অভিনয়ও আমাদের  
ভাল লাগে নাই—প্রথমতঃ এ চরিত্রটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক  
ভাবে আঁকা হইয়াছে। তার উপর অভিনয়ে প্রাণ ছিল  
না—তাহাতে যে একান্ত কৃত্রিম ও নেহাইই অভিনয়—  
প্রতিপদক্ষেপই তাহা প্রমাণিত করিতেছিল। রাধুনীকে  
চাবুক মারিবার মত সাহস আজকালের দিনে দেখান  
অসম্ভব। বিশেষতঃ শিক্ষিতা নারীর পক্ষে—কারণ বাংলার  
নিজেরা 'হৈসেলে' যাইতে বা সাংসারিক কাজ করিতে  
অক্ষম, তাহাদের পক্ষে চাকর বামনকে মেজাজ দেখান  
অসম্ভব—আজকালের রাধুনী চাকরগীরি করণ 'ওমর'  
তাহা গ্রহণকারি জানেন না। এ ছবি মিশ বঙ্গের  
পূর্বের স্তব্ধতা "Modern Day Bengal"এর ছবি  
বিশিষ্টা চালান যাইবে না।

আর অসহ্য লাগিয়াছিল ইহার পর্বে তেলি বৌর  
ছাকাকো—এসব জিনিস এত পুরাতন যে, এসব দেখাইয়া  
আজকালের দিনে একমাত্র বীভৎস ব্যতীত অস্ত্র রস  
সৃষ্টি করা অসম্ভব।

সাধারণতঃ সামাজিক নাটকের দৃশ্যপট লইয়া তেমন  
মাথা ঘামান হয় না। এ সম্বন্ধে প্রফুল্লের পুনরভিনয়ে  
ষ্টার থিয়েটার সামান্য কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন—তৎপরে  
চিরকুমার সভার অভিনয়ে উহা অনেক পরিমাণে উন্নত  
হইল। মিনার্ভার প্রবেশকর্তা বাঙ্গালী নাটকেও কিছু  
নূতন দেখাইবার জুই চেষ্টা করিয়াছেন এবং একটা নূতন  
সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যবিত্ত  
গৃহস্থর বাটার দৃশ্য পরিকল্পনা বেশ একটু মৌলিকের  
পরিচয় পাওয়া গেল।

স্বন্দরদের অস্তঃপুরস্থ উজ্জ্বল দৃশ্যপটখানিও আধু-  
নিকতম ধনী গৃহেই উজ্জল প্রতিক্ষি।

স্বন্দরদের বাটার দৃশ্যপটখানিও বেশ স্বন্দর হইয়াছে  
তবে আসবাব পত্রের মধ্যে Chair Couch আদ্য প্রভৃতি  
আঁকিয়া দেখাইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হইত  
কারণ ওগুলি আজকালের দর্শকের যনোন্নত করিতে  
পারে না।

রঙ্গা থিয়েটার আবার শিল্পই নাকি তাহার দ্বার  
উন্মোচন করিবে। এবারে বাটার মালিক নিজেই নাকি  
থিয়েটারটি চালাইবেন। শিবরাত্রির সলিতার মত ভিজ-  
প্রদর্শন ব্যবস্থাকে বাঙ্গালীর এই একটীমাত্র প্রতিষ্ঠান যেদিন  
দর্শকের সম্মুখস্থিত হইয়াছে তাহার দ্বার কক্ষ করিতে বাধ্য  
হইয়াছিল সেদিন আমরা সত্যই মধ্যস্থিত বাধ্য পাইয়া-  
ছিলাম। বিদেশী পাণী আসিয়া কলিকাতায় বাজড়ার  
জালের মত বায়ুস্রোত প্রদর্শনী গৃহে ভরিয়া নিতেছে—দুই  
হাতে পয়সা লুটতেছে অথচ কাঙ্গালীর একটীমাত্র বায়ুস্রোত  
অল হল কেন? অথচ এই রমায় বিভাঙ্কর, আঁপারে  
আলো, মানভঙ্গন, চন্দ্রমা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যী কিছু  
দেখান হইয়াছে। ভবানীপুরের অধিবাসীরা সকলেই  
নিশ্চিত ও সমগ্র ভাষার কর্তব্য রঙ্গা থিয়েটারকে আর  
যাহাতে ভবিষ্যতে দ্বার কক্ষ করিতে না হয় তৎসম্বন্ধে  
তত্বদান হওয়া। ভগবান ইহাদের উত্তমকে লাফলা ও  
সার্থকতা মণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার মুখ রঙ্গা  
করুন।

ভাড়ুড়ী সম্প্রদায় এবার কর্ণওয়ালিস রুমকে দেখা  
দিবেন বলিয়া আশা হইতেছে। এখানে বিভাবিনোদের  
'কর্ণ' ও গিরিশ বাবুর 'পাওবের অজ্ঞাতবাস' লইয়া  
অভিনয় আরম্ভ হইবে। ভাড়ুড়ী মহাশয়কে কোণাও  
স্বাস্থ্য হইতে দেখিলেই আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ  
করিব।

আট থিয়েটারের কর্ত্তব্যও রবীন্দ্রনাথের একখানি  
গীতিনাট্য ও একখানি নাটকে হাত লাগাইয়াছেন। প্রথম  
গানির নাম 'মায়ার খেলা' আর শেষেরখানি 'শেষবোধ'  
পুরের মত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বরেন ও গগনেন্দ্র-  
নাথ ঠাকুর মহাশয় দৃশ্যপটখানি পরিকল্পনার ভার লইবেন  
বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ষ্টার থিয়েটার আবার চন্দ্রশেখর অভিনয় আরম্ভ  
করেন। ভূমিকালিপি কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে।  
আলাভ সুরিসের ভূমিকা লইয়াছেন নাট্য-মন্দিরের

তৃত্যপূর্ণ জটিনেতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পুনর্জন্মে  
'দায়ব' ও শীতায় 'শব্দক' এই দুইটি ভূমিকায় অল্প দিনের  
মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকায় প্রফুল্ল বাবুর অভিনয়ও আমাদের  
খুব ভাল লাগিল—তাড়াছাড়া একে প্রতাপের ভূমিকায়  
চমকায় মানাইয়াছিল। এতদিন একে এই ভূমিকাত্তি  
না নামাইয়াছিল কি কারণ ছিল জানি না তবে প্রথমেই  
একে 'প্রতাপের' ভূমিকা দিলে বোধহয় অভিনয় আরও  
বেশী জমিত।

আগামী ২রা এপ্রিল গুডফ্রাইডের দিন সম্ভ্য ১০-টা  
মিঃ থিয়েটার সম্প্রদায় শ্রীদুর্গা নাটকের অভিনয় আরম্ভ  
করিবেন এবং উপর্যুপরি চারি রাত্রি অভিনয় চলিবে।  
রবি ও সোমবার দুই দিনই ম্যাটিনী অভিনয় হইবে।  
মহামায়ার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তারাহন্দরী ও মহিষাসুরের  
ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহড়ী দর্শকসম্মুখে অভিনয়  
করিবেন। শ্রীমতী হুহু হুহা কামকলার ভূমিকায়  
এক অপূর্ণ নৃত্যকলা দেখাইবেন বলিয়া আশাস পাওয়া  
গিয়াছে। নৃত্যকলার এক সময়ে তিনি অধিতীয়া ছিলেন  
সুতরাং তাহার নিকট নূতন কিছু প্রত্যাশা করা চলে।

শ্রীদুর্গার দৃশ্যপট পরিকল্পনার ভার লইয়াছেন মিনার্ভার  
শিল্পী পরেশ বাবু। আধুনিক যুগোপযোগী দৃশ্যপট স্বরূপে  
পরেণ বাবু স্থান অর্জন করিয়াছেন সুতরাং দৃশ্যপটখানি  
যে মনোজ্ঞ হইবে তাহা পূর্বেই বলা যাইতে পারে।

রঙ্গমঞ্চের আশংক্যসমূহা সন্তান করিয়া, রঙ্গালয়ের  
অভিনব প্রদান করিয়া ইহার আলোককে মাজিত-  
কৃতি দর্শকের যোগ্য করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।  
পাণী-পঙ্কজের প্রাথমিক দ্রুত হইলে আলোকে রঙ্গমঞ্চ  
অজ্ঞাত রঙ্গমঞ্চাংশে যে আরামপ্রদ হইবে তাহা বলা  
যায়।

ব্যবসায়ী থিয়েটারে সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বল্প নাট্যকলা-



সমত অভিন্ন করা নানা কারণে অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে—তন্মধ্যে প্রধান কারণ দর্শকভাষা। যে শ্রেণীর দর্শক থিয়েটারের জীবন স্বপ্ন, তাঁহারা এখনও এসব নাটকের রস গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন নাই। তাঁহারা চান নিতা নৃতন ছন্দের নাচ, নৃতন সুরের গান, ভ্রমকালো দৃশ্যপট আর সাজা পোষাকের বটী—সুতরাং আধুনিক উন্নত নাটকের অভিনয় করিতে হইলে অর্থাগমের আশা ত্যাগ না করা ভিন্ন অস্ত্র উপায় নাই।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্ত কয়েকজন নাট্যরসিক মিলিয়া “রূপছত্র” নাম দিয়া এক সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে যে কোন সাধারণ রস-

মঞ্চের অভিনেতা বা অভিনেত্রী যোগদান করিতে পারিবেন—তন্নিবন্ধি বাহিরের অনেক সৌখীন অভিনেতাও ইহাতে থাকিবেন। এইরূপ একটা সম্মেলন প্রতিষ্ঠায় অনেকগুলি রসিকের একত্রে মেলানেশার সুবিধা হইবে ফলে অনেক উন্নত আধুনিক নাটকের অভিনয় সম্ভব হইবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যকা হইতেছেন ঠার থিয়েটারের শ্রীকান্ত অহীজ চৌধুরী, শিল্পী চাকচন্দ্র প্রভৃতি। উপস্থিত কবীজ রবীন্দ্র নাথের “মুকুন্দরা” অভিনয়ের আয়োজন করিতেছেন। তাহাদের এই চেষ্টা যে সত্যই Art for arts sake তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন—সুতরাং এ চেষ্টার সহিত প্রত্যেক নাট্যমোদীর সহায়ত্বিত্তি ও শুভ কামনা যে বিজড়িত থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

## নিবেদন

### শ্রীসরনীলা বসু

শিশির ভাঙ্তী মহাশয়ের নীতা অভিনয়েক উপলক্ষ্য করে শ্রীর বসুসরনীলা ধামে শিল্পিত বাঙ্গালী ভঙ্গলকরণ যে কবির লড়াই শুরু করেন সে সংক্ষেপে দু'চার কথা না লিখে থাকতে পারলাম না, কেন না আমিও একজন প্রবাসিনী বাঙ্গালী। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মিলন বা বিসদায়া ছুঁএর ভাল সময় মাঝে আবারও একটা অংশের দাবী রাখা সম্ভব মনে করি।

বিশ্লিষ্ট ভাবে কোন কথাই আমি আলোচনা কর্তে চাই না, শুধু নিরাপদ ভাবে কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই। অভিনয়ের সমালোচনা নিয়ে প্রথমে ব্যাণ্ডারটির ঘটনা, তারপর দুই পক্ষ পরস্পরকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছেন। একপক্ষ প্রথম চাবুক নামে কাগজ বেরবের ভিত্তে কবিতার গালমন্দ দিয়ে সেই কাগজ দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে সবার মধ্যে একটা তরঙ্গ তুলেছেন অপর পক্ষ ভঙ্গলপাণ্ডা ‘বুদ্ধেতা’ নামে কাগজ বার করে তাতে খুব উত্তর কাটা কাটা করেছেন। এটা কি সেই আগের দিনের গ্রাম্য কবির লড়াইওরই পুনরাবৃত্তি? তারপর এক পক্ষ যে অপর পক্ষের মূর্তা স্তোদের পর্যন্ত উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন এবং কীর্তিগীতিকোষ লক্ষ্য কর্তে হাডেন মিল এর অর্থ কি? বাঙ্গালীর বীরত্ব বা গৌরবের কি এই পরিচয়? উভয় পক্ষই শিল্পিত ভঙ্গল সন্ধান, সাহিত্যদোষেরও দাবী রাখেন, তার উত্তর তাঁরা প্রবাসী বাঙ্গালী, পশ্চিমবাসীরা তাঁদের

এই গৃহবিবাদ দেখে ভাববেই বা কি বলবেই বা কি? আমাদের দেশবাসীরা বলে থাকেন ভারতবাসী নারীকে খুব শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে পূজা করে এসেছেন—

নারী যেখানে পূজা পান না সেহতা তথায় বাস করিত না ইত্যাদি শ্লোক শাস্ত্রে গীতা আছে, এবং এটাও সত্যি কথা—নারীর শ্রেষ্ঠ সম্মান যে মাতৃর ভা ভারত নারীকে চিরকাল দিয়ে আসচে যা অস্ত্র দেশে কখনও ভাঙ্গি না, ভারতের প্রত্যেক নারীরই অপরিসীমর কাছে সম্মান য়া—সেই মাকে কিন্তু ভারতবাসীরা যতটা মানেন তা এই লড়াই স্বগড়ার মুখেই টের পাওয়া যায়, হায় রে গোলাঘের জাতি, এ না হলে তোমাদের এতো অধঃপতন। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটা কাটা যা করবার তা কর না কেন, তার মাঝে অস্ত্রপুত্রিকাদের টেনে আনবার কি দরকার? এ না হলে আর দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালীর ঘরের ঘরের ইচ্ছা তিন সন্ধ্যা নষ্ট হয়? বাঙ্গালী খবরের কাগজে তাই পড়ে, কাগজগে শোনে, বৈঠকধানায় বসে আলোচনা করে, রেখে ভনে কি বলতে ইচ্ছে হয় না এরা পুরুষ নয় স্ত্রীকেই দল?

দেশের এই দুঃখ দুর্দিনের দিনে বাঙ্গালীর কি কণ্ডা করবার সময়, এ কথাটা বুঝেও কি তাঁরা বুঝবেন না? বড় দুঃখে না হ'লে, বোঁনু হয়ে এই কথাগুলি বলতে হোলে।



বিতীয় বর্ষ]

২০শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩২, ইং ৩রা এপ্রিল ১৯১৬

[ ৩৩শ সংখ্যা ]

## কয়টি তারিখ\*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, দি-আই-ই

আমরা অনেক দিন দরিয়া বাঙ্গালা ও তিরহতের ইতিহাসের আলোচনা করিতেছি; কিন্তু গুটিকতক তারিখের জন্ত আমাদের সব আলোচনা বুঝা হইয়া যাইতেছে। তারিখটি হইল ইতিহাসের নম্বর। তারিখ না থাকিলে বিনা নম্বরে নৌকায় মত ইতিহাস যে কখন কোন দিকে ভাসিয়া যায়, তাহা ঠিক করা যায় না। তাই আজ আমি কতকগুলি তারিখের আলোচনা করিব।

প্রথম তারিখ রাজা গণেশ কোন্ বৎসর রাজা হন। এতদিন ইহার কিছুই ঠিক ছিল না। মুসলমানদের ইতিহাস হইতে ইহার ঠিক হয় নাই। রিখা-জু-নালা-তিনে ইহার নির্ণয় হয় নাই। মুসলমানী সিদ্ধা হইতেও ইহা ঠিক হয় নাই। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় একটা বাঙ্গালা অক্ষরের দিকা হইতে ঠিক করিয়াছিলেন, রাজা গণেশ ১৪১১ ইসবীতে রাজা হন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে রাজা গণেশের নাম নাই, নাম আছে দহজমর্দন দেবের, তিনি বলেন, দহজমর্দন দেবই গণেশ। সিদ্ধাটী গোড়ের টাকশালে ছাপা হয়। দহজমর্দন যে গণেশ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আরও অনেকে নানাকল্প করনা-

জ্ঞান করিয়াছেন, কিন্তু লোকের মন তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই।

সম্প্রতি শ্রীহর-নিবাসী বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় ‘বাঙ্গালীনাট্য’ নামে একখানি বই ছাপিয়াছেন। ইহাতে অমৈত্র আচার্য প্রভুর বাঙ্গালীলার বর্ণনা আছে। গ্রন্থকার লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। শ্রীহরদেশে লাউড় নামে একটা ছোট রাজ্য ছিল। কৃষ্ণদাস সেখানকার রাজা ছিলেন। অমৈত্রের পিতা কুবের পণ্ডিত সে রাজ্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজ্যের ঘোর শাস্ত্র, আর কুবেরের পুত্র কল্যাণ ঘোর বৈষ্ণব। রাজ্যের সহিত তাহার মনোবিবাদ হয়। অমৈত্র আশিয়া শাস্তিপুত্র বাস করেন। কৃষ্ণদাসও পরে বৈষ্ণব হইয়া শাস্তিপুত্রের অমৈত্রের বাড়ীর নিকট বাস করেন এবং শেষ বয়সে ‘বাঙ্গালীনাট্য’ বলিয়া একখানি সংস্কৃত বই লিখেন। অনেক কষ্টে শ্রীমান অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় সেই বইখানি সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন। বাঙ্গালীনাট্যগ্রন্থটির রচনার কাল ১৪৮৭ ইসবী অথবা ১৪৯২ শক। তখন অমৈত্র আচার্যের বয়স তিন্ময় বৎসর। অর্থাৎ তিনি জন্মান ১৪৩৪ ইসবীতে বা ১৪৬৬ শকে।

\* বৈষ্ণবী সাহিত্য-সঙ্কলনের ইতিহাস শাখার পণ্ডিত।



অষ্টম মহাপ্রভু শিভাঘাট নাউড়িয়া নরসিং রাজা গণেশের স্ত্রী ছিলেন; তাঁহারই নীতি অনুসারে চলিয়া রাজা গণেশ মুসলমানদিগের বাহালা রাজা অধিকার করিয়াছিলেন। নাউড়িয়া কুমুদাস সে রাজা অধিকারের তারিখ দিয়াছেন ১৩৩৩ শক অর্থাৎ ১৪১১ ইস্বী। কুমুদাসকে এ বিষয়ে অধিকার করিবার কোন কারণ নাই। তিনি তখন অতি প্রাচীন, নিজে রাজা ছিলেন, স্বতরাং সন তারিখ মনে থাকা খুবই সম্ভব। তিনি যে নরসিং, হুসেন ও অষ্টম তিন জনকেই দেখিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

স্বতরাং বাহালায় একটা প্রধান ঘটনার সন, তারিখ এখানে পাওয়া গেল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অষ্টমের জন্ম-তারিখ ও কুমুদাসের এই লেখার তারিখও পাওয়া গেল।

ত্রি- এই সময়ে তিরহত রাজ্যেরও দুই-একটা সন তারিখ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে বিভাগপত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার একটাতে শিব সিংহের রাজ্যাভিষেকের তারিখ দেওয়া আছে। তারিখটিতে হুইল্লু সন দেওয়া আছে। এক লক্ষ্মণসেন-সম্বৎ, আর তাঁহারই শক। শক নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ১৩২৪। কিন্তু সেটা ২২ হইবে না, ২৭ হইবে। কারণ নগেন্দ্রনাথ প্রাচীন রীতি অনুসারে সম্বৎকে ৪ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে উহা অনেক দিন হইতে ৭ হইয়াছে। বাহালায় পাঠ্যলগ্নে পরিচালিত, উহারাই জানেন, এক চক্র, দুই গণ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পঞ্চাশ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্টবহু, নয় নগর, দশে দিক্। স্বতরাং আমাদের দেশে সম্বৎ ৭, কাছের নগেন্দ্রবাবুর ১৩২৪—১৩২৭ হইবে। ২৭ হইলেই লক্ষ্মণসেনের সঠিক মিল হয়, নইলে ৩৪ বৎসরের তফাৎ হইয়া পড়ে। ১৩২৭ শক হইলেই ইস্বী ১৪০৫ হয়। শিব সিংহই বিভাগপত্রিক রাজপণ্ডিত নিযুক্ত করেন ও তাঁহাকে বিদ্যাপী নামক গ্রাম দান করেন।

কিন্তু শিবসিংহ যে বংশের রাজা, সেই ঐকী বংশের ইতিহাস বিভাগপত্রী কর্তৃক নামক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত লোকে জানে, ঐকী বংশের প্রথম রাজা কামেশ্বর, তারপর ভোগেশ্বর, তারপর বীরসিংহ ও

কীর্ত্তিসিংহ, তাহার পর ভবেন্দ্র, দেবসিংহ ও তাহার পর দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ, এ কথাগুলি ঠিক নয়। কীর্ত্তিনাথ কামেশ্বরের প্রথম রাজা বলে, দ্বিতীয় রাজা ভোগেশ্বর, তৃতীয় রাজা ভোগেশ্বরের পুত্র গণেশ্বর বা গণেশ্বর। গুণেশ্বর ২৫৩ লক্ষ্মণসিংহ অর্থাৎ ১৩৬৭ ইস্বীতে অশ্বলান নামক একজন মুসলমানকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরে সে বিধাখণ্ডাকতা করিয়া গণেশ্বরের পাশে বসিয়া তাকে মারিয়া ফেলিয়া তিরহত রাজ্য দখল করিয়া লয়। পুত্রসন দখল করিয়া রাখে, জানা যায় নাই। গণেশ্বরের পুত্র কীর্ত্তিসিংহ পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য জোয়ান-পুরের হুলতান ইব্রাহিম সাহের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া অশ্বলানকে তাড়াইয়া দিয়া পিতৃরাজ্য দখল করেন। অশ্বলান তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। ইব্রাহিম সাহ ইস্বী ১৪০০ সালে জোয়ানপুরের হুলতান হন এবং যখন কীর্ত্তিসিংহ উপস্থিত, তখন তিনি বলিতেছেন, ইনি সকলের উপর, ইহার উপরে কেবল ভগবান। স্বতরাং ইব্রাহিম যে জোয়ানপুরের স্বাধীন রাজা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জোয়ানপুর নগর দ্বিতীয় হুলতান ফিরোজ সাহের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিরোজ সাহের যুগা মামুদ ভোগেশ্বরের আসল নাম ছিল জোনাপা। তাঁহার নামেই নগরের নাম হয়। ফিরোজ সাহের রাজত্বকালেই দ্বিতীয় রাজা দুই ভাগ হয়, পূর্ব ও পশ্চিম। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী জোনাপুর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী দিল্লী। ১৩৩৪ সালে খোজা জাহান জোনাপুরের শাসনকর্তা হইয়া আসেন। ১৩৩৮ ইস্বীতে তৈমুরজ্ঞ আসিয়া দিল্লী লুণ্ঠ করিলে দিল্লীর সাম্রাজ্য ক্ষয় হয়। তখন খোজা জাহান আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করেন। তিনি খোজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রবধূ ছিল না। তিনি মোবারক নামক তাঁহার এক প্রিয় পাত্রকে হুলতানী দান করিয়া যান। মোবারকও এক বৎসরের অধিক বাসেন নাই। তিনি মরিলে, তাঁহার ভাই ইব্রাহিম জোয়ানপুরের হুলতান হন। এই ইব্রাহিমের নিকটই কীর্ত্তিসিংহ সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্বতরাং ইব্রাহিম ১৪০০ সালের পূর্বেই হইতে

পারে না এবং ১৪০৫ সালে শিবসিংহ রাজা হন; স্বতরাং তার পরেও হইতে পারে না। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কীর্ত্তিসিংহ ঐকী বংশের রাজা পুনরুদ্ধার করেন ও তথায় হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিসিংহ, ভবেন্দ্র, দেবসিংহ ও শিবসিংহ চারিজন রাজা কিরূপে হন বৃত্তিতে পরিতেছি না। বোধ হয় বংশলতায় বংশের সকলকে “রাজা” বলিয়াছেন। যাহা হউক, ঐকী ঠিক যে ১৪১১ সালে রাজা গণেশ বাহালায় মুসলমান পরাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন; আর ঠিক সেই সময়েই কীর্ত্তিসিংহ তিরহতে হিন্দুরাজ্য পুনঃ স্থাপন করেন।

দুই জায়গায় এই সময় হইতে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার খুব ঐক্যি হয়। তিরহতে এক বিভাগপত্রী উদ্ভেদ-ই ঐক্যি করে। তিনি মৈথিল ভাষায় গান লিখিতেন, বই লিখিতেন, সংস্কৃত ভাষায়ও বই লিখিতেন। তিনি রাজ্যের একজন প্রধান প্রধান ছিলেন। তিনি কতলায় বাটয়াছিলেন, বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ১০০ বৎসরের উপর বাটয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নগেন্দ্র-বাবুর পুস্তক হইতে তাঁহার জীবনকাল স্থির করিতে হইলে, বড়ই মুশ্কিল হয়। তাঁহার ১১ গানে ভোগেশ্বরের ভণিতা আছে। তাহা অঙ্কিত ১৩৬৩ সালের পূর্বে। কারণ ঐ সালে ভোগেশ্বরের পুত্র রাজা গণেশ্বর অশ্বলানকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আর ১১ গানে নয়ং সাহের ভণিতা আছে। নগেন্দ্রবাবু বলেন, নয়ং সা বাহালায়

হুলতান হসেন সাহের পুত্র। ইনি ১৪২১ সালে রাজা হন ও ১৪৩১ সালেই মরেন, তাহা হইলে ১৭০ বৎসর ধরিয়া বিভাগপত্রী ক্রমাগতই গান লিখিয়াছেন। এটা একটু বাড়িয়া যায়। বাহালায় হুলতানদের সঙ্গে তিরহতের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, মনে হয় না। তাহাদের সম্পর্ক জোয়ানপুরের হুলতানদের সঙ্গেই ছিল। ইব্রাহিম সাহ ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া মরিলে, তাহার ১৬ বৎসর পরে হসেন নামে একজন হুলতান হন। হসেন সাহের পরে নয়ং সা বলিয়া আর একজন হুলতান হন। এই নয়ং সার ভণিতা বিভাগপত্রীর গানে থাকিলেও বলিতে হয়, বিভাগপত্রী ১০০ বৎসরের উপরেও গান লিখিয়াছেন।

বাহালায় রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র পোন্ডের সময় বাহালায় বৃহৎপতি নামে একজন ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষার খুব ঐক্যি করে। তিনি বাহালায় একধাষী নৃত্তিনিবন্ধ লেখেন, অমরকোষের টাকা লেখেন, রত্নবংশের টাকা লেখেন, আরও যে কত পুস্তক লেখেন তাহার তিকানা নাই। হুলতানেরা বুনী হইয়া তাহাকে ‘রামহুতু’ এই উপাধি দিয়াছিলেন। এই বাহালায় হুলতানদের সময়েই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন।

স্বতরাং আমরা যে কয়টা তারিখের কথা বলিলাম, তাহা ঠিক হওয়ায় যে শুধু বাহালা ও তিরহতের ইতিহাসের নগর গাড়া হইল, তাহা নয়, উহাতে বাহালায় ও তিরহতের সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের ইতিহাসের নগরও গাড়া হইল।

## সত্য স্নাতা

### ঐক্যকবিশোর দাস বি-এল

মহিত কীর্ত্তিগোদ হ’তে সজাখিত চক্রমার মত  
তোমারও মুখহিৎ; কৃষ্ণপক্ষ কালো আঁখি চুট  
রাখিছে কলম যেন বসিত গৌরবে। পুটে লুটি’  
যন আঁখিয়ার সন দাড়া ছলে কীলো কেশ যত।  
পরিসার ভয়ে ভীত ঐক্যের স্তম্ভ বাস খানি,  
—স্বপ্নের জ্যোতিষা যেন—তু ভব ধরছে আঁকড়ি’  
অঞ্চলের কৃষ্ণপ্রাণী পানোহত বক্ষোপরে গড়ি’

শোভে নব মেঘমালা পর্জন্ত শিখরে। শিরে হানি’  
বজ্রাঘাত দিনশেষে রবি গেছে চলি—  
তাই কি মলিনী সত্য—মনোহুকে কেছে অশ্বিনী—  
আরক্ত চরণ ছলে ক্রমিকলে লুটাইছে পদী;—  
নীরব মজীর রব, অলি যেন মুমথোরে ঢলি’;  
আঁখি তব তপ উৎস শতমুখে উট্টাইছে জঙ্ঘাণি’  
বিস্মিত গুপ্তিত বিব, সময়ে প্রণমে পদে আসি।





## তোমাতে দেখিনি কতকাল

ঐশ্রিয়স্বদা দেবী

তোমাতে দেখিনি কতদিন,  
তুই চোখ উড়ে যেতে চায়,  
সুখিত পীড়িত বল হীন  
হায় তারা আবদ্ধ খাঁচায়।

তোমাতে দেখিনি কতকাল,  
যুগে গেছে জীবনের স্বাভাবিক,  
সিদ্ধালোক সকাল বিকাল  
সুখ মম আর সুখ সাধ।

ভাবি আমি বসে একা একা,  
কত বার সেদিনের কথা,  
আনন্দের তুলি দিয়ে লেখা  
জীবনের নিতুল ব্যর্থতা।

চোখে চোখে গড়া ইতিহাস,  
খুলে যায় নিখিল জুবন,  
পরশে পরশে পরকাশ,  
সুহৃদিত তরলতা বন।

## প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের উপকরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"পাণ্ডুল"

আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ১০০ খ্রী পূর্ব অবধি হইতে আরম্ভ করিতে পারি। ঐ সময় হইতে মোটামুটি একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাই। কিন্তু পুরাণ আলোচনা করিলে আরো অনেক পূর্ব হইতে ভারতের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখা যাইতে পারে। পুরাণে যে সকল রাজাদের ধারাবাহিক নাম এবং তাঁহাদের রাজত্বকাল দেখিতে পাই, ঐ সকল তারিখ উট্টা রিকে গণনা করিলে আমরা খ্রী পূর্ব ২৪৩৯ অব্দে নিয়া পৌছিতে পারি। এবং চন্দ্রগুপ্ত হইতে উট্টা রিকে চলিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৪৩৯ খ্রী পূর্ব অব্দে জরাসন্ধ রাজত্ব করিতেছেন। এই জরাসন্ধকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখিতে পাই। তাহা হইলে ১৪৩৯ বা ৪০ খ্রী পূর্ব অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি। ঐ যুদ্ধ কে, পি, জয়লাল সিংহ

করিয়াছেন যে, ১৪৩৮ খ্রী পূর্ব অব্দে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব বন্ধ করেন এবং ঐ সালে ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ হয়। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর সহদেব ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। আমরা নীচে জরাসন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পর্যন্ত রাজগণের নাম ও তাঁহাদের রাজত্বকালের একটা কঙ্কাল দিলাম। অধিকাংশ রাজাদের নাম নানা পুরাণে পাওয়া যায়। সকল পুরাণের মতই প্রায় এক প্রকার। কে, পি, জয়লাল 'বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির প্রজিকার' মন্ত পুরাণ হইতে যে সকল রামায়ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর পাঁচজন নৃতন রাজার নাম পাওয়া যায়। ঐ পাঁচজন রাজা অতি অল্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, বোধ হয় তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় না।

খ্রী পূর্ব অব্দ	নং	রাজগণের নাম	রাজত্বকাল	অভিমত।
১৪৩৯	—	জরাসন্ধ	—	কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।
১৪৩৯	—	—	—	যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব বন্ধ এবং ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ।
১৪৩৮—১৪২৪	১	সহদেব...	১৪	
১৪২৪—১৩৬৬	২	সমাবী...	৫৮	
১৩৬৬—১৩০৬	৩	ঐশ্রিয়স্বদা...	৬০	
১৩০৬—১২৮০	৪	আয়স্বদা...	২৬	
—১২৪০	৫	নিরমিত...	৪০	
—১১২০	৬	হৃৎ...	৫০	
—১১৬৭	৭	বৃহৎ...	২৩	
—১১৩২	৮	সেনজিৎ...	০	
—	৯	স্বতন্ত্র...	৩৫	
—	১০	বিত্ত...	২৫	মন্ত পুরাণাচার্য্যের স্বত্বপু এবং বিজুর মধ্যে আরো দুই জন রাজা অল্প কয়েকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।
—১১০৯	১১	স্বতী...	৬	
—১০৭৩	১২	ক্ষেত্র...	২৮	
—১০১৩	১৩	স্বতন্ত্র...	৬০	
—১০০৮	১৪	ধর্মেন্দ্র...	৫	
—৯৫০	১৫	নিরমিত...	৫৮	
—	১৬	ব্রিন্দ্র...	২৮	নিরমিত ব্রিন্দ্রের মধ্যে মন্ত পুরাণাচার্য্যের একজন রাজা ছিলেন।
—২২২	১৭	দুধাসেন...	৮	এখানে মন্ত পুরাণাচার্য্যের একজন রাজা ছিলেন।
—২১৪	১৮	স্বতী...	২০	এখানে একজন রাজা ছিলেন।
—৮২৪	১৯	স্বতী...	২২	এখানে একজন রাজা ছিলেন।
—৮৭২	২০	স্বতী...	৪০	
—৮৩২	২১	স্বতী...	২৫	
—৮১৭	২২	স্বতী...	৫০	
৭৭৭—৭২৭	২৩	স্বতী...	১১১	



বিপ্লবই উল্লিখিত বংশের শেষ রাজা। শিশুনাগ অশ্ব মগধের সিংহাসন লাভ করেন। আমরা এখন হইতে নবম নম্ব পর্যন্ত অষ্ট বংশ মগধের রাজ্য করিয়া- পুরাণ হইতে শিশুনাগ বংশের রাজাদের নাম এবং রাজত্ব ছিলেন। নবমবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ষ ৩২৬ কাল উল্লেখ করিব।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ষ অক্ষ	নম্বর	রাজগণের নাম	রাজত্বকাল	অভিমত।
৭২৭—৬৮৭	১	শিশুনাগ	৪০	
—৬৮১	২	কাকবর্ধ	২৬	
—৬৪১	৩	ক্ষেমবর্ধ	২০	
—৬০১	৪	ক্ষেমবিং	৪০	
—৫৫২	৫	বিবিশার	৫১	
—৫১৮	৬	অজাতশত্রু	৩৪	অজাতশত্রু রাজগৃহের পঞ্চপাহাড়ের বাহিরে
—৪৮০	৭	দর্শক	৩৫	নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন।
—৪৬৭	৮	ঐবজ্যিন	১৬	উহার রাজধানীর চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ
—৪৫৮	৯	অহরুধ	৯	অজকাল ও দেখা যায়।
—৪৪৯	১০	মুদ্রা	৮	
—৪৩২	১১	নন্দ (১)	৪০	
—১৭৪	১২	নন্দ (২)	৩৫	
—৩৬৬	১৩	নন্দ (৩)	৮	
—৩৫৮	১৪	নন্দ (৪)	৮	
—৩৫৮	১৫	নন্দ (৫)	২৮	
৩০৮—৩২৬	১৬	নন্দ (৬)	১২	এই সময় আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত কোটিল্লোর সাহায্যে অজাত নন্দকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন লাভ করেন।
			৪০২	

পুরাণ হইতে আমরা মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হইতে ইতিহাস আরম্ভ করিতে পারি। ইহা ভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি অনেক কিছু জানিতে পারি। পুরাণে উল্লিখিত রাজগণ—ঐতিহাসিক রাজা বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক ধর্মের জটিল অর্থ বুঝিত না। সত্যকে সরল করিয়া বুঝাইবার জন্য মহাপুরুষগণতাহাদের পুরাণ রচনা করিতেন। রাজা রাজাদের এবং প্রজাদের চরিত্রের ভিতর দিয়া সামাজিক, পারি-  
বারিক, নৈতিক ও ধর্মতাব ফুটাইয়া তুলিতেন। এই-  
ভাবে সাধারণ লোককে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত।  
ইতিহাসের উপকরণের দিক হইতে আমরা রামায়ণ  
মহাভারতকে বাদ দিতে পারি না। রামায়ণে এবং  
মহাভারতে আমরা পারিবারিক অবস্থা হইতে রাজস্বরবার  
সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য বিবরণ পাই। বিশেষতঃ মহাভারতের  
সভাপর্ষ্য ভারত ইতিহাসের এক অমূল্য রত্ন। মহা  
হইতে আমরা মানুষের অধিকার সম্বন্ধে নানা তথ্য

পাই। মহা হিন্দুদিগের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক  
প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বিষয়ের আইনের পুতক। এই সকল  
ছাড়া অজাত শত্রু সমুদায় পুতকেও আমরা অনেক ঐতি-  
হাসিক বিবরণ পাই। পানিনী ব্যাকরণ হইতেও আমরা  
অনেক উপকরণ পাই।

এই সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা বিষয়ের পুতক  
বাদ দিলে আমরা বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র এবং অজাত বৌদ্ধ  
পুতকাবলীতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাই। জ্যৈষ্ঠ  
পূর্ষ যষ্ঠ শতাব্দির শেষ ভাগে ভারতবর্ষে এক যুগান্তর  
আরম্ভ হয়। এই যুগের অবতার হইলেন ভগবান বুদ্ধ।  
ভারতবাসী তখন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রের জটিল  
অর্থের মীমাংসা করিতে পারিত না। আস্তে আস্তে  
মানব সত্যের পথ তুলিয়া অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছিল,  
এমন সময় বুদ্ধ আসিয়া জগতকে এক সরল পথ দেখাইয়া  
দিলেন। উহার প্রদর্শিত পথ, হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণগণের  
মত কোন এক বিশেষ শ্রেণীর ভিতর স্থান পাইল না।  
পণ্ডিত-বুর্জ, ব্রাহ্মণ-মুন্স সকলেই উহার সরল সত্যের ঘোঁটে  
গা ঢালিয়া দিল। এই যে নৃতন একটা ধর্ম ভারতে আরম্ভ  
হইল, প্রথম কিছুদিন ইহার কোন পুঁথি পুতক ছিল না।  
কখনো কখনো বৌদ্ধের রচিত হইল, এই সকল  
পুতকের কতকঅংশকে ইতিহাস বলিলেও অজ্ঞার হয় না।  
এই সকল পুতক ইতিহাসের দিক দিয়া আবশ্যকীয় হইলেও  
এখানে সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা আবশ্যক করে না।

কর্মহাস্তের মানবকে বার বার ধর্মীয়র বৃকে জন্ম-  
গণিত হইতে হয়। মানুষের চরম উদ্দেশ্য মুক্তি।  
অর্থাৎ ভগবানের সহিত এক হইয়া যাওয়া, এক জন্মে  
মাহুৎ কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আস্তে আস্তে  
নানা জন্মে, নানা স্বকর্মের দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর  
হইতে হয়। এই ভাবে বহু যোনি জন্ম করিয়া মুক্ত  
হইতে হয়। ভগবান বুদ্ধও এক জন্মে মুক্তি লাভ করিতে  
পারেন নাই। মুক্তি লাভের জন্য তাহাকে ধর্মীয়র বৃকে  
৫৫৫ বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কোন জন্মে  
বুদ্ধের যোনিতে, কোন জন্মে মূগের যোনিতে, কোন  
বার পূর্ণের যোনিতে জন্ম করিয়াছেন।  
ভগবান বুদ্ধ যখন বুদ্ধ লাভ করিলেন, তখন অজাত

জন্মের কথা উহার মনে উদয় হইল। নানা কারণ,  
অনেক সময় উহার অজাত জন্মের কথা ভক্তগণের নিকট  
বলিতেন। এই ভাবে উহার ৫৫৫ বার জন্মের কথা  
বলিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, উহার জন্মকথা ভক্তগণ  
দ্বারা সংগৃহীত হয়; উহাই জাতক নামে প্রসিদ্ধ। এই  
সকল জাতক পালী ভাষায় লিখিত। কয়েকখানি জাতক-  
সংস্কৃত ভাষায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। জাতক রাজা-  
রাজাদের বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া না গেলেও,  
সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিষয় জাতক হইতে যথেষ্ট  
জান যায়।

জাতক যে শুধু পালী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা  
নহে; শিল্পীর লেখাও অনেক জাতক পুস্তকের গায়ে  
লেখা হইয়াছিল। অজন্তার গিরিগুহায় শিল্পীর লিখিত  
জাতকের কয়েকটা ঘটনা দেখা যায়। পট্টনার মিউজিয়াম  
ছোট হইলেও এখানে কয়েকটা জাতকের চিত্র আছে। ইহা  
ঐতিহাসিকগণের নিকট অমূল্য বস্তু। যাহারা এই সকল  
জাতক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের চেষ্টা ও পরি-  
শ্রমের জন্য আমরা উহারিগণকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই  
প্রকার চিত্র যত অধিক আবিষ্কার এবং সংগৃহীত হইবে,  
প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপকরণ ততই বৃদ্ধি পাইবে।

জাতক পরিভ্যাগ করিয়া আমরা এখন গুপ্তযুগের  
কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের ছুই-চার-খানা গ্রন্থের কথা  
বলিব। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রধান  
কবি ছিলেন। তিনি রঘুবংশ, শতসত্তা প্রভৃতি কয়েক-  
খানা পুতক ও নাটক লিখেন। তৎকালে যে ভারতবর্ষের  
সমাজে নাটক স্থান পাইয়াছিল, তাহা কালিদাসের পুতক  
দেখিয়াই বুঝিতে পারি। গুপ্তযুগের পর হর্ষবর্দ্ধনের  
রাজত্বকালে বান দ্বারা লিখিত হর্ষচরিত্র ইতিহাসের এক  
অংশ। হর্ষবর্দ্ধন কি প্রকারে রাজা হইলেন, কি ভাবে  
শাসনকে বধ করিয়া পতি রাজাত্মিক উদ্ধার করিলেন—  
ইহা ভিন্ন হর্ষবর্দ্ধনের গান-ঘানের বিষয়ও জানিতে পারি।  
বুদ্ধদেব যখন নৃতন সত্যের আলোকে ভারতবাসীর  
অন্ধর-রাত্তা আলোকিত করিলেন, তখন ভারতে আর  
একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। উহার নাম মহাবীর;  
তিনি বৈদ্য ধর্মের প্রবর্তক। এই যে নৃতন একটা চিত্র।



ও সত্যের ধারা দেখা দিল, এ সম্বন্ধে অনেক পুঁথি থাকি-  
বার সম্ভাবনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত তৈমনসের বিশেষ কোন  
ভাল পুস্তক পাওয়া যায় নাই। তাহাদের পুস্তক পাওয়া  
গেলে, তাহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া  
যাইবে বলিয়া অস্থান্য হয়।

প্রাচীনকালে যে সম্ভ্রুত সাহিত্যের যুগান্তর আরম্ভ  
হইয়াছিল, তাহা ভারতের বিশেষতঃ হিন্দুগণের অমূল্য  
সম্পত্তি। ইতিহাসের দিক দিয়াও ইহার স্থান অনেক  
উচ্চে। এই প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়  
না, পাওয়া গেলে ইহা যে কত আনন্দের বিষয় হইত তাহা  
ইতিহাসাহার্যী ব্যক্তিমাজেই বৃত্তিতে পারেন। আমরা  
এখন আর একখানা গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াই সাহিত্য বিষয়ের  
কোন শেষ করিব। এই গ্রন্থের নাম “কৌটিল্যের অর্থ-  
শাস্ত্র”।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিসের?—অনেকেই ইহার  
বিষয় জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যয়নকারী  
অনেক বি. এ, পাশ ছাত্রও এই অমূল্য গ্রন্থের নাম জানে  
না। অনেকে নাম জানে, কিন্তু ইহার ভিতর যে অম্যা-  
ন লুকাইয়া আছে তাহার সংবাদ রাখে না। ইতিহাস  
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছাত্রগণই যখন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে জানেন না,  
তখন সাধারণ লোকে তো জানিতেই পারেন না। এ  
বোধ ছাত্রদের নয়—এ বোধ বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির এবং  
বর্তমান কৃশিক্ষার যোগে ঘোহিত অভিশাপগণের।  
অনেককে বি. এ, পাশ ছাত্র আছে, যাদ্যদিকের “সিভি-  
জিল” কোন একটা গানের প্রথম লাইন বলিতে বলিলে,  
সে বলিবে যে, সে “সিভিভালি” নাম ভনিয়াছে; কখনও  
পড়ে নাই। যে দেশের শিক্ষক এবং ছাত্রগণের অবস্থা  
এই, সে দেশের লোকের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বস্তুটা যেকি  
—তাহা না জানিবারই কথা।

চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, চাণক্য, তাহার রাজ-  
নীতিজ্ঞ জ্ঞানের সাহায্যে এত বড় রাজ্য স্থাপন হইয়াছিল।  
এই চাণক্যের অপর নাম কৌটিল্য,—পতিতগণ ইহাই  
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি “অর্থশাস্ত্র” নামে একখানা  
পুস্তক লিখেন। এ পুস্তকে যে সকল আইন কাহন,  
সামাজিক রীতিনীতি দেখা যায়, উহা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের

স্থাপনের চিহ্ন মাত্র। এতদিন এই পুস্তক আমাদের  
চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়াছিল। কিছুদিন হইল শ্রাম  
শাস্ত্রী নামে একজন লাইব্রেরীওয়ান মহীশূর লাইব্রেরী হইতে  
উহার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং ইংরেজী ভাষায়  
উহার অমূল্য প্রকাশ করেন। তাহার এই কার্যের জন্ত তিনি  
ভারতবাসীর ধন্যবাদার্থ। এই পুস্তক হইতে আমরা চন্দ্র-  
গুপ্তের রাজত্বকালে শাসন-প্রথা ও সভ্যতার নির্দশন পাই।  
এইজন্য কত পুস্তক ভারতের কত গুরু-কোণে নাই হইয়া  
যাইতেছে উহা আবিষ্কার করিতে পারিলে প্রাচীন ভারতের  
ইতিহাসের উপাখান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

২। আমাদের প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দ্বিতীয়  
উপকরণ—শিলালিপি, তাম্রলিপি এবং মুদ্রাদি। এই  
সকল বস্তু হইতে যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া  
যায়, তাহার একটুকুও অতিরিক্ত নহে।

অশোক যখন ভারতে রাজত্ব করিতেন, তখন তাহার  
ঘরাই বোধ হয় প্রথম শিলালিপির প্রচলন হয়; কেননা,  
তাহার পূর্বের কোন শিলালিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার  
নাই। অশোকই প্রথম রাজত্বের চূড়ায়, ভগ্নে সত্যের  
বাণী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি কবে যে যে নামে নানা  
কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হয় ত এতদিন কেহ বৃত্তিতে  
পারেন নাই; বোধ হয় এক মাত্র তিনিই বুদ্ধিমান ছিলেন।  
আজ জগৎবাসী তাহার এই কার্যের মর্ম বৃত্তিতে  
পারিয়াছে। অশোকের শিলালিপি না থাকিলে  
আমরা তাহাকে জগতের রাজগণের মাথাকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ  
সিঁতে পারিতাম না। হয় তো তাহার রাজত্বের অনেক  
বিষয়ে অশ্বকায়ের গাঢ় অশ্বকায়ের লুকাইয়া থাকিত।  
অশোকের পর যে সকল হিন্দু এবং বৌদ্ধরাজ্য ভারত-  
স্থিতিশাসনে বিঘ্নাচ্ছেন, তাহাদের সকলইই ছুই একটা  
শিলালিপি পাওয়া যায়। এই সকল শিলালিপি সত্যের  
সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল শিলালিপিতে তাহাদের  
রাজত্বকাল এবং কার্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক  
স্থানে ছুই রাজত্বের সীমার মাফকানে, ছুই রাজ্যের সন্ধিসর্ব  
মাধ্যম করিয়া শিলালিপি ছুই রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিয়া  
দিত।

শিলালিপির পরই তাম্রলিপির স্থান। তাম্রলিপিও

অনেক ঐতিহাসিক সত্যের সত্য নির্দেশ করিয়া দেয়।  
রাজ-রাজাদের পরাবাসী সন্ধিপত্র, ও নানা প্রকার নিষ-  
বাসী তাম্রলিপি হইতে পাওয়া যায়। কোন রাজা কোন  
রাজাকে পত্র লিখিলে, হয়, বুকের পাতায় না হয়, তাম্র-  
লিপিতে লিখিতেন। বুকের পাতা কালের করালগ্রাসে  
ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; তাম্রলিপি আজও পুরাতন ভূতি  
বকে ধারণ করিয়া জীবিত আছে। তাহার কঠিন বুকে  
প্রেমিকার প্রেমের চাক্ষুরী ভরা কার্যচালা এখনও  
গাঢ় হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল যে, আজও তাহা  
মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। এই দাগগুলি আজও  
তাহার প্রাণে প্রেমিকার প্রেমের চিত্রা জ্বালাইয়া রাখি-  
য়াছে। গোড়া কাল এই সকল বিরহীগণকে ধ্বংস করিতে  
পারে নাই। তাই তারা আজও ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া  
রহিয়াছে।

বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রমুদ্রা প্রভৃতি হইতেও আমরা সঠিক  
কতকগুলি ইতিহাসের উপকরণ পাই। বিশেষতঃ মুদ্রার  
ভিত্তিতে যে সকল রাজাদের নাম পাই—তাহার ভিতর  
কিছুইও ভ্রমবিহীন নাই। আর তাহাদের প্রতিমূর্তিও  
অনেক মুদ্রার ভিতর পাওয়া যায়। অনেক সময় বিদেশী  
রাজাদের অনেক মুদ্রা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়।  
এই সকল মুদ্রা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এত  
কালের এ দেশের সহিত সে দেশের আদান প্রদান চলিত।  
এ দেশের লোক অত্ন দেশে গিয়া বাণিজ্য করিত; এ  
দেশের ভ্রম্যের বিনিময়ে অত্ন দেশের মুদ্রা আনিয়া দেশের  
শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত। গ্রীস দেশের কয়েকটা মুদ্রা দক্ষিণ-  
ভারতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে যেন হয় ভারত-  
বাসিগণের গ্রীস প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।  
এই বাণিজ্যের জন্ত ভারতে অনেক জাহাজ নির্মিত হইত।  
তাহাতে চড়িয়া তাহারা লঙ্কা, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে  
বাণিজ্য জয়া লইয়া যাইত।

৩। প্রাচীন ভারতের উপকরণ লাভের অন্ততম  
উপায় বৈদেশিক আগন্তুকগণের লিখিত বিবরণ। অতি  
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত অন্ত্যান্ত দেশের নানা  
প্রকার যোগ ছিল। এবং নানা দেশের অধিবাসী ভারতকে  
আগমন করিত। তাহাদের অনেকে ভারত সম্বন্ধে অনেক

কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল অতিথিগণের মধ্যে  
ম্যাকাবিয়াস, কাহিয়ান ও হেরোডাস প্রমুখ।

গ্রীকরাষ্ট্রা আসেজ্ঞাভাষের মুক্তার পর তাহার বিস্তৃত  
রাজ্য কয়েক বিভাগ করিয়া, এক একজন শাসনকর্তা,  
এক এক বিভাগে রাজত্ব করিতে থাকেন। অনেক যুদ্ধ  
বিগাহের পর পশ্চিম ভারত এবং আফগানিস্তান প্রভৃতি  
স্থানের রাজা সেনুকাশের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সন্ধি হয়, এই  
সন্ধির পরে সেনুকাশ চন্দ্রগুপ্তের শাষী স্বভাব সহিত বিবাহ  
দেন এবং সেনুকাশসিংহনকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে দূত-  
রূপে প্রেরণ করেন। তিনি চারিবৎসর চন্দ্রগুপ্তের দর-  
বারে অবস্থান করেন এবং ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা  
লিখিয়া যায়। এই বিবরণ গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়া-  
ছিল। তাহার বিবরণের সমস্ত পাওয়া যায় না। যেইখ-  
ন পাওয়া যায় তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। তথাপি যাহা  
পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দিক হইতে  
কম কথা নহে।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চন্দ্রগুপ্ত যখন ভারতে  
গুপ্ত-রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন চীন পরিভ্রমক কাহিয়ান  
ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষে চীনাবাসিগণের  
নিকট বর্ণ। সমস্ত চীনাবাসী বৌদ্ধ। এই বৌদ্ধ ধর্মের  
কেন্দ্র ও পীঠস্থান হইল বুদ্ধগয়া, তাই কাহিয়ান বৌদ্ধ-  
ধর্মের পীঠস্থান দেখিবার জন্ত এবং বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ  
করিবার জন্ত পথভ্রমক পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গলের ভিতর  
দিয়া ভ্রমণে আগমন করেন। তাহার প্রশ্ন বাস্তবী  
উত্তিরাছিল ধর্মের জন্ত, বৌদ্ধধর্মের বর্ণ বৌদ্ধগয়া দেখিবার  
জন্ত তাহাকে পাপল করিয়াছিল, একটা নিগূঢ় সরল সত্য  
—তাই হুর্জত রক্তার স্মৃতিতে রক্ত হন নাই, সিংহ  
বায় হিংসে জঙ্ঘর ভয়ে ভীত হন নাই। তিনি অনেক  
দিন ভারতের নানা তীর্থস্থান ও পীঠস্থানে ভ্রমণ করিয়া  
অবশেষে জাহাজে চড়িয়া সিংহলে গমন করেন। তথা  
হইতে জাহাজে চড়িয়া দেশে প্রত্যাপন করেন। তিনি  
ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়া  
গিয়াছেন। ভারতবাসী এই বৈদেশিক অতিথির নিকট  
ভিন্নশ্রী।

কাহিয়ানের দল হেরোডাস নামে এক একজন চীন



পরিভ্রাজক সমুদ্র শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আগমন করেন। এই সময় ভারত সিংহাসনে বসিয়া হৰ্ষবর্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি ভারতের নানাদেশ ভ্রমণ করেন এবং পাঁচ বৎসর বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালান্দার প্রধান অধ্যাপক শীলভট্টের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শীলভট্ট বাগানী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি ভারত সঞ্চড়ে অনেক কিছু তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন।

কাহিয়ান এবং ছয়েং সাংয়ের ভ্রমণ-কাহিনী চীনা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আজ্ঞাশাল উহা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষাই অনুবাদ হইয়াছে।

৪। এখন বলা হইতেছে ভারতের শিল্পকলা এবং অস্ত্রাস্ত্র দেশের শিল্পকলা হইতে আমরা কিরূপে ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি। ভারতের শিল্পকলার ক্রমবিকাশ ও উহার আদর্শ হইতে আমরা ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি। মৌর্য-শিল্পে মৌর্য-রাজত্বের শিক্কা, সভ্যতা, প্রকৃতি স্ফুটী উদ্ভিগ্নাছে। গুপ্ত রাজাদের সময়ে গুপ্ত শিল্পের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তাহাদের নাম ধাম প্রকৃতি এবং তাহাদের সভ্যতা শাসন প্রকৃতি বিষয়ের গৌরব বোধগম্য করিতেছে। আবার গান্ধার শিল্পকলা দেখিলেই মনে হয়, এই শিল্পকলার ভিতর গ্রীক-শিল্পের অনেক কলা-কৌশল প্রবেশ করিয়াছে। এই যুগের শিল্পীগণ গ্রীক-সভ্যতার আঁলে অনেকটা গা হেলাইয়া দিয়াছিল। এবং গান্ধার প্রকৃতি পশ্চিম ভারতীয় প্রদেশে যে গ্রীক-সভ্যতার বাতাস বহিত এবং সেই বাতাসের হিলোলে মাতোয়ারা হইয়া ভারতীয়গণ যে গ্রীক সভ্যতারূপদীকে প্রাণের ভিতর পাইবার জন্ত উৎসুক হইয়া

উদ্ভিগ্নাছিল; তাহার একটা কলঙ্কমুক্তি আশ্রিও গান্ধার শিল্পের ভিতর চিত্র করিয়া অস্তিত্বেছে।

গ্রীক, ব্যাবিলনিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের মোটা-মোটা একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। এই ইতিহাস অনেকটা এই সকল দেশের শিল্পকলার উপর নির্ভর করে। তাহাদের ক্রম বিকাশ শিল্পের সহিত আমাদের ভারতীয় শিল্পকলার তুলনা করিলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। ত্রিমুখ রাথালগাশ ব্যানার্জি মহেন্দ্রা ও হারাণা হইতে আবিষ্কৃত বস্ত্রগুলিকে ব্যাবিলনিয়ার অতীতযুগের শিল্পকলার সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল বস্ত্র আবিষ্কৃত সভ্যতার নিদর্শন। আধাংশ ভারতে আসিবার পূর্বে আবিষ্কৃত সভ্যতা নামে একটা উন্নত রকমের সভ্যতা ভারতের অনেকাংশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অস্ত্র দেশের আর্ট হইতে যেমন ভারতীয় ইতিহাসের অনেক আভাস পাওয়া যায়। তেমনি অস্ত্র দেশের ইতিহাস হইতেও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। বৈদেশিকগণ অতীতযুগ হইতেই এদেশে আসিত এবং ভারতীয় সভ্যতার অপ্রাপ্তি হইয়া উহা তাহাদের দেশে প্রচার করিত; তাহার ফলেই তাহাদের দেশের ইতিহাসে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক বিষয় স্থান পাইত। বিশেষতঃ লম্বা এবং চীনদেশের ইতিহাস আমাদের ভারতীয় ইতিহাসের এক অল্প বলিয়া ধরিলেও অসত্য হয় না। সিংহল এবং চীনা সভ্যতার ভিতর ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

মিঃ মিন নানা প্রকার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নূতন নূতন উপকরণ পাওয়া বাইতেছে এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ক্রমাগতই বদলাইয়া নূতন আকার ধারণ করিতেছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এই ভাবে অনাদিকাল পর্যন্ত বদলাইতে থাকিবে।



## সাম্য

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়

বিনিময়ের অপরাহ। বন্ধুবর নরেশ উকিলের বৈঠক-খানায় আমরা কয়েকজন একত্রিত হইয়া তর্ক-বিতর্কে ও সিগারেটের ধূমে ঘরখানি সরণম করিয়া তুলিয়াছিলাম। কথায় কথায় ক্রী-স্বাধীনতা সঞ্চড়ে তর্ক উঠিলে হরেন জিজ্ঞাসা করিল—“ওহে! আজকের \* \* \* কাগজে অবরোধ প্রচার বিবন্ধে যে আর্টিকেলটা (প্রবন্ধ) বাহির হইবে—সেটা পড়ে দেখেছে?”

আমরা ষাড় নাড়িয়া স্ব স্ব অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে হরেন গভীরস্বরে বলিল—“প্রবন্ধ লেখকের মতে ভারত-বর্ষ হইতে অবরোধ প্রথা যতদিন না উঠিয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ্যভাভের আশা করা বাতুলতা মাত্র।”

ডাক্তার ঘোষ সিগারেটে ধূম বিয়া টেবিলের উপর একটা মধ্যম বকমের মূর্ত্যাবাত করিয়া বলিল—“ও মতের আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। দু’টা হাতের মধ্যে একটা হাত বহাদির আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যেমন atrophy (অসারত্ব) প্রাপ্ত হয়—ক্রীলোকদিগকে অস্ত্রপূর্বের মধ্যে চাবি বদ্ধ করিয়া রাখিয়া আমরা সেইরূপ অর্ধেক শক্তি নষ্ট করিতে বসিয়াছি।”

নরেশ চেয়ারে একটু পোকা হইয়া বসিয়া বলিল—“টিক বলো, ডাক্তার! ‘Freedom lies crushed where woman fettered stands’ ভবে আমার মতে শুধু অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলেই চলবে না। ক্রীলোকদিগকে পুরুষদের সঙ্গে সকল বিষয়েই সমান অধিকার দিতে হবে।”

‘আমি একটু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলাম—“কি বলছ নরেশ? Division of labour বলে ইংরাজীতে

যে একটা কথা আছে তে! তুলে যেও না। কাজের ভাগ না থাকিলে সংসারের বিশৃঙ্খলতা ঘটেই যেতে। ক্রীপুরুষের শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তি সঞ্চড়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমাদের জানী পুরুষপুঙ্খপণ ক্রীলোকদিগকে ঘরের কাজ ও পুরুষদিগকে বাহিরের কাজ করিবার জন্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বর্গাঙ্গমের স্বষ্টিও ঐ কারণে—চাতুর্য্যগোষণা স্বঃ ও পুরুষবিভাগশঃ।”

হরেন হো হো শব্দে হাসিয়া বলিল—“ওগো মশায়! ওদব Stale (পচা) যুক্তি-একালে আর খাটে না। ইউরোপ আমেরিকা ক্রী-স্বাধীনতার জন্ত এখন বিশৃঙ্খল হইয়ে উঠেছে যে তাহারা ই এখন সমস্ত পৃথিবীর স্বাধীন। আর আমাদের পুরুষপুঙ্খপণের শৃঙ্খলায় ব্যবস্থায়, আমাদের হস্তগড়ে দামের লৌহঘন শৃঙ্খল দিন দিন এমন ঢাণিয়া বসিয়া যাইতেছে যে কখন বলিবার আশাটা পর্যন্ত নাই বলিয়েই চলে।”

মধ্যম উকিল একটু হেঁচকি ও করি। সে ভাড়াভাড়া টেবিল হইতে মোটা একখানা আইনের বহি টানিয়া লইয়া বাহাইতে বাইতে গান ধরিয়াছিল—

“সাম্য! সাম্য! সাম্য!  
যদি চাও দেশ করিতে স্বাধীন  
ক্রীকে কেবনা কঠে পদনিশীন  
সেই পাপে তোরা আছিস হইয়ে হীন  
সুঁবে কেন দরা এত অশ্রম!  
ইউরোপ আমেরিকা এমন কি জাপান  
যাহারা ই স্বাধীন, যাহারা ই প্রধান  
অবরোধ প্রথা ক’রে ঘেঁষে জ্ঞান  
তা’ দেখেও তোদের হ’ল না চৈতন্য!  
তখনই হ’বে ভারত উদ্ধার  
(হবে) ক্রী-পুঙ্খ পাবে সমানাবিকার



ঘৃতিবে ভোজের মতক বিকার

এ সহজসত্য হ'বে বোধগম্য।

সাম্য! সাম্য! সাম্য!"

গান শেষ হইলে, তর্কের জের মিটিয়া যখন সভাস্থ তখন বেশ রাতি হইয়া গিয়াছে।

২

প্রাতঃকালে নিরাভাব হইলে চক্ষুস্বাসন করিয়া দেখি স্ব্যারাম গবাক্ষর, দিয়া গৃহমাধ্য প্রবেশ করিতেছে। টেবিলের উপর টাইমপিস বড়ির ছোট কাঁটাটা আটটার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। আফিসে লেট হইবার ভয়ে ভাড়া-তাড়ি শূন্যতাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। অজরিন সাতটা না বাজিতে ঘৃণী কোমল করে সেন প্রবল দাঙ্কা। কিন্তু অজ্ঞ তাঁহার কোন সাদা শব্দ না। পাইয়া ভাবিলাম যত্নে তিনি নীচে গৃহকর্মে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু নীচে নামিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখি ঘৃণী ইজিচেয়ারে শয়ন করিয়া হাতলের উপর শ্রীচরণ মূল তুলিয়া দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে টেটস্ম্যান পাঠ করিতেছেন। রসিকতার এরূপ আধিক্যভায়ে আশ্চর্য্য হইয়া প্রতিবাদ করিব মনে করি-তেছি এমন সময় আমার প্রতি নৃষ্টিপাত করিয়া ঘৃণী একটু ভংগনীর ধরে বলিয়া উঠিলেন—“তোমার ঘুমের মাজাটা দিন দিন বড় বেড়ে যাচ্ছে।”

তাঁহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমাকে নির্দ্বন্দ্ব দেখিয়া তিনি রাগত্বের বলিলেন—“Don't Stand there gaping like a fool!”—এখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি নাকি?”

প্রায় বিশ বৎসর হইতে চলিল শ্রীমতীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছি—এবং তাঁহার কিছার পৌড় দ্বিতীয় ভাগের ‘ঐক্য বাস’ পঞ্চাশই জানা ছিল—(অবশ্য ‘ঐক্য’ অপেক্ষা ‘বাক্য’র ভাগটাই বেশি ছিল)—কিন্তু আজ তাঁহার মুনিস্বস্ত ইংরাজী গালি পাইয়া সত্য সত্যই একেবারে বিম্মিত হইয়া গেলাম। রাতারাতি তাঁহার বিজ্ঞা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে পরীক্ষা করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আজ কাগজে কিছু নতুন খবর আছে কি?”

ঘৃণী একটু তাক্সিলাখের উত্তর করিলেন—“এমন কিছুই নেই—তবে আজকের টেলিগ্রামে নতুন Viceroy এর নাম বাহির হ'য়েছে।”

আমাদের কন্ডা মণিমালা তাঁহার জননীর পার্শ্বে এক-চেয়ারে বসিয়া তাঁহার স্থল পাঠাপুস্তক পাঠ করিতেছিল। তাঁহার মাতাকে সন্ধান করিয়া বলিল—“মা! মা! Parent মানে পিতা না মাতা? ঘৃণী—Parent মানে মাতাও হয়—পিতাও হয়। বাঙ্গলায় ঠিক প্রতি-শব্দ না। সংস্কৃত ‘পিতরো’ বলিলে মাতা পিতা উভয়কে বোঝায়। সত্য—কিন্তু এবই শব্দে মাতা কিবা পিতাকে বোঝায় এরূপ শব্দ বাঙ্গলাতে শু' নাই-ই—সংস্কৃতও নাই। কি বল বীরেন?”

ওয়ে বাবা! এ যে আমার আমার নাম ধরে—তাও আমার মেয়ের নামে—চমৎকৃত হইয়া ভাবিলাম—ঘৃণী শু'ণ্ণ যে বিদুষী হ'য়েছেন তা' নয়—সভ্যতালোকও প্রাণ হ'য়েছেন।

ঘৃণী বয়সের কাগজখানা আমার দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—“কাগজটা পড়তে চাও ত' একবার খ' করে চোখ বুলিয়ে নাও—কিন্তু Doctor ঘোষজ্ঞায়ার নিকট তোমাকে একবার যেতে হবে—মনি বাস সমস্ত রাতই মাঝে মাঝে কেশেছে।”

আমি বিম্মিতত্বের জিজ্ঞাসা করিলাম—“ডাক্তার ঘোষ-জ্ঞায়ার কাছে?”

ঘৃ। হাঁ হাঁ—ঘোষ-জ্ঞায়াকেই এবার একটা নতুন Prescription করে দিতে বাগে। Doctor ঘোষ গতবারে যে গুণ্ড দিয়েছেন-তা'ও কখন উপকারই হয়নি। Doctor ঘোষজ্ঞায়ার is far more intelligent than her husband—আর তাঁর পড়াশুনাও তের বেশি।”

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—“কিন্তু বাঙ্গারে যেতে হবে যে?”

ঘৃণী বলিলেন—“না-না! আজ বাঙ্গারে আমিই যাচ্ছি। মনি! শব্দকে বাঙ্গারের মাথাটা নিয়ে আসতে বল ত'। আর আমার ছাতিটা অমনি ওপার হ'তে তুই নিয়ে আর।”

আমার বাক্যবোধ হইবার উপক্রম হইল। কেবলই মনে হ'তে লাগল “গিদির মাথা খারাপ হ'ল, না আমিই পাগল হ'লাম। ব্যাপারটা যে সবই নতুন নতুন টেকে।”

শব্দর ধামা লইয়া আসিয়া বলিল—“গিদিয়া! এখনও সব বাসন যে মাজা হয়নি?”

ঘৃণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“বেলা আটটা বাজতে চলো এখনও বাসন মাজা হয়নি? ষ্টোটা কুঁড়ের দাড়ি! এর পর বাজারে গেলে আর কি কিছু পাওয়া যাবে। চল এখন বাজারে চল—বাজার হ'তে কিরে এসে বাকী বাসন মাজবি।”

ঘৃণী প্রশ্ন করিলে আমি মণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মনি মা! ডোর পড়া রোগ কে বলে দেখ রে?”

মনি—“কেন—মা বলে দেন।”

আমি—“সে কি রে? কালও যে তুই আমার কাছে কথামালাসে মানে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলি।

মনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—“তুমি কি যে বল বাবা! তা'র ঠিক নেই। আমি খার্ডক্লাসে পড়ছি—তোমার কাছে কথামালাসে মানে জিজ্ঞাসা কর্তে যাব কেন?”

আমি বিম্মিতত্বের জিজ্ঞাসা করিলাম—খার্ড ক্লাসে পড়ছিলি?”

মনি উত্তর করিল—“বা! খার্ড ক্লাসে পড়ছি নে?” তারপর একটু গর্হিতভাবে বলিল—“মা বলেছেন আমি আমি যদি ভাল ক'রে ম্যাট্রিক পাশ কর্তে পারি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমারকে বিলাতে পাঠাবেন।”

আমার মাথাটাই নিশ্চয় খারাপ হ'য়ে গেছে মনে করিয়া ডাক্তার ঘোষের নিকট যাওয়াই স্থির করিলাম।

৩

ডাক্তার ঘোষের Consultation Roomএ প্রবেশ করিতে করিতে ভনিমালা তাঁহার পত্নী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“আজ তোমার বেশি Call আছে কি?”

ডাক্তার ঘোষ উত্তর করিলেন—“না—মোটো ছ' খাণ্ণায় আছে। দিন দিনই রোগী কমে যাচ্ছে।”

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—“সে তোমারই দোষে।

তোমাকে এত ক'রে বলি—পড়া শুনা ছেড়ে না। নতুন নতুন Medical বহি ত' পড়া চাই-ই—তা'ছাড়া British Medical Journal ও Lancet নিয়মিত পড়া উচিত।

তুমি ত' তা' শুনবে না। এখন লোকে up-to-date না হ'লে ডাক্তার কেন? আমি Journal—Lancet রীতিমত Subscribe করি—তুমি পড়লেই পা? সেই Sodi Bicarb আর Quinine-এর Prescription এখন-কার রোগীর মন ভোলান যায় না। এখন ক'বার ক'বার Injection চালাতে হবে। নতুন নতুন গুণ্ড Prescribe কর্তে হবে। ফলে দেখ এত আমার Call যে, সব রোগী attend করেই উঠতে পারিনে।”

আমি একটু গলা শানাইয়া আমার উপস্থিতি জ্ঞাপন করাইয়া দিতে, আমার দিকে চাহিয়া ঘোষজ্ঞায়ার বলিলেন—“বীরেন বাবু যে—নয়মাত্র—কিছু সংবাদ আছে নাকি?”

আমি উত্তর করিলাম—“ডাক্তার ঘোষ আমার মেয়েকে কানির জন্ত যে গুণ্ড দিয়েছিলেন তা' খাইয়ে কোন ফল হয় নি—কাল সমস্ত রাত মাঝে মাঝে কেশেছে।”

তা: ঘোষজ্ঞায়ার একটু গভীর স্বরে বলিলেন—“কেবল গুণ্ড খাওয়ালেই রোগ সাধে না। পথ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। আপনার মেয়ে দুখ খায় ত'?”

আমি—“দুখ ছ' বেলাই খায়।”

ঘোষজ্ঞায়ার।—“দুখ একেবারে বন্ধ করে দেবেন। Consumption রোগ এখন যে এত বৃদ্ধি পাইতেছে তা'র প্রধান কারণ দুখ। ঘুমের ব্যাসিলি কিছুতেই নষ্ট হয় না।”

ডাক্তার ঘোষ স্ত্রীর বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—“সে কি বলছ? আল দিলেই যে ঘুমের ব্যাসিলি নষ্ট হয়ে যায়।”

ঘোষজ্ঞায়ার বিজ্ঞ ভাবে মুখ হাসিয়া বলিলেন—“My-Dear তা' হয় না। আল দিলে ঘুমের উপর যে Hard crust পড়ে—সেই সরের মধ্যে যে ব্যাসিলি থাকিয়া যায় তাহা নষ্ট হয় না।”



আমি বিনীত হয়ে বলিলাম—“আমার মেয়ের জন্ম আপনি একটা Perscription করে দেবেন?”

যেমনজায় স্বামীর প্রতি একবার আত্মগুরুপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া একটা Prescriptipon লিখিয়া দিয়া বলিলেন—“এই গুণ্ঠটা আনাইয়া নেবেন। খুব সম্ভবতঃ এক শিশিতেই কাশি ভাল হ’য়ে যাবে। আমি এখন চম্চম—আজ অনেক ‘কল’—কিয়তে বেলা ১টা হ’বে দেখতে পাছি।”

ডাক্তার যোষাফা চিয়া যাইবার পর আমি ডাঃ যোষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“ডাঃ যোষ! আপনার সঙ্গে আমার কতদিনের আলাপ—বসুতে পারেন?”

ডাক্তার যোষ উত্তর করিলেন—“১৪১৫ বৎসরের হ’বে। কেন বলুন ত’?”

আমি—“আচ্ছা! আমার মাথা খারাপ হ’য়ে গেছে বলে কি আপনার স্বপ্ন সন্দেহ হ’য়েছে?”

ডাক্তার যোষ আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিলেন—“কই না! কেন, আপনার মাথার ভিতর কোন ঘাতনা ঘটনা হয় নাকি?”

আমি—“যাখন ত’ কিছু বুদ্ধি—তবে আজ সকাল হ’তে পৃথিবীর সব ঘন বসলে গেছে দেখতে পাছি। চায়ে দোকানে বেখলাম ভ্রূ-দীপুকে এক টেবিলে বসে ঢা খাচ্ছে—মাথায় দীপুকে উভয়েই পান চিত্তে ভিত্তে থাকিলে ছুঁছে। দী-পুকে উভয়েই দোকানে জিনিষ বেচতে ব্যস্ত। আমার গৃহিণী ত’ চাকরের মাথা ধামা চাপিয়ে বাজার করতে বেরলেন। আপনার দ্রী-নেকসেসের পরিবর্তে গলার ষ্টেথোস্কোপ (Stethoscope) নোলাইয়া রোগী দেখতে বাহির হইলেন। ব্যাপারটা কি বলতে পারেন?”

ডাক্তার যোষ—“এতে আপনি এত আশ্চর্য্য বোধ করছেন কেন?”

আমি—“লেন কি! এতে আশ্চর্য্যবোধ করি না। রাত্তারাত্তি সবাই ভ্রাম হ’য়ে গেলে নাকি?—কিন্তু ভ্রাম-কের মধ্যেও ত’ দ্রীমোকেরে এরূপ অবস্থা ঘটিতনা নেই?”

ডাক্তার যোষ একটু হুঃভিত্তে ভাবে উত্তর করিলেন—“Sudden lapse of memory ধীরেনবাবু! Sudden

lapse of memory। মেডিকেল রেকর্ডে এরূপ অনেক কেস্ সাইট করা আছে। অকস্মাৎ কাহারও কাহারও এমন স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকে যে জীবনের কতকাংশের সমস্ত ঘটনা একেবারে বিস্মৃত হয়ে যায়। কেহ কেহ হয় ত’ কোন একটা বিষয়ের কথা কিছুতেই মনে আনতে পারেন না। Eraser দিয়ে ঘেন স্মৃতিপট হ’তে ঘষে সে সমস্ত ক’ত তুলে ফেল দেখ। গত গত জিম্ বৎসরে আমাদের দেশের দ্রীমোকেরা কিরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হ’য়েছে—পুরুষের সঙ্গে সর্গে বিষয়ে সমান ভাবে কিরূপ চলা ফেরা করছে আপনার স্মৃতিশক্তি আপনাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে পারছে না। অকস্মাৎ আপনার এরূপ স্মৃতিশক্তি হ্রাস হওয়ায় আপনি দ্রীমোকেরদের স্বাধীন কাঞ্চিকলাপ দেখে আশ্চর্য্যাবিত হ’য়ে গেছেন। যা’ হ’ক আপনি ভাববেন না—আমি একটা Prescription করে দিচ্ছি—ব্যবহার করুন সম্ভবতঃ শীঘ্রই নষ্ট স্মৃতি ফিরে আসবে। কাহারও কিছু বলবেন না—কেবল মনে মনে ঘটনার পারস্পর্য্য স্মরণ কর্তে চেষ্টা করবেন।”

৪

একটা পূর্ণ উপলক্ষে আফিস বন্ধ ছিল। বৈকালে মরিটন কোম্পানীর কেসিয়ার উপেন বাবুর বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বেশি বেশির উপর ঢা প্রান্তরে সরগাম লম্বা একখানি চেয়ারে উপেনবাবু বসিয়া আছেন এবং অল্পে গৃহকোণে জানলার নিকট একখানি আরাম কেরদারায় অর্ধ শায়িত অবস্থায় কেসিয়ার গৃহিণী একখানি অর্ধ ছিন্ন পুস্তক পাঠে উন্মগ্ন হইয়া আছেন। উপেনবাবু একখানি চেয়ার আমার নিকটে টেলিয়া দিয়া বলিলেন—“এই যে ধীরেনবাবু! বহুদিন দেখা শুনা নেই—ছিলেন কোথায়?” অস্থ-হিত্তির কারণ বিবৃত করিয়া চেয়ার দখল করিয়া বসিলে আমার সমুখে এক পেয়াদা ঢা রাখিয়া দিয়া আমাকে পান করিতে অহুরোধ করিলেন। তা’রপর গৃহিণীকে সোধেদন করিয়া বলিলেন—“জল ঠাণ্ডা হ’য়ে যাচ্ছে—তোমার চাটী আগে খেয়ে নেওনা কেন?”

কেসিয়ার গৃহিণী পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া স্বর্ণমণ্ডিত

চন্দ্রমার মধ্য দিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হতব্রিত পুস্তক দেখাইয়া বলিলেন—“ধীরেনবাবু! ম্যাককিন্স-লারেলের স্লেগ কাল এই rare gemটা কিনিয়াছি।” ঢা পান করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“বহি ধানার নাম কি?”

কেসিয়ার গৃহিণী গর্জিত স্বরে উত্তর করিলেন—“Shakespeare—17th Century’s edition।”

উপেনবাবু বিম্বরণে বলিলেন—“বহিধানা rare সভা—কিন্তু ৫০০০ হাজার টাকা দাম টা—”

স্বামীর বাক্যে বাধা দিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—“High bid কিনতে হ’য়েছে—তা’ আমিও খীকার করছি—কিন্তু আমার বিশ্বাস British Museum ব্যতীত এ পুস্তক আর কোথাও নাই।”

উপেনবাবু ধনবান ব্যক্তি। ৫০,০০০ হাজার টাকা জমা দিয়া মরিটন কোম্পানীর অফিসে ৪০০০ টাকা মাহিনার কেসিয়ারা করিতেছেন—কিন্তু একখানি বহি ৫০০০ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিবার মত তাঁদের আর্থিক ক্ষমতা আছে কিনা জানায় আমি চূপ করিয়া থাকিলাম।

কেসিয়ার গৃহিণী আমাকে সোধেদন করিয়া বলিলেন—“ধীরেনবাবু! আপনি বলুন ত’ এ বহির দাম কি টাকায় তুলনা করা যায়?”

আমি বিনোদ্য গোপন করিয়া বলিলাম—“সে কথা সভা। কিন্তু এখন আমি আর সন্ধ্যাপিয়ারের ভক্ত নই—এখন লেজারের ভক্ত। অফিসে লেজারের পাতা উড়াইতে উড়াইতে বিভ্রাট। কেন—অন্ত সমস্ত লুপ্ত চাপা পড়ে গেছে।”

কেসিয়ার গৃহিণী বিজ্ঞপের কণ্ঠে বলিলেন—“বলেন কি? বয়েসের সঙ্গে সবই গেছে Sans teeth, Sans eyes, Sans taste, Sans everything except ledger।”

আমি উত্তর করিলাম—“কি করি বলুন? সময় গেলে ত’ অজ্ঞাত চর্চা কর্তে পারি?”

কেসিয়ার গৃহিণী—“এ সব পুরুষদের lame excuse যাচ্ছে ছুতো—আপনার দ্রী ত’ আমাদের Union Club

এর member—তিনি অফিসে চাকরী করেও তা’ মাহিত্য সেবা কর্তার সময় পান?”

আমি বিনীত হয়ে বলিলাম—“সত্যার সেবাটা যদি তিনি আমার যাড়ে না চাপাতেন কেবল অফিসের কাজ করতাই যদি থালাস পেতাম—তা’ হ’লে আমিও মাহিত্য-সেবা কর্তার সময় পেতাম।”

কে—গু—ঃ! সন্ধ্যার কাজ ত’ বড়? আপনার দ্রী Divorce প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলন করা সম্ভবে যুক্তি দেখাইয়া গত সপ্তাহে Club এ যে অল্পের প্রবন্ধটা পাঠ করেছিলেন—সেরূপ গবেষণাপূর্ণ Writing লিখতে যে সময় ব্যয় হয় সে সময়ে দশটা সন্ধ্যারের চাল ডালের হিসাব লেখা যায়।”

আমি—“সে কথা অব্যবহার্য্য করি না। কিন্তু দ্রী-পুরুষে উভয়েই যদি সভা সমিতি ও বক্তৃতা নিয়ে থাকে—তা’হলে সাংসারিক লুপ্ত বন্ধনটা কে দেখে বলুন?”

অর্ধদৃষ্ট স্বরে “Damn your সংসার” বলিয়া কেসিয়ার গৃহিণী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—আর আমার দিকে চাইিয়া—“Excuse me—Inspection এ রতকণ্ঠি বহি Butterworth-এর দোকান হ’তে নিয়ে এসেছি—সেগুলো এখনও দেখা হয় নাই—বলিয়া জতপদে দর হইতে প্রস্থান করিলেন।

আমি উপেনবাবুকে বলিলাম—“আপনার দ্রী ত’ দেখিছি পাতা Bookworm হয়ে উঠলেন।”

উপেনবাবু স্মরণে বলিলেন—“Worm বিষ। Beetle যাই হ’ল তাতে ত’ ক্ষতি ছিল না—কিন্তু যে রকম পড়া ছেঁড়া বহি Fabulus Price-এ কিনতে আরম্ভ করেছেন তা’তে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আর মাহিনার টাকাতো খেঁ গেলেই ঝাঁচি—বিষয়ে হাত না পড়লেই বন্দ।”

এমন সময় স্মরণ উকিল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—“এই যে ধীরেন বাবু এখানে। ভালই হ’ল আপনার ওখানে আর যেতে হবে না—আমি উপেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে যাব বনে করে এসেছিলাম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কেন? বিশেষ কোন দরকার আছে নাকি?”



মন্ত্রণ উত্তর করিল—“দরকার বলে দরকার! নরেশ বাবুর জী এয়ার Divorce Bill Councilএ move কর্ষেন বলে নৌশাণ পাঠিয়েছেন। আপনাবার জীই নাকি ও বিষয়ের প্রধান পাড়া। তিনিও নরেশবাবুর জী Councilএর মেম্বরের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে Canvass কর্ছেন। শুনতে পাঙ্কি জীলোক মেম্বরণ ত' ওঁহাদের Billএর স্বপক্ষে ভোট প্রদেবনই—অনেক পুরুষ মেম্বরের স্বপক্ষে ভোট দিতে স্বীকার পেয়েছেন।”

উপনবাবু বলিলেন—“সে ত' বেশই হচ্ছে। সর্গ-বিষয়েই জীলোকেরা যখন স্বাবীন হয়েছ—তখন ওঁটাই বা বাকী থাকি কেন?”

মন্ত্রণ বলিল—“মিছে নয়। সেদিন কোট হ'তে ফেরবার সময় দেখি আমার ছেলে বেটা একটা ছুঁড়ী ও মেয়েটা একটা ফোঁড়ার গলা ঘরে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সেট্যল এ্যান্ডিনিউ দিয়ে যাচ্ছে, বাড়ীতে এসে গৃহিণীকে বলায় তিনি মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন—“তোমার মন এখনও বড় সকাঁপ—ওরা College Chum—ওতে দোষটা কি হয়েছে?”

আমি বিষয় চিন্তে বলিলাম—“পুরাতন ইতিহাসে আমরা যে ভারতবর্ষীয় জীলোকগণের পবিত্র চরিত্র পাঠ করিয়াছি, এখন দেখছি—সেসব “Forgotten days” মন্ত্রণ বলিল—“এখন ওসব কথা থাক—চলুন একত্বে নরেশবাবুর কাছে যাওয়া যাক—বিলটা পাশ যাতে না হয় সে বিষয়ে সবাই মিলে একটা পরামর্শ করিলে।”

৬

পরদিন প্রাতে দ্বায়ে অফিস যাবার সময় দেখি বেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে দ্বারকান্ত মারা—

“অজ টাউন হল

বিরাট সভা

বিষয়—ডাইভোর্স বিল” ইত্যাদি

বক্তৃৎগের নামের তালিকা মধ্যে ডাক্তার ঘোষ-জায়া, উপনবাবুর জী, নরেশবাবুর জী, আমার গৃহিণী প্রভৃতির নাম অল্প অল্প করিয়া অন্তর্ভুক্ত।

আমার পার্শ্বে বসে একজন স্ত্রী-কোরাণী আর এক-

জন স্ত্রী-কোরাণীকে বলিতেছিল—“আজ সকাল সকাল অফিস হ'তে বেরকতে হবে—তা' না হলে টাউন হল জায়গা পাওয়া যাবে না।”

অপর বলিল—“তুই Billএর forএ না againstএ?”  
প্রথম—“নিশ্চই Forএ। তবে আমেরিকা নাকি Contract System অর্থাৎ ৪১০ বৎসরের জ্ঞত বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের মধ্যেও সেধু কবর্ত পারলে ভাল হয়।”

অপর হাসিয়া বলিল—“সবুর মেওয়া কলে। ক্রমে ক্রমে সেটাও হ'তে বাকী থাকবে না।”

বেলা ৪টা না বাজতেই বড় বাবুকে বলিয়া অফিস হইতে বাহির হইয়া টাউনহলে উপস্থিত হইলাম। পাচটার সময় মিটিং—কিন্তু ৪১টা না বাজিতেই টাউনহল ভর্তি হইয়া গিয়া সমুদ্র ময়দান লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। সভা-আম্বানকারিণীগণ টাউনহলের সমুদ্র ময়দানেই মিটিং করা স্থির করিয়া তক্তাপোষ পাতিয়া মঞ্চ প্রস্তুত করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। ৪টা বাজিয়া বাইলে মঞ্চের উপর বক্তৃৎগ এক এক দেখা দিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে পুরুষদের সহিত স্ত্রীদের বিল সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হাতাধাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল। আমি অনেক কষ্টে মঞ্চের নিকট একটা জায়গা পাইয়া-ছিলাম। সভাপত্রীর আস্রানে নরেশবাবুর জী বক্তৃতা দিতে পাড়াইয়া উঠিয়াছেন এমন সময় বেশিলাম দুবে ডেপুটী কমিশনার, কনেষ্টবল, মাউন্টেড পুলিশ ও সার্জেণ্ট সমভিষাহারে স্ত্রী-পুরুষের ভীড় তৈলিতে তৈলিতে অগ্নয় হইতেছেন। অগ্নয়ের পদতলে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কায় স্ত্রী-পুরুষ উভয় দর্শকগণ হুড়াহুড়ি জুড়াহুড়ি করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। মঞ্চের নিকট পৌঁছিয়া ডেপুটী কমিশনার সাহেব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। সভাপত্রীর হস্তে একখণ্ড কাগজ দিয়া বলিলেন—“পাশ্চাত্যদের আশঙ্কায় তিক কমিশনার ‘মিটিং বন্ধ করিয়া দিবার জ্ঞত এই নৌশাণ জারি করিয়াছেন। আপনাবার সভা তত্ৎ করিয়া দিন।”

সভাপত্রী নৌশাণ পাঠান্তে মঞ্চ বক্তৃৎগের সহিত

কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া ডেপুটী কমিশনারকে বলিলেন—“একপ বে-আইনী আরেণ আমরা মানিতে বাধ্য নহি। আমরা সভা করাই স্থির করিলাম।”

কমিশনার একটু বিম্বিত কর্তে বলিলেন—“আপনাবার কি বলছেন বোধ হয় বুঝতে পার্ছেন না। আপনাবার যদি সভা ভাঙ্গিয়া না দেন তাহ'লে আমাকে বাধ্য হইয়া জোর করিয়া সভা ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। আইন অমান্য করার জ্ঞত আপনাদিগকেও প্রের্ষার করিতে হইবে।”

সভাপত্রী সে কথা কপ্পা না করিয়া নরেশবাবুর জীকে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছিত করিলেন। নরেশবাবুর জী পাড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা দিবার উপক্রম করিলে ডেপুটী কমিশনার বংশীধ্বনি করিলেন। দেখিতে দেখিতে মঞ্চ সার্জেণ্ট ও পাহারওয়ালার ভর্তি হইয়া গেল। তাহার পাশ্চাৎ কোলা করিয়া বক্তৃৎগকে মঞ্চ হইতে নামাইয়া দিতে লাগিল। বক্তৃৎগ পুলিশের দাড়ি ছিড়িয়া দিয়া স্ট্রাচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাদের কার্যে বাধা দিতে

চেষ্টা করিতে লাগিল। এই বীভৎস দৃষ্টে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যেমন মঞ্চের দিকে অগ্নয় হইতে মাইব—একজন সার্জেণ্ট পার্শ্ব হইতে একটা প্রবল পাশ্চাৎ দিয়া আমাদের কুতলে ফেলিয়া দিল।

চৈতন্য হইলে চাহিয়া দেখি গৃহিণী বাটনারক্তিত হস্তে আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে বলিতেছেন—“বলি আজ কি আর অফিসে যেতে হবে না। এরিকে বেলা যে ৪টা বাজে।”

আমি কিছুক্ষণ বিম্বিত দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলাম—“ওঃ! তুমি! তাহ'লে এতক্ষণ কি পদ দেখ-ছিলাম।”

গৃহিণী স্নেহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন—“হা গো আমি! স্বপ্নস্বপ্নরীকে নিয়ে ভোর হয়ে থাকলে ত' আর পেট চলবে না। অফিসের-সাহেব ত' আমার নমাই নয় যে অফিসে না গেলেও মাসে মাসে মাহিনা পাঠিয়ে দেবে।”

তুল

শ্রীমতী মলিনী দেবী

এবারে সুস্থিরে ফাওন এলো না,—

শীতের হল না শেষ,

ধাক্কা ধাক্কা কাশিয়া উঠাই

রয়ে গেল অবশেষ।

দখিণা পবন কোথায় ঘুরিছে

পথটা করিয়া তুল

কোকিল এবারে ভাস্কিতে কুলেছে,

ফুটিতে কুলেছে ফুল;

বিরহিণী বধু এখনো ভাবিছে

শীতের হয়নি শেষ,

বাধিনি সে চুল, প্রেমেরতে রাজানো

পরেনি রজনী বেশ;

তবু কাণ্ডের পথ-চাওয়া-স্বপ্ন,

পাইনে তাহার তুল,

বাঁচিয়া থাকুক বিরহ আমার,

বাঁচিয়া থাকুক তুল।





### শ্রীকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

#### আতিশ

অনেক ধানি পথ উভয়ে কোন প্রকার আলাপ করিলেন না। আনন্দে, বিষয়ে, হরেন্দ্রাব্যুত যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন। স্মৃতিবীর অদ্ভুত শক্তি অবলোকন করিয়া তিনি একতরপ বিশ্বয় বিমুগ্ধের মত নিরীক হইয়া গিয়াছিলেন। অনেক পথ আসিবার পর বিমল জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কি মনে হয়, মেয়েটিকে পাওয়া যাবে কি?”

এ কথাই তিনি যেন লাফাইয়া উঠিলেন বলিলেন “বিমল পাওয়া যাবে কি। এ বিষয়ে কি এখন তোমার সম্বন্ধ থাকতে পারে। অদ্ভুত। অদ্ভুত! এর চেয়ে বিশ্বয়কর জীবনে কিছু দেখেছি বলে ত মনে হয় না। নিশ্চয় পাওয়া যাবে।”

বিমল বলিল, “লোকটার অদ্ভুত কন্মতা, কি বন্দন।  
“এ সম্বন্ধে কোন তর্ক বা শংশ উঠতে পারে না।  
উনি বহিঃ ইচ্ছা করেন আমার মনে হয় এই মেয়ে কোথায় কি ভাবে আছে সে কথাও বলে দিতে পারেন। তারপর কষ্টের একটি কোমল করিয়া বলিলেন “আপনার এ উপকার আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। আমার জীবনের পথ বললে গেছে যে বিমল। এমন সব লোক আজও আছে যারা সর্পি পত্তীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে

বসে থাকে, আর হিন্দুর শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস করে—  
বলে ও সব আজগুবি ব্যাপার, ইচ্ছা করে তাদের ডেকে এনে দেখিয়ে দি আজও যা আছে তা বোধ হয় আর.  
কোন দেশে আছে কি না সম্বন্ধ।”

বিমল এ সব কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং মুক্তিকার-দিকে চাহিয়া বলিল “আমি আপনার ছেলের মত আমাকে এমন করে বললে আমার ভারী লজ্জা করবে।”

পথ চলিতে চলিতে হরেন্দ্রাব্যুত বলিলেন, এমন খাটি লোক আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ইনি যদি কলকাতা যান ও টাকা উপার্জন করতে ইচ্ছা করেন, তা’ হলে টাকা রাখবার স্থান থাকে না।”

“উনি গরনা করে কারো নিকট থেকে টাকা নেন না। আমি দু-তিনবার দেবার চেষ্টা করেছি। এটাকে এটাকে উনি সাধনা হিসাবে দেখেন।”

কথায় কথায় এবার দুহস্তের ভিতর তাঁহারা টেপনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রাটফর্মের উপর অনেক আয়েসী সমাগম হইয়াছে। সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে ছুটোছুটি করিতেছে।

হরেন্দ্রাব্যুত জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিমল তুমি এখন বরাবর বাসায় যাবে না, টেপনে যাবে?”

বিমল উত্তর করিল “কলকাতার গাড়ী আসবার সময় হয়েছে। টেপন দিয়ে ঘুরেই যাব।”

হরেন্দ্রাব্যুত মন আজ খুব খুশী হইয়াছিল। স্তব্রাং তিনি বলিলেন, “এখন গাড়ী আসবে। চল আমারও দরকার আছে—অবনীরা আসবার কথা আছে, এগাড়ীতেও আসতে পারে, গাড়ীটা দেখে যাওয়াই ভাল।”

হরেন্দ্রাব্যুত ও বিমল যখন প্রাটফর্মের গিয়া প্রবেশ করিলেন, তখনও গাড়ী আনিতে দশ মিনিট বিলম্ব আছে। বিমল ‘ভার বর’ হইতে অহুস্ফান করিয়া আসিয়া জানাইল যে, পূর্ববর্তী টেপন হ’তে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আকিস হইতে একখানি চেয়ার আনিয়া হরেন্দ্রাব্যুতকে বসিতে অহরোধ করিল।

হরেন্দ্রাব্যুত বলিলেন “তুমি আমার চেয়ারের জন্ত কষ্ট করতে গেলে কেন? একই বেড়ান যাক। আজ সকাল থেকেই ত বসে আছি।” একটু ধানি প্রাটফর্মের উপর ঘুরিয়া হরেন্দ্রাব্যুত আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। এই সময় প্রবেশ, উমেশ, বিপিন ও হরেন্দ্রাব্যুত সকলে গাড়ী দেখিবার নিমিত্ত প্রাটফর্মের আসিয়া উপস্থিত হইল। হরেন্দ্রাব্যুত দেখিয়া তাহারা সকলে তাঁহার নিকট গিয়া পাড়াইল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল “এ গাড়ীতে কি কেউ আসছেন?”

হরেন্দ্রাব্যুত উত্তর করিলেন “তোমাদের গ্রামের মহেন্দ্রাব্যুত ছেলে অবনীরা আসবার কথা আছে। ভদ্রালায়, গাড়ী এখন আসবে, তাই দেখে ঘাই, যদি সে আসে। সে সূতন লোক, এখানে কোন দিন আসে নাই। প্রবেশ ত তাকে কখনও দেখে নাই—চিনতে পারবে না। তুমি অবজ্ঞা কেন।”

এই সময় একটা বিকট বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে সর্ক হইয়া উঠিল। বাহারা বসিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া পাড়াইল। বাহারা পাড়াইয়াছিল, তাহারাও নিজ নিজ জিনিসপত্র গুছাইয়া সম্মত হইয়া গাড়ী আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, গাড়ী আসিয়া টেপনে প্রবেশ করিল। ফেরিওয়ালাগণ জরুজগতিতে গাড়ীর জালাবার নিকট নিজ নিজ দ্রব্য হাঁকিয়া গেল।

হরেন্দ্রাব্যুত ও অজ সকলে দেখিতেছিলেন, কোন বাহাণী বাহু গাড়ী হইতে অবতরণ করে কি না।

উমেশ বলিল “ঐ যে অবনী এসেছে।”  
অবনী গাড়ী হইতে নামিয়া স্থানীর সাহায্যে জিনিসপত্র নামাইতেছিল এবং চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল, কোন লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছে কি না।

হরেন্দ্রাব্যুত গাড়ীর নিকট গিয়া বলিলেন “এই যে তুমি এসেছ। বাড়ীর সংবাদ সব ভাল ত? গাড়ীতে কোন কষ্ট হয় নাই ত?”

অবনী তাড়াতাড়ি হরেন্দ্রাব্যুতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অনেকগুলা জঙ্কনী কাছ হাতে থাকায়—শেষ করে আগতে একখনি বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিল “আপনার শরীর কেমন আছে? জ্যাঠাই মা ভাল আছেন? প্রবেশ এখানে আছে ত? তার সঙ্গে, অনেকদিন দেখা শুনা হয় নাই। হয় ত সে আমাকে চিনতেই পারবে না।

হরেন্দ্রাব্যুত বলিলেন, “সবাই ভাল আছে। প্রবেশও এসেছে, প্রবেশ কোথায় গেলি? তোর দাদাকে প্রণাম কর।” উমেশ তখন সমুখে আসিয়া অবনীকে নমস্কার করিল, এবং তার মার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। অবনী বলিল “সব ভাল আছে।” প্রবেশ প্রণাম করিয়া অবনীরা মূখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবনীকে লইয়া সকলে যখন বাসার দিকে ফিরিতেছে তখন উমেশ বলিল, “প্রবেশ দেখেছ, নদীর টেপনে কি করতে এসেছিল। ঐ বেরিয়ে যাচ্ছে।”

প্রবেশ বলিল, “আমি ত দেখছি। বেটা অনেককণ খুঁবে টেপনে ঘুরছিল। আমারের দিকে কটমট করে চাইছিল। আমার মনে হয়—বেটা বোধ হয় এখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টাও আছে; তাই গাড়ীর সন্ধান নিতে এসেছিল।”

উমেশ বলিল, “তাও হতে পারে।”

এই সময় অবনী বলিল, “তোমার মা বলে দিয়েছেন, এবার যখন ছুটি থাকবে তখন একবার বাড়ী যেও।”

উমেশ উত্তর করিল “এবারই যাবার ইচ্ছা ছিল। তবে শরীরটা বড় ভাল ছিল না, আর এ দিকে দেখ-



লাম, একটু 'চেঞ্চে'ও দরকার তাই এঁদের সঙ্গে এসে পড়লাম।"

সেনিন যখন অবনীকে সঙ্গে করিয়া হরেন্দ্রাব্দ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন নানা কথাই সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িল।

কর্ণাময়ী অত্যন্ত স্নেহ-ভরে অবনীকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন "অনেক দিন তোমাকে দেখিনি অবনী। বসো বাবা! বসো একটু ভাল করে দেখি। এলাহাবাদ থেকে আসবার পর, তিন চার বার মাত্র তুমি তোমার বাবার সঙ্গে এসেছিলে আমাদের বাসায়। এখন বেশ বড় হয়েছে। উকীল হয়েছে—আর কি জ্যাঠাই মাকে মনে থাকে। বোমা কেমন আছে! একবার সঙ্গে এনে দেখালে না ত?"

অবনী কর্ণাময়ীর কথা শুনিয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া উত্তর করিল, "এলাকাই সব দেখতে হয়।"

কর্ণাময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন "সব যখন দেখতে হয় বাবা তখন জ্যাঠাইমাকে কি বাব দিয়ে দেখতে হয়—এ ঠিক উকীলের বুদ্ধি হলো না।"

এই সময় লতিকা চা ও জলখাবার লইয়া আসিয়া হাজির হইল। একখানি আসন পাতিয়া বলিল "অবনী দা জল খান।" "মা অবনী-দা উকীল হয়ে বড় একটা আমাদের খেঁজ রাখেন না।"

অবনী বলিল "আমি ত তোমাকে মাঝে মাঝে পত্র দি। তবে কেন বলছ খেঁজ রাখি না।"

লতিকা বলিল, "সে আমি পত্র দিয়ে খেঁজ নিলে তবে আপনি তার উত্তর দেন।"

"এবার কিছু কাকীমা ও বৌ-দিককে আমাদের বাড়ী পাঠাতে হবে এমন থেকে বল রাখছি।"

অবনী জল খাইতে খাইতে হাসিয়া উত্তর করিল, "ঠ্যা জ্যাঠাই মা, লতিকা যখন এত জোর তুলব দিচ্ছে, তখন নিচ্ছই ওর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গিয়েছে।"

লতিকা বলিল "হান। আপনার এক কথা। বিবাহ না হ'লে বৃষ্টি আর কারো আসতে নেই। অমনি অমনি বৃষ্টি সোটা আকারণ আসা হয়?"

কর্ণাময়ী বলিলেন, "লতিকার বিবাহের এখনও

কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি। আর দেবী করাও চলে না।"

কর্ণাময়ীর কথাই ব্যাধা দিয়া লতিকা বলিল "অবনী-দা, আর কি আনব বলুন?" বলিয়া সে উঠিয়া দাড়াইল। অবনী বলিল "বিবাহের কথা হইতেছে শুনিয়া একটা অছিলা করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাও।"

"আচ্ছা কেমন পান সাম্রাজ্যে শিবেছি দেখা। ভাল করে পান দেখে নিয়ে আয়—আজ ছু-দিন গাড়ীতে পান পাওয়া হয় নি।"

লতিকা পান সাম্রাজ্য আনিবার জন্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল।

"আচ্ছা জ্যাঠাই মা, আমি একটা ভাল পাত্র বেছেছি লতিকার জন্য।"

"বেশ ত বাবা! বেশ ত! মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে মত শয় হয় ততই ভাল। সেই জন্ত আমি লতির কলমে পড়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি। গেরত ঘরের মেয়ের বেশী কিছু পাড়ার দরকার কি বল! আমাদের লতির তুলনায় লিটুই শিখিনি, তা বলে কি আর সংসার চলছে না? তবে আজকালকার মেয়ে লেখাপড়া না জানলে ছেলের পছন্দ হয় না। মেয়েরা ত আর রোজগার করে টাকা আনবে না কি বল বাবা?"

অবনী বলিল, সে কথা ঠিক। আসল কথা হচ্ছে, বর্তমান সময়টা হচ্ছে একটা ভীষণ পরিবর্তনের যুগ। পরিবর্তনে সকল দিক দিয়ে নিতে অনেক বিলম্ব থাকলেও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতেই হবে। তার ভাল মন্দ বিচার ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত আছে।

"তুমি যে পাত্রের কথা বলছ, সে ছেলেটি কেমন!"

"আপনার ও জ্যাঠামশায়ের যুগ পছন্দ হবে। তাদের ছুপহার সংস্থান আছে। চাকরী বাকরী করে যে খেতে হবে এমন অবস্থা নয়। তারপর যেমন ছেলে তার মা ও তেমন—এমন হুমুর মেজাজের মানুষ আজকালের দিনে দেখা যায় না? আপনি মত করিলে এখন ঠিক করে ফেলতে পারি।"

"বেশ ত বাবা! তোমার জ্যাঠামশায়ের কাছে আজ পাওয়া দাওয়ার পর এ কথা প্রস্তাব করবে। তবে

তিনি বলেন "নন্দিনীর বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই লতিকার বিবাহ দেবেন না।" বলিয়া নন্দিনীর জ্ঞ কর্ণাময়ীর নয়ন হইতে ছুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

এবার অবনীও আর্থি-পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "সত্য বলিতে কি, জ্যাঠামশাইএর নিকট হ'তে তার পেয়ে মনে বড় আশা হ'য়েছিল বৃষ্টি নন্দিনীর সংসার পাওয়া গিয়াছে। মাত' উদ্ভূত হয়েই আছেন। তিনি মুখে কোন কথা প্রকাশ না করলেও এই টেলিগ্রাম যাওয়ার পর থেকে তার মনের মধ্যে একটা প্রবল আনন্দ দেখা গিয়েছে। হৃদয়বাদের দিতে না পারিলে, এ ধাক্কা সামান্য মার পক্ষে বড়ই কঠিন হবে এখন থেকে বুঝতে পারছি। আমিও আশঙ্কায় জ্যাঠামশাইকে এখনও পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি। তিনিও কিছু বলেন নি।"

"এই দেখ না আমিও কথায় কথায় তাঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি! তিনি আজ সকালে কোঠা নিয়ে একজন ভাল জ্যোতিষীর নিকট গিয়েছিলেন। কি হলো! তাঁকে ডাকাচ্ছি এখন।"

এই সময় লতিকা একরাশ পান সাম্রাজ্য লইয়া আসিয়া বলিল, "পান খান অবনী-দা কিন্তু সমালোচনা করতে পারবেন না।"

সমালোচনার বেলায় এত ভয় কেন। সমালোচনা না করলে, দোষ সংশোধন হবে কি করে! এই প্রশ্নমেই

দেখ, একটা মাহারের জন্ত যদি এত করে পান সাম্রাজ্য—তা' হ'লে যে সংসারের তুমি কতী হবে সে সংসার অধিরে যে দেউলে হ'য়ে যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

লতিকা উত্তর করিল "এই যে ধানিক আগে আপনিই বললেন, যে ছ'দিন পান পাওয়া হয় নি।"

"সে জন্ত কি ছ'দিনের পান এক দিনে তাকে খেতে হবে? না তোমাকে তাই দিতে হবে?"

কর্ণাময়ী বলিলেন, "লতিকা একবার ঠেকে এখানে ডেকে আন ত!" কিছুক্ষণের মধ্যেই হরেন্দ্রাব্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবনী তখন মনে মনে লতিকার বালিকা-স্বলভ সরলতার কথা চিন্তা করিয়া বিশেষ আনন্দ অস্থলব করিতেছিল।

হরেন্দ্রাব্দকে দেখিয়া কর্ণাময়ী বলিলেন, "অবনী বলছিল, নন্দিনীর কি কোন সংবাদ পাওয়া গেল!"

সেই কথা তখন থেকেই বলব মনে করে ভুলে গিয়েছি। আজ বড় আনন্দের দিন। জ্যোতিষী বলেছেন নন্দিনীকে পনের দিনের ভিতর পাওয়া যাবে। এ কথা শুনিবামাত্র সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত হ'য়ে নিন্দীক হইয়া গেল।

হরেন্দ্রাব্দ বলিলেন "জ্যোতিষী অবনীকে খেঁজিতে চাইয়াছেন। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব তাঁর কাছে।"

অবনী রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তা'হলে নন্দিনীকে পাওয়া যাবে জ্যাঠামশাই?"

(ক্রমশঃ)







## দেবতার দান

(টলস্টয়ের গল্প হইতে)

শ্রীধরকুমার বসু

১  
যুটোচি কিয়তোহা সহরের একজন বৃদ্ধ মুচি। তাহার মত কারিকর সহরের মধ্যে আর নাই। সহরের যত বড়লোক তাহার প্রস্তুত জুতা ভিন্ন পরিহিত না; সভাই তাহার হাতের তৈরী জুতা অল্প মুচির জুতা অপেক্ষা স্থম্বর ও মজবুত হইত। হুতরাং সকলেই তাহার হাতের প্রস্তুত জুতা কিনিবার জন্য যত হইত। তাহা ছাড়া বৃদ্ধ যুটোচির আর একটা গুণ ছিল। সে কখনও দাম লইয়া কেতার সঙ্গে বেসী দর কবাকবি করিত না। হাঙ্গমুখে সকলকেই সে দোকানে অভ্যর্থনা করিত এবং কেতারও সে বাহা বলিত, সেই দাম দিয়াই জিনিষ লইত।

সে ছিল অশুভ্রক। জগতে তার আপনার জন বলিতে একমাত্র গ্রীহী ছিল। নন্দ্যাতীর প্রথম যৌবনে ফুলের মত কোমল স্থম্বর দুইটা কচি শিশু একে একে তাহারের আঁধার ঘর আলো করিতে আসিয়া অকালে করিয়া পড়ে। তাহার পর তাহাদের হৃদয় শৌরভটুই হৃদয়ের গোপন পেটিকায় অতি বস্ত্র ধরিয়া রাখিয়া সেই দিন মুচি-দম্পতী দিন কাটাইত। সংপথে থাকিয়া বাহা কিছু উপায় করিত তাহাতেই স্বচ্ছন্দে তাহাদের চলিত। প্রান্তে ও সন্ধ্যায়

ভগবানের নাম করিত আর মধ্যে মধ্যে মৃত শিশু-দ্বয়ের জন্ত দুই এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিত।

সে সর্বদাই রাতুর ধারে তাহার ছোট দোকান ঘরে বসিয়া কাজ করিত। তার প্রতিবাদিনী তেওনি যখন তার লাল বস্তুর সান্টিনের জামা ও কাঠের জুতা পরিয়া, মাথায় ভিনের রঙা কাপড় লইয়া বাজারে যাইত, চলিবার সময় মূৰ কিরাইয়া দেখিত যুটোচি কাজ করিতেছে। প্রতিবাদী কামাহুয়া যখন দুখ বেচিয়া সম্ভার সময় বাড়ী আসিত তখন সেও দেখিত বর্ষাক্রান্তি, টাকগোলা বৃদ্ধ যুটোচি বসিয়া কাজ করিতেছে। বি তার সন্তিত চোখা-চোবি হইত, বৃদ্ধ হাসিয়া তাহাকে নন্দ্যাতীর করিত।

২

জাহাযারী মাস। চারিবিকে কেবল দুয়ার পাত হইতেছিল। কোথাও একটা তুণ বা গাছের পাতা নাই। যেদিকে চাও কেবল সাদা, বরফে বাড়ী-ঘর সব যেন সাদা হইয়া গিয়াছে, আর কেবল শীতের শোভা বাতাস হু হু শব্দে বহিয়া যাইতেছে। কোথও জন প্রাণীর সাদা শব্দ নাই। চারিবিক নিশব্দ নিশব্দ।

এমন একদিন সকাল বেলা যুটোচি উঠিয়া চায়ের জন্ত

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩শ সংখ্যা]

দেবতার দান

১১১৯

গরম জল চাপাইয়া দিল এবং সেদিন বোধিসত্ত্ব অমিতাভের জন্মদিন ছিল বলিয়া কাজ-কর্ম বন্ধ করিয়া একখানি পুস্তক খুলিল। যে পাতা সে প্রথমেই খুলিল তাহাতে এই কবিতা কথা সে পাঠ করিল—“সর্গ জীবের দয়া করিবে • • যদি কোনে দুষ্টাত্মর তোমার নিকট আসিয়া ছুটী অন্ন চায়, তৎক্ষণং তাহাকে মাধ্যমত অন্ন দিবে—জানিবে আমার দুষ্টা পাইয়াছে; যদি কেহ শত ছিন্ন বাস পরিয়া তোমার নিকট আসে—জানিবে আমার বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে; যেখানে অন্নাত, আতুর, রোগগ্রস্ত দেখিবে—জানিবে তাহার। আমারই প্রতিমূর্তি এবং মাধ্যমত দেবা করিবে” গড়িতে গড়িতে যুটোচির সমুদ্রবিশ পুস্তকের লেখা সকল যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। চক্ষু দিয়া তাহার অক্ষধারা গড়িতে লাগিল, হৃদয় একটা অযাক্র আবেগে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ সে যেন ভুলিতে পাইল কে যেন ঘরের স্বন্দকার কোণ হইতে বসিতেছে “যুটোচি! আমাকে পেতে হলে জীবের দেবা কর।”

কতক্ষণ সে এইরূপ বাহজ্ঞান শূন্য অবস্থায় ছিল তাহা সে জানে না। তারপর সে চমকাইয়া উঠিয়া দেখিল যে তাহার পত্নী বলিতেছে ‘তুণ করে বসে কি ভাবচ’। চা বরেনা না? চল, শীঘ্র অমিতাভের ঘনির্ঘরে যাই। এখন যে উৎসব আরম্ভ হবে।’ যুটোচি কথা কহিল না কেবল মাথা নাড়িল। তারপর অশ্রু মুছিয়া বসিয়া চা পান করিতে লাগিল।—চা পান করিতে করিতে সে ভাবিতে পাইল যেন বাহিরে “মা” “মা” বলিয়া কে ডাকিতেছে। একটি মনোযোগে যিহা তনিল যে কচি গলায় ডাকিতেছে “মা! মা!” তখন সে বিম্বিত স্বরবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর খুলিল এবং দেখিতে পাইল যে যুব ছোট ফুলের মত স্থম্বর ছুটী ছেলে হাত ধরাধরি করিয়া দরজার নিকট ধাঁড়াইয়া বহিয়াছে।

একটা ছেলের বয়স ৬ ও ৭ বৎসর এবং অপরটির বয়স ৩ বৎসর। ছোটটি অত্যন্ত শিশু। ভালরূপ কথা বলিতে পারে না। বড়টি তার হাত ধরিয়া আছে, পাছে তাহার ভাইটি হারাইয়া যায়। তাহাদের বোধ হয় কেইক নাই—অন্নাত। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহাদের হাত

ধরিয়া বলিল—“আহা! বাহারা এস, আমার ঘরে এস।” বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিল এবং অন্নাত শিশুকে দেখিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল “ইহারা কারা?” বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া আসিল। সে বলিল, “ইহো! এরা অন্নাত।” বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণ নৈবে বলিল, “আহা! ভগবান এদের মদল করুন।” তারপর শিশু-দ্বয় বলিল, “মা, বিদে পেয়েছে, শীত পড়েছে।”

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাদের আগনের কাছে বসাইল ও দুই পেয়ালা চা ও দুইখানি রুটি খাইতে দিল।

তাদের পরিধানে গরম জামা ছিল না। যাহা কিছু পরিচ্ছন্ন ছিল তাহাও ছিন্ন ও মলিন। পায়ে জুতা ছিল না, শীতে বেচারীরা কাপিতেছিল। এখন আগনের উত্তাপ পাইয়া তাদের বড় আনন্দ হইল। ছোট ছেলেটি উমানের উপর কোমল হাত ছুটী মেলিয়া হাসি মুখে বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিল। বৃদ্ধ ইতিমধ্যে তাহার বিছানায় বেশ পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া দিল ও দুটা ছোট জামা আনিয়া শিশুদ্বয়কে পরাইল। তাহার। নূতন জামা পাইয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিল এবং বড় ছেলেটি বলিল—“মা! এবার কি আমরা শুভে যাব?” ছোটটিও বৃদ্ধার দিকে হাত তুলিয়া বলিল—“মা, ঘুম।” বৃদ্ধ-দম্পতী তাদের ফুলের পাগড়ীর মত কোমল কণ্ঠে চুপন দিয়া তাদের কোলে তুলিয়া লইল ও বিছানায় শোয়াইয়া দিল। মুহূর্তের মধ্যে শিশু দুটি স্থপ্তির কোক্ষে নিমগ্ন হইল। কিন্তু সেই নিমিত্ত অবস্থায়ও তাহারা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়াছিল। কেবল তাদের শিরের জাগিয়াছিল চারিটা সজল স্নিগ্ধ চক্ষু। বৃদ্ধের কেবলই মনে সেই উপলব্ধের বাবাগুলি জাগিতে লাগিল—“যে ছুটী অন্ন চায়, তাহাকে মাধ্যমত অন্ন দিবে—জানিবে আমার দুষ্টা পাইয়াছে।” যে শতছিন্ন বাস পরিয়া তোমার নিকট আসিবে—জানিবে আমার বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে • • • বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া ফোটা ফোটা অশ্রু গড়িতে লাগিল।

চক্ষু মুছিয়া যুটোচি বলিল—ইহো!

ইহো বলিল—কি?

বৃদ্ধ গাঢ়স্বরে বলিল—এত দিনে দেবতার দয়া হইল, এ ছুটি তাহারই দান।





মহানগরী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকা  
সার সঞ্চালন

## সত্যের পরীক্ষা

পরিবর্তন

যে সময় আমি নাচ শিখিতে ব্যস্ত ছিলাম সে সময় আমি যে কেবল কীবনটাই উপভোগ করিতেছিলাম একথা কেহ ভাবিবেন না। পাঠকল্প লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে সে সময়েও আমি আত্মারা হই নাই। এই ষোড়শের মাধ্যম পড়িয়াও আমি নিজের বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিতাম। আমি যাহা কিছু খরচ করিতাম তাহার পাইদারি পর্য্যন্ত হিসাব রাখিতাম। অতি সামান্য ছোট ছোট খরচ, যেমন বাসের ভাড়া, ভাষকখরচ, ব্রহ্মের কাপড় কেনা প্রভৃতি—সমস্তই লিখিতাম এবং প্রত্যহ শুইবার সময় জমাখরচ করিয়া বাকী মিলাইয়া দেখিতাম। এই অভ্যাসটী আমার আজ পর্য্যন্তও আছে এবং ইহার জন্তই সাধারণের লাখ লাখ টাকা নাড়াচাড়া করিলেও ঐ সমস্ত টাকা খরচের সময় খুব সাধবানতা অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, ফলে কোনোর পরিবর্তে ব্যবহারই বাকী মজুত পাইয়াছি। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে প্রত্যেক যুবককে আমি সতর্ক হইতে উপদেশ দেই এবং তাঁহার যাহা কিছু খরচ করেন সেই সমস্তের হিসাব রাখা অভ্যাস করিলে পরিপাণে তাঁহার লাভবান হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমার নিজের ব্যক্তিগত খরচের উপরও আমি ব্যবহার খুব কড়া নজর রাখিতাম কারণ আয় বৃদ্ধি বায় করাই উচিত বলিয়া আমি মনে করি। সেইজন্য আমি আমার খরচের অর্ধেক কমাইয়া ফেলিতে মনস্থ করিলাম।

যানবাহনাদির খরচ আমার যথেষ্ট দিতে হইত। গৃহস্থ পরিবারে থাকিতে হইত বলিয়া আমাকে প্রতি সপ্তাহেই পরিকা দিতে হইত। সেই আমায়ইর কোন লোককে ভিন্মারে নিমন্ত্রণ করিলে এবং তাহাদের সহিত পার্টিতে যাইলে, বাতায়াত বাবদ অনেক খরচ হইত। সখী যদি মহিলা হইতেন তবে সমস্ত খরচ পুরুষ সহচরকে বহন করিতে হইত—এইরূপই গুণের পদ্ধতি। বাহিরে যাইলে সেটা বাড়তি খরচ হইত কারণ বাড়িতে না থাওয়ার জ্ঞান সাম্প্রদিক বিলে কিছু বাদ পাওয়া যাইত না। আমার মনে হইল যে চেষ্টা করিলে এসব খরচের অনেকটা বাঁচাইতে পারা যায় এবং জুয়া মর্যাদা রক্ষা করিতে যেরূপ বাজে খরচ হয় তাহাও অনেকটা কমান চলে।

ভাষিয়া চিন্তিয়া আমি একটা ঘর নিজের জন্ত ভাড়া করাই স্থির করিলাম এবং নিজের কাপড়ের আয় বৃদ্ধিও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া থাকাই ঠিক মনে করিলাম। ইহাতে বহুস্থান পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতাও লাভ করা যায়। এমন জায়গায় ঘর লইতাম যে, সেখান হইতে গায়ে ইটিয়াও আধ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থলে পৌছান যাইত—ইহাতে বাতায়াত বরচ ব্যয়িতা যাইত। আগে আমি কোথাও যাইতে আসিতে হইলে বস প্রভৃতি যান ব্যবহার করিতাম এবং ভ্রমণের জন্তও কতকটা শতভ্রম সময় নষ্ট করিতাম। নূতন বন্দোবস্তে পরদাও বাঁচিত এবং প্রত্যহ ৮ হইতে ১০ মাইল ইটার জন্ত ব্যায়ামের কলও লাভ

দ্বিতীয় বর্ষ ৩তম সংখ্যা]

ইয়ং ইন্ডিয়া

১১২১

হইত। ইংলণ্ডে বাসকালীন আমার যে বড় একটা অস্থব্ধ বিহ্বল হয় নাই ও আমি বেশ সবল ছিলাম তাহার প্রধান কারণ নিম্নোক্ত এই দীর্ঘ ভ্রমণ।

আমি দু'টা কামরা লইয়াছিলাম, একটিতে বসিতাম—পত্রিকাটিতে শুইতাম—ইহা আমার দ্বিতীয় দশা—তৃতীয় দশার কথা পরে বলিতেছি।

এই ব্যবস্থার আমার খরচ প্রায় অর্ধেক কমিয়া গেল—কিন্তু কি করিয়া সময় কাটে তাহাই মস্ত চিন্তার বিষয় হইয়া পড়াইল; কারণ ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার জন্ত পড়িতে খুব বেশী সময় লাগে না—সুতরাং সেজন্য আমার বেশী সময় লাগিত না। তবে আমি ইংরাঞ্জীতে যে কীচা ছিলাম সেজন্য আমি ব্যবহারই স্কুটিত বোধ করিতাম। মি: লেলীর (যিনি পরে সার ফ্রেডরিক লেলী হইয়াছিলেন) "অক্সে বি-এ, পাশ কর তাৎপর্য আমার কাছে আসিল" কথাটি তখনও আমার কাছে বাজিত। সেইজন্য মনে মনে স্থির করিলাম যে ব্যারিষ্টারী পাশ করা ছাড়া সেখানকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রীও আমায় লইতে হইবে। কেবলমাত্র ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেজন্য আমি যোগ্য করিলাম—কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শও করিলাম কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, কারণ অল্পস্থানে জানা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইতে হইলে আমায় সেখানে আরও অধিকদিন থাকিতে হইবে এবং খরচও অনেক বেশী হইবে। একজন বন্ধু বলিলেন যে যদি কঠিন রকমের একটা পরীক্ষা পাশ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে তুমি 'লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন' পাশ কর তাতে বিশেষ এমন খরচ কিছুই নাই। এবং ইহার জন্ত পরিতোষিত আমায় প্রচুর এবং এইবার পরীক্ষার উপযুক্ত হইতে হইলে সাধারণ জ্ঞানও খুব বাড়িয়া যায়।" কথাটা আমার মনে বেশ লাগিল কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের স্থলীর্ঘ বর্ধ দেখিয়া প্রাণে ভয় হইল। অপর পরীক্ষায় লাতিনও একটা আধুনিক ভাষা আবহু পাঠ্য। লাতিন কি করিয়া শে শিখিব তাহা বড় চিন্তার কথা। লাতিন কিছুরই আমার লাতিন শিখিবার উদ্দেশ্যে, খুব উৎসাহিত করিয়া বলিলেন "দেখ, ব্যবহার্য-জীবনের লাতিন শেবা আবশ্যক, আইনের বই পড়িতে

লাতিন ভাষা জানাটী খুব কাজে লাগে। রোমান 'থ' এর একখানি গ্রন্থ পড় লাতিনে লেখা থাকে আর তাছাড়া লাতিন জানা থাকলে ইংরাঞ্জীতেও সহজে বেশ ভাল দখল জন্মে।" কথাটা বেশ মনে লাগিল—আমি মনে মনে লাতিন শিখিতে রুতসাক্ষ হইলাম—তা সে যতই কঠিন হউক না কেন? পূর্বেই আমি ফ্রেন্স পড়া আরম্ভ করিয়াছিলাম সুতরাং সেইটাকেই 'আধুনিক ভাষা' হিসাবে পড়ি টিক করিলাম। আমি একটা গ্রাইডেট ম্যাট্রিক র‍্যাশে যোগদান করিলাম। প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা হয় কিন্তু তখন পরীক্ষার আর পাঁচমাস মাত্র বাকী সুতরাং আমার পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটী খুব গুরুতর ব্যাপার হইয়া পড়াইল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে যে নিম্নলিখিত ইংরাঞ্জী ভদ্রলোক পড়িতে ছিল সে আজ একাগ্রচিত্ত ছাত্রের পরিণত, হইয়াছে—কাজেই কঠিন হইলেও নিরাশ হইবার কোন কারণ ছিল না। আমি সময় ঠিক করিয়া লইলাম কিন্তু আমার বুদ্ধি বা শ্রুতিপত্তি ঐ অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে অস্বাভাবিক বিষয়ে ব্যাপ্তি দান করিয়া আবার লাতিনও ফ্রেন্সে অধিকার দিতে পারিল না। ফলে আমি লাতিনেই ফেল হইলাম। কিন্তু এতে আমার নিরাশ হইবার কিছু ছিল না। কারণ আমি লাতিন ভাষার একটা আশ্রয় আধা ছিলাম সুতরাং আমি ভাবিলাম যে আর একবার চেষ্টা করিলে আমার ফ্রেন্স আরও ভাল হইবে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান অল্প একটা মৃত্তন বিষয় লইব। পূর্বে আমি বিজ্ঞান বিভাগে 'গ্যারান' লিখিয়ালাম কিন্তু উপযুক্ত অংশগুলির (Experiment) অভাবে ইহা আমার তখন প্রতিক্রিয় হয় নাই। তবে তারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেড়া বাখাতা ছিল বলিয়াই আমি লণ্ডনের পরীক্ষায় ইহা লইয়াছিলাম এখানে 'উত্তাপ ও আলোক' নামক বিষয়টী রসায়নের পরিবর্তে লইলাম। সফলের দ্বারগা যে ইহা অতি সহজ—এবং আমারও তাই বোধ হইয়াছিল।

আর একবার পরীক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার নিজ বাবদ খরচ কমাইবার জন্ত আমি আর একবার চেষ্টা করিলাম—আমার মনে হইতে লাগিল যে যেভাবে আমি চলিতেছি তাহা আমাদের মত মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের



যোগ্য নহে। আমার সেই জীবনসংগ্রামে রত ভাইটীর—  
যিনি বলিষামাত্র আমার অর্থাৎ পূর্ব করিতেছেন—কথা  
মনে পড়িলে মনে বড় ব্যথা পাইতাম। আমি দেখিলাম  
যে বাহারা মাসিক আট হইতে পনের পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ  
করে তাহার। বৃত্তি পায়। আর চোখের সামনে অনেক  
দরিদ্র ছাত্র কিরূপে স্বল্প ব্যয়ে চালায় তাহাও দেখিতে  
পাইলাম। একটীর কথা আমার মনে আছে, সে বতীর  
মধ্যে একখানি ঘরে থাকিত সপ্তাহে দুই শিলিং ভাড়ায়;  
এবং লকহাটের সত্তার কোকার দোকান হইতে ৮০  
আনার কোকা ও রুট খাইয়া দিন কাটিত।

অবশ্য তার মত কষ্ট সহ করিবার ক্ষমতা আমার  
ছিল না, কিন্তু আমি ভাবিলাম যে ছুটি ঘরের পরিবর্তে  
একটি ঘরে আমি কাজ চালাইতে পারি এবং নিজের  
খাবার কিছু কিছু রাখিয়া লইতে পারি—এরূপ করিলে  
মাসে ৪০ পাউণ্ড বাঁচিয়া যাইতে পারে। অন্যদিক দ্বারা  
জীবন যাপন করা সম্ভবে পুস্তক ও ২৪ বানি পাঠ  
করিলাম। ফলে দুইটি ঘর ছাড়া দিয়া একটি মাত্র

ঘর লইলাম এবং একটি ঠোঁড় কিনিলাম। রাত্রি করিতে  
২০ মিনিটের বেশী লাগিত না কারণ কোকারের জন্ত  
জল গরম করা ও ‘ওটমিল পরিষ্কার’ প্রস্তুত করা, এ ছাড়া  
আর কিছু করিতাম না। এইরূপে দৈনিক এক শিলিং  
ও পেনী ব্যয়ে আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগি-  
লাম। এই সময় আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে  
পাঠ্যভাষ্য করিতাম এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তে জীবন যাপন  
করিয়া আমার সময় অনেক বাড়িত বলিয়া আমি  
পরীক্ষাও কৃতকার্য হইলাম।

এসব ব্যাপার পড়িয়া পাঠক যেন ভাবিবেন না যে,  
আমার জীবনটা মল্লভূমির মতই নীরস হইয়াছিল বরং  
ইহার জন্ত আমার জীবনের ভিতর ও বাহির দুইটা  
দিক একই পথে চলিতেছিল। আর এভাবে জীবন  
যাপন করা আমাদের সাংসারিক অবস্থার অমূল্যত্বই  
হইয়াছিল। এইরূপে থাকিয়া জীবনটা সত্যের পথে  
চলিতেছিল এবং আমার অন্তরও আনন্দে ভরিয়া উঠিতে-  
ছিল। (তমশঃ)

## অপরূপ

### শ্রীলীলাদেবী

এক হাতে তার জগৎ সাধন  
এক হাতে তার বীণী  
এক চোখে তার অশ্রু বধন  
অপর চোখে হাসি  
এক অঙ্গীমে মহা প্রণয়  
দ্বিধলয়ে স্বাক্ষর  
অপর সীমায় সৃষ্টি বিধায়  
নিত্য প্রেমের রাসিকা!

এক পাশে তার বিয়োগ উল্লস  
রক্ত বরণ জবা  
অপর পাশে দ্বিতীয় কল  
শব্দ সুহৃৎ ভা!  
এক হাতে বায় কালের গতি  
অপর চির স্থির  
এক নয়নে দিব্য জ্যোতি  
অপর চোখে নীর!



চৈত্রের চৈত্র

শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র বহু ‘ইংলিসম্যানের’ বিরুদ্ধে যে  
মানহানি ও ক্ষতিপূরণের মামলা আনিয়াছিলেন তাহা  
গত সোমবার উত্তীর্ণাছিল—তবে এখনও বিচার সমাপ্ত  
হয় নাই। এ মামলার ফলাফল জানিবার জন্ত বাঙ্গালী  
মাজেই যে উদ্ভাবন রহিবেন তাহা জানা কথা।

রাজবন্দীগণ একে একে মুক্তি পাইতেছেন—উপেন্দ্ৰ-  
নাথ পাইয়াছেন—অনিলবরণ পাইয়াছেন—স্বভাষচন্দ্র কবে  
পাইবেন তাহা জানিতে পারিলে অনেকেই আনন্দিত  
হইবেন। গত ২৬শে মার্চের টেষ্টম্যান “অনিলবরণ,  
স্বভাষচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন রাজবন্দী মুক্তি পাইয়াছেন  
লিখিয়াছিলেন”—আমরা প্রার্থনা করি এই মিথ্যা সংবাদ  
শীঘ্রই সত্যে পরিণত হউক।

চিত্তরঞ্জন সেবা সনন উন্মুক্ত হইয়াছে। এখানকার  
শয্যাশ্রয় প্রভৃতি সমস্তই বন্ধের প্রস্তুত—রোগীর  
চিকিৎসা ছাড়া এখানে ভ্রমরদের ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীর  
কার্য শিকা দেওয়া হইবে। এরূপ একটি প্রতি-  
ষ্ঠানের যে কলিকাতায় বিশেষ আবশ্যক ছিল তাহা  
কাহারও অবদিত নাই। বেশবন্ধুর পূর্ণানাম বিজড়িত  
এই প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী হউক ইহাই প্রার্থনা।

কলিকাতা ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরীটিকে দিল্লীতে স্থানা-  
ন্তরিত করিবার জন্ত অনন্য কল্পনা চলিতেছে ইহার বিরুদ্ধে  
কলিকাতাবাসীগণের তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। এই  
লাইব্রেরীর পাঠকবর্গের সংখ্যা কলিকাতাতেই অধিক  
সুতরাং তাহাদের অসুবিধা করিয়া সামান্য দুই চারজন  
দিল্লীবাসীর সুবিধা করা মুক্তিস্তম নহে।

কলেজকোয়ার মার্কেটে গো-মাংস বিক্রয় প্রবর্তন করি-  
বার জন্ত একদল উট্টরা পড়িয়া লাগিয়াছেন। মার্কেটের  
পার্শ্ব মেছুয়াবাগার ঠাট্টে গো-মাংসের দোকান আছে  
কিন্তু মার্কেটে না থাকায় এক সাম্প্রদায়িক লাবী স্বত্ব দেখা  
ছাড়া মুসলমানদের অল্প কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে  
হয় না; কিন্তু তার আবদার যে টোপ ফেলিয়াছেন তাহাতে  
আরও কত কি উদ্ভট আবদার উঠিবে তাহার কোন  
স্থিরতা নাই।

সিদ্ধুবাসী মুসলমানেরাও এই সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ভাল  
করিয়া ছুটাইয়া তুলিবার জন্ত বারোটা বৎসর পূর্বে মহম্মদ  
বিন কাশিমের সিদ্ধুবিষয় ব্যাপারটার একটি ‘স্মরণোৎসব’  
করিবার উত্তোষ করিতেছেন। ইহাতে আত্মিকার মুসল-  
মানদের গর্ব করিবার কিছু নাই আজ তাহারও হিন্দুদিগের  
মত বিজিত তথাপি ইহাতে হিন্দুদিগকে তাহাদের অতীত  
যুগের নিধ্যাতন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে  
তাহাদের মধ্যে ব্যথা দেওয়া হইবে—এইটুকু লাভের জন্মই  
বোধহয় এই বিজয়োৎসব। সাম্প্রদায়িকতার ইহা যে  
একটা চরমোৎকর্ষ তাহা আজ ইহার। বৃদ্ধিও বৃদ্ধিবে  
না।

গত সোমবার অপরাহ্ন ৫০ ঘটিকা তার কুম্ভগোবিন্দ  
গুপ্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকে টিক  
অকাল মৃত্যু না বলিলেও তাঁহার পরলোক গমনে বাঙ্গালা  
তথা বাঙ্গালীরা যে একজন সম্ভব স্বাভাবিকবৎসল পুরুষকে  
হারাইলেন না ইহা একটা বিষম কোভের বিষয়। আমরা  
তাঁহার শোকসম্প্রদায় আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানাই-  
তেছি ও তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা  
করিতেছি।



কলিকাতার উত্তরাংশে আজকাল অনেক গলীতে কাবলী ও গালাদের বাস করিতে দেখা যাইতেছে। নিরীহ বাঙ্গালী গলীর মধ্যে এই জঘন্যকৃত্ত জীবগণের বসবাস যুব হলফ নয়। কারণ এ সব অঞ্চলের চৌদ্ধানা বাড়ীর পুরুষই কেবাগীসিরি করিতে বা অজ্ঞাত কাজে দণ্ডার সময় বাহিরে যায় হুতরাং খিগ্রহের বাঙ্গালীর বাড়ী এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। এই সময়ে এক দৃষ্ট মতিত দীর্ঘকায় মূর্তি ঘনি দীর্ঘ যন্ত্র বা শাণিত ছুরিকা লইয়া কোন বাড়ীতে প্রবেশ করে তবে অতি সহজেই কেবল প্রাণের ভয় দেখাইয়াই সে কিছু না কিছু সংগ্রহ করিতে পারিবে—অসন্ত: তাহাকে শুধু হাতে কিরিয়া আসিতে হইবে না এইখু খরিয়া লওয়া যায়। এ অবস্থায় গলীর মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের অভাগমন যে বাসীর নহে তাহা অতি সত্য। পূর্বাঙ্কে সাধান না হইলে ডবিষ্ণতে নিম্নল ক্রম্ভনে কোন ফল হইবে না।

মুন্ডভী হীমাবে একজন বাঙ্গালী (কোন চা-বাগানের অধিকারী) প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া প্রথম শ্রেণীতে বসিয়াছিলেন, এই অপরাধে এক যেতারা সহযাত্রী কর্তৃক অবমানিত হন তবে সৌভাগ্য এই যে তিনি সে অপমানী তখন বেমানলুম হকম করিয়া পরে সংসারপথেরে কলমে বিক্রম প্রকাশ করেন নাই। তিনি এই চর্যের বদ্বাক্ত উচ্ছ্বাসের কলপ্রম মুষ্টিযোগ জানিতেন এবং উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া তৎকথায় হাতে হাতে লুকল পাইয়াছিলেন। খবরের কাগজে কাল্য আর আদালতের দ্বারে ধনী না দ্বারা নিখিরাতে ভারতবাসী যদি পরে পদে মুষ্টিযোগ চালান তে এই শ্রেণীর অত্যাচার শূন্যই হ্রাস হইয়া যাইবে। এসব ব্যাপি বিদ্রুপ মলম লাগাইলে যে সাধেনা তাহা না বৃষ্টিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দশা।

টাম কোম্পানী ভাড়া কমাইতে শুরু করিয়াছেন—না কমাইলে তাঁহাদের কাজ ক্রমশঃই অচল হইয়া আসিতেছিল। ভাড়া কমানটা সাধারণের নিকট ভাল বলিয়াই বোধ হইবে কিন্তু কবাটা হইতেছে এই যে ভাড়াটা বরাবরের জ্ঞত কমিবে কি কেবল ভাড়া কমাইয়া বাসগণ্যাদের চেষ্টা ও জ্ঞত করা হইবে সেই পধ্যন্তই কম থাকিবে। কারণ উদার-দ্রব্য বিদেশী বণিকদের মূল নীতি হইতেছে কাজের সময় কাজ, কাজ দ্রুতলেই পাঞ্জী কর্পোরেশনের উচিত ভাড়া কতদিন পধ্যন্ত কম থাকিবে সে সম্বন্ধে একটা প্রাঙ্গন্তর লেখাপড়া করাইয়া লওয়া নতুবা কার্যোদ্ধারের পর কোম্পানী সাধারণের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন কে বলিতে পারে।

আমরা শুনিয়াছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদটি অবৈতনিক করিবার চেষ্টা করা হইবে। বাংলা এই কার্যের অগ্রণী, আমরা তাঁহাদের সাধুবাধ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চেলে-সেয়ের পদ চিরদিনই অবৈতনিক এবং বেতনভাতা, বশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে কোন দিনই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইতে বাগা জন্মায় নাই। বরং বাংলা শিক্ষা-বিষয়ে সর্বজন যীকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহারাষ্ট কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইসচ্যান্সেলারের পদটির জ্ঞত মাসিক তিন চারি হাজার টাকা অপব্যয়িত না করিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগে, উপকারে লাগাইতে দিয়া যেন। বিনা বেতনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথা দেশের কার্য করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব ঢাকায় হইবেনা বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।



# বদ্বাক্ত!



## অভিনয়ে মৃত্যু

শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম্-এ

বাস্তবের চিত্র রদ্বমকে প্রদর্শনের নাম "অভিনয়," মহাকবি লেক্সীয়ারের ভাষায় বলিতে গেলে "holding the mirror to Nature"—মুহুরে বাস্তবের চিত্র প্রতি-বিস্তিত করা। এই চিত্র প্রদর্শনের উপাধান নাটক, অভিনেতা, দৃষ্টপট, বেশভূষা ইত্যাদি। অভিনেতা নাট্য-কারের অদিত চরিত্রকে ভাব ভক্তি ও কণ্ঠস্বর দ্বারা সজীব করিয়া, অবস্থা বিশেষে পড়িলে তাহার মানসিক ভাবের অভিভাষনা কর্তৃপ হইবে ইহাই দৃষ্টকরে দেখান। মানব-চরিত্র ও বাস্তব জীবনের ঘটনার দ্যাত প্রতিভাত, এই দুই বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও তদুপর বল্লনাশক্তি নাট্যকারেরও যেমন থাকা আবশ্যক, নটেরও তেমনি থাকা আবশ্যক। নচেৎ অভিনয় কথনো realistic হয় না। উগ্ধচিত্ত প্রবন্ধে কেবলমাত্র "মৃত্যু অভিনয়" করা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মৃত্যু অভিনয় করা দ্রুত ব্যাপার। ইহাতে নটকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কল্পনাশক্তির উপরেই অধিক নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে—the dividing line between the sublime and the ridiculous is very thin (অর্থাৎ মহান ভাব ও হাস্যকর ভাবের মধ্যবর্তী ব্যবধান অতি সূক্ষ্ম)—রদ্বমকে অনেক সময়ে মহান ভাবের অভিভাষনা করিতে গিয়া অভিনেতা হাস্যাম্পদ হইয়া পড়েন ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। "পতন ও মৃত্যু"র ছড়াছড়ি বহু নাটকে দেখা যায়, কিন্তু শুধু পড়িলে ও মরিলেই মৃত্যু অভিনয় হয় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে বাঘাঘোণে কোন ইতালীয় নাট্য সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত "ক্রিয়োগেট্টা" নাট্যাভিনয় দেখিষাছিলাম। যেখানে ক্রিয়োগেট্টা বিজয়ী রোমক দৈতের প্রাঙ্গনদ্বার আক্রমণ সংবাদ পাইয়া বিশ্বাসনে আত্মহত্যা করা মানব করিয়াছেন, দেখিলাম তিনি কয়েক প্রকার বিভিন্ন ক্রিয়াশীল বিষ আনাইয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্দীকে বিশ্ব ষাণ্ডাইয়ার আদেশ করিয়াছেন। হৃদয়ী ক্রিয়োগেট্টা অর্ধপারিত অবস্থায় দেখিতেছেন, হতভাগ্য বন্দীরা কত প্রকারে মরণ পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে কি ভীষণ নিষ্ঠুর দৃষ্ট, লেখনীতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দেওয়া সম্ভব। একজন বিশ্বাসন করিযামাত্র বিস্মিত আয়ত লোচনে "ক্যাল ক্যাল" করিয়া চাহিয়াই, বুকে পেটে হাত চাপিয়া আন্তে আন্তে খলিত দেহ হইয়া ভূতলে শুইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িল। দ্বিতীয় বন্দী বিশ্ব পানাত্তে ভীষণ মরণ্য হস্ত বাগা নিজ গলদেশে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, হস্ত পদাধির আক্ষেপসহ সবগে পড়িয়া মরিল। এইরূপে ৫৩ প্রকার ভীষণ ভাবের মৃত্যু অভিনীত হইল। প্রতিভাবান নটের কল্পনা সাহায্যে মরণের অভিভাষিত ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বঙ্গরদ্বমকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মৃত্যু অভিনীত হইতে দেখা যায়।

(১) বেগ বা জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু



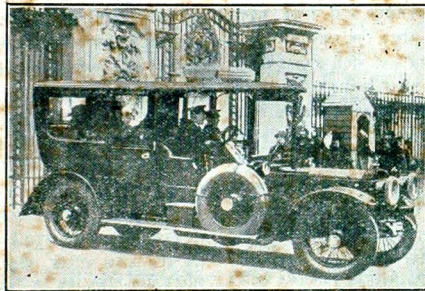




পুলিসের হাত হইতে পলাইয়া এই সরাইএর গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে সুবোধ আদিল যে পুলিস তাহার অশ্রম করিয়া গৃহস্থার উপস্থিত। পলায়নোদ্দেশ্যে ম্যাকেয়ার লক্ষ প্রবনে পিছনের জানালার উপর উঠিয়াছে সেই মুহূর্তে রজ্জা ভাঙ্গিয়া পুলিস গৃহে প্রবেশ করিল, শিকার হাতছাড়া হইয়া যার দেখিয়া কিপ্রবলে পিঙ্গলের গুলি-যাত্রা তাহার নফ ভেগ করিল। এখানে “পতন ও মৃত্যু” চুকিয়া যায়, কিন্তু প্রাণহীন দেহে সেইখানেই যদি পড়িয়া যান, তাহা কি দুর্ভাগ্য বীর ম্যাকেয়ারের উপযোগী শুভ। অতঃপা অভিনেতা অপেক্ষা অভিজ্ঞ তবে বড় কিসে। তিনি পিঙ্গলো গুলিতে আঘত হইবার পর জানালী হইতে গৃহমধ্যেই লাকাইয়া পড়িলেন, উন্নত বক্ষে গর্ভিত দুষ্টিতে

পুলিসের সম্মুখীন হইয়া, দুগ্ধ পরবিক্ষেপে টেবিল পর্যন্ত আঘিয়াই, প্রাণহীন খালি দেহে ভূপতিত হইলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়াও বীরের দেহে যে ২১ মুহূর্ত প্রাণ থাকে, তাহারই অভিব্যক্তি আঁচিৎ এই মৃত্যুতে দেখাইলেন। উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত শ্রীমতী চৌধুরী পুণ্ডিক আঁচিৎএর আরো কয়েকটি চমৎকার মৃত্যু অভিনয়ের বর্ণনা করিয়া পরিশেষে তিনি লিখিয়াছেন he did a dozen different deaths—ইহাই ত আর্ট! প্রত্যেক মৃত্যুটি বিভিন্ন প্রকারের বেশকাল পাছোড়িত অভিব্যক্তি। কিন্তু অসাধারণ বলনাশক্তি থাকিলে ও সাধনা করিলে তবে এরূপ অভিনয় তবে মৃত্যুর অভিব্যক্তি করিতে পারা যায়, তাহা সহজেই অসম্ভব।

### সম্রাট পঞ্চম জর্জের মোটরগাড়ী



উপরে যে মোটর গাড়ীর চিত্র দেওয়া হইল উহা সম্রাট সম্রাট পঞ্চম জর্জ হোয়াইট চতুর্দশ বৎসর কাল ব্যবহার করিয়াছেন এবং এ বাবৎ উহা বিনা মেয়ামতীতে একাধিকমে ১৭৬০০ মাইল চলিয়াছে। ইহার নাম ক্রিস ভায়মলার, ইহা জাপিখ্যাৎ দ্রীভ-ভালুৎ নাইট-এঞ্জিন দ্বারা চালিত হয় ও দৈর্ঘ্যে ১৭ ফুট লম্বা। পেটল বাক্সে গাড়ী স্থানির ওজন ৪৫০ পাঃ অর্থাৎ তিন টনের কিছু কম। ১৯১০ সালে ইহা সম্রাটের জন্ম নিশ্চিত হয় ও চৌদ্দ বৎসর রাজসেবা করিয়া ইহা একমে নাইট-এঞ্জিন প্রস্তুতকারক উইলিং-ওভারল্যান্ড কোম্পানিও তত্ত্বাবধানে আমেরিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। ১৯২২ সালে ইহাতে আধুনিক Dual Ignition ও বৈদ্যুতিক ষ্টার্টার

পরান হয়। যদিও দেখিতে আধুনিক গাড়ীর মত হৃদয় নহে তথাপি ইহা আজও নতুনরূপে মত কার্যক্ষম আছে ইহা “নাইট এঞ্জিনের” দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও নিকপত্রের বাজ করিবার একটা উজ্জল নিদর্শন। স্পেনের সম্রাটের মোটর বিভাগের প্রধান এঞ্জিনিয়ার ও উইলিং-ওভারল্যান্ড গাড়ীর সম্বন্ধ খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। কলিকাতায় যে সমস্ত উইলিং নাইট গাড়ী বিক্রয় হয় তাহাতেও এই নীরব নাইট-এঞ্জিন থাকে। দ্রীভ-ভালুৎ নাইট-এঞ্জিন বাহা পূর্বে কেবল রাজারাজ্জার গাড়ীতে ব্যবহার হইত তাহা আজকাল উইলিং-ওভারল্যান্ড কোম্পানীর চেষ্টায় সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছে।



বিত্তীয় বর্ষ]

২৭শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩২, ইং ১০ই এপ্রিল ১৯২৬

[ ৩৪শ সংখ্যা ]

### খেলাধুলা\*

রায়া বাহাদুর—শ্রীদানেশচন্দ্র সেন ডি-লিট

একদিকে পাহাড় উঠেছে, অপর দিকে অকূল অপার নীল জলরাশি। এক দিকে ডেউয়ার পর ডেউ সচল, নিত্য চঞ্চল। অপর দিকে রাশি রাশি ডেউ অনড়, অচল, যেন পটে লিখিত; যেন কৈটু ভিট! বলে নীল ডেউ-গুলিকে পান্থ্য ক'রে রেখে দিয়েছে। সিন্ধুতা ভূমিতে ছুটি ছেলে ও একটি মেয়ে খেলা করছে।

মেয়েটি ছয় বছরের, পাহাড়ের গায়ে একটি উৎসের মত, চঞ্চল ও জীড়াশীল। ছুটি বাসকের মধ্যে একটির বয়স দশ, অপরটির আট। বড়টির রব শ্রাম, সিঁদু শ্রাম, চোখ ছুটি বড় বড়, অশ্রুপ্রত্যয় হৃদয়িত ও হৃদয়, কথাবার্তা তেজস্বিতা স্ফূট, লুপ্তি পরা, গায়ে কোন লুপ্তি নাই, তার নাম হাফেজ। অপরটি পৌরবর্ণ কীর্ণ দেহ, লুপ্তি পরা, গায়ে একটি বেশমের স্ফুট, কথাবার্তা মেয়েলি ছাফের, রুহু স্বভাব—নাম ইসমাইল।

মেয়েটির নাম লয়েলী।

হাফেজ জন্তপতিতে নারকেলের পাতা কুড়িয়ে সেগুলি বিছনী করে একটা নৌকার মত তৈরী করে। লয়েলী যদ্য হর্ষ সে নৌকা নিয়ে সমুদ্রের নীল জলে ভাসিয়ে

বিলে। ডেউয়ের বাত প্রতিস্থাপ্ত সহ করে ভুবতে ভুবতে নৌকাখানি ভেসে চলতে লাগল। লয়েলী সকাঁড়কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলার নৌকার গতিবিধি দেখতে লাগল। এমন সময় হাফেজ ধাঁ করে এসে লয়েলীর খোঁপাটা খুলে নিয়ে লম্বা বেগীটা ধরে টান মারল। লয়েলী চিংকার ক'রে কান্নার স্বরে বজে,—না, হাফেজবা—আমি আমার তোমার সঙ্গে খেলা করব না, আমি তোমার নারিকেল পাতার নৌকা চাই না। এই বলে ছুটে এসে ইসমাইল খেদোনে নিরীষ্ট মনে বালির ঘর তৈরী করিল, সে তার পা ঘেঁষে পাশে এসে বসে পড়ল। হাফেজ আবার এসে তার বেগীটা ধরে টান মেরে আঁকা করে গিঠে কয়ে ছুটো কিল মেরে বসুতে লাগল,—তোমার এত বড় আশ্পর্ষা, আমার সঙ্গে খেলা কর্বি না!

ইসমাইল বলে—আজ্ঞা, তুমি প্রক-বিনা দোরে এমন করে খনন তখন মাহুরে কেন? ওকে কি তুমি তোমার বউ পেয়েছ? হাফেজ—মাহুর আমার ঘৃণী, তোর কি? ওকে তোর ছোট বউটি, যে তোর গায়ে এত লাগে? হাফেজ হাসতে ইসমাইল বলে—হাণা লয়েলী, তুই কার ছোট বউটি হবি—আমার না হাফেজের?"



কম্বার হুগে লয়েলী বলে—“তোমরা যগড়া কোর না; আমি হুগেনেরই ছোট বউটি হব, তা’ হলেই হ’ল।”

২

কাঁচা বাঁশে মূখ।

এই ভাবে তারা যোগ সমুদ্রের উপকূল বেলা করত। ইসমাইলের বাগ সম্পন্ন প্রুহর। তাহার ঘরে টাইল ডরা দান, গোলাপ, লতা ‘ধূম বিদ্যারী’ গাই, তাহার অনেক ক্ষেত থামার আছে। কুমারেরা সেখানে ফল বায়, তাহার বাড়ীতে বড় বড় ইমারত। কিন্তু হাফেজের কেউ নাই। বড় বিবিমা তাকে মাছধ কচ্ছিল, তার কাছ টাকা আছে।

লয়েলী মারার পরে তবুও হাফেজের প্রতিই বেশী অহুয়ারী। যখন তখন সে এসে ঝাপটা বাতাসের মত লয়েলীর নীল শাড়ীর ঝাঁল ধরে তাকে টেনে নিয়ে যায়। লম্বারদায়ে লয়েলী শাড়ীর টানে দূরী বাচুর মত তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে; কখন বা কিল চড় ধায়। “আর একবার হাফেজের মূখ দেখে না, আর হাফেজদার সঙ্গে বেলো করব না”—একশ বার এই শপথ করেও লয়েলী লুকিয়ে হাফেজের মূখ দেখে। যেদিন হাফেজ বেগী ধরে না টানলে, সেদিন তার বেগী বিহীন দেখা হয়ে যায়। হাফেজের শত অভ্যাচার শব্দ করে সে কলার ধরে। তার মূখ দেখবে না, তার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াবে না, সেমার ঘর ভৈরী করবে না—প্রভৃতি বিবিমে বিবিমে বয়েও সে নিতাই পা গেঁথে তার মারার পথে ও বহনী অন্তে যাবেই যাবে!

ইসমাইলের বাগের বড় বাড়ী ঘর, তার চাইতে হাফেজের ইঁড়ে ঘর লয়েলী বেশী গছন্দ করে। অথচ ইসমাইলের সঙ্গে তার গলায় গলায় তার। সে আর ইসমাইল এখন সমুদ্রের ধারে বলে গর করে, তখন কে বুঝবে যে অত্যাচারী হাফেজের পক্ষেপে কুমার ভ্রত তার একটা কাপ, পথের দিকে পড়ে থাকে। ইসমাইল ও লয়েলীর মধ্যে কোন দিন বচসা হয়নি। হাফেজ মারলে ইনবাইল লয়েলীর পক্ষ নিয়ে যগড়া করে। কিন্তু তথাপি কোন গুণ কারণে লয়েলী হাফেজের প্রতি বেশী অহুয়ারী,

এই মনস্তত্ত্বের কারণ এ পর্যন্ত কোন মন্তব্য দিতে পারেন নাই।

যার বাথা সেই বুকে। যদিও লয়েলী ইসমাইলের সঙ্গে মিটি কথা ছাড়া কিছু বলে না, তথাপি সে যখন হাফেজকে ‘বা’ তা’ বলে গলাগালি করে তখনও তার হৃদয়ের মধ্যে কি একটা জ্বিনিস ধরা দেয় যা ইসমাইলের কাছে কেন্দ্রের বলে মনে হয়। লয়েলীর সঙ্গে তার মিটি কথা চাইতেও সেই বড় কথার মধ্যে যেন বেশী দরজ থাকে। বালক ইসমাইলের অন্তরাত্ম তা’ বুঝতে পারে এবং তখন তার মনে যেন ঠেগার হুল ছুঁতে থাকে।

‘বে’—‘বা’

দিন চলে যায়, কার সাধ্য তাকে রাখে? হাফেজ এখন বড় হ’লো। তার বড় বিবিমা ম’রে গিয়েছে। সে কতকটা জমি ইঁকারা নিয়ে চাষ-বাস করে, তাতে একদশ মন্ড উপার্জন হয় না। সে হুতোরের কাছও বেশ শিখেছে। জাহাজের তরু। সে এমনি করে ছোড়া দিতে পারে যে বড় হুতো-রোগও তা পারে না। তা ছাড়া সে বেয়েদের কাছ থেকে নানারূপ সুরি ও মাছি তৈরী করতে শিখেছে। সে বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। হুতরাং তার উপার্জন বেশ হতে লাগল।

এক মাছাড়া লয়েলীর সংসারে কেউ নাই। তিনিও মৃত্যু শয্যাশায়ী। ইসমাইল লয়েলীর প্রতি অহুয়র, ইহা তিনি টের পেয়ে মনে মনে দূরী ছিলেন। এত বড় ঘরে তার মেয়ের বে’ হ’লে তার বহু দিনের আশা সার্থক হবে। ইসমাইলের অবস্থা ভাল হ’লেও তারা বংশে একই বাট। তা’ হোক না কেন লয়েলী তা রাজ্যবাণী হবে। এই সকল চিন্তা মুহুর শয্যাশায়ীর মনে মাঝে মাঝে হত। কিন্তু ইসমাইলের সঙ্গে বৈরী কথা শুনে লয়েলীর যৌবন-রাগ-প্রসন্ন মূখখানি যেন খণা-লম্বায় আর একটু লাল হ’ল; সে আনন্দে অস্তর চলে গেল।

হঠাৎ একদিন মা মারা গেলেন,—সে এত হঠাৎ যেন একটা দম্কা হাওয়ায় দীপটি নিবে গেল। বুকের পে জাহায়াটি মন্দির পোতলায়ের মত সর্বদা কাগে, সে কাপাটাও হঠাৎ বন্ধ হ’য়ে গেল। দুই আত্মীয়েরা এসে লয়েলীর কাছে

সমুদ্রের কূলে মাটি দিতে নিয়ে গেল। এই ঘটনার বক্তবিন পুরে একদিন এক হাতে একটা বাটানী, দূরী পরা দীর্ঘকাঁধ, শ্রামাশ, চোখ-মুখে প্রতিভার দীর্ঘ হাফেজ এসে হঠাৎ লয়েলীর হাত ধরে বয়ে—“লয়েলী চল আমার সাথে, তোর সাথে আমার বে হ’বে। আর, মৌলবীর কাছে কবুল মাখ, আর।”

এই কথাগুলিতে এত বড় একটা জোর ছিল, এবং ইহা এতটা স্বপ্নের অগোচর ও অচিন্তিতপুরু যে লয়েলীর মূখ দিয়ে কোন কথাই ফুটল না। হাত ধরে যুবক হাফেজ যখন যুবতী লয়েলীকে সঙ্গে নিয়ে গেল, সে তাহা বোধ কর্তে পাবল না এবং সে যখন সকলকে ডেকে বলে ‘লয়েলী আমাকে বে কর্তে কবুল হ’য়েছে’ তখন বালিকা বিম্বিত হ’ল কিন্তু ‘না’ বলতে পাবলে না বরক বোধ হয় মনে মনে একটু খুসীই হ’ল। তাদের ঘর সমান, হুতরাং এ কাঁচা কাহারও নিকট অশোভন মনে হ’ল না।

কিন্তু, যেদিন বাজতাও বাড়িয়ে হাফেজ লয়েলীকে ‘বে’ করে বাড়ীতে নিয়ে এল, সেদিন ইসমাইল চারিদিকে ঝাঁধার দেখল, সেই ঝাঁধারে যেন কতগুলি শব্দের ফুল বেগতে লাগল। তার মনে হ’ল বাড়ী ঘর দালান কোঠা ভাঙতে লাগল,—লয়েলীর মা বেঁচে থাকতে প্রাতঃরাশী করলে বোধ হয় আমি লয়েলীকে পেতে পারতাম।

৪

কবি

কি স্বপ্নের বৃক্সের সুর গলী কৃষ্ণকের জীবন! হাফেজ যখন মাঠে চাষ করে, তখন আইল বেঁধে লয়েলী চায়ের ভিত্তে জমি ‘পাট’ করে। জাঙ্গ মাসের চাষা এক যারগা হ’তে আর এক জাহায়ায় লাগতে হয়। লয়েলী হাত বাড়িয়ে সেগুলি শ্রামীর কাছে দেয়। লয়েলী কব্জের শাওনে বড় দিতে দিতে যখন জাবাটা হাফেজের হাতে যায়, তখন হাফেজ এক একবার লয়েলীর মূখখানি চেয়ে দেখে, চাঁকার আভরণের আলোতে তা’ যেন সোণার মত ষক ষক করছে। লয়েলী রীতি ক’রে বলে থাকে, হাফেজ

কতকলে মাঠের কাছ গেলে বাড়ী কিংবদ, এই আবার। তারপর তা’ পায়ের শাফে লয়েলীর বৃক্সের মধ্যে যেন আনন্দের একটা তোলপাড় পড়ে যায়। যখন লয়েলী আনিয়ায় থান মাড়াই করে, কিংবা ঢেকিতে তুয় ছেঁতে চাল তৈরী করে, তখন হাফেজ তার শিক্ষাকারিতার কতটা প্রশংসা করে। পোষ মাসের কোরাসা ঠেসে একটা হাফিতে আগ নিয়ে পাখা ভাতের শানুকি মাথায় লয়েলী শ্রামীর সঙ্গে কখন কখন মাঠে যায়। চৈত্র মাসের যোয়েল-ও বউ-কা-কও তাদের পাগল করা ডাক ভেঙে বনখণীকে আহির করে তোলে। তারা দুজনে কেতের কাছ কর্তে কর্তে এ ওর মূখের দিকে চেয়ে কি আনন্দই না পায়, তারা কত বৃহৎ কাজ কর্তে থাকে!

যখন হাফেজ কব্রাত দিয়ে কাট চিরে নোকোর পাট তৈরী করে, তখন লয়েলী তুয়ের আঙন করে। তজ্ঞাগুলির নীচে বেগে সেগুলি বৈকিয়ে দেয়। কখনও হাফেজ বেত চাছে। লয়েলী এগে পা বেঁধে বেতগুলি হাতের কাছে নিয়ে ধরে; হাফেজ হঠাৎ কাজ কূলে তাকে জোর করে তার নিটোল গালে একটা চুমো দিয়ে ফেলে।

প্রতিদিন ইসমাইল তার বাড়ী হ’তে রওনা হ’য়ে হাফেজের কুটারে পথ দিয়ে সমুদ্রকূলে বেড়াতে যায়। হিনের বর দিন সে বেগতে পাখা হাফেজের ইঁড়ে ঘর-গুলি সংখ্যায় বাড়ছে, তার গোলায় শ্রী দাম্বালপায় পাশ-পাশে উজ্জল হয়েছে। সে কৃষাণ বেগেছে এবং তাদের সঙ্গে নিজে কাজ করছে। কখন কখন তার সন্তুষ্ক চক্ষু বেগতে পায় কুমার হাসানী গলায় শ’রে বাঁকবাগ্নে পারে তাইদের বড় সাধের লয়েলী—হাফেজের জুলাই লয়েলী নীল শাড়ীতে পা ঢেকে নর্তকীর ভায় আনন্দে এ ঘর থেকে ও ঘরে আনাগোনা কচ্ছে।

এই হৃদয়ের চিত্র দেখে তার হৃদয় ভেঙে একটা হালা-বার উঠে। সে নিঃশব্দে নিজের বাড়ীতে ফিরে বহ-লোকের কথাবার্তায় মূগ্ধিত প্রকাশ পুঠীটিকে একা-নির্জন মনে করে লুকিয়ে কমালা ট্রিয়ে ছুই এক কোঠা চোকের জল মুছতে থাকে।



এবাসে।

সে বঙ্গের বড় দুঃসময়, কেষ্টে একেবারে ফসল হয় নাই। হুজির রাজ্যজুড়ে হাংকাক উঠেছে। কোন দিকে কাজকর্মের সুবিধে নেই। হাফেজের এখন একটি ছেলে সাত বছরের;—একটি মেয়ে পাঁচ বছরের ও আর একটি শিশুমেয়ে বেড় বছরের, সব হাংকাক দিতে শিখেছে। এবার কোন আয় নাই, স্বতরাং সজিত টাকা থেকে খরচ চলছে।

হাফেজ একদিন জাহুর ভেতর মুখ গুজে একান্ত মনে চিন্তা করছে, এমন সময় লয়েলী এসে বলে—“শত ভাবছ কি? কত লোক চারিদিকে না খেয়ে মারা পড়ছে। জ্ঞাতব্য হাফেজ বলে আমাদের ত এখনও তা? হয়নি!”

হাফেজ বলে—“হয়নি বটে, ছেলে মেয়েরা ত বড় হচ্ছে, রহিমটাকে মনে করছি সাহেবদের কলে, কাজ শিখতে দেব। একটু লেখা-পড়া শিখলে রোগাগার বেশি হয়। সাহেবদের মজ্জবে একটু ইংরেজী পড়লে তারপর কলে কাজ শিখলে দু-পয়সা বেশী হয়। মেয়েটাকে কাপড় বোনা শিখান মনে করছি, এই পাঁচ বছর বয়সেই জিরেবোর দার হাত দুইখ, দিয়া কাঁধা দেলাই করে। এরপর এক বৈ দিতে টাঙ্গার দরকার হবে। রহিমটাকে কিছু-তেই চায়ের কাজ দেব না—টাকা ত চাই। এ বছর ত কোন উপায়ই হল না। এখন যে বছর ফসল ভাল হয় সে বছরও খরচ-পুত্র ও জমিদারের খাজনা ছুগিয়ে বেশি কিছু জমাতে পারি না। যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, এই হাড্ডাখা খাইনি না ঘাইতে পারি তবে আমাদের কি উপায় হবে?”

লয়েলী—“খোদার মজ্জা, স্তত চিন্তা করে কি হবে? হিদি জিত দিয়েছেন তিনি আবার দেবেন। টাকা ত কিছু আছে, এখন এত চিন্তা করে কি হবে?”

হাফেজ—“লয়েলী, এই এক মুঠো টাকা যদি বলে খাই তবে স্বেচ্ছা দুইখ,—তারপর?”

লয়েলী—“তারপরে, তুমি ত একেবারে অশক্ত হয়ে পড়নি। এখনও একা একা জনের কাজ করতে পার।

কবে ব্যারাম হবে, কবে কি হবে, এত ভাবল রাজ্যের রাজারও ব্যালি হ'য়ে পড়বার কথা।”

হাফেজ—“না গো লয়েলী, তা' নয়। ভবিষ্যতের সম্বল সম্বয় করতে হয়, সময় থাকতে থাকতে। আমি কি ত্রিক করছি জান, আবদুল ও করিমরা যাবার বাচ্ছে, হুগুরীর চালান নিয়ে। আমি যির কতক টাকা দি, তবে আমাকে বাড়ির ভাগ বেশী দেবে, যেহেতু তারা জানে আমি তাদের থেকে ব্যবসা বেশী বুঝি ও থাকতে বেশী পারি। যারা যাবার গেছে, তারা বলছে, এক বছরে সেখানে লা লাভ পাবে, চাটগাঁ সন্দের সাত বছর হাড্ডাখা খাইনি খেটেও তা খাবার সম্ভাবনা নাই। আমি এদের সঙ্গে যাবার ব্যব ত্রিক করে ফেলছি। তুমি একটা বছর আমাকে ছুটি লাও, লম্বীটি আমায়।”

লয়েলী কাল ফ্যাল করে চেয়ে বইল। হঠাৎ তার চোখে জল এসে চোখ ছুটি কাঁপা হ'য়ে গেল। সে হাফেজের হাত ছুটি ধরে বললে—না আমি যেতে দেব না। আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব?”

হাফেজ বললে—“আমাদের হাতে যে টাকা আছে তাতে দু-বছর বেশ বায়রান্না করে চলতে পারে। আমি চারশ টাকা নিয়ে যাব। আর যা থাকবে তাতে তুমিও দু-বছর চালাতে পারবে, যেহেতু আমার জন্ম ত আর কোন ধর লাগবে না। হোটো মেয়েটাকে সেখানে, ও বড় রোগা, লম্বীটি অমন করে কাঁদছ কেন! কারবার করুতে কত লোক ত দেশদেশান্তরে যায়। আমি ত্রিক একটি বছর পরে কিরে আসব। তারপর আমাদের আর কোন ভাবনা থাকবে না।”

তখন যেন দুঃস্বপ্নের নানারূপ তরু বিবর্ত চলল। শেষে অনেক আশা দেখিয়ে, অনেক বেহেরে মিনতি করে, হাফেজ লয়েলীর কাছে ছুটি নিল। একটি হোটো কাঠের বাজ হাফেজ নিজ হাতে তৈরী করেছিল। একটুকরা কাগজে টিকার ছাইয়ের উপর তেল মাখিয়ে হাফেজ তার ছোটো মেয়েটির একটি পায়ের ছায়া দিলে এবং তার দুমারী লয়েলীর এক পাছা লখা চুল কেটে সে কাগজ টুকরার ভেতর তা গুছিয়ে সেই বাজটি সঙ্গে নিয়ে চলল। তারপরে যখন লয়েলী তার কাঁধে বাহ রেখে কাঁতে লাগল

তখন তাকে সাধনা দিয়ে, তার মুখে চুমো খেয়ে খোলা-তুলার কাছে তাকে অবে রাখবার প্রার্থনা জানিয়ে ও অশেষ রোয়া করে,—বীরমুখী হাফেজ এক অল্পপাখয়ে,—যখন দেখাশার আতরণ ভেদ করে হৃদয়ের নিজকে প্রকাশ করবার জ্ঞাত অসংখ্য রোদের পর ছুঁড়ছেন,—ও খিচার ভেতর পোখা পাখীটা শোখান ‘রহিম’, ‘রহিম’ বলে পুজের নাম ধরে ডাকছে—সেই সময় ধীরে ধীরে গাছের আড়ালের পথ ধরে সন্দের দিকে রওনা হ'য়ে চলল। বাঁশপাড়ের পাতাগুলি ও বনজল তার দিষ্ট স্পর্শ করুতে লাগল। যতক্ষণ সে অদূর না হ'ল ততক্ষণ সন্দের চক্ষে লয়েলী তার দিকে চেয়ে বইল।

৬

তালী-বনে।

সন্দের জাহাজ ডুবে গিয়েছে কিন্তু বলবান হাফেজ সাতার কেটে একটা ডাঙ্গার নাগাল পেয়েছে। সেখানে মায়ের নাই, কেবল বনজল ও হরিণ প্রভৃতি নানা জন্তু। সেখানে ছোট একটি পাহাড় ও একটা বরগা,—তথায় হরিণ শিতরা জল পান করে। একটা বড় তালগাছের নীচ বড় অসীম জলরাশি দেখা যায়,—পাহাড় পর্যন্তের মত বড় বড় উঁচু আকাশে উঠতে চেষ্টা করে এবং না পেরে শতধা হ'য়ে জলের মধ্যে লীন হ'য়ে যায়,—এ যেন দেহান্তরের নিত্য দুঃখ, ত্রিভুবৎক্ষেত্র—শত শত কোণ ও টকার, শত শত বীর গর্জন,—এ যেন মহাসমুদ্রের কোন বিরাত সন্ধ্যা, শত শত জামের বাঁধী, নারদের কীণা, শত শত হুম্মরীর গুহরমুখের নুপুরের ধ্বনি। এ যেন যখন মহাজ্ঞান, কত অর্থবোধাত ভাষীা চুরিয়া তল হয়ে বাচ্ছে, শত শত হৃদয়মি হোমারির জ্বা যাবার্নাল হ'য়ে নিস্তর হরিণ ওপর জন্মে,—কত লোকের প্রাণের আছিকরণ মহা হবিবুজ এই অর্থি কে জেলে রেখেছে। উপরে মহা-অশ্লীল লইয়া যেন নটরাজ মহাদেব ধ্বংসের নৃত্য করুচ্ছে।

কখন একটা অসীম ক্ষুণ্ণ বাগানের মত উম্মারাগী এর উপর পুষ্পখয়া বিধিয়ে রাখেন। কত পানী ছিন্ন মুক্ত-হারের জ্বা দুলে দুলে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। তালী-বনের নীচে বসে হাফেজ দিনরাত এই ঐন্দগিক অপর দীপা প্রাক্তন করুচ্ছে—গভীর রাতে পাহাড়ের গুহার গিয়ে

জয়ে থাকত,—হরিণ ও পক্ষীর মাংস পুড়িয়ে বেত, হরিণের ছড় পরত। সে এক জটাজুটমারী সম্মানীর মত হয়ে গিয়েছে। বনের কাঠ চেঁছে সে এমনই শরাসন তৈরী করেছে ও নল খাপড়া দিয়ে এমনই তীক্ষ্ণ শর তৈরী করেছে যে কোন পশু তার কাছে এগোতে সাহস পায় না। কিন্তু তার কাছে সেই নীল বনাঙ্কের শোভা ও সন্দের অপর দৃষ্টমত মধ্যে একটা ছবি বিনরাজি চোখের সামনে ফুটে ওঠে, রক্তা শিশু কল্যাণীকে আবার পাখা দিয়ে বাতাস করছে লয়েলী এবং রহিম ও জিবরো আনিদা ছুটোছুটি করছে। কখনও মনে হত হাফেজী গলায় রূপোর পৈছা হাতে নীল শাড়ী পরা লয়েলী চোখের পা দিয়ে ধান ডানছে; কখন বা রায়হারী আকর্ণের আলাতে হুম্মরীর মুখ অঙ্গুর হামর দেখাচ্ছে। সেই অসীম প্রাক্তনিক পটের সমস্ত বর্ণমাণীত দৃষ্ট দেখে উঠছে তার মনে এই ছবি। হরিণের ছড় পরা জটাজুত কেশ-শঙ্খফাবৃত মুখমণ্ডল, তালীবনে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন সম্মানীর এই এক তপস্বী। এই ভাবে বাত করব কেটে গেল, এর মধ্যে সে দেশে কিরবার কোন সুবিধাই পেল না।

৭

টোপা-ফেলা।

যখন ছুই বঙ্গের কেটে গেল, অথচ হাফেজ এল না তখন কত অল্প ফেলে লয়েলী উপাধান সজ্ঞ করুতে লাগল। সে কত লোকের কাছে গেছে সংবার নিতে! চাটগাঁর বন্দরে জাহাজ লাগলে পাগলিনীর মত আন্দোলিত কেশপাশে সে নিজে গিয়ে যার তার কাছে খোঁজ নিয়েছে। কোন বানাই কেহ কিছু বলে নাই। আর কি হাফেজ আছে। সেই রোগা মেয়েটি মারা গিয়েছে, তাকে যখন ঘাটা দেয়, তখন লয়েলীর যে কি প্রাণ বিদীর্ণ-কারী কষ্ট। রাতদিন হাফেজের ভাবনা, মেয়েটির চিকিৎসার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গিয়েছে, এখন সে সংসার অচল। তার নীল শাড়ীটা এখন শত তালি, কার কাজ মুখ ফুটে যায় চাইতে বাবে। সে যে একান্ত লক্ষ্মীশীল! ছেঁড়া কাপড় খারে কি করে সাতার বের হবো! দশ বছরের শিশু রহিম যে একান্ত নিরাশ্রয়।



লয়েলী সুখের কাহ্নে, সুখের বৃক্ষের বাখা খোঁজতে বলে।  
বৃক্ষের মধ্যে তার কেবল হায় হায়।

একদিন ইসমাইল সেই পথ দিয়ে বেড়ে দেখতে গেল  
লয়েলী ছেঁড়া কাপড়ে কোনরূপে নিজেকে ঢেকে পুঙ্খুরে  
জল আনতে যাচ্ছে। ইসমাইল পথের কাছে এসে বললে—  
“লয়েলী! আমি তোমার একান্ত পর হ’য়ে গিয়েছি  
কিন্তু হাফেজ আমার বন্ধু, বন্ধুর জ্বর উপরে আমার কি  
কোন কর্তব্য নেই। আমার ঘরে খাবার অভাব নাই  
সে বরি কিরে এসে দেখে, তোমরা অভাবে কষ্ট পাচ্ছ  
তখন আমাকে অহযোগ রিতে পারে যে আমি থাকতে  
তার জ্বর এরূপ কষ্ট পাচ্ছিল আমি তার কিছু করি  
নাই।”

লয়েলী ঘোমটা দিয়ে মুখখানি ঢেকে মুখের বসলে—  
“আপনি মৌলবী শহিদুল্লাহ নাহেবের সঙ্গে আমার  
সম্বন্ধ কথা কহিবেন। তিনি বুড় ও পাড়ার মুন্সী।  
আমি নিজে কিছু বুঝতে পারছি না।”

মৌলবী শহিদুল্লাহ বয়ল বাহান্নর, তাহার হৃদয়ে বেশ  
করুণাবৃত্তি ছিল। অর্ধলোভটা যে কিন্ত না ছিল তাহা  
নহে। ইসমাইল তাকে একটা বড় কাংলামাছ ও কতক  
ভিজ মোরগ ভেট দিয়ে দেখা করে বললে—“বহিসের  
বড় কষ্ট, আমি তাতে মাল মাস কিছু সাহায্য করতে চাই,  
আপনার হাত দিয়ে সাহায্যটা দিলে কেমন হয়।”

মৌলবী সাহেব ভাবার নলটা মুখ হতে খুলে রেখে  
বললেন—“এত ভাল প্রস্তাব, সে বেচারী বড় কষ্টে  
পড়েছে। তা তুমি বা দেবে তার হিঙ্গাব রেখে।  
হাফেজ তোমার বন্ধু, এমনয় যদি তোমারা সাহায্য না  
কর তবে কে করবে। সে কিরে এসে তোমার টাকা  
শোধ করবে। সে এমন ছেলে নয় যে তার জরীপুত্র-  
কন্ডার এক পদসা কণ সে রাখবে।”

বাবুয়া হয়ে গেল, এখন রহিম ও জিব্রেল্লা প্রায়ই  
ইসমাইলের বাড়ীতে বাতায়ত কর্তে লাগল। ইসমাইল  
যে কলসী, তাকে তারা চাচা বলে জানত। সে ও  
তাদের ঠিক নিজের ছেলের মত ভাল বাসতে লাগল,  
তাদের লেখাপড়ার ব্যস্থা করে দিলেন এবং এমন  
সকল কাপড় চোপড় দিতে লাগল যা তারা কোন কালেই

পেরে নাই। তা ছাড়া তাদের নাম করে খাওয়া দাওয়ার  
ভেট প্রায়ই লয়েলীর বাড়ীতে আসতে লাগল। কিন্তু  
ইসমাইল সেই দিনের বেখার পর নিজে আর তাদের  
বাড়ীতে আসে নাই কিংবা লয়েলীর সাথে দেখা করে নি।  
আড়াল থেকে এমন সকল মেয়ের বাণ লয়েলীর গ্রামে  
আসতে লাগল যে ধীরে ধীরে সরলা রমণীর মন তার দিকে  
আকৃষ্ট হতে লাগল। ছেলেরা প্রায়ই আনন্দ কোলাহলে  
তাদের ঝুঁড়ুর ঘুরিত করে এসে বলে—“বেথ, মা,  
আজ চাচা আমাদের কি দিয়েছে।” এই বলে কোন  
দিন রাশা সাড়া, কোন দিন ছবিও বই দেখাতে লাগলে।  
কোন দিন চাচার বাড়ীতে কি চমৎকার মোরগের চালান  
খেয়েছে তার বাখা। করতে লেগে যায়।

তিন বৎসর এই ভাবে কেটে গেল। হাফেজের  
আসার সন্তানবা জন্মে দশমীর শেষ রাতের চাঁদের  
আলোর ভায়ে লীন হয়ে যাচ্ছে। এখন কঠোর সত্য  
উগ্র ভেদে এসে কি দৃষ্ট দেখাবে তাই ভেবে লয়েলী  
আতঙ্কিত হ’য়ে ওঠে। আর বস্ত্রি সে আসবে না।  
একদিন এক বুড় বৈজ্ঞান্য বামুন্ডর বাড়ীতে লয়েলী গিয়ে  
ঠাঁহরের পারে সেগাম জানিয়ে ধরা দিয়ে পড়ল এবং  
বললে—“ঠাকুর আমার বামী কবে আসবে তোমাকে  
বলে গিয়েছে হ’য়ে।”

তার চোখের জল দেখে ও মিনতি শুনে ঠাকুরের মন  
ভিজে গেল। তিনি বহু শ্রুতি পত্র ঘেটে বললেন—  
“তোমার বামীর কি হয়েছে, ঠিক বলতে পারি না।  
যতবার গুন্ডি ততবার দেখছি একটা ভালগাছের তলা।  
এর মাল কি ঠাঁহর করতে পারছি না। ভালগাছটি খুব  
ভাল লক্ষণ বলে মনে হয় না।”

লয়েলী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল। সেদিন  
সে উপোস করলে রইল, সাঁরা বামী যুগ্মেদ না। বহিসের  
মুখে ইসমাইল রোজই নানা ছলে তার মা কেমন আছে,  
কি কষ্টে তার সন্তান লয়। সেদিন কামাটা খুব বাড়-  
বাড়ি রকমের তনে আর কিছুতেই ঘোঁরার বাঁধ রাখতে  
পারল না। সে মীর পদক্ষেপে হাফেজের বাড়ীতে  
উপস্থিত হ’ল। রহিম ও জিব্রেল্লা “চাচা এয়েছে” বলে  
শুন যখন বসে আনন্দে চাঁকান করতে লাগল তখন ঘোমটার

মুখখানি ঢেকে একখানি কাঁটাল কাঠের পিড়া হাতে  
বাড়িয়ে দিয়ে মুখের লয়েলী বললে—“আপনি বহন।”

ইসমাইল বললে “তোমার কি অস্ত কোন কষ্ট হ’য়েছে?  
তুমি আমার কাছে কোন লজ্জা কোর না। হাফেজ যদি  
কখনও ফিরে আসে তবে কড়ার গড়ায় সে আমার সমস্ত  
টাকা ফিরিয়ে দেবে। হুতরাং যদি আমার কিছু করবার  
ধাকে—তোমার হৃৎ নিবারণের জন্ত, তা’ করতে আমি  
কল্প করব না। খোঁজালা সাধী তোমার অতল দূর  
কর্তে আমার আনন্দ বৈ মনে আর কোন ভাব হবে  
না। তুমি দয়া করে এ অধিকাট্টহু আমাকে দিও।”

লয়েলী সজ্ঞ ও সন্তোজ চোখে তার দিকে চেয়ে  
বললে—“আপনি যা কচ্ছেন, তাই বোনের জন্ত তা করে  
না। আমার ছেলেরা তা তাদের পিতাকে চেনে না,  
আপনাকেই চেনে। আমার কপালে আচ্ছা যে সকল  
কষ্ট গিলেছেন মাহুষের সাধ্য নাই তা দূর কর্তে।  
আমার সেলাম নাই। আমি আপনার উপকারের প্রতি-  
দানে আর কি কর্তে পারি?”

ইসমাইল—“আচ্ছা হাফেজ কোথায় গেছে সে সকল  
কি কিছুই বলে যায় নাই। আবদুল ও করিমুল্লাও ত  
সঙ্গে গিয়েছে। তারাও ত ফিরে আসে নি। যে জাহাঙ্গীর  
কিন্তু তারও ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তার  
যা বা ছাড়া আর কোথাও যাবার ইচ্ছে ছিল কিনা তার  
কি বিবৃতিসর্বও কিছু বলে যায় নি।”

লয়েলী—“না কিছু বলেন নি। যা বা যে যাবেন, এই  
ত স্থির ছিল, তবে—  
ইসমাইল—“তবে কি?”

লয়েলী—“ভাল তিন বছর হয়ে গেছে, তাই বলি।  
তিনি কি একটা কাগজ লিখে তোরদের ভেতর রেখে  
গিয়েছেন, বলে গেছেন ‘তিন বছরের মধ্যে এ কাগজের  
কথা ককেও বোল না।’ আমি লেখাপড়া জানি না,  
এ পর্যন্ত তার হৃদয় মেনে সে কাগজ কাকেও দেখাই  
নি। গত মাঘ মাসে তিনটি বছর হ’য়ে গেছে। এখন  
কখনও চলেছে, কাগজ খানা কাউকে দেখাব।”

ইসমাইল—“আমাকে দেখাও না।”

লয়েলী—“আপনি কি অগ্রহ করে দেখবেন।”

তবে আস্তি আমি হাত ধুয়ে তোরদ খুলে কাগজ খানি  
নিরে।”

বিষম কৌতুহলের সহিত ইসমাইল সেই কাগজখানির  
প্রতীক্ষা কর্তে লাগল।

অনেকগুলি লাল স্ফোয় বাঁধা এক খানি চিঠির  
ধামে পোরা ছই খানি কাগজ। অতিশয় আগ্রহের সহিত  
কাগজ খানি হাতে নিয়ে পড়ে ইসমাইল তা’ লয়েলীকে  
ফেরৎ দিল। যদি অশুশঙ্কিত কোন লোক সেখানে  
থাকত, তবে সে বুঝতে পারত কাগজ পড়ে একটা প্রচ্ছন্ন  
আশঙ্কের ভাব হঠাৎ ইসমাইলের চোখে মুখে বিদ্যারত  
মত মুহূর্তের জ্ঞত হলে গেল।

ইসমাইল বললে—“এ কাগজ য়া লেখা আছে, তা  
আমায় মুখ দিয়ে তোমার না শোনাই ভাল। এতে  
বুঝতে পাচ্ছি হাফেজ তোমায় কত ভালবাসে। তুমি  
শহিদুল্লাহ সাহেবকে কাগজ ছুখানি দেখিয়ে সব খবর জেনে  
দিও।”

এই বলে আর কোন কথা প্রতীক্ষা না করে ইস-  
মাইল দ্রুতগমে সে স্থান হতে চলে গেল। মাস্তানের মত  
কোন অজ্ঞাত ভায়ের নেশা তার পা-ধুখানি টানে  
পড়ছিল কি না, তা’ স্বন্দরনী চক্ষু হত আবিষ্কার কর্তে  
পারত।

শহিদুল্লাহ কাগজ ছুখানি পড়ে শুনালেন। এক খানিতে  
লেখা আছে, “মাহুষের জীবনের বিশ্বাস নেই; যদি তিন  
বছরের মধ্যে আমি না ফিরি, জানবে আমি জীবিত নাই।  
বৈতে থাকলে আমি তিন বছর তোমার না দেখে থাকতে  
পারব না। স্বস্তরাং যদি তিন বছরেও না ফিরি তবে  
আমার আশা ছেড়ে দেবে। আমি মৃত্যু তোমাঘের  
কি গতি হবে এ ভাবনা চিরকাল ভেবে আসছি। আজ  
বিশেষ যাবার পূর্বমুহূর্তে সে ভাবনা আমাকে পেয়ে  
বসেছে। আমার ছেলে ময়ে নিয়ে তুমি পথে ঠাড়াবে  
ভাঙতে আমার কলিঙ্গা ফেটে যাবে। এজন্য তিন  
বছরের পরে এ কাগজকে যে আর একখানি কাগজ পাবে  
তা’ হচ্ছে ভালকানমা। তুমি নিকে করে খর গৃহস্থালী  
ক’রো। তুমি হুখে আছ, জানলে মরার পরেও আমার  
আশা পরিতুষ্ট হবে।”



লয়েলী যুব সংঘশালী মেয়ে হলেও এ পাত্র তখন ঠিক থাকতে পারলে না। সে সজ্জাশীল হ'য়ে ছুঁয়ে লুটিয়ে পড়ল। এখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন সে দেখতে পেল তার পাড়াগড়নীর ধরাধরি ক'রে তাকে বাড়ীতে এনেছে। সে পাত্র ও ভালকনামা শহীদুল্লা সাহেবের বাড়ীতে রয়ে গেল।

তারপর আবার স্বর্গের উদয় ও অস্ত। দিনগুলি বহানীতি কাটতে লাগল। ইসমাইলের ভালবাসার প্রগতি নির্ধন আরও বেশি করে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু সে অতি সাবধান। সে আর লয়েলীর বাড়ী মাড়ায় না। কিন্তু অলপ্যে শত শত সন্ধ্যানে তার দ্বন্দ্বের ভাব ছেলেদের মারক লয়েলীর পোচর করে। ক্রমে ছেলে মেয়ে এমন হ'ল যেন তারা ইসমাইলেরই ছেলে মেয়ে এবং সাম্প্রতিক

শত অভাব অভিযোগের মধ্যে একপ সফল ঘটনা ঘটেতে লাগল যাতে করে বেশ বোকা যেতে লাগল যে ইসমাইল ভিন্ন সেই পরিবারের আর গতি নাই। রোগে শোকে উৎক্রেম ইসমাইলই এখন প্রধান আশ্রয়।

ক্রমে এমন যে সত্যিকার তা' হতেও হাফেজের ছবি মুখে যেতে লাগল। সময় কি না ক্রতে পারে। সময়ে এক মাত্র পুত্র-শোকাক্রান্ত রমণীর মুখে বারমাস হাসি ফুটে ওঠে। বা মনে কল্প সমুদ্রের মত পৃথার তা' সময় শুকিয়ে ফেলে। বা পর্তের মত উচু তা' সময়ে সমতল হ'য়ে যায়। ছ'বছর গেছে, এখনও লয়েলী হাফেজের অস্ত্র কাঁদে কিন্তু যে অক্ষ আগে চোখে সেগেই ছিল এখন তা' মাল হু'মাল পরে চোখের কোণে দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

## বেদনা

শ্রীমতী নলিনী দেবী

ওগো,—কেমন কোরে আমার ছেড়ে

থাকো তুমি যে,

আমি তা, বুঝতে পারি নে!

দিন রজনী তোমার তরে

মন যে আমার কেমন করে!

গোপন-করা ব্যথার বোকা

বইতে পারিনে,

আমায় ছেড়ে কেমন কোরে

আছ তুমি যে,

আমি তা, বুঝতে পারিনে!

আমার,—সারাদিন, সারা রাত

কেমন কোরে যার

তুমি তা, বুঝতে যদি হয়!

নয়ন দুটো তোমার তরে

চাহু দিকে চায় পিয়াস ভরে!

আর যেন এই ছাড়াছাড়ি

সইতে পারিনে,—

আমায় ছেড়ে কেমন কোরে

থাকো তুমি যে,

আমি তা, বুঝতে পারিনে!



সভাপতি শ্রীমুখ্য বাবু অমৃতলাল বসুর সূচনা-বচনের সংক্ষেপ সার

বীরভূম্য সম্মান-সম্বাহ!

আপানদের এই প্রাচীন জনপদ যে এক সময়ে বীরের আবাসভূমি ছিল, ইহার বীরভূম্য নাম-ই তাহা প্রকটরূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। কিন্তু বর্তমান কালে বাঙ্গালীর বীরত্ব কোন্‌কারী পিয়াসার ঢকে অপরাধ বলিয়া নির্ণীত হইলেও আপানদের অন্তরঙ্গ বীরত্বের যে একেবারেই ত্রিস্তর হইয়া ভ্রমভূমির মৌরবপূর্ণ নামের সার্থকতা নষ্ট করে নাই, তাহা বীরভূম্যবাদিগণের অজকার আচরণ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীক্ষ্যমান হয়।

বঙ্গীর সাহিত্য-সম্মিলনের সে সন্ধানের আসন ঘোড়শ-বর্ধকাল সার্বভৌমিক পণ্ডিতমণ্ডিত জননায়ক বা রাজশ্রী-মণ্ডিত মনীষিগণের অধিষ্ঠানে অলঙ্কৃত হইয়া আদিলাছে, সেই আসন গ্রহণের অস্ত্র আমার ছায় একজন অচিহ্নিত অদ্বিকারীকে আশ্রান করার সাহস অতি বড় বীরের দ্বয়েই সম্ভবে।

আপানদের এই দান আমি আনন্দে গ্রহণ করিলাম।

আমাদের সাহিত্যের ধারা কোন দিকে বাইতেছে বা কোন দিকে যাওয়া উচিত, এই কথা লইয়া নিত্যই নৃতন নূতন মত বিজ্ঞানের প্রকৃত জগৎ দেখি সরস্বতীর প্রতিমায়, সরস্বতীর ঘানে, সরস্বতীর প্রপানে। হিন্দুর বেবেরবীর মৃষ্টি কল্ম-নার মধ্যে সরস্বতীর প্রতিমায় যে ভ্রমোচ্ছল সৌন্দর্য্য, যে বৃহৎ-কন্মনীয় লাভ্যচ্ছটা আছে, তাহা আর কোনও বৈদ্য-প্রতিমায় নাই। মা আমার বক্ষ-বিলেপমালাবদন-বিপাণি, স্বধাত্য কল-বাহিনী, বীণাবাছ-বাহিনী, ভরল-সরসী-সলিল-শোভন-কলমল-বাহিনী। মা যেন নিজের বিশ্ব-মনোবোহন রূপ ধেখাইয়া মানবকে বলিতেছেন, "তোমার কাণ্ডা যেন আমারই বর্ণের ছায় পবিত্রতাও চম্ব হয়, আমার বদনবিলেপনের ছায় কাবোয় অর্ধবোধ যেন বন্ধ হয়; তোমার বিজ্ঞান, ধর্ম্মন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য সবই যেন পদ্মদলের সুরভিতে পরিপূর্ণ হয়, আর ঐ পদ্মের মধু যেন তোমার জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি দেখে নষ্ট

করে; তোমার কথা-সাহিত্য যেন শ্রোতার কর্ণে বীণা-বন্ধারের মিত্রতা বৃষ্টি করে। আমার প্রতিমার প্রতি ভূমি যেমন সত্যক বিশ্লদ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, উঠি উঠি করিয়া উঠিয়া বাইতে পারিতেছ না, তেমনই তোমার রচিত গ্রন্থের ছত্রছত্রের প্রতিও বিচার্য্য যেন ঐরূপ আনন্দে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

কিন্তু বিভাভাসের ব্যাঘাতকে আমরা মাকে কি পরিবর্তিত মৃষ্টিতেই না প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। কর্তৃপ কল্মে যার উচ্ছল নরনরগুণে স্টিলতার কৃষ্ণ ছায়াপাত করিয়া দিয়াছি—কর্তব্য গাভীরের কালিমা মাখাইয়া যার অধরে মধু মধু গাউন্টিক মুছিয়া গিয়াছি; অক্ষ বিলেপ-মালাবদন কাড়িয়া লইয়া যার অক্ষ লৌহ বর্ধে আবৃত করিয়া দিয়াছি, কমলদল দলিত করিয়া মাকে তুলিয়া কেতকী-বনে বসাইয়াছি; আর বীণা—আহন, আমার মদে একবার, একটা বিভাভাসে গ্রহণ করি, দেখাই, বীণাপাণি আজ কেমন কল্যাণের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বৃক্ষেতু বৃষ করিতেছেন।

নীলস নীতিকথার আভিধানিক অর্ধবোধ করিয়া কবে কাহার নীতি সম্প্রত হইয়াছে?

ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, রবনীতি, সমাজনীতি, পার্শ্ব-নীতি প্রভৃতির ব্যাঘাত এক মহাভারতে বত আছে, বোধ হয়, পৃথিবীর অস্ত কোনও গ্রন্থে তত নাই, কিন্তু উপভাসের বিচিত্রবিভাসে ঐ নীতি প্রীতিপ্রদ না হইলে বিশ্বের পঠন নিপাণি মিটিহিতে কি আজ মহাভারত কখনও সমর্থ হইত!

এই ত মেল প্রবেশিকা-পাঠ সংক্রান্ত পুস্তকের কথা। স্বর্গীর সার আভিতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভাশীর্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অধুনা বাদলা ভাষাকে সন্মানের ঢকে দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কলম পাঠা বাদলা পুস্তকগুলি সম্বলনমায় এবং সে সম্বলন নিদানীয় নহে, কিন্তু পরীকার্য্য অনেক ছাত্রই দললিত অংশগুলি প্রায় মূলগ্রন্থে পূর্বেই পাঠ করিয়া রাখিয়াছে, অন্তর্য্য



কলেজে অধ্যয়নকালে পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্ত কোনরূপ নুতন উৎসাহকে তাহাদের চিত্ত উদীর্ণ হয় না। মূলগ্রন্থ পূর্ণহই পাঠ করিয়াছে বলিলাম, কোথায় পাঠ করিয়াছে? সাধারণ পাঠাগারে বা প্রচারণ পুস্তকাগারে সাহায্যে।

এই সভাখলে সমাগত বা অনাগতদের মধ্যে এমন বিদ্বান, এমন চিত্তাশীল, এমন ভাবপ্রবণ সরল-জ্ঞান স্বামী অনেকই আছেন—বাহারী একটি প্রভাট, একটি অভিনাদ, একটু না-থাকে হোগগে ভাব পরিত্যাগ করিলে বাস্কাহার সাহিত্য, বাস্কাহার কাব্য, বাস্কাহার বিজ্ঞান, বাস্কাহার দর্শন, বাস্কাহার ইতিহাস ভাষার মানুষকে, ভাবের ঐশ্বর্যে ভূষিত করিয়া ভূতাত্ত্বিক বাস্কালাকে মিষ্ট পানীয় প্রদান করিতে আনান্যে সমর্থ হইলেন। তরুণ মনোরম অশ্রুত গল্পের ভুলে 'জলভাগ' যেমন বিজ্ঞানের ছবি কবির আদর্শে বসিয়া নিখিয়া রাহিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমার দেশের মহোত্তমই প্রতিভাপূর্ণ লোক বিভ্রমমান আছেন। কিন্তু হয় তাহাদের মনে একটা উদ্বিগ্ন হয় নাই, নহ অগ্রাহ্য করিয়া এই সভা দেশ-হিতসাধনে অগ্রগণ্য হইলেন নাই। আজ যদি রামেন্দ্রচন্দ্র জীবিত থাকিতেন, আমি তাঁহার পায়ে মাথা নুটিইয়া বলিতাম, 'বাবা, তোমার প্রাণ আছে, স্তম্ভি আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে, আদর্শের ছেলেরের জন্ত একধালা বই দিয়ে বাও যাহাতে তাহারা ক্লান্তকথা ভনিতো ভনিতো বিজ্ঞান শিখিয়া লইতে পারে।'

বদি উপাচার্যের মত উপদ্রব হয়, তবে ঐ এক উপদ্রব পাঠ হইতেই বিশোধকোষ মনে ভ্রুগোল, ইতিহাস ও বিভিন্ন বিজ্ঞান পাঠের প্রস্তুতি আগ্রহ হয়। 'ছদ্মবাস' নবিত পাঠ করিয়াই প্রথমে জ্ঞানের ইতিহাস, তাহা হইতেই ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রকৃতি পাঠ করিবার আগ্রহ আমার মনে জন্মিয়ছিল।

তাবা কিরণ গুপ্তা উচিত, এতর্কের মীমাংসা এখনও হয় নাই এবং শেষ মীমাংসা যে লখনৌ হইতে পারে, এমন মনে হয় না। আজ যাহা নুতন, কাল তাহা পুরা-

ন, আজ যাহা যথেষ্ট, কাল তাহা অকিঞ্চিৎ; আজ যাহা যৌবনের ছটা-ছটায় মনোমোহিনী, বৎসর কয়েক পরেই তাহা জরার জীর্ণ আধার। আবার অতি ব্যবহারে ভাষার বৌদিক গৌরব হ্রাস হইয়া যায়; অতি সলল, সহজ, নির্দোষ কথা ও নষ্ট শিল্পতা ইত্যদ্য প্রাপ্ত হয়।

যে বহির্মুখের ভাষা-জ্যোৎস্না-জলে দান করিয়া বাস্কালা কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ণের শিখরশীর্ষে পুনরিত হইত, সেই বহির্মুখের ধারার প্রতিও নব্যবর্ষের অহরহাৎ যেন ক্রমে ক্রমিমা আগিতছে।

চন্দ্রিয়াছি বড় বড় কলাবিদ্যা বলেন, সৌন্দর্য্য বহু তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত, নীতির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার উত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যিনি স্বয়ং সরল, তীব্র জ্ঞাতক শক্তি বাহার জটিলের অনলকে জ্বালাইয়া বাহিয়াছে, তিনি তাঁহার নিজের বাড়িতে বসিয়া বিবিধ অসম্পাদ্যের সাহায্যে মনুষ্য ইচ্ছা রসনার ভূমিসাধন করিতে পারেন; কিন্তু কাম্বলী চাটিতে চাটিতে উপপাতালে অরগ্রত বোয়ীর বিভাগে বেড়াইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই দেহবো-বিহীন শ্রীমৎ পরমহংস ভৈলদ শ্যামকৈও কেহ কখনও বারাদালীর ঢকের পথে নর মৃতিতে দর্শন দিতে দেখে নাই।

সমাগত সন্ধানগণ। আমার আধিকারিক এই বাচালতা ক্ষমা করিবেন, অজ্ঞতার দৌর্বল্য, বিচার বুদ্ধির দোষ, পরামর্শ দিবার অভিজ্ঞান আপনাদিগের মহৎসঙ্গে সহিষ্ণু হইয়া সহ্য করিবেন; বিশ্বাস করিবেন, এই এলাচীনের অভিজ্ঞিত মন্দ নহে; আর বিশ্বাস করিবেন যে, সাহিত্যের শক্তির সমুদ্রে তরবারি অবনত, বারুদ শক্তিহারা, কামানের গোলা নিফল রাজার মুহুর্তও নাগোতের শক্তির সমুদ্রে নষ্ট হইয়া পড়ে। বঙ্গ-বিজয় ইংরাজ পলাশী-ক্ষেত্রে করেন নাই; ইংরাজের কাছে বাসালী পরাজিত হইয়াছিল হিন্দু কলজের হস্তে। (দৈনিক বহুমতী হইতে উদ্ধৃত)

## দাবীর জের

শ্রীহিন্দুভূষণ রায় বি-এ

অচিন্ত্য আর প্রেমের তুল্য ও কমলাকে একটি সেকেন্ডার কল্যাণ-মেন্টে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাল-পত্র কোব রকমে ঠাণ্ডেই গার্ড সাহেবের হুইলিং মেজে উঠল ও গাড়ীখানা হাওড়া ষ্টেশনের স্ট্রাটফর্ম থেকে নেচে নেচে চলতে লাগল। সে কল্যাণ-মেন্টে আর কেউ ছিল না, শুধু ওপরের বার্ষ মাথাযা-পাটী রেখে চারদু মুহূর্ত দিয়ে একটি লোক গুয়েছিল। হঠাৎ গাড়ীতে ভিড় দেখে সে মুখ থেকে চারদুটা সুরিয়ে চারদিকের তাকিয়ে নিয়ে কি মনে করে উঠে বসল।

তুভা প্রেমের কাণের কাছে মূব নিয়ে চুপি চুপি বয়ে 'লোকটা কি অসভ্য তখন থেকে কি বিশ্রীভাবে ঠাকুরের দিকে তাকাচ্ছে দেখ না।' প্রেমের যে এটা লক্ষ্য করে নি তা নয়, তবে তার মেজাজটা কিছু বেশী নির্বিন্দীরা ব'লে ও তাদের গম্ভ্যস্থান বেশী দূর নয় এই মনে করে সে চুপ করেই ছিল। অচিন্ত্যর কাছে এটা স্বপ্ন না ওহুয়াতে সে স্থির থাকিতে পারিল না। লোকটার গায়ে চিলা পাছারী ও পরনে পায়জামা দেখে সে ভালা হিন্দুতে শাণিয়ে উঠল—'বাচনে কা শাধ হায় ত' মাথা ঢাকুক চুপ চাপ শো রহো নেই ত খাড মরকে নিফল বেগা—Scoundrel কাঁধাকা।' লোকটা প্রথমতে একটু খতমত খেয়ে, পরে কমলার দিক হ'তে চোক না সুরিয়েই জ্বালা দিল 'খোলা ঝাঁপ দিয়া দেখেন কা ওখাণ্ডে বাহুজী—বে কাফালা গোসা মং যাও' 'ধাঁড়াও শালা তব' বলে অচিন্ত্য রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে দিকে এগিয়ে যেতেই প্রেমের তার দুটি ধ'রে বয়ে—'খাক আর হাতাহাতিতে কাজ নেই—বংস গার্ডকে ডেকে ব'লে দে—হস্তভাগাকে আর কাথাও নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিচ্'।

বেগতিক দেখে লোকটা চুপ চাপ গুয়ে পড়ল বটে কিন্তু কমলা বেশ বুদ্ধিতে পারল যে তার দুটি তাকেই ধরাবর লক্ষ্য ক'রে আছে। কমলার মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল সে জানালার বাইরে মাথাটা বাড়িয়ে দিল।

তুভা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে 'অমন ক'রে বসল কেন ভাই?' কমলা অশ্রুত পরে জবাব দিল 'মাথাটা ভয়ানক ধরেছে বৌদি।'

বর্জমান ষ্টেশন আসতেই এরা সকলে নেমে গেলেন। নেমে যাবার সময় কমলা একবার দেখে নিল লোকটা ওপাশ ফিরে মুখ ঢেকে গুয়ে আছে।

'ঠাকুরি তা হ'লে চিঠি আমাকে দেখাবেন না?' 'না!'

'না দেখাও ত' আমার দিদি।' কমলা তুভার কলের উপর চিঠিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তুভা এক নিঃবাসে পড়ে যেতে লাগল—

জানি না কার অভিযাণে আমার পরশুর মিলতে গিয়ে অশান্তাঙ্কিত রকমে ঘরে ছিটকে পড়েছি। কোন পক্ষ দোষী সে বিচার করতে চাই না—তবে এখন একটা সামান্য কারণে বিয়ের সভায় আমার বাবা বিশেষ রকম লালিত ও অপর্যায়িত হ'লেন তখন এ ছাড়া আর আমার অজ্ঞ উপায় ছিল না। চলে আসবার সময় তোমাকে বলেছিলাম—তোমার স্বামীকে পেতে চাও ত আমার সঙ্গে চলে এসে। এ কথা বুঝবার মত বহুসংতোমার তখন ছিল কিনা জানি না। যাক সে কথা।

ভূমি বড়লোকের মেয়ে। হয় ত খাণ্ডা পরায় কই কোন দিন পাবে না তবে ধর্মের ও আইনের গোণে আমি তোমার ভরণ-পোষণের ভার নিতে বাধ্য। তাই এই থোমের মধ্যে সামান্য কিছু পাঠাইলাম। এ নিতে তোমার কোন লক্ষ্য, সন্দেশ বা ষিধা থাকতে পারে না—অন্ততঃ আমার বিবেচনায়; কারণ এটা তোমার ভাষা পাঠে।

সেদিন কমলাটা থেকে ফিরবার সময় ট্রেনে



তোমাকে কেববার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। সে জ্ঞ  
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ইতি—

অমল।

সুখে সঙ্গে ঠুক ক'রে ভাঁজ করা একটা কাগজ খামের  
ভিতর থেকে নীচে পড়ে গেল—সত্য হাতে ক'রে নিয়ে  
সেটা দেখলে—একটা দশ হাজার টাকার চেক।

পাশের ঘরে একটা সোফার উপর কল্যা চোখ দুটো  
বুকে নিশ্চীনের মত পড়ছিল—সত্য বীরে বীরে তার  
কপালে হাত বুসিয়ে দিতে দিতে বলে "তাকে যদি দেখে-  
ছিলে ত' আমাদেরকে কেন দেখিয়ে দিলে না তাই?"

"তোমরাও তাঁকে ভাল ক'রেই দেখেছ ভবে চিন্তে  
পারো নি।"

"সে কি। কোথায়?"

"সেই পায়জামা পরে চামর ঢাকা দিয়ে ওপরকার  
বার্ষে গুয়েছিলেন।"

এলাহাবাদে বাগানঘেরা একটা ছোট বাড়ীর ভ্রমি  
রুমে চেয়ারে ব'সে হরেনবাবু চা খেতে খেতে দৈনিক  
ধরনের কাগজটা পড়ছিলেন। অমল এসে পাশের এক-  
খানা ঘোরে বসতেই বুদ্ধ বলেন "বাবা সেই রেজিষ্টার  
চিঠিটার রসিদ এসেছে—ভাল ক'রে কান্ডিলে তুলে রেখে  
না।" অমল সেখানা নিয়ে কোন কথা না ব'লে বেরিয়ে  
মাছিল—বুদ্ধ ডাকলেন "অমল।"

"বাবা।"

"আমার কাছে এস।"

অমল কাছে এসে দাঁড়াল। পিতা চোখ দুটো রক্ত  
ক'রে শুষ্ক বলে "তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করব বাবা  
—আশীর্বাদ করবার মত কিছু ত' আর রাবিনি—বয়স  
এতদিন খ'রে কেবল কইই দিয়ে আসছি—"

"না বাবা—আমার ত' কোন কই নাই—"

কথা শেষ না হতেই কমলার পিতা সভাবাবু কমলার  
হাত ধ'রে ঘরে ঢুকলেন—পলটা একটু খেতে নিয়ে  
বলেন—"আপনার গুণ্ডরথকে পৌছে দিতে এসেছি।  
মনোমালিন্য বাবা আছে সেটা আমাদের মধ্যে থাক-  
এব' ত' কোন অপরাধ নেই—এ কেন দুঃখের ভাগী হয়।"

পায়ের উপর থেকে কমলাকে টেনে তুলে হরেনবাবু  
স্থির কণ্ঠে বলেন "খুব সময়েই এসেছ মা—অমল ত' একা  
আর আমাকে সামলাতে পারছিল না—তোমার শব্দ  
মশারকে প্রণাম কর অমল—ও কি বেয়াই মশার আপনি  
চলেন যে—"

আছে হা—আমি বিদায় হই—বাইরে পাড়িতে আমার  
ঐ, পুত্র, ও পুত্রবধূ আছেন—"

হরেনবাবু চেয়ার থেকে উঠে কীয়ে চারদটা কসে  
বলেন—"অমল এ তোমার বাড়ী—তুমি নিজের কাজ কর  
—যাও—তাদের নামিয়ে নিয়ে এস—আমি আর বাধা  
হবে দাঁড়া না—আমি মুখেই শামের বাড়ী চলায়  
এ ছুটো দিন সেইখানেই থাকা যাবে—ছুটে যাও অমল  
—দেখা করো না—যাও মা—তুমিও পাড়িয়ে থেকো  
না—"

চৌকাঠের কাছে তাঁর হাত ধরে ধরা গলায় সভাবাবু  
বলে উঠলেন—"আমার অপর্যাপ্ত অনেক—তবু কমা চাইতে  
পারি কি? যাক্ কমা না করেন—কমা চাইবার অধি-  
কারই শু' আজ দিয়ে যান—যদি দিন পাই পরে চেয়ে  
নিত পারব।"

আর কিছু বলতে হ'ল না—খোলা মনে খোলা প্রাণে  
হরেনবাবু বৈবাহিককে ছাড়িয়ে ধরলেন—দুই বৈবাহিকের  
কোলাহুলি সেই থানেই হয়ে গেল।

টেবিল ল্যাম্পের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘোরে ব'সে  
অমল একখানা বই নিয়ে পড়ছিল কি কেবল তার পাতা  
কলুটিচ্ছিল তা ভগবানই জানেন। দারুণ লম্বাটাকে  
কেন রকমে একটা ছোট পাঠো ঘোমটার আড়ালে রেখে  
কমলা আত্তে আত্তে শায়ীর পায়ের কাছে এসে প্রণাম  
করলে। চোখে মুখে দুটামি ডরা হাসি হেসে অমল বলে—  
"তোমাকে ছোঁয়া দূরে থাক্ তোমার রিক্ত তাকাতোই  
ভর করছে—তোমার দাদার হুহুম না গেয়ে—"

দরবার পাশ থেকে সত্য হৈকে বলে—"তাঁর হ'য়ে  
ছহুমটা না হয় আমিই দিয়ে যাচ্ছি—" বাইরে থেকে ঘরের  
শিকলটা তুলে দিয়ে ছুঁ দুই ক'রে গে কলে সে পাশিয়ে  
গেল।

## ভাষার ডোর\*

শ্রীমতী সরলা দেবী

কাল অগ্রসর হয়েছে—বাল্যাদেশ কালের পশ্চাতে  
পড়ে নাই। এই বর্ষীয় সাহিত্য সম্মিলন বাঙ্গালীর  
জাতীয় জীবনতরীকে উন্নতি-সমুদ্রে বহুবোদ্ধন পথ উত্তীর্ণ  
করে এনেছে। আশ্র ১৭ বৎসরের সেই সমুদ্র প্রতি-  
ষ্ঠানের সাহিত্যবিভাগের কর্ণধার মনোনীত হয়ে আমি  
কৃতার্থবদ্ধ বোধ করছি। গত বৎসর ঠিক আশ্রকার  
দিনে প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য সম্মিলনে সভানেত্রীরূপে  
আহূত হয়েছিলাম। স্বদেশে যে সম্মান কোন বয়স-ব্রতী  
আজ পর্যন্ত লাভ করেননি, দীর্ঘ প্রবাসের পর বঙ্গ বিধে  
আসিলামাজ সেই সম্মানের অধিকারী হয়ে, আশ্রকের  
সভার সভানেত্রী পদের গৌরব লাভে আমার দেশবাসী ও  
আমার ভাষাভাষী ভাইবন্ধুগণের সন্মের পরিচয়ে অতি-  
কৃতজ্ঞতায়, আনন্দচিত্তে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন  
করছি।

আমাদের ভাষার জন্ম কবে, কোথায়, কেমন করে হল  
কেউ ঠিক বলতে পারে না। এ বিষয়ে অস্থানীয় ভাষা  
চলে। পণ্ডিতগণের অধ্যয়ন এই যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা  
মুহুরের সহজাত। প্রথমাবৈদিকযুগের বহুজুগবসি  
আদিম মানুষের সহজাত যে ভাষাবীজ ছিল, তাই ক্রমে  
অঙ্কুরিত ও পুশিত হয়ে বর্তমান-বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে  
এই তাঁদের সিদ্ধান্ত। সংস্কৃত বাদের কবিত ভাষা ছিল  
সেই আধুনিকমণ্ডের জাতি যখন ভারতকে বিস্তার লাভ  
করেন, তখন আধ্যাবর্তের বিভিন্ন প্রদেশে আদিম অধি-  
বাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশীভাষা প্রচলিত ছিল।  
সেই দেশী ভাষাগুলি বিদেশী সংস্কৃত ও সংস্কৃতপ্রভ ব্রাহ্ম-  
স্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও, চেহারায সম্পূর্ণ পরিবর্তিত  
হলেও আশ্রপর্যন্ত সেই দেশী ভাষাই আছে। গৌড়ীয়  
ভাষা বা বঙ্গভাষা তাদের অন্ততম। হ'কোর খোল ও  
নদেতে দুই বদলে গেছে, কিন্তু হ'কোটি সেই আছে।

নিখিত ও কবিত ভাষালা, সংস্কৃত এবং প্রাকৃতিক অভি-  
ধানের সমস্ত শব্দশলপ আশ্রগণ করেছে অথচ বাঙ্গালী  
রয়ে গেছে। বাঙ্গালার নিজস্বের পরিচয় প্রকাশিতঃ নগণের,  
শব্দস্বরের ও বজ্রের আবহমান কাল প্রচলিত অন্তরে;  
বিত্ততঃ তার শরীরে এখন পর্যন্ত এমন কতকগুলি আদিম  
শব্দের অবস্থানে বাদের সংস্কৃত বা সংস্কৃতপ্রভ কোন শব্দের  
সঙ্গেই সৌগদ্যুত নাই; এবং শেষতঃ কতকগুলি রীতিতে  
বা হায়ে যাকে বৈয়াকরণেরা গৌড়ীয় রীতি আখ্যা দিয়ে-  
ছেন। বীজ বাঙ্গালার সংস্কৃত হতে স্বতন্ত্রতার সিদ্ধান্ত  
কল্পনা প্রসূত নয়, অস্থানীয়। অস্থান্যও একটি প্রমাণ  
যা মুক্তিযুক্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণবিশ্বজ্ঞানগণের  
বিচারের পুণ্যাপুণ্য পর্য্যালোচনার স্থান এ নয়, বাদের  
সে বিষয়ে অতিক্রি ভাগবৎ তীরা যেন স্বয়ঃ প্রাকৃত-  
ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান যুলে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন।

যুদ্ধবের সময়, অর্থাৎ অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর  
পূর্বে বঙ্গবিশিষ্ট স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে ভাষার  
লিপি এত প্রাচীন, তার সাহিত্য প্রাচীনতর হবে সন্দেহ  
নেই। আজ পর্যন্ত সবচেয়ে পুরাণ যে বাঙ্গালারক্ষা  
পাওয়া গেছে তাঁর বয়স অস্থান্য এক হাজার বৎসরেরও  
অধিক। সেটা রামাই পণ্ডিতের ধর্মপুণ্য বা পুণ্যপুণ্য।  
যে বাঙ্গলা আধুনিক বাঙ্গালীর দূর্বোধ্য নয়। তার  
একইস্থানি নমুনা দিই :—

নহি বেক নহি রূপ নহি ছিল বর চিন।  
রবি সসী নহি ছিল নহি রাস্তি রিন।  
নহি ছিল অলখল নহি ছিল আকাশ।  
যেক মদার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ।  
মেষল দেহারা নহি শুবিরার দেহ।  
দেপুণ্য মাফ পরভূর আর অচ্ছি কেউ।  
কথি যে তপশী নহি নহিক বাস্তন।



পর্শত পাহাড় নহি নাহিক স্থাবর জন্ম।

স্বয়ং নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।

সাগরসম নহি নহি দেবতা সঙ্গল।

নহি ছিট ছিল আর নহি স্থর নর।

রক্তা বিহু ন ছিল ন ছিল আধার।

বায়বন্ত ন ছিল নছিল যে তপস্বী।

তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী।

ঐরাগ মাংস নহি কি করি বিচার।

স্বগণ মন্ত নহি ছিল সব পুঙ্খকার।

দম দিগপাল নহি যেন তারাগণ।

আউ নিন্ত নহি ছিল যমর তাজন।

চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সান্তর বিচার।

গোপাত বেদ ঐকলন পরভু করতায়।

ছিদ্মন পরারিন্দ করিবাক নতি।

রামাক্রি পণ্ডিত কহে হনরে ভারতী।

এক বাঙ্গাল বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী যদি দুটি একটি শব্দ বাব দিয়ে আমাদের হুবোধ্য হয়, তবে বুকের সম-সাময়িক বাঙ্গালী সেজ হাজার বৎসর পকেই রামাই পণ্ডিত ও তাঁর সমকালীনদেরও দুর্বোধ্য না হওয়ারই কথা। এইরূপে লোকশ্রুতির প্রায়ন্তর দেবে পরশপার প্রাপ্ত পিতৃ-পিত্তামহাত্ম্য এক এক ভাষা চলে আসছে, পরিবর্তনমান হতে হতেও প্রত্যেক পুরুষে লোকসমাজে তারা ভাবের আদান প্রদানের সহায়তা করেছে ও সামাজিক জীবন-প্রবাহ অক্ষর রাখছে।

বাঙ্গালী মাতার উর্ধ্বরতা যেমন অসাধারণ, বাঙ্গালী মনের ভাটখাতাও তেমনি অসামান্য। সেই ভ্রাণপত ভাটখাতার বাঙ্গালী পরশপার ভাবের উত্তম বাহন মাতৃভাষাকে কাঁকড়িয়ে ধরে রেখেছে। যেমন বৈদিকযুগের আৰ্য-ভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষা লোপ পায়নি, তেমনি মুসলমান যুগের কার্ণির প্রভাপেও বঙ্গভাষা আত্মবিসর্জন করেনি। উত্তর পশ্চিম হাজার বয়েছে, প্রাকৃত হিন্দির পাশাপাশি উর্দু নামক আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী লোকভাষাকে অর্ধ রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে, এবং সেখানে নাপারী লিপির সঙ্গে আরবী লিপি আজ সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করছে। বাঙ্গালীরা কিন্তু বাঙ্গালাভাষাও লিপির অসপত্ত্ব রাখা কায়ম

রয়েছে। বাঙ্গালী দেশে পাঠান মোগলের অভিযান প্রত্যহ হলেও, পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক গুণে বৃদ্ধি পেলেও, বাঙ্গালার বুকের ভিতর উর্দু স্থান হয়নি, এবং বাঙ্গালালিপি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আর কোন লিপি এ দেশে প্রতিষ্ঠা পায়নি। বাঙ্গালী মুসলমান হলেও বাঙ্গালী রয়ে গেছে। তার ভাষা না চিত্তা, খান-খারগা, দুঃস্থব্ধের অস্থূতি তার জন্মভূমির ভাষাতেই ব্যক্ত না করে সে থাকতে পারেনি।

মোগলপাঠানরা বণবিজয় করলেও বাঙ্গলা বাঙ্গালীরই রইল। যদি দেববংশে বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশে একটি অল্পাংশ প্রাচীর বেঁচে উঠত, বাঙ্গালার বাহিরের একটি মুসলমান আর বাঙ্গলার পরাণ করতাই না পারত, তবে কেবলমাত্র হিমশিকোরাগণসহ বাঙ্গালী মুসলমানও বৈদ্য-পূরণসহায় বাঙ্গালী হিন্দুতে ভাই ভাই এক ঠাই হয়ে, পরশপারের জ্ঞানধর্ম, বিভাবুদ্ধি ও বলবীর্যের সাহায্যে এমন একদানি বেশ, এমন একটি জাতি গড়ে তুলতে পারত, যা পৃথিবীর সকলের দর্শনীয় হত। কামাল পাশার ধর্ম-স্বমুক্ত এক বলীমান তুরঙ্গ রাঙ্গোর তুল্য বাঙ্গলায় একটি নির্দশ হতেল স্বয়ং জাতি পড়ে ওঠার সম্ভাবনা এখনও বিজ্ঞানসম্মত, কেননা বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান ভাষার ভাবের রাইখ। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালীর গাটে গাটে ভারি স্টিট—বড় শক্ত স্টিট। এ স্টিট আজ পর্যন্ত কেউ খুলতে পারেনি। আরব, ইরান, কাহুল, পাকার, মিল্লী লক্ষ্যেই বাঙ্গালায় এ স্টিট আজ পর্যন্ত খোলেনি। বিদেশী বিজ্ঞান-গণ ইতর, অশিক্ষিত বাঙ্গালীর দেহে কোষপারের অজ্ঞাগ্র মরিয়া ঢেলে দিলেও, ভয়ে ও অজ্ঞতার দলে হারাণের অজ্ঞ সাধারণ ইসলাম-পন্থী বনে গেলেও বাঙ্গ-মাতার ক্রম তাদের ছাড়েনি, মাঘের বুলি তারা ভুলতে পারেনি। বিদেশী মুসলদের সন্ততভাবে অনেকগুলি পার্শ্ব ও আরবী শব্দ তাদের বৈদিকনি জীবনে প্রবেশ করে তাদের বাঙ্গালায় কিছু বিকৃত করেছে বটে, কিন্তু তা বাঙ্গালার রয়েছে, উর্দু হয়নি। সেই বাঙ্গলার মুসলমান চাবী বান বোনে, সেই বাঙ্গালার মুসলমান মাঝি ঠাঙ টানে, সেই বাঙ্গলার মুসলমান মা শিত্তের ঘুম পাড়ায়, সেই বাঙ্গলার মুসলমান বোয়ী নৌকা নেয়। হিন্দু মুসলমান দুয়েরই দরবারী

ভাষা হল কারি, ঘরের ভাষা উভয়েরই রইল বাঙ্গলা, এবং সেই বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান দুজনের প্রাণ হইতেই নিঃসৃত হল বাঙ্গালী সাহিত্য। কে বলবে নিম্নলিখিত গানটি পূর্ববঙ্গের কোন হিন্দুর বা মুসলমানের রচনা? মনমাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী ভবনবির তুকান ভারি!

তোর হেলে পেলেনা জল,

তোর হেলে পেলেনা জল, কি করবি বল,

কেমনে জোমাবি পাড়ি!

তোর হেলে হুগুগন দড়ি যাচ্ছে ছিড়ি,

এ ঠাখ পোটাস পোটাস করি!

ডুল তোর ডগ তরী হায় কি করি

কেমনে জোমাবি পাড়ি!

মাঝি তরঙ্গ হেরি হইতি নারি

তাই তোলে জিজ্ঞাসা করি

বল দেখি কোন্ মাটির শিখার তোরে

ওজু ওবি এ মাঙ্গিগিরি।

উপনিষদের দেবভাষা প্রচারিত হইবে অপরূপ সত্যটি নিয়ের গানে ফুটে উঠে, বাঙ্গালী ভাষায় ব্যক্ত হয়ে, বাঙ্গালী-মাতার মূর্ধ সন্ধানদের জ্ঞানেই অর্থব্য বিতরণ করছে, কি আসে যাহ মুসলমান ভাষকের চিত্ত হতে তা উদ্ভূত হয়েছে বা হিন্দুর?

রূপ দেবিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে। আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা গিল আমারে। সাহিত্য মহন্ত সমাজে মাহুদেই এমন একটি আশ্বজ, যা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, জনপদ হতে জনপদান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে বিচরণ করে মনে মনে, ভাবে ভাবে, কল্পনায় কল্পনায় মিলনপ্রার্থী বেঁচে বেঁচে। যা আমার ভিতর নেই তা তোমার কাছ থেকে এনে আমার দেয়, যা তোমাতে নেই তা আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে তোমার দেয়।

যেমন মাহুদের দুটি শরীর—প্রাণঘর ও অন্নঘর একটির বিধে আর একটির অস্তিত্ব লোপ পায়, তার আশ্বজ সাহিত্যেরও তেমনি দুটি শরীর, একটি ভাবের ও একটি ভাষার। একের বিরহে অপর অস্তিত্ব থাকে না।

দুয়ের মিলনে শরীরী সাহিত্যের প্রকাশ হয়। ভাবের প্রাচুর্য থাকলে ভাব নিজেই ভাষায় গুণে বাহির করে সাহিত্য-রূপ ধরে, আর ভাষার দৃশ্যতা থাকলে ভাষাই কীর্ণভাবকে গুণে করে, স্বল্পভাবকে উদ্ভব করে, নিগূঢ়-ভাবকে বাহিরে টেনেও সাহিত্যের স্রষ্টি করে। ভাব ও ভাষা দুয়েরই যথোনে অপ্রভুল সেখানেই সমাজ সাহিত্যে অপরূপ থেকে যায়।

সামান্য-সামান্য সাহিত্যের পিতৃকৃত্যে কৃত্তিত্বের পরিচয় আমরা বাখার পেয়েছি। বৈদিক যুগের সাহিত্য এক-কালে শুধু স্রষ্টিগম্য ছিল। এই শ্রৌত সাহিত্যের তেজ, ক্ষমতা ও শক্তির কথা সর্বজনবিদিত। বৈদিক সাহিত্যই সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সভ্যতার ছত্রভূত এনেছিল। যমজা নিজেই সেই ভাষার সাহিত্যই সমস্তের ক্রুর-সেবক, কিন্তু পরভাষাযিৎ হয়ে, পর সাহিত্যে প্রবেশ পূর্বে তার নিকট হতেও সেবা গৃহীত হতে পারে, যদিও তা কষ্টজনক। তথাপি এইরূপেই প্রাচীন ভারতের আদিমনিবাসী প্রাকৃত-ভাষীগণ সমৃদ্ধে ব্যাপন্ন হয়ে তার নিকট হতে সেবা আদায় করেছিলেন।

যাঁদের মাতৃভাষা বৈদিকভাষা বা সংস্কৃতভাষা ছিল না, তাঁরাও আৰ্যভাষা শিক্ষা করে আৰ্য-সাহিত্যের মর্মগ্রাহী হয়ে আৰ্য-সভ্যতার অংশভাগী হয়েছিলেন। যেমন আমরা আজ-কালকার ভারতবাসীরা পাক্যভাষা শিক্ষা করে, পাক্যতা সাহিত্যের সাহায্যে পাক্যতা সভ্যতা আশ্বাস্য করছি। মাহুর নানা দেশের নানা ভাষা ও সাহিত্য হতে নানা চিত্তা ও কল্পনা হতে যে পুষ্টি গ্রহণ করে, তা নিজের ও পরের দেশকে নিজেরই ভাষার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠান করে। আমরা অধুনি কালীয়া বাহির হতে যা কিছু মানসিক খোঁজক গ্রহণ করছি তা বাঙ্গলা সাহিত্যেরই পুষ্টি-বর্ধনের কাছ লাগছে। আমাদের ভাবের প্রাচুর্য যত বাড়ছে ভাষাও ততই শক্তিশালী হচ্ছে। স্বাভিপ্রায় ভাব ও ভাষায় মিলে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে তুলছে এবং সম্ভব সাহিত্যই জাতির প্রত্যেকের জীবনের প্রদার বাড়াবে, তার জীবনী শক্তিকে ক্ষীত করছে। প্রাচীনকালেও তাই হয়েছিল। তখনও এক-বার প্রাচ্য তথা-পশ্চিম অনাধা ভারতে পাক্যতা তথা-



কথিত আৰ্য্য সভ্যতার প্রাচীন এসেছিল। প্রথমে আদিম ভাষাভাষীরা আৰ্য্যভাষা শিক্ষা করে, আৰ্য্য সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজেদের মানসভাগের পূর্ণ করতে থাকেন। ক্রমে আৰ্য্য অসাহিত্যিক যখন একাকার হয়ে ভারতবর্ষীকে ভ্রষ্টতার বর্ষণে প্রাণপণ হতে বাধ্য করেন, তখন লোক-ভাষার যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়ল, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যও লোক-স্বভাবের ভাঙার হতে ভাব ও চিন্তারস্তরের সম্ভারে পূর্ণাবয়ব হল। এইসকল আশ্রম প্রাচীনদের দ্বারা উদ্ভবেরই ত্রিবিধ হতে থাকল।

সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত ভাষাতে আদৃত বাঙ্গালীর রচিত কাব্য, দর্শন, ত্রায় ও খণ্ডশাস্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থিক গ্রন্থ আছে। বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতে লিখিত। লোক-সাধারণ মাতৃভাষায় লিখিত। পণ্ডিতসমূহের কাছে তার আদর এমন না কেনে তাদের আবেগে ধরে বসে লেখা পুঁথি গ্রন্থ যথেষ্ট খেকে যেত। বৌদ্ধযুগে দেশীভাষার প্রতি পণ্ডিতদের আর অবজ্ঞা নেই দেখে গোপাল সাহস করে হর ত আপন আপন রচনা তাদের সামনে বের করত—যেমন পৈশাচী ‘বৃহৎ কথ’। পৈশাচী নামক প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার রীতি গোঁড়ীয় রীতির সব সংযোগে মিলে বলে প্রাকৃত বৈষ্ণবকরণেরা নির্দেশ করেছেন পৈশাচী বঙ্গ ভাষার প্রাচীন রূপ। তখনা যার কোন আধুনিক মাত্রার প্রত্যয়িক এই বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সন্দর্ভ আমি দেখিনি, হস্তগত যতগুলি তাঁর প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিসংশয় না হচ্ছিল, কিংবা তাঁর যুক্তি সর্বত্রগ্রাহ্য হচ্ছে বলে না জানি, ততদিন পূর্বস্বদীপের সিদ্ধান্তই মেনে নিয়ে স্বীকার করব পৈশাচী ভাষার অর্থ তদানীন্তন গোঁড়ীয় ভাষা বা বঙ্গভাষা। তাই যদি হয়, তবে ‘বৃহৎ কথ’ বাঙ্গালীর সাহিত্যিক অধ্যবসায়ের একধানি বিপুল পরিচয়। ‘বৃহৎ কথার’ অধিকাংশ পাণ্ডিত্যভাবীরা রাজার অনাদরে ধ্বংস হয়েছে, তার সমগ্রাংশ মাত্র কথাসিংহ দাপ্তরে রক্ষিত হয়েছে। সে কথাসিংহদাপ্তর এখন সংস্কৃতে নিকট, মূল বাঙ্গালী বিলুপ্ত। চীন জাপানের সাহিত্য ও বীরাণের ‘চৈতন্য’ যেমন ভারতের অনেক লুপ্ত সাহিত্যের সন্ধান দেয়, এই সংস্কৃত কথাসিংহদাপ্তরও তেমনি বাঙ্গালীর লুপ্ত সাহিত্যিক কীর্তনের একধানি অসিদ্ধিত ইতিহাসের সম্পূর্ণ উপবরণ দান করে।

বাঙ্গালী ভাষায় জাতি। ভাবপ্রবণতা বা কল্পনা-জীবিত্য তার সম্ভার প্রধান উপাদান। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাতেই ত লক্ষ্য করা যায়। এই যে আত্মকাল শব্দ শব্দ মোটর-বাস দিনরাত কলিকাতা মেদিনী কপিত করে দৌড়োড়ি করছে, এদেরই শরীরে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর পরিচয় প্রতিভাত হচ্ছে। ইংরেজ, হিন্দুয়ানী বা পাঠারী কোম্পানীর বাসের নাম নিত্য গজাঙ্ক, বড় জোর মোটা মোটা ভাব-ব্যবহা—যেমন ‘গোলাফোর্ড এও কো’ ‘বালসা মোটার মার্ভিন’, অথবা হৃদ—‘অয় সত্যনারায়ণ’—

কিন্তু বাঙ্গালীর কথিত ব্যবসায়েও ফুটে বাহির হয়েছে,—কিবা নাম সব!—অশ্বা, কিম্বারী, বিমান, নিয়তি, উদয়, প্রভা, শেকালী, বিজলী—আরও কত কি। শুধু কি ভ্রমলোকের ছেলে লেখা-পড়া শিখে কথিত কো? তা না। বাঙ্গালীর জীবিতের দেখ—কল্পনার দুখনি তানা তাদেরও স্বচ্ছ জাঁটা আছে। তাঁদের ভিতর দিয়ে উনিয়ে বুনিয়ে কত রকম কবিকল্পনার রঙিয়ে এক এক জাতের সাজীর নামকরণ হচ্ছে,—কেউ নীলাধরী, কেউ চাঁদের আলো, কেউ ক্ষুদ্রের হাওয়া, কেউ গুণবাংরা। আবার পাড়ের নামেও কত কল্পনার বেলী—কোনটি সত্তরকি পাড়, কোনটি বেগপাড়, কোনটি গলা-মুন্না, কোনটি বড়গড়।

তাতিপাড়া ছেড়ে যদি ময়রার ধোকায়ে গুঁটা যায় দেখানোও কল্পনা কবিত্বের গজাগড়ি—‘আবার বাসো’, ‘রাঞ্জুভাগ’ ‘মনোহরা’ আরো না জানি কি। একটি চুকটুকুলাল ক্ষীরের গোলার ‘লেভিক্যানিন’ নামকরণে মোরক্কাতির একাধারে কল্পনা-শক্তি ও রাজসমী-জ্বিত্য পরিচয়ের সমগ্র যিনি না হবেন তিনি নিশ্চয়ই বৈরাগিক।

গোপ হয় অহুদস্থান করলে বাঙ্গালী শ্রমিকের প্রত্যেক স্তরেই—কাজজীবী, মস্তজীবী, পর্ণজীবী—সকল শ্রেণীর মধ্যে এই কবিত্বের অথবা ভাবপ্রবণতার ছড়াছড়ি পাওয়া যায়। বীরাণের সাহিত্যপরিষদের এবং তার শাখা-প্রশাখা-গুলির মরা বস্ত্রের প্রত্যন্ত উদ্ভার ছাড়া—জীবন্ত বাঙ্গালীর এই এক আর্থী আধুনিক তত্ত্ব সমগ্রও কিঞ্চিৎ কালকেপ করা উচিত।

ভাব এখন একটি জিনিষ যাকে আটকে রাখা যায় না। ভাব নিজেই প্রকাশের পথ খুঁজে বের করবেই। চিত্রে, মূর্তিতে, স্থাপত্যে, গতিতে, শব্দে ও ভাষায়—নানা আধারে ভাব নিজেই ব্যক্ত করে। বৈদ্যমনি লোক-ব্যবহারের রত প্রত্যেকেই নিজের অভিপ্রায় ভাষায় ব্যক্ত করতে হয়। কিন্তু অভিপ্রায় বা প্রয়োজনব্যবহা ভাষা ও বিনা প্রয়োজনে শুধু ভাবব্যক্তির ভাষায় তফাৎ আছে। একটর ভিতর আছে শুধু আপাতদৃষ্টি ও শ্রবণ, অন্যটির ভিতর আছে এক অদৃষ্টদৃষ্ট-পূর্বের অহুদস্থান, সৌন্দর্যের অহুদস্থান। প্রয়োজন-ব্যবহারের জেতে মোটাটো ভাষাজান চাই, ভাবব্যক্তির জেতে চাই ভাষায় কলাবিশ হওয়া—যে কলার নাম সাহিত্যিক চাই, আত্মজ কলার ত্রায় সৌন্দর্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা মাছবের চিত্তকে হৃদয়ের জল লালারিত করে তোলে,—কল্পনা, কার্যে, যদে জীবনে সর্বত্রই হৃদয়ের অহুদস্থান ও প্রতিষ্ঠা-ব্যাঙ্গল হয়।

মানবসমাজকে ব্যবহারিক ও হাদিক ঐগজোরে বেধে রাখার বিষয়ে ভাষার হাত যে কত বড় তার পরিচয় আমরা বাইরের টাওয়ার-অব্যবহারের উপাধ্যানে পাই। এ জগতে মাছবে মাছবে সন্তাবে বাস করছিল, চাঁদ তাদের মধ্যে ভাষার ব্যবধান এসে পড়ল, কেউ আর কাউকে বুঝে পানে না, কেউ কারো হৃদয়ে পৌঁছিতে পারে না। সম্ভবমাত্রার পরিবর্তে তখন যোর দৌমনজে বুন ভরে গেল। এক ভাষা-ভাষী মাছবে মিলে যে গর্গের সিঁড়ি রচতে বসেছিল, তা আর রচা হল না।

ভাষার একোয় উপরই জাতীয়তা নির্ভর করে। রোমান-অব-আর্ক ক্রাসের মজিকলে এই কথাটাই স্বয়ং হতে অহুদস্থ করছিল। যুগ, গ্রাম্য বোড়শী বদেশের দায় মোচনে অহুদস্থেরিতা হয়ে, ভাবের আবেগে এই একই সত্তার দর্শন পেয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারে যখন ঘদী সেনাধ্যক জোয়ান-অব-আর্কে জিজ্ঞাসা করলে ‘তোমার দেশ কোথায়?’ লোরেনের অশ্রুগত ভোমের মিডে না?’

জোয়ান উত্তর দিল—“হী, তাতে কি আসে যায়? আমরা সবাই ফরাণ্ডীভাষী।”

সেনাপতি যখন জিজ্ঞেস করলে—“ইংরেজ দৈনিক কি ভাষায় লড়াই করে বেছেছে?”

বালিকা বললে—“তারা ত মাছব। বিখ্যাত আমা-দেবই মত তাদেরও সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিজের দেশ ও নিজের ভাষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রেরত কখনও নয় যে, তারা আমাদের দেশে আগবে আর আমাদের ভাষা বলতে চেষ্টা করবে।”

সেনাধ্যক উক হয়ে বললেন—“এ সব গাঁজাখুরি কে তোমার মাথার ঢোকাতে? দৈনিকরা তাদের প্রকৃত অধীন, সে প্রকৃত বাগ্গাতির ডিউক, ক্রাসের রাজা বা ইংলণ্ডের অধীশ্বর যখন বেই হোক। তাদের নিজের ভাষার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?”

জোয়ান উত্তর দিল—“আমি তা বুঝিনে। আমরা সবাই বৈকুণ্ঠের রাজার অধীন। তিনিই আমাদের আপন দেশ ও আপন ভাষা দিয়েছেন, আমাদের তাতেই নিষ্ঠা চান। তা যদি না হত, তবে যুদ্ধক্ষেত্রেও ইংরেজের মারা নরহত্যা হ’ত, আর নরকায়িতে দৃষ্ট হবার ভয় থাকত তোমার। নরপ্রভুর প্রতি কর্তব্যের কথা ভেবে না, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যের কথা ভাবো।”

র্যাক প্রিন্স ও তার সৈন্যদের কথায় জোয়ান বললে—“ঈশ্বর তাদের জেতে যে দেশ সৃষ্টি করেছেন, এবং যে দেশের জেতে তাদের সৃষ্টি করেছেন সেই বদেশে কিংবে গেলে ইংরেজেরা ঈশ্বরের হুসোবা শিষ্ট হবে। আমি র্যাক প্রিন্সের কথা শুনেছি। সে যে মুহুর্তে আমাদের দেশে পাদক্ষেপ করে শয়তান সেই মুহুর্তে তার ভিতর প্রবেশ করে তাকে দানব বানিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের দেশে—যেদানকার জেতে সে খষ্ট—সে অতি ভালমাছব। সব বিকটে এই কথা। আমিও যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের দিকটাই ইংলও দখল করতে যেতুম, সেখানে বাস করতে ও সেদানকার ভাষা বলতে চেষ্টা করতুম, আমারও ভিতর শয়তান প্রবেশ করত।”

জোয়ান-অব-আর্কের অবিকলিত ধারণা হয়েছিল যে, যে ভাষা যার, সেই ভাষা যে দেশে কথিত হয়, সেই দেশই তার। অতি সহজ সরল কথা। শিশুও বুঝতে পারে, অশিক্ষিত সৈনিকও বুঝতে পারে, গ্রাম্য নরনারীও বুঝতে পারে।



পারে। আমার ভাষা যে বলে না যে আমার পর, আমার দেশ তার নয়, সে বিদেশী। বিদেশীর আমার দেশে অধিপত্য করা অস্বাভাবিক, এবং আমার দেশকে পরের অধীনতা থেকে মুক্ত করার কামনা আমার স্বাভাবিক।

যেখানে অপর পরিমিত, কিন্তু তার প্রার্থী অপরিমেয়, যেখানে জোর বার অল্প তার এই নীতি চলে, সেখানে জোয়ানের পরিকল্পিত ভাষাবিভাগে দেশ, বিভাগের ঘায়া আত্মরক্ষা চেষ্টা অনিবার্য। যে জাতি পরকৃত নীড়নে চরুল, পরকৃত নীড়নে নিরয় ও পরিত্যক্ত নীতিতে ভিন্ন ভিন্ন, সে জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জড় আত্ম-ভাষা ও পরভাষার মধ্যে ভেদের রেখাটি স্থগিত করে টানতে হয়। জাতীয়তাবাদ সর্বদাই যে জাতির ধর্ম হয়। কিন্তু সে কাল ধর্ম মাত্র, চিরস্থায়ী ধর্ম নয়। জাতীয়তা প্রত্যেক জাতির সাধন, বিশ্বাত্মবোধ তার সাধ্য এবং সার্বদেশিক ভাষাজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যক্রিয়ই তার উদ্যোগিক।

যোগলগঠান একই ধর্মদ্রষ্টব্যাকুল হলেও যে যখন বসনদেশকে ও বসভাষাকে আপন দেশ ও আপন ভাষা বলে মনেছে সেই অপরের অভিযানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। হসিনেও আছে—

হুস বলে বস্ত্র মিনালে ইমান।

শেখ-খ্রীতি ধর্মেরই অঙ্গ।

সুতরাং যেখানে যেই মুসলমান থাকুক, তার মানবধর্ম বিবর্তন দিয়ে ভাষার একাত্তরে সে আর যে সব মানব পরিবারের সঙ্গে হৃদয়ের ও ব্যবহারের যুগে ঝাড়া আছে তাদের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে যে সে, পৃথিবীর অজ্ঞানতা, অজ্ঞ ভাষাভাষী, চীন, তাতার, আফগান, ইরান, রোম বা ভারতের বংশধারী, মূল্যবোধের পায়ে নিজেদের বন্দিমান করবে এটা স্বাভাবিক ও নয়, সত্যও নয়। হাতে হাতেই দেখা গিয়েছে বিলাসকবিপুর্ণতার তুলার প্রাশস্তি অপলাপের ভয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মুষ্টি-মেঘমাঝের নিজস্ব ব্যাঘাত ঘটেছিল—যে মুষ্টিমেয় বা অল্পলিপ্য ব্যক্তিরা বিলাসভের লজ্জাধারী হয়ে নিজেদের নেতৃত্ব পরিচালনের একটা মহাঅযোগ্য পেয়েছিলেন। এও

দেখা গিয়েছে স্বকাজিত স্বার্থ পরিকার বোল আনা যে বোম্বে সেই তুলার, ভারতীয় খিলকীর উজ্জ্বল স্বন নিজেদের স্বার্থ বিকাকারী বুঝলে—তখন তাদের একে-বাইরে আমল দিলে না—ছকার করে উঠল—‘হুই বাও, আমাদের আত্মরক্ষার জড় যা ভাল বুঝি তাই কর, তোমাদের নাকে কাঁছনিয়ে কর্ণপাত করে নিজেদের স্বার্থনাশ করব না।’

তুলার মত আমাদেরও বুঝতে হবে আমরা বাঙ্গালী হিউই হই আর মুসলমানই হই—সোপার বাঙ্গা আমাদের জন্মভূমি, মণ্ডলা বাঙ্গালা আমাদের মাতৃ-ভাষা। হিন্দুহুসলমানে মিলে আমরা এই বাঙ্গালার সাহিত্যের বর্ণিমন্দির গড়ে তুলব—যে সাহিত্যই আমাদের মাহুয় করলে।

কথিতভাষায় মুখে মুখে দশ যোজন অন্তরে কিছু না কিছু তফাৎ হয়ে যায়; লিখিত ভাষা ছিন্ন পাকে। কথিত ভাষা যখন লিখিত হয় তখন তার ভিতর নানা সংস্কার প্রবেশ করে, নানা নিয়মের আঁচবাঁচে সে ঝাড়া পড়ে। সেই লিখিত সাহিত্যিক ভাষা দেশের আদর্শ ভাষা হয়। সে আদর্শ সকলের অঙ্গবর্তনীয় হয়ে সকলের কথিত ভাষার মধ্যেও একতার সঞ্চার করে। পূর্বের উদাহরণগুলোর তারতম্য অহুসারে পশ্চিমঘোলা বা পূর্বের ঘোলা লোকদের ঘড়ির কাঁটা আগে পিছে হওয়া পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার যে অসুবিধে হয়, তা দূর করার অন্তে যেমন ঘড়িতে একটা ট্যাগার্ড টাইমারি করে নেওয়া হয়—সেই ট্যাগার্ড অহুসারে সকলে চলবে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারের সৌকর্য্য হয়, ভাষা সম্বন্ধে যেমনি একটা আদর্শের অঙ্গবর্তন জাতির পক্ষে বাঙ্গালীর প্রতীতি হয়। সর্বজন আদৃত সাহিত্যের ভাষা দেশে সেই আদর্শ দান করে। মুসলমানদের মধ্যে যত শিক্ষার প্রচার হবে ততই “মুসলমানী বাঙ্গালা” উৎকর্ষ লাভ করবে, শ্রোত্র ও স্থলজিত হবে। বাঙ্গালী উর্দু বা ফার্সি প্রাচীর প্রবেশিকার যথেষ্ট আছে—কিন্তু ভাষা বুঝে এবং কার্য্য করে তাদের প্রবেশ করতে হবে যাতে বাঙ্গালার খাতে মিলে যায়, কিন্তু ক্রিয়াকার না দেখায়, ক্ষতিমূহুর হয়। কবি বিহাঙ্গীলাল চক্রবর্তীর কবিতা

অনেক সময় চলিত ফার্সি শব্দ হৃদয়ভাবে স্থান পেয়েছে, সংস্কৃত শব্দের অর্থে অল্প টেলে দিয়ে তার সঙ্গে মিলে গেছে, কোথাও বইকা লাগায়নি। নিম্নলিখিত পানটী তার দৃষ্টান্ত—

পাগল মাহুয় চেনা যায়,

তার হাসি হাসি মুখ শশী

খুলী ফোটে চেহোয়ার।

সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,

তার নাহি আপন পর।

সে জানে না ছুনিয়াদারী—

ভালবাসে ছুনিয়ায়।

এমন আরও অনেক হিন্দু কবি ও লেখক আছে যারা প্রচলিত ফার্সি শব্দের ভাণ্ডার থেকে অধ্যাপ্তভাবে গ্রহণ করেও বাঙ্গালী কাব্যচর্চা নষ্ট করেন নি, কিন্তু মুসলমান লেখকেরা প্রায়ই এজন্য টিক রাখিতে পারেন না, তাঁদের হাতে আব্দুলী ফার্সি অধ্যাপ্তভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে বাঙ্গালার শ্রী অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর গ্রন্থে প্রথমই অনেক ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেন, স্বানে পড়েন তাতে ভাষার জোর বাড়ে, কিন্তু কখন কখন বেকায়দা যে হয় না, আঁটির মত গলায় বেধে যে না যায় তা নয়।

প্রয়োজনের ভাষায় তবু নানা দিক্‌দশে থেকে শব্দ সংগ্রহ চলে, কিন্তু কাব্যের ভাষায় অর্থাৎ ভাবের ভাষায় ধর্মনিষ্ঠাচর্চাশক্তির স্থপলতা অপরিহার্য্য। কবি নরকুলে সেই সুশলতা আছে। ভাবের তোড়ে তাঁর কবিতা অপ্রচলিত উর্দু শব্দবহুল হলেও বইকা লাগায় না, চমৎকৃত করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান কবির রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

মুসলমানদের সব কিছু কাজেকর্মে ‘ফাতেহা’ নামক যে বেদানগীতি গীত হয়, কবি গোলাম মোস্তাক্করুত তার নিম্নলিখিত অঙ্গবাদটি মনোরম ও সর্বজনবোধ্য।

তোমারেই মোরা করি প্রাণিপাত,

তোমারেই মোরা পুজি দিনরাত,

তোমারি কাছে যাচি হই শক্তি—

মোরা যে শক্তি-হীন।

সরল সঠিক পুণ্য-পদ্ম।

মোদের দাগগো ব’লে।

চালাও সে পথে—যে পথে তোমার

প্রিয়জন গেছে চ’লে।

যে পথে তোমার চির-অভিশাপ,

যে পথে আশ্রিত-চির পরিতাপ,

সে পথে যেন গো না চলি কখনো

এ জীবনে কোন দিন।

কিন্তু এর উপরের দুই চরণে মূল আরবী শব্দের

ব্যবহারে বাঙ্গালীরা হৃদয় হয় নি। যথা—

ছুমি হৈ গোলা, ‘রহমাত-রহিম,’

‘মালেক-ইয়াও মেদ্দিন’

শত প্রশংসা তোমারি নামে

হৈ ‘রাব্বিল আলামুনি’!

‘মোহাম্মদী’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় মুসলমান কবিদের দেখাশোনা হিন্দু কবির রচনাও ‘বোখা’ শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালাকে রীতি করেইছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বাঙ্গালায় ‘বোখা’র স্থলে ‘খি-অফর’ ‘বিক’ শব্দ ব্যবহার করে ছন্দের মতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার গাতি সাধন করতে পারেন। মনে করে দেখুন খুঁটান বাঙ্গালী বাঙ্গালী কবিতা লিখিতে গিয়ে ঈশ্বর অর্থে যদি ‘গড’ শব্দ ব্যবহার করেন তবে সে কেমন বাঙ্গলা হয়? পূর্বোক্ত গোলাম মুহুফার ‘নবমুণ’ নামক কবিতাটা বাঙ্গালী ভাষা হিসেবে প্রায় অনবজ্ঞ। তার দুই একটি চরণ উদ্ধৃত করছি :—

আজকে এ কোন নূতন যুগের

নূতন আলোকে

ভারতভূমি উঠল সে

পরম পুলকে!

নয়নে মোর পুলক লাগে,

হৃদয় কোণে কি গান লাগে।

কোন বাণী আজ ছড়িয়ে গেল

ঢালোক-ভূলাকে!

নূতন নূতন—সবই নূতন,

নূতন এ দিনে,



নূতন মাহুত, নূতন গীতি,

নূতন এ বীণে।

বাঙ্গালা বানানে মুসলমান লেখকেরা 'স'য়ের স্থানে যে 'ছ' লেখেন, তাতে তাঁদের রচনার উপর 'মুসলমানী' টিকিট লেগে তা নিম্নোক্তরূপে একগুণে হয়ে থাকে।

মো'ম্বদীতে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দেবলুপ— "বলুলে বাঙ্গালা"। বাঙ্গালীরাতি অস্থান্যে এর অর্থ হবে, "যে বাঙ্গালা বলুলযুক্ত"। কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় আর কিছু—তিনি ফার্সীরাতি লিখিয়ে "বলুলে বাঙ্গালা" এই পদের দ্বারা বোঝাতে চান "বাঙ্গলার বলুল"। এক ভাষার রীতি আর এক ভাষায় ঢোকান চলে না, যেমান্ন বা অর্থপূর্ণ হয়।

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বাহন হলে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকল বাঙ্গালীর বাঙ্গলাই এক আশ্রয়ের অস্থান্যী হবে, সমীকরণে বাঙ্গলার শ্রী ও শক্তি উভয়ে বৃদ্ধি পাবে। সেদিন বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা-সম্মিলনের প্রয়োজন হবে না। ঠাঁর মৃত্যু স্বাধীন মুসলমান বন্দী সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন স্বহিত করা হয়েচে, অনেকেই বোধ হয় জানেন না—সেই ইমদাদল হক বিশ বৎসর পূর্বে ভারতী পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁর বর্ণনায় অতি বিস্তৃত স্থলানিত ভাষা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শুধু মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী

নয়—এই নিখিল বন্দী সাহিত্য সম্মিলনেরও শোক প্রকাশ কর্তব্য।

আবদুল রহিমের মত মাতৃভাষার স্তম্ভগারী পদ্ব বাঙ্গালী মাতৃভাষার হস্তাক হতে চাইলেও বাঙ্গলার উল্লেখ্য আত্মপ্রকাশকারী প্রস্তাবের প্রতিরোধ করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গের অঙ্গবিচ্ছেদ বাঙ্গালী হিন্দুতে হতে দেননি, বঙ্গের ভাষাবিচ্ছেদ বাঙ্গালী মুসলমান হতে দিলেন না। তুর্কীদের মত দেশ বেপ ও ভাষা এ ভিত্তিতে এক হয়ে বঙ্গমাতার সব সন্তানগুলি যেদিন পাশাপাশি সৌভাগ্যভাবে ঠাঁজাবে, ধর্মভেদ যেদিন আর তাদের মধ্যচ্ছেদ করতে পারবে না, সেদিন বঙ্গসাহিত্যের মহারত উদ্ঘাটিত হবে।

"আসিবে সেদিন আসিবে।"

এই কবি বাণী সত্য হয়ে।

সরগোষ্ঠীমলিতকণ্ঠে বল জাই

"আসিবে সেদিন আসিবে"

নবীখলা বধধরিত্রীর প্রতি নদীতট হতে, প্রতি বীক, প্রতি মোড় হতে প্রতিক্রিয়া উঠুক।

আসিবে সেদিন আসিবে!

ভেদরিপুনরাগিনি মম বাণী

গাও সেই অমৃত গান।

## রোজা বা উপবাস ব্রত

এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

জগতের প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রেই উপবাসের বিধি আছে। উপবাস অর্থে অমহা কোন নিষ্কিষ্ট সময় (মুসলমানী শাস্ত্রে) মতে স্বর্ধ্যোবর হইতে স্বর্ধ্যান্ত) পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের পানাহার হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা বৃত্তি। উপবাসও অনেক ব্রত-মের আছে। যথা হিন্দুদিগের ত্রিকার্ক উপলক্ষে উপবাস এবং একাদশীর উপবাস। মুসলমানদিগের রমজানের

উপবাস, প্রত্যেক চাত্রমাসের ১০ই, ১১ই, ১২ই তারিখের উপবাস এবং মহরম মাসের প্রথম দশ দিনের উপবাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে রমজান মাসের উপবাস ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট, স্তব্ধতা অবস্থ কর্তব্য কর্ণ। ইহা পালন না করিলে পাপ হইবে, অগ্রাহ্য করিলে ক্রোধের বা অবি-  
শ্বাসী (infidel) বসিয়া পরিগণিত হইবে।

ষষ্ঠীয় বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা]

রোজা বা উপবাস ব্রত

১

রমজান শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি জলিয়া বাওয়া। বাস্তবিক শাস্ত্রে কথিত আছে যে—যেমন অগ্নিতে লৌহ প্রভৃতি দাত্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিচা করিয়া যায় তদ্রূপ উপবাসকারীর শরীর হইতে পাপ করিয়া মন পরিষ্কার হয়। দ্বিতীয় অর্থ—বৃষ্টি হওয়া। ইহার ভাবার্থ এই যে উপবাস-কারীর উপর নিয়োক পোনেচী রহমৎ বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাচুর্যের জলধারার স্রাব পতিত হয়।

১। অর্থের সচ্ছলতা।

৩। রাজিকালীন তাহার উপাসনামধ্যে গণ্য হওয়া।

৪। প্রত্যেক সংকারণের দ্বিগুণত্ব।

৪। স্বর্গীয় সুতপনের উপবাসকারীদের ইহলৌকিক

মঙ্গল ও পারত্রিক মুক্তি রজ ঈশ্বর সন্থীপে প্রার্থনা।

৬। তাহাদের উপর সয়তানের প্রভাব না থাকা।

৭। ঈশ্বরের দয়ার দ্বার খোলা থাকা।

৮। একমাস পর্য্যন্ত স্বর্গের দ্বার খোলা ও নরকের দ্বার বন্ধ থাকা।

৯। প্রতি রাতে ৭ লক্ষ নারীর মুক্তিলাভ।

১০। ঐ সংখ্যার ৭ গুণ ঐ মাসের প্রতি শুক্রবার রাতিতে মুক্তি।

১১। প্রত্যেক রাজির শেষভাগে পূর্ণ দিনের কৃত পাপ ক্ষমা হওয়া।

১২। প্রত্যেক দিন স্বর্গ হুসজ্জিত হওয়া।

১৩। উপবাসকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া।

১৪। তাহার শরীর পূর্ণকৃত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া।

১৫। তাহার প্রতি ঈশ্বরের সন্তোষ।

মোসলমানদিগের অবস্থ করণীয় পক্ষ ধর্ম্ম-কর্মে মধ্যে রমজান মাসের উপবাস ব্রত একটি। প্রত্যেক সাবালক ও সজান মোসলমানের উপর ইদা করজ বা অবস্থ কর্তব্য কর্ণ। কেবল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভঙ্গ করিলে ক্ষমা পাইবে।

১। অসমর্থ বৃদ্ধ (কিন্তু প্রত্যাহ ১জন করিয়া কাঙ্গালী ভোজন করা হইতে হইবে)।

২। গর্ভবী (গর্ভাশ্রয় উপস্থিত হইলে)।

৩। স্তম্ভগারী সন্তানের মাতা (যদি শিশুর দুগ্ধাভাবে প্রাণাশঙ্ক্য উপস্থিত হয়)।

৪। পীড়িত ব্যক্তি (পীড়াবৃত্তির আশঙ্কা থাকিলে)।

৫। প্রবাসী (যিনি ৩ বা ততোধিক দিনসের জঙ্গ বিদেশ গিয়া)।

৬। ক্ষুণ্ণপিপাসায় জীবন সংশয় উপস্থিত।

৭। দ্বিগুণকর্তৃক দষ্ট ব্যক্তি (জীবনশঙ্কা থাকিলে) রমজান মাসের ২৭শে তারিখের (২৬শে দিন গতে রাতে) রাজিক শবেকরর বলে। শাস্ত্রমতে ১০০০ এক হাজার মাসের রাজি অপেক্ষাও এই রাজি অধিক মূল্যবান এবং মাননীয়। শাস্ত্রে আদেশ আছে যে এই তারিখের সমস্ত রাজি জাগ্রত থাকিয়া উপাসনা করিবে। ইহাতে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

যদি কেহ স্ব-ইচ্ছায়, সজ্ঞানে ও বিনা কারণে রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করে, তবে নিয়োক কার্যের মধ্যে তাহার যে কোন একটি পালন করিতে হইবে।

১। একটি দাস বা দাসীকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা।

২। ক্রমাঘুয়ে ২ মাস উপবাস করা।

৩। ৬০ জন কাঙ্গালীকে ভোজন করান।

৪। একান্ত অপারক হইলে ৬০ জন।

যাহারা সমস্ত মাস ভঙ্গ করে তাহাদের জঙ্গ উপলোক ব্যবস্থা। আংশিক হইলে ঐ অংশভাগে করিলে চলিবে। অগ্রাধ্য মহা পাপ হইবে।

পত্রিক কোরাণে লিখিত আছে যে—যে ব্যক্তি এই মাসে ১ জনকে আহ্বার করাইবে অথবা ১ পয়সা বা ১ টাকা দান করিবে তাহার স্বর্গাশ্রয় ৭০ জনকে ধারণায়, ৭০ পয়সা বা ৭০ টাকা দানের পুণ্য হইবে। যত অধিক দান করিবে—বৎসরের অন্ত সময় অপেক্ষা এই মাসে—ঐ অংশভাগে তত বেশী পুণ্যলাভ হইবে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক কৃষ্ণার্থের জন্ত ৭০ গুণ পাপের অধিকারী হইতে হইবে।

রমজান মাসের উপবাস ছাড়া যে কেহ যখন ইচ্ছা স্বীয় পাপ মোচন বা উচ্ছেদ সিদ্ধির জন্ত উপবাস করিতে পারেন। ইহা স্বাধীন দ্বিক দিয়া যেমন উপকারী পরমেশ্বরের সহিত (প্রার্থনায়) সাধিলাভেও তদ্রূপ সাহায্য-কারী এবং অমোঘ। মোসলমানদিগের বৎসরের মধ্যে পাঁচ দিবস উপবাস করা মহা পাপ। যথা—১। ইদুল-কবরের দিন। ২—৫। ইদুল-জাফা ও তৎপরভী ৩ (তিন) দিন।





## বাংলার পীর কাহিনী

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ

বাসবিবি পীর সাহেবানীর জীবন কাহিনী।

বাংলা দেশের অশ্রুত পীর আবেদা কাংরানু নাম।  
ওক্ বাসবিবি পীর সাহেবানীর কথা আমি সর্ব প্রথমে  
আপনারিগকে শুনাইব। চল্লিশ পরগণা জেলায় অশ্রুত  
বশিরহাট মহকুমার অধীন, বাসিয়া পরগণার মধ্যে  
বাহুড়িয়া থানার এলাকায়, বাসপুর গ্রাম (১) অবস্থিত।  
এই বাসপুর গ্রামের মধ্যে, এক মাত্র বিখ্যাত জ্ঞাত পীর,  
বাসবিবি সাহেবানী হইতেছেন। এই পৃথগীলা বিদ্বী  
তপস্বিনী চির কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বনকারিণী “বাসবিবি  
পীর সাহেবানী” ইংরাজী ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে,  
দিল্লী মহানগরীর মোগল-ওমরাহ-হারেমে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন (২)। বাসবিবির পিতার নামে হজরৎ আল্লামা  
মোহাম্মদ আশেক সিদ্দিকী (৩) এবং মাতা সাহেবানীর  
নাম হামিদা বানুম (৪)।

আবেদা বাসবিবি, তাঁহার পিতামাতার তৃতীয়  
সন্তান। ইহার জন্মের পূর্বে, মোহাম্মদ আশেকের, সালোহা  
বাং নাজী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি  
তিন বৎসর বয়স্ক কালে, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত  
হইয়াছিলেন। সালোহা বাণু সিদ্দিকীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর  
পরে, বীরবর মোহাম্মদ আশেকের ঔরয়ে ও বিদ্বী  
হামিদা বানমের পক্ষে ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে আবেদা বাসবিবির  
জন্ম হইয়াছিল (৫)।

এসলামী ব্যবস্থা পুস্তকের বিধানানুসারে বাসবিবির  
জন্মের একবিশ দিবসে, আকিকা করিয়া, মোহাম্মদ  
আশেক, কস্তার নাম রাখিয়াছিলেন “কাংরানু নামা” (৬)।  
বাসবিবির জন্মের পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে মোহা-  
ম্মদ আশেকের আসাদ্ উল্লাহ মোহাম্মদ আদিন সিদ্দিকী  
নামক পুত্র এবং ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে সায়্যৎ উল্লাহ মোহাম্মদ

মুহম্মতি ছিলেন বহিরা (সাধকও ছিলেন) আলমে সমান তাঁহার  
“আল্লামা” উপাধি বিধাছিলেন। হুজুরজাদও বিশেষ জানী ছিলেন  
বহিরা, তিনি সম্রাট কর্তৃক “খান” উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চা হাজারী  
সমন্বয়পরের পর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৪) হামিদা বানুম ঘেরের বর্ণী ছিলেন। মোহাম্মদ জাকর নামক  
জনৈক সওদাগর, সওদাগরী কাণ্ডে দিল্লী আসিয়াছিলেন, দিল্লীতেই  
তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই সওদাগরের কন্যা বাসবিবির মাতা।

(৫) সম্রাট আক্বরের জন্ম ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে এবং বাসবিবির জন্ম  
১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে হুজরা বাসবিবি, সম্রাট আক্বরের অপেক্ষা দুই বৎসরের  
ছোট ছিলেন।

(৬) আর্য ভাষায় শিশির বিন্দুকে “কাংরানু নামা” বলে। কবিত  
আছে যে, দেশের কতট বাসবিবির জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার পিতা  
মাতা তাঁহার নাম কাংরানু নামা রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কস্তাকে তাঁহার  
নামের করিয়া, বাসবিবি বহিরা ডাকিতেন। পিতা মাতার এই আদরের  
বামেই তিনি পরবর্তী কালে জন্মনামের বাসবিবি বহিরা পরিচিত হইয়া-  
ছিলেন।

আদিন সিদ্দিকী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।  
মোহাম্মদ আশেক সিদ্দিকী গোলাকারে রাশেদিন যুগের  
প্রথম বলিকা মহাত্মা (৩) আবু কোহাফা হজরৎ আবুল্লা  
বিন্ আতিক আবু বক্বের সিদ্দিক রাণী আল্লাহের বংশধর  
ছিলেন। মোহাম্মদ আশেক হইতে ৪৪ পুরুষ উর্দ্ধে প্রথম  
বলিকা হজরৎ আবু বক্বের সিদ্দিক রাণী আল্লাহের স্থান।  
সকলের অব্যতির জ্ঞান, নিম্নে কুসিনামা বর্ণনা করিতেছি।

“তারিখ-ই-খোলাফায়ে আরব ও এন্সলাম” নামক  
ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম  
আবু কোহাফা হজরৎ আবদালা বিন্ আতিক আবু বক্বের  
সিদ্দিক রাণী আল্লাহ হইতে ৫০ পুরুষ উর্দ্ধে পৃথিবীর শেষ  
আদম অর্থাৎ বর্তমান মানব জাতির পিতা হজরৎ আদম  
আলায় হেন্সলাময়ের স্থান। আমর প্রথম বলিকা হজরৎ  
আবু বক্বের হইতে মোহাম্মদ আশেক পর্যন্ত নিম্নে ৪৪  
পুরুষের কুসিনামা বর্ণনা করিতেছি।

“তোব্বাক্ সিদ্দিকী” নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠে  
জানিতে পারা যায় যে, মহামতি হজরৎ আবু কোহাফা  
আবুল্লাহ বিন্ আতিক আবু বক্বের সিদ্দিকী রাণী আল্লা-  
হের ছোট পুত্র মহামতি হজরৎ আল্লামা আব্দার রহমান  
সিদ্দিকী রাণী আল্লাহ। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ  
আল্লামা মোহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত  
পুত্র, হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত  
পুত্র হজরৎ আল্লামা আব্দার সিদ্দিকী। তাঁহার  
অশ্রুত পুত্র, হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ্ সিদ্দিকী।  
তাঁহার অশ্রুত পুত্র, হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ ওমর  
সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র, হজরৎ আল্লামা মোহা-  
ম্মদ হারির সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা  
আব্দার রহমান সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ  
আল্লামা আবু মুসলিম সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র

হজরৎ আল্লামা আবু নসর সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত  
পুত্র হজরৎ আল্লামা আবু ওসমান সিদ্দিকী। তাঁহার  
অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা আবু জাকর সিদ্দিকী।  
তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ এয়াযুব  
সিদ্দিকী।

হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ এয়াযুব সিদ্দিকীর পুত্র  
হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ এয়াযুব সিদ্দিকী। তাঁহার  
অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ জিকরিয়া সিদ্দিকী।  
তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা আবু ইউসুফ সিদ্দিকী  
(১)। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ  
তালুহা সিদ্দিকী। তাঁহার একমাত্র পুত্র হজরৎ আল্লামা  
আহমদ সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা  
আবরহুমাহ সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা  
মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র  
হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ আবু সোলায়মান সিদ্দিকী। তাঁহার  
অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ সিদ্দিকী। তাঁহার  
একমাত্র পুত্র হজরৎ আল্লামা আবু মাহমুদ সিদ্দিকী।  
তাঁহার একমাত্র পুত্র হজরৎ আল্লামা এনাৎ উদ্দিন  
সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা নসিম  
উদ্দিন আবু সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ  
আল্লামা মোহাম্মদ জাকর সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত  
পুত্র হজরৎ আল্লামা আনী সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত  
পুত্র হজরৎ আল্লামা আহমদ আবু সিদ্দিকী। তাঁহার  
অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী।  
তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা মোহাম্মদ মুনী  
সিদ্দিকী। তাঁহার অশ্রুত পুত্র হজরৎ আল্লামা জালাল  
উদ্দিন সিদ্দিকী (২)।

(১) বাগদাদের আব্বাসীরা বলিয়াসিয়ার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিকা  
মহানাজ হাকিম-সর-শরিফ সাহেবের শাসন কালে ইনি কাজীজু কোছাত  
ছিলেন।

(২) পৃথিবীতে অশ্রুত পুরুষ (৩) মহা ভক্তাচারী চান্দেজ  
কাজীজু ও জাভাডা হালকা খাঁ যখন মহানগরী বাগদাদ ধ্বংস করিয়া-  
ছিলেন, সেই সময় ইনি সম্রাট বাগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া, ভারতবর্ষে  
আসিয়া, ভারত সম্রাট শুলতান মোহাম্মদ উদ্দিন হুমায়ূনের আশ্রয় গ্রহণ  
করিয়াছিলেন। যশুতান কুবচও ইহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত  
গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) চল্লিশ পরগণা জেলায় এটি বাসপুর গ্রাম আছে। এটি  
বাহুড়িয়া থানার এলাকায়, দ্বিতীয় পুনঃপুনঃ থানার এলাকায়।  
বাহুড়িয়া ও পরগণার উভয় থানাই বশিরহাট মহকুমার মধ্যে। তৃতীয়  
বাসপুর বশিরহাট মহকুমার এলাকার রাজাহাট থানার মধ্যে।  
প্রথম বাসপুরই আবেদার আসাদ্ বাসপুর। এই বাসপুরই বাসবিবির  
হাজোওলা নাজার শরীক। পরগণার থানার মধ্যে বাসপুর পীরের  
মহানাজ। এখানে কয়েক বিঘা মাগেরা জমি আছে এবং তাহা  
জমক বিন্দু এখন দখল করিয়াছেন। পূর্বেকালে সাধারণ উল্লার বংশ-  
গেরা এই মাগেরার দখল করিতেন। রাজার হাট বাসপুর এবং মোসি  
থানার এলাকার শিমলা গ্রামে বাসবিবির দর্গা নামে যে দর্গা আছে, তাহা  
হাজোহা বা মহানাজের দর্গার নহে।

(২) বাসবিবি সাহেবানী ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে  
ভোজের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) মোহাম্মদ আশেক সিদ্দিকী, আলমে সমাজের বাগ। “আল্লামা”  
ও বাগদাদি সাহেব কর্তৃক “খান” উপাধি পৌরবে পৌরবাধিত হইয়াছিলেন।  
ইনি এসলামী শরীফ, তরিক্ব, হকিকাত ও নাজারক শাখার নিজার

(৩) এসলাম শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে বাহ্যিক তাহাজে মহাত্মা বলা  
চলে না। এজন্যই বিশাখ অশ্রুতের খোলাওলা ওলালকে পরমায়,  
পরমায় সাহেবদিগকে জেগীতারা, পরমায় সাহেবদিগের অন্তর,  
সহজ, ও পার্শ্বগরিগকে মহাত্মা, এজন্য—ভাইয়ে-ভাইয়ে ভাইয়েই-পীর-  
গুরু-তোহত-আলম জগুতিক পুণ্ডালা, এবং সাধারণ মানবকে সর-  
গালা, পাণালা জগুতিক বিশেষণে বিশেষিত করিত পারা যায়।



হজরৎ আলোম আলীউদ্দিনের অতম পুত্র হজরৎ আলোম মহিউল্লাহ সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম মোহাম্মদ নাসের উদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম আহম্মদ হাকিম সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম মোহাম্মদ আমিন সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম আলী হাসান সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম নূরুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম কমর উদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম বাহা উদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম ফিরোজ হায়দার সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম মোহাম্মদ ইলিয়াস সিদ্দিকী। তাঁহার অতম পুত্র হজরৎ আলোম মোহাম্মদ আশেক সিদ্দিকী (১)। আশেক সিদ্দিকীর চার সন্তান; দুই কন্যা এবং দুই পুত্র। সোতা সন্তান—কন্যা, সালেহা বাহ সিদ্দিকী (২)। দ্বিতীয় সন্তান—কন্যা, কাংরান নাদা সিদ্দিকী ওকে বাসুবিবি সিদ্দিকী (৩)। তৃতীয় সন্তান—পুত্র, আগাউ উজাহ মোহাম্মদ আমিন সিদ্দিকী (৪)। চতুর্থ সন্তান—পুত্র, সাধালাহ উজাহ মোহাম্মদ আমিন সিদ্দিকী (৫)।

(১) হজরৎ আলোম মোহাম্মদ ইলিয়াস সিদ্দিকী সাহেবের পাঁচটি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদুপাে এখন সম্ভাব্য করণঃ আলোম মোহাম্মদ আশফার সিদ্দিকী, দ্বিতীয় সন্তান হজরৎ আলোম নাদা সিদ্দিকী, তৃতীয় সন্তান হজরৎ আলোম রওশান আলী সিদ্দিকী, চতুর্থ সন্তান হজরৎ আলোম হাসান বাসুবিবি সিদ্দিকী এবং পঞ্চম সন্তান হজরৎ আলোম মোহাম্মদ আশেক সিদ্দিকী। ভারত সম্রাট হায়দর, যখন সালেহা বাহ কর্তৃক গৃহীত হইতে বিবাহিত হইলেন, তখন পুত্রাচার্য ইলিয়াসের পুত্র-পুত্র এবং জানাচরণ কেহই হুমায়ুনকে আশ্রয় করেন নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানেরই আশ্রয় করিয়াছিলেন। হুমায়ুন যখন পুত্রারা ভারত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তখনও মোহাম্মদ আশেক ভারত সহ্যে গাফিলত করেন এবং সম্রাটের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন সিংহাসনাধিকার করিয়া, মোহাম্মদ আশেককে 'খান' উপাধি দান করেন এবং পঞ্চ হাজার মদনদার পদে বাহাগ করিয়া আশেকের সম্ভ্রম ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

(২) ইনি তিন বৎসর বয়সকালে হুমায়ুন পতিত হইয়াছিলেন। ইহারা চারি জাতি ভদ্রীক দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আশেক সিদ্দিকী কন্যা কাংরান নাদা ওকে বাসুবিবির বিদ্যা শিক্ষার জন্ত "হাতে তখতী" দিয়া, হজরৎ আলোম উম্মত জহরা খানম নাদী "শাহী-ওস্তানী" মতন, বাসুবিবিকে তত্ত্বি করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার কয়েক বলিকামিগকে এখনকার মত পাঠ্য ভাষায় মোহাম্মদ বহন করিতে হইত না; তখন কেবল আরবী, ফার্সী এবং বিশেষ প্রয়োজনে হিন্দী শিক্ষা করিলেই চলিত—হিন্দী ভাষা ইহা কথায় করিতে পারা যাইত (১)। বাসুবিবি এই ওস্তানী সাহেবানীর মতনবে দুই বৎসর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, আরবী ও ফার্সী অক্ষর পরিচয় এবং বেহেস্তী কেরান কোরাণ-শরীফ মতনপাঠ ও অক্ষ-শাস্ত্রের শতকরা প্রভৃতি অক্ষের পরিচয় শেখ করেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বমত উম্মত জহরা বিবির মতনবে বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন এবং শাহী মুসলমানের এমাম হজরৎ শাহ নাসের মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সাহেবের নিকট, কোরাণ শরীফ হেফজ করিতে থাকেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কোরাণ শরীফ হেফজ শেষ করেন এবং উম্মত জহরা খানমের নিকট তিনি, আরবী ও ফার্সী ব্যাকরণশাস্ত্র ও আরবী—ফার্সী বিশেষ বিশেষ কেরান পাঠ শেষ করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহী সন্তাপতিত

(৩) ইনি আলোমের পীর সাহেবানী বাসুবিবি সিদ্দিকী।

(৪) ইহার বংশধরগণ এখন দিল্লী, আগা, কোমাই, পাঞ্জাব, হরগাট, মালভা, এলাহাবাদ, প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

(৫) ইহার বংশধরগণ এখন দিল্লী, মুম্বাই, গুজরাট, নেহাউ, রুম্মান, প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। বীরাণা বাসুবিবি এমাম বাস করিতেছেন, তাঁহার বাসুবিবি পীর সাহেবানীর রক্তা শরীফের গায়েদবার, সাফায়া, নদীও পদনিবাসী।

(৬) সে যখন সালেমের বালক-বালিকামিগকে মাত্র দুইটি বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। একটি আরবী, অপরটি ফার্সী। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সালেমের এমাম করিলেন, বাসুবিবিবির হাত হইলে বেশির ভাগা হিন্দী শিক্ষা করিত। এখন সালেমের বালক-বালিকা বিদ্যাক পাঠ্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। আরবী ও ফার্সী অক্ষর শিক্ষাও লইলেন, যে কেহু ইহা ধরতাম, উচ্চভাষাকে বাসুবিবি বিবির নামে। তাঁহার পর বাংলা বাঙালী এবং ইংলীশ ভাষাও শিখিত হইত। পঞ্চ বাৎসর্য হিন্দী-ভাষামিগকে মাত্র তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। হুমায়ুন আনবার মতে, বাৎসর্য সালেমের ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যাক এখন মাত্র আরবী, বাংলা ও ইংলীশ শিক্ষা দিলেই চলিত পারে। ধর্ম-সম্রাট অজ্ঞ পাঠ্য শিক্ষা করেন বই এখন কোরাণী বাংলা ও বিদ্যক বাংলায় ইহা হইত।

মোহা। আশুফকদারের নিকট হাদিস ও তফসির এবং কেশাশ্রম অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ সকল শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, "আলোম" উপাধি গ্রহণ করেন। এই সময় বাসুবিবির বয়সক্রম মাত্র পঞ্চদশ বৎসর। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি (বাসুবিবি) শাহী মুসলমানের এমাম হজরৎ শাহ নাসের মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সাহেবের নিকট (মত গ্রহণ করিয়া) মুহিব হায়েন এবং এমলায়ের হিকমাত শাখার সাধনা আরম্ভ করেন (১)। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বাসুবিবি সাহেবানী, বাদশাহ হারেম, জানানী মুসলমানের এমাম পদে নিৰ্বাচিত হইলেন, এবং বেগম ও শাহজাদীদিগকে অর্থতঃ নমাজ, জুমার নমাজ, এবং ইয়াহযেনের নমাজ প্রভৃতি নমাজ পড়াইতে থাকেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সাধনা কার্য বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাসুবিবি বালাকাল হইতেই খোদা-পরত (ঈশ্বর ভক্তিময়ী) ছিলেন। রোজা, নমাজ এবং কালান-শরীফ তাল্লাওয়া (পাঠ) করিতেই তিনি বিশেষ আনন্দান্বিত হইতেন। কি বালাকালে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে কোন দিনই তাঁহাকে বিনাসিত-রোগে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার পিতা মাতা অথবা শাহী হারেমের কোন শাহজাদী অথবা অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাঁহার বিবাহের

(১) মুহিব হজরত পূর্ব, তিনি এমাম শাস্ত্রের বাসুবিবির সাহেব ও গুরুকি মতন এখন দুইটি শাখার সাধনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। সম্রাট এবং মোহাম্মদ আশেক বাসুবিবির বিবাহ বিবাহ জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাসুবিবি বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন নাই। মোহাম্মদ আশেক বহু কালে, গৌ হামিদা খানম, কন্যা বাসুবিবি এবং পুত্র আগাউ উজাহ ও সাধালাহ উজাহ মোহাম্মদ আমিন সিদ্দিকীকে সম্রাট হুমায়ুন ও সম্রাট ইব্রাহীম খানম বাৎসর্য সাহেবানীর হাতে হাতে পোষণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হুমায়ুন সম্রাট হুমায়ুন মৃত্যবধি জীবিত ছিলেন আশেক পরিবারের অর্থ-অর্থের দিক বিবেচনাক্রমে অর্থ রাখিয়াছিলেন ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে যখন হুমায়ুন মৃত্যু হইল, তখন সেই মৃত্যু শব্দ্যায়ও তিনি আশেক পরিবারের বহু ভুক্তিতে অর্থ দিলেন। তিনি এক ওস্তানিয়ার আর, পুত্র আগাউ উদ্দিন মোহাম্মদ আশেক ও বহু মোহাম্মদ বাহাদুরকে, আশেক পরিবারের জন্ত বিশেষ ভাবে অর্থদান করিয়াছিলেন।

প্রত্যহ উপস্থাপিত করিই তিনি বলিতেন "এক জন্মে দুইজন জন্মগ্ধের সিংহাসন স্থাপিত হইতে পারেন না। খোদা ওয়াক্তাওয়ালা সৃষ্টি কর্তা ও পালন কর্তা; তিনি বাদশাহ। যে জন্ম তিনি অধিকার করিয়াছেন, সে জন্মে স্বাধীন অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু শরীয়াতে বারমহাশাহের, পত্নীর ইংকাল পরকাল স্বাধীন পদসেবা। অর্থদান নরকবাস নিশ্চয়। এমতাবস্থায় আমি কি করিব? আমার জন্মে দুইজন জন্মগ্ধের সিংহাসন স্থাপন সম্ভব।"

মোহাম্মদ আশেকের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে, সম্রাট হুমায়ুন মৃত্যু হয়। কিন্তু শাহী নিয়মাদ্বারা, পোশের কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই, সাম্রাজ্যের সর্ব প্রধান ব্যক্তি মোহাম্মদ বাহাদুর ঐ কর্তৃক, মৃত্যুকাল আগাল উদ্দিন মোহাম্মদ আশেককে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং আশেকের নামে বাহাদুর ঐ রাজকবাস পরিচালনা করিতে থাকেন। আগাউ উজাহ মোহাম্মদ আমিন এবং সাধালাহ উজাহ মোহাম্মদ আমিন জাতীয় বাহাদুর ঐ কর্তৃক আশ্রিত হইয়া প্রত্যহ রাজসভায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে বাসুবিবি ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, শাহী হারেমের জানানী মুসলমানের এমাম পদে বাহাগ করিয়া ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি এই পদত্যাগ করেন এবং নভেম্বর মাসে তিনি "সোশা-নশীন" অর্থতঃ বিবাহ করেন। বাসুবিবি পীর সাহেবানী "সোশা-নশীন" হইয়া যে পুত্র অশ্রম করিতেন, সে পুত্র অপর কহাতেও প্রবেশাধিকার ছিল না। গৃহ-বিবাহ বিধি কহিতেও বন্ধ থাকিত, কেবল আহাযের সময় (১), গৃহস্থার উম্মত হইত। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি "সোশা-নশীন" ছিলেন।

(১) যখন বাহাদুর খোদাওস্তানিয়ার নামে এবাদত করিবার জন্ত "সোশা-নশীন" অর্থতঃ বিবাহ করেন, তখন তিনি দুঃ, কলি, বিনা লগ্নের পোশেপ আহায করিতে পারেন। সমস্ত দিন গোলাবায় অর্থদান এবং দাত করিয়া, সম্রাট সময় একবার করত, পুত্রদ্বয় সমস্ত রাজি এখাত করিতে হয়।





## দাঙ্গা প্রসঙ্গ

বিনামধ্যে বজ্রাঘাতের মত অস্বাভাবিক কলিকাতার বন্ধের উপর প্রশস্ত দিবালোকে প্রহরী পুলিশের সম্মুখে যে অস্বাভাবিক কাণ্ড সংঘটিত হইল—তাঁহা কবে যে শেষ হইবে—কবে যে আবার এই মহানগরী তাহার নষ্ট শাস্তি কিরাইয়া পাইবে—কবে যে গুণ্ডাদের তাণ্ডবলীলার অবসান হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

এই ভ্রাতৃবিরাগের মত গভীর দুঃখের ও উভয় সম্প্রদায়ের অনিষ্টকর, ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহার কারণ কি? একি সেই আলিগড়ে উদ্ভূত বিবের জ্বিহা। কাগজে সাম্প্রদায়িক বিবেকের কথা লিখিলে সম্পাদক দণ্ডাই হইলেন কিন্তু প্রকাশ সমগ্র সাম্প্রদায়িক বিবেকের বিজ বপন করিলে তাহা কি রাজ্যের ধন প্রাণ মান ও শাস্তি নষ্ট করিবার পৌষ বারণ নহে।

এ ব্যাপারে দোষ কার—তাঁহা লইয়া মাথা ঘামান সুখ। দোষী উভয় পক্ষই তবে কোন পক্ষ হয়তো বেশী কোন পক্ষ কম। হুদনার দাওয়াই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আর মুসলমানেরা হিন্দুর স্বর্গে অর্পণ করিতেছে হুতরাং প্রকৃত তথ্য নির্ণয় হওয়া এখন অসম্ভব। এখন ব্যাপারটা বাহ্যতে শীঘ্র সহজে সম্ভোজনক ভাবে মিটিয়া যাই সেই বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়াই উচিত। দোষ নির্ধারণের আবশ্যিকতা নাই এবং তজ্জন অপহার্য করিবার মত সময় নাই।

দাঙ্গাটা কিজনত হইল? ওনা বার আর্দ্যসমাজীদের শোভাযাত্রা বাইতেছিল হারিসন রোডে দলজিনের পার্শ্ব দিয়া, দেখানে মুসলমানগণ উপাসনা করিতেছিলেন—এমন সময় একজন লোক নাকি বাজনা বাজাইয়াছিল—কিন্তু বাস্তবিকই কি একটা বাজনার আওয়াজে উপাসনার ব্যাঘাত হয়। ইহার আশেপাশে অনেক সময় ব্যাওওয়ালার দল ব্যাও বাজাইয়া থাকে মোটরের হরপ

বাজে, ট্রামের ফটাও বাজে তাহাতে তো উপাসনার বিঘ্ন হয় না। হুতরাং উপাসনার ব্যাঘাত হইয়াছে এই অস্বাভাবিক একান্ত দুর্বল এবং অনেকটা দোষী ছাপশিওর বিরুদ্ধে ব্যাঘ্রের জগলোলা করিবার মত। আর আর্দ্য-সমাজীদেরও বলি বাপুহে একটা ঢাকে কাটা না দিলেই কি হইতে না? দেখ উভয় পক্ষেরই আছে কারণ উভয় পক্ষের মধ্যে অশান্তি লোক যথেষ্টই ছিল।

পুলিশের একজন কর্মচারী প্রশংসনের সঙ্গে ছিলেন বলিয়া জনিয়াছি তিনি কি তৎক্ষণাৎ কোন পরিয়া পুলিশ আনাইয়া হাঙ্গামা এখানেই থামাইতে পারিতেন না? প্রশংসন লইয়া যাইবার পাশ পুলিশই দিয়াছিলেন এবং পাশ দিবার পূর্বে মুসলমানগণ যখন আশঙ্কিত করিয়াছিল তখন ঐ রাত্তর প্রশংসন যাইবার ব্যবস্থা না করিলেও তাঁহার পারিতেন কিন্তু যাহা ঘটবে তাহা কেহ বোধ করিতে পারে না বলিয়াই এত উপায় থাকিতেও এই ব্যাপার ঘটিল।

তারপর দাঙ্গাটা কি এখানেই শেষ হইতে পারিত না? আর্দ্যসমাজীদের সহিত যদি মুসলমানদের লড়াই হয় তজ্জন দলিরাটের শিবমন্দির ভাঙা হইল কেন? এটা কি পারে পা দিয়া সমস্ত হিন্দুজাতির সহিত ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা নয়। অবশ্য প্রভুত্ববশত হিন্দুবা যে দলিরা দর্শা বা গীরের আন্তানা ভাঙিয়াছে তাহা আমরা কোন মতেই সমর্থন করি না বার হিন্দুগুণ্ডাদের এই সমস্ত আচরণ এই বিবাদের অপ্রতিফল্য হুতাঘাত স্বরূপ হইয়াছে মনে করি। এবং এই সমস্ত অস্বাভাবিক কার্যের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িয়া যাইতেছে—ইহা উদ্ভলক্ষণ নহে—দেশের বা জাতির কিছুই পক্ষেই নহে।

চার দশমাসের শ্রেণীর লোকেরা (তাহাদের মধ্যে হিন্দু

ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই আছে) এই সুযোগে অনেক লুটপাট করিয়াছে তাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয় শ্রেণীর ব্যবসাদারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—এ ক্ষতি-পূরণের জন্ত দায়ী কে? অনেক স্থলে পুলিশ ও মিলিটারীরাও লোকান হইতে অস্বাভাবিক লুটিয়া লইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়াছে তাহা। কতদূর সত্য এখনও জানা যায় নাই।

হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়ের অশান্তি নিরস্ত্রের ব্যক্তিগণের দ্বারা অস্বস্তিত এই হাঙ্গামার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ভয়, শঙ্কিত, ব্যঙ্গসারী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অস্বাভাবিক ক্ষতি হইল উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই উগ্রবর প্রশমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ফলে বিশেষ কিছু হয় নাই কারণ এই শ্রেণীর লোক ভয় বা যুক্তির দ্বারা ধরে না। চোরাকর্ষণ ধর্মের কাহিনী ভালবেসে না—ইহারা দাঙ্গাধাঙ্গামা লুটপাট আত্মকলং ভলবাসে এবং সর্বদাই সুযোগ ও সুবিধার জন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ব্যাপার থামাইবার জন্ত সরকারের দলপতি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীকৃষ্ণ জে, এম সেনগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রায়, মৌলানা আবুল কালামআব্বাস খা: এন্ড স্যারপ্রী প্রধান হইতেই প্রাথমিক চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন তাঁহারা যে উভয় সম্প্রদায়েরই বক্তব্যভাঙ্গন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে আমমুদরার নামও শুনা গিয়াছে। কিন্তু ইতিপেশেট দল—লিবারেল বারাম মন্ডারো দল এদের তো কোন উচ্চরাজ্য নাই—তাঁহারা কি মন্ত্রী লাভের স্বপ্নেই ভোর আছেন। এরা আবার দল পাকান—নেতা সাজিতে যান। এরা দেশের দোহাই দিতে যান—দেশবাসীরা এত মূর্খ নয় যে এসব কথা ভুলিয়া যাইবে। সম্ভার পর ঘরে বসিয়া ইহঁরা সোচ্চারিতামি নেতা হওয়া যায় না। সাম্প্রদায়িকতার আভা-মোজারী লইয়া যিনি এতদিন আফালন করিতেছিলেন—সেই স্ত্রীর আবহরণের তো প্রথমে কোন সাড়া শব্দই ছিল না—পঞ্চম দিনে তিনি

“মোশলেম রিলিক সমিতি” খুলিয়াছেন—যাক এতদ্বারা সাম্প্রদায়িক ভাবটা ঠিক বজায় রহিল এই পরম সৌভাগ্য নতুবা দাঙ্গাধাঙ্গামা থামাইবার চেষ্টা করিলে তাঁহার অত সাধের সাম্প্রদায়িকতাটা নষ্ট হইয়া যাইত।

দাঙ্গার ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দুগণের কোনই সম্পর্ক নাই—তাঁহারা অনেক বিপন্ন মুসলমানকে হিন্দুগুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—নিজ্বেলের বন্দীরাহি মুসলমান গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন—অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বৃক ফুলাইয়া গল্পের দাঁড়াইয়াছে ইহা বাঙ্গালীর উদ্বুদ্ধ কার্য। বন প্রকাশিত এফ মোশলেম দৈনিক একজ তাহারিগকে অজ্ঞ গালি পাড়িয়াছেন। তাহাতে আমরা ক্ষতি বা লজ্জা বোধ করি না কারণ আমরা জানি অনেক মোশলেমের এখন সাম্প্রদায়িকতার মোহে বিচার বুদ্ধি হারাইয়াছেন। অনেক মুসলমান ভুলকালকণ নিপীড়িত হিন্দুদের রক্ষা করিয়াছেন—সাধা করিয়াছেন এই অবসরে সেই মহত্বের কথা স্মরণ করিয়া আমরা এসব তুচ্ছ কথা ভুলিয়া যাইতে চাই।

বাঙ্গালীর এই মহত্বই সঙ্গ করা এক মুসলমান পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে তিনি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অথবা অজ্ঞ বিবেচনাপূর্ণ করিয়াছেন। ইহাও আমরা হিন্দুমুসলমান মিলন উপলক্ষে হিন্দুজাতির পত্রিকাকে ব্যর্থ বিজ্ঞপ করেন কিন্তু হঠাৎ আজ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এই সময়ে এই শ্রেণীর লেখা পড়িলে ফলে উভয় সম্প্রদায় শান্ত না হইয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িবে—পরিণাম যে কি হইবে তাহা কি তবু নিশ্চয়ই দেখিবার। এ লেখা পড়িয়া আমরা কোন হিন্দুদ্বায়েই দুঃখিত হইবেন ও প্রকৃত হিন্দুমুসলমান মিলনাকাজী মুসলমান মাঝেই লজ্জিত হইবে।

দাঙ্গার প্রাণবাহ্য হইল, কেবল হিন্দুমুসলমানের কে জিতিল—এই প্রশ্ন নাই। যথেষ্ট একবার ভাবেন না যে ইহাতে হারিবার বা জিতিবার কিছুই নাই—এ লড়াইতো বাঙালার মনসন লইয়া নয়—এ একটা অকারণ



তুচ্ছ উপলব্ধি দুই ভ্রাতার মধ্যস্থিত সংগ্রাম। ফলে যে জিতবে তাহারও ক্ষতি যে হারিবে তাহারও ক্ষতি—ইহাতে হার জিত কিছু নাই। ইহাতে দেশমাতৃকার অপমান—দেশের সমুদ্র কতি—জাতির গভীর অবনতি—এ সংগ্রামের পুরস্কার জয়মাল্য নয় এর ফলে গৌরব লাভ হইবে না—সমগ্র দেশের ললাটে অবনতির গাঢ় কলঙ্ক লেগিয়া দেওয়া হইবে মাত্র।

কলিকাতার একখানি ছদ্মবেশ দৈনিক এই ক্ষুদ্রমতে কংগ্রেস ও স্বরাষ্ট্রদলের উপর একহাত লইয়াছেন। একনিষ্ঠ দেশসেবক শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের বিরুদ্ধে একটা অলীক অপবাদ রটাইয়া নিজেদের কাগজ বিরুদ্ধের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন এবং পরে একটা সামাজ্য ক্রুটি স্বীকার করিয়া উহাকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিষয়ে বাহাতে বাড়ে এমন লেখা ছাপিতেও কষ্টের করেন নাই। কাগজ প্রকাশের মূলে দেশসেবা নামক যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কাগজ বেচিয়া লাভ করিবার লোভে অনেক কাগজই সেটা ছুলিয়া যান—ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। কংগ্রেস স্বরাষ্ট্র দল এ ব্যাপারে যেটুকু কাজ করিয়াছে এদের মালিক বা সম্পাদক যদি তার এক আনা বরকমও করিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলও বা কথা ছিল।

পুলিশ বা মিলিটারী কতীরাও যে বিশেষ কিছু কোরামতী দেখাইতে পারিয়াছেন—তাহা বোধ হইল না। হইলে দাশা এতদিন থাকিত না—এত বেশী মূল্য জবন হইত না। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের নিকট গোবিন্দ পাল বসিয়া চেয়ার জুড়িয়া তাস খেলিয়াছে, মোড়া বিয়ার ধ্বংস করিয়াছে মেওয়া, লেবু, সিগারেট প্রভৃতি উপভোগ করিয়াছে এইমাত্র অথচ ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান এই কার্যকরিতার প্রশংসায় শতমুগ্ধ। তবে এ হাদামাটা যদি ইংরেজটোলায় হইত এবং পাঁচদিন থাকিত তাহা হইলে এই সব অর্ধ সর্কারী কাগজে কিরূপ লেখা বাহির হইত তাহা সংক্ষেপে অল্পমাত্র। উক্তর সীমান্তে কোহাট প্রদেশ হইতে এক ইংরেজ নার্সের অপহরণ এই সব

কাগজে যে প্রচুর বাধাইয়াছিল সে কথা এখনও সকলে বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই।

কেবল পুলিশের বা শাসক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বাঙ্গালীর দন প্রাণ আর নির্ভর নহে—তাঁহা আত্ম রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালীর সম্মতকে ব্যায়াম চর্চা করিতে হইবে—লাঠী ধরিতে হইবে। অস্ত্রে আমাদের অধিকার নাই এবং তাহার আবশ্যকতাও নাই কারণ আমরা নারীদের মর্যাদা, নিজেদের সম্পত্তি পল্লীর মন্দির বা মসজিদ প্রতিবাদীরা মান রক্ষা করিতে চাই—ভগবান আমাদের সহায় হউন।

লর্ড আরউইনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এই হাদামা বাধিল ও এরূপ বিস্তৃত হইল এবং বীভৎস আকার ধারণ করিল দেখিয়া মনে হয় এটাও যেন একটা কাহার চাল। লর্ড আরউইনকে যেন চোখে আঁচুল বুঝা দেখাইয়া দেওয়া হইল যে ভারতবর্ষ কি প্রকার উণ্মূল দেশ, বঙ্গবাসীরা কিরূপ কলহপ্রিয় ও শাস্তিভঙ্গকারী—এদেশ শাসন করিতে হইলে ওমং আইনের কত আবিষ্কার পুলিশের হাতে বেশী ক্ষমতা দেওয়া ও তাহাদিগকে তোয়াড় করা কিরূপ অপরিহার্য মিলিটারী কমান্ড কত অসম্ভব। বোধের দাশাও যেন এই উদ্দেশ্যে বাধান হইয়াছিল—ভারত যে স্বায়ত্বশাসন লাভে এখনও যোগ্য হয় না। কিন্তু বুদ্ধিমান লর্ড আরউইন কি রহস্যের যবনিকা ভেদ করিতে পারিবেন না।

দাদার ফলে অনেক মারবাড়ীকে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছে; এ ব্যাপার আজ প্রথম নয়—ইতিপূর্বেও কয়েকবার হইয়াছে। মারবাড়ীগণ কলিকাতায় বাসনা করিয়া প্রকৃত ধনের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহার আত্মরক্ষার সুব্যবস্থাও করিতে পারেন। দুইটা করিয়া বন্দুকধারী সিপাহী রাখিতে পারেন এমন মারবাড়ী কলিকাতায় কি এক সহস্রও নাই। বিপদের দিনে এই দুই সহস্র সিপাহীর সাহায্যে তাহার অক্লেশে সমস্ত সম্প্রদায়কেই রক্ষা করিতে পারেন

এবং এই হিসাবে অর্থব্যয় করার একটা পার্থক্যতাও আছে কিন্তু তাহার কোন যে এই উপায় অবলম্বন করেন না তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ঠেননিয়ার কালীমাতার মন্দির রক্ষা বাঙ্গালী যুবকরা করিয়াছেন। এই মন্দিররক্ষার ব্যবস্থা যে অতি স্বল্পর ইচ্ছাছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত শক্তিশালী পুলিশবিহারী দাস, নন্দলাল ঘোষ ইন্দ্রচাঁদ নন্দী প্রভৃতি যে শক্তিরূপণ এই রক্ষাবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাহার বাঙ্গালীমাতারেরই ধন্যবাদ-ভাজন। ভগবানের রূপায় তাহাদের বাহুতে শক্তি ও দ্রুতবেগে দেশ ভক্তি চিরদিন অক্ষুর থাকুক।

এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া মধ্যস্থলের যুবকগণ যদি এইরূপে সজ্ঞাবদ্ধ হইতে চেষ্টা করেন ও লাঠী ধরিতে শিখেন তবে বোধ হয় সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিত্য নারীনির্যাতনের কাহিনী পড়িয়া লক্ষ্যের আমাদের অশোভন হইতে হয় না। বাঙ্গালার তরুণ সম্প্রদায় জাগ—নিজেদের মা-বোনের সম্মানরক্ষার ভার নিজেরা গ্রহণ কর দেখিবে দেবতার আশীর্বাদের মত দৈবীশক্তি তোমাদের বরাদ্দ হইবে। মহাশক্তির অংশরূপিণী জননী ভগিনীদের গুণবীর হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর—পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিও না—আত্মনির্ভরশীল হও।

## পরলোকে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, তাঁকার স্বপ্নসিদ্ধ জমিদার, সর্বজনপ্রিয়, সর্বপ্রকার জনহিতকর অচ্যুতানন্দে অগ্রণী, স্বদেশ হিতৈষী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গত বুধবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবনের কার্য্য নানারূপে বিস্তৃত ছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে স্বপরিচিত ছিলেন; একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাই সন্মিলনের সভাপতিও হইয়াছিলেন। সাহিত্যপ্রিয়দের তিনি অত্যন্ত প্রধান কণ্ঠী ছিলেন। হিন্দু মহাসভা ও সংগঠন আন্দোলনেরও তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বঙ্গীয় কায়দ-সমাজের উন্নতির জ্ঞা তিনি নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। যতীন্দ্রবাবুর মত অমায়িক, সহৃদয় ও মধুরপ্রকৃতির ভরলোক খুব কমই দেখিয়াছি। এবিধে তিনি সেকালের বাঙালী হিন্দুর আদর্শ ছিলেন। আমরা এই বহুগুণাধিত দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের সেবক, বাঙালী প্রাধানের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসম্পন্ন পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।





চোলের চোলে

বাঙ্গালার সংস্কারের প্রিয় সন্তান স্বভাষচন্দ্র আজ বিনা বিচারে, অজ্ঞাত অপরাধে 'অদ্ভুতের ক্ষেত্রে' রাজস্বোবে বন্দী ক্রিয় সর্বোচ্চ বিচারালয়ে তাঁহার মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে জ্ঞানবিন্দু কুংসা রটনার ভ্রাত 'ইংলিসম্যান' পত্রকে দুই দফা মুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালীমাত্রেই যে আনন্দিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বভাষচন্দ্রের মানের প্রকৃত মূল্য কি তাহা আদালতে নির্ণীত হইতে পারে না—তবে এই বিচারে তাঁহার মর্যাদা সম্যক রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার মর্যাদা অবশ্য অর্থদ্বারা পরিমিত হইতে পারে না। যে উদার, মহৎ, একনিষ্ঠ দেশসেবক অস্বাভাবিক সমস্ত স্বাধীনবিন্দন দ্বিগুণ দেশের ও দেশবাসীর সেবায় অক্লান্তি ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ের ধন—নয়নের মনি সেই স্বভাষচন্দ্রের মানের মূল্য জগতের সমস্ত কাকনের বিনিময়ও যে হইতে পারে না ইহা কে না জানে ?

লন্ডন আরউইন ভারতসাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন—আমরা তাহাকে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আন্তরিক স্বাগত করিতেছি। আমরা আশার বাগী ভনিয়া ভনিয়া আজ দ্বন্দ্ব স্বতরাং তাঁহার নিকট বক্তৃতার আর প্রার্থী নহি। ভারতবাসীকে তিনি যাবৎ মহম্মদের অবিকার দান করিতে পারেন—অন্ততঃ আন্তরিক চেষ্টা করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে ব্রুকলিনের রাশি-চক্রের গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব অতিক্রম করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার হইবে কি না জানি না তবে অস্বাভাবিক কেহই তাহা পারেন নাই বলিয়াই বা ভয়।

কুচবিহার রাজ্যের প্রজাপণ দাক্ষণ মধ্যবাহ্য পীড়িত হইয়া মহামাতা গভর্নর জেনারেলের নিকট ঐ রাজ্য সম্বন্ধে বহাবিধ অভিযোগ আনিয়াছে। তাহার মধ্য এইরূপ—কুচবিহারের বর্তমান মহারাজী যুবতী ও বিধবা, তাঁহার পুত্রকর্তব্যপন নাবালক। এই নাবালক মহারাজের অভিভাবক নিয়ুক্ত হইয়াছেন নবাব প্রজন্মের মহাবুর্জ আলিবর্গ নামক এক দাম্ভিক্যভাবাসী মুসলমান এবং নবাবজালা আবদুল করিম নামক অপর এক মুসলমান যুবক ৮০০ টাকা বেতনে মহারাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দু রাজস্বপুত্রের এরূপ দায়িত্ববর্ণ পদে ছুইজন বিধবীর নিয়োগ কোন হিন্দু সমর্থন করিতে পারে না। বিশেষতঃ অনেকের ধারণা যে বর্তমান কামারের মহারাজ স্রাব হরিসিং সন্মুক্ত বিলাতে যে সকল তুংগিত মোকদ্দমা উত্তীরাছিল নবাবজালা প্রজন্মের তখন নাবি প্রিন্স মহাবুর্জ নামে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। এরূপ লোককে যুবতী বিধবা হিন্দু মহারাজীর সান্নিধ্যে আসিতে দেওয়া অস্বাভাবিক এবং ইনি হিন্দু রাজ-কুমার ও রাজকুমারীগণের অভিভাবক হইবার অযোগ্য। ইহাদের কে নিয়োগ করিল ও কিরূপ হিন্দু সেক্রেটারী নিযুক্ত হইল না ? মহারাজী বয়োব্রাহ্ম রাজকুমারী—তিনি হিন্দু মহারাজী হইয়াও মুসলমান বর্ণভারী নিয়োগে যে কেমন আপত্তি করেন নাই তাহা সত্যই আশ্চর্য—তিনি বিদেশীনা কুচবিহার রাজ্যের প্রতি তাঁহার মায়া না থাকিত—তবে কিং তাঁহার সন্তানসন্ততি যে কুচবিহারের, সে কথা তিনি ভুলিলেন কিরূপে ? এই ব্যাপারের সম্যক অঙ্গুলদান হওয়া আবশ্যক ও কুচবিহার রাজ্যের প্রজাপণের প্রাপ্তি সংস্থার সম্ভব কিনা বিচার করিয়া তাহা পূর্ণ করা গভর্নমেন্টের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

## বঙ্গালয়

মিজ বিয়েটারের বোধনের বাজ বাজিয়া উঠিতেই, অর্থাৎ ঢাকে কাটি পড়িতেই লাগালাটি চৌকাঠুকি স্থল হইল দেখিয়া ভয়ে আর তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রাখিতে বাহিতে পারি নাই। তবে বিয়েটারের কণ্ঠস্বর যেমন উচ্চাঙ্গী তেমন নাহল, তাঁহারা এ ব্যাপারেও না দমিয়া পাওয়ার মধ্যে পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তনিলাম লাঠি খাইবার ভয়ে টিকিট কিনিয়াও অনেকের রথালয়ে হাঙ্কির হইতে পারেন নাই তবে পরবর্তী অভিনয় রাজ্যে তাঁহাদের অভিনয় দর্শনের স্বযোগ বিধা মিজ সম্প্রদায় দর্শকবৃন্দকে মিত্রতা পাশে চিহ্নবিনের স্রাজ আবাক করিয়াছেন। নৃতন সম্প্রদায়ের পক্ষে এ একটা মন্ত ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহাতে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া গেল।

ধরা কবিরাজ করিয়াই মা আসিলেন—মা যে আমাদের শক্তিব্রতপিনী—রূপচর্চা। দ্বিতীয় রজনীতে অভিনয় বন্ধছিল—তৃতীয় রাত্রেও পাংগা দিয়া অভিনয় হইয়াছিল।

চতুর্থ অভিনয় রাজ্যে কুচবিহারের আগ্রহাতিথেয় একবার না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না—কিন্তু বেশী দূর পথান্ত থাকিতে ভরসা হুলায় নাই—কারণ সেখানে বনিয়া ইন্ডোনায়েডেন্স প্রবল শাসক কথা তনিলাম কাজেই দুই স্তম্ভ মাজ দেখা হইয়াছে ; এ অস্বাভাবিক অভিনয়ের কোনরূপ সমালোচনা করা অসম্ভব ও অকর্তব্য।

তথ্যার্থ যত্নসূচক বলা চলে ততটুকু তো বলিতে হইবে। প্রথম কথা বাঙালিদের আসুল সংস্থার করিবেন বনিয়া মির সম্প্রদায় যে যোগদান করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি হইয়াছে ; অধিকন্তু এই সংস্থার কার্যে তাঁহারা উন্নত রুচি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে গিয়াছেন—আগন্তব্যেত্তর আর সে 'ভাতা-জোবান্দা' মুক্তি নাই। বাট্যানির বহির্ভাগ 'নয়নরঞ্জন' নীলাভামণ্ডিত হইয়া

অপূর্ণ-শ্রী-সম্পন্ন হইয়াছে, ভিতরের সমস্ত অংশই শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত ; পশ্চাৎভাগের বেজের আসন তুলিয়া আধুনিক "টিগ আপ" চেয়ার দেওয়া হইয়াছে।

রঙ্গমঞ্চের সমুদ্র, পার্শ্বভাগ বনিয়া প্রান্তিক মধ্যমলে আবৃত হইয়া নয়নাভিরাম মুগ্ধি ধারণ করিয়াছে আর যে পার্শ্বী রুচির প্রতীক—অপূর্ণ চিত্র-বিচিত্রে ভরা নাই ; এটা যে আধুনিক দর্শকের পক্ষে কতটা স্ববিধাজনক হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইতিপূর্বে যতবারই আসায়েতে বাহিতে হইয়াছে ততবারই সেই অসম পার্শ্ব চিত্রকলার উৎসাহে অতিষ্ঠ হইতে হইয়াছে। অতীত বাঙ্গালী বিয়েটার সম্প্রদায়ও ইতিপূর্বে এই সকল সৌভাগ্য সম্পাদন কোন চেষ্টাই করেন নাই—অন্ততঃ একমুখ মিজ সম্প্রদায় সাধারণের দৃষ্টবাদের পাজ।

ভারতীয় মধ্যস্থ নট্যমন্দিরে শানাই বাজাইয়া ভারতীয় বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছিলেন এবং ইংল্যান্ড চূর্ণা মাতার পূজার উপকরণ উপকরণ ঢাক ঢোল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—তবে একান্তন বাদনেরও বেশ ভাল ব্যবস্থা ছিল—গোয়ারা বাজনা না বাজাইয়া ইংল্যান্ড যে গিয়ানো, জলতরঙ্গ, বেহালা ও বিবিধ তারের বাদ্যের সমন্বয়ে বেশ সুমিষ্ট ও স্বপ্নাব্য বাদ্যের আয়োজন করিয়াছেন তাহা সত্যই উপভোগ্য।

দৃশ্যপটটিও বেশভূষার ব্যবস্থাও চমৎকার হইয়াছিল—বজ্রপাত, রুগী প্রভৃতিও বেশ কৃত্রিমের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যপট যতগুলি দেখিয়াছি যতদূর নৃতন ও মনোজ্ঞ বোধ হইল।

অস্বহুলের প্রাধান্য যেমন স্বপ্নের বোধ হইল স্বপ্নের প্রাধান্য তেমন হয় নাই বিশেষতঃ ইন্ডের ও শ্রী-চূর্ণার প্রাধান্য আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। অস্বহুলের বর্ণ যেমন নীলাভ ছিল শ্রীচূর্ণার বর্ণ পীত হইলে প্রায়ই ভাল হইত।



শ্রীমতী কুম্ভম্বারীর কাম-কলার অভিনয় ভালই হইয়াছিল। উপরোক্ত প্রসাধনের দ্বারা ইনি প্রৌঢ়বয়সের প্রভাব যে সম্পূর্ণ অপরিস্রব করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

শ্রীমতী তারাহম্মদীর দুর্গার অভিনয় সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে তবে তাহা যে তাঁহার নামের অযোগ্য হয় নাই এতটুকুই এখন বলা চলে। তবে তাঁহার প্রসাধন আরও ভাল হওয়া আবশ্যক।

অভিনেতাংশের মধ্যে মহিষাসুরের ভূমিকায় নির্মলেন্দু বাবুর অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য তবে তাহাতে ভাঙ্কড়ী মহাশয়ের অভিনয় ভর্যার অসুস্থরণ প্রভাব বড় বেশী পরিমুখ্ত হইল। ইতিপূর্বে অন্তর তাঁহার অস্বাভাবিক ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই কথাই বলিয়াছি। নির্মলেন্দু বাবুর নিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, ভারস্বরক নমন, সৌম্য আকৃতি প্রকৃতি অনেক নটোচিত গুণ আছে তিনি যদি এইগুলির সম্যকহার্য করিয়া অভিনয়ের একটা নিম্নতর ভর্যী সৃষ্টি করেন তবে স্বনাম অর্জনে তাহা তাঁহাকে যতটা সাহায্য করিবে— শূন্য অসুস্থরণ তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। মহাশয়ের সহিত মহিষাসুরের অভিনয় সম্বন্ধে মহাকাল রূপিনী তারাহম্মদী ও মহিষাসুর বেশী নির্মলেন্দু বাবুর অভিনয় যে অতি উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে হইবে।

কুহ কুহ ভূমিকার মধ্যে ‘শনি’র অভিনয় ভাল তবে উৎসব বাবুর বা প্রকাশ বাবুর অভিনয় আমাদের তেমন ভাল লাগে নাই। নর্তকীশক্তি নির্মুখ না হইলেও চলন সহি এবং একটা কুহ (অহমান ৭৮ বৎসর বয়স) নর্তকীর নৃত্য-নৈপুণ্য ও নৃত্যকলার অভিব্যক্তি বড় মধুর হইয়াছিল। শটীর কণ্ঠস্বর মধুর নয় তাঁহার স্বর সাদনা দ্বারা পরিণত না করিতে পারিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ গুণ অপরিস্রব নহে।

কাত্যবানের অভিনয় আশাপ্রদ। অভিনেতার কণ্ঠস্বর ভাল, আকৃতি ও রঙ্গমঞ্চোপযোগী তত্ত্ব অব্যবহিত

স্থানে স্থানে দোষ আছে সেটা শিক্ষাগ্রাণীর দোষ বলিয়াই মনে হইল।

হুটসের ভূমিকা নইয়াছিলেন শ্রীমতী দীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু ভূমিকাসীটে যে তিনি হস্তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা অস্বাভাবিক ও যেন বহু মর্যাদা-পালিত বলিয়া বোধ হইল—তবে এ সম্বন্ধে আমাদের মনে যত অভিনেতার অপেক্ষা ভূমিকার রচনাই অধিকতর দোষী।

পরে শ্রীমতী সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল উপস্থিত এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে ‘মডার্ন থিয়েটার বা ‘বেবলী থিয়েটার’ লিঃ প্রকৃতি যে সমস্ত নবীন সম্প্রদায় অ্যালেক্সেড রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অপেক্ষা মিত্র সম্প্রদায়ের যোগ্যতা অনেক বেশী এবং তাহাদের বিরাটত্ব আশাপ্রদ। উত্তরোত্তর তাঁহারা উন্নতি করুন ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

রঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নৃত্যন নাম হইয়াছে পূর্ণ থিয়েটার। পূর্ণ থিয়েটারে নিত্য দর্শকে পূর্ণ হউক এইমাত্র আশা বলিতে পারি। ইহাদের অভিনয় আরম্ভ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু বিগত ১লা এপ্রিল ডবানীপুর অঞ্চলে প্রচুর হাওবিল বিলি হইয়াছিল তাহাতে লক্ষ্য ছিল যে ১লা এপ্রিল পূর্ণ থিয়েটার অভিনয় আরম্ভ করিবেন ও ঐ দিবস সাধারণকে বিনা দর্শনীতে প্রবেশ করিতে দিবেন বলা বাহুল্য অত্রক নিম্নগত গ্রহণে অনেকেইই আগন্ত ছিল না—তাই তাঁহারা সকলে সম্বন্ধেই স-পুত্রক অভিনয় দেখিতে আসিয়া ‘এপ্রিল ফুল’ বলিয়া সিদ্ধাছিলেন—বলা বাহুল্য যে ঐ হাওবিলগুলি কোম্পানীর প্রতিপক্ষ-গণ কর্তৃক বিতারণিত হইয়াছিল। পূর্ণ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের উপর দর্শকস্বত্বকে বিক্রয় তোলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল তবে বাঙ্গালী দর্শকদের হৃদিত উপর আমাদের এ শঙ্কাটুকু আছে যে অকারণে তাঁহারা এই নবীন সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।



বিত্তীয় বর্ষ]

৪ঠা বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৩, ইং ১৭ই এপ্রিল ১৯২৬

[ ৩৫শ সংখ্যা ]

## খেলাধুলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রায় বাহাদুর—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট

চৌপা পেলা।

সেদিন বর্ষার সন্ধ্যা; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। লয়েলী সন্ধ্যের দীপতি ঘরে নিয়ে মাদুর পেতে বসেছে; এইমাত্র অন্ধ কবে নামাঙ্ক পড়ে সে বসেছে। পুরুষের জন্ম নারীর এবং নারীর জন্ম পুরুষের যে অন্তরের অন্তরতম প্রবেশে একটা স্মৃতি আছে তার হাত হতে রক্ষা পাওয়া অতি কঠিন। লয়েলীর অন্তর ব্যাপিরা দ্ব্যবহিতের জন্ম একটা আকাজক। সেখানে। এমন সময়ে ইসমাইল সেখানে এসে পাড়াল। লয়েলী জন্তুতার সহিত উঠে তাঁকে মাদুরে বসতে অহরোধ করলে।

ইসমাইল বসলে না। সে ধাঁড়িয়ে বললে “লয়েলী আমি ও হাফেজ বালির ঘর তৈরী করতাম,—তোমাকে নিয়ে কত খেলার স্বপ্নভাঙা না হ’ত তা মনে আছে কি? তুমি আমাকে কাকি দিয়ে হাফেজের হলে, বুকে পাখাং বেধে তা’ সখ করিয়ে। আল তোমার সামাজ্য কিছু উপকার করুছি তাহাই ধোরে আমি তোমার কাছে কোন অসুচিত প্রতাপ উপস্থিত করব না। পোষার গোহাই, আমার কোন জোব জবরদস্তি বা অন্তায় অহরোধ

নাই, কিন্তু একখাটি জেন, আমি তোমারই জন্ম নিয়ে তরিনি। আমার বাড়ী শশমান্তুল। এখন তোমার ছেলে মেয়েরাই সে গৃহের আনন্দ-প্রদীপ, তাদের নিয়ে আমি বেশ সুখে আছি, কিন্তু আমার চুড়াভ হ’ত হ’ত যদি—”

এই পর্যন্ত শুনেই লয়েলী জাচলে চোখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল।

ইসমাইল—“তোমার ছুখের কারণ হ’লে আমি চলে যাই। আমি তোমাকে কাঁদাতে আসি নি। আমার চিরকাল বুকের ভেতর গুমরিয়ে উঠেছে। আমি চেষ্টা—”

লয়েলী কাঁদতে কাঁদতে বলে—“আপনি আমার জন্ম আদীর্ঘন অস্বহী, এ ভাবতে আমার বুকে পেল বিখচ্ছে, কিন্তু আমি যে হাফেজ ভিন্ন জানি না। এ ভাষা মন নিয়ে আপনিক করবনে?”

ইসমাইল বিষমভাবে বলে,—“হাস্যরূপে উপকার করুতে চাইলেও আমি রহিম ও জিবমেহার জন্ম যমটা করতে চাই, নোক লন্ডায় ততটা করতে পারি নে। জিবমেহার বিবাহ দিতে হইবে, তাকে আমার মেয়ে



বলে গ্রন্থ-ক'লে আমি তার কথা খ'বতে পারতাম  
এখন কি তাই পারব? যদিও যে আমার সম্পর্কিত  
অধিকারী হ'ত—এখন খাই করব তাতেই লোকে কাণা-  
মুখে করবে। তার ত সর্ব স্বার্থই আমার ছেলে  
মুখের দিক, কিন্তু ছেলে যেহেতু মধ্যদাঁ ও পদ ত তার  
দিতে পারছি নে। তাহেই দিকে চেয়ে আমি মনে  
করেছি আমাদের মধ্যে সফল দূত হওয়া দরকার। তুমি  
হাফেজকে ভালবেসে, তার স্মৃতি পুষা করে, তথাপি যদি  
আমি তোমায় পাই তবে বেধে চাই নে। অধিক কি  
বলব হাফেজ আর কিববে না, এটা নিশ্চয় তুমিও জেনেছ  
আমিও জেনেছি। এখন তোমার পুত্রকাতারে দিক তবে  
আমার উপর হকুম দিও। একথা গ্রিক জেনো তোমার  
হকুম আমি মাথা পেতে নেব। আমি বিতীয়বার  
অনুরোধ করব না।”

মায়ের মনে ছেলেদের ভবিষ্যৎ স্থবের ছবি, তার মূল্য  
কত বেশী তা' সকলেই জানে। মুহূর্তকাল লয়েলী প্রত্যন্ত  
মুষ্টির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলে—  
“এ কথাটা এত হঠাৎ উপস্থিত করেছেন যে আমি বিশেষ-  
হারা হয়ে পড়েছি। আমি যেন একটা কান্নার সমুদ্রে  
পড়ে কুল কিনারা দেখতে পাচ্ছি না। কিনারা আর  
একটি বছর ভাবনার অবসর দিন।”

ইসমাইল বলে—“একটি বছর কেন, তোমার কপায় আমি একশ বছর প্রতীক্য করব আমি ত সমস্ত জীবনটাই তোমার প্রতীক্য করে আছি।”

ইসমাইল শহীদুল্লা সাহেবের কাছে অনেক দরবার চালিয়েছে। তিনি বলেছেন “তুমি যতটা করেছ, পর হ’য়ে একরূপ কে করে? লয়েলী যদি তোমায় নিকে না করে তবে সে ধৰ্ম্মে পতিত হয়।”

ইসমাইল—“এ কথা বলবেন না। আমি উপকার  
করেছি এ কথা বলবেন না। আমার ছেলে মেয়ে নাই।  
আমি বিয়ে করি নি। এর ছেলে মেয়ে আমি নিজে  
ছেলেদের মত পালন করে এসেছি। আমি তাদের পর  
হয়ে উপকার করছি এ কথা যেন তারা ভাবতে না  
পারে। তাদের সর্বপ্রকারে আপনার কর্তার উদ্দেশ্যে  
আমি এই প্রত্যাব করছি।”

আর একটি বছর চলে গেল। তারপর লহরী  
আরও একটি বছর প্রতীকার কথা জানালে। ইস্মাইল  
তাতেও সম্মত।

আজ হাফিজের গৃহ ভাঙ্গের আট বছর পরে নানা  
অলঙ্কার-ভূষিতা নানা উজ্জ্বল বস্ত্র-অলঙ্কিতা লয়েলীর দশ  
ইশমাইলের পরিবৃত্ত হয়ে গেল। বিবাহের পর একদিন  
ইশমাইল লয়েলীর কাণে কাণে বলেছিল—“তুমি যখন  
ছোট মেয়েটি, তখন একদিন বলেছিলে—তুমি আমার  
ও হাফিজের ‘ছ’খনেরই ছোট বউটি হবে। সে কথা  
আজ বাঁধলে।”

ਭੀਰੁ ਮਰਾ ।

যেদিন চট্টাগায়ের বন্দর থেকে গী-পুত্র-বস্ত্র ছেড়ে  
হাফেজ "স্বরূতি" জাহাযে যাবা অভ্যস্ত হয়ে ওঠা হয়েছিল,  
তাঁরপর ঠিক বাটী বছর চলে গেছে—যে তুফান  
"স্বরূতি" ভুবনছিল—সেই তুফান এখনও হাফেজের মাথার  
গম্বীর দিয়ে মনোজাগিত ব'য়েছে চলেছে। এই বার বছরের  
প্রবাস থেকে তা' বলে বোঝান যায় না। প্রতিদিন  
চুইটি চোখ বিদ্যাপাতিত করে দেখে জাহাযের গাল দেখা  
হয় কিন্তু না, রাতদিন হাফেজ তাই লক্ষ্য রাখেন।  
চার বছর আগে একটা স্বাক্ষর দূর তন্দবর গাঁব দেখা  
দিয়েছিল। স্বভেদ স্বভাবে দুই বিশিয়ে একটা লম্বা বিশেষ  
ভগায় হরিণের ছড় টাটিয়ে সে সেই জাহাযের লোক-  
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু বড়পর-  
গড়ি প্রতিক্ষু ছিল। তার কবোজিত বংশধরগণ হরিণের  
হৃৎ পদ হতে আশা ভাবতে পেরে না। জাহাযের মনে  
তার সমস্ত আশা ভরসা ব্যর্থ করে সমুদ্রপথে অদুত হয়ে  
পড়ল। সেই তালীঘরবর তলার বয়ে দিন রাত সমুদ্র  
উত্তীর্ণ হবার শ্রোণে পুঁজিলে। একবার কাঠে কাঠে  
বেতের ভোড়া দিয়ে সে একটা ভিহির মত তালী কয়ে-  
কিছু, কিন্তু সেই অসীম গভীর সমুদ্র পথে দিব্বার  
হাফেজ বানিকটা চেষ্টা পেয়ে বয়েছিল সমুদ্র ঘোষণার  
গানি মন—সে কাঠের ডোলায় উঠে পান ছেড়ে পারবে  
না। সে কতবার মনতে ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু একটা বান-  
লায়কটা না দেখে—হরিণের পথে একটি চমো না পেয়ে

দ্বিতীয় বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা]

ভিষয়েছায়ে বৃকে না জড়িয়ে পড়ে, একটবার তার  
 সূর্য্যনিষ্ঠ কর বাঁশখাতিকে আদর না করে, ভবানী  
 হতে বিবাহ নিতে পারবে না। এই তার আশা, সে  
 যে সুতোর মত কনক, তথাপি ভাল লোহে শিকলের  
 শক্তিতে তার মনকে বেঁধে রাখল। রাতেও পর দিন  
 আসে, আশা কেবলই পিছু হটিয়াও সামনের দিকে তাকে  
 ঈদ্রিত করে মিলনের চিহ্ন দেখায়,—সুত ঝাঁপের মধ্যে  
 আশা তাকে ছেড়ে যায় না। তার চোখে আর অশ্রু  
 নাই, বৃকের ভেতর দুঃখ জমে জমে বরফের পাথরের মত  
 চেপে আছে।

একদিন সভা সভায় 'আশা' ফলগতী হ'ল। সেই  
পুখুরী হাতে বিদায় দেওয়া, নির্জন উপরীপটার পাশে  
একটি একটা হাজাজ আসছে। ঘুর হ'তে শায়ে শায়  
দেখে সে মনে করেছিল সেটা আকাশের গায়ে পড়  
একটা পাখী। এমন ত শুভ শব্দ পাখীক সে জাহাজ  
মনে করেছিল। কিন্তু আশা মাং মাং—বার বহর একবার  
হয়েছে। আশা এই আশা নিরাশার ব্যত প্রতিধ্বা  
যেয়ে তার দৃষ্টি চির তৃষ্ণার চক্ষু সভায় আশাহের নাগা  
পেল।

আবার বংশদণ্ডের উপর হরিণের ছড় জড়িয়ে  
প্রাণপণে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে লাগল। জাহাজে  
কাপ্তান তাকে দূরবীণ দিয়ে দেখতে পেলেন এবং সেই  
দ্বীপের দিকে জাহাজখানি ভিড়তে শুরু হলেন।

কাছে এসে তারা দেখতে পেলে এক অদ্ভুত মাছের  
—হরিণের ছড় পায়, জটাজুটসমবিত ধ্বংসাপ হলে  
প্রোচ বয়স একটা লোক। জিশ বছর বয়সে সে বা  
হয়ে এসেছিল, এখন তার বয়স বোয়ালিশ কিন্তু দেখে  
তাকে তার চাইতে বেশী বয়স বলেই মনে হয়।

জাহাঙ্গের লোকেরা প্রথম মনে করেছিল, একে  
বড় লোক। কিন্তু সে যখন বাটা চাটগাঁয়ে ভাষায় কথা  
বার্তা বলতে লাগল, তখন জাহাঙ্গের খালসীরা বুঝি  
সে তাদেরই দেশবাসী। জাহাঙ্গীর চাটগাঁয়ের বন্দরে  
রিকেই যাচ্ছিল; এক হস্তা পুরস্বীপে চেয়ে তার পাঁচদি  
নম্বর ফেলে বইল, তারপর চাটগাঁয়ে এসে একদিন প্রাণে  
হামেজগর তার চিরপরিচিত ঘাটে নামিয়ে দিলে।

খেলা ধূলা

פזנץ

হায় জন্মভূমি! হাফেজ চাঁটগীরের মাটিতে হাত দিয়ে সেলাস করুলে। তারার স্থাবরচিত পথ ধরে বাঁধা মুখে রওনা হ'ল। তাকে চিনেবে? সেই নবধরালি শ্রামবর্ণকি আঁস আছে? সে চিনেবে পুঙ্খ, বৃষ্টিতে ভিজে থা'ল নিশ্চিত একটা মুষ্টিতে পরিণত হয়েছে, তাকে চিনেবে? উৎকর্ষায় তার উজ্জল বড় কোণখট্টা কোটব-গত হয়েছে। তার শালকরম মত ঋতু, দেহ একটু বৈকে গেছে, কে তাকে চিনেবে? তার দিবা গুণ্ড এমন শোভে যে পাঠের মত মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করে ফেলেছে, কে তাকে চিনেবে? জাগরণের বালীসারা একটা ছেঁড়া লুপি তাহাকে গিয়াছে, তাই পরে সে মাটিতে পা দিয়েছে। কিন্তু জাহাঙ্গির খেনিন তোবে, সেদিনও নেওয়ার ছিল, সে তা' ছাড়ে নি। যে কাগজের টুকরা তার মেয়টির পায়ের ছাড়া ছিঁত তা প্রায় নোনা জলে ধুয়ে গেছিল। কিন্তু তথাপি সেই কাগজটুকু সে বুকে চেপে ধরত, যখন তার বুকটা তাদের না দেখার বশে বন্ধ বড়কড় করে উঠত। আর নলেন্দীর দীর্ঘ কেশটি সে যে কত অশ্রুশলে রোজ রাখে বুকে সেবেত, তা' আর কি বল। সেই বাক্সটি হাতে ধরে সে চলেছে, কেউ তাকে চিনে না। কোন পাহাড় গর্ভরতের যকির ভেবে লোকেরা কৌতুকে চক্ষু তাকে দেখছে। কিন্তু তার অঙ্গ কোন দিকে দৃষ্টি নাথ; বুকটার ভেতর বড়ই ঘড়া'স করছে। পুর হতে সে দেখতে পেল তার বাঁড়ার ভিত্তি। কোথায় গেল সেই টিখি গোথারী যা লয়েদী তার বাগের পাখি থেকে এনেছিল এবং যা তার পায়ের শব্দে কলরব করে উঠত। কোথায় সেই নাগের গরু কতমা, যা দ্বিধ দৃষ্টির দ্বারা তাকে রোজ অভিনন্দিত করত। কোথায় বর দাগা কইলী নাই, কেবল আছে উঠানের খাঁয় গাছটি, —খান্য মুলে লয়েদী ও সে জল সেঁচত, যার চিরিচিরী বাঁশের বেড়া প্রস্তুত করে এত যত্নে তারা বড় করেছিল। আঁজ সে গাছটা খুব বড় হয়েছে, তার ডালে ডালে আঁস বুলুছে। একটা শকাদনের মালেক অমৃতের নিকখি'স মত সেই আমগাছটি দেখে তার মন কখিৎ'স চুপ্সি হইল। আর তার গ্রী-পুঙ্খ-কথা কি দৈনৈ, তারা কি



অজ্ঞাত চলে গেছে? স্বয়ং জুড়ে তার একটা বিকট হাহাকার উঠল; সে আর দাঁড়াতে পারল না। তার উঠানে শঙ্কাহীন মত সে বসে পড়ল।

সেইখানে হানিক সেখের স্ত্রী নিরামংজান বাস করত। বার বছরে তার চেহারা তার পরিবর্তন হয়েছে। হাফেজ তাকে চিনতে পারল, কিন্তু হানিকের স্ত্রী তাকে চিনতে পারল না। সে নিরামংজান জিজ্ঞাসা করলে—“বকতে পার, এখানে হাফেজ বলে একটা লোক ছিল কি? তার পরিবার ছিল, তারা উঠে কোথায় গিয়েছে?”

ফকির ভেবে বুঝা তাকে সেলাম করে বললে—“হাফেজ বার তের বছর হ'ল জাহাজে চলে গেছিল; অনেকি সে জাহাজে চুরি হ'য়ে মারা গেছে। আজ চার বছর হ'ল তার স্ত্রী লয়েলী ইসমাইল শেখকে নিকে করেছে, তারা বেশ ভাল আছে।”

হাফেজের মুখ থেকে একটা অক্ষুট চীৎকার বের হ'ল। মনে হ'ল যেন বজ্রের মত কোন তীব্রতার অঙ্গ দিয়ে কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা কেটে ফেলে। সে দু'হাত দিয়ে দু'কপে ধরে অজ্ঞানের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হানিকের স্ত্রী তার কোন শব্দ পিড়া হ'য়েছে, মনে করে জল এনে তার মুখে চোখে দিলে। তখন হাফেজ চোখ মেলে চেয়েছে। নিরামংজান কহিল—“বাবা! তোমার কি কোন অসুখ করেছে?”

হাফেজ—“হাঁ, বাবা, আমার বুকে পিঠে একটা বেদনা আছে, মাঝে মাঝে বড়ই কষ্ট দেয়।”

হানিকের স্ত্রীর পীর ফকিরদের উপর খুব বিশ্বাস ছিল। সে ছুটি হাত জোড় করে বললে—“বাবা, কয়েকটা দিন আমাদের কুঁড়েতে থেকে শরীয়াত ভাল কর।”

মসজিদটির দ্বার হাফেজ তাদের বাড়ীতে গেল। এখন সংসার, পৃথিবী, গৃহ-স্বথ তার কোথায়? সেই অকূল বায়বির মধ্যে বাস করেও সে স্থবির স্বপ্ন দেখেছে, আর যে তার বাড়ীর উঠানের কাছে এসেও কূল কিনারা হারিয়ে সে তলিয়ে যাচ্ছে।

হাফেজের মিষ্ট কথায় সে বাড়ীর লোকেরা ভুলে গেল। বিশেষ শব্দ এখন নমাছ পড়ে তখন তার চোখ

ছুটি জলে ভেসে যায়। খোঁধার নাম সে এখনি ভাবে বলে,—এত বিশ্বাসের সঙ্গে, এত ব্যাকুলতার সঙ্গে—যেন মনে হয় সমুদ্রে পড়ে কেউ একটা ডেলা বেধে ধরতে চেষ্টা পাচ্ছে।

নিরামংজান একদিন বললে—“হাফেজের জীবনটা কষ্টে কষ্টেই গেল। তার স্ত্রী কিন্তু অনেকদিন তার জন্ত বিস্তর কাঁদা কাটি করেছিল কিন্তু কি করবে? একে খিনতে দেবে? অবশেষে তাকে থালাহেবকে নিকে কর্তে হ'ল।”

হাফেজ বললে—“তাদের ছেলেরা ভাল আছে?—একটা রোগা মেয়ে তাদের ছিল।”

নিরামংজান—“সে মেয়েটা বাপ চলে যাবার পরেই মারা যায়। আর ছেলে ভাল আছে। এই এক বছর হ'ল লয়েলীর একটি নতুন খোকা হয়েছে।”

পাষণ, পাষণ, বৃক পাষণ হও, যে খোকা, এই তোমার সংসার! লয়েলী হুখে থাক!—এইরূপ অসংলগ্ন ভাবে চিন্তা কর্তে কর্তে হাফেজ ঘরের কোণে লুকিয়ে রইল।

এর মধ্যে তার প্রবল বেগে জর এসেছে। বন, জঙ্গল, স্রষ্টা ভেঙ্গে চূড়ে যেমন ক'রে ঝড় আসে তেমনই হাফেজ পাঞ্জর ভেঙ্গে জর এল। হাফেজ বুঝলে—এই শেষ। তার দেহ আর ক'র সহ্য কর্তে পাচ্ছে না। সমুদ্রে শাঁটার কেটে যে নিজেকে ঝাঁড়িয়েছিল, মনের এই বিষম ও উৎকট দুঃখ সে কিছুকবেই সহ্যে পারুক্বে না।

সেদিনটা বাদলা কেটে গিয়ে স্থাণ্ডারের শেষ রশ্মি গাছ পাশার উপর পড়েছে। অজরটা চলে গিয়ে শরীর অনেকটা হাল্কা হয়েছে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিবে এল। পাড়াগায়ে নিশীথিনী মূঠো মূঠো কালির রেণু ফেলে যেন একটা জমাট কালির পাহাড় স্রষ্টা করল। বহু কষ্টে হাফেজ উঠে লাঠিতে ভর করে ইসমাইল বা সাহেবের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। আজ কদিন সে নিরঙ্ক উপবাস করেছে। নিরামংজান অনেক বলে কয়েও তাকে এক কৌটা জল থাওয়াতে পারে নাই। “আমার গলার ভেতর কি হ'য়েছে, কিছু খেতে চাইলে গলার আঁকিয়ে যায়।” এই বলে সে এড়িয়ে গেছে।

লাঠি ভর করে হাফেজ ইসমাইলের বিড়কীর দরজা দিয়ে অন্ধরে ঢুকল। সেই প্রাচীন বৃৎ পুরীর আলি গলি তার জানা ছিল। অন্ধকারে তাকে কেউ দেখতে পেল না। নিঃশেষে সে ইসমাইলের শায়াগৃহের একটা উম্মুক্ত জানালায় একটা গরাদ খরে নিজেকে অদৃশ্য করে ভেতরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। একখানি কেটে বসে লয়েলী চুপা আঁচড়ালি,—এই বার বছর পরে দেখা,—লয়েলীর সেহে যৌবনের উঠন্ত স্ত্রী এখন যৌবন মহিমা পরিণত হয়েছে, সে আর তত কীর্ণ নাই। তাহার পার্শ্বে কোচের হাতল খরে পাঁচিয়ে আছে জিবনেছা, তার বয়স এখন আঠার। অবিকল মায়ের প্রতিমূর্তি,—বার বছর পূর্কের লয়েলীর চেহারা, বাহা হাফেজের শায়াঘরের মূর্তি। সামনে একটা ছড়ি ঘুরিয়ে যুবক রহিম ইসমাইলের [সুখে কথা কহে]। ইসমাইল লয়েলীর কোচের কাছে একখানি আসনে বসে আছে। তার হাতে একটা রকীম হোমাল। ভগিনীর কোলে উপবিষ্ট সন্তজাত শিশুপুত্রটি তার কোচের পক্ষে লিখিত সোণার চেনটিয়া বাঁধা সন্তজাতা ধরতে চেষ্টা করছে। লয়েলীর স্বদ্বীর্ধ কেশপাশ উড়ে উড়ে ইসমাইলের গায়ে এসে পড়ছে।

এই সংসার, এই স্থব পাছে তার একটা নিঃশ্বাসে ভেঙ্গে যাবে সেই আশঙ্কায় অতি সন্তর্পণে হাফেজ সেখান হতে বাহির হ'য়ে এল। পাছে তার বুকের ঠোটা পড়ার শব্দ কেউ শুনে, পাছে তা নিরঙ্কশাস যৌথার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত হ'য়ে সেই ঘরের মধ্যে হাহাকার জাগায়,—এই ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বাহির হয়ে পড়ল।

পরদিন নিরামংজান এসে দেখলে ঘোর জর বিকারে ফকির সাহেব অচেতন হ'য়ে পড়ে আছে। নিরামং প্রাণ দিয়ে শুদ্ধা করতে লাগল। সন্ধ্যার সময় তার জান কিরে এল। হাতখানি দিয়ে নিরামংকে ফকির সাহেব ডাকলে। নিরামং সমুদ্রে এলে হাফেজ বললে—“তুমি আমার চিনতে পারলে না? একবার ভাল করে দেখে দেখি। আমি হাফেজ। তোমাদের আদিনাথ ত সারা-জীবন চলা ফেরা করেছে।”

একটা অর্ধক্ষুট চীৎকার করে নিরামং তার দিকে তাকিয়ে ভাবলে—একি জর বিকারে তুল বন্ধু? তার পর খুব নিরীক্ষণ করে দেখে তার সম্ভেদ দূর হ'ল। হাফেজের কপালের কাছে কতগুলি চুল কৌকড়ান ছিল। হাজারবার আঁচড়ালেও সেই চুলগুলি কোঁকড়াই নই থেকে যেত, স্রষ্টার পাশে সেই চুলগুলি দেখে সে চিনিল। আর চিনিল তার বহু ছুটি চোখ দেখে,—চোখ বুজলে সে বড় চোখের পাতা আর চিনতে তুল হয় না। আর চিনিল তার ছুটি পাতলা অধর দেখে। তার চেহারার উপর নানা বিড়ন্য যে একটা কাল বরাবিকা ফেলে দিয়েছে, হঠাৎ নিরামংয়ের চোখে তাহা অস্পষ্ট হয়ে গেল। সে হাফেজের হাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—“আমি এখন গিয়ে লয়েলীকে বলে আসি, তাকে তোমাকে চিৎকসা করে বাঁচাক।”

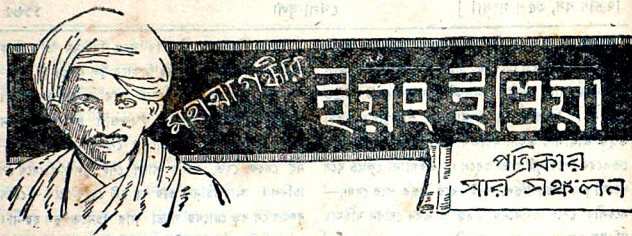
হাফেজ—“বাঁচাবে? বাঁচালে কি হবে? আমি বাঁচব না। শবরদার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার পরিচয় কাউকে বলবে না।” জোর করে হাফেজ নিরামংয়ের হাত ধরে নিজেই মাথায় ধরলে, জোর করে তার মুখ থেকে সেই শপথ আদায় করে নিয়ে হাতখানি ছেড়ে দিল। নিরামং মাটিতে পড়ে কাঁপতে লাগলে।

হাফেজ নিরামংকে আবার বললে—“আমার মৃত্যুর পর কেউ ভুলে, পাছে তা নিরঙ্কশাস যৌথার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত হ'য়ে সেই ঘরের মধ্যে হাহাকার জাগায়,—এই ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বাহির হয়ে পড়ল।

পরদিন নিরামংজান এসে দেখলে ঘোর জর বিকারে ফকির সাহেব অচেতন হ'য়ে পড়ে আছে। নিরামং প্রাণ দিয়ে শুদ্ধা করতে লাগল। সন্ধ্যার সময় তার জান কিরে এল। হাতখানি দিয়ে নিরামংকে ফকির সাহেব ডাকলে। নিরামং সমুদ্রে এলে হাফেজ বললে—“তুমি আমার চিনতে পারলে না? একবার ভাল করে দেখে দেখি। আমি হাফেজ। তোমাদের আদিনাথ ত সারা-জীবন চলা ফেরা করেছে।”

এই হাফেজের কথা শুনে নিরামংজান চোখ বুজল। তার মুখের উপর একটা অদ্ভুত হাসি ফুটল। সে হাফেজের হাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—“আমি এখন গিয়ে লয়েলীকে বলে আসি, তাকে তোমাকে চিৎকসা করে বাঁচাক।”





## সত্যের পরীক্ষা

### পরিবর্তন

আমি যতই নিজের মনের ভিতর গভীর ভাবে অন্বেষণ করিবে লাগিলাম ততই বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে সন্দেশ আস্তাস্তর্য পরিবর্তন করাও যে দরকার তাহা যেন বুঝিতে পারিলাম। খোঁষাকা পরিচ্ছন্ন ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে খাড়া সন্দেশও পরিবর্তন করিতে লাগিলাম। নিরামিষ ভোজন সন্দেশ বহু লেখকের মতমত পাঠ্য করিয়া দেবিলান তাহারা এ বিষয়টা ধর্ম, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল দিক হইতেই আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে পশুর উপর মানব আত্মির প্রাধান্য ও আধিপত্য হিসাবের উপর স্থাপিত নয় বরং তাহাকে আশ্রয় দান, পালন ও রক্ষাব্যবস্থার উপরই স্থাপিত। তাহারা আরও বলেন মানব ভোজন করে তাহার জীবনধারণের জন্য, ভোগের বা রসনা পরিভূতির জন্য নয়। কাহারও কাহারও মতে কেবলমাত্র মাংস নয়, এমন কি ভিড় ও দুগ্ধ পর্যায় পরিত্যাগ করা উচিত। কেহ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মানবজাতির দৈহিক গঠন-প্রাণী হইতে জ্ঞান। যাহা যে তাহা আহার্য্য পাত্র না করিয়া ফল মূল ইত্যাদি ভোজন দ্বারা জীবনধারণ করিবার উপযুক্ত। তাহারা আত্মবুদ্ধির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে সম্পূর্ণ চাইনি ইত্যাদি দ্রুপাচ্য অব্যাবি বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। নিরামিষ ভোজন সব চেয়ে অল্প-ব্যয়-মাপেক্ষ স্টো ইহার অঙ্গুল্যে বদ্ধ কম মুক্তি নয়। এই সমস্ত মুক্তি-প্রমাণ মনের মধ্যে

যে একটু আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; তা' ছাড়া নানা নিরামিষ হোটেল নানা মন্ডের নিরামিষাশির সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। বিলাতে নিরামিষ ভোজীদের একটা সমিতি ছিল সেখান হইতে একখানি সামগ্রিক পত্রিকাও বাহির হইত—আমি সাম্প্রতিক যামির গ্রাহক ও সমিতির সভ্য হইলাম কিছুদিনের মধ্যে আমি উক্ত সভার কার্যনির্বাহের সভ্যদের মধ্যে স্থান পাইলাম। এদেশে গাহারা নিরামিষভোজীদের মধ্যে এক একটা দৃষ্ট বিশেষ সেইরূপ অনেক লোকের সহিত পরিচয় হয়—আমি অতঃপর নিজে খাড়া সন্দেশ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই।

বাটা হইতে যে সমস্ত মিঠার ও চাইনি আনাইয়া ছিলাম সে সমস্ত খাওয়া বন্ধ করিলাম। যে সব নিরামিষ বাহন পূর্বে বিখ্যার বলিয়া মনে হইত ক্রমশঃ তাহাও বেশ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল তাহাতেই ব্রি-লাম প্রকৃত স্বাদ রসনায নয়, মনে। কেহ কেহ বলিতেন, চা এবং কাকি শরীরের অপকার করে পরন্তু কোনো হিতকারক স্বতরাং আমি চা এবং কাকি পরিত্যাগ করিয়া কোনো কান করিতে আরম্ভ করিলাম।

এই সকল পরীক্ষা ব্যতীত অস্বাভাবিক সামান্য বিষয়েরও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কখনও খেতসার মুক্ত ভোজ্য পরিত্যাগ করিলাম, কখনও ফলমূল ও রুটী ইত্যাদি আহার করিতাম আবার কখনও বা পানীয়, দুধ

ও ডিথ খাইতাম। এই ভিম বাওয়ার পরীক্ষা প্রায় এক পঞ্চাশ চলিয়াছিল। যে সংস্কার খেতসার বন্ধিত খাড়া হইতে বলিতেন তিনি ডিথ খাওয়ার বড়ই পক্ষ-পাতী ছিলেন; তিনি বলিতেন ডিথ খাইলে প্রাণী হত্যা করা হয় না—আমিও এই মুক্তির প্রোত আমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিলাম কিন্তু এই পতন ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। আমার তুল শীঘ্রই আমি বুঝিতে পারিলাম—প্রতিশ্রুতির অর্থ নিজের স্ববিধামত খুরাইবার অধিকার আমার নাই। মনে আনিলাম আমার মাতা মাংসের উল্লেখ করিলেও ভিমও উহার অন্তর্গত ছিল।

বিলাতে মাংস শব্দের অর্থ তিন প্রকার করা হয়—প্রথম পশু ও পক্ষীর মাংস—স্বতরাং মৎস্য ডিথ ইহার অন্তর্গত নয় দ্বিতীয়তঃ—জীবিত প্রাণীর মাংস—স্বতরাং ডিথ ইহার অন্তর্গত নয় তৃতীয়তঃ—জীবিত প্রাণীর মাংস ও জৈবিক দ্রব্য মাঝেই ইহার অন্তর্গত স্বতরাং মাংস, ডিথ এমন কি দুগ্ধ পর্যায় ইহার অন্তর্গত। ভিম পরিত্যাগ করিয়া একটু মুস্থিল হইল কারণ হোটেলের নানারূপ ব্রু ডিম দিয়া প্রস্তুত হইত।

এই স্থলে প্রতিশ্রুতির অর্থ সন্দেশ দু' একটা কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পৃথিবীতে এই কারণে বহু দ্বন্দ্ব ও মনোমানসিগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যতই পরিষ্কার-

ভাবে বাক্যের দ্বারা প্রতিশ্রুতির গঠন হইক না কেন ব্যর্থণের মাছর কোশলে ঘুরাইয়া কিরাইয়া ঠিক নিজের তাহা হইতে স্ববিধামত অর্থ করিতে পারে। তাহারা স্বার্থে অন্ধ হয়, স্বার্থ বোধক শব্দের দ্বারা নিজেকে এবং অপর সকলকে, এমন কি ঈশ্বরকে পর্যায় প্রত্যাহারিত করিতে চেষ্টা করে। প্রতিশ্রুতির নিয়ম এই যে বাগ্যকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তিনি যে অর্থে উহা গ্রহণ করেন ঠিক সেই অর্থ মানিয়া লও।

গাহারা যে ধর্মীদের বংশ জন্মগ্রহণ করে তাহাদের চেয়ে নব দীক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম বিষয়ে উৎসাহ অনেক বেশী। তখন বিলাতে নিরামিষ ভোজন একটা নূতন তথ্য। এদেশ হইতে মাইবার পূর্বে মাংস ভোজনে আমার দৃঢ় আস্থা ছিল—স্বতরাং সেখানে আমি নবদীক্ষিতের উৎসাহ লইয়া কয়েক অবতীর্ণ হইলাম। বেঞ্চওটার পল্লীতে সার এড-উইন আর্লডকে সহকারী সভাপতিত্বপ্রেম আহ্বান করিয়া নিরামিষভোজীদের একটা দ্রাব গুলিলাম—'ভেনি-টারিয়েন' পত্রিকা সম্পাদক ডাঃ ওল্ডফিল্ড হইলেন সভাপতি, আমি হইলাম সেক্রেটারী—স্বাভাবিক কয়েক মাস বেশ চলিয়া গেল বহু হইয়া গেল। অল্প সভা গঠনের ও পরিচালনের এই সামান্য অভিজ্ঞতা পরে আমার খুব কাজে লাগিয়াছিল।

## বসন্তে

### ত্রিপুরাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো যোততির সিঁহুর ঢালা স্বনীল নীলাধরে ?

মুখ মধুর হাসির পরশ গিরির জটা' পরে।

হৃদয় ভরা আঁচল কা'র ?

উড়ছে বন-বীথির ধার—

গোলিণ-ফোটা বিজন বনে বইছে মলয় বায়।

বসন্তে আজ পরাণ মাঝে কি স্থব বাজে হায় !

বনানীতে কোকিল গীতে

কি স্থর দিতে আশার চিতে

ছুটছে বাতাস পাগলপারা শিম্বের বেলা আজ।

বাঞ্ছা মধুর মধুর ধরে আবার স্বপ্ন মাশ !

আমের বোলের হরাপোতে,

সাসুছে কা'রা হাওয়ায় মেতে,

গাছের পাতা কাঁপিয়ে কা'রা ছুটছে অজ্ঞানতে।

মাথার 'পরে জাপছে 'তার' রাবের পাহারাতে !

চাঁদের আলোর পাহাড় হ'তে

লক্ষ-ক্ষণ জলের প্রোতে

মিশ্র'তে তেজে নদীর বুকে কোঁস কোঁসায় ধায়।

টুক'রা হীরক বকুল তলে গড়াগড়ি ধায়।





## গোলাপ ও শিশিরবিন্দু

অমিতা পূর্ণশী দেবী

গোলাপ—

তোমার আশ-পথ চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ রজনী যে শুধু জাগরণে যায়,—কোথায় তুমি? কোথায় গগো প্রিয় বাহিত আমার! আমার ব্যাখুলিত উন্মুগ হিয়াখানি যেখিয়া সারা নিশি তোমার প্রতীকার জাগিয়া আছি,—তুমি এসো,—এস গো, আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথা-তাপ-হারী!—আমার এ বিরহভক্ত, তৃপ্তিত-তাপিত বক্ষ তোমার অমিয় মাথা সিক্ত পরণে ছুড়াইয়া দিতে এসো,—এসো সখা!—

শিশির—

এই যে,—এই যে আমি এসেছি। ও আমার অতি-মানী পরবর্তী গোলাপ-রাণী! তোমার প্রেম চল চল বিকশিত হিয়ার তলে ঝাপাইয়া পড়িতে এই যে আমি এসেছি!—

দাও,—দাও ও গো স্বন্দর-রাণী! তোমার সোহাগ-পরাগ-মাখা প্রেম স্রবিত মধুময় স্বরূপ-পেয়ালায় আমার এই অতিক্রম কবিরের জীবন-কণা নীরবে, নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে দাও!—

এই আক্লিষ্ট, তলস্র, মধুময় মিলনকণ্টকুর আশায় আমি যে সারাক্ষণ ব্যাখুল, উন্মুগ হইয়া আছি—আমার সোহাদিনী!—

গোলাপ—

আ মরি! মরি! সখা গো!—কি হৃদয়-হৃদ-নির্খল তুমি! কি প্রাণ ছুড়ান মধুরতা, কি সজল-সিদ্ধ করুণতা

তোমার এই মুহূ-কোমল সরস-স্পর্শটুকুতে।—কি প্রাণ ভরা হৃৎ—কি বুক ভরা তৃপ্তি!

কিছু সখা! এ হৃৎ অক্ষুন্ন হই যা যেন?—ওই যে—আমাদের এ নিভৃত মিলন স্বপ্নের, হৃদারক, অরুণ-কিরণ তোমাকে আমার বক্ষ হ'তে ছিনাইয়া নিতে ওই বুকি আসিয়া?—হায়! নির্দয় নিহঁর! না, না,—ওগো! তোমাকে পাইয়া, তোমাকে বুকে ধরিয়া, আমার প্রাণের পিপাসা এখনো যে একটুও তৃপ্ত হয় নাই! এখন তোমাকে ছাড়িতে আমি পারিব না,—পারিব না,—আমার প্রাণাধিক!—

শিশির—

কিসের ব্যথা, কিসের ভয়, গোলাপ-রাণী! অরুণ-কিরণ নিহঁর! না, না, নিহঁর বটে তোমার ওই চকল দুরন্ত ব্যাভাস, যে আমাদের কাতরতা উপহাস করিয়া আমাদের ঝাঁড়াইয়া, তোমার ব্যথা শিহরিত, আখুলিত বক্ষ হ'তে আমাকে কণে কণে, নিমেষে নিমেষে ঝরাইয়া ফেলিতে চায়। অরুণ-কিরণ আমার দরদের দরদী, মরমের মরমী বন্ধু, যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে আসে না—আসে তার নব জাগরিত দীপ্ত অহরাগ-রাগে আমা-দের নিভৃতের নীরব, নিদ্রা গোপন প্রেমটুকুকে রূপরস-গন্ধে ভরপুর, সার্থক করিয়া তুলিতে,—আসে আমাদের এই অপরিভূত কণিকের মিলনটুকু অটুট অবিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেমিকার প্রেমময় কোমল স্বরূপে প্রেমিকাকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিতে! এই ক্ষণ-ভঙ্গুর ছপের অগতে, তার চেয়ে পরম ও চরম হৃৎ আর কি আছে আদরিণী!

## দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

মুকং কবোতি বাচালং পন্থং লজ্জতে গিরিং।

যংকুপা তমংবন্দে পরমানন্দ মাধবঃ।

পরমশ্রীতিভাজন শ্রুতিপতি সভামহোদয়গণ, বাল্যকালজ্ঞ অনেকের মুখে বাঙ্গালার ভক্তকবি রাম প্রসাদের গান শুনিতাম—

কে জানে গো কোন্‌ কী ধেমন,

যজ্ঞদর্শনে যার না পায় দর্শন।

প্রাণের বৃদ্ধ পতিতগণ এ গান শুনিয়াই অশ্রুপাত করিতেন, আমি অবাক হইয়া তাহা দেখিতাম। উহার কারণ কিছু বুঝিতাম না। “যজ্ঞদর্শনের” অর্থও তখন বুঝিতাম না। তখন মনে হইত বুদ্ধি বৃদ্ধ না হইলে উহা বুঝা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধনার অভাবে উহা বুঝিতে পারিলাম না। তথাপি যজ্ঞদর্শনকে বাহার দর্শন পাণ্ডুরা যায় না, তাহারই ইচ্ছা, আজ আমিও এখানে আপনাদিগের নিকটে দর্শন বিষয়ে কিছু বলিবার জন্ম উপস্থিত হইয়াছি।

ব্রহ্ম দার্শনিক প্রাচীন হরিতত্ত্বসূত্র-বিবৃতিত “যজ্ঞদর্শন সমুদ্রক” প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে যজ্ঞদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রকাশিত (১) সাংখ্যদর্শন, (২) বৈশেষিকদর্শন, (৩) জায়দর্শন, (৪) পাতঞ্জলদর্শন, (৫) পূর্বমীমাংসাদর্শন এবং উত্তরমীমাংসা বা (৬) বেদান্ত দর্শনই যজ্ঞদর্শন বলিয়া এতদ্বন্দে পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এ বিষয়ে একটী প্রাচীন মোকও কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

কপিলস্ত কবাস্ত গৌতমস্ত পতঞ্জলোঃ।

জৈমিন্যেবাস্তবেদস্ত দর্শনানি যজ্ঞে যিঃ।

বেদান্তস্বরূপলগনে এবং পাণ্ডুরাজ সিদ্ধান্তের অঙ্ক-

সরণে ভারতে যে সমস্ত বৈষ্ণবদর্শনের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা যজ্ঞদর্শন বেদান্তদর্শনেরই অন্তর্গত বলা যায়। কারণ, সমস্ত বৈষ্ণবদার্শনিক আচার্য্যই তাঁহাদিগের মতকে বেদান্তদর্শনের মত বলিয়াই সমর্থন পূর্বক নিজ নিজ মতাহরণের বেদান্তদর্শনের ভাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবচার্য্য প্রভুপাদ বল্লভের বিভাক্তমহাশয়ও শেষে বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাট্টনির্ণাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শারীরকভাণ্ডে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের—(১২৫২১০৩)—দ্বারা ই পাঞ্চরাজ সম্বত “চতুর্বিহাবা”কে কোন অংশে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া গণন করিলেও রামানুজ প্রভৃতি সেই বেদান্তদ্বয়ের দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রামানুজের পূর্বক যাম্বুচাৰ্য্যও “আগমগ্রামাং” গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া পাঞ্চরাজ সিদ্ধান্তের বৈদিকত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা ব্যাখ্যাভেদে মতভেদ হইলেও বৈষ্ণবদর্শনও যে বেদান্তদর্শনেরই প্রকার বিশেষ, ইহা স্বীকার্য্য। বেদান্ত-স্বরূপলগনে ঐক্যভাট্টারের প্রাচীন শৈবদর্শনও আছে। আবার বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃ এতদিন পরে নারায়ণপরমাচার্য্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের সাধনা ও অধিতীয় প্রতিভাবলে রঙ্গপুরে শাক্ত দর্শন ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গবাণী পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপ জায়দর্শনও ব্যাখ্যাভেদে যে সকল মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও সম্ভাব্যভেদে ঐ সমস্ত দর্শনের মত বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ববর্তী ভাস্করবির “প্রতিমা” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যে মেঘাতিথির জায়দর্শনের উল্লেখ আছে, তাহাও আমার গৌতমের জায়দর্শন বলিয়াই বুঝিবারি। কারণ, মেঘাতিথি যে, জায়দর্শনকার অংল্যাপতি গৌতমেরই



নামান্তর, ইহা মহাভারতের শাস্তিপূর্বে—(মোক্ষমুখ ২৬৫ অঃ ৪৫ শঃ)—বচনের দ্বারা বুঝা যায়। এবং অক্ষপাণ্ডও যে তাঁহারই নামান্তর, ইহাও স্বল্পপুণ্যপূর্ণ—(মাহেশ্বর কুমারিকাণ্ড ৫৫শ অঃ ৫ম)—বচনের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু ভ্রায়দর্শনোক্ত উদ্ভাসন প্রমাণকে ত্যাগ করিয়া প্রমাণজয়বাহী ভূষণ প্রভৃতি বাহারী “ভ্রায়দর্শন” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মত ভ্রায়দর্শনের মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। শৈবব্যাক্তি ভগবান ভাস্করজ “গণকারিকা” গ্রন্থে যে মতের সূচনা করিয়াছেন, তাহাও পুরোক্ত কোন দর্শনের মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আর্যবেরদ ও তত্ত্বশাস্ত্রে যে দর্শনের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও সর্ম্মাংশে পুরোক্ত বহুদর্শনের দর্শন বলিয়া বুঝা যায় না। “ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান” পুঙ্খপূর্ণ যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিশিষ্টতা আছে। তত্ত্বশাস্ত্রে যে কিছুদর্শন দর্শন তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক এখন অতি বিরল। তন্ময়ের “মাহার্ষ্যমন্ডরী” “চিদগগন চক্রিকা” “ত্রিপুরা বহুত” “বোমিনী দ্বন্দ্ব” “মালিনী বিজয়” এবং অগস্ত্যকৃত “শক্তি হৃত্ত” ভোজব্রাহ্ম কৃত “তত্ত্ব প্রকাশ” ও অভিনব গুপ্তপাদের “পরাক্রান্তিকা” এবং গোড়পাদকৃত “শ্রীবিজ্ঞান হৃত্ত” প্রভৃতি বহু গ্রন্থে তন্ময় দর্শনের অতি গভীর উল্লেখ তত্ত্ব বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “বামকেশবরত্ন”ের “ভূতবৃত্ত” চীকারক মহাদার্শনিক ভাস্কর দ্বারা যেভাবে দার্শনিক বিচার ও নানাদর্শনের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ববিজ্ঞান হৃত্ত দ্বারাও অসম্ভব পাঠ্য। মহামতি উক্তসাহেবের তত্ত্বব্যাখ্যা পাঠ করিলেও আশানার। তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মভীরা দার্শনিক তত্ত্বের কিছু পরিচয় পাইবেন। সে বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলিবার অবিকার নাই।

পুরোক্ত “বহুদর্শন”ের উৎপত্তির কাল ও গোষ্ঠীগণ্য বিষয়ে অনেকদিন হইতে এদেশেও শিক্ত সমাজে প্রভীড়া-ভেদ অনেক আলোচনা হইতেছে। আপনাদিগের নিকটে সে সকল কথাই আলোচনা বা পুনরাবৃত্তি ব্যর্থ। তবে আমাদিগের শাস্ত্রাহুগার ইহা অবশ্যই বলিব যে, বেদাদি সমস্ত বিদ্যাই সেই পরব্রহ্মের নিশ্চিন্ত, অর্থাৎ সেই

পরব্রহ্ম হইতেই অন্যান্যসেই সকল বিচার উদ্ভব হইয়াছে। ঋষিগণ তাহা লাভ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। গৃহস্থ মূনিগণ যে, নানা কথ-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত এলয় পৃথগ্ন দেখানোই অবস্থান করেন এবং পরে তাঁহারাই আবার স্থলির আদিত্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞা প্রকাশ করেন। এবং সেই সমস্ত মূনিগণ হইতেই তপন ব্রহ্ম, পুণ্য, বেদাশ্র, উপনিষদ, শ্রোত্র, যজ্ঞ, ভাগ্য এবং অমৃত সমস্ত পাইয়াই প্রকাশিত হয়,—ইহা যোগবলে সর্বজ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই বলিয়াগিয়াছেন। তিনি যে, মূনিগণ হইতে, স্থলির প্রায়ত্ত “স্বহ” ও “ভাষ্য”র ও প্রকাশ হয় বলিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা অবশ্যক।\* পরন্তু দার্শনিক হৃত্তকার মহর্ষিগণের যোগবলে হ্রদীভীজিতা বসন্ত পুরোক্ত প্রকাশ কর্তে তাঁহাদিগের মহাগুণবান হইত। তখন তাঁহাদিগের পরম্পরের “বান্ধ” বিচার হইত। তাই আমরা এক দর্শন অপদর্শনের মতের উল্লেখ ও সমালোচনা দেখিতে পাই। এক দর্শন অপর দর্শনের হৃত্তেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহারা শিশুগণের অবিকার অস্থানারে তাঁহাদিগের আশ্রয়ী দীক্ষান্ত হৃত্ত দীক্ষান্দশাদানের জ্ঞান তাঁহাদিগের নিকট অপর সিদ্ধান্তের বহনও করিয়াছেন। তাঁহাদিগের হ্রদীভীজিতা বিবাস করিলে ঐতিহাসিক রাজ্যে অনেক গোল মিটিয়া যায়। এখনও কোন স্থানে অপ্রচলিতভাবে “কবিশঙ্ক” বিঘটন আছে। আমরা পুনরায় ভারতের বহু তাঁহাদিগের শুভপার্যপণের প্রতীকী করিতেছি। আমাদিগের তাঁহাদিগকে পুরোক্ত বিবাস করিতে হইবে। প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাহী হইয়া তাঁহাদিগের অবিভ উড়াইয়া দিলে আমাদিগের অন্তিম থাকিবে না। আমাদিগের দর্শন চর্চা করিবার পুরোক্ত ইহা অসম্ভব রাখিতে হইবে যে ঋষিগণই প্রথমে অজ্ঞানের সূচীভেদ অন্ধকার নিবারণের জ্ঞান ভারতের সর্বজ্ঞ জ্ঞানের সমুজ্জ্বল দীপাবলী লাগিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রথমে ভারতের মুক্তির বার্তা আনয়ন করিয়াছিলেন। মুক্তিই তাঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্রের পদম

\* মতো বেদাঃ পুণ্যাক বিদ্যোপনিবৃত্তবঃ।

শ্রোত্রাঃ হরাণি ভ্রাতাণি অক্ষয়িকবণাঃ যঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—অধ্যায়দ্বয়কণ। ১৩০।

প্রয়োজন। দার্শনিক রাজ্যের হ্রদীজ্ঞা প্রাণে আমাদিগের সকলে মিলিয়া চিরকাল মনঃকৃত করিয়া তর্কশক্তির বৃত্তি অথবা জীর্ণীয়া সকল করিয়া আনন্দাহুতব করা তাঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। অস্বা ও অস্বপ্ন রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রোক্ত দৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ও প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ব্যতীত কখনও দার্শনিক তত্ত্ব বুঝা যায় না। জীর্ণীয়া প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জিজ্ঞাসার অভ্যাস করিলেও উহা বুঝা যায় না। তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনের দ্বারা অধিকারীকেও বলিয়াছিলেন—

“তত্ত্বিচ্ছি প্রাপিগতেন পরিপ্রশ্নেন সেব্যতা”।

ঋষিগণের দর্শন শাস্ত্রের পদম প্রয়োজন যে মুক্তির কথা বলিলাম, তাহার স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও উহার অন্তিবে কথারও কোনও বিবাদ হয় নাই। আমরা ধ্বংস সাহিত্য—(৭ম মণ্ডল ৫৭ অষ্টক চতুর্থ অঃ ৫০ম হৃত্ত ১২ম মঃ) এবং যজুর্বেদ সাহিত্য “ব্রাহ্মকণ্ঠম্ভাষ্যে”—ইত্যাদি যন্ত্রের শেষে “ব্রহ্মাত্মকীয় নামুতাত্”—এই বাণী “অমৃত” শব্দের দ্বারা মুক্তির সংবাদ পাই। সাধারণ্যার্থেও ঐ “অমৃত” শব্দের দ্বারা শাস্ত্রা মুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের অত্যন্ত উচ্চতর হইয়াই জ্ঞান ও মৃত্যুর অত্যন্ত উচ্চের হওয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির রূপ মুক্তি হয়। উহাই পুরোক্ত মন্ত্রে দ্রাবিদ “অমৃত” শব্দের দ্বারা পদম পুঙ্খার্ঘ্য বাচ্য প্রার্থ্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায়া শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—“জ্ঞান-মৃত্যু-জ্ঞান দুঃখৈবিন্মুক্তোহমৃতমুত্তমঃ”।

১৪২-২৭।

পূর্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সকাম অধিকারী-দিগের জ্ঞান প্রদানতঃ যেরূপে কথকগণেরই ব্যাখ্যায়ার তাহাতে তিনি মুক্তির কোন বিচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাত কথ্য যে নিকাম ভাবে অস্বপ্নিত হইলে মুক্তিরই প্রয়োজন হয়, ইহা তাঁহারও সিদ্ধান্ত বৃত্তিতে হইবে। মীমাংসাচার্য্য আপোদেব তাঁহার “জ্ঞান প্রকাশ” গ্রন্থের সর্বশেষে উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু বেদান্ত দর্শনের শেষপাদে ব্রহ্মলোকগত মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণিত করিতে এবং তৎপুর্বে অস্ত্রবিধর্মেও মহর্ষি বাসদেব জৈমিনির যে সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন,

তদ্বারা জৈমিনিও যে, বাসদেবগণের দ্বারা উপনিষদের ব্যাখ্যাহুগারেই মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে মতবিশেষের ব্যাখ্যা করিতেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃত্তবাং তাঁহার মতেও স্বর্গভিত্তি পদম পুঙ্খার্ঘ্য মুক্তির অন্তিম আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবর খারী ও ব্যক্তিকার কুমারিল ভট্ট ও জৈমিনির মতের ব্যাখ্যা করিতে স্বর্গভিত্তি মুক্তি এবং উহার কারণের ব্যাখ্যাও সর্বদা করিয়া গিয়াছেন। তবে কুমারিলের মতে মুক্তির স্বরূপ কথ্য, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাত মহাপ্রাণীমাংসক পার্শ্বদারবিমিচ্ছ তাঁহার “শাস্ত্র-দীপিকা”র তর্কপাদে ঐ মতভেদের স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে মুক্তিতে নিত্যস্থানের অভিব্যক্তি হয় নাই। “ভট্টকিরামণি”র তর্কপাদে গাগা ভট্টও উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু “মাহাত্ম্যম্ভাষ্যে” গ্রন্থে (প্রাথম্য পূঃ ২৬শ শ্লোকে) মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্ত উচ্চের হইলে নিত্য স্থানের অভিব্যক্তিই কুমারিলের সমস্ত মুক্তি। সে যাহাই হউক মুক্তি হইলে যে, চিরকালের জ্ঞান সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এই সর্বসম্মত। ভ্রায়দর্শনে মহর্ষি গোতমের মত লক্ষণ বলিয়াছেন তাহাতেও ঐ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাসদেবগণের পুরোক্ত শৈব-সম্প্রদায়ের বৈদ্যাদিকগণ দ্বারা দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া গোতমের মতে মুক্তিতে যে নিত্যস্থানের অভিব্যক্তিও হয়, এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা আমরা নানা কারণে বুঝিয়াছি। বাসদেবায় বিশেষ বিচার পুরোক্ত উক্ত মতের বহন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনেক পরে জীর্ণীয়া নবমশতাব্দীতে বৈদ্যচার্য্য ভাস্করজ তাঁহার “ভ্রায়দর্শন” গ্রন্থে অগম পরিচ্ছেদে বাসদেবগণের মতে বিশেষ বিচারপুঙ্খক বহন করিয়া পুরোক্ত মতই সর্বদা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি তাঁহার সমর্থিত ঐ মতকে গোতমের মত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীশম্পদায়ের বৈদ্যাদিচার্য্য বৈদ্যনাথ তাঁহার “ভ্রায় পরি-ভাষ্য” গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ভ্রায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মতেও যে মুক্তিতে নিত্যস্থানের অস্বপ্নিত হয়, ইহা সর্বদা করিতে দেখে উক্ত বিষয়ে ভ্রায়দেবগণের



উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভূষণ ভাস্কর্যের "প্রায়সার"র অষ্টাংশটীকার মধ্যে প্রধানটীকার। আমরা আজ পর্যন্ত এই ভূষণের টীকা দেখিতে পাই নাই। পরন্তু "সংক্ষেপ-শব্দরত্না" গ্রন্থের শেষে—(১৬ অং: ৬৬৩০)—মাঘবাচ্যের বর্ণন করিয়াছেন যে, ভগবান শূর্যচাচ্যের পরিভ্রমণ কালে কোন স্থানে কোন নৈমায়িক তাঁহাকে গর্ভের সহিত প্রায় করিয়াছিলেন যে, "যদি তুমি সর্গের হও, তাহা হইলে কণাধ-সমত মুক্তি হইতে গৌতম-সমত মুক্তির বিশেষ কি? তাহা বল, নতঃ সর্গজ্ঞতা বিষয়ে প্রজ্ঞিতা পরি-তাপ কর।" তদন্তরে ভগবান, শূর্যচাচ্য বলিয়াছিলেন যে, "কণাধের মতে আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত বিনাশগ্রন্থক আকাশের দ্বায় জড়ভাবে স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু গৌতমের মতে এই অবস্থায় আনন্দাচ্ছূতি থাকে।" শূর্যচাচ্যরূপ "সর্গসিদ্ধান্ত সংগ্রহে"ও নৈমায়িক মতের বর্ণনায় ঐরূপ সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। আমাদের মনে হয়, শূর্যচাচ্যের নিকটে প্রস্তুতকারী নৈমায়িক ভাস্কর্যের পূর্ববর্তী গুরুসম্প্রদায়ের কোন নৈমায়িক হইতে পাবেন। অথবা তিনি গৌতমের সমত মুক্তি বিষয়ে বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন মতবিশেষই শূর্যচাচ্যের নিকটে শুনিয়া তাঁহার সর্গজ্ঞতা অর্থাৎ সকল মতবিজ্ঞতার পরীক্ষা করিতেই উক্তরূপ প্রায় করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, বাৎ-স্রায়নের পূর্বে কোন সম্প্রদায় যে, গৌতমদম্বত মুক্তিতে নিত্যহৃৎসর অহুত্বও সর্বদা করিতেন, ইহা আমরা নানা কারণে বিশ্বাসি। মাঘবাচ্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিজে কল্পনা করিয়া ঐরূপ একটা অমূলক কথা লিখিতে পাবেন না। এইরূপ মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে আরও নানা মতভেদ পাওয়া যায়। বোদান্তদর্শনের সোপানদে মহর্ষি বানার্ধ্যরু ঋতি অঙ্গপরে ব্রহ্মলোকান্ত মুক্ত পুরুষের নানাবিধ ঐক্যও নানা স্বরূপজ্ঞাপের বর্ণন করিয়া শেষে ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্গশেষোক্ত "নচপুনরাবর্তন্তে নচ-পুনরাবর্তন্তে"—এই ঋতিবাক্যদ্বারা সর্গশেষ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অনাবৃত্তি: শব্দানাবৃত্তি: শব্দাঃ"। অর্থাৎ সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হয় না, ইহা ঋতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেখানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত পুরুষদ্বয়ের সম্বন্ধেই তিনি ঐ স্থলে বলেন

নাই। এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই তাহার মতে চরম মুক্তি নহে। বাহ্যার উপন্যাস বিশেষের ফলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার ফলে মহাপ্রলয়ের হিংস্রগর্ভের সহিত বিবেচনাবল্য বা নির্গণ মুক্তিকাল করিবেন, তাঁহাঙ্গিরের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই বোদান্তদর্শনের সর্গশেষ স্বয়ং বলা হইয়াছে। নারায়ণ উপনিষদেও—"তেন্দ্রব্রহ্মলোকান্তে পরাক্রমে পরা-মৃত্যুপরিমুচ্যাসিগর্মে" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তই বক্ত হইয়াছে। বোদান্তদর্শনে মহর্ষি বারায়ণও পূর্বে (৪৩।১১।১১) দুই স্বরের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলেই মুক্তি হয় না। উহা প্রকৃত মুক্তি নহে। নির্গণ মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। উহা হইলে তখন সেই মুক্ত পুরুষের কিস্তি অবশ্য হয়, এই বিষয়েই নানা মতভেদ হইয়াছে, এবং নানা কারণে তাহা হইতে পাবেন।

কিন্তু ভক্তগণ নির্গণমুক্তি চাহে না। তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা বাহ্যীত কোনপ্রকার মুক্তিই দান করিলেও গ্রহণ করেন না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতও (৩.২১।১৩) বলিত হইয়াছে। শ্রীরাঘবভক্ত শ্রীহরিশ্রমও শ্রীরাঘবভক্তের বলিয়াছিলেন যে, "যে মুক্তিতে আপনি প্রকৃত্ত্বও আমি দাস, এই ভাব বিলুপ্ত হয়, সেই মুক্তি আমি চাই না।" শাক্ত ভক্ত রামপ্রসাদও গাহিয়াছিলেন:—

নির্গণে কি আছে বল, জলেতে নিশায় জল।

ওরে চিনি হুতা ভাল নয়, চিনি থেতে ভালবাসি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এইরূপ সাধারণত প্রেমকেই পরম পুরুষার্থ বা চরমপ্রার্থা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রেম কি, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না। মুক ব্যক্তি যেমন কোন রসের আশার করিয়াও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ প্রেমও ব্যক্ত করা যায় না। তাই প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে যাইরা স্ববি ও স্বয়ং বলিয়াছেন "মুকাবাদনং"। হুতরাং যাহা আশার করিয়াও ব্যক্ত করা যায় না, তাহার নামান্বয় শুনিয়া কিরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিব? পরন্তু যেখানে প্রোথারভারী শ্রীমান নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যেখানে অমরকবি জয়ধ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

রূপলাভ করিয়া "ললিতকোমলকান্তপদাবলী"র দ্বারা প্রেমিককে জয়যে প্রেমের পীতৃস্বখারা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং যেখানে প্রেমমুগ্ধ চণ্ডীদাস প্রেমময় সঙ্গীতের দ্বারা প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন সেই বীরভূমিতে আসিয়া তঁহাদের অতি দুর্লভ আমি প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিব, ইহা ত ভাবিতেও পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যে, বাহ্যার প্রোই চানেন, তাঁহারাও মুক্তিই চানেন। কারণ তাঁহাঙ্গিরের ঐ প্রেমলাভ হইলেও আত্মাতিক হৃৎ-নিবৃত্তি হয়। তাঁহাঙ্গিরের পক্ষে ঐ প্রোইই মুক্তি। তাই স্বপ্নমূলেও কবিত হইয়াছে "নিশ্চিন্তা অবি ভক্তিহা। সেই মুক্তির্জ্ঞানদান"। ব্রহ্মবৈবর্ত পুণ্যে আবার শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, মুক্তি বিবিধ। নির্গণ ও মুক্তিই অর্থাৎ প্রেম। তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণ প্রেমরূপ হইতে চানেন। অত সাধুগণ নির্গণমুক্তি চানেন। সেখানে নির্গণ প্রার্থীমণিকের সাধু বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-বৈবর্তের সেই বচনয় "শব্দবজ্জন্ম" (মুক্তি শব্দে) উক্ত হইয়াছে।

### দৈতবাদ ও অদৈতবাদ

পূর্বেকি যদশ্রমণের দ্বারা মানবদেহের প্রকাশ হইলেও তন্মধ্যে যৈতবাদ ও অযৈতবাদ বৃদ্ধিলে অনেক বাধাই বুঝা হয়। যে মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবভেদ আছে, সেই মতকেই আমি এখানে "যৈতবাদ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। হুতরাং রামাশুভের বিশিষ্টযৈতবাদ গনিত্যদেহের "যৈতবাদ"প্রকার প্রভুত্বও "যৈতবাদ"। হুতরাং, বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল ও পূর্বমীমাংসা-দর্শনে যে, কিন্তু যৈতবাদই পরিত্যজ্য হইয়াছে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। অযৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কেহ কেহ অযৈতমতে জায় ও বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা করিবার জন্ত কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাঙ্গিরের সে চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া আমরা কখনও মনে করিতে পারি না। কারণ, জায় ও বৈশেষিক দর্শনে হৃৎ শরীরের কোন উল্লেখ হয় নাই। পরন্তু জ্ঞান ইচ্ছাও স্ববৃত্তি প্রভৃতি যে, মনের গুণ নহে, উহা জীবাত্মারই বাস্তববিষয়ে গুণ, ইহা বিশেষ বিচার পূর্বক স্পষ্ট

ভাবেই সমর্থিত হইয়াছে। আরও অনেক বখার দ্বারা জায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে জীবাত্মা যে, প্রতি শরীরে ভিন্ন, হুতরাং অসংখ্য ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। হুতরাং এই মতে অসংখ্য জীবাত্মার সহিত এক "অখিতীয়" পরমাত্মার বাস্তব ভেদ বা ভেদাত্মার কোনরূপেই সম্বন্ধ হয় না। পরন্তু বাস্তব ভেদই সিদ্ধ হয়। আবার শাস্ত্রে অনেক স্থানে যেমন জীবাত্মাকে বিত্ব অর্থাৎ আকাশের দ্বায় সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে, তদ্রূপ অনেক স্থানে জীবাত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্র-প্রতি সঙ্গতভাবে বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দেবভক্তির মধ্যেও এই মতভেদের সূচনা আছে। চরক সাহিত্য ও হৃৎকৃত সাহিত্য এই মতভেদ ব্যক্ত আছে। অধিকারিবিশেষের অধ্যাত্ম ভাবনা বিশেষের জ্ঞাত্ব শাস্ত্রেই ঐরূপ সিদ্ধান্তভেদ হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। ভক্তিলিপ্ত দৈতবাদ দার্শনিকগণ জীবাত্মার অণুও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করায় তাঁহাঙ্গিরের মতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য জীবাত্মার সহিত বিশ্বব্যাপী এক পরমাত্মার বাস্তবভেদ অবশ্যই স্বীকার্য। এইরূপ যে ভাবেই হউক, স্বপ্রাচীনত্ব দ্বারা হইতে যৈতবাদের প্রকাশ হইয়াছে। অধিকারি বিশেষের জন্ত যৈতবাদও শাস্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত। মহর্ষি দশম জন্মে অযৈতবাদী হইয়াও (দশ সাহিত্যের শেষে) অধিকারি বিশেষের পক্ষে যৈতবাদও যে একটা পক্ষ বা সিদ্ধান্ত, ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গাচাৰ্য প্রভৃতি অনেক যৈতবাদী আচার্যই যৈতবাদের প্রতিপাদক বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ অযৈতবাদও শাস্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত। স্মৃতি ও পুরাণেও অনেক স্থানে অযৈতবাদের স্বস্পষ্ট প্রকাশ আছে। অধিকারিবিশেষের জন্ত উভয় বাধাই শাস্ত্রে বলিত হইয়াছে। হুতরাং কোনদিন কেহই উভার কোন ব্যক্তিই বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণব মহাদার্শনিক মাধবমুখ্য "পরপক্ষ গিরিহস্ত" নির্মাণ করিয়া অযৈতবাদের স্বস্বচীত সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গে প্রাপণে বহু বজ্রনিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতেও উহা ভস্মীভূত হয় নাই। আবার কাশীর হইতে অদৈতবাদী সদানন্দ "অযৈতব্রহ্মসিদ্ধি"র বলে



ঐশ্বর্যবাদের স্বাক্ষরমণি মণিচ্ছিন্নে বহু “মূদ্রার প্রহার” করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও উহা বিচূর্ণ হয় নাই। অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞাত ঐশ্বর্যবাদ ও অঐশ্বর্যবাদ সর্ব-মুখে চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। এই বস্তুবোধে পূর্বকালে ঐশ্বর্যবাদের ভ্রান্ত অঐশ্বর্যবাদেরও বিশেষ চর্চা হইয়াছে। খণ্ডনখণ্ডবাক্যকার অঐশ্বর্যবাদী শ্রীহর বাবুলী, এই মতেও এমন অনেক প্রমাণ চিনিতেছি। বঙ্গের বাহ্যেও ব্রাহ্মণ বুদ্ধকণ্ঠ মীমাংসাবিশিষ্টের ভ্রান্ত বৈদ্যুত সমুদ্রেরও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তিনি মহৎ-সাহিত্যের টীকার প্রারম্ভেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নবযুগের তार्কিক-শিরোমণি রঘুনান শ্রীহরের খণ্ডন খণ্ড-প্রহারে টীকা করিয়া অঐশ্বর্যবাদ বিচার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং উদাহরণার্থে “আত্মতত্ত্ব বিবেক”-এ টীকার শেষে তিনি উপনিষদের শাস্ত্রভাঙাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্গের বঙ্গ্যযুগীয় হরিহর ভট্টাচার্যের পুত্র সার্বভৌম রঘুনন্দন উহার মনসাস তত্ত্বাদি গ্রন্থে শারীরকভাঙ্গাদির সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং “আত্মবিশেষ” তিনি অমৈত-মতভাঙ্গারাই গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্গের বরিশাল জেলার মনুস্মন সর্বস্বতীর অঐশ্বর্যবাদী অঐশ্বর্যবাদের অসুপ্ত গ্রন্থ। দাক্ষিণাত্যে কান্দেবীতীরে “নান্দু-ব-পুত্র” গ্রন্থের রমণী কামাক্ষী দেবীও এই অঐশ্বর্যবাদির বিষয়বস্তুর টিপ্সনী করিয়াছিলেন। উহা এমনও পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে পরবর্ত্তিকালেও বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজে অঐশ্বর্যবাদে সিদ্ধান্তে অভিব্যক্তি ফলে নান্যধর্মের মধ্যেও উহার প্রচার হইয়াছিল। তাই আমরা তৎকালীন অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যেও কোন কোন স্থলে অঐশ্বর্যবাদ সিদ্ধান্তের প্রকাশ দেখিতে পাই। এমন কি উক্তকবি যে রাম-প্রসাদ নীলগঙ্গমুক্তি চান্দেন নাই, তাহার “বল দেখি ভাই কি হয় মলে” এই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থিক গানের মধ্যেও আমরা অঐশ্বর্যবাদ সিদ্ধান্তেরই প্রমাণ প্রকাশ দেখিতে পাই। তাই বসিরাছি, পূর্বকালে বঙ্গদেশেও পণ্ডিত সমাজে অঐশ্বর্যবাদেরও বিশেষখণ্ড চর্চা হইয়াছিল।

আর একটি বাদ আছে, তাহার নাম “অচিন্ত্য ভেদা-ভেদবাদ”। অনেকদিন হইতেই শুনিয়াছি এবং আধুনিক অনেক বাঙ্গালী পুস্তকে এইরূপ কথা পড়িয়াছি যে,

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। কিন্তু প্রভুগণ শ্রীজীব গোষামী যে, তাহার “সর্বসংবাদিনী” গ্রন্থে এক স্থানে লিখিয়াছেন “স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভাবঃ,”—তাহা জগতের উপা-দান কার্য, ঈশ্বর ও তাহার কার্য জগতের স্বতন্ত্র,—জীব ও ঈশ্বরের স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রাধান্য পূর্বক দেখা আব-শ্যক। শ্রীজীব গোষামী যে, এ গ্রন্থে অনেক স্থানেই স্পষ্ট ভাষায় মল্লভাচার্যের মতাহ্বানে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদের সর্বময় করিয়াছেন এবং তাহার “তৎসমকর্তে”র টীকা ও “সিদ্ধান্তরত্ন” গ্রন্থে শ্রীবল্লভের বিভাজন্য মহাশয় যে, আরও স্পষ্ট করিয়া মল্লভাচার্যের মতাহ্বানেই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ-বাদই সিদ্ধান্তরূপে সর্বময় করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও প্রমাণিত পূর্বক দেখা আবশ্যক। বাহ্যাদ জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়বাবিরূপেই অভেদ বসিয়াছেন। উহা কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নহে। আমি এই সম্বন্ধে গত ভাস্কর্যাসের “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় যথামতি যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ধার হইয়াছে কিনা, ইহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া নির্ণয় করা উচিত। কোন প্রবাদ বা সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া দার্শনিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা উচিত নহে।

### দর্শন-শাস্ত্রে স্বাধীনচিন্তা

অনেকদিন হইতেই “স্বাধীনচিন্তা” এই শব্দটি চিনি-তেছি। কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এ শব্দের প্রয়োগ আছে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু “স্বাধীন-চিন্তা” বলিলে এমন আমরা যাহা বুঝি, তাহা কখনও মানবের মুক্তির কারণ হইতে পারে না। মানব অনস-কাল পর্যন্ত স্বাধীনচিন্তার অনন্ত পথে স্বাধীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলে মুক্তির পথ ধরিতে পারে না, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। বৈশেষিক দর্শনকে যটপদার্থতত্ত্বজ্ঞান, অথবা জ্ঞানধর্মবোধক বোধগদপদার্থতত্ত্বজ্ঞান যাহা মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাও কোন স্বাধীনচিন্তা বা কেবল তর্ক বিচারের দ্বারা লাভ করা যায় না। তাহা-তে যোগ্যপাদসির দ্বারা আত্মসংস্কার আবশ্যক, নির্নি-

কল্পক সমাধি আবশ্যক, ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান আবশ্যক। ত্রা-দর্শনের চতুর্থে অধ্যায়ে শেষে মহর্ষি গৌতম নিজেও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতের দার্শনিক রাস্তাে স্বাধীনচিন্তারও কোন দিন অভাব হয় নাই অনেক অংশে স্বাধীনচিন্তার ফলেই স্বপ্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিবিধ বেদবাহু দর্শনেরও উদ্ভব হইয়াছে। মহৎসাহিত্যের শেষে “গা বৈদ্যবাহাঃ স্বতত্ত্বো বাস্তু কাশ্চ কুদুগঃ” (১২১৫) ইত্যাদি শ্লোকে “হুতুগী” শব্দের দ্বারা বেদবাহু নাস্তিক দর্শন শাস্ত্রে আমরা বুঝি এবং উহার দ্বারা স্বপ্রাচীন কালেও যে দর্শন শাস্ত্র অর্থেও “দুগী” শব্দের প্রয়োগ হইত, ইহাও আমরা বুঝি। ত্রাযদর্শনের (৩১১১)—ভাস্ক্রে বাস-ত্ৰায়নও দর্শন শাস্ত্র অর্থে “দুগী” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেক স্থানে তিনি “দর্শন” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া-ছেন। প্রাচীন বৈশেষিকগণের প্রশস্তপত্রাণ্ডে লিখিয়াছেন “জরীশ্রমি বিপরীতেন্দু শাখাদিধর্মশ্চ” (কাশী সংস্করণ ১৭৭ পৃঃ)। এখানে মৈথিলী টীকার উদাহরণার্থে এবং বৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর বাঙ্গালী টীকার শ্রীহরভট্ট উভয়েই “দর্শন” শব্দের দ্বারা শাস্ত্রবিষয়েই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে বাহা হউক স্বপ্রাচীনকাল হইতেই যে, বেদবাহু নাস্তিকের “হুতুগী”রও খট হইয়াছিল, ইহা আমরা মহৎসাহিত্যের পূর্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝি। পরন্তু উপনিষদেরও আমরা “নৈরাশ্র্যবাদ” “স্বভাব বাদ” “কালবাদ” “নিয়তি বাদ” “মুচ্ছাদ বাদ” “স্বচনা দেখিতে পাই। কঠোপনিষদের “অতীতকালে নয়মতীতি চৈকে” (১২২) এই কথা র দ্বারা নৈরাশ্র্য বাদ সূচিত হইয়াছে। খেতাস্বতর উপনি-ষদে “কালঃ স্বভাবো নিয়তির্মুচ্ছাদাঃ” (১২) এবং “স্বভাব-কে কবয়ো বদন্তি কাংস্তু তদাত্তে পরিমুচ্ছাদাঃ” (৬১) এই বাক্যের দ্বারা কালবাদ ও স্বভাববাদ প্রভৃতি নাস্তিক মতের উল্লেখ হইয়াছে। স্বতরাং প্রাচীনকালেও যে এই সমস্ত নাস্তিকমত স্বাধীন চিন্তার দ্বারা বিভিন্ন সমুদায় কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। স্বতন্ত্র সাহিত্যের “স্বভাববীষয়ঃ কালঃ” (শারীর ১১১) ইত্যাদি শ্লোকেও স্বভাববাদ ঈশ্বরবাদ, কালবাদ, মুচ্ছাদবাদ, নিয়তিবাদ ও পরিপন্যবাদের উল্লেখ দেখা যায়। টীকা-কার ভট্টপাণ্ডাও সেখানে এই স্বভাববাদ প্রভৃতিকে আত্ম-

র্ষেদের মত বলিয়া উদাহরণের দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্তই আত্মর্ষেদের মত বিরূপে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। পরন্তু তিনি সেখানে “মুচ্ছাদবাদের” যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও আমরা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমরা “আকস্মিকস্ববাদ”কেই “মুচ্ছাদবাদ” বলিয়া বুঝিয়াছি। “স্বভাববাদে” স্বভাব বলিয়া একটা কিছু কার্য স্বীকৃত হইয়াছে। “আকস্মিকস্ববাদে” কার্যের কোন কারণই স্বীকৃত হয় নাই। কোন মতে কার্যের উপাদান কারণ আছে, কিন্তু নিমিত্ত কারণ নাই, ইহাও এক প্রকার আকস্মিকস্ববাদ। ত্রায দর্শনের (৪১১২২) ভাস্ক্রে বাস-ত্ৰায়ন এইরূপ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। অস্বভাবের বুদ্ধচরিত্রে (নয়ম গর্গে) আকস্মিকস্ববাদের দ্বারা ঈশ্বর-বাদেরও বর্ণনা আছে। ত্রাযদর্শনের (৪১১১০) ভাস্ক্রেবাদের উল্লেখ হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (২০১ অঃ ৫০) টীকার নীলকণ্ঠও পূর্বোক্ত “কালবাদ”, “স্বভাববাদ” প্রভৃতির একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থে জিহ্বাবাদ, অজিহ্বাবাদ, অজ্ঞানবাদ, বৈনিয়তবাদ, উচ্ছ্বেদবাদ, হেতুবাদ, প্রতীত্যসমুৎপত্তিবাদ, স্বকীভা-সমুৎপত্তিবাদ, অসার্বিকসমুৎপত্তিবাদ, প্রভৃতি বহুবাদের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ “ব্রহ্মজাল সূত্রে” ৬২ প্রকার বাদের উল্লেখ আছে। বাসভাস্কর ভাস্ক্রে (৪১১১০) এবং যোগদর্শনের দ্বারা ভাস্ক্রে (১১৫) পূর্বোক্ত উচ্ছ্বেদবাদ ও হেতুবাদের উল্লেখ আছে। বাহুল্যেই এখানে এই সমস্ত বাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। ভাস্কর বৈষ্ণীমাধব বজ্রায় বুদ্ধদেবের পূর্বকালীন অনেক মতের ইতিহাস সন্ধান করিয়াছেন। শুনিয়াছি, জার্মান ভাষায় ভাস্কর অ্যোপেনহার বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক দার্শনিক মত সমূহের ইতিহাসও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা কিরূপে জানিব? এইরূপ এই ভারতবর্ষে যে স্বপ্রাচীনকাল হইতে কত সমুদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদিগের সর্বপ্রকার ইতিহাস আমরা কিরূপে জানিব? শারীরক ভাস্ক্রে (১২৩৭) টীকা-কার শৈব, পাণ্ডপত, কাশিক সিদ্ধান্তী এবং কাপালিক,



এই চতুর্বিধ মাৎস্যের সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। আবার এই হলেই ব্রহ্মচাচারের অসুভাষের টীকাকারে গোষাধী পুরুষাত্মক, “কালামুখ” নামে একপ্রকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ ও তাহারিণির মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহারিণের সমস্ত ইতিহাস কিরূপে জানিব? বহু বিজ্ঞ স্বর্ণপত্র অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্ষীয় উপাঙ্গক সম্প্রদায়ের” ক্ষুদ্র ধর্মশালায় ভারতের অনেক সম্প্রদায় স্থান পান নাই। ইহা কি আমাদিগের বহু ভুলের কারণ নহে?

পূর্বে যে স্বাধীনচিন্তার কথা বলিয়াছি, তাহা ভারতীয় বেদবিশ্বাসী দার্শনিকগণের মধ্যে ছিল। যাহারা এই বেদের রাখে বড় রাজতন্ত্র প্রজা ছিলেন, তাহারাও অনেক স্থলে স্বাধীনচিন্তা দ্বারা বেদের নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াও বেদের সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কুমারিলের “তত্ত্ববাস্তিক” দেখিলে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। “প্রজাপতি নিজ কন্ডায় উপগমন করিয়াছিলেন,” “ইন্দ্র অংলাজার”—ইহাতে দেখা যাইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্ববাস্তিকে কুমারিল বলিয়াছেন যে, “এ “প্রজাপতি” শব্দের অর্থ স্বর্ঘ্য, উৎকাল স্বর্ঘ্যের অত্মারূপ হয়, এজন্ত ঐকালকে তাহার কন্ডারূপে বলিয়া করা ঐ কথা বলা ইহা হইল এবং “ইন্দ্র” শব্দের অর্থ ঐ স্বর্ঘ্য, “অংলা” শব্দের অর্থ রাত্রি, স্বর্ঘ্য রাত্রির ভরণ অর্থাৎ ক্ষয়ের কারণ হওয়ায় ঐ বাহ্যে স্বর্ঘ্যকেই বলা ইহা হইল “অংলাজার”। আপনারা ইহাকে বিজ্ঞা বাখ্যা বলিলেন, তাহা জানি না। এইরূপ পরবর্ত্তিকালে নৈয়ায়িক পণ্ডিতসমাজে আরও স্বাধীনচিন্তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় জ্ঞান দর্শনকার মহর্ষি গৌতমের “দ্যামনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা” (১৩০০) এই সূত্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণের দোষ প্রমাণইয়া বণ্ডন করিয়াছেন, ইহা টীকাকার গণধার ভট্টাচার্য্য অস্বাক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন। আবার রঘুনান শিরোমণি স্বাধীন চিন্তার দ্বারা মহর্ষি গৌতমের মতবিশুদ্ধ অনেক মত সমর্থন করিয়া নূতন গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের নাম “পরার্থকেন্নিকরণ।” আমাদিগের

দেশে বুদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ উহার নাম বলিতেন— শিরোমণির পরার্থকণ্ড। এই রঘুনান শিরোমণি অল্প বয়সেই মিথিলায় জ্ঞানশাস্ত্রে অধ্যয়ন করিতে যাইয়া স্বাধীন চিন্তার দ্বারা মিথিলায় পূর্বপ্রচলিত অনেক মতের খণ্ডন করিয়া তাহার গুরু পঞ্চধর মিশ্রকেও নিরস্ত ও অস্থিরকৃত করিয়াছিলেন। যে সময়ে মিথিলায় ভক্ত কবি বিষ্ণুপতি শ্রীভগবানের নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতেন— “নাতিক ভুয়া পরমেশ্ব”—সেই সময়ে “প্রথমমুখ্য” ও “অমৃতপদম” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটকের প্রণেতা মহাকবি ও অস্থিতীয় নৈয়ায়িক পঞ্চধর মিশ্র (জয়দেব)— “তত্ত্বচিন্তামণি”র “আলোক” নামে টীকা প্রণয়ন করিয়া শত শত বিজ্ঞার্থীকে নিজ গৃহে অন্নদান পূর্বক জ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনান শিরোমণি পঞ্চধরের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও স্বাধীন চিন্তার দ্বারা তাহার মত খণ্ডন পূর্বক নূতন গবেষণার দ্বারা অনেক নূতন মতের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থের “দীপ্তি” নামে টীকা প্রণয়ন করিয়া নবযুগে নবজাতের প্রকাশ করেন। পরে মথুরানন্দ, ভবানন্দ, জগদীশ ও গণধার ভট্টাচার্য্য ঐ দীপ্তির টীকা করিয়া নবযুগে জ্ঞানশাস্ত্রে এক নবযুগ আনয়ন করেন। সেই যুগে তাহারিণের স্বাধীনচিন্তা ও প্রতিভার প্রভাব মিথিলায় পঞ্চধরের প্রকট প্রদীপ আলোক ও নিস্তৃত হইয়া যায়। তখন ইহাতেই বঙ্গদেশ জ্ঞানশাস্ত্রে সমগ্র ভারতের ওকশনে হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রের তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য ও ধৃত হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ এই বঙ্গদেশে নানা স্থানে বহু মহানৈয়ায়িকের উদ্ভব ও জ্ঞানশাস্ত্রে নানা গ্রন্থ-রচনা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কোলকাত্ত সাহেবের বন্ধু শান্তিপুত্রের রাখামোনে গোষাধী ভট্টাচার্য্য দ্বিত ও ত্রায় শাস্ত্রের বহু টীকা করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ শতাব্দীতেও ভারতের অস্থিতীয় নৈয়ায়িক মহাজ্ঞান মহামহোপাধ্যায় পূজাপাদ রাখারাম জায়দত্ত মহাশয় জায়দত্তের “দীপ্তিকল্পনুসংবাদ,” “জগদীশনুসংবাদ” ও “গণধারনুসংবাদ” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া স্বাধীনচিন্তার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অনেক গ্রন্থ ও পুস্তকে পড়িয়াছি যে শ্রীচৈতন্যদেবও জ্ঞানশাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন কিন্তু রঘুনান শিরোমণির প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্ত উদারভাবশতঃ দয়া করিয়া তাহার নিম্নকৃত টীকা একদিন রঘুনান্থের সমক্ষেই গণধার ফেলিয়া দিয়াছিলেন। “অমৃত প্রকাশ” গ্রন্থে বৈষ্ণব ইশান দাসও লিখিয়াছেন— “সেই ক্ষণে রঘুনান্থির মধ্য উপজিল। নিম্নকৃত টীকা গণধারকে ভারি দিল।” কিন্তু অমৃত-প্রকাশে ঐ ঘটনায় রঘুনান্থের নামের কোনই উল্লেখ নাই। তবে যদি কোন কড়ায় রঘুনান্থের নাম করিয়াই ইরূপ ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব উহা গোবিন্দদাসের কড়ায় জায় অপ্রমাণ। কারণ আমরা বুঝিয়াছি, পঞ্চধর মিশ্র ও তাহার শিষ্য রঘুনান ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্ত্তী এবং নবযুগের নৈয়ায়িক বাহুবধে সার্বভৌম হইতে পুরীধামের সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভিন্ন ব্যক্তি। বাহ্য ভয়ে এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে আমি আপনাদের নিকটে জ্ঞানার বহুদিনের আকাজিক একট প্রস্তাব জানাইতেছি যে,—আমাদিগের মাতৃভাষায় ভারতীয় ও বিদেশীয় সমস্ত দার্শনিক মত ও সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস সকল করিয়া এক বৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদনের ব্যস্থা করা হউক। ঐ গ্রন্থে “বিশ্বকোষের” জ্ঞান আকারমুখে সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায় ও তাহারিণের সমস্ত মতের নাম উল্লেখ করিয়া উহার ইতিহাস ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি লিখিতে হইবে। এবং একটা বৃহৎ স্টী এমদ ভাবে প্রস্তুত করিয়া ঐ বৃহৎ গ্রন্থের প্রথমে পরিবেশিত করিতে হইবে যে, উহার সাহায্যে—যাহার যেটুকু জানা প্রয়োজন, তিনি সহজে তাহা জানিয়া লইতে পারিবেন। যাহাদিগের নানা ভাষা জানিবার উপায় নাই এবং নানা গ্রন্থ পড়িবার অযোগ্য ও সামর্থ্য নাই, তাহারা ঐ গ্রন্থের সাহায্যে সকল মতই জানিতে পারিবেন। যাহারা সকল মতের তুলনামূলক সমালোচনা

করিতে চাহেন, তাহারা ঐ গ্রন্থের সাহায্যে তাহা করিতে পারিবেন। যাহারা নানা মত জানিয়া সম্পন্নগ্রহ হইবেন, তাহারা যদি ঐ গ্রন্থের ফলে জিজ্ঞাসা লাভ করেন, তাহা হইলে কালে জ্ঞানলাভও করিতে পারেন। কারণ, জিজ্ঞাসা মানবের জ্ঞানলাভের মূল। যে মানবের জিজ্ঞাসা হয় না, তিনি জ্ঞান-রাবোজের ঘর ঘুরে আছেন। জিজ্ঞাসা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম সোপান। হুতরাং যে সংশয়ের ফলে মানবের জিজ্ঞাসা জন্মে, তাহা তত্ত্বনির্দেশের প্রথম সোপান। প্রত্যর্থাতি গ্রন্থ সম্পাদনের জন্ত দেখানো যে সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাহারিণের সাহায্য লইতে হইবে। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, তাহাকে সেই বিষয়ে লিখিবার ভার দিতে হইবে। আমি এই কার্যের জন্ত অনেক হযোগ্য দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, তাহারা উৎসাহ পাইলে সকলেই বিশেষ পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন। যদিও এই কার্য বহু ধনজনসাধ্য, তথাপি চেষ্টা করিলে এখনও উহা আমি অসম্ভব মনে করি না। আর যদি আমরা এইরূপ কার্যের জন্ত একটা চেষ্টাও না করি, তাহা হইলে আমাদিগের মাতৃভাষার এই ব্যতিক পূজার বড় অঙ্গহানি হইবে। মাতৃভাষার চির সাধক অনেক হুশিক্ষিত বিভোক্তসাহাী মহাজ্ঞান ব্যক্তি নিঃস্বার্থ সাধনার ফলে মাতৃভাষার দ্বারে যে মলমল অশ্রয়বটের এবং পরে তাহার চারিদিক মহা-শাখারও উদ্ভব হইয়াছে, ঐ চারিদিক মহাশাখা তুলনাতবে সর্বগোচর ফলবর্তী না হইলে আমাদিগের আশা ফলবর্তী হইবে না। আমাদিগের এই সম্মিলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শিষ্টভাবনের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া এই মলমলস্থানে প্রাণপণে প্রস্তুত হই। তিনি চিরদিনই আমাদিগের সর্ব কার্যে সহায় আছেন। তিনি চিরদিনই মঙ্গলময় ও করুণাময়। আমরা সাধনার দ্বারা তাহার করুণালাভ করিতে পারিলে ষড়ধর্মেও তাহার দর্শন পাইব।





শ্রীকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### উন্মত্তা

“মহুয়া ?”  
“কেন দাছ ?”  
“তুই আজ কোথায় গিয়েছিলি ? আমি এগে তোকে ত দেখতে পাইনি ?”

“দাছ আজকাল দেখছি তোমার কোন কথা মনে থাকে না। সকালে তোমাকে না বললাম, প্রবেশধারুর মা আমাকে নেমন্ত্রণ করেছেন। সেখানে যাব কি না, জিজ্ঞাসা করলাম ? কত কথা তোমার সকে হ'ল। তুমি বললে, ভরসার কথা করে তোকে নেমন্ত্রণ করেছেন, যাবি বৈকি। না গেলে তাদের অপমান করা হয়। “এমন সব কুসে গেলে ? কেন দাছ আজকাল তোমার এমন হয়েছে ?”

সমীর কিছুক্ষণ আর কোন প্রশ্ন করিল না। সে একমনে হৃদয় পর্গতের মাথার উপর যে কাল মেঘ জমিতে ছিল, সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। মেঘের পর মেঘ আসিয়া মত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অন্তরাকাশে তেমনি চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহা ভাবজাল করিয়া তুলিতেছিল। সমীর এতদিন ধরিয়া মনে মনে মহুয়া সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, যত্নের তার বুদ্ধি ও বিবে-

চনায় ক্লান্ত তাহা দিয়া দে, দেখকা ভাবিয়াছে। একটা পরিষ্কার নিশ্চিষ্ট পথে, দ্বারীতপ্পর আশ্রয়ে, মহুয়াকে তুলিয়া দিবার মত দীর্ঘাংখ্য তখনও সে উপনীত হইতে পারে নাই। এই নিরাশ্রয় যক্ষরী যুবতিকে লইয়া এখন সে কি করিবে ? কোথায় রাখিবে ? সে মনে মনে ভাবিল আমি ত আর তিরদিন বাঁচিয়া থাকিব না যে মহুয়াকে এমনভাবে আশ্রয়িয়া বসিয়া থাকিব ? না বুঝিয়া না ভাবিয়া কাজ করিলে, সেই কাজই যে তাহার কষ্টের বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আজ বেশ স্পষ্ট করিয়া অহুভব করিতেছি। এখন কি করা যায় ? কোন বেদের সকে কি মহুয়ার বিবাহ দিয়া নিশ্চিষ্ট হইব ? অকস্মাৎ সমীরের অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন সাড়া দিয়া উঠিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন ধরিয়া এমনভাবে বাহাকে দেখে, মমতা, ভালবাসা, গিরে ঢাকিয়া রাখিয়া আসিয়াছ, আজ কি তাহাকে একজন অশিক্ষিত বেদের হাতে তুলিয়া দিয়া গতা সত্যই তোমার অন্তরের দেবতা পরিত্যক্ত হইবে ? মহুয়া নিজের বিষয় অবগত না থাকিলেও তুমি ত তার সব ইতিহাস জান ? জানিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি এতদূর আশ্রয় করিবে ? যদি সত্যই তাহাকে ভালবাস তাহা হইলে যাহাতে সে তার বেদে জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তার সত্যকার

জীবন যাত্রার পথে কিরিয়া যাইতে পারে তার ব্যবস্থা কর না ? এবার সমীরের মনে পড়িল, তার নিজের সত্যকার অতীত জীবনের কথা। যেদিন সে প্রথম জানিতে পারিয়াছিল যে, সে জন্মগত বেদে নয়—সেদিন তার অন্তরটা বহুদিনের বেদে জীবনের অভাঙ্গ, সংস্কার কি দ্বারা দৃষ্টিতে না দেখিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তই তার মনে হইয়াছিল, আজই সে তার জন্মগত ও বংশগত অধিকারের দাবী নিয়ে কিরিয়া যাইবে এবং সারা বেদে জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। তার প্রথম ও প্রধান কাজ হইবে তার প্রতি অত্যাচারিত অত্যাচারের প্রতিবিধান করা। তার অন্তরের দেবতা যখন এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কিন্তু সমীর ভাবিয়া দেখিয়াছিল এই অভিধান করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে এতদিন পরে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজ যদি সে সমাজের দ্বারের গিয়া তার সমস্ত কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান প্রত্যাখ্যা করে তখন যে তাহাকে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিতে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমাজ কি অগ্রগ্রহ করিয়া তাহার অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা করিতে রাজি হইবে ? বরং একটা নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা তা'কে জঙ্ঘরিত করিয়া তুলিবে ? এমনই কত কথাই সমীরের মনে মহুয়া সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিল। আজ যদি সে মহুয়াকে তাহার আত্মীয় স্বজনদের নিকট লইয়া গিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে মহুয়া যে আত্মও কীমতি আছে জানিয়া তাহার আনন্ডিত হইবার পরিবর্তে দুঃখিত হইবে এবং মহুয়ার এইরূপ বাঁচিয়া থাকাই যে তাহাদের সমাজের, বংশের আশ্রয় ও অত্যন্ত অপমানজনক একথা মনে করিয়া তাহাকে আশ্রয় করা ত দুয়ের কথা, বরং অবজ্ঞার মুখ ফিরাইতে কিছুমাত্র বিধা বোধ করিবে না। এতদিন ধরিয়া বাহাকে অপাপবিশ্ব, বৈদ্য মত খ্রীতি-সেহে পূজা করিয়া আসিয়াছি, সে বৈদ্য প্রতিমা কাহার দ্বারাও বিস্ময় দিয়া আসিয়া ? “না, না, তা আমি প্রাণ থাকিতে পারিব না।” বলিয়া সে আপনাপনি কোন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই যোগে তাহার ভিতর হইতে তাহার বেদে জীবনটা যেন আর্দ্রনাভ করিয়া বলিয়া উঠিল এতদিন ধরিয়া

সময়ে, গৌরবে যে জাতির উপর আধিপত্য করিয়া আসিলে, যাহার নিকট তোমার দীর্ঘ জীবনের সমস্তদিন কাটাইলে, তাহাকে অনায়াসে ছিন্নবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইলে তোমার কি কর্তব্য করা হইবে ? যে বেদে জাতি মত্তক নত করিয়া তাহাদের সকল শক্তি, ঐশ্বর্য অশ্রুতি অস্ত্রের তোমার চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছে, আজ একটা অপত্যসেহের দাবীর নিকট অকৃতজ্ঞের মত আত্ম-সমর্পণ করিবে ?

এবার সমীরের মুক্বে বেদে জীবনটা চারিদিক দিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর সমস্ত সন্মান, সকল সৌভাগ্য সে তার বেদে জীবনের মধ্যেই দেখিতে পাইল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমীরকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মহুয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দাছ তুই চুপ করে রইলি যে ? তোর কথা বুঝি না বুঝি গেলিছ ?”  
“তুমিনি। ভাবছিছ একটা কথা।”

“কি ভাবছিলি দাছ ? তুই কেন ভাবিস বল ত ? আমরা বেদে আমাদের আবার ভাবনা কিসের ?”

“আমি ত ভাবতে চাই না মহুয়া,—ভাবনা তোরের মত, করণ যে মনের ঘরে ঢুকে বসে থাকে তা ধরতে পারি না। তাকে তাকি দিয়ে দিতে যাই, সে ততই জোর করে বেড়ে উঠে।”

“আজ্ঞা তোর যত সব ভাবনা আছে আজ থেকে সব আমাকে দেখ না, দেখি তাহা কেনন করে আমাকে পেরে উঠে ?”

সমীর এবার আর হাসি সঞ্চয় করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত রেহুস্তের মহুয়ার হাত ধরিয়া বলিল, “এত ভার কি তুই বহিতে পারবি ? যতদিন আমি আছি, তোর দাছর বুড়া হাড় গুড়িয়ে না যাচ্ছে, ততদিন তোর কোন ভাবনা নাই মহুয়া।”

মহুয়া উত্তর করিল “ওই ত তোর দোষ।”

এবার সমীর কথার দ্রোত অন্তরিকে ফিরাইয়া দিবার জ্ঞান বলিল “হ্যারে তোকে তাঁরা বেশ যত্ন করে ত ? না, কি চাকরের মত আলাদা খেতে দিচ্ছেন ? ছোট



ভাত মনে করে ঘুরে বসিয়েছিল?" বলিয়া সমীর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহুয়ার মুখের প্রতি চাহিল।

একবার মহুয়ার মুখানি লাল হইয়া উঠিল। তারপর সে নিজেই সামশাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "তুই কি বলছিলি দাদু। তারা অত্যন্ত ভাল লোক। প্রবোধবাবুর মা, ঠিক মনে নিজের তথ্যের মত আমাকে দেখেন। সামান্ত দিনের পরিচয়, তথাপি মনে মনে হয় কত দিনের পরিচিত আপনায় জন। তিনি যেমন সহজে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হন না, আমারও তাকে ছেড়ে আসতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় আনন্দ হয়।"

সমীর বলিল "তাই নাকি। তিনি তোকে এত ভালবাসেন?"

এবার করুণাময়ীর হেঁধের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া পুলকানন্দ মহুয়ার বড় ভদ্র টানা কালো চক্কের কোণে ছুই বিস্মৃত মত অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। ওঁহা সমীরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মহুয়া বলিল, "দাদু প্রবোধবাবুর বাবাও হুম্বর লোক। একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তুমি কুলতে পারবে না।"

সমীর অত্যন্ত বিশ্ব প্রকাশ করিয়া উত্তর করিল, "বটে। তারা তাহ'লে তোকে কোথায় খেতে দিয়েছিল?"

মহুয়া বলিল, "কেন লজিকাও আমি এক আশ্রয়স্থল বসে থেকেছি। কোনপ্রকার পার্থক্য করে নাই। লজিকার মত মেয়ে দেখা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি সেখানে আমি যতক্ষণ থাকি তারা কিছুতেই আমাকে মনে করবার কোন অবকাশ দেয় না যে, আমি বেদের মেয়ে, তাদের একজাত নই।"

সমীর এবার উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোন কথা তুই কোনদিন গোপন করিসনি, আচ্ছো কর্বি না, তা জানি—সত্যি তারা তোকে কোন বিকল্পে মনে করতে দেয় না যে তুই বেদের মেয়ে।"

"দাদু তুই কেন বিমিশ্র হচ্ছিস? আমার যা পারি না, তা যে আর কেউ পারবে না, এত কোন মুক্তিও কথা নয়।"

আমি যদি তাদের ব্যবহারে, যত্নে, স্নেহে কুলে না যেতাম, তাহ'লে কোন সাহসে, আমি লজিকার সঙ্গে একসাথে খেতে সাহস পেতাম?"

এবার সমীর মনে মনে চিন্তা করিল তাহ'লে করুণাময়ী ত খুব উদার। এঁদের কাছে যাইয়া যদি সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলি, তাহা হইলে কি মহুয়ার একটা উপকার হয় না? আমার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, মহুয়ার উপর দিয়া কেন আমি সে প্রতিশোধ লইব? তারপর সমীর জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা মহুয়া, তুই ত বলেছিস বিয়ে করবি না কেন? যাক সে কথা। এখন বল দেখি তোর বেদে জীবন ভাল লাগে না, বাঙ্গালীর জীবন ভাল লাগে?"

মহুয়া সমীরের মুখের প্রতি চাহিয়া একবার দেবিল। কোন উত্তর করিল না।

সমীর সে কথা আর তুলিল না। বলিল, "হ্যাঁরে মহুয়া, তুই নেমতন্নয় যাবার সময় একটা খুব হুম্বর পুত্র এনেছিস, সেটা কৈ দেখতে পারছি না?"

মহুয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তুমি সেটা দাওয়ার উপর রেখে যেমন চলে গেলে, আমাকে ভাবতে প্রবোধবাবুও এলেন কিনা—"

মহুয়ার কথা বোঝা গিয়া সমীর উত্তর করিল, "বুঝ্ছি। সে পদ্মটা কি হুম্বর! সহজে বড় একটা অবতক পুত্র দেবতে পাওয়া যায় না। দেবসেই সবাই নিতে ইচ্ছা করে। বেদের ঘরে সে পদ্মের কোন যোগজন নেই। ঠিক লোকের হাতে ফেঁদে। স্বর্গের ফুল মাটিতে গড়াগড়ি যাবে এটা আমারও ত ইচ্ছা নয়।"

একথা বলিবার পূর্ব মহুয়া যেন কেমন একটুখানি গভীর হইয়া পড়িল। সমীর মনে মনে ভাবিল—নিশ্চয় পদ্য সে ভুলেছে। তা' হ'লে হলো। আর দেখতে হবে না?

সমীরের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া সে মনে মনে খোঁচা আনন্দ অতীব করিল। পাছে একথা কোন দিক হইতে কথায় কথায় বাহির হইয়া পড়ে। পাছে মহুয়া তার ভাবান্তর অবলোকন করিয়া তাহাকে সন্দেহ

করে এই আশঙ্কায় সমীর বলিল "মহুয়া আমার একটু কাছ আছে। আসতে সন্ধ্যা হ'তে পারে। তুমি যেন ভাবিও না।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। মহুয়া দেখিল সে চেষ্টানের দিকে যাইতেছে।

অকস্মাৎ তার দাদুর এই ভাব বিপর্যয় দেখিয়া তাহার মনে নানা কথার উদয় হইতে লাগিল। সে আকাশ পাতাল কত কথাই চিন্তা করিলে। তার মনে হইল করুণাময়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহুয়া তুমি আমাদের সঙ্গে কলিকাতা যাবে। সেখানে তোমাকে অনেক জিনিষ দেখাব।" আমি কিন্তু তার স্নেহে আশ্বাসের কোন জবাব দিতে পারি নাই। তিনি বলেছিলেন

দাদুকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে দাদুকে ত সে কথাটা বলা হয় নাই। তারপর নিজে নিজে বলিল, "আমার কিন্তু যেতে খুব ইচ্ছা করে। আচ্ছা কেন ইচ্ছা করে? কে জানে? দাদুকে বলে যাবে? দাদু যদি আগন্তি করে। তখন দেখা যাবে। এই সময় উদ্দেশ্য ও অবনো আশিয়া বলিল, "মহুয়া তোমাকে একটি আমাদের বাড়ী যেতে হবে প্রবোধের অত্যন্ত অস্থব। তার জীবনের আশা একদম নাই।" মহুয়া কিংকর্ষণবিমূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কি হয়েছে?

(ক্রমশঃ)

## বাসন্তী গান

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১  
রূপকথা যে শুনেতে এলেন, ওরে অশোক, তোদের কাছে,  
সেই শুলকে কাণ্ডন-হাওয়া ফুলন খেলে রঙন-পাছে!

এসিছি আজ রঙের পুরে,  
কিশোর কিশলয়ের হরে,  
কানন-ভরা রঙের ভাষা আমার প্রাণে লুকিয়ে আছে।  
শোঁ করবি, শিখি'য় পলাস, ফুলাল-টাপা, ফুমকো-লতা!

বলবি কি ভাই, কাণে কাণে মূবনের মনের কথা?  
বাজে শুনি মউল বনে  
ফুলের বাঁশি কণে কণে  
কমলাফুলি যং মেখে তাই 'কুহর' তালে মন যে নাচে!

২  
সাদ ক'রে আজ পথ ফুলে ভাই,  
অক্লি, আমি ফুলন-ধারে,  
সবুজ পাতার ডাক শুনেচি,  
থাকতে ঘুরে পারব না রে!

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো!  
তোমার প্রেমের কিরণ ঢালা,—  
ময়ন-তরী বাহু ভেসে যাহ  
নীলাকাশের পারাবারে।

আমার বিভোল চিত্ত-মাছে  
নাচের নুপুর নিত্য বাজে,—  
সেই তাতেতে বিশ্ব-বীণা,  
শুনব আমি বাজবে কিনা,  
ফুটিয়ে তুলে হাসির মত  
ফুলের কুঁড়ি ভায়ে ভায়ে!

৩  
হৃদয়ে আজ দোল দিলে রে,  
সেই দোলেতে তুবন দোলে, দোহুল দোলে,  
বনের পাতায় দুলচে শ্রামল,  
মধুরিত হরের দোলে, দোহুল দোলে!

দুলচে মেয়ে তারার হাসি,  
আলোর কুঁড়ি রাশি রাশি,  
মাথরা ঐ ঢুলিয়ে দোলে!  
মিলন-পুলক আগিয়ে তোলে, দোহুল দোলে!  
রঙন-ফুলের রাজা দোলায় দুলছে ভ্রমর, দুলচে আলি,  
মানস-সরোবরের জলে দুলচে ভাবের কমল-কলি!  
বিশ্ব-দোলার দুলকি-তানে,  
যৌবনের বিজ্ঞ-গানে,  
তাইবো মনে বাউল হয়ে  
জীবন আমার মরণ তোলে, দোহুল দোলে!





## পঞ্চপ্রদীপ

শ্রীঅশেষচন্দ্র বহু বি, এ,

১। পতঙ্গ

পতঙ্গ জীবন পর্য্যায়চক্র করে একটা বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে প্রাণিতত্ত্বেরো Metamorphoses বলেন। পতঙ্গের অণু হইতে প্রথমে কীটাকার প্রাণী নির্গত হয়। তাহাকে পতঙ্গবিদেরা Larva, grub বা caterpillar বলেন। ঐ কীটাকার জীবের বুদ্ধি অতীব প্রবল। কিংবদন্তি পর্য্যন্ত ভোজনের পর ও ক্রমাগতই তিনবার স্বপ্ন মোচনের পর ঐ কীট এক কোষ নির্মাণ করিয়া আপনাকে তত্ত্বয়ে বদ্ধ করিয়া ফেলে। ঐ কোষকে Cocoon এবং ঐ অবস্থায় পতঙ্গকে Chrysalis, pupa বা nymph কহে। এইরূপে নিচল মৃতপ্রায় ভাবে কিছুকাল থাকার পরে কোষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ণাবয়ব পতঙ্গ আকাশে উড়ান হইতে থাকে। পতঙ্গ জীবনের এই অন্ত্য্যবস্থা ঘটনার সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ আছে। সমসার-বিরাগী যখন মায়া মোহযত্ন, আশা-কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে বীতরাগ হইয়া পড়ে তখন তাহার ভাব অননিশ্চয় Caterpillar-এর মত। তখন সে প্রবর্তক। প্রবর্তকের এই অবস্থায় সংকথন, সরালাপ, সাদাচার ও সংগ্রহপাঠে Caterpillar-এর বুদ্ধির মত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পরে যথেষ্ট বৃত্তিবুদ্ধির সহিত সাধনেচ্ছা প্রবল হয় ও প্রবর্তক তখন সাধকরূপে আত্মস্ব বা বোগাবস্থায় নিমগ্ন হইয়া পড়েন। ঐ ধ্যানমগ্ন অবস্থাই Cocoon-এর মধ্যে Chrysalis stage-এর মত। পরে আত্মদর্শন বা ইষ্টলাভ ঘটিলে যোগী সিদ্ধ হইয়া দেহাশ্র-বোধের কোষ হইতে মুক্ত হইয়া পড়েন ও তখন সত্যের আলোকে অনন্ত ব্যোমে বিচরণ করিয়া সজ্ঞানে সর্বদা কৃমা মধ্যোই স্থিতি করিতে থাকেন।

২। অর্থ

স্বপ্নের শিবের বিস্তরশক্তি। ব্রহ্মার বরে তিনি চতুর্ধ লোকপাল, উত্তর দিকের অধিপতি ও যক্ষরাজ। কিন্তু

তিনি অতি ধন্যকার। তাহার তিনটা পা ও আটটা দাঁত। পুরাণ বিবৃত এই রূপের তাৎপর্য্য আছে। ইহার অর্থ এই যে, অর্থ মোহ জন্মাইয়া, মানবকে দয়া ধর্ম সন্তোষাদি হইতে বঞ্চিত করে ও কুংসিত করিয়া দেয়। অন্ধার আসিয়া ব্যাঘ্রার পাদফোটন করিতে থাকে। এই ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ স্বেপনের অচ্ছন্ন মায়াধানের ব্য-হায়ে লক্ষিত হইয়াছে। মায়াধান যহদি অশান্তের মস্তকে নিগ্ধবন ত্যাগ করিয়াছিল। অষ্ট হস্তের অর্থে বোধ হয় যখন অষ্টবর্গ লাভ সম্ভব হইলেও বহুতীর সংবৃত্তি অষ্টশক্তির অপ্রত্যাহারে অষ্টভাগে অন্তর হইতে-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ধনীর পার্শ্বদগণও যক্ষ ও কিম্বদন্তির মত কদাচারী ও কুংসিত ভাবাপন্ন। ত্রিবিদ্যার রাজা Midas-এর গল্পও অর্থের কিংবদন্তি রূপে আছে। Midas দেবতাধিপত্যে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করেন যে তাহার স্পর্শে যেন স্পষ্ট বস্তু স্বর্ণ হইয়া যায়। দেবতার বর লাভ করিয়া স্পর্শ মাত্রই তিনি জুড়ি জুড়ি স্বর্ণলাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পান ভোজন করিতে যাইলে পয় ও জোতা বস্ত্র স্বর্ণ হইয়া গেল। দিনের পর দিন তাহাকে উপ-বাসী থাকিতে হইল। শেষে অগত্যা দেবতাধিপত্যে বর প্রত্যাগ্রহণ করিতে অস্বরণে করিলেন। ইহাতে অর্থের অনর্থকারিতা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাহার ধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল সে কার্পণ্য বশতঃ পান ভোজন করিতেও পরামুখ হইয়া পড়ে। ইচ্ছামত থাইতে পরিত পারেন না। কোন বস্তু উপভোগের আকাঙ্ক্ষা হইলেই স্বপ্নের চিন্তা (অর্থবোধ) মুগ্ধ পরিগ্রহণ করিয়া অন্তরে পরিমুগ্ধ হয়। তখন আত্মমানি আসিয়া থাকে। Midas-এর গন্ধিত কর্ণের অর্থে আমার মনে হয় যে ধনীরা স্বভা-বতই শ্রম বিমুখ বলিয়া স্বর্ণ ও কলাবিজ্ঞা বিবঞ্চিত হয়। তাহারো জ্ঞান সৃষ্টির বিচারে দিব্যজ্ঞানরূপ Apollo-কে পরাজিত করিয়া অছপদন্ত Pan-এর কণ্ঠেই অমর্য্য অর্পণ করে।

শ্রীতারি বর্ষ, ৩৫শ মধ্যা [

অধ্য

১৮১

৩। আস্ত বাহি

সোরা গন্ধক ও অন্ধারের পরিমাণাভ্যাসী সম্মিশ্রণে যেমন হুম্মর আস্ত বাজি তৈয়ারি হয় তেমনিই স্বপ্ন, রক্ত ও তমোগুণের বিভাগাভ্যাসের মহাপুরুষের স্বপ্ন হইয়া থাকে। শুষ্ক সোরা গন্ধক বা কয়লায় আস্ত বাজির নীপক ভাব বা অস্ত কোনও গুণ বর্ধমান থাকে না। সেইরূপ কেবল স্বপ্ন, রক্ত বা তমোগুণে কোনও বিশেষ মহাভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে না। শুষ্ক স্বপ্নগুণ নিষ্ক্রিয়ের মত; যেমন সোরা। তাহাতে অপর ছুইগুণ আংশিক ভাবে যুক্ত না হইলে ক্রিয়াশক্তি বর্ধাইতে পারে না। আবার শুষ্ক তমোগুণ অন্ধারের মত। তাহাতে অপর ছুইগুণের মিলন হইলে জীব উত্থান শক্তি জন্মিয়া থাকে।

৪। বামন

পর্বে বামন দেখিয়াছিলাম। বয়স তাহার অধিক কিন্তু দেখিতে ঠিক বালকের মত। সমস্ত অবয়ব ক্ষুদ্র। যখনই সহিত দেখের বুদ্ধিলাভ হয় নাই। সে সকলের মননপথবর্তী হইয়া কীতুহেলগুণিত করিতেছিল এবং সকলে তাহার মধ্য হস্তস্পর্শ উপভোগ করিতেছিল। প্রকৃতির এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ভাবিলাম আমাদের মধ্যে বামন অনেকই আছেন। তাহাদের দেহের অল্পাংশে বুদ্ধির পোষণ হয় নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানলাভ ঘটে নাই। তাহারো বয়সে প্রাচীন কিন্তু বুদ্ধিতে চির-নবীন। সত্যক অস্বপ্নীনের অভাবে তাহা ধর্ম্মাকার বাম-

নের মত। এইরূপ বুদ্ধিতে বামনের সংখ্যা মানবসমাজে অল্প নহে। নারায়ণ বামন অবতারে দৈত্যরাজ বলিরই বামনত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। বিশ্লেষকব্রী হইয়াও বিরোচন পুত্র অন্ধার জয় করিতে পারেন নাই। তিনি দান শৌণ্ডের প্রশংসা দেখাইতে গিয়া ভগবানের নিকট বামন হইয়া গেলেন।

৫। অন্ধ

একবার একটা অন্ধ বালককে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া-ছিলাম। তাহার সকল অঙ্গই নিদোষী বিধাতা কেবল তাহাকে দৃষ্টিহীন করিয়াছেন। দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট অহু-ভব করিলাম। পরাশ্রিত, পরোপজীবী, পরপাল্য; সকল বিষয়েই তাহাকে অপরের করুণার উত্তর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা মাঝেই বুলিলাম আমিও অন্ধ; আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেকেরই অন্ধ। আমাদের দৃষ্টি তো ভবিষ্যৎ ভেদ করে না। তাহা তো ইহলোকাশ্র-গামী নয়। পরজগতের সীমার সে দৃষ্টি শৌণ্ডার না। আমাদের মনশ্চক্ষু নাই; আমরা অন্ধদৃষ্টি বিহীন। বার্ষ ও সর্গীণতার আয়রণে তাহা ক্ষুদ্র। ভোগ বাসনার ধূলিকণায় অন্ধ হইয়া আমরা দৃঢ়দৃষ্টি হারাইয়াছি। পর-লৌকিক বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য আদৌ নাই। ইহলোকে কোন প্রকারে জীবন যাত্রা হ্রস্পশ্য হইলেই হইল। আমরা জন্মের অন্ধ, বুদ্ধিতে ধর্ম্ম, বিবেকে ধর্ম্ম ও মনো-বুদ্ধিতে ধর্ম্ম। সামান্য পার্শ্ব স্বপ্নের জড় বাহার্য্য পর-মার্ধকে হারাইয়া ফেলেন তাহারো কি অন্ধ নয়?

অধ্য

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

বেদনাবিক্রি আলায়ে প্রস্তু হে

সকলি করেছ ছাই,

কি দিয়া তোমার অর্থ্য সাধার

ভাবিয়া কিছু না পাই।

এমন আখ্যাত হেনেছ,

অশ্রু টানিয়া এনেছ,

তুমি চাচি সে আশি জন দিয়া

অর্থ্য রচিছ তাই।

প্রভু! আশি আর কিছু নাই।





## চোড়ের চোড়

আমরা আমাদের গ্রাহক অগ্রগ্রাহক পাঠক ও লেখক-বর্গকে ধার্য্যাদি নব বর্ণের অভিব্যক্তি জানাইয়া নব বর্ণের কৰ্মক্ষেত্রে দূরদূর করিলাম। আমাদের যে সকল অনিচ্ছাকৃত দোষ ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে উহার ক্ষম্য দেশবাসিগণের নিকট উজ্জ্বল আমরা মাঞ্জনা প্রার্থী। ধার্য্যাদি নিঃস্বার্থভাবে রচনা-দানে নববর্ণের সাহিত্য-গৌরব বর্ধিত করিয়াছেন—নববর্ণকে এই স্বল্প কালের মধ্যে অসম সাধারণ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন তাঁহারের নিকট এই অবকাশে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন আমরা ১১ সংখ্যা “সুগন্ধের” আবির্ভাব দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। ইহার সম্পাদক শিরাম চক্রবর্তী মহাশয়ের সতিত নববর্ণের পাঠকবর্গের বহুবার আলাপ হইয়াছে। এবার তাঁহার উত্তম সফল ও সার্বক হইয়া কাগজখানি স্থায়ী লাভ করিলেই আমরা সত্যই সন্তোষানন্দ করিব।

এই বৎসরের বৈশাখ হইতে ‘কালি-কলম’ নামে একখানি মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রতি সংখ্যাতেই অনেকগুলি সুন্দর কবিতা, কবিতা, উপদ্রাঙ্গ ও সাহিত্য-প্রঙ্গণ থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ শৈলজানক মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু ইহার সম্পাদক। হাবিধ্যাত পুস্তক প্রকাশক বরদা এজেন্সীর শ্রীকৃষ্ণ শিশিরকুমার নিয়োগী ইহার কৰ্ম-সচিব। কাগজখানির বার্ষিক মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

স্বযোগ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষী রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়কে আশ্রিত মাস ছুটি লইতে হইল। এই ছুটি লগ্নয়া ব্যাপারেও অন্তরালে যে সকল কারণ আছে তাহা

সাধারণে স্পষ্ট না জানিলেও অহমান করিতে সক্ষম। স্পষ্টতই যে বিরাট দাঙ্গাধাঙ্গা হইয়াছিল তাহার প্রশমন করিলে তিনি যে বিগত কয়েকদিন অনাহারে, অনিদ্রায় জীবন তুচ্ছ করিয়া দাঙ্গার মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ রত্ন কলিকাতার উত্তর বিভাগের শান্তি রক্ষার ভার তাঁহার হস্ত হইতে ছাড়িয়া একজন খেতাবকে দেওয়া হইয়াছে। বোমার যুগে লাহিড়ী মহাশয় স্বভাবের মূখ না চাহিয়া যে গভীর রাজভক্তি দেখাইয়াছিলেন সেই রায়বাহাদুর আশ্রিত প্রকারান্তরে অকর্ম্মণ্য বিবেচিত হইলেন ইহার ভিতরও যে সাম্প্রদায়িক প্রভাব আছে তাহা কি লোকে বুঝিতে পারিবে না। আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের অবস্থা বিপর্য্যয়ে সত্যই দুঃখিত। কথা আছে “বড়র পীরীতি বানির ঝাঁপ, কণে হাতে ধড়ি, কণে ঘেঁ চান” কথাটা যে পাকা তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

ভারতের শাসনবর্গ গ্রহণ কালে ভারতবর্ষীয় মহাত্মা স্বর্গীয় সামাজ্য ভিক্টোরিয়া যে ভারতবাসী স্বর্ধসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আমলাবর্গ নানা অজুহাতে বহুবার আঘাত দিয়াছেন—কিন্তু স্পষ্টতই পুলিশকমিশনার বাগদুহ চক্র পূজার রাজনা বন্ধ করিয়া, জেলোপাড়া সং বাহির হইতে নিষেধ করিয়া ও শিবিরগণকে তাহাদের স্বর্ধ সম্বন্ধীয় শোভা-যাত্রা স্থগিত রাখিতে অশেষ করিয়া, এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিবাসে সে গভীর আঘাত করিয়াছেন তাহার আর তুলনা নাই। তাঁহার এই একদেশদর্শী আদেশের ফলে প্রকারান্তরে মুসলমানগণকে কি অথবা প্রঙ্গণ দেওয়া হইল না? যাহারা অস্বাভাবিক প্রথমে শান্তি ভঙ্গ করিল তাহা-লগ্নিকে গুলী রাখিবার জন্ত হিন্দু, শিখ প্রভৃতির ধর্মে

হস্তক্ষেপ করা কি অশোভন নহে? মোহরমের শোভা-যাত্রার সন্ধ্যা একটা আদেশ দিবার সাংস তাঁহার হইত কি না জানি না—তবে তিনি জানেন যে হিন্দুরা নিরীহ শান্তিপ্রিয়, তাই তাহাদের সন্ধ্যা একত্র পক্ষ-পাতিত্বপূর্ণ আদেশ দিতে সাহসী হইয়াছেন। মুসলমান-দের মনস্তত্ত্ব করিতে তিনি যে তৎপর তাহার কারণ— তাহারা উদ্ভত, দাঙ্গাবাজ বলিয়া কি!

এই আদেশের মধ্যে পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা দ্বারা স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে যে মুসলমান গুণগণ দাঙ্গাধাঙ্গা বাধাইলে তাহাদিগকে শাস্ত ও সন্দেহ করিবার শক্তি পুলিশের নাই। যদি এই নীতিকোষ, সাম্প্রদায়িক ভাবে উত্তেজিত গুণগণের ভয়ে হিন্দুকে তাহার চিরাচরিত অস্বাভাবিক, উৎসব বন্ধ করিয়া গৃহে অগ্নিলব্ধ করিয়াই থাকিতে হয় তবে পুলিশবিভাগের অতিথের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অনেকে অহমান করেন যে মৈনৌপুরী হুয়োরাগিরি মাঝে পড়িয়া বুরোকোশি এই ফুলারী নীতি পুনরলম্বন করিয়াছেন। স্বরাগলার প্রতিপত্তি বড় করিবার জন্তই নাকি এই ভেদনীতি অবলম্বিত হইতেছে—তাহা যদি সত্য হয়, তবে বুরোকোশির এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হইতে পারে না। গভীরকার্য্য ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভেদনীতি দ্বারা অশান্তি বৃদ্ধি পায়, সাম্প্রদায়িক বিবেধে প্রজ্জ্বলিত হয়, ইহা চতুর রাজনৈতিক ইয়াজ্ঞ কি বুঝেন না।

বড়পেটার পুলিশের দারুণ অত্যাচারের কথা সংবাদ-পত্রে তুলিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু সে বিষয়ে সরকারের কোন মতামত এখনও উন্মিত পাই নাই।

এটা যে চরমাইনদের দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। চরমাইনদের পুলিশ যে ভাবে সরকারী সাহায্য পাইয়াছিল তাহাতে উজ্জ্বল হইয়া তাহারা যে একত্র একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

দাঙ্গা দাঙ্গার গোলমালে মাদারীপুরের স্বাধিকারবর্ত্তের ব্যাপার সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য ইহাতে স্বাধীন অধিবাসীগণের অনেকেই ইহাতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং দুঃস্থ বাল্লিকগণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। এই সাহায্য ভাণ্ডারের জন্ত পূর্ব্বস্থ ব্যাভা-ত্বেহলি হইতে এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে, তনিতৈছি ঐ ভাণ্ডারের অর্থ মি: বি, চক্রবর্ত্তীর নিকট আছে—আমাদের মনে হয় এই উপলক্ষে আর নতুন অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া ঐ ত্বেহলির টাকাটা দিয়া দেওয়াই উচিত ও সঙ্গত সঙ্গত তাহার একটা খোলসা হিসাব সাধারণকে দেওয়া আবশ্যক। জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট অস্বাভাবিক পড়িয়া থাকিবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। আবার কলিকাতার মন্দির সম্বন্ধি পূর্ণচন্দ্রের যখন লোককে টাকা দিতে হইবে তখন মাদারীপুরের সাহায্য ভাণ্ডারের জন্ত বড় অর্থ সংগ্রহ করাও কষ্টকর হইবে। তবে মজা এই যে সাধারণ যে কোন কণ্ডের টাকা সাধারণত: কোষাধ্যক্ষগণ হাত ছাড়া করিতে চানেন না—টাকার বোধ হয় একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে অস্তত: গিরিশ শ্রুতি স্মিতির টাকার কথা মনে পড়িলে মনে এই ভাবটাই জাগিয়া উঠে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি করেন দেখা বাউক। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রবচানন্দ যে মহান সেবা ভ্রমের পরিচয় দিতেছেন তাহা সত্যই অস্বাভাবিক।



## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

শ্রাবসী চৈত্র ১৩৩২ সাল ৪—এমাসের “প্রবাসী” প্রথম প্রবন্ধ “কন্কিউশিয়ান্স” চীনদেশের বনামধ্যাত মহাপুরুষের পরিচয়। লেখক শ্রীধরপণ বোহাল এম এ বিদ্যাবিনোদ প্রাঞ্জল ভাষায় চীনদেশের এই কবী ও রাষ্ট্রনেতার জীবনী ও তাঁহার জ্ঞান গর্ভ উপদেশের সার সঙ্কন বরিহা বিবাহেন। কন্কিউ-শিয়ান্সের সম্বন্ধ আলোচনা মাসিকের পৃষ্ঠায় এই নূতন না হইলেও ইহার পুনরালোচনা আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে কোন মতেই অনাবশ্যক নহে। “ভারতীয় অধ্যাপকের আমিস ব্যবহার” প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুগ্ম চরণ বংশোদ্ভাষায় মহাভারত হইতে কতক নয়া উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে মাসই অধ্যাপকের প্রধান খাদ্য ছিল, ভ্রাষণ ও অতিথি ভোজনের সময় মাস ব্যবহৃত হইত দেব ও শিশুপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য প্রাচীনাতিতে মাস উৎসর্গ করা হইত। ক্রমে এই মাস-ভোজন প্রথা ক্রমিক কমিয়া আসে। প্রবন্ধে নূতনত্বের পরিচয় নাই। প্রাচীন ভারতের রাজত্ব বর্ণকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যশাসনাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, এই সকল রাজপ্রণোদ্য কার্যের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মাস ভোজনের আবশ্যকতা ও ব্যবস্থা সে কালে ছিল। ক্রমশঃ ভারত সময় অবসানের পর সর্জন্য শক্তি হাপিত হইলে অপ্রয়োজন বোধে প্রাচীনরা মাহাত্ম্য কীর্ণিত এবং মাসোহার নিশ্চিত হইয়াছিল। তন্মতে ক্রিয়গণের ও বৈশ্বগণের মাসোহারের ব্যবস্থা যে শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক সমর্থিত হইত না, একথা বলা যায় না। “বাসদেবী”—শ্রীবিদ্য। কান্তি মুখোপাধ্যায়ের রচিত। কলা ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনার বিরূপ যুদ্ধিতে পরিকল্পিত তাহার পরিচয়।

অধ্যাপক অমৃতলাল শীলের রায়ের ঐতিহাসিকতা এই সংখ্যায় শেষ হইল, আমরা এই স্থানীয় প্রবন্ধটি পড়িয়া তুলিয়া দিই। ইতিপূর্বে লেখক গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণিকতা সংক্ষেপে বিবৃত মত প্রকাশ করিয়া

এক যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সময় বৈষ্ণব সাহিত্যভক্ত কোন কোন লেখকের মধ্যে চাঞ্চল্যের ও আশ্চর্য্যের স্রষ্টা করিয়াছিল। আলোচ্য প্রবন্ধেও লেখক যুক্তি-প্রয়োগপূর্ণ বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ “রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা” এই সংখ্যায় সমাপ্ত করিলেন। লেখক রবীন্দ্র-ভক্ত, কবির কাব্য সকল তিনি ভাল রূপেই অধ্যয়ন করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার প্রথম দান হইতে আরম্ভ করিয়া “পলাতক” পর্যন্ত সমস্ত কাব্য প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কবির বাণী কত বিভিন্ন স্থরে বাজিয়াছে এবং কত বিভিন্ন ভাষার তরঙ্গ তুলিয়াছে। “পুরবীর” আলোচনা বাদ না দিলে এই প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ হইত। লেখকের প্রবন্ধ কতকটা স্তুতি-বাগ (appreciation) প্রাচুর্যে। লেখকের মতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে ছুইটা যুগ দেখিতে পাওয়া যায় একটা “সাধনার” যুগ আর একটা “সুবুদ্ধির” যুগ এবং তাহার মধ্যে “সুবুদ্ধির” যুগই প্রতিভার পূর্ণগোকে উজ্জলতর এবং সমৃদ্ধতর। এ বিষয়ে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না আমাদের মনে হয় রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণবিকাশ “সাধনার” যুগে। লেখক বলেন রবীন্দ্রনাথের “নেবেছ” যুগদাম পাঠকবর্ণের নিকট বিশেষ আদরীয়—ইহার অসম্প্র-দায়িকতার ভয়।

“আলোর খেলা”—শ্রীমারলাল দাশগুপ্ত রচিত এই প্রবন্ধে লেখক একটা বিশেষ সম্ভাষণ তুলু (Impressionist School) চিত্রশিল্পীগণের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি নূতন তথ্যে পূর্ণ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের “পরিজ্ঞাপ্রবন্ধ” প্রবন্ধের নামের সহিত বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গতি নাই। এই প্রবন্ধে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গ শিল্পের পরিচয় প্রদেয় কম বিবর্তন দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রবন্ধে নূতন তথ্য কিছু নাই। এই প্রবাসীতেই কিছু

দ্বিতীয় বর্ষ]

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

১১৮৭

দিন পূর্বে এই বিষয়ক একটা প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে তৎপূর্বে ১৩২৪/২৫ সালে অমৃতলাল সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রক ব্রহ্মাচার্যীর মাহাশয় এ বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলেন, “রাষ্ট্রসংগঠন বর্তমান ভাবের দ্বারা” প্রবন্ধ ক্ষুদ্র হইলেও স্বাধীনতা, জাতীয়তা, আন্তর্জাতীয়তা এই তিনটা রাষ্ট্র-নৈতিক বিষয় বেশ শৃঙ্খলার সহিত গুড়াইয়া বসিয়াছেন—প্রবন্ধ পাঠিত্য প্রকাশের জন্য কোদও টকাত নাই। রাষ্ট্রসংগঠন আধুনিক পুস্তক অবলম্বনে লেখক ক্ষুদ্রাকারে প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লিখিত তিনটা বিষয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

“আমি ও তুমি”—বাস্তবসম্বন্ধ রচনা। এই রচনায় রস তেমন গাঢ় ভাবে না জমিলেও “হুজুদ রামের” প্রথম প্রচেষ্টা অপেক্ষা ইহা সকল হইয়াছে বলিতে হইবে। স্বাধীন যোগেশ চন্দ্র বসু “কৈতুক কথার” সেই স্থপরিচিত কবি মোহন বাঈ বি, এ ফেলু (অর্থ শাস্ত্রে সিকি নম্বরের ভ্রাতা) বেন এই রচনার ভিতর দিয়া “উকি সুকি” মারিতেছে।

শ্রীযোষা কুমার রায় চৌধুরীর “টেলিগ্রাম” একটি ছোট গল্প; স্বর্গে নৃত্যবান নাই, নাখিলেও লিখন-পন্থায় চিত্রিত হইয়াছে। “দিবসের শেষে” আর একটি কল্প-হৃদয়াক গল্প, কল্পকারমূলক অল্পভীতি হইতেছে গল্পের ভিত্তি, গল্পটি পড়িবার পরে মনের উপর কোন দাগই পড়ে না।

আমোঘা সংখ্যায় অনেকগুলি কবিতা আছে। “ওষোহা দু’একটি দেহো ও প্রায়ে সাধারণ পাঠকের মনে শ্রদ্ধা ও ভয়জাতীয় একটা ভাক জগাইয়াছে মাত্র, শ্রীতির উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠে নাই।” আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হুজুদরামের কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবি কল্পনার চরমোৎকর্ষ দেখা দিয়াছে কবি যোহাতি লাল মজুমদার মহাশয়ের “বিশ্বরশ্মি” শ্লোক কবিতায়—

হৃদয় সাগরে কেন তরঙ্গ

হৃদয়ে জ্যোতির্ময়।

মনোমুগ্ধকে ধনি অদাহত

নিবারিছে সশূন্য।

কণে জাগে রূপ, হ্রস্ব শব্দে চোখে।—

ইত্যাদি ইত্যাদি

বিষয়ের চিত্র কবি স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন, বোধ করি পাঠকের মনোভাব সঙ্কনায় উপলব্ধি করিয়া। “বিশ্বরশ্মি” ছন্দের গতি অতি স্বচ্ছন্দ,—রবীন্দ্রনাথের “অভিমান” প্রভৃতি কবিতার কথা মরণ করা ইহা দেখে।

শ্রীহেমেন্দ্র বাগ্গী রচিত “কবিতা” আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শব্দ ও ভাব সম্পদে ইহা যথার্থই “কবিতা”—কবিতা নহে।

“চিত্তবাসন্তী” শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা। ভাব, ভাষা, সমগ্রই ধার করা, কথার উপরে কথা বসাইয়া কবি একটা কিছু গড়িয়া তুলিয়া তাহার দিকে মনে নিজেই বিশেষ অবাক হইয়া চাহিয়া আছেন।

ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩২ ৪—এই সংখ্যায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এম-এ মহাশয় বাঙ্গাল ভূষ নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা বিশেষ ক্রীত হইয়াছি। বাহারা back to the village, “পল্লীতে ফেরো”, “back to the plough, কৃষিবৃত্তি অবলম্বন কর” ইত্যাদি উৎদেশ বাক্য উচ্চকর্তে প্রচার করেন তাহাদের অনেকেই ধারনা নাই, পল্লীতে চাষযোগ্য জমি কিঞ্চদ ছুপিয়া বাহারা পল্লীগ্রামের সম্বন্ধে আছেন এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (Bengal Tenancy Act) বিধান মোটামুটি জ্ঞানেন তাহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করেন। লেখক জ্ঞানেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে অনেক তথ্য—বিশিষ্ট বাহির করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া চিত্তা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্তনের জন্য আশোলান চলিতেছে। আইনের পরিবর্তিত বিধানগুলির ফলে কি পাড়াইবে, তাহারও একটা আভাস লেখক দিয়াছেন। এই স্থলিখিত ও স্থচিহ্নিত প্রবন্ধটি পড়িলে, এই পল্লী ও কৃষি সমস্যার সম্বন্ধে যে



সমস্ত অন্তরায় (practical difficulties) আছে সে সম্বন্ধে পরিকার ধারণা হইবে।

শ্রীমতগোপাল কৃষ্ণ এম-এ, মহাশয় তিন পৃষ্ঠার মধ্যে "উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব" ব্রূহ্মাইচ্ছাছেন। বাহ্যদ্বয়ী নিশ্চয়ই।

"কালাভা ও জাগ্রদ্বী", "গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শন", "মোটের কান্দীর বাজা" এবং (সম্পাদকের মতে) "কোরি ফারাক" এই চারটি প্রথম বৃত্তান্ত। সম্পাদক এককালে পয়চি ছিনে বলিয়া তৎসম্পাদিত পত্রিকাতেও বোধ করি ভ্রমণ কাহিনীর এমন নিবিড় সমীক্ষণ।

"কণ্ঠগত" হলেধক শব্দর রায় এম-এ, বি-এল, রচিত "বাইরেতে ম্যাও" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ; জাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সেনাদল" একটি বিষয় প্রবন্ধ। লেখক সার্জেণ্ট যশীন্দ্র সাহিত্যী বি-এ, বিষয়টিকে বেশ চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। ছাত্র-সেনাদল গঠনের উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সামরিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতা মূলক হওয়া উচিত। এই শিক্ষা আশ্রয়দায়ক পক্ষে সাহায্যকর কতখানি উপযোগী করিয়া তুলে সম্প্রতি ঘটিত ঘটনা পরস্পরা হইতে আমরা তাহা বিলম্ব বৃত্তিতে পরিচায়াছি। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন হওয়া উচিত।

"ভারতবর্ষে" ছোট পত্রের দৈর্ঘ্য বিশেষ তাবে অভিযোগের বিষয়। একমাত্র শৈলঙ্গা বাবুর "প্রাণেশ্বর" গল্পটি এই মাসের ভারতবর্ষের মান রক্ষা করিয়াছে। বর্ত্ত-জীবনের একটি দৃষ্ট লেখক বেশ নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

মিলন-পূর্ণিমা, মনের পরশ, দ্বন্দ্ব, হাই-ফেন, দিক্‌শূল এই পাঁচখানি ক্রমশঃ প্রকাশিত উপজ্ঞান। "হাই-ফেনে" লেখক চাক বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় ক্রিয়াগত নৃত্যের আদ্যমাত্রী করিয়াছেন, বলা—"সে গোপনে লিখিতো, গোপনে ক্রান্তিতো, গোপনেই কোন পত্রিকায় প্রেরণ করিতো, আর যেটি প্রকাশিত হইতো তাহার ভিত্তি তাহার লঙ্কার ও আনন্দের অবধি শান্তিতো

না।" এই রূপ সঙ্গর। এই সমস্ত ক্রিয়াগত বৃত্তি চার্লিক ব্যাকরণ-সম্বন্ধ। না ফনেটিক পদ্ধতি অস্বাভাব্য উচ্চারণ-রূপ বানান? তাহাই বা কেনন করিয়া বলিব! আমরা চতুটি ভাষার ক্রিয়াপদগুলি ত্রুণ ভাবে উচ্চারণ করি না! তবে কি ইহা একটা—নৃত্যন কিছু ক্রিয়াবার বৌক?

—আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে জ্যেষ্ঠেন্দ্রলাল রায়ের "উর্জ্জ্বল অভিশাপ" পাখাটি উল্লেখযোগ্য।

মানসী ও মঙ্গলানী, ফাল্গুন, ১৩৩২:

—এই সংখ্যা হইতে "মানসী ও মঙ্গলানী" নব-বর্ষ আশঙ্ক। মহাবীর জগদীশ নাথের পরলোকগমনের পর, তাঁহার পুত্রপৌত্রিত ও সম্পাদিত পত্রিকার ভার প্রভাত-সুভার একাই স্বহস্তে লইয়াছেন। ভাণ্ডের যত্নক তিনি অমৃত্যব করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দায়িত্ব ও ভার বহনের তিনি যে সম্যক উপযুক্ত, এবিষয়েও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রভৃতিতে "মানসী" তাহার পূর্ণ প্রসিদ্ধি অক্ষুর রাখিয়াছে। মহাবীর ভাণ্ডারের অসমাপ্ত রচনা "প্রতিশ্রুতির" যে অংশইহি তিনি মৃত্যুর প্রাক্কালে লিখিয়াছিলেন তাহার হস্তাক্ষর প্রতিলিপি সহ মুদ্রিত করায় পত্রিকা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

"বন্ধের শ্রমজীবী" একটি সময়েোগ্য বিষয় প্রবন্ধ। লেখক শ্রীকীরেবর ভট্টাচার্য। এই প্রবন্ধে বঙ্গের শ্রমজীবীগণের বর্ত্তমান অবস্থা, অভাব ও অভিযোগ এবং পাশ্চাত্য শ্রমজীবীর সহিত তাহাদের তুলনামূলক আলোচনা ও বঙ্গীয় শ্রমজীবীগণের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির উপায় নির্দেশ প্রকৃত্তি অনেক জ্ঞাত এবং জাতব্য তথ্যের অব-ভারণা করা হইয়াছে।

"আমির মানব" শ্রীউদ্যাপতি বাকগেদীর লিখিত সূতব্য বিষয়ক প্রস্তাব। এই বিষয় লইয়া অধ্যাপক পকানন মিত্র মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে সাহিত্যে আলোচনার স্বরূপাত করেন। সূতব্যে জ্ঞানের পরিধি এক্ষণে অনেকটা বাড়িয়াছে, এ বিষয়ে নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাকগেদীর মহাশয়ের প্রবন্ধ technicality বঙ্কিত এবং সাধারণ পাঠকের বোধোপযোগী করিয়া লিখিত গ্রন্থের "দ্বন্দ্ব ও আর্থা" মূলিনীকান্ত মজুমদারের লিখিত। বৈদিক প্রবন্ধ। লেখকের গবেষণা সঙ্গ নূতন বিষয় কিছুই নাই। মধ্যকালে সম্রাটের Vedic Index লেখকের প্রধান অবলম্বন। সন ১৩২৮ সালের "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত তারানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে বিশদ ও মৌলিক আলোচনা করিয়াছিলেন। "পরলোক প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লেখক শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরলোকে সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের বিশ্বাস ও ধারণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "তপোবনের স্নেহ" বৃত্তান্ত ছোট হইলেও ইহাতে লেখকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি, স্বসৃষ্টির পরিচয় পাই।

—অধ্যাপক গণেশেন্দ্রনাথ মিত্রের হোলি প্রবন্ধ "প্রেমের অকরণ্যের কাণ্ডগোল"। লেখক প্রসঙ্গক্ষেত্রে হোলির ethnology টুইর হকেশলে অবতারণা করিয়াছেন।

ভাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত তাঁহার রচিত "সাহিত্য ও ধর্ম" প্রবন্ধে কয়েকটি স্বাধীন মতের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, ধর্ম সাহিত্যের মূল বস্তু নহে। সাহিত্যের কাণ্ডগোল; সাহিত্যিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া সত্যকে (বীভৎস হইলেও?) উন্মোচিত করিবেন, তাহাতে যদি সামাজিক ক্রটি বা স্বাধীনতার আঘাত করে ক্ষতি নাই।" লেখকের সকল কথাই সম্যক আলোচনা ক্ষুদ্র পরিধির সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত

আলোচনা হওয়া আবশ্যক। জ্ঞান-বুদ্ধিতে বাহ্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নরেশবাড় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা "সত্য" কিনা তাহাই বিবেচ্য। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সমালোচক সাহিত্যের সহিত ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে সরাসরার যে মত পোষণ করেন, তাহার বিপরীত মতকে সমর্থন করেন। তবে ইহা "মানসী"র পূর্বতন রচিত পোষক নহে ইহাই মনে হয়।

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার লিখিত "তৃষাভূর" গল্পটি পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম। এটালী বিনোদের চরিত্রে কামুকতার ছবির পাশ্বে পতিতা নারী চক্কার পুঙ্খসেহাভূততার অভিব্যক্তি সুপরিষ্কৃত হইয়াছে।

"রবীন্দ্রনাথের বর্গপতি" শ্রীযুক্ত নীলমণি আচার্য লিখিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষার লেখক রবীন্দ্রনাথের বর্গ-সঙ্গীতগুলির সৌন্দর্য ব্যাখ্যান করিয়াছেন। আলোচ্য সংখ্যা শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দেবী—শ্রীযুক্ত সত্যজিৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, রমণীমোহন ঘোষ, প্রমুখ কবিগণের কবিতা আছে। কবিতাগুলি সুপাঠ্য। সত্যজিৎচন্দ্রের "আকর্ষণ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের "বহুভাষার" ছায়া পড়িয়াছে। বসন্ত-বাবুর "বসন্ত" কবিতায় শব্দ সন্নিবেশ মনোযোগ আকর্ষণ করে। শ্রীগণেশেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত "কিরে এস" কবিতায় কবিত্ব ও মিষ্টত্বের পরিচয় পাই। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত বলিয়া মনে হইল; তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সফল হইবে মনে হয়।

## গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীমান-সুন্দরী গু—শ্রীশ্রীশ্রীমান-সুন্দরী গু, ১৩১৭ বিজয় জিট, "মানসী" প্রেস হইতে শ্রীশ্রীশ্রীমান-সুন্দরী গু প্রকাশিত। মূল্য ২০ টাকা। ৩৩৬ পৃষ্ঠার সমাপ্ত।

ইতিপূর্বে "একবার" "সীতানামা" নামে একখানি

গ্রন্থ উপজ্ঞান লিখিয়া সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। উপজ্ঞান পাঠকের নিকট "সীতানামা"র যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। "শ্রীশ্রীমান-সুন্দরী" লেখকের তৃতীয় সামাজিক উপজ্ঞান। জুজিয়ার তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্মের অমৃত্যব শাস্ত্রবিধি ও হিন্দু সমাজ প্রচলিত



আচার ব্যবহার বিধির সহিত মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ও সনাতন, সর্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা বা প্রেম প্রভৃতির বিরোধেই ইহার আলঙ্কারিক। বিধবা বিবাহ বর্তমান হিন্দু সমাজের একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার উপরই আলোচ্য গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপিত। এই উপস্থাসে দুইটি হিন্দু বাল-বিধবার চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ণিমাছন্দী ও হিরণবালা। পূর্ণিমা রমণশীল হিন্দু ঘরের আদর্শ বাল-বিধবা। সনাতন প্রণয় শিক্ষিতা। হিরণবালা শাস্ত্রাধ্যাপকের দুহিতা হইলেও কতকটা পাকাতা শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত। বাল-বিধবার ভাগ্যে সমবেদনা-বশে যে সকল পাকাতা ভাবে অস্বাভাবিক যুবক বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, সমাজ কুমার তাহাদের প্রতীক। সমাজকুমার হিরণবালাকে বিবাহ করিতে চায়। সমাজ এবং উভয়ের অভিভাবক সে-বিবাহের বিরোধী। স্বতঃস্ফূর্ত মতান্তরে বিবাহের জ্ঞ উভয়ে গোপনে গৃহত্যাগ করিল। তাহার পর নানা-প্রকার ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া হিরণবালা আত্ম-ঘাতিনী হয়। পূর্ণিমা তাহার পূর্বজন্মের স্বামী ব্রজহৃদয়ের পবিত্র স্মৃতি রূপে ধারণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে

কর্মের মধ্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিল। এই আখ্যান বস্তুরে গ্রন্থকার পারিপার্শ্বিক চরিত্র ও ঘটনা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন। পূর্ণিমাছন্দীর চরিত্র হৃদয়ের ভাবে সৃষ্টিয়াছে। হিরণবালায় জীবন-নাট্যের শেষ দৃষ্টিকে “ট্রাজিডিতে” পরিণত করিবার অবশ্যকতা ছিল না। গ্রন্থকারের ভাষা ও বর্ণনা বন্ধনী ভঙ্গী। গ্রন্থের নানাহানে লক্ষ্যচক্ষের প্রভাবের নিদর্শন বিদ্যমান। তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত পূর্ণিমার স্বপ্ন বহির্মুখের কুন্দ-নন্দিনীর স্বপ্ন বৃত্তান্তকে মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে আভিধানিক ও স্বচলিত (coined) শব্দ বিস্তারের জ্ঞ শ্রুতি কঠোর হইলেও ভাষা মার্জিত, সরল ও সতেজ। গ্রন্থোক্ত কথোপকথনগুলি অপেক্ষাকৃত সন্ধিগত ও সংঘত হওয়া উচিত ছিল। তৎকালিক কথোপকথনে মতটুক বাগড়বড়, উচ্ছ্বাস ও লীলাতল চলিতে পারে এই উপস্থাসে তাহার লীলা অতিক্রান্ত হইয়াছে। শেষভাগে জ্ঞত সমাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল সমাপ্তি দোষ থাকিলেও, গ্রন্থকারের “সীতা-নাথের” জায় এই উপস্থাসখানিও স্বরচিত ও শিক্ষাপ্রদ।

## তন্ময়

### শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস বি-এল

কেমন করে তো পোহাল কিছুই নাহি মনে,  
অলস অবশ তত্ত্ব তোমার পরশনে।  
গুরু গুরু বৃকের ঢুক, কালো ঢুক বাঁকা,  
মধুর মুখে স্বধার হাসি প্রাণে আছে ঝাঁকা।  
ঘুমে মগন সর্গ গগন, নিশ্চয় চারি দিক;  
জাগে শুধু নিশান পবন, গড়ির টিকিটিক;  
ফুলের স্বধাস বইছে বাতাস আকাশ কিরণ ডরা,  
তাহার মস্তে রূপটি তোমার ভুবন আলো কাঁরা।

হুমকি তারার চিকিমিকি সারা স্থানীল নতে,  
মাতাল কোকিল মাতায় নিবিহ্ন হুহু কুহু করে !  
দুগ ব'য়ে যায় এক নিমেষে; একটি রাতের কথা  
গুলিয়ে গেছে,—ভুলিয়ে দেছে তোমার মাসকতা!  
বলতো তুমি পাগল আমায়, ভাবতো এরে ছলা;  
স্বভাব আমার যথা তথা মিছে কথাই বলা।  
বিধি করে বলতে পারি—“হাস্যে তো না কোঁ কিক্,  
তুমি যদি আমি হ'তে—এমনি হত টিকি।”



# বদ্বন্দ্ব!



দাদাহাশামার ফলে সকল রমালয়েই দর্শকভাষা  
ঘটিয়াছিল—বিশেষ করিয়া মা-লক্ষ্মীর রূপা হইতে সকল  
রমালয়েই বঞ্চিত ছিল। এখন দাদাহাশামার একরূপ  
নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তবে রূপা আতঙ্ক এখনও আছে।  
ইয়ের পর স্টেট্ চলিয়া যাওয়া উচিত এবং আমাদের  
মন হয় যে অন্তঃপর বাঙ্গালার নাট্যমোদী মরনারীগণ  
পূর্ববৎ রমালয়ের শোভাবর্ধন করিবেন। কারণ দর্শক-  
ভাবে অনেক সময় “স্ব-অভিনয়”ও ভাগিয়া যায়। ইদ  
উলক্ষেও বাঙ্গালার রমালয়ে আনন্দের উপযুক্ত আয়োজন  
হইয়াছে। এই আনন্দের ধারা-প্রবাহে যুক্তি অশাণ্ডির  
বৃত্তি মুছিয়া যায় তো তাহার চেয়ে বড় আনন্দের বিষয় আর  
কিছু নাই।

দাদাহাশামার ফলে সকল রমালয়েই দর্শকভাষা  
ঘটিয়াছিল—বিশেষ করিয়া মা-লক্ষ্মীর রূপা হইতে সকল  
রমালয়েই বঞ্চিত ছিল। এখন দাদাহাশামার একরূপ  
নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তবে রূপা আতঙ্ক এখনও আছে।  
ইয়ের পর স্টেট্ চলিয়া যাওয়া উচিত এবং আমাদের  
মন হয় যে অন্তঃপর বাঙ্গালার নাট্যমোদী মরনারীগণ  
পূর্ববৎ রমালয়ের শোভাবর্ধন করিবেন। কারণ দর্শক-  
ভাবে অনেক সময় “স্ব-অভিনয়”ও ভাগিয়া যায়। ইদ  
উলক্ষেও বাঙ্গালার রমালয়ে আনন্দের উপযুক্ত আয়োজন  
হইয়াছে। এই আনন্দের ধারা-প্রবাহে যুক্তি অশাণ্ডির  
বৃত্তি মুছিয়া যায় তো তাহার চেয়ে বড় আনন্দের বিষয় আর  
কিছু নাই।

আট ঘিঘেরা কবীজ রবীন্দ্রনাথের ‘বিদায়’ অভি-  
শাপের’ অভিনয় যোগ্য। ক্রিয়াছিলেন কিন্তু দ্বাধার জ্ঞ  
গৌরিন অভিনয় স্থগিত ছিল। আশা করি তাহার বিদায়  
অভিশাপেও কৃত্রিম দেখাইতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের  
নাটক তাহার একচেটিয়া হইল দেখিতেছি—অজ্ঞাত  
রমালয়েও রবীন্দ্রনাথের হুঁ একখানি নাটকের অভিনয়  
দেখিতে আমরা ইচ্ছুক।

অপরেণ বাবুর “শ্রীকৃষ্ণ” ও সম্ভবতঃ শ্রীমদ্র অভিনীত  
হইবে কারণ শ্রীকৃষ্ণের একখানি অভিনয় প্রাচীর বিজ্ঞাপন  
ময়ের চতুর্দিকে দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ঘটনা বহল  
গৌরন যে নাট্যকারে অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারে তাহা  
নিশ্চয়।

নির্মার্ভা ‘বাঙ্গালী’ বেশ চলিতেছে। পরবর্তী  
অভিনয়ে অনেক উন্নতি সংশোধিত হইয়াছে। কুহাবুর  
ভূমিকার অভিনয় কমপক্ষে উজ্জল হইয়া উঠিতেছে।

বড়গৌরী (দীনদাসের স্ত্রী) ভূমিকাও শ্রীমতী নগেন্দ্র  
বালার অভিনয় বড়ই মঞ্চশর্পী হইয়াছে। টানাটানির  
সংসারের গৃহীণী অবস্থা অভিনেত্রী স্মৃতি হৃদয়ের ভাব  
দেখাইয়াছেন—আর দেখাইয়াছেন মাতৃ হৃদয়ের বেহের  
পরিত্য। একপ্র স্বাভাবিক অভিনয় খুব কমই দেখা  
যায়।

স্বপ্নাশের স্ত্রীর ভূমিকাও শ্রীমতী প্রকাশমণির অভিনয়ও  
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ধনী গৃহীণীর ঐশ্বর্যভাজ  
অধঃস্রাবটুকু যেমন চমৎকার ভাবে দেখাইয়াছেন তেমনি



কুপ্তো আত্মীয়ের (গৃহিনীর মাতুল) দোষ ঢাকা দিবস।  
স্বাভাবিক চেষ্টাও বেশ ফুটিয়েছে।

ছোটখাট কৃষিকার মধ্যে বামন দিবস অভিনয়ও বেশ  
মঞ্চশ্রী হইয়াছিল। মোটের উপর 'বাঙ্গালী' নাটকে  
বাঙ্গালীর সুসংগে এমন একটা দিক দেখান হইয়াছে যাঁহা  
বাঙ্গালী মাঝেই প্রত্যা।

ভাটুড়ী মহাশয়ের 'নাট্যমন্দির' 'কর্ণওয়ালিস' রম্যকে  
দর্শকবৃন্দকে নিমগ্ন করিয়াছে। জনরব যে 'পাগবের  
অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয় তাঁহার প্রথম করিবেন।  
অভিনয়ের তারিখ এখনও নির্দিষ্ট না হইলেও বৈশাখ  
মাসেই অভিনয় আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়।

মিঃ বিয়েটার শ্রীদুর্গার অভিনয় চলিতেছে। অভিনয়  
সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যাঁহা বলিয়াছি শেষ পর্যন্ত দেখিয়া  
তাঁহার অপেক্ষা আর বেশী বলিবার কিছু নাই। তবে  
নাটক সম্বন্ধে কিছু বলিবার বহিল, নাটকখানি প্রকাশিত  
হইলে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করিব।

হুইসের গানখানি আমাদের ভাল লাগিল। তাঁহার  
কৃষিকাটি স্থিতিস্থাপক হইলে অভিনয়েও যথেষ্ট রস পাওয়া  
যাইত কিন্তু নাট্যকার কৃষিকার বক্তব্যাদি তেমন স্বন্দর  
হাস্যরস সংযোগ্য করিতে পারেন নাই; বস্তুতঃ হইয়াছে  
তাঁহা কেবল অভিনেতার চেষ্টায়। তবে কৃ-এক স্থলে  
তাঁহার অভিনয়-ভঙ্গী শীলতার সৌন্দর্য অতিক্রম করিয়াছে।  
হাস্যরসের স্রষ্টা করিতে কৃষিকার অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্য  
লওয়া অথবা অঙ্গীল হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের  
সাবধানতা আবশ্যিক।

শ্রীদুর্গার কৃষিকার তারাত্মকতার আবৃত্তি স্বন্দর

হইয়াছে। গ্রন্থকার কৃষিকারকে কেবল বক্তৃতার উপ-  
যোগী করিয়াছেন। শেষ দৃশ্যে তাঁহাকে দশভুজা মূর্তিতে  
দেখাইয়া অভিনেত্রীকে বড় বিপদাপন্ন করিয়াছেন কারণ  
হুইটী স্বাভাবিক হস্তের সহিত আটটা কৃত্রিম হাতের গতি  
তাল রাখিতে পারে নাই।

সমগ্র নাটকে একমাত্র মহিষাসুর চরিত্রেই উজ্জল  
হইয়াছে কিন্তু তাহাতে আত্মকিকি ভাব অপেক্ষা মহত্বই  
বেশী প্রকটিত। অভিনেতা নির্মলেন্দুনাথ কৃষিকারকে  
প্রাণপণ শক্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রৌত্রাজকে চাবুক মারা, অরিসুতে নিক্ষেপ প্রভৃতি  
দৃশ্য 'জমাতা' হইলেও অস্বাভাবিক এবং পুরাতন, এদের  
যেন বরদাভাবের মিসর কুমারীর প্রতিধ্বনি মাত্র। একই  
নাট্যকারে হুইটানি নাটকে একই কৌশল অবলম্বন  
প্রশংসনীয় নহে। তবে দৃশ্য হিসাবে এগুলি নূতন না  
হইলেও বেশ উপভোগ্য।

স্বর্ণবিজয়ী মহিষাসুরের সঙ্গায় অঙ্গরায়গণের মলিন-  
মুখ-ভাব ও অনিচ্ছায় গীত-গানের মধ্যে বেদনার ব্যঞ্জনা  
বেশ একটু নূতনত্ব দেখান হইয়াছে।

ধরিত্রী, বিজয়া প্রভৃতির গানগুলিও খুব স্বন্দর  
হইয়াছে। তবে অনেক স্থলে গানগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া  
বোধ হইল—সেগুলি দর্শকবৃন্দকে যেন গান শুনাইবার  
জন্ত সংযোজিত। নাটকখানি অথবা গানের ভাবে যেন  
ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মিঃ সন্দ্রবার শ্রীদুর্গা পণ্ডিত কীর্ত্তোদ প্রসাদের জয়শ্রী  
নামক স্মৃতিনাট্য অভিনয় করিবেন। আশা করা যায়  
উহার নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে।



[ বিত্তীয় বর্ষ ]

১১ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৩, ইং ২৪শে এপ্রিল ১৯২৬

[ ৩৬শ সপ্তাহ ]

## নববর্ষে

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে!

আজি নবীন বর্ষসনে  
আগিছে আমার মনে  
নিভা নূতন সাথে

যত পুণ্যতন;  
পুণ্যে বন্ধুর মুখ  
দিতোছে নূতন স্বপ্ন  
প্রাচীনে নবীনো একি।

মধুর মিলন।

উদ্ভূত গগন সম  
খুলিয়া স্বপ্নর ময়  
পাঠাইছ তব কাছে

শ্রেয় গ্রীতি দেব,  
ভূমিও আমার মত  
তুলে যাও তুল যত  
ভূবে যা'ক শ্রেয়-নীরে

সকল সন্দেহ।





## ঠান্দিদি

(দেখী ঠাটে বিলাতী গল্প)

রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাঁহাজুর

১

ঠান্দিদি সকল দেশেই আছে। তবে, ভারতের ঠান্দিদির যেমন নির্বিধার ও নিয়ম ভাব, অস্ত্রাত দেশ তত দেখা যায় না। স্বতরাং, মনে করুন যদি একজন বিলাতী ঠান্দিদির ভাব দেখী ঠান্দিদির মধ্যে আবিষ্কার করিয়া সেই চিত্র বানি পাঠকের সমুখে উপস্থিত করা যায়, তবে সেটা অভিনব হইয়া দাঁড়ায়। এরকম প্রথা এখন খুব চলুতি। সাহিত্যে, উপন্যাসে, গান-বান্ধনায়, প্রত্যহ ইহার নমুনা পাওয়া যায়।

ছোট গল্পে ইহার তত্ত্বিক খুব সহজ। কোন একটা বিলাতী গল্পের কথা মধ্যে মধ্যে তর্জনা করিয়া, দেখী ভাব তাহার সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। এই প্রণালী অনেকটা পাশ্চাত্যপন্থীর স্বত্বগত। পুন্ডি, চপ, কাটলেট প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে গেলে আমরা সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাহবা লইয়া থাকি।

২

চৈত্র মাস। রাত্য়ার দুলা উড়ছে খুব। উয়, ট্যান্ডি, ফেটনি, ও ক'লের বিয়া মন। রাত্য়ার এপার হতে ওপার যেতে হ'লে হরিমান না ক'রে গাওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক মুহুর্তে চাপা পড়বার ভয়। তিনকড়ি তাহাতে জক্ষেপ না ক'রে তার সমের হাক্কলার সার্ভের আত্মনি গুটিয়ে ও B. P. I. W এর 'মুখ' এসেল মাথা কমালানি ব্রেগপেকটের মধ্যে বানিকটা বের ক'রে টিক ৬০ টার সময় হেগের মোড়ে টামের অপেক্ষা করছিল। উদ্ভেদ হাওয়া ঝাওয়া ও দেলভনাই। চোখ দুটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, যেন লবহুশ বনবাস হ'তে অযোধ্যায় ফিরে এসেছে। পকেটে ছ' আনার একানি। মুখে মিঠা পান। এমন

সময় একটা দম্কা হাওয়ার সঙ্গে, এক-আপটা ধূলা তার চখের উপর এসে পড়ল।

তিনকড়ি (রেগে)—“ভ্যাম”—

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠের উপর একটা মনবীর বেহ এসে দাঙা খেয়ে পড়ল। তিনিও ব'লে “Damn”—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানি তিহুর হাত আঁকতে ধ'লে। তিহু বিরক্ত হয়ে সেটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ছোট্ট বাট্ট একটি যেম বেগে সে অগ্রসর হয়ে গেল।

তিহু—Beg your pardon

রমণী। আমি বাঙ্গালী। ইংরাজি বলতে হবে না। আর একটু হ'লে হেঁচাই খেয়ে পড়েছিলাম আর কি।

তিহু। মাথায় লেভিহাট্ট হাতে দরদান, ও পরনে গাউন দেখে আমার ভুল হয়েছিল। মাফ করবেন। এয়ে ট্রাম আসছে।

রমণী। ইডেন গার্ডেনের দিকে যাবেন ত?

তিহু। বোধ হয়। আপনিও কি সেই দিকে?

রমণী। নিশ্চয়।

উভয়ে ট্রামে চড়বার পর তিহু জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি হাওয়া বেগে যাচ্ছেন?

রমণী। ব্যাও শুনতে যাচ্ছি।

৩

রাত্য়ার মধ্যে ছ'জনের বড় একটা কণোপকন হর নাই। কেবল তিহু সেই রমণীর মুখানি দেখবার স্বত একটু ব্যগ্র হয়েছিল। কিন্তু মুখখানি লেগেচাক।

ইডেন গার্ডেনে যাবার সময়ও রমণী তিহুর হাত ভাঙে নাই। তাহার কৈফিয়ত স্বরূপ রমণী বলেন “তোমার

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা]

খোঁকা

১৯১৫

হাত এই ভেড়ে আমার নিত্যন্ত সহায়তা করেছে। আমি অতিশয় বড়ো মাহয়। ‘আশী বৎসর বয়স।’

যে প্রজন্মে তিহু জড়িত হ'ছিল, তাহা মুহুর্তের মধ্যে ছিন্ন বিছিন্ন হওয়াতে সে বিরক্ত হয়ে পড়ল।

‘আপনার উচিত ছিল একটা রিক্শ ভাড়া করা, কিংবা একখানা ট্যান্ডি।’

রমণী। আমার নিজেরই ‘কার’ আছে, কিন্তু চ'লে বড় একটা বেগুত পাইনে। তোমার হাতটা ছাড়বার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই।

তিহু। আপনি থাকেন কোথায়?

রমণী। তোমার বাটার নম্বর কত?

তিহু। আমি—মিজের ছেলে—নং—মাশিকতলা ঠাট।

রমণী। যার নামে হাড়ী ফাটে?

তিহু। (হেসে) আমার তত কুপণ নই। আর আপনি?

রমণী। (হেসে)—বোনের বৃত্ত প্রাপ্তিমহী। মাথ ক'রে সকলে ঠান্দিদি বলে ডাকে।

তিহু। (সহিষ্ণুত) ও—আপনারা ত খুব বড় লোক। আমি শুনেছি, আপনি এখনও মেয়েদের নাচ-গান শোনা।

রমণী। নাচগানের কি কাল্যাকাল আছে ভাই? তাই ভগবান স্রীভাত বলেছেন ‘প্রয়াণ কালে মনসা চলেন’

অর্থাৎ মরণের সময়ও নেচে নেচে চলে যাবে। তোমার যদি বেগতে ইচ্ছে হয় তবে ইডেন গার্ডেন হ'তে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব। আমার কার এখানেই আছে।

কথা শেষ হতে না হ'তে দুটি বালিকা দৌড়ে সেখানে উপস্থিত। তার মধ্যে ছোটটি আনন্দসহকারে চেষ্টায়ে উঠলো ‘দিদি’—এই যে ঠান্দিদি এসেছেন!

‘দিদি’ আগম্বককে দেখে একটু লজ্জা পেয়েছিল হুতরাং কোন বাক্যব্যয় না ক'রে সমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠান্দিদি বলেন ‘এটি আমাদের বাড়ার লোক। বড় ঘরের ছেলে। এরি জন্তে আজ এতদূর আসতে

পেরেছি। তিহু—ভাই! তোমার হাতটা এখন ছেড়ে দিই। বিমলা ধক্ক। তবে তুমি সঙ্গে এস।’

বিমলা ও কমলা ঠান্দিদির দুই হাত ধরে ব্যাঙের বাঁধনার দিকে গেল। তিনকড়ি সেই অবসরে তার কমালখানির ব্যবহার করে মুখের ধূলাটা ঝেড়ে ফেলল।

আবার সেই স্বপ্নজাল।

ইডেন গার্ডেনে মধুর স্রীংএর ব্যাঙের হাম’নির সঙ্গে তিনকড়ির করনগোল এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, যখন বিমলা এসে বলল—‘আপনাকে ঠান্দিদি ভাচ্ছেন’ তখন তার স্বর্ণমণি পাতালের দৃষ্টি ছিল না।

৪

টিক্ তাই এক বৎসর পরে দেখা যাচ্ছে যে বিমলা তার স্বামী তিনকড়ির সঙ্গে—নং বাটার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কার জন্ত অপেক্ষা ক'চ্ছে। এমন সময় একটা মটরকার এসে উপস্থিত। কমলার সঙ্গে ঠান্দিদি।

কিন্তু ঐ ঠান্দিদির বেশ আর এক রকম। কালী হতে ঠান্দিদি ফিরেছেন। পুরায় কুতূহলের মালা। নামাবলী গায়। হাতে জপমালা। বাঁধানে দাঁত ফেলে দিয়েছেন। কমলার হাতে একটা ছোট সেতার। কমলা তার বিহির মুচুচুন ক'রে বলে ‘ঠান্দিদি আর নাচেন ন’।’

ঠান্দিদি হেসেই খন। ‘তোদের নাচ দেখে আর কি আমার নাচতে ইচ্ছে করে? আমি বিলিতি ও দেশী নাচ সবই জানুচুম ও তোদেরও শিখিয়েছি। কোন্টা ভাল বলতে বিমলা?’

বিমলা তার মাথার ঘোমটা একটু বেঁকি করে টেনে দিয়ে ব'ল ‘দেশী’ এবং স্বামীর সঙ্গে ঠান্দিদি দুটো হাড় ধরে গায়ের তাকে উপরে নিয়ে গেল।

ঠান্দিদি চখের জলে ভেসে বলেন ‘এই ত বর্গ! বানাদ বনে, আত্মকুঁড়ের ধারে পড়ে থাকলেও এই বর্গ!’

কমলার সেতারের তারও বেজে উঠলো।





## বঙ্কিম স্মৃতি-তৰ্পণ

### শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

প্রতিভা ব্যক্তিবিশেষই পরিষ্কৃত হয় কিন্তু তাহার আলােকে ব্যক্তি নিবিশেষে সকলেই উপকৃত হইয়া থাকে। স্বর্ঘ্য একা, বিস্তৃত তাহার কিরণে সমগ্র সৌরজগত উদ্ভাসিত। অনন্তসাধারণ প্রতিভা ও সর্বসাধারণের স্বাক্ষর দ্বারা করে।

যে ধর্ম পুণ্য আপন সৌরভে বাতাসের অঞ্চল ভরিয়া দেয়, যে ধর্ম গিরিদিগের নিম্পত্ত ক্রম স্রোতধিনী পাশাঘের বাধা দৈলিয়া, আর্থের চক্র ঘুরিয়া দেশ দেশান্তরে আনন্দতার উর্ধ্বরতার আশীর্বাদ ঢালিয়া দেয়, সেই ধর্মই প্রতিভা তাহার শাসনা-স্বত্ব স্রোত স্রোত জাতিধর্ম নিবিশেষে জগতের কল্যাণেই উৎসর্গ করিয়া পরিতুষ্ট। এই স্রোত মাহু চিরদিন প্রতিভার পদপ্রান্তে ভক্তিতরশির। এই স্রোত মাহু জাতিধর্ম দেশকালগত সর্ববিধ পার্থক্য ভুলিয়া প্রতিভার স্মৃতি-তৰ্পণে দ্বয়রের শ্রীতি-শ্রদ্ধার অঙ্গলি সহ সমবেত হইয়া অধরে ভার হাফা করে।

এই প্রতিভার জ্যোতিষ যে জাতির ভাগ্যগণনে সংখ্যা যত অধিক উদিত হয় সে জাতি তত ভাগ্যবান—সে জাতি তত গৌরবাহত। বাংলাদেশের ভাগ্য অস্ত্র বিষয়ে উজ্জল না হইতে পারে কিন্তু বহু প্রতিভাসম্পন্ন সন্তানের গৌরবে বাংলা মাতের মুখ আনন্দ সমুজ্জ্বল। যেদিন বাংলা বাঙালীর ছিল—যেদিন বাংলার শত সখ্য ছিল, স্বাধীনতার ভার ও ব্যবস্থা বাঙালীর নিজের হাতে ছিল, যেদিন বাঙালী চিন্তায় স্বাধীন, বাস্বে স্বাধীন, কার্যে স্বাধীন ছিল, এক কথা যেদিন অস্ত্র জাতির সহিত বাঙালীর প্রকৃতভার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই—সেই পদপ্রার্থ্যাকৃত হৃদয় অতীত দিনের কথা ছাড়িয়া দিলে যেদিন বাঙালী-নিজ দেশে পরবাসী হইয়া গোলামীর কাস গলায় পরিয়াছিল সেই দিন হইতে আত্মিকার এই দ্রুত-জ-

মহামারী প্রণীড়িত ম্যালেরিয়া-মহিমাঘিত Peace and order পূর্ণ দীর্ঘা কাটার যুগ প্রধাত এই স্বর্ঘ্যকালের মধ্যে বাংলা আধার অদৃষ্টকালে সংখ্যা-ভূমি প্রতিভা জ্যোতিষের আবির্ভাবের অভাব হয় নাই। কপাল-ভুগুলায় স্রষ্টব্য 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের কবি স্বর্ঘ্যই বঙ্কিমচন্দ্র সেই জ্যোতিষ মণ্ডলীর অতীতম।

বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাহার এই অসাধারণতার তাহার আত্মজ সঙ্গী। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রায় সকল দেশেই প্রতিভা পর্বতরূপে জগদ্রহণ করিয়া শৈশবে শাশবে পুঁই হয় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তাহার বৈপর্য্যতা ঘটিয়াছিল—সমতলপথের গৃহে তাহার জগদ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু ঐশ্বর্যের আবেশে জ্ঞানার্জনের বৃত্তির ক্ষতি প্রায়ঃ বাধা পাইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে কিন্তু তাহা ঘটে নাই—তিনি সম্যকভাবে জ্ঞানার্জনের বৃত্তির অসীমলীন পূর্বক আপনার অপরূপ প্রতিভার পরিচয় দানে লোক সমাজকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে জগদ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে 'দেশের মন ইংরেজী শিক্ষার প্রথম দ্বাভায় একই অভিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, হিন্দুধর্মে হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা অবলম্বন হিন্দুধর্মের জার্তব্য বা রক্ষিতব্য' কিছুই থাকিত পারে না—এই সামাজিক ধারণায় শিক্ষিত সন্তানদ্বয় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পরের ঘরে ভিক্ষারী বেশে ছাড়াইতে কোন সূত্র কোন লজ্জা কোন কবিত্ব না। 'তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা অনেক অল্প শিক্ষিত প্রতিভাধীন ব্যক্তি ইংরেজীতে ছুই ছত্র লিখিয়া অভিযানে প্রীত হইয়া উঠিতেন' কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী হইয়াও সেই অভিমান সেই গ্যাতির মালকত পরিহার করিয়া 'তখনকার বিদ্যা-

জনের অজ্ঞাত বিষয়ে আপনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ পূর্বক এক অপরিষ্কৃত অপরিস্রুত অনাদৃত স্বাক্ষর পথে আপনায় নবীন জীবনের সমস্ত আশা উজ্জ্বল ক্রমতাকে প্রেরণ করিয়া যে গভীর আত্মবিশ্বাস ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ—অপরূপ! অথচ এই অপরূপ আত্মশক্তি নিয়োগের মূল গরিত-দানের অবজ্ঞামিশ্রিত অহংকারের বেশ মাত্র সম্বল ছিল না। তিনি যে দীন দীনাতাচার দেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার মূল একমাত্র স্বার্থাই প্রেরণা ছিল। তাই তিনি 'যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্য, প্রেম, যত্ন, ভক্তি, বদেহা-চরাগ—শিক্ষিত পরিণত বৃত্তির যতকিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তা-ভাড়া ধনস্বত্ব সমুদ্রই তিনি অসুদৃষ্ট ভক্তিভক্তি বঙ্গবাসীর দেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর ভিতরে অনেকের নিষ্ঠা-এবং বাংলার বাহিরে প্রায় সকলের কাছে নেভলিঙ বলিয়াই পরিচিত কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যে বাঙালীর জীবনের উপর কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন—সাহিত্যের মধ্য দিয়া শিক্ষিত বাঙালীর মনের গতি কত প্রকারে যে পরিবর্তিত পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহার অন্যতম ধারণা করা দুঃসাধ্য। সাহিত্যে তিনি ধ্যান যোগীছিলেন না—মনোবিদ্রোহী নাথের বা প্রিয়নাথের ছাত্র একান্ত মনে বিরলে ভাবের চর্চা করিয়াই তাহার প্রতিভা নিরন্তর নিরালয় যোগ-মগ্না থাকিত না। বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যে কণ্ঠধ্বগী। তাই 'সাহিত্যের যেখানে বাহা অভাব ছিল সেখানেই তিনি আপনায় বিপুল প্রতিভা ও আনন্দ লুইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্মতত্ত্ব যেখানে বখনই থাকে আত্মক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।' ফলতঃ নবীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই তিনি একটা স্রোতঃ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ছায় বঙ্কিমের প্রতিভা সাহিত্যের সকল বিভাগে উজ্জল রশ্মিধার কবিত্ব ও কথা-সাহিত্যেই যে বঙ্কিমের প্রতিভার আলােক স্রোতঃ সমধিক হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

বর্ধমান কালে বাঁহাড়া উপজাতির নামে দাসিকা

কৃষ্ণনসহ উপজাতি মাত্রকেই 'বাঁহাড়া জিনিসের' তালিকার মধ্যে নিক্ষেপ করেন তাহাদের অবশ্যই গভীর চিন্তায় বিষয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ছায় প্রতিভাসম্পন্ন দেশভক্ত সন্তান—বিনি 'ধর্মতত্ত্ব' 'কৃষ্ণচরিত্র' 'গীতার ধর্ম ও ব্যাখ্যা' প্রভৃতি এবং রচনায় আনন্দাত্ম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন—তিনি কোন তত্ত্বপ্রাণ কথা-সাহিত্য রচনায় তদীয় প্রতিভার বহলাংশে অপব্যয় করিতে গেলেন! তাহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন যে নেভলিঙ এই যুগের পুরাণ। তিনি জানিতেন আমাদের ব্যক্তিগত সমাজগত ও জাতিগত দীনতীরের সমাধাচনা ও সংস্কার এক নেভলির মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে—এবং জাতিগত সাধনা ও লক্ষ্য অসংখ্যশে নেভলির দ্বারা নিষ্কিষ্ট হইয়া থাকে। তাই যেদিন বাঙালীর জাতীয় কবি হেমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—“এ 'দেশে ভারত সঙ্গীত' লিখিয়া কুল করিয়াছি" সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' রচনার উদ্দেশ্যে—বার্ষ হইবার আশঙ্কায় নিরাশ হইয়া উঠার পরিকল্পনা তাগ করতেন নাই বরং 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—“পচিশ বৎসর পরে উহার ফল ফলিবে।” বঙ্কিমচন্দ্রের সে ভবিষ্যৎবাণী একেবারে বার্ষ হয় নাই। এইরূপ ভবিষ্যৎ উক্তি সকল দেশের মহাপুরুষেরা করিয়া থাকেন।” ফরাসী ভূমির শ্রেষ্ঠ লেখক মনসী ভিটের হিগো একবার একটা ভবিষ্যৎ উক্তি করিয়াছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটবে না কিন্তু বিশ্বের ভূর্তাণ্য যে এই বিংশ শতাব্দীতেও সে ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইবার কোন স্বপ্নও লক্ষ্য হইতেছে না। কিন্তু অফিসেসেরা কলকাতায় যুগে বৃহদা বঙ্কিমচন্দ্র যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন “যে এখন যেমন লোকে উন্নত হইয়া ধনমান ভোগারি প্রতি ধাবিত হয় একদিন মহত্ত্বজাতি সেইরূপ উন্নত হইয়া পরের হৃদয়ের প্রতি ধাবমান হইবে” সে ভবিষ্যৎবাণী সকলতার সূচনা আমাদের রামকৃষ্ণ সেবাস্রম প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এবং বাংলা গাছীর গিরিঘর লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমের স্বর্গপ্রয়াণীর দৃষ্টিগতির পরিণয় পাইয়া চমকিত হই এবং দেশপ্রাণ সন্মানী অরবিন্দ যে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বর্ঘ্য আখ্যায় কৃত্বিত করিয়াছিলেন তাহার স্বার্থকতা অস্বত্ব করি।



বহুমুখ্য আজ আমাদের নিকট একাধারে কবিত্ব-ঔপন্যাসিক হুদা সমালোচক, সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক, বিচকণ ধর্মোপদেশী, এক কথায় তিনি বাঙালার নব অস্ত্র-যেয়ে সার্থকশ্রম প্রবর্তক। যদিও তাঁহার বহু পূর্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের মতিপতি কির্যাইবার উদ্দেশ্যে প্রায় সর্গবিধ অচটানের স্বরূপাং করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কালব্যর্থে সে কার্যে অনর্থক হইয়াছিলেন। বহুমুখ্যের প্রতিভা অবলোকন্যে সেই কাহা সাধনে সমর্থ হইয়াছিল।

তিনি সাহিত্য-নির্দেশক উপন্যাস সাহিত্য উপলক্ষ করিয়া সাময়িকগে আপন ঘরে ক্রিরিতে বসিয়াছিলেন। এইবার বহুমুখ্যের উপন্যাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই অধিকারের স্বয়ং প্রবন্ধ শেষ করিব। যদিও বহুমুখ্য সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তথাপি তিনি বরচিত সমুদ্র উপন্যাস সম্বন্ধে এই নীতি রক্ষা করেন নাই। বিবর্তক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ উপন্যাস নীতায়ান পর্যন্ত সকল উপগ্রাসেই তাঁহার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। কেবল দুর্গেশনন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা ও গুণালিনী উপন্যাসে সেদূর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বদিও আধুনিক শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রফেসর শ্রীমুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের মতে বহুমুখ্য ‘কপালকুণ্ডলা’ গ্রন্থে চরিত্র সৃষ্টি ব্যপদেশে মনোহর ও সমাজতত্ত্বের একটা কঠিন প্রশ্ন দার্শনিকের সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত বিচার করিয়াছেন এবং ললিত রাবুর পূর্ণাঙ্গ বহুবর্ণিত ত্রৈলোক্যবিরাহী মুখোপাধ্যায় নব-পুণ্যায়ের বদ্বর্ণনে প্রকৃতির সহিত মানব-চিত্তের অচ্ছেদ্য বোগ প্রদর্শনই ‘কপালকুণ্ডলা’ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি সৌন্দর্যের যে চরমোৎকর্ষের দৃষ্টিকে বহুমুখ্য কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছিলেন তাহা কপালকুণ্ডলা কাব্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। কঠোর সমালোচক বর্ণীয় অক্ষরচয় সুরকার মহাপ্রয়ের মতে—‘কপালকুণ্ডলা অজিত অপরূপ কাব্যগ্রন্থ, বাঙলায় এমন আর নাই!’

সেই অজিত অপরূপ কাব্যগ্রন্থ কপালকুণ্ডলার পরি-কল্পনা কেন্দ্র—এই দরিয়াপুর!’

সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্ডলিনীর অবতরণকর্তা নব্য বঙ্গসাহিত্যের আদি সম্রাট বাঙ্গালীর চিত্তাধিপ হুজলা হুজলা মলয়কিশোরী বঙ্গভূমির মাতৃবংসল প্রতিভাশালী সন্তান বহুমুখ্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কপালকুণ্ডলার পরিচালনা কেন্দ্রে এই দরিয়াপুর অর্থ ভবিষ্যতে একদিন বাঙালী সাহিত্যসেবীর তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হইবে বলিয়া আশা করিলে, বোধ হয় তাহা একান্ত দূরাশা হইবে না।

আজ আমরা এই বিশ্বাস স্বরূপে জাগ্রত রাবির যে বহুমুখ্য দৃষ্টত আনাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার সহিত আমাদের ভাবগত অদৃষ্ট হৃদয় সম্বন্ধে বিচ্ছেদ হয় নাই। তিনি আমাদের জন্ম যে অপরূপ অবদান সন্তার রাবিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায় আমাদের সমাজকে আনন্দের আনন্দে বিলাহিত্তে বিলাহিত্তে হৃদয়ে পরিচালিত করিলে। কখনও আবর্তনে এক রাস্তায় পর আর এক রাস্তায় উদয় বিলয় ঘটিতে পারে কিন্তু বহুমুখ্যের সহিত আমাদের এই জাতীয় সংস্কৃতির বহু কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নয়—বিক্রমসাহিত্যের রত্নসিংহাসন সর্গদ্বারী কালের সুসি-গত হইয়াছে কিন্তু কালিদাসের মালকো আশ্রম অমান-বহিষ্যছে! বহুমুখ্যের প্রায়াজিও সর্গদ্বারী কালবিজয়ী হইয়া পতিতোদ্ধারী প্রায়গলিয়া জাহ্নবীর জলপ্রবাহের জায় তাহার পবিত্র ভাবধারা এই লাচিত অভিশপ্ত জাতিকে অভিবিক্রিয়া চিত্রায় ও কাহ্যে মুক্তির পথে অগ্রসর করিতে থাকিবে।



## শাশুড়ী-বোঁ

শ্রীমতী রমা দেবী

“তর্পণ” আমাদের জীলোকদের কাগজ। বড় বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি, একদল বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের নেই। আমাদের জ্ঞানে বা আসে, তাই নিয়ে আমাদের লিখতে হবে। তবে সে সব জিনিস এখন হুতো উচিত, যা পড়ে আমাদের কিছু কিছু শিক্ষা হয়, কিছু কিছু উপকার হয়। আর আমি শাশুড়ী বোঁএর বিষয়ে কিছু লিখব।

জীলোকের ভগবান পরের ঘরে ঘর করার ব্যবস্থা করেছেন। বার তের বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতা মাতা আমাদের লালন পালন করে পরের ঘরে নিয়ায় ক’রে নেয়। সেইখানেই আমাদের থাকতে হয়, সেই-খানেই পুস্ত-কলার মা হ’তে হয়, জীবনের যা কিছু সব, সেইখানেই হয়। বীদের দমায় পুখুরী দেখি, তাঁদের সঙ্গে অন্নদিনের মধ্যেই একদল সব চুকে যায়। স্ব-দুঃখ, শান্তি অশান্তি, সব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরের ঘরে ভোগ করিতে হয়। যে ঘরের সহিত একদল সম্বন্ধ সেখানে আমাদের চলা ফেরা ভাল ক’রে বুঝেই করা উচিত।

আমার বিষয়ের আগেই আমার শাশুড়ী বর্ণনাম করে-ছিলেন। সুতরাং আমি শব্দবাক্য গিয়ে শাশুড়ীর আর-যে মাতা-মত্না গাবার সৌভাগ্য লাভ করিনি। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ঘরেই শাশুড়ী-বোঁর মধ্যে সন্ধ্যা বেগতে পাওয়া যায় না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যত্নাড়া হ’য়ে সংসারের শান্তি নষ্ট হয়। কেন যে একদল হয়, তা’ ভেবে চিন্তে ঠিক বুঝা যায় না। এ জন্তই এ বিষয়ে আমি হুঁচকার কথা বলব ইচ্ছা করেছি।

নারী-জীবনের স্বামীই সকল জিনিষের সার, স্বামীর সঙ্গে বাঁরা শুধু ভোগ-স্বপ্ন বিলাসের সম্বন্ধ মনে করে, তা’রা বড় ভুল বোকা। স্বামী আমাদের ইহপরকালের

বড়। জ্ঞান হ’লেই আমাদের জীবনের যা কিছু আপন তা ভুলে গিয়ে সব স্বামীর পায়ে ঢেলে দি। আমাদের আপ-নার বলে রাধারার আর কিছুই থাকে না। যে জিনিষের সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ, যিনি আমাদের হৃদয়ের দেবতা, শাশুড়ী আমাদের সেই স্বামী দেবতার জননী। মা’র চেয়ে পুখুরীতে আর কোন কিছু বড় থাকতে পারে না।

মা’র পুখুরীতে জন্মে বেগে খেলে বেড়ায়, কেউ বড় হয়, কেউ ছোট হয়, তা’রা কেউ স্বামী কেউ জীব পুস্ত-কলার লাভ করে, স্বপ্ন শান্তি পায়, এসবই মা হ’তে। মা না থাকলে জন্মতেই জন্মতেই সব চুকে যেত। মা’র যদি এমন মা’য়ের পুখুরী না করে, তা’হলে তা’তে থাকল কি? সেও যা’ পুস্ত-সকলী তাই। আমাদের স্বামী যখন সব, আর সেই মা’র মণির, জীবনের সার জিনিষের যিনি মা, তিনি যে আমাদের কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধার জিনিষ, তা’ ভেবে চিন্তে দেখলে সকলেই বুঝতে পারবেন। যিনি আমাদের দেবতারও উপর, তাঁকে যদি সন্তুষ্ট ক’রতে না পারি, তা’হলে আমাদের সংসার করা বুঝ। আমাদের আচারে ব্যবহারে, আমাদের কথা-বার্তায় যদি সেই জীবন্ত দেবতার মনে বাধা লাগে, চক্ষে জল পড়ে, তা’হলে কি আর আমাদের কোন কিছুতে মদল হতে পারে! তাঁর দীর্ঘনিশ্বাসে আমাদের বর-করা পুড়ে ভাই হ’য়ে যাবে। তাঁর চক্ষের জলে আমাদের সব ভেসে যাবে। ভক্তি ক’রে ভালবেসে, লোকে ভগ-বানের আসন টলায়, আর মা’র মত্নে মা’র মত্নে বর-করা কি করিন কোন কাজ হ’তে পারে! আমরা যদি তাঁর পায়ে তলায় গড়িয়ে পড়ে থাকি, ভাল বলুন, মন্দ বলুন, কোন বাধ প্রতিবাদ না ক’রে তাই যদি মা’র পেতে সব ক’রে তা’রা বড় ভুল বোকা। স্বামী আমাদের ইহপরকালের

নি, আর মনের সহিত অকপটে তাঁর সেবা যত্ন করি, তা’-



হ'লে তিনি কতক্ষণ কিরূপ থাকতে পারবেন? এভাবে তাঁর অসীমতা স্বীকার করতে আমাদের মান অধমান লজ্জা স্রম কিছুই নেই। মন্স কাজ করলেই লোকের কাছে বেহু হ'তে হয়, আর গুরু গুরু মহাগুরু সেবা করলে, অহুগত হ'য়ে চলে গৌরব বেড়ে ওঠে।

হাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, দেখা সাফাং ছিল না, আলোপ পরিচয় ছিল না, তাঁদের কাছে গিয়ে বাস করিতে হবে। এ স্থলে আমরা যদি তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করি, তাঁদের অবাধ্য হই, তাঁদের চেয়ে আপনাকে উঁচু মনে করি, তা'হ'লে কি সেখানে মেলা-মেলা সম্ভব হয়, না স্বপ্ন শাস্তি থাকতে পারে। আমরা যদি একজন পরের ঘরে গিয়ে নিজে বোলআনার মালিক হ'তে চাই, তাঁদের সংসারের স্বপ্ন শাস্তি নষ্ট করে ফেলি, তা'হ'লে আমাদের চেয়ে হেয় আর কি হ'তে পারে। দোষ যে কেবল বাস্তবীর অবাধ্য বৌএর, একবার এ কথা যারা ভাবে, তারা খুবই বোকা। দোষ বাস্তবীরও আছে, বৌয়েরও আছে। তবে কারও বেশী, কারও কম। এ কথা অবশ্য ঠিক, বেশীর ভাগ জায়গায় বাস্তবীর দোষই

অধিক। কিন্তু তা'তে আমাদের বিচলিতা হ'লে চলবে না। অনেক কারণে বাস্তবীর বৌ'র উপর প্রথম প্ররক্ত ভালবাসা বেহু আসতে পারে না। সে সব কথা বলতে গেলে প্রবন্ধ খুব বড় হ'য়ে পড়বে। আমরা যদি তাঁর ভালবাসা, বিরোধ, ভালকথা, মনকথা, গ্রাহ না করে, নিজের মধুর ব্যবহারে তাঁকে সম্বলিত করতে পারি, তা'হ'লে এ অশান্তি আসতে পারে না। বেহু ভালবাসায় বাধা ভাঙুক পোষ মানে, আর মাহুযকে আপনায় করা কি কঠিন কাজ। আমাদের সকলের একত্র প্রাণপাত করে, এক-মাত্র ধর্ম ও কর্তব্য মনে করা উচিত।

অতএব আমরা পরের বাড়ী গিয়ে, তাঁদের সংসারের শাস্তি নষ্ট করবার কারণ যেন না হই এবং নিজের আচার ব্যবহারে, কথা বাস্তবী, চালচলনে, তাঁদের সম্পূর্ণভাবে যেন আপনায় করে নিতে পারি। নিজের মধুর ব্যবহারে সেই সংসারের সকলের চেয়ে পুজনীয় বাস্তবী ঠাকুরাণীর বেহু, মায়, আদর বহু লাভ করে এই নারীস্বীককে দখল করে, গুণের বৌ বলে খ্যাতিলাভ করতে পারি। এই করে মহত্ত্ব জীবন সার্থক করাই বাঞ্ছনীয়।

## পুরাতন স্মৃতি

শ্রীঅলকা দেবী

ফুটেছিল একটি গোলাপ—  
একপাশে এক বনের ধারে,  
ছায়া-শীতল সমীরে তাঁর  
লুইত স্বপ্না ভায়ে ভায়ে।

একটি অলি সদোপনে  
বাচত এসে একটু স্বধা,  
পিরোলা ভরে বদুরা-বধু  
মিটা'ত তাঁর প্রাণের ক্ষুধা।

পথে যে'তে বাদশাজাদা  
শোয়ার থেকে লক্ষ্য করে  
কঠোরতম একটি টানে  
পরগটি তার নিল হরে।

শেষ-বিদায়ের অশ্রুতপা  
মিলা'য়ে গেল সমীরণে;  
বেধনাতুর অলি আঙ্গণ  
ব্যাহুল হ'য়ে গিয়ে বনে।

## সব সাধ যদি মিটিত ধরায়—



হঠাৎ দেবিহু যেন হৃন্দরীর দল  
শোহাগেতে যেহি মোরে হালে বল বল

অভিমানে কারো হেরি আঁখি ছল ছল  
তবু রূপ-কৃষ্ণা মিটিল না—জীবন বিফল!





## রক্তজবা

শ্রীশ্রীচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

১

মাঝে তার ইচ্ছায় তার ভ্রমকালটাকে এগিয়ে বা  
পিছিয়ে নিতে পারে না।—যদি তা সম্ভব হ'ত!...কি  
দুঃস্থ খেয়াল! তাতে কিন্তু পৃথিবী অকালে এতগুলো  
যৌবন সম্পন্ন হ'তে বঞ্চিত হ'ত না! অগুণ স্বপ্ন-শাস্তি  
বিরাজ কর্তৃক ধরা-মার বৃকে। ধরনী মা! তোমার  
বৃকে আমার এতগুলো দিন, মাস, বছর কেটে গেল—  
তা'তে বা বেখলেন—শুধু অশান্তি; যেটির যার সঙ্গে  
যোগ হওয়া উচিত ছিল, সেটা হয়নি। এই বিসদৃশ  
বিশ্বাস আমার স্বপ্নে মরতে গিয়ে না!...জন্ম—শুধু জন্মই  
তার জন্ম একমাত্র দায়ী...একে যদি কেউ বোধ করতে  
পারত!...আমি যদি চিরদিন জন্ম-শিশু থাকতুম!...  
তাই ভাবি, সংসার-ধারার উপর ভগবান মানুষকে কারি-  
গরী করবার অধিকার না দিয়ে বড় অজ্ঞার করেছেন। এই  
আজ এই জানালার ধারটাকে বসে আমি ভাবি এই  
বিভাবুদ্ধির আমার ত' কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাই,  
যিনি আমার জ্ঞান-বিকাশের প্রথম সহায়তা করেছিলেন,  
তার মত অপরাধী আমার কাছে! আজ আর কেউ নয়!...  
ওই যে ঘড়িওয়াল চোখে ঝুলি-চশমা লাগিয়ে একবার  
ঘড়ির ছোট ঘাট অংশগুলোকে দেখে নিচ্ছে, তা'র পর  
গুট-ঘাট করে কাজ করে যাচ্ছে—ভগবান আমার শুধু

এটুকুই যোগ্য মনে করলেন না কেন!...তার বেশী  
মনে করবার কোন সার্বকথাই আমি বুঝে পাই না!  
...উঃ! হাওড়া ঠেশেই প্রথম যেদিন এসে পাড়ানুম  
সে দিন চোখের সামনে শুধু একটা বিরাট বিশ্বাস। সমস্ত  
যায়গাটা যেন মোটা-বওয়া মাছের সীমাহীন একটা  
মেলা!

...যে ভাড়াটে বাড়াটায় আমরা এলুম সেটা কণ-  
কাতায় স্থাপিত শিল্পের প্রথম নিদর্শন বললেও কিছু মাত্র  
অতৃপ্তি হয় না! ঠিক যেন শীতের রাতের জড় পাওয়া  
এক ঘোড়া! ঘরের কাটল দিয়ে ছোট ছোট বটগাছের  
শেকড়গুলো বেরিয়ে পড়ে ছেলেবেলার পাতালপুত্র  
নাগকন্ডার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।...

উপরে হইলেন আমাদের বাড়ীওয়ালার তাঁর পুত্র-  
পরিবার নিয়ে। নীচে হইলাম আমরা। আমাদের  
বাড়ীওয়ালার আবার আর এক জন্মের ভাড়াটে, তাঁদেরই  
নিজবাড়ী। যাই হ'ক স্বপ্নের স্বপ্নের মত আমরা হইলাম।  
বয়েস তখন কত আর হ'বে—বড় ছোট চোদ!

ছোয়াতি আমাদের বাড়ীওয়ার বো। উপরের  
অংশের সমস্ত ছোট-বড় কাজগুলি তা'কে ভোর থেকে  
রাত দশটা এগারটা অবধি করতে হ'ত। আমি স্বপ্নের  
ভাল ছেলে, ভোরে উঠেই পড়া হুক করতুম—স্বলে যেতুম

...সাড়ে মটার পর ভয়ে পড়তাম। শুনেছিলাম সে  
বাড়ীওয়ার বো—এই পর্যন্ত, দেখা হয়নি। পকার  
বছরের বাড়ীওয়ালার—তা'র বো। দেখবার বিশেষ  
উৎকণ্ঠা ছিল না। আমি ভাল ছেলে, আমি পড়তুম।...

রাতে পারিনি ভাই। শুধু ভাড়াভূক্তি দিয়ে ধেরে কেতে  
হ'বে।

আমি নতমুখে নীরব হ'য়ে হইলাম।  
তবু যে ভাতও চুটে। দিতে পেয়েছি, এই কত!...

ইহুনের ভাত ত কখনো রাঁধিনি। কত ভয়  
হচ্ছিল—তা হ'ক—তুমি ত আর হুটম মাহব নও যে  
লজ্জা!...পায়েস, আম, মিষ্টি বিকেলে খাবে, পড়ে এসে।  
...ভারি ত ঝাণ্ডা, তা'র জন্তে আবার ইহুগ কামাই!...  
এদনি ছোয়াতি কত কথাই বলে যাচ্ছিল!...আমি প্রায়  
পালার সঙ্গে মাথা একেবারে খেয়ে চলছি!...এর জন্তে  
পরে কত ঠাট্টাই শুনেছে হয়েছে!

ছোয়াতি একবারটি গরম দুধ হাতে করে ঘরে ঢুকতেই  
ভয়ানক রকম চমকে উঠলুম...

ছোয়াতি বললে, পছন্দের কি দিনের বেলায় ভয় কাকে!  
কাছে বসতে পারবো না ভাই, কিছু মনে নিয়ো না!...  
আমি ন'বছর বয়েস থেকে এই পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত  
এইখানে ঘর করে আসছি...কত দিন চুটে। রাত পর্যন্ত  
এই বাড়ীতে একলা কাটিয়েছি...আমার ত ভয় করে  
না!...

...ভাতের সঙ্গে নাকটা ঠেকে গেল। লুকিয়ে আমার  
হাতটা দিয়ে নাকটা মুছে ফেললুম, ছোয়াতি কিন্তু তা  
লক্ষ্য করতে ছাড়লেন না!...

হরিদ্বারের চট্টার ফটকটানী শোনা গেল। তিনি  
বাক্সার থেকে ফিরছিলেন। ছোয়াতি উঠে গেল। হরি-  
দ্বার ছেলেবেলা বকতেন বোধ হয়। আমিও উঠে  
পড়লাম।...

হরিদ্বারাল বাস্তু হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, এই যে।  
আমারও বাড়ী ঢোকা, তুমিও উঠে পড়ো!...আমার  
দেখলে কি ঝাণ্ডার বিতৃষ্ণা হয়ে যায়!...আজ্ঞা ভয় কি  
ভাই, এগুলো মারা যাবে না—বিকলে হ'বে।

ছোয়াতি এসে আসতে আসতে বলল, তোমার আসতে  
দেরি হচ্ছিল...আমি খুবী দুখ থেকে—

বেশ ত! বৈশী দুখ ওবেলায় আমিই নিও। আর  
এগুলো ওবেলা পছন্দ করে দিবে।

ছোয়াতি মুখ স্বরে বলল, তা'হলে আমি যা ঝাণ্ডা

ভাত নিয়ে এসে বললে, ইহুনের ভাত, এখনও কিছু



বলেছি সেগুলো ও কখন যাবে! এগুলো তো তোমার দেওয়া।

হরিদয়াল বললেন, ভেবো না, রাত্তির আছে, কাল সকাল এখনও পালায় নি। আর একটা অংশ ও থেকে আমার জন্যে রেখেও যদি দাও, তাহ'লেও তোমার নূতন দেওরটা বিশেষ স্বরূপ হবেন না।

এইরূপ সহজ কথাগুলোতে তাঁর সম্বন্ধে একটু আশে যে-বিশ্বাস ধারণা আমার মনে স্থান পেয়েছিল তা নিম্নে প্রবেশ পূর্বে গেল। আমি কৃত্তো স্থগারি এলাচ লবঙ্গ মুঠো ভর্তি স্নোতিস্ত্রি হাত থেকে নিয়ে নীচে নেমে এলাম।—সুন্দের বোলা হয়েছিল। এই আমার একতারা থেকে গোতালার প্রমোদনের বিবরণ। এ রিনটা আমার স্ত্রীর খাতায় সোণার কলিতে লেখা থাকবে।

বিকলে স্থল থেকে ফিরে, মুখ হাত মুতে না মুতেই স্নোতিস্ত্রি একতারা কমলিত্রি নিয়ে নেমে এল। আশ্চর্য্য তাই—সে রিন আমার নিমন্তনার মাটা ধুইয়েছিল। তাই স্নোতিস্ত্রি চলে গেলেও যে বাড়ীতে তার স্পর্শ ছিল, যার মাটা তার চরণগুলি-পূত—সে বাড়ীকে আজও ছাড়তে পারিনি। তার আলোয়া-স্বতি এই বাড়ীটাকে হানা বেধে, আমি জনহীন বাড়ীটার এক ঘরে পড়ে রক্ত ভুলে মেখে রঙিয়ে তুলি। তারি সেই রক্তবর্ণা বৃষ্টি তার ছোট পা দুটির ছাপ।...

স্নোতিস্ত্রি পালাটা নামিয়ে বলল—এইগুলো তোমার দাবার দেওয়া, এইগুলো বঙ্গীর মামার বাড়ীথেকে এসেছে—আর এই কটা আমার। এ কটা সব রেতে হ'বে।

সে রিন আসর সূর্য্যের বিদায় বেলায় তার কণ্ঠে যে সহজ অধিকারের স্বর সীলায়িত হয়ে উঠেছিল—আজ জীবনের বিদায় বেলায়ও যেন সেই স্বর স্পষ্ট শ্রুতে পাচ্ছি।...

আমি বললাম—অত খাবার আমার এক হস্তার খোরাক—তা হলে ত খুবই খাইয়ে।—এস, আমার সঙ্গে এস। আমার কাছে বসে গল্প করতে করতে সব ফুরিয়ে যাবে।

এস, তোমার দাদা নেই বেরিয়ে গেছেন।

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না।—

—তার মনে যেন কত যুগের কথা, কত যুগের প্রাণ জুগিয়েছিল। আমার যতটুকু প্রাণ সে ছেদে নিলে। এই রক্ত প্রস্রাবের হাঁকে খাবারের খালাটো প্রাণ ফাঁক হয়ে এল।

দেখ দেখি কোথা দিয়ে সব ফুরিয়ে গেল। দুটির পর রোজ উপরে এসে গল্প করে করে জল খেতে হবে এবার। একলা থাকতে তোমার এত ভালোও লাগে ভাই। আমার প্রাণ ত আর না পেরে হাঁপিয়ে ওঠে।

সে বারও আমি 'না' বলতে পারিনি।

স্নোতিস্ত্রি বলে চলল—জল খাওয়া হয়ে গেলে তুমি বেড়তে চলে যা'বে আমি আলোয় তেল দেবো, কাছ সাধু।...

সে রিন বোরখা-পরা বাড়ীর আড়ালে কখন হ'ল। অত গেল টের পাই নি। মা মরার পর এমন যেহ আর কেউ করেনি।...

৩

বাড়ীর সকলে কিরে এলেও আমার উপরে পাওয়ার অধিকার কেউ হাত দেয় নি। কারণ সে অধিকার-দাত্তা যে স্নোতিস্ত্রি নিজে। বিকেলবেলার থানিকটা এমনি করে বেশ কাটিছিল। দিন, মাস, বছর—এরা যাবার সময় প্রত্যেকেই সাধ্যমত বহনটাকে এগিয়ে দিয়ে যাক। তাই আমি যখন যোলর ঘরে, স্নোতিস্ত্রি আমার চেয়ে তখন এগিয়ে—আর আমার আঠারো ও স্নোতিস্ত্রির উনিশ।...সেইখানটায় যে একের তদ্ব্যবস্তি বিবন্ধ কিছু নয়—এটুকু আমি না জানলেও আর একজন ভেদে-ছিল।—

কি একটা বিষয় সংক্রান্ত মামলার দরুণ হরিদয়ালকে ধানবার যেতে হয়েছিল। কয়েকটা দিন বালে তাঁর আসবাবের কথা। স্নোতিস্ত্রি ডাকে আমি উঠরে গেলুম।

স্নোতিস্ত্রি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, আমার একখান কাপড় দেবে না?

তার মানে!

তোমার দ্বিধামাকে বলছিলাম যে যাই বেকসলই তাঁকে

একখানা ভাল ছুখে গরম স্কিন দেবে। তা আমার কথা বুঝি আর একবার মনেও হল না।

আপনি বুঝি তসার পরেন!

তসার পরলেও কাপড় পরি।...তবে!

আপনি কি মনে করেন আমি যে নাটকটা লিখিচি ওখানা বা'র হলেই বিক্রী হবে?

তা জানিমে। যদি বিক্রী না হয় ত তোমার দ্বিধা-মারও হবে না, আমারও হ'বে না। আর যদি হয়—

আপো হ'ক'ই—পাড়ান—

তবু দিতে মন সরে না? এ অপাজে দান নিবেশ বৃষ্টি! এ কথাই আমি কি বলব।...

স্নোতিস্ত্রি হঠাৎ শীর্ণ দীপশিখার মত কেঁপে উঠল।

আমি তাড়াহুড়ি বললুম, আপনি সত্যিই বলছেন এ আমি ভাবিনি।

...বাসি, পশ্চৎ...তুমি আমার কাপড় দেবে সে

কাপড় পরতে আমি সত্যিই ভালবাসি!...আমি তোমার ভালবাসি পছন্দ, তাই তোমার দানও বড় ভালবাসি।...

তুমি বল পছন্দ আমার মন উঠু হয়ে বাঁধা...ভুল, সব ভুল—পছন্দ। তাই নাইলে তোমার দেখে আমি কেন

আশ্চর্য্য করতে পারিমে। কাছকর্ষের মধ্যে নিজেকে ছুঁবিয়ে দিয়ে ভেবেচি তোমার কথা মনে আনব না—

উল্টো বিপত্তি—সব ভুলে তোমায় ভেবেচি!...পারিনি, তোমায় ভেবেচি—সদ্য হলেই তোমায় ভেবেচি।...

ওকি ভাই চুপ করে রইলে যে!...আমায় আর লজ্জা করে না, তুমি যে আমার সন্তান-দীপ। তুমি যে আমার

সম্মান সাধা...লজ্জায় হেঁট হয়ে রইলে। কিন্তু কি কর্তব্য আমি!...আমার জীবন মরণ যে তোমার নামের

স্বরে গাঁথা হয়ে গেছে। তাই আর আমি আমার ছলনা করতে পারিনি।...ভয় করো না, পছন্দ—আমি তোমায়

কেড়ে নেবো না, তুমি শুধু বল আমার আমি আশ্রয় করিনি কিছু।...

কি দুঃস্থান মানসিক উজ্জ্বল। এত আকর্ষক। বেশ মনে পড়ে এ কথা উত্তর দিতে গিয়ে আমি শুধু শুদ্ধ

মুষ্টির মত বসেছিলাম।...কত কথা আমার মনে হল, তবু যুগে এলনা।

—রোজ এমনি সময় যে তুমি ছুইত। আজ কথাও কি ছুরিয়ে গেল!...বলবে না?...

বলব...

কী বলবে তুমি!...বল...বল...

নীচের পোরে কড়া খটখট করে বেজে উঠল। হরিদয়াল ফিরেছেন। তাঁর ভাক শোনা গেল—রেণু...রাণী...

বেণু মা স্নোতিস্ত্রি সেই মুহূর্তে আত্মদর্শন করে নেমে

গেল। অন্তরের দারিদ্র্য বৈদ্যনা সংসারের কঠোরতার

নীচে সম্বন্ধ থেকে কত স্নোতিস্ত্রি এমনি করে নিঃশব্দে

পুরুষের মন জুগিয়ে চলে।...

ভয়ে ভয়ে নীচে নামলাম। এই বিশিষ্ট ব্যাপারটা

কেউ যদি শুনে থাকে...আমার হতভয়ের শাশু শিষ্ট

হলেটা এই ভয়ে আত্মল হয়ে উঠল।...নেমে দেখলুম—

আমরা মিছে, নীচের সবাই তখন এক বাসনওয়ালাকে

নিম্নে মরা যাত।

...সমস্ত খটনাটা নীচে এসে ভাবতে চেষ্টা করলাম।

প্রায় সবটাই অস্পষ্ট হয়ে রইল। আজ যতটুকু বুঝতে

পারি!—তার মধ্যে যে প্রাণদহী নারীটা ছিল এতদিন

মায়ের পছন্দকে পেয়ে তার প্রাণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হ'ল।

তুহিতের মত সে খুটে এল আমার কাছে অমৃত নিম্ব

আশায়, কিন্তু আমি তখনো জাগিনি, আর যদিই বা

জাগেছিলুম ত তার জন্মে প্রস্তুত হইনি। তাই সে

আমার কাছ থেকে সাশ্বনার একটা ছোট কথা পর্যন্ত

পায়নি।...আজ এই জনহীন বাড়ীর নিরালা ঘরটিতে

পড়ে আমার মনে কতকথাই তার নামে রচে যাই।

তাতে কি তার কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এর বেশী

কিছু করবার ক্ষমতাও আমার নাই।...

সেইদিন থেকে স্নোতিস্ত্রি যেন বদলে গেল। দারিদ্র্য

মত অতি বৈদ্যনা যেন সে মুক হয়ে রইল।...ঝড়ের পর

শাশু সমুদ্র যেমন—তেনি।...

হরিদয়ালের শরীর ভাল না থাকায় তিনি সেদিন

ফিরে আসেন। যদি কঠিন রোগ ধরে তাহলে তাঁকে

দেখবে কে, এই ছিল তাঁর আশা। সে আশা যে

তাঁর অমূলক নয়—এইটে প্রমাণ করতই যেন তান

জন্মে পড়লেন।



ডাক্তার এল; অনেক রকম করে পরীক্ষা সেবে  
স্বাভাবিক সময়ে একটামাত্র কথা বলে গেলেন, এ কাশ।  
অনেকদিনের পুরোশো, খাওয়ার হেফাজতে চাপা ছিল—  
এখন আর থাকে না।

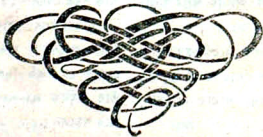
...এত দ্রুত! মানুষের জীবনের গতি এত দ্রুত  
যেমন যায়! যেন ঘড়ির পেডুলাম—শেষবারও যখন সে  
বোল খেল তখনও ঠিক বোকা গেল না যে ঐটেই তার  
শেষ সঞ্চলন।

সেদিনের বীতংস স্মৃতি—আজও সবটুকু মনের মধ্যে  
থবে রেখেছি।—আবধব্রতের অশ্রুত বর্ষা...যেমন জল  
তেমনি পাগল স্বপ্ন...খুঁজড়ে বাড়ীটার হাড় পাঁজরাগুলো  
সব কাঁপচে। মাথার উপরে ছোট ছোট পাছগুলো  
ছাতের গুণের লুটোপুটি খাচ্ছে। একটা রাত-চরা পানী  
জল বড়ের কাপটা বেয়ে মাঝে মাঝে চাঁককার করে  
উঠছিল...এমনি ছুঁতেগে ভীষণ রাগে জ্যোতির আঁর্শ  
চাঁককার বার হয়ে পৃথিবীর সমস্ত রক্ত তাওবকে ছাপিয়ে  
উঠল।...কি রকম!...

আজ মাঝে মাঝে হরিদ্বারের মৃত্যুর কথা ভেবে  
চোখে জল রাখতে পারি না।—

হ'ন তিনি বিগত যৌবন, হ'ক তাঁর তৃতীয় পক্ষে  
বিবাহ নীতির অভ্যাস, কিন্তু জ্যোতির কোলে নিশ্চিত  
বিবাহে মাথা রেখে যখন তিনি তাঁর রানায়মান দৃষ্টি  
দিয়ে গৃহ-বিধবানিকে শেষবার দেখে নিলেন তখনও  
যে তিনি জানেননি—জ্যোতি তাঁকে সমস্ত জীবনের  
চেঁচাতেও ভালবাসতে পারেনি! অসহায় বলে তাঁকে  
গুপ্ত স্ফূর্তি করেছে...

তাঁর জীবনের সব চেয়ে রকম অংশ বোধ হয় এই।  
নিজের তাকপোর গৌরবে তাই আমি উৎফুল্ল হ'তে  
পারিনি।...



...পরদিন জ্যোতির ভাই এসে সিত-বসনা জ্যোতিকে  
বাড়ী নিয়ে গেল। গাড়াতে গিয়ে যখন সে বসে, মাথার  
কাপড়টা তার খসে পড়ে।...জ্যোতি যেন রোজের মৃতি।  
...হরিদ্বারের চিত্তাঘ্রিতে সে যেন তার সঞ্চলন  
শেষ করে দিয়ে এসেছে।—মাশা শিতিটা তার রাশি  
শেষের শুকতারার মত দগধণ করছিল...ঠিক মনে আছে,  
আমার ঠিক মনে আছে।

জ্যোতি চলে গেল। যেন বেড়াতে এসেছিল,  
বেড়ান শেষ হওয়ায় চলে গেল। সেদিনও সন্ধ্যা হ'ল,  
নীচে আমাদের উনিশের আঙন পড়ল...উপরতলায় শুধু  
আলো জ্বলল না, প্রতিদিনের মত জ্যোতি সেখানে ঘুরে  
বেড়াল না। সেদিনের রাত্রি সন্ধ্যা যেন বিধবা, তার  
বুকে কোনো উৎসবের সাজা নেই।

• • •

• সন্ধ্যা এখনও আসে। শুধু উপরে ওঠা যায় না।

আমার জীবনে উনিশবার বসন্ত এসে ঘিরে গিয়েছিল  
অনাদৃত, উপেক্ষিত। হৃদির ক্ষেপে আমি পূর্ণ চেতন  
পেশাম, কাউকে আমার চাই, তাকে না হ'লে চলে না।  
আমার বুকের কটি-পাথরে যখন এতজনের রাগ ধরা  
পড়ল তখন সে আর আমার কাছে নেই। বসন্তকে  
আমার বুকের অঙ্গণে অভ্যর্থনা করতে সেলাম...হাত  
উঠল না।...

জ্যোতির স্মৃতির গোড়াপাশা বুকে ধরে এমনি ভাবে  
পড়ে আছি...দিনের পর দিন...রাত্রির পর রাত্রি...।  
বুকে ছেঁড়া বস্ত্র তুলে বিধবার পায়ে আলতা পরিবে দিছি  
...এ বাড়ীর মাতিকে রক্তজবা দিয়ে সাজিয়ে তুলছি  
সবয়ে...। কে জানে এ হরিদ্বারের অভিশাপ কিনা,—  
জ্যোতির মনস্তাপ নয়।



মহানগরী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পরিচালক  
সানি সঞ্চলন

## সত্যের পরীক্ষা

রক্ষা-কবচ

আমি ভেজিটারিয়েন সোসাইটীর কার্খানীকাক  
সমিতির সভ্য হইবার পর প্রত্যেক সংমেলনে উপস্থিত  
ধাক্কাতেম বটে কিন্তু কখনও কোনও বিষয়ে বাস্তবদৃশ্য  
করিতে সাহস হইত না। ভাঃ গুডকিঙ্ক আমায় বলি-  
তেন—“আপনি তা' আমার সঙ্গে বেশ কথা বলেন কিন্তু  
সভায় ত কখনও কিছু বলেন না; আপনি ঠিক পুরুষ  
মুখমিকার মত” তাঁহার এই সরল পরিহাসের সত্যতা  
আমি ব্রহ্মতাম সভ্যই আমাকে বড়ই অলস দেখাইত—  
সকলেই যখন কোন না কোন বিষয় লইয়া ব্যস্ত আমি  
তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম—আমার যে বলিবার  
কিছু ছিল না তা' নয় তবে নিজেদের মত মুখে প্রকাশ  
করিতে পারিতাম না। এইরূপে কিছুদিন কাটিল।

ইতিমধ্যে একটা গুরুতর বিষয় মীমাংসার জন্য সভায়  
উপস্থিত হইল। এ সময় অল্পপরিচিত ব্যাংকও নয় অথচ  
চুপ করিয়া একদিকে সম্মতি দেওয়ার কাপুরুষতা বসিয়া  
মনে হইল। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইরূপ :—এমমস আয়ারণ  
ওয়ার্কসের সর্বাধিকারী মিঃ হিলস আমাদের সভাপতি  
ছিলেন। তাঁহারই আর্থিক সাহায্যের বলে আমাদের  
সভাপতি ছিলেন। তাঁহারই আর্থিক সাহায্যের বলে  
আমাদের সোসাইটি চলিত। তিনি সৎকে বড়ই গোঁড়া  
ছিলেন। অধিকাংশ সভ্যই তাঁহার সাহায্য প্রার্থী  
ছিলেন। নিরামিষ খাদ্যের বিখ্যাত প্রচারক ডাক্তার  
এলিঙ্গনও এই সোসাইটীর সভ্য ছিলেন, তিনি

জমনিয়ন্ত্রণ সংঘে দরিদ্র ও মজুর প্রতিনিধির মধ্যে  
বক্তৃতা করিতেন এবং তৎসংঘে কৃত্রিম উপায়  
সমূহ তাহাদের শিক্ষা দিতেন। মিঃ হিলস বলিতেন  
সমস্ত উপায় প্রচার করাও নীতির মূল বুঝারামত করা  
একই কথা। তিনি মনে করিতেন ভেজিটারিয়েন  
সোসাইটীর উদ্দেশ্য কেবল খাদ্যসংস্কার নয় নৈতিক  
সংস্কারও বটে স্বতন্ত্রাং সাধারণ একজন নীতিগঠিত মত  
পোষণ করেন একজন লোককে এ সভায় থাকিতে দেওয়া  
উচিত নয়। ডাক্তার এলিঙ্গনকে এই সভা হইতে অগ-  
মারিত করিবার একটা প্রস্তাব উঠিল। আমি ডাক্তার  
এলিঙ্গনের প্রচারিত মতগুলিকে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত  
অহিতকর বলিয়া মনে করিতাম এবং মিঃ হিলসকে  
আমি তাঁহার স্বাভাবিক বদাভ্যন্তার জন্য শ্রদ্ধা করিতাম।  
কিন্তু খাদ্য সংস্কার সভার, নৈতিক সংস্কার করিবার ক্ষমতা  
তিনি অস্বীকার করায় তাঁহারকে এই সভা হইতে বিহৃত  
করাও আমি অস্বীকার বলিয়া মনে করিতাম। মিঃ  
হিলসের আপত্তি ব্যক্তিগত বলিয়া আমার মনে হইল  
ইহার সভার কোন সমস্যা ছিল না। সভার একমাত্র  
উদ্দেশ্য নিরামিষ খাদ্যের প্রচলন ও পরিবর্জন ইহার  
সহিত নীতির কোন সমস্যা নাই। আমার মতে নিরামি-  
ষাশী মাঝেই এই সভার সভ্য হইতে উপযুক্ত অর্থ বিষয়ে  
তিনি কি মত পোষণ করেন তাহা আমাদের দেখিবার  
প্রয়োজন কি? এই বিষয়ে আমার শীঘ্র মত ব্যক্ত করা



উচিত বলিয়া মনে করিল। কিন্তু কি উপায়ে তাহা করা যায় তাহাই হইল সমস্যা—বক্তৃতা করিবার সাহস আমার ছিল না। হুতরাং নিজের মতামত লিখিয়া কাগজটী হইয়া সভায় চলিলাম—আমার যত্নের মনে হয় প্রবন্ধটী ঠাড়াইয়া পড়িবার মত সাহসও যোগাইল না অথচ। সভাপতি মহাশয় আমারে স্বাভাৱ প্রবন্ধটী পাঠ করাইলেন—ডাক্তার এলিঙ্গমেনের দল হারিলেন। হারিলেও এটুকু সাহস না ছিল যে ভাষের পক্ষে পরাজয় অজ্ঞানের পক্ষের জয়ের চেয়ে ভাল—এই ঘটনার পর আমি উক্ত সভার সভ্যের পর তাগণ করি।

আমার এই সভা সফলিত ভাব যতদিন বিলাতে ছিলাম ততদিন সমতাব্যেই ছিল। এমন কি যখন কোন সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতাম তখনও পাঁচ ছয়দলের বেশী একসঙ্গে একত্রিত হইলে আর আমার মূগু দ্বিগা কথা বাহির হইত না।

আমি একবার মিঃ মজুমদারের সহিত ভেটনরে গিয়াছিলাম। সেখানে এক নিরামিষভোজী পরিবারে আমার আশ্রয় লই। “রি এথিক্স অব ডায়েট” নামক পুস্তকটির প্রকাশক মিঃ হাওয়ার্ডের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি স্থানীয় নিরামিষ খাদ্যের উৎকর্ষকল্পে স্থানীয় সভায় আমাদের বক্তৃতা করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। আমি জানিতাম এ দেশে বক্তৃতাটী প্রবন্ধদ্বারা লিখিয়া সভায় তাহা পাঠ করা লক্ষ্যজনক নহে—বরং অনেকে বক্তৃতাটী হাতেতে বেশ সরল সংক্ষেপ ও সহসংক্ষেপ হইয়া সেই-জন্ত এই পথ অবলম্বন করেন। হুতরাং আমিও একটি প্রবন্ধ লিখিলাম। সভায় গিয়া তাহা পাঠ করিব বলিয়া উল্লেখ্য ঠাড়াইলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না যদিও বক্তৃতাটী অতি সংক্ষিপ্ত তথাপি পড়িতে গিয়া কাগজখানি বাগদা দেখিতে লাগিলাম হাত পা কাঁপিতে লাগিল। মিঃ মজুমদার আমার পরিবর্তে ওই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যুব-ভাল হইয়াছিল সকলে যুব প্রশংসা করিলেন। আমার অক্ষমতায় আমি লক্ষ্য হইতে অক্ষিত হইলাম।

বিলাতে বক্তৃতা করিবার আমার শেষ চেষ্টা, যখন আমি যথেষ্ট প্রত্যাগমন করি সেই সময়। দুর্ভাগ্যক্রমে

এবারেও পূর্বস্কারের মত কেবল নিজেকে হাতশাম্প করি। আমার নিরামিষভোজী বন্ধুবান্ধবগণকে হবং রেস্তোরাঁয় ভিনার বাইবার নিমন্ত্রণ করি—এরূপ রেস্তোরাঁয় নিরামিষ খাদ্যের আয়োজন একটু অভিনব হুতরাং আমার এই উদ্দেশ্যে বহুগুণ আনন্দের সহিত যোগদান করেন। পাকাতো আহাৎ কেবল রসনার তৃপ্তির জন্ত নয় ইহার আয়োজনেও উপভোগে শিল্পীর নিপুণতা ও অহুত্বের প্রয়োজন। ইহাদের আহাৎের সহিত বাহ্যিক আভরণ, সজ্জা সশীত ও বক্তৃতা সবই প্রয়োজন। বক্তৃতাকালে যখন আমার পালা আসিল—আমি মাত্র একটা কথা বলিয়াই কাত হইলাম আর বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না।”

আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে এ দারুণ সম্ভাটকে কথঞ্চিৎ দমন করিয়াছিলাম। পূর্বে হইতে প্রস্তুত না হইলে কিছুতেই বক্তৃতা করিতে পারিতাম না। শ্রোতাদের মধ্যে বেশী অপরিচিত লোক দেখিলে আমার বক্তৃতার ক্ষীণশ্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইত।

এই লক্ষ্যের জন্ত মাঝে মাঝে হাতশাম্প হওয়া চাড়া আর কোনও অহুত্বই ভোগ করি নাই, বরং প্রকৃতপক্ষে ইহাতে অনেক লাভই হইয়াছে। ইহা হইতে আমি বাকসংযম শিক্ষা করিয়াছি হুতরাং সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-সংযমেরও সাহায্য হইয়াছে—সেই জ্ঞান আমি বিনাশিয়ার বসিতে পারি আমার বাক্যে বা লেখায় কোনও অসংযমের পরিচয় দিই নাই এবং যাহা লিখিয়াছি বা বলিয়াছি তাহার জন্ত কখনও ক্ষমতাগত করিতে হয় নাই। অভিজ্ঞতার জ্ঞানিয়াছি যৌনতা, সত্যপ্রিয় বা আধ্যাত্মিক সংযমের অগ্র বিশেষ। সত্যকে অতিরিক্ত জ্ঞান, গোপন কথা ও বিবর্ত করা আমাদের বাস্তবিক দৌর্লভ্য হুতরাং এই দৌর্লভ্য এড়াইতে হইলে যতটুকু যৌনাবলম্বন করা যায় ততই ভাল। অল্পভাষী ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত রখনও কোনও কথা বলেন না। হুতরাং দেখিতেছি আমার এই বাস্তবিক সজ্জা ও সজ্জাত প্রকৃতপক্ষে আমার রক্ষক হইয়াছে—ইহা আমার বিচার ও বিবেচনা শক্তি বাড়াই-

য়াছে এবং সত্যের স্বরূপ চিনাইয়া দিয়াছে।

### অসত্যের বীজ

চলিষ বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক তুলনায় অতি সামান্য মাত্র ছাত্রই বিলাতে পড়িতে যাইত। বিবাহিত ছাত্রেরও অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিত তখন এইরূপ রীতি চলিত ছিল। বিলাতে ছাত্র জীবনে কেহই বিবাহ করেন না কারণ সেখানে ছাত্রজীবনের সহিত সামাজিক জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা অসম্ভব। পুরাকালে আমাদের দেশে ছাত্রেরা কঠোর তপস্বী পালন করিত। এখন বাস্তব-বিবাহ বেশ চলিত হইয়াছে। ভারতীয় যুবকেরা যে দেশে গিয়া নিজদেশের বিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিত। সত্য গোপনের আরও একটি কারণ ছিল। সত্য প্রকাশ হওয়াট, তাহাদের আশ্রয়ভাড়া পরিবারের অনুভূতি হুতরাং সত্য প্রকাশে মেলামেশার পথে সম্ভাব্য হইত। এরূপ মেলামেশা নির্দোষ এবং সেখানে পিতামাতা ইহার পক্ষপাতী। সেদেশে যুবকেরা নিজে পত্নী নির্মাচন করেন সেদেশে এরূপ মেলামেশা নিতান্ত প্রয়োজন—কিন্তু এদেশের যুবকের পক্ষে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক—ভারতীয় যুবকেরা যদি তাহার অমূল্যরূপে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার পরিণাম বড় ভাল হয় না, ইহার প্রমাণও যথেষ্ট দেখা গিয়াছে। এই সম্ভাব্য ব্যাপি হইতে অসত্যও নিস্তার পাই নাই—যদিও আমি বিবাহিত এবং পুত্রের পিতা, তথাপি নিজে অবিবাহিত বলিয়া চালাইতে ছিলাম। এইরূপ সত্য গোপনে আমার যে কোন লাভ হইয়াছিল তাহা নয়। আমার বাস্তবিক লজ্জা ও সম্ভাট এ ক্ষেত্রে আমার রক্ষার কারণ হইয়াছিল। যদি কখনো না বলি তবে কোন বাস্তবিক আমার সহিত আলাপ করিতে বা এক সঙ্গে বেড়াইতে যাকি হইতে পারে না।

আমার সম্ভাটও যেমন ছিল তখনও তেমনি ছিল। ভেটরে যে পরিবারের সহিত আমি থাকিতাম তাহাদের রীতি অনুসারে গৃহকর্মীর প্রজ্ঞা তাহাদের অভিজ্ঞকে লইয়া বহিস্করণে যায়—আমার আশ্রয়ভাটীর কথা আমাকে একদিন ভেটরের হুতরাং পরাড়ে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন—আমি স্বভাবতই দ্রুত চলি কিন্তু আমার

সকল আমার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত চলিতে পারিতেন; দেখিলাম তিনি অনর্গল বকিতে বকিতে আমাকে ত একপ্রকার টানিয়া লইয়াই চলিলেন—তাঁহার এই কথার শ্রোতের উত্তরে আমি কেবল মৃদুভাবে ‘হা’ ‘না’ ‘হা’, ‘তাই’, ‘তাৎপর্য’ ‘কি হুতরাং’। ইত্যাদি কথা সম্ভব-সম্ভব সন্ধিগুণ্ড ভাঙিতে লাগিল। তিনি ততক্ষণ পানীর মত বেগে অগ্রসর হইতেছিলেন আমি যতক্ষণ কি করিয়া বাড়াই কিরির সেই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম। এই-রূপে আমরা এক পরাডের শিবিরে আরোহণ করিলাম, এখন কি প্রকারে নামা যায় সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমার পক্ষবিশিষ্টবর্ষ বহুত যুবতী সঙ্গিনী তাঁহার উচ্চ সোড়ালির জুতা দিয়েও তাঁরবেগ অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন—এদিকে আমি লজ্জার দ্বায়ে কোন রকমে নিজেকে সামলাইরা দীর্ঘে দীর্ঘে নাগিতে লাগিলাম। তিনি ততক্ষণ নীচে পড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়া কোন রকমে, অতি কষ্টে নীচে পৌছিলাম। তিনি হাসিয়া হাততালি দিলে আমার লজ্জাও শতগুণ বর্ধিত হইল—হাততালি দিবার কথাই বটে।

কিন্তু সবক্ষেত্রে এইরূপ সহজে অব্যাহতি পাই নাই। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা আমার জ্বর হইতে এই আভার অজ্বর উৎপাদন করা। ভেটরে বাইবার পূর্বে একবার আমি ব্রাইটনে গিয়াছিলাম, এখানে হোটেলের শান্ত-তালিকা ফ্রেঞ্চ-ভাষায় ছিল আমি স্মৃতিতে না পারিয়া চুপ করিয়া চলিয়াছিলাম তাহা দেখিয়া আমার পার্শ্বে ছাত্রটি এক বুকা মিছিল। আমাকে সাহায্য করিলেন—আমি দখলবা দিগা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। এই আলাপেই আমাদের মধ্যে পরিণামে বন্ধুতার হৃদয়গত হয়। তিনি তাঁহার লণ্ডনের টিকানা আমাকে দেন এবং প্রতি রবিবার তাঁহার সহিত আহাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিশেষ ভাষার সময় তিনি আমারে নিমন্ত্রণ করেন এবং যাহাতে আমি লজ্জা জ্বর ক্রিয়ায় পারি সেইরূপ উপস্থিত যুবতী মহিলাগণের সহিত কথাবার্তায়া প্রবৃত্ত করাইলেন, তাঁহার সহিত একটী



মহিলা অবস্থান করিতেন বিশেষ করিয়া ইহার সঙ্গে আমাকে কথা কহিতে হইত এবং আমাদের দু'জনকে অনেক সময়ে নির্জন ঘরে রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইতেন। প্রথমে ইহা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইত—কথাবার্তা আরম্ভ করিতে পারিতাম না, কোন রহস্তে বোধ্য দিতে পারিতাম না। কিন্তু এই মহিলা! ক্রমশঃ আমার সঙ্গে কাটাঁইয়া দিলেন; পরে কবে রবিবার আসিবে এবং এই মহিলা বন্ধুর সহিত আলাপ করিব তাহার আশায় থাকিতাম।

বৃদ্ধা মহিলাটীও তাঁহার জালধানি বেশ চড়াইয়া ফেলিতেছিলেন তিনি আমাদের মেলামেশায় উৎসাহ ও স্বযোগ দিতেন। সম্ভবতঃ আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশা মনে পোষণ করিতেন।

বড়ই সমস্তায় পড়িলাম। মনে হইল “আমি বৃদ্ধা মহিলাকে যদি জানাইতাম আমি বিবাহিত তাহা হইলে কোন মন্তিল হইত না। বাহা ইউক তখনও সময় আছে এই সময় সত্যপ্রকাশ করা উচিত; না হইলে পরে বিপদ ঘটিতে পারে।” এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে যে এক পত্র লিখিলাম তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

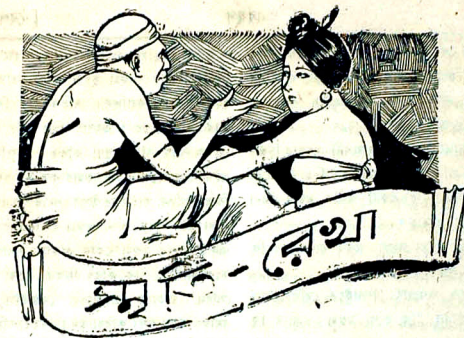
“আপনার সহিত পরিচয় অবধি আপনার অগ্রহ পাইরাছি, আপনি আমাকে মাতার মত কৈ করেন। আমার বিবাহ করা উচিত মনে করিয়া আপনি অনেক ভর বুঝতাদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। এ ব্যাপার আর অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি আপনাকে জানাইতে চাই আমি আপনার সেরের অযোগ্য আমার ইতিপূর্বেই আপনাকে জানান উচিত ছিল আমি বিবাহিত। আমি জানি এদেশে ভারতীয় বিবাহিত ছাত্রেরা অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দেয় আমিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি—এখন বৃদ্ধিতেই এরূপ করা আমার পক্ষে কতদূর অজ্ঞায় কার্য হইয়াছে। এহলে আমার বলা উচিত অতি শৈশবেই আমার বিবাহ হইয়াছে এবং বর্তমানে আমি পুত্রের পিতা। ভগবান যে আমাকে সত্য স্বীকার করিবার মত সাহস দিয়াছেন তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আপনি আমার

অপরাধ মাফনা করিবেন কি? আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আপনি যে মহিলাটির সহিত আমার পরিচিত করিয়াছেন তাঁহার সহিত আমি বিন্দুমাত্র অসংযত ব্যবহার করি নাই। সংযমের সীমা সতদূর তাহা আমি জানি—আপনি জানিতেন না যে আমি বিবাহিত। সেই জন্ত আমরা বাহাতে বাগ্‌বন্দ হই সেইরূপ ইচ্ছা আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটী আর বাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে সেই জন্ত আমি সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য।”

“যদি এই পত্র পাঠ করে মনে করেন আমি আপনার আতিথ্যের অগ্রপুঙ্ক্ত আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমি তাহাতে কোন দোষ গ্রহণ করিব না। আপনার অগ্রগৃহের জন্ত আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আর যদি ইহা সন্দেহও আমার সহিত বন্ধুতা রক্ষা করেন এবং আমাকে আপনার অতিথি হইবার অযোগ্য মনে না করিবেন তবে বাহাতে আমি আপনার সেরের ও অগ্রগৃহের উপযুক্ত হইতে পারি তাহা সর্ব্বণ-ভাবে চেষ্টা করিব।”

পাঠকের এখানে জানা উচিত আমি এই পত্র একবারে লিখি নাই। অনেক কাটাঁকাটির পর তবে ইহা এইরূপ দিয়াছিলাম। ইহা লেখাতে আমার মনের ভাব লম্বা দিয়া গেল। ফেরৎ ভাঙে তাঁহার উত্তর পাইলাম :—

“আপনার সরল স্বীকারোক্তিপূর্ণ পত্র পাইলাম। আমরা উভয়েই আনন্দিত হইয়াছি এবং উহা পড়িয়া খুব এক চোট হাসিয়াছি। সত্য গোপন করার অপরাধে আপনি অপরাধী তাহা মাফিনীয়া। তবে আপনি নিজের বিষয়ে সত্য প্রকাশ করিয়া খুব ভাল কাজই করিয়াছেন। আমার নিমন্ত্রণ বাহাল রহিল এবং আপনি যে আগামী রবিবারে আসিয়া আমাদের পরিবার শিশু-বিবাহের কথা চনাইবেন তাহা আশা করি। আপনার বিবাহের কথা ভনিতেন খুব মশা হইবে, সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে যে আপনার সহিত আমাদের বন্ধুতা অঙ্গুর রহিল তাহা বলাই বাহুল্য।



### শ্রীকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

#### ভিত্তিক

পথে আসিতে আসিতে মধ্যাহ্ন কত কথাই মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম। দুই ঘণ্টা পূর্বে সে তাহাদের বাড়ী হইতে আসিয়াছে তখন ত অশ্বখের কোন বৃক্ষপাত হয় নাই। হঠাৎ এমন হইবার কারণ কি! মধ্যাহ্ন কেমন তার দাহুর উপর একটা সন্দেহ হইল। সে কোন কথা প্রকাশ করিল না। তার বৃষ্টি কাঁপিয়া উঠিল।

নিবৃত্তভাঙা কথা মধ্যাহ্ন জিজ্ঞাসা করিল “আজ্ঞা উদ্দেশ্যবানু, অশ্বখটা খাওয়া দাওয়ার পর হ’তে আরম্ভ হয়েছে, না তার পূর্ণ হ’তে।”  
“আহার করতে করতেই ওর গাটা কেমন ঘুলিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি উড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বমি আরম্ভ হ’ল।”

মধ্যাহ্ন সংশয়ান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তবনি বোধ হয় ঔষধ দেওয়া হয়েছিল।”

তুমি ত জান হরেন্দ্রবাবু নিজেই একজন বড় ডাক্তার। বাড়ীতেই একরূপ সব ঔষধ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজেই অত্যন্ত নিম্নমার্গিত হইয়া পড়িলেন, ঔষধের বিশপটী জিয়া দেবে। এক ঘণ্টার মধ্যে বমি বন্ধ হ’ল বটে। কিন্তু প্রবোধ ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাতে লাগল।

একথা শুনিবামাত্র মধ্যাহ্ন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। ঔষধ প্রয়োগে উটী জিয়া হইল তবনি তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সংশয় ও উদ্বেগ আরও বেশী করিয়া বাড়িয়া উঠিল। মধ্যাহ্ন মনে মনে ভাবিল যত ঔষধ প্রদান করা হইবে ততই জীবন সংকটাপন্ন হইবে। এখন আমার কি করা কর্তব্য? আমি শুধু হাতে গিয়া ত কোন প্রতিকার করিতে পারিব না। বহুদিনের সঙ্কিত শুণা অজ্ঞাতে তাহার অন্তরের কোন গোপন প্রদেশে যে, ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া শৈবালের মত জমিতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহাকে গর্ভাকার মস্তক পাড়াইতে দেখিবা যে বিন্দিত হইয়া তাহার মনের দূরত্বকে তার দাহুর বিক্ষোভ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইতে সে শুধু আশ আশ্রয়ে ফণা তুলিয়া গঞ্জিয়া উঠিল। দাহুর এই ব্যবহার মনে করিতে তাহার চক্ষু কাটিয়া জল আসিল।

যদি সে প্রবোধকে বাঁচাইতে না পারে, তবে সে দুঃখ, সে বেদনা বৃদ্ধি সে সহ্য করিতে পারিবে না। সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, “দাহু এত বড় সর্ব্বনাশ কি কোন মানুষ করিতে পারে।” মধ্যাহ্নর স্বেদময় দাহু যে একাজ কোন দিন করিতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করিবার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইল না কেন! আশা



ভাষা, বিখ্যোক্তা যুগা, অপর্যন যে তোর মহাবীর মাথার  
উপর স্থাপিত পড়িয়াছে, আর এক মুহূর্তের মধ্যে সব  
জানিতে পারিলে, তাহার যে কি অশ্রু হইবে তাহা কি  
সমীর বৃষ্টিতে পারিতেছে।"

পথে চলিতে চলিতে অনেকবার অবনী মহাবীর চিত্তা-  
ভারাক্রান্ত মুখের প্রতি মহাবীর অজ্ঞাতে চাহিয়া দেখিতে-  
ছিল। তাহার অনেকবার একটা অলৌকিক মূর্ত্তী কল্পনা  
মনের মধ্যে উকি মারিতেছিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সহসা পথের মধ্যে মহাবীর  
ভাবিয়া শুভ হইয়া অপর্যন পাঁজাইল।

উদ্দেশ্য মহাবীরে অকস্মাৎ ধাড়াইতে দেখিয়া ব্যস্ত  
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হলো মহাবীর? পায়ে কি  
পাথর লেগেছে?"

উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া এত দুঃখের ভিতরও বিদ্রোহ-  
ক্ষুরণের মত একটা কীর্ণ হাসি মহাবীর অধর-প্রান্তে দেখা  
দিয়া তখন মিলাইয়া গেল। তাহার অপর্যন ভিতর যে  
হাহাকার দারুণ বেদনায় বাহিরের আকৃতি চাহিতেছিল,  
নির্ভর সখ্যমের প্রয়োগে তাহাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধমন  
করিয়া সে মনে মনে উত্তর করিল "উদ্দেশ্যবানু পাথর  
পায়ে লাগে নাই, বৃক্ষের উপর চাপিয়া পড়িয়াছে।  
বাহিরের বলিল "না কিছু লাগে নাই। আপনাবা এখন,  
আমি দুই একটা গুণ্ড নিয়ে এখন আসছি। আপনাবা  
শৌছিতে শৌছিতেই আমি গিয়ে পড়ব। বলিয়া মহাবীর  
একদম দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহার হৃদয় অভিযুগে  
ছুটিল।

উদ্দেশ্য বলিল, "বোধ অবনী-না আমবা বাহের বৃক্ষ  
অনিশ্চিত, অভয় অপূর্ণ বসে আসছি, কিন্তু তাদের  
মধ্যে বর্তমান অন্তরের পরিচয় ও কর্তব্যজ্ঞান পরিদৃষ্ট হয়  
তা আত্মকাল আমাদের মধ্যে আছে, এ কথা মনে করতে  
ভরসা হয় না।

মহাবীর তাকাতা টেবিলের উপর হইতে পদ্মটা তুলিয়া  
আলোকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি পরীক্ষা করিয়া। দেখিল,  
সে বাহা ভাবিয়াছে, তাহাই সত্য। পদ্মের মধ্যে একটা  
তীব্র বিধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বাহ্যের জ্ঞান গ্রহণ  
করিবামাত্র এই প্রকার সূচী নিশ্চয়। এই অস্তুত কিছা

তার দাঙ্গ কিছুদিন পূর্বে মহাবীরে পাছাড়ে লইয়া গিয়া  
নিখাইয়াছিল। মহাবীর দুইটি গুণ্ডাই তার দাঙ্গের নিকট  
হইতে শিক্ষা করিয়াছিল। যদিও এদের বিজ্ঞা শিবিবার  
তার কোন আশ্রয় বা উৎসাহ ছিল না। এই বিজ্ঞাকে  
সে অন্তরের সহিত যুগা করিত। কতদিন এই প্রসঙ্গ  
লইয়া তার দাঙ্গের সহিত মহাবীর কত তর্ক লইয়া যিহাছে।  
কিন্তু সে দিন, পাহাড়ের উপর সমীর যখন তাহাকে এই  
বিজ্ঞা দান করে তখন মহাবীর কোনরূপ আপত্তি করে  
নাই। তখন মহাবীর কোন প্রকার অস্বাভাব্য প্রকাশ  
করে নাই। তার কারণ ছিল। মহাবীর দেখিয়াছিল;  
সেদিন, পাহাড়ে প্রবেশোদ্যে বেড়াইতে আসিয়াছে।  
সমীরও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। মহাবীর যদি তার দাঙ্গের  
মস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করে, আর তার দাঙ্গ রাগিয়া  
প্রতিপোষ লয় প্রবেশের ওপর। এই কারণে মহাবীর  
অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দাঙ্গের কথা খুব  
ভালমাস্থ্যের মতই মন দিয়া সেদিন শুনিয়াছিল। ইহাতে  
সমীরের মনের মধ্যে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছিল।  
সমীর ভাবিয়াছিল, এতদিন পরে মহাবীর ঠিক রাস্তায়  
আসিতেছে। মহাবীর মনে মনে ভাবিয়া পৃথিবীতে মন  
বলিয়া কোন জিনিষ নাই। মস্তের মধ্যে মস্তের স্বপ্নের  
উপজ্জ্বল। আজ যদি সে তার দাঙ্গের নিকট হইতে এই  
বিজ্ঞা শিক্ষা না করিত, তাহা হইলে প্রবেশকে বাচাইবার  
কোন চেষ্টাই সে করিতে সাহস পাইত না।

মহাবীর তার অঞ্চল হইতে কি একটি গুণ্ড বাহির  
করিয়া বিমানের পদ্মের পাঁপড়ির উপর প্রদান করিল।  
সেইভাবে সেখান পদ্মের শুষ্ক পাঁপড়ির নীচে নীচে যেন  
নবীনতা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিবার  
মাত্র মহাবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।  
মহাবীর এই কার্যের প্রতি চাহারও লক্ষ্য ছিল না।  
মহাবীর যখন সেই পদ্মটি লইয়া গিয়া মাটির মধ্যে পুতিয়া  
কুণ্ডল, তখন লতিকা জিজ্ঞাসা করিল এ ফুলটা মাটিতে  
পুতে কেন মহাবীর?

'সে অনেক কথা' বলিয়া মহাবীর চুপ করিল। মহাবীর  
অন্তরে তখন দারুণ একটা অন্তরদাহ হইতেছিল। তার  
দাঙ্গ, বৃক্ষ যে এতদূর একটা পততি কার্য করিতে পারে,

একটা ভাবিতে মহাবীর মনে মনে মরিয়া যাইতেছিল। অকারণ  
দাহ যে বাহ্যের প্রাণ সামান্য খেলার মত গ্রহণ করিতে  
পারে এ যে সে কোনরকম দিয়া কোনদিন বিশ্বাস  
করিতে পারে নাই। তার দাঙ্গের উপর মহাবীর ভীষণ  
রাগ হইতেছিল। তার দাঙ্গ নরহন্তা। মহাবীর আর  
জানিতে পারিল না। দুই হাতে তার নিম্নের চক্ষু চাপিয়া  
ধরিল। নরহন্তারূপ তার দাঙ্গের চেহারা সে যে কিছুতেই  
বরাদ্দ করিতে পারিতেছিল না। এরা যদি কোন  
প্রকারে জানিতে পারে, নরহাতী সমীরের নাতনী হইছে  
আমি। সারা বিশ্ব মহাবীর চক্ষে নরহাতীর বিভীষিকা  
লইয়া গাশিয়া উঠিল।

লতিকা পুরাতন জিজ্ঞাসা করিল, "পদ্মটি দেখছি  
আমার দাদার আহতের কারণ হচ্ছে। শুভে কি  
আছে?"

"বহি ভগবান দিন যেন লতিকা তোমাকে সমস্ত কথা  
বলব। তুমি দিন কি আসবে?"

"কেন আসবে না মহাবীর?"

এবার মহাবীর কোন উত্তর দিল না। একটা গভীর  
লৌহ নিঃশ্বাস ভাগ করিল। সে গিয়া প্রবেশের নিকট  
উপবেশন করিল। তারপর করুণাময়ীকে বলিল "মা  
আপনি এখন যান কোন আশঙ্কা নাই। আমি সব  
যাচনা করছি। মাত্র লতিকা আমার কাছে থাকলেই  
চলবে।"

করুণাময়ী রোক্তমানকটে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাবীর  
মা, আমার তবে কি আমার প্রবেশকে ফিরে পাব।"

"মা, আমার প্রতি আপনাবা আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়  
পাবেন।"

অত্যন্ত বেহেতরে মহাবীর চিত্ত স্পর্শ করিয়া চুপ  
করে করুণাময়ী বলিলেন, আশীর্বাদ করি চিরায়ুত  
হও।"

"বেদহ মহাবীর কি ভুলে চলেছে।"

অবনী বলিল "ঠিক বলেছে।" আমার কিন্তু মহাবীর  
দেখে পর্যন্ত ওর উপর কোন একটা মাহা হইবে।

তারপর প্রবেশের অশ্রুধর আসোচনা করিতে করিতে  
উভয়ে যখন বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন

পছাতে হইতে মহাবীর ভাবিয়া বলিল, "আমাকে তা হলে  
আপনাবা এতদূর পারেন নি দেখছি।"

মহাবীর কর্তব্যর চিন্তা উভয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসিত  
হইয়া পছাতে দিখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে তুমি  
বললে বাড়ী থেকে গুণ্ড নিয়ে যুরে আসছ। বাড়ী বৃষ্টি  
যাও নাই?"

"গিয়াছিল, গুণ্ড নিয়ে একটু ভোরে এসেছি কি না।"

"ভোরে এসেছি কথার অর্থ বৃষ্টিতে উদ্দেশ্যের বাকী  
রহিল না। সে বৃষ্টি সারা পথ মহাবীর ছুটিয়া আসিয়াছে।  
তখন তাহার বস্ত্রের স্পন্দন ঘন ঘন উঠিতে পড়িতেছিল।  
কপালের উপর সূতার মত বেদ জমিয়া, মুখনিখ লাল  
হইয়া উঠিয়াছে। মহাবীর কর্তব্যজ্ঞান ও পরদুঃখ কাতর  
উদার অন্তরের কথা মনে করিতে উদ্দেশ্যের সর্গসরীর  
পুলকে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সকলে যখন বাড়ীর ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন  
হরেন্দ্রবাবু বাহিরের ঘরে মাথায় হাত দিয়া গভীর চিন্তায়  
নিমগ্ন। উদ্দেশ্যকে দেখিবারমাত্র তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত  
কটে বলিয়া উঠিলেন "আমিও কোন আসা দেখছি না।  
এতদিন ভাঙারী করার অভিজ্ঞতা ও অহংকার মুহূর্ত্ত  
ভগবান ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখন জোয়া যদি কিছু  
করতে পার। মহাবীরকে আনতে পারলি না?" বলিয়া  
তিনি একদম কাঁদিয়া ফেলিলেন।

উদ্দেশ্য বলিল "আপনি ব্যস্ত হবেন না। মহাবীর  
এসেছে আর কোন আশঙ্কা নাই। মহাবীর কি করতে  
পারে আর না পারে তা ত সব আপনি ভনেছেন।"

মহাবীর বাবুর উত্তর শুনিয়া কোন কথাই বলিল  
না। তাহাকে দেখিবারমাত্র হরেন্দ্রবাবু পাগলের মত  
ছুটিয়া গিয়া অসহ্যেতে আপনাবা কড়া বোধে মহাবীর হাত  
দু'খানি নিজ হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "মা  
মহাবীর, প্রবেশকে বাচাও।—ও বই আর আমার যে  
....." বলকের মত ভাঙার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর অত্যন্ত শূন্য হইয়া বলিল "মত ভগবানের হাত;  
তবে বাবা আমাবা প্রাণ থাকতে পারে আপনাবা পুস্তকের  
কোন অপকার না হয় তা আমি করব।" বলিয়া মহাবীর  
বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।



মহা দেবিল, প্রশাঙ্ক সাগরের মত অবিচলিত অন্তঃ-  
করণ করণাময়ী শয্যার উপর বসিয়া পুত্রের মূখের প্রতি  
এক দৃষ্টিতে চাহিয়া গায়ে হাত ব্লাইতেছেন। মহ্যাকে  
দেখিয়ামাত্র যেন একটা কণী আশা তাহার দেহের  
ধারাকে চকল করিয়া তুলিল। ইঙ্গিত করিয়া মহ্যাকে  
নিকটে আনিলেন। মহয়া করণাময়ীর নিকট ঘাইলে,  
তিনি তাহার মস্তকে হাত দিয়া মূহুরে বলিলেন "মা  
প্রবোধ যে আমাদের ছেড়ে যায়।"

প্রবোধের পায়ে নিকট লজ্জিত বসিয়াছিল। তাহার  
হুই নমন বহিয়া অক্ষ গড়াইয়া পড়িতেছিল। মহ্যাকে  
দেখিয়ামাত্র অক্ষের বাজিয়া উঠিল। সে কোন কথা  
বলিল না। কেবল কাতর দৃষ্টিতে মহয়ার মূখের প্রতি  
চাহিয়া যেন বলিল "বোন ধারাকে ভূমি বাঁচাতে পারবে  
না?"

প্রবোধের তখন সম্ভা একবারে লোপ পাইয়া-

ছিল। মৃতের মত সে শয্যার উপর পড়িয়াছিল। সমস্ত  
মৃহটি আগ্নেয় বিপদের ভীষণ ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।  
হস্তের বাঁধ খসে ভিন্ন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।  
এই কয়েক ঘণ্টার ভিতর যে এতবড় একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড  
হইতে পারে, কেহ তাহা কোনদিন ভাবিতেও পারে  
নাই। মহয়ার হঠাৎ মনে হইল, আজ তাহাকে নিমন্ত্রণ  
করিয়াই কি তাহাদের এই বিপদ উপস্থিত হইল? এই  
কথা মনে হইয়ামাত্র লক্ষ্যের দৃষ্টিতে যেন সে মুখ তুলিয়া  
চাহিতে পারিল না। ইচ্ছা হইল সে ছুটিয়া এখান  
হইতে পালাইয়া যায়। তাহার মনে হইল এই বিপদের  
প্রধান কারণ যেন সে, সমস্ত অপরাধ তার। এর মনে  
আর কোন কৈকিরং নাই। মহয়া মনে মনে ভগবানের  
নিকট প্রবোধের জন্ত কণ্ঠা-ভিক্ষা করিল। হঠাৎ  
মহয়ার নজর পড়িল, সেই সকলের দায়ুর নীত পদ্মটার  
উপর। (ক্রমশঃ)

## সাহিত্য-সম্মিলন

### শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন আমরা কোন সত্যবস্তকে পাই তাহাকে রক্ষণ-  
পালনের জন্ত বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের  
প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মাছের কবিরার জন্ত  
মাতাকে গুরু মন্ত্র বা স্বভিঃসিংহার অঙ্গশাসন গ্রহণ  
করিতে বলা অন্যাবসর।

বাঙালী একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার  
সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর সম্মত বৃত্তি  
বাঙালীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি  
সাধারণ স্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক  
ঐক্য দেয়, এমন আর কিছুই না। কলমে বিস্মেদ  
আজ যখনে বাঙালী আছে সেখানেই বাঙালী সাহিত্যকে  
উপলব্ধ করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে। তাহার সত্য  
অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কি আছে?

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের  
আনন্দ নহে, উপার্জন করিয়া যাহা পাই, তাহাতেও  
আমাদের আংশিক অধিকার; নিজের শক্তিতে যাহা  
আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ,  
তাহার পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যেরূপে  
আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্বত্র আমাদের আত্মা  
আপন বহুধা শক্তিকে নানাবিধভাবে নানাক্রমে সৃষ্টিকর্মে  
প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার  
পর্যায় এত উচ্চতরে এবং এমন নিখলানভাবে গঠিত হইত  
না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে  
আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলা সাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন কি, ইহা  
আমাদের নৃতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ ইহা আমাদের

দেশের পুরাতন সাহিত্যের অঙ্গবৃত্তি নয়। আমাদের  
প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-থাকে বহিত, বর্তমান সাহিত্য  
সেই থাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ  
আচার-বিচার পুরাতনের নিষ্কণ্ঠ পুনরাবৃত্তি। বর্তমান  
অবস্থার সঙ্গে তাহার অঙ্গবৃত্তির সীমা নাই, এইজন্য  
তাহার অধিকাংশই আমরাগকে পদে পদে পরাভবের  
দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নৃতন  
রূপ লইয়া নৃতন প্রাণে নৃতন কালের সঙ্গে আপন যোগ-  
সামন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালীকে তাহার  
সাহিত্যই বর্ধাভাব্য ভিতরের দিক হইতে মাছ করিয়া  
তুলিতেছে। সেখানে তাহার সমাজের আর সমস্তই  
বাধীন পথার বিরোধী, সেখানে তাহার লোকচার  
তাহাকে নিষ্কণ্ঠের অত্যাচারে দাসত্ব-পাশে ঢাল করিয়া  
বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি  
দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে অচ্যুত পুত্রলীর  
মতো তাহার বৎসরের দৃষ্টির টানে বাধা কাহায়া চল-  
কেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যেই তাহার মন  
বে-পরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে, সেখানে সাহিত্যেই  
অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবন-সমতার নৃতন  
নৃতন সমাধান, প্রথার গতি পার হইয়া আপনাই প্রকাশ  
হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একলা তাহাকে বাহিরেও  
মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার  
ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে মাছ বন্দি, বাহিরের কোনো  
প্রজিয়ার দ্বারা সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।  
আমাদের নব সাহিত্য সলক দিক হইতে আমাদের মনের  
নাগণ্য-বন্দন মোচন করুক; জানের ক্ষেত্রে, ভাবের  
ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক, তাহা হইলেই দেশকে  
কর্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে বাধীন হইতে পারিবে।

ইচ্ছনের নিজের মধ্যে আগুন প্রজ্জ্বল আছে বলিয়াই  
বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জলিয়া ওঠে, পাথরের উপর  
বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে গণকালের জন্ত তাড়িয়া  
উঠে, কিন্তু সে জলে না। বাংলা সাহিত্য বাঙালীর  
মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলি-  
তেছে; ভিতরের দিক হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল  
ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের

দিকে জলিবে, তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না,  
বরং বাজিয়া উঠিবে। এতদিন বাংলা দেশে আমরা তাহার  
প্রমাণ পাইয়াছি। বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের  
দিনে মততার তাড়নায় বাঙালী যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার  
পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষে কোথাও  
জলিয়া থাকে সে বাংলা দেশে, কোথাও যদি দলে দলে  
ছঃসাহসিকেরা দাঙ্গা ছাফের পথে আত্মহননের দিকে  
আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলা দেশে।  
ইহার অন্তর যে-কোনো কারণ থাক, একটা প্রধান কারণ  
এই যে, বাঙালীর অন্তরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অনেক-  
দিন হইতে অগ্নিসংকট করিতেছে—তাহার চিত্তের ভিতরে  
চিত্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার  
নিষ্ঠুরতা বড়াবতাই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে,  
তাহার চেয়ে ছঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালীই সকলের  
চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ী মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করিয়াছে।  
পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ভোজন-  
পাংকির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধ্যমোচন প্রভৃতি  
ব্যাপারে বাঙালীই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি  
করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জঘন্য করিতে  
চাহিয়াছে। তাহার চিত্তের সোপানিকের বাহন সাহিত্যই  
সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কুস্তিবাসের  
রামায়ন লইয়াই আবহমানকাল হর করিয়া পড়িয়া যাইত,  
মনের উদার সফরদের জন্ত যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত  
আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত, তবে তাহার মনের  
অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি  
হইয়া তাহাকে চিত্তার ও কর্মে সমান অচল করিয়া  
রাখিত।

মনে আছে আমাদের দেশের স্বদেশিকতার একজন  
লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া  
বলিয়াছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য যে ভাববিশ্বাসে এমন  
বহুমুখা হইয়া উঠিতেছে, দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের  
লক্ষণ ও অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে  
বাঙালীর মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে—সাধারণ দেশহিতের  
উদ্দেশ্যেও বাঙালী এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ  
করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের



ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপ অল্প কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালীর গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মজ্জিকের বাহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এমনি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা এমনি মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কোনো মন্ত্রবলে একত্রিত করিয়াও বৈতাত্যিক্যে করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটবে না। শ্রামদেশের জোড়ায় যমজ যে বৈশিষ্ট্য শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চিত্তে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দৈবেক তাহার নিজের স্বভাব জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অল্প বৈতাত্যিক্যই আমাদের যোগে একটা রন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলা ভাষাকে নির্দোষিত করিয়া অল্প যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে একথা একেবারেই অস্বপ্নের। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন, সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালীর চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায় একথা বলাই বাহুল্য। কোনো ব্যাহিক উৎসেত্তের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাধনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই জাতীয় মূঢ়তা। বাংলা সাহিত্যের ভিতর থিয়া বাঙালীর মন বসে বসে বসে, ভারতের অল্প জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারা মনের পূজ্যতা মনের অপরিণতি ঘটে; যে অল্প ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না, সেই অল্পই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান, বাঙালী-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উগ্রত হইয়াছেন। এ যেন ভাষের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলা-দেশের শতকরা ৯৯য়ের অধিক সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের

উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আখ্যানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি? চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এখন অল্পত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ভাষা না করিলে তাহাদের মুসলমানির স্বর্গতা ঘটবে। বস্তুতই স্বর্গতা ঘটে যদি জবাবদিহি দ্বারা তাহারিগকে ফাসি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হয় তবে সেই ভাষার মধ্য থিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। স্বর্গমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকগণ প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বাংলা প্রতিভাশালী, তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাতে তাহারা মুসলমানী মালমসলা বাড়াইয়া থিয়া ইত্যাক অতো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলা ভাষার মধ্যে ত কেই উপাধারের কন্মতি নাই—তাহাতে আমাদের স্বেতি হয় নাই ত। যখন প্রতিদিন বৈষ্ণব করিয়া আমরা হয়মান হই, তখন কি সেই ভাষার আমাদের হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিরুদ্ধি ঘটে? যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায় তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আন্তর্য দোষণ প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু দ্বন্দ্ব পূর্ণ করে না? হিন্দুর প্রতি বিরুদ্ধ হইয়া ওগড়া করিয়া যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেই ভালো হয়? বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে-ভাইয়ে পরস্পরকে বকিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব করণো চলে?

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানী বাংলা, কেতাবী বাংলা নয়। ষ্টাইলগের চলতি ভাষাও ত কেতাবী ইংরেজী নয়, ষ্টাইলগও কেন, ইংলগের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজী নয়। কিন্তু তা লইয়া ত শিক্ষা-ব্যবহারে কোনো দিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষার বিনিষ্টতা থাকেই। সেই বিনিষ্টতার নিয়ম-বন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যভার উচ্ছিন্নতার সাহিত্য গান খান হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু দুই তরফের কেহই একথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অল্প প্রশস্ত ক্ষেত্র আঁজো প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বনিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তার পরে পলিটিক্‌স্ সত্য হইতে পারে। যানকতক বৈষ্ণোড় কাঠ লইয়া খোঁজা থিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি পাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে একথা ঠিক নহে। খুব একটা খড় খড় অল্পত্ব গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্ সেই রকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোহালে ছায়ের ঢাকাই আমাদের ঘরের টিকনায় পৌছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা মোকা হইয়া উঠে।

বাংলা দেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে-প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীক সাহিত্যে গ্রীক দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত পুষ্টান ছিলেন। তিনি যেতুম্বা ভারতীয় যে বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক বন্দনা, তাহাতে কবির ঐকিক পারত্রিক কোনো লোকশানের কারণ ঘটে

নাই। একদা নিটীবানু হিন্দুগণ মুসলমান-সামলে আরবী ফাসি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাহাদের কোটা কাঁপ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুস্তীর গণনাখণ্ডের মতো, সেধানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব সাহিত্যে বাংলা দেশে যে একটি বিপুল মিলন-বন্ধের আয়োজন হইয়াছে, তাহার বৈধি আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে কাবের উপরে তাহার প্রতিষ্ঠা সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে বাহারা ক্রমিক বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা মুসলমানেরও বন্ধন নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও বাহারা ছেদন করিতে চাহেন, তাহাদের অস্বাভাবিকি জানেন তাহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধ্যর্থক আত্মন করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু আশা করিতেছি তাহাদের সেটা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমই বলিয়াছি বাংলা দেশের সাধনা একটা সত্য বস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আত্মরিক মনস বোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইহাদের আক্রমণে পরাজিত হইবে না।

(বৈশাখের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত)







কাজের কথা

কলিকাতার শিবলিখা গলিতে উৎসাহী যুবকগণ অনেকদিন হইল নানাবিধ সমাজ হিতকর কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। রোগীর সেবা, ঔষধ পথা দান, পুস্তকালয় ইত্যাদি সেবা-সমিতির বিভিন্ন বিভাগের কার্য ভালই চলিয়াছে। গত কলিকাতার দ্বাদশ সম্মেলন বৈঠক, সহযোগী গুণগণের অত্যাচারের সম্মুখে নিরীহ গৃহস্থ পরিবার কত অশ্রু ও অসহায়। এবং গবর্ণমেন্টও শাস্তিকার এবং গৃহস্থদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে অক্ষম। এমনতরবায় রক্ষাধীন গঠন করিয়া আপনকালে শাস্তিরক্ষা ও আত্মরক্ষার কার্য কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নহে। এই ভাব হইতেই শিমুলিয়াতে ব্যায়াম, বলচর্চা ও লাঠী খেলার জন্য একটি আথল্যা প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধ করা হয়। বাসন্তী বীরাষ্ট্রীর পুণ্য দিবসে ব্যায়াম-শালা প্রতিষ্ঠার উৎসব ঘোষণা হইয়াছে। প্রজাতন্ত্র সংশ্লিষ্ট মণ্ডলে ক্রীড়াতীর পূজা হয়। জীৱামক্খ, বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মসাম্বৎ এবং দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত পুণ্যমন্ডলে ভূমিত হইয়া মণ্ডলের শোভা বর্ধন করিয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মণ্ডলী স্থপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং আট খিচেরী কোম্পানী সন্মিলনের উদ্যোগে ভাষে জোগাইয়া যুবকদের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন। অপরূপে লাঠী খেলার কৌশল দেখান হয়। প্রোট, যুবক, বালক অনেকই লাঠী খেলার কৌশল দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতা সহরের সকল শ্রেণীর সকল মতের বহু গণমাধ্যম ভ্রমণকাল এবং যুবকগণ দলে দলে উৎসবে খেগ দিয়াছিলেন।

(আনন্দবাজার)

বাসন্তী পূজা সম্পর্কে পুলিশকমিশনার বাহাদুর যে ভাবে ইতহাচার জারী করিয়াছেন তাহাতেও হিন্দুদের

ধর্মস্বত্বীয় অধিকার যথেষ্ট ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। শাস্তি রক্ষার অঙ্গহাতে যদি পুনঃ পুনঃ এইরূপে হিন্দুগণকে মর্দ্যাহত করা হয় তবে সেটা মুসলমানের পরিচয় নহে। এ সম্বন্ধে সরকার বাহাদুরের কি বিবিতার আছে তাহা আমরা জানিতে চাই।

যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে মুসলমানগণের রাজস্বকালেও কখন এইভাবে হিন্দুদিগের ধর্মচারিত্র বাধা দেওয়া হইত না—হুতরাং ইংরাজ রাষ্ট্রেরে এরূপ ব্যাপার অগ্রহণিত হইলে তাহা অসম্মত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বর্জক বলিয়া মনে করিলে তাহা তুল হইবে কি! টেগার্ট সাহেব থাকিলে আজ পুলিশের শাস্তি রক্ষার অপরাগততার অঙ্গহাতে এরূপ ইতহাচার দিতে হইত বলিয়া মনে হয় না।

বালদার গবর্ণমেন্ট আজ যে নীতি অবলম্বন করিলেন তাহার ফলে হিন্দু মাঝেই তাহাদের রাজনৈতিক মত-ভেদ তুলিয়া কেবলমাত্র ধর্ম রক্ষার জন্য সম্মত হইবে। তাহাতে স্বরাষ্ট্রাঙ্গদের প্রভাব বাড়িবে বই কনিবে না কারণ হিন্দুসকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারে কিন্তু তাহাদের ধর্মচারিত্র ব্যাঘাত উপস্থিত করিলে তাহা তাহারা কিছুতে সহ্য করিবে না। এই অসামঞ্জস্য নীতির ফলে অনেক সহযোগিতাকারী হিন্দুও বিশ্বস্ত হইবে সরকার বাহাদুর সে কথা বেন তুলিয়া না যান।

সরকারের এই মুসলমান আত্মরক্ষার ফলে মফঃস্বলের গুণাশ্রেণীর মুসলমানগণ কিন্তু ঊচ্ছ্বস্ত প্রকাশ করিতেছে তাহা হুমিয়ার ব্যাপারেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই গুণাশ্রেণীর মুসলমানগণের ধারণা যে ইংরাজ সরকার মুসলমানগণকে মনে মনে অত্যাচার ভয় করেন—তাই তাহারা

হিন্দুগণকেই দাবাইয়া রাখিতেছেন। পাবনা, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানেও মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এখনও যদি গবর্ণমেন্ট রহিম-শ্রীতি ত্যাগ করিয়া হুবিচার না করেন—পক্ষপাতের ত্যাগ না করেন তবে ঐ সকল স্থানের মুসলমানগণ আত্ম খার-ণার বশবর্তী হইয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিবে—তখন বাধা হইয়া হিন্দুদিগকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; ফলে দাঙ্গাধাঙ্গায়া অনিবার্য হইয়া পড়িবে। কলিকাতায় বহু সংখ্যক পুলিশ থাকি সত্ত্বেও সামান্য দাঙ্গা মিটাইতে ৬০০ লাগিয়াছে মফঃস্বলের চতুর্দিকে দাঙ্গা হইলে তাহা প্রশমন করা পুলিশের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

চনা হইতেছে যে অতঃপর গবর্ণমেন্টের কোন গ্রিহ-পাত্রেয় আবধারে পুলিশবিভাগে বৈধী করিয়া মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। সাম্প্রদায়িক বিষয়েটা মুসলমানদের মধ্যে বৈরত প্রকট হিন্দুদের মধ্যে ততটা নাই। হিন্দুরা বিশেষতঃ বাঙালীরা কোনকালেই কনভেন্স হইতে ইচ্ছুক নহে হুতরাং বঙ্গের মুসলমানগণ যদি ঐ চাকরী কামনা করেন বাঙালী হিন্দুদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই; তবে এই নব নিযুক্ত মুসলমান কর্মচারীগণ যে নিরপেক্ষ ভাবে কর্তব্য পালন করিতে পারিবেন কে তাহার জামিন হইবে আমরা তাহা জানিতে চাই?

জগৎ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া একজন আমেরিকান মহিলা এক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন “তীন-নাঙ্গা, আমি পছন্দ করি কিন্তু ভারতবর্ষকে আমি ভাল-বাসি। ঐক্যটি বেশ বেশ, ইউরোপের সন্মোহিনী শক্তি যথেষ্ট এবং আমেরিকা চমৎকার!” ভারতবর্ষীয় লোকদের স্বাধীনতাসম্মেলন চেষ্টার সমস্ত তাহার যথেষ্ট সহায়ত্ব করিয়াছে তাহা হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ দেখিয়া তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কলিকাতার দ্বাদশ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে এসব ব্যাপার এদেশে অস্ত্র সময় ঘটিলেও বর্তমানে ঘটা উচিত নহে। এ দেশের

অধিবাসীরা যদি সত্যই স্বরাজ চায় তবে তাহাদের উপস্থিত সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিদ্বেষ পরিহার করিয়া সম্ভবতঃ হওয়া আবশ্যক। একতা স্বরে আবশ্যক না হইলে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে বিভ্রান্তের গলায় ঘটা বাধিবার লোক কৈ!

স্বরাজ্য দল এবং পারম্পরিক সহযোগিতার মিলনার্ধ সবরমতী আশ্রমে এক মিলন-সভা বসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমুক্তা সরোজিনী নায়ডু, লালু লাল্লুগং রায়, ডাঃ কেলকার, মিঃ জ্যাকার, ডাঃ মুখোপাধ্যায় মতিলাল নৈকেল, পণ্ডিত মনমোহন মালব্য প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বাহাতে একযোগে পুনরায় কাজ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বন্ধুর প্রচলন, বিনয়-গ্রহণ প্রভৃতি সকল সমস্যা এই সভায় সমাধান করিবার চেষ্টা হইতেছে, ফল ও আশাশ্রম বলিয়া মনে হইতেছে। তবে মহাত্মাজীর নিজের মনোভাব পরিবর্তিত হইবে না তিনি শব্দ ও চরকার প্রচারেই আশ্বিনযোগ্য করিবেন। এদিকে রহিমদল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে গবর্ণমেন্টের পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া স্বধর্মীদের চাহুরী-বাহুরীর জোগাড় করিবার জন্য কোমর বাঁধিতেছেন—এসময় মিলনই যে বাঞ্ছনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গত যুববার সন্ধ্যায় পাঞ্জাবী হিন্দুগণ রামনবমীর এক মিছিল বাহির করেন ইহা হারিসন রোড দিয়া মনোহর দাস চক, খোয়াপটী, আয়েমনিয়ান স্ট্রীট, মলিক স্ট্রীট, বড়তলা, বাসতলা, মধ্যপটী, কটন স্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তা দিয়া যায়। পুলিশের কর্তারা বোধ হয় মুসলমানদের ভয়ে মজিদের পাশ দিয়া মিছিল যাইবার পাশ বেন নাই। ইহাতে গুণাশ্রেণীর মুসলমান ও সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-প্রচারক মৌলবী প্রভৃতির যদি পক্ষে যুগ ফুলাইয়া বেড়ায় তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। অতঃপর তাহারা যদি কোন দিন হিন্দুদিগকে মজিদের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে নিষেধ করে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।



মানসী ও মন্ত্রবানী, চৈত্র, ১৩৩২ ও—শ্রীকৃষ্ণ সুরাভদ্রার মন্ত্রবানীর “রুক্মিণী লিঙ্গ” চিত্রাঙ্কন রচনা। শ্রীকৃষ্ণ সুরাভদ্রার সেনগুপ্তের লিখিত “অমৃত-বচন” দ্বন্দ্ব-সম্প্রদায় বিশেষের পরিচয় এবং তাহার দার্শনিক মতের আলোচনা; তথা নৃতন হইলেও সাধারণ পাঠকের নিকট চর্চ্চ্যো; কেন না, প্রবন্ধোক্ত যৌগিক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতীত বোধগম্য হইবার নহে।

“মাছ গড়া” শ্রীকৃষ্ণ তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। লেখক মহাশয় আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্রের অমৃতবচন বর্তমান বাঙ্গালী জাতির পর মুখোপেক্ষিতা, অমরিতবৃত্ততা এবং তজ্জনিত হৃদ্যঙ্গার কথা কহিয়াছেন। লেখকের মতে, “নিরন্তর স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালীর যদি কেহ কোন উপায় করিতে পারে, তাহা হইলে সে আমাদের বিশ্ববিভাগ্যর। বিশ্ববিভাগ্যের দ্বারা যে কাজ হইবে শত সহস্র বক্তৃতার তাহা হইবে না। সেই জ্ঞাত মাছ-গড়া কাজটি বিশ্ববিভাগ্যরই গ্রহণ করিতে হইবে।” স্বন্দর কথা। কিন্তু আমাদের মনে হয় বর্তমান বিশ্ববিভাগ্যের দ্বারা এই “মাছ-গড়া” কাজটা পক্ষতের নিকটেই ক্ষত অগ্রসর হইতেছে। যে শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাবের দলে দলে কেরাণী এবং মামলাহীন উকীল খট হইতেছে, যে শিক্ষা পদ্ধতির আলু পরিবর্তন এবং সম্বন্ধে মন্ত্রবানীর আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের লক্ষ্যের পরিবর্তন না হইলে “মাছ-গড়া” কাজটা সম্ভবপর কিরূপে হইবে?

“আধুনিক মন্ত্রবল” অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের লিখিত পূর্ণ-রচনার অমৃতকুণ্ড। একটা জীবন্ত জাতীয় পল্লীবাসিগণের জীবনযাত্রা কিরূপ কন্দমর ও প্রাপবন্ত ভাঙা এই প্রবন্ধ হইতে স্পষ্ট ভাবে বৃষ্টিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রবলখণ্ডে যথেষ্ট মহাশয় লিখিত “জ্যোতির্বিজ্ঞান” এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। লেখক মহাশয় নানা দিক দিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানবাদের বর্তমান সাহিত্য-জীবনের আলোচনা করিয়াছেন। পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে তৃপ্ত এবং উপকৃত হইবেন।

“পৌরাণিক নাটকে গিরিক্ষত্র” প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্তমোহন যথেষ্ট মহাশয় গিরিক্ষত্রের “জনা” নাটক

কের আলোচনা করিয়াছেন। “জনা” নাটকের মূল গল্পাংশ স্বর্গীয় নাট্যকার কোথ্য হইতে উদ্ভূত ছিলেন, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ তৎসংঘর্ষে গবেষণা করিয়াছেন, স্বর্গীয় গিরিক্ষত্রের নাটকের আলোচনা এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়াছে পূর্বে “নাট্যমন্দির” নামক মাসিক পত্রের ত্রিমাসিক শব্দকোষে যথোক্ত আলোচনা আরম্ভ করেন। আশা করি স্বতন্ত্রভাবে তাহার আরম্ভ আলোচনা অসম্পূর্ণ রাখিবেন না। এইরূপ আলোচনা যত বেশী হইবে ততই পাঠক সমগ্র স্বর্গীয় নাট্যকারের অনন্তসাধারণ প্রতিভার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উপনিষৎ বাসুদেবীর “আদিনি মানব” এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। মানব-সত্যতার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের বিবরণ লেখক বেশ শৃঙ্খলার সহিত বর্ণিয়াছেন। প্রবন্ধটি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “হুল প্রবীণের কীর্তি” একটি ছোট গল্প। ভাল লাগিল না।

আলোচ্য সংখ্যায় কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনীর “চিত্রা” ও পাতা স্বরা আকারে ছোট হইলেও ভাবময়। শ্রীপ্রবোধ নাথায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বর্ষাবের” স্বরূপ কবিতা—ইহার পেশোশই ভাল হইয়াছে। ইহার অল্প কবিতা “কৃষ্ণব্রহ্ম” চৈত্র মাসের “বর্ষাবাগীতে” ও প্রকাশিত হইয়াছে। “বর্ষাবাগী” সমালোচনা সম্পর্কে লেখকের কৃষ্ণ প্রেমের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যৌগীন্দ্রনাথ রায়ের “হাসি” কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গবানী চৈত্র, ১৩৩২ সাল ৪—আলোচ্য সংখ্যা “দৌণ্ড-বর্ধন” প্রবন্ধে লেখক শ্রীযতীন্দ্রের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরাণইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী দৌণ্ড-বর্ধনের পুরাতত্ত্বের আলোচনা ও উহার স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে আধুনিকতম মতের উল্লেখ করিয়াছেন। বড়ভার উত্তর পশ্চিম মহাপ্রদেশগড়ই প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে মৌলিকার দৌণ্ডবর্ধন। লেখক স্বয়ং মহাপ্রদেশগড়ে ভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার পরিবেশে প্রবন্ধটিতে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন।

“আবার ভ্রাম্যমাণ” দ্বিতীয়পত্রের রায়ের লিখিত

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ভ্রাম্যমাণের প্রাণহীন রচনার স্থানে স্থানে অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিতে মনস্ত দূর্বলমান! দ্বিতীয় পত্রের রমণ ও সঙ্গীত, ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্কার প্রবাসী; দেশী কালোচ্ছ্বাসের উপর স্থাপন পাইয়াছে বিজয়বাণ বর্ণন করিতে ছাড়েন না। কিন্তু নিজের ভাবার কালোচ্ছ্বাসটির সম্ভারে এত উল্লাসী কেন?

অধ্যাপক স্বরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের “ভিলক-চরিত” ক্রমশঃ চলিতেছে; প্রবন্ধটি কি লোকমাত্র ভিলকের জীবনের অনেক অজ্ঞাত পূর্ষ তথ্যে পূর্ণ!

“আর্থ ও অনার্থ শিল্প” শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। শব্দের গঠনকানন ভেদ করিয়া এই তথ্য জানিতে পারা গেল যে “আর্থ” শিল্পের অন্তরে অন্তরে অনার্থ শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুপ্তি হইয়াছে।

“সামাজিক ব্যাপি ও তাহার বিষময় ফল” প্রবন্ধে আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র ভারতের জাতি-ভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, সামাজিক আচার ব্যবহার এবং এই সকলের মূল স্বার্থ ও শাস্ত্রকারগণের উপর দৃষ্টোক্তি নিক্ষেপ করিয়াছেন। মাসিকের পৃষ্ঠায় এবং বক্তৃতা-পীঠে তিনি এ যাবৎ যে কথা কহিয়া আসিতেছেন আলোচ্য প্রবন্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি।

“বৌদ্ধগণ ও দেহার ভাষা” সম্ভারকীর প্রবন্ধ। পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সম্পাদক মহাশয় মূর্ত্তিকর্ত্ত্ব দ্বারা মহাপ্রবোধপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন বৌদ্ধগণ ও দেহার ভাষা সম্বন্ধে বঙ্গবাদের পুরাতন বাঙ্গালী। বিজয় বাবুর মতে ইহা প্রাকৃত-মিশ্রিত হিন্দি। পণ্ডিত পণ্ডিতে বিতণ্ডা আমরা দুই হইতে উপভোগ করি।

এমাসের “বর্ষাবাগীতে” ছোট বড় কয়েকটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধনাথায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

“কৃষ্ণ-প্রেম” অবরোধ ভাষিয়া যুগপৎ “বঙ্গবানী” ও “মানসী” মন্ত্রবানীতে “আত্মপ্রকাশ” করিয়াছে। কি প্রচণ্ড আবেগ এই কৃষ্ণ প্রেমের। প্রবোধনাথায় বাবুর কবিতার ছন্দেই হইয়াছে। শব্দের কবিতা এবং অল্পপ্রাসে উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানান্ত এই যে, এক মাসিক পত্রিকায় প্রেরিত কবিতা পুনরায় পত্রান্তরে প্রকাশের জ্ঞত পাঠাইলেন কেন?

স্বকবি শ্রীকৃষ্ণদেব রায় চৌধুরীর “রক্তা” কবিতায় তিনি কাব্য-রসিকদের পক্ষ রক্তা প্রদর্শন করেন নাই—আত্মকালকার তথা কবিতা কবি-মাত্রেই যাহা প্রাইই করিয়া থাকেন—সুখ চতুর্দশপদীর পরিমিত গভীর মধ্যে কবি উৎকলের স্থবিখ্যাত রক্তা-ধ্রুকের তরল সৌন্দর্য্য হৃদয় ভাবে উল্লাসিত করিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার “রাজেন্দ্রাবী” কবিতায় “কালিদাসী” ছাপ বর্ত্তমান থাকিলেও স্থানে স্থানে কবিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“জীবনের বসন্ত” একটি ছোট গল্প; লেখক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গল্পের মধ্য দিয়া সৌরীন্দ্র বাবু এই কথা বলিতে চাহেন যে, “জীবনের বসন্ত দুরার মন, শরীরের বহন থাকিতে পারে; মনের বহন নাই—মন চিরমোহন, ‘আইভিগিটার’ কোন বিখ্যাত বৈদেশিক লেখকের গল্প হইতে লওয়া হইলেও, গল্পটিতে সৌরীন্দ্র বাবুর গুণাবলি হাতের কোমরটি আছে। কিন্তু তিনি যে তাহলে বাজাইয়াছেন, তাহা বড়ই লুপ্ত ও চপল।—নায়ক-নায়িকার চটল নন্দীন্দ্রার সরস বর্ণনা এক শ্রেণীর পাঠকের কুচিগ্রন হইবে সম্ভব নাই। কিন্তু বিদেশী after-dinner series এর পথ্যায়কৃষ্ণ “বঙ্গবানী” মত কাগজে বাহির না হওয়াই উচিত ছিল; কেননা পাঠক সমগ্র “বঙ্গবানী” কুচি সম্বন্ধে অত্যাধিক অজ্ঞবিদ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

## অভিনয়ে সামঞ্জস্য

শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম্, এ,

ভোক্তার পরিতৃষ্ণি সাধন করিতে হইলে যেমন প্রধানতঃ বাস্তবের উপকরণ উত্তম হওয়া চাই এবং নিপুণ

পাঠকের রচনা ও সুসজ্জিত ভোজন গৃহ ও পত্রাদি এই তিনটিরই অবশ্যক, রসপিণ্ডার দর্শকের তৃষ্ণা-সাধনের



জ্ঞাতও সেইরূপ প্রধানতঃ স্থানিতি নাটক ও তৎসঙ্গে স্থানিতি নাটক, মনোহর রাজসম্মান ইত্যাদির আবশ্যক। ইহার একটির দ্বারা অনেক সময়ে অপরটির গুণ নষ্ট করে, তবে ইহাও অনেক সময় দেখা যায়, যেমন মাহা একটু “রস” ইহাও নিম্নপাঠ্যের রচনা পরিপাঠ্যে উৎকৃষ্ট “কালিয়া” রূপে ভোক্তার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে, তেমনই অনেক নিকট নাটক উৎকৃষ্ট অভিনেতার গুণে “তিরিয়া” যায়। এরূপ ব্যক্তিগত দোষ গুণের কথা ছাড়িয়া সাধারণভাবে বিবেচিত আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে নাটক, নট ও দৃশ্যগটিকা, এই তিনের একত্র সমাবেশে উৎকর্ষ হইলে তবেই অভিনয় বার্থ্য উপভোগ্য হয়। “প্রতিউদার” বা প্রয়োগশিল্পীর কর্তব্য যে কেবল মাত্র রাজসম্মান ও দৃশ্যগটিকার উৎকর্ষ সাধন করিয়াই শেষ হয়, তাহা নহে। অভিনয়ের দোষ জটী গুলিও সম্মতিতে করিয়া তৎসঙ্গে রাজসম্মান ও দৃশ্যগটিকা সমাবেশের মধ্যে একটা সৌভাব্য ও সামঞ্জস্য স্থাপ্ত করা, ইহাই বার্থ্য “প্রয়োগনৈপুণ্য”। প্রয়োগশিল্পী যে নাটকের উপরে একবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, এমন নহে, স্থানে স্থানে কর্তন ও সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য সৌভাব্য স্থাপ্ত করাও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নহে। এ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে বিতর্ক করা যাইতে পারে, যথা (১) নাটকে অর্থাৎ নাটক রচনার (লেখকের পক্ষে) সামঞ্জস্য ও (২) অভিনয়ে (অভিনেতার পক্ষে) সামঞ্জস্য।

বহু-বক্তব্যকে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক, প্রধানতঃ এই তিন প্রকারে নাটক অভিনয়। তত্ত্বের ইত্যাদি বস্তু “কেশব” ও হাতসর প্রধান “প্রধান” ইত্যাদিও অভিনয়িত হয়। অপেরা প্রহসনাদির অভিনয় সাক্ষ্য পক্ষের “দ্রষ্ট” বা প্রয়োগনৈপুণ্যের উপরে বিশেষ নির্ভর করে না। যা হউক একটা কিছু গল্প থাকিলেই হইল, তাহাতে কতগুলি পরী অপেরার নাটগান, জেলে জেলেনীর বৈতন গীত, ঘোবা-ঘোবানীসের পাথরে কাপড় আড়াইতে আড়াইতে “কোরাঙ্গ”-এই সকল বস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকে, যদি ২১১ খানি transportation scene বলা রাজ প্রাসাদ হঠাৎ হুদ শবে একটি প্রক্ষুটিত পদক্ষেপে পরিণত হইল এবং পদ মধ্য হইতে একটি বালিকা

বাহির হইয়া মৃত্যুগীত আরম্ভ করিল—এই সকল থাকিলে বাস্তবীক দর্শক আর বড় বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না। তার উপরে যদি জেলের ক্রিয়াকার মৃত্যুকালীন ভূমি ধোষ এবং জেলেনীর ক্রিয়াকার হৃদয়াকা শ্রীমতী পেতা বলা থাকেন—“তা’হলে হা হা হা সে ত সোয়ায় সোয়ায়।” কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে এ শ্রেণীর অভিনয় পরিভাষা করিয়া কেবলমাত্র খাতি “নাটক” সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

অনুনা প্রায়ই এক শ্রেণীর সমালোচনা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় যে, অমুক “ঐতিহাসিক” বাস্তবিক “ঐতিহাসিক” কিনা, তাহাতে বর্ণিত অমুক যুদ্ধে অমুক রাজা পরাজিত হইয়া কখন নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন কি উল্লেখ্য নগরে গিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ইতিহাসে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায়, ইত্যাকার “থ্রিটানি” লইয়া তুমুল আলোচনা ও বাস্তবিতা। কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ আলোচনার বিশেষ ফল নাই, কারণ এ দেশে রঙ্গমঞ্চের অবস্থা এতাদৃশ উন্নত হয় নাই যে একখানি “ঐতিহাসিক” নাটকে চরিত্র মুখ, রাজসম্মান, ঘটনা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তই নির্ভুল নিরুপ ভাবে দেখান যাইতে পারে। তাহাতে যে পরিমাণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অর্থব্যয় প্রকৃতি আবশ্যক তাহার আদ্যাবসরে দেশে কেন, ইংলও প্রকৃতি দেশেও যথেষ্ট বর্জমান। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, আদর্শ বর্জ করিতে হইবে। নিজ শক্তির অল্পত্ব চেষ্টা নিম্নাই করা উচিত, যে সময়ের ঘটনাবলী লইয়া নাটক রচিত, তৎসাময়িক একটা “আবহাওয়া” (atmosphere) মোড়ের উপরে স্থাপ্ত করাই উদ্দেশ্য, ইহা করিতে পারিলেই দর্শকের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর, আলোকজ্ঞানের যুগান্তের স্রাবণাল পরিভেদে কি ছাগলচরের জুতা পায়ে দিহেন, তাঁহার গৈরিকগণ যুগান্তের সময়ে ঢাক বাজাইতে কি “কাড়ানগরা” বাজাইতে, এই সকল লইয়া কচকচিত্র বিশেষ ফল আছে বলিমা মনে হয় না। এসকল বিষয়ে সামান্য তুলনাজ্ঞান অসামান্য নহে। বিধি বিধাত ইতালীয় চিত্রকর, বিদ্যুৎ প্রদায়ের পটভাস্য পাইলেটের সভা অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার সৈন্যকণ্ঠের হাতে বন্দুক

দিয়াছিলেন, অথচ বন্দুক প্রায় তাহার সম্মুখস্থিক বসুর পরে রাখিত। এ সম্বন্ধে বহিঃস্রব্দ তাঁহার রাজসম্মান উপভোগ্য হইয়াছিল। “ঐতিহাসিক” ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপভোগ্য হইয়াছে হইতে পারে।…… উপভোগ্য লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামতে অভিত সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।……উপভোগ্যে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।” মহাপুত্রের এই উক্তিগুলি কি নাটক সম্বন্ধেও খাটে না? ইহা ত গেল নাটক রচনার কথা। প্রডাকশন (production) বা অভিনয় সম্বন্ধে আমার মত সর্বদয়ের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলও “হাম্লেট” নাটক চিরকালই সমরোপযোগী বেশকিছু দৃশ্যগটিকা সহ অভিনয়িত হইয়া আসিতেছে, হাম্লেট বলিতেই doublet and pose পরিহিত মুষ্টি দর্শকের কল্পনাক্ষেত্রে উদ্ভিত হয়, কিন্তু সমস্তই ইংলওর এক স্থপরিচিত অভিনেতা প্রচার করিয়েন যে, তিনি সমরোচিত বৈশিষ্ট্য একবারে বর্জন করিয়া আধুনিক ইংরেজ ভাষালোকদিগের প্রচলিত বেশকিছু পরিধান করিয়া উক্ত নাটক অভিনয় করিয়েন। তাঁহার মুক্তি এই যে মহাকবির রচিত নাটক অভিনয় সাধনের জন্য বেশকিছু ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে না, এরূপভাবে অভিনয়িত হইলেও উহা অপ্রিয় বা অসঙ্গত হইবে না। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি কথামত কাঁচও করিলেন এবং তাঁহার অভিনয়ে দর্শকেরও অভাব হয় নাই। নাটকবিদ বাস্তবিক সারগর্ভ্য থাকে, তবে তাহার অভিনয়ে আড়ম্বর অধিক না করিলেও তাহা লোকপ্রিয় হইতে পারে, অপর পক্ষে তেমনি নিকট অন্তঃসার শূন্য নাটক অনেক সময়ে বহু বাড়াড়খরের দ্বারা লোকচক্ষু ঝলসাইতে চেষ্টা করিলেও সে প্রয়াস প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া যায়।

লিখিত নাটকে যে সকল অসামঞ্জস্য দোষ থাকে উদ্ভক্ত অর্থ নট দায়ী নহেন, নাট্যকারই দায়ী। বাস্তব ভাবে এ সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথা বলিব। সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটকে নাটগান চাইই, নচেৎ দর্শক তুষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অমৃতলাল বসু মহাপুত্রের লেখনী প্রস্তুত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিলে যথেষ্ট হইবে। এখকার

নাটক লিখিয়া থিয়েটারে ম্যানেজারের নিকট লইয়া আসিয়াছেন ও এইরূপ বাধাদায়ক হইতেছে:—

“এখকার। শব্দাই, নাটক লিখলেই হয় না, চিত্রে হবে। ওই ও তারিণ, audienceকে খুসি করতে হবে। নাচের যাগা পাই না, মল্লিকদের মেজবোকে বিড়কির খাটে নাচিয়ে নিশুম।

অপেরা মাঠার। গেরস্তর বউ নাচবে?

এখকার। নাচবেই না!

হয় অভিনেতা। কেন নাচবে?

এখকার। নাচবে, because সে নাচবে। সে তোড়া পাবে, ক্রাপ পাবে, হাওবিলে লিখে দিতে পারবেন singing and dancing throughout তাই নাচবে।”

এই “অমৃতলাল নাটগানের” ব্যবস্থা করিবার জন্যই গাইয়া নাটকে, ভিখারি, পাগলিনী, ময়রা, ময়রানী প্রভৃতির অবতারণা করিতে হয়, তা সে ভাবাবিকার হউক আর অস্বাভাবিক হউক। তারপর তথা কথিত “ঐতিহাসিক” নাটকে এরূপ অজুত পরিষ্করণ দেখিবার যে অস্বাভাবিকতা রাজপুত্র রাজমহিরা একাকিনী পদক্ষেপে আবারী অর্কতের পারদর্শনে উপস্থিত, সেখানে তাঁহাকে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাঁহার দ্বারা একজন আর্ন্তের রক্ষা সাধাণিত হয় না, হস্তান্তর তিনি উপস্থিত। সস্তাই হউক আর অসঙ্গত হউক তাহা হইতে টানিয়া হাজির করা হইল, রক্ষাকার্য সাধিত হইল, অভিনেত্রীও ক্রাপ পাইলেন। আবার এমন ঘটনা বহু নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়, লেখক মহা পাণ্ডিত্যে চিত্রিত অঙ্কিত করিয়াছেন, চারি অর্থ ব্যাপি তাহার দৃষ্টি ও পাগচরণের কাহিনী চলিল, নাট্যকার উপরে সে অনেক অত্যাচার অনাচার করিল। কিন্তু পক্ষম অর্থে হঠাৎ নাট্যকার এক পাঁচ মিনিট ব্যাপি “লোকচারণের” ফলে সে চিত্রকার করিয়া উঠিল “মা, যা, আজ হতে ভূমি আমার না। আরথেকে খুন আর আমি করবো না, জায়াতিত আজ হতে আমার ত্যজ্য পুত্র, জুয়াচুরির সঙ্গে আমি নন্দো-অপারেশন করলাম, আজ হতে শুধু হিরণ্যাক্ষ জপ করবো আর রোজ সকালে গঙ্গাধান করবো।” অমনি দর্শকগণের ঘন করতালি। লগাই মাখাই মহা পাণ্ডিত ছিল, এবং



মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নৈতিক প্রভাবে স্বেচ্ছায় তাহাদের অসুস্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, একথা সত্য। কিন্তু চৈতন্য দেবের মত চরিত্র কি ঘরে ঘরে জন্মায়! মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকার ফলেই নাট্যকার এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা (sudden rofomation) বা চরিত্রের অব-তারণা করিয়া থাকেন। সামগ্রিক না রাখিতে পারিলে নাটকের যেমন নানা দোষ-দুর্ভেদ্য হইয়া পড়ে, অভিনয়েও তাহাই হয়। প্রয়োগ নৈমুণ্যের অভাবে, অতি সামান্য ক্রটি থাকিতে অভিনয় অনেক সময়ে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ হইয়া পড়ে, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইতেছি। কোন নাটকে দেখিয়াছিলাম—একজন জলময় ব্যক্তিকে উদ্ধার। বহুশব্দে সে দৃষ্ট চরিত্র উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের উক্তি-তে বৃথা গেল, অথচ নদীপার্শ্বে একটি লোক ভুবিয়া মরিতেছে। তন্মধ্যে একজন শৌড়িয়া ঠেঙের পিছন দিক দিয়াই “নদীতে বস্তু প্রদান” করিলেন, “বস্তু” করিয়া জলে গড়ার শব্দও শুনা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে ব্যক্তি উদ্ধার কার্য সম্পন্ন করিয়া ঠেঙে কিরিয়া আনিলেন, কিন্তু আমি অবাক হইয়া দেখিলাম তাহার গায়ে বা জামাকাপড়ে কোথাও এক ফোটা জল নাই! এই ঘটনাটি দেখিয়া আমি নাট্যকারের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকা সত্ত্বেও তাহাকে একখানি পত্র লিখি, তত্ত্বত্ত্বে তিনি আমাকে জানান যে অন্তঃপুর উক্ত অভিনেতা ঠেঙের পিছনে (দর্শকচক্ষুর অন্তরালে) ঘাইবামাত্র তাহার উপরে এক টব জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য জল ঢালিয়া দেওয়াতে অভিনেতার একটি শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয় বটে, কিন্তু আর্টের জন্য এতটুকু স্বার্থীকার না করিলে ব্যাপারটি যে বড়ই হাস্যোৎপাদক হইয়া পড়ে। অন্তঃপুর একজন ঘটনা অনেকবার দেখিয়াছি, সেত পরিচ্ছদ পরিহিত কোন অভিনেতা আক্ষাফলন পূর্বক দর্শকচক্ষুর অন্তরালে “মুদ্র” করিতে চলিয়া গেলেন, কণ পরেই তিনি “রক্তাক্ত” কলবরে কিরিয়া আসিয়া আহত মুদ্র ব্যক্তির অভিব্যক্তন করিতে লাগিলেন। তাহার সমস্ত জামাকাপড় রক্তে রঞ্জিত (অর্থাৎ তাহার উপরে ছুই বোতল আলুতা গোলা ছিটিয়া দেওয়া হইয়াছে) অতি লোম-হর্ষণ মুদ্র, কিন্তু আমার ইহাই সব চেয়ে লোমহর্ষণ মনে

হইয়াছে যে, তরবারির আঘাতে তাহার দেহ বহুখণ্ড হইয়া কথিরাগ্নত হইয়াছে কিন্তু তরবারি তাহার জামাকাপড়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এখনে তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল, তাহাতে প্রত্যেক অভিনেতা এক সেট পোশাক ছিটিয়া নষ্ট করিতে হয় বটে, কিন্তু সেটুকু ব্যয়ভার বহন না করিলে যে দৃষ্টটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আর একটি বিষয় অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি, পাঠক, আপনি কখনো কোনও অভিনয়ে কোন অভিনেতাকে খুব ছোঁড়া “চিরকুট” ময়লা কাপড় চোপড় পরিতে দেখিয়াছেন কি? হটক সে ভিক্ষুক, হটক সে দীন দরিদ্র! অনেক নাটকে এমন চরিত্র থাকে, বাহার প্রকৃত অভিব্যক্তি দেখাইতে হইলে কিছুকিছু বোপদত্ত কাপড়ের মাধ্যম পরিচয় করিয়া অতি জীর্ণ মলিন বেশ ধারণ কর্তব্য, কিন্তু কোন অভিনেতাকে এতটুকু স্বার্থীকার করিতে দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল—ইংলণ্ডে কোন নাট্যকান্ডিনে যে অভিনেত্রী নামিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে একটি দৃষ্ট এইরূপ অভিনয় করিতে হইল যে ঘটনাটিকে তিনি দারিদ্র্যের নিম্নতর উপস্থিত, ঝড় ও তুষারপাত হইতেছে, তিনি পথিমধ্যে নিঃসংসার অবসর দেখে কাতর ভাবে বলিতেছেন “হা অদৃষ্ট, শেষে কি আমাকে পথিমধ্যে অনাহারে মরিতে হইবে!” তৎকালে গ্যালোরি হইতে একজন দর্শক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “দীনের আশ্রিত বাঁধা দাও না, না দেখে মূরে কেন!” বিদায়পূর্বক কণ অভিনয় একবারে “মাটি” হইয়া গেল, কারণ অভিনেত্রী দারিদ্র্যোচিত জীর্ণ মলিন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আত্মলুপ্ত যে দীয়ার আশ্রিত ছিল তাহার বখা ভুলিয়া গিয়া সেটি পরিচয় করেন নাই। এতটুকু সামান্য জিনিষের উপরে অভিনয় সাক্ষ্য নির্ভর করে! কারো দৃষ্টিভ্রান্ত করিতে হইলে কতটা একাগ্রতা আবশ্যক, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ কথিত আছে যে ইংলণ্ডের কোন অভিনেতা “ওথেলো” (কামি-চরিত্র) অভিনয় উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র হস্ত পদ ও মুখেই কাপোর বা মাথিয়া কাপড় হ’ল নাই, নিজের সর্বস্ব কক্ষপের রঞ্জিত করিয়াছিলেন। বারম্বার এ বিষয়ে আশো কিক্রিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা বলিল।



[ বিত্তীয় বর্ষ ]

১৮ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৩, ইং ১লা মে ১৯২৬

[ ৩৭শ সংখ্যা ]

## প্রণিপাত

শ্রীমদ্বিষয় মুখোপাধ্যায়

কর্তৃ পুর উঠল আমার

তোমার গানে তোমার হৃদে,

পেয়ে এলাম বিজয় গীতি

তাইত ময়াল, বিশ্বপুরে!

ওগো জগদ্রাথ—

তোমার আমার হৃদে ছুটী

উঠুক সারা জীবন ছুটি

তোমাথ প্রণিপাত!

হৃদয় হ’তে সাড়া পেলাম

ভূমি আছ আমার তরে

বার্ণ বরেন ল’য়ে এমন

কেন তবে পুরেই মরে!

ওগো বিশ্বনাথ—

প্রেম, বেহে ও ভক্তি জীতি

অটুট বন্ধ জীবন নীতি

তোমার প্রণিপাত!

ছুটেছে আমার জীবন নদী—

কত মন্দ থর বেগে—

মরু মরীচিকার মাঝে—

উঠেছে আমলতা জেগে;

ওগো নিখিল নাথ—

পার হয়ে এই বিশাল দেশে

তোমাথ গিয়ে মিশব শেষে—

তোমাথ প্রণিপাত!





## শিক্ষার আদর্শ

অধ্যাপক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্—এ

আমি যে আপনাদের এই বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রণ পাওমা মাত্র সাগ্রহে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম, তার কারণ আপনাদের এই লাইব্রেরীট একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আমি বহুদিন বাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই সেবা করে আসছি, তাই আপনাদের এই অস্থানানের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ প্রাণের যোগ আছে। আজকার ব্যাপারে আমি পৌরোহিত্য করতে পারব কি পারব না, এ চিন্তা একবারও আমার মনে হয় নি। আমার মনে হ'ল যেন একটা চিরপরিচিত ভাক আমি শুনতে পেয়েছি, এ যেন আমারই নিজের আশ্রিত্য ঠাণ্ডিয়ে আমাকে কে পুরাণ ঘেঁষের হয়ে ডাকলে, তাই আমি ছুটে এসেছি। আমি আপনাদের এই অস্থানানের শিক্ষায় কামনা করি।

দেখুন সারা বিবে আজ শত সম্বলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। এখন অনেক লোক আছে, যারা দ্বিবা-নিশি নিরলস ভাবে ধ্যান করছেন যে কেমন করে খেন প্রণালীতে শিক্ষা দিলে অল্প সময়ে অধিক ফল লাভ হয়। 'অল্প সময়ে অধিক ফল' কামনাই জগতের সমস্ত শিক্ষা প্রণালীর মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে কলটা যে কি, তা নিয়ে এখনও অনেক মতভেদ আছে। বেশী অর্থ উপার্জন করবার মত হলেই শিক্ষার সাফল্য, না শক্ত-নিপাত করবার সামর্থ্য বেশী পেতে চাই, না দশজনকে প্রতিপালন করবার ক্ষমতা চাই, না সকলের মাথা নত করে দিয়ে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, এ নিয়ে পণ্ডিতদের ভিতর এখনও বাগবিতর্ক চলছে। পৃথিবীও সে সকল উপেক্ষা করে জড় তত্ত্ব। তার দিকে চলছে কি মন দিকে চলছে, সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়। সব জিনিষেরই ছুটো দিক আছে। এতে অনেক হয় ত গভীর ভাবে লক্ষ্যে নেবে,

বর্তমানের শিক্ষাপ্রণালীতে ভালও হচ্ছে, মন্দও হচ্ছে। মন্দই যে বেশী হচ্ছে, তার প্রমাণ কি? অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, মোটের উপর আমরা উন্নতির দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। সব সময়ে যে আমরা সরল ভাবে বরাবর এগিয়ে যাচ্ছি, তা না হতে পারে। হয় ত কোনও কোনও সময়ে পেছিয়ে পড়ছি, কোনও সময়ে আঁকা বাঁকা হয়ে ঘুরে ঘুরে চলছি, কিন্তু মোটের মাধ্যম দেখতে গেলে আমরা এগিয়েই চলছি। অর্থাৎ কিনা যোড়শ শতাব্দীর লোক থেকে সম্ভবদশ শতাব্দীর লোক, এবং সম্ভবদশ বা আঠার শতাব্দীর লোক অপেক্ষা আমরা এই বিশ শতাব্দীর লোক অনেক ধাপ উপরে উঠে এসেছি। এই উন্নতিবাদীদের মূল্য খণ্ডন করা বড়ই শক্ত। তারা যেমন বলেই হোক আমাদের এগিয়ে ধরেনই। এখন তাঁদের বিবাস নিয়ে আমাদের উপস্থিত কোনও লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। আমরা যখন সব দিক বখিয়ে দেখবার অবকাশ পাই, তখন মনেটা এই উন্নতিবাদীদের গোলাবী ভেঙে ছবিতের রঙীন হয়ে পড়ে না। আমরা ছলনে ভুবে থাকতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সব দিক ভেবে দেখলে সে আশা মুহুর্তে ধূলিসা হয়ে যায়। যখন ভাল করে ভেবে দেখি, তখন দেখি যে, আমরা নানা অপর কুপথ ধরে চলে চলে কেবল আঁত লাভ মলিন হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। মানুষের যে সকল আদর্শ আছে, তার জিন্দামান্যও পৌঁছিতে পারি নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য আর যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, এ আমাদের আদর্শের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। আমাদের বর্তমান অবস্থা অস্থায়ী আমরা-শিক্ষাকে ছোট কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছি বটে, তাই বলে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য যে অর্থোপার্জন নয়, এ কথা আমাদের হিন্দুদের ব্যুত্থি বপুতে হবে না। বর্তমান আবিষ্কারি ঝিট জীর্ণশীর্ণ বালালী দু'মুঠো অয়ের

বিত্তীয় বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা]

শিক্ষার আদর্শ

১২৭

জল কাবাল। কিন্তু একবার সেই সমুদ্র সন্ধান করতে পারলে, বালালী আশ্চর্যবিশ্ব হয়ে থাকে না। সে ত্যাগের মহিমা জানে, সে জানে যে এখনও আমাদের দেশের প্রকৃত মহিমা সম্বাসের গৈরিক বগনে সমুদ্রজল, এখনও সম্রাটের নিকট আমাদের গর্বের্যস্ত শির সমুদ্রে নত হয়ে পড়ে। আমাদের আদর্শ সেই তপস্কর-তরু ত্রাঙ্গণ যিনি তপোবানের নিরালা স্কটীর হইতে সাম্রাজ্যের বিধি বিধান প্রণয়ন করছেন; আর মহত্ব সমাজ তাই অবশ্যতঃশিরে ধ্যেনে নিত। রাজার ছত্র চামর বস যিনি অনিত্য বলে হেলায় উপেক্ষা করতে পারতেন; সেই ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি সম্রাটী এখনও আমাদের আদর্শ। সে কাল এখন নাই, সত্য। কিন্তু আদর্শের বেশী পরিবর্তন হয় নি। কালের দ্রুতর সাগর অতিক্রম করে সেই ত্রিকালজ্ঞ জ্বিগা এখনও কি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছেন না! আমাদের জীবনের প্রধান সম্ভার—বিবাহ,উপনয়ন,শ্রাদ্ধে প্রভৃতি এখনও তাঁদের নিয়ন্ত্রেই চলে। তাঁদের নিহিট দেবারতনই এখনও আমাদের তীর্থযাত্রা চলছে। তাঁদেরই আদর্শ আমাদের সমস্ত চিত্ত বিনা তর্কে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছে। তাই এখনও আমাদের শিক্ষা দীকার গুরু ঐতিহ্য—সম্রাটী। জীৱামৃত্যু পরমহংস—সম্রাটী। তাই এখনও আমাদের কাছে ত্যাগের আহ্বান এমন করে বাজে। স্বামী বিবেকানন্দ ত্যাগের মহিমা অল্প বয়সেই দেশের পূজা পেয়েছিলেন। গান্ধী মহারাজের রাজনৈতিক মত সকলে গ্রহণ করে নি। সকলে জানেনও না। জানে শুধু তিনি মহাত্মা, জানে শুধু তিনি সম্রাটী। পাশ্চাত্য দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সমুদ্রের তেউয়ের মত। কখনও কখনও বহু উজ্জ্বল তুলে দিলে, কখনও আবার দিন কয়েক বাদে অতল তলে ডুবিয়ে দিলে। কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শ আমাদের দেশের অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজনৈতিক মত ছুঁদিন বাদে লোকের হুঁড়ে কেলে দিতে পারে, কিন্তু তিনি যে মহাত্মা, তিনি আত্মকে তার নিজ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তাত-বাসী তার মর্যাদা চিরদিনই দেবে। আমাদের দেশের চিত্তরঞ্জন এই আমাদের চোখের সামনে সেনিন দেবশ লভ করে গেছেন, সে কিরণে জগে! তাঁর অপেক্ষা

বড় লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে। কিন্তু এই অধঃপতিত আনাদৃত দেশ সেনিন সেই হারাণো আদর্শ পেয়ে যেমন করে' সাক্ষা দিয়ে উঠেছিল, তেমন বহুদিন করেনি। সে কালের বৈদিক যুগ হতে যে স্বরাজ্য নিয়ে এসেছে, সে দ্বারকে এই ত্যাগের ভুবন প্রাণী স্বরণ মাঝে মাঝে উৎসারিত হয়েই বাঁচিয়ে রাখছে। আপনাদের হৃদয়ের জ্ঞানেন যে, বৈদিক যুগে বজ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, নিজের অর্থ ত্যাগ। ভগবান ব্রহ্ম যজ্ঞ করিলেমন, অর্থাৎ আপনাকে এই সংসারের মধ্যে একবারে বিলিয়ে গিলেন। তাই তিনি পূর্ব ভগবান, আমরাও বৃষ্টি ত্যাগেই পরি-পূর্ণতা। আজ এই নিদ্রাব্যের সাহায্যে যদি এক কলসী জল এখনই এখানে রাখা যায়, তাহলে দেখবেন তার পরিপূর্ণতা সার্থক হবে আমাদের তৃষ্ণার নিহুতি করে। তাই ঈশ উপনিষদ বলেছেন—

পূর্ণত্ব পূর্ণমায়ার পূর্ণবেশবিশিষ্ট।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলেও তা পূর্ণই থাকে। তার মানে আর কিছু নয়, পূর্ণ যখন আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে, তখনই তার পরিপূর্ণতা চরম সার্থকতা লাভ করে। সেই ত পূর্ণ, যার ত্যাগ সম্পূর্ণ, সেই ত পূর্ণকাম, যে সর্বপ্রকার অভাবকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে চিরত্যাগ হয়। শূন্য কলসীর সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ করে দেয় জল, তাই কলসী পূর্ণ। আবার সে কলসী আপনাকে শূন্য করে অপরের অভাব পূর্ণ করে দেয়, তাই তার পূর্ণতা মালিক। যাকাল পূর্ণ কলসী অপেক্ষা শূন্য কলসীর দর্শন প্রশংস, যদি সে শূন্য কলসী আবার পূর্ণ হতে যায়। স্বতরাং এই ত্যাগ হ'ল আমাদের শিক্ষার আদর্শ। এ সম্ভারের মত আমাদের সাথে সাথে রয়েছে। অস্বাভাবি গণ্য হয়ে আমরা কখনও কখনও ভুলে থাকি। কিন্তু দিন বিহীন দীর্ঘ রাত্রির মধ্যে কেন্দ্রীয় উদার মত এইই আলোক আমাদের প্রাণে সময় সময় চমকিত হয় বলেই আমরা আত্মও টিকে আছি। আমি আশঙ্কর এই অস্থানানে আপনাদের নিকট এই কথাটি যে পুনঃ পুনঃ বলবার চেষ্টা করছি, তার কারণ আপনাদের এই পাঠাগারটি দশকনের মিলিত চেষ্টায় চলছে। আমাদের দেশের অনেক সমবেত উচ্চম নিম্নল হতে দেখা যায়,



শুধু এই ভাগের অভাবে। হস্তরাং এখানে কাজ করতে হলে যে আদর্শটি সকলেরই সমুখে রাখা উচিত, আমি তারই কথা বিশেষভাবে আজ আপনাদের কাছে বলতে চেষ্টা করছি। স্বার্থ, সংকীর্ণতা, প্রতিষ্ঠা এই সবই ভাগের শত্রু। এগুলিকে পরিত্যাগ না করলে ভাগ্য সম্পূর্ণ হয় না। এই কথাটিই আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা যুদ্ধ হই, প্রৌঢ় হই আর যুদ্ধ হই, আমাদের সকলেরই শিবিবার স্থান এই সংসার। আমরা এই পাঠাগার হতে যেন এই ভাগের শিক্ষাই লাভ করে যেতে পারি। যে ঐক্য সমস্ত বেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মাহবুকে মাহবুকের সঙ্গে বেঁধে দিতে চায়, তা কখনই স্থায়ী হতে পারে না। যতক্ষণ বেনা পাওনার সামঞ্জস্য থাকে, ততক্ষণ সম্মতি থাকে। বেই হিসাবে একটু গোলা বাধে, অমনি এক নিমেষে সমস্ত ঘেরের বন্ধনগুলি ছিঁড়ে যায়। প্রেম ভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে, সে প্রেমই নয়। আপনাকে নিঃশেষে জান করব এই হ'ল প্রেমের কথা। আমাদের মধ্যে ভাই ভাইয়ে যে অনেক বলে কলহ দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ আর কিছুই নয়, মাঝখানে বেনা পাওনার সম্বন্ধ আছে বলে। প্রথম থেকে ভাইয়ের সঙ্গে সব জিনিষ ভাগ করতে করতে প্রেম আর গড়ে উঠতে পারে না। ভাই ভাইকে যত্নবুঝে দেখে আমরা অস্তের শল্য ধরে' ভাব করতে চাই। আপনারা এই লাইব্রেরীর কল্যাণে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শটি, যা আমরা হয় ত একদিন পাশ্চাত্য জগৎকে গৌরবের সহিত ধার দিতে পারব—সেই ভাগের আদর্শটি আপনারা শিক্ষা করুন। আপনাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকলকে এই মহামন্ত্র নিবিয়ে দখ হোক।

পাঠাগার যে শুধু কতকগুলি ডাল অডাল বইয়ের আলমারী মাত্র নয়, এ কথা আপনাদের বলে দিতে হবে না। এ যদি শুধু পুস্তকের গুণাম ঘর হয়, তা এর সার্থকতা বড় বেশী নয়। পাঠাগার শুধু একটা কল নয়। এখানে এসে ছুঁগ পড়লেই যে কলে জ্ঞানবুদ্ধি হবে সে আশা বুধা। জ্ঞান-বুদ্ধির উদ্ভবই যে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা একথা আমি অস্বীকার করছি নে। পাশ্চাত্য দেশে

যেমন শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে, তেমনই গ্রামে গ্রামে গল্পীতে গল্পীতে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার সংখ্যা শতকরা ৩৪ জনের বেশী নয়, সেখানে এ রকম পাঠাগারের সংখ্যা যে নিতান্তই কম হবে, তা আর বিচার কি? শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে মনের খোঁজকে খোঁজাবার দরকার হয়। সেই জুড়ই পাঠাগারের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা মনে ঘে, পাঠাগার শুধু মনের একটা হোটেল মাত্র নয়। আপনাদের এই অস্থানটিতে যদি আপনারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে না উঠতে পারেন, তা'হলে এ নিত্যন্ত নিষ্ফল পুস্তকের মত হয়ে থাকবে। আপনাদের প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে এ সাড়া রিতে পারবে না। এর স্পন্দনে আপনাদের জীবনের তন্ত্রী বেজে উঠবে না। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, নিজের প্রাণ এতে ঢেলে দিতে হবে। এখানেও আবার সেই ভাগের কথা এসে পড়ে। শাস্ত্রে বলে দেবতা না হলে দেবতার পূজা করা যায় না। কথাতা একটু প্রধিধান করে' দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, পাণ্ডা প্রতিমাকে দেবতা করে তুলতে হলে, নিজের দেবতা হওয়া চাই। যার নিজের দেবতা নেই, সে কি পাণ্ডে বা মূর্তিপটে দেবতা এনে দিতে পারে? সেই রকম এই পাঠাগারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজের প্রাণ এতে ঢেলে দিতে হবে। প্রাণের বিলন ঘাটতে হবে, সকলের প্রাণের মিলিত স্পন্দনে ইট-কাঠ-লৌহের পাঠাগার প্রাণময় হয়ে উঠবে। তবেই এ আপনাদের জীবনে অদ্বুত শক্তি, অদ্বুস্ত আনন্দ, কল্যাণময়ী প্রেরণা এনে দিতে পারবে। আমি প্রার্থনা করি, আপনাদের এই বাস্তব সমিতি ও তৎসংগঠিত পাঠাগার প্রাণের অভিনব সকারে প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠুক—যেন আপনারা এর থেকে অস্বাভাব্য লাভ করতে পারেন। শ্রুতিতে একটি গল্প আছে যে, 'একদা উৎখতি চান্দ্রাশ্ব নামে কৃষি কোনও রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, সেখানে বৃহৎ এক রজের অস্থান হচ্ছে। প্রত্যোতা, উগপতা প্রতিহস্তী সব স্ব স্ব আসনে বসে যথেষ্ট উচ্চারণ করছেন। তখন কৃষি বললেন, "আপনারা যদি দেবতাকে যথার্থ না জেনে উপাসনা করেন তা হলে আপনাদের মস্তক ক্ষত্ৰঘাত হয়ে পড়বে। এই কথা শুনে

তার চূপ করে' বসলেন—তুচ্ছীমাসাক্রিরে। তখন রাজা কৃষিকে বিনয় বচনে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষি বলিলেন আমার নাম উৎখতি, আমি চক্র নামক কৃষির পুত্র।" রাজা বলিলেন, "আমি আপনাকেই এই যজ্ঞে বরণ করব বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনার সন্ধান না পাওয়ায় ইহা বিগত হয়ে বরণ করেছি, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হোন।" তখন প্রত্যোতা কৃষিক জিজ্ঞাসিত হয়ে 'কৃষি বললেন,

"প্রাণই সেই দেবতা। প্রাণ ইতি হোবাচ সন্ধানি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেতাভিঃ বিশস্তি প্রাণমকৃষ্ণি হতে। প্রাণেই সমস্ত চরাচর বিশ্ব বিলীন হয়; আবার প্রাণকে লক্ষ্য করেই উৎপন্ন হয়। অতএব প্রাণের আরাধনা কর।" আমারও নিবেদন আপনাদের নিকটে, আপনারা ভাগের দ্বারা, সেবার দ্বারা, সমবেত প্রাণ-চেষ্টার দ্বারা আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাণময় করে তুলুন।

## থোকা

### শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

গুরে দুই থোকা

কেউ বা তোরে ঢালাক বলে কেউ বা হাঁদা বোকা।  
আমি কিন্তু দুই নীতে হার মানি তোতার সনে  
দিবা নিশি যুটীনাট্য ফন্সী মনে মনে  
বারন আর অবাংবোরে তুই ব্যস্ত করিম মোরে  
তবু যে বোরে রইতে নারি চোখের আড়াল করে  
চোখ দুটা তোরা দুই নীতে সাদাই থাকে ভরা  
তারি সাথে স্বরতে থাকে হাসির কোয়ারা।  
কখনও বা দেখি তোরে চপল অতিশয়  
কখন আর 'ঢেঁপো' কথায় অবাক হতে হয়  
ডালবাগায় বাঁধতে পারিস ছোট বড় সবে  
বন্ধু যে তোরা নয় কে আমি পাইনে তাহা ভেবে  
প্রার্থনা মোর দুই নী আর হাসি-খুসী নিয়ে  
ডরে থাকিস যখন মোদের ভরে থাকিস হিয়ে।







## শীতের নিঃশ্বাস

শ্রীমতীস্বপ্নার দাস

...সেদিন 'বোস-ভিলা'তে কি একটা উৎসব ছিল। তা শেষ ক'রে ফিরে আসবার পথে আমিরা একটু রান হেসে রক্তিমাকে বললে—আজ তোর খুব অজ্ঞার হয়ে গেছে দিদি। প্রাণবাহুকে এমন করে অপমান করবার তোর কি অধিকার ছিল?...

রক্তিমা হয় তো মনে মনে সেই কথাটারই আলোচনা করছিল। সে যে কতটা অজ্ঞার করেছিল, তা সে নিজেও বুঝেছিল; কিন্তু আমিয়ার কথা তার সইল না। সে জলে উঠে বললে—প্রাণবাহুর মতো মানুষের জন্ত বরষ দিয়ে কথা বলা শুভু তোকেই সাধে আমি।

আঘাত পেয়ে আমিরা চুপ করে রইলো। এটা তার একটা বিনোদন। মানুষের সঙ্গে এরকম ক'রে কথা বলতে সে জানে না।...

...রক্তিমার বাবা প্রকাশ মিত্র কলিকাতা হাই-কোর্টের উকীল। সংসারটি তাদের যেমনই সুস্থ, তেমনই শান্তিময়। রক্তিমার একটি ছোট ভাই ছিল। রক্তিমার মা অশ্রুপা যেন খেঁচকরণার জীবন্ত প্রতিমা। তা'ছাড়া এই সুস্থ সংসারটিতে আর ছুটি প্রাণীও এসে স্থান পেয়েছিল। সে হল প্রকাশের বিধবা ছোট বোন কল্যাণ ও তার এক মাত্র মেয়ে আমিরা।

রক্তিমা আর আমিরা প্রায় সমবয়সী; তবু ছাঁচার মাসের বড় বলে রক্তিমাকে আমিরা 'দিদি' বলেই ডাকতো। তারা বেথুন কলেজে কাঠ'ইয়ারে পড়ছে।

বোসেরের সঙ্গে তাদের আলাপ অনেকদিনের। তা'ছাড়া তাদের একটি মেয়ে রক্তিমাদের সঙ্গেই একত্রে পড়তো। এই যমুদ্র সম্পর্কিত দুই টানে প্রায়ই তারা পরস্পর পরস্পরের বাসায় যেত।...

...সেদিন সকালবেলা সবাই চায়ের টেবিলে বসে হাসি-ভাসমা গল্প করে তাদের দৈনন্দিন এই চা-খাওয়া কাজটাকে সহজ-সুন্দর করে নিচ্ছিল। এমন সময় রাণী এসে সেখানে ঢুকলো।

আমিরা হেসে বললে—কি রে রাণি, আজ এক সকালে যে?

রাণী একথানা চেয়ার টেনে বসে বললে—ভাগ বাবা বলে হিঁসে হচ্ছে বুঝি; কিন্তু তথ্য নেই—আমি একটা কাজেই এসেছি।

প্রকাশ বাবু তার চশমা ছাটা চোখ দু'টো তুলে একবার রাণীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তা কাজ এখন পরে হবে না, এখন এই উপস্থিত কাজটাই করে ফেল বেণি আগে আমাদের সঙ্গে। তা না হলে কি করে বুঝবে যে তুমি সত্যি কাজের মেয়ে।

বলা বাহুল্য রাণীকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হ'ল।...

চা-পার্স শেষ হতেই পড়ার ঘরে গিয়ে রাণী রক্তিমাকে বললে—একটা জিনিষ রকেজে তোর কাছে, সেইটে নিতে এসেছি।

মাঝখানে কোথা থেকে আমিরা এসে রাণীর ঠোঁটে একটা চুমো বসিয়ে দিয়ে বললে—যা, দিদিরটা আমিই দিয়ে দিলাম।

রাণী হেসে উঠে ঠোঁটে হাত বুলাতে বুলাতে বললে—কি রাহুদী মেয়ে গো! ঠোঁট ছুঁটা আমার একবারে পুড়িয়ে দিলে। তোর বর হবে আমাদের পাশের বাসার সেই ঠাঁড়ীমুখো খানসামাটা! খুব করে চুমো খাস।

আমিরা বললে—পোড়ারমুখী!

রক্তিমা হেসে বললে—এইটেই চাইতে এসেছিলি তো?

রাণী তার গালে একটা ছোট চর্চ বসিয়ে দিয়ে বললে—তুই ম'ল। শীগগির আমার দাদার কবিতার খাতটা কিরিয়ে দে আমার।

রক্তিমা বললে—বা, সে আমি আনি নি তো।

আমিরা মুখ ভার ক'রে বললে—আমি এনেছি। কিন্তু এখনি চাই কেন?

রাণী একটু হেসে বললে—তা আর জানিগুনে বুঝি! দাদার কাব্য-রাজ্যে যে 'লকা-কাণ্ড' হয়ে গেল! সব খাতা-পত্র পুড়িয়ে ফেলছে, এখন এইটেই কেবল বাকী। যা দেখাল গুঁর। উৎসবের দিন কি হ'ল জানিনে, রাত্তিরে ঘরের বেঝেতে আতঙ্ক দেখে আমি গিয়ে দেখি—এই কাণ্ড। আমার একটা মাল হেসে বললে—রাণি, কবিতা টবিটা আর ভালো লাগে না। আমি ছুগু করে বললাম—আহা সবগুলো কবিতার খাতা পুড়িয়ে ফেললে? শেষটার তোমার মানসীর এই দশা হবে—তাতো আগে জানিনি।

—দাদা! একটু শুদ্ধ হাসি হেসে বললে—মানসী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রাণি, তাই শূণ্য ঘরটা পুড়িয়েই ফেললাম; কিন্তু তোকে কালকে এক কাজ করুতে হবে। খুব সকালে উঠেই মিস্ত্রীদের বাড়ী থেকে আমার

কবিতার বইখানা নিয়ে আস'বি। সেটাকে রাখলে অজ্ঞার করা হবে।

—আমি বললাম—আচ্ছা, নিয়ে আস'বো কাল;—বুঝি তো এখন, কেন এখনি চাই।

প্রাণবাহুর এই আশ্চর্য কাণ্ডটার অর্থ ধরতে গিয়ে রক্তিমা ও আমিয়ার—বিশেষ করে রক্তিমার একটুও কই পেতে হয়নি।...রক্তিমা কি ভেবে বীরে বীরে বাইরে চলে গেল।

আমিরা দুইহাতে রাণীর গলা জড়িয়ে ধরে বললে—দোব না আমি রাণি। তুই তাকে বুঝিয়ে বলিস—আমিরা কিছুতেই দিলে না। তাহ'লেও কি তিনি রাগ করবেন?

রাণী কিছুক্ষণ আমিয়ার ভাগ্য চক্ৰ দু'টির দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বীরে বীরে একটু হেসে বললে—চাইনে আমিরা, দাদাকে আমি বুঝাবো'খন।

রাণী চলে গেল!

একটু পরেই রক্তিমা এসে বললে—খাতাটা 'নিখে'ল আমিরা?

আমিরা বললে—হা।

রাত্তিরে রক্তিমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কি যেন একটা অজানা বাধায় তার বুক ভরে উঠছিল। সেই বেহনাকে উপেক্ষা করে রতই সে তার মনকে নিশীলতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, ততই যেন তা ছিগণ হয়ে বেড়ে উঠছে। শেখটা সে আর না পেরে পাশ'কিরে ভাবলো—আমিরা, ঘুমিয়েছিস?

আমিরা ঘুমিয়েছিল কিনা জানিনে, সে ভাবতেই শাড়া দিল—উ।

তুই ঘুমিয়েনি তাহ'লে?

আমিরা ছুই হাতে রক্তিমাকে বেঠেন করে ধরে বললে—না তোর কি কোনো কষ্ট হচ্ছে দিদি!

না। ঘুম আসছে না আজ। চল বাইরের বারান্দায় গিয়ে একটু শাড়াই।

ছ'জনে উঠে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলো বাইরের দিকে তাকিয়ে।...



অমিয়া বললে—কাল যাবি একবার রাণীদের বাড়ী।—

রক্তিমাবললে—কেন?

অমিয়া চুপ করে রইলো। অনেকক্ষণ এই রকম ভাবেই কেটে গেল। বাইরে অন্ধকার আকাশের অসংখ্য তারা তাদের দিকে চেয়ে মিট মিট করে হাসছে।...

অনেকক্ষণ পরে অমিয়া আবার বললে—প্রশ্নবান্ধু তোকে খুব ভালবাসতো—না দিদি?

অন্ধরের নীলতাকে চেপে রাখবার জন্যে অন্ধকারের মধ্যেও মুখে একটু অবিচলিত হাসি ফুটিয়ে রক্তিমাবললে—কি ক'রে বলি?

তার কবিতাগুলো আমি পড়েছি। মাহব্ব এমন ভালবাসা বাড়িকে বাসতে পারে—তা আমার ধারণা ছিল না। সত্যি দিদি, তার প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে একটা আত্মনিবেশনের ছবি হৃদয়ের ভাবে ফুটে রয়েছে। তুই এমন একজন লোককে সামান্য একটা কথাই জল্পে এতবড় আঘাত দিলি? না জানি এজন্য তিনি কত কষ্ট পেয়ে তার কবিতার খাতাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলেছেন।

রক্তিমা একটা কথাও বললো না। কিন্তু অন্ধকারে তার মুখখানা লুকানো না থাকলে অমিয়া দেখতো—তা তখন একেবারে ভুজ ছিল না।

...অমিয়ার কাছে নিজের এই দুর্দলতাটুকু ধরা পিঁটে রক্তিমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তা'হলে কি হবে,—অনেক চেষ্টা করলেও প্রশ্নের সঙ্গে সে যে ঠিক ব্যবহারই করছে, এই কথাটা অমিয়াকে আজ বলে তা'র নারীত্বের গর্ভকে বজায় রাখতে পারলে না।

হৃৎকেন্দ্রে আবার চুপ করে রইল। চারিপাশের এই অন্ধরহীন নীরবতার মধ্য দিয়ে হৃৎকেন্দ্রে চিন্তাই সমান ভাবে ছুটে চলছিল—বোধ হয় একই দিকে!...

অনেকক্ষণ পরে অমিয়া বললে—একটা কথা সত্যি করে বলি আমার?

রক্তিমা বললে—কি?

আগে বল—বলি কিনা?

বা রে, না জন্মে আগে কি করে বলবে!

অমিয়া ধীরে ধীরে দুইহাতে রক্তিমার কণ্ঠ বেঁধে ক'রে ধ'রে বললে—তুই প্রশ্নবান্ধুকে সত্যি কি ভালোবাসিসনে দিদি?

না না,—একটু নয়। আঃ ছাড়—আজ তোর হ'ল কি পোড়ারমুখী! আমার বড় মুখ পেয়েছে; রক্তিমা তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চলে গেল।

হৃৎকেন্দ্রে পরের কথা।

প্রশ্নে একটু রাগ করেছে বললে—সব সময়তেই তুই যদি এরকম করে বিরক্ত করিস রাণি, তাহ'লে সত্যি বলছি—এবারীতে আমার টিকে থাকাই দায় হবে। ভারি অবাধ্য হয়েছিস আজকাল তুই।

রাণী ঠোট ফুলিয়ে কাঁধে কাঁধে হুয়ে বললে—হা, তা হব বই কি! হতে যদি তুমি কারো ছোট বোন, আর তোমার দাদাটি যদি তোমারই চোখের সামনে এরকম করে দিন-রাত ভেবে সারা হয়ে যেত—তাহ'লে কি রকমটি লাগতো দেখতে।

রাণীর চোখ ছুটি অশ্রুভরে ছল ছল করে উঠলো। প্রশ্নে এবার রাণীকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অসহায়ের মতো তাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে বললে—কিন্তু জানিস রাণি, পৃথিবীতে আশ্রয় কেউ ভালোবাসে না।

দাদার এতখানি মেহ রাণী সহিতে পারুলে না—কৈবে ফেললে।

একটু পরে ধীরে ধীরে বললে—অমিয়াকে নিতে পারো না কি তুমি দাদা?

প্রশ্নে একটু ভৎসনায় হুয়ে বললে—কি বলছিস রাণি?—কাউকে অমন ক'রে অপমান করতে নেই। ছি!

অপমান আমি করিনি কাউকে দাদা, আমি ভাল করেই জানি, অমিয়া তোমাকে ভালোবাসে।—তোমাকে ছাড়া গুরু হ'তে চলেবেই না।

প্রশ্নে অবাক হ'য়ে রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পৃথিবীতে যে কেউ তাকে ভালোবাসতে পারে—রক্তিমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা পেয়ে যেমন এ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল।...

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্নে ধীরে ধীরে বললে—রাণি, আমার ভালোবাসা ঘরে গেছে; কিন্তু তাহ'লেও

এমন যদি কেউ থাকে, যে আমাকে একটুও ভালোবাসে—তাকে আমি চাই। একাকী যে আর বেঁচে থাকার বোঝা বহিতে পারিনি।...

রাণী গভীর বেদনায় প্রশ্নের মুখের দিকে চেয়ে একটা নির্ধনিশ্বাস ছেড়ে চলে গেল।...

প্রশ্নে ভারতে লাগলে, কেন এমন হয়? মাহব্বের মন কেন একজনের পেছনে এমন করে ছুটে যেতে চায়? ...রক্তিমা,—হ্যাঁ! রক্তিমাকে তার ভালোবাসতে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করতো; কিন্তু রক্তিমার তা যদি ভালো না লাগে—তাহ'লে তার দোষ কি?

প্রশ্নের সবটুকু কথা রাণী অমিয়ার কাছে বলে তার টোটে একটা চুম্বা খেয়ে বললে—আমার দাদাকে সত্যি ছুঁ নিবি আমি?—তাকে বাচাবি?...

অমিয়ার হুই চোখ জলে ভরে গেল। কণ্ঠের বুকে ধ্বংসে বললে—কিন্তু পৃথিবীতে কেউ তাকে ভালোবাসে না—এ বিশ্বাস তার হল কেন রাণি?...

কাল বৈকালে, যাবি একবার আমারের বাসায়! আমার সঙ্গে দেখা করুবি,—বলে রাণী অধীর আগ্রহে অমিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

অমিয়া মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো। রাণী আবার বললে—চুপ করে রইলি যে! অমিয়া বললে—খাবো।

...রাক্তিরে রক্তিমাকে জড়িয়ে ধরে অমিয়া চুপে চুপে বললে—দিদি একটা কথা বলতো?

কি কথা রে?

একটু নীরব থেকে অমিয়া বললে—আমি প্রশ্নবান্ধুকে ভালোবাসি।

রক্তিমার বুকের রক্ত হ'তে জমাট বেঁধে গেছিল—সেই অমিয়ার কথাই উদ্ভবে কিছু বলতে না পেয়ে পাখরের মতো নিচল হ'য়ে পড়ে রইলো।

অমিয়া ডাকলে—দিদি!

রক্তিমা নীরব।

অমিয়া আবার বললে—দিদি, ঘুমোনি?

রক্তিমা এককণে বেন কথা বলবার মতো অবস্থা ফিরে পেল। বললে—না ঘুমই নি। তবে কিছু শুনিনি বো।

কি আর বলবে? তবের শুনে খুব স্থবী হয়েছি। কালকে ঘুম থেকে উঠেই শিশিমাঝে এই ভজনসংঘাট দিয়ে আমাদের স্নেহস্রবের যোগ্যের বসুতে বলবো। যদিও কথাগুলোর মধ্যে প্রাণের আঁচড় মোটেই ছিল না—তবু সহজ ভাবে 'এইটুকু' বলতে পেয়ে রক্তিমা বেন একটু হাঁপ ছেড়ে বীচলে। কিন্তু বুকে যে আঘাত তার জন্ম হয়ে রইলো—তার হাত থেকে সে কিছুতেই মুক্তি পেলো না।...

অমিয়া নিজের রক্তের নেশায় মগ্ন ছিল, রক্তিমার বুকের রক্তাঙ্কা ইতিহাসটির পরের সে কিছুই পেলো না। সে মুখটি আরো জোড়ে রক্তিমার বুকের ভেতর চেপে ধরে বললে—দিদি, মাকে বলি সত্যি! কালকে? আমি কিন্তু তখন থাকবো না।

রক্তিমা বললে—শাঙ্ক্য! আচ্ছা,—তুই বরং সেই সময়টায় একটু 'বেহাশু-ভিলা' থেকে আসিস।

হ্যাঁ—আমাকে কাল যেতে হবে একবার।

...প্রশ্নে টেবিলের উপর থেকে পড়কি সব লিখছিল। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে হাত ঝোঁক করে নমস্কার জানিয়ে বললে—আমহন অমিয়া দেবী।

অমিয়ার দিকে সে একখানি চেয়ারে চলে গিয়ে। অমিয়া প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলে বললে—রাণী কোথায়?—আ?

প্রশ্নে একটু মান হাসি হেসে বললে—তারো ছদ্মবেশে আমার বাবার চলে গেছে। আসতে রাক্তির হবে।

অমিয়া বললে, রাণী তাদের নির্জন সাক্ষাতের হুযোগ দেবার সূতাই তার মাকে নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভেতর প্রশ্নের সামনে বসে সে কোনো কথা বলতে গিয়ে কেবলি ঘামতে লাগলো। ভেতরটা যেন বার বারই ভকিয়ে যাচ্ছিল।...

প্রশ্নে তাই দিকে তাকিয়ে বললে—ও, আপনি বড়



দাম্ভেন বে। হা—একটু পরমণ্ড পড়ছে আজ। তার চেয়ে চলুন না কেন দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দায় গিয়ে একটু শাড়াই। বেশ হাওয়া পাওয়া যাবে’ন।

...হ’লেন বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে পাশাপাশি ঠাড়ায়ে।

কিছুক্ষণ পরে প্রস্থান বললে—জানেন অমিয়া দেবী, ছোট-বেলায় একদিন মা তার এক আত্মীয়ের কাছে আমাকে আবার করে বলেছিলেন, তোমরা দেখো, আমার প্রস্থান রাজা হবে। রাজা হওয়াটা বেশি, তা তখনো বুঝিনি; কিন্তু এখন বোঝাবার মতো সময় হল, তখন মার কথাতে আমি বিশ্বাস করুলাম। আশা হল—রাজাই হয় তো হবে একদিন। কিন্তু সে আশা যে আমার এমন করে আকাশস্থলে পরিণত হয়ে যাবে—তা তো কোন-দিন ভাবিনি। আচ্ছ আমি ভিখারী।

অমিয়া বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, তেমনি চুপ করে রইলো। হয়তো সে প্রস্থানের কথা বুঝতে পারেনি—হয়তো বা সে অস্ত কিছু চিন্তা করছিল।

প্রস্থান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিন্তু ভিখারী হলেও আজ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অমিয়া দেবী, আমি সম্রাট ভিখারী।

অমিয়া তার ব্যাধা ভরা চোখ দুটি প্রস্থানের মুখের উপর রেখে বললে—প্রস্থান বাবু, আমি তো আপনাদের কাছে এই কথাগুলো শুনতে আসিনি। আমি শুনতে চেয়েছিলুম—

অমিয়া মাথা নীচ করলে।

প্রস্থান নরম স্বরে বললে—কি শুনতে চেয়েছিলেন অমিয়া দেবী?

অমিয়া তেমনি চুপ করে রইলো।

প্রস্থান বললে—আমি যদি আমার ব্যাধা-ভরা রিক্সা জীবনের বোঝাটা—যার সঙ্গে এক কোটা ভালবাসা নেই, একটু করুণা নেই—তা যদি আপনার হাতে তুলে দি, তাহলে কি আপনারা অপমানের আঘাত দেওয়া হবে না, অমিয়া দেবী?

অমিয়া মাথা নীচ করে দুই হাতের অঙ্গুলিতে মুখখানি ঢেকে ধীরে ধীরে বললে—কিন্তু আমি যদি সে অপমানের আঘাতকে অভিনন্দন করে নিই। তাহলে?

প্রস্থান বিশ্বাস-বিমুগ্ধ নয়নে একবার অমিয়ার দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে তার একখানি হাত নিজের হৃৎকোষে তুলে নিয়ে বললে—কি শুনতে চেয়েছিলে তুমি তাহলে অমিয়া?

অমিয়া একবার কঁপে উঠলো। প্রস্থানের মুখে এই প্রথম ‘অমিয়া’ ভাক, তার ‘তুমি’ সম্বোধন—অমিয়ার শিরা উপশিরাগুলিতে যেন আতন ধরিয়ে দিলে। সে ধীরে ধীরে বললে—আমি তোমার কাছ থেকে কিছু না পাওয়ার ব্যথাতে সইতে পারবো না। কিন্তু যেটুকু আমার দেবান—সেটুকু তোমার কাছে অভিশাপের মত হবে না তো?—এইটুকুই শুধু আমি জানতে চেয়েছিলুম।

অমিয়া প্রস্থানের মুখের দিকে তাকালো।

প্রস্থানের সমস্ত মুখখানা বেগনায় ভরে উঠলো। সে আরো আবেগে অমিয়ার হাতখানাকে চেপে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে—আমি একদিন বলেছিলুম অমিয়া, আমার ভালোবাসা মরে গেছে; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—যে মরে গেছে সে ভালোবাসা নয়, হয়তো আর কিছু। আজ আমার ভালোবাসার জন্ম হল।...ওঃ অদ্ভুত হয়ে গেছে, চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

হা—চল। কিন্তু অমিয়া এক পাও নড়লো না। সে একবার প্রস্থানের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নীচ করে থাকিয়ে রইলো।

প্রস্থান একটু হেসে বললে—কি?

অমিয়াও মুখ তুলে একটু হাসলে। প্রস্থান তাকে বুকের মাঝে টেনে এনে মুখখানি তুলে ধরে—তারপর হেসে বললে—তুমি ভাবি ছুই হবে অমিয়া। এই যে বজ্রিচ্ছে—আমার উপর তোমার কোনো দাবী নেই।

আছে—কণো আছে, চিরদিন থাকবে—বলে অমিয়া প্রস্থানের বুকে মুখ লুকালো।

...সব শুনে প্রস্থানের মা খুব খুশি হ’ল। করুণা, প্রকাশবাবু, অচ্যুতমা—সবাই আনন্দিত হ’ল। করুণা অমিয়াকে বুকে চেপে ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে—সব চেয়ে বড় দুঃখ, গার মেয়ে তিনি আজ নেই

এই আনন্দের দিনে। কিন্তু তুই স্বথী হয়েছিলি তো দমিয়া?

মুখখানিকে নিবিড় ক’রে মার স্নেহাশ্রয়ের মধ্যে চেপে রেখে অমিয়া বললে—হাঁ।

রাণী এশে হাসতে হাসতে অমিয়ার গলা ধরে বললে—ও ভাই বৌদি, তোদের সেদিনের রিহাসেল আমায় একটু বুনো।

অমিয়া রাণীর গাল টিপে নিয়ে বললে—ইশ গরজ বেশ না মেয়ের। বৌদি কি লো পোড়ারমুখী?

রাণী ঠোট ফুলিয়ে বললে—বা রে, এতুনি গাল টোপা হচ্ছে? বোস না—বলে বোস দাদার কাছে।—সত্যি ভাই, সেদিনের কথাটা বলবি নে?

একটু মুচকি হেসে অমিয়া বললে—কি বলবো?

আহা, চমকে আবার বাঁচিলে। কি বলবো—যেন আমি জানি আর কি! আচ্ছা, প্রাণে না গইলে সবটা না বলি ভাই—শুধু উপসংহারটা বল।

অমিয়া হাসতে হাসতে রাণীর মুখে একটা চুম্বা দিয়ে বললে—এই—

রাণী অমিয়াকে আর ধবুতে পারলো না। শুধু মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বললে—পোড়ারমুখী, মুখে বললে চমকো না বুঝি? প্রাকৃতিক্যাল দেখাতে এলেন।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও একজন কিছুতেই নিজের অন্তরের বীনতাকে ঢেকে রেখে সবার সঙ্গে হর মিলিয়ে চলতে পারলো না।—সে রক্তিম।

## সার্থকতা

শ্রীঅতুলচন্দ্র দন্দ

তুমি ত চলিয়া গেলে,  
অবজ্ঞায় পায়ের দলে  
কত সাধে গাঁথা ফুলহার।  
আমি ত রয়েছি বসে,  
নয়নের জলে ভেসে,  
বুকে করে সেই ফুলভার।  
তুমি ত চলিয়া গেলে,  
আমারে কণ্টক ফেলে;  
কতে বৃদ্ধ রক্ত শতধার।  
সাক্ষিতেছি হাসি মুখে,  
তোমার দেওয়া দুখে,  
মনে করে সুস্থ প্রহার।

তুমি ত ভাঙিয়া গেলে,  
বীণাখানি অবহেলে;  
রহিয়াছি বুকে করে তাই।  
একেছিহু যত ছবি,  
ছিঁড়িয়া দিলে ত সবই;  
এতটুকু আশা হয়ে নাই।  
চরণ মোহাব বলে,  
ভাসিছ নয়ন জলে;  
তুমি শুকিয়ে দিলে তাও।  
উপেক্ষাই সার্থকতা—  
ধর হোক মোর ব্যাধা,  
লইব যতনে বাধা দাও।





## স্মৃতি-রেখা

একত্রিংশ

রাখি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটা টুলের উপর একটা বেগোমিনের টেবিল-ল্যাম্প জলিতেছে। মারা গুহটি নিতান্ত। নাকের মাঝে কল্পাময়ী আসিয়া সংবাদ লইতেছেন,—‘এখন কেমন মহা, জানা হয়েছিল কি।’

মহা উত্তর করিল “মধ্যে ছইবার অল্প অল্প জান হইছিল। কিন্তু অত্যন্ত অল্পজন হাটী। মা, আপনি ভাব পাবেন না। নিশ্চয় আশেপাশে হবেন। এখন আর কোন ভয় নাই। আপনি একটু গরম ছুঁ পাতিয়ে দেবেন।”

ইতিমধ্যে হেরেজবাবু একবার আসিয়া ‘হাট’ পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং হাটের অবস্থা পূর্ব ভাল এ সংবাদ সকলকে জানাইয়াছেন। লতিকা এই মাত্র উঠিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ মহার সহিত সমানে সে তার দারার সেবা করিয়াছে এবং বহুবার মহাটিকে অনুরোধ করিয়াছে তার ভাই যাগতে রক্ষা পায় সে জ্ঞাত বিশেষ চেষ্টা করিতে।

কল্পাময়ীকে প্রবেশের মুখের প্রতি উৎকর্ষপূর্ণ ব্যাঙ্গ দৃষ্টিতে বিনীত থাকিতে দেখিয়া মহার বুদ্ধিতে

বাধী রহিল না যে, পুত্রবৎসলা জননীর অন্তরের মধ্যে কি নিদ্রাকণ বেদনা, কণ্টকের মত না পীড়া প্রদান করিতেছে। পুত্রের এই নবট অবস্থা যেন কল্পাময়ীর সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করবার মত হইয়া আসিতেছিল। তাহার মন হঠাৎ উদ্ভাসিত প্রহুৎ মুখখানি বিপদের নিবিড় মলিন ভায়া সমাজে। সর্বত্র বিনিময় করিল যদি পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় এমন কোন প্রস্তাব সাগরে সমদল করিতে কল্পাময়ী যে প্রস্তুত এমন একটা ভাব তাহার উজ্জল মনে আত্ম-আগ্রহে প্রস্ফুট হইয়াছিল। বিশেষ সমস্ত অশঙ্ক যেন এক সঙ্গে আজ পরামর্শ করিয়া তাহার একমাত্র আনন্দ ভ্রূলাকে অপহরণ করিতে আসিয়াছে। এ বিধাশ শত সহস্র মুক্তি, তর্ক, বাধাকে ঠেকিয়া ধরে ফেলিয়া কল্পাময়ীর মনের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

কল্পাময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া মহার সরল, করুণ অথর ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে ভাড়াভাড়ি তাহাকে সেখানে বসিতে সূচাইয়া দিবার নিমিত্ত বলিল, “মা আপনি যান। এখনই গিয়ে ছুঁ পাতিয়ে দিন। প্রবেশবাবুর জ্ঞাত বিষয় ভাববেন না।”

মহার কথায় যেন কল্পাময়ী অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়া ব্যাকুল ভাবে উত্তর করিলেন, “তোমার কথা

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩৭৭ সংখ্যা]

স্মৃতি-রেখা

১২৩৭

কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। মহা, জানি না, কি দিবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব? এমন দিন, এমন অবসর কি আসবে, যেদিন ভগবান আমারে সে অবসর দিয়ে তাঁর অপার দয়ার মহিমা প্রকাশ করবেন।”

এবার মহা কোন উত্তর দিল না। কেবল অত্যন্ত সঙ্কপ কাতর দৃষ্টিতে সে তার বড় বড় সজল কাল চক্ষু ছুটি কল্পাময়ীর মুখের উপর একবার মাত্র সংস্থাপন করিয়া, অপরাধিনীর মত ধীরে ধীরে নামাইয়া লইল।

কল্পাময়ী চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লতিকা ছুঁ লইয়া উপস্থিত হইলে মহা জিজ্ঞাসা করিল “লতিকা তোমার খাওয়া হয়েছে?”

লতিকা উত্তর করিল “আমার কিদে নাই। কিছু খাওয়া।”

মহা বলিল “এমন অবস্থায় যে কারো কিদে থাকতে পারে না, তা কি বোন আমি জানি না? কিন্তু উপায় কি। এখন সত্যি বোগীর জ্ঞাত জাগতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, তখন যাতে সে সেবার কোন দিক দিয়ে জটী না হয়—শরীর পক্ষিষ্ণ করতে পারে, সে জ্ঞাত হোক করে খেতেই হবে। না খেলে, কর্তব্য পালনের পক্ষে জটী হবার খুঁই সম্ভাবনা। যাও তুমি খেয়ে এসো। তুমি এলে তবে আমি উঠতে পারব।”

লতিকা কি বলিতে বাইতেছিল, মহা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল “বোন, কেবল চক্ষের জল ফেলিয়া অসহায়, অনিশ্চয় বোগীর শয্যার উপর বসিয়া থাকিলে কোন দিনই কর্তব্য করা যায় না। এ সকল কাজ করতে শারীরিক বলের প্রয়োজন, স্বতরাং নিজেই যদি দুর্বল হয়ে পড়ি তাহলে কেমন করে পীড়িতের প্রতি পরিপূর্ণ কর্তব্য করা যেতে পারে তুমিই ভেবে দেখ। বুঝা তর্ক করার এ সময় নয়।”

এবার লতিকা মহার কথার আর কোন প্রতিবাদ করা সম্ভব মনে করিল না। সে তখনই সেখানে হইতে চলিয়া গেল।

মহার প্রস্তুত ঔষধের জিন্দা আরম্ভ হইয়াছে। নাড়ীর অবস্থা খুঁই ভাল হইয়াছে। মহার অন্তরের মধ্যে

একটা বিপুল আনন্দ আত্মল আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সে প্রবেশের মাঝে গায় হাত বুলাইতেছিল, এবং অপেক্ষা করিতেছিল কতক্ষণে তেমন পরিচয় আসে। তাহার সে বাশা এবার অচিরে পূর্ণ হইল।

অত্যন্ত গভীর নিশ্বাস পর, নিম্নোক্ত ব্যক্তির নিকট যখন সংগা সমস্ত প্রকৃতি মূহন মনে হয়—তখনই প্রবেশ যখন একটা দূর্বিনীতাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চক্ষুদ্বিঃ বিশ্বাঘাত দৃষ্টিতে চালাইল—চালাইল। সে যেন কিছু মনে করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, সে কোথায় আসিয়াছে? সমস্তই যেন তার অপরিচিত স্থান। এখানে সে কেমন করিয়া আসিল। কে তাহাকে এখানে আনিল। তাহার জননী কল্পাময়ী তাই। লতিকাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না। তাহার পিতা হেরেজবাবু কোথায়। তারপর তার মহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। অস্বস্তি কোতুলকপূর্ণ অনিমেষ মননে সে কি ভাবিয়া মহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টিতে অনেককণ পর্যন্ত চাহিয়া রহিল। সে যেন কি সব কথা স্বরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। একটা অতি ক্ষীণ “স্মৃতিবেশা” তাহার মনের ছায়ায় নিকট আসিয়া বিরিয়া গেল। সে সেই স্বপ্নময় স্মৃতি। যেন কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা নয়। সে কি ভাবিয়া পুনরায় চক্ষু মুজিত করিল।

এই অবসরে মহা চামচে করিয়া অন্ন অন্ন ছুঁ প্রবেশের মুখে প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। সে বিনা আশ্রিতে ধীরে ধীরে গুণ খাইল।

মহা এবার দক্ষিণ হস্তে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং বামহস্তে তাহার বিশৃঙ্খল কেশদাম লবিত্ত করিয়া দিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ ধীরে ধীরে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিল। কিছুক্ষণ মহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহুঃ পরে বলিল “বাতাস করার আর প্রয়োজন নাই।”

মহা পাখা রাখিয়া দিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এবার প্রবেশ জিজ্ঞাসা করিল “আমি কোথায় এমছি।”



মহুয়া উত্তর করিল “আপনাদের নিজেদের বাড়ীতেই ত আছেন। কোথাও আসবেন নাই।”

“এটা ত আমার ঘর নয়। আমার ঘর হ'লে আমার পড়বার বই কৈ! সে সব ছবি কৈ! দেশবন্ধুর ছবি কৈ! মহাত্মাজির সে বড় ছবিস্থানা ত দেখতে পাচ্ছ নাই। না, না, তুমি সব ভুল করছ। তুমি বুঝি আর কাউকে মনে করেন? আমার নাম প্রবোধ। তুমি হয় ত আমার ঘর না। তুমি আর কাউকে মনে করে হয় ত আমার সেবা করছ। আমার জ্ঞান ছিল না। নইলে তোমাকে মানা করতাম—এখন কি করব। আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ঘনে দেখেছি—একটু একটি মনে পড়েছে।”

বলিতে বলিতে প্রবোধ পুনরায় চক্ষু মূর্তিত করিয়া যেন কি ভাবিতে লাগিল। অনেককণ পৰ্যন্ত সে আর কোন কথা কহিল না। মহুয়ার কিন্তু অত্যন্ত আশঙ্কা হইল—ঐশ্বরের ফল সন্দেহে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বলিবার দাশ্য দুষ্কৃতি হইল। যদিও বা ভগবানের রূপায় প্রবোধবাবু প্রাণ পাইলেন, তবে কি তার মৃত্তি লোপ পাইবে? শ্রুতি হারাইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা যে মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! এখন উপায় কি! যদি তার মৃত্তি কিরিয়া না আসে? তাহা হইলে কি করিব! করুণাময়ীকে, লভিকাকে কি বলিয়া সাধনা দিব। দাড়া তুই এ কি বিপদে আমাকে ফেলিল। একবার মহুয়ার মনে হইল দাড়া নিশ্চয় এর প্রতিকার জানে, তার হাতে পারে ধরিয়া তবু কি তাকে ভাবিয়া আনিব। সে যদি প্রতিকার করিতে রাজি না হয়। তাহ'লে—এবার মহুয়া মনের মধ্যে বল আসিল। সে, আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, তাহ'লে দাড়ুর পায়ের কাছে নিজে প্রাণ বিসর্জন দিব। বেবিব, বুঝিব, তখন দাড়ুর সেহেরে ভালবাসার মূল্য কতখানি। এ কথা ভাবিতে মহুয়ার হৃদই চক্ষু অশ্রু প্রস্রবিত হইল।

প্রবোধ পুনরায় চক্ষু চাহিয়া বলিল “এবার চিনতে পেরেছি। তুমি মহুয়া! মহুয়া বল তুমি কেমন করে এখানে এলে?”

মহুয়া অত্যন্ত মুহূর্তে উত্তর করিল “আপনি অস্থ,

উত্তেজিত হবেন না। এখনও খুব দুর্বল।” পরে সমস্ত ঘটনা জানতে পারবেন।” বলিয়া মহুয়া তাহার মাথায় হাত বলাইতে লাগিল। প্রবোধ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল “দেখ মহুয়া আমি এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। আমার শরীর মোটেই দুর্বল নয়—বল তুমি কেমন করে এখানে এলে।” বলিয়া মহুয়ার হাত ছ'খানি প্রবোধ অত্যন্ত আগ্রহ ভরে নিজের বুকের উপর ঢাণিয়া ধরিল।

মহুয়ার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা তক্তিক প্রবোধ যেন সহসা প্রবাহিত হইয়া গেল। সে যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। আশঙ্কায় তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা এখানে আজ এমন অবস্থায় আসিবার সত্য কারণ বলিতে হইলে, তার দাড়া সন্নিহিত পার্শ্ববর্তী নীচতর উল্লম্ব করা ভিত্তি আর কী, যে বলিবার থাকিতে পারে, এমন কোন কথাই মহুয়ার মনে আসিতে-ছিল না।

প্রবোধ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় মহুয়ার মুখের প্রতি কাতর ভাবে চাহিয়াছিল “আপনার অস্থ করছে তাই এসেছি।” বলিয়া মহুয়া প্রবোধের বুকের উপর হইতে আঁতে আঁতে আপনাবার হাত দুখানি প্রবোধের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল “এখন বেশ সুস্থ মনে করছেন কি।”

একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রবোধ বলিল “হা মহুয়া এখন আর কোন অস্থ নয়। আচ্ছা আমার কখন অস্থ কর। তা—আমার স্বপ্ন হচ্ছে না। কে তোমাকে আমার অস্থের সংবার দিল?”

“এখন ওসব কথা থাক। আপনি কিছু খাবেন কি।”

“মহুয়া তোমার সব কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার এমন কি অস্থ করছে যে, আমার কথা বলার পর্যন্ত তুমি ভয় পাজ? আমি যে অস্থ এখন কোন ধারণাই আমার মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমি যেন অনেককণ পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। ঘুমের ঘোরে মধ্য যেন তুমি কথা এসে আমার শরীর উপর দেবীর মত বলে আছ। ভয় হচ্ছে, এখনি তোমার দাড়া এসে তোমার

উপর কত রাগ করবে। তাই জিজ্ঞাসা করছি তুমি কেমন করে এখানে এলে? তোমার দাড়া যদি জানতে পারে মহুয়া?”

“আপনি সে জন্ত কিছু ভাববেন না। দাড়া যদি রাগ করে তার জবাব আমি তাকে দেব। এখন আপনি একটু ছুপ খান।” বলিয়া মহুয়া যেমন চামচে করিয়া প্রবোধের মুখ দুখ দিতে যাইবে অমন সে একটু মুখ হাসিয়া বলিল, “দেখছি সত্য সত্যই আমাকে রোগী পাড় করাইয়া তুলছে। চামচের কোন প্রয়োজন নাই। দুধের বাটা আমাকে দাও।” মহুয়া চামচ রাখিয়া দিল। প্রবোধ উঠিয়া দুধের বাট লইবার চেষ্টা করিলে মহুয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল “এখন আপনাবার উঠবার কোন আবশ্যক নাই। এখনও আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই।” বলিয়া অত্যন্ত ঘর সহকারে মহুয়া তাহার মুখ দুখ ঢালিয়া দিতে লাগিল।

প্রবোধ আর কোন আপত্তি করিল না। কিছুক্ষণ পরে প্রবোধ জিজ্ঞাসা করিল “মহুয়া সত্যই কি আমার এমন অস্থ করছে যে উঠবার অসম্মতি নাই।”

“আজ রাত কাটলে আপনি সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। তখন আর কোন আপত্তি থাকবে না। এবার প্রবোধের ধীরে ধীরে সব কথা যেন মনে পড়িতেছিল। সে বলিল “মহুয়া, এখন বুঝছি কেন তুমি আজ এখানে এসেছ। একদিন তুমি বিশ্বাসব্যুরার দ্বার প্রাণ রক্ষা করেছিলে, আর আজ আমার জীবন দান করলে।”

মহুয়া একটা কথা আমাকে আজ সত্য বল,—তুমি কি বেদের মেয়ে হই?”

“হদি তাই হই।” প্রবোধ উত্তেজিত কর্তে বলিয়া উঠিল “মিথ্যা কথা।” “উত্তেজিত হবেন না। আমি বেদের মেয়ে হ'লে, তাতে কার ত কোন ক্ষতি নাই।”

“কেমন করে বলতে পার মহুয়া কারও কোন কতি নাই? সকলের অন্তর জানবার মত বাহ্যমুখ বিবিধাতা তোমাকে বিড়েন, তাহ'লে হয় ত তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা

করতে না। তাহ'লে তুমি জানতে পারতে কতখানি কতি আছে। কষ্ট পাওয়ার মধ্যে যে কষ্ট দেওয়াই বেশী আছে তা কি সবাই বুঝতে পারে?” বলিয়া প্রবোধ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

“আমার উপর অসম্মত হবেন না। বেদের মেয়ে হবার যেমন আমার হাত ছিল না, বেদের মেয়ে না হবারও হাত কিছু আমার আশ্রয় নাই। যেখানে মাহুঘ বড় হয়েছে, সেখানে সহস্র প্রতিবন্ধক কোন দিনই তার গুণ জোড়া করে তাকে বাধা দিয়ে সাক্ষ্য লাভ করিতে পারে নাই। নদীর গতি কোন দিনই যে দেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, সেখানে সে দেশের ব্যতীরা খুঁজে যায় না। প্রেমের গতিও কি সেই রকম নয়?—কে তা অস্বীকার করছে মহুয়া! এ কথা কেন বল? অরণ্যের ফুল অরণ্যে ফুটে স্বরে যায় কে তার জন্ত সহ্যাহুত্বিত প্রকাশ করে?”

“সে যে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে?” “লোক চক্ষুর গোচরে এলেই যে সব সমস্ত “দেবশূভাষ” লাগে এমন ভাণ্ডা খুব কম ফলের অর্জুই ঘটে। আপনি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। যাকে ভেঙে দিয়ে যাই।”

“মহুয়া, সত্যই কি তোমার আমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না? আজ যদি তোমাকে আমি যেতে না দিই “মা যখন তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, কেন তাকে এখানে ভেঙে আনতে চাইছি।”

“আজ যদি যেতে না দেন, কাল ত যাবেন। তাতে আর কি আসে যায়।”

এবার প্রবোধ বলিল “হদি একেবারে যেতে না দিই। যদি তোমাকে সেই বেদের ঝুঁজুতে ফিরে যেতে বাধন করি। যদি বলি মহুয়া তুমি বেদের মেয়ে নও। তুমি আমাদের। তাহ'লেও কি তুমি চলে যাবে?”

“হদি যেতে চাই!” “তাহ'লে। আমার কর্তব্যজানের হোঁহাই দিয়ে আর তোমাকে ফিরে যেতে দেবো না।”

“মা কি মনে করবেন? দাড়া কি মনে ভাববেন? লভিকা কি বলবে? তারপর একটা আস্ত-বুল-শীল



বেদের মেয়ে আশাদের সংসারের কোন কাজে আসবে ভেবে দেখুন? কোন অধিকারে আপনার গৌরব রক্ষা করে আমাকে সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দিতে পারবেন?"

মহুয়া তোমার সব যুক্তি আমি মানতে পারি। অন্তর্য উত্তরনার বস্তুত্ব হলে, বেথালের সাহায্যে কিছু উল্লেখ্য এমন কথা যেন তোমার মনে না আসে আমার অন্তরের দেবতা যেন বলে দিচ্ছে তুমি "বেদের মেয়ে" নও। যদি এসত্য প্রমাণ না করতে পারি, তাহ'লে জেনো, তুমি আমার জীবন-মাত্রী। স্বতরাং আমার কাছে আমার প্রাণ-মাত্রী কি কোন জাত থাকতে পারে মহুয়া!" বলিয়া এবার মহুয়ার হাত তুখানি নিজ হাতে মথ্যে অত্যন্ত আভায়ে টানিয়া লইল। মহুয়া কোন প্রকার বাধা দিবার অবসর পাইল না। তাহার মাথার ভিতর তখন একরাশ চিন্তা ছিন্ন কুসুম-হারের মত এলা-বসিতা হোতা ছড়াইয়া পড়িতেছে। মহুয়ার মনে হইতেছিল, আজ তার যে জীবন যাইতে বসিয়াছিল, সে আমার জন্তই। দাছ আজ যে সর্বনাশ করিয়াছিল, সে সর্বনাশের মূলে যে আমি। দাছ নিশ্চয়ই প্রবেশবাবু

ভিতর এমন কিছু দেখাচ্ছেন, যাতে তাহার দৃঢ় মনোহইয়াছে, প্রবেশবাবু

"আপনার কাছে আমার থাকলেও সমাজের কাছে ত আছে। অবশ্য এ কথা শুনিবেন নিজ স্বার্থের জন্য সমাজের পবিত্র শৃঙ্খল ছিন্ন করার সহায়তা মহুয়া কোন-দিন আপনাকে করতে দিতে সম্মত হবে না। তার পূর্বে সে তার প্রাণ বিসর্জন দেবে।"

"আর যদি প্রমাণ হয় যে তুমি বেদের মেয়ে নও। তা হ'লে কি উত্তর? দেটা কি শোনার মত অধিকার কি আমার নাই!"

অক্ষম্য বহুদিনের সঞ্চিত অর্থ যদি কেহ কুপণের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে সে যেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, আত্ম মহুয়া তার নিভৃত অন্তরের নাকানো প্রেমের আত্মল আবেগ শত চেষ্টারও চাপিয়া রাখিতে পারিল না। প্রবল ব্যথার গতি যেমন কোন বাধা মানা না। আজ মহুয়ার বিপুল সংখ্যে তেমন কোন ব্যক্তিও তুলিল না। সে ছিন্ন লজ্জার মত প্রবেশের পায়ের উপর ধুপ রাখিয়া শুণু কাঁদিয়া উঠিল।

## কুড়ের বাদশা

### শ্রীকুড়োম শর্মা

কুড়োমর সংঘে কিছু লিখিবার জন্ত নবযুগের সম্পাদক মহাশয় আমায় আদেশ করিয়াছেন এবং সে আদেশ আমি সামলে রাখা পাতিয়া লইয়াছি কারণ আমি মনে প্রাণে আমি এবং বিরাগ করি এ সংঘে আমার বিশেষ দখল আছে। লোকের কুড়োমর জন্ত আমার নিম্না করে আমি জানি কিন্তু পৃথিবীতে আমার গুরু করিবার ঐটা একমাত্র বিষয় বলিয়া আমি সে নিম্নাকে নিম্না মনে করি না; নিম্নার এই পক-ভিতরই আমার লগাটে জয়-চীৎকা হইয়া পাড়াইয়াছে। আমায় হেসেবেলা যে শিক্ষক

পড়াইতেন তিনি বলিতেন আমি কুড়ের সর্দার এবং পৃথিবীতে আমার কখনও উন্নতি হইবে না কিন্তু তিনি জানিতেন না যে কুড়োমীতে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আমি জগতে অক্ষরকীর্ণি রাখিয়া যাইব তবে ইহার ফলে জগতে আমার যাঁহা কিছু করিবার ছিল তাহা করা হইল না—কিন্তু যাঁহা কিছু না করিবার তাহা করা হইয়া গেল ঐ এক কুড়োমর জন্ত এবং সেই জন্তই আমার পৈতৃক নাম কুড়োমর কুড়োমর হইয়া পাড়াইয়াছে ইহাতেও আমি কোন আপত্তি উত্থাপন করি নাই কারণ এতদ্বারা একেবারে

পর একটা আকার বসাইবার রেশ আমায় স্বীকার করিতে হইল।

সকলেই মনে করেন যে কুড়োম কিছুই করে না—সেই জন্তই তাহারের কুড় বলা হয় কিন্তু বিখ্যাতার সন্ত-কৌশল এমনি চমৎকার যে জগতে কাহারও কিছু না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। শত চেষ্টা করিয়াও যেমন মাছের সম্পূর্ণভাবে নিমজ্ঞ হইতে পারে না তেমনি কিছু না করিয়া একেবারে নির্মিলাকার হইবার কোন সম্ভাব্য বা কঠিন উপায় নাই কারণ কুড়োমিরকও বিশেষ কাজ করিতে না হইলেও তাহারের 'কুড়' নাম সার্থক করিবার জন্ত সময় নষ্ট করিতে হয় এবং বাহারা সময় নষ্ট করারূপ মহৎ কার্য-জীবনে ব্যর্থও করিয়াছেন তাঁহার উদ্ভবরূপ অবগত আছে যে সময়কে সার্থক করিতে হইলে যেমন বড়, অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির আবশ্যক, ফল বিভিন্ন হইলেও সময়ের তেমনই বিধি ওপন্যেণ আবশ্যক, ফল বিভিন্ন হইলেও সময়ের সমাধা বা অপব্যয় বাহা কিছু করিতে হইবে তাহাতেই পরিশ্রম করিতে হয়। বাৎসর লাখ টাকার উত্তরাধিকারী হইয়া সে পয়সা স্বরা পণ্ডিত ও মেসোজবদের সাহায্যে ব্যয় করিতেও যেমন মত্তিক চালনা করিতে হয়, পরিশ্রম করিতে হয় শানদামের বা পুণ্যার্থী অছটান করিতেও তরুণ নতুন চালনা ও পরিশ্রম করিতে হয় স্বতরাং কুড়োম একেবারেই কিছু করে না একথা বলা চলে না। পরিশ্রমীরা সময়ের সম্যবহার করেন তাহারা না হয় তাহার অপব্যবহার করে কিন্তু করে ত। এখন করে তখন তাহারা ক্রিয়ালীল—সুতরাং কথ্য। ইহরূপ স্থির করিয়াই আমি এই শ্বেচ্ছাব্যব 'কুড়' উপাধিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি কারণ আমি জানি যে কুড়োম প্রকৃত বশিষ্ঠ স্বতরাং কুড়োমিতে অশ্রোণের কিছু নাই। আর তা ছাড়া পরিশ্রমী লোককে ইচ্ছা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া তবে 'পরিশ্রমী' এই স্থ্য্যতি লাভ করিতে হয় কিন্তু কুড়োমের স্থ্য্যতি আপনি আইসে ওজ্জ্বল চেষ্টা বা যত্ন করিতে হয় না—এটা যেন গুণবানের দান স্বতরাং বিনা চেষ্টায় এমন একটা আখ্যা লাভ করা সৌভাগ্যের কথা কারণ অল্প লোকেই ইহা পাইয়া থাকে। মোটর গাড়ীর যুগেও যখন তাহার পাশে গরুর গাড়ী দীর মধুর গতিতে

চলিয়া বেড়াইত, তখন বশিষ্ঠ-জন-বহুল ধরিতীর দিকে আমায় কুড়ের দল যে পক্ষোত্তর শিরে বিকিরণ করিব তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। সহজ সহজ বশিষ্ঠ মানবের মধ্যে এক আখ্যা কুড় দেখা যায় স্বতরাং তাহার বহুল সংখ্যাই তাহাকে তুর্লভতার একটা বিশেষক দান করে, গোমহুত্রেণে প্রকৃত কমলবৎ কুড় মহাশয় আপন গৌরবে আপনি বিস্তার করেন।

একেবারে চূপ করিয়া কেহ বলিয়া থাকে না কারণ জীব মাঝেই পতিশীল তাহাকে নড়াচড়া করিতেই হইবে। এমন যে উদ্ভিদ তাহাকেও বায়ু প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে শাখা-প্রশাখা সঞ্চালন করিতে হয় আমাদের লাটনাহেবের কাউন্সিলের মনোনিীত সভাপণ্ডিতও সরকারী তরফে ছোট দিবার জন্ত হাত তুলিতে হয় অভাব পক্ষে হ্যাঁ বা না বলিতে হয় স্বতরাং তাঁহারও শ্রেণের জন্ত কাজ করেন—তা ভালর জন্তই হউক বা মন্দের জন্তই হউক তাঁরা ক্রিয়ালীল তো বটে তবুও বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী দলেরা তাঁহাদের অক্ষর্য্যা বলেন। আবার কুড়োমরা কাজের অভাবে ঠিক চূপ করিয়া বসিয়া থাকে না—কারণ কেবল বসিয়া থাকিলে কুড়োমির মধ্যস্থিত গুণ রগটুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না সেই জন্ত তাঁরা সর্ববাই কাজে ব্যস্ত এমনটাই দেখান অবশ্য তার ফাঁকে ফাঁকে এক এক চুম্বক কুড়োমী-মুখা পান করিয়া লন। যদি বাস্তবিক করিবার কিছু না থাকে তবে কিছু না করাও কোন লাভ নাই কোন কুতিজ নাই স্বতরাং সে আর কুড়োমী হইবে কিরূপে কারণ তখন সময় নষ্ট করাটাই একটা অবশ্য কর্তব্য হইয়া পাড়ায় এবং এরূপ কর্তব্য পালন অপেক্ষা কাজ করিয়া কর্তব্যপালন করা অনেক সহজ। কুড়োমীর আসল রূপ হইতেছে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ কাজ করিবার আছে—করিবার সামর্থ্যও আছে সময়ও আছে অথচ তখন না করিয়া সময় নষ্ট করিব। নিমিত্তা পণ্ডীর অধর-মুখ গোপনে পান করিলে যেমন মধুর লাগে সাধারণ সাগ্রহে প্রান্তর চুপন করনই সময় নষ্ট না করিলে ঠিক কুড়োমীর শার পাওয়া যায় না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াই লোকে পণ্ডীসম্বোধে বাস-



বিনতার পূর্বে গমন করে কারণ নির্দিষ্ট কালের আশ্বাসন অগতের স্মৃতির স্মরণ হইতে আজ পর্যন্ত সমভাবে যত্নের বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

যখন আমি হুহু থাকিতাম তখন কেবলি মনে মনে ভাবিতাম কয়েক দিনের ক্ষুদ্র অশ্রু হইলে একবার বিশ্রাম পাওয়া যায়। ভগবানকে, নোকে অস্তর্য্যামী বলে—বলটি একেবারে মিথ্যা নহে কারণ আমার মনের অবস্থা তিনি জানিয়া হঠাৎ একদিন ইন্সফুয়েন্সাকে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন সে আশিয়া বন্ধুর মত উচ্চাঙ্গ আগ্রহে আমাকে ভড়াইয়া ধরিল এবং শেষে শয্যা পোয়াইয়াও দিল। ভগবন্তাপহরণ ভক্তার বাবু আসিলেন, লোকে ভগবানকে ঐ নামে ডাকে কিন্তু আমি জানি ভগবান ভবের স্রষ্টাপ হরণ কর্তে পারেন না পরলোকের তাপ উত্তাপের পতিবিধি জানিনা বলিয়া ভাবি মনে হয় যে পরলোকের স্রষ্টাপ হুতরাং তিনি হরণ করিলেও করিতে পারেন কিন্তু ভবের টোপোড়ের কমান তাঁর কর্তৃ নহে সে পারেন ভক্তার বাবু—তাঁহার হুইনাইন নামক তাপের স্রষ্টাপ হুঁড়িয়া। আগে হুইনাইনের গুলি চলিত এখন আবার তাহাকে গুলিয়া হুঁড়িয়া শিরায়ে শিরায়ে ঢালিয়া দিয়া ভবের তাপ ভাংরাইয়া কমাইয়া থাকেন এবং বেকী বোলাকি হইলে তালীকে ভগবানের পাঠাইয়াও দিয়া থাকেন হুতরাং তাঁহার সম্মুখে বিশেষ ভগবানের কাণ্ডারী গিরিও করিয়া থাকেন। বাহাই হোক তাপহারণ বাবু আসিয়া হেরকরকম ভবের স্রষ্টে ব্যবস্থা দিলেন “পারবেক্টে-রেট” কিনা নির্ণয় বিশ্রাম। মুখখানা খুব গভীর করে এটাও বলে গেলেন যে কেসটা বেশ সিরিয়াস টাইপ নিয়েছে আর ছটার দিন এ অবস্থায় রাখলে কি হোত তা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে মাক সেই দিন প্রাতেই আমার হাঁচি কাশি ও জ্বর হইয়াছিল হুতরাং ভক্তার বাবুর এই বাণ্য গতের আবৃত্তিতে না হাসিয়া আর পারিলাম না।

মনে হইল ভক্তার বাবুয়া যখনই আসেন তখনই এই ভাব—সত্য সত্য আর ছটার দিন পরে এলেও ঠিক ঐ কথাই শোনা যায়। বাই হোক ২১ দিনের মধ্যেই আমি পথ্য করিয়া কিন্তু ভক্তার বাবু না ছোড়

বান্দা—তিনি দেখিলেন আমার শরীরে তেমন রক্ত নাই তা ছাড়া আমার হাঁচিও খুব ‘টুং’ নম চেঞ্জের বিশেষ মরকার। ভক্তার বাবুয়া তো যোগীর মনিবাদেরে অবস্থা জানেন না, তাঁরা নিজেদের মনিবাপটার পেট্টা কিসে ফুটিয়া উঠে সেই দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন যাহা হউক উপদেষ্টাদের বা অপদেষ্টাদের যেমন আমার মনে তজ্জি না করিলেও ভয় করি এবং মুখে দেখাই সাধে—

তেমনি ভক্তার বাবুয়ের কাছে আমরা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম যে তোমাদের চালাকী আমরা বুঝি—কিন্তু অস্তরে তাহা সহস্রবার তোলা পাড়া করি কিন্তু বাহিরে তাঁহার আদেশ অমাত্র করিবার মত সাহস দেখাইতে পারি না। আশান্বয়ের অর্থাৎ কর্তৃগণের অশ্রু ভাল লাগে না বোধ হয়, কারণ অশ্রুই আপনাদের কর্তৃ করিবার সময় নষ্ট করে এবং শাস্ত্যও নষ্ট হয়, কিন্তু আমার মনে হয় অশ্রুটা একটা খুব উপভোগের অবসর। যে ব্যক্তি হুবেলা হুইয়া ভাত নাকে মুখে ঢুজিয়া ১০টা-১০টা আফিস করে সেও অশ্রুতে পড়িলে বিধান্য তইয়া থাকিতে পার অল্প সময় যাহাকে নিজেই কাঁধে করিয়া বাস্কার করিয়া আনিত হইত অশ্রুতে পড়িয়া সে রাইশাই চালা চালে জী আসিয়া মাথা টিপিয়া দেয়, মাথা আসিয়া শিরের বসিয়া পাখা করেন, স্রষ্টা পা টিপিয়া দেয়—যার রিনায়েত বলি পাখা ছুটিত না সেও বেরানাই, আছুট্টা হুঁকোয়া কমলা লেবু কি হুঁখানা বিন-একটু বিস্টু টিচিবাতে পায়। হুতরাং অশ্রুের মধ্যে ভয়ের কিছুই নাই কর্তের কিছু নাই বরং অশ্রুই হইতেছে বিরামের অবসর—হুতের সহচর। কোনকালে বন্ধ-বাঙ্কবে যার বোজ লয় না সেও অশ্রুতে পড়িলে ভক্ততার বা চক্ৰলক্ষার খাতিরে বন্ধ-বাঙ্কবেরা আসিয়া কেমন আছ ভিজাশা করিয়া যায়, এমন কি নিরীক্ষ হুঁকাই পাওনাঘরেরাও সে সময় কেমন আছেন সেই খবরটাই লয়—টাকার তাগাদটা আর করে না। এমন রেহাই যে এনে দেয় সেই অশ্রুের নিদ্রা যারা করে তারা পাণী মহাপাণী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু হইলে কি হয় এমন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ বিশ্রামের অবসর পাইয়াও তাহা ভোগ করিতে পারিলাম না এই

বিশ্রামই আমার কাল হইল। মহাকবি ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছিলেন “গুণ হইয়া দেখ হইল বিভার বিভা” আমারও অনুরূপে ঘোষে এই বিশ্রাম সপ্তম কারাবাসের মত পাড়াইল—কিছু না করিয়া নাগাদ একমাস কাল শুইয়া কাটান, আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পাড়াইল—কেহ যদি আমার কাজ করিতে বলিত আমি কিয় গালিয়া বলিতে পারি যে আমি কাজের মধ্যে সাধ্যমত বিশ্রামই করিতাম কিন্তু বিশ্রাম করিতে বলিলে বিশ্রাম করা অসম্ভব; কেবল আমার পক্ষে নহে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। কথামালার সেই কাঠফড়ানী বুড়ীর গল্প মনে পড়িল—বোচারী ছুপে কটে ভাবনকে ছুঁরুহ মনে করয় নিচ্ছনে বনের মাঝে বলিয়া ফেলিয়াছিল “গোড়া যমলক আমার কুলে গেছে” আর যায় কোথা। তখন বোচারী বাস্তার চলন ছিল কি না জানি না কেমন করিয়া যমরাজের কাণে কথাটা গিয়া পৌছিল—তুমিরা লক্ষ্য্য তাঁহার মুখখান লাল হইয়া উঠিল। পটের সাঝরা সত্য-বানের ছাচেতে যমরাজকে পুলকাণ ও ঘোর ক্ষত্বর্ণ বিপিত করিয়া আঁকা হয় এবং আজ কালের শিত-পাঠা অর্থাৎ শিতগিকে অকালপক করিবার ক্ষমতা সমস্ত গুণক রচিত, মুদ্রিত এবং ঠেকট বুক কমিটি কর্তৃক অহমোদিত হয় তাহাতে এবং ঠেকট বুক কমিটি কর্তৃক অহমোদিত হয় তাহাতে ওরফার পুরিহিত করিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকেন—এর কোনটা ঠিক তাহা বিচার করিতে হইলে প্রত্যস্তাঙ্কন মহাশয়ের দ্বারস্থ হইতে হইবে—তার মত মহাপাগ আর

কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না কারণ তাঁরা খোলামুচি দেখিয়া এমনি ভুক্তকে যান যে তাই খেকেই ভারতের ইতিহাস রচনা কর্তে বসে যান। মোট কথা এই যমরাজের বর্ষ বর্ষ সত্যই কৃষ্ণ হয় তাহা হইলে লক্ষ্য্য তাঁর গাল লাল হওয়াটা সম্ভব হবে না কারণ কাল জিনিসের সঙ্গে লাল মিশে গেলে অনেকটা বেগুনী রঙে পাড়ানই সম্ভব। বাই হোক যমরাজ বোচারী লক্ষ্য্য হইলে সেজার-কিপার চিত্রগুপ্তকে বরেন গুহে একবার বুড়ী বেটার পাসপত্র ফাইলটা দেখতো ওর expiry কবে due িরতপ বিলেকের খাইগিদিন না হলে—হিসাবে বড় মজবুত হইনি বরেন খার নাইনটি জেস্। যমরাজ হেসে বরেন তবে একটা এ্যাকভান্স করে বোচারীকে ভব যম্মা থেকে মুক্ত দিয়ে দিই বলে কয়েকটা লুত নিয়ে পাহারা ওয়ালা বেটীতে ভেপুটা কমিশনার অব পুলিশের মত সেই নিচ্ছনে বনে গিয়ে হাজির হলেন। বুড়ীর চোখে তেমন জোরে না থাকলেও ‘যম’ এমনি জিনিস যে সেও তাঁর আগমন অজ্ঞাবে বুদ্ধতে পড়ে বরেন “হুমি কে বাবা, এখানে দুপপেলন কি মনে করে” যমরাজ হেসে বরেন “বুড়ী আমায় চিনেও পাচ্চেন না এই মাত্র যে আমায় ডাকছিল—‘যামি এসেছি’।” বুড়ী বুজল যম সত্যই আসিয়াছে তখন সে ভয় পাইয়া বলিল “হা বাবা—তোমায় ডাকছি” এই কানেই বোকাটা। আমার মাথায় কুলে দেবার কল—যমরাজ ব্যাপার বুজিয়া একটা হাসিলেন এবং বুড়ীর মাথার কাঠের বোকা তুলিয়া দিয়া বহানে প্রস্থান করিলেন।







মহানাগরিক

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকা  
সার সঞ্চলন

## সত্যের পরীক্ষা

ধর্মভাব

ইলও প্রাসাদের দ্বিতীয় বঙ্গরের শেষভাগে দুইজন খ্রিস্টানের সন্নিহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহারা দুইজনে সন্ধ্যার, উভয়েই অবিরাহিত। কথায় কথায় তাঁহারা গীতার বিষয় উল্লেখ করেন—তাঁহারা সার এডউইন আর্নল্ড কর্তৃক অনুদিত গীতা—“বি সা গিলেচাল” পাঠ করিতেন এবং আমাকে তাঁহাদের সহিত গীতার মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে অহুরোধ করেন। আমি হিন্দু বা সংস্কৃত গীতা পূর্বে কখনও পাঠ করি নাই বলিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। আমি বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বলিমান “আমি গীতা কখনও পড়ি নাই। তবে যাহা সমাজ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছি তৎসাহায্যে অহুরোধ যদি কিছু অবিরাহিত ঘটিয়া থাকে তাহা বেশ হয় মূল গ্রন্থ পাঠে ঘরিতে পারিব। আমি সাত্বত্বের সহিত গীতার অহুরোধ পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম—বিত্যয় অধ্যায়ের এই মোক দুইটি আমার মনে যে তাঁর রেখাপাত করিয়াছিল আজ পর্যন্ত তাহার একটুও বৈশিষ্ট্য ঘটে নাই—

—যাতো বিশ্বাস্য পুংসঃ সন্ততঃসোপজায়তে  
সদ্বাস সন্মারতঃকামঃ কামাং কোমোহিভিভ্যাজতে  
কোমোভবতি সন্মোহ সন্মোহাং নৃত্তি বিমমঃ  
নৃত্তি অন্মোহ বুদ্ধিগোশো বুদ্ধিগোশাং প্রপত্ততি।

অর্থাৎ বিশ্বাসের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বাসে আসক্তি জন্মে—আসক্তি হইতে আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ হয় আকাঙ্ক্ষা বাধা প্রাপ্ত হইলে কোমোহর উদয় হয়, কোমো

হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্রব, স্রব হইতে বুদ্ধিলাশ পরে বুদ্ধিলাশ হইতে সর্লনশ হয়। এই গ্রন্থ যাই পাঠ করি ততই ইহার প্রতি আত্মা বাঁচিয়া যায়। ইহা বাস্তবিকই এক অমূল্য রত্ন। সত্যায়োবৌকে পথ দেখাইতে ইহা অবিভীত। গীতার সকল প্রকার ইংরাজী অহুরোধই আমি পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে সার এডউইন আর্নল্ডের অনুদিত গ্রন্থই সর্বোৎকৃষ্ট—তাঁহার অহুরোধ মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা ধরিয়া লইলেও পড়িবার সময় নিরল অহুরোধের মত শ্রবায় না—এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব।

এই সময় যদিও গীতা পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র অহুরোধ করি নাই—ইহার কয়েক বঙ্গর পরে গীতা আমার দৈনিক পাঠ্য এবং আলোচ্য পুস্তক হইয়াছিল। এই সাত্বত্বের কথামত আমি সার আর্নল্ড প্রণীত “লাইট অব এন্সিয়া” পুস্তক পাঠ করি কিন্তু তাঁহার “ভাগবৎ গীতা” অমোক্ষ এই পুস্তক আমি আদিক আগ্রহে পাঠ করি। পরে এক সময়ে এই সাত্বত্ব আমার “রাভাটিকিলক” লইয়া গিয়া মাদাম রাভাটিকি ও মিসেস বেনাস্তের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন—এই সময়ে মিসেস বেনাস্ত খ্রিস্টানিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করেন—তাঁহার এই অভিনব সংস্কার গ্রহণ সংকল্প সে সময় জের সমালোচনা চলিতেছিল, সে সময় আমি অন্তিম আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। বঙ্গরূপ আমাকে এ সোসাইটিতে যোগদান করিতে অহুরোধ

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা]

ইয়ং-ইণ্ডিয়া

১২৪৫

করেন তাহার উত্তরে আমি বলি—“আমার নিজের দর্শন সংকল্প আমার জ্ঞান এত অল্প যে তৎসাহায্যে বিচার করিয়া আমি কোন দর্শন সংকল্প যোগ দিতে পারি না। আমি মাদাম রাভাটিকি প্রণীত “কি টু বিশ্বাসক” পাঠ করি—তাঁহার ফলে হিন্দু দর্শন বিষয়ক অজ্ঞাত পুস্তক পাঠ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়—এবং হিন্দুদর্শন কেবল হৃৎস্বাস্থ্যের উপর স্থাপিত বলিয়া মিশনাচরীয়া যে প্রচার করেন তাহা কতদূর মিথ্যা তাহা বেশ ব্রূমিতে পারি।

এই সময়ে এক নিরামিষ বেডিং হাউসে ম্যাককোটার হইতে আগত এক খৃষ্টানদের সহিত আমার আলাপ হয়—তাঁহার সহিত আমি গৃহস্থ আলোচনার প্রবৃত্ত হয়—রাজকোটের মিশনারীর কাহিনী তাঁহাকে আমি চিনাই তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন—আমাকে তিনি বাইবেল পাঠ করিতে বিশেষ অহুরোধ করেন। তিনি নিজে বাইবেল বিক্রয় করিতেন তাঁহার নিকট হইতে আমি এক বিষয় সংস্কারের গ্রন্থ ক্রয় করি। গলুট টেটামেন্ট পাঠ করিতে আমার ভাল লাগে নাই—গলুট গড়ার ব্যতিরেকে পড়ার লজ্জা কোন মতে তাহা শেষ করি।

নিউ টেটামেন্ট একেবারে বিস্তারিত, ইহা পড়িতে আমার খুব আগ্রহ হয়—বিশেষ “সারমন অন দি মার্কিট” উপদেশাবলী আমার অন্তর স্পর্শ করে—আমি উহা গীতার সহিত তুলনা করি—“আমি তোমাদের বলি পাপকে বাধা দিও না বরং যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গায়ে আঘাত করে তাহাকে অঙ্গ গড়ে আঘাত করিতে বাড়াইয়া দাও”—ত্যাগই ধর্মের চরমোৎকর্ষ তাহা আমি বেশ উপলব্ধি করিতে শিখিলাম। একটুকু পাঠের ফলে অজ্ঞাত দর্শন প্রচারকগণের জীবন ব্রূমিত পাঠ করিবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল। আমি জটনৈক বঙ্গর উপদেশে কারলাইল প্রণীত “হিরোজ এও হিরো ওয়ার-শিপ” নামক গ্রন্থ পাঠ করি।

এদিকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া দর্শন বিষয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করিবার সময় পাইতাম না তবে মনে মনে ঠিক করিলাম পরীক্ষার পর সমস্ত মূল দর্শনগ্রন্থগুলি পাঠ করিব।

নিরাশর বানীত্বের প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই ব্রাডলাকের নাম জ্ঞাত আছেন—এ বিষয়ে আমি কতকগুলি বই পড়ি কিন্তু উহার যুক্তি তর্ক আমার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই কারণ তখন আমি নাট্যিকতার মকত্বমি পার হইয়া আসিয়াছিলাম।

এই সময়ে ব্রাডলাকের মৃত্যু হয়। আমি তাহার অষ্টোষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে হিলাম—কয়েকজন পাদরীও তাঁহাকে শেষ সন্মান দেখাইতে আসিয়াছিলেন—সমাধিক্ষেত্রে হইতে দ্বিগিয়া ঠেগনে আমাদের টেবলের লজ্জা অপেক্ষা করিতে হয়। নিরাশরবানী সন্ধ্যার একজন চাই একজন পাদরীকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—

“আচ্ছা মশাহ, আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?”

পাদরী দীর্ঘ গাভীর্থের সহিত উত্তর করিলেন—“হাঁ, করি।”

আন্তরিক্তিভাষ্য মূহ হাতের সহিত তিনি বলিলেন—  
“আচ্ছা আপনি এটাও মানেন যে পৃথিবীর পরিধি ২৮০০০ মাইল, ঠিক কি না?”

“হাঁ, মানি।”

“তাহা মানেন তবে দখা করে বলুন ত’ আপনাদের ঈশ্বরের আকার কিরূপ এবং তিনি কোথায় থাকেন।”

“তিনি আমাদের উভয়েরই স্বরূপে বিরাজমান।”

“বেশ, বেশ, আপনি ক’টি খোকা মনে করেন দেখছি।”

পাদরী নিকন্তর।

এই কথাবার্তার ফলে নিরাশর বানীত্বের প্রতি আমার মনে বিত্বফায় তরিয়া উঠিল।





বিনীত বিজ্ঞানবিদে 'স্বাধীনতা'



দাঙ্গার হাঙ্গামে প্রেসের বর্ষচরীষণ নিয়মিত আসিতে না। পারায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাংগ বাহির করিতে হইতেছে তথাপিও নবমুণ বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হইতেছে ফলে নবমুণে অনেক ভুল চুক থাকিয়া যাইতেছে। ৩৫ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ মহানরোপাধায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বগীন্দ্রনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নামের সঙ্গে একটি 'বারু' অনিশ্চিত বসিয়া গিয়াছে। 'বারু' কথাটা যে পণ্ডিত প্রবরের নামের সঙ্গে অশোভন তাহা বলাই বাহুল্য। মাননীয় ও মঞ্চবাগীর সমালোচনায় কুমার যোগীন্দ্রনাথ ভায়ের নামের স্থলে "থগোল" হইয়া গিয়াছিল। গত (৩৬) সংখ্যায় স্মৃতিরোখার পৃষ্ঠা পুত্র কানীন পাঠ্যোশ অঙ্গরর ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে ১২১২ পৃঃ ৩০ পংক্তির পর ১২১৩ পৃঃ ৩১ পংক্তি হইতে পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে ও শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া তারপর মধ্যস্থিত অংশটুকু পাঠ করিলে অর্থ সঙ্গত হইবে এবং বর্তমান সংখ্যায় স্মৃতিরোখার পাঠ্যংশ ১২১৩ পৃষ্ঠার ৩০ পংক্তির পর আরম্ভ হইবে। এ সকল ক্রটির জগৎ যে আমাদের চিরসহিষ্ণু পাঠকবর্গের নিকট মার্জনাপ্রার্থী তাহা বলাই বাহুল্য।

সংগ্ৰহিত একদিন রাজিতে জৈনক জমিয়ার তাহার চাকরশরী রোডহিত বাসাবাড়ী হইতে একখানি ট্রিপাড়া করিয়া তাহার জী ও অঙ্গবহন একটা চাকর সহ বরিশাল শীমার ধরিবার জগৎ বাগামতলী শীমার ঘাটে রওনা হন। গাড়ীখানি যখন প্রায় মিটকোর্ড রোডে আসিয়াছে তখন ভক্তলোকটি গাড়োয়ানকে বলিলেন যে, তিনি টাকাসহ মণিবাগাটা বাসাবাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গাড়োয়ান নানাপ্রকার ওজর আপত্তি দেখাইয়া পুনরায় বাসায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে। অগত্যা ভক্তলোকটি নিরুপায় হইয়া

গাড়োয়ানকে শীমার ঘাটে তাহার জী ও চাকরটিকে পৌছাইয়া দিতে বলিয়া প্রথং বাসার দিকে রওনা হন। গাড়োয়ান তখন বাগামতলী শীমার ঘাটের দিকে না যাইয়া হস্পিটাল হইতে নয়াবাজারের দিকে যে রাস্তাটা গিয়াছে সে দিকেই গাড়ী চালাইতে থাকে। উক্ত ভক্তলোকের চাকরটি গাড়ীর উপরে বসিয়াছিল, সে গাড়োয়ানকে বিপথে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং গাড়ী থামাইতে বলে; কিন্তু গাড়োয়ান তাহার কথা কবপাত না করিয়া দুঃ-অভিপ্রায় বশতঃ গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল। এমন সময় মোহনদ্র কামেশ্ব নানক জৈনক উভয়বংশী ও শিকিত মুলমান যুবক ঐ পথে আসিতেছিলেন। রাজি তখন প্রায় সাড়ে বারটা; তিনি "পিকচার হাউস" হইতে বায়স্থাপ দেখিয়া ঐ পথে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। উক্ত যুবককে দেখিতে পাইয়া গাড়ীর উপর হইতে চাকর ছেলেটী মটনার বিষয় তাহাকে জানাইল। তখন উক্ত যুবক গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলেন; গাড়োয়ান যুবকের কথা কবপ না করিয়া আরও তড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া যাইতে লাগিল। যুবক গাড়োয়ানের দূরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গাড়ীর পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটিয়া গাড়ী থামাইবার চেষ্টা করিলেন। গাড়ীখানি যখন "আনন্দ রায় স্ট্রীট" ছাড়িয়া "মাহতলী" রোডে যৌবিকলেজের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে তখন যুবক অতি কষ্টে ঘোড়ার পার্শ্বে যে দড়ি থাকে তাহা ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে গাড়োয়ান নিশ্চয়ভাবে তাহাকে চাকর মারিত থাকে; কিন্তু যুবক মেরিকে কবপ না করিয়া অতি দ্রুততার সহিত ঘোড়ার মূখের রশি ধরিয়া ফেলেন; ফলে গাড়ী থামিয়া যায়। তখন গাড়োয়ান নাথিয়া যুবকের নাসিকাতে পুদি মারায় তাহার নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত



হইতে থাকে। যুবক অতি কষ্টে নিজকে রক্ষা করিয়া পাড়োয়ানকে গাড়ী ঘুরাইয়া ধীরে ঘাটে লইয়া বাইতে বলেন, তাহাতে পাড়োয়ান অধিকতর উত্তেজিত হয় এবং অস্বীকার করে। যুবক তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, কাজেই বেশী বাড়াবাড়ি করিতে না পারিয়া তিনি তখন ত্রী-লোকটীকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে বলেন। ত্রীলোকটী তাহারই করিলেন, এবং চাকরটীও তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া জিনিষ পত্র নামাইয়া ফেলে। পাড়োয়ান তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। বড়ই দ্রুতের বিষয় গাড়ীর নখর বেধা হয় নাই, কারণ তখন নখর যেবিবার মত জান ও বৃদ্ধি যুবকের ছিল না। যুবকটি জিনিষপত্র চাকরের নিকট দিয়া কতক নিজের হাতে লইলেন, এবং ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া ধীরেঘাটে পৌঁছিলেন। ধীরে ঘাটে পৌঁছিলে পর উক্ত ডব-লোকটীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলেন। অতঃপর যুবকটী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তখন তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নিভত হইতে থাকে। যুবকের ডান পায়ে গিয়াতে অত্যন্ত কষ্টময় হইয়াছে। অতঃপর ত্রীলোকটী যুবককে ৫০-টী টাকা দিতে চাহেন; কিন্তু যুবক তাহা লইতে অস্বীকার করেন এবং বলেন—“আমি এমন কিছু করি নাই যার জন্য আমি পুরস্কৃত হইতে পারি; আমি আমার কষ্টব্য করিয়াছি মাত্র।” আমরা এই সংসাহারী যুবকের উদ্ভিত ও দীর্ঘবীর্য কামনা করি। (‘টাকা প্রকাশ।’)

পাবনা জেলার ভারতীয় মুসলমান জমিদার জাহেদাল খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহে স্থানীয় হিন্দুদিগকে এক মহৎ ভোজ দিয়াছিলেন। একজন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং রন্ধন কার্যে ব্রাহ্মণ ঘাটাই বরান হইয়াছিল। অমাত্র এই মুসলমান জমিদারের বিবচনাগের ভূমণী প্রশংসা করিতেছি। এই সংস্কারিক বিবেচনের দিনে তিনি যে একজন উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য সমস্ত বাঙ্গালী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছে।

কলিকাতায় যে সকল মুসলমান নেতা নিরক্ষর ও নির-শ্রেণীর মুসলমানদিগকে অবিরত উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহারা এই প্রশংসার জমিদারের মত জ্ঞাতভাবে কি হিন্দুগণকে গ্রহণ করিতে পারেন না? (স্বাধীনী)

পূর্বোক্ত দুইটা ঘটনা হইতে মুসলমানের মধ্যে মহত্বের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হুতরাং দাশ। উপলক্ষে যাহারা মুসল-মানদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেছেন তাঁহারা অবহিত হউন। একজন উদারতাবাদী হিন্দু মহাশয় যুব-মূলতঃ নহে। সকল জাতির মধ্যেই ভাল মন্দ দুইই শ্রেণীর লোক আছে তবে কাহারও মধ্যে কম কাহারও মধ্যে বেশী। সেটা প্রধানতঃ শিক্ষার প্রকার ও প্রসারের উপর নির্ভর করে। আমরা এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের নিকট যে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা হাযী বীকার করিতে পরম আনন্দ বোধ করিতেছি।

যতীন্দ্রনাথ বহু ও চন্দ্রকান্ত দেব নামক যে দুইটা তরুণবাঙ্গালী ভীকতা নামক জাতীয় কলঙ্ক দূর করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—গত বৃহস্পতিবার সম্মাননে নিমন্তব্য তাহা তাঁহাদের পারলৌকিক কিম্বা শরীয় হইয়াছে। বিশুল বাঙ্গালী সমতা সমবেত হইয়া তাঁহাদের যোগ্য সম্মান অর্থাৎ দিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের অসহায় পরিবারবর্গের জন্য দেশের লোকে একটা স্বেচ্ছাব্যয় করিলে ভাল হয়। ত্যাগ ও উৎসর্গ ভিন্ন যে জাতির মুক্তি নাই তাহা জাতি আত্ম মর্মে মধ্যে বৃদ্ধিযায়।

স্বহরের উত্তরাংশে আজ তিন দিন অশ্রিত্ত ভল-নেই। পাথখানার পুষ্টিগণ্ডে বাটীতে বাস করা যায় হইয়াছে। সব টাঙ্কই ঢ়্ঢ় করিতেছে। মেঘের মহাশয় ইংরেজ মহল্লায় থাকেন তিনি এসব কষ্ট সহ্যত্ব করিতে পারিবেন না জানি কিন্তু বসিয়া বসিয়া কেবল টেটমেন্ট বাহির করিলে কি হইবে—লোকের প্রাণ যে যায় যায় হইয়াছে।



## দাঙ্গা—দ্বিতীয় সংস্করণ

গত সপ্তাহের নবযুগের শেষ খণ্ডা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় স্বহের দাবার দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে জনিলাম, তজ্জন্য গত সপ্তাহে এসময়ে আমরা বিবেচ-কিছু লিখিতে পারি নাই। আর কি ছাই লিখিব? লিখি-বার মুখ নাই—দ্বন্দ্ব নাই—ভাষা নাই—“ভাইয়ে ভাইয়ে” এই নিরাক্ষর মারামারি কাটাকাটি একি লিখিবার কথা। তবে ব্যাপার দেখন্ত ঠাড়াইয়াছে তাহাতে না লিখিয়াও আর চলে না; কারণ রক্ত মধ্ববেদনার যাতনা সহ করা যায় না তাই লোকে শোকে চীৎকার করিয়া কাদে। প্রকাশ করিতে পারিলে শোকের ভার সত্যভাবেই হ্রাস হয় তাই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই জাতীয় অবনতির সংবাদ লিখিতে হইতেছে।

জনিলাম গত বৃহস্পতিবার তিনজন মুসলমান স্বা-পান করিয়া মদমত্ত গতিতে, উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে কল-ট্রাটে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের প্রতি গালিগাণের করে তাহা-নিগণকে নিষেধ করিলে তাহারা পথভিৎ একটা গাভীকে হত্যা করিবার জন্য ছুরিকা হস্তে তৎপ্রতি খাতিত হয় তাহাতেই হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে প্রহার করে সেই সংবাদ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় মুসলমানগণ-কিপ্তের দ্বারা হিন্দু পবিত্রমাসকেই আক্রমণ করে—ইাম, বাপ প্রভৃতি যান হইতে হিন্দু আরোহীদিগকে টানিয়া আনিয়া কান্দুকের মত হত্যা করে একটা হিন্দুকে গৌ-পানার মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার নাসা ও কণ্ঠ ছেদন করিয়া দিয়াছে এমনকি অসাময়িক অত্যাচার পূর্বত করিতেও লজ্জা বোধ করে। আর আজ শব্দের নামে কিন্তু নীচ-মুসলমান গুণাগণ এই কালকরিয়া গর্ভে বুক ফুটাইয়া বেড়াইতেছে এবং মুসলমান সমাজে ২৪টা লোক ছাড়া কোন শিক্ষিত লোকই তাহারদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে না—এটো যে মস্তক্বেষের হিসাবে তাহাদের গভীর

অবনতির পরিচায়ক তাহা কি শিক্ষিত মুসলমানেরাও আজ বুদ্ধিতে পারিতেছে না!

হত্যাভয়ের সংখ্যা বা হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করিয়া লেখনী কলিষ্ঠ করিতে চাহি না সে সমস্ত সংবাদ আপ-নারা দৈনিক পত্রাদিতে পাই করিয়া থাকিবেন তবে এই নূতন সংস্করণ দাবার বিশিষ্টতা হইতেছে গুণ্ডা মুসলমান-কর্তৃক ক্ষমতাজ নির্ভিচ্ছাতে পূর্ণতা হইতে হিন্দু-মণ্ডার বৃকে পিঠে বা পায়ে লাঠী বা ছুরি চালান। তাহের বৃকে ভাই ছুরী বসায় এবং হাসিমুখেই বসায়—এ দৃশ্য কি দ্বন্দ্ব-ভেদী!

যেদিনটা মুসলমান গুণ্ডাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা এই হত্যাশোভে বহিতে আরম্ভ করিল তাহাদের প্রেরণার করিয়া কি পুলিশ এ বাঙালী প্রায়ভেই দমন করিতে পারিতে না? খেঁচনম্যান প্রভৃতি আধারকারী সংবাদ-পত্রের প্রতি তত্ত্বেই দণ-বিষয় পুলিশের কার্যকারিতার প্রশংসা জনি কিন্তু কামের উপর নম্র রাখিয়া বলিলে বলিতে হয় যে ঐ সব চাটুবাগী আলীক, মিথ্যা—কেবল সরকারের লুপ্তপ্রায় প্রতিষ্ঠাকে চোলা দিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা। এসব যুক্তি, এসব কাহিনী আর শিশুতঃ জনিয়াও বিশ্বাস করেন না।

উত্তর কলিকাতায় শান্তি রক্ষার ভার এখানে তো ‘লালমুখ’ পাইয়াছেন তবে রাঙাবাঙার খানায় বাইয়া গুণ্ডারা সেখানকার ভেঁকনাইলগকে হত ও একজন কনটে-বলকে হাতে করিল কি করিয়া। সরকারি বিবেচনায় যিনি আজ অক্ষর্য্য—সেই রায় পূর্ণজ লাহিড়ী বাহাদুরের আমলেও যে গুণ্ডার এমনটা করিতে সাহস করে নাই। তাহা হইলেও ভীষণ দণ্ডার সাহায্য হয় নাই এবারের এই



গুপ্ত হত্যার ঝামেলায় তাহা ঘটিল ইহা উক্ত পদম শ্বেভাক পুলিশ কর্মচারীর পক্ষে প্রাধার কথা নহে—এবং ইহাতে পূর্বতন ডেপুটি কমিশনার লাহিড়ী মহাশয়ের যোগ্যতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদে অন্ধ চাটুকারের পরামর্শে গভর্নমেন্ট যে অবিচার করিয়াছেন তাহা যে অজ্ঞায় তাহা তো হাতে হাতে প্রমাণ হইয়াছে। সত্যকে চাপা দিবার বুধা চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালার গভর্নমেন্ট আজ অনেকের শ্রদ্ধা হারাষ্টতেছেন।

হত ও আহতদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বে বারবার বেশী তাহা স্বপট বোঝা ইহাতেছে স্বতরাং হিন্দুরাই নির্যাতিত হইয়াছে অথচ পুলিশের ও আইনের প্রত্যেক পড়িয়া আবার তাহারাই দণ্ড ভোগ করিতেছে স্বতরাং হিন্দুর মন যে ইহাতে তিক্ত হইয়া উঠিতেছে নিশ্চল সন্দেহে ভিতরে গচ্ছিয়া উঠিতেছে গভর্নমেন্ট কি তাহা অগ্রহণ করে নিয়াছেন? সরকার বাহাদুর এই ব্যাপারে মুসলমানদিগের পক্ষ লইবার চেষ্টা করিলে তাহা কি হিন্দুরা বুঝবে না? বাঙ্গালী হিন্দুর কথা ছাড়িয়া দি তাহাদের অধিকাংশই না হয় ইংরেজের কোণাঠী কিন্তু মারবাড়ী হিন্দুরা এ ব্যাপারটাকে কিভাবে লইবেন? তাহার। যাবদা বাবিশ্য প্রচাবে ভারতে বট্টেনেভান ভা হাত; আজ যদি সেই ভান হাত গুটাইয়া যায়, যদি মারবাড়ীরা এক মত হইয়া তাহাদের চেম্বার অফ কমার্শ হইতে ইংরাজদের চেম্বার অফ কমার্শকে এক পাত্র দেন যে গভর্নমেন্ট তাহাদের ধনমান রক্ষার বন্ধোবন্ত না করায় তাহার। ব্যথা হইয়া বিলাতী বর আনান বন্ধ করিতে—তাহা হইলে গভর্নমেন্টের কি অবস্থা হইবে? স্মৃতি কিন্তু ম্যাকডোনের তত্ত্বাবধানে দখনে তাহায়া অভীষ্ট হইয়া উঠিলেন না কি? মুসলমানের সাধ্য নাই—অসন্তোষ বাংলা দেশে তো নাই—যে তাহারা বিলাতী কাগজের কাছ চালাইবে। সে অর্থ, সে যোগ্যতা তাহারা পাইবে কোথায়? কলকাতায় যে কয়েকটি দিল্লী ওলা বিলাতী মালের কারবার করেন মারবাড়ী মহাশয়ের নিকট তাহাদের অনেককেই টিকি বাণ আছে এমন মারবাড়ী হাত গুটাইলে তাহাদের ব্যবসা রক্ষা করাই কঠিন হইবে। জানি মারবাড়ী

ইংরাজজ্ঞ, উল্লগানে স্বপট কিন্তু তাহারা যে ধর্মপ্রাণ; তাহাদের ধর্ম আখ্যাত লাগিলে তাহারা যে বিলাতী কাছ বন্ধ করিতে যে ইত্তস্ত: করিবে তাহা তো বোধ হয় না। গভর্নমেন্ট সহীদুলের ভোটের জোরে রক্ষণ হইতে চালাইতে পারেন কিন্তু বট্টেনেভান ব্যবসা রক্ষা করা রহিমরাজের সাধ্যাতীত।

ছোলতান নামক মুসলমান চালিত এক গজিকা মুসলমানদিগকে হিন্দুর সংগ্রহ ভাগ্য করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন। সহযোগী তুলিয়াগিয়াছেন যে একই দেশে বাস করিয়া হিন্দুর সব সংগ্রহ ভাগ্য করা এক প্রকার অসম্ভব। মুসলমানের মধ্যে কুবিজীর সাখা অধিক হইলেও অধিকও যথেষ্ট; দক্ষতা, প্রেসম্যান, চুতরা, মোটর ড্রাইভার, ফোরম্যান, মিত্রী, কলের fitter প্রভৃতি বিবিধ নিপীগ্রির কাজে অসংখ্য মুসলমান হিন্দুর নিকট চাকরী করে—সেই সমস্ত লোকদিগকে কাছ দিবার মত মহেই মুসলমান ব্যবসারী বাঙ্গাল্য নাই। আবার চারিদিককেও হিন্দু আভ্যন্তর্য্যের নিকট মাল বেচিতে হয়—স্বতরাং সহযোগীর পরামর্শ মত মুসলমানেরা পাড়ায় পাড়ায় একধান মুদিখানা খুলিলেই হিন্দুর সংগ্রহ ভাগ্য করা যায় না এসব পরামর্শ বাতুল কনোচিত এবং ইহা শুনিয়া কোনও মুসলমান মুসলমান নাচিটা উঠিলেন এমন বোধ হয় না আর তা ছাড়া এই চারী রা প্রসিদ্ধিদিগের মধ্যে হিন্দু বিবেচ্য নাই। হিন্দু বিবেচ্য গজাইতেছে অন্ধ শিকিত মুসলমানদিগের মধ্যে—যাহাদের নিবেশের ভাণ্যে যোগ্যতা নাই স্বতরাং হিন্দুর চাকরী বা ব্যবসার কোনওকি হিংসা করিয়া তাহাদের অযোগ্যতা চাপা দিবার চেষ্টা করা ছাড়া তাহাদের অজ কাছ নাই। আর গাজোমান, কলের কুলী প্রভৃতি শ্রেণীর লোক—ইহাদের কথা হিন্দুদিগকে উৎখাল করিতেছে।

স্বরাজ্য দলের প্যাক্টের প্রত্যক্ষ ফলটা নাকি করিয়াছে যে বাঙ্গালী ও শিবদিগের সহিত মুসলমানদের 'পটী' হইয়াছে, স্বতরাং তাহাদের হাত আক্রোশ মারবারী ও আর্দ্যসমাজীদের উপর। এসব কথা যেমন ভিত্তিহীন তেমনি

নিরীক্ষিতার পরিচায়ক। বাঙ্গালীদের সহিত মুসলমানদের তো কোন বিবাহ হয় নাই স্বতরাং সন্ধি হইবে কি ক্ষত। বাঙ্গালীরা আর্ন্ত মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিয়াছে উৎসুক তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিয়াছে নিজেদের শ্বেমশক্তি ব্যাধি রক্ষা করিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ও আশ্চর্য্যকার পরিচয় আছে—আক্রমণের কোন চিহ্ন নাই তথাপি অনেক বাঙ্গালীকে মুসলমান গুপ্তভাতকের হাতে শাস্তিত ও আহত হইতে হইয়াছে। তবে সহযোগীর বরি এই উদ্দেশ্য হয় যে উক্ত ইত্তাহার পাঠে বাঙ্গালীগণ অপরূপ রণ বিপন্ন হিন্দুদের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবে ও মুসলমানেরা মারবাড়ী ও আর্দ্যসমাজীদের উপর নির্ভর্য্যে অত্যাচার করিতে পারিবে তবে তাহাকে উদ্ভাট বশিয়া ভাবিলে চিন্তাশক্তির অপমান করা হইবে না। বাঙ্গালী ও হিন্দু স্বতরাং সে বিপন্ন হিন্দুকে রক্ষা করিতে স্মারত: ধর্মত: বাধ্য—বাঙ্গালীর বন্ধিমুগ্ধই বলিয়াছিলেন 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে।' বাঙ্গালী তাহাদের জাতীয়তার উদ্বোধন গুরুদেবের এই ঐকান্তিক অগ্ররোধ রক্ষা করিবে। তবে মানবতার দিক দিয়া—প্রতিবাসী, জাতি হিসাবে সে বিপন্ন মুসলমানকেও রক্ষা করিবে। স্মার ও কর্তব্যপালনে তাহারা চিরদিনই অগ্রসর, শ্রান্ত ও তাহার। কোন বিষয়েই পরামুখ হইবে না।

দাদার কারণ দেখে কেং বলেন ওহা ধর্মের বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন। কেং বলেন ওহা ওয়াসিগের কাজ। আমাদের মনে হয় ইহার কোনটাই ঠিক নহে। কারণ ভারতবর্ষে মুসলমান ছাড়া আরও অনেক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করেন। ২৫শে এপ্রিলের স্টেটসম্যান লিখিয়াছেন—

The growth of the communal spirit has been too quick and too strong. Allowing every possible deduction Sir ABDUR RAHIM will be at the head of thirty Mohammedans in the Council who are not Swarajists. Given the support of the Government vote he can form a Ministry, apportion the offices, and

defeat his opponents in every division that takes place. The Bengal Swarajists • • • have played their cards in Bengal with such amazing fatuousness that they have left every trump in the hands of Sir ABDUR RAHIM.

ইহার অর্থ করা নিশ্চয়োজন। সার আবদার রহিম মুসলমানদের ভোটের সাহায্যে রক্ষণ গভর্নমেন্টকে সতল করিবেন। মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর বীতরাগ না হইলে স্কল মুসলমান তাহাকে সাহায্য করিবেন কেন। সকলেই তো স্মার আবদার রহিম নন এখন মুসলমানকে হিন্দুদিগের সহিত সকল রক্ষা সম্পর্ক ছিন্ন করাইতে হইলে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সবই এই দাদার পরিচুট হইয়াছে। হিন্দুরা নিরীহ যতন ও দেশ-বাসীর অগ্ররোধ তাই তাহারা দরহই হইলেও বিনা বিচারে বিলাসিত কতে চালা দিয়াছে। জল-প্লাবনের সময় চালা তুলিয়া নিরহ বৈধবহিপাকে গীড়িত মুসলমান ভাইদের অধ যোগ্যইয়াছে। আজ পায়ে পা দিয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া না বাবাইলে কি করিয়া সমস্ত মুসলমানকে হাত করা যায়। কারণ দাদা বাহার। করিতেছে তাহার। অশিক্ষিত নিরশ্রেণীর লোক তাহাদের পক্ষান্তে যে কয়টি পাঁজ ধর্মের নাম তাহাদের খেপাইতেছেন তাহার। জ্ঞানেন যে হিন্দু নিরীহ হইলেও ধর্মপ্রাণ। তাহার মন্দির না ভাঙ্গিলে বা তাহাদের ধর্মচারণে কোন অছিলায় বাবা না দিলে তাহার। ঝগড়া করিবে না—তাই এই অযাচিত আয়োজন।

যাহারা অস্ত্রাঙ্গে থাকিয়া এই ভাবে স্বজাতির ও শ্বশনের সর্বনাশ করিতেছেন তাহাদের ধমক না করিলে এ দাদা থাকিবে না—পুলিশের ভয়ে প্রকৃত দাদা নিবাসিত হইতে পারে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের প্রক্কর আশির্বাণ গুপ্তভাতার আকারে নিভা দেখা দিতেছে— তাহাতে যে কত নিরীহ হিন্দু মুসলমানকে জীবন দিতে হইবে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তাই মনে হয় এ দাদার কারণ মদদিগের সমুখে বাতুলানি মন এর মূলে আছে



রাজনৈতিক চাল। থানা কাটিয়া দ্বীপের আনিলে ফল যা হয় তাই হইতেছে। দাঙ্গা উপলক্ষে আজ কেবল হিন্দুই মরিতেছে না—পুলিশের কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবল শেতাঙ্গ সার্জন, এংলো ইন্ডিয়ান সকলেই মরিতেছে শেতাঙ্গের নিত্য-ভক্ষ্য মাংস দ্বারা হইয়াছে তাই এতদিন পোতা দারজিলিংয়ে লাট সাহেবের ভ্রমক পড়িয়াছে তিনি এই দারুণ পরমেও কলিকাতার আসিয়াছেন।

সত্যগ্রহের সময় অশিক্ষিত জনসাধারণকে সত্যাগ্রহ পালন করিতে শিখাইতে বাইয়া যে শেচোনী হত্যাকাণ্ড ঘটয়াছিল তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে এই অশিক্ষিত শ্রেণীদের একবার কেপাইয়া দিলে পরে তাহারা আরক্তের বাহিরে চলিয়া যায় এমন কি মহাআ গান্ধীর মত অতুলনীয় ব্যক্তিরের অধিকারীও তাহাদিগকে স্বপথে চালিত করিতে পারেন না। গুণ্ডা চিরদিনই গুণ্ডা; তাহার জাতি-বর্ণ নাই—শোণিতপাত, নরহত্যার, লুণ্ঠনেরই তাহার আনন্দ। ব্যাঘ্র যেমন নরশোণিতের আশ্রয় পাইলে পুনঃ পুনঃ শোণিত পানার্থ অল্প নরহত্যা করে—গুণ্ডারও তেমনি বর্ণের নামে কেমিয়া এমন সব অর্থ কড়িয়া বসে যাহা লুণ্ঠনের কোন বর্ণই অস্বাদন করিতে পারে না। এই সব দেবিয়া, বানিয়া বাহারি বিদেশ কোন উদ্ভেদ সামর্থ্য নিরক্ষর মুসলমান গুণ্ডাবর্গকে উত্তেজিত করিয়াছেন তাহারা কি এই দারুণ জন্ত প্রকৃত দানী নন? গভর্ণমেন্টের কুট-কৌশলী সি, আই, ডিগণ যেমার আধিকার করিতে খুব খপুই আমরা জানি কিন্তু তাহার কি এই জাতীয় বিষয়ে প্রচারকগণকে প্রমাণ প্রদানসহ দরিয়া আনিতে পারেন না? যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত বা অর্থের জন্ত বা পদের জন্ত অল্প নিরীহ ব্যক্তির হত্যার কারণ তাহার কি চিরদিনই আশ্রয়গণন করিতে পারিবে—একদিন তাহারই অন্তরে থোলস-কি খনিয়া পড়িবে না—তখন তাহার স্বজাতির কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? মনে হয় তাহার নীচ ভণ্ড প্রতারক ও স্বার্থপর বলিয়া স্বজাতীয়গণ কর্তৃক দৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

ছয় হয আমাদের নিরীহ মৃত হিন্দু-মুসলমানগণের জন্ত। হিন্দু পাড়ায় হিন্দু গুণ্ডারা একাকী পাইয়া এক নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করিল আবার নিরীহ হিন্দু একাকী মুসলমান পরীতে প্রবেশ করিবার অপরাধে ছুরিকার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল—ইহা দ্বারা হিন্দু বা মুসলমান কোন ধর্মেইই মধ্যমা বাড়ো না হত্যাকারী গুণ্ডাব্যক্ত, তা সে যে কোন কারণেই হত্যা করুক না—সে সর্বসমাজের ঘৃণ্য, দণ্ডনীয়—কোন ধর্মেই তাহার আশ্রয় নাই। ইহাতে মসজিদ বা মন্দির কিছুই প্রতিপত্তি বাড়িবে না। তবে গুণ্ডবৃত্ত্যকে যদি কোন সন্ত্রাস্য ধোরবের কাজ মনে করেন বা এই দাঙ্গাকে ধর্ম যুদ্ধ ভাবেন তাহলে বৃত্তিতে হইবে তাহার ধর্ম কি তাহা জানেন না।

মুসলমান চালিত প্রত্যেক পত্রিকা এই ব্যাপারে সমস্ত—অন্ততঃ বেশী দোষ হিন্দুদিগের উপর দিচ্ছেন এমন কি যে বাঙ্গালীরা এ ব্যাপারে আত্মরক্ষা ও আর্জ-রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন না, তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া তাহাদিগকে কটকি করিতেছেন। এবং স্বজাতীয়গণকে হিন্দু মাঝেরই বিরুদ্ধে বং-পরোনাস্তি উত্তেজিত করিতেছেন। এ গুলি বড়ই অবিশেষতার কাণ্ড। বাঙ্গালীরা মুসলমান দেশবাসীদের দ্বীয়া বাহিরের জন্ত বাহা করিয়াছে তাহার ফলে আজ মুসলমান সমাজ বর্ণেই উন্নত হইয়াছে। বাঙালীর প্রভাব না পাইলে মুসলমান সমাজে আজ কথা বলিবার একটা লোকও হোবা হইত না। শিশু ও সন্তানরা জন্ত তাহার বাঙালীর আদর্শই অল্পপ্রাণিত হইয়াছেন আজ যে শত-করা ৪৪জন চাকরীর দাবী করিতেছেন তাহাও এই বাঙালীরা ছোট চুটাইয়া দিয়াছিল বলিয়া। হাইকোর্টে জজ হইবার দাবী আজ যে মুসলমান করেন—সেও বাঙালীর স্বত্ববৈষয় অধিকার নতুন নতুন একটা কিছু মালায় কোন মুসলমান কবে কি করিয়াছেন। অশিক্ষিত আবদেদের ছোট ভাইটাকে খুশী করিবার জন্ত যেমন বড় ভাই খোপাঙ্কিত বিঘের অর্থে তাহাকে হাসি মুখে ছাড়িয়া দেয় বাঙ্গালী তাহার মুসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করিতে চেয়েছে সকল

হুবিধা—নিজদের স্বজাতির দাবী উপেক্ষা করিয়াও দিয়াছে। তাহারই ফলে স্বরবর্ধি সাহেব আজ ডেপুটী মেয়র, তাহারই জোরে এক অজ্ঞাত কুশলীল খুটনকে গীর মনে করিয়া মিউনিসিপাল মার্কেট করব দিতে বাওয়ার পরও তিনি অবার ডেপুটী মেয়র হইতে পারিয়াছেন। কেবল যদি কোন সাহেব মেয়র থাকিতে তবে এই স্বরবর্ধি সাহেবকে বহুলা পূর্বে পরত্যাগ করিতে হইত। স্বজাতি দলের চীক-হুগ-হুইবার বর্ণেই যোগা শিক্ষিত বাঙ্গালী থাকিতেও এক মুসলমানকে সেই পদ দেওয়া হইয়াছিল—এই সব প্রশ্ন পাইয়াই ভ্রাতৃগণ ভাবিয়াছেন হিন্দুরা আজ বাক্যবর্ণেই পুঁ আমদের দারুণতর তাহার বর্ণেই ভয় করে তাই তাহার দিনের দিন বত অজ্ঞার অসমত দাবী করিয়া জোরে সহিত তাহা আদায় করিতে আগিলেন—পাছে মুসলমান পৃথক হইয়া যায় তাই বাঙ্গালী নীরবে তাহাদের সকল আশ্রয় সহ করিয়াছে কিন্তু তা বলিয়া বাঙ্গালী যে দুর্বল—ভীক বা বিধায়-যাতক নয় তাহার বর্ণেই পরিচয় এই দাদার মধ্যেও তাহারা দিয়াছে। মন্ত্রমুখের পরিচয়ে যেখানে আবশ্যক সেখানে তাহারা দেশের মুখ উজ্জল করিয়াছে।

অন্তরের বিবেচ চাখিয়া চাকরী বাকরীর লোভে যে অনেক মুসলমান স্বজাতিগণে ঢুকিয়াছিলেন তাহা কাউন-সিলে ক্রমাগত ভিগবাকী বাইয়া তাহারা নিম্নশিক্ষিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন কেবল একজন এতদিন সিংহ চম্ভারিত ছিলেন আজি তাহার সেই কৃত্রিম আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে। এইসব স্বার্থপর ভণ্ড-বদশেদেবীরের জুই দেশের আজ এই দুর্দশা, এইসব 'হুমারী তলোয়ার' লইয়া থেলা করিতে গিয়া আজ স্বজাতিগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন।

মীনা পেশওয়ারী নামক এক মুসলমান এই ব্যাপারে খুব নাম কিনিয়া লইয়াছে আমদের স্বজাতি স্বরবর্ধি সাহেব তাহার মুসল্লী সাক্ষিয়া লালবাজারে গিয়াছিলেন তাহাদের সামনেই নাকি এই পেশওয়ারী বীর এক রিকল-ডার দেখাইয়া যেটির যোগে পলায়ন করেন এই কাণকে আমরা গুণ্ডা-অনোচিত মনে করি কিন্তু 'বহুমতী' লিখিয়া

ছেন যে ইহাকে গুণ্ডা বলিলে স্বরবর্ধি সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—যাহাই হোক এই গুণ্ডাই বলুন বা মুসলমান বীরই বলুন ইনি বাঘের গুণ্ডায় বাইয়া অক্ষত বেহে দিরায়াছেন। পুলিশের বড় বাড্ডা, যেখানে ডজন-বাজেন হোমসারও গেমসারও ডেপুটী কমিশনার অফিস করেন—যেখানে পাহারাওয়ালার স্টোয় পল চলা দায়, সেখানে থেকে এভাবে পলায়ন বাহাদুরীর কাজ নিশ্চয়ই তবে সে বাহাদুরীটা পুলিশের নয়, এই গুণ্ডার। স্বরবর্ধী সাহেব তাহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশে হাজির করিবেন বলিয়া-ছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল কিন্তু অনেক ২৪ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে পুলিশ আর 'মিনার' ধর্মবলিতে সক্ষম হয় নাই। যদি কোন বাঙ্গালী পুলিশ কর্তৃকচারীর সম্মুখ হইতে মিনা পলাইত তবে 'আজ তাহার পরচূতি হওয়ারই যু বশী সন্তাননা ছিল এবং ইংলিসম্যান স্টেটসম্যান প্রভৃতি এই স্বরে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটাকেই ভীক ও অকর্মণ্য বলিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতেন কিন্তু আজ তাহারা নীরব কেন—তাহাদেরও কি লজ্জা হইয়াছে না কি? আমদের মনে হয় এই দাদার বাজারে মীনার মত লোকের সাহায্যে অনেকের আবশ্যক আর সম্রাট ব্যক্তি-গণের মধ্যে তাহার বধন মুসল্লীর অভাব নাই তখন নিশ্চয়ই সে কোন প্রভু মুসল্লীর আশ্রয়ে নিরাপদে পান-ভোজনাদি করিতেছে, এমন মজার সহর কলিকাতা ছাড়িয়া সে অজ্ঞত যায় নাই। মীনাকে ধরিতে না পারিলে সমগ্র পুলিশ বিভাগের কলঙ্ক দূর হইবে না—এবং লোকে বুঝিবে পুলিশের ক্ষমতা সত্যই হ্রাস হইয়াছে তাহারা কেবল দুর্বল পীড়নেরই সক্ষম।

একজন বিশিষ্ট মুসলমান নেতার জাতি নাকি রাশিয়ায় বাস করেন এবং বলশেভিকদের সঙ্গে নাকি তাহার আলাপ-পরিচয় আছে—হুতার দাদার স্বযোগে বলশেভিক লিখিত পত্র প্রচারিত হইয়া অসমর্থ নয় কিন্তু এই সময়ে তাহা কোন মতেই বাস্তবীয় নহে স্বতরাং সে নিকেও সরকার বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আবশ্যক।

জোর গুণ্ডব যে একজন মুসলমান নেতার বাটী থানা



তল্লাশী হইয়াছে—এ গোড়াণ্য এই বাৎসরিক বাঙ্গালী হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন হইল! গভর্ণমেন্ট কি তবে এতদিনে নিজের ভ্রম বুঝিয়াছেন তাহার। কি বৃত্তিতে পারিয়াছেন যে মুসলমান হইলেই সাধু হয় না আর হিন্দু হইলেই গভর্ণমেন্টের অমঙ্গলকামী হয় না।

কথায় বলে গো মড়কে মৃত্যুর পার্শ্ব। হিন্দু মুসলমানের বিবাহ উপলক্ষে সাহেবেরা পুলিশ অধিক সংখ্যক খেতাব নিয়োগ করিতে গভর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। অনেক বেকার ইংরাজের এই উপলক্ষে দুটা অঙ্গদখান হইবে—পর্যব কর্তৃত্বের কষ্ট হইল, তাহাতে কি! দাশর্য্য তাহার। পুলিশের কি সাহায্যই না পাইয়াছে। এরূপ সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে কিছু পুলিশের বরচ বাড়িতে না চাহিলে তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কি উপায় আছে। স্ত্রীর আশ্রয় তাহার জাতি-ভাই-বের কনঠেবালী চাকরী জুটাইয়া দিবে—অনেক টো-টো কোপানী, অনেক গুণ্ডা, পকেটমারের চাকরী হইবে—তাহারা কি ইহার বিনিময়ে একটুও কৃতজ্ঞ হইবে না। হিসেবা চিরদিনই সহিয়া আসিতেছে এখনও সহিতে হইবে, প্রতিবাদ নিফল—তাহারা তাহা জানে।

দাশর্য্য বিভাগিকার মধ্যেও একদিন গুজব সম্রাট আমাদের পরীবাখনার পায়ের ধূলা দিয়া গিয়াছেন। তার শব্দগুলি সবই আতঙ্কিত; তবে কথা এই যে সাধারণের মার নাই। ধারা সাধারণ হইতে চান তাহার। সাধারণ হইবেন তাহে আমরা এই সব কথা বিশ্বাস করি না।

এখন-তিনি নিয়মিত নম্বরগুলি দিয়া বলিলেন যে কোন হিন্দু যেন এ পাড়ীগুলি না ব্যবহার করে কারণ সেগুলি হিন্দুবেশী মুসলমান শোকার চালিত এবং তাহাতে হিন্দু আরোহী উঠিলে তাহাকে এমন স্থানে লইয়া যাইবে যেখানে হইতে কিরিয়া আসা সহজ হইবে না—নম্বরগুলি এই—

৭০৭, ১০৩৪, ১১৬, ১৪৪২, ১৪০৭, ৪০৪৭, ১০১০, ১০৭৭, ১২০৭, ১০৪৭, ১০২৫, ১০৪১, ১০৭১, ১০৩৫,

৪৫১, ১১৬, ২০০, ৪৫৭, ১৫১০, ১৪৪১, ১৫২০, ২০৭, ১৪৪৭, ১০৪৭, ৪৫০, ২০৬, ১০২৫, ২২৬, ১৪২২, ১৪৭, ৪৭, ৩২৬, ১০, ২৫৫, ২০৪, ১০৫৫, ১২০০, ১৪০৭, ১০০, ২০০, ২০৭, ৩২৬, ১৫১০, ১০০০।

দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে একজন হিন্দুবেশী মুসলমান 'দহিবাড়া' ফেরি রুটিতে হিন্দু পল্লীতে যাইতেছে তাহারের হইবড়াতে নাকি বিষ মিশ্রিত থাকিবে স্বতঃবা চেনা লোক ভিন্ন যেন অপরিচিতের নিকট হইতে দহিবাড়া কোথ কিনিবেন না। বাঙ্গালীরা দহিবাড়ার ভক্ত নয়, দহিবাড়ার পুষ্টগোষক হইতেছেন—মারবাড়ীপণ তাহার। একথা বিশ্বাস করেন তো সত্যক হইবেন।

বিড়ি সহজেও এমনি একটা গুজবের কথা বলিয়া সেলেন যে তাহাতে নাকি মৃত্যুর প্রভুতি মিশ্রিত করা হইবে অতএব বিড়িকারীপণ স্বভাবীয় এবং পরিচিত বিড়িওয়ালার নিকট বিড়ি লইবেন। স্বদেশীয় যুগে অনেক পকেটমার বিড়িওয়াল। হইয়া স্বপ্নে ঘর-সংসার করিতেছিল—তাহাদের এইবার বড় মুক্তিলাভ হইবে দেখিতেছি।

এরকম হাঙ্গামার মধ্যেও শ্রেণীর গুজব তো অসম্ভব নয় কারণ এরূপ গুজব রটাইয়া অনেকে কৌতুক উপভোগ করে। বহুকাল পূর্বে পানেন পোকার গুজব রটিয়া পান ব্যবসায়ীদের প্রকৃত কতি হইয়াছিল তাই আজও পর্যন্ত তাহার। পরস্পর ভিন্ন গোছ পানের মূল্য পাঁচ ছয় পয়সা গোছ হিসাবে আদায় করিয়া নিরীহ ক্রেতাদের মুক্ততার প্রতিশোধ দিতেছেন।

স্বভাব্য মলের যদি এখনও হিন্দু মুসলমান প্যাট্টে আধা থাকে—তবে তাহার। প্যাট্টে লুইয়া থাখুন দেশের লোকে আর এই কথা প্যাট্টে লুইবে না—যেন বেথানে এক বিলুও ঐক্য নাই সেখানে চাকরী দিয়া, হিন্দুদের ধর্ম আবার পুষ্ট করিয়া প্যাট্টে রচনা করিবার উদ্দেশ্যে কোন অধিকার নাই। তাহাদের প্যাট্টে কোন হিন্দু বাঙ্গালী আর বাসিন্দে না—যদি তাহার। কোন প্যাট্টে বাঙ্গালীর বলিয়া চালাইতে চান তবে সেই মুহূর্ত্তই তাহার। জাতি

প্রতিনিধিত্ব হারাইবেন। প্রকাণ্ড শত্রু, গুপ্ত শত্রুর চেয়ে অনেক ভাল এবং এই প্যাট্টের আচরণের যে দৃষ্টিত ক্ষত চাকা ছিল আর তাহা স্বভাব্যদের সর্বোচ্চ দুটিটা উগ্রিয়াছে স্বভাব্যদের সাধন।

দ্বিবিচলনের আবু হোসেনের একটা গান আছে।

“রাম বহিম না খুঁজা করেয়ে মিলকী শাচ্চা রাখেজী, হাকী হাকী করত রুহাে দুনিয়াদারী বেখোজী” এই বহিমের দল যখন রামের দলকে জুলাই করিলেন তখন সে অপমানের ক্রতা আর মাথায করিয়া বেড়াইবার মিলন এলেন নাই। মুসলমানের সুহিত সং হিন্দুর মিলন ছিল, এবং আছে সহ্য দাশর্য্য পরও থাকিবে। যাহারা মেকী তাহার। বধ। পড়িয়াছে আর তাহাদের বাঁটা বলিয়া চালাইবার কোন চেষ্টা আজ সফল হইবে না। সেতারা যেন বিদেহ ভরিয়া যখন মিলন বৈঠক ডাকিয়া কথার পেচ বেলেম তখনই বুঝা যায় যে নেতায় নেতায় যে মিলনের বন্দোবস্ত তাহা প্রাণের মিলন নয় তাহা শেখানের শেখানে কোলাহুলি। প্রকৃত মিলন দেখা যাইবে সাহিত্যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে; সেই মিলনই স্বামী মিলন তাহার মধ্যে দাঁড়া হাঙ্গামা নাই।

দাশর্য্য মধ্যে দু'একটা রাজপথ-পরিষ্কারক হতা করা হইয়াছে বলিয়া তাহার। এক ভোট হইয়া কাজ বন্ধ করিয়াছিল। কর্পোরেশন পুলিশের সাহায্য চাহিলে দেশী ফেলের কর্পোরেশন বলিয়া পুলিশ তাহা গ্রাহ্য করে নাই যেহেতু দিন রাষ্ট্রপথ অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে। চৌরশর দিকে বেতপত্রের উত্তান, সেখানে ময়লা গাঙ্গু হইয়াছিল কি না ও হইয়া থাকিলে কি করিয়া হইল আমরা তাহা জানি না তবে সম্ভবতঃ হইয়াছিল নতুন। সাজ সাজ রব পড়িত। কিন্তু উত্তর কলিকাতার ভক্ত পল্লীর ছেলেরাই পথচাট নাক করিয়া বল দেওয়া প্রভৃতি কাজ নিজেদের হাতে করিয়াছে—এ কাজ এতদিন কেবল খেবরের একচেটিয়া ছিল আজ ভ্রমসন্ধানপণ তাহা করিয়া পল্লীগলিকে মড়কের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এজন্য তাহাদিককে আমরা খুবদার দিব না কারণ এটা মহত্ত্বের খুব উচ্চ

আদর্শের পরিচায়ক হইলেও এটা আমাদের ঘরের কাজ হইা কাজ আমাদের কর্তব্য স্বতরাং নিজেদের কর্তব্য করিয়া নিজেরা বাহবা লইতে আমরা পারি না তবে ইহাখারা প্রতিপন্ন হইল যে বাংলার তরুণদের মধ্যে সংহতি আনিয়াছে, জাতি পড়িয়া উঠিয়াছে। দেশবন্ধুর কাব্যকে বাধাধা ধ্বংসমূলক বলিতে লজ্জাবোধ করিভেন না তাহার। আজ দেখুন ও যুগুন আজ বাঙ্গালীর সকল মিক দিয়া জাতীয়তার স্বপ্ন, উদার ও মহৎব্যাক লক্ষণগুলি দেখা যাইতেছে কি না বাঙ্গালী হিন্দু যে একটা জাতি তাহা প্রথম বুঝা গিয়াছিল দেশবন্ধুর মৃত্যুসময়ের শোভা যাত্রার দিন, আর তাহা যে শোকের কণিক প্রকাশ নয় তাহা যে জাতীয়তাবাদী প্রতীক তাহা এই দাশর্য্য কর দিলেই প্রমাণিত হইয়াছে। বাধারা বীর পুত্ৰিয়াই ফল চাহেন—গ্রাহকে বাড়িবার সমস্যাটুকুও দিতে চাহেন না, তাহার। জীবদ্দশায় দেশবন্ধুর মহাত্মা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপদৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার। আজ যুগুন যে জাতি গঠনের কি হুপুট বোজ তিনি নিজের অপমানতা ত্যাগের মধ্য চেষ্টা তরুণ বাঙ্গালীর দ্বয়ে তিনি উপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহার অপূর্ণ ভাগ্য—অভুলনীয় দেশপ্রেমিকতার আদর্শে আজ বাঙালার মহিমায় তরুণ সমাজ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ধন্য বাঙ্গালার তরুণেরা আজ তোমরা সবাই বঙ্গের ও বাঙ্গালীর গৌরব।

জোর গুজব যে ত্রিযুক্ত পূর্ণজ্ঞ লাহিড়ী মহাশয় অপর ত্র্যমুখশাল কমিশনার রূপে শীঘ্রই দেখা দিবেন। ইহা সত্য হইলে সাধারণ যে অতীব সম্ভ্রম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই—সামর্য্যও সুস্থিবে যে এবার যথার্থই স্বজিবার হইল।

এক মুসলমান নেতা হাওড়ায় যাইবার চেষ্টা ছিলেন কি উদ্দেশ্যে তাহা জানি না তবে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া বামুনগাছি, টিঙালবাগান, গিলনাগা, পঞ্চাননতলা, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক নিরক্ষর মুসলমান বাস করে, তাহার। সহজই উত্তেজিত হইতে পারে এই আশঙ্কায়



হাওড়ার কর্তৃপক্ষিণ ম্যাগিষ্ট্রেট নাকি তাঁহাকে সেখানে ঘাইতে দেন নাই—ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ হাওড়ায় দাঙ্গা বাধিলে তাহা ধামান সম্ভব হইত কিনা তাহা বলা যায় না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইলে নিরীহ লোক দিগের যেমন বিপদ পুলিশের বিপদও বড় কম নয়। পুলিশ গুলি চালাইলে যদি হিন্দু মরে তো হিন্দু কাগজগুলি বাকি-বেশ পুলিশ মুসলমানের পক্ষ লইয়া হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতেছে আর মুসলমান মরিলে মুসলমান কাগজগুলি বাকিবেশ হিন্দু পুলিশ সাম্প্রদায়িক ভাবে বিধিত হইয়া মুসলমানদিগকে পীড়ন করিতেছে। নিরীহ ব্যক্তি দিগেরও হিন্দু হইলে মুসলমান পাড়ার ঘাইলে মার ঘাইতে বা মরিতে হইবে আর মুসলমান হইলে হিন্দু পাড়ার ঘাইলেও ফল সেই এক। তারপর কোন স্থানে দাঙ্গা

হইয়া গেলে দাঙ্গাকারিগণ সরিয়া পড়ে ও নিরীহ হিন্দু বা মুসলমান দর্শকেরা বা পথিকেরাই পুলিশের হস্তে ধরা পড়ে কারণ অতুহল হইতে আসামী রেষায় পুলিশের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ফলে নিরীহ পথচারীগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান এখন মারিচের অবস্থায় পড়িয়াছেন। রায়ে মারিবে নম্রক রাবণে মারিবে।

মংখের আলি সাহেব ও সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অতীত নহেন। স্পষ্টত তিনি এক সংবাদ পত্রের প্রতিনিবির নিকট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, না জানা থাকিলে তাহা পাঠ করিলে মনে হইত যে এ যেন রহিম সপ্তদায়ের উক্তি—তবে রহিমীদল বুঝেকাশীর পক্ষে, আর বিলাফতীদল বুঝেকাশীর বিপক্ষে। হুতরাং দেখা ঘাইতেছে যে মিষ্ট তেঁতুল অঙ্গুরন না হইলেও খুব কমই দেখা যায়।

## ব্রাহ্মণ

দোহানী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী

অন্ধ যুগের ধর্মগুরি পতি নিখিল জ্ঞানের শিখ,  
ব্রাহ্মণ ওগো এ হিন্দুর প্রাণ কল্যাণ বাণী চিকিৎসা।  
অন্ধকারের মহাবল তুমি ধরায় ছিলে ইন্দ্রজিৎ,  
বেশের বার্তা-জ্ঞানের সাগর, আমলে তুমি ত্যক্ত জীত।  
ঐশী জ্ঞানের পূজারী তুমি, তপোবনের পাবন মন,  
ঈশ্বার ধারা অন্ধবুদ্ধের অন্ধ তারণ আনন ধন।  
সংসার-ত্যাগ মিলন-মন্ত্রে জাগালে কত বিপদ যাত্রী  
হরিষে নিলে প্রাণের ব্যথা আর্ন্ত পাপীর গভীর রাত্রি।

সামের গানে ভুলে ধরা, আনলে কত পীড়ন ধার  
পবিত্রতার শোভন গেছে শোভন-মণি আলোক ধার।  
মহার কায়া ছাড়ার মায় সব যে ভোমার সব তাম্র  
সামনা ভব দেশের সেবা সেবার মতি বিশ্বজন।  
পরম পাতা পরমালাকে করলে তুমি বিমল মন  
ঘুচিয়া হিয়া ভুলে তুমি ধন্য-করা-গমন-বন।  
আজিও তব গুণগরিমা ধরায় মাঝে বোধন গান  
প্রমোদ লহ মক আশ্বাস; তুমি গো হিন্দুর ব্যথার দান।



বিতীয় বর্ষ]

২৫শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩০, ইং ৮ই মে ১৯২৬

[ ৩৮শ সংখ্যা

## অভয়াশ্রম

শ্রীব্রহ্মনাথ ঠাকুর

আমার যে কথা মনে এসেছে তা বস্তুতে হবে কিন্তু পাছে সেটা উপদেশের মত শুনে হই মনে সেই আশঙ্কা আছে। বাইরে থেকে ঘটানোবন্ধের জন্তে উপদেশ দিয়ে বিশেষ কিছু বল হয় বলে আমি মনে করি।  
ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছেন যে তাঁর স্বাভাবিকী জান বল জিজ্ঞাসা—তাঁর যে জিজ্ঞাসা জানকিয়া, বলজিজ্ঞাসা, তা স্বাভাবিক। তেমনি বিস্তৃত বর্ণনা যিনি তিনি আপনার প্রকৃতিগত প্রবর্তনা থেকেই কাজ করেন। এইজন্তে নিজের কর্তব্য তাঁর আনন্দ আছে অহঙ্কার নেই। অহঙ্কারের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেকে নিজে ঘৃণা দিই, বাহ্য ফল লাভও ঘৃণা। ঈশ্বর কাজ স্বাভাবিকী শক্তিই প্রকাশ, অস্তরের বাহিরে তাঁর কোনো ঘৃণার প্রয়োজন নেই। ঘৃণার তাগিদে যে কাজ চলে তাতে বিকার ঘটে তাই বাধ্য।  
কর্মের পূর্ণতা ও বিস্তৃততাকে যিনি নিজের প্রতিপত্তির চেয়ে বড় বলে জানেন তিনি এই বিকার সঙ্করতে পারেন না। পরের হিত করছি এই কল্পনায় আমরা যখন কাজ করি তখন সেই কাজের মাঝখানে অহং এসে পড়ে, কর্তব্যে আঘাত করে, যা বিষয় কর্ম নয়, বা বিষয়ক অহমিকা তার প্রকৃত পরিবর্তন করে দেয়, সত্যের স্বাক্ষর

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মতাপ্রিয় লোক ব্যক্তিগত নিজেদেরই বড় করে দেখাতে চায়। তখন সে নিজের কর্তব্যের বিরোধীকে সত্যের বিরোধী মতই দণ্ড দিতে চায়। তখন সে আপন সংগ্রামের অস্তিত্ব করবার চেষ্টা করে এবং যেখানে তার বাধা ঘটে সেখানে সংযোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মত ব্যবহার করে। এমন অবস্থায় ভাল কর্তব্যও সত্যকে পীড়া দেয়। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই নিজের ভার। আমরা যখন কর্তব্য অহমিকা ধাংগা ভারাক্রান্ত করি তখনই যত বিরোধ যত বাধা।

পাছের প্রাণশক্তি পল্লবে ফুলে ফলে আপনার প্রাচুর্য আপনার আনন্দে আশুপ্রকাশ করে। সেইজন্তে এই সৃষ্টির মধ্যে কেবল সৌন্দর্যের নয় কল্যাণেরও আবির্ভাব। ফল ফুলের মধ্যে স্বাভাবিকতার ধারা বিশ্বের কাছে আশু-নিবেশন। তেমনি আমাদের কর্তব্যও যেন প্রাণের পূর্ণতা নিজের অষ্টভুক্ত আনন্দে প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশেই বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটে, তখন আমরা সৃষ্টির উৎসাহে কর্ম করি, প্রেমের প্রাচুর্যে আশুপ্রকাশ করি। দয়া করে পরের উপকার করছি কিনা সে কথা তখন



ছোট হয়ে যায়, আড়ালে পড়ে। সাধারণতঃ আমরা শিক্ষাজগতের চেষ্টায়, কণ্ঠের বাহ্যিক বাধা বিপত্তি দূর করবার জন্তেই প্রয়াস পেয়ে থাকি। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর সাধনা নিজেদের অন্তরের বাধাকে দূর করা, কণ্ঠের কেমনস্বল নিজেদেরই আসন পেতে দেবার যে প্রবৃত্তি তাকে তুলতে পারে। বড় কাজের কর্মী যিনি তিনি আপনায় চেয়ে আবার কণ্ঠকেই বড় করেন। আত্মা যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখন সে যিহাদ্ব্যাকে প্রকাশ করে; প্রাণী যেমন বিশ্বের প্রোত্যিকেকে প্রকাশ করে, নিজেকে নয়, নিজের বৃত্তল সঞ্চয়কে নয়।

আমরা অনেক সময় যখন ইচ্ছা করি না তখনো অগোচরে আমাদের অস্বহিকা সকল উনৈতে নিজেদের প্রধান ভাগ বসায়, সত্যের নামে নিজেদের নামটা চালিয়ে দিতে চায়।

চুপের ভিতরকার কীটের মত এই প্রচ্ছন্ন অস্বহিকা সকল বড় কাজের প্রাণ কয়কর। কণ্ঠকে বাহ্যিকস্তির উপায় বলে না মনে করে যদি তাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ বলে জানি তবেই এই ত্রিষ্টুটাকে দূর করবার জ্ঞাত আমাদের চেষ্টা হয়, নইলে মিছেই একে প্রস্তর বিই। আমাদের এই কামনা এই সাধনা হোক, যে বিস্তৃত আনন্দ দ্বারা আমরা আত্মাকে মুক্ত করব। সেই কণ্ঠ স্বভাবতই সকলের কণ্ঠ করা হবে। দেশ যেখানে আত্মাকে প্রকাশ করতে পারছে না সেখানেই সে বন্দী। যারা নিজেদের আত্মাকে মুক্তি দিয়েছেন তাঁরাই দেশকে মুক্তি দিতে পারেন। বাহিরে সিদ্ধি না পেলেও যিনি অন্তরের মধ্যে মুক্তিকে পেয়েছেন তিনি সেই আনন্দে কণ্ঠকে হুপ্রতিষ্ঠ করেন। তিনি যেকোন আপাত প্রতীয়মান সিদ্ধি আসল সিদ্ধি নয়। সত্য সাধনার মধ্যেই সিদ্ধি নিহিত আছে। অনেক সময় বাহির থেকে তা দেখা যায় না। অনেক সময় বাহ্যত তা পরাও হতে পারে। বীজ মাটির মধ্যে দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা হয় ত মনে করি তার ধ্বংস হল, কিন্তু বৃষ্টি গেলেই সে অস্বস্তিত হয়। আমি পদার্থটী নদর বিধায় না পেলে বুঝী হয় না। কিন্তু আত্মা আপনায় সত্যে আপনি আনন্দিত। সত্যকে উপলব্ধি করেছি, নিজের মধ্যে অস্বতকে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এক হাজার

লোক আমার দলে আছে, এমন কোন বাহিরের প্রমাণের তার প্রয়োজন নেই। কণ্ঠের মধ্যেও আত্মার সাধনা করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে বলাতে হবে এই নামরূপওহালা যে আমি এ সত্য নয়। আপনাকে এর থেকে তড়াণ করে দেখতে হবে—যেমন জগতের সব জিনিষকে বাইরে দেখছি। আমি পদার্থ বহির্বাধ্যায়ের অঙ্গ, বস্তুদের মত উৎপন্ন হয়ে আবার লীন হয়। আত্মার মধ্যে চিরজ্যোতিষ্মদ আনন্দরূপকে অত্যন্ত নিকট করে জানতে হবে। তা হলেই আমি আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়—যেমন করে সূর্যের আলোকে অন্ধকার যায়। আত্মাকে ধারা দেখেছেন সেই স্মিরা বলছেন—আত্ম পরকা গতিঃ—ইনিই ইহার পরমা গতি। ইনি আর এই; আত্মায় পরমাশ্রায় তেই কাছাকাছি। পরমাশ্রায় সবে এমনতর সম্বন্ধকে অছড়র করলে সব সহজ হয়ে ওঠে। ইনি আর এই—এর সহজ তাঁদের ভালো করে বোঝা দরকার ধারা বিশ্বকর্ম করবেন। বিশ্বকর্মে ধারা নিম্নর ভাষা এই ইনিকে বাদ দিয়ে বসেন।

বিশ্বকর্মের ত্রী ধারা তাঁদের এই কথা বলতে হবে য আত্মা বলদ, আত্মাদানেই ধার সৃষ্টি, যিনি বলদ, আত্মাদানেই ধার বল, আমার কণ্ঠে তাঁকেই উপলব্ধি করি। এই বলে আত্মাকে পরমাশ্রায় মধ্যে জাগ্রত রাখলে কণ্ঠ করা সহজ হবে।

ভারতবর্ষের একটা স্বভাবসিদ্ধ শক্তি আছে যার দ্বারা সমস্ত কাজকে সমাজের সহজ প্রাণজিয়ার অঙ্গ করে তুলতে সে পারে। তার শিক্ষাদীক্ষা আয়োগ প্রমোহ প্রভৃতি সম্বন্ধে এই রকম সহজ। শাস্তিনিকেরজন থেকে কিছু দূরে কেঁদুলীতে বছর বছর জয়দেবের মেলা হয়। কবিকে স্বরণ করার এমন জহজ উপায় আর কোনো দেশে নেই। আবার কোন মহৎ লোক মরলে তাঁকে কি করে স্মৃতিপথে রাখা যায় এইজন্ত বক্তৃতা করি, টাধা তুলি। এসব আমরা পৃথিব্যের কাছে শিখেছি। আমাদের দেশের যে প্রণ লী তাতে প্রেসিডেন্ট নেই, সেক্রেটারী নেই, মনতাগার নেই। বঙ্গসরের পর বঙ্গর লক্ষ লক্ষ লোক এসে তাঁকে স্বরণ করছে, গান করছে, আনন্দ করছে। এই যে বৃহৎ আকারে লোক শিক্ষা এটা সমাজ

নুর্যের স্বাভাবিক জিহা। এতে দুল নেই, রূপ নেই, বর্ণ হয় নেই। এই শিক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী লোক মনকে যেমন উল্লস করেছে, তেমন শিক্ষা আর কোন দেশে নেই। পাকিস্তান দেশে শিক্ষাকে অশিক্ষিতে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ। ওদের slavesএর লোক একেবারে প্রকাণ্ড প্রভূতি। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের মধ্যেও একটা শিক্ষার ধারা বর্ণন হয়েছে; তাতে তাদের চিত্তকে সফল, কোমল, সরস করেছে। আমাদের দেশের চাষীরা সারাদিন চাষ করে ঘরে ফিরে এসে রাত ১১টা পর্যন্ত আভিয়ার কীর্তন করছে এ আমি দেখেছি। অস্ত্রদেশে মুক্তিকে তোলে। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের উপর যে শিক্ষার ধারা বর্ণন হয়েছে তাতে সহজেই তারা কণ্ঠের রানি থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারে। আমাদের দেশে যে নিরক্ষর সেও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। চাষীকেও যদি তত্ত্বব্যা বলি তবে সে বৈদ্যের সঙ্গে শোনে। আমি এক জায়গায় গেয়েছি চাষীরা রাতত্বপুর পর্যন্ত যোগিস্থানের পালা বসে বসে শুনে। তার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা সাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। মুসলমান চাষী প্রজাণও

রাত ত্বপুর পর্যন্ত সেই গান শুনে। এই বৈধী, ভালো জিনিষ পাবার জন্তে এই রকম মনকে প্রস্তুত করা,—এ সহজ নয়। অস্ত্র দেশে সাধারণ লোকের কাছে এই সব কথা বলতে গেলে লাঠিমেয়ে তাকিয়ে দেবে। সমস্ত সমাজের স্বাভাবিক প্রাণজিহা ধারা আমাদের দেশে এই শিক্ষা সহজ হয়েছিল।

যেমন সহজ বঙ্গর ঘরে এই শক্তি স্বাভাবিক প্রাণের জিহা ধারা গ্রামে অস্ত্র, বিদ্যা, ধর্ম দিয়েছে তেমনই আজও করত। সেই পদ্ধতিকে বাধ্যমুক্ত করে তাতে প্রাণসংকার করতে হবে। আমাদের দেশে যাত্রা গান একটা স্বাভাবিক আনন্দের উপায়। যুরোপে সবই গুচ্ছভার; Theatre, stage, piano এসব ভারি জিনিষ, যেখানে সেখানে নিয়ে ঘুরে বেড়ান যায় না। আমাদের সারেকী একতারা একেবারে লোকের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এই ভারহীন আত্মপ্রকাশকে প্রাণবান করে তুলতে হবে, আজকের এই সর্বপ্রধান কর্ম। দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তার স্বাভাবিক আকারে বর্তমানের কণ্ঠকে নুতন প্রাণে জাগ্রত করে তুলতে হবে এই কথা বলে আজকে আপনাদের নিকট হতে বিশাল গ্রহণ করি।

## “আকাজ্জা”

শ্রীবিমলা দেবী

সমসারের শত দষ্ট শূন্য কোলাহল  
সহস্র বেদনা ভরা অস্তির চঞ্চল  
ব্যস্ততা হইতে মোরে লয়ে যাও ঘুরে  
গগো বহু হুহে পথিক দূর বনান্তরে  
যেথা মোরে চিনিবে না কেহ, যেথা মোরে দেখি  
বিস্মিত-কৌতুক ভরা, প্রাণ ভরা আঁধি  
চায়ে না আমার মূখে। হে বন্ধ আমার  
সর্ব হেঁথে তানি ধাও যত অঙ্গকার  
আনন্দে আঘর, ঘুরে দূর অন্তরালে  
লয়ে যাও আজি বন্ধ তোমার অঙ্কলে  
সর্বকাল তাকিয়া দাও আনন্দে আঘর  
ওগো বন্ধ মোরে যাও লয়ে যাও মোরে।

সকীহীন, গৃহহীন, নামহীন ধারা  
অভিধি এ বিশ্ব মাঝে, দীন গৃহহারা  
ভাষাদের সাধী করি, তাহাদের মাঝে  
মুক্তি দাও মোরে বন্ধ, মোর ভান হাতে  
যেহা দাও তোমার ও আশীর্ষের সাধী  
দাও মোর সর্ব দেহ অঙ্গকারে ঢাকি  
হে বন্ধ হে প্রিয় মোর, তপু কণ্ঠ জর  
তোমার সখীত দাও আনন্দে আঘর।  
নয়নে আঘিরে যবে সন্ধ্যার আঁধার  
পোখুলির শুভ লগ্নে জীবন আমার  
নামহীন গৃহহীন সে পুশ শস  
যেন করে যার ধীরে ওগো প্রিয়তম।



আজকাল স্ত্রী-শিক্ষার কথা ভাবিয়া অনেকেরই নাসিকা ফুটিত করিয়া বসিয়া থাকেন—“বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের এই লেখাপড়া শিখিবার কি প্রয়োজন—তাহারায় আর চাকুরী পড়িতে পারিব না।” ছুৎবে বিষয় এই যে, শিক্ষার সহিত যে চাকুরীর কোন সম্বন্ধ নাই একথা অনেকেরই হৃদয়স্থল করিতে পারেন না। লেখাপড়া শিখিলেই যে চাকুরী করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই, বিভাগিকার প্রধানতম উদ্দেশ্য জান লাভ করা। শিক্ষা বলিতে শুধু বিভাগিকার পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বুঝায় না, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষা বলিতে অনেক বিষয় শিক্ষা বুঝায়।

বাঙ্গালী মেয়েরা হুঁই ও অন্তঃপুরেরই জীবন অভিবাহিত করিয়া থাকে তবু পাইয়াই জীবনে তাহাদের অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়, স্বতন্ত্র তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করিতে না পারিলে অভিজ্ঞতারূপ ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। বাঙ্গালী পুংস্বর মেয়েদের অবশ্য উচ্চ শিক্ষা-লাভের তেমন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তা বসিয়া নিরক্ষর হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের দেশের মেয়েরা গৃহকার্যে প্রায় সকলেই হুঁনিগণ, কিন্তু লিখিতে বা পড়িতে পারে এমন মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। স্ত্রী-শিক্ষার বাহারা বিরোধী তাহাদের জুই মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন না।

সাধারণতঃ অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারেই দেখিতে পাওয়া যায় মেয়েরা অতি কষ্টে কোন প্রকার একধানী চিঠি যদিও লিখিতে পারে কিন্তু তাহার টিকানা লিখাইবার জন্ত তাহাদিগকে অপরের তোষামোদ করিতে হয়। সেই প্রকার ইংরেজীতে টিকানা লেখা একধানী জ্ঞান আসিলেও তাহা পড়াইবার জন্ত অপরের শরণাপন্ন হইতে হয়। সামান্য লেখাপড়া শিখিলেই এ কাণ্ড মেয়েরা সহজেই সম্পন্ন করিতে পারে। অভিবাহকদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ।

লেখাপড়া না জানিলে মেয়েদের বিবাহ দেওয়াও

আজকাল বড় সহজ নয়। বর্তমানে কেহ মেয়ে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে প্রথমতই মেয়েটা লেখাপড়া কতদূর জানে এই বিষয় অগ্রসংস্থান করা হয়। লেখাপড়া জানা হুঁশিকিত হইলে মেয়েদের বিবাহ দিতেও অনেক সময়ে ততটা বেগ পাইতে হয় না, মেয়ের পিতাকেও বরপণ সংগ্রহ করিতে সর্বস্বান্ত হইতে হয় না। লেখাপড়া জানা মেয়ে পাইলে অনেক বিনা পণেও বিবাহ করিতে সন্মত হয় এরূপ দূরত্ব বিরল নহে।

স্কুল কলেজে না গিয়াও মেয়েরা মোটামোটা ধরনের লেখাপড়া গৃহে বসিয়া শিক্ষা করিতে পারে। সাধারণ গৃহস্থদের মেয়েদের আর কিছু হাউক অন্ততঃ বিতম ভাষায় চিঠি পত্র লেখা এবং ইংরেজীতে চিঠি লিখিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু ইংরেজীতে নাম টিকানাটা লিখিতে ও পড়িতে জানা একান্ত আবশ্যক। হাত পা চক্ৰ কর্তৃক থাকিতেও নিজের চিঠি পত্র অপরের সাহায্যে লিখাইতে ও পড়াইতে হইবে ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

বাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়েদের পক্ষে এম, এ, বি, এ, পাশ করিয়া সভ্য-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া বা চাকুরী করিতে যাওয়া সেভা পায় না, কিন্তু তাহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিয়াই জগতের সংসার জানিতে দেওয়া যাতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। লিখিতে পড়িতে পারিলে গৃহস্থ বৃদ্ধাও অন্তঃপুরে থাকিয়াই সংসারপত্র, সাময়িকপত্র ও প্রাথমিক পাঠ করিতে পারে, ইহা হারা তাহাদের মান মর্যাদার কিছু মাত্র হানি হয় না, বরং জুনিয়ার সংসার জানিয়া স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারে।

আজকাল এদেশীয় মেয়েদের শিক্ষা একমাত্র চিঠি লেখাই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কোন প্রকারে অসংখ্য তুল করিয়া একধানী চিঠি লিখিতে পারিলেই তাহার মেয়েদের শিক্ষা সমাপন হইল মনে করে। সকলে আবার চিঠিও লিখিতে পারে না; চিঠিত দূরে

কথা স্বীয় নাম পর্যন্ত নয়। আমরা স্বতঃকৈ দেখিয়াছি কোন কোন পরিবারে বরপণ মেয়ে দেখিতে আসিয়া মেয়েকে নাম লিখিতা আনিতে বলিলে মেয়ের ভগিনী বা অপার আত্মীয় কেহ নাম লিখিয়া মেয়ের লেখা বলিয়া পরিচয় দিতেও বিমুখ্যাজ বিধা বোধ করে না।

স্ত্রী-শিক্ষা বলিতে কেবল লেখাপড়া শিখাইলেই চলে না, গৃহকর্মগুলিও স্ত্রী-শিক্ষারই অন্তর্গত। রান্না-করা, শিশুপালন, সূচীশিল্প, সাংসারিক হিসাব রাখা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে যাহা মেয়েদের অবশ্য শিক্ষনীয়। এই সকল শিক্ষার সঙ্গে লেখাপড়ার খুব নিকট সম্পর্ক। মেয়েরা বই পড়িতে পারিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকা পাই পারি। শিশু-সন্তানদিগকে পালন করিতে পারে; শিশুদের শিক্ষারও সুযোগ ঘটে। সংবাদপত্র পাঠ করিয়া দেশের হাবভাব বুঝিতে পারে, শিল্প বিষয় শিক্ষার যে কত সুবিধা হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতে না পারিলে তাহাদের অস্বাভিকিত কৃষ্ণাচার ও অজ্ঞতা কখনও দূর হইতে পারে না।

আজকাল অনেকেরই স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন; ইহা স্বতঃকৈ কথা সম্বন্ধ নাই, কিন্তু অনেকস্থলেই আবার তাহাদের শিক্ষা কার্যকরী হইতেছে না। যে শ্রীকাম মেয়েদিগকে ‘বাবু’ করিয়া তুলে সে শিক্ষার চেয়ে পাঠানাদেশের মত অজ্ঞা থাকি তত্তপ্তে প্রেরণ। অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় মেয়েদের বিবাহের সময় তাহাদের আত্মীয়-স্বজনগণ দানপাত্রাদির সঙ্গে মেয়েদিগকে আধুনিক উপকরণ গ্রন্থ উপহার দিয়া থাকেন। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই মেয়েরা প্রচলিত উপকরণ সকল পড়িতে আরম্ভ করে। অথচ মেয়েদের উপযোগী একধানী গ্রন্থও পাঠ করে না, ফলে উপকরণ হইতে শুধু কেবল পাশ্চাত্য আদর্শ অহুকণ করিবার সুযোগ পায়; ইহাতে মেয়েদের হৃদয়ে বিলাসিতা ও বাগ্মণির বীজ উপ হওয়া স্বাভাবিক। এই শ্রেণীর

শিক্ষিতা (?) মেয়েদের দ্বারা বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের স্বত্বের আশা করা যুগ। ইহারা যে গৃহকার্যে অমনোযোগী হইয়া সর্বদা বিলাসিতার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিবে তাহাতে আর বিচিৎ কি। মেয়েদিগকে সর্বগণ-সম্পন্ন, প্রকৃত শিক্ষিতা করিতে হইলে অভিবাহকদের বিশেষ যত্ন দেওয়া প্রয়োজন। মেয়েদিগকে উপকরণ পাঠ করিতে না দিয়া “পারিবারিক প্রবন্ধ” “গৃহশ্রী” স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা পাই পাঠ করিতে দেওয়া উচিত। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিও মেয়েদের পাঠ করা কর্তব্য। মেয়েদের পক্ষে উপকরণ পড়িয়া কিছু জ্ঞান জন্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। আধুনিক অল্প লেখাপড়া জানা মেয়েরাও সর্বদাই উপকরণ পাঠ করিয়া থাকে। আজকাল বিবাহের দানসামগ্রী বা যৌতুকর মধ্যে প্রধান জিনিস উপকরণ। সংগ্রহ পাঠ করিয়া স্ব-আদর্শ গ্রন্থ করিলে মেয়েদের শিক্ষার দেখ দেওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা প্রথমভাগ শেষ করিয়াই উপকরণ-লইয়া ইচ্ছা চোরেই নিম্ন যাপন করে আর বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া তুচ্ছ করে এবং সাংসারিক কার্যাদি অবহেলা করিয়া শিক্ষার পৌরষ করে তাহাদের সে শিক্ষা নিতান্ত দুর্দনীত। এইপ্রকার শিক্ষিতা মেয়েদিগকে দেখিয়াই অধুনা অনেকে স্ত্রী-শিক্ষা পছন্দ করেন না। কিন্তু যত্নসহকারে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলে তাহার স্কল অতি হকল হয়।

মোটের উপর স্ত্রীলোকের বিভাগ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদিগকে হুঁশিকা দিতে হইলে অভিবাহকদের মনোযোগী হওয়া দরকার, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্ত পিতামাতাই দায়ী। আধুনিক সভ্যতার নবযুগে মেয়েদের বিভাগশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা এখনও বাহারা বুঝিতে পারেন নাই, তাহার ভবিষ্যতে ইহার উপকারীতা বুঝিতে পারিয়া অশ্রুত হইবেন সন্দেহ নাই।



## গ্রীষ্ম ও বর্ষা

ত্রিযুগলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাণ্ডিছে মেদিনী,

প্রলয় বিধান বাজে গরজে সাগর,  
গ্রীষ্ম বরষার আঁধি বাধিবে সমর,  
সাজিছে দুজ্জয় অনির্কিনী।

শুক চরাচর—

ভৈরব নিবায় সৈন্ত সূর্য্য সেনাপতি  
প্রস্তুত পবন-খরি' ভীষণ মুরতি,  
আজ্ঞামাত্র হবে অগ্রসর।

পরি রণশাল,

জলেশ বিশাল বক: প্রশান্ত উদার  
বশিল চরণ আসি বরষা বাজার  
করে পেতে ইন্দ্রবন্ত বাজ।

চলিল বাহিনী

জলবে ডাকিয়া কহে জলধি গর্জন  
বরণ অকণ আঁধি, 'বিশ যেন রণে  
তনে—গ্রীষ্ম বিজয় কাহিনী'।

বাধিল সমর

বিস্তৃত সে রণাঙ্গণ অনন্ত গগন,  
হুকারে নীরদ ঘোর মন্ত প্রভঞ্জন,  
শব্দাহুল শূন্য চরাচর।

চমকে মেদিনী

নিনায়ে অশনি তনি উপজে তারা  
টলিল বাতুকাঁ ঘন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস  
দিগন্তনা নাচে উদ্ভারিনী।

বরণ ভাস্কর

প্রতিদ্বন্দ্বী সমকক্ষ মহা শক্তিমান  
দুঃখদ দুঃখীর পোহে শমন সমান  
শরাসন অনল নিষ্কার।

নাহি চিন্তা আর

ক্লক রবি ক্লক পথ মেঘ জালে বন্দী  
অনিল বিপক্ষে ভজে, গ্রীষ্ম যাচে সূচি  
উঠে রব, 'জয় বরষার'।

অবসান রণ

স্বভাব হৃদয়ী হাঙ্গে, বহে সমীরণ,  
নিদ্রায় মলিন মুখে করে পলায়ন  
কণতরে শূন্য সিংহাসন।

আদিল বরষা

ছত্রধরে নীলাধরে তুবন ভরসা  
উটিল মল্ল গান হৃদয় দরশা  
বহুধরা শামলা সরসা।

সব সাধ যদি মিটিত ধরায়—



সংসারে বিরক্তি এল ভাবিহ মনেতে,  
চলিল এবার হস্তে ধর্মের পথেতে

সব তাজি হুহু, খামী তেংচেতানন্দ  
ভক্ত, ভক্তিমতী খেরে করয়ে আনন্দ।





## মহাপুরুষের ক্রোধশূন্য জীবন

ক্রোধবোধ বিধ্বাস এম-এ

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসাদি প্রভৃতি যড় ত্রিপুর মধ্যে কোষেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; এবং ইহা যাত্রা জগতের যেরূপ অন্তি সাধিত হইয়াছে সেদূর বোধ হয় অপরগুলি যাত্রা হয় নাই।

আমরা সচরাচর বেহিতে পাই মাংসমাজেই আত্মিক ক্রোধের বশবর্তী। অন্তরীক্ষা অবোধ শিশুর মধ্যেও আমরা ইহার বিকাশ দেখিতে পাই। ইহা মানবজাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি। প্রাণী প্রিয়তম প্রাণনিরী উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন, জী প্রিয়তম স্বামীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন, সন্তানবৎসলা জননী মেহের পুত্রলী পুত্রক্কার উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন, পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের উপর, গৃহিত-বৎসল পুত্র পিতার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, গুরু শিষ্যের উপর শিষ্য গুরুর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এইরূপ ক্রোধ সামান্যতঃ অক্ষমধুর; দৈনন্দিন জীবনেই ইহার প্রসার ও ভ্রাস, উৎপত্তি ও নিবৃত্তি, গর্জন ও বর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে আবার এই রিপুই বোল কলার পূর্ব হইয়া প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে; তখন তাহা ভীত অস্বপ্নপূর্ব, কেবলই তাহার গর্জন ও ক্রন্দনই তাহার প্রসার। তখন মানব ব্যতীয়া বিহীন বীচিমানার ভাষ উন্নত, মধ্যস্থ মার্গও বৎ প্রচণ্ড ও রক্তিমভা। এই কারণে অধ্যাত্মবাদীরা বলেন ক্রোধের বর্ষ লোহিত।

পৃথিবীর যে সমস্ত অতীত ভয়ঙ্কর ঘটনা আত্মিক মধ্যে মধ্যে আমাদের দৃষ্টির নিভৃত কন্দরে মধ্ববন্দনার যুগ্ম স্পন্দন জাগাইয়া তোলে; ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা ও নগরীর ধ্বংসাত্মক যাহাদের সত্যতা সহজেই আত্মিক মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে সে সমস্তের অধিকাংশই এই ক্রোধ রিপু সন্নাহ। পুরোহিত্যকারী জননীর দ্বন্দ্বভেদী আর্জনা, পতিহীনা রমণীর স্বর্গবিহারক শোকার্ক, বিধ-

ব্যাপী হাফাকার ও মধ্ববন্দনের দৃষ্টাগত যুরোপের মহা-বিপ্লবও এক ছবিগত ক্রোধ সন্নাহ। প্রিন্সেপ নামক সার্ভিসার দ্বারা কর্তৃক অস্ত্রাঘাতের যুরাক আর্চডিউক ফ্রাঙ্ক কার্ভিভাও ও তাহার পত্নীর হত্যাকাণ্ডই এই মহাবিপ্লবের প্রধান কারণ। দুর্ঘোষনের ক্রোধে হুকবংশ ও হুককেন্স ধ্বংস হইয়াছিল। ক্রোধ এরূপ প্রবল রিপু যে, ইহা দ্বারা অস্ত্র রিপুকে আংশিক ভাবে দমন করা যায়। ইহার উল্লেখ স্বরূপ আমাদের পুরাণের মননভয় বিবৃত করা বাইতে পারে। বট-বিষকরাক-হরিতকী শোভিত পুত-স্ববদনী-বিশ্বোত্ত চিরতুয়ার মত্তিত হিমালয়ের অশ্ব মহা-যোগী ধূম্রকীর নিকটে বধন কিশোরী উমা পুশ্যভরণে স্থজ্জিতা ইহা ধীরে ধীরে উগনীভা হইলেন তখন গিরি-চূড়ার অন্তরালে মরকতেন পশুপাশের মহাযোগীর ধ্বনে ব্যাঘাত ঘটাইতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু অনঙ্গের চেষ্টা অসফল হইতে পারিলেন এবং কোণারি প্রকাশে সেই মননকে ভয়ানক করিয়া ফেলিলেন। ইহাতেই বিব্রিতে পড়া যায় যে ক্রোধের নিকট কাম আংশিক ভাবে বশ। রামায়ণ ও মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে আমরা অবগত হই যে পুরাকালের মূনিস্ববি যেমন দুর্ভাসা, অষ্টাবক, নারদ প্রভৃতির মধ্যেও ক্রোধ রিপু বোল কলার বিরাজ করিত। তাহারই সামান্য কারণে লোকের সর্বনাশ করিতেন। তাহারই সাধারণতঃ অস্ত্র রিপুগুলিকে দমন করিতেন কিন্তু এই ক্রোধ রিপু নিকট বশতা নীকার করিতেন। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয় ক্রোধ রিপুকে পরাভব করা কঠিন। কিন্তু তাই বহিঃ। ক্রোধশূন্য জীবন ইহজগতে একেবারে বিলম্বও নহে। নিয়ে কতগুলি মহাপুরুষের নাম করিব যাহারা দুর্জয় কোষরিপুকে দমন করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশীয় হুথিয়াত পানিক পণ্ডিত (Socrates) সকেটীস্ একরূপ শরীরস্থ রিপু-

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা]

মহাপুরুষের ক্রোধশূন্য জীবন

১২৬৫

গুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। কোষ ক্রোধকে বশে, তাহা তিনি জানিতেন না। পরন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাহার সহধর্মীণী জ্যান্টিপী (Xantippe) তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি সর্বদাই রাগিয়া থাকিতেন, এবং স্বামীকে অহম্মিশ নিদারুণ কটুক্রিয়া জ্ঞাত করিতেন। তাণ্ডিগ কিন্তু তিনি পত্নীর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কথিত আছে যে, একদিন সকেটীস্ জীব বাসাবাস আর হ্রদ করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অস্বাহ্যিত লাভের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঘরের বহির্ভাগে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। প্রিয়বৎসা জ্যান্টিপী ইহাতে অধিকতর কোপাবিষ্টা হইয়া ভ্রমণের গৃহের উপরিতলে উঠিলেন এবং ক্রোধেতে এক ধামলা মগলা জল দ্বিতল হইতে স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। অপহরণের বিষয় এই, তাহাতেও সকেটীস্য়ের চিরবিব্রিত উপস্থিত হইল না। তিনি শ্রিতবন্দনে যেমন এই কথাটা বলিলেন,—‘এত গুরুপত্নীর মেঘ-গর্জনে পর এক পশলা বৃষ্টি না হইলে শোভা পাইবে কেন?’

হুথিয়াত বৈজ্ঞানিক সার আইজ্যাক নিউটন তাহার কোষশূন্য জীবনের জড় বিখ্যাত ছিলেন। নিউটনের ‘ভায়মণ্ড’ নামে একটি অস্ত্রান্ত গ্রন্থ রচিত ছিল। কথিত আছে একদিন সন্ধ্যার সময় নিউটন লিখিতে লিখিতে বার্ষিকপত্র পাঠ্যে ঘরে গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কিরিয়া আর্গিরা দেখিলেন যে, তাহার বহিরের গরিক্রমের ফল, সমগ্র প্রায় লিপিকল্পের উপর ‘ভায়মণ্ড’ নামক প্রাণী ফেলিয়া দিয়া সেইগুলিকে ভ্রমাবশেষে গণিত করিয়াছে। নিউটনও সে সময় রুদ্ধ হইয়াছিলেন যিনি যে পুনরাব নেতুলিকে লিখিয়া উঠিতে পারিতেন এমন কোন আশা তাহার রহিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে সুস্থের উপর অনেক প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ক্রোধকে সংযত করিলেন এবং ভ্রুত ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন,—‘O diamond, diamond little do you know the mischief you have done!’ ‘ভায়মণ্ড, তুমি যে আমার কিরূপ

ক্ষতি করেছে তা বোধ হয় তুমি সম্যক অবগত নও।’ তাহার পর তিনি দ্বিষ্ট হইতে দূর গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন।

মহারাজার প্রসিদ্ধ কবি ও সাধু তুকারামের সাংসারিক অদ্বৈত বিশেষ সচ্ছন্দ না থাকায় তিনি সামান্য দ্বিষ্ট হইয়া জেদবিশেষেই যমসেই কিছু কিছু উপাধীন করিয়া সংসারের আত্মহুলা করিতে আরম্ভ করেন। স্বতঃপূর্ব তাহার বিবাহ হয়। তাহার ভাণ্ডা সকেটীস-পত্নী জ্যান্টিপির দ্বারা অতিশয় কোপনভাবা ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুপও উপহার পাইয়া সেগুলি প্রাণী বালকবালিকাদিগকে দান করিয়া এককণ্ড মাজ লইয়া গৃহে উপস্থিত হন। তাহার গুণবর্তী স্বধর্মণী সমস্ত কথ্য তিনিয়া সেই ইক্ষুও দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই ইক্ষু দগুণী ছুই থণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। ভিত্তিক তুকারাম সকেটীসের দ্বারা কবল-এইমাত্র বলিলেন—‘প্রিয়ে, তুমি আমাকে এতই ভালবাস যে, আঁকরাছটা তোমার একেলা থাকিতে ভাল লাগবে না বলিয়া ছুই থণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।’

মেথিস্তা চার্চের স্থাপন কর্তা জনওয়েল্লির ভাণ্ডা অতি মুখ্য ছিলেন। একদিন ওয়েল্লি উপাসনা গৃহে লোকজন সহ উপাসনা করিতেছিলেন এমন সময় তাহার স্ত্রী আনিয়া স্বামীর উদ্দেশে মধ্যবর্তমানি হুংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্যস্তহুংসা ইত্যাদি শেষ হইলে ওয়েল্লি স্ত্রীকে হইয়াবো বুলিলেন, ‘প্রিয়ে তোমার উপাসনা কি শেষ হইয়াছে?’ তাহাতে তাহার স্ত্রী কোথাক হইয়া স্বামীর প্রতি তীব্র কটু উক্তি করিতে লাগিলেন। কটু উক্তি সমাপ্ত করিয়া স্ত্রী চলিয়া গেল ওয়েল্লি জীবন মতিগতি পরিবর্তনের কোন ভিঃ ভগবানের নিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন।

গ্রীক স্টোটা দার্শনিক কোষের সময় মৌনভাব অব-লম্বন করিতেন। একদা তাহার বহুবর্ষ তাহার মৌনাবস্থা লক্ষ্য করিয়া কাশন কিজাসা করিলে তিনি বলিলেন, ‘স্বামি কোন ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছি এবং মৌন-ভাবেই কোষ প্রকাশ করিতেছি।’



ইহাশীর্ষের কুসংসার মধ্যে এখন বোমক সৈন্তগণ বীজ-  
থুঁতে কুসংসার করিতেছিল তখন ভীষণ মর্ষণের যাতনার  
মধ্যেও কোথা সম্পর্ক মাত্র বিহীন হইয়া বীজথুঁত যাতক-  
দিগের অপরাধ মার্জনার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা  
করিয়াছিলেন “প্রভু, ইহারা কি করিতেছে তাহা বুঝে  
না, আপনি ইহাদের দোষ মার্জনা করিবেন।” অজ্ঞানের  
সমগ্র দুঃস্থের মধ্যে হইই চরম দুঃস্থ বলিয়া বোধ হই।

প্রায় দ্বিগুণ বয়স পূর্বে যে মহাপুরুষ প্যালেস্টাইনের  
উষর ভূমিতে অস্বাভাবিকভাবে ধর্মের বীজ উপর করিতে  
প্রয়াসী লইয়াছিলেন এবং সার্ব দ্বিগুণ বয়স পূর্বে যে  
মহাপুরুষ হিমালয়ের পারশেমে দহা, কমা, অজোব  
প্রভৃতির অমিয় বার্তা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন আজি

বিশ শতাব্দীতে তাহাদেরই ভাব সর্বমতি আশ্রমে  
শাস্ত্রসামাজিক ভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা  
গান্ধী সেই বেদ, দহা, মায়া, মমতা, সত্য, সৌভ্র,  
অজোব ও কমা মস্তিষ্কান বিগ্রহ।

মহাপুরুষের জোখ শূন্য জীবনের কারণ এই যে  
কোষকে জয় করিতে না পারিলে আত্মার বার্থ্য্যত্ব  
উপলব্ধিতে ব্যাধাত জন্মে। সেই জন্মই তাহাদের তপ,  
ব্রত, জপ ও যোগাভ্যাসের এত আয়োজন। আবার  
মহাযোগী শিবের বিকৃতি-ভূমিত মস্তিষ্কে মনে হয়  
যে তিনি ঐ সমগ্র রিপুকে যোগবলে ভয় করিয়া সেই  
ভয় অঙ্গে মাখিয়া শোভা পাইতেছেন। সেই মহাযোগী  
এই পৃথিবীরতের সমগ্র যোগীর গুরু।

## ফুলের ব্যাধা

শ্রী অশোক রায়

সে ফুলের ছোট একটি কলি। এখনও প্রকৃত  
জীবনের সুখ-দুঃখ তার অজ্ঞাত। এখন সে শুধু  
আপন মনে বাতাসে ভর করে দোলে। তাইতেই  
সে অসীম সুখ পায়। এমনি আছে—সব্বা যার  
প্রভাত আসে। একদিন প্রভাত এল। সঙ্গে সঙ্গে  
তার কয়েকখানি পাঁপড়ি খুলে গেল। বাইরে থেকে  
এক ঝটকা আলো তার স্বপ্নের কাছাকাছি এসে  
থেমে গেল। তখন তার মন নবীন, অপূর্ণল  
একটা সুখের আশায় উতলা হয়ে উঠল। সে  
প্রভাত চলে গেল। আবার নতুন প্রভাত এল—  
সঙ্গে নিয়ে এল তার জন্মে বাইরের সব আলো, বাতাস  
আর আনন্দ। তার দুইটা হঠাৎ এতগুলি জিনিষ  
পেয়ে খুসী হয়ে উঠল। “সে বলল, “বা: চমৎকারত।  
এমন ত কখনও দেখিনি। কি সুন্দর।”

কালো একটা নতুন জীব এসে তার বৃক্ষের উপর  
বসল। তার পরশ পেয়ে সে একটা নতুন অজানা  
পুলকের শিহরণ অনুভব করলে। সে তাকে ভালবাসল।

তাকে বৃকে টেনে নিল। তার নিম্নের সমস্ত ময়ূহ  
তাকে সে নিঃশেষে দিয়ে দিল। প্রিয়তমকে দানের  
আনন্দে তার সৌন্দর্য্য বেড়ে গেল। কিন্তু প্রিয়তম চলে  
গেল, শুধুই গান ভনিয়ে, তাকে নিঃশেষ করে দিয়ে,  
আর ফিরল না। তারপর কতদিন সে তাইই পাশ  
দিয়ে চলে যেত অন্ধ দিকে—সে কত পাঁপড়ি ছলিয়ে  
ডাক্ত। কিন্তু সে আর ফিরত না। নিঃশেষ তাকে  
মরমে মেরে চলে গেল। সে বৃক্ষ, ও সকলের দশাই  
তারমতই করে।—সবাকার বৃকটি খালি করে মূ  
নিখে পাশিয়ে যায়, আর ফেরে না। তাদের গ্রু  
তার কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু তাদের বৃক্ষে  
ময়ূহ।...সে দুঃখে যিয়মান হয়ে গেল। আশ্চর্য্যে  
তার একটি একটি করে পাঁপড়ি গুলো ঝরে পড়তে  
লাগল। হঠাৎ একটা ঝটকা বাতাস তার সব কাটা  
পাঁপড়িই উড়িয়ে নিয়ে গেল। শুধু তার বৃক্ষের ব্যাধা  
একটি ফল হয়ে জেগে উঠল।



## পথহারী\*

শ্রীললিতা সিংহ

গনরী বছর সন্ধ্যায়ের নিম্ন পূর্ণবারায় পালন করে  
এবং সাধনার পথে নিয়মিত ভাবে অগ্রসর হয়েও এখন  
স্বামী যোগানন্দ বহুদিনের পরিচিত একখানা পথের ছবি  
মন থেকে দূর করতে পারলেন না তখন সেই মাঘঘটিকে  
সন্ধ্যারের পক্ষি হুপ থেকে উজ্জ্বলই তাঁর প্রধান এবং  
প্রথম কর্তব্য এবং ভগুবানের অভিপ্রেত বলেই মনে  
হলো। শৈশবের জীড়ার সাথীতি যেন আজও ভাষা-  
হীন মিনতিভরা মুখে চোখে জাগাচ্ছে “ওগো ভূমি কত  
উঁচুতে আর আমি নারী বলে কত নীচে—আমার বাঁচাও  
—আমি ত তোমার চরণে আমার সর্ব্বণ নিবেদন করতে  
প্রস্তুত ছিলাম—ভূমি যে তা গ্রহণ করনি। তোমার  
জন্মই ত আমার আশ্রয় এ দশা।”

সত্যই ত—সে যদি অনিবার্য বাপ মায়ের তোলা  
বাধার আবরণ অগ্রাহ করে তার পুরুষাচারিত শক্তিতে ভেঙ্গে  
চুরমার করে দিত—নিশ্চয়ই জয়ের গৌরবে সে মত্তিত  
হতে পারত। সারা গাঁপানাই যে তাকে সাহায্য করতে  
প্রস্তুত ছিল। তা’হলে ত অনিবার্য ভাগ্য-চক্র বর্তমানের  
দিকে ফিরত না। তার স্নাত না হলেও অনিলাকে  
এখন পাগের কুসংসার পথে ধাক্কা দিয়ে স্থিত জীবনভার  
বহন করতে হোত না। সে আজ নর্তকী—সাধাষণ

বেলা—ছি—ছি—ছি—তার স্থিত জীবনের জন্ত প্রত্যক্ষ  
না হলে পরোক্ষভাবে সেই ত দায়ী। সাধু চাঁৎকার করে  
বলে উঠলেন—না—না—তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

পাশের মঠের ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা  
সবিত্তরে বর্ণনা করে স্বামীজি তাঁর পিতৃদেহু তার তাঁর  
উপরই দেবার ইচ্ছা করলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন—  
উদ্বেষ্ট সাধু বটে তবে কি জানেন—পথ বড় পিচ্ছিল—  
কিন্তু এতে এখন শান্তি পাচ্ছেন না—তখন চেষ্টা করতে  
পারেন—কিন্তু খুব সাধনা।

২

হাতীবাগানের একটা বড় বাড়ীর ধারে বানকতক  
মটরগাড়ী ধাক্কা দিয়ে বোঝা হয় তাবের মালিকের অপেক্ষা  
করছে। বাড়ীখানি নর্তকী শিরোমণি অনিলা দেবীর।  
কলকাতা সহরে যাবের একটু লগ আছে—বারা থিয়েটার  
বাথকোণে ছ’এক টাকা সাপ্তাহিক ব্যয়কে বাজে খরচ  
মনে না করে স্বাস্থ্যের জন্ত (for the sake of recre-  
ation) অবশ্য প্রয়োজন, মনে করেন তাঁরা এই রূপণী  
গায়িকাটির নামের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত; কেহবা  
যেহা গায়িকার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়েও আবছ। ধনী,  
বিদ্বান, গাঢ়ক, কলাবিৎ সকল সম্ভাব্যের লোকই অনিলা

\* Anatole France বিখিত Thais নামক গল্পের হাতালায়ল।



দেবার গৃহে থাক। দিয়ে আপনাদের ভাগ্যবান মনে করেন এবং তার কৃপাকবি পলে সভায় যেন বর্গ হাতে পান। প্রেসিডেন্সি বিদ্যেচারে সে যখন গারিবার ভূমিকা নিয়ে আসবে (stage) অভিনয় আরম্ভ করে তখন কর-তারিণ ও প্রশংসার ধ্বনিতে সারা বাড়ীখানা ভরে উঠে।

মৃত্যু বই খুললে ত কথাই নাই; এটিও কোন হানাই বাদ থাকে না। এই কারণেই বিদ্যেচারের মালিক অনিলার সব দাবী মিটিতে কখনও বিচলিত করেন না।

সৈনিক ও অনিলার ঘরখানি অতিথি সমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল—যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউবা ধনকুবেরের সন্তান কেউবা আপনাদের বিজ্ঞা বুদ্ধিতে 'বনাম ধর্ম' পুস্তক। অনিলা তার স্বভাব-স্বলভ যিনিই হাসিতে তাঁদের মন চকিয়ে দিয়ে কিছুকণ স্বভাবান্তর ঘটিয়ে তুলে দেন তাঁর পরে দেখুন আজ বড় দুখের সহিত আপনাদের আশ্রিতে বলতে হচ্ছে—আমার শরীরটা 'আজ তেমন ভাল নয়।' সকলের মুখকেই এক একটা সুহৃৎ-ভক্তির কথা বেরিয়ে কলরব স্বজন করতে।

সকলেই ডাক্তারের কথা উত্থাপন করতেন। অনিলা আর এক বলক বেলে চোখে মুখে বিস্ময়ের তরঙ্গ খেঁচিয়ে বললে—'ধর্মবান! আপনাদের—তেমন বিশেষ কিছু নয়—আজকে বিশ্রাম করলেই, সেরে যাবে। আপনারা ধরা করে আজকের মত আশ্বাস।'

অনিলার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান একজন চিকিৎসকসহই মনস্তাপের বোঝা নিয়ে বিনাশ নিলেন। যিনি বসেই হলেন তিনি পার্শ্বিক শিশুরামণি সমরনাথ। তিনি ভাবেন সকলের চেয়ে অনিলা দেবী তাঁকেই অগ্রগণ্য বোধ করেন সুতরাং তাঁর দাবীটাও সবচেয়ে বেশী। তাই আশ্বাস্যতা দেখাবার জন্যই তিনি তখন তখন করে অনিলা দেবীর বাহ্যের বিষয় খোঁজ নিতে লাগলেন। অনিলা তাঁর বাবাহারে হাড়ে হাড়ে চটে উঠে ভিতরে একটা কাপ্তির রক্তা অশ্রুত কলমেও বাহ্যের বাহিরে মুখে কিছু বলতে পারলেন না। সমরনাথ তার খুব কাছে এসে হুটী খারপ একটু মোলায়েম করে বললেন—'তাই তো অনিলা তোমার শরীরটা আজকাল খুবই খারাপ যাচ্ছে—বসি কি তুমি একটু মাগবনে থাক—বলত রমেন

ডাক্তারকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করে দি।' অনিলা জমেই উত্তর দিয়ে উঠতে লাগল—তার শরীরটা খারাপ না হলেও মনটা আজ সত্যই বড় খারাপ। সে অধিষ্ট হয়ে উঠে বললে—'আর সবচেয়ে পারছি না বহন তবে—আমি একটু ভাইগে।'

সমর। এত খারাপ হচ্ছে তোমার শরীর অনিলা! জর হযনি ত! আমি কি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি না!

অনিলা মনে মনে বললে—কি আগদ! এই ছিনে জেঁক কিছুতেই ছাড়তে চায় না—মুখে বলল ধর্মবান! আপনাকে—বহন আপনি না—না—আপনার কিছু করতে হবে না। এই বলেই সে বেরিয়ে গেল। সুসমরনাথও একটা বাঘার নিশাস ফেলে বাড়ী ফিরে গেল। অনিলা আপনার ঘর তুলে তার স্ত্রি চাককে ডেকে বললে—'চারি' এই সব দুখের পর আমায় উদ্ব্যস্ত করে যারসে—কি করি বলত।

চার। ও কথা বলতে নেই মা—ওসাই ত বলতে গেলে তোমার লজ্জা!

অনিলা। দুঃ ছাই লজ্জা!

চার। ও সব বোলোনা মা ওরা তোমায় সত্যই ভালবাসে—ভক্ত করে।

অনিলা—ভালবাসে—তাকে! আশ্রয়—না আমার এই রূপ আর এই দেহকে!

চার। তা ত্রি মা—তোমার মত এমন কাঁচা শোণার কাস্তি ক'জনের হয়—তাই ত বলছি মা এইবেলা যত পার আশ্রয় করে সিন্দুক ভর্তি করে নাও।

অনিলা। কেন লো—হুঁদিন বালি কি আমি কোথাও চলে যাব?

চার। তা নয় মা—তবে ওসবত চিরদিন থাকবে না—বয়স ত এগিয়ে যাবেই!

অনিলা—ও এই কথা! আমার রূপ যাবে না দেখবি—

—এক একজন সাহেবে ডাক্তার এমন একটা জিনিস বার করেছেন যা ব্যবহার করলে এসব কখনও নই হয় না।

এর একটা সহস্রত দেবার জন্ত চাকর মুখটা নড়ে উঠলেও কেননা বাব খা খেঁকতে লাগল। বিস্ত সিদ্ধ

যে একটা হর উঠে বলল "ও রূপও যাবে অনিলা—তুমিও বুড়ো হবে—পৃথিবীর কোন জিনিস কালের পরিত্যোগ করতে পারবে না।"

বাক পড়ার শেষের মতই তারা হুঁজনেই চমকে উঠে দেখলে এক জটিলতারী থেকুয়া কাপড় পরা সন্ন্যাসী ধরবার কাকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আবার বললেন—"তুমিও বুড়ো হবে অনিলা—তোমারও ওর যাবে—যৌবন যাবে—কেউ রাখতে পারবে না। এটা ভগবানের নিয়ম।" এমন একটা পৌমাভাব সাধুর মুখে চোখে আঁকা ছিল—এমন একটা দিবা জ্যোতিষ—তাঁর চেহে বেকে বার হজিল যা তারা আর কোথাও দেখেনি—তাঁদের হুঁজনারই মাথা কোন রকম বিচার না করেই তাঁর পায়ে পড়িয়ে পড়ল।

সাবু হুঁজনেই 'দেখে মতি হোক' বলে আশীর্বাদ করে চাককে চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। চাক চলে গেলে তিনি আবার বললেন "অনিলা—তুমিও যে বুড়ো হবে—তোমারও রূপ স্নলসে যাবে—তোমার নির্দোষ গালে টোল পড়বে—দেহ নোদ হয়ে যাবে—ই জাখ রাত্তার গুণের বুড়িকে—চিরদিন ও এমন ছিল না একদিন ও রূপে যৌবন তোমার মতই ছিল।" অনিলা নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। সাধু বললেন—আমায় তুমি চিনতে পারছ না অনিলা—পালের কঠোর আশ্রিতে তোমার চোখের দুষ্টি শক্তি নষ্ট হয়েছে—আমি তোমার খেলার সাথী ভগ্নকণার আশা ভঙ্গার স্থল ছিলাম—আমিই সেই অলকনাথ। সমসারে তোমায় হারিয়ে এই পথে এসেছি—সাবু সঙ্গে সবই তুলে গিয়ে—ছিলাম কিন্তু তুমি যে স্নানও সংসারের কঠোরতার অগ্নে কষ্ট বিকৃত হয়ে কষ্ট পাচ্ছ—তাই তোমায় উদ্ধার করতে এসেছি। এন অনিলা পালের আশ্রিতে আর যুগ পাক হয়েছে দিশেধারা হয়ে ফেঁকা না। এস সব ছলনাময় কল্পনার গ্রন্থ ছেড়ে প্রকৃত আনন্দমাগবে বেহ ভাগাবে এন।

অনিলা ভক্তির আর একবার প্রমাণ করে বললে ও তুমি এলেছ, এতদিন পরে এই পাণ্ডিত্যকে মনে পড়েছে—কিন্তু আমি যে নারকী—মুক্ত কি আমার

মিলবে! আর এই সব ছেড়ে কি করেই বা যাব অলকনা!

সাবু। খুব পারবে—ও কিছু নয়—জোর করে ছেড়ে একবার সোঁতা রাত্তার উঠে পড় দেখি সব সোঁতা হয়ে যাবে।

অনিলা। পারব—কিন্তু—আচ্ছা অলকনা হুঁদিন সময় দাও—একটু ভাবতে দাও।

৩

হুঁদিনের স্থলে চার দিন ভেবেও অনিলা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'তে পারলেন না। এই সব বাড়ী ঘর বিশালদের সামগ্রী হেলায় পায়ে দৌরে সন্সারের প্রান্তে কোন্ মরুভূমিতে গিয়ে প্রকৃতের সকল রকম অত্যাচার সহ্য করে সে যে কি স্থান পাবে তা' সে অহমান করতে পারলেন না। একজন পতিতা হ'লেও সারা দেশটা তাকে যে সন্সানের চোখে দেখে—তত বড় ভাগাই বা ক'টা লোকের হয়ে থাকে। তার মুখের এক একখানি কর্তন বুদ্ধদের পথান্ত চক্ষু জলে ভরিয়ে তোলে। সমাজের পরিত্যক্তা—কাতির বিয়ের নিশাস হ'লেও সে যে তার শুক কঠে মথুর রস ঢেলে দিয়ে তাকে সতেজ করে। লোকে উদ্ভাসের মত নিঃস্বের অবস্থা তুলে গিয়ে তার পায়ে সব ঢেলে দিয়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হলেও ত তার ভাত্তে পোষ নাই—সে ত কাউকে ডাকে না—কাহারও অর্থের দিকে ত তার লোলুপ দুষ্টি পড়ে থাকে না। সে রূপের বাবসায় করলেও তার রূপের আওনে সে ত কাউকে পোড়াতে চায় না। শুধু যে আসে তাকেই আবার যত্নে তুলে করে—সে ত জোর করে তার সম্পত্তি কেড়ে লয় না। যে নিজেই আপনার পায়ে স্নানাত্তাভিত করবে তাকেই সে শুধু সেখে গিয়ে নিরাশর করে না। তারও ত একটা প্রয়োজন আছে? জীবনের ব্যয়ভারের জন্ত স্নানাত্ত ত তাকে একটা পক্ষাও তিকা দিয়ে না। তার জীবনটা পালের দুর্গন্ধে ভরা হ'লেও ত সে তেমন বেশী কিছু অজ্ঞায় করে নি। সে বিশ্বা হোল—স্নানাত্ত নাসিকা স্বেদিত করে তাকে এক গানে জ্বলে রাখলে—তাঁরোগে সব জিনিস জোর করেই কেড়ে নিলে। তবুও











মৃগা নীরা বিথুণা তুলুহু কুতে যো নো বপতেহব্বীং ।  
সিরাচ ক্রীঃ সত্তরা অসমো নেরীংইংসংখাঃ পক্ষমেয়াং ॥

ইত্যাদি ।

অর্থাৎ হে সখাগণ একান্ত হইয়া জাগ্রত হও, দক্ষিণা উষাধেরী এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে রক্ষা হেতু আবাহন করিতেছি । অস্ত্র সকল শান্তি ও শোভিত কর ; উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অমুষ্ঠান কর, লাশলগুলি যোজন্য ও যুগ-গুলি বিভাজিত কর । এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে বীজ বপন কর । আমাদিগের ত্ববের সহিত বেনে আমাদের আর পরিপূর্ণ হয় ; স্থণ্ডিগুলি (কাতে) নিকটবর্তী পক্ষ শস্ত্রে পতিত হউক । অনন্তর দেবতা-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে,—

“আ বো বিংং যজিহং যত উত্তরে দেবা দেবীঃ

যজতাং যজিহামিহ ।

না মো দ্বীতীত্ববসেব গবী সহস্রাধাপা পয়সা মই গোঃ ।  
হে দেবতাগণ ! তোমাদিগের ধ্যান আত্মিক সিতেরিহি আমাদিগকে রক্ষা কর । ত্বণ ভোজন করিয়া গভী যেরূপ সহস্র ধারায় দুগ্ধ প্রদান করে সেইরূপ যজীং ত্ববে তুই হইয়া আমাদের অভিলାষ পূর্ণ কর ।

“শতপথ ব্রাহ্মণে” কৃষি কার্যের পদ্ধতি অতি সুস্বরূপে বর্ণিত আছে :—ক্ষেত্র কর্ণ, বীজ বপন, রোপণ এবং শস্ত-নিষ্কাশন যথাকালে সম্পন্ন করিবে, পক্ষ শস্ত স্থণ্ডি দ্বারা কর্তন করিয়া প্রথমে গুচ্ছ করিয়া বাঁধিবে পরে সেইগুলি ক্ষেত্র বাটীতে লইয়া জমীর উপরে আছড়াইয়া শস্ত সকল পৃথক করিবে, পরে সেইগুলি চালানী অথবা শক্ত-জিন্দা যন্ত্র (winnow) দ্বারা সু-পরিষ্কৃত করিয়া তৎপরে উর্দর দ্বারা মাটিয়া উঠাইবে । যাহারা এই কার্য করে তাহারা ধাতকরী নামে অভিহিত ।

দ্বিতীয়াহাতে হুফা ও শস্ত ছান্দায়া হয় তৎক্ষণ আর্ঘ্য-গণ মাঘ কাশ্বন মাসে ভূমি কর্ণ করতঃ বৈশাখ মাসে বপন ও আষাঢ় মাসে রোপণ কার্য করিতেন । বীজ-বপনের পূর্বে রাহু,—

“হিমেদে বারিণাসিক্তং বীজঃ শাস্তমনাঃ ৩তিঃ ।

ইহং চিত্তে সমাধায়ং যং মূর্ত্তিযং বপেৎ ॥”

হিম অথবা পিচ্ছিল শীতল জলে বীজ ভিজাইয়া পর-

দিন প্রাতে পবিত্র শাস্ত্রচিহ্নে ইজ্রকে মনে চিন্তা করতঃ প্রথমে যথ্য ভিন মূর্ত্তি বপন করিতেন । পরে ধাত্তের পুণ্যাহ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে পূর্ব্বাহ্ন হইয়া,—

“বহুধেং হেম গর্ভাসি বহুশত ফলপ্রদে,

বহুপুণ্ড্যো নমস্তভ্যং বহু পূর্ণিত্ব মে কৃণিঃ ।

রোপয়িষ্যামি দ্বাদশাং যুগ-বীজানি প্রাত্তিঃ ।

হুতা ভবন্তু কৃষ্যকা দনধাতু সমৃদ্ধিভিঃ ॥”

এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ বহুমতীর উদ্দেশ্যে করিতেন । অনন্তর,—

“বাস্তবে নিত্যাবধীয়াসিত্যবশ্যং ভোয়দাঃ ।

শস্ত্র সমস্তভ্যঃ সূর্য্যঃ সন্ধ্যাঃ সন্ত নীকরুণাঃ ॥”

ইজ্রকে অর্ঘণ ও আহ্বান করিয়া প্রণাম করিতেন । অধর্ক-বেলের ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ১৩২ সূত্রে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে বীজ বপনের শতকে আহ্বান করিয়া ত্বব করিতেন, “হে শত্রুগণ, তোমরা আত্মপক্ষি প্রভাবে প্রত্যেক বীজ হইতে নির্গত হইয়া সাগরের ত্রায় অসীম, আকাশের ত্রয় উচ্চ হইয়া প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হও । যাহারা তোমার সেবায় নিয়োজিত তাহারা লাভ-বান এবং তাহাদের শতভাতার পূর্ণ ও অক্ষয় হউক, আর যাহারা তোমায় ভোজন করে তাহারাও হৃদয় ও অধিনাসি হউক ॥”

ক্ষেত্রে জল সেচন, কৃপ ও গাল প্রভৃতি বনন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কৃষকের ১০ম মণ্ডলের বিভিন্ন সূত্রে পটুইয়াছে । অধর্যবেদেও জল-প্রবাহ-প্রণালী ও গাল বননের প্রকার উল্লেখ আছে :—“হে পবিত্র জল-দেবতা—অগ্নি প্রবল প্রবলমাত্র-পুংসুখলিা প্রবাহিণী ! আমি যুগাহ তোমার পথ প্রদর্শন করাইতেছি সেই স্থান দিয়া প্রবাহিত হও ; তোমার জলে ক্ষেত্র দিক্ত হইয়া ভূমি উর্ধ্বরা হউক—প্রচুর শস্ত উৎপন্ন করুক ইত্যাদি ॥”

বৈদিক যুগের ত্রায় ব্রাহ্মণে ও পৌরাণিক যুগের সর্ব্ববর্ণ-মত্যা, কৃষিকার্যের উন্নতি কল্পে, যে যজ্ঞ ছিল তাহা মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশে এইরূপ অবগত হওয়া যায়,—“হে মহারাজ ! কৃষি, গো-রক্ষণ বাগিচা এবং ঐদৃশ অজ্ঞাত যে কোন

বর্ষ উপস্থিত হইবে তাহা বহু পুঙ্খ দ্বারা এরূপ ভাবে সম্পাদন করিবে বাহাতে কণ্ঠনামের সন্তানবা না থাকে । যদি মহুঃ, কৃষি গো-রক্ষণ, বাগিচা প্রভৃতি কার্যের অমুষ্ঠান করিতে বিধা দয়া বা রাজকীয় লোক কর্তৃক প্রণীড়িত, ভীত বা সংঘর্ষ প্রাপ্ত হয়, অথবা রাজকণ্ঠচারী কর্তৃক করণীড়িত বা উত্তেজিত হয় তাহা হইলে রাজা লোকের নিকট নিম্নিত হন ; হুতরাং সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পালন ও রক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম ॥” অজ্ঞাত নারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হে নরায়ণ ! আপনরা রাজ্যের স্থানে স্থানে কি বৃহৎ দীক্ষিকা, সরোবর প্রভৃতি বনিত ও প্রতিষ্ঠিত আছে ও যাহাতে কৃষকসকলে কেবলমাত্র পঙ্কজ-পশিত জলদ্বারা উপর নির্ভর করিতে না হয় ? রাজ্যের কৃষক ও বন্দীবন্দগণ হুখে আছে ত, দ্বাখ ও অর্ধের তাহারের কোনরূপ অভাব নাই ত ? রাজ্যের সাধুব্যক্তিগণের নিকট হইতে রাসনরকার হইতে অশ্রম কর্ণ পাইয়া থাকে ত ? ইত্যাদি কৃষির উন্নতি বিষয়ক ত্ববের বহুল উল্লেখ দেখা যায় ।

কিন্তু যদ্যপি কৃষিগণের অংশাদানকাল হইতে ‘অহিংসা পরম ধর্ম্ম’ প্রচারিত হইবার পর হইতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বিগৃহীত বোধে ব্রাহ্মণ ও কনিষ্ঠগণ কর্তৃক ইহা বর্জিত হইতে লাগিল ; ক্রমে, কালে বেদজ্ঞ যোগগণও তাহাদের অমুষ্ঠাই হইলেন । হুতরাং ঐ সকল কার্য্য বেদজ্ঞ ব্যবহার-বঞ্চিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের—তথা অশিক্ষিত কৃষকসকলের হস্তে পড়িল, শস্ত আর পূর্ব্বের ত্রায় উত্তমরূপে উৎপন্ন হইল না ; ভারতের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতে লাগিল । ভারতের সেই এক স্ববর্ণযুগ—যখন জগন্নাথ আর্ধ্যহিন্দুগণ হল হস্তে পঞ্জাবীর পক্ষদেব উপকর্মে সমবেত হইয়া তারতবর্ষে গান করিয়াছিলেন :—

“মধুমতীরোযণীবীণাং সাগো

মধুমতী ভবন্ততরীংকং

ক্ষেত্র পতিমধুমাতো

ক্ষেত্র পতিমধুমাতো

পত্রজো মধুনা পয়োভিঃ

তনা নীরা জনমশ্বাং যন্তং ॥”

সেই এক যুগের দিন ‘অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; “তেহিনো দিবসা গতা” ভারতের সে সৌভাগ্যতপন আর অন্তর্মিত । এক সময়ে এই ভারতে টাকার আট মণ চাউল ছিল, বর্তমানে তাহার স্থলে আট টাকার একমণ ভাল চাউল ও পাওয়া যায় না । অতঃপর জািননা ‘অপরখা কিম্ ভবিষ্যতি’ ।

মধুনা ইংরাজ রাজের হুগ্ৰসাদে শিক্ষার প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে এবং কৃষির ক্রীড়িত সাধনের জ্ঞ হানে স্থানে কৃষিবিদ্যা ও তাহার শাখা কাঞ্চালয় স্থাপিত হইয়াছে । ভারতবাসী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তাশীল ও বিচারক্ষম ; আমাদের সমাজের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহাতে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত বৌী আলোচনা হয় ততই মঙ্গলের বিষয় । আমাদের দেশের কৃষকগণ নিরক্ষর বিধায় তাহাদের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনা সম্ভব নহে ; হুতরাং বাহাতে দেশের কৃষকসকলের অবস্থার উন্নতি হয়, শিক্ষিত জনসাধারণ দাস্তবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে নিজের ভীক্ষিকা অর্জনে সর্ব্বত্র হুয় বিষয়ে চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য ।

আমাদের ভারতভূমি—ইহা বহুদূর প্রস্তুতই হেমগর্ভা, চির-রত্ন প্রসবিনী । অতএব যদ্যপি আমাদের নিক্তিত ধনীলোকগণ অশিক্ষিত কৃষকসকলের উপর একবারে সকল ভার স্তম্ভ না করিয়া—তাহাদিগকে সশিক্ষা করিয়া, আত্ম পরিশ্রমে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে, প্রচা ও প্রকৃষ্টতার প্রণালী সমাবেশে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, নিজের দেশের ও দেশের ঐক্য সাধনে বৃত্তমান হন তাহা হইলে অবশুই দেশ-জননীর আশীর্ব্বাদে অমুন্য-দুগ্ধ পূর্ণ আর্ধ্য গোয়ষ কিরিয়া ‘আগিবে ; সৌভাগ্য-তপন উদিত হইয়া আবার মাতৃভূমির মৃগোজল করিবে ।

অতএব,—

“উত্তীতঃ জাগ্রত প্রাণা বারিবিষেত ॥”





## কুড়ের বাদশা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাহাই হোক ভক্তার বাবুর আদেশ তো পালন করিতে হইবে নতুবা মরিয়া বা বাচিয়াও স্থান নাই; কারণ যদি মরি তাহা হইলে ভক্তার বাবু বলিলেন—Sad death! Poor fellow never acted up to my advices (হুংখের মৃত্যু। হতভাগা আমার পরামর্শ মত করেননি চলে নাই।) আর তাঁহার আদেশ পালন করিয়া মরিলে তিনি বলিতেন—“Cant help I did my best but I cant give life” (কি করিব যথাসাধ্য করলাম তবুও কিছু হইল না আমি তো আমার পরামর্শ দিতে পারি না) আর তাঁহার কথা শুনিয়াও যদি বাঁচিতাম তাহা হইলে তিনি বলিতেন—“It's a miracle and a chance in a thousand” (বড়ই আশ্চর্য্য রকমে বেচেছে, হাজারেও একটা এমন ঘটে না।) মোট কথা সর্ব্ব অবস্থায় প্রয়োগ করিবার মত উভয় ভক্তারবাবুরের কর্তব্য থাকে। যাহা হউক আমি তেঁকে সেলা—সেলাম দেওয়া—বেশী দূরে নয়। দেওথরের ব্যাপার অনেকই জানেন হুতরা! অনর্থক সে সব কথা বলে আবর্জনা আর বাড়িতে চাই না। আমরা যে বাড়ীতে সেলাম—তার পানের বাড়ীতে একঘর বাঙালী এসেছিল। তবে তখন ‘সিজন’ নয় বলে সকল বাড়ী ভরিয়া উঠে নাই। আমরা মনে, আমিও আমার পিসিমা এবং এক পুরাতন ভৃত্য—ভৃত্যটী আবার আমারও উপরে যায়, সে বাড়িতে পাইলেই শুইয়া পড়ে—পাঁড়াইতে সহজে চাহে না। কাজেই সে যে আমার যোগ্য ভৃত্য-তাহাতে আর কোন সন্দেহই ছিল না। পিসিমা বৃদ্ধা মাছ, তার উপর চোখে কিছু কম দেখেন হুতরা! তাঁহার গতি স্বভাবতঃই মধুর ছিল। এইসব কারণে এই কুড়ে পরিবারীয়ের কর্তব্য হিসেবে আমাকে মন বানায় নাই। আগারদিহর পর নিত্য উপগ্রাস পাঠ করিতাম—সেটা যদি একটা কন্ডের মধ্যে আপনাদের গণ্য করেন তবে আমি সমস্ত দিনই কাঙ্গ করিতাম।

আমার একটা পরম গুণ ছিল সেটা হচ্ছে সহজে তুলিয়া যাওয়া—সমস্ত দিনে যাহা পড়িতাম, সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাইবার সময় কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত যে কি বই পড়িয়াছি বা তাহার গল্পাংশটা কি তাহা হইলে আমার পক্ষে তাহার উত্তর দেওয়া খুব সহজ হইত না। কারণ—ক্রেপ পুস্তকের নামটা যদি ভুল করিতো পরিভাষা কিন্তু গল্পাংশ, ও বাবা! সেটা ভ্রম্যশ্রমের মত অসীম মনোবাহার আঁদাড়ে পাল্লাড়ে কোথায় যে পড়িয়া থাকিত তাহা একত্রিত করিয়া বলা আমার পক্ষে কেবল অসম্ভব হয়ে নয় উপরন্তু কোন মতেই সম্ভব নহে। উপগ্রাস পাঠ করত কে যদি আপনারা অকর্ণধ্যাতার চিত্র মনে করেন তবে হে স্বদীপকনকন, তাহা হইলে আপনাদের সমুৎ বিপর জানিবেন। কারণ আপনাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা দিবা ত্রিগ্রহের নির্জন ক্ষেত্র চিত্রণ শানের (বাহ্যেরে মার্শেল বাঁধা ঘর অবশ্য তাঁহাদের মার্শেলের শীতলমেঘে) মেনে ভিন্না গামছায় মুছিয়া একটা বালিস টানিয়া শুইয়া কুছল আলাপিত করিয়া একমনে এই মহাকাব্যই করেন—তাঁহাদের অকর্ণধ্যা বলিবার মত সাহস আপনাদের আছে কি? আর মনে থাকিলেও যুৎ খুটটার থো নাই কারণ আপনাদের অকর্ণ-বিধাতৃগণ বিরক্ত হইলে ছুঁবেলা ছুঁমুঠা পাইতেছেন (যদিও সে উড়িয়া নন্দনের প্রস্তুত—তথাপি ‘স্বপ্নারভিনন্দন’ গৃহীতীয়া এখনও করেন বলিয়া শুনা যায়) তাহা বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। কেবল ঐ অনশন ক্রেপের আশঙ্কায় প্রকোচে তাঁহাদের অনেকবার শুনাইতে হয়—“আহা বাগ্গি! বাগ্গি! একবারে কঠা বাহির হইয়া পড়িতেছে ইত্যাদি”—ইহা যে নিচর প্রবঞ্চনা তাহাও উভয় পক্ষই জানেন কিন্তু গুণভট্টা নাকি আশ্রয় এবং পায়—উভাবিধ প্রবঞ্চনার উপরই চরিত্য থাকে তাই এক পক্ষ মনে মনে হাসেন আর অপর পক্ষ ভাবেন যে খুব ঠকাইয়াছি—কিন্তু দুইজনই সন্তুষ্ট থাকেন।

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩৮-শংখ্যা]

কুড়ের বাদশা

১২৭৭

আমার জীবনের বেশী সময়টাই আমি শয্যাতে ব্যয় করিয়াছি এবং সে গুহ বিদ্যুৎ আর অশ্রুতপ নহি কারণ আমি সর্বদাই বলিতাম পৃথিবীর দত্ত কিছু আমার সবই বিছানার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে। ইহা ভুল নহে কারণ আমি দেখিয়াছি কঠোর পরিশ্রমীরাও আলস্ত বোধ হইলে সে একটু গড়াইয়া লইবার জন্ত শয্যা আশ্রয় গ্রহণ করে। শয্যা শয়ন করিয়া হাত পা বিস্তৃত করিয়া যখন শুই তখন সত্যই মনে হয় পূর্ণ স্বপ্ন বলিয়া যে কালীনিক স্থবের কথা শুনা যায়—তাহা এই ভাবেই প্রত্যক্ষ করা যায়। শয্যায় শুইয়া যদি মাছ তাহার মেয়ের পরশ না পাইয়া নিশ্চয় হইতে বিকৃত হয় তবে তাহার কঠোর আর অবশি থাকেন না। নিশাকালে শয্যায় শুইয়া বিনিস্ত রজনী যে যাপন করিয়াছে, যে শয্যার অগ্নে বিকৃত, তাহার মত তুর্ভাগ্য জগতে আর নাই—নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত অপরাধীর চেয়েও সে দুঃখী।

কিন্তু গ্রহের ঘেরে এত স্বখময়ী শয্যাও আঙ্গকাল কটকাঁকি বোধ হইত। কেবলি মনে হইত আমি ভক্তারের কঠোর আদেশেই আজ শয্যাবন্ধ—শয্যার সঙ্গে আর আমার সেই যেকোনো সহজ ঘেহেময় সম্পর্কটা নাই কর্তব্যের কঠোর স্পর্শ শয্যা আমার কঠিন-স্পর্শ হইয়াছে তাই শুইয়াও শান্তি পাইতাম না—নভেল পড়িয়াও ছুঁরি হইত না, তখন যদি মনে হইত ভক্তাকে ঠকাইবার জন্তও আমার কাজ করা উচিত—কাজ না করিলে কেশিয়া যাইব মনে হইত।

পানের বাড়ীতে যে ভক্তালোচনী থাকিতেন তিনি কোথাকার সাবজ ছিলেন—তাঁর মেয়েটার অহংয়ের পর হাওয়া বদলাইতে এখানে আসিয়াছেন, হৃদয়ে পুষ্ট; তার একমাস হয়ে গেছে, বাকী আছে আর একটা মাস। আমরাও আর একমাস থাকিব হুতরা! বিদায় যাত্রাটা এক সময়েই হইবে এমনটা স্থির ছিল। বলা বাহুল্য এবং কাজের কাজ ছিলেন গুরু বাবুর গৃহীণী। তাঁহার সহিত আমার পিসিমার যুগ যুগিষ্ঠা হইয়াছিল—দারপন গ্রামে আসেন বাঙালী, বিশেষ করিয়া বাঙালিনীদের সহজেই আত্মীয়তা জন্মে কিন্তু দেশে থাকিবার সময় ঘটে ঠিক ইহার বিপরীত। নিজের দেশে বাঙালী পুণ্যভেদে মধ্যে কিছু

পরিমাণ সত্যাব বরণ থাকে কিন্তু মহিলা মহলে রেবারেরি ও মনকাবদীর মাজাটা সাধারণতঃ খুবই প্রবল হইয়া উঠে। ছোট ছুয়ানি হারাওয়া গেলে যেমন খুঁড়িয়া পাওয়া কঠিন হয় তেমনি ইহার কারণ অহসন্ধান করিয়া বাহির করাও কঠিন। বোধ হয় পিসিমার গলায় তুলসীর মালা এবং হাতের পাচমড়া হিরিনানের কোলা নামক পদার্থ ছুটী, তাহাদের আধ্যাতিক আকর্ষণ শক্তিবাহী জ্বল গৃহীণীর বিচারগম্য হৃদয়ের আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জ্বল বাবুও মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন—চা ও পেঁড়া থাইতেন এবং আমাদের বাড়ীতে আসিতেন—পাচমড়া করিত নিষেধ করিতেন। পিসিমাও কবোঁরে আঙ্গল হইতে কতক দৃষ্ট দৃষ্টক অদৃষ্ট ভাবে পাঁড়াইয়া তাঁহার উপদেশব্রতমালার অহমোদন করিয়া বলিতেন “আমিও তো দিন রাত তাই বলি তোরা কিসের হুংবু বাছা, যে অত লেখাপড়া করঁবি—তোরা পানের যা কোলাপানীর কাগজ আছে তাহার স্বপ্নে একটা রাগিয়া চলে যায়—তা আমি—(একটা কথা বলতে তুল হইয়াছে, আমার চলতি নাম ‘কুড়োয়াম’ হইলেও আমার একটা পোষাকী নাম ছিল সেটা হচ্ছে অমিনকুমার ‘স্বপ্নোপাখ্যায়’) কি সে কথা কান দেহ” জ্বল বাবু হাসিয়া বলিতেন “দিদি আমিও সন্মত হইব কারণ মনে না ও রকম যবনে মেয়েদের পড়াশুনার একটা বাই চাপে” বুদ্ধিলাম গতিক বাবার। জ্বল বাবু হঠাৎ পিসিমাকে দিদি বলিয়া ফেলিলেন যে কেন তাহা বুদ্ধিতে আমার দেখা হইল না—কারণ আমি কুড়ে হইলেও বোকা ছিলাম না এবং কুড়েরে মাথায় তুর্কি নামক দ্রুত পদার্থটির কণাও আঁতাব হয় না এইজন্যই প্রবচনে কুড়ে গুরু জ্ঞত ভ্রম পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জলযোগ্যে জ্বল বাবু বলিলেন “অমিন চল একটু বেড়িয়ে আসি” ভক্তালোকের কথা এড়াইতে কুড়েরে সাইক্লোপিডিয়াতেও নিষেধ করে, কাজেই একটা লম্বোনের সাইট টাউন পরিস্রাম ও পায়ে মিল্লী নাগরা চড়াইলাম পরণের কাপড়ধানা ফরসাই ছিল—পাছাড়ে দেশ বলিয়া বেড়াইবার সময় একগাছি সূর বেতের ছড়ি লইতাম, সেটাও লইলাম—কেবল পারিলাম না চুলাটা কিরাইতে



ও কমলে একটু গন্ধ ঢালিতে সেটা যে কুড়মের দখল ঠিক তাহা নহে বরং সেটা লজ্জায় বলিতে হইবে। যাহা হউক জঙ্গবাবুর বেশ বেশী দূর আর বাইতে হইল না। তখন রোম পড়িয়া গিয়াছে—দূরে পশ্চিমের আকাশ দেখানো গিয়া গাছের মাথায় ঠেকিয়াছে দেখানটায় কে যেন থানিকটা রক্ত ছড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। জঙ্গ বাবুর বাল্যের সামনে ছোট একটু ফুলবাগান ছিল বেশীর ভাগই গোলাপ গাছ, কিনারায় কিনারায় কয়েকটা মন্দির। বেশের কাড়ও আছে—কটকটা হোচ্ছে চান্দরীয়া লতার ঢাকা, বাগানের মাঝখানে দিয়ে হাত বেড়েক চড়কা একটা সুলাল কাঁকরের রক্তা গিয়ে একেবারে সামনের বারান্ডার 'সিঁড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে; তার দুপাশে দুটা ঝাঁকড়া গাছের শোণ, একটা কাঁটালী চাঁপার আর একটা হোসানোহার। আর কোণের দিকে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকড়া নিমগাছ তার বেলা ভালুপান ছড়িয়ে ধাঁড়িয়ে আছে যেন একটা বৃক্ষকিত দানব। তার নীচে কয়েকটা বেতের নীচু ইঁজি চেয়ার পাতা আছে একটা বেতের টিপুয়ে চায়ের আসবাব সাজান—বাইরে থেকে সেই দিকে একটা অশ্বমোহন-জাপক চাহনি নিক্ষেপ করে তিনি আমার বয়েসে" এই যে মিছ আর তার মা চা করছে এসবে দেখি আমার এক আখ কাপ চা পাই কি না—কি বল!" চা জিনিসটার উপর আমার একটা আশ্রয় প্রীতি ছিল এবং চা পান করিতে যদিও স্বামী স্বীকার করিতে হইত তথাপি আঁই চা পানের অধ্বোধন কখনও অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম না—বিশেষতঃ এ ব্যাপারে আমার নীতি ছিল "অধিকন্তু নোয়াহ।" আমি নীরবে তাঁহার অশ্বমোহন করিলাম। মিছর মা চেয়ার ছাড়িয়া পাঁচাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "বস বাবা অনিল বোস—মিছ, অনিলকে এক পেয়ালা চা করে দে"—এখন মিছটির কথা কিছু বলি; কারণ আমার প্রশ্নটা তাকে দূর থেকে রেখে অব্যবহিত কি যেন বলি বলি করছে স্বতরাং না বলে আর থাকতে পারছি না—এবং এ জিনিসটা এমন বোঝাও যে এই উজ্জ্বলস্নেহ মুখে না বলিয়া ফেলিলে পড়ে যত লজ্জার বলা হইবে না আর নয় ত থাক বাকী হলে বেয়ম নেতিয়ে পড়ে তেমনি পড়ে বলটা দূর তো রস-

হীন প্রাণহীন হয়ে পড়বে। কি সেই জন্তই গেয়েছেন "বলি বলি বলা হোল না" এই না বলার মধ্যে কুড়মীর প্রশ্ন আছে স্বীকার করি কিন্তু তেমনি বোঝানো আছে; স্বতরাং কুড়মীর খাতিরে বলা বন্ধ করা চলিবে না—বরিতে যাইলে পেট ফুলিবে, বুক ধড়ফড় করিবে প্রাণটা হাঁসকাঁস করিবে চোখদুটো এধার ওধার করিয়া বেড়াইবে পদমধ্য গতিবিধি রহিত হইবে চক্ষুস্থ পদম্পর্কে আশ্রয় করিবে।

মিছ তাহার প্রোট জনকজননীর মধ্যে পাড়াইয়াছিল যেন অন্ধকার মেঘের মধ্যে বিহ্বলের রক্তবরষার মত—যেন আনন্দের একটা হিরোল—মৃগ্মন্তী সরলতা অথচ তাহার বিনয় লজ্জা ও সন্তোষের মধ্যে একটি সন্তোষ সলীল প্রগলভতা ছিল যাগতে তাহাকে বেশী করিয়াই ভাল বাসিত—হ্যাঁ! একি বলিয়া ফেলিলাম, এতো কুড়ম জনোচিত হইল না; তবে কি চক্ষে আসিয়া কুড়মীর পরিচয় আমাকে কাটিতে পাইয়া বসিল। যাক তার কথা আর বলি না—বাসু! জঙ্গবাবু একধালা চেয়ারে বসিলেন, আমি একধালায় বসিলাম। স্রীমতী মিছ পাড়াইয়া খাঁড় নীচু করিয়া চায়ের দিয়ালার চামচ দিয়া তিনি মিখাইতে-ছিলেন; পেয়ালায়ও চামচে টুন টুন স্বনি উঠিতেছিল আর তার তার হাতের চড়কা চড়কা ভায়নম কাটা চুটীগুলি রূপ রূপ ক্ষতিয়া রপিতেছিল। এই ছুইয়ে মিখিয়া আমার প্রাণ যে একটা মিঠা রকমের কনকনি আনিত্তেছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

মিছর ঘাড়টা ছিল নীচু করা—নুড়ী ছিল টিপ-পেট কিছু চোখের তরাফদুটা সেই সসীম স্নেহ স্রোতবরের মাঝে যে ছুটাছুটি করিতেছিল তাহা আমি পৃথিব্যন্তর হালকি করিয়া বলিতে পারি কারণ তাঁহার সেই সসম চকিত চকিত হইতে হইতে একটা অস্বিকৃতিপূর্ণ আমার পানে ছুটীয়া আসিতেছিল আমার দৃষ্টিবাহিনী। অনেকদিন ঘুরিয়াই তথাইয়াছিলি কাকেই সন্দেশই আভ্রন লাগিল লাউ লাউ করিয়া অনিল। আমি চকল হইয়াছিলাম, কি কোনরূপ অসভ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কি কোন রকমে ধরা পড়িয়াছিলাম—জানি না। কিন্তু ভয় হইতেছিল কারণ মিছর—সেই খাঁড় নীচু-করা মেয়েটির চাপা ঠোঁট দুটা কস বেয়ে একটু একটু বিজয়ের হাসি

গড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু সাবজবাবু সেদর কিছু লক্ষ্য করেননি বলা করেননিয়া। কিরূপে, যে যথেষ্ট এদর লক্ষ্য করার সে বদর দিতে অনেকদিন ছেড়ে গেছে এখন তিনি বসেগিয়াছেন খুল খুল লইয়া পরম আনন্দে আমাদের দুজনকে সম্মুখে দেখছিলেন চা প্রস্তুত হইলে মিছ তার বাপকে এক পেয়ালা দিতে গেলেন তিনি বলিলেন "আরে বেটী অনিল হাতে আমাদের অতিথি, ওক আপো দিতে হয়" আমি অনিল শৌভবের পশরা ধুয়ে বসলাম "তাতে আর কি আমি" আমাদের ঘরেরই ছেলের" শেষ ছুটা কথা শুনেই মিছ একটু মুগ্ধা করিয়ে নিলে বোধ হয় হাসিটা চাপতে না পেরে কিছু করে একটু হেসে নিয়ে আশ্ব-সংঘত হল। তারপর এক পেয়ালা চা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন "এই নিন"। মিছর মাতার কুখ্যাত গৃহিণীদাম যথ পাকাছিলেন। জঙ্গের গৃহিণী—তার কাছে স্বহস্তার ছাড়া তো অবিচার হইবার কোন আশঙ্কা নাই। তিনি attachment before judgment করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বসিতে বসিয়াই থরে থিয়াছিলেন, আসিবার সময় ছ'হাতে ছুই থালা খবার লুইয়া আসিলেন। একখানি আমার সামনে রাখিয়া বলিলেন "বাবা অনিল, এই সন্দেশ রসগোল্লা সব আমার মিছর হাতে তৈরি, বাড়ীতে ছয় কেটে জানা করছে—" আমি বলিলাম "বাঃ বেশ ত!" জঙ্গবাবু সন্দেশ কামড় দিতে দিতে বলিলেন "এ তোমারা ভীমপাশে চেয়ে কম যায় না—মৌী আমার রূপে লক্ষী গুণে স্বরস্বতী। একদিন যদি ওর গান শোন তো আবাক হয়ে যাবে এই তো মোটেই বোলয় পকেছে কিন্তু রবিবার গানগুলিও নিজে বাজিয়ে যা গায়, তা সত্যই অনেক বড় গাইতেও গায়িতে পারেন না" মিছ কিন্তু এই সুকল প্রশংসার চাপে বিশেষ সঙ্গতিতে হয়ে পড়ছিল—তার মা তাই দেখে বসে "এতে আর লজ্জা কি মা—অনিল তো আমাদের ঘরের ছেলে" সন্দেশগুলা খাদে অশ্রুভূষা হইলেনও লজ্জা আসিয়া কঠনালী এমন জোরে টিপিয়া ঘুরিয়াছিল সে পেণ্ডলা তাহার মধ্য বিধা পজ্জনে যেন পলিখা হইতে পারিতেছিল না—এমন কি সন্দেশের ঊৎসবগন্ধ ছুটা যে সাধুবাদ করিব তাহারও উপায় ছিল না—কোন ভাষাই সেই কষ্টকণ্ঠে গিয়া বাহির

হইতে পারিল না। কোন রকমে জগদগগ স্নানপ্র করিয়া উঠিলাম—জঙ্গ বাবু বললেন "আর সন্দেশগুলা খোঁষায় যাবে, চল খাব গিয়া বসে দুজন গল্পগাড়া করি—মিছ মা তোর কাজ না থাকতে বরং ছু'একটা গান আমাদের শোন"—মিছ হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল এক দৌড়ে ঘরের পানে ছুটিল। মিছর মা আমার বললেন "এদ বাবা অনিল আর্যা যাই" বলিয়া আমাকে ডুকিয়েলেন লইয়া চলিলেন—সেখানে একখানি বড় কৌড়ে আমি আরাম করিয়া বসিলাম। ভূত আসিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া গেল। মিছর মা তখন কতকগুলো দুাননের কাজ আনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বসাইলেন যে মিছর মত শিল্প কর্ণে পারদর্শিনী কোন বায়ালীর মেয়ে আর আছে কি না তাহা গভীর সন্দেশের বিষয়। তারপর একটা ভূমিখ খাতা আনিয়া water color-এ জাঁক হাঁস, বক, গাছ, ফুল দেখাইয়া তাঁহার কল্পার চিত্র-বিভাগও যে বিকল্প আশ্রয় অধিকার তাহা বসাইতে লাগিলেন আমি সকল কথাতেই ই। দিতেছিলাম কারণ আমার মনটা তখন এই সব বিচার অবিকারিগীতী কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছে তা জানিতই উৎসর্ক হইয়াছিল, আমার নয়ন তুবিতে হইয়া উঠিতেছিল—কণ্ঠস্বর সেই অন্তরালবাসিনীর কবের কনক কণ্ঠস্বর শিখিনী স্তনিত উৎসর্ক হইয়াছিল—মনটা দ্রবকারা ভাঙ্গিয়া সেই গোপনে অস্বাভাবিকারীকর জগৎকমলের উদ্দেশে মাখিত হইতেছিল। এমন সময় মিছর মা ডাকিলেন "মিছ কোথা গেলি অনিলকে তোর সেই "মায়া না তোমার ভেড়া বাবা" গানটা শোনান, অনিল বাবা, মিছ এ গানটা এমন চমৎকার গায় যে লোকে মনে করে ঠিক যেন গ্রামোফোন বাজছে—" গ্রামোফোনের গান যে গানের একটা আশ্রয় আমি তাহা জানিতাম না; তবে মিছ যখন তেমনিটাই গাহিয়া থাকে তখন সেটাকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। অতঃপর মিছ দ্বন্দ্বরী তাঁহার অজ্ঞাতবাস ত্যাগ করে স্বয় শরীরে অশ্রুমেজ্জলে বহাল তরিতে ডুকি ঝুমে এবে আশ্রয়প্রাপ্ত করলেন। লাজে তাঁর ব্যক্তি হুটী হুটী মুখে কলমের মত, আর গও ছুটা লাজে বাজা, আর আসছিলেন 'সরমে জ্বলিত চরণে"—এসেই আমার উদ্দেশে একটা ছোট



নমস্কার করে একেবারে সরাসরি গিয়ে আপনীর অর্গনটীর কাছে টুল বসলেন—বখতে গিয়ে রবার সৰু সোণার হারটা যেন একটা পোল খেয়ে নিয়ে, আর পূর্ণ বিলাসিত খেটটাও তার ভালো যেন নেড়ে উঠল—তিনি গান গায়িতে লাগলেন, তাঁর মা মাঝে মাঝে তাকে বাহরা দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন, আর আমি নির্দ্বাক নিশ্চিন্ত হয়ে কাণ দিয়ে শ্রাণ দিয়ে, তাঁর গানের অমৃত কণা কলিলাম। আর দুইটা নুগ পতঙ্গের মত তাঁর সেই উদ্ভিন্ন বোঁবনের রংগের দীপ্ত অগ্নিশিখার পাশে মুখে বেড়াইল। গান বাঘিলে আমি বলিলাম “অতি চমৎকার, এমন মিষ্ট গলা আমি খুবই কম শুনেছি—” মিহর লজ্জানত ঝাঁখি ছুটি পলকের তবে একবার বিবোধীর মত মাথা ঠেলে উঠে আমার চোখের পানে ছুটে এল এবং এক লংহায় আমার চক্ষুর কাছ থেকে কি একটা কেড়ে নিয়ে আমার ধরণীর দিকে সরিষিট হল। যেন হল যেন একটা তারাবাজী অগ্নিসংযোগে উৎফুর হয়ে আকাশের বুকটা বিধেতে ছুটে গেল, আমার সেখানে গিয়ে কিসের স্পর্শে যেন কেন্দ্রে বামনখান হয়ে ধরণীর বুক ছড়িয়ে পড়ল। তবে ঠিক বলতে পার্জি না আমার প্রাণটা যদি সে সময় চোখের উপর এসে ভেসে থাকে তবে সেটিকেই হয়ত সে অপহরণ করে নিয়ে গেছে—যোটের উপর আমি বেশ স্পষ্ট কিছু একটা বুঝতে পার্জিলাম না—একটু আশ্বহ হয়ে দেখি মিহর মাতা-ঠাকুরাণী কান্যাক্ষরে গৃহভাঙ্করে গ্রন্থেণ করেনে, আর সামনের বারান্দার সাবজলবার একটা ইকিচেছোয়ে শুয়ে একটা ভীষণ মোটা বইয়ের পাতা উটোজান আর তাঁর মুখ দিয়ে অনবল পোষা বেকছে। মোটার গন্ধ জানিয়ে মিল যে, তিনি অকস্মিক চুপস্ট সেবন করছেন কারণ বাশ গুণের মত একটা চুপস্টের অর্ধদ্রব স্ফাশবশেণ তাঁর জান হাজের ছ’আঙ্গুলে ধরা ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর সতর্ক উৎসব দৃষ্টি মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়ে এসে বেগলিল যে চোয়ের মাছটা বড়ীতে দিখোছে কিনা ?

আমার কথা শুনে মিহ মুখ নীচ করেই বলে “ছাই গলা—আপনি যেন যেন হয়ত অল্প রকম ভাবছেন” আমি শশবোধে বাধা দিয়া বলিলাম “সে—কি—আমি বা

বলেছি তা সত্য বলে অহতব করেই বলেছি—ওটাকে খাতির বা সভ্যতার আদর কাগল মনে করে যদি আবিধান করেন তবে তো ভগ্নমীর কলম আমার সহ কর্ত্তে হবে। হুড়ে বলে আমার খণ্ডে খাতি আছে এবং নানা কারণে আমি সেটা সহিয়া যাই কিন্তু ভগ্নমীর অলপা দিলে আমার তার বিকক্ষে প্রতীবার কর্ত্তেই হবে।” কথাগুলো একদমেই বলিয়া ফেলিয়াছিলাম কারণ আমি জানিতাম একবার খামিলে আমার সাহস সঞ্চয় করিয়া তাহার কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে দ্রুত ও ক্রেশকর হইবে। বা বলিবার থাকে সংক্ষেপ, একেবারে বলিয়া ফেলাই আমার নীতি। আমার কথা শুনিয়া মিহ একবার চোখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল “আপনি কতবে খুব হুড়ে নাকি ?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “লোকে আমাকে হুড়ের বাদশা বলে” মিহ হাসিল—কিন্তু সে হাসিতে কোন রসনি ছিল না—সেটা ফলটীর মত তাহার অধর গল্প উদ্ভাসিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া আমার তাহার আরক্তিম গণ্ডস্থলে মিলাইয়া গেল। আমার ঝাঁখি ছুটি নির্দ্বাক নিশ্চল হইয়া তাহার নয়ন পানে বেহায়ার মত, বহুস্থুর মত কিসের নিবেদন জানাইল। মন বুলিল আরতী মজুর হইল, তবে সত্যই মজুর হইয়াছিল কি না জানি না। মিহ কিন্তু আমার যাচ নীচ করিল—নয়ন কিরাইয়া লইল কিন্তু মুখে বলিল “কেন আপনার কি কোনো কাজ নাই।” আমি বলিলাম “কি কাজ করিব বলুন—আনকাল আপনারা পুরুষের সঙ্গে সমান অবিভাবের দাবী করিতেছেন। আনয়া, পুরুষেরা যদি সেই সব অবিভাব আপনারদের বাড়িয়া না দেই তবে বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আপনারা ভাঙ্করা পড়িতেছেন, ব্যারিটার হইতেছেন, টাইপিষ্ট হইতেছেন, হুডো কোরাণীও হইবেন এমনকি রাজনৈতিক কমেণ্ডও কর্ত্ত্ব করিতে চান—সংবাদপত্রের সম্পাদকের কার্য করিতেছেন প্রভৃৎ আমরা নীচক্রয় না হইলে তৌকটুকি বাঁধিবার ভয় বেশী” “ও—আমাদের লজ্জাই আপনি হুড়েনা ব্রত ধারণ করিয়াছেন—যাক্ আপনারা কখনোবর এমন সময় মিহর না ঘরে আসিলেনে সমুখে একটা কোঁচে বসিয়া বসিলেন “মিহ—যা’না রান কতক

চপ কাটেন্টে ভেঙ্গে এনে দেনা অনিলবাগুকে, শীতের সময় লাগবে ভাল” মিহ হাসিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন—হাসি শেখিয়া বুলিলাম আমার কানির জ্বলু হইয়া পেল তবে এ কানীটা যাবজ্জীবনের কানী অর্থাৎ না মরা—পর্জি। মিহর মাতাঠাকুরাণী ইত্যবধরে তাঁহার কন্ডার ক্ষুদ্র রক্তন-বিভার ব্যাথা করিতে লাগিলেন আমি নীরবে এই অন্তর কারিনী প্রবণ করিতে করিতে ভাবিলাম কলি-মুগের এই ত্রৌপদীটির বিবাহের কি উপায় হইবে কারণ এখানে পক্ষপাতের এক পতীই আইনে বাধিত। যথাসময়ে গরম গরম চপ কাটেন্টে আসিল তাহার সন্ধ্যাহার করিয়া পূর্ণ উত্তর,কত-বিকত জ্বর লইয়া ঘরে কিরিলাম বন্দন, প্রত্যন আমার টেবিলের বি-টাইমপিস্ট জানাইল

১টা বাজিয়া গিয়াছে। এতখানি সময় কি করিয়া এত সহজে বিনা আমায়ে ব্যাচিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। বলা বাহুল্য যে ইহার পর উভয় পরিবারের নবদ্বারপিত আমাধীত পুত্রটুকু বহাদুর খনিষ্ঠতায় বেশ মূল ও চুচ হইয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতরে পিসিনাতেও মিহর মাতে মন ঘন ‘সাবকমিটা’ সবিতে লাগিল—এবং একই দিনে এক গাড়ীতে আমরা উভয় পরিবারই দেওবর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। তারপর কি হইল জানিতে ইচ্ছা করেন ? মিহ একশে শাহকে সময় কাটাইবার লজ্জ আমার কক্ষে এবং বন্ধে বন্ধী পাঠা লইয়াছে কিন্তু আমাকে ডাকিবার আবশ্যক হলে বলে “ওগো, ও-হুড়ের বাদশা !”

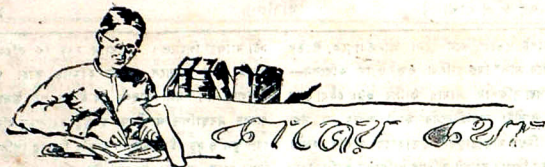
## বারাঙ্গণ

ত্রিফলকিশোর দাস বি-এল

ও নহে পোভানা সিঁখি—বলকে দামিনী,  
মোহনিয়া বেগী নহে—বন্ধনের জুবি,  
বসিম জগৎ, ও যে কামের শিখিনী,  
নলিন নলন তীজ গরলের জুবি।  
বিমালিনী আভা যেন নব মঞ্জরী—  
ওই হামি—কামারির অলঙ্কার হইল—  
ও নহে মৃণালনিধি তুজ বলরী  
কোমল গরম—ভীম তুমুল বেটন।  
হে মোহিনী, তব ভীত মোহে মদিয়ার  
পক্ষে অল্প জ্ঞান নর সৃষ্টিত চরণে।  
নিষাও প্রাণপথ শিখা তপ আলোয়ার,  
মানব-পতঙ্গ যায়ে জুড়ায় মরণে।  
তাক হুকিনী বেশ, দেখাও ব-তপ  
জোয়ের সরসী নহ—তুমি কাম্যুপ।

ভাঙ্গলী নিশার শেষে পাণ্ডু শব্দর,  
কোণা তুমি অক্ষমুখী মলিনা বালিকা ?  
বিরল কণাল তব, বিভক্ত অধর;  
রবিকর বধ্য যেন বিধ্বী দলিকা ?  
রমণীর মণি জুবি, মুন মোহর—  
কি ছায়েও এ বেশে আভি সেজেছ গলিকা ?  
মমত করী সম, কে কেনে পামর  
অশালে বলিল এই কোমলা কলিকা !  
হে হিমু, সংহর তব সারঙ্গণ নীতি,  
জ্ঞেয় বোঝেতে কেন জ্ঞেয় শাসন !  
কোষায় লজিলে যেন বিপরীত রীতি,  
নিহ্নর মানবী ক্রিয়া—বালিকা দলন ?  
প্রানিরিয়া দাও বৃক, দাও আশা, শ্রীতি;  
বিতারী মৃগল কর করণো গ্রহণ।





গত সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় 'শিকার আশ' নামক প্রবন্ধের লেখকের নাম 'অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ' হলে 'যোগেন্দ্রনাথ' মুদ্রিত হইয়াছিল। একজন আমরা উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকটে ক্রমাগত। আশা করি তিনি মুদ্রাকর প্রমাণজনিত এই ত্রুটি মার্জন করিবেন।

বিলাতের শ্রমিকশ্রেণী ধনীদিগের বিরুদ্ধে এতদিন যে অভিযান করিতেছিল তাহা একটা বিরাট দখলিতে পর্যাবসিত হইয়াছে; ফলে ২৫ লক্ষ শ্রমিক আজ বেকার। সেখানকার গভর্নমেন্ট এতদিন তাহাদিগকে সঙ্কট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের নিত্য নূতন আবদারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এইবার শেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কালক্রমে একরকম বন্ধ—য়েল, জাহাজ, প্রভৃতি চলাচল বন্ধ হইয়া আসিতেছে—সংবার শুল্কগুলিও বন্ধ আছে। উপরিত বৈশ্বকলম-গণের সাহায্যে কোন রকমে খুব দরকারী কাজগুলি করান হইতেছে। এ পর্যন্ত বিশেষ দাঙ্গা হান্ধাম হয় হয় নাই বলিয়া ভনা গিয়াছে, তবে শেষ পর্যন্ত যে ইহা নিরীকরোধে চলিবে এমন বোধ হয় না। তবে বিরোধ বাধিলে তাহা ঘরোয়া লড়াইয়ে পরিণত হইবে—কল কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। এই উপলক্ষে মি: সাকলাতলা উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা করিবার অপরাধে গৃহ হইয়াছিলেন, তবে তাহাকে 'হাউস অব কমন্স ব্যাডী অন ক্রোন হাউসে বক্তৃতা করিবা না' এইরূপ স্তম্ভ করাওয়া লইয়া জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজগণ হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ লইয়া ভারতবাসীগণকে স্বরাজ পাইবার অঙ্গশূলক বলিয়া খুব সৌরগোল করিতেছেন—এখন তাহাদের ঘরোয়া বিবাদ দেখিবা ভারতবাসীরা যদি বলে, "যে

ইংরাজগণ রাজ্য শাসনের অঙ্গশূলক, বাহারা ঘর শাসন করিতে পারে না, তাহারা গরবে স্থানাসনে রাখিবার দ্বারী করে কোন মুখে"—তবে তাহা বোধ হয় অসম্ভব ভনাইবে না? ভারতবন্ধ কি বলেন?

ভারতেও শ্রমিকবিপ্লব গতকাল ভাল নহে, যদিও বিলাতের মত অতটা ধারণা নয় তথাপি এক শ্রেণীর স্ববিধাবাহী লোক শ্রমিকবিপ্লবের উদ্ভাট করিবার অছিলায় তাহাদিগকে যে ভাবে নাচাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বড় ভুল লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজের মধ্যে অনেকই শ্রমিকদিগকে ঠেকাইয়া ছ'গন্ডা করিবার মতভাবে আছেন আর 'কেহবা বাহবা'র লোভে শ্রমিক ক্ষেপাইতেছেন। তাহাদের জানা উচিত যে আওন লইয়া খেলা করিবার এ সময় নয়। বিলাতের লোকেরা স্বাধীন হইয়াও এখন শ্রমিকবিপ্লবের আলায় উন্মত্ত হইয়াছেন এখন এদেশে শ্রমিক ক্ষেপিলে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইবে। আর শ্রমিকদেরও উচিত এই সব তথাকথিত নেতাদিগের মায়াজালে পড়িয়া নিজেদের আয়ের মাটা না করা। এ ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সময় এখনও এদেশে আসে নাই।

গতবারে আমরা মৌলানা মহম্মদ আলির নবমুগ্ধি ধারণের কথা বলিয়াছি, এইবারে তাহার দাঙ্গা মৌলানা সৌকত আলির নূতন মুগ্ধি ধারণের কথা বলিব। বোম্বাইয়ে এক সভায় তিনি কাকেরগিপকে শাসাইয়া বলিয়াছেন যে মুসলমানেরা তাহাদের মত মজিতে ভয় করেন না। উত্তর কথা। তবে খেলাকতী চালা বাহাদের সময় কাকেরের রক্ত শোষণ করিবার আবশ্যকতা ছিল তাই তাহারা এতদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পুরোহিত সাজিয়া ছিলেন।

যাক এই দাঙ্গার আর কিছু লাভ হউক বা না হউক হিন্দুগণ মাঘ চিনিতে পারিল। হিন্দুদিগকে 'কাকের' বলিতে যে বিবেচনাকৃত দুটিটা উদ্ভিগাছে তাহা অশ্লীলিত মুসলমানকে সাজিলেও মৌলানা সৌকত আলির বোয়া নহে এই পর্যন্ত বলিতে পারি। মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এতদিনে বুঝিয়াছেন যে তাহার মত সরলচিত্ত ত্যাগীর কাহা নয় মাঘ চেনা—ধর্মের ক্ষেত্রই তাহার বোয়া। রাজনীতির ছুটলতা ও শতবারে বর্গাবর্তে তাহার মত নিঃসঙ্কট সহজ সরল বিধানীর স্থান নাই। তাই আজ তিনি গভীর নিরাশায় হিন্দু-মুসলমানের একতার সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

নাটোরের হরিগভার গৃহে অস্বিতে ভস্মীকৃত হইয়াছে, মুক্তাগাছা, জিপুরা, হুমিচা, ফেণী, চট্টগ্রাম, পাবনা প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু-মুসলিম যোগদানে নষ্ট করা হইয়াছে। মুসলমান চালিত পত্রিকাগুলি এগুলিকে হিন্দু-বচন সংগ্রহ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান—তাহাদের স্বভাবের এই কাপুরুষতা গোপন করিতে তাহাদের এ চেষ্টা স্বাভাবিক; কিন্তু আমরা জানিতে চাই গভর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন। সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দু-অধিবাসীদের মধ্যে এই ভাবে গুপ্তগুপ্তে আঘাত করিলে তাহার পরিণাম কি পাড়াইবে তাহা অঙ্গশূলক করিয়া এখন এ সম্বন্ধে উপযুক্ত অঙ্গশূলক হওন দান করা কর্তব্য এবং এই শ্রেণীর অত্যাচার আর বাতানে না হয় সেজন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত নতুবা কি হইবে কে বলিতে পারে? ধর্মের উপর অত্যাচারে সহজ শাস্ত নিরীহ ব্যক্তিও কিঙ্গ হইয়া উঠে—এবং অত্যাচার বন্ধ না করিতে পারিলে, গভর্নমেন্ট কর্তব্য পালনে অক্ষম বুঝিয়া লোকে আশঙ্কাকর ভাব নিজ গড়ে গ্রহণ করিলে সারা বাঙ্গাল ছড়িয়া দাঙ্গা বাধিতে পারে। রাজনৈতিক উদ্বেগ সামান্য শ্রেণী বিশেষকে অপর কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে অত্যাচার করিতে দেওয়া সকল সময় নিরাপদ নহে।

দাঙ্গার লেখালেখি লইয়া বহুমতী, দুর্ধু, ভারতমিত্র, ছোঁহুতান ও হানাকী আইনের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। যামসার দিন পড়িয়াছে, ফলাফল পরে ভনা যাইবে।

ট্যাঙ্কির নথর প্রকাশ করা লইয়াও ছ' একটা প্রেসের স্বাধিকারী ও মুদ্রাকর অভিজ্ঞ হইয়াছে বলিয়া ভনা গেল। বরগুড়া ও 'পত্রিকা', তাহারা কোন শাস্তি রক্ষার জন্য মুচলেনা দিতে বাধ্য হইবেন না তাহারা কাজ দর্শাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অথচ মোহাম্মদী, মুসলমান প্রভৃতি মুসলমান চালিত এবং হিন্দু চালিত ছ' একগামি পত্রিকা কি করিয়া আইন এড়াইয়া গেল তাহা বুঝা গেল না। গভর্নমেন্ট এ ভাবে কি জাতীয় বিশেষ দমন করিতে পারিবেন? মেঘের আড়ালে যে সকল হিন্দু-বুজিবান বর্ণন করিয়া দাঙ্গাকারীদের নাচাইতেছে এবং বাহারা সারা বঙ্গে দাঙ্গার বিষ ছড়াইয়া দিতেছে তাহাদের কি গভর্নমেন্ট কিছুই করিতে পারিবেন না।

সরমসভীর প্যাট নাকি আবার ফ'শিয়া দিয়াছে—দুর্ভাগ্যে ভারত—তোমার সম্মানদের মধ্যে একটা বৃদ্ধি আনিবে না, নতুবা স্বরাজ কোন দিন তোমার করতলগত হইত। এই যে স্ব-প্রধান ভাব—এই যে আশা গণ্ডা পাত কাগম, এ ভাব ঘূর না হইলে—একজনকে মানিয়া চলিতে না শিখিলে দল কখনও পড়িয়া উঠবে না আর ভারতবাসীরা সম্মত হইতে না শিখিলে স্বরাজ কিছুতেই আসিবে না। দোষ কারও নয় ভারতের অসুখে নিতাই ভাগ্যনিরতা বাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা শ্রমিকের বিষয়ই আজ এত দাঙ্গাধীন, মনসকসপি এত আঘাতের।

ইসলামিক জগৎ নামক একগামি মুসলমান চালিত পত্রিকায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যোগাযোগের নিবন্ধিগণের দ্বারা বিশেষ মঙ্গলোৎসবে কি দাম্পত্য কতি হইতেছে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হজরত মহম্মদের পবিত্র বাণীর কণ্ঠ করিয়া এই শ্রেণীর লোকগণ যে পৃথিবীতে অশ্রবক কলহ বিবাদের স্বজন করিয়া থাকে তাহাও স্বীকার হইয়াছে। ধর্মের নামে কলহ করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি স্বার্থের সর্গী দৃষ্টিতে বাহারা অঙ্গ তাহারা ধর্মের মোহাই দিয়াই বিবাদ বিসম্বাদের স্বতী করে।





### শ্রীক্ষরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অজিংশ

তখন ঠেঁশন হইতে নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া রাত্রি তিনটা বাজিল। মুক্ত জানালার পথে প্রবেশের শব্দ্যার উপর প্রায় অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাবোধের স্রোত প্রবাহিত হইয়া পড়িয়াছে। সারা প্রকৃতি যেন নিস্তর গাভীর মতো শুভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেবল শ্রান্ত নিস্ত্রাঙ্গা রমণীর রূপ বনানীতলে মত অশ্রুতে ভাস্ত তটিনী মুহু বায়ুস্পর্শে তরলীভূত হইতেছিল। মাঝে মাঝে ছুই একটা বিধ্বংস ফুকারিয়া উঠিতেছিল। এতক্ষণ প্রবেশ বোধে নিস্ত্রা হইতেছিল। মহুয়া সে যেন কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া জ্ঞাতে চক্ষু উদ্বীলন করিল। চারিদিকে যেন কাহার সম্মানে চাহিল। চক্ষু চাহিয়া মাত্র সে দেখিল তখন তাহার শব্দ্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে মহুয়া একই ভাবে।

“এ কি!—মহুয়া তা হ'লে তুমি সত্যই আমাকে ছেড়ে বাও নাই?” বলিয়া প্রবেশ আনন্দ আনন্দে মহুয়ার শব্দে প্রতি চাহিল।

মহুয়া ঘোরে ঘোরে তাহার চক্ষু প্রবেশের কাতর দৃষ্টির নিকট হইতে সরাইয়া লইল। তারপর সে নিকটের সমস্ত করিয়া মুহু ও সমবেদন-কাতর কর্তে উত্তর করিল।

“এখনও যে আপনি সম্পূর্ণ স্বস্থ হতে পারেন নাই। কেমন করে ফেলে যাই বলুন? মা, যে আপনায় সেবার তার আমার উপর বিশ্বাস করে। বিয়েছেন।”

“তা হ'লে আমি স্বস্থ হলেই চলে যাবে কেন?” বলিয়া প্রবেশ মহুয়ার শব্দে প্রতি একটা সঙ্কল্প অস্বপ্ন-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মহুয়া শব্দ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বাধিত স্বরে উত্তর করিল “আমার না গিয়ে যে কোন উপায় নাই, তাতো আপনি জানেন। অকারণ আমাকে নিষ্টের বিবেচনা করেন না। জগদত্ত অন্তরায়, যে ব্যবহার আমাদের মধ্যে নিবিড় শৃঙ্খলে দৃঢ় বলে বন্ধন করে বেছেছে তার মধ্যকার রক্ষা করবার নিমিত্ত সমাজের রক্তচক্ষু সর্বত্র সতর্ক পাহারায় আগ্রহ রয়েছে তা তুললে চলবে কেন!”

“সমাজকে আমান্ত করলে চলবার দুরতিসিদ্ধি কোন দিন আমার ছিল না, আজও নাই। এমন কোনও পথ, কোন দিন স্বপ্ন বলে গ্রহণ করব না,—যাও প্রিয় মনের অন্তরে গীড়া দেবার বা লজ্জা পাবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাকে বিশ্বাস কর মহুয়া। তোমাকে নারীত্বের পূর্ণ গৌরবে, সমানে প্রতিষ্ঠিত করে পারি তা আমার জীবন-দাত্রীর আমার পুত্রার অর্থা অন্তরের রক্তজ্ঞতা চক্ষু অন্তরিত করে, শ্রদ্ধা উপহার দেবার দাবী করব।”

“এ যে আমার চুপে, দুঃখাকাজ্ঞা বলে মনে হচ্ছে! দুর্বল নারীর অধিকার অন্তরে আমার উজ্জ্বল প্রতীপ জ্বলে তার অসম্ভব প্রত্যাশাকে প্রলুদ্ধ করবেন না। আমি আপনাদের দয়ার কাশাল, মেহের ভিখারী এর বেশী চাহিবার মত দাবী বেহের মেয়ে কোন দিনই আশা করে নাই।” বলিয়া মহুয়া প্রবেশের শব্দে উপর একবার কক্ষ কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া তখনই দৃষ্টি অত্যধিক কিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল “এখন কেমন আছেন।”

“বেশ ভাল আছি। আমার যা অস্থব্ব করেছিল, তুমি না বললে, মনে করবার কারণ ছিল না মহুয়া।”

“এখন রাত অনেক বাকী আছে। আপনি যুগোয়ার চেষ্টা করুন।”

“আজ অনেক ঘুমিয়েছি আর ঘুম হবে না।” বলিয়া প্রবেশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তারপর প্রবেশ অনেকক্ষণ একই ভাবে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। মহুয়া মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। মহুয়ার মনে হইল হয় ত সে এমন কোন কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, যা প্রবেশের অন্তরে আঘাত করিয়াছে। সে আগাগোড়া তার নিজের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু মহুয়া আজ তার নিজের একটাও কথা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না। প্রবেশ যা তাহার কথার উত্তরে বলিয়াছে, সেগুলি সহস্রবার শ্রুত এখন মনে হইতেছিল।

প্রবেশ ডাকিল “মহুয়া?”

মহুয়া চিন্তার স্রোতে বাধা পাইয়া চমকিয়া উঠিল। উত্তর করিল “কেন!”

“সারারাত্রি তুমি দেবীর মত আমার সেবা কর’হে। এবার তুমি বিশ্রাম কর। তুমি একটু ঘুমাও। নইলে স্বস্থ হবে মহুয়া।”

“আমার জন্য ভাববেন না। আমার এতে কোন কষ্ট হয়নি, আপনি অস্থব্ব রাত জাগলে আপনার অপকার হবে। আপনি শুয়ে পড়ুন।”

এবার প্রবেশ মুহু হইয়া উত্তর করিল—

“বেশের মেয়ের এ দৃষ্টি খুবই স্বন্দর। তোমার রাত জাগলে বুঝি কোন কষ্ট হয় না? অস্থব্ব করতে পারেন

না? সমস্ত ভাবনা চিন্তা বুঝি আমার জন্য? এমন করে অন্যের সেবা সত্য আমার করতে পারি না। কিন্তু তার অর্থ প্রাপ্যতা করে সেবা ও পরিচয় করতে যে কি কষ্ট হয় তা বোঝবার মত ক্ষমতা ভগবান দেন নাই একথা বললে তার করুণার অশ্রদ্ধা করা হয়।”

মহুয়া উত্তর করিল “আপনি বিশ্বাস, জানী বীকার কর, কিন্তু মনে রাখবেন আপনি রৌদ্রী স্বতরাং এই নির্জন গভীর নিশীথে আজ আপনাকে আমার হৃদয় মেলে চলতে হবে, আজ আপনার স্বাধীন কোন ইচ্ছাই চলতে পারবে না। আপনাকে আমার জন্য ভাবতে হবে না। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হ’য়ে শুয়ে পড়ুন।”

প্রবেশ হাসিয়া বলিল, “হৃদয় অমনা করবার অধিকার আমার নাই, যখন না তোমাকে যে অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মহুয়া, মা তোমাকে যদি এমন অধিকার দেন, যাতে করে আমাকে চিরদিন তোমার হৃদয় মনেতেই থাকাই থাকে তাহলে আপনি এমনি ভাবেই অকরণ প্রত্যাখ্যান বয়ে নিয়ে আসবে?”

“হৃদয়দ্বারের আদেশ মানাই হচ্ছে আপনার কাঙ্ক্ষা। তাকে প্রশংসা করবার কোন অধিকার আপনার আছে কি না, মাঝে জিজ্ঞাসা করে জানাব। এখন আপনি যুগোয়ার কি না বলুন? প্রত্যাখ্যান করবার মত গৌরব আমার থাকলে, হয় ত তা করবার পক্ষেই আত্ম-সমর্পণ করবার পক্ষ। আমার জগে উঠতে মোটেই দ্বিধা করত না।

মা যদি সত্যই আপনার উপর হৃদয় চালাবার আইন চিরদিনের জন্ত আমাকে কায়েম করেন, তখন অবশ্য আমার সে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে একটা আপোষ করতে যে রাজি না হবে এমন কথা বলতে পারি না।”

“তমের দিনের জন্ত আশা পথ চেয়ে বসি আমার চিরদিন কাটে তাতেও আমি সত্য বোধি হইয়া যাব। দেখা যাবে সে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে একটা আপোষ করতে যে রাজি না হবে এমন কথা বলতে পারি না।”



“আমি ভাল করে বুঝে দেখিনি?”

“কেন দেখ নাই মহুয়া?”

“ইচ্ছা হয় নাই?”

মহুয়া এবার অল্প হাসিয়া বলিল, “আপনি দেখেছি আচ্ছা নোক ত? আপনি যদি না খুমান, আমি এখন মাকে তাকে আনব।”

“কেন ইচ্ছা করে নাই বলতে কি দেখা আছে?”

“নিষ্প্রিয় বাথকে অক্ষর উত্তেজিত করে বিপদকে কে আহ্বান করে থাকে বন্দু?”

“বুকেছি! তাহ’লে দেখছি, নিফলতার আশঙ্কায় সন্দেহভায়ে দূরে তেলে রেখে আত্মকর আহ্বান করছে। বেশ তুমি তাহ’লে বিশ্রাম কর আমি বাইরে চললাম।”

মহুয়া বলিল, “আদেশ অমান্য করলে কি হয় জানেন?”

“আনি পাতি নিতে হয়?”

“তাহ’লে আমি মাকে ডাকি?”

“আর আমি বৃষ্টি মাকে ডাকতে পারি না?”

“আজ আপনার সে হুকুম নাই মনে রাখবেন। আমার হুকুম আর সর্বত্র প্রবল।”

মহুয়া বলিল “থাক এতদ্ব্যজ্ঞিতে মাকে আর ডাকবার প্রয়োজন নাই। আগনি শুয়ে পড়ুন। আমিও যেনেতে চাই। আপনাকে আর বাইরে যেতে হবে না।”

মহুয়ার কথাই বাহাল রহিল। প্রবেশ পুনরায় শয়ন করিল।

মহুয়া মেঝের উপর অঙ্গল বিছাইয়া উঠিল। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিল। মহুয়া প্রথমটা একবার ঘুমাইতে প্রয়াস পাইল কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রা আসিল না। নানাবিধ চিন্তা আজ তাহার মনের চতুর্দিক বেঁধে রাখিয়া তাহাকে কোন অধির কানিয়া তুলিল। সে তার মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত তার জীবনের সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথাই আজ যেন তার সারা জীবনের স্মৃতিত কানিনীকে বিলুপ্ত করিয়া নৃতনের মিথিয়ার প্রকৃষ্টিত হইতে চলিল। তার দাঙ্গ যে তাহাকে অন্ধরের সহিত

সেই করে তাহা সে খুব ভাল করিয়া জানিত। তাহার লজ্জাই যে বুড়া আজও আলোবিরহী কুঁড়ে ঘরের অপরিহার্য গভীর মধ্যে, তার মুক্তজীবনের গতিকে শূন্যলিখিত করিয়া রাখিয়াছে। তার বেগে জীবনের শাবনিতাকে পরাধীনতার আসনে অস্থগুণ উৎপীড়িত করিতেছে, সে যে কেবল মহুয়ার ভবিষ্যত ভাবিয়া, তাহা মহুয়া অন্তরে অস্থগুণ করিত।

এই বেলা বৎসরের ভিতর মহুয়া কোন দিনই তার বেগের দায়ুর কাছ ছাড়া হইয়া একটি দিনও কোন খানে অভিযান্ত্রিক করে নাই। আজ যে তার দাঙ্গ কুঁড়ে ঘরে ফিরে গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে কি ভয়ানক ভাবনার না পড়িয়াছেন। হয়ত বুক আর বহুপুর্ণ ব্যথিত অন্তর-খানি নিয়ে, উৎকণ্ঠায় এই স্থবীর রজনী পথের পানে আমার প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে হয়ত আমার কোন দৈব দৃষ্টিগোচ্য ঘটনায়ে ভাবিয়া নীরবে অঙ্গ বিসর্জন করিতেছে। হয়ত সকালে আমাকে না দেখতে গেলে ঘরে আশ্রয় ধরিয়ে দিয়ে কোথায় চলে যাবে! দাঙ্গকে একটা খবর না দেওয়া যে কত বড় অন্তরায় হয়েছে একথা ভাবিতে মহুয়ার বুক ছুর ছুর করিয়া কপিয়া উঠিল। সারা দিনের ভিতর মহুয়ার যে এতদূর চিন্তা একবারও মনে আসে নাই সে লজ্জা সে তার নিজের আচরণের নিকট যেন কোন কৈফিয়ৎ অস্থ-সন্ধান করিয়া পাইল না। তার ফেন মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা, তার দায়ুর নিকট গিয়া পাড়াই-বার শব্দ ছোড়া করিয়া পাড়াইল। সে যেন কি করিয়ে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া দ্বিগুণ করিতে পারিতকি না। যতক্ষণ প্রবেশ অস্থ ছিল, ততক্ষণ এসব চিন্তা তাহার মনের মধ্যে স্থান পায় নাই। মহুয়া আর তুইয়া থাকিতে পারিল না। সে উদ্গারিনীর মত উন্মীয়া বলিল। প্রবেশের শব্দ আর বিকে চাহিয়া দেখিল, সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একবার মনে হইল। প্রবেশকে ডাকিয়া সে এখন তার দায়ুর কাছে চলিয়া যাইবে। কিন্তু আবার তার ভয় হইল তাহাকে লাগালে পাছে তার শরীর ধারাপ হয়। তবে সে এখন কি উপায় করিবে। কেমন করিয়া তার দায়ুর পেছন বন্ধের করণ আশ্বাসের মধ্যে

গিয়া থায়া দিলে। মহুয়া আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে মুক্ত আকাশের নীচে আসিয়া পাড়াইল। মনে করিল করুণামতীকে ডাকিয়া বাহিরে যাইবে। কিন্তু তার সে সাহস হইল না। সে নিরন্তর প্রকৃতির কোলে যৌন স্থানী আকাশের নিয়ে পাড়াইয়া করজোড়ে বিধাতার নিকট কাতর কর্তে অস্থ-সিদ্ধ নয়নে প্রার্থনা করিল “আমাকে বল দাও, হৃদয়ে নিয়ে চল তখান।

টিক সেই সময় গৃহের মধ্য হইতে প্রবেশ ডাকিল,

“মহুয়া!”

মহুয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

“জামাকে ডাকছেন?”

## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতী, চৈত্র, ১৩৩২—“ভারতী” পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল; ইহা বড়ই আনন্দের কথা। বাঙ্গালী শিশু বয়সে বাঙ্গলা মাসিকের ভাণ্ডারে অনেক স্থলে বিখ্যাত-পুস্তক পঠনেষে মুগ্ধা লিখিয়াছেন। অদৃষ্টও পুস্তকাকারে যখন মধ্য যুগে দীর্ঘজীবন লাভ করিত থটে। “ভারতী” এই দীর্ঘজীবন সাহিত্যসাধনা দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয়তা ও লোকপ্রিয়তা হৃদিত করিতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে, এই ভারতী-মন্দিরে অনেক ভক্ত কৃত্তিক পূজোপহার বহিয়া আসিয়া মায়ের ঐশ্বর্য বুদ্ধি করিয়াছে। এই ভারতীর পবিত্র মন্দিরে ঠাঁয়র বিশ্লেষণ প্রমুখ পঞ্চ ভাষার জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ জালিয়া আরজিক করিয়াছিলেন। একে একে বন্ধের ঠাঁয়র বিশ্লেষণ প্রমুখ পঞ্চ ভাষার জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ নিভিতে আরজিক করিয়াছে, মাত্র রবির উজ্জল বিভা অবশিষ্ট।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ “বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা”

“হা! মহুয়া, আমাকে একটু জল দাও বড় তৃষ্ণা।”

মহুয়া জল দিল।

প্রবেশ জিজ্ঞাসা করিল, “মহুয়া, তুমি কি ঘুমাও নাই?”

“ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, কিছুতেই ঘুম এলো না। দাছ বোধ হয় আমার জন্য বড় ভাবছে।”

“কেন ভাববে মহুয়া। লজ্জিকা যে তোমাকে তখন বললে তাকে সত্যই পেওয়া হয়েছে, তাকি তুমি শোনো নাই।”

মহুয়া উৎকণ্ঠ হইয়া বলিল, “দেওয়া হয়েছে।”

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখায় সম্পাদিকা কর্তৃক পঠিত অভিভাষণ। ইহাই এই সংখ্যার সর্বপ্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধাকারে লেখিকার ব্যক্তিগত আলোচনামূলক সকলেরই চরম স্পর্শ করিবে। বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গভাষার উৎপত্তির ইতিহাস দিতে গিয়া লেখিকা যে পাণ্ডিত্য, যে গবেষণা ও পাঠ্যগ্রহণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হুগুণ্ড। প্রবন্ধের ভাষাও মর্শ্বশীর্ণী ও উদ্ভীর্ণনাময়ী।

স্বর্গীয় বিশ্লেষণের সঞ্চয় এ সংখ্যায় তিনটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রথমটি বুদ্ধ অমৃতলালের “সেকালের কথা।” এই প্রবন্ধের নাম “সেকালের কথা” না হইয়া “বঙ্গ-সাহিত্যে ঠাঁয়রবাজীর প্রভাব” রিলেই যেন মানাইতে ভাল। বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে এবং বঙ্গের জাতীয় ভাবের স্মরণে লোড়ালোকের ঠাঁয়র বসীয়েরা কিরণ কার্য করিয়াছেন, এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়া মহাশয় তাহার প্ৰকাশসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।



দ্বিতীয় প্রবন্ধ শ্রীহৃৎ অবনীন্দ্রনাথ রায় রচিত "বিজ্ঞাননাথ" প্রবন্ধটি আভ্যুপগম্য সম্ভবতঃ সর্বসৎ এবং সেজন্য স্বয়ং-শীর্ণ। "ভাব কি পেকেছে?" শীর্ষক প্রবন্ধ বিজ্ঞাননাথের শিল্প-স্বপ্নের পরিচয় দিতেছে।

প্রাচীনকালের জীভা কৌতুক" শ্রীমদীন্দ্রনাথ বসু রচিত একটি মৌলিক প্রবন্ধ। এ যতদূর মনে পড়ে এ প্রবন্ধটি মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত "মাধবী" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নাম জাহির করিবার ইচ্ছাটা আভ্যুপগম্য লেখকের মধ্যে এত প্রবল যে তাহার সাহিত্যিক রীতিনীতির ধার ধারেন না। এই লেখকই উক্ত অধ্যাত্ম মাসিকের সম্পাদক; তিনি নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় প্রবন্ধটি বাহির করিবেন ইহা মনে মনে স্থির করিয়াও কোন রীতি অহুদারে "ভারতী"তে প্রকাশের লজ্জা প্রবন্ধটি পাঠাইলেন। অন্ততঃ "ভারতী"তে প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার এ প্রবন্ধ নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বিরত থাকা উচিত ছিল?

"মেদিনীপুরের মোসেম পুরাকীর্তি" শ্রীহৃৎ মহেন্দ্রনাথ রায় রচিত। ঐতিহাসিকের নিকট এ প্রবন্ধের বর্ণিত বিষয়গুলি আশ্রয়ণীয় হইবে।

শ্রীচিন্তরঞ্জন রায়ের "বড়াম" ও "বিশালাকী" (মেদিনীপুর ও স্বপ্নরবন অঞ্চলে পূজিত দুই দেবতার পরিচয়) এবং ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর "অজ্ঞাত ইচ্ছা" (Psycho Analysis সম্বন্ধে রচনা) স্বপ্নপাঠ্য হইয়াছে।

"বই বিক্রী" শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত লিখিত রসাত্মক রচনা। অধুনিক পাঠিকা ও পুস্তক বিক্রয়তা সম্বন্ধে একটা নিম্ন

নম্রা। পাঠক ইহাতে চেনা-মুখের ছবিও দেখিতে পাইবেন। আইডিয়াটি লেখকের নিজস্ব না হইলেও এই রস-রচনা পাঠে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি এবং লেখার অনেকখানি শক্তি পরিচয় পাইয়াছি।

কবিতার মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের "নব-বহু।" নিয়ে কবির নাম টুই এই ক্ষুদ্র কবিতাটির পরিচয়। শ্রীকীর্তি ঘোষের "বার্ণ" কবিতা হিগাবে সত্যই বার্ষ "বসন্ত" বসন্ত আলি মিত্রের লিখিত। এই কবিতাটিতে বসন্তশ্রী বেশ সুচিন্তা উদ্ভূত। দ্বিতীয় প্যারাটি আমাদের ভাল লাগিল—

"অশোকের ডালে ডালে কাহ্ন অজ ছুড়িছে গিচকারী।  
অশ্বের পাতায় পাতায় রাখিকার উড়িতেছে শাড়ী।  
ঝড়-বনে বাজে বেগু বৃষ্টি তাই বাতাস উত্তাল।  
হুহু করে কেঁপে ওঠে কি-বন্ধা হয়নি ঘা-বলা।"

"কান্না" শ্রীঅমৃত্যুসুন্দর ভাট্টার রচিত একটি ছোট কবিতা; দুই ছেঁটা আখিল্লের মত করুণ রসে টলটল। একটু উক্ত করিয়া দিতেছি—

"কান্না আর কান্না  
সম্পদেরই সেবা আমার  
হীরে মতি পালা।

পায়ে পেশা মনের আড়ন  
অধির পেয়ালার  
ছপের সাকী বুকের মক  
তুবারে পিলাহ।"  
ইতি স্বপ্ন!



দ্বিতীয় বর্ষ]

১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩০, ইং ১৫ই মে ১৯২৬

[ ৩৯শ সংখ্যা ]

## পরিশ্রুতি

শ্রীবীণাপাণি রায়

সারা নিশি জাগে—আঁধি।  
নাহি ঘুম নাহি রহি পথ চাহি'  
পাছে দিয়ে যাও—ঈদিকি!

আশায় আশায় রজনী কাটাই  
কে জানে কখন সুযোগ হারাই  
বাক্সে দূবে বাঁশি—চমকিয়া চাই  
বন্ধু আগিল নাকি?

প্রতিদিন সম—আজো নিশা ভোর  
প্রভাতী গাহিল পানী,  
প্রতিদিন সম—চোখে বহে সোয়  
দৈরজ—কিসে রাধি?

জাগি সারারাত্তি আত্ম আশায়  
বন্ধু স্বপ্ন এপে ফিরে যায়  
চলিতে একেলা প্রাণ নাহি চায়  
আর পথ কত বাকি?



( ৩১ সংখ্যা ১০৪৪ পৃষ্ঠার পর )

তেজাল হাড়া হুপে অস্ত্রান্ত রোগের বীজাণুও নির্মিত থাকে—দ্রবের তাপমাত্রা আবার বেশে স্তেপে অপরিকৃত অবস্থায় থাকে, তাহাতে এই স্ত্রীণী বিপদের শাসনগণ বৃষ বৈশী। সত্বে অগলে মৃত্যুনা বাসে। অপরকে স্বয়ংগে দেবা দিগাছে—করোবো বৃত্ত রোগীর লম্বা। দিনের নি বাহিত্তেছে। ভাক্কোবো বসন্তে যে স্বরোবোবো বীজা হুয়ের সাহায্যেই বৈশী বসন্ত হয়; তা ভাড়া নির্ম হুয়ের অস্ত্রা, হোয়ের অস্ত্রা, ধুয়ার প্রাণবা, গুয়ে সে-সেবনি প্রভৃতি আকারে যোগে ক্রমশঃ বসন্ত হইয়া যবে। স্বাক্কাল জীবন বাপনের স্তেপে স্বয়ংবো বটায়ছে, তাহাতে মদ্যবিত্ত্রের পক্ষে স্বর্জিবংসার সাহায্য পণ্ডা বা বাসু-পণ্ডার যববা বরা অসম্ভব। তাহো বো পণ্ডীয়াবো ভাক্কার নাই, তাই সেখানে ভা

চাষের কাজে নামিবার পূর্বে—আমাদের দেশে স্বত্বানু  
তাহার কি কি অস্ত্রব্য আছে সে বিষয়েরও আলোচনা  
আবশ্যক। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে ভূমির আবশ্যক—  
অনাবাদী স্থানে যে খুর বেশী পড়িয়া আছে তাহা মনে  
হয় না। পল্লীভায়ে প্রায়ই জমী আবাদ করা হইয়া থাকে  
—তবে অবশ্য ভালরূপে আবাদ হয় না হস্তান্তর ফসলও  
ভালরূপ হয় না কিন্তু তাহাতে কি আদিয়া যাহ—সেগুলি  
কেহ ভাল করিয়া আবাদ করিতে চাহিলেই যে বর্ধমান  
অমিকারী জমী সহজে ছাড়িয়া দিবে তাহা মনে না।  
ভূপ্রশাসনের অধিকারভূক্ত প্রায় সমস্ত জমীই স্বত্বানু  
কৃষকশ্রেণীর অধিকারে কারণ ভূস্বত্বসীমণে নিজ তথা-  
বদানে চাষ করার আয়াস লইতে বিমুখ হওয়ায়, হয় জমী  
তাগে দেওয়া আছে আর নত তাহা বাসনায় বিলি  
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাজনায় দেওয়া জমী ফিরিয়া  
পাওয়া ভূস্বামীর পক্ষেও কঠিন কারণ আত্মকালী কীলার  
দল বাড়িয়া গিয়াছে, মামলা করতে বাধে ও মামলায়  
সম্মুখা বুদ্ধি হয়গোতে, মামলা করতে বাধে ও মামলায়  
কি মধ্যস্থলে কোথাও অভাব নাই। কবে কো  
স্বরাগতীয় যুগে জমিদারেরা নিরীহ প্রজার উপর  
অত্যাচার করিত, তাই সেই কৃষকদের রক্ষার্থ  
সদায় রূপীণ গভয়গেট এমন পাকা বন্দোবস্ত কার্যে  
করিয়া দিয়াছেন যে এখন সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া জমী  
দলন করা জমিদারের পক্ষেও অসম্ভব। চাষের কাজে  
নামিবার পূর্বে প্রজাগণ আইনটী ভালরূপে বুঝিতে  
হইবে। যদিও সোমক ব্যবহারাক্রীৰ নতুন তথ্যি সে  
সম্ভবে একটু মোটাটুি রাণা দিবার চেয়ে তাঁহার পক্ষে  
গুটতাই হইবে না বোধ হয়। আইনের বিধান প্রকাশ  
ভিনে (সংখ্য) ; (১) গাঁতিদারের গাঁতি সখ (২য়)  
রায়তের জ্যাং সখ (৩য়) কোকী প্রজার ঠিক সখ।  
ভাগে জমী চাষ করাইলে তাহাতে উপায় শক্তের অংশ  
অধিকার জন্মা ছাড়া জমীর উপর কৃষকের কোন সখ  
নাই—তবে এটুকুও তুলিয়া দিবার জন্য এক শ্রেণীর কৃষক  
হিউটী ব্যক্তি সরকার বাহাছুরের নিকট যথ দরদার  
করিতেছেন। যদি ভাগিদার বা বর্ণগাঁতীকে জমীর সখ  
দেওয়া হয়, তবে মধ্যবিত্ত ভূপ্রশাসনের যে ভীষণ অনি



সাধিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য—কিন্তু আজকালের দিনে মধ্যযুগেরই যত বিপদ—যদী বা জমীদার করিয়া করিলে সরকারের টনক নড়ে; আর অধিক কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা আজকাল ধর্মঘটের ভয় দেখাইয়া সরকার বাহাদুরকেও রক্ত আঁচি দেখাইতে শিখিয়াছে। ফলে এই উচ্চশ্রেণীর চাপে মধ্যযুগেরা মারা যাইতেছে, তাহাদের কাছে তো তেমন কিছু প্রশস্তির আশা নাই, তাই তাহাদের মুখ চাহিবার মত নেতা জন্ম দূর্ভাগ্য। বাক্য, এখন প্রজাসমূহের কথা বলি। কোন রূপে যদি প্রজা একবার জ্যোৎস্ব সম্বৎ প্রমাণ করিতে পারিল, তবে আর তাহাকে পায় কে? তাহার উচ্ছেদ একেবারেই অসম্ভব এমন কি বাঁতাদারের গাতিসম্বৎও অনেক স্থলে এমন কায়েম হইয়া পাড়াইয়া যে তাহার উচ্ছেদও সহজসাধ্য হয় না। আইনে এমন বিনিয়ও আছে যে বিশ বৎসর জমীদারের অধীনে যে প্রজা চাষ আবার করিতেছে সে যে কোন জমীতে একবার লাগল চালাইতে পারিলেই উহাতে তাহার জ্যোৎস্ব জন্মিলে, কর উচ্ছেদ, কেমন করিয়া করিবে? একমাত্র বাকী—কোনরও ডিক্‌লারীতে উচ্ছেদ হইতে পারে, তাও কোন রকমে ডিক্‌লারি টাকটা জমা দিতে পারিলেই পাণ চুকিয়া যাইবে। প্রজা যদি জমী নষ্ট করিয়া তাহাকে চাষের অযোগ্য করিয়া ফেলে তাহা হইলেও তাহাকে উচ্ছেদ করা যায় কিন্তু তাহারও ঔষধ আছে। কিছু কৃতিপুত্র ধরিয়া দিলেই জমীদার মহাশয় জন্ম জ্যোৎস্বের হস্তান্তর করিলেও উচ্ছেদ করা চলে কিন্তু আজকালকার চাষারাও গ্রামের ঈকি বৃক্ষে—কাহারো সামান্য একটু জমি নিজের জন্ত রাখিয়া বাকী সমস্ত জমী হস্তান্তর করিয়া ফেলে, আইনের সুষ্টি যদিও যত তদাধিপণ্ড এই স্থল চালাকাটা সে বৃষ্টিয়াও তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারে না। সামান্য বাতালী গাছ এইভাবে পাকা রাজনৈতিকের আইনকে গড়া কেমন পদ্ধতি করিয়া রাখিয়াছে। রায়ত তাহার প্রজাক্কে অর্থাৎ কোর্ক প্রজাক্কে নোটিশ দিয়া উচ্ছেদ করিতে পারে কিন্তু এই মধ্যবর্তী রায়তকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে জমীদারের সাধ্য কি যে তিনি তাহার জমী স্পর্শ করেন—ফলে কোর্ক

প্রজাও জমীদারের মধ্যে রায়ত প্রজা থাকায় সে কোন-অস্থিবিধায় পড়ে না, সে পাগড়ের আড়ালে আছে মনে করে। আবার স্থান বিশেষে দেশোচ্চায় জমীদার কোর্ক প্রজাও জ্যোৎস্বের অধিকারী হয়—তাহাকে উচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব। পল্লীগাম্বে একবলে অনেকটা জমী কোর্কও নাই—পারিতে হইলে ঐ সকল জমীর বর্তমান অধিকারী করিয়া দিলে রায়ত ক্ষান্ত আত্মকাল জমীদারদেরও নাই—এমন কি নিজের জমীও যদি বিলি করা হইয়া গিয়া থাকে তবে তাহা কিরাইয়া পাওয়াও অসম্ভব। তার উপর আমাদের দেশের কৃষকসকল একেবারেই অশিক্ষিত এবং অলস, তাহারা কৃষির উন্নতি প্রভৃতি বুঝে না—কোনরকমে একটু আদুট চাষ করে—ছুটা পেটের ভাতের ভরসা; তাহারা কৃষির উন্নতি, দেশের উন্নতি, জাতিগঠন প্রভৃতি বুঝে না—একেবারের মত খাইবার সংস্থান থাকিলে তাহারা দুই বেলায় মত খাও সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করে না—অথচ এই শ্রেণীর হাতেই দেশের বিজ্ঞান রহিয়াছে—আমরা বড়ই কমপ্রেস করি, বহুতা করি, কাগজে লেখালেখি কিন্তু নি কমে—দেশের আসল জীবন-কাটিটি পল্লীর ক্ষেত্র মধ্যে লুকায়িত আছে—হস্তরাং এই নিরক্ষরদিগকে ছুলাইয়া বিশেষ বণিক যে ঈকা বাণুগিরির উপাধান দিয়া দেশের প্রাণধন ধাতু-স্রাবণি জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবে তাহা তো খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক। এ ছাড়া আরও অসংখ্য অস্থিবিধা সম্ভব আছে। এ দেশের স্বকলস এতই পুরাতনপর্য্য যে, নূতন কোন ব্যাপার তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তাহা সহজে ফলবতী হওয়া কঠিন প্রথমতঃ তাহারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি লইয়া চাষাবাস করার কথা চিনিলে হাসিয়া উঠিবে—ব্যাপারটার ওজন উপাধি করিতে পারিবে না এবং বৃষ্টিবার চেষ্টাও করিবে না। তারপর দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ভাব—যদিও কিনিবার মত অবস্থা অনেক কৃষকেই নাই। আবার এদেশে পৈতৃক সম্পত্তি সকল পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকে। যখন এদেশে একারবত্তী পরিবার ছিল তখন এ নিয়ম সত্যই দেশের কল্যাণ সাধিত; কারণ সম্পত্তির

উপসব্ব ভ্রাতাপুত্র সমভাবে ভোগ করিত—সম্পত্তি নষ্ট হইত না বরং সকলের সমবেত যত্নে ও চেয়া বন্ধিত হইত। আজকাল বিলাতী আবেদ্যায় সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়াছে—একারবত্তী পরিবার আর নাই বলিলেই চলে—যাহা কোথাও বা আছে তাহাও যাইবার মত হইয়া পাড়াইয়াছে হস্তরাং 'ভাই ভাই ঠাই ঠাই' হইতেছে; ফলে পৈতৃক জমীখানা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া যাবার ধারণ করিতেছে। সেইজন্য যন্ত্র সাহায্যে কৃষিপোষ্যগণী একত্রে ছুঁতিন হাজার বিঘা জমী পাওয়া দুর্ভাগ্য। আবার ছোট ছোট টুকরা জমী যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করিলে খরচও যেনেং পোষায় না। ইংলেণ্ড বা আমেরিকায় জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তরাধিকারী হয় বলিয়া জমীখানা টুকরা টুকরা হইয়া যায় না, এজন্য ঐ সব দেশে বৈজ্ঞানিক প্রশালীতে কৃষিকাণ্ড করিবার বিশেষ অন্তরায় ঘটে না। বৈজ্ঞানিক সারের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক অস্থিবিধা আছে। কোন ফসলের চাষে কোন বৈজ্ঞানিক সারের আবশ্যক তাহা নির্ধারন করা কঠিন। কারণ যে জমীতে যে ফসলের চাষ হইবে, সেই জমীর উপাধান মধ্যে ঐ ফসলকে পুষ্ট করিবার মত কোন উপাধান নাই তাহা নির্ধারণ করা বড় সহজ কথা নয়। এ দেশের চাষাবাসের পক্ষে তো সম্ভব নয় এমন কি যাহারা চাকরী বাকরী ছাড়িয়া চাষ করিতে যাইলে তাহাদের মধ্যে কাহারও ছুড়েরের চান আছে কি না সন্দেহ। এ দেশের চাষাধার সারের জন্ত অব্যয় করিতে স্বভাবতঃই নারাজ—তাহারা পোষার, পচা পাতা, পুতুরের পাক বা মরা নদীর মাটি ব্যবহার করে; খোদ, লবণ প্রভৃতি বিশিষ্ট কারণে কচিৎ ব্যবহৃত হয়। নদীর পারে পরিপূর্ণ জমী পাইলেই তাহাদের খুব হুঁশি, সার দিবার হাঙ্গামা করিতে হয় না। তাহার পদ্মা দিয়া হাড়েং সার, ফিস্ত গুণামো, পাটাশ নাইটেট প্রভৃতি কোনেকে আশ্রয়দায়ী কাজ মনে করে। তারপর কল বিগড়াইবার ও তাহার মোরামতি অস্থিবিধা করণও আছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

ধন, মূল্য প্রথমতঃ রত্নপাতি সাধারণ না লইয়া পূর্বতন প্রধার সহিত বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার করিয়া

চাষ আরম্ভ করা হয় তাহা হইলেও মজুর ও গরুর আশ্রয়ক। বাঙ্গালদেশে পূর্বে মেরণ সবল স্বয়ং হেলের গরু পাওয়া যাইত, এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। তাহার কারণ অধুনা ভোজনার্ণা অধিক গো-মাংসের আবশ্যক হইয়াছে—পূর্বে বয়ী মূলমানদের মধ্যে ভোজনার্ণ গো-মাংস কচিৎ ব্যবহৃত হইত অধুনা ছাগ বা ভেড়ার মাংস দুর্দল্য হওয়ার দরিত্র মূলমানসরণ গো-মাংস ভেড়ার বাধ্য হইয়াছেন—তদুপরি আজকাল হিন্দু মূলমানে সাম্প্রদায়িক বিবাহ হওয়াতে গোমাংস ভক্ষণ অবশ্য কর্তব্য হিলাবেও অনেকে গোমাংস ভক্ষণ করিতেছেন। আবার ইংরাজদিগের মধ্যে দরিদ্রগণের পক্ষে হইয়াই একমাত্র মূলত মাংস-বাচ। আবার নিম্ন, অল্পমত শ্রেণীর হিন্দুরা, যাহারা পেটের দায়ে ক্রীড়ান হইয়াছে, তাহারাও ইহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; ফলে মেষের উপর গোমাংসের ন্যায় বহল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এ ছাড়া বিদেশেও অনেক পণ্ড ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা হয়, তন্মধ্যে গাভী বৎ প্রভৃতি যে থাকে না তাহাও বহা যায় না। এরিক কৃষকগণ দরিদ্র বলিয়া পোষকে উপযুক্ত খাদ্য দিতে পারে না এবং পূর্বে গো-চারপের জন্ত প্রত্যেক গ্রামে যে সকল মাঠ পড়িয়া থাকিত এক্ষণে জমীদারগণ অর্থেলাজে তাহাও জাবারী জমি করিয়া লইয়া থাকেন। আদায় করিতেছেন। তজ্জনাকের ধরে আজকাল গোপালন প্রাণ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে—সহরে স্থানাতাব—পণ্ড বাতের মূল্যাবিকা, সর্কেপরি গোপালনের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে পোষক সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। পূর্বে হিন্দু, নারীগণ ভক্তি সহকারে গো-পরিচর্যা করিতেন, এক্ষণে সভ্যতাকাক পাইয়া সেই কায়েকে উহার। ধুবার চক্ষে দেখেন—এমন কি অনেক কায়েৎ বীষ শিশুকে পালন করিতেও অনেক জননী বিরক্ত হইলেন। পুত্ৰবোম্ব অর চিন্তায় পরের দাসত্ব করিতে চুটে—যাহা কিছু স্বল্প অবসর থাকে, তাহা তাহা, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলায়, নহে ত খিচেরি বাচাপাণ বৈশিষ্য কাটাওয়া মনে। তাহারাও গাভী পরিচর্যার আবশ্যকতা অল্পমত করেন না। ফলে চাষাবাসের জন্ত পণ্ডতা পাওয়াই যায় না। পণ্ডর অভাবে শিশুর প্রাণধনক হ্রাসও দিন দিন দুঃস্থাপ হইতেছে।



এই ত গেল গল্পের কথা—একশে মজুরের কথা বলা যাউক। কলকারখানার আধিকা হেতু বাঙ্গালী কৃষিক শ্রমিক আজকাল হুশাণ্য হইরাছে। কলকারখানায় বার মাস কাজ পায় এবং প্রত্যেক অধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিতে পারে বলিয়া, ও এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে মজুরান, বাগ্‌গির প্রভৃতি চলে বলিয়া বাঙ্গালী শ্রমিকেরা আজকাল জল কাবা ভাঙ্গিয়া চাষের কাজ করিতে রাঙ্কি হয় না। এমন কি বর্ধমান প্রভৃতি কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ও শাঁওতাল মজুর আনাইয়া চাষ করিতে হয়। বিলাতী সভ্যতার আবহাওয়া এমন মনোরম যে কেহ আর মুটে মজুর থাকিতে চায় না—কাজ পাইলেই সকলে ছোট বড় হলুট টাট্টা, পাঞ্জাবী পরিয়া, জুতা পরিয়া ‘বাবু’ শাক্তিতে চায়। মজুরের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া, যে অল্প সংখ্যক মজুর এখনও আছে, তাহাদের পায়। এমনি ভারী হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের সাহায্যে কাজ চালাইবার চেষ্টা বন্ধকারি ছাড়া অল্প কিছু বোধ হয় না। তার উপর এই সব মজুরদেরও আবার নিজেদের ২৪ বিঘা আবাদী জমী আছে—আগে সেই জমী চাষ করিয়া তবে তাহারা ভরলোকের চাষের কাজ করিবে। প্রত্যেকের নিমিত্ত ‘কাল বাইরা কাজ করিব’ এই আশ্বাস দিয়া ১১ টাকা হিসাবে দান লইয়া থাকে। পরদিন যিনি বাড়ীতে আসিয়া খোসাঘোষে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবেন তাঁহার জমীতেই সে হাত দিবে। হুতরাং পদ্মা এবং তাহাও উজ্জ্বল

দ্বিগুণ নিশ্চিয়ে কাঁচা সমাধার আশা নাই। অগ্রিম লইয়া ভরলোককে ইহারা সময় সময় আবার চোপ ও রাঙাইয়া থাকে। ফলে একস্থান লাগল ৪ ঘণ্টা চালাইবার জন্ত আজকাল বেড় টাকা পর্যন্ত দিতে হয় এবং তাহাও সময় এবং সুবিধামত পাওয়া যায় না। এসব অসুবিধা দূর করিতে হইলে বাহির হইতে মজুর আনা (Indentured labour) ভিন্ন উপায় নাই কিন্তু সে উপায় অস্বপ্নন করিতে হইলে অনেক লোকের বহুদিনের কাজের যোগাড় রাখিতে হইবে কারণ বাহিরের কুলীরা দল বাঁধিয়া আনিবে ও নিশ্চিত দীর্ঘ সময়ের জন্ত কাজের কড়ার না পাইলে তাহাদের আসা পোয়াইবে না। সে যোগাড় করিতে হইলে আর ছোট খাটভাবে চাষ করিলে চলিবে না, বেশী জমীর আবশ্যক হইয়া পড়িবে। বেশী জমী পাওয়া যাইতে পারে—(১) আসাম অঞ্চলে জঙ্গল কাটাইয়া, ঐ সব বনভূমিকে আবাদ যোগ্য করিয়া লইতে পারিলে (২) হুদার বনের লোণা জমীকে উন্নত করিয়া লইতে পারিলে, (৩) জলা প্রভৃতি পতিত জমীর অবস্থা বদলাইয়া দিতে পারিলে; কিন্তু এই তিনটির কোনটিই অল্প অর্থ বা অল্প সময়ে সম্ভবিত হওয়া সম্ভব নহে এবং ব্যক্তিগত হিসাবে এইভাবে কাজ করাও সম্ভব নহে। হুতরাং সমবায় হিসাবে কৃষিকার্য্য করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতে সমবায় বা যৌথ কৃষির সঙ্গকে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।



## নবযুগ

### রায় সাহেব—শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মহাশয়—

বড়ই আনন্দের বিষয় যে আপনি বঙ্গদেশে নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এ নবযুগ কোন্ আভির? অবশ্য বাঙ্গালীরা, তাহাতে সম্মত হইতে পারে না, কারণ আপনার এ ‘নবযুগ’ বঙ্গদেশে জলন্ত বঙ্গ অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের নবযুগ কোথা হইতে আসিল? আমাদের অত্থান কেবল হইল? আমরা এমন কি পুণ্য করিয়াছি, যাহার বলে আমরা নবশক্তি লাভ করিচা, নবীন উদ্ভাসে উৎসাহিত হইয়া, সমগ্র জগৎকে দেখাইতে পারি যে আমাদেরও ভাগ্য্যপগনে আজ নবযুগের উদয় হইয়াছে? অবশ্য, আমরা বর্তমান যুগ দেখুণ্য পুণ্যসঙ্ঘ করিতে পারি নাই এবং পারিবও না। তবে বহু প্রাচীন যুগে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পুণ্য সঙ্ঘ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অবিকারী—কিন্তু অযোগ্য অবিকারী। আমরা নিজের নিজের ভাবনাতেই বিভোরা। আমরা স্বার্থভাগ্য্য করিতে শিখি নাই, আমরা প্রতিবেশীর উন্নতি দেখিয়া স্বপ্নে আনন্দের পরিবর্তে টকা অহুভব করিয়া থাকি, পরোপকার যে মানবজাতিরই বিনোদ ধর্ম তাহা বিদ্রুত হইয়াছি। হুতরাং অগাধ পুণ্যরাশির অবিকারী হইয়াও আমরা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছি, পুণ্যের পরিবর্তে পাপের ভাগী হইতেছি, সভ্য-জগতের সঙ্গকে আত্মসম্মান হারাতে বসিয়াছি। এখন আমরা নিজের পক্ষে ভর দিয়া পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ক্ষুদ্র শক্তির মত প্রতি পদক্ষেপেই পদাশ্রয় হইতেছে। অন্যতোপায় হইয়া পুনরুদ্ধারের জন্ত বাবংবার পরমুখপেণী ও পয়ের সাধ্যপ্রার্থী হইতেছি।

এই তো গেল আমাদের বর্ধমান শোচনীয় অবস্থা। তবে আর কোন্ মুখে আমরা নবযুগের প্রাণা করিব?

আমাদের আবার নবযুগ? এই পতিত জাতির আবার নবযুগ! না না, আমাদের অদুর্ভাগ্য নবযুগ নাই। আমরা নবযুগ চাই না, আমরা চাই সেই পুরাকালের পুণ্যময়, স্বধর্ম, শাস্তিময়, হিন্দুর প্রাচীন যুগ। যে যুগে নৃনি ধর্মগণ সাংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া নিরুদ্ধনে ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিতেন, যে যুগে সাধুগণ ইহলোকের যুগ ভোগাদি বিষয়ব বর্জনপূর্বক পরমোকে আত্মার উন্নতির জগাই নিম্নত লালনান্তি হইতেন, যে যুগে হিন্দুর গৃহে গৃহে উচ্চারিত বেদমন্ত্রে দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত হইত, যে যুগে ধোমতুংগে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপর প্রদত্ত হবির্দ্বারা হইতে উদ্ভূত পুত্র পুত্র্যাশি গৃহপ্রাপ্তকে স্মরিত করিত, যে যুগে অগোরাজে একবারমাত্র হবির্ভারকপ সাধিক আহার করিয়া লোকে পরম দৃষ্টিলাভ করিত এবং রাজসিক ও তামসিক আহারজনিত রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করতঃ ষষ্ঠপুত্র বলিভঞ্জে গৃহে কালবাপন করিত, যে কালে বিলাসিতা ছিল না, হুতরাং কল্পিত অভাবও ছিল না, আমরা সেই পুরাতন যুগের, সেই পুরাকালের প্রত্যাবর্তন চির মানসপটে অঙ্কিত করিতে চাই। সত্য বটে, আজকাল বিজ্ঞানের সহায়তায় যে সকল অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ওখন সে সমস্ত বলের অগোচর ছিল। এখন আমরা রেলযোগে একদিনে চারি পাঁচ শত কোশ অনায়াসে যাতায়াত করিতেছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে বসিয়া টেলিগ্রাফ যোগে দেশ বৈশাঙ্করের সংবাদ পাইতেছি, টেলিফোনের সাহায্যে শত যোজন দূরে অবস্থিত বন্ধু বা আত্মীয়ের সহিত কথাপকথন করিতেছি, গ্রামোফোন যন্ত্রের দ্বারা মৃত ব্যক্তির মুখোচ্চারিত তানলয়মুক্ত গীত সকল শ্রবণ করিতেছি, এরোপেনে আরোহণ করিয়া পক্ষীর ভায় আকাশপথে বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেছি, বৈদ্যুতিক (X-Ray) আলোকদ্বারা



শরীরের মাংসপেশী ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টি অভ্যন্তরস্থ অস্থি প্রভৃতি পৃথক্ অবলীলাক্রমে পৃথক্ হইতেছে, এমন কি, বিনাভারের টেলিগ্রাফের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্রই সংবাদের আদানপ্রদান চলিতেছে। পুরাকালে এ সকল কথা কাহারও নিকট উপাধন করিলে হয়তো লোকে তাহা বাতুলের প্রলাপ জ্ঞান করিত। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এ কথা বলিতে পারি না যে, এই সকল বিজ্ঞানগ্রন্থত অশুভ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া আমরা নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি। কারণ এ সমস্তই বিদেশীয়দিগের মনস্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের অবিশ্রাস্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলভোগ করিতেছি আমরা। তবে আমাদের নবযুগ কোথায়?

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেরের বলিবার কিছুই নাই। ইংরাজ ভারতে রেলপথ বিস্তার করিয়া আমাদিগকে রেল চড়াইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া দিতেছেন; আমরা রেলপাড়ীতে শয়নপূরক রাতারাতি একদেশ হইতে দেশান্তরে উপনীত হইতেছি, অথচ বেলে বড়ই নিভার ব্যাথা হয় বলিয়া রেলের স্থাব্যব্যার প্রতি কলঙ্কারোপ করিতে বিমুগ্ধ হই না। বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিভা এইখানেই শেষ। অবশ্য, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বহু মহাশয় স্বীয় প্রতিভাবলে বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক প্রাকৃতিক রহস্য আবিষ্কার করিয়া অগণকে তস্তিত্ত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে বহুজন জগদীশ বহু জগৎগ্রন্থ করিয়াছেন? বলিতে গেলে আমরা বিজ্ঞানের কোন দারই দারি না। গ্রামোফোন যন্ত্র জন্মের, জ্যাগার্ডী প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইতেছে; ধামরা সুপরিবারে কিবা সবদুর্ভাবকে একত্রে বলিয়া অভিনয় দর্শন—দর্শন নহে, অবদ—করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিতেছি। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী ভাষায় অভিনীত কথোপকথন ও গানসকল কোন দূরদেশে কোন বিজাতীয় ঘারা

বিজ্ঞান বলে যন্ত্র হইয়াছে এবং কোন বৈজ্ঞানিক শক্তি ধারা বারংবার উহা উজ্জারিত হইতেছে, আমাদের মধ্যে কতজন সে বিষয়ের সম্ভান লেখেন বা সম্ভান লইবার চিত্ত কোঁতুহলী হইয়েন? লজ্জার কথা!

আমাদের এই শোচনীয় অবস্থাকে উন্নতি বিখ্যাত্যাদয় বলিয়া মানিয়া লইতে কোনক্রমে স্বীকৃত নহি। এখন আমরা বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া তুলিয়া যাই, আন্তরিক বোর্সলা অমৃতত্ব করিতে পারি না, পারিলেও চাহি না। যেসে আমাদের দেহ জর্জরিত, অঙ্গের স্তম্ভ আমরা নালারিত, বস্ত্রের স্তম্ভ আমরা পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছি, অর্থোপার্জন আমাদের জীবনের প্রধান—প্রধান কেন, একমাত্র—উদ্দেশ্য। অর্থোপার্জন ও জীবিকা-নির্বাহ আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তাহা এক বিষয় সমস্তা হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেন্ট অফিসে একটা চাকরী থালি হইলে শত শত আরম্ভি পড়িতে থাকে, তন্মধ্যে যে ভাগ্যবান চাকরী হস্তগত করিতে পারিলেন, তিনি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ভারতে এত শুল উৎপন্ন হয়, যে সমগ্র ভারতবাসী তাহা উদ্বাহ করিতে সমর্থ হয় না; অথচ এত শুল প্রতি বৎসর বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে যে নিরন্তর ভারতবাসীগণ একবেলা পেট পুরিয়া বাইতে পায় না।

এই কি আমাদের নবযুগ? এই কি আমাদের অত্যাচারের চরম উৎকর্ষ? আমাদের সেই প্রাচীন যুগই ভাল ছিল। যে যুগে প্রজারজক রামচন্দ্র, সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ প্রভৃতি রাজগণ জগৎগ্রন্থ করিয়াছিলেন, যে যুগে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি পতিপ্রাণা সাক্ষী নারীগণ জগৎগ্রন্থ করিয়া ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়া ছিলেন; সুন্দরাক মহাশয়, আমাদিগকে সেই অতীত যুগরোগ লইয়া চলুন, সেই আধ্যাত্মিক জগৎকে নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত করুন। তখন জ্ঞানিষ আশ্রয় রণধিকার “নবযুগ” নাম সার্থক হইয়াছে।



হবি

শ্রীলীলা দেবী

যোগাড় ক'রে নিতে পারতো। তারা ছিল নেতীভ জীতান—তাই সিঁটাতু মেবলুএর অগ্রহে যে তাঁর কাছে থেকে পড়া শিখে পাশ দিয়ে এই ছুঁতিন বছর হ'ল ক্রমগণর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হ'য়েছে। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'কোমারটার' থেকে ছেলেরের ফুলের বাগান দেখা যেতো—আর সেই বাগানেই ছিল দেবদাক গাছ। চামেলী প্রায়ই তাই যে তার বাগ না মরি জীতান না হ'তেন তাহ'লে বেশ হ'ত। সে বাগালী হ'য়েও যেন সকলের কাছে পুর হ'য়ে আছে, সবাই তাকে যেম ব'লে ঘুরে ঘুরে যায়। বাগালী মেয়েরা তাকে ঘোমটারে ভিতর থেকে দেখে মুগ্ধ টিপে হাসে, তার ছায়া মাড়তেও তারা ভয় পায়, পাছে তারা অপবিত্র হ'য়ে যায়। তবু সে তো ভাদেরই মত সাক্ষী পরে ভাদেরই তত জাত ভাল খায়, তবু সে যেন স্বভাবি, যুগের সব থেকে বিচ্ছিন্ন আত্ম। একটা নিঃশব্দ ফেলে সে তার নিঃশব্দ জীবনের কথা ভাবে, তখনই রাতেও গভীর আঁখার তেজ ক'রে, মুহুর্ত তারার আলোয়, সববদন-মুগ্ধর দেবদাক, তার শাখা ছলিয়ে, পাতা কাঁপিয়ে বারবার জ্বালিয়ে দেয় যে, সে তার সখী হ'য়ে আছে। চিকণ পাতার ক'কে ক'কে তারাজ্জা আকাশের ধূসর বৃক একই একই বেশা যেতে, তাও যেন সেই দেবদাকই চোখের দৃষ্টি হ'য়ে যদি না মিসনারি মেয়ের সাহায্যে, সে চাকরীর



চামেলীর বুকের ভেতর পর্যন্ত পহুঁছিত। কি কল্পনায়ই বামীর আগ্রাহ ভেসে আসে, কখন বা কথার আগ্রাহ, আবার পানও। সে যে কি পান! কত মিষ্টি, কেমন ধারা প্রাণ হৌওয়া, আর কত মধুর, তা সে বোঝাতে পারবে না। দেবদাক পান গাছ, কথা কথ, বামী বাজায়। এমন কখন শুনেছ তোমরা কেউ? কিন্তু সে যে শোনে, রোজ শোনে। যা শুনেছে কি ক'রে বলবে তা শোনেনি, তাই বলা যায় না, এতে তোমরা যদি আশ্চর্য হও, বিবাস না করো, তাহ'লে সে নিরুপায়।

এই যে সারারাত খ'য়ে উৎসবের মধুর লীলা বিরহের কল্পনায় কেঁদে কেঁদে ফেরে, এর কি শেষ হবে না কোন দিন বিলনের বাক্ হারা মুহুর্তে? যখন গগনের ও কুবেরের সমস্ত নাচ পান ও ছন্দ ভক্ত হ'য়ে যাবে আনন্দ সাগরে ডুবে গিয়ে? বতকণ না ঘুম আসে ততখন সে পান গাওয়া দেবদাকর দিকে চেয়ে চেয়ে এই সব ভাবতো, ঘুমের ঘোরেও বুঝি তার এ ভাবনার শেষ হ'ত না।

২

ঘুম ভেঙে প্রথমে চোখ মেলেই সে আবার দেখতো সেই বেহালাই। সকালের সোপার আলো গায়ে মেখে নুতন শাফে শোকে ধাঁড়িয়ে আছে। বিন্দু বিন্দু শিশির-কণা হীরে পান্নার কবচ হার চ'য়ে ঝলমল ক'রত তার সারা মেখে।

চামেলীর ভাই রবিন্দু সেদিন তাকে এক অসম্ভব প্রশ্ন ক'রে ব'সল—“দ্বিদি। তোমার বন্ধু কি আমার বন্ধুর চেয়ে হৃদয়? চামেলী একটু হেসে ব'লে—“তোমার কোন্ বন্ধু তুমি?”

“কেন, আমাদের নবকিশোর বাবু। তিনি কেমন হৃদয় ব'লে তো?” চামেলী ভাইকে রাগাবার অজ্ঞে ব'লে—“ভারি তো হৃদয়। আমার দেবদাকর চেয়ে নয়।” রবিন্দু তার দ্বিদির হাতের সেলাইটা টেনে ফেলে দিয়ে ব'লে—“ভারী তো তোমার বন্ধু। তার আবার হৃদয় হুজিৎ! দেবদাক বুঝি মাছ? ওটা তো একটি গাছ। কিন্তু যে ব'লে তুমি দ্বিদি।”

চামেলী এবার গম্ভীর হ'য়ে ব'লে—“আচ্ছা বেশ, তুমি আজ তাঁদের গুণানে গিলেছ?”

“হ্যাঁ, এইমাত্র প'ড়ে এলুম আমার কত রত্ন ক'রে পড়ান। সেই জট্টেই তো আমি ক্রোধে ফাঁট হ'ই। নবকিশোর বাবু কি ব'লেন জানো?”

“কি ব'লেন?”

“ব'লেন তিনি আমার খুব ভালবাসেন, আর কাউকে তো বাড়াইতে ডেকে পড়ান না বইও কিনে দেননা খালি আমাকে ধেন, কত ভালো তিনি না দ্বিদি?”

ছোট ভাইটির এই সরল শ্রদ্ধা ভরা কথা চামেলীর মূখ আচম্বা একটু লাল হ'য়ে উঠলো। সে হাতের সেলাইটা রেখে দিয়ে ভায়ের মাথায় হাত রেখে ব'লে—“তুমি ওঁদের গুণানে রাতদিন ঘেঁষো না। কখন কি ছুঁবে কেনেবে তখন তাঁরা মুখিলে প'ড়বেন। ঠায় হিন্দু আর আমাদের জীতান কি না।”

নবকিশোর বাবুর অল্প ভক্ত একথাও কাণ না গিয়ে ব'লে—“কি যে ব'লছে দ্বিদি তুমি তার ঠিক নেই।”

“নবকিশোরদা ওসব হিন্দু জীতান মানেন না, তিনি আমার সব ছুঁতে যেন।”

চামেলী আর একবার তাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রলে কিন্তু রবিন্দু সে কথা অগ্রাহ ক'রে তার পুরাণো প্রশ্নের জের তুলে ব'লে—“বল না তোমার বন্ধু না আমার বন্ধু কে ব'লে হৃদয়?”

১০ বৎসরের ছোট এই ভাইটি নেহাৎই পুর মেয়ের আধিপত্য খানটা নির্বিবাদে দখল ক'রে ব'সেছিল, তাই তার আবার আশ্চর্য্য সবই চামেলীর মাথা পেতে নিতে হয়—অল্প কেউ হ'লে হয়তো সে ছুটো ভাঙা দিয়ে খামিয়ে ও সন্তুষ্ট। বা বাগ চালাই ৬ মাসের ছেলেটিকে এই দশ বৎসর ধরে এমনি ভাবেই সে মাছ ক'রে আসছে। ভায়ের কপালের ছোট টোটে চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে চামেলী ব'লে—“তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমার বন্ধুর চেহারাটা তুলনা হয় না রবিন্দু। যেমন ব'ল্ হ'ল আরগলদ ফুলের কে বেশী হৃদয় ঠিক বলা যায় না, যেমন সাজান বাগানখানি না গোড়ালে গভীর

যার কে বেশী হৃদয় ঠিক বলা যায় না এও কতটাই সেই রকম। আমার বন্ধুর রূপ আছে আমার নেইও, তিনি হৃদয় আবার কালোও।” রবিন্দু তার দ্বিদির এই লেখকাদের মনে কতটা বুঝলে তা ঠিক বোঝা গেলো না, সেদিন কিন্তু সে তার দ্বিদিকে সে বিষয়ে আর প্রশ্ন ক'রলো না।

নবকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর হাই স্কুলের শিক্ষক তা ছাড়া জেলা বোর্ডের মেম্বর। ঠারই স্থাপনিত চামেলীর চাকরীর উদ্ভাস। রবিনের পড়ার ভারও তিনি নিজেকে নিয়েছেন—তা'ছাড়া সময়ে অসময়ে বন্ধুত্বের হুতাশ যে অকারণ কল্পনা নানা হেতুতে জমা হ'য়ে উঠতে আরম্ভ ক'রেছিল—তার ভায়ে চামেলী যেন দিন দিন হুঁ হুওয়ার বদলে বিষম হ'য়ে উঠছিল। তিনি যখন তাই এত করেন, কিন্তু চামেলী যে তাঁর নখাশ্রেরও মধ্যে ঘা, সে তাকে কি যেনে এর বদলে? যেখানে যাদের বদলে কিছুই দেবার নেই, সেখানে সে দান কি দেয়া উচিত? সেদিন এমনি ধারা আলোচনায় তাদের বেড়ার পথটা যেন এক মিনিটেই শেষ হ'য়ে গেলে।

শেষে নবকিশোর বাবু ব'লেন—“বেশ তো আপনি যদি দেবার জন্তে এতই ব্যস্ত হ'য়েছেন,—তবে দিননা আমার কিছু—আমি চাইতে প্রশস্ত আছি।” দান হাসি হেসে চামেলী ব'লে—“আমার সাধ্য আছে কি না আপনাকে কিছু দেবার। একে তো আমি নেটটি জীতান আর খাপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। তার উপর এই তিন বৎসর খ'রে খাপনার অক্ষয় দান যে কি ভাবে ক্রমে উঠেছে, তার কি আর শোধ হয় যে দেবো?”

হাসিমুখে নবকিশোর ব'লেন—“হয় না ব'লে তো হবে না মিস্ রে, যদি হয়—তখন?”

—“তখন দেবো।”

চামেলীর এই ছুটি কথা যেন আনন্দের ঢেউ উঠলে উঠলো। নবকিশোর হেসে ব'লেন—“দেবেন তাহ'লে?”

“হ্যাঁ।”

“আপনার একখানা ছবি চাই, সেবেন ব'লেছেন যখন তখন দিতেই হবে।”

চামেলীর দান মূল লক্ষ্যার গোলাপী আভাষ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো,—সে মুখ নীচু ক'রেই ব'লে—“সে তো দেবার মতও নয় আর চাইবার মতও নয়—তবু দেবো—আমার সাধো ওর চেয়ে বেশী আর কি'বা দেবার থাকতে পারে—এখন রবিন্দুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

রবিন্দু ছবি দিয়ে যখন ফিরে এলো তখন তার হাত শূন্য নয়, সে নিয়েও এলো কিছু। তার হাত থেকে স্টো নিয়ে কাগজের বাঁধাটা খুলে ফেলে চামেলী দেখলে নবকিশোরের ছবি। সে বিরক্তির ভাবে অশ্রুস্রব মুখে ভাইকে ব'লে—“কেন তুমি এ ছবি নিয়ে এলে? কে তোমায় আনতে ব'লে?”

হাফাতে হাফাতে রবিন্দু ব'লে—“বাঃ আমি কেন আনতে যাবো? নবকিশোরদা দিলেন যে! ব'লেন তোমার দ্বিদিকে দিও।”

ইচ্ছা নশেও সেদিন ছবিটা চামেলী ফেরাতে পারলে না, ভারলে তার পরদিন পাঠিয়ে দেবে কিন্তু আজ কাল ক'রে সে ছবি ফেরৎ দেওয়া যেন তার পক্ষে অসম্ভব কঠোর হ'য়ে উঠলো।

৩ মাসকত বাধে একদিন রবিন্দু ছুঁতে ছুঁতে এসে ব'লে—“দ্বিদি। নবকিশোর বাবুর বো এসেছে। আমাদের একদি যেতে ব'লেছেন, সন্ধ্যায়ের মেসজর।” চামেলী কোন কথা কইলে না। সেদিন রবিবার রাত্রি নেই সে বাইবেল খুলে মন দিতে চেষ্টা ক'রছিল। অধির হ'য়ে রবিন্দু আবার ব'লে—“এসেছে কিনা তুমি অনিলকে ডেকে জিগ্যাস করো আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়।”

চামেলী এতক্ষণে ব'লে—“এসেছে বেশ তো।” এতবড় একটা সমস্যাযের ব্যাপারে দ্বিদির এই সংক্ষিপ্ত উৎসাহধীন উত্তর রবিনের মাটেই মনঃশুভ হ'ল না। সে যেমনিই উৎসাহের সঙ্গে ব'লে—“চলো তবে শীগগির। সন্ধ্যাই চলে গেছে, খালি আমদেরই দেবী হ'য়ে যাচ্ছে যেতে। কি ভাববেন এত দেবী হ'লে?”

চামেলী বাইবেলের পাতা থেকে চোখ ওঠালো না সেখ



রবিন্ তাকে প্রস্তুত করবার চেষ্টায় এবার বলে—“কি স্বপ্ন দেখাচ্ছে আজ নবকিশোরবাবুকে। কপালে চন্দন যেশমের ধূতি এই সব প'রেছেন কিনা। তাঁর বৌও ভেদমনি স্বপ্ন, সে কত গমনা প'রেছে লাল সাড়ী প'রেছে। তুমি ঐ বৌএর মত গমনা প'রো না কেন দিদি? আজ তোমার অর্ধনি গমনা প'রে যেতে হবে।”

চামেলী অতি কষ্টে চোখের জল লুকিয়ে বাইবেল খান। বচ ক'রে বলে—“তুমি কোন জামাটা প'রবে আজ রবিন্?”

“বৌ! বড়দিনের সময় কিনে দিয়েছিলে সেইটা।”  
উদ্বেগপূর্ণ চামেলী বলে—“চলো তাহলে সেটা বাস্তু থেকে বার করি।”

রবিন্ বলে—“আর তুমি? গমনা প'রবে?”  
জানা বার ক'রতে ক'রতে চামেলী বলে—“না।”

তাকে জড়িয়ে ধ'রে রবিন্ বলে—“নবকিশোরবার বৌ প'রবে আর আমার দিদি কেন প'রবে না? তা কিছুতেই হবে না তোমাকে প'রতেই হবে।”

জানা পরিয়ে তার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চামেলী বলে—“তার যে বিয়ে হয়েছে কিনা তাই গমনা আর লাল সাড়ী প'রেছে, আমার কাজে বিয়ে হয়নি তাই প'রতে নেই।”

দিবর মুখের দিকে চেয়ে রবিন্ এবার ভেবে ভেবে বলে—“তবে তুমি সেই ভালো সাদা সাড়ীটা প'রবে? বৌ তোমার জন্মদিনে দিসটার মেসু' দিয়েছিলেন?”

তাকে সাজাবার জন্তে তার ভায়ের এই একান্ত আশ্রয় চামেলীর চোখ ছাপিয়ে জল নিয়ে এলো, সে রবিন্কে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ছই গালে চুম্বা খেয়ে বলে—“লম্বী ছেলে। আমার জন্তে তোমার অত ভাবতে হবে না আমি তো দেখানো যাবো না। তুমি যাও বেড়িয়ে এসো গিয়ে। হুজুতে চোখে রবিন্কে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে চামেলী আবার বলে—“দেখো, যেন বেশী শ্রম না, আর কিছু জিনিষ পত্তর ছুঁয়ো না, কারো গায়ে টায়ে হাত দিও না—বুঝলে? আজ তাঁরের শুভদিন কিনা।”

রবিন্ এবার ভেবে চিন্তে বলে—“তুমি না গেরে নবকিশোরবাবু কি ভাববেন?”

“কিছু ভাববেন না।”  
“তুমি কেন যাবে না?”

“আমি গেলে যেহেতু আমার দেখে পালাবে, আমি জীটান্ কিনা, হিন্দুদের বিয়ের সময় জীটান্ মেয়ে ছুঁতে অমঙ্গল হয়।”

হুড়াপড়াগের গির উপর শুয়ে প'ড়ে রবিন্ বলে—“তবে আমিও যাবো না, আমিও তো জীটান্!”

“তা হ'ক, তুমি ছেলেমানুষ তোমায় তারা আলাদা ক'রে বাইয়ে দেবে তুমি।”

রবিন্ মুখ ভার ক'রে বলে—“ওরা ছুট! আমি শুকের গুণানো যাবো না।”

চামেলী তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলে—“হি! ওগা ব'লতে নেই!”

“নৈই তো কি। আমার দিককে যারা ছোঁবে না আমিও তাদের বাড়ী যাবো না,—কক্ষণো যাবো না।”

রাগ ক'রে রবিন্ তার গায়ের জামা খুলে দেয় গেলো, চামেলী তার হাত চেপে ধ'রে বলে—“লম্বী জা! আমার! রাগ ক'রতে নেই। যে রাগ করে, ঈশা তবু উপর রাগ করেন। জামা খুলানো, তুমি যদি ওয়ার না ঘাও, তাহলে রোজা-বেলা দিগিরের গুণান যেন বেড়িয়ে এলো, আজ রবিবার ভালো কাপড় প'রেই যেন হয়।”

রবিন্ এবার কতকটা শান্ত হ'য়ে বলে—“তাই যাবো তুমি?”

“আমার বাইবেল পড়া বাকী আছে, হ'য়ে গেরে আমিও যাবো, তুমি রোজা-বেলা দিগিরে ক'রো।”

রবিন্ এবার অনেকটা খুশী মনে চ'লে গেলো।

ভাইকে বেড়াতে পাঠিয়ে চামেলীও যেন বাঁচলো।

বয়ের আয়নাতে তার নিজের ছায়ায় চোখ প'রতে একটা বুক ভাঙা নিশ্বাস ফেলো সে বলে প'ড়ল, তারই চোখ বেয়ে জলধারা নেমে এলো! এই কাল সৌ চোখেরা নিয়ে কেমন ক'রে সে নবকিশোরের কথা তরুণী জীর পাশে গিয়ে পাড়াবে? তবু তাকে যেন

হবে একদিন। নবকিশোরের বিয়ের কথা যখন থেকে হ'চ্ছে তখন থেকেই সে চ'লে যেতে চেয়েছিল এদেশে, কিন্তু কাগ্যগতিকে তা হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু কেন তববে তিনি এতদিন হ'য়ে এত রকমে তাকে কৃতজ্ঞ জ্ঞান করে তিনে চুয়েছেন? কেনই বা তার বিশ্রী চেহারার ছবি চেয়ে নিলেন? সেটা বোধ হয় উপহাস? কিবা ছলনা! না, তাই বা কেন ভাবছে সে, ভালো লোক বলে দয়া ক'রেই এতটা ক'রেননি, তা বলে তার মত একজন বিশ্বাসী রূপখোবনদীমাকে তিনি যে ভালোবাসতে পারবেন না এতো জানা কথাই, এতো অনেক আগে থেকেই তার বোঝা উচিত ছিল, তা না বুঝে কেন সে এমন ক'রে নিজেকে অসম্বদের উদ্দেশে নিবেদন ক'রে দিলে? সে নৈবেদ্য তো কেউ ছোঁবেও না, কেবল অবশেষে আরা তাক্ষিণ্যের দৃষ্টি তার উপর জমা হ'য়ে থাকবে তিনের। কিন্তু তাই যদি হবে তবে কেন সেও গাটা এছবি তো সে কখনও চাননি, তবু তিনি নিজেই সে স্থান দিয়েছিলেন একদিন। যাক, সে ছবি এবার সে কোন্‌র দিয়ে আসবে। বিয়ের উৎসব চুকে গেলে, একদিন নিরিবিলিতে গিয়ে তাঁর বৌকেই সেটা সে রূপার প্রেম ভ'রে উপহার দিয়ে আসবে।

৪

অতি সংকট রাখা, কাগজে মোড়া ছবিখানি সে আছে আছে খুলে জানালার ধারে ব'সে প'ড়ল। এ ছবি সে যতবারই দেখে ততবারই নতুন লাগে, দেখে দেখে যে তার কিছুতেই স্থিতি হয় না! কেমন ক'রে সে এ ছবি ফেরত দেবে? তার তো আর কিছু নেই,—নিরপায় ভাবে সে দেবদাস্কর দিকে চাইলে, কি আশ্চর্য! এত মানুষ! এত মিল! তাই তো! এ ছবি এবার সে কোন্‌র দিয়ে আসবে তাহ'লে। মনের জোর ক'রে যেমন ক'রে হ'ক দিয়ে আসতেই হবে তাকে।

সেইদিনই সন্ধ্যা সে নবকিশোরের স্ত্রীকে ছবিখানি দিয়ে এলো। নবকিশোর তখন বাড়ী ছিলেন না, ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে স্বপ্নর রূপের স্বেমে তাঁরই ছবি দেখে ও ইচ্ছার মিল প্রের আসার কথা শুনে তিনি চুপ ক'রে

রইলেন। তাকে কোন মতামত প্রকাশ ক'রতে না দেখে নবযুগ হুতারা একটু আশ্চর্য হ'য়েই ব'লে—“আহা! যেচোরী গরীব মাটারীসি। এত পরচ ক'রে উপহার দিলে গুকেও আমাদের কিছু দেখা উচিত।”

নবকিশোর বলে—“দিলে সে দেবে না।”

হুতারা বলে—“তাহ'লে গুজবান দিয়ে একখানা চিঠি লিখে দিলেও কতকটা ভাল দেখায়।”

নবকিশোর বলে—“সে যখন দিয়ে গেলো মুখে তাকে গুজবান জানাওনি?”

“তাঁতো জানিয়েছি তবু সে একপক্ষে, তোমারও তো জানান উচিত।” নিজের প্রত্যাখ্যান ছবিখানার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে নবকিশোর বলেন—“জানাবার কিছু নেই।”

বমীর এই অবহেলায় গরীব মাটারীসি প্রতি হুতারা সহ্যহুতী আরো বেড়ে উঠলো, সে আবার বলে—“আহা! যেচোরী সনসুম কেউ আপনার লোক নেই, যা ঐ একটা ভাই, আর সে নাকি জামান সামাজেও তেমন কারো সবে মেশানো—কি নিঃসঙ্গ জীবন!”

নবকিশোর কোন কথা কইলেন না, ববদের কাগজে তাঁর চোখ ছুটো একেবারেই ভুবে গিয়েছিল। হুতারা স্ত্রী স্ত্রী সহ্যহুতীর রেশ তখনো ধামেনি, সে আবার বলে—

—“তার এখনো যখন বিয়ে হয়নি তখন এই বোকা বয়েসে কেঁবা গুকে বিয়ে ক'রবে আর! আহা যেচোরী!”

এবার যেন অশ্রু হ'য়ে নবকিশোর বলে উল্লেন—“ওকে কেউ বিয়ে ক'রতে চাইবেও গু কাউকে ক'রবে কিনা সেইটাই দেখেই বিবাহ।” হুতারা প্রোজ্ঞাসের ভয়ে কথা ক'টা বলেই নবকিশোর সে ঘর থেকে চ'লে এলেন। চ'লে এলেন বটে, কিন্তু তার মন কিছুতেই পাখিল না। চামেলীর করুণ মুখের বিবাহভরা চাউনি তাঁর মনের কোথায় যেন হুতারা ক'রেই বিধিছিল—বুঝি চামেলী আর কখনও তাঁকে ক'রবে না!

নবকিশোর জোর ক'রেই এই ব্যাঘাত্য চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিলেন, কিন্তু তার অনেক ক্লিম্ব আছে, যা সারতে চাইলেও শরতে চায় না।

ক্ৰমশ: মন জুড়ে একখানা অতিমানের মেঘ ঘনিয়ে



আঙ্গিল, চামেরার আজকের উপহারকে কেন্দ্র করে! যে ছবি সে না চেয়েই পেয়েছিল সেই অশাণ্ডিত পাওয়া এমন করেই নির্মম হ'য়ে সে ফিরে গিলে! তা সেবে বহিকি! কিন্তু তাঁর শারীরিক ছায়ায় এই কাগজের ইকুরোটা ছাড়া আর কি তাঁর কোন ছবিই তার কাছে নেই? এই যে এতদিন ধরে এত গান এত বাঁশী বেজে বেজে ফিরেছে সে কি তবে সবই মিথ্যা? কোন ছবিই কি তারা একে একে চলেনি। মুহুরে মুহুরে সে সব ছবি যে খাঁকা হ'য়ে গিয়েছে, আর অক্ষয় হ'য়ে জল জল ক'রছে তার চারিদিকে। বিশেষ করে এই দেবদাক পাছে ধার তলার গভীর রক্তিরে কত বাঁশীই বাজিয়েছে তিনি কত গানই পেয়েছেন!

সে সব ছবি কি চামেরা ফিরে গিয়ে পারবে কখন? তবে কেন এই ছবিখানা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে ও নিজেকে সে মিথ্যাই এত ব্যথার পাখ করে তুলে? যা কেয়ান যায় না, তা কেবোতে গেলে,—অ ফেরানটাই বেশী করে চোখে পড়ে!

চামেরাও একদিন অথাক হ'য়ে দেখলে যে সে ছবি সবচেয়েই আপনাকে ধরা দিয়ে ফেলেছে, সে আবার কত ভাবে কত ভাবিতে! সেই একখানি ছবির মায়া ছাড়তে পেরেছিল বলেই না সে আজ তাঁর হাজার হাজার ছবি পেয়েছে তার চারদিকে—শরনে, স্বপনে, সলাই।

## মৃত্যু-বরণ

### শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত

• • • আচ্ছা ভাক্তার, তোমার কথাই শুনেও কিন্তু তার আগে আমার জীবনের যে ইতিহাসটুকু বলবো তার সবটুকুই তোমার গুনতে হবে!.....কেন দেখছায় মৃত্যুকে বরণ করলুম, কেন যে এখন করে সর্জনশয়ের পথে নিজেকে টেনে আনলুম, এই প্রশ্নটাই তুমি আমাকে সেদিন করেছিলে নয়?—অবশ্য বিশেষ কিছুই নয়, তবুও আমি সুরলভাবে সবটুকুই বলবো,—ইচ্ছা হ'য় বিশ্বাস করে, না হয় করে না!.....হ্যাঁ, ভাল কথা, ওই জান্নাতটা একটু খুলে দাও না, ভাক্তার!—আর একটু.....হ্যাঁ, হয়েছে, থাক!.....

.....তুমি কখনও কাউকে ভালবেসেছ ভাক্তার?—মা, বাপ, ভাইবোনের কথা আমি বলছি না, কোনও মেয়েকে?—কখনও না?.....তুল ভাক্তার, তুল, ভাল করে মনে করে বল দেখি কখনও কোন মেয়েকে তুমি ভালবাসনি?.....ছেলেবেলায় কি—তবে!.....

হ্যাঁ, আমিও ঠিক সেই বিপদে পড়েছিলাম! অবশ্য ভালবাসা নয় পড়াটা যে বিপদে পড়া সেকথা আমি ঠিক বলতে চাইনে, তবে আমার জীবনে—সে আলাবা কথা!.....মেয়েদের ভালবাসা, সেটা যে কতবড় শক্ত তা কি ছাই আমি জানতুম?.....সত্যি ভাক্তার, তোমার কাছে নিখোঁ বলবো না, প্রথম যখন তাকে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গান গাইতে দেখলুম, কালাপোড়ে চামেরা-আলো কাপড়খানা পরে সে যখন প্রথম আমার কাছে জলবাবারের খালাটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো, তখন আমি কেন, যে কোন লোক, তাকে ভালবাসতে চাইতেই! তারপর—সে কি চাহনী? আমার বোধ হয় মেয়েদের সমস্ত সৌন্দর্যটুকু ভগবান তাদের চোখের ওপরই সাজিয়ে রাখেনা—তা নয় তো কি?.....মেয়েদের চোখের হানিটুকু যেমন হৃদয়, তাদের চোখের জলটুকুও ঠিক তেমনি!.....সেদিনটা কি বার ছিল, তা আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু যে-বারই হোক না কেন

সেই দিনটাই যে আমার জীবনের একটা 'পূর্ব্যাহ' তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে!.....হ্যাঁ, ভাল কথা, তাঁর প্রথম দিনের সেই গানের কটা লাইন আজও আমার একটু একটু মনে পড়ছে, রবিবাবুর সেই কটা লাইন,—সেই যে—

তুমি সন্কার মেঘ শান্ত স্বপ্ন

আমার সাগরে সাধনা,

আমি আপন-মনের মধুরী মিশায়ে

তোমারে করেছি রচনা,

তুমি আমারি, তুমি আমারি.....

—আচ্ছা ভাক্তার, মাহুষের ভেতরকার কলকল নিয়েই তো তোমার বাসনা! বলতে পার, মাহুষের কোন্ অংশটা বেশী দুর্বল, সবচেয়ে ভেঙে পড়ে?.....বুখানা নয়?—তা নয় তো কি?.....দেখ না, সেই তো একটা দিনের পরিচয়, ক' ঘটাই বা? বড় জোর তিন ঘণ্টা!.....সেই তিন ঘণ্টার পরিচয়টাই শেষে এতবড় হয়ে উঠলো যার ধাক্কা আজও ঠিক সামলে উঠতে পারিনি!.....হাসছে, নয়?.....ঠাট্টা নয়, ভাক্তার, ঠিক তাই-ই! পুরুষের মন বড় দুর্বল, মেয়েদের চেয়েও চের বেশী!.....

—তা, কাল যে আমি একলাই বেসেছিলাম তা নয়, ওই তিনটা ঘণ্টার চেনা-পরিচয়ের মধ্যে আমাদের দু'জনের মনের এত বেশী পরিচয় কখন যে অমলশা হয়ে গড়লো, আমি তো মোটেই বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলুম—তখন চের হৃৎ চলে এসেছি, সেই তিনটা-ঘণ্টা তখন কত পেছনে পড়ে!.....তারপর কতবার তাঁদের বাড়ী গেছি, কত কথা, চামেরা-আলো-মাথা নির্জন জাতে বসে দু'জনে মিলে কথাবার্তার কত স্বপ্ন গড়ে তুলেছি,—নিখোঁ বাবো না,—হাতে হাত, বুক বুক, মুখে মুখে রেখে সে কত কথা, সব বলতে গেলে সমর হয়ে উঠবে না,.....কিন্তু আজকের কাছে সে সব নেন একটা নিচক স্বপ্ন!.....বিশ্বতপ্রায় কল্পনার মত কীণ, তেমনি অস্পষ্ট.....

.....অথচ তোমরাই বল মেয়েমাছ বড় দুর্বল, ভালবাসতে নাকি তাদের মত আর কেউ পারে না!.....

হ্যাঁ, এতবড় মিথোচাই আজ সব চেয়ে সত্যি বলে সবাই জানে!.....জাহুক, আমি কিন্তু তা স্বীকার করবো না,.....আমার জীবনের ইতিহাসই তো তাঁর অনন্ত প্রশংসা!—এই যে তিল তিল করে ধুয়ার দূত এসে আমার শিরেরে দাঁড়িয়েছে, এই যে তিনশটা বছরের মধ্যেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার সমস্ত পরিচয়, দেনা-পাওনার হিসাব মিটিয়ে দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁর গোড়ার তো এই মেয়েমাছ আর তার ভালবাসা!.....বিশ্বাস কাউকে করার না ভাক্তার, সবাই সমান, যিহেতাদের অভিনেতা অভিনেত্রীর চেয়েও কেউ কম নয়, বরং তাদের চেয়ে এরাই অভিনয়টা আরও ভাল করে করতে পারে!.....

—যাক ভালবাস্তুম সে আমায় কি বলতো জানো ভাক্তার?.....বলতো সারা দুনিয়ার সে নাকি আমাকেই একমাত্র ভালবাসে, আমায় না পেলে আত্মহত্যা করবে, সারাটা জীবন কুমারী হয়েই—হাসি পায় ভাক্তার, এখন সে সব কথা মনে হলে, আর নিজেকেও যিকার দিতে ইচ্ছা করে, ছিঃ এত বোকা ছিলাম.....

—তা'ছাড়া দোষটা শুধু যে তাঁর একলাই একথা বলতে চাই না! যেখানে আসল ভালবাসা, ভগবানের আশ্রিত্য কি আছে জানিনি, পোকা বাঘও সেখানে একটা দোষেই! দেখ না, আমার ছিলাম বড়কলো, তারা গরীব,—আমরা জাতে ব্রাহ্মণ, তারা কায়স্থ!.....সব দিক দিয়ে আমি বড় হলেও ভালবাসার কাছে তো নিজেকে ছোট হয়ে যেতে হোল!.....সত্যি কথা বলতে কি, ভাক্তার, 'জাত' বলতে কি বোঝায় তা আমি জানিনি, জানতেও চাই না,—পরশটাঁই সব চেয়ে বড় নয়, যে ভালবাসাটা আমি তা'কে দিয়েছি সেইটাই আমার সবচেয়ে বড়—সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ.....

বড়িটা দেখতো ভাক্তার,—কটা? রাত তিনটে?.....একটু জল,—হ্যাঁ, ওই গেলানটায় আছে,—আঁ!.....

—হ্যাঁ, কি বলছিলাম?—ভাল কথা,.....হ্যাঁ মনে পড়েছে!—সেই যে বছরে তাঁর বিয়ে হয়, সে বছরটা আমার বেশ মনে আছে, বিশেষ নিমজ্ঞ পেয়েছিলাম,



যাই-নি যে তাও নয়, লোকে প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে যে ভাবে মুড়ে পড়ে, আমার প্রতিমাকে শেষ বিসর্জনের-পেছা দিতে গিয়ে আমিও ঠিক তেমনি মুড়ে পড়েছিলাম।.....বিষোড়ার আলো, বাজনা,—সে সব কিছুই মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে বিয়ের আগে একবার তাঁকে একলা পেয়েছিলাম, সে আমার পায়ের ওপর তাঁর মাথাটা ঠেকিয়ে বলেছিল,—মনে করো তোমার রান্নাঘরে গিয়েছে, আর পার তো তাঁকে কমা করো।!.....

মুখ তুলতেই দেখেছিলাম তাঁর চোখে জল! জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তো পারবে?.....এতদিনের পরিচয়, ভালবাসা.....

সে তাঁর উত্তরে কি বলেছিলো জানো ডাক্তার? বলেছিলো—যেমেদামহুকে চেমনো না, তাই ওকথা জিজ্ঞেস করছে, তা'রা মরতে পারে, তুলতে পারে না।!.....

তারপর সে কী অস্বরোধ, বলেছিল—বিয়ে করো, জীবনটাকে অমন করে নষ্ট করো না।!.....

হা, আর একটা কথা সে বলেছিলো ডাক্তার, বলেছিলো—এ জগতে আমাদের মিলনে ভগবানের বাণী, পারি তো আসছে জন্মে তোমায় পাবার জন্যে প্রার্থনা করবো।!.....তুমি আমার চিরদিনই.....

—সত্যি ডাক্তার, একখাটা যদি তাঁর অন্তর থেকে সত্যের আভাস নিয়ে বেরিয়ে থাকে, সে আমার পূজা, সে আমার দেবী,—আর যদি তা না হয়, যদি একটা সামান্ত সাধনার বাণী হয় তো আমি তাঁকে আজীবন ঘৃণা করতে চেষ্টা করবো।!.....হয়তো পারবো না, কেননা আমি যে তাঁকে বড় ভালবাসি ডাক্তার!.....



—তারপর চোখের সামনে দিয়ে আরও তো তিনটে বছর কেটে গেল,—কতবার তাঁকে পথে একথানা বড় মোটরে বসে যেতে দেখেছি, কি আশ্চর্য ডাক্তার, চোখে চোখে পড়েছে, তবুও চিন্তে পারিনি, মুখ কিরিয়ে নিয়েছে,.....হাথরে, এই তো মেমেদামহু আর তাঁর ভালবাসা!.....

তুমি হয়তো ভাবছো ডাক্তার, পুরুষের পক্ষে এতটা বাড়াবাড়ি।!.....আমিও তা অস্বীকার করিনা, কিন্তু কি করবো ডাক্তার, বিয়ে করবার ইচ্ছে মাঝে মাঝে ছুঁ একবার হয়, কিন্তু পারিনা, মনে হয় যদি তাঁর শেষ কথাগুলো সত্যিই তাঁর অন্তরের হয়?.....আর তা ছাড়া দেখ ডাক্তার, তোমার কাছে লুকোবো না, সত্যি কথা বলতে কি, মেমেদামহু জাতটাকে আর ভালবাসতে ইচ্ছে করে-না, সারা জীবনের বিনিময়ে এ অভিজ্ঞতাটুকু যে পরম মূল্যবান ডাক্তার।!.....

—এখন যে ক'টাদিন আছি শুধু মদ খেয়েই কাটাবো।—ও-ই একটা জিনিস, ডাক্তার,—এক মৃগুই সব ভুলিয়ে দেয়, ভাবনা চিন্তার হাত থেকে পরিমার্জন পাবার এই একটীমাত্র ঝুঁকি। শুধু তাই খেয়েছি না এ কল্‌জেক্টাকে পচিয়েছি।!.....বুখা ডাক্তার, বুখা! তোমাদের শত সহস্র চেষ্টা-ও আর আমাকে ফেরাতে পারবে না। ছুখ-ও তাতে আমার নেই,—এ মৃত্যু-বরণ আমার গৌরবের।!.....সারা জীবনটা ধরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছি, হাজার দুখ কষ্টের ভেতর দিয়ে হলেও সেইটাই যে আমার সব চেয়ে লাভ ডাক্তার! এতো আমার মৃত্যু নয়, এবে আমার সব চেয়ে বড় কামা, সব চেয়ে বড় প্রার্থনার জিনিষ।!.....



ব্রহ্মা গঙ্গার

ইম্ ইম্ ইম্

পরিচয়  
সার সঞ্চলন

সত্যের পরীক্ষা

“নির্বল কে বল রাম”\*

যদিও হিন্দুধর্ম ও জগতের অত্যাধর্মের সহিত আমার কাঁকা কাঁকা গোছের একটু অলাপ হয়েছিল তথাপি আমার জানা উচিত ছিল যে পরীক্ষার সময় তাতে বিশেষ কাজ হবে না। বিপদে পড়িলে মাহুৎ যে শক্তির প্রভাবে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেই শক্তির সম্যক পরিচয় সকলের জানা থাকে না—যে অবিশ্বাসী সে বলে যে ভাগ্য-বলে সে রক্ষা পাইয়াছে, আর যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সে বলে ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। সে এমনি হয়ত মনে করিতে পারে যে, তাহার ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা সাহিত্য-ভাবে জীবন যাপন করার জন্ত সে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু ঠিক বিপদের সময় সে ভাবিতে পারে না যে কে তাহাকে রক্ষা করিল। যিনি ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে গর্ব করিয়া বেড়ান বিপদের সময় তাহার সে গর্ব ধূলিসাৎ হইয়া যায়, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান (অভিজ্ঞতা) নহে, কারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দুইটিই পার্থক্য বিজ্ঞান) বিবাদের সময় ব্যবহৃত হইতে ভাগ্যমান ভূগের মত ভাঙ্গিয়া যায়।

কেবল, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান যে বিশেষ কাণ্ডাকর মনে। তাহা ইংলেণ্ডে আসিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারিলাম। ইতিপূর্বে যে আমি সড়ট-সময়ে কি করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম জানি না, কারণ তখন আমি ছোট ছিলাম কিন্তু এখন আমার বয়স ছুটি বসর হইয়াছে এবং আমি

ও পিতা রূপে আমি অনেকটা সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

ইং ১৮২০ সালে অর্থাৎ আমার ইংলণ্ড প্রবাসের শেষ বৎসরে পোটসমথ সত্বরে নির্যাসিরাষ্ট্রদের এক বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে আমি ও আমার এক ভারতবাসী বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। পোটসমথ সত্বরে একটা বন্দর এবং উহার অবিশ্বাসীরা সকলেই প্রায় নাবিক। এই সত্বরে অনেক অলাপা স্বভাবের জীলোক বাস করে—তাহারা কিন্তু পুরাঙ্গর বৈষ্ণব নহে; তবে নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ ধরাকাট ছিল না। আমরা এমনি একটা জীলোকের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। অত্যাধীন সমিতির কর্তৃপক্ষেরা ইচ্ছা করিয়াই যে আমাদের এরূপ বাড়ীতে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলো তাহা নহে। যাহারা অগ্নিরের জন্ত এ সত্বরে যেড়াইতে আসেন, তাহাদের পক্ষে এরূপ জনবহুল স্থানে কোন বাসীতা ভাল কোনটা বা মন্দ তাহা নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

সত্বার সময় আমরা বৈঠক হইতে কিরিয়া আসিলাম। সূচ্য ভোক্তানের পর আমরা একটু রিড খেলিতে বসিলাম। আমাদের বাড়ীওয়ালী আসিয়া খেলায় যোগ দিলেন, পুরুষদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করার



রেওয়াজ এদেশে ভয় ঘরেও আছে। খেলিতে খেলিতে যেমুন্ডার নির্দোষ ঠাট্টা তামাসাও করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার সঙ্গী ও বাড়ীওয়ালী বিবি যেসব হাঙ্গ-কৌতুক করছিলেন তা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা যায় না। আমার বন্ধুরা যে এসব ব্যাপারে বেশ পোক্ত তা আমি জানিতুম না। আমারও দেখে মনে কেমন একটা স্নেহ হইল এবং ঐ সব হাঙ্গ পরিহাসে আমিও যোগ দিলাম। ক্রমান্বয়ে বেলা ফেলিয়া আমি শীততর সীমা অতিক্রম করবার মত হয়ে উঠতেই, ভগ্নমান আমার সঙ্গে সেইসকলের মূখ্য বিয়ে "কি হে ছোকরা তোমার আবার এ ব্যাঘ্রাম কেন—সবের পড়, সবের পড়" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়ে আমার সাংবান দিলে।

আমার চৈতন্য হল, লজ্জাও হল, আমি সাংবান হলাম। মনে মনে বন্ধুরা উদ্দেশ্যে রূতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং সে স্থান ত্যাগ করুন।

প্ৰথমত খেয়ে ভরে কাঁপতে কাঁপতে আমি ঘরে ফিরে এলাম—বকটা আমার তখনও চিপ চিপ কজিল—ব্যাঘ্র কষ্টক পূজ্যভাবিত হৃদয়ের মত গালিয়ে এলাম।

আমার বন্ধুব মনে পড়ে, আমার পুত্রী ভিন্ন অপর রমণীকে বেশে আমার মনে লালসার স্বেচ্ছ হওয়া এই প্রথম। নানারকম কষ্টকারী পীড়ন সহ্য করিয়া কোনরকমে বিভিন্ন রজনী যাপন করিলাম। ভাবিলাম—এ বাড়ী ছেড়ে পালাব কি এ সবর ছেড়েই চলে যাব? আমি কোথায়? যদি মাথা ঠাণ্ডা করে সাংবান হয়ে না চলি তবে আমার কি হবে? তারপর থেকে খুব সাংবানে চলে, মনে মনে দ্বিধা করুন—কেবল ঐ বাড়ীটি ছাড়লেই হবে না পোর্টসমত সবর কোন উপায়ে তাগ করতেই হবে। আমাদের বৈঠক আর দুদিনের বেশী বসবে না—আমি কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় সে সবর ত্যাগ করিলাম। আমার বন্ধুরা অবশ্য আরও কিছুদিনের জন্ত হয়ে গেলেন।

ধর্মের সাহায্য বৈ কি, ঈশ্বর যে কি বা আমাদের মতো তিনি কি ভাবে বিরাজ করেন এ সম্বন্ধে অবশ্য আমার কোন সন্দেহ থাকি না। কেবল ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুদ্ধিমান বে এ বাড়ী তিনিই আমার রক্ষা করেছেন।

"ঈশ্বর আমার ব্যক্তিগত" এ কথাটি সেদিন আমার গণ্ডে যে কিরূপ খাটিয়াছিল তাহা আমি জানিতাম, তথাপি আমার মনে হয়ে যে ঐ কথাটির সম্যক অর্থ সেদিনও আমি হৃদয়ভর্য করিতে সমর্থ হই নাই। কিন্তু আমার সকল বিপদেই—নৈতিক আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক—ঈশ্বর আমাকে রক্ষাও রক্ষা করিয়াছেন তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি—ব্যারিষ্টারী করিবার সময়ও তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

যখন সকল ভরসাই নষ্ট হইয়া যায়—যখন সাহায্য-কারীরা হার মানে ও সাহায্য দূরে অপসারিত হয়; তখন কোথা হইতে কেমন করিয়া যে সহায় আসে তা আমি জানি না—কিন্তু আসে যে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা আমার উপলব্ধি বরাইয়াছে। পান, কোজন উপবন, জমণ প্রভৃতি কাজের চেয়েও আশ্বাসিবেশন, পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতি আরও সত্য, এগুলিকে কোন মতেই স্থান্যকার বা মনের দৌর্য্য বাবা চলে না। কেবল এইগুলিকেই মগতে সত্য ও সার বলিয়া সম্ভ্রান্ত না কিছু কাজকে আমার বলিলে খুব যে বাড়ীওয়ালা বলা হয়—তাহা মনে হয় না।

প্রকৃত পূজা বা প্রার্থনা কেবল মূখের কথা বা বাক-চাতুরী নয় তাহা দৃশ্য হইতে নিশ্চিত হয়। দৃশ্য হইতে যখন একমাত্র ভালবাসা ভিন্ন অপর যাহা কিছু সব নিশ্চিন্ত হয় তখনই দ্বিধা সত্য সত্যই পরিণত হয়। মনের সম্ভ্রান্ত তারগুলিকে যদি আমরা নীচ পদ্যের বেঁধে রাখতে পারি তবেই জন্মের তারে সেই অদৃশ্য মহা সঙ্গীত খেলি ওঠে। প্রার্থনার জন্ত ভাবার কোন প্রয়োজন হয় না। ইহা ইচ্ছা গ্রন্থ সকল চেষ্টার উপরে। জন্ম হইতে প্রকৃতির প্রভাব দূর করিবার জন্ত প্রার্থনাই যে একমাত্র উপায়, সেসব শব্দ আমার বিশ্বাসও সন্দেহ নাই। তবে প্রার্থনার সঙ্গে মনে গীন ভাবটি থাকি চাই।

ব্যারিষ্টারী তো হইলাম—কিন্তু তার পর?

এহাৎ আমি আসল কথা অর্থাৎ ভাব ব্যারিষ্টারী পড়িবার উদ্দেশ্যে আমি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম সে

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলি নাই। এক্ষণে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত।

যথাবিধিত বায়ে এ যোগদান করিতে হইলে ছাত্র-দ্বিতীয় ছুটীটা পর্যন্ত পালন করিতে হয়, সে দুইটা হচ্ছে টারমস বজায় রাখা ও পরীক্ষায় পাস করা। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় ১২টা টারম থাকে তাহা। প্রায় তিন বৎসরের সন্ধান—টারমস বজায় রাখা মানে, বানায় হাজির থাকা ও তাহার সম্বাহরণ করা। একটা টার্মে ২৪টা থানা দেওয়া হইয়া থাকে, উহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত ছয়টিতে হাজির থাকা চাই। তবে ভিনারে যে খেতেই হবে এমন কোন ব্যাবাহকতা ছিল না—যথা সময়ে হাজির হইয়া, সেটা কর্তৃপক্ষকে জানান এবং শেষ পর্যন্ত অবধান করা এই-গুলিই ছিল দরকার। তবে ভাল ভাল থানা ও নির্বাচিত মত দেওয়া হইতে বলিয়া সকলেই বাঙালার ব্যাপারে যোগদান করিত। এক একটা ভিনারে আড়াই শিলিং থেকে সাড়ে তিন শিলিং অর্থাৎ ২৩ টাকা খরচ হইত। এ খরচ খুব বেশী নয় কারণ কোন হোটেল বাইলে কেবল মদের পাইই এর চেয়ে বেশী দিতে হইত। ভারত-বাসীর কাছে অবশ্য এটা খুবই আশ্চর্য বলের বোধ হইবে কারণ থানা এখনও খুব সস্তা হই নাই উারা ভাবতে পারেন যে বাঙালার খরচের চেয়ে মদের খরচ বেশী হওয়াটা অস্বাভাবিক। প্রথমবার যখন এই সব ব্যাপার বেশমুখ তখন আমার মনটা তেনে কেমন হয়ে গেল, আমি উঠের উঠতে পালন না যে কি করে পোকে মদের জন্ত এভাবে পয়সা নষ্ট কর্তে পারে। পরে অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি এই সব বানায় প্রায়ই কিছু বাইতাম না, কারণ আমার খাবার মত কটা, আর সিদ্ধ করা আলু ও বাঁধা কপি ছাড়া অজ কিছুই থাকিত না। প্রথম প্রথম এসব খেতে ভাল লাগত না বলে আমি চাইতুম না কিন্তু পরে যখন এ সকলের স্বাদ পেলাম তখন সম্ভ্রান্ত খাবার চাহিয়া লইবার মত ভরসাও আসিয়া গেল।

বেকার অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের জন্ত যেসব খাবার দেওয়া হইত, ছাত্রদের খাবারের চেয়ে তাহা ভাল হইত। এক-কি নিরামিষাশী পার্শ্বাচ্ছাদ্য ও আমি, নিরামিষগোষ্ঠী-

দিগের স্বার্থ সংরক্ষার্থ, বেকারদিগের জন্ত যে সমস্ত নিরামিষ খাদ্যের আয়োজন হইত, ঐরূপ খাদ্য পাইবার জন্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইলাম। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং আমরা বেকারদিগের খাদ্য হইতে ফল ও সম্ভ্রান্ত নিরামিষ খাদ্য পাইতে লাগিলাম। প্রত্যেক চারিজন ছাত্রের একটা গ্রুপ বাদ হইত এবং এইরকম এক একটা দলের জন্ত ২ বেতল মদ দেওয়া হইত। কিন্তু আমি মত সম্পূর্ণ করিতাম না বলিয়া অনেকেরই আমার দলে লইতে চাহিতেন কারণ যে বলে আমি থাকিতাম সে দলে ৩ জনে ২ বেতল মদ খাইতে পাইত। প্রত্যেক টারমের মধ্যে একদিন আমার "গ্র্যাণ্ড নাইট" হইত, সেদিন বরাড ২ বেতল পোট বা শেরা ছাড়া বাড়তি শ্রাপনে প্রকৃতিমদ দেওয়া হইত। কালেক্সাঞ্জের গ্র্যাণ্ড নাইটে আমায় উপস্থিত থাকিবার জন্তও আমার দলে লইবার জন্ত সকলেই উত্তীর্ণা পড়িয়া লাগিতেন।

তখন বা এখনও আমি বুঝিতে পারি না যে, এই বানা বাঙালার স্বাভাবিক হইবার কি বিশেষ সুবিধা-জনক সম্পর্ক আছে। এককাল ছিল, যখন ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল তখন বেকারদিগের সহিত ছাত্রদের ভাবের আশান প্রদান হইত, বক্তৃতা দিত। তাহা হইতে ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান বাড়িত, তাহাদের চাল-চলন দৃঢ়ত হইত, তাহারা সত্যত্ব হইত এমনকি তত্কারা বক্তৃতাশক্তিও উন্নত হইত। কিন্তু আমারা যে সময়ে ব্যারিষ্টারী পড়িয়াছিলাম, সে সময় এসব কিছুই সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তখন বেকাররা ছাত্রদিগের নিকট হইতে দূরে আলাদা বসিতেন। পূর্বে যে উদ্দেশ্যে এ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা পণ্ড হইয়া গেলো ও পুরাতন-পন্থী ইংরাজ জাতি এখনও পর্যন্ত সেই প্রথাটিকে বজায় রাখিয়া আসিতেছেন এই হইত।

পাঠ্য বিষয় খুব সহজ ছিল, সেইজন্য ব্যারিষ্টারদিগকে "ডোজনে মড" ব্যারিষ্টার বলিয়া সাধারণে ঠাট্টা করিত। সকলেই জানিত যে এই পরীক্ষার বিশেষ কোন মূল্য নাই। আমাদের সময় দুই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত, রোমান আইন ও সাধারণ আইন। এ সম্বন্ধে পাঠ্য-পুস্তক নিশ্চিত ছিল বটে কিন্তু প্রায় কেহই তাহা পড়িত



না। রোমান ল'এর নেট মুখের ক্রিয়া ছ'পস্থানের মধ্যে আমি অনেককে রোমান ল' পাশ করিতে দেখিয়াছি এবং সাধারণ আইন পরীক্ষাও এ সম্বন্ধে নেট মুখ করে ২৩ মাসের মধ্যে পাশ করা যাইত। পরীক্ষার প্রশ্ন খুব সহজ দেওয়া হইত এবং পরীক্ষকগণও খুব সহজ ছিলেন। রোমান ল' পরীক্ষায় শতকরা ৯৫—৯৯ জন পাশ হইত এবং শেষ পরীক্ষাতেও শতকরা ৭৫ জন বা তারও বেশী পাশ হইত। এই সব কারণে পরীক্ষার অত্যন্ত দক্ষ হইবার আশা আদৌ ছিল না এবং পরীক্ষাও বছরে একবারের জায়গায় ৪ বার লওয়া হইত। এই সব সুবিধামূলক পরীক্ষাকে আদৌ কঠিন বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়াই পরীক্ষাকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছিলাম। আমার মনে হইল সমস্ত বইগুলি আমার পড়া উচিত। বইগুলি না পড়া একটা প্রথমেই বলিয়া আমার মনে হল। আমি সেসকল পয়সাও খরচ করিলাম। রোমান ল' লাভিন ভাষায় পড়িবার সূচ্য হইল। লতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যেটুকু লাভিন আমি পড়েছিলাম তাহা আমার এ সময় বিশেষ সাহায্য করিল। কিন্তু এসব পরিজন একেবারেই বুঝায় যায় নাই কারণ বর্ণিত আফ্রিকার, যেখানে পরে আমি ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলাম, সেখানে রোমান আইনই সাধারণ আইন বলিয়া পরিগণিত হইত। সেসকল 'ল্যাটিনিয়ান' পড়িয়া আমি বর্ণিত আফ্রিকার আইন স্থিতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলাম।

## প্রিয়া

### শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস বি-এল

যতকল কাছে থাক, নাহি বৃষ্টি, প্রিয়ে,  
মোর কতখানি ছুটি' তোমার আসন;  
করুন কোমল কান্ত আঁখি ছুটি দিয়ে  
ভরিতা রেখেছ মোর সকল কুবল।  
হৃৎ কিস্ত সাধ আছে, যত কিস্ত আশা,  
আমার সকলি, সখি, তোমাতে মগন;  
তোমার ও অনাবিল শুভ ভালবাসা

নয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ইংলণ্ডের সাধারণ আইন পাঠ শেষ করিলাম। ক্রমসের সাধারণ আইন বইখানি কোক্সলোকীপক হইলেও বৃহদাকৃতি ছিল, প্রত্যয় উহা পাঠ করিতে অনেকটা সময় লাগিল। মেলের 'এডুইট' বইখানি ভাল হইলেও বৃষ্টিবার পক্ষে একটু কঠিনায়ক ছিল। হোয়াইট এবং টিউডরের লিভিং কেসেসের (প্রধান প্রধান মামলার বিবরণ) মধ্য হইতে কতকগুলি নিরীক্ষিত মামলা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল—ইহাতে আমার এবং শিক্সা দুইই পাওয়া যাইত। উইলিয়াম এবং এডওয়ার্ডের 'রিয়েল প্রপার্টি' এবং ওডইন্ডের 'পারসন্সাল প্রপার্টি' নামক বই দুখানিও আমি বেশ যত্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ভারতবর্ষে ফিরিয়া যেনের 'হিন্দু-ন' নামক বইখানিও খুব আগ্রহসহকারে পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। তবে সে কথা এখন থাকুক, কারণ এখানে ভারতের কথা আমি বলিতে বসি নাই।

পরীক্ষার পাশ করিবার পর ১৮৯৭ সালের ১০ই জুন 'বারী' আমার তাক পড়িল। ১১ তারিখে হাইকোর্টে এনবোলুট হইলাম, ১২ তারিখে গৃহাভিমুখে দাখা করিলাম।

এত করিয়া পড়িয়া শুনিয়াও আমার কেবলই মনে ভয় হইত—আইন বাবলা আরম্ভ করিবার উপক্রম বুলিয়া আমি নিজেকে মনে করিতে পারিতাম না। আমার এই অনবোধ ভাব সত্বেও একটা স্বস্তির পরিস্থিতির আরম্ভক।

অভিনব স্বর্গলোক করেছে রচন।  
গুপ্ত কোন মায়াপুরী কক্ষে হুগোপনে  
সুখাইয়াছিছ আমি, হে বরহুদারি,  
কখন 'জীবন কাঠি' স্পর্শিলে নয়নে  
চরাচর বিধি ভাঙ্গে নবরূপ ধরি।  
আমি যাদুকরি, একি মোহ মন্ত তব,  
জ্ঞান হৃদি শাখে ছল কোটে নব নব।



চোরে চোরে

গত ২ই মে নিজের দায়ীবে শিবদিয়ে শোভাযাত্রার অমতি দিয়া লর্ড লিটন দেখাইয়াছেন যে তিনি সত্যই তেজস্বী ইংরাজ এবং বৃত্তীশ গভর্ণমেণ্টের ব্যোগ্য প্রতি-নিধি। তাঁহার পূর্বরূপ অনেক কাজ যাহা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনায় নিম্নাই বোধ হইয়াছে—আমরা তাহার নিম্না করিয়াছি, কিন্তু আজ তিনি মুসলমান নেতাদের অস্তায় আধাবার করণ্যতা না করিয়া যে দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা রাজ্যচিহ্নিত এবং মহাশয়ের পরিচায়ক। যদিও শিবদয়ের সহিত হিন্দুদের ধর্মগত কোন সম্বন্ধ নাই—তথাপি এই দাঙ্গার তাহাদের অনেকগুলি উপাদান যান মুসলমান গুণ্ডা কর্তৃক কলুষিত হইয়াছিল বলিয়া ও তাহারা বংশের অতিথি বলিয়া, তাহাশিগের সহিত মহাশুদ্ধিত প্রকাশ হিন্দু মাজেরই কর্তব্য। অনেক মুসলমান পত্র এজন্য বাঙ্গালী হিন্দুদিগের উপর একহাত নইয়াছেন—তাঁহারা যাহা হুদী বলিতে পারেন হিন্দুরা আর তাহাতে জ্ঞপ্তিও করিব না কারণ এখাবৎ মুসলমানদের মন যোগাইতে গিয়া তাহারা নিজদের স্বার্থ ধরেই ত্যাগ করিয়াছে—পরিশেষে পুরস্কার পাইয়াছে বড় দাঙ্গা সৌকর্য্য আলীর ভাষায়—'কাফের'। বাস, আর বেশী সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই।

শিবদিয়ের শোভাযাত্রা নির্দিষ্টবাসে সম্পন্ন হইয়াছে—ইহেই তো, যে মেলিনগানের টেলা। সেখানে তো পেছন থেকে বৃক ছুরি বসাবার হুগোপ ছিল না। যাহাই হউক, এবারকার পুলিশের বস্কাবস্ত দেখে মনে হল বাংলার গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে দাঙ্গা একদিনেই থামাইতে পারিতেন। তথাপি দাঙ্গা এত দীর্ঘস্থায়ী যে কেন হইল ও তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ এত শীঘ্র কেন বাহির হইল তাহা বুঝা উঠা কঠিন।

আমাদের দাঙ্গা শ্রামহুসর সেবিন শিখ প্রসেসনের সঙ্গে আধারোহণে গমন করিয়াছিলেন। আজকাল বাঙালীর ছেলেরা আধারোহণ করে না—করে না মানে করিতে পায় না। অথ দরিসের পক্ষে বলত নহে আর দ্বনীর পক্ষে অধাপেক্ষা মোটরই অধিক প্রিয়। কাজেই দাগার একীর্ষি, এ যুগের পক্ষে যে অস্বাভাবিক, তাহা অস্বাভাবিক করা যায় না। হুই গোকে বলে যে তাঁড়ের মধ্যে হাটখা যাইতে দাগার নাকি সখি গধির মত হইয়াছিল তাই তাঁহাকে অশপৃষ্ঠে ছাপনা করা হইয়াছিল ও দুপাশে দুজন রক্ষকও দেওয়া হইয়াছিল। আবার তাই নিয়ে বহুমতী ও আনন্দবাহিনী নাকি চিমটা চাঁটাচাঁটিও চলেছে। আমার, বলি,—'শুভবুদ্ধি যোড়া চাঁটা চাঁটা তুমি যাও হে!'

খেলাফৎ কমিটি, তাক্বিম, জমিয়ৎ উলোম প্রভৃতি মুসলমান সমাজগণ শিবদিয়ের শোভাযাত্রা সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা খেবেক হিন্দু মুসলমানদের একত্বে যে গত কয় বৎসরে কতটা গড়ে উঠেছিল তা এখন বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় খিলাফৎ সভায় এক বক্তা হিন্দুদের মধ্যে 'প্রাত্য' কথাটি ব্যবহার করার শোভিত্বস্ব বহুপ ক্রিপ হযে উঠেছিলেন তাহাতে অত্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এই শব্দটি আমাদের ব্যবহার করাও অস্বচিত।

আলী ভায়েদের ছোট ভাইটী প্রত্যেক অমুসলমানকে মুসলমান করাই যে তাঁহাদের জাত ভায়েদের কর্তব্য তা বলতেও লজ্জা বোধ করেননি—এমন কি মহাশ্যাকেও কলম পড়বার আশা যে তিনি রাখেন, সে কথাটিও



কৌরবের মাথার বলে ফেলেছেন। যা এতদিন বৃকে গুমরি গুমরি বেদনা দিতেছিল—দাঙ্গার ধমকে তা কাঁদা হয়ে বেরিয়ে গেল—হল ভাল। অতঃপর মহাত্মা তাঁহার এই ভানহাত বঁধতে ছুখানির প্রীত্যর্থ কৌরব কাণ্ড স্থগিত রাখুন—কারণ গুরুশ্রদ্ধার মূখে কলমার আবৃত্তি ভাল নাও লাগিতে পারে—আর একটা বিপদ, তিনি আবার নিরামাশিক—এখন উপায় ?

—

দেশবন্ধু বসিষা বাঁচিয়াছেন—তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলেও হয় তা তাঁহার প্যাক্টের ফল তাঁহাকে কলমা পড়াইবে বলিত। খ্যাতিমানের কথা অনেক ভূনিয়াকি কিছু এই দাঙ্গার বাহা প্রত্যক্ষ করা গেল তাহাতে বুঝা গেল যে স্বয়ং বাসিন্দাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক এমন ব্যক্তি বাস করে যাহাদের বাতুলালয়ে রক্ষা করাই কর্তব্য প্রকাশ্য বাতুল ব্যক্তি বিশেষের ‘অনিষ্ট’ করে আর এই স্বয়ং বাতুলেরা একটা জাতিকে অবলীলাক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। এর কি প্রত্যকার নাই ?

—

উপসর্গ দূর হইয়াছে বটে—কিন্তু এখনও গা খোলসা হয় নাই এখনও একটু মেজমোজানি ভাব আছে—উপসর্গটা চাপা পড়িয়াছে, একটু বেশী মাজায় পুলিশরূপ হুইনান প্রয়োগে; তবে রোগের জড় এখনও আছে। মুগলমানের নূতন এবং অশুভ দাবীর—যে কোন মঙ্গলভের সমুখে বা আশে পাশে কেহ কোন গোলমাল করিতে বা বাজনা বাজাইতে পারিবে না—যীমানা না হওয়া পর্যন্ত ক্রোধের মিটিবে বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতায় মঙ্গলের বরণ প্রভৃতির অন্ত নাই—প্রায় সকল রাস্তার ধারেই মঙ্গল হুঁ একটা পড়েই। এই দাবীতে রাজ্য হইতে হইলে হিন্দুদের পক্ষে রাজপথ ঢালাই করিত হইবে। তবে বেলাকাতী মল খদি কলিকাতা ও আশপাশের একটা মাথা বাহির করিয়া মঙ্গলভের অবস্থানস্থানগুলি লাল দাগ দিয়া দেন এবং হিন্দুদের এক একখানা ঐ ম্যাপ উত্তাহার দেন তবেই বেচারীরা পথ হাটবার সময় হুঁসিয়ার হইয়া চলিতে পারিবে।

মোটর-অধিকারীদের অটোমোবাইল এসোসিয়েশন বলিয়া একটা সমিতি আছে—কলিকাতার মধ্যে খেদব জাহগার রাস্তা মোটরের পক্ষে অস্ববিধাজনক সেখানে তাঁহার একটা করিয়া বাধা গাড়িয়া উপরে এক জয়গজ ঐতিহ্যদেয়ন, তাহাতে লেখা থাকে A.A.B. DANGER খালিকতের ম্যাপের ঐ লাল দাগগুলিকেও হিন্দু পায়েয়া Danger Spot বা বিপজ্জনক মনে করিয়া না হয় ঐ সব স্থান এড়াইয়া চলিবেন। আলী ভায়ের কি বলেন ?

—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৬৪ জন কাউন্সিলার মেয়রের নিকট তাঁহার সহকারীটিকে পদত্যাগ করিবার হুজুম বিহার জন্ত অহরহ প্রয়োগ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন। এই স্বাক্ষরস্বাক্ষরদের মধ্যে মজারটে, নিবালেন, ইতিপন্ডেট ও সন্ন্যাস ইংরাজগণ আছেন—নাই কেবল মুসলমানের দল। নানাব্যাহাই নামক খাজ খরো যেমন হুজি আছে তিনি আছে, গি আছে, কিজ জল নাই; এতও ভেদনি সফল ধর্মের লোক থাকিলেও কোন মুসলমান কাউন্সিলারের স্বাক্ষর নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরপেক্ষ লোকের সংখ্যা কত। গত দশবার ডেপুটি মেয়র তাঁহার পদের যোগ্য কোন কাহারই করেন নাই বলিয়া তিনি সকল কাউন্সিলার তথা কলিকাতাবাসীর বিশাশ হারাইয়াছেন—যিনি সাধারণের কাছে নিরুদ্ধ হইয়া পালনের কর্তব্য সময় সাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া সাম্প্রদায়িক কার্যে মনোনিবেশ করেন তিনি সেরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদের যে আযোগ্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই পত্র দিবার পূর্বেই তাঁহার পদত্যাগ করা উচিত ছিল—এমন বোকা যাক্ত তিনি কি করেন ?

—

এক অজ্ঞাত কুলশীল খুঁটানকে ‘পীর’ আখ্যা দিয়া তাহাকে হুগ মার্কেটে সমাধিস্থ করিয়া ইনি কর্পোরেশনে বিধম গণযোগ্য ঐযাদিয়াছিলেন—তখন দেশবন্ধু জীবিত, তাই তিনি কোনরূপ ইংসকে সে দাজা রক্ষা করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে সাম্প্রদায়িক আচরণ পূর্ণ করিবার জন্ত কলিকাতাবাসীরা তাঁহাকে ডেপুটি মেয়র

করে নাই কিন্তু তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে তিনি মুগলমান হইয়া খদন অগ্রহণ করিয়া স্বরাজ্য হলে প্রবেশ করিয়াছেন তখন মুসলমানদের খুশী করিয়া বাহাদুরী দেখান তাঁহার কর্তব্য। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে যে যোগ্যতার আবশ্যক, সে কথাটা মুগলমান সমাজ মোটেই ভাবেন না তাই আজ তাঁহারা তাঁহাদের জন সংখ্যার হিসাবে সরকারী চাকরীর দাবী করেন। সব জীবের দ্বারা যে যব মাকান হয় না এ কথাটা তুলিলে চলিবে কেন ?

গত ২ই যে শান্তিনিকেতনে কবিবর রবীন্দ্রনাথের জন্মদশবর্ষ স্মরণ ও হুজাকরণে সম্মার হইয়াছে। শব্দ-ধ্বনি ও সঙ্গীত মন্ডলোৎসবের সহিত পণ্ডিত বিবৃশের শাস্ত্রী কবিবরকে মফাণের লইয়া যান। কবিবরের রচিত কতগুলি নির্দাচিত সঙ্গীতের পর, উদ্দেশীয় অধ্যাপক সঙ্গীত, পৃথিবীর সাহিত্যকে গৌরবমণ্ডিত করিবার জন্ত কবিকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। পরে করানী অধ্যাপক দ্বারা কবিবরের প্রভাব ও সম্মানের কথা উল্লেখ করিয়া অভিনন্দিত করেন। চৈনিক সম্প্রদায় হইতে অধ্যাপক লিন্ টাংহায়ে অভিনন্দিত করেন। মিঃ ওকসক পূর্বে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হইয়া কবিবরকে সংবর্ধনা করেন। পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্রিতিমোহন

দেন প্রভৃতি কবিবরকে অভিনন্দিত করেন। কবিবরের সন্মান নাটকের অভিনয় ও ভোজের পর উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়।

এই উপলক্ষে কবি একটা নূতন নাটক রচনা করিয়াছেন। ‘কথা ও কাহিনীতে’ ‘পুষ্কারী’ নামে যে কবিতাটি আছে তাহার মূল ভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই এই নাটক রচিত হইয়াছে।

জন্মদশবর্ষ তারিখে আশ্রম-বালিকাগণ এই নাটকটি অভিনয় করিয়াছে।

মৃত বীর চন্দ্রকান্তের পরিবারের সাহায্যের জন্ত কবি এই নাটকটির আয় দান করিবেন, ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ বাবু ইহা ছাপাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শিল্পী নন্দলাল বাবু এই পুস্তকের চিত্র বিনা পারিশ্রমিকে আঁকিয়া দিবেন। ইহার আয় মৃত বীরের পরিবার প্রতিপালনে ব্যয়িত হইবে।

নাটকটির নাম ‘নটীর পুষ্কা’। খর্খেরী রেবণভের শিষ্যগণ সন্ন্যাস অঙ্গভাষণের সহায়তায় খদন দাবীর বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করিতেছিল—তখন ভক্তিমতি শ্রীমতী মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পুষ্কার জন্ত প্রস্তুত হইল। আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়াও শ্রীমতী প্রভুর পূজা সমাপন করিয়াছিল; ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য।

## হিন্দু-সভা

লালা লাক্ষপত রায়

(‘পিপল’ পত্রিকা হইতে অনূদিত)

প্রত্যেক আন্দোলনকেই, একটা জীবন্ত শক্তিতে পরিণত হইবার পূর্বে তাহার বিবর্তন পথের কতগুলি ক্রমিক স্তর অতিক্রম করিতে হয়—এই স্তরগুলি অবিচ্ছিন্ন হইলে তবে অস্তিত্ব সম্বন্ধ এই আন্দোলনকে বিশিষ্ট শক্তি বলিয়া মানিয়া লন। উন্নতির পথে প্রথম ধাপ—উপহাস, দ্বিতীয়—বাধা, তৃতীয়—উদ্বাসীতা, চতুর্থ এবং শেষ ধাপ—পরিজ্ঞান। হিন্দু-সভা যদিও নূতন আন্দোলন নয় তথাপি বর্তমান সাম্প্রদায়িক অবস্থায় ইহাকে নূতনই বলিতে হইবে।

বোধায়ের হিন্দু-মহাসভার বৈঠকে দেখিলাম ইহা প্রথম ধাপে অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ধাপে পদার্পণ করিয়াছে, ইহা হুগের বিষয় সন্দেহ নাই।

ইহার বিপক্ষে আছেন :—

- (ক) মুসলমান শরৎচন্দ্রাণী।
- (খ) তাহাদের এংলো-ইণ্ডিয়ান পৃষ্ঠপোষক।
- (গ) জাশনাসিদ্ধি হিন্দু।
- (ঘ) গোষ্ঠা হিন্দু।
- (ক) বিপক্ষ দল নামমাত্র বলিলেই হয়, কারণ



তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান মানেই বুদ্ধিযাছেন যে বাধা দেওয়া কোন লাভ নাই—বরং ইহার সহিত সম্ভাব্য রাধিয়া কার্য করাই বিধেয়। কিন্তু (গ) দলবান্দীরা এখনও হাল ছাড়েন নাই তাহারা শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িবেন না—বন্ধায় বলে “বিশ্বের চেয়ে কক্ষি রক্ত” মহাত্মাদের মুসলমানের ক্ষমতা বাধা তাহাদের নিজদের চেয়ে বেশী। অতঃপর ধর্মবিশ্বাসীগণকে বুঠান বা মুসলমান ধর্মে রীক্ষিত করা তাহাদের চক্ষু স্পষ্টিকর কিন্তু হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধি তাহাদের চক্ষুশূল।

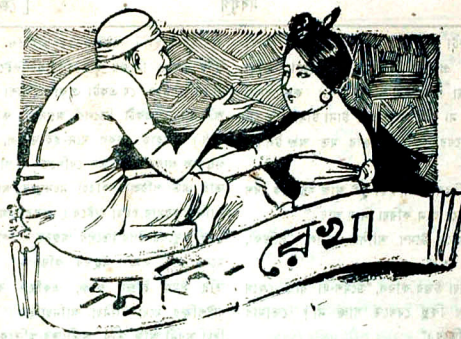
(গ) দলের অনেক জ্ঞানানলিষ্ট হিন্দু বোধ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারা যে হিন্দু মহা-সভার কার্যাবিসংগতি আন্দোলন করেন একথা বলা চলে না। তবে যুগের বিষয় এই যে, তাহারা বাহির হইতে অনুরোধ মত টিটকারী দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন নাই—ব্যাসনাটী বুদ্ধিবার ক্ষমতা ইহার ভিতরে প্রবেশ করাও যে দরকার সে বুদ্ধি তাহাদের আছে। জ্ঞানানলিষ্টদের উচিত নাহাতে কোন প্রকারে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ রাজ-নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, যদ্যেবের প্রতি ইহার চেয়ে বড় কর্তব্য আর নাই। ইহার প্রকট উদ্যোগ এই যে বিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবের ইঙ্গিত মাত্র বর্জমান, তাহার উত্থাপন হইলেই সেদণ্ড প্রত্যাবকে অজ্ঞের বিনষ্ট করা—এইরূপে পূর্ণমাত্রায় সকলকাম না হইলেও সাম্প্রদায়িক ভাবকে একটী নির্দিষ্ট পণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়—এইরূপ রম্যমত ফলোন্মী-মনাবের উত্তেজনাতেও সহজে তাহা মাথা চাড়া দিতে পারে না। বোধ্যায়ের ঈর্ষাক্ষেপেইলাম এই সত্যটী জ্ঞানানলিষ্টগণ উপলব্ধি করিয়াই উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছেন।

(ঘ) বিপক্ষবলগতি বিশেষ ক্ষমতা নহা। হিন্দু সভার কার্যে অনেক গোড়া হিন্দু বাধা দিতে অগ্রসর। তাহারা অশুশ্রুততা সযত্নে এইটুকু মানিয়াছেন—অশুশ্রুতগণকে হিন্দু-ধর্মের ভিতর রাখিতে হইবে—অহিন্দুর সহিত তাহারা যেরূপ ব্যবহার করেন এইটুকুতে তাহাদেরও দাবী আছে—তবে তাহাদের মধ্যে এখনও এমন অনেক আছেন তাহারা এইটুকু ত্যাগ স্বীকারও নারাজ। মোটের উপর, অধিকাংশ

হিন্দুর মতে আমরা অহিন্দুর সহিত যেরূপ আচার ব্যবহার করি হিন্দু অশুশ্রুতদের সহিত অন্ততঃ সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ সাধারণ রাস্তা, বিজালায় ও জনাশয় প্রভৃতি তাহাদের ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। তাহারা যখন হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত তখন তাহাদের মানসিক, নৈতিক আর্থিক ও আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এই পর্যন্ত করিতে অনেককেই স্বীকৃত, ইহার বেশী প্রস্তাব দিতে প্রায় সকলেই নারাজ হতরাং প্রথম এইটুকু লইয়া কার্য আরম্ভ করাই যুক্তি ইহার বেশী করিতে পারা যায় ত ভালই।

সনাতন ধর্মীদের সম্ভারের মূল আশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই যে মহাসভা বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন একথা কেহই বলিতে পারেন না। আমি নিজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী। কিন্তু মহা-সভার সভাপতি বলিয়া আমি এ পর্যন্ত মহাসভায় উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দিই নাই। অনেক হিন্দু ও সনাতন-ধর্মী যে বিধবা বিবাহের পক্ষে তাহা আমি জানি। বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা উত্তরাবর্তের বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন গোড়া হিন্দু পরিবারের মধ্যেও ইহা অঙ্গীকৃত হইতেছে তাহাও আমি জানি তবুও আমার মনে হয় হিন্দুধর্মের মধ্যে পূর্ণ একতা রাখা করিতে হইলে বর্জমান বিধবা বিবাহ সযত্নে মহাসভার হস্তগত না করাই শ্রেয়ঃ।

আমি এইমাত্র বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই—আর্য-সমাজগণ যেন হিন্দু-সভার নামে সংস্কারের গতি উত্তরাবর্তের বন্ধিত না করেন এবং সনাতন ধর্মীগণও যেন কেইল অগ্রসর এবং অসম্মত না হন। আমার আশ্রয়ন সেকল বিধারা সত্যই ভিন্ন মতাবলম্বী তাহাদের কাছে কিন্তু বিধারা স্বভাব বশতঃ বিপক্ষ মত পোষণ করেন তাহাদের সযত্নে বলিবার কিছুই নাই। তাহাদের সম্মত করিতে হাজার চেষ্টা করিলেও মতভেদ শেষ হইবে না—কোন না কোন অঙ্গিয়ার তাহারা গোড়ার দলকে সভার বিরুদ্ধে যে উত্তেজিত করিবেন ইহাতে সম্মত হইবে। এমনকি সভার ভিতরের লোক কেইবাও তাহারা সভার কার্যে বাধা দিবার ক্ষমতা সভার শক্তির সহিত মিলিত হইতে পারে এমন একদণ্ডও দেখা গিয়াছে। এই শ্রেণীর লোককে সম্মত করা অসম্ভব।



শ্রীকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভেদপ্রাণ

“না, আমি তাহ’লে এখন আসি।” বলিয়া মহা-কর্ণগাম্বীরী উত্তরের জ্ঞান তাহার মনের প্রতি চাহিল। সেখানে লজ্জিকা বসিয়াছিল। “সে” বলিল, “তা কিছুতেই হ’তে পারে না। বেলা প্রায় এখন দশটা বাজে। সরাসরি দেখে, না খেয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না। ক্ষুধা—জানিনা কেন তোমার গুণর আমাদের দ্বারা, দ্বারা বেড়ে চলেছে। তুমি যে ভাই রাগ কর না, সে অধিকার বিনা আপত্তিতে ছেড়ে দিয়েছে।”

“ওগর কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না। মা থাকাকে নিজের মেয়ের মত তাঁর স্নেহময় বকের ভিতর টেনে নিয়ে আমার পোষক ও স্পর্শের চেয়ে বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন। সামাজ্য নগণ্য বেদের মেয়ের পক্ষে এ অধিকার তাঁর আশ্রয় চেয়ে কত বেশী, তা তোমরা হয় ত না বুঝতে পার, কিন্তু আমি ত ভুলতে পারি না। লজ্জিকা! তোমাদের কোন কথা আমায় করার মত সাহস বা দৃষ্টান্ত থাকি নাই। কিন্তু লজ্জিকা তুমি ত জান আমার দায়িত্ব আমি ছাড়া আর কেউ নাই। কাল থেকে হয় ত তাঁর গেলো হয় নাই। সেজন্য আমি যেতে চাইছি। এখন তাঁর প্রবোধমাত্রায় বেশ স্বস্তি হয়ে ছেলে।” যদি বর আবার বয়স বিকলে আসব।”

“আর যদি বলি তোমার দায়িত্ব বাবার গুণ রান্নিতে মা উৎসাহকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

মহা-যেন এই আশাতীত, অপ্রত্যাশিত সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে, কোন উত্তর যেন দৃষ্টিয়া পাইল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, বাহাদের ভগ্নবান বড় করেন, তাহাদের তিনি বড় হইবার মত অস্তঃকরণ ও প্রাণ দিয়া থাকেন। যিনি পরের বাধা বোধকেন, যিনি পরের দুঃখে কাতর হন, ভগ্নবান তাহার জ্ঞান যে ভাবেন এবং খুব ঠিক।

কর্ণগাম্বীরী বলিলেন, “মহা তোমার দায়িত্ব বাবার ব্যবস্থা আমি বরংছি। উৎসাহ গিয়ে তাকে বাবার দিয়ে থাকবে মা! তুমি মা, মানি করে নাও—আজ তোমাকে আমি নিজে বসে থাওয়ানো, তাতে আমার আনন্দ হবে, আপত্তি করিসনি মা। মহা আর ভয়ে তুই মা আমার নিশ্চয় মেয়ে ছিলি, তোকে দেখে পর্যন্ত কে যেন সে কথা আমার অন্তরের মধ্যে সর্বদা বলছে রে? আমি বুঝি তোকে ছাড়তে পারব না।”

মহা কর্ণগাম্বীরী কথা শুনিয়া মুগ্ধিকার দিকে নত নতনে বলিয়া রিল। এ কথা যে কি উত্তর দিতে পারা মহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গির করিতে গিয়াছিল। সে তার পায়েয় বুদ্ধাঙ্গুলী দিয়া মাটি বুড়িতে



নাগিল। কি একটা কথা তার নিভৃত অন্তরের মধ্যে মাথা তুলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা লইয়া জিহ্বাগ্রে আসিয়া শুভ্র হইয়া রহিয়া গেল। কল্প বেননা বাহিরে দৃষ্টিতে না পারিয়া তাহার টানা টানা সরসতাপূর্ণ কালো চোখের কোণে মুক্তার মত অশ্রু টল টল করিতে লাগিল।

কর্ণশ্রাব্যী বলিলেন, “লভিকা তুই আজ মহাশয়কে বেশ করে সাধনা মাথিবে বান করিয়া নিজে আয়।”

এই সময় সেখানে উমেশ আসিয়া বলিল, “লভিকা, কাকীমা কোথায় রে?”

লভিকা হাসিয়া উত্তর করিল, “উমেশ-না রাত জেগে বৃষ্টি ঘুমে চেপে কিছু দেখতে পাচ্ছ না? তোমার সামনে যে মা ধাঁড়িয়ে।”

উমেশ এ কথা শুনি অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

কর্ণশ্রাব্যী বলিলেন, “কেন যে উমেশ?”

“একবার মহাশয়কে ভেঙে বিন না। জ্যোতিষী ঠাকুর বলেন তার গালের বাহিরিকে একটা কাল ‘তিল’ আছে।”

কর্ণশ্রাব্যী বলিলেন, “এই যে মহাশয়, সেবি মা তোমার মুখধামি।”

অবনী রুদ্রার অর্ধ মহাশয় কিছুই বুঝিতে পারিল না। এতখানি প্রাণে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কি? আমার মুখের উপর কি একে কি না, ধাক্কা দেই বা কি? আর না ধাক্কা দেই বা কি? তাহাতে কাহার কি আসিয়া যায়? সে বিষয়-বিষয় দৃষ্টিতে অবনী রুদ্রার প্রতি চাহিল। অবনীকে মহাশয় কেবলমাত্র গুরুত্ব দেখিয়াছে, এবং যে সময় তাহার সহিত মহাশয় লাক্ষ্য হয় তখন তার প্রবেশের অন্তরের কথা ভানিয়া, মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তখন যে তাহার কাধকেও ভাল করিয়া ধরিবার ঘোড়াই অবশ্য ছিল না। উমেশ, আত্মলভার মধ্যে সে তাহার কোন পরিচয় জানিবার ইচ্ছা করে নাই অথবা সুযোগ পায় নাই। কিন্তু একবার মাত্র সে অবনীকে হেলিলেও, আজ তাহার মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিবার সময় মহাশয় মনে হইতেছিল, এ মুখ যেন সে অনেকবার দেখিয়াছে। এ মুখ যেন তার অন্তর্য জানা মুখ বলিয়া

মনে হইতেছিল। মহাশয় চোখা করিয়াও অবনী রুদ্রার উপর হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না। অবনীও যে একটা প্রকাণ্ড আশা নৈরাশ্য লইয়া অতি সামান্য একটা ভিলের অঙ্গুলীকান করিতে আসিয়াছিল। তাহার কেবল মনে হইতেছিল, যদি সে মহাশয় গন্তব্যে আকাজিক ভিল দেখিতে না পায়, তাহা হইলে, তাহা এত পরিষ্কার করিয়া বসন্তপূর্ণ আসা এক মুহূর্তে জাতিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। অতীত অবনী অপরিচিত যুবতীর মুখের উপর ভিলের অঙ্গুলীকান করিতে কিছুমাত্র মনের মধ্যে লক্ষ্য অঙ্গুল্য করিল না। সে বৃষ্টি আর তার সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি, একত্রিত করিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিপথের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। সারা মন প্রাণ বিয়া অবনী আজ তার অতীতের স্মৃতিকে সবল টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল এ নন্দিনী না হইয়া কিছুই হইয়া যাইতে পারে না। ছেলেরা যেন সে যে তাহাকে কতবার কোলে পিঠে করিয়াছে তার সেই ছোট বোনটি কি আজ তাহার ঘেঁষাঘেঁষা প্রত্যাশিত করিতে পারিবে? অবনী অত্যন্ত উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, “কাকী-মা এই যে তিল রয়েছে! আর কি ভাঁকি বিতে পারে? নন্দিনী এবার ভোকে চিন্তে পেরেছি।” বলিয়া অবনী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং বিধাশ্রু অন্তরে সে মহাশয় গন্তব্যের তিলটি চাপিয়া ধরিল। মহাশয় অবনী এই প্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং নির্দীকারে তাহার গন্তব্য চাপিয়া ধরিতে দেখিয়া সে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সরলা বালিকার ভাষে অপাপবিশ মুষ্টিতে অবনী রুদ্রার প্রতি চাহিয়া রহিল। কিছু বুঝিতে পারিল না ব্যাপার কি ঘোড়াই তার চিন্তার বোধগম্য হইল না। কেন আর এরা আমাকে লইয়া এমন করিতেছে—সেটা ভাবিবার মত সহস্র পথ মহাশয় জিজ্ঞাসা পাইল না। সে কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছিল না। সে তখন সৰ্ব্বশক্তি হারিয়া মুষ্টিতে কর্ণশ্রাব্যীর মুখের প্রতি চাহিল।

কর্ণশ্রাব্যী তিল আছে এ কথা শুনিয়া যে কতখানি আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি মুখ ফুটিয়া প্রকাশ

করিতে পারিতেছিলেন না। মহাশয় চাহনি তাহাকে যেন কতকটা প্রতীক্ষা করিল। তিনি তখন একগাল হাসিয়া অবনীকে বলিলেন,—

“আজ্ঞা ছেলে দেখছি তুই ত। বেচারীর মুখখানি এমন ভাবে চেপে ধরেছিল যে আর কোন দিন ছাড়বি বললে মনে হাচ্ছে না। ওর যে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড় করে তুলেছিল। ছেড়ে দে। আমাদের দেখতে দে। ওর অবনী ভগবান যে চিহ্ন মাছের শরীরে দিয়ে দেন, তা কেউ কোনদিন অপহরণ করতে পারে না। তোর জন্ম নেই, আজ সে চিহ্ন লুপ্ত হবে না।”

অবনী অপ্রতিভ হইয়া মহাশয় রুদ্রার উপর হইতে হাত সরাইয়া লইল।

কর্ণশ্রাব্যী অন্তর্য দেহভরে ও আগ্রহসহকারে মহাশয় চিহ্ন ধরিয়া মুখখানি নিজ মুখের নিকট তুলিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একটা ক্ষুদ্র হইলেও উজ্জ্বল তিল মহাশয় মুখে অপূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রদুটিত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ণশ্রাব্যী এবার আর নিশ্চয়ই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। মহাশয় মুখচুমন করিলেন। লভিকা নির্দীকার বিষয়ে মহাশয় মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

“মহাশয় মা আমার, আজ ভগবান আমার মুখ রাখা করেছেন। আজ হারানিধি ফিরে পেয়েছি রে। আজ যে আমার আনন্দ রাখবার ঠাই নাই! এতদিনে প্রাণ হ'লো তুই বেদের মেয়ে নেস।” বলিয়া কর্ণশ্রাব্যী পুনরায় মহাশয় মুখচুমন করিলেন।

মহাশয় অপরাধিনীর মত জিজ্ঞাসা করিল, “মা, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।”

“বুঝতে পারবে না, আর দিনকতক পরে। তুই যে আমাদের হারানিধি।”

মহাশয় কর্ণশ্রাব্যীর কথার উত্তরে বলিল, “মা আমার যে বজ্র ভয় করছে।”

একটা নবু নিরাশার প্রবল স্বপ্ন তখন মহাশয় মনের মধ্যে চলিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, এঁদের যদি ভুল হয়, এঁরা যদি এঁদের ভুল ধরিয়া পক্ষাঘাত হন? তা হইলে রাহুর যে লক্ষ্য রাখিবার পথ থাকিবে না! রাহুর মনে কি ভীষণ ব্যথা লাগিবে? লক্ষ্য, যুগায়, অপমানের দাও যদি আমাকে ভাগ করিয়া নিরুদ্দেশে বাঁধা করেন? মহাশয় আর ভাবিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি গিয়া কর্ণশ্রাব্যীর পা ধুঁধানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “না ভুল করবেন না আমি বেদের মেয়ে।”

এই সময় প্রবোধ ও উমেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অবনীকে জিজ্ঞাসা করিল “কি হে কি দেখলে?”

অবনী বলিল “ঠিক হয়েছে তিল আছে।”

“তবে আর কোথায় যার” বলিয়া উমেশ লাক্ষ্যই উঠিল।

মহাশয় তাহাদের কথার কর্ণপাত না করিয়া বলিল “না ভুল করবেন না। আপনার মহাশয়কে সামান্য ভুলের জন্ত যেন চিরজীবন কষ্ট পেতে না হয়। আমার রাহুর যেন কোন দিক থেকে আমি কোন রকমে লক্ষ্যের কারণ না হই। আমি যে বেদের মেয়ে চিরদিন বেদের মেয়ে থাকলে কেউ কোন কথা বলবার সাহস পাবে না। মনে রাখবেন আপনার মহাশয় বেদের মেয়ে।” প্রবোধ বলিল “মহাশয় বেদের মেয়ে নয় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে” সকলে নির্দীকার হইয়া প্রবোধের মুখের প্রতি চাহিল। প্রবোধ পূর্বের মত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল।

“মা, আমার কথা ঠিক হয়েছে মহাশয় বেদের মেয়ে নয়। এখন তা প্রমাণ হবে যাবে।

(কর্ণশ্রাব্যী)



## খেরা

## ঐশীচূষণোপাল মুখোপাধ্যায়

শুভল মাঝি বেয়া দিত।

রাত্রির অন্ধকার আকাশের কোলে ভোরের রক্ত-  
আলো ছুটিয়ে তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁর মেটে ঘরখানি  
ছেড়ে আশিশবরের পরিচিত খেয়া ঘাটটির উদ্দেশ্যে বারি  
হয়। অশ্রুত আলো-নাখারী ঢাকা প্রভাত থেকেই  
নেত তার প্রতীক।

হু'প্রথমে মাঝ-আকাশ আর নদীর জলে আগুন লাগে।  
নৌকাখানি গায়ে বেঁধে খেয়া-সরকারের ছোটোটার  
সাহায্যে হু' পদ্মার মুক্তি, এক পদ্মার রাজ্য আসে, যুগো  
এই ধরণের কলহসুখী আনন্দের গায়ে বসে থাকে।  
তরপার নৌকাখানা ধানিক জপে ঠেলে নিয়ে গিয়ে  
সেখানকার তল-আঁতল পুরে যায়।

বেলা পড়ে আসে। সন্ধ্যার বাতাস লেগে নদীর  
বুক কম্পন জাগে; ওপারের বাকীরা ঘরে কেতে, ঘাট মাঠ  
অন্ধকারে ঢুকে যায়। শুভল সেই সন্ধ্যানীর নদীর ধারে  
তাঁর খেয়া-নৌকাখানি বেঁধে বসে থাকে, যেন সে  
অনন্তকাল থেকে প্রতীক্ষায় আছে—কেউ তাঁর আসবে,  
দূর গ্রামাঞ্চল থেকে এই সমরভীতে কিংবা... পাশে একটা  
মিঠাইটে আলো রেখে নিশ্চয়ই সে তাঁর প্রত্যাপিতকে  
পথের সন্ধান দেবে। যাকে না—তাঁতে বীতশ্রয় অন্ধকার  
বা কৌতুহল বলে কবে না।

রাত্রি বহন তাঁর মাঝ-নৌকা পার হ'য়ে যায়-যায়, সেই  
সঙ্গে সে ঘরে ঢোকে। এখনি একটানা ঘোড়ে, গুণ  
টেনে নৌকা বাওঁতার মত তাঁর এখনকার দিনগুলো  
চলছিল।

এই শুভল মাঝির একটা ইতিহাস ছিল। সে ইতিহাস  
তাঁর বৈদ্য-নিবন্ধের। হু'ত তে বৈদ্যকলমে তাঁর অসংখ্য  
মধু হল ফুটেছিল, কিংবা তাঁর কঠোর শ্রমসাধ্যতে যৌবন  
অঙ্গে পুঙ্খ হুই হয়েছিল। তবু সেখান জানবার অবকাশ  
বা কৌতুহল কোনো বাকীরাই ছিল না।

শুভল একদিন একটা অসুস্থচ্ছিন্ন তরুণ তাঁকে তাঁর  
ইতিহাস বসতে অস্বাভাব্য করেছিল। শুভল প্রথমে  
বলতে চায়নি। ছেলেরাও তাকে সহজে ছাড়েনি;  
সে বেগছিল—‘তবু বলনা বা হু'একটা কিছু।’ বেঙ্গি  
—সেটা আমি তোকে ছাপ্পার অন্ধরে বার করে শোনাব।  
শুভল তাঁর উত্তরে বলল—‘ও আপনার চাপা করাও বা’  
না কতও তাই। পড়ার ব্যসে এসে পৌঁছবার অনেক  
আগেই পিতৃভাবের ‘মিটে কড়া’ জ্বত করে সামতে

নৌকায় বাহাল হই।’ ছেলেরা বলিল, ‘আমি তোকে  
পড়তে শেখাব। তুই নিজে পড়িসে সেটা—’

শুভল হাসলে। ‘না, সত্যি আমি তোকে আসছে  
ছুটিতে এসে পড়াব। বস এবার—’

শুভল তাঁর রোহে-পোড়া কালো মুখখানা উজ্জল  
ক'রে বলিল ‘পড়তে যাতে পারি সে রকম শেখাবে  
ত?’

ছেলেটা বলিল, ‘নিশ্চয়। তিন মাস ছুটি হয়ে  
আমাদের—আমি সারা ছুটি তোকে পড়তে শেখাব।’

‘তাহলে, একটা বড় মজার কথা আছে দেখিও কই’  
বলে মধু পরিহাস করে একটা কাহিনী আরম্ভ করত  
গিয়ে মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর করে তুললে। বোঝা  
গেল, ব্যাপারটা আর যাই হ'ক বিশেষ মজার নয়।  
ধানিকমণ চূপ করে থেকে সে বলল—‘বখন ছাপ্পার  
হরণেই বাঁধ হ'বে তখন মোহা কখাটাই বলি—কেন  
এমন ছত্রছাড়া হলু—’

সেই হ'ব হ'ব। সারাদিন জল হয়েতে, নদীর  
বাগিচর সব ভিজল, আকাশে তখনও কালো কালো  
মেঘ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত দিনে একটাও বাকী হয়নি।  
সন্ধ্যার সময় বহি মেলে এই আশা করে বসেছিলাম।

‘এক চুপড়ি মাটা বোঝাই করে হুরকী মাটিতে ময়লা  
কাপড়টাকে বিচিতির করে, এক মাগি এসে হুরকের ঘুরে  
বললে, নৌকা খুলে দে মাগি—’  
আমি জিজ্ঞাস্য করলাম, ‘তুই কোন কলে কাজ  
করিস?’

নৌকার কিনারার বাসে সে তখন তার গুলেভটি বা  
হু'টো ধুয়ে নিচ্ছিল। মাথা নীচু করে হাতে হাতে  
বললে, ‘নৌকা ছেড়ে ওপারে পৌঁছিয়ে দে; কোন্ কলে  
কাজ করি, সে খোঁজ তোর কেন রে।’

আমি তখন ভাবি লজ্জা দেবে বললাম—‘আর সব  
বাকী এলেই নৌকা ছেড়ে দেবো। জিজ্ঞাস্য কচ্ছিলাম—  
সে—মাগি বললে—সে কি খাবার মাগি?’

সে ঘরের কথা, ঘাটের কথা নয়। তেবু নীমটা  
বল, আমার নাম ত জানিই—শুভল মাগি।

পাক তখন তার নাম বললে।

তোর ঘরের কাজ কিরে মাগি?

—না—সে তখন তার কথা কিছু নয়। বাপ পিত-  
মোর আমলে চালাটা খড়ে খড়ে পড়-পড়।...আমরা বহি

ছুটা লোক হ'তাম ত...হু'জনের হেঁকমত দিয়ে খেটে  
ছেয়ে নিতাম...

পাক একটা হুইবুঝি হাদি হেসে বলে, লুকাছাপা  
করিস কেনের মিলে। সোজা বলনা আমার যে বে  
করতে ইচ্ছে হয়েছে। তা ভাই আমার বে'বে' হয়েচে  
একবার—

না, তোর আবার বে হ'ল কবে। রোজই ত দেখি  
কলে খাওঁতে যান।...আজা পারি, তুই আজ এত সন্ধ্যা  
সন্ধ্যা কিংবদন্তি বেন্দুধিরিনি?

তোরে পেরেবার লেগে নয় রে, নয়। এখনি এলাম,  
দেখ'তা আকাশে ভাবি রেগেছে, শীর্ণগির করে ঘরে যেতে  
হ'বে ত—

আমি তখন জোর করে বললাম, ‘তোরে আজ ঘরে  
যেতে দিযনা।’

পাক বললে, ‘বেশ, আমিও আর একদিনও ঘর যেতে  
চাইনা। কেই বা আছে আমার দেখা।’

তুই গান জানিস না পারি? একটা বলনা তনি।

বুঝী কলে কত, মেঘেরা ত গাণা করে।

পাক একটা গান করলে। সত্যি বাবু, অমন আর  
শোনলাম না। কি যেন...

‘কোন গেরায়ের কোন্ তুমি, কোথায় বা গাও—  
আর—একটা কতা গওনা বা কও, পান খেইয়ে গাও—’

নৌকা বেঁধে সকাল সকাল ঘরে ফিরলাম।...

মাগি আমার কথা; সন্ধ্যার আগে আর হু'জনের  
মেঘবার ফুরান, নিলত না। সমস্ত দিমমান ব্যস্ত হয়ে  
থাকতাম—কতকণে সন্ধ্যা লাগবে। রামা সারতে যেই  
মুখে তেত তাগপন সারারাত্রির ঐয় গর করতেই ফুরিয়ে  
যেত।—সে কত কথা। কোন্টা তার বলব বাবু?—  
আবার ছেলে-বেলার কথা, পারি ছেলেবেলার কথা—  
একদিন পাক বলছিল, কলের একটা বাবু-হোঁড়া করে  
মাকি তার কালো টেট ছুটা বেধে লোভ না সামুলাতে  
পেরে...বলতে বলতে মাগি কেনে ভালালে, ‘বলে, তুমি  
বহি কিছু মনে কর ভয় হয়—আমি বললাম, ‘হু! ওরা  
অমন করে।’

বছর ঘুরল।—  
পেরিন যেমন জল তেমনি ঝড়। গাছপালাগুলো  
সে হু'তাত তুলে চীৎকার করে...বিছান চিহ্নর হানছে।  
রাত নীচা বাজল, তখনও পাক কর থেকে ফিরলো না।  
মাগিকে খুঁজতে ছুটলাম।  
কল কারখানা সব ডে' ডে' অন্ধকার। জুতের  
আজ্ঞার মত হু'মেয়ে—বাহুগুলো অন্ধকারে হুইপুই

কছে। বাইরে জল। তা'হই মধ্যে সন্ধ্যা খুঁজে দেখলাম...  
পারিক দেখলাম না!

সন্ধ্যানী সন্ধ্যার কেমীর দোরে গিয়ে থাকে মারতে  
লাগলাম।

মাগি ঘর থেকে জিজ্ঞেস করলে, এই আঁধার রাতে  
যারে কে বা মারে গো?

আমি শুভল। পারি কোথায় রে?

ঘর থেকেই মাগি জবাব দিলে—কি জানি মাগি অত  
শত। কলের হোঁড়াটাত ব্যঙ্গা গুটিয়ে কলেক্তায় চলে  
গেল—পারক বুকি ঐ সবেই গেল। আহা হোঁড়া অনেক  
দিন থেকে কটা'ক করেছিল।...তা, চললি মাকি? এই জল  
অন্ধে যা'বি চোখাবা, একটা বসে যা...  
সে গুটুগুটে অন্ধকারে নদীর ধার দিয়ে বাড়ী ফিরলাম।  
...অত জল, অত বড়...কিছু না—সব আগুন। দেব'তা  
তা'কে বাসনার দিনে দিয়েছিলেন, বালাতেই নিলেন।...  
কি করব।...

সেকি আসবে না আর, হ্যাংগো ছেলে?...আমি জানি  
সে আসবে। আজ হ'ক, হু'দিন আমার হ'ক...সে আসবে।  
সে তেমন মেয়েই নয়। তাই আমি নদীর চরে বসে তাঁর  
প্রতীক্ষা করি...যদি সে এসে ফিরে যায়। রাত্রির নিকট  
হয়ে যুগ্মতে পারিলে—মনে হু'ব বুকি এল, ভাবি, ছেলেরা  
আমার পারিকে ছেড়ে দিয়েছে, সে ছুটে এসেছে।  
বাইরে এসে দেখি কোথায় কিছু সেই, সামনে ধখধে  
বাগিচর নদীর মত ঘুমচ্ছে...দূরে নদী-চিকচিক হ'বে।  
এখনি কতদিন আমার তার পথ চেয়ে থাকতে হ'বে।  
...তুমি দিও, ওটা ছাপা করে দিও, আমি তাঁর কথা বলে  
বসে পড়ব।...

শুভল মাঝির কথা কথা গল্প লেখকের রচিত তুলির  
স্পর্শে সজীব হয়ে বাঙলা কাগজের পৃষ্ঠায় বা হ'ল।  
সমালোচক বললেন, সারাগর বাহরের স্বাধ স্বাধের কথা  
এমন সরলভাবে আর কেউ বলেনি। এ যেন বিক্রম মধ্যে  
বাথার সিদ্ধ। বলশিল্প পাঠক বললেন, বাঃ!

যশের সারি মাধ্যম করে তরুণ সাহিত্যিক দেখে  
ফিরল ছুটির সময়।

শুভলের নৌকাখানা পাড়ে পড়ে কাটছিল। সেই  
কাটলের ঠাঁকে ঠাঁকে কচি ঘাস বাসা তুলে জানাখিল...  
মাঝি অপেক্ষা করতে পারেনি। অজানা এক নদীর পার  
হতে তাক এসেছিল, সে চলে গেছে। সে আর খেয়া  
দেয় না।



## অভিনয়ে সামঞ্জস্য

শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম্ এ

২

এ বিষয়ে প্রথম প্রস্তাবে স্থলভাবে নাটক-রচনা এবং অভিনয় ও প্রভাক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে উহার মধ্যে আরো ছোটখাট বিষয়গুলি দেখিতে গেলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—অভিনেতার শিক্ষা। এদেশে অভিনয় শিক্ষার্থীদের জন্য কোন শিক্ষাভবন নাই। চিনিয়াছি পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর ইচ্ছা ছিল যে একটি জাতীয় থিয়েটার (National Theatre) ও শিক্ষাভবন স্থাপনা করিবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইয়ুরোপে কয়েকটি দেশে এরূপ অস্থান কিছু কিছু আছে এবং অনেক প্রবীণ অভিনেতা অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজে এরূপ স্থল চালাইয়া থাকেন যথায় অভিনয় প্রণালী, স্বর সাধনা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেশে এখনো পর্য্যন্ত এরূপ কোন অস্থান নোবা বার নাই, আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে কেহ এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন। এক্ষণে যিনি অভিনেতা হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রসঙ্গ সাহায্যে “পার্ট” তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়, অথবা প্রত্যেক থিয়েটারে যে একজন “নাট্যাচার্য্য” থাকেন তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। নাট্যাচার্য্য যে সকল নাটকে প্রত্যেক অভিনেতাকে স্ব স্ব পার্ট শিক্ষা দিয়া গঠন করিয়া লইতে পারেন তাহা লব্ধ বলিয়া মনে হয় না, বাহ্যিক কার্য্যসূত্রে থিয়েটারের সহিত নাটকে আছেন তাহারা এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী বলিতে পারেন। নাট্যাচার্য্য যদি গঠিত অভিনয়ের দোষ ক্ষেত্রগুলি সংশোধিত ও যখন যখন স্বীয় অভিজ্ঞতা অমূল্যের পরিবর্তিত করিয়া সৌষ্ঠব সৃষ্টি করিতে পারেন, আমার মনে হয় তাহাই একজনকে পক্ষে যথেষ্ট।

অভিনয় শিক্ষার মধ্যে দেখা যায় ঠেকের চলা ফেরা, বাসা, পাড়ান ইত্যাদি স্বাভাবিক “বড় চড়ার” ব্যাপারেও অনেক অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষণীয় জিনিস আছে যাহা সাধারণতঃ নট আয়ত্ত করেন না এবং তাহার ফলে তাহার অভিনয় নানা দোষ দুষ্ট বা বার্থ হইয়া যায়। অধিকাংশ নটই প্রধানতঃ মুখভঙ্গি ও স্বর এই দুইয়ের সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু অভিব্যক্তির সহায়ক আরো অনেক উপকরণ আছে যাহা তাহার জ্ঞানে না, অথবা জ্ঞানিলেও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কখনও নট হস্তভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন? অধিকস্থলেই দেখা যায় অভিনেতা হাত লইয়া কোথায় রাখিবেন—কি করিবেন যেন হির করিতে পারেন না, কলে হয় আড়চোখে হাত রাখেন, না হয় আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ভাবিক্রমের ভাবে “শূন্যে কবাত কাটেন” (Sawing the air) অর্থাৎ হাতখানি সোজা প্রসারিত রাখিয়া কবাত কাটার ছায় ভঙ্গি করেন। অথচ ইহা একটা স্বাভাবিক মূল্যবোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে ২৪ জন লোক বসিয়া পাড়াইয়া কথা কহিতেছে, দেখানো লক্ষ্য করিয়া দেখিলে কখনকো এমন করিয়া কবাত কাটিতে দেখা যায়? জগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষকগণের মতে হস্তের ছায় উৎকৃষ্ট মনোভাব ব্যঞ্জক বস্তু আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকার সুবিখ্যাত অভিনেতা জর্জ আলিস (George Arliss) বলিয়াছেন “হস্ত মস্তিষ্কের আঙ্গায়ে হস্ত। মনোভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত আপনা হইতেই চালিত হয় এবং অনেকস্থলে মৌখিক উক্তি অপেক্ষা হস্তভঙ্গি স্পষ্টতরভাবে মনোভাব বিকাশে সাহায্য করে।” হস্তভঙ্গি দ্বারা মনোভাবের অভিব্যক্তির উদ্ভাবনযোগ্য উপায়ে বহু-বহুমানক যাহা দেখিয়াছি মনে

পড়ে—শ্রীকৃষ্ণ শিশিরকুমার ভাট্টার মশাস্বরের “আলমস্টার” নাটকে আলমস্টারের ভূমিকার অভিনয়ে—যেখানে সম্রাট ও উদিশুরী বেগম পাশাপাশি বসিয়া কথোপকথন হইতেছে; উদিশুরী সিংহাসনের উপরে স্বীয় পুরস্কার দাবি লইয়া ক্ষোভ করিতেছেন, সম্রাটের হাতখানি অঙ্গসভাবে পাশে টেবিলের উপরে পড়িয়াছিল, কিন্তু তর্কবিতর্কের সঙ্গে সঙ্গে উহা “সজীব” হইয়া উঠিল এবং কোথ, অস্থিরচিত্ততা উদিশুরীকে হস্তার ইচ্ছা ইত্যাদি ভাবের বিকাশ স্পষ্টভাবে সূচিয়া উঠিতে লাগিল। ইহা বিশিষ্টভাবে হস্তভঙ্গি দ্বারা ইহা ভাববিকাশের অভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে সকল অভিনয়ে সকল স্থানেই হস্তভঙ্গির উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখা ও তদ্বারা যাহাতে অভিব্যক্তি আরো স্পষ্টতর হয়, এই চেষ্টা করা প্রত্যেক অভিনেতারই কর্তব্য। আমেরিকার বিখ্যাত প্রতিউদার ডেভিড বেলাস্কো (David Belasco) বলিয়াছেন “হস্ত মাহুষের রক্তের বহু প্রয়োজন সংসাধনের উপযোগী বস্তু, মাহুষের দ্বারা আবৃত্তিত কোন প্রকার বস্তু বা কল তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না।” তিনি এ বিষয়ে চর্চ্চা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে নানা হাস্যপাতালে ও পাগলা-গারদের ঘুরিয়াছিলেন। রোগব্রত্য়গণ, ব্রত্য়গণ “অপারেশনের” সময় প্রত্নভিত্তিক কল প্রকারের হস্তভঙ্গি হয় তাহা লক্ষ্য করা এবং আদ্যন্তে কাঠগায়ে শাক্যী শাক্যী দিতেছে, অপরাধী প্রাণীদের দণ্ডিত হইতেছে, এমন কি প্রাণের দণ্ডিত অপরাধীর electrocution দ্বারা মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত রকম ভঙ্গি হইতে পারে এই সকল পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন এক প্রসঙ্গপারে ডাক্তারের দণ্ডিত পাড়াইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র, উহার মৃদুসে বায়ু প্রবেশ করিবার পূর্বে, প্রথম চিৎকার খাড়া হইয়া বিস্তৃত হয়—এই ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে মৃদুসে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং শিশু চিৎকার করিয়া উঠে, অর্থাৎ “ভীষা” আরম্ভ হয়। তৎপরেই শিশু মৃদুবোধ করে, এবং ভাবের হাত মুখে চাপিয়া যায়, অর্থাৎ মৃত্তিক তাহার

একটি ঘটনা উল্লেখ করিব। “একদিন আমি কোন বন্ধুর বাটার ছাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময়ে নিকটবর্তী আর একটি বাটার ছাতের উপরে একটি বিধবী জীলোককে পানচারণা করিতে দেখি। তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে ক্রমে একটি হাত মাথার উপরে তুলিয়া অঙ্গুলিগুলির এমন অদ্ভুত ভঙ্গি করিতেছিলেন, যাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। “বুড়া” আঙ্গুল ও “কয়ে” আঙ্গুল দুইটি সোজা উঁচু করিয়া ক্রমাগত নাড়িতেছিলেন। বন্ধুকে প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানিতে পারিলাম যে রমণী বিস্ময়-মস্তক, “পাগল”। পাগলের হস্তভঙ্গির উপমা বেলাস্কো দিয়াছেন “যেন অশিক্ষিত ও অসমর্থ চালকের অধীনে তেলবী অর্থ” এবং উক্ত ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় উপমাটি কত সূন্দর। ইয়ুরোপীয় বা আমেরিকার অভিনেতার কত হস্তভাবে এ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও সাধনা করেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্পয়োজন। হস্ত সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, পা সম্বন্ধে একটু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বিখ্যাত “কিসমৎ” নামক নাটকের অভিনয় বাহা চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছিল, বাহারা দেখিয়াছেন তাহাদের মনে থাকিতে পারে উহার প্রধান ভূমিকার “ভিক্টর হাজি” রূপে আমেরিকার বিখ্যাত অভিনেতা ওটিস স্কিনার অভিনয় করিয়াছিলেন। (Otis Skinner as Haji in “Kismet”) যেখানে হাজি রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণকারী লক্ষ্যকে পরাণ করিয়া একটি বুৎ “চৌবাক” নামের ফেলিয়াছিল, এবং তাহাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে চৌবাকের পাশে উপস্থিত হইয়া উভয় ক্রমাগত তাহার মাথা জলের মধ্যে চাপিয়া ডুবাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার পায়ের ভঙ্গি একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ ছিল। হাঁটু থেকে পা খুবকি উঠ করিয়া এগাশ এগাশ পদোলাও নাচাতেনে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া শব্দবজ্রজনিত হর্ষ, কেবলমাত্র এই পা নাচানতেই চমৎকারভাবে সূচিয়া উঠিয়াছিল। উহা বাহারা দেখিয়াছেন কখনো ভুলিবেন না। বর্ষ রমমকে অভিনয়ে আর একটি দোষ লক্ষ্য করিয়াছি, সাধারণতঃ অভিনেতার উত্তম “খোতা” হইতে পারেন না, অর্থাৎ একজন অভিনেতা যখন কথা কহিতেছেন,









## বাংলার উন্নতি

এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, বাশাটী

১। উপযুক্ত লোক কোথায়?

আজকাল বঙ্গের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র দেশাত্মবোধের প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেহ কার্পাস উৎসাহে নব্বান, কেহ বস্ত্রবধনে, কেহ বা ডাক্তার কবিরাজ সাজিয়া বাস্তব-সত্য অথবা ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি গঠন করিয়া পরিস্রাবী নিঃসংহা রক্ত-রক্তকে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রগণ, ইনফ্লুয়েন্সা প্রভৃতি বিবিধ মারাত্মক ব্যাধির কবল কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের উন্নতি সম্পাদনে উত্তীর্ণা পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে সকল কার্যক্ষেত্রেই উপযুক্ত কর্মীর অভাব দৃষ্ট হয়। অনেক হস্ত বিনিবেশ যে অশুভা বিধান গ্রহণকার, বলা ও বশেষহিঁতনৌ নেতৃত্ব, হাজার হাজার স্বদেশবৎসল বেচ্ছাসেবকবল বর্তমান থাকিতে উপযুক্ত লোকের অভাব কি? তত্ত্বতরে আমার বক্তব্য এই যে, লোক হাজার হাজার থাকিতে পারে কিন্তু কাজের লোক কই? আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গালীর আজ পদে পদে অভাব অভিযোগ। এই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার করণে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মহাপুরুষ অবিরত চেষ্টা পাই-তেছেন কে জানে তাহাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না।

উপরন্তু উল্লিখিত স্থলকলেব পরিত্যক্ত বিদ্যালয়, গুরু আবর্জনার বাকুপন এবং অস্বাস্থ্যকর বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘের ব্যায় সংঘে পর্যাণোচনা করিলেই আমরা সেই অল্পভার অর্থ সন্ধ্যা উপলব্ধি করিতে পারি। স্থল কলেবের ছাত্র বসিতে সাট, কোট প্রভৃতি বিবিধ পোষাক পরিহিত, সাইকেল-আরোহী, ঢকে চমচা ও বকে সোপার চেম-বুট, কাউন্টেন পেন, মুখে সিগারেট শোভিত একটা ধিগদ কীপার লীল আমাদের মানসকলকে উদিত হয়। গার বস্ত্রগুলি উন্মোচন করিলেই তাহাদের

স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন আমরা যোগ্যতারে হীনবাহ্য, মেকদণ্ড বাসা কীপদুষ্টি, অতির্থনার, প্রায় বার্ষিক উপস্থিত একটা শোচনীয় চেহারা দেখিতে পাই। তখন আমাদের সমুদয় আশা ভরসা একবারে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়। ইহারা দু-দশ মাইল ইটিতে হইলেই মাথায় বস্ত্রভাত্তল্য বেদনা অনুভব করে, ঘরের স্নেহে সংসবণের বসিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে, অসহ্য বা কোন কাজেই মাথা উঠে না। দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ্য থাকিয়া আলস্তের প্রশ্রয় দিয়া বাস্তব চিরতরে বিসর্জন দিয়াছেই উপরন্তু সংসারে জীবনভার বহনও প্রায় একজন অসমর্থ বলিলেই চলে। নাক হইতে চসমা গুলিয়া ফেলিলেই আর কিছু দেখিতে পায় না, সাইকেল ছাড়া একপদ অগ্রসর হইতে নারাজ, বালিগায়ে একজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করিতে হইলে লজ্জিত।

২। তাহাদের আত্মস্থরিক অবস্থা।

ঐ সকল ছাত্রবল ১৩ হইতে ২০ বৎসর বয়সেই স্থল কলেব পরিত্যক্ত করিয়া দার পরিগ্রহ করে এবং কেহ বক্তা, কেহ গ্রন্থকার কেহ বা বেচ্ছাসেবক সাজিয়া বসে। উদ্যোগ্যের উদ্ধার না করিয়াই বিবাহ শুমলে আবস্ত হইয়া তাহাদেরই মত দু-চারটা জন্ম অল্প কাগা খোঁড়া উৎপাদন করিয়া কোনক্রমে স্থলিক্রান্ত হইয়া বসিতেছে। ফলে এই সকল অপরিত বয়স পিতামাতা এবং নবব্রাত শিশু সন্তানগণ অচিরেই কালের হুকোমত কোড়ে অকালে চিন্তাশ্রিত লাভ করিতেছে। দেশকে রক্ষা করা দূরে থাকুক প্রমেহ, উপদংশ, পণোহিয়া, শ্বস্বত্ব, বাত প্রভৃতি শুক্রগত রোগ হইতে নিজেদেরই রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বাসাবিবাহ এবং কৃষা-বস্ত্র বিবাহ হচ্ছে এই সকল রোগের সূত্র কারণ। এই

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা]

বাংলার উন্নতি

১৩৩

দুই কারণেই—শিশুদিগের মধ্যে যে কয়টা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও তাহাদের পিতামাতার অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উত্তরাধিকারস্বরে তাহাদেরই মত কাগা করিয়া, তাহাদেরই মত কাগজে কলমে গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া দেশের জ্ঞাত প্রকৃতি উন্নতি উন্নতি এবং গোপনে 'আহি যথুসদন' রবে প্রকৃতি নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। দেশের কাজ করবে কে?

যে দেশে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় ১২২২২২, কলেরায় ১২৪৪৪, বসন্তে ৩৩৩৩ জন লোকের মৃত্যু হয় এবং যে দেশে অন্ধ, কাল, বোবা প্রভৃতি আত্মদের সংখ্যা ১০০৮৪, বিপত্তীক ও বিধবার সংখ্যা ৪৪৪১১১, বেস্তার সংখ্যা ৪৪৪৪৪, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৩৩৩৩১, গেল, অনাথ আশ্রম, পাগলা গারদের অধিবাসী ১৩৩৩ এবং শিকিদের সংখ্যা হাজার দশ পুরুষ ১১ জন, স্ত্রীলোক ১১ জন যে দেশের উন্নতির আশা কোথায়? শুনিলেই যে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

৩। ইহার কারণ কি?

অজ্ঞাত দেশের তুলনায় বদম্যতার সন্তানগণ যে অকর্মণ্য, আলস্যপরাশ ও রোগা তাহা একটা চিন্তা করিলেই নুকা যায়। তাহারা কালি কলমে গায়ের ঝাল ঝাড়িতে পারে কিন্তু নারীশিক্ষা বা স্বাধীনতাশুলক কোন প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেই শাস্তের পোহাই দিয়া মাথা নোরাইয়া বসে। তাহারা ভাবিয়া যেমন না যে নারীশিক্ষা না থাকায় তাহাদেরই কত সর্বনাশ হইতেছে। পাঠের আগা মরিয়া গেলে আমরা যেমন মরিবার কারণ খোঁজায় অশ্বস্থান করিয়া থাকি তদ্রূপ দেশের বর্তমান দুঃস্থতার জ্ঞাত ও আবাদিগকে অশ্বস্থান করিতে করিতে খোঁজায় যাইতে হইবে এবং তাহার যথোচিত প্রতিকার করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের উন্নতি ঘুরে ধারুক রপা পাওয়াই কঠিন। রোগের জ্ঞাত বাঙ্গালী আজ অলস এবং অকর্মণ্য, উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাধীনবিশি পালনাত্মকেই তাহাদের মধ্যে রোগের এত ছড়াছড়ি। কাল পিতামাতার সন্তান স্বেচ্ছাবৃত্তই রূপ ও অপরিশুদ্ধ মস্তিষ্ক হইবে। রোগ ঘুর করিতে হইলে

প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষা দরকার এবং বাস্য-বিবাহ দুর্বল ও কৃষাবস্থায় বিবাহ প্রকৃতি বিবহৎ বর্জন করিতে হইবে।

৪। শিক্ষার অভাব।

ক্ষেত্র উন্নয়ন না হইলে যেমন পরিপক্ব বীজের অল্পর সল, সতেজ এবং পরিপুষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রদোষে অচিরেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে গতাহ হয়, সেইরূপ আমাদের বাচার পাখী, শক্তির অংশ, কীশাধী মাতৃ-জাতির সন্তানসন্ততিগণও যে এ দশা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর বিচির কি?

মুখে মুখে আমরা নারীজাতিকে 'শক্তির অংশ', 'মাতৃজাতি' প্রভৃতি বিবিধ মর্ষণশী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বাস্তবঃ যথেষ্ট বাড়ির ব্যক্তি থাকি বটে কিন্তু পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে সংসারী গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেই সত্য সচেষ্ট। 'জী-শিক্ষার' কথা উঠিলে অনেককে বলিতে শুনা যায় যে 'স্ত্রীলোক বিধান হইলে বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে', 'চালচলন রীতিনীতি ব্রাহ্মের মত হইয়া যায়', শাস্ত্র ব্যাক্যের দ্বার দ্বারে না', 'সর্ব ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান দাবী করিয়া বসে', 'বিধান হয়ে তাহা কি চাসুরী করিবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। শাস্ত্রমতে তাহাদের সত্যীক স্বয়ং হওয়ারও নাকি যথেষ্ট সন্দেহ। যে দেশের শাস্ত্র এইরূপ সেই দেশের কোনক্রমেই উদ্ধার নাই। কি ভয়ানক ব্যাপার! একদা শাস্ত্রও গোড়াইয়া ফেলা উচিত। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সভ্যতালোকে আজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত। তাহাদের মাতৃজাতি কি আমাদের জাতির মত গিঞ্জাবাষ, নিজীব পক্ষী? তাহারা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া নিজদের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন বসিয়াই তাহাদের এত উন্নতি। পক্ষাঙ্ঘে আমাদের মেয়েরা ত গাছের ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, যেন সাক্ষ্য নদীর শূন্য। তত্বের এক কড়ার শক্তি নাই, গুরুত্ব করিতেই অপারগ, অধুনা বাধক, প্রদর, মৃতবৎসা, বাত, হৃদিকা প্রভৃতি লাগিয়াই আছে।

সংসার বর্ষক্ষেজ। মানবগণ এই ক্ষেত্রের কর্মী।









## শ্বেত ময়ূর

### শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ

যখন সাধা ময়ূর দেখিলাম তখন যেন তাহার ভিতর কি একটা হারাইয়া গেল। ময়ূর দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া যেন কি একটা মুষ্টিতে লাগিলাম। তাহার ভিতর যেন কোন বস্তুর বিশেষ অভাব বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পে গন্ধ, গন্ধে মিষ্টতা; গীতে স্বর, স্বরে লালিত্য; রূপে মাধুর্য, মাধুর্যে স্নিহিত; এবং আলোকে প্রভা ও প্রভার ছটা না থাকিলে যেমন দেখায় সাধা ময়ূর দেখিয়া আমার তাহাই বোধ হইতে লাগিল। সেই আছে অথচ যেন কোন বিশেষ বস্তু নাই। এ যেন ইট, কাঠ, মাটির তৈয়ারী তাড়নহলের মত; জাকড়া ও কাগপের তৈয়ারী ফুলের তোড়ার ছায়া এবং পালিস করা ও ভায়মণ্ড কাটা নিকেল বা রূপার গহনার মত। সাধা ময়ূরে সৌন্দর্যের জ্বাটা, ভাব, কল্পনার ক্রৈবদ্য স্পষ্ট প্রতিকলিত দেখিলাম। কাঠ বা লোহের সিংহাসন কিরণ? কীবের নারীবেশ কেন? যেন হয় বিংশদী শ্রীযুক্ত স্বরাজিত বুদ্ধিজিত করিয়া খেয়াল বশত; আবার তাহাকে জলে হুইয়া মুছিয়া রাখিয়াছেন বা কলাপীর সৌন্দর্য পরিষ্কৃত করিবার জন্যই তাহার বসড়া আমাদের নয়ন গোচরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। সৌন্দর্যের নকল বোধ হয় এইরূপই হয়। গোলাপের গুচ্ছ গোলাপের নির্দোষ উল্লেখ্য করার কথাও ভাবিলাম। বড়ই কৃত্রিমতা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পতীর স্থানে বারান্দা ও রাতার স্থানে বিমাতা যেমন, ময়ূরের পার্শ্বে

সাধা ময়ূরও তেমন বলিয়া বোধ হইল। ভাবিলাম কেহ যদি র‍্যাকলে ক্লেবল বা মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র অমুকরণ করিতে যায় অথবা বেটোজেন, মেন্ডেলমোনে মাইয়ার বেথার বা মোজাটের সহিত সম্মুখে সমকক্ষতা লাভ করিতে প্রয়াসী হয়—তাহা হইলে তাহাদের সকল আয়াস এইরূপ পণ্ডত্য পর্যাবসিত হইবে। ময়ূর ব্যক্তি করিয়া আবার ভাক্ত ময়ূর স্বজন কেন? প্রকৃতির দেখালের কথা ভাবিলাম। শিশুর মারলা, নারীর কোমলতা ও বুকের গাঞ্জীর্ঘ্য না থাকিলে যেমন দেখায়—ময়ূরের কাছে সাধা ময়ূরও সেইরূপ বিসদৃশ দেখাইতে লাগিল। এ যেন রূপে গলদ। শুণু রং থাকিলে খাঁদা, বোঁচা, ট্যাগ, মেথেকে যেমন দেখায় বা জ্যোৎস্নার দিনে বাড়ীর উঠানে গ্যাসের আলো জ্বালিলে যেমন লাগে এও যেন তেমন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বুদ্ধিলাস শুণু নামে বিকান চলে না। পণ্ডিতের মত মূর্খ, সাধুর নিকট ভণ্ড, দাতার নিকট রূপণ ও গুণীর সকাশে নিগুণ কখনই শোভা পায় না। নামের যোগ্য গুণ থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে বিলাতী বাতের মত ব্রত, তান লয় থাকা সত্ত্বেও বিলাতী পুষ্পের মত বর্গের মনোহারিত্ব লইয়াও, বা মেমের মত বর্ণ ও নারীত্ব মত্তিতা হইয়াও সৌন্দর্যে কদম্ব হইয়া থাকিতে হয়। আমার মনে হইল সম্পাদিত সঙ্গারে যে সকল নর-নারী নিগুণ তাহারাই সাধা ময়ূরের মত।

## নূতন ভূগোল

### শ্রীবিলচন্দ্র চৌধুরী

#### পৃথিবীর আকৃতি

১। পৃথিবীর আগাগোড়া চাপা, নহিলে সমুদ্রই না এবং সকল সময়ে সত্য কথা বলিতে পারে না।

গোল। চাপা বলিয়াই সকলে মনের কথা বলিতে পারে

২। বাঁহারা লেখেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবী উঁটার মত, বাঁহারা পেন্টক তাঁহারা বলেন কমলা লেবুর মত। কথা একই, তবে বাহার যেমন করি।  
৩। জাহাজ আসতে দেখিই হি গোলা বোঝা গিয়াছে, গ্রন্থ দেখিয়া সম্ভব ভরন হইয়াছে।

যদি সেই হাত চাপিয়া ধরে তখন তাহাকে যোদ্ধক বলে।  
৬। বাহা সকলে ডিঙ্গাইতে পারে না, অথচ ডিঙ্গাইতে পারিলে অমর্য লাভ করা যায়, তাহাকে সমুদ্র বলে।

৭। উচ্চ কূলে জন্মিয়া যে নিজের তরলতা দোষে আপন ভাসিত ভাসিত শেখে দুই কুল তাপাইয়া সাগর স্বপ্নে প্রাণত্যাগ করে তাহাকে নদ বলে।  
৮। জলের অজ্ঞাত বিবরণ দেখে গেল না বঙ্গদেশে দড়ী কলসী অজ্ঞাত সত্য শুভ সেই কারণে। তত্ত্বির অনেকে জল দেখিলে ভয় পান।

### পৃথিবীর গতি

১। পৃথিবীর দুই গতি; নিত্য বাহা হয় তাহাকে দুর্গতি এবং বৎসরে বাহা একবার হয় তাহাকে সদগতি বলা যায়।

২। পৃথিবীর গতি নিয়মিত চক্রে হইয়া থাকে, সে চক্রে দেখা যায় না, অস্বহমান করা যায়, সেই জন্ত তাহাকে অদৃষ্টচক্র বলে।

৩। পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ অকূল পাথারে তাসিতছে, গড়াইবার হল নাই।

৪। পৃথিবী এক গ্রহ, আরও অনেক গ্রহ আছে, সকলেই টানাটানি করে, তাই পৃথিবী এক বকম চলিয়া যায়।

### পৃথিবীর ভাগ বর্ণন

১। পৃথিবীর কতক জল, কতক হল; ভাষা কথায় উহাকে অর্ধ পঙ্গাজনী বলে, কিন্তু সেটা ভুল; কারণ জলই বেশী।

২। অধিক ভূমি এক স্থানে দেখিলেই ঘেঁষে হয় অনেক ঘেঁষে থাঁকায় করিয়াও লেখন—দেশ। ফলতঃ ঘেঁষে লেঘ নাই, ইহা সর্ববাসী সম্মত; কেননা দেশ-ভাগী হইতে যে সে অস্বহোরে করে; কিন্তু ঘেঁষ-ভাগী বলিয়া কোন কথা চলিত নাই।

৩। যেখানে গৌরবের জন্ম হয়, সেই স্থানকে রৌপ বলে; দেশী গৌরবের জন্মস্থান বিশেষরূপে জানাইতে হইলে নবরূপ বলা যায়।

৪। বড়লোক যেখানে হাত ঝাড়ে সেই স্থানে পর্বত হয়।

৫। অন্ধকারে সিঁধ কাটিয়া সিঁধের ভিতর হাত বাড়াইয়া দিলে সেই হাতকে অস্তরীপ বলা যায়, গৃহস্থ

৩। পুরাতন পৃথিবীতে ভিড় বেশী, নানাপ্রকার নরলোকের সমাগম। যেখানে প্রথমে আসিয়া জন্মহুতে হইয়া থাকে, তথা হইতে নরকুল পৃথিবী ছাইয়া ফেলে এবং শেষে যেখানে আসিয়া নরগণ (বিক্রমে) দৌরাভ্য করে তাহাকে বলে এলিয়া। কাকেরীরা যেখানে জন্মায় তাহাকে আফেরিকা। কেহ কেহ বলেন আফেরিকার প্রকৃত নাম আফেককা; ইয়রপে (Europe) য়েথকার সিঁহে ভল্লক প্রকৃতি চতুষ্পদ এবং গৃধ প্রকৃতি মহা পক্ষীর প্রভৃৎ তাহাতে ফেক হইতে আফেককার নাম করণ অসম্ভব হয়। যিনি ইয়রপ তাহার পরিচয় দেখে নিশ্চয় যোজ্ঞক, কারণ ইয়রপের অর্থই (you are-up) ভূমি এখন উপরে।

৪। পৃথিবীর যে আধাখানা জুড়িয়া দেবগণ বাস করেন এবং যেখানে বাস করিলে অমরতা ভাল হয় তাহার নাম অমরিকা।







"ও সব খাণাপ মেয়েমাছের সঙ্গে মিশতে নেই মা।" খাণাপ মেয়ে মাছ?—বীণা মুখানা বিষয় করিয়া কৃত্ত কঠে বলিল "কিছু ওর মুখানি যদি একবার দেখতে মা, ঠিক যেন দিগির মন্তন। তাই আমার এত ভাল লাগছিল ওকে"—

মা আর কিছু বলিলেন না, বহননি অদূর প্রাসানী কস্তার কথা মনে করিয়া তাহার চক্ষু ছুটি জলে ভরিয়া উঠিল।

একিকে চামেলী কতকণ সেইখানটিকে অন্ন মনে নীরবে রাখিয়াছিল। তারপর অস্মিক মঙ্গলভিতে ঘরে ফিরিবার সময় বীণাদের বাড়ীর দিকে আর একবার উকিঝুঁকি মারিয়া বহু কষ্টে দেখিতে পাইল তাহাদের গোময় লিপ্ত পরিবার উঠানটার একটা পাশে, বীণার মা বসিয়া কোড়ম্ব খুঁচাতুর সন্তানের মুখে মাতৃ-বসন্তের অস্বস্তি ঢালাইয়া দিতেছেন। হৃদয়পানে পরম ভূত ও তপ্ত হইয়া শিশু আনন্দে প্রস্থন্ন নয়নে মায়ের দেহ-চল চল মুখানির পানে চাহিয়া আছে। জননীর স্বেদবনস্ত শিশু শিশু চক্ষু ছুটি হইতে মনবতার উৎস যেন করিয়া, রায়িয়া পড়িতেছিল।

চামেলী অপলক বিষম দৃষ্টিতে সেই স্বেদময়ী গণেশ-জননী রূপ দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে কি জানি কেন চামেলীর উদাস মনখানি একটা অজ্ঞাত বেদনার ব্যথিত হইয়া উঠিল। সেই শাখা লাড়ী পরা উজ্জল জামানী সৌভাগ্যবতীর পায়ের কাছে চামেলীর চাক-চিকাময় প্রদীপ্ত রূপরাশি ও অনন্তসাধারণ ধন সম্পদ সমস্তই যেন ভুলে অবনত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল বালিকা বীণার কথা—তোমার কেউ নেই?—তবে খাখ কি করে? সত্যই তো, এই বিশাল বিশ্ব-সংগারে চামেলীর যথার্থ আপন বলিতে আর কে আছে? কেহ নাই, কেহ নাই। সূদাস চামেলীর অস্থঃস্থল কপ্পিত করিয়া একটা গভীর নীরবিন্দু-খাস বাহির হইয়া গেল। তাহার অন্তঃস্থ শূন্যচিত্র যেন হাফাকার করিয়া কাঁথিয়া উঠিল "ওরে ছুঁড়ানী! তোমার কেহ নাই, কিছু নাই!"

২

বীণা মনে করিয়াছিল তাহার জননীর নিষেধ রাখিবে,

তাহাদের প্রতিবাদিনীর সহিত আর দেখা বা আলাপ করিবেন না। কিন্তু কাথ্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। পরদিন দ্বিপ্রহরে দুইশত খোঁকাকে মুখ পাড়াইতে গিয়া তাহার সঙ্গে যখন কণ্ঠস্বাক্ষর মাতাও নিব্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন নিঃসঙ্গ বীণা কাজে ও অকাজে খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া কোন এক সময় পায়ের মলগলি গুঁজিয়া অতি সঙ্গর্পণে ছায়েব ঠিক সেইখানটিতে গিয়া উপস্থিত হইল, কি জানি কিসের টানে। চামেলীকে যে সে কি চক্ষে দেখিয়াছিল তা কে জানে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, চামেলীও তখন যেন তাহারই প্রতীক্ষায় সেই বোরান্নায় আসিয়া চাড়াইয়াছিল। এই সরলা বালিকাকে দেখিয়া পথান্ত চামেলীর মনে যেমন একটা মমতা জাগিয়াছিল। বীণাকে দেখিবার জন্ত সে সকাল হইতে এদিকে কতবার উকি দিয়া বিদ্যাছে, এতকণে তাহাকে পাইয়া চামেলী বড়ই আনন্দিত হইল। সেদিন কথাবার্তা সমস্তই বড় চুপি চুপি সতর্কতার সহিত হইল, মা জানিতে পারিলেন না। তাহার পর এই গোপন অভিনয় প্রায় প্রত্যহই চলিতে লাগিল।

সেই সব অতি সাধারণ বৈচিত্রহীন গল্প, বীণার মা, বাবা, ভাই বোনের কথা, তাহাদের অশ্রুজল স্রবৎ বর-কল্পায় বৃত্ত নৃত্যনিতি কথা শুনিতে চামেলীর যে কেন এত আগ্রহ হইত, এত ভাল লাগিত তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না।

এমনি করিয়া এই বিভিন্ন সমাজের অসমবয়সী মেয়ে-ছোটর মধ্যে অল্প কালের মধ্যেই বিলম্বন সত্ত্বেও সংখ্যাত স্থাপিত হইয়া গেল।

সেদিন রবিবার। অফিসের ছুটি, বীণার পিতা প্রকাশ বাবু মাসকাবারি বাজার করিয়া অনেক বেলায় আহারাদি সারিয়া নিব্রিত খোকার পাশে বিভ্রাম করিতে-ছিলেন, নির্দোষ আশিয়া স্বামীর কাছে পানের ডিবা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খোকা মুহূন"—হ্যাঁ, বীণা কোথায়? "ওই ওপরে বৃষ্টি কি একটা পড়ছে।" তার পর স্বামীর পাশে বসিয়া নির্দোষ একটু ইতঃপতঃ করিয়া বলিল "দেখ, একটা কথা রোজই তোমায় বলব বলব মনে করি, এ বাড়ী থানাতে এসে আমরা ভাল কাজ করিনি,

ভাড়া অল্প বটে, অস্থবিশেষও কিছু নেই, কিন্তু—" প্রকাশ বাবু একটু বিম্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু কি? ভুলভুল খেতেছ না কি?"

নির্দোষ সহান্তে উত্তর করিলেন "না ভুল নয় নয় বটে, তবে তা'র চেয়েও তদানক জীব"—আমাদের পাশের দোতলা বাড়ীথানাতে কে থাকে জান তো? জান না নাকি!—এদিন এসেছ একবারও দেখনি তা'কে এও কি একটা কথা?"

প্রকাশবাবু খানিক ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন "ওহো বুঝি, তুমি কা'র কথা বলছ। তা'র পরিচয় তুমি ঠিক জান না।" "জানি গো জানি, সে ছুঁড়ী এক বেসা!" "না, না, ঠিক তাই নয়, তবে অনেকটা সেই রকম"—বটে।" নির্দোষ এবার আগ্রহ ভরে বলিল "নাও তোমার হোঁচলী রাখো, বাবু, কথাটা ভেবেই বস না ছাই! এরই মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে বুঝি?"

প্রকাশবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া রহন্তজ্বলে বলিলেন "ভদ্র নৈব নির্দোষ। তোমার এই অন্তঃসারশূন্য দরবারের নিব্রিটকে আর কেউ কেড়ে নেবে না! তুমি শুকে জান না, ওয়ে আমাদের বড় বাবুর—বুঝলে তো?" "হরি বল!—তাই নাকি? ও মা! তোমাদের বড় বাবুর পোটে পেটে এত! বাড়ীতে মাগ ছেলেও রয়েছে তো—" "ধাক্কাই বা, একে বড় ভোেকের হোল, সেই কথা ভাবিয়াই বালিকার সরল প্রাণ ব্যথিত ব্যাহুল হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় আসিলে কি একটা জিনিষ লুকাইয়া বীণা বীরে বীরে নিশ্চয়ে আসিয়া মায়ের পাশে রাখিয়াছিল। কস্তার মুখে অপরাধীর ভাব দেখিয়া নির্দোষ লম্বিত চিত্তে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রে বীণা?—তোমার হাতে ওটা কি?" বীণা নিরুত্তর; একটা কাগজের বাঁধ আদ্যো মাস কায়ে রাখিল। বাছের ঢাকনা খুলিয়া নির্দোষ খেবিল তাহার মধ্যে একটা স্বন্দর বড় মোয়ের পুস্প চক্ষু বৃষ্টিয়া মুখাইয়া আছে, স্রাবও কত স্বন্দর স্বন্দর মাখী দেখেনা। মা অবাক হইয়া চাহিয়া আনন্দে দেখিয়া কহিয়া তা'র পোনে মা, বুঝিয়ে বুঝিয়ে বর সঙ্গে মিল করত। তাই তো বলছি, এ বাড়ীতে এসে ভাল করিনি। ছুঁড়ীটো

বাড় করানোই চোখ ছুটি খুলে চাইবে, ঠিক যেন সত্যি-কান্তের—" এ সব কথোকে এক বীণা? কে বলে তাকে?" মায়ের অস্বাভাবিক দৃষ্টকর্তব্যের খতমত রাখিয়া বীণা সভয়ে মুহূবরে বলিল "আমাদের জানকীর মা দিয়ে গেল যে, ওই যে ও বাড়ীটা চামেলী দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে, আমার জেতে আর খোকার জেতে—জানকীর মা বীণাদের বাড়ীর হিন্দুস্থানী ঠিক কি মেয়ের স্নেহের কথা শেষ হইবার আগেই মা সন্কেবে গম্ভীয়া পাঠিয়ে "চামেলী দিদি!—পোড়ার মুখে মেয়ে আমার সম্পর্ক পাতাতে গিয়েছেন ওর সঙ্গে! ধরদার ফের বরি কপাতে—" চমকিত হইয়া বীণা কান কান হইয়া বলিল "শ্রামি কি করব?—আমি কি এ সব ওটা চাইতে গিয়েছিলাম?—আমি তো—" বীণা আর বলিতে পারিল না, কায়ার তাহার গলা বুজিয়া আসিতেছিল। ষ্টেট ছুঁখানি ঘন ঘন কাঁপিতেছিল। নির্দোষ, বাস সন্তোষ খেলনাগুলি বীণার দিকে ঠেলায় দিয়া তেমনি কঠিন স্বরে বলিল "বাও এগুলো এখন রেখে দাও দিতে, ওগুলো জানকীর মা কাজ করতে এলে তা'র গিয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে, বুঝলে?" বীণা আর মামলাইতে পারিল না, সে এবার মুখে আসল চাপা দিয়া কাঁথিয়া ফেলিল শুষ্ক জিনিষগুলি হাত ছাড়া হইবার ভয়ে নড়ে, তাহাদের এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান চামেলীর স্বেদময় কোমল অস্তরে যে কতখানি আঘাত করিবে, সেই কথা ভাবিয়াই বালিকার সরল প্রাণ ব্যথিত ব্যাহুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কস্তার কাতরভাষ প্রকাশবাবু ব্যথিত হইয়া বলিলেন "আহা বাবুনা, আমার কয়ে গিয়েছে যখন, তখন আর ফিরিয়ে কি হবে? ওতে তো আর কিছু লেগে নেই। যাবো মা বীণা, নিয়ে যাও ও খেলনাগুলো তোমরা ভাই ভাই ভাল করে নিয়ে।"

বীণা কপ্পিত কুণ্ঠিত হস্তে বাস্তবী ভুলিয়া লইয়া অস্ত্র ঘরে চলিয়া গেল। তখন নির্দোষ গভীর অগ্রসর মুখে বলিল "মেয়েছেলেও একটা আশ্বাস্য দিতে নেই। এমন দিন দিন ভগ্নর হচ্ছে তো। কতবার বারণ করছি। তবু গোনে না, বুঝিয়ে বুঝিয়ে বর সঙ্গে মিল করত। তাই তো বলছি, এ বাড়ীতে এসে ভাল করিনি। ছুঁড়ীটো



যেন মেয়েটাকে একবারে পেয়ে বসেছে। বলিতে কি, ও সব লোকের সঙ্গে কথা কহিতে পধ্যস্ত আমার থাকা কবে, নইলে একদিন আচ্ছা করে' গুড়ে দিতুম্।" "মিছে স্বগভা-  
খ্যাতি করে কি হবে নির্মলা, তা'র চেয়ে চুপ করে থাক, হবিষ্যমত আর একটা দেখে, উঠে গেলেই হবে।" যাইবা কোথায়? ওদের গতিবিধি কোথায় নেই বল? নইলে কাশীর মত পুণ্যস্থানে, বাবা বিনয়নাথের চাকর ওপর বসে হস্তভাঙ্গিয়া পাণ করত এইরূপে ওরার না? "মতি বৃকের পাটা যাহোকে!" পত্নীর উত্তেজিত উগ্রাক্ষ মুখের গানে চাহিয়া প্রকাশ্যাবাস হানিয়া বলিলেন "তাইতো বলছি নির্মলা, আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, এইখানে থেকে, তোমার পুণ্যের বাতাসে যদি একটা সাপীকে স্মৃতি দিতে পারো, তা'হলে তোমার অক্ষয় পুণ্য লাভ হবে।"

৩

বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে। বালিক। বীণা একণে উদ্ভিন্ন-  
সৌন্দর্য্য কিশোরী। মাঘের কড়া শাসনে, সতর্ক পাহারায়  
সে এখন আর চামেলীর সহিত বাক্যানাশের অবকাশ  
পায় না, বৈবাহ্য ছ'জনে চোষোচোষি হইয়া গেলে বীণা  
একটুখানি হাসিয়া মুখখানি নামাইয়া বের। তাহার সেই  
নিষ্ঠ হাসিস্থল পেরিবার জন্ত চামেলী তৃপ্তি নয়ন ছুটি  
যেন সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত, উগ্ৰুজ্জ্বল থাকে।

একদিন আনন্দের মার মুখে চামেলী একটী নুতন  
সংবাদ শুনিতে পাইল, বীণার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া  
গিয়াছে। পাত্রী বিভীতায় পক্ষ, তবে বয়স বেশী নয়,  
এলাহাবাদে কোন একটা বড় আফিসে বেশ মোটা  
মাহিনার কাজ করেন। লোকটীর মহৎ অন্তরে বোধ হয়  
জ্ঞানারগ্ৰস্ত অভাগাদের জন্ত একটুখানি কল্যাণ ও  
সহায়কুতি সঞ্চিত ছিল, তাই বিনাপ্রণয় গবীরের মেয়েটাকে  
গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে নির্ভীকৃত ততদিন আঙ্গিয়া পড়িল।  
কালক্রমে আর একটা নাতিশীতোষ্ণ অন্নান দিনে বীণাদের  
বাত্তেতে মঙ্গল শব্দ বাজিয়া উঠিল। গায়ে হলুদ ও  
বিবাহের সর একই দিনে পড়িয়াছিল।

শাখা পুংখ ঘরের মেঘের বিবাহ, বাজ ডাঙ, ধুমধাম

বিশেষ কিছুই ছিল না। তবু নিমন্ত্রিত অজাগতগণের  
আগমনে, আনন্দ কলহের, সেই ক্ষুদ্র বাড়ীখানি যেন  
উৎসবে গম্ গম্ করিতেছিল।

চামেলী সন্ধ্যার পূর্বেই বেশবিশ্রাম সমাধা করিয়া  
বারাণসীর ঘোষানটীতে পাড়াইলে বীণাদের উঠানের  
কিয়ংগ দেখা যায় সেইখানটীতে আসিয়া ঠাঁড়াইল।  
কত হুংগা, হুংগায়ে ছোট বড় মেয়েজিৎ সেইখানি রিয়া  
আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু বাহার জন্ত চামেলী ব্যগ্র  
ব্যাহুল হইয়া আছে, সেই বীণাকে একটীবার ও দেখিতে  
পাইল না। এই সময় কনের স্বম্বর সঙ্গে মাজিয়া বীণাকে  
কেমন দেখাইতেছে, তা'র সেই ছোট্ট কচি মুখখানি  
জন্ত হৃদয় কলস্কন্দন কেমন চন্দংকার নামাইয়াছে, একটী-  
বার তাহা পেরিবার জন্ত চামেলীর প্রস্তুত মন যেন ছট-  
কট করিতেছিল। কিন্তু হায় যে অশ্রু! সে যে পতিতা!  
স্বপ্নবিজ্ঞ বিবাহ মণ্ডপে প্রবেশাদিকার সে কোথায় পাইবে?  
সেখানে তাহাকে দেখিলে ঐ সব পুণ্যবতী এঘোষাণীরা  
স্বগায়, মালিকা হুঙ্কিত করিবেন না। মাঝে উপর নির্মল নীল  
সন্ধ্যা উজ্জীর হইয়া গেল। নাকি বার পনের নির্মল নীল  
আকাশে চাঁদ হাসিয়া উঠিল। চামেলী তখনও তেমনিই  
চিনাকিপিত্তের মত সেইখানে ঠাঁড়াইয়া জন্ম হইয়া কি যেন  
ভাবিতেছিল। তাহার অতীত জীবনের স্বপ্ন ভ্রমের চিত্র-  
বলি আজ যেন একটীর পর একটী তাহার মানসগটে ছুটয়া  
উঠিল। চামেলীর মনে পড়িল, এমন এক জ্যোৎস্না-  
মধুরা ক্ষুদ্র মিলন-রজনীর কথা, যেদিন সেও স্তম্ভ আশা,  
কত আশা প্রাণে লইয়া তাহার আনন্দিত তবু দুয়ারী  
দ্বারখানি তাহার জীবন দেবতার পায়ে নিষেপে উৎসর্গ  
করিয়া দিয়াছিল, সেদিনের সেই আনন্দ উৎসব, বিবুল  
সমারোহ, সমস্তই আজ যেন স্বপ্নে পণিগত হইয়াছে।

তাহার পর, চামেলীর, তরুণ সৌন্দর্য্যের উপাসক,  
রূপ মুগ্ধ স্বামীরা প্রবল আবেগে ভরা, উজ্জ্বলময় ছুটিদিনের  
ভালবাসা, বাহার অসুখ অনাচারিত স্বপ্নে আত্মহারা  
হইয়া সে একদিন অমর বাহিত বর্গবাহ্যও বুদ্ধজ্ঞান  
করিত, সে আদর, সে সোহাগ, সেসব বৃত্তি স্বপ্ন, তবুই  
স্বপ্ন।

আবার চামেলীর সেই নারী জীবনের সবচেয়ে

ভাবাবে, অভিশপ্ত দিন,—যেদিন স্বামীর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব-  
হীনতার হস্তাঘরে অবজায়া, অভিযানে জানহারা হইয়া  
সে অশ্রুত প্রাণের আকর্ষ পিপাসা লইয়া, ক্লান্ত বারি  
মনে অলীক মর্হাটিকার পানে ছুটিয়া গেল, হৃদয়মনে হেলাং  
পান করিল, সেই ভীষণ দিমটী মনে পড়িতেই সন্ধ্যার  
আতকে তাহার আশাশ্রমস্তক কটকিত হইয়া উঠিল।

৪

সেও এক জ্যোৎস্নার বিশেষারা, পুণ্যগন্ধে মোহোয়াারা  
অন্নান বহুদিন সন্ধ্যা। মদ্যাসনা তরুণী প্রকৃতির আজ  
মোহন রূপ। সমস্ত বিশ্বসংসার একই মধুর ছন্দে বাধা  
আকাশে বাতাসে সর্বত্র এক অভিনব মধুরতা মিলন  
রাগিণী যেন গুঞ্জরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। সেই মদির,  
মধুর স্বরের নেশা পড়িগ্রেমে-বঙ্কিতা গ্রন্থসংহারা, উপে-  
ক্ষিতা চামেলীকে আবেশে বিবলন করিয়া তুলিল।

কি এক আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের আশায়, উজ্জ্বলিত পুংক-  
কর্ণশনে তাহার অশ্রুত তরুণ জন্মখানি ভরিয়া উঠিয়া  
বার বার শিরহিয়া উঠিতেছিল। ফুলের স্বগন্ধে ভূ-  
ভূয়ে, ভূভূয়ে দখিবা বাতাস আজ যেন থাকিয়া থাকিয়া  
চামেলীর কাণে কাণে বলিতেছিল 'মাজি সে আসিবে,  
আসিবে!—সে নিষ্ঠুর, সে দ্বন্দ্বহীন, তবু আত্মিকার এই  
মিলনের দৃষ্ট অবসর, মধুর তত্ত্বপটুই সে কখনই  
প্রত্যাখান করিতে পারিবে না।'

মনে মনে কল্পনার স্বপ্ন-জাল বুনিয়া, বড় আশায় বুক  
বাধিয়া, চামেলী আজ অনেকদিন পরে সাক্ষিত বলিল।  
স্বামীর দ্বন্দ্ব হইয়াবনি তাহার বেশ বিভ্রাস্তে কচি ছিল  
না। আজ কতদিন পরে চামেলী আবার পরিণামী করিয়া  
মনের মত চল বাধিল। অশ্রু মলিন দেহবানি মাজিয়া  
গসিয়া, বাজিয়া বাজিয়া একখানি হাসকা বাসন্তী রংয়ের  
জরীর বৃত্তি দেওয়া স্বস্ত্যচাকাই সাজী পরিল। বহাদিনের  
তুলিয়া রাখা নামের গহনা ক'খানি, হীরার টায়ের  
মুক্তার ককী, পান্নার ছল সন্ধ্যে পরিয়া সেই ঘোঁষনপুট  
লাগাঘায় বেহেলতার পোতা ও সৌন্দর্য্য আরও হুটাইয়া  
তুলিল।

তাহার পর একটী স্বপ্নাঙ্ক পানের বিলি মুখে দিয়া  
পাতলা চোঁট ছুখানি ভাগিল ফুলের মত লাল টুকটুক

করিয়া চামেলী বাগানের দিকে নিতৃত বারান্দাটীতে  
আসিয়া ঠাঁড়াইল। অমনি নবোদিত শশপরের তরুণ  
জ্যোৎস্নাধারা অস্বাভিতভাবে আসিয়া চামেলীর সর্ব্বাঙ্গে  
ছড়াইয়া পড়িল।

সেই তরুণ চন্দ্রকরোদাসিত, প্রস্রাণিত সন্ধ্যোহন রূপের  
মাদকতায় যেন বিবলন মুগ্ধ হইয়া চামেলী মনে মনে  
হাসিয়া বলিল "আজ একবার আত্মন দেখি, এই রূপের  
মোহ কাটাইয়া কেমন করিয়া বান!"

ঠিক সেই মুহুর্তে একটা পরিচিত পরবনি শুনিয়া  
তাহার বৃকের দৃষ্টির ছক ছক করিয়া উঠিল, তাহার বুক  
ভরা আশা আজ বৃত্তি স্তম্ভাই সফল হয়! এই যে চামেলীর  
আরাধনার ঘন, দ্বন্দ্ব-দেবতা স্তম্ভাই তাহার সমুখে  
উপস্থিত।

আশাতীত আনন্দে, পুংকে কল্হবাস, কল্হবাক  
হইয়া, চামেলী রোমাঙ্কিত বেসে ছবির মত ঠাঁড়াইয়া  
রহিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামী একটুখানি  
কাঠ হাসি হাসিয়া নীরল বসে করিলেন 'ইন্! আজ যে  
বড় বাহার দিবেছ দেখছি!—যাওয়া হবে কোথায়?' সে  
কথায়, সে স্বপ্নে এতটুকু কোমলতা যা মেহের স্বপ্নেরা ছিল  
না। চামেলীর ব্যাহুল তৃপ্তি প্রাণ; যেন সেইখানে  
স্বামীর পায়ের তলায় লুটাইয়া কাঁদিয়া বলিতে চাহিল  
"এইখানে—ওগো আমার জীবন সর্ব্বস্ব! আমার মান  
আর কোথায়?" কিন্তু বহাদিনের সঞ্চিত ব্যাধা ও অভিনয়  
যেন চামেলীর পলা চণিয়া ধরিল। সে মাতীর দিকে  
চোখ নামাইয়া অন্তকণ্ঠে বৃহৎকণিত স্বপ্নে বলিল "মামলয়ে  
কিছু অশ্রুভিত হইয়া স্বামী দৃষ্টিত ভাবে করিলেন "ওহো!  
রাগ হয়েছে বৃত্তি; করিনি বাড়ী আসতে পারিনি তাই?"  
কিন্তু জানো তে ভূমি, বাবা গিয়ে পধ্যস্ত কি রকম  
কণ্ঠাট পড়ে গেছে। এত বড় জমিদারীর সমস্ত ভার  
একা আমার থাকে,—ওগোনাটা তে যেতে অসমর্থ!  
যে দিকে না দেখি সেই দিকেই ফুল ফোটে ব্যাধা, এক দণ্ড  
অবসর পাই না যে—" স্বামীর এই মিথ্যা কৈকিয়তে  
চামেলীর যেন আশাশ্রমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত  
হইয়া ক্ষুদ্র অশ্রীর কণ্ঠে বলিল "থাক থাক আর বলতে  
হবে না! আমি সমস্তই জানি। কিন্তু জমিদারীর



কাজ বুঝি ওই তোমার সব বেড়াড়া বন্ধুগণের সঙ্গে না হলে হয় না ?

মহাংহতা পত্নীর এই ভৎসনটুকুও সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামী মহাশয়, এবার ত্রীভিন্নত উচ্চ হইয়া ক্রুদ্ধ-বশে বলিলেন “হয় না হয়, তোমার যে তখন কাজ কি ? কাজালের মেঘে, রাজস্বায়ীর হালে রয়েছে, আমার তুমি কি চাও তুমি?—বন্ধু বান্ধব, আমোদ প্রমোদ সব ভোগ পরে দিনরাত তোমার ঝাঁচল ঘরে” পরের কোণে বসে থাকিবে এই না? আশাবারও তো কম নয়!”

হুংহে, কোড়ে, লম্বাঘা, চামেলী যেন সরসে মরিয়া গেল। তাহার ভাষাইল মুখে আর একটীও কথা ফুটিল না, শুধু আবাধ অশ্রুজল চক্ষু ছাপাইয়া টপ, টপ, ঝরিয়া পড়িল। তাহাকে কাদিতে দেখিয়া স্বামী আরও বিরক্ত হইয়া অবলম্বার সহিত বলিলেন “এই হ’ল কাহা হুক! এসব নভেলখানা আমি দুইচক্রে দেখিতে পারি না। এসেছিলুম একটা কাজে, তা সবই ঘুলিয়ে গিয়ে।” তাহার পর স্ত্রীর আরও কাছে আসিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন “আমি এমন কি শরু কথা বলছি, নীর হয়ে একেবারে কেন্দ্রে ভাসিয়ে দিলে? দু’টোটার সর্ব্ব কর, একটু সাহুলে নি আমি, তারপর ঘর সামান্য তো আছেই। হ্যাঁ, দেখ, বাবার লোহার সিন্ধুদের চাবিটা কোথায় রেখেছ? নাও তো একবার দরকার আছে।” চামেলী তখনও নিচল, নির্দ্বন্দ্ব। স্বামী নীর হইয়া উত্তরক বটে কহিলেন “ভুলতে পাও না? বার করে বাওনা চাবিটা ঈগুপিস,—এখনই বেরুতে হবে যে।” চামেলী উন্মত্তিত চক্ষের জল মুহিতে মুহিতে আলমারী খুলিয়া ভারি চাবির গোছাটা তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। স্বামী প্রসন্ন মুখে চাবি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যান দেখিয়া চামেলী আর স্থির থাকিতে পারিল না। মনে অপমান সমস্ত তুলিয়া সে ভাড়াভাড়ি গমনোন্মত্ত স্বামীর পা হুঁশানি ঝড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল “এখন চলে যেও না, ওগো তোমার পায়ের পিড় একটুখানি বসে,—আজ এতদিন পরে এসেছ ঘিমে—এই অশ্রুজল ভরা করুণ সিন্ধুতে বুলি পাখান পানিয়া যাইত। কিন্তু তাহার স্বামীর পাখান প্রাণ উলিল

না! তিনি অটল নির্দ্বন্দ্বতার ভাবে সসব্যস্তে বলিলেন “তুমি পাগল হলে নাকি? কাহা এসে বসব’খন আর যেতে দাও, রাত হয়ে যাচ্ছে।”

চামেলী জালিল না, আরও দৃঢ়ভাবে পা হুঁশানি চাপিয়া ধরিয়া সে কপিত আঁর্জবশে বলিল “না, আমি ছাড়ব না, ওগো বসো আমাকে কি শোবে পায়ে ঠেলেছ, আমি কি করেছি তোমার?”

“আঃ কি জ্ঞান! ঈগুপিস ছেড়ে দাও বলাছি, দেখী হয়ে পেল, ছাড়।” সেই হুকোমল প্রেমময় বাহুজের সজোরে ছিন্ন করিয়া, চামেলীর বুকভরা আশা, ভালবাসা পদদলিত করিয়া স্বামী বহুদূরে চলিয়া গেলেন একবার কিরিয়াও চাহিলেন না। হাং নিটুর।

হুংহ লম্বাঘ, অপমানে, নৈরাশ্রের তীব্র বেগনার মহাংহত হইয়া চামেলী যখন দলিতা ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া পাড়াইল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছে; বুকের ভিতর আগুন জলিতেছে। কলকী টাদের হাসি তখন আরও অসমান উজ্জ্বল হইয়া অকৃত্রিমারে করিয়া পড়িতেছিল। বাগানের ওয়ার হইতে সারাদিনের অশ্রুর প্রাণ দারবানদিগের ‘হোদী’ গানের একটা ‘কলি’ শব্দ শব্দে ভরাহুল হৃদয় ময়মানিলে ভাষিয়া আসিয়া সেই আহত হৃদয়ের বেগনা বিগুণ করিয়া তুলিল—

“আয়ে না আয়ে না, ফণ্ডল আয়ে,—আমায় না নিটুর বিহারী।”

অন্যে কোন্ নিরুত্তর তরুণাধার দুকাইয়া থাকিয়া একটা মুখের কালো কোকিল, যেন চামেলীর ব্যর্থ বাসক-সজ্জাকে উপাশন করিয়া তীব্র মধুর স্বরে ভাঙ্কিয়া উঠিল—

“হুদ! হুদ!”

অবশ্য মহাংহায স্বাধীর হইয়া, অভিমানে দুলিতে দুলিতে কাটিয়া পড়া দুখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চামেলী যেন মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরে আসিয়া পাড়াইল। কিন্তু সেখানেই কি নিজের আছে? সমুদ্রেই যথোলের গায়ে অটী, বেড়াভাড়ি বিজুজিত হইল দূর্ণ, তাহাতে চামেলীর তড়িত লতার মত অসমান কাঙ্ক্ষা, উজ্জল রূপপ্রভা প্রকটিত হইয়া যেন চক্ষু ঝলসাইয়া উঠল। এই রূপের পরবর্তী হইয়াই না সে আজ তার বিমুখ দৃষ্টিতে ধরিয়া রাখিতে গিয়াছিল,—পারিল কি? কি রূপ! পোড়া রূপ তার!

ভাড়াভাড়ি ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া; চামেলী ব্যথিত বিভ্রান্ত চিত্তে তাহার সেই ব্যর্থ রূপ,—প্রসাধন নষ্টা অশ্রুকার নির্জন কক্ষে লুটাইয়া পড়িল।

কতখন পরে, তাহার খাস কি বিধু দরজার কাছে আসিয়া ভাকিল, “বৌদি মনি।” “করে বিধু? ভেতরে আসনা, দরজা ফোঁদান রেছে।” ঘরে ঢুকিয়া বিধু সবিম্বশে বলিল “ওমা!—বহু অশ্রুকার কেন?” চামেলী ধমক করিয়া উঠিতে উঠিতে স্তম্ভ হয়ে বলিল “আলোটা জ্বলে যেতো বিধু। বহু মাথা ধরেছিল, তাই অশ্রুকারে একটু ভয়ে পড়েছিলুম।”

ঘরের আলো জ্বালিয়া, চামেলীর দিকে চাহিয়া বিধু গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা! তুমি একা রয়েছ বৌদি? আমি তেবেছিলুম দাধাবাবু ঘরে রয়েছেন।”

“বয়ে গেছে তাঁর থাকতে।” “এরি মধ্যে বেরিয়ে গেলেন? আঃ পোড়া কপাল।”

উজ্জল ভক্ত ভক্তিমোকে সেই আনুখ্যল বেশা, বিপর্য্যত বেশা, মানমুখী স্বন্দরীরা লালিত রূপরাশি দেখিয়া বিধু মুগ্ধচিত্তে ব্যথিক নির্দ্বন্দ্ব হইয়া পাড়াইয়া বহিল, তাহার পর চামেলীর কাছে বসিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল “দাধাবাবু কি পাখান প্রাণ বৌদি! এমন রূপের জালি ঘরে ফেলে তিনি যে কিসের লোভে বাইরে বাইরে যোবেন!”

চামেলী নীর হইবে একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল “পুরুষগণের দশাই ওই বিধু! তার জন্তে আর হুংহ করে? কি হবে? বল? ওদের প্রাণে কি ভগবান দয়া মাধা কিছু দিয়েছেন?” বিধু ভাড়াভাড়ি হাত দুখা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল “না, না, ওকথা বলা না বৌদি মনি। সব পুরুষ কি সমান হয়? এতো আমাদের নিবিলেশ বাবু রয়েছেন, তোমার সঙ্গে তিনি যে কত হুংহ কত আপশোষ করেন, বলেন শতীন্দ্রাধার! অতিবহ, দুর্ভাগ্য, যে এমন রূপের প্রতিমা, পরীর মত বউ, তার কণর বুকলেন না। আমরা এমন স্ত্রী পেলে এক বহু চোখের আভাল করতুম না, দিন রাত চোখে চোখে বুকে বুকে রাখতুম—চামেলী উত্তেজিত হইয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিল “কেন মিছে বহুবিধ বিধু?

কে তোর নিবিলেশ? সে আমাকেই বা কবে দেখবে?” বিধু চোখ মুখ ধুয়াইয়া বলিল “ই যে গো!—নিবিলেশ বাবুকে জানো না তুমি? তিনি দাধাবাবু যে পরম বহু, দাধাবাবুকে ঘরমুখা করবার জন্তে ভক্তলোক কতই না চেষ্টা করেন। মৃত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু কি চমৎকার নরম স্বভাব, রূপও যেন কাঞ্চিক বজ্রই হয়। কবে কেন্দ্র করে কি জানি তোমায় দেখতে পেয়েছিলেন, সেই অবধি আর একটাবার তোমায় দেখবার জন্ত লোকটা যেন পাগল—“বিধুর মুখের কথা শুনেই থাকিয়া গেল, চামেলী ধমক দিয়া তর্জ্জনস্বরে বলিল “তোরা আশ্পর্ক ভয়ে গেছে বিধু!—আমার সামনে এসব কথা শুনে আনতে একটু লম্বাও হ’ল না? তোকে স্টেটিয়ে বিদেয় করে দেব তা’ জানিস।” চামেলী তখন বড় গর্গর করিয়া ঝিক ঝিক করিয়া বসে, কিন্তু বিধুর আশ্রয়িত্যপূর্ণ হৃদয় চমকলি আশ্রয় তত তাহার তৃপ্তিত তপিত জ্বলমানিকে মিষ্ট স্বপ্ন করিয়া তুলিল। তবে, তাহার লজ্জও কেহ জাবে? তাহাকে দেখিতে পাগল হয়?—সমসার তরে সে শুধুই একটা হেলোফোর সামগ্রী নহে?

তাহার পর?—তাহার পর কৈমন করিয়া কি হইল কে জানে। কেন কোন একজ্ঞানিকের মায়াবলে চামেলীর বিরূপ কটিন চিত্ত, এক অপরূপ মধুর রসে সিক্ত, কোমল হইয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে সেই অদেহা অপর্যায়িতর পানে নত হইয়া পড়িল।

এখন সে আর বিধুকে তিরস্কার করিয়া ভাড়াইয়া দেয় না, বহু কাছে বসাইয়া গুটিয়া বৃষ্টিয়া নিবিলেশ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহারই ধ্যানে মগ্ন বিভক্তার হইয়া নিঃসঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাসে জ্বলে কাটাওয়া দিতে পারে। আশ্চর্য পরিবর্তন! অবশ্য ক্রমেই সপ্নী হইয়া পাড়াইল।

অবশেষে একদিন চামেলীর সেই ধ্যানে দেবতা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, তাহাকে শর্গের রথে তুলিয়া যখন লইয়া চলিলেন, তখন চামেলীর যেন চমক ভাঙ্গিল। স্বাধীর পরে অভিমানে করিয়া, যৌবনের মোহোচ্ছ্বাস-বিশ্বস্ত হইয়া সে আশ্র নিবের কি সপ্নান্য করিতে বসিয়াছে? কিন্তু তখন অহতাপ বুধা, ফিবিবার আর পথ ছিল না।



অপবিত্র পুত্র তথা কামনা লইয়া, একটুখানি শাস্তির আশায়, স্বপ্নের প্রলোভনে হতভাগিনী চামেলী আজ যে বহুমুখ পতনের মত জলন্ত অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এখন পুড়িয়া মরা ভিন্ন তাহার আর উপায় কি? গৃহ-ভাগিনীরা দুঃখপন্থের কলঙ্কের ছাপ লইয়া সে আর কাহার স্বপ্নই হইবে,—কে তাহাকে আশ্রয় দিবে?—একজন দিতে পারিতেন, তিনি এখন স্বর্ণে।—চামেলীর দেহেয় পিতা, যাকুবীনা ছুটিতাকে যথানুযায়ী জমিদার নন্দনের অঙ্ক লম্বা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে বিদায় লইয়াছেন।

অনেক কদিয়া, ভাবিয়া, ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া, পাণীড়া চামেলী শেষে যে পথে পদার্পণ করিল সে গণ যেমন ভয়ানক, তেমনি—পিচ্ছিল। তাহার পর জন্ত নামিতে নামিতে, সে আজ অধঃপতনের নিম্নস্বরে। সে কোথায়—পঙ্কিলতাপূর্ণ বন্ধকরের ভীষণ আবর্তে আসিয়া পড়িয়াছে? হায়! তাহার পবিত্র নারী জীবনের এই কি চরম সার্থকতা?

সদৃশ বিবাহ বাড়ীর আনন্দকলোচ্ছাস ও ছোড়া খুঁধের শব্দে সচরিত হইয়া চামেলী চক্ষু মুছিয়া বীণার 'বর' দেখিতে রাত্তার দিকে ছুটিয়া গেল।

আজ বরকন্ডা বিদায়ের পালা। এই দৃশ্য বড়ই কষ্ট, বড়ই মর্শ্বাসী! ভিতরকার দালানে বসিয়া নির্খলা কল্লার সঙ্গে দিবার জন্ত বাস তোরঙ্গ প্রাচুর্য গুছাইতে-ছিলেন। বীণার প্রিয় সামগ্রীগুলি বান্ধে তুলিতে তুলিতে মা লুকাইয়া বার বার চক্ষের জল মুছিতে ছিলেন। প্রাণাধিকা হুহিতার আশ্রয় লভানায় ঘেহেমী জননীর কোমল অন্তরধানি ব্যথিত উৎপ্রেতি হইয়া উঠিতেছিল। সমাপ্ততা কুইথিনীরের মধ্যে অল্পব্যয়্যার ঘরের ভিতর কনে সাজাইতে ব্যস্ত, বয়োভোগ্যাপ নির্খলার কাছে বসিয়া তাহার কার্যে সাহায্য করিতেছিলেন, এবং

"মেয়ে যে পারব ধন, পরে জন্মই তা'দের মাহুয় করা" "তোমার বীণার তপস্কে ভাল যে বিনা পয়সায় এমন ঘর বর জুটে গেল। এখন আশীর্বাদ কর, ও পাকা চুলে শিঁধুর পরে" জম জম সেই ঘরই কলক! "এমনি সব মিঠি বচনে ব্যথিতা জননীকে সান্ধা দিতেছিলেন।

এমন সময় প্রেক্ষাপাশু বাহির হইতে আসিয়া পড়ীকে লম্বা করিয়া বলিলেন "একবার শুনে যাও" বীণার সঙ্গে শয়ন কর্তে আসিয়া নির্খলা ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গা? কেন ডাকলে?" প্রকাশবাবু পকেট হইতে একটি নীল রংয়ের ডেলভেই মোড়ো ছোট বাক্স বাহির করিয়া জীর হাতে দিয়া বলিলেন "এই মাত্র বড় বাবু দিয়ে গেলেন বীণার জুতো" নির্খলা আগ্রহে বাক্সটা খুলিয়া দেখিতে পাইলেন এক ছড়া অতি সুন্দর দামী জুতো। "নেক্‌লন্" অভি মাত্র বিশ্বমে চক্ষু ছুটি বিফারিত করিয়া নির্খলা পুলকিত স্বরে কহিলেন "এবে অনেক টাকার জিনিস গো! বড় বাবু দিলেন? তাঁর এত যে অহংগ্রহ—" নেক্‌লেসের পাশে এক টুকরা কাগজ ভাঁজ করা রাখা ছিল, সেটি নির্খলার হাতে দিয়া প্রকাশ বাবু বলিলেন "গড়" কাগজখানিতে পরিষ্কার অক্ষরে, স্বন্দর ছায়ে লেখা ছিল—

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

মা! এই গহনধানি আমার বস্ত্র প্রদত্ত, পতিতার পাশোক্ত ধন নহে। ইহা বাহ্যরে আপনায় বীণার ধর্ম ও পবিত্রতা কিছু মাত্র স্মরণ হইবার আশঙ্কা নাই। তাই ভরসা করি, আজ মঙ্গলর দিনে, তা'র অভাগিনী চামেলী দিবার আত্মরিক মঙ্গল-কামনার সহিত অর্পিত এই সেরের দানটুকু প্রত্যাখান করিবেন না।—

পড়া শেষ করিয়া নির্খলা কখন যথ তুলিল, তখন তাহার আনন্দ চক্ষু ছুটিতে ছু ফোটা জ্বল, স্বচ্ছ অশ্রুজল মুক্তার মত টল টল করিতেছে!

## ওরাওঁদের কথা

### শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সি

নিম্নের কতকগুলি কাক্সের জন্ত এবার আমাকে ওরাওঁদের ছুঁচরটা এম্মে যেতে হয়েছিল। রাতি রোনার যিনি গিয়েছেন তাঁর মন নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হয়েছে এই ওরাওঁদের বেথে। এদের দেহ বেশ স্বচ্ছ ও সবল, মাংসপেশী বৃহৎ, চেহারাও বেশ কাল কুহুতুচে, লম্বা লম্বা বাহীর চুল চিকমকি দিয়ে সাজানো। মোটের ওপর বাংলা-দেশের মালোব্রীয়া প্রাণীজন্তুদের মত চেহারা ইহাদের নয়। সেখানে যে ম্যালেরিয়া নাই তা আমি বলছি না কারণ মোহারভাগার সরকারী ডাক্তারবাবুর কাছ হতে শুনেছি যে, গাছোড়ী অঞ্চলের দিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশ একটু বর্ধমান আছে—তবে সেটা বর্ধকালে, সব সময় নয়। বাহ্যের দিক দিয়ে যেতে গেলে পুরুষ ও নারী উভয়েই যথানিয়ম মেয়েলীয়া যেরূপ জারি ভারি বোঝা মাথায় করে হাসি মুখে যায় আমাদের এখানে পুরুষ 'জনেবা'ও তা পারেন না।

ফুড়ি, বাইশমান ঘর নিয়ে এদের এক একটা গ্রাম। অনেক আধাঘর এর মধ্যে বেশীও দেখা যায়। সবই খোলার বাড়ী মাটি দিয়ে খোলা তৈরী। দেখালের গায়ে চূর্ণ দিয়ে আবার লতাপাতা কাটি—মাছঘের মুষ্টিই (anthropomorphic figures) বেশী দেখা যায়। বাড়ীর মধ্যে বড়ো দুইটা থাকে সামনে একটা দাওয়া তার সামনে একটা উঠান—সেটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশেপাশে অল্প কিছু বেড়া দেখা আমি দেখা যায়, তরিতরকারী লাগানর জন্ত। একদিন আমাদের এক ওরাওঁদের জমিদারের—গৃহে যেতে হয়েছিল—সে গ্রামটা মোহারভাগা হ'তে তিন কোশ দূরে। সঙ্গে ছিলেন আমার কাকা আর লম্বী টিথার ডেইজ কোশানির ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ হিমাশঙ্কর। জমিদার বাবুর গৃহে পৌঁছেই তিনি উঠে দাড়িয়ে হিমি ভাষায় আমাদের অভিনন্দন করলেন। কাকা আর ম্যানেজারবাবু অল্প কয় করবার ইচ্ছায় তার কাছে গিয়েছিলেন তাই তাঁরা

সেই সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন। আমি এই সময়টুকুর মধ্যে জমিদারবাবুর আসবার পনের দিকে একটু লম্বা করলাম, তার বাড়ীর চারিপাশের খোলা জায়গাটা মোড়া বাঁধা তাও দেখলাম—উঠানটা একবারে তৃণমূক্ত—বাহিরের বাগানখান কতকগুলি হরিণের শিশু, কোথান আছে সেগুলি সবই জমিদারবাবুর অত্যন্ত শিকার প্রিয়তার লক্ষ্য স্বরূপ ইত্যাদি আরও অনেক লম্বা করলাম যা লিখতে গেলে পৃথি বেড়ে যায়। তবে বিদায়কালে জমিদারবাবু একটা second-hand মোটরগাড়ী ক্রয় করিবার অভিপ্রায় জানালেন আর আমরা ক'লকাতা হ'তে এসেছি শুনে তিনি আরও অনেক করে আমাদের বয়সে এমনকি তাঁর ঠিকানা পড়ত দিয়ে দিলেন বাঁতে গাড়ী আমাদের সন্ধ্যাবেলাে এসেই তাঁকে থবর দেই। ওরাওঁদের গ্রামের অবস্থা যে খুব ভাল সে কথাটা বলা যায় না তবে মোটের ওপর মন্দ নয়। এদের অবস্থার উন্নতির পক্ষে একমাত্র বাধা অত্যধিক 'হাতি' সেবান।

প্রত্যেক গ্রামে একজন 'মোড়ল' থাকে। তার নাম 'মাহালাই'। গ্রামের মধ্যে ঘরে ঘরে বিবাহ বাপলে তিনিই তা নিশ্চিন্ত করেন। গ্রাম শাসনের ভার তার উপরই জড়। তিনিই সব শাস্তির বিধান করেন। অবশ্য বিবাহ বিসম্বাদের গুরুত্ব হিসাবে তাদের সরকার বাহা-দুহের আদালতে উপস্থিত হতে হয়। গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা মাহালাইর হস্তে কোন অধিকার নাই। গ্রাম বন্দোবস্তের দুটা দিক আছে। একটা তার ধর্মের দিক অর্থাৎ যিনি ধর্মজ্ঞান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন আর একটা গ্রাম শাসনের দিক অর্থাৎ যিনি গ্রামের লোকদিগকে শাসন করেন। মাহালাই একপ্রকার গ্রাম শাসনে রাখে।

গ্রামে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে যিনি লোকদিগকে পয়াম্প্রণে তাঁর নাম 'পাহান'। গ্রামকে অশান্তির হাত হ'তে রক্ষা করা তাইই কাজ। অত্ৰ কোন গ্রামের কোন 'পাহান'



তার গ্রামে 'ছুত' চালান করেছে কিনা, কোন অপরাধের তার কোন দৃষ্টি তার গ্রামের উপর পড়েছে কিনা, 'সিঁথিহুত' গ্রামের কোন লোকের কাছ হ'তে পূজা চান কিনা ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করাই 'পাহানের' কাজ। এসব বিষয়ে 'মাহাতোর' কোন হাত নেই। গ্রামের বিবাহ ব্যাপারেও 'পাহানের' একটু প্রতিপত্তি দেখা যায় তবে 'মাহাতো'ও এ বিষয়ে বাদ যান না।

স্বামী-স্ত্রী, গুলকস্তা, ভাই ইত্যাদি নিয়ে এদের পরিবার। পরিবারের মধ্যে প্রায় সবাই বৃদ্ধ। যেহেতু ই যেন অধিক বর্ণশূন্য। কেউ চাষবাগ কর, কেউ কুলির কাজ করে, ইত্যাদি এমন কাজের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের সৈন্যবিন অভাবের পূরণ করে। লোহারজাগা অঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীগণ ইহাদের সাহায্যেই সেই দুর্গম পাহাড়ের জঙ্গল হতে কাঠ নামাইতে পানেন। সমস্ত দিন কাজের পর সম্ভাব্য সময় গ্রামে ফিরিয়া ইহারা স্নানি অপরাধনের জন্য মাল বাজাইয়া স্ত্রী পুত্র উভয়েই নৃত্যগীতাদিতে মত্ত হয়। এদের মধ্যে একতার অভাব নেই। শান্তিই এদের মনের স্বয়ং, এরা যে খুব বেশী সাহসী তা নয়; 'অত্যন্ত ভীকও যদি বলা যায় তা'হলে যোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না।

এবার এদের বয়ঃপ্রবর্তনের কথা বলা যাক। 'দ্বি-বসন্তী' বলতে এদের যে সব আদর্শ আছে সে সব খুব বেশী দামী নয় 'হু' একটা মাদুর (পিড়ি) রাখা অস্ত্রাধারের সম্ভবতঃ মন্ত্র। এদের মেয়েরা খেঁড় পাতা দিয়ে মাদুর তৈরী করে। যাদের অবস্থা একটু স্বচ্ছন্দ তাদের ঘরে 'হু' একটা পাতিয়া দেখা যায়। এই পাতিয়া খড় বা বিড়ালি বিছাইয়া ইহাদের শয্যা রচনা হয়। ইহারা আবার গাওয়ার সময় কাঠের পিড়িও ব্যবহার করে। ভাত খাওয়ার জন্য 'পাহারী' আছে রক্তার তৈরী, 'হুতা' হচ্ছে এদের বাটা, কোল ডাল ইত্যাদি রাখার জন্য ব্যবহার হয়। 'লোটা' এদের খচ বা দ্রাসের কাজ করে। ইহা ছাড়া রান্নাঘরে আরও অনেক আদর্শ আছে রান্না করার জন্য যেমন (১) কাকচুল বা হাতা (২) দুই বা খুন্টী (৩) কাথি বা হাড়ি (৪) তেওরা বা কড়া ইত্যাদি। ইহারা অনেক প্রকারের চুপড়ী তৈরী করে

যেমন (১) ছুটকা—চাল জমা করে রাখার জন্য (২) দৌরা ফুল ইত্যাদি চান বা বহন করার জন্য (৩) টুনটী—শাক, মরিচা ফল সংগ্রহ করার জন্য ইত্যাদি। ইহাদের বস্ত্রভেদও অনেক প্রকারের আছে যেমন নাগেরা (দামুয়া) ঢোল, ঢাক, তিরিও, মুন্টী ইত্যাদি।

গুরাওদের সৌম্যর্থাপিগণা অত্যন্ত প্রবল। কিসে নিজের চেহারাটা ভাল দেখাবে সেদিকে তাদের নজরটা খুব বেশী বলেই বোধ হয়। প্রকৃতি দেবীর সেরেপুর্ন কোড়ে বাস করে, তাঁর রাজ্যের স্বত্বের প্রকাশ দেবে তারা সেই স্বত্বকে ধরতে চায়। এই সৌম্যর্থাপিগণা কেমন করে এদের মধ্যে এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে sex-instinct এর কথা। নারী পুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় হুমকী হ'য়ে, আর পুরুষ নারীর সামনে হুমকী রূপ ধরে চায়। এই হুমকী হবার ইচ্ছাটাই তাদের সৌম্যর্থাপিগণা জন্মে জন্মে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাদুরের ভিতরকার এই হুমকীকে প্রকাশ করার চেষ্টাটা আসলে তখনই, যখন বৃকের মধ্যে একটা সোহাগ কোমল হর ফিরে ফিরে য়ে বেড়ায় একটা অব্যক্তকে ব্যাক করে, একটা অস্পষ্টকে মূর্ত করতে—নাচা বাজির কাউকে খুঁজতে—তাই মাদুরে নিজেকে নানা রঙে সজির নেয় এই ভেবে বৃদ্ধি এই দর্শন মিলে। এই জন্মেই গুরাওদের মধ্যে গহনার আধিক্য। এদের মেয়েরা কাপে ছায়া বিনুদিও, গলায় পরে 'কাঁহলি', হাতে ছায়া 'গুগলিনা' আর পায়ের 'পৈনরা'। এদের বৈশিষ্ট্য কন হুমকী দেখায় না—প্রথমে একটা চিকম্পী (বপিন্ধা) পরে, তারপর আছে অনেক রকমের মাথার কাঁটা যেমন 'সুগা বনসো' 'ছাইনাথসো', 'আইনাথসো' ইত্যাদি। নানারঙের ফুল দিয়ে এরা এদের বৈশিষ্ট্য সৌম্যর্থাপিগণা পুরুষদেরও নানারকমের গহনা পরতে হয় শুষ্ক সৌম্যর্থাপিগণা খাতিরে—এদের হাতের কজিতে থাকে 'চেরা' মাথার পরে 'পুন্ডুরা' 'ছুচিচাপুন' মোচারশুন' ইত্যাদি। মাথার চূর্ণ বেশ সাজানো তার ভিতর আবার চিকম্পী (বাগিরকা) দেওয়া। উড়ী পরাটাও এদের মধ্যে কম দেখা যায় না।

গুরাওদের খগোজীর ভিতর বিবাহ হয় না। ইহারা অনেকগুলি গোষ্ঠিতে বিভক্ত। ইহাদের গোষ্ঠীর নামকরণ হয় ইতর প্রাণী বা প্রাণহীন নিম্পন্দ বস্তুর নামে। নিম্নে কতকগুলি গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হল—

(ক) ইতর প্রাণীর নামে—  
(১) আলুদা (হুহুর) (২) লাকুদা (ব্যায়) (৩) এরগো (ইমুর) (৪) বিদি (শশুন) (৫) কোকুরো (মোরগ) (৬) কেমু (এক প্রকারের মৎস্য) (৭) হুগুদা (এক প্রকারের মৎস্য)

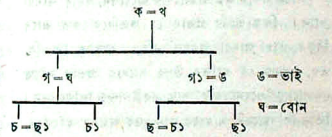
(খ) প্রাণহীন নিম্পন্দ বস্তুর নামে—  
(১) বাবু (বটগাছ) (২) মাতগি (মহারা গাছ) (৩) কেনডি (এক প্রকারের গাছ) (৪) জুরবি (জলাশয় যান) (৫) পুরবি (এক প্রকারের গাছ)

এই নাম করণের একটা অর্থ অসঙ্গত জাতিরা ভায় যে তাহারা যে নামে তাদের গোষ্ঠীকে পরিচিত করে অপরের সামনে, সেই সব নামধারী প্রাণী বা প্রাণহীন বস্তু হোতে তাদের উৎপত্তি কিন্তু যে কয়টা আমার নজরে পড়েছে আর অনেক জিজ্ঞাসা করেও দেখেছি যে তারা তেমন কিছু উৎপত্তির কথা বলে না। উপরোক্ত প্রাণী বা বস্তুকে তারা সমান যে করে তাও আমাদের মনে হয় না। গুজির বস্ত্রিও এখনও বর্তমান আছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে উহা বিবাহের সঙ্গে জড়ান। 'আলুদা' গোষ্ঠীর পুরুষ ঐ গোষ্ঠীর নারীকে বিবাহ করতে পারে না তাই তাকে বিয়ে করতে হয় অন্য গোষ্ঠীর নারীকে। এই প্রকারের বিবাহকে হবিবিবাহ বলে। ভিন্ন গোষ্ঠীর নারী হ'লেই হোল, না কারণ আর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে বাপ পড়ে আত্মহত্যা লেগাই দিয়ে তাই তাদের বিবাহ পদ্ধতি গঠিত হ'য়ে আরও স্থবর্তন নিয়মে বন্ধ হয়েছে। কতকগুলি মেয়ে থাকে যাদের কতকগুলি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া খুব প্রাশস্ত। মাধারনগর: অসঙ্গত জাতিদের মধ্যে বিবাহ স্বত্ব কতকগুলি নিম্নরূপ দেখা যায় যেমন—

(ক) একজন পুরুষ তার (১) মায়ের ভায়ের, (২) বাপের বাবনের কিংবা মায়ের মায়ের বাবনের মেয়েকে পত্নীরূপে বরণ করতে পারে। এই বিবাহকে cross-cousin বিবাহ বলে।

(খ) বড় ভায়ের বৌকে ছোট ভাই বিবাহ করতে পারে (Levirate)। এই প্রকার 'আরও অনেক নিয়ম আছে। গুরাওদের মধ্যে 'ক' এ উল্লিখিত নিয়মাদ্বারা বিবাহ হয়। এদের মধ্যে 'মাতনী ঠাকুরদার' বিবাহও বোধ হয় চলিত আছে সেটা বোঝা যায় শুধু তাদের মদুর সম্পর্ক দেখে।

নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে তাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা বেশ সুবিধা হইবে।—



এখানে 'ক' পুরুষ তার বাপের বোন অর্থাৎ 'খ' এর মেয়ে 'ছ'একে বিবাহ করবে। এই বিবাহে 'চ'র সহিত গ২ এর সম্বন্ধ দাড়ায়—যেমন

বাপের বোন } এইটাই  
মার ভায়ের স্ত্রী }  
আবার 'ছ' 'চ'এর সঙ্গে বিবাহ করে তা'হলে 'ছ'এর সঙ্গে 'খ'এর সম্পর্ক দাড়ায় যে সে 'ছ'এর

(১) মায়ের ভাই } এল, মামু  
(২) বাপের বাবনের স্বামী }

এদের পারিবারিক সম্বন্ধ হ'তে শব্দাবলী ও অনেক আছে যেমন আভা (পিতামহ); আভী (পিতামহী); বাবু (পিতা), আইও (মাতা); ভাইস (ভ্রাতা), দাসো (বড় বৌদি); ভায়ো (ছোট ভায়ের স্ত্রী); এল, হিয়ালি (স্ত্রী), এল, হিয়ালাম (স্বামী); এল, দামু (পুত্র), এল, দা (কস্তা); এল, কাকামু (খুড়া), এল, বড়ামু (জোতা); এল, থেরো (পুল বধু); জোনি বাদি (জামাতা); ইত্যাদি আরও অনেক নাম আছে।

গ = ভাই। চ = পুরুষ। ছ = পুরুষ।

গ২ = বোন। চ২ = মেয়ে। চ১ = মেয়ে।



এদের 'বার' মাসে তেঁদের পার্শ্বণ' না থাকলেও বৎসরের অনেকগুলি 'পূর্ব' আছে। ভাদ্র মাসে হয় 'সার্ব'— এই সময় নাচ গানের খুব ধুম পড়ে যায়। নানা রঙের ফুলে নিষেদের চেহারায়ে সাজিয়ে নিয়ে পুরুষ মেয়েতে উৎসবে এমনি ভাবে যেতে গুটে যে সে সময় দেখানো

হয়ে একটি আনন্দের বহা বয়ে যায়। আশ্বিন মাসে 'জিত্তি' পূর্ব। কাষ্টিক মাসের অমাবস্যা হয় 'সাহারাই'। 'আর হুন্' আর 'হোলি' হচ্ছে এদের বসন্ত কালের উৎসব।

## খাণ্ডের প্রভাব

জীবন রক্ষার জন্য খাণ্ডব্যবহার প্রয়োজন, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু উহার প্রভাব যে কতদিন কত ভাবে বিস্তৃত, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভ্রতি মি: সি, এক, এডওয়ার্ড এই জাতির উপর বাহ্যের প্রভাব সম্বন্ধে যে সালের "ওয়েলফেয়ার" গজে একটি সম্বন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, মাংসের জ্ঞান যতই অগ্রগত হইতেছে, ততই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, খাণ্ডব্যবহার পার্শ্ব্য হেতু জাতির সহিত জাতির আকারে প্রকারে, বর্ণে এমন কি ক্রোড়িতে পর্যন্ত পার্শ্ব্য জন্মাইয়া দেয়। এ, পি, আর্পিটজ নামক একজন যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক "খাণ্ড ও জাতি" সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের প্রধানরাই বলেন, খাণ্ড মায় ক্যাম্বিজম ও অলগিন পূর্বে লনের রেল সোসাইটি অব আর্টস এই সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই সকল কথার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সাধারণ পাঠকের গম্যে রচিতক হইবে না। সেই জন্য উহার যে অংশ আমাদের গম্যে প্রয়োজনীয়, আমরা তাহারই বিষয় বর্ণিকা আমাদের মস্তব্য সমেত সরল ভাবে আলোচনা করিলাম।

আমরা 'ভেতো' বাঙ্গালী একরাশি ভাত উন্নয়ন করিতে পারিলেই আমাদের ক্ষুধিহৃত হই; মি: আর্পিটজ অনেক তথ্য দ্বারা সম্ভাষণ করিয়াছেন যে, খাণ্ডার কেবল ভাত খায়, তাহাদের কিছু স্বাকার হইয়া থাকে। খাণ্ডার গর বাঘ, তাহাদের দেহ 'ভেতো' লোক অপেক্ষ দীর্ঘ হয়। সেই জন্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রুখোর বা হুঁতাভোজী জাতি অপেক্ষ ভেতো অর্থাৎ তুলুমাঝ ভোজী জাতি দৈর্ঘ্যে কিছু ছোট হইয়া থাকে।

তাহার কারণ ভাতে বা তুলু প্রোটিনের (Protid) ভাগ অতি অল্প আছে। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, যত তুলুভোজী জাতি, সকলই স্বাকার। যে পরিমাণ গমে বা মধ্যায় ৭৮ তোলা প্রোটিন আছে, সেই পরিমাণ ভূঁয়া বা জনারে ৭০ তোলা, যব ও রাইয়ে ৬১ তোলা এবং চাউলে ৬৮ তোলা প্রোটিন বিদ্যমান। স্বতরাং বুঝা গেল, চাউলে যতটা প্রোটিন আছে, তাহার দ্বিগুণ প্রোটিন গমে বিদ্যমান।

আমরা বাঙ্গালী জাতি ভাত খাই সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাছও খাইয়া থাকি। এই মাছে প্রোটিন অধিক আছে। আমাদের পূর্বা পুরুষেরা ভোজনে বসিয়া কেবল বাশি রাশি আর উন্নয়ন করিতেন না, তাহার অয়ের সহিত মৎস্য, হুত, হুত প্রভৃতিও খাইতেন। কাজেই তুলু প্রোটিনের ভাগ অল্প হইলেও মৎস্য ও হুত সে অভাব পূর্ণ হইয়া যাইত। সেকালে যখন এই বাঙ্গালায় মাছ ও হুত হুলত ছিল, তখন বাঙ্গালীর আকৃতি বিশেষ বর্ধি ছিল না। তাহাদের দেহে তখন বলও ছিল, এবং রোগের আক্রমণ সহ্য করিবার মত শক্তিও ছিল। বিশেষ খাণ্ডের অবস্থা একটি স্বচ্ছল ছিল, তাহার্য সন্দেশ, মোতা, বঙ্গগোয়া, ছানাবড়া, দধি প্রভৃতি নিত্য ভোজন করিতেন। তখন ১ টাকার পাঁচ সের সন্দেশ মিলিত। কারি, কোপা, ক্যাটলেট প্রভৃতিতে তখন লোকের কচি জন্মে নাই। তবে সাধারণ ও গরীব আশ্রয়করণের বৈধ্য একটি অল্প হইত। শিবরাত্রি প্রদানতঃ গোমুভোজী বসিয়া দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। খাণ্ডার গোমুখের সহিত হুত, দধি বা পনির খাইয়া থাকে, তাহাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় ম্যাক ক্যারিসন আর একটা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভূমির উপাদান ভেদে উৎপন্ন শস্তের ভিতর প্রোটিনের খণ্ডিকিৎ ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চলের গ্রাম্য লোকেরা 'বাঙ্গা' খায়। পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে জমীতে গোবর প্রভৃতি সার দেওয়া হইয়া থাকে, সেই জমীতে উৎপন্ন বাজার্য (millet) পুষ্টিকর উপাদান অধিক থাকে। যে জমীতে বার বার চাষ দিয়া তাহার উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, সে জমীতে উৎপন্ন শস্তের ভিতর শরীর পোষক উপাদান অপেক্ষাকৃত অল্প লক্ষিত হয়। আবার ইংলও দেখা গিয়াছে যে, কৃত্রিম সার দিলে জমীতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাতে শরীরপোষিকা শক্তি কিংবা অল্প দেখা যায়। ইংল সকল শস্ত সম্বন্ধে স্থিরীকৃত হয় নাই।

ইংলার সকলেই একবারেই বলিয়াছেন যে, চাউল প্রভৃতি পরিষ্কৃত ও ধবধবে শাদা করিয়া খাওয়া ভাল নহে। উহাতে তাহার পোষিকাশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। গমের ভিতরকার শাখা অংশের উপরে যে পাতলা আবরণ দৃষ্ট হয়, তাহা ফেলিয়া দিয়া ধবধবে শাদা মধ্য করিয়া খাওয়া উচিত নহে। উহা রাখিয়া দিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়। কাল খান গম প্রভৃতি পরিষ্কার না করিয়া ঢেকে দিয়া ছাটিয়া লইলে ভাল হয়।

বর্ণের উপরও খাণ্ডব্যবহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। খাণ্ডার লবণ বা যে সকল খাণ্ডব্যবহার লবণ অধিক থাকে, সেই সকল খাণ্ডব্যবহার, তাহাদের বর্ণ কণী হইয়া থাকে। অল্প স্বর্য কিরণের প্রভাবকে জীবের বর্ণ মলিন হইয়া যায়। কিন্তু কেবল স্বর্য কিরণই মাংসের বর্ণকে মলিন করে না। খাণ্ডব্যবহারে পটাস থাকিলেও তাহাতে মাংসকে দৌরবর্ণ করে। মিত্রার আর্পিটজ বলেন, লবণ খাইলে বর্ণের ব্যতিক্রম হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যে জাতি যত অধিক লবণ খায়, সে জাতির বর্ণ তত গৌরব হইয়া থাকে। সেই জন্য খাণ্ডার মধ্যে লবণ বা লবণাক্ত দ্রব্য ভোজন করে, তাহাদের বর্ণ সর্বাঙ্গোপা অধিক গৌরব হইয়া থাকে। খাণ্ডার অপেক্ষাকৃত অল্প লবণ খায়, তাহাদের বর্ণ অপেক্ষাকৃত অল্প মলিন হইয়া থাকে।

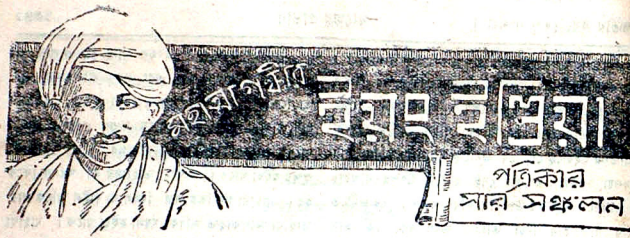
খাণ্ডার শস্ত ও খেতসারবহুল খাদ্য খায় ও শাকসবজী খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং লবণ অতি অল্প খায়, তাহাদের বর্ণ অধিক মলিন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে খাণ্ডার পুরুষ পুরুষাঙ্কমে তুলু ভোজন করিয়া থাকে, তাহার্য মলিন পরিবর্তনের মধ্যে সর্বাঙ্গোপা হ্রাস হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাদের বর্ণ অনেক ফিকে হয়। খাণ্ডার গম ভিন্ন অল্প দ্বিধল বা পাইল অধিক খায়, তাহার্য অপেক্ষাকৃত অধিক মলিন হইয়া থাকে। খাণ্ডার্য বৃক্ষের মূল প্রভৃতি অধিক ভোজন করে, তাহাদের বর্ণ অল্প ও একটু অধিক মলিন হইয়া উঠে। আর খাণ্ডার্য মূল খুইয়া খায়, তাহাদের বর্ণ সর্বাঙ্গোপা অধিক মলিন হইয়া থাকে।

কেবল স্বর্যকিরণ এবং পাকসবজী যে মাংসের বর্ণকে মলিন করে, তাহা নহে। পরন্তু যে স্থানে অধিক রুটি হইয়া থাকে, খাণ্ডার্য অল্প (নোকাট) এবং জলাভূমির মাটিতে বাস করে, তাহাদের বর্ণ মলিন হইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয়, বাঙ্গালার লোক অপেক্ষাকৃত অধিক মলিন। আবার খাণ্ডার্য সাধারণতঃ মাটিতে বাস করে, সাধারণতঃ মাছ খায়, তাহার্য তাদৃশ মলিন হয় না।

তবে একটা কথা বিশেষ ভাবে 'অন্ন' রাশিতে হইবে, দুই এক পুরুষের প্রভাব তাহাদের উপর বিশেষ পরিচরিত সাধিত করিতে পারে না। এই পরিবর্তন এত দীর্ঘ দীর্ঘে নশ্পাদিত হয় যে, দুই চারি পুরুষ ইংলার প্রভাব বুঝা যায় না। স্বতরাং এ বিষয়ে পরীক্ষা করা কঠিন। তাহা হইলেও বহু স্থানে বিশেষ যত্ন পূর্বক অংশদানের ফলে এই সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। দরিদ্র লোক অপেক্ষা ধনী লোক অধিক দৌরবর্ণ হইয়া থাকে, তাহার কারণ, তাহার্য বহু পুষ্ক খরচায় বর্ণের উজ্জলতা-সাদক বস্ত্র খাইয়া থাকে।

খাণ্ডব্যবহার ভেদে মস্তক গঠনেরও প্রভেদ হইয়া থাকে। তবে বর্ণ জাতি নির্ণায়ক বলিয়া যে মত ছিল, সে মত এখন পরিভ্রান্ত। এখন মস্তকের গঠন যে জাতি নির্ণয়ের লক্ষণ বলিয়া মাত্র, তাহাও টিকে কি না সন্দেহ। খাণ্ড হুত, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একে একে মস্তকবহুল খাদ্য খাওয়াই বস্তু। তাহাতে দৈহিক শক্তি ও বট সহিষ্ণুতা বাস করে। (দৈহিক বহুমতী হইতে)





## সত্যের পরীক্ষা

আমার নিরুপায় অবস্থা

ব্যারিষ্টারী পাশ করাটা সোজা কিন্তু ব্যারিষ্টারী করা বড় কঠিন। আমি আইন পড়িয়াছিলাম কিন্তু সে-গুলিকে কাজে লাগাইতে শিবি নাই। আমি আইনের বীজমন্ত্রগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলাম কিন্তু ব্যারিষ্টারী করার সময় কি করিয়া সেগুলিকে ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানিতাম না। এই মূলনীতির মধ্যে একটা ছিল "নিজের সম্পত্তি—এমনভাবে ব্যবহার করিবে যেন অপরের তাহাতে কোন ক্ষতি না হয়" আমি ভেবেই পেশুন্ম না যে কেমন করে এই কথাটিকে আমার মক্কেলের হবিধার্থ প্রয়োগ করা চলতে পারে। এই নীতির সহজে যতগুলি লিপিবদ্ধ মামলা আছে সে সবগুলি পড়েও আমি যে এতটুকু আমার ভবিষ্যৎ ভক্তেরগণের কাছে লাগাইতে পারিব, এমন মনের জোর আমার হয় নাই।

এ ছাড়া আমি ভারতীয় আইন সম্বন্ধে কিছুই পড়ি নাই। হিন্দু বা মুসলমান আইন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। এমনকি একখানা আর্জি লিখিতে প্রযুক্ত আমি শিবি নাই। কাজেই আমি বের্ন অফুণ পাথারে পড়িয়াছিলাম। আমি গুনিয়াছিলাম যে, আদালতে সার ফেরোজা মেটা, সিংহের গায় গর্জন করিতেন কিন্তু ইংলণ্ডে যে তিনি কি করিয়া উহা শিবিয়াছিলেন তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। তাঁর মতন আইন-দক্ষতা লাভ করাতো আমার পক্ষে—আমি অসম্মতই মনে করিতাম এমন কি আইন ব্যবসা করিয়া যে আমি

কখনও পেট চালাইতে পারিব, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

আইন অধ্যয়ন কালেই এই সব সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা আমি উদ্ভূত হইতাম। এক বন্ধকে আমি ব্যাপারটা জানাইলাম তিনি আমাকে দানাতাই নৌরঞ্জীর পরামর্শ লইতে বলিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহঁদের সময় দানাতাই সাংহেয়ের নামে আমি একখানা পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম কিন্তু এ যাবৎ আমি উহা ব্যবহার করি নাই; কারণ আমি ভাবিতাম যে এরকম একজন বড় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করা কোন বকমেই উচিত নহে। বাহাই হউক এখন আমি সেটাকে, এই দীর্ঘ বিলম্বের পর কাজে লাগাইয়া দিলাম। যখনই তিনি কোন সভায় বক্তৃতা বিবনে একগুণ ঘোষিত হইত আমি ঐ সভায় উপস্থিত হইতাম এবং একটা কোণে দাঁড়াইয়া চমক ও কণ্ঠের তুলি সাধন করিয়া উদ্ভুদ্ধিত অন্তরে গৃহে ফিরিতাম। ছাত্রদিগের নিকট-সম্পর্কে আসিবার জন্ত তিনি একটা সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন আমি এই সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতাম ও ছেলেদের প্রতি তাঁহার গভীর বেহ ও তাঁহার প্রতি ছাত্রদের অপরি-সীম শ্রদ্ধার বিনিময় দেখিয়া আনন্দ অতীব করিতাম জন্মে একদিন সাংসে ভয় করিয়া সেই পরিচয় পত্রখানি তাঁহাকে দিলাম। তিনি বলিলেন, "যে কোন সময়ে তুমি আসিয়া আমার পরামর্শ লইতে পার"। কিন্তু আমি

[দ্বিতীয় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা]

ইয়াং-ইণ্ডিয়া

১৪৩৭

সে অবিধাতৃক কখনও লইতে পারি নাই কারণ আমি ভাবিতাম যে খুব ঠেঁকাখ না পড়িলে তাঁহার মত লোককে বিরক্ত করা উচিত নহে। সেই জন্তই সে সময়ে আমি আমার বন্ধুর উপদেশ অমুখ্যারী দানাতাই সাংহেয়ের সাহায্য লইতে সাহস করি নাই। আমার ঠিক শ্রবণ নাই যে এই বন্ধুটি কি অপর কোন একটা বন্ধু আমাকে নিম্নে ডেভেরিক পিনকটের কাছে যাইতে বলেন। তিনি (কনজারডেটী) সংরক্ষণকারী হইলেও ভারতীয় ছাত্র-দের প্রতি তাঁহার নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক স্নেহ ছিল। অনেক ছাত্রই তাঁহার নিকট পরামর্শ লইত, আমিও এক-দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইলাম এবং তিনি তাহাতে সানন্দ সম্মতি দিলেন। সেইদিনের কথা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না—তিনি বন্ধুর মত আমায় অত্যাশী করিলেন ও মধুর হাস্যের প্রভাব আমার মনে সঞ্চিত নৈরাশ্রের ছায়াকে অপসারিত করিয়া বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে সকলকেই শ্রম কিরোজগা মেটা হইতে হইবে? কিরোজগা বা বনকালেন খুব বেশী মেলে না। সাধারণ আইন ব্যবসারী হইতে হইলে খুব অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক হয় না। জীবন-ধারণের মত উপার্জন করিবার জন্ত সাধারণ সততা ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। সব মামলাই জটিল নয়। আচ্ছা আপনার কি রকম পড়াশুনা আছে বলুন।"

আমার সামান্য বা কিছু পড়া ছিল সে সব কথা বলিলে তিনি বোধ হয় যেন একটু নিরাশ হইলেন—কিন্তু সে ভাব দৃশ্যভাবী, পরক্ষণেই মুখ্যধারিক হস্তোদ্ধাসিত করিয়া বলিলেন "আপনার যে কি অমুখ্যারী তা আমি বুঝিছি। আপনার সাধারণ পড়াশুনা খুবই অল্প। জগতের সম্বন্ধে যে জানাটুকু উকীলের পক্ষে আবশ্যক তাহা আপনার নাই। এমন কি আপনার ভাগ্যতবয়ের ইতিহাসও পড়েন নাই। উকীলের পক্ষে যত্ন চরিত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক। মাছের মূখ দেখিয়া তাহা হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইবার ক্ষমতা উকীলের গাত্রে উচিত। অবশ্য কালুতী করিবার জন্ত ইহা অপরিহার্য্য নহে তবে সে জানাটা থাকা খুব ভাল। আমি দেখিছি আপনি কে এও ব্যালিগের সিগারী বিক্রোহের ইতিহাসও পড়েন নাই। বইখানা আপনি আজ থেকেই পড়তে

বুঝ করুন আর ল্যাটোরী ও সেমেলপেনিকের Physio-gnomy নামক বই দুখানিও পড়বেন।"

এই মাননীয় বন্ধুটির নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলাম। তাঁহার সমুখে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ আমার কোন ভয় ছিল না কিন্তু যেমন সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম অমনি আমার যেন যেমন ভয় কবিত্তে লাগিল। মুখ দেখিয়া মাছের চেনার কথাটা ক্রমাগতই আমার মনে তোলপাড় করিতে লাগিল এবং বাটা ফিরিবার সময় সমস্ত পথটাকেই কিষ্টিয়ানবী সঙ্কটীয় বই দুখানির কথা আমার মনে হইতেছিল। পরদিনই আমি ল্যাডেটোরীর বইখানি কিনিয়া ফেলিলাম, সেমেলপেনিকের বইখানি স্থানীয় বোকামে পাওয়া পেল না। ল্যাডেটোরীর বইখানি আমি পড়িলাম তবে উহা সেলের একুইটী অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবোধ হইল এবং উহা পড়িতে মোটেই আগ্রহ জন্মে না। সেম্পীয়ারের আকৃতির বিশেষত্ব অধ্যয়ন করিলাম বটে কিন্তু লগনের পথচারী ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে ঐ সব চিকিৎসা পাইবার মত কোন শক্তিই আমার জন্মিল না।

ল্যাডেটোরীর পৃথক পাঠ্য করিয়া আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয় নাই। নিম্ন পিতৃদের উপদেশ আমায় প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না কিন্তু তাঁহার যেহে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিল। তাঁহার হাতোঁকা, প্রশান্ত বদন আমার স্মৃতিগটে চূড়ান্তে সঞ্চিত হইয়াছিল এবং আইনের ব্যাবাসে সাক্ষ্য লাভ করিতে হইলে পরিশ্রম ও সতর্কতাই যে যথেষ্ট এবং কিরোজগা মেটোরে মত ক্ষমতা, দীক্ষিত ও ঐশ্বর্য্য যে অপরিহার্য্য নহে, তাঁহার এই কথাগুলিতে আমার গভীর প্রীতি জন্মিয়াছিল। আমার সততা ও পরিশ্রম করিবার সমাধি ছিল বলিয়া আমি মনে মনে অনেকটা নিশ্চিত হইয়াছিলাম ইংলণ্ডে থাকিবার সময় আমি যে, এও ম্যালেনের বই পড়িতে পারি নাই তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বাসকালে উহা পাঠ করিয়াছিলাম কারণ প্রথম যোগ্য পাইলটই উহা পাঠ করা আমার অভিপ্রায় ছিল।

এইরূপ নিরাশার মধ্যে সামান্য একটু আশার বন্ধি বন্ধে ধারণ করিয়া আমি "আসাম" জাহাজ হইতে বোহাই বন্দরে নামিয়াছিলাম। বন্দরের সমুদ্র অশান্ত থাকায় আমাকে লোকে করিয়া জেটীতে আসিতে হইয়াছিল।

(জন্মঃ)





## রায় শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনাথ সজ্জনদার বাহাদুর

কতকগুলো লোক সংঘে গিয়ে জুটতে, তাদের মাথায় দেশের মঙ্গলের জন্ত নানাবিধ বন্ধনা খেলে। তারা পায় পায় ভাল। পর্যা আছে। বই পড়ে, গানের মাঠে হাওয়া বায়, দর্শন, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের কথা কয়, তরু বিতর্ক করে, এবং কি করে কোন দেশ স্বাধীন হয়েছিল, এবং তার মধ্যে ভারতবর্ষের উপযোগী কোনটা তাও ঠিক করে নিয়েছে।

এই যে জীব দেহ, যার তের আনা পাড়াগাঁ, যেটা অন্যায়েরও রোগে দ্রিষ্ট, এবং যে চেষ্টা করেও ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের হাত এড়াতে পারে না, যার অধিবাসী একটা বন্ধকের আগুয়াজ তুললে কিংবা পুলিশের কৌজ বেলে কোন দিকে যাবে তার পথ পায় না, এবং যারা কোনো রকমে কায়রো পূর্বে সম্ভারবশতঃ হরিনাম মারা জপ করে ভব সংসার হ'তে মুক্তির চেষ্টা করে, সেটাকে খাড়া করে তোলা কি তোমার আমার কাজ? যৎ সস্তিকর্তা পারেন কি না সম্বোধ। তবে কি সস্তিকর্তা চেষ্টা করেছেন না। হয় ত এমন একটা কার্যচূপি চলছে যে এক সময় দেশটা ভাঙা হয়ে উঠবে।

কিন্তু তখন আমরা অর্থাৎ আমাদের বংশধরগণ কি বলতে পারবেন আমরা সেই বাংলা দেশের লোক? হয় ত আমাদের ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ সব বদলে যাবে। স্বতরাং যদি পরলোক থাকে; সেখানে তারা গেলেও পূর্বপুরুষদের কখনও চিনবে না। আমাদের কি এখন, বাশের আদি পুষ্ট যদি অবতীর্ণ হন, তাঁকে চিনতে পারি? খোদ বঙ্গালসেন এসে দিনাজপুরের লোক তাঁকে

লাঠি দিয়ে খেদাবে নিশ্চয়, যতক্ষণ না তিনি হিসাব পত্র নিয়ে এসে তাঁর দীঘির গরচা কড়ায় গণ্ডায় মুক্তিবে না দেন। অত কথায় কাজ কি, স্বামী যদি স্বর্গে যায়, সহবান্ধিও তাঁকে চিনে নিতে পারবে না। এই জন্ত আমরা বলে থাকি সংসার অনিত্য, মায়ায়ই ইত্যাদি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে হিনিবাস সরকার ওরুকে ছিছ রামায়ণের চালু হতে তার ছিপগাছটা পেড়ে, বেশ করে মুহুর, তাহাতে হুইল বেঁধে মুগা হুতার অগ্রভাগ কড়ার মধ্যে বের করে, কালো লাল হুতো মজিত দাঁড়া বেশ করে লাগিয়ে কেঁচো, পিঠিগি ও ময়দার টোপ যোগাড় করে ও খোটা কতক বোলুতার টিপ কাপড়ে বেঁধে, পুহুরের পারে গেল। সেখানে তার বন্ধু নীননাথ আগেই চারের সরঞ্জাম করে রেখেছিল।

২

প্রথমে কোথায় চার করা যায় তার বিচার হল। প্রকাণ্ড পুষ্করী, ঠাসা মাছ, বিসারও থাসা জারগা চাষুগিকে। কিন্তু তিন সরিকের পুষ্করী। কোনো সরিক মাছ ধরলে তিন ভাগ করে দিতে হবে। এমন কি একটা পুটি মাছ ধ'লেও সেই বিধান বন্দোবস্ত। মুড়ো ও গর্দান প্রথম সরিকের, পেটি দ্বিতীয়ের, অর্থাৎ সরকার মশায়ের ও ল্যাকা তৃতীয় সরিকের। এই প্রথা মাসে মাসে বদলানো হয়। বৈশাখ মাসে ম্যাকা প্রথম সরিকের, জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় সরিকের, এবং আষাঢ় তৃতীয়ের। এই রকম প্রত্যেক মাসের কার্যনা নূতন। তাহার কারণ, যে গমিয়ারী হিজ্জা প্রত্যেকের ও অনান্য তিন গর

এক কড়া কাঞ্চি এবং দস্ত দস্তর মত কালেক্টরি তৌলিতে ঘর্ষ করা। তারি মধ্যে দুই আনা এবং সাত গণ্ডার অংশ পতনী বিলি, এবং সেই অংশের অর্ধেক হিজ্জা এক-দশ দরপতনীদারের এবং তিনিই উপরোক্ত নীননাথ। এবং কালেক্টর। সে কালিকাতায় গিয়ে একজন বিখ্যাত পণিতের অধ্যাপকের কাছে হিসাব করে এনেছিল যে মাছের পটোকা ও সাইস বাদ দিলে, পেটীর, কিংবা মুড়ার, কিংবা ল্যাকার একের তেরিংশ অংশ অর্থাৎ ১০০০০ তার প্রায়। তবে ২৭৭ বদলে ৪ করে নিতে পারেন। যদি মাছের পেটে ভিন্ন থাকে তবে কেবল সেই ভিন্নের আনবিক চতুর্থাংশ রীখ পাবে।

পূর্বে সরিকের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোনো বিবাহ হয় নাই। এমন কি লজ্জ কবুণগুলিশের বিখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাটায়ও এটার উল্লেখ ছিল। কিন্তু পাছে কোনো গোলাযোগ বাধে এই আশ্বাসের সম্প্রতি সেটা মকলে রেজেন্টারি করে নিয়েছিলেন।

নীননাথের চারু করবার স্থান উত্তর পশ্চিম কোণায়, হিনিবাসের উত্তর পূর্বে। পুষ্করী উত্তর দক্ষিণ লখা। পূর্ব পশ্চিমের ব্যবধান বেশী নয়। এমন কি চারে মাছে দুই দিলেও একপক্ষ অপরকে হুকা দিয়ে ফিরে আসতে পারেন। ছুটি মাছপাতেই শেওলা পরিষ্কার করা হয়েছিল, এমন কি গলাজল পর্যন্ত সিকি ছু আনি পাঁড়ে গেলেও হুড়িয়ে নেওয়া যায়। বাশের উপায় ছাড়া বেঁধে, ও নিচে একথানা কঞ্চল পেড়ে উভয় বন্ধু নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হ'লেন।

পাতা কঞ্চলের উপর ছাতার নিচে দিবা দ্বিপ্রহরে হুকা হাতে করে বসে মাছ ধরা বাংলা দেশের সমস্ত গ্রাম। এ গ্রাম উঠে গেলে আমাদের দেশের একটা বিখ্যাত আট লুপ্ত হয়ে পড়বে। যাতে এটা রক্ষা পায় তাহা দেশদ্রিষ্টবৈরা মাতেরই কর্তব্য কণ্ঠ।

ইদিলপুরের করাত কাটা কাতলা গাঁবিয়ার বড়ুপি, বর্ধমানের কই মাছ ধরার উপযোগী কাটা, আমাদের হাতে ভাঙা মুগা, এ সব ঐতিহাসিক সরঞ্জাম। চারের মধ্যে মেথি, তাড়ুল, একাশী, ও কতকগুলো মাধ্যমসী মশা (যাংরা দীলোকেরা, ব্যবহার করেন) তিসি ও খইল

ভাঙা, কুঁড়ো ও ছাতু, পাউরুটি পচা, এ সব ত সামান্য মাল মশলা। যাঁরা তুর্কতর্ক জানেন তাদের মধ্যে দীঘর খুব একজন পাকা লোক। বেলা মেড়টা পর্যন্ত হিনিবাসের চারে কেবল পুটিমাছ জুতে লাগল। দীঘর চারে পুটিমাছের দৌরাখা ছিলনা, তাতে দীঘর আশা হয়েছিল যে বড় গোছের একটা কই কিংবা কাতলা জুটবে। স্বতরাং সে বাগাবায় না করে এলুমুটে কাতার দিকে চেয়ে ছিল। হিনিবাসের মধ্যে মধ্যে কঞ্চলের হাত বলে সে সম্প্রতি আফি ধরেছিল। বেলা তাঁর সময় তার কল্পনায় উদয় হল যে, যদি আফিঃ মাছের নেশা হয়, তবে টোপের মধ্যে একটু আফিঃ দিলে মাছেরও ত হ'তে পারে? এবং যদি একবার হয়, তবে সে মোটে পাঁড়ে বারবার আসবে না কেন? যতই তামাক হুকুতে লাগল, ততই তার মনের মধ্যে সেই ভাবটা অন্তর্যম্যে গেল। তার মনে হল যে সকলরই একটু করে আফিঃ ধরা উচিত এমন কি স্ত্রীলোক পর্যন্ত। তাতে শুধু শাস্তি-সংস্থাপন কেন, ধর্মসংস্থাপন পর্যন্ত হতে পারে। এই মায়ায় সংসারের ঘন কলহ মেটাবার অনেক চেষ্টা ত হয়ে গিয়েছে, অনেক মহানালিতে বংশানু এবং উত্তর পক্ষের সর্গনাশ হয়েছে, কিন্তু এই সামান্য ঔষধে কত মঙ্গল হ'তে পারে তা কি কেহ ভেবে দেখে? ক্রমে হিনিবাস মনে মনে প্রতীজ্ঞা করল যে, যদি তার ছেলে গুলে হয় তবে তারের আফিঃ ধরাবে নিশ্চয়।

এই আনন্দময় চিত্র মানসপটে উদ্ভিত হওয়াতে হিনিবাস তার বড়ুপি হ'তে কেঁচোর টোপ ও ময়দার টোপ বেড়ে ফেলে, পাউরুটির সঙ্গে ঈষৎ আফিঃ এর ভাগ দিয়ে নূতন করে উৎসাহের সঙ্গে বসে গেল। কেবল তার সন্দেহ হয়েছিল যে, যদি আফিঃ এর উৎকট গন্ধে মাছ না আসে। যাহোক, আপাততঃ পুটি দৌরাখা যে কমে গেল সেটা নিশ্চয়।

এদিকে দীঘ তার বন্ধু চারের দ্বি প্রজ্ঞা দেখে মনে করল যে হিনিবাস একটা কিছু তুচ্ছ করেছে, কিংবা দীঘর বিজ্ঞো সে আনুত পেয়ে সেই পথ অহরণ করেছে। কথটা এই যে হিনিবাস বেয়ম আফিঃখোর, দীঘ সেই পরিমাণে সিকিশের। তার মনে হয়েছিল যে



টোপের সঙ্গে একটু সিঁড়ির গুলি মেখে দিলে, অস্ত্রতঃ  
নেশার বাতিরেও বড় বড় মাছ আসবে। নেশা কোথায়  
নাই? বাগিচা ব্যবসাতে আছে, সাহিত্যে আছে,  
স্বাস্থ্যশাসনে আছে, ইলেকশনে আছে, স্বর্ণালম্বার ও  
পোষাকের মধ্যে আছে, তবে মাছের গ্রাণে থাকবে না  
কেন?

অনেকক্ষণ পরে ছিনিবাস জিজ্ঞাসা করলে—

‘দীহ দা’ তুমি কিসের টোপ দিয়েছ?

দীহ। কিছু নতুন নয়, একটু পানী মিশিয়ে দিছি।

সার তুমি?

ছিনিবাস। একটু বিহুট।

উভয় বন্ধু বুঝতে পারল যে উভয়েই মিথ্যা কথা  
বলছে, হতর। উভয়েই চক্ষু নেশায় জড়িয়ে পড়ল, এবং  
উভয়েই বিমুগ্ধ হল।

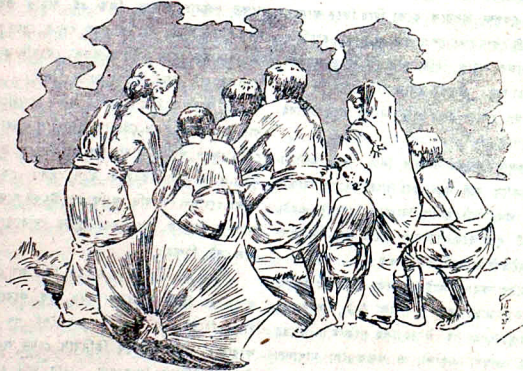
কতক্ষণ এই ‘অস্বাভ্যাস’ ছ’জনের কেটেছিল তা ঠিক  
বলা দুষ্কর। তবে এটা ঠিক যে বেলা ৪টার সময়  
ছিনিবাসের হাউল হতে হতো আপনাই বেকতে আরম্ভ  
করল, এবং দীহের ও সেই ব্যাপার। দীহ চাঁচকার করে  
বলে ‘ছিনিবাস, সাবধান! প্রকাণ্ড কাতলা পেঁকেছে’।

ছিনিবাস তড়াক ক’রে লাফিয়ে উঠে হত্যের টান  
দেখে বুঝতে পারল যে মাছটা অস্ত্রতঃ বাইশ নয়!  
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার ছিপের হত্যে ও দীহের  
হত্যে একদিকে দৌড়চ্ছে কেন?

দীহ। ছিনিবাস! সাবধান! একিই মাছ আমার  
টানে গেছে যাওয়াতে তোমার চার দিগে দৌড়াবার সময়,  
তোমার বড়িধণ্ড ও তার পেটে লেগে গেছে। তুমি টেনে  
ধরে থেক’। যদি আমারটা খুলে যায়, অস্ত্রতঃ তোমারটাও  
সামলাতে পারবে।

কিন্তু সে কথাটা কাজে লাগল না। কারণ, ছিনি-  
বাসের দিকে যখন মাছ আসে তখন তার হত্যেতে তিল  
পড়বে যেতে লাগল, এবং না জানি কেন, দুজোড়া বড়িধণ্ড  
টান বার্ষ ক’রে, জল তোলাপাড় ক’রে, মাছটা দুটো  
হাউলে হত্যে নিয়ে সরে প’ড়ল।

শিথিল কোঁচা এবং কাছা হতদুঃসম্ভব সামলে নিয়ে  
উভয় বন্ধু শুক ও স্নানমুখে পরস্পরের সম্মুখীন হ’ল।  
উভয়েরই পুরণোদের চেয়ে বাতনা, ও উভয়েই দের



[দ্বিতীয় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা]

পুত্রশোক

১৩৪৭

বালা দেশের ও বালালীর মুখে কালি দিয়েছিল এইরকম  
একটা ধারণা। থবর পেয়ে পাড়ার হাবু এসে জুটে গেল,  
দুহুরের অপর পাড়ে প্রথম সন্ধ্যার বাড়ীর ভীলোকেরাও  
বিত্তমুখে ব্যাপারটার তদন্ত ক’রতে দাড়িয়ে গেল।

ভ্রামশায়ে বালালীর যেমন মলম তেমন অস্ত্র কোনো  
জাতির আছে কিনা সন্দেহ, বিশেষতঃ পাড়ারিগ্য কোনো  
ব্যাপার ঘটেছে। প্রথম সমতা মাছটা যে গেঁথেছিল কার  
কৃপিতে প্রথম। দ্বিতীয় সমতা মাছটা কোন জাতির।  
তৃতীয় সমতা দুটো হাউলের হত্যে উদ্ধার করার উপায়।

প্রথমতঃ, কাতলা মাছ যদি হয় তবে সেটা টোপ  
গিলে যায় নাই তাহা নিশ্চয়। কতিং কখনো কাতলা  
মাছ টোপ যায় শুভ, কিন্তু এ পুষ্করিণীতে সে রকম কখনো  
গোষা যায় নাই। অথচ, টোপ যে যায় নাই, সেটাও  
নিশ্চয় বলা অসম্ভব, কারণ দীহ নিজেই স্বীকার ক’রতে  
যাও হলে যে, হত্যে নেবার অনেকক্ষণ পরে সে টেনে  
পরেছিল। হত্যরাস, হয় টোপ গিলেছে কিংবা পেটে  
বড়িধণ্ড বিধে গেছে।

টোপের মধ্যে এক পক্ষের সিঁড়ি ও অপর পক্ষের  
খাঙ্কি মেশানো ছিল তাহা উভয় পক্ষ প্রকাশ করাত,  
বিচার করা আরও জটিল হয়ে প’ড়ল। মাছটা যদি  
Extremist হয়, তবে সিঁড়ির দিকে ঝুকেছিল, যদি  
Moderate হয় তবে আখিঙের দোকেই তার আসা।  
এং যদি ছুঁদিকই টান থাকে তবে এটার হত্যে ‘ওচারে  
গরে বেড়ার সময় কণ্ঠকল বণতঃ দুটো বড়িধণ্ড তার  
পেটে মেখে দিয়ে সে জল্লালে পড়ছিল নিশ্চয়।

দীহ তামাকে খোঁচানু দিয়ে বলে, ‘তোমরা বেয়াহুফ।  
যদি টোপ গিলে থাকে তবে এতক্ষণ তার নেশা ভেঙ্গে  
উঠত। প্রায় ছুঁদিক কাবার হয়েছে।

ছিনিবাস নানারকম চিন্তায় মগ্ন ছিল। ছুশো হাত  
মুগো হত্যের দাম বড় কম নয়। অপিত তার সহধর্মিণী  
মাছের পেটের জন্ত আশা করে বসে আছে। এপ্রকার  
হুটীনা হয়ে জানতে পারলে সে এ কাজে হতক্ষেপ ক’রত  
না। এখন উপায় কি?

হাবু। দেখ, আমি জলে নেমে সম্মান করি, যদি  
কভার কর যে, মাছের অর্ধেকটা আমার মেনেত্তবরুণ  
পাও।

ইহা ভিন্ন আর উপায় কি? কাজেই উভয় পক্ষকে  
রাজি হ’তে হল।

খানিকক্ষণ এপাড় ও ওপাড় তোলাপাড় ক’রে হঠাৎ  
হাবু বলে ‘ঐ দেখ কাতা ভাসছে।

জলময় ছেলের কাপড়ের খুঁট দেখতে পেলে যেমন  
বাপ মামার বুকে আশার সন্ধ্যার হয় সেই রকম একটা আশা  
ছিনিবাসেরও হয়েছিল। কিন্তু দীহ তাকে হতাস ক’রে  
বুঝিয়ে দিল যে একজাগায় কাতা খির হয়ে দাঁড়ানো  
অসম্ভব। যদি তাই হয় তবে মাছ খুলে গিলেছে নিশ্চয়।

ছিনিবাস। তবে, কি জান, যদি তার আখিঙের  
নেশা হয়ে থাকে? সে কথাটা ভুলে যাক’ কেন?

দীহ। আমার সে বিষয়ে খুব সন্দেহ আছে।  
মাছের বমতে মাছ কখনো বোঝুক হয় না।

ছিনিবাস টেটিকে জিজ্ঞাসা করল হাবু, কাতাটা কত  
জলে ভাসছে?’

হাবু। প্রায় গলা জল। পাড়াও দেখি।

এই বলে সে কাতাটার অগ্রভাগ ধরে, একবার  
হত্যেটা টেনে দেখে, উল্টোদিকের ব’ল ‘খুব ভারি। মাছ  
মাটি নিয়েছে। এখনো খুলে যায় নি।

দীহ। বেশী টেননা। ছিড়ে যাবে।

ছিনিবাস। ওটা আমার কাতা, না দীহদ্বার?

হাবু। নীল হতো।

দীহ। ঐ দেখ, আমি আগেই বলেছি, আমার  
বড়িধণ্ডেই প্রথমতঃ বিধে যায়।

ছিনিবাস। আমার বড়িধণ্ডের হত্যে গেল কোথায়?

হাবু। পেটের নিচে আছে, কিংবা সেওয়ার জড়িয়ে  
গিয়েছে। একটা কলসির কানা নিয়ে এস। এ মাছ  
কিন্তু ভেঁই নড়বে না দেখছি।

দীহ। তুমি হত্যে ধরে জলে ডুব দাও।

ছিনিবাস। তা কখনো হতে পারে না। যদি বড়িধণ্ড  
হাতে বিধে যায়, ও মাছটা আবার দৌড় নেয় তবে  
রক্তাক্তি ব্যাপার হয়ে পড়বে।

ইতিবশরে হাবুর মা থবর পেয়ে ঝাঁটা হাতে রশখলে  
উপস্থিত হ’লেন। তিনি ঝাঁটা খুরিয়ে বজেন হাবলা,  
দিগগির জল ককে ওঠ, মৃত্যু ঝাঁটা পেটা করব।





দীহ। পিসি! তুমি অত আশঙ্কা কর'না। মাছটা কাবু হয়ে পড়েছে। আমিই নয় জলে নামছি।

৪

যখন তীর্থসেবকের জলে অবতীর্ণ হওয়া কাহারো অভিপ্রেত ছিল না। দীহ একটু প্রবীণ লোক, কাহা ঘাটা অভ্যাস নাই, এবং সাতার কতদূর জানা ছিল তাহা কেহ ঠিক জানত না। কিন্তু পিসির পুত্রবাংসলোর পৌরব রক্ষা করবার জন্ত সে জলে নামতে বাধ্য হল। হাবু বাধা দিয়ে বল, আমি যা কিছু তাতে গোলমাল করলে সব ভুলু হয়ে যাবে।

দীহ। তুমি অনবিকার চর্চা কর'না। মাছ সযত্নে তোমার কোনো জ্ঞান নাই। আমরা তের বৎসর এই কাজ করছি।

হাবু। চর্চা করছে কি অবিকার হয়। আমিও দশ বৎসর ধরে উপগ্রাস লিখছি, অথচ কখনো কোনো জীবনোৎসর্গে সন্দেহ মিশি নাই।

দীহ। ফাল্গুনের মতো বোকানো। উপগ্রাস যে সে লিখতে পারে। মাছ বরা একটা কব্জিকাও। দস্তর মাফিক বিজ্ঞতা চাই।

এই বলে দীহ স্বতাটা ধরে ছুতিনবার টেনে দেখল।

বেশ বোম্ব হল যে মাছটা। ভাষার দিকে যাচ্ছে।

পারের উপর হতে ছিনিবাস বলল—সাবাস্ দীহ।

দীহ। আমার বোম্ব হয় মাছটার নেশাই হয়েছে।

ছিনিবাস। আমারও সেই মত। আমি জলে নামব না কি?

দীহ। এলে ভাল হয়।

ছিনিবাস প্রস্তুত হ'ল। দ্বিতীয় সুরিকের বাধার জলে যাবেন, এ সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি ছিল, কিন্তু ছিনিবাস বলে উঠল, আমরা ভীক বাসালী। সামান্য একটা মাছের কাছে যেতে যদি এত ভয় করে তবে দেশের অবস্থা ভাল হবে কেমন কর'বে?

এই বলে তিনি খুব ছিনিবাসীর সঙ্গে বেধানে স্বতো শেষ হয়েছিল সেইখানে গিয়ে নেশাখোর মাছের অস্থস্থান মন্ত হলেন।

নিম্নের মধ্যে তাঁর মুখ নীলবর্ণ হয়ে উঠলো, এবং তৎক্ষণাৎ চশম'র কোণে কালি পড়ে গেল। এই প্রকার বর্ণের পরিবর্তন দেখে সকলে চীৎকার কর'বে উঠল।

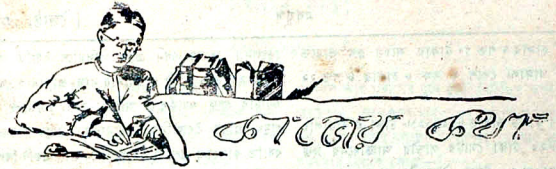
দীহ। ব্যাপারটা কি?

ছিনিবাস। কসে কামড়ে ধরেছে।

হাবু। সে কি গো!

ছিনিবাস। কছপ শালা। প্রায় একমণ ওজনের। এখন রক্ষা কর।

ছিনিবাসের বিগদ দেখে তার জী ও ছ' বৎসরের ছেলে কেঁদে উঠলো। ছিনিবাস ক্ষীণবরে বলে উঠলো কোনো ভয় নাই, আত্মলুটা ছেড়ে দিয়েছে। তখন অনেকে গামছা নিয়ে কছপটাকে অভিমুখ্যর মত গিরে ফেলে টেনে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছোড়া ছোড়া বড়িও স্বতো পাওয়া গেল। কছপটার চোখ দেখেই বোকা গেল যে তার নেশা হয়েছিল। তাহার বিশেষ গ্রাম যে বড়ি ছুটেই তার পেটের মধ্যে। স্বতরাং টোপও গিলেছিল নিশ্চয়।



এ সম্বন্ধেই চিত্রখানির শিরী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ বাবু বীরেশ্বর সেন। ভ্রম বশতঃ কয়েকখানি চিত্রের নিম্নে শ্রীকৃষ্ণ কৃতিশক্তি মনুমানবের নাম মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে কয়েক শত মুদ্রিত হইবার পর উহা সংশোধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মসজিদের সম্বন্ধে বাস্তবনি করা চলিবে কিনা ও চলিলে কি ভাবে চলিবে তাহা সিদ্ধান্ত করিবার জন্ত সেনিণ যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহা পত হইয়াছে। মুসলমানগণ সেই একই বুলি আঙড়াইয়াছেন যে প্রত্যেক মসজিদেই দিবারাজ প্রার্থনা করা হয় সে জন্ত মসজিদের সম্বন্ধে কোন সময়েই বাজনা বাজান চলিবে না। বলা বাহুল্য যে হিন্দু-তোমার একবার সম্মত হইতে পারেন নাই। অগত্যা লর্ড-লিটন বৈঠক ডাকিয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট এদেশকে চিন্তা করিয়া যাহা হউক একটা সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়াছেন। এখন সিদ্ধান্ত কিরূপ হয় তাহা দেখিবার জন্ত আমরা বাত রহিয়াম তবে লর্ড-লিটন যে সম্ভাব্য বিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব করিবেন না তাহা আমাদের বিশ্বাস আছে।

মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন সাহেব একজন প্রসিদ্ধ দ্বন্দ্বিতা মুসলমান বংশেই যুগের সময় হইতেই তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দেশসেবার পন্থা পালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে রাজ পথে বাস্তবনি করা বা শোভাযাত্রা বাহির করা যজ্ঞসেবের পক্ষে অবমাননা হুচক নহে এবং এই সকল কার্য করিবার অবিকার প্রত্যেক প্রজাই আছে। শুধি আমোলন লক্ষ্যে তিনি জানাইয়াছেন যে এই প্রকার কার্যে প্রত্যেক দ্বন্দ্বিতা বিশেষ এবং এই কার্যে হিন্দুদের পূর্ণ অবিকার আছে। মৌলভী সাহেবের স্মৃতি গভী উক্তির জন্ত আমরা

তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। সর্গীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে ধর্মের প্রকৃত মাধ্যম উপলব্ধি করা যায় না তাহা মৌলবী সাহেবের উক্তিহেই পরিষ্কৃত—তবে বর্তমানে এই সাম্প্রদায়িকতার অন্তরালে রাজনৈতিক দুর্ভাবাক্ষা বিঘ্নমান থাকায় এই সরল সত্যটুকু মুসলমানগণ স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না।

কৃষ্ণনগরের তরুণ সভায় সভাপতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ উপগ্রহনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসব্দ যে একজন সভাকার তরুণ এবং অকৃত্রিম দেশ সেবক তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কৃষ্ণনগরবাসীগণ উপগ্রহনাথকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে যোগ্য সম্মানই দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা যাহা শুনিতে পাইব তাহা মামুলী ভাষা ভাষা বক্তৃতা নয় তাহা বাস্তবীকরণের বাণী। আপামী সম্বন্ধে এদেশকে বিবৃত আলোচনা করা যাইবে।

কয়েক বৎসর হইতে একজন ভারতীয় রাশায়নিক এদেশে 'বর্ধাতি' কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি সফলকাম হইয়াছেন। পরলোকগত চিত্তব্রত দাশ মহাশয়ের চেষ্টার ধারাই এই ভ্রম লোকের এই প্রচেষ্টা। স্বয়ং সম্পন্ন হইয়াছিল। সরকারের হিসাব পুস্তক হইতে আমরা নিম্নে যে হিসাব প্রদান করিলাম তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে, কি পরিমাণে বর্ধাতি কাপড় প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ওয়েল ব্রথ, ছাতার কাপড়, ক্যামিস প্রভৃতি ত আছে। বৎসরে ১৫ হাজার ৮ শত ৬০ টাকার ওয়াটারপ্রুফ পোষাক অর্থাৎ বর্ধাতি ভারতে আমদানী হয়—তদুপাধালায় ২০ হাজার ৩ শত ৫৫ টাকার মাল আইসে।



৮ শত ১৫ হাজার ৪ শত ১০ টাকার অয়েল রূপ ভারতে  
আইসে। বাঙ্গালা দেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ২২  
টাকা।

ছাতার কাগড় ভারতে ৮২৫৪১১০৮ টাকা এ বাঙ্গালায়  
—৫৩৪১৮২৫ টাকা মোটর গাড়ীর আঙ্গারদের জুড়  
ক্যাথিস—৩১২০৫০ টাকা তৈয়ারী ছাতা—২৬৭৩৮৪  
টাকা।

উপকাজ কয়েকটি দফা ছাড়া অস্ত্রাত্মক খুঁচরা ব্যবসেও  
এ প্রকারের বর্গাতি কাগড় অনেক এদেশে আসিয়া  
থাকে। পোষ্টালিসের ও সেন্ট্রালিসের ব্যাগের জুড় তালু  
থাকে।

জুড় অনেক তেরপল, ক্যাথিস প্রভৃতি আসিয়া থাকে।  
মোটের উপর বৎসরে প্রায় ১০ কোটি টাকার বর্গাতি  
কাগড় এদেশে আইসে, রসমাথে শুধু বাণালায় ৫ কোটি  
টাকার কাগড় বিক্রীত হয়। এই কাগড় যদি দেশীয়  
বৈজ্ঞানিকগণ এদেশে বৈহয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতে  
পারেন, তাহা হইলে বৎসরে ১০ কোটি টাকা বিদেশে  
পাঠাইতে হইবে না। শ্রীযুত মনোরঞ্জন ঘোষ নামক  
জনৈক বাঙ্গালী যুবক বর্গাতি কাগড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা  
করিয়া কয় বৎসর পূর্বে চিত্তরঞ্জনের সাহায্যে ৩০০০  
রসারোড সাউথ ভবানীপুরে একটি কারখানা স্থাপনা-

হিলেন। তথায় এখন প্রচুর পরিমাণে বর্গাতি কাগড়  
প্রস্তুত হইতেছে। এই কারখানার নাম শ্রীমানলা ডাইও  
ওয়াটার প্রক ওয়ার্কস। আচার্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়  
প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকরা মনোরঞ্জন বাবুর কারখানার  
বর্গাতি কাগড়ের প্রশংসা করিয়া থাকেন। একটি বিলাতী  
বর্গাতি পোষাকের দাম যে স্থলে ১ শত টাকা, একটি  
কোট পোষাকের দাম সে স্থলে মাত্র ৩০ টাকা। একবার  
থারাপ হইয়া গেলে তাহা কারখানার পাঠাইবারাজ কয়েক  
আনা পারিশ্রমিক দিলে আবার নূতনের মত হয়।

(দৈনিক বহুমতী)

গত বৈশাখী পূর্ণিমায়া স্থপরিচিত সাহিত্যিক বঙ্গবর  
শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বহর সহিত স্বদেশিকা হুমারী  
বেহমতী নিম্নের শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। এই কবি-  
সম্মিলনের মঙ্গল যোগা বিশেষত্ব এই যে এক ঘোড়া রানী  
এবং একখানি চেলী ছাড়া কস্তাপক্ষে কাছ হইতে আর  
কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। আঙ্গালকার বাজারে  
উচ্চশিক্ষিত যুবকের এই আর্থ প্রশংসনীয় ও অহংকরী।  
শ্রীজগদানন্দ বিদ্যাপতিকে হুণী করুন এই আমাদের একান্ত  
কামনা।

## বাঁচাও প্রভু

শ্রীমতী মেঘমতী বসুজায়া

তোমার এই জগত হ'তে  
বাঁচাও প্রভু বাঁচাও মোরে !  
আমার বলে বাহা আছে,  
সকল ভুলি লগণো হ'রে !  
নিশিদিন কালাতোতে  
মনের মানি ধাওণো ঘুরে ;  
নিশিদিন গোপন পথে  
বুকতে দাও চরণ ছুঁয়ে ;  
আমার ভলস আমার বেদন  
ভলস তোমার হৃদি করে ।  
তুমি এই জগত হ'তে  
বাঁচাও প্রভু বাঁচাও মোরে ।

আবার আশায় নিয়ে চল  
কখনোই অসীম দেশে,  
আবার আশায় গ'ড় তোল  
শুভতা আর দীনের বেগে ;  
নিশিদিন নদীর মত  
ছুটবে আশি বহুহারা ;  
নিশিদিন অবিরত  
ঢালবে আশি গানের ধারা ;  
আমার চলায় আমার বদায়  
স্বরের নেশা উঠুক ভরে ।—  
তুমি এই জগত হ'তে  
বাঁচাও প্রভু বাঁচাও মোরে ॥

## সন্ধ্যার যাত্রা

শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেশ বৃকতে পারুচি, বসন্ত বিদায়  
নিচ্ছে। সামনের ভয় শিরীষ গাছটার ফুলগুলি রান  
হ'য়ে এসেছে ... পুষ্পভরণ থলে ফেলে বৈরাগী-বাসন্ত  
আজ স্বরা-পাতার রথে বিদায়-যাত্রা শুরু করেছে।

এবার কখন যে কাঁলঙণের ফুল-ফোটা সারা হ'য়ে  
গেল, আমি তা জাবাবর অবকাশই পাই নি। এবারে  
বসন্ত আমার প্রহর প্রাণের অভিনন্দন পায়নি, শুধু রোগ-  
জীর্ণ বৃকের শীর্ণাঙ্গ নিয়ে ফিরে গ্যাছে ... আমার  
বসন্তের অবসান আজ ভিন বছর আগে হ'য়ে গ্যাছে,  
বেদিন চিত্তার হাতখানি পরাগের হাতের উপর রেখে  
বলেছিলাম—“চিত্রাকে তোরাই হাতে সঁপে নিশ্চিন্ত হলুম  
পরাগ, আমি জানি তুই এর মধ্যাধ্যা বুঝবি—”

মনে পড়তে শরৎের সেই শিখ সন্ধ্যাটা, পরাগকে  
বেদিন চিত্রাদের বাড়ীতে প্রথমে নিয়ে যাই—চিত্রার গান  
সোনাবার উপলক্ষ্যে। ডুবির ক্রমে পরাগকে বসিয়ে  
চিত্রার সন্ধানে গিয়ে বললুম—“পরাগ বসে আজ গান  
সোনাবার জগ্জে—”

চিত্রা কৌতূহলের স্বরে জিজ্ঞাস করল—“কোন পরাগ-  
বাবু—আটিষ্ট ? এ মাসের ‘মালকে’ ‘শিল্পীর কল্পনা’  
ছবিটা বুঝি ওরই কাঁকা ?”

বললুম—হ্যাঁ, তিনিই বটে। ভারি আগ্রহ করে  
এসেছে—“চিত্রা রাগ করে বললে—‘রোজ রোজ তুমি  
ভত সব লোক ছুটিয়ে আনচ—আর আমি তাঁদের বসে  
বসে গান সোনাই—কাজকর্য বেনে কিছুই নেই আমার—”

কিন্তু তার কাণ্ডগুলি তলায় যে একটি গোপন খুঁচর  
স্বর বেজে উঠেছিল, আমি তা'র পেয়েছিলাম। চিত্রার  
সঙ্গে পরাগের আলাপ করিয়ে দিয়ে তাকে হেসে বললুম—  
“চিত্রা তোরা ছবির ভারি ভক্ত—”

পরাগ স্মিতমুখে ঠাড়িয়ে উঠে নমস্কার করলে।  
চিত্রা মুখ রাঙা করে প্রতিনন্দন করে বললে—“আপনার  
ছবি তো নানা পত্রিকাতেই দেখি—”

সেদিন পরাগের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে চিত্রার টেট  
দু'খানি অকারণ কেঁপে উঠেছিল, চোখের পাতা ছ'য়ে

পড়ছিল আর পরাগের মুখে ফুটে উঠেছিল রূপমুগ্ধ শিল্পীর  
তন্ময়তা। অনেকগণ গান-গল্পের পর পরাগ বিদায় নিলে  
পর, চিত্রা আমার বললে—“দীপনাবা! তোমার বহুটা কিন্তু  
চমৎকার মিত্তক পোষা—”

বাস্তবিক, চমৎকার ছেলে এই পরাগ। হুহ বলিষ্ট  
চোরা, তরুণ মুখে প্রতিভার দীপ্তি, ধন-মান কোন  
কিছুইর অভাব নেই ... ওরই পাশে চিত্রাকে মানার।  
আমার এ দীনতা রিক্ততার মাঝে কোন স্পর্শইর আমি  
তাকে টেনে আনব ? তার দীর্ঘ পূজারতি হবে শুধু  
আমার নিছত অন্তর-মন্দিরে ...

মনে মনে ভাবলুম ওদের দু'জনের মিলন ঘটাব—  
নিজের ব্যথা-কৃত বৃকের দিকে না চেয়ে।

কাঁলঙণের এক মাধবী রাতে যখন তাদের দু'জনের  
হাতছুটা মালার ভোরে বাঁধা পড়ল চিত্রা-কীরনের মত,  
আমার বেদন-রাঙা প্রাণ তখন জ্বলধনি করে উঠেছিল  
... আমার সকল ব্যথা অপকল্প শোভায় ফুলের মত  
ফুটে উঠেছিল। তারপর গভীর রাতে বরষা বধন বাসে  
চুকল, সারা উদ্ভব-মুহুরে বাড়ীটা ঘুম-সুখীর মত নিভর  
হয়ে পড়ল, কে জানে কেন তখন আমার নিহিরা চোখ  
ছুটে গেলে একটা সন্মল হাহাকার বেরিয়ে আসতে  
চেয়েছিল ...

কিন্তু আপন হাতে যে আশার স্বহৃদী বৃক্কাচ্যত,  
করেচি, কি হবে এখন তার স্বরা-পাপড়ীগুলি ফুটিয়ে ?

শান্তি-কাতাল মনটাকে একটু শান্তি দেবার আশায়  
এই একলা নির্জন প্রাসাদে এলুম, কিন্তু তবু তো অতীত  
স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পাই না। ওই কে বাঁশী বাজাচ্ছে  
না ? একটা চেনা গানের উদাস করণ স্বর ভেসে আসচে—

“হেলা খেলা সারা খেলা খেলা আপন মনে।  
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে—”  
বাগিসে ভর দিয়ে জানলার ধারে এসে বললুম। ঘুরে  
পাছাড়ের আঁড়ালে আহত সেনার মত রক্ত-রাঙা রবি  
চলে পড়েছে। সন্ধ্যার পাখী নীড়ে ফিরছে। আমারই  
ঘরের স্বপ্নের রাঙা কাঁকরের পি দিয়ে দলে দলে বাছো-



মস্তকানী লোকেরা বেড়াতে বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের হাসির উজ্জ্বল স্রোতে পাচ্ছি। কি সুখী ওরা! সকলেই প্রাণের উল্লাসে তরঙ্গিত।

পথের ধিক্কা হুটী তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল। মেয়ে-টার পরনে মধুরকণী শাড়ীখানি পড়ন্ত বোধের আভাস স্বলম্বল করছে। গল্প করতে করতে তারা এগিয়ে আসছে ... এ যে চিত্রা আর পরাগ! রজনীগন্ধার মত চিত্রার লাবণ্যমাধা মুখখানি আনন্দোজ্জ্বল, পরাগের মুখখানি হাসিতে লীল! আপন মনে গল্প করতে করতে তারা

চলে গেল ... তুমি যে সুখী হচ্ছে চিত্রা, এইটুই আমার জীবনের বেলা-শেষে পরব মাখনা!

ভাষাগম্ভীর তিমিরাকুলের ছায়া ঘনিয়ে আসছে ...  
আঃ মাগো, তোমার সের-কোমল মুখখানি আজ বারে বারে মনে পড়ছে ... আমার সমস্ত প্রাণ আতুল স্বরে বলে উঠছে—

“সন্ধ্যা হোল গো—

ওমা সন্ধ্যা হোল বৃকে ধর,  
অতল-কালো মেহের মাঝে  
চুঝিয়ে আবার স্বপ্ন কর।”

## ব্যুৎপত্তি না বিপত্তি?

সাহিত্য সাধনা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ব্যাপবেশে অনেক নবীন সাহিত্যিক বিষম বিপত্তি ঘটাঁইয়া বলিতেছেন। ইতিপূর্বে একাধিকবার আমরা এ সম্বন্ধে নবীন লেখকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম—কলে কিছুই হয় নাই—নিম্নে হুঁখানি অভিযোগ পর মুজিত হইল—পাঠে সাধারণ সমস্ত অবগত হইলেন। এই হুঁইটা ছাড়া গত সংখ্যা নবযুগে ‘প্রতিপাত’ লিখক যে কবিতাটী শ্রীমণিদয় মুখোপাধ্যায়ের নামে মুজিত হইয়াছে—তরুণ কবি কটিকচন্দ্র বসু্যোপাধ্যায় উহার লেখক বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং তাহা তিনি প্রমাণ করিতে পারিবেন এমন কথাও বলিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বেনামহার-গণের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিতেছি; যদি সম্ভবমত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাই তবে বন্ধিৰ অভিযোগ সত্য এবং ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর লেখক সৌধিকার রচনা (না প্রবন্ধনা) নবযুগে মুজিত হইবে না। উপরন্তু নবীন লেখকগণের রচনা অন্তঃপর আমাদের পরিচিত কোন সাহিত্যিকের মারফৎ না পাইলে অর্থাৎ রচনা সন্দেহ নিঃসন্দেহ না হইলে আমরা নবীন লেখক লেখিকাদের রচনা প্রকাশিত করিব না। এমনও অনেক অভিযোগ আমরা পাইয়াছি যে, পুরুষের রচিত কবিতাকে কোন কোন মহিলা স্বহস্তে নকল করিয়া নিজস্ব বলিয়া প্রকাশ্যে আমাদের নিকট পাঠাইয়া থাকেন—ভবিষ্যতে এরূপ সম্ভেদ-সম্বল রচনাও প্রকাশিত হইবে না।

ঐতিহাসিক হুয়ার লিখিতছেন :—“আপনার ১১ই

বৈশাখের ‘নবযুগে’ ‘পুরাতন স্মৃতি’ কবিতাটী পড়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হনুম। কে একজন “অলকাদেবী”এর রচয়িত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন, অথচ কবিতাটী আমার লেখা আর আবিস্কার হ’লে আমি তা প্রমাণ করতে পারি। আমার আরও একখানি কবিতা কোন এক প্রসিদ্ধ মানিক পত্রে অস্ত্রের নামে বেরিয়েছে, কোন কারণে আমি তার প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু এবার প্রতিবাদ না করে পারছি না। অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে—অপ্রকাশিত রচনা অস্ত্রকে পড়তে দেওয়ার এই হল। সে যা হোক, অপরের লেখা নিজের নামে ছাপানার সৌধৰ অপেক্ষা দীনতা যে কত বেশী আশা করি এই ভক্ত মহিলাটী অল্পভব করতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বিরত হবেন।

শ্রীমণীমা সেন লিখিয়াছেন :—“দহাশত, গত মাঘের ২৫শ সংখ্যার নবযুগে প্রকাশিত ‘মানিক’ গল্পট দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। এ লেখা আমার। আমি এ গল্প ছদ্মক হইতে ‘মানসী’ ও মধুবাদী’র জন্ত পাঠাইয়াছিলাম—মানসীতে মাঝে মাঝে আমার গল্প প্রকাশিত হয় বলিয়া এই গল্প সম্বন্ধেও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়ের নামে এ গল্পট কিরূপে প্রকাশিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না।

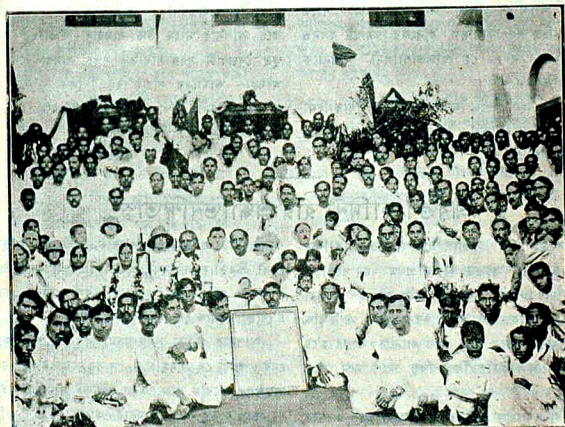
আপনি কি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন? অথবা অল্পহৃদয়পূর্ণক বিমলকান্তিবাণকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন?”



দ্বিতীয় বর্ষ ]

১৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩, ইং ২৯শে মে ১৯২৬

[ ৪১শ সংখ্যা ]



কবি শ্রীবল্লভ কামিনী রায় ও বৈষ্ণবচাঁটার যুবক সমিতির সভাপতি



## বৈষ্ণবাচারী যুবক সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত কামিনী রায়কে প্রদত্ত অভিনন্দন

ছয় সপ্তাহ মধ্যে মাণ্ডুয়া শ্রেষ্ঠ যেমন মনুষ্য বসন্ত, বিধবাদের মধ্যে সর্বাঙ্গ শ্রেষ্ঠ যেমন মনুষ্য কোকিল; সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ যেমন পৃথিবীর চন্দ্র, বসন্তের মহিলা কবিত্বের মধ্যে কবিত্ব শ্রেষ্ঠ তেমন আপনায় কাব্য। হে আর্থে, আপনাকে আমরা মনস্কর করি।

গাঙ্গী বৈষ্ণবীর প্রাচীন ও পবিত্র লেখনীর যোগ্য উত্তরাধিকারিণী আজ আপনি। বঙ্গভাষার নবগুণ আপনায় অপূর্ণ-বর্ণ-তুলিকা "আলো ও ছায়া" সম্পাদিত যে উজ্জল চিত্র অঙ্কন করেছিল, রসিকের চিত্রপটে কখনও তা মলিন হবে না। হে প্রতিভাশালিনী আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

আপনার মহাভীষায় অতীত ভারতের পূণ্যকামিনী তখন আমরা ধ্বংস হয়েছি। আপনার বিচিত্র রাসগীত ২১শে মার্চ ১৯১৫।

## শ্রীযুক্ত কামিনী রায় শ্রদ্ধাভিনন্দিতাস্তু

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে সায়াল কোম্পানীর প্রকাশিত 'আলো ও ছায়া' আমার হাতে প্রথম যখন পড়েছিল তখন আমার চ-বছর বয়সে। এই বইয়ের কবিতা বোম্বার বা তার ভাব গ্রহণ করবার মত জান-বুদ্ধি তখন আমার হয়নি। শুধু তার ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে কোনো কোনো কবিতার কিছু কিছু অংশ মনে গেঁথে নিয়েছিলুম।

'আলো ও ছায়া'র কবিতাগুলির মর্ম গ্রহণ করবার ক্ষমতা এখন হ'লো, তখন বয়স কখন সে যুগের বড় কবি হেমচন্দ্র বলেছিলেন যে, এই বইয়ের কবিতাগুলি পড়ে স্থল বিশেষে তাঁর হিমাশ্রয় উদ্ভেদ হ'য়েছিল। বার বার সেদিন এই কথাই মনে হ'য়েছিল যদি কোনদিন আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পাই তো ধ্বংস হব। সেদিন আজ এসেছে। আপনি ছাড়া বাড়লার আর যে তিনজন মহীয়সী মহিলা

লীলারিত গতিতে বর্ধমানের আশা ভাষা ছন্দিত হয়ে উঠেছে। আপনার স্বর, স্বরধ্বনির অনাহত স্রোত অনাগতকেও বহন ক'রে এনেছে। হে ত্রিকালদর্শী কবি আপনাকে আমরা বরণ করি।

বাংলার নব জাগ্রত জাতীর সঙ্গীতে, উপেক্ষিত অস্ব-পুত্রও যে মৌনরক্ত অবলম্বন ক'রে থাকেনি, আপনার কাব্য গাথাই তার জলন্ত নিদর্শন। বিশ্বসত্য আপনি অক্ষয় স্বর্ণ লাজ করেছেন আপনার অমর সৃষ্টি আজ বাস্তবায়নের পথে নিমি। তাই সমগ্র দেশে সমগ্র জাতির কণ্ঠে আপনার নামে উচ্চ সামবার উচ্চারিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র বৈষ্ণবাচারী যুবক-সমিতির সভ্য আমরা—সেই সঙ্গে আদরাও আমাদের সাগ্রহ বর্ধ মিলিত ক'রেতে চাই। হে প্রিয়বাসিনী দেবি, এই কুজ অভিজ্ঞান পত্র গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থিত্ব করুন।

যুবকসমিতির সভাপতি।

কাব্যরসায় প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছেন, শ্রীমতী বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়দর্শনা দেবী তাঁদের সকলকে ধনিতভাবে জানবার পরম গৌরব আমার হ'য়েছে। আজ সে গৌরব গর্ব হ'লো।

আপনার কবিতা সমালোচনা করবার পক্ষী আমার নেই। আমি যে সমুদ্রভিত্তিক, সে সব অস্তরের ভিত্তির সঙ্গে অশ্লীলন ক'রেছি আজ কেবল এইটুকুই জানাতে চাই।

আপনি এক সময়ে আপনার কোনো কোনো কবিতা লেখতে বলেছিলেন "অনেক দিনের বাসি ফুল পাঠ-পাঠিকার কোনো হৃদয় পাইবেন কিনা জানিনা।" আপনার সে উক্তির আজ প্রতিবাহ ক'রাই। বাসিফুল সে নয়—তার রেণুতে রেণুতে যে যুগ্ম সিক্ত ছিল আজও তা জ্বর মনের রূপিণীসাত্বস্থ ক'রছে। তাই বৈষ্ণব সৌন্দর্যের শেষ নেই।

আপনার ভাষাতেই বলি—

"যে দেশে আছিল তোরা সৌন্দর্যের শেষ নাই

জরা সেথা শিশু-বউবন

পুৱাতন নাহি দেখা নুতনের চিরলীলা

জীবনের জনক মরণ

সরিতে নুতন নীর ফুলবনে নব ফুল

যদি যবের শিশুদের হাস

মানবের হিয়া মাঝে উলিছে নুতন আশা

যেমন বরষা দিন যায়।"

আজ থাৱা হিন্দুসম্প্রদায় সমস্তার জটিলতায় জড়িত, গান্ধী তাঁদের ক'ল্পন অস্তরে এমনি ছুঃ অছত্ব করেন। প্রাণ-পাজীর নির্ভাচনে কর্তৃপক্ষের শাসন ও সিদ্ধান্ত চরম হয়না, তাদের নিজেদের চরনের উপর নির্ভর ক'রলে তা কল্যাণকর হবে এই বিশ্বাসে তর্কবিতর্ক এখন তিনি তখন আপনার হিন্দুর কথাগুলি মনে পড়ে।

মাশিমা ভেবেছি আমি যে হবে আমার স্বামী

নিজে আমি বেছে নিব তাহ

বেছে কিনি থালা বাটী, নিজে বেছে লই সাটী

থালা ভাঙে সাড়া ছিঁড়ে যায়,

যে আমার স্বামী হবে, চিরদিন স্বামী রবে

বিবাহ তো ঘূষবার নয়

যারে বেছে দিবে পরে মনে যদি নাই পরে

সাধিত্রীর মত যদি হয়

আগে আমি কোন্ জনে বরিহাছি মনে মনে

বরমালা দিব কি অপর?

যেদিন রাজে মথুরার ঠেপনে প্রথম পৌঁছাই এবং পরদিন যুগুদ্যানের আনন্দের কল্পনায় মন জাগ্রত থাকে, যুগ্ম দেবার আগে আপনি তার যে কল্পনা ক'রেছিলেন সে রাতে কেবল তা আবৃত্তি করেছিলুম, তার স্বর, তার স্বরার, তার ললিত রচনা আজও আমার প্রাণে বাজছে—

তার কুলে কুলে বৃষ্টি বহুল তমাল

করে ফুল ছায়া দান

তার জলে জলে ছুটে প্রেমের স্মিতি

কল্লোলে বিরহগান

যথা সমীর হিলোলে বাজে বা বীশ্বরী

পরশ উদাসী করা

যেথা বিশ্বের আলো গোপনিলি কোমল

আধার কোমলী ভরা

বৃষ্টিবা চিরদিনই আমার প্রাণ এরি ধ্বনিত ভরপুর

থাকবে। আপনার কবিপ্রাণ সবধিক দিয়েই পূজের ছন্দে

ছন্দে এমনি মাণ্ডুয়ার পরিচয় দিয়েছে—

জগতের অন্তঃপুরে, নব বধূতার মত

ভালবাসা যত পড়ে করে বিচরণ

পশিলে আপন কাণে আপনার যুগ্মীত

সরমে আকুল হয়ে মরে সে তখন

আপনার ছায়া বেধি দূরে দূরে সরি যায়,

অমৃতে অমৃতে ফুল ফুটে তার পায় পায়।

কিন্তু এই ভালোবাসা, আবার সমগ্র মানবকে যখন

আলিঙ্গন করতে চায়, তখন এক লজ্জা হেঁই, সঞ্চোৎ হেঁই

তখন তার সৃষ্টিত হ'য়ে থাকবার আর উপায় নেই, তাই

আপনি বলেছেন—

ওহে দেব, ভেদে ভেদে ভাঙা ভীতির শৃঙ্খল

ছিঁড়ে মাও লাজের বন্ধন

সমুদ্র আপনাদের দ্বিই একবারে

জগতের পাত্রে বিসর্জন।

আপনার নিঃস্বার্থ মহান প্রাণ তাই তিরস্কার ক'রে

ব'লেছে—

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে

পায়ে না মুছিতে নমন ধার?

পরহিত ব্রত পায়ে না রাখিতে

চাপিয়া আপন বিধাভার

আর প্রচার ক'রেছে প্রেমের সেই অমৃতময়ী বাণী

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি

এ জীবন মত সন্নিহিত দাও,

তার মত স্বপ্ন কোথাও কি আছে

আপনার কথা ভুলিয়া যাও

আপনাকে ল'য়ে বিব্রত রহিতে

আপো নাই কেউ অবনী পরে

সকলের তরে সকলে আবার

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।



মধুকাবে নয়, নাট্য সাহিত্যেও আপনার বশ মধু প্রতিকূলিত হয়েছে। আপনার 'সিঁতিমা' রঙ্গালয়ে অভিনীত হ'য়েছে—আপনার 'অখা' এই সেদিনও অভিনয় সাকল্যলাভ ক'রেছে। তবে এই নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দিনেও 'অখা'র অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হ'য়েছি।

এই সন্ধ্যা সময়েও বিশেষ এই সভার মধ্যে আপনার রচনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কিছুই বলা হ'লোনা, তবে যে চেষ্টা ক'রেছি সেইটুকুর জন্তেই মনে মনে কৃতার্থ হ'জি। সামান্য জিনিষও যে সকলের সামনে ধরার লজা নেই, এক সপ্তাহ আগে আপনার 'শিশু'র কবিতা পড়ে সে জ্ঞান লাভ ক'রেছি—

আছে কিনা আছে গন্ধ। কিবা আসে যায়

যা গেরেছ ঘেবেছ তা বেবতার পাথ,

তাই করে মানবের আনন্দ বিধান।

বর্গ গন্ধ রূপ রস হাসি অঙ্গ গান

যার যাহা আছে, আছে যতটুকু পানি

কিছু ব্যর্থ নহে, যদি নিবেশিতে আমি।

কিন্তু শুধু এই করণ লনিত স্বই আপনি বাজান নি। আপনি যে অলঙ্কারমালা বাগীর মধ্যেও চিত্তকে প্রস্তুত ক'রেছেন সেইটুকু জানিয়েই আমি আমার কথা শেষ ক'রবো। এই নারী-জাগরণ ও নারী-নিখাদনের দিনে তার সার্থকতা আছে—তার বহুল ঘোষণা হওয়া উচিত।

আপনার কোবিন্দ বা'লেছিল 'ভূঙ্গী'র রমণী প্রত্যয় কর'না তার'

কিন্তু আপনার দেবযানী বলেছিল :—

কথা নাই রমণীর তরে

যে পাপের, সেই পাপ করি, চিরদিন

অসম্যত পুরুষ, সে বৃষ্ট লজ্জাহীন,

অকৃত্রিম রহে স্বখে এই পৃথিবীতে;

ভুতিতারে বাখনিয়া, চাহে তা দেখিতে

কেবলি নারীর মাঝে। নারী ভারে ক্ষমি

করে নিজ সর্সনাশ, তার পায়ে নমি।

পুরুষ প্রবৃত্তি-পরে না লভিল জয়

নারীর সতীত্ব রবে? হোক সে নিদ্রা,

হোক ক্রোধে অমিশ্রা, হোক ক্ষমাহীন,

দেখিবে, এ নরকুল শুভ হয় কিনা।

নারীকে সোধেন ক'রে আপনি বা ব'লেছেন তাতে

জবাবের বক্ত চকল হয়ে ওঠে—

“নারী জীবনের জীবন যে মান

সেই মান, সেই সর্বশ্রম যায়

তিনি, একদিন চলিত অচল

তোদের স্বপ্ন তুলেনা তার?

পুরুষেরা আজ পুরুষত্বহীন

সচল যুগের পুতলী নারী

সজীব যে তারি মান, অপমান

গৌরব, সাংস, বীরত্ব তাহাই

সীতা সাবিত্রীর জন্মে পাবিত

ভারতে রমণী হারায় মান,

তিনিয়া নিশ্চিন্ত রয়েছিল সব

তোদের সতীত্ব শুধু কি ভাগ?

রমণীর তরে কাঁদেনা রমণী

লাজ অপমানে জলে না হিচা

রমণী শকতি অস্থির দলনী

ভোরা নিরমিত কি নাহি দিয়া?

কৈঁদে বদু দিয়া পিতার চরণে

“অত্যাচারে এক ভগিনী মরে”

বদু ভ্রাতৃ পাশে কি করিছ তাই

ভোমাদের বাহু কিসের তরে—

বলিবি পুত্রেরে প্রাণেশ আমার

পাকে যদি প্রেম পত্নীর ঘরে

দেখাও জগতে দুহিতা শাসন

সতীর অন্নান কেনে কেনে কর’

ভারতে অস্থির করে উৎপীড়ন

বীর, বীরনারী ভারতে নাই—

দশাশনজ্ঞা, নিশ্চলনাশিনী

মোর অন্তর্যে মরিয়া যাই

কে আজ নীরবে রয়েছি দেশে?

কায় ভার, পতি মগন স্বখে?

রমণীর স্বর গৃহভেদ করি

হউক ক্ষনিত সপত্র ভূমে—

পূজ্যাপন সভাপতি মহাশয়, কল্যাণীর বৈজ্ঞাতারী বৃক সমিতির সভাপণ, আজ এখানে আপনাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া আমি নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিতেছি। কিন্তু এইটুকু বলিলেই আমার সবটুকু মনোভা প্রকাশিত হয় না। আমি নারী এবং মাতা। বশ এবং সখান কোন নারীরই চরম লক্ষ্য নহে। উহার নারীস্বপ্নে পূর্ণত্বস্থি দিতে পারে না।

আমি এক সময়ে লিখিয়াছিলাম “বশ: আমি চাহি নাই, চেয়েছিছ স্বপ্ন, চেয়েছিছ একখানি শান্তি ভরা শেখ, নহে সভা সমিলনে সহস্র চক্ষের দৃষ্টি।” স্বস্ত্য: সভা-সমিলনে উপস্থিত হওয়া চিরদিনই আমার কাছে একটা কঠিন ব্যাপার বলিয়া অস্বস্ত হইয়াছে। এখানে যদি কেবল অভিনন্দন লইবার জন্তই আসিতে হইত হয় তাহা আসিতাম না। বাহারা আমার কবিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমি তরুণ বয়সে যৌবন তপস্যা লিখিয়াছিলাম। যৌবন যে কেবল দেহের বস্ত্রই নহে আত্মার অন্তঃপুরে তাহার নিবাস এই পরম সত্য একদিন স্বপ্নে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতে তাহারই তপস্যা স্থখে দুখে শাশন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তরুণদের স্বপ্ন দুখ আশা উভয়ের সঙ্গে সহায়ত্বের যোগ রক্ষা করিতে না পারিলে আত্মার অন্তঃপুর হইতে যৌবন অলক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন লিখিয়াছিলাম—

তখন স্বপ্নগুলি নিকটে আসিবে যবে  
আমারে বরজ-ভাবি আশার স্বপন ক'রে,  
নির্দাশ প্রাণী যার—কেই যদি থাকে কেন  
বিধাতার আশীর্বাদে ধোয়া আলো পায় যেন  
হাত পায় ধরিয়া ধাঁড়াতে।

তাই পরিণত বয়সে যখনই তরুণদের আশ্রয় আসিয়াছে, আমার মাতৃ-স্বপ্ন অতি কষ্ট ভাবে হইলেও তাহাতে সাড়া দিয়াছে। উদ্ভতবাক্যের শেষ অংগের আকাঙ্ক্ষা জীবনে সার্থক করিতে পারিয়াছি এত বড় দৃষ্টের কথা বলিতে পারি না। তবে যে বিশ্বমননী মাতৃ-স্বপ্ন দিয়া আমাকে নারীরূপে গঠন করিয়াছেন আমার

স্বপ্নের ঐ আকাঙ্ক্ষাটুকু তাহার চরণে নিবেদন করিতে করিতে জীবন-পথে চলিয়াছি। আজ তাই বলিতে চাই এখানে সম্মান আহরণ করিতে আসি নাই, কিন্তু তরুণদের প্রভা ও সহায়ত্ব দিইয়া প্রাণের তাক্ষ্য পূর্ণজীবিত করিয়া লইতে, তাঁহাদের আশা উত্তম ও স্বর্ধনিতার সাক্ষ্যে আসিবা আমার স্বপ্নরূপে নব আশা ও উত্তম পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কাহাকেও ধরিয়া তুলিবার জন্ত হাত বাড়াইতে যেমন আনন্দ, প্রীতি ও সহায়ত্বকৃতিতে প্রসারিত অপরের হাতখানি ধরিয়া ধাঁড়াইতেও সেইরূপ আনন্দ। আমি সেই আনন্দ লাভের আশায় আসিয়াছি। আপনাদের অভিনন্দনের মধ্যে সেই সহায়ত্বকৃতির সবল হাত প্রসারিত।

গত ২৪৩০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে নূতন শিল্পরূপ দেখা দিয়াছে। লিখনের বিষয় ও ভঙ্গী পুরাতন প্রথা ও পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন রেশে নূতন পথে বাহির হইতেছে। চিন্তার গভীরতার চেয়ে ভাবার কোমলতা, ভাবের চেয়ে ভাবাটী, ভিতরের প্রাণ-শক্তির চেয়ে বাহিরের পরিচ্ছন্ন মনে হয় যেন তরুণদের মনো-হরণে অধিকতর সক্ষম।

তাই আশা ছিল আমি বৃষ্টি পুরাতন জীব গুপের মধ্যেই নির্দাশন লাভ করি। আজ এই তরুণ সময়ের সর্ধনা আমাকে সে আশা হইতে মুক্ত করিয়াছে। আজ কবির হেমচন্দ্রের আশীর্বাদ যেন নূতন হইয়া আমার মস্তকে বসিত হইতেছে। এই অভিনন্দন পত্রের প্রত্যেক প্রশংসাবাণীর আমি ধোয়া এমন কথা মনে করিয়া আমি উৎফুল্ল হইতেছি না। তরুণদিগের ভাবার আভিগম্যে যে স্বপ্নরূপতা, স্বপ্ন মমতা, যে স্বপ্নে প্রীতি ও নারীর প্রতি যে স প্রকাশিত হইয়াছে সেই সমুদ্র অত্বতব করিয়া আমি আনন্দলাভ করিতেছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। উপস্থিত সকলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।





“চোর”

ত্রিবাণাপাণি রায়

এক

সে আজ অনেক দিনের কথা। কিন্তু এখনো সেই ছবি আমার মানসপটে জলন্তভাবে ঝাঁকু রহিয়াছে। কালের স্বদীর্ঘ ব্যবধানও সে ছবির উজ্জ্বল বিন্দুমাত্র নিশ্চত হয় নাই।

পূজার ছুটির দীর্ঘ অবকাশ যাপনের জন্ত, এবং দিন দিন আমি ভর-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছিলাম বলিয়া সেই কারণেও আমার স্বামী আমাদের লইয়া মধুপুরে হাফা পরিবর্তন করিতে গিয়াছিলেন। “আমাদের” অর্থে আমি এবং আমাদের একটি মাত্র পুত্র বিজয়কে বঙ্গ। বিজয়ের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর। একটি মাত্র সন্তান বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে আদর দিতেন খুবই—কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিতে হইত আমাদের। যদিও তিনি জানিতেন পারিলে বিজয়ের সমুদ্র অভাবই পূরণ করিতেন। কিন্তু তাহার কাছে বিজয় খুবই ভালো নাহয়টি সাজিয়া থাকিত।

ছই

সামনের বারান্দায় পায়চারি করিতেছি। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। বারান্দার সমুখস্থ ছোট উজানটিতে তখন সবে মাত্র ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি নিশ্চলক মনে তাহাই অবলোকন করিতেছিলাম। এই

ফুলগুলির ফুটিয়া কী হয় হয়? তাহার সবটুকু আনন্দইত উপভোগ করে অপর। আজ তাহারা আমাদের অনাবিল আনন্দ দান করিয়া—আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া কাল করিয়া পড়িবে। এই পুষ্প জীবনে তাহার সার্থকতা কি? পরকে আনন্দ দান করা। এই “দান” করিতে পারার” আনন্দ টুকুই আমাদের পরম এবং বহন লাভ। এ আনন্দে যদি তাহারা আত্মহারা না থাকিত তবে প্রত্যহ চল চল শোভায় অতুল আনন্দে ফুটিয়া উঠিত না।

ওই যে সমুখস্থ প্রান্তরে বৃহৎকায় বটবৃক্ষটি নগায়মান রহিয়াছে, শত বর্ষা—শত শত শিলাবৃষ্টি—বাতাসঘাত উপেক্ষা করিয়া আপন ভেত্রে সমুদ্রত নীর হইয়া আছে, অপরকে ছাড়া ও আত্মীয় দান করা ব্যতীত, উহারই বা তরুজীবনের সার্থকতা কি? ভগবানের রাক্ষস প্রত্যেক সত্ত্বার মধ্যে ত্যাগের বিরাট মহিমা দেখিয়াও আমরা তাহা দেখি না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই থাকি। তাই সেই নীলাময়ের এই প্রজন্ম ইন্দিটুকু উপলব্ধি না করিয়া কেবলই স্বার্থের শিঞ্জন ছুটিয়া থাকি।

ফুলের পানে চাহিয়া চাহিয়া নানা চিন্তা-মাগুরে ভাগিরাছি এমন সময়ে বিজয় ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার ভীষ্মা চাকর

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা]

“চোর”

১৩৫৯

ছিল। বিজয় সাধ্য সমন শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল দেখিয়া আমার হৃৎ হইল যে স্বামীর জন্ত মাংস রান্না করিতে হইবে, আর বেড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না। আমি ঘরে ফিরবার উত্তোষ করিতেই বিজয় আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া বলিল—“মা-মণি! আমায় একটা জিনিষ দেখে?”

আমার এই ত্যাগী পরম্পরাকার ছোট ছেলের এমন হাসিই শবের আবেশন শুনিলেই আমি বৃত্তিতে পারিতাম যে কাহারও কিছু অভাব মোচনের জন্তই এতটা মিষ্ট ভূমিকার আড়ম্বর হইতেছে। আমি হাসিয়া বলিলাম—“কি চাই তোমার বিজু?” “আমায় একবার গরম দুধ দাওত! আর একটা পুরাণো কাপড় দিতে পারবে কি মা?” আমি ব্যাপার কি জানিবার জন্ত ভীষ্মের পানে চাহিতেই সে বাহা বলিল তাহার বর্ণনায় ইতরূপ—“একটা ভিগারী আধ তিন দিন অনাহারে, রাতারা পড়িয়া আছে এবং জরে তাহার সর্গশরীর কাপিতেছে। তাহার বাস করিবার স্থানটুকু পর্যন্ত নাই, তাহার পরিধেয় বস্ত্রপানিও একপ্রভাবে ছিন্ন বাহাতে তাহার সর্গ শরীর পর্যন্ত আচ্ছাদিত হয় না।”

নীয়েব সমুদ্রই শুনিলাম। কি করি? দুধ ঘরে বেশী ছিল না, যেটুকু ছিল—তাহারই বেড়াইয়া আসিয়া থাইবার কথা। আমি বলিলাম—“তুমি বেড়িয়ে এসে দে দুধ খাও, মাতা সেই দুধটুকুই আছে, এবারের দুধ এখনও দেয়নি।”

বিজয় শব্দবাক্যে বলিল—“সেই দুধই হবে মা। এক-কোলা দুধ না খেলে আমি মরে যাব না, কিন্তু তার অবস্থা যদি তুমি দেখতে মা!” বলিতেই তাহার সঙ্কিত এবং প্রাপণগত সখ্যত অশ্রু, বিন্দু বিন্দু আকারে তাহার মুখ-মণ্ডলে করিয়া পড়িল।

আমি তাড়াতাড়ি তাহার প্রাণিত দুধ ও বরত হিলাই, উপরন্তু আমার স্বামীর গায়ের একটি পুরাতন ছায়া আর একটি টাকা দিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটাইলাম। সে আক্লাদে নাচিতে নাচিতে আবার ভীষ্মাকে সঙ্গে লইয়া রাতারা ঘরির হইয়া গেল।

এখনেই আমার মাতৃ-দগরের বড়ই দুর্দলতা ছিল।

তাহার মুখে হাসিটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত আমার কিছুই অসমর্থ ছিলাম।

তিন

কিছুক্ষণ পরে সেই ভিগারীকে সঙ্গে লইয়া বিজয় এবং ভীষ্মা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কহিলাম—“কিরে, এক আবার বাড়ীর মধ্যে আনুলি কেন?” “বিজয় বলিল—“ও যে জাগাঘাটা থাকে মা, সেটা অনেক—অনেক দূরে। ভিকের নোভে আর পেটের হয়ে জ্বব গায়ে খুঁকতে খুঁকতে এত দূরে এসে পড়েছে। উঠতেই পারছিল না। দুপটুকু বেয়ে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত আসতে পেরেছে। আজ আর মা, ও এক পাও চলেতে পারছে না।”

এই পর্যন্ত বলিয়া বিজয় যেন একটি বৃত্তিতভাবে ভয়ে ভয়ে বলিতে লাগিল—“তাই আমি বলছি কি, রাতারা পড়ে থাকবে? তার চেয়ে আজকার রাতটুকু এখানে থাকুক না মা? আর মা, ভূমিত বেশ হোমিও-পাথিক ওষুধ জানো,—এক একটা জরের ওষুধ দেখে দাওনা মা?”

আনন্দে—পর্বে, আমার বয়স ক্ষীত হইয়া উঠিল, বৃত্তিবা চোখে জলও আসিয়া পড়িয়াছিল। “ভগবান! বিজয় কি আমার, বাঁচিবে?” এবং মুখে বলিলাম—“আজ, বৈঠকখানার পানের ছোট ছোট ঘরটি ওকে শুইয়ে দাও গিয়ে। আমি রাখতে যাকি, ওষুধের বাস্তু গুলে এক ফোটা একোনাট-৩× খাইয়ে দাও। বেশী রাখে যদি আমার খেতে চায় ত বসো, ফোটা জ্বলে দুধ-সাবু করে দেব তাই যেন যায়।” বলিয়া আমি প্রহ্নানোত্ত হইতেই ভিগারী ছেলেটি বলিল—“একটু অপেক্ষা করুন মা, আপনাকে একটা প্রণাম করি।”

সে আমার প্রণাম করিল। এই সময় ভূত্যা ঘরে সন্ধ্যার বাতি জালাইয়া রাখিয়া গেল এবং সেই আলোকে বারান্দাও আলোকিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম—তাহার বয়স খুবই কম। সন্তোষে আত্মারোহণ বেশী হইবে না। তাহার বয়সটি অতীত হৃদয় এবং গাজ বগের গাঁও। একটা ভক্ততার ছাপ তাহার মুখে স্পষ্ট প্রতিকলিত হইয়া







দীন, একে ধানায় নিয়ে যাও।" বিজয় তাড়াহুড়ি তাহার জনকের পরতলে পতিত হইয়া বলিল—“এবারটি ওকে ছেড়ে দাও বাবা। ধ'রতে পোকে ওর এ শাস্তির দারী আমিহি। আমি যদি ওকে বাড়াইতে না আনতাম, তবে রাস্তাতেই গড়ে থাকত। এখানে না এল ও টাকার আওয়াজ শুনতে পেত না, তাহ'লে ওর প্রাণে লোভের স্ফার হোত না। এক দিনের ভ্রম্তে আশ্রয় দিয়ে আমি ওর কী সর্লনাশ করলাম? হ'রত—এগুণর ওর ভালো হ'তে পারত—হ'রত ওর জীবনে কোনদিন সুরাধা আসত, উত্তরির আশা থাকত। কিন্তু ও আমি ওর কি করলেন বাবা? ওয়ে চির জীবনের মত 'দাঙ্গী' হ'য়ে থাকবে। এমন কি, ধাণে ধাপে, পাপের পথেই নেবে যাবে। এবারকার মত ভকে মাক করা বাবা, ধ'রতে গেলে ওর অংগশতনের মূল আমিহি।”

“ছেলোমহাশয়ের মুখে ওসব বড় বড় বুক্তি তর্কের কথা আমি শুনতে চাই না বিজু। তোমার অনেক অভাষ আযহার আমি রেখেছি কিন্তু তাই ব'লে এরকম বিলাসবাতক চোরকে তোমার কথায় আমি ছেড়ে দিতে পারিনে। যাও রামদীন, ধাঁড়িয়ে কেন—ভনুতে পাচ্ছে না?” স্বামী কোষ বিকম্পিত স্বরে এই কথা কয়টি বলিলেন। রামদীন মোহনের হাত ধরিয়া টানিল। সে শেষবার একটা মর্মভেদী দৃষ্টি দ্বারা বিজয়ের পানে চাহিল, আর বিজয় শুধু “ওঃ” বলিয়া মাটিতে গড়িয়া পেল!

“আমি চমকিত হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কালে লইতে গিয়া দেখিলাম ছেলে আমার একেবারে অজ্ঞান—নিশ্পান! আমি টাকার করিয়া বাখীকে বলিলাম—“ওগো ভনু? ছেলে কেনম হ'য়ে পড়ল দেখ। তুমি ওকে ছেড়ে দাও গো ছেড়ে দাও।” স্বামী নিজে ভান্ডার, উত্তরকণে তাহাকে গরীক্য করিয়া বলিলেন—“রাখার জল আর হাওয়া দাও খেলিগে সন্টটা নাকের কাছে” ধরো। ফেট হ'য়ে পড়ছে ভয়ে বিজুই নেই। বা ভয় আমার হ'য়েছিল—বুঝি বা হাটের ‘পালপিটের’ই বা হোস।” আধখটাটিক শুকবার পর বিজু আমার প্রকৃত্তি হইয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, স্বয়োগ পাওয়া

সঙ্গে মোহন পলাইয়া যায় নাই, অগল দৃষ্টি বিজয় মুখ পানে নিবন্ধ রাখিয়া তাহার মাখায় বাতাস দিতে ছিল।

### ছত্র

মোহন ত ছাড়া পাইল কিন্তু তার পরদিন হইতে বিজয়কে সে একেবারে ‘পাইয়া’ বলিল। প্রত্যং একবার কথিয়া সে আমাদের বাড়ী ডিঙ্গা করিতে আসিতে আসিত করিল। বিজুও প্রত্যহই টাকা সিকি আদুগি বাহাই আহার নিরুট হইতে আদায় করিতে পারিত, তাহাকে দান করিত। এক এক দিন বৈকালে তাহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া যাইত, আমি নিযেধ করিলে সে এমনি সমল চোখে আর কাতরভাবে আমার পানে চাহিত যে তৎকথাও আমি সমত শাসন প্রণালী তুলিয়া দিয়া তাহার ইশির কার্যের অম্মোমনাই করিতাম। মোহন ভরলোকের ছেলে। তাহার শপের কথা না হোক—তাহার আকৃতি দেখিয়া স্বতঃই মনে বিশ্বাস জন্মে যে, সে ভদ্র সন্তান। তাহার আচার ব্যবহার, বাক্যালাপ, অবয়ব ইত্যাদি সমস্তই তাহার ভদ্রতার আস্থ-স্থলো সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তবুও সে একের পানে ঘুরী করিয়াছিল এই দ্বুভিত। বারবারই “কীটা বেধার” মত আমার প্রাণে গীড়া দেয়। এবং এই লোকের সাধর্চাই যে আমার একমাত্র সন্তানের “পুন্দরী” এটাও যেন কেনম ভালো বোধ হয় না। উনিও প্রায় প্রত্যহই বলিতেন—“বিজুকে ওই চোরটার সঙ্গে অত বিশতে দিয়ে না।” এজন্ত তিনি প্রত্যেক দিনই আমার অস্বয়োগ দিযেন। পাড়ার অস্বাত ভদ্র বালক, বাহারা পূর্বে বিজয়ের বন্ধু হইলে নিজেদের ধন মনে করিত, বাহারা বিজয়ের অস্ব-বন্ধুত্বকে পরিণত হইয়াছিল, তাহারাও আর বিজয়ের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা রাখে না। বিজয় চোরের সঙ্গে মোলামেশা করে বলিয়াই তাহাদের অভিজাবকণা যে বিজয়ের সঙ্গে বিশিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন—সে বিষয় কোনই সম্ভব নাই। তবুও বিজয়ের ঠৈতন্ত হইয়া কেন? সব ছাড়িয়া সে যেন ওই মোহনকেই একা-চিন্তে এগুণ করিয়াছিল!

### সাত

দিন পনেরো পরের কথা।

দৈনন্দিন কাঙ্কর্ষ দীর্ঘ দীর্ঘে সম্পাদন করিতেছি। চাপান—অবরো কপাল আধায়—ভান্ডার বাহির করিয়া দেয়া, হুটনা কোটা ইত্যাদি সকল প্রাভাতিক কাণ্ডগুলি শেষ হইয়া গিয়াছে। স্বামীও প্রভাত-ভ্রমণ শেষ করিয়া অনেকগুণ হইল বাড়ী ফিরিয়াছেন। বিজয় প্রত্যহ আহার মঙ্গে লইয়া পোষ্টাক্সিমে চিঠি আনিতে যায়। কিন্তু আজ সে ঘরবানের দ্বারা অনেকগুণ হইল ‘ভাক’ পাঠাইয়া দিয়াছে এবং বলিয়া দিয়াছে সে হুতুর বাংলায় তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে বাইবে এবং ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে এবং তাহার সঙ্গে যখন মোহন রহিয়াছে তখন হরোয়ানের আর কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের বাঙালীটা লালপড়ের মধ্যে। মধ্যে একটা “রেল লাইন” আছে, সেইটা পার হইয়া গেলে হুতুর বাংলা সামুদ্রিক পড়ে। হুতুর বাংলা আর লাল গড়ে বাতায়াক করিতে হইলেই রেল লাইন পার হইয়া যাইতে হয়। এইটাই সোজা রাস্তা পড়ে। আমাদের বাড়ী হইতেই হুতুর বাংলা দেখা যায় এবং আমাদের বাড়ীর খুব নিশ্চই উক্ত বাঙালীগুলি। কিন্তু মাথানে ওই রেল লাইনই ব্যবধান। বিজয় লাল গড় হইতে সোজা পোষ্টাক্সিমে গিয়া সেইধারা হইতেই হুতুর বাংলায় গিয়াছে। বাহোয়ান বলিল চিঠি লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় বিজয়ের এক বন্ধু স্বরেনের সঙ্গে তার দেখা হয়। স্বরেন বলে যে তার মা তাহার স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টায় বাইবার জন্ত বিজুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই স্বরেনের মা বিজুকে একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বিজয় স্বরেনের সহিত বরায়র ভাকখর হইতেই হুতুর বাংলায় চলিয়া গিয়াছে আর বাহোয়ান ভাক লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

এখন বিজয়ের বাড়ী ফিরিবার জন্ত সেই রেল লাইনটা ‘ক্লক’ করিয়া আসিতে হইবে। অশু পথে আসিতে গেলে ঘুরিয়া আসিতে হয় এবং অনেক দূর পড়ে কিন্তু লাইন পার হইয়া আসিলে আমাদের বাড়ী আর হুতুর বাংলা কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান।

কিন্তু মোহন যদি তার আন্তানায় ফিরিয়া গিয়া থাকে, তবে নিশ্চই বিজয় একাই লাইন পার হইবে, এই মনে করিয়া আমি ঘরবানকে ডাকিবার জন্ত বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, বিজয় আমার, পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। আমি শব্দকল্পণে ও ত্রুণ চরণে গেষ্টের কাছে গিয়া ধাঁড়াইতেই সে ছুটিয়া আসিয়া আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া “মা আমার—মাগো, আমার সর্লনাশ হ'য়েছে।” বলিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস কেলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পোলযোগ শুনিয়া আমার স্বামীও বাহির হইয়া “কি? কি?” করিয়া ব্যস্ত ভাবে বিজয়ের পানে আসিয়া পাড়াইয়াছেন।

এইবার বিজয় উক্কেশেরে চীৎকার করিয়া কানিয়া উঠিল। আমরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্রিককণ্ডবা বিচু হইয়া রহিলাম।

এইবার অতি কষ্টে সে বলিল—“প্রাণ দিয়েছে মা, প্রাণ দিয়েছে। যাকে তোমারা চোর বলে যুগ করতে বাবা, সেই মোহন আমাকে বাচাবার জন্তে একেবারে প্রাণ দিয়েছে!!”

আবার তাহার অশ্রুসিক্ত উখলিয়া উঠিল। “কী সর্লনাশ! সে কিরে?” বলিয়া ব্যাখুলভাবে আমি তাহাকে আরো নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিলাম। সে বলিতে লাগিল—

“আজ সাড়ে আটটার প্যাসেঞ্জার যে আটটাতেই এসে পড়বে তা কে জানত মা? আমি স্বরেনের সঙ্গে পোষ্টাক্সিমে থেকে বরায়র হুতুর বাংলায় এসেছিলাম, রাস্তাতেই মোহন আমার লগ নিলে। বললে—‘ভাই, তোদের বাড়ীতে গেলে ভান্ডার বাবু কইমটিয়ে আমার দিকে চাইতে থাকেন—আমার বড় ভয় করে তোদের বাড়ী বেশী যেতে। নোংরা একেবারেই যেদিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না সেই দিনই তোদের বাড়ীর মধ্যে বাড়াই। তাই, আমাদের সাফাটা হুতুর বাইরে বাইরেই হ'য়ে যায় ততই ভালো।’ আমি স্বরেনদের বাড়ী গিয়ে পাওয়া পাওয়া শেষ করে বেশমু—তখনো প্যাসেঞ্জার আসবার টাইম হয়নি। পাড়া চলে যাওয়ার জন্ত অপেক্ষা করতে গেলে আরো বেশি হবে



ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী আসছি। লাগলাম।  
মোহন আমার সঙ্গে আসছিল—তাকে আসতে মানা  
করলাম। কিন্তু আমি জানতাম না যে, সে পিছন থেকে  
আমার সঙ্গ ধরেই ছিল। আমি লাইন “ক্লেশ” করে  
টিক মাঝামাঝি এসেছি এমন সময় দেখি পায়েজারের  
ইন্সিন, আমার প্রায় কাছেই এসে পড়েছে। মোহন  
লাইনের পায়ে ছিল সে—“বিজয়! ছুটে যাও—ছুটে  
যাও—” করে হেঁচিয়ে উঠল। গাড়ীও থুথুই কাছে  
এসে পড়তে আমি হতভম্বের মত সেই রাসেই দাঁড়িয়ে  
যেলাম। এক সেকেন্ডের মধ্যেই মোহন লোক দিয়ে এসে  
আমার দায়ের ওপর পড়ে আমার এক পায়ে লাইন  
থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিলে। আমি ছিটকে এসে অজ্ঞ  
লাইনে পড়লাম। টিক তখনই তখনই ঠেলে মোহনের ওপর  
চিয়ে চলে গেল। মাগো, সে দুঃস্বপ্নের মতই না।”

### আজ

আমরা স্তম্ভিত প্রায় হইয়া তাহার কথা শুনিতে-  
ছিলাম। তার কথা শেষ হইলে তাহাকে কোড়ে তুলিয়া  
লইলাম। তখনই আমার একমাত্র সন্তানকে অপ্র-  
ত্যাশিত ভাবে তুমি রক্ষা করেছ—কিন্তু প্রাণের বিনি-  
ময়ে প্রাণ নিলে কেন দেব? কিন্তু তা’তো নয়! যে  
নিজের প্রাণ দিয়ে—এর প্রাণ রক্ষা করলে দৈবিক ভোতারই  
অংশদত্ত নয় প্রভু? সর্ব মানবেরই যে ভোতার সত্তা  
বিরাজমান, তাই ইমান কিরবার জন্তই কি লীলারম্বের  
এই এক অভিনব লীলার সৃষ্টি?

স্বামী শান্তির অসুস্থত চিত্তে ঘটনা স্থলে চলিয়া  
গেলেন। আমি শুই নিদ্রাক্ষণ দৃঢ় কল্পনা মাজেই শি-  
থিয়া উঠিলাম। মাহ সূচনার রক্ত পৃষ্ঠস্থ আমি দেখিতে  
পারি না, আমি কিরূপে সে দৃঢ় বৈধি? বিজয় আর  
একটিবার জন্মে পক্ষ তাহার প্রাণদাতা দেবতা বজ্জকে  
দেখিবার জন্ত যাবুল ইহায়াছিল তাহাকেও আমি  
আর বাইতে দিলাম না। তাহার কচি প্রাণে কত সহ-  
ন্য। স্বপ্নাবিষ্টের দ্বারা আচ্ছন্ন ভাবে সে আমার কোড়ের  
উপর পড়িয়া রহিল। আমিও অনেকখণ এক ভাবে  
তাহাকে লইয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া  
বসিলেন—“বুই! সন্ধ্যা দৃঢ় যুগল। এমন মন  
যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।  
তাই একে এত ভালোবেসেছিল বিজয়। আর সে?  
কী ভালো সে বিজয়কে বেবেছিল যুগল? কী ভালো  
বেবেছিল—কী ভালো বেবেছিল!!” বলিয়া তিনি

উদ্ভূতের দ্বারা চতুর্দিকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে  
লাগিলেন।

দেখিলাম তাঁর চক্ষেও অশ্রু বিন্দু ঝরিতেছে। আমার  
চক্ষু হইতে ত এই নিদ্রাক্ষণ সন্ধ্যা সন্ধ্যার পর হইতেই  
অশ্রু ঝরিতেছিল, কিন্তু স্বামীর চক্ষে অশ্রু এই প্রথম  
প্রত্যক্ষ করিলাম। সে আমার স্বামীর তরফে সর্বদা  
সন্তোষ থাকিত, কেবল বিজয়ের লোভেই সে এতদূর ভিত্তা  
করিতে আসিত। এখন দেখিয়া যাও মোহন, তুমি  
পাশাণেও জল ঝরাইয়াছ।

### শান্ত

তারপর? তারপর আর কি? এই ঘটনার আর  
কিন পথেই আমরা মধুপুর হইতে কলিকাতায় চলিয়া  
আসিলাম। বিজয়ের আর মধুপুর ভালো লাগিত-  
ছিল না, সে সর্বদাই তাহার প্রাণের অঙ্গল বেননা  
প্রাণধারণে সংযত করিতে চেষ্টা পাইত। মোহনের দৃষ্টি  
সর্বদাই যেন তাহাকে ঘেরিয়া থাকিত, মধুপুর তাগ  
করিতে পারিলেই যেন মুক্তির নিশাশ ছাড়িয়া ব্যাঘ্র  
এইরূপ মনে হইতে লাগিল। আমার স্বামী মোহনের  
ভাই মৃদারিকও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আমিও  
মৃদারি আমার বিজয়ের সঙ্গে তাহার মত আমারে প্রতি-  
পালিত হইতেছে।

এতদিন কাটিয়া গেল—সেই ঘটনার পর স্বদীর্ঘ দশটি  
বৎসর অতীত হইয়া গেল—সেই প্রিয়দর্শন মোহন  
ভিখারীকে আমার জুলিতে পারি নাই। কি জুল বলি-  
তেছি? শ্রৌতদেহের সীমানায় পৌঁছিয়া আমার কি বৃদ্ধিও  
লুপ্ত হইতে চলিল? দৈবিক ভিখারী? সে যাই ভিখারী  
কহে রাজ্যের কে? দ্বন্দ্ব সম্পদে তা’র জলা নী  
আছে কে? কিরূপে তাহাকে জুলিব? বৃদ্ধি বা  
জীবনান্ধকার পৃষ্ঠস্থই তাহার স্মৃতি আমাদের দ্বারা  
জীবনান্ধকার হইয়া রহিল। আমার সর্ব স্বপ্নের মুখ-  
পারই সে। আজ আমরা একমাত্র সন্তান—যে আমাদের  
মহত্বমির ওয়েসিস্ তাহাকে হারাইয়া কি “সর্বদারী”  
হইতাম না? রাষ্ট্রব্যর্থতার উপর বলিয়া থাকিলেও কি  
স্বপ্ন হইতে পারিতাম? যে আমাদের সর্বদা ফিরিয়া  
দিরাছে তাহাকে জুলি কিরূপে? প্রত্যহই তাহার উদ্দেশে  
ক’ ফোটা অশ্রু বিন্দু প্রধান করিয়া তাহার পবিত্র আত্মা  
তর্পণ করিতেছি।

করুণাময়ের বিধবাবরণ সে ছিল—বিধবের অনাড়ম্বর,  
সকলের সহ্যেও সাহসকৃত্তি বসিত একজন চোর। কি  
তাঁহার আপন রাজ্যেও কি সে ভাই?



# মুহম্মাদ গান্ধী ইয়ৎ ইন্ডিয়া

পরিচালনা  
সার সঞ্জন

## সত্যের পরীক্ষা

### রায়চাঁদ ভাই

গত পরিচ্ছেদে বলায়ছি বোখাই বন্দরে পৌঁছিয়াও  
সমুদ্র অতীত তরঙ্গময় বোধ হইতে লাগিল—আরব্য  
উপদ্বীপের ইহা অস্বাভাবিক নয়। এদেশ হইতে সমস্ত  
পথেই এই একভাবে কাটিয়াছে। প্রায় সমস্ত যাত্রীই  
অশ্রু কেবল আমিই ভাল ছিলাম—ভেকের উপরে  
উত্তাল তরঙ্গের তাওবলীলা উপভোগ করিতে করিতে  
আসিতেছিলাম। হুই একজন যাত্রী প্রান্তরাশ করিতে  
সাধারণ টেবিলে আসিতেন—“ওটমিল পরিজ্ঞ”এর ডিস  
কালের উপর সন্তর্পণে দখিয়া তাহাই একটু একটু বাই-  
তেন কারণ একটু অস্বাভাবন হইলেই “পরিজ্ঞ” আসিয়া  
কালের উপর ভিসের স্থানটুকু অধিকার করিত।

বাহিরের প্রকৃতির এই চকলতার মধ্যে আমি যেন  
আমার ভিতরের চকলতা প্রতিকলিত হইতে দেখিতাম  
কিন্তু বাহিরের এই ঝড়পাণটার সমুদ্রে আমি যেমন  
অটল ছিলাম তেমনি ভিতরের শত অস্থিরতাও আমাকে  
বিস্তলিত করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ স্বজাতীয়গণের  
সহিত বোঝাপড়া, দ্বিতীয়তঃ আইন ব্যবসায়ের নিজের  
অসুখায়তা এবং তৃতীয়তঃ আমি একটা ছোট খাট  
সম্ভারকও ছিলাম হতবীর সর্বদাই ভাবিতাম কি ভাবে  
সম্ভার কার্য আরম্ভ করিব। তখন জানিতাম না যে  
এই সকল মোটামুটি বিপত্তি ছাড়া আরও অনেক আমার  
জন্ত অশুভভাগেও সঞ্চিত আছে।

আমার অশ্রম আমাকে লইতে ডকে আসিয়াছিলেন

তিনি ইতিমধ্যেই ভাঃ মেহতা এবং তাঁহার অগ্রদূতের  
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ভাঃ মেহতা আমাদের  
তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন—বিলাতের সামান্য আলাপ  
এখানে দৃঢ় বন্ধুত্ব পরিণত হইল।

আমার মাতাকে দেখিবার জন্ত মন বড়ই অস্থির  
হইতেছিল। তিনি যে আমাকে তাঁহার স্নেহময় বকে  
ধারণ করিতে ইচ্ছা করতেন নাই তাহা আমি এই প্রথম  
জানিলাম। শৌচক্রিয়ারি বাধাবিহিত সম্পন্ন করিলাম।  
আমার বিলাত অবস্থান কালেই মাতা ইহলোক ত্যাগ  
করিয়াছিলেন এ ছঃসংবাদ আমার অগ্রজ আমার জানিতে  
দেন নাই। এখন এই সংবাদে আমি মর্শ্বাভূত হইলাম।  
আমার অনেক আশা অতুরেই বিনষ্ট হইল। আমার  
মনে আছে এ অবস্থায় আমি শোককে দমন করিয়াছিলাম  
বাহু ভায়ে। অন্তরের সেই পুণীভূত বেনদারানি প্রকাশ  
করি নাই।

ভাঃ মেহতা আমার তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধুগণের  
সহিত পরিচিত করিয়া রাখাছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার  
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বোরাশ্বর জগজীবন অজ্ঞতম। এই সময়েই  
ভাঃ মেহতার অগ্রদূতের ভ্রাতা এবং “রোবান্দর জগজীবন”  
নামে পরিচালিত বিখ্যাত জুয়েলারী ব্যবসার অংশীদার  
কবি রায়চাঁদের সহিত আমার আলাপ হয়। ইহা  
বয়স তখন পঁচিশের উর্দ্ধে নয় কিন্তু প্রথম আলাপেই  
আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল ইনি একজন মহৎ ও বিদ্বান



লোক। ইহার আর একটা নাম 'শতাবধানী' অর্থাৎ যিনি এককালে এক শত বিষয় শ্রবণ করিতে পারেন। ভাঃ যেহেতু ইহার বুদ্ধিশক্তির অসামান্য ক্রিয়া কলাপ দেখিতে বলেন। আমি যতরূপ ইউরোপীয় ভাষা এবং তাহা হইতে বহু ভাষা শ্রবণ করিতে পারিলাম সব বলিয়া সেলাম এবং তাহাকে সেইগুলি আত্মিক করিতে বলিলাম—আমি ঠিক যেমন পয়ের পর বলিয়াছিলাম তিনিও ঠিক সেইরূপ আত্মিক করিয়া গেলেন। তাহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, উন্নত এবং অকলুষিত চরিত্র এবং আত্মজ্ঞান লাভের দারুণ স্পৃহা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার যুগে সর্বদাই তিনিই পাইতাম—“যেদিন আমার প্রত্যেক কার্যের ভিতর তাহার বিকাশ দেখিতে পাইব সেদিন আমিই ধর্ম।”

রায়চাঁদ ভায়ের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাতিত। তিনি হীরক ও মুক্তার প্রকৃত জহরী ছিলেন। ব্যবসায়ের কোনে কটিল ব্যাপ্যাই তাহার পক্ষে মীমাংসা করা দুরূহ ছিল না। কিন্তু এই সকল ব্যাপার তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না—জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা। তাহার টেবিলের উপর সর্বদাই তাহার দিনলিপি ও কোন না কোন ধর্মলক্ষ্য পুস্তক রাখিত দেখিতাম। যে মুহূর্ত্তে ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য শেষ হইবে সেই মুহূর্ত্তে হয় তিনি দিনলিপিতে লিখিতেন না হয় ধর্মপুস্তক পাঠ করিতেন—তাঁহার প্রকাশিত সমস্ত লেখাই এই দিনলিপি হইতে উদ্ভূত। যে ব্যবসায়ী যুগ ব্যবসার কথা শেষ হইবামাত্র হুস্র এবং গুঢ় আধ্যাত্মিক বিষয়ে লিখিতে পারেন তাহাকে ব্যবসায়ী বলা যায় না তিনি একজন প্রকৃত সত্যাবোধী। তাঁহাকে এইরূপ শত কার্যের ভিতর আবক্ষ থাকিয়াও আধ্যাত্মিক চিন্তার মগ্ন থাকিতে একবার দুইবার নয় বহুবার দেখিয়াছি। এই পোটনার ভিতরেও তাঁহার কখনও চিত্ত-সমোর ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই। তাঁহার সহিত আমার বৈধবিক

সম্বন্ধ না থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা খুবই ছিল। যদিও এসময়ে আমি ধর্মবিষয়ে কোনরূপ গভীর অধ্যয়ন করি নাই তথাপি তাঁহার ধর্মবিষয়ক মূর্ত্তি মনেতে মনেতে আমি তন্ময় হইয়া যাইতাম। এরূপ আমি অনেক ধর্ম প্রচারা-কর নেতা, বক্তা ও গুরু সহিত মিশিয়াছি। কিন্তু রায়চাঁদ ভায়ের হৃদয় মূল্য মুক্তি আবার জ্ঞানে যে গভীর রেখা পাত করিত এমনটা আর কেহই করিতে পারেন নাই। তাহার মূর্ত্তিতে যে গভীর বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাইত তাহাতে আমার অন্তরের গুঢ় প্রবেশে স্থির বিশ্বাস জন্মাইত যে ইনি কখনও বুঝা ব্যাঘাত তর্কমালা রচনা করিয়া সত্যের পথ হইতে আমাকে দূরে লইয়া ফেলিবেন না। নিজের অন্তরে যাঁহা সত্য ও হৃদয় বলিয়া জ্ঞানেন তাহাই তিনি মুখে প্রকাশ করিতেন। ধর্ম-বিষয়ে কোন সন্দেহ জাগিলে ইনিই আমার একমাত্র সাহায্যকারী ছিলেন। এসমস্ত সবেও আমার অন্তরে ইহাকে গুরুর আসনে বসাইতে পারি নাই—সে আসন আজও শূন্য—উপগুরু গুরুর অংশদান আজও চলিতেছে। হিন্দু মত গুরু ব্যতীত আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ অসম্ভব তাহা আমি নিজেও স্বীকার করি। গুরুর কৃপা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানলাভ অসম্ভব এটা খুব সত্য কথা। যিনি পূর্ণ জ্ঞানী তিনিই গুরু হইবার উপযুক্ত। যতদিন এরূপ গুরু না পাওয়া যায় ততদিন নিজেও শুদ্ধ করিয়া তাহার দর্শন-লাভের আশায় সাধনা করা অনাবশ্যক।

সেই জ্ঞান “রায়চাঁদ ভাই অনেক ধর্মবিষয়ে আমার পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হইলেও তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতে পারি নাই। আধুনিকগণের মধ্যে তিনি ব্যক্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছেন—রায়চাঁদ ভাই তাঁহার স্বীয়জীবন উদাহরণের দ্বারা—উল্লেখ্য তাঁহার ‘দি কিংডম অব গড ইজ ইউইন ইউ’ নামক পুস্তকের দ্বারা এবং রাম্‌স্‌ তাঁহার—“অনু টি দিল লাইট” নামক পুস্তকের দ্বারা।

সেকালের মুনি ঋষিদের, অবসর মত এবং আবশ্যক মত আমরা গাল পাড়িয়া থাকি বটে কিন্তু সময়ে আবার তাঁহাদের উপদেশও আমরা অঙ্গুরণ করিয়া থাকি। শরীরকে তাঁরা যে ব্যাধির মন্দির বলে গেছেন কথাটা যে খুবই পাঠ্য তাহাতে কোন সন্দেহই নাই কারণ মন্দিরে যেমন লোকে উপাসনা করিত যাহ শরীরের মধ্যেও আমরা তেমনই ব্যাধির আরাধনা করিয়া থাকি। তবে তখন ভারতের ভাষে হয় মূলমান বা ক্রীকানেরা আসেন নাই আসিলে তাঁহার ‘মন্দির’এর পর মঙ্গলিৎ—সিদ্ধিৎ চ ইত্যাদি বসাইয়া নিতে পারিতেন; সে কাজটা এখনকার সমাজ স্বাস্থ্যরক্ষকেরই করা উচিত। মন্দিরের বেত্যা যেমন ভক্তের আরাধনায় প্রীত হইয়া শরীর এবং মন্দির প্রত্যেক হইয়া ভক্তকে দেখা দেন তেমনি শরীরের মধ্য দিয়াও ব্যাধি মহাশয় আসিয়া দেখা দেন এবং তিনিও যে ভক্তবৎসল তা প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়া দেন।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখিবেন বিবিধ ঔষধের বিজ্ঞাপন—পঞ্জিকার আগায় ও গোড়ায় আয়ুর্বেদীয় ও অমৃত ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকিবেন ঐগুলির যেকোন একটি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই দেখিবেন যে বর্ণিত লক্ষণগুলি আপনার শারীরিক লক্ষণের সঙ্গে অসুতরূপে মিলিয়া যাইবে—এইরূপ যত ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের বিবরণ পাঠ করিবেন ততই স্পষ্ট বৃত্তিতে পাবিবেন যে, আপনার শরীর স্বস্থ নাই উন্মত্তে ব্যাধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে—হুতরাং কোন ব্যাধিটির ঔষধ সেবন করিবেন তাহা স্থির করা আপনার পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া পড়াইবে। একবার মাথায় ঐ বিজ্ঞাপনের বীজ প্রবেশ করিলে চিন্তা-শক্তি সেচনে উঠা অসুবিধে হইয়া উঠিবে এবং ক্রমশঃ উহা শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধিত বহীকরণের আকার ধারণ করিবে, তখন আপনি কিংকর্তব্য বিষয় হইয়া পড়িবেন। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলে সমস্তা সমাধান হওয়া দূরে থাকুক উহা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়াইবে। কবিরাজের নিকট যাইলে তিনি একসঙ্গে ৪৫টা প্রকার বীজা চূর্ণ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন আপনার অবস্থা ভাল হইলে ঐ সঙ্গে তৈল মালিস ও ঘৃত সেবনের ব্যবস্থাও

করা হইবে। তবে কি জ্ঞানেন অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা গ্রহণে অবস্থা মানে শারীরিক অবস্থা নহে কারণ শারীরিক অবস্থার চিকিৎসকের কি আসিয়া যার বাহার শরীর সেই সে অবস্থা মর্মে মধ্যে উপলব্ধি করিবে—চিকিৎসকের আবশ্যক রোগীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহা অবগত হওয়া কারণ রোগীর আর্থিক অবস্থা যত ভাল হইবে তাহার শারীরিক অবস্থা সেই পরিমাণ মন্দ হইবে ইহা ভাবিতকি আয়ুর্বেদে লেখা না থাকিতে পারে কিন্তু ইহা চিকিৎসক মণ্ডলীর অপরিজ্ঞাত নহে। ধনী রোগীরা সামান্ত জর হইলে ‘আইগ ব্যাগের’ আবশ্যক, রক্ত পরীক্ষা করান আবশ্যক, প্রচারা পরীক্ষা অপরিহার্য কিন্তু রামদীন মুষ্টিয়ার ঐরূপ জর কেবল আট আনার হুইনইন নিম্নস্তরে সাধিয়া যায়। তবে ইহা হইতে যদি একজন অসুস্থমান কোন যে, এই চিকিৎসার তারতম্যের ফলে রামদীনের দলের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা অধিক এবং ধনীরা প্রায়ই নীরোগ বীরজীবী ও হুস্থ অবস্থায় কালযাপন করেন তাহা হইলে আপনি বিমম্বন করিবেন। কারণ ধনীদের মধ্যে মাড়ে পনের আনা লোকেরই নিত্য একটি না একটি রোগে থাকিয়াই থাকে এবং সেইরূপ তাঁহাদের সর্বদাই খুব সতর্ক হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়—তাঁরা জামিয়ার ভয়ে শীতের দিনে সর্বদাই কফেটার বা মাকলার গলার বাণিতে হইবে—ঘরের বাহির হইতে হইলে জুতা মোকা পরিতে হইবে, গায়ে অলোটার খাটিতে হইবে তার উপর গরুর কাপড়, শাখা জামিয়ার পাতে জড়াইতে হইবে আর রামদীনের দল একখানা বোখাই চার বা হুতি কখন জড়াইয়াই শীতকে রক্ত প্রদর্শন করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দিনে ধনীর ঘরের জালার আতপ নিরাকরণে জল গল্গলগলে টাটা লাগান থাকে—ঘরের মাঝে বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে আর রামদীনের দল খুব গরমের সময় রাত্তার কল হইতে ঢুক ঢুক করিয়া একপেট জল খায় আর রাত্তার গায়ে কোন পাড়ী-বারান্দার তলার বলিয়া গামছার মুড়া নাড়িয়া একটু বাতাস বাইয়া শরীরকে তাজা করিয়া লয়; তথাপি তাহাদের নিত্য রোগে হয় না অথচ ধনীদের হয় কেন? ধনীরা প্রাতে ছুটি প্রহরতন বাগানের হুসিক জম, পুরের টাটকা ঘা বাটা মাখানো বা মাগুর মাছের



ঝোল দিয়া ভোজন করেন আর রামনীর দল আশাদের ত্বনি হৃদ আটা এবং আখা পাওয়া অরহরিকি ডাউল সাঁচিয়া স্বচ্ছন্দে হজম করে। রাজ্যে ধনী মহাশয় হয় ত একবাটা বালি বা একটু হরলিকি খাইবেন কেহ বা একটু চানার জল খাইয়াই তাহা হজম করিতে উঃ আঃ করিতে থাকেন আর রামনীর দল তো ছুঁবেনা খাইতে পায় না—জুটিলে আশাদের হাতু তিন চারিটা কাচালগ্ন সহ পরিপাক করিয়া ফেলেন। এ পার্থক্য কেন? যাহারা যত বেশী সাধনান—যত শরীরের যত লব তাহাদের শরীরই তত ভাঙ্গিয়া পড়ে কেন?

কারণ আছে বৈকি, না থাকিলে কার্য হইতেছে কিরূপে। আমার এক বন্ধু ডাক্তারী করিতেন উৎসাহে আনি এই প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন যেওকাজ যদি কেবল বসাইয়া রাখা হয় ও খাইতে দেওয়া হয় তবে কিছু দিন পয়সা খরচা গাড়ী টানিতে পারে না কেন? এ কথাটা সত্য কিন্তু জানি না কার্য আমার যেওকাজেই নাই এবং ছিল না, তবে ডাক্তার বাবু উপর আমার যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তাহা সেদিন নষ্ট হইয়া যাইবার মত হইল। ডাক্তারী পড়াশুনা করে লোকটা কি না মাছকে যোকার সহিত তুলনা করে—যেওকাজে আর পথাতে বেশী আর কি তুলনা? বিশেষতঃ কথার বহন ধরে রাখা নামক ভীষক পিটাঁয়া খোড়া প্রস্তুত করা হয় ততবার প্রকারান্তরে মানসভাষিক তিনি যে পথা বলিয়া বলিবেন তাহা আমি কোন মত সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমার যুগভাব দেখিয়া মনোভাব তিনি বুঝিয়া নইলেন এবং একটু হাসিয়া বলিলেন—“আমাদের এই বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ছিলপণ্ডিয়া প্রায় বহুতালো লোককেই আছে এ আপনি স্বীকার করেন তো?” স্বীকার আমি মনে করিলেও, তৎক্ষণে একটা স্বীকার করাতা আমি কর্তব্য মনে করিতাম না কিন্তু স্বীকার করিবার উপাধও ছিল না কারেই নীরব রহিলাম। তিনি বলিলেন—“এর কারণ আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের অভাব আমরা এই বাবু হইয়া কিছুই ছাড়ে যে, কলম কাগজের কাছ ছাড়া অন্য কোন কাজ করিতে হইলেই আমাদের অপমান বোধ হয়। সহজে স্বলতে টান বাস প্রভৃতি থাকায় লোক পথে ইটিতে চায় না এমন কি মুটে মজুররাও ক্রমশঃ অসুস্থকর করিতে বাইরা এই সব ছোটখাট বিলাসিতা এমন ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে শীঘ্রই তাহাদের মধ্যেও এই সব বাবুজানার যক্ষ আভ্যাক্রম ব্যাবিগলি দেখা দিবে; তবে তাহাদের জীবিকা নির্বাহের

জ্ঞাত্যকিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া এখনও তাহারা টিকিয়া আছে। আমরা এমন বাবু হইয়াছি যে নিজেদের বাড়ীর বাগবাটাও নিজেরা করিতে পারি না, হাত খুলিয়া ৪৫ পের জিনিসও আনিতে পারি না—বসই এই এক অপমানের ভয়ে পাছে বাবুজানায় আঘাত লাগে। কেবল মতিচু চালাইলে বা কলম লইয়া নান্দা চাড়া করিলে ভুল ভ্রম জীবী কাহাবে কে? তারপর আমরা বাহা বাই তাহার মধ্যে জীবী করা যায় না এমন অনেক ভেজাল জিনিস পাছে শিখান থাকে—যেমন যক্ষার সহিত China Clay—যুগের সহিত চর্কি—বস্ত্রের সহিত জল, সূর্য ঠৈলের সহিত গন্ধদ্রবী কেরোসিন ঠৈল প্রভৃতি—এসব পরাধ হজম করা কি মানব পাকস্থলীর কর্ম? অথচ জানিয়া শুনিয়া আমরা এই সব খাইতেছি—নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেরা নষ্ট করিতেছি আর জাতির শক্তিমত্তার কথা বক্তৃত্য বলিয়া কর্তব্য মানপন করিতেছি—প্রভৃতি—কারের কোনই উপায় করিতেছি না।” শুনিয়া বন্ধুদল যেকথাটা একান্ত উপহাসের নয়, তখন বলিলাম—“আজ্ঞা ডাক্তারবাবু এর কি কোন উপায় নাই?” ডাক্তারবাবু বলিলেন—“থাকিবে না” কেন—উপর নিজেদেরই হাতে বহিয়াছে তবে তাহা অবলম্বন করিবার মত মনের জোহ আর আমাদের নাই—পূর্বেই বলিয়াছি যে এক বাবুজান চুকিয়াই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। পাছে কে “বাবু” না ভাবে এই ভয়েই আমরা সর্বনাশ সম্বরিত—বাহাতে কায়িক পরিশ্রম হয় এমন কাজ আমাদের বিশেষ আন্তরিক আর বাগতা দাওবার যতক্ষণও বন্ধুর সাধারণতা অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা করা উচিত—ভেজাল বি খাওয়া অপেক্ষা যি না খাওয়া ভাল জগো দুখ না মিথিয়া গাড়ী চালন করা কর্তব্য আর তা বিদ্রুনের পরিবর্তে মুড়ি নারিকেল খাওয়াও ভাল। বিশেষ করে এই চা আর চপ বাইলে পাওয়া এই দুইটা আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন নেই হইয়া থাড়াইয়াছে বাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বোধ হয় পনের আনা তিন পাই রকম দোকানের চপ কাটলেট স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর উপাদান প্রস্তুত কিন্তু এ সকল ভ্রম্য রসদার পক্ষে এমন তৃপ্তিকর যে বাবুদের তাহা না হইলে আর দিন চলে না।” আমি বলিলাম—“তাহাদের কি এসব কথা বুঝাইয়া বলিলে তাহারা সাধনান হইবে না?” ডাক্তারবাবু বলিলেন—“হবেও পারে কিন্তু বিজ্ঞানের গলায় দণ্টা রাখে কে?”



## ভারত ইতিহাসে বিহারের স্থান

“পাপুল”

এই বিরাট ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিহারের স্থান কোন্‌ স্তরে?—এই জটিল সমস্যার সমাধান করা অনায়াস-সাধ্য নহে। অনেক মহাপুরুষই বিহারকে ভারতের ইতিহাসে শীর্ষস্থান দিবেন এবং এই স্থান লাভের জন্ত বিহার অনেকাংশে দাবী করিতেও পারে। বিহার যে যানই লাভ করুক, আমরা তাহা বিচার করিব যে। আমরা এইমাত্র বলিব যে, খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে হইতে মূল্যমান অধিকারকাল পর্য্যন্ত বিহার ভারত ইতিহাসের ন্যাট্যশালায় এক প্রধান অংশ লইয়া থেলা করিয়াছে। এই খেলার সাক্ষ সন্ধানও পোষাক কি এবং এই খেলায় সে ভারতবাসীগণকে কিত্তপ আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই আজ আমরা বিচার করিব।

বর্তমানে যে স্থানকে বিহার বলা হয়; অতি প্রাচীন কালে তাহা মিথিলা ও মগধ নামে খ্যাত ছিল। পঞ্চমী নামে বিহার পৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পৌড় নামেই করিত হইত। আবার বঙ্গের পাল রাজ্যের সময় বর্তমান বিহারের অনেকাংশকে বঙ্গ বলা হইত। নাগামা, রাজগীর, মানভূম, ধাবভাগ প্রভৃতি স্থান বঙ্গ-প্রেম হইতে পৃথক হইয়া বিহারের কলেশ্বর বৃত্তি করিয়াছে। যুগেযুগের যুগের ছই শতাব্দি পরে আমরা বিহার নামের স্মৃতি প্রাপ্ত হই। বৃহদেবের যুগের দিল স্বজ্ঞাতশক্ত ও অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে সমস্ত মগধ রাজ্য বৌদ্ধধর্ম ও সংখ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় যথেষ্ট নানাস্থানে বৌদ্ধ সম্মানীগণের থাকিবার জ্ঞাত এবং ধর্ম্মালোচনার জ্ঞাত অনেক বৌদ্ধমতী নির্মিত হয়, এই বৌদ্ধ মঠকে ‘বিহার’ বলা হইত, সেই ‘বিহার’ হইতেই এই প্রদেশের নাম বিহার হইয়াছে। বর্তমানে বিহার কথাতীর সহিত আর একটা ভাব মিশ্রিত আছে।

স্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া ইহাকে বিহার বলা হইত; আজকাল এই প্রদেশে রাজগীর, শিমলতলা, দেওঘর, মধুপুর, গিড়িডি প্রভৃতি বিহারের স্থান গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহাকে বিহার বলা যাইতে পারে।

সাম্রাজ্ঞানী যুগের পূর্বের কথা

রামায়ণের বিহারের ঐতিহাসিক ভিত্তির প্রথম সূত্র, পুরাণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, অতি পূর্বকাল হইতেই বিহারে তিনটী হিন্দুতীর্থ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। যথা, বৈষ্ণব ও হরিহর ছদ্ম এই তিন স্থানে সতীর তিন স্রব গড়িয়াছিল বলিয়া হিন্দু-মিথের নিকট এই তিনটী স্থান তীর্থকেন্দ্র। জনক রাজার বহু পূর্বে হইতেই মিথিলা ধর্ম্মালোচনা ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। গয়ার নিকটবর্তী পাহাড় এবং তপোবন পাহাড় হিন্দু-ঋষিগণের তপস্কার স্থান ছিল। মিথিলার উত্তর ভাগে নেপালের স্বাধীন সুলল বনরাজ ও পর্তুগীষ নির্দ্ধন রাজের অনেক মহাপুরুষই সমাধি লাভ করিয়াছেন।

সাম্রাজ্ঞান ও মহাজ্ঞানকেন্দ্র যুগ

আজ রামায়ণ ভারতবাসীর নিকট আত্মিক দিক দিয়া, যুগের দিক দিয়া, কবিবর্ষ দিক দিয়া, ইতিহাসের দিক দিয়া, গয়ের দিক দিয়া, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার দিক দিয়া, বড় আদরের অমূল্য বস্তু। এই রামায়ণ আছে বলিয়াই আমরা প্রাচীন লঙ্কার রাজ্য রাবণকে চিনিতে পারি। লঙ্কার কলা-কৌশল, ধনবত্ত, শাসনশক্তি ও সভ্যতার কথা জানিতে পারি। এই রামায়ণ বিহারের নিজস্ব নয়। রামায়ণ রচিতা মহাকবি বামদিকিও বিহার লিখের বঙ্গের সম্মান বলিয়া দাবী করে। রামায়ণের নামিকা সীতা বিহারের গর্ভভাগ আশ্রয়ের কথা। বিহার তাহার কন্ডাকে বিয়াই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারে। সীতা তাঁর রূপ, সত্যতা, মাতৃব ও গতিভক্তি



দিয়াইবিহারকে গোঁরাবাসিত করিয়া রাখিয়াছেন, যেমন সীতা ভেমন তার পিতা জনক। কখন শোক তার মত হইতে পারিয়াছে। তিনি রাজা ছিলেন। গৃহী হইয়াও কবি হইয়াছিলেন; আবার কবি হইয়াও আদর্শ গৃহী ছিলেন। এই জ্ঞত তাঁহাকে রাজবী বলা হয়। তিনি যে আদর্শ পাইয়া গিয়াছেন জগৎ তাহা দেখিয়া ভক্তিত হইয়াছে। এই রামায়ণী যুগে সংস্কৃত ভাষারও বহুল চর্চা হইয়াছিল।

রামায়ণী যুগের পর আমরা মহাভারতে মগধের রাজা জরাসন্ধকে দেখিতে পাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই প্রাচীনকালে পার্শ্বাত্য মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হানে সমভারত প্রথম বিকাশ হয়। মিয়র, মধ্যএশিয়া, সিরিয়া, জীট, রাশপুতনা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন সভ্যতাই তাহার প্রমাণ। মগধের রাজগৃহ (বর্তমান নাম রাজগীর) দেখিয়া মনে হয় জরাসন্ধের বহু পূর্বে এখানে উন্নত ধরনের সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক জরাসন্ধকেই আমরা প্রথম মগধের রাজা দেখিতে পাই, তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশীয় অজ্ঞাত রাজা এবং অজ্ঞ বংশের অনেক রাজা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাদের অনেকের নামই আমরা শ্রীমদ্ভগবতে দেখিতে পাই, এই ভাবে অজ্ঞাত শত্রু পৃথক পৃথক মগধের রাজধানী রাজগৃহতেই ছিল।

### বৌদ্ধ যুগ

বর্তমান জগতের এক পঞ্চমাসক অর্থাৎ প্রায় ৬৬ কোটি লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এই ধর্মের যিনি প্রবর্তক, (মহাপুঙ্খ বুদ্ধদেব) তিনি এই বিহারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শত বৎসর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্ত্র নামক প্রদেশে এক গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। সিদ্ধিবি বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই প্রদেশে শাসন করিতেন। শুদ্ধন এই সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের একজন ছিলেন। তাঁহার পুত্রই ভগবান বুদ্ধ। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন হিমালয়ের পাদদেশে, আর তাঁহার কণ্ঠস্থ হইল গয়ায় নিকটবর্তী নিরঞ্জন নদীর তীরে এক বনের ভিতর। তিনি বুদ্ধ-গয়ায় মুক্তির আলো লাভ করিলেন এবং সেই মুক্তির

উপায় জগৎবাসীকে বুঝাইয়া দিলেন। জগৎবাসী তাহা গ্রহণ করিয়া দ্বন্দ্ব হইল। মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁহার শিষ্য হইলেন। ভগবান বুদ্ধ এইভাবে নব ধর্মপ্রচার করিয়া বিহারের অন্তর্গত বুদ্ধানামক এক স্থর গ্রামে চির বিজ্ঞান লাভ করিলেন। বিহার দ্বন্দ্ব হইল, আবার বৌদ্ধ-গণা বৌদ্ধ জগতের তীর্থস্থান বা স্বর্গ। চীন, জাপান, কোরিয়া, থায়, ব্রহ্মদেশ, লন্কা, নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধগণ বিহারের অন্তর্গত বৌদ্ধগয়ায় আসিয়া থাকে।

আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃত পক্ষে ভারতের ইতিহাস বিহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শিখনাগণ বা নাগ-বংশীয় রাজগণই ভারত ইতিহাসের প্রথম রাজা। শিখনাগ বংশের পর নন্দবংশ রাজত্ব করে। তাহাদের সময় পার্শ্বাত্যস্থি রাজগৃহ হইতে সর্গ বিহারে স্থিতিধার জ্ঞ গণা নদীর ও শোন নদীর সংলগ্নস্থলে পাটলীপুত্রে (পুষ্ক-পুর বা পুষ্কপুত্র) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্র নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে কেন? ইহার একটা মূখ্য কারণ দেখা যায় বহু পূর্বে হইতেই ভারতের সহিত লন্কা, জাভা, মলয়-উপদ্বীপ এবং পারন্ত আরব প্রভৃতি স্থানের সমুদ্র পথে বাণিজ্য চলিতেছিল। রাজগৃহে রাজধানী থাকিলে এই জলবানিজ্যের অনেক অসুবিধা হইত হুতরাং পাটলীপুত্র নগরে রাজধানী হইল। তৎকালে জাহাজ পাটনা হইতে গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপি নগরে আসিত। তথা হইতে অজ্ঞাত যেনে গমন করিত। এই জলবানিজ্যের জ্ঞ তৎকালে তাম্র-লিপি বর্তমান নাম তম্রলুক একটি প্রধান সমুদ্র বন্দর হইয়া উঠে। মাধিহায়ে বিবরণে তাম্রলিপির বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি এবং তাহার বহুপুর্বে মগধে এই রাজত্ব লক্ষ্য গমন করিয়াছিলেন। আজকাল যেনে প্রত্যেক গভর্ণমেন্টেরই Navigation Department নামে একটি Department আছে; তৎকালেও নৌ-বিভাগ নামে গভর্ণমেন্টের একটি বিভাগ থাকিত। এই বিভাগে নির্দিষ্ট কতকগুলি কণ্ঠচারা থাকিত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালেই এই বিভাগটা প্রবল হইয়া উঠে।

ইতিহাসের দিক দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আমরা প্রথম প্রথম

পর্যাক্ত সম্রাট দেখিতে পাই। তিনি প্রায় সমস্ত ভারত-যাত্রার একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাহার বংশগৌরব এবং পরাক্রম এত অধিক ছিল যে খ্রীস্টাব্দ সেলুকস তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ তাহার সম্মান রক্ষার্থে মেগাস্থিনেসকে দুইরূপে পাটলীপুত্র নগরে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার বন্ধুত্ব স্বীকার হইয়া স্বীয় ছবিটাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দেন। ভারত সিংহাসনে যত সম্রাট আরোহণ করিয়াছেন তাহার ভিতর একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন আর কোন সম্রাট ইউরোপের রাজকন্ডার পানিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। মেগাস্থিনেস পাটলীপুত্রে পাঁচ বৎসর আস্বাসন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব দেখিতে যাত্রা লিখিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বিবরণ না পাইলেও যৌতু আমরা পাই এবং যৌতুই সত্য, তাহা ভারত ইতিহাসের পক্ষে কম মূল্যের নহে। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ভিতর সমস্ত ছিল। কিন্তু তথাপি প্রজাদের সম্মতি ভিন্ন তিনি কিছু করিতেন না। কয়েকজন যাত্রী লইয়া একটা সভা গঠিত হইয়াছিল। সেই সভায় সম্রাটই প্রধান ছিলেন কিন্তু খ্রীস্টাব্দ বিনা অসুযতিতে কিছু করিতেন না। কোথা-যাবার বিনা অসুযতিতে তিনি এক কণ্ঠকণ্ডও ধন্যগার হইতে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। রাজত্ব রাজা হইলেও রাজ্যের ভিতর অনেক প্রজাতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের আইন কাহ্নন তাহারাই প্রচলন করিত এবং তাহারাই দেশ শাসন করিত। কেবল বিশেষী আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জ্ঞ রাজার সাহায্য লইত এবং কর দিত। এমন কি একজন লেখকের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় “... the ancient Indo-Aryan village was essentially a self-governing community ...” রাজ্য প্রজাপিগকে রক্ষা করিতেন বলিয়া তাহারায় কর দিত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যন্ত্রেণ যন্ত্র ভারত রাজ্য শাসিত হইত এবং তিনি যেখানে যে রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন; আজ পর্যন্ত ভারতে সেইরূপ শাসন গণ্ডিত প্রচলন হইয়াছে কিনা সম্ভব।

ভারত সম্রাটগণের ভিতর যাহারা বিহারে রাজধানী

নিৰ্মাণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন; তাহাদের ভিতর চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক প্রসিদ্ধ। বিহার তাহার এই দুইটা পুত্র ঘরাই ভারত ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। অশোক যে পৃথিবীর ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট, তাহা বলাই বাহুল্য। Mr. H. G. Wells লিখিয়াছেন “... “Asok was one of the greatest monarchs of history ... He is the only military monarch on record who abandoned warfare after victory” পৃথিবীর ভিতর ভারতবর্ষ ভিতর এমন বেশ খুব কমই পাওয়া যায়, যে স্থানের রাজা সম্রাটী সাজিয়াছেন। মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম শ্রাম, ব্রহ্ম, পশ্চিমভাষার, লন্কা, জাভা, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়। ইহা ভিন্ন ইউরোপ, আফ্রিকায়ও বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার আরো সমস্তই প্রজামণ্ডলীয় স্থিতির জ্ঞ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জ্ঞ ব্যয় হইত। অশোক সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে পাহাড়ে ও স্তম্ভে যে বাগী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার কীৰ্ত্তি ঘোষণা করিতেছে এবং করিবে। এই বাগীর অর্থ একমাত্র তিনিই ক্ষয়ক্ষয় করিয়াছিলেন।

### শিখ্যাক্ষা

মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর কয়েকজন সম্রাট পাটলীপুত্রে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজত্বকালে ভারতের রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে স্থানান্তরিত হয়। বিহার হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিহার পতন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তখনও বিহারের পতন হইল না বরং বিহারে শিখ্যাক্ষা ও শিক্কা বান্ধিত হইতে লাগিল। তাহার ফল—নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিকমশিলা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিহারে মুনবিগণের আনন্দচর্চা ও শিকার অনেক কেন্দ্র ছিল। বিহার বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে বহু বৌদ্ধ-বিহার নির্মিত হয়। এই বিহারে ভিক্ষুগণ বহু চারিমাংস (জৈষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের কিছুদিন) বিজ্ঞান



করিতেন এবং শিশুমণ্ডলকে জানোপদেশ দিতেন। আশিনের শেষে আকাশ মেঘশূন্য হইলে তাহার প্রচার কার্যে বাধিত হইতেন। এই সকল বিহার বৈশালী, রাক্ষুণ্ড ও বরাবরের পাহাড়ে বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে নিশ্চিত হইত। বৈশালীর ক্ষেতবন, রাক্ষুণ্ডের বেগুন এবং বরাবরের শিকাকেস্কের কথা কে না জানেন। যে সমস্ত বিহার অজ্ঞাতশত্রু এবং অশোকের সমন্বিত হইয়াছিল তাহার ভিতর রাক্ষুণ্ডের বিহার এবং—

### বক্রাবক্র

পাহাড়ের শিকাকেস্কই প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধ নন্দ্রণ লাভের পূর্বে এই পৃথিবীতে নানা আকারে ৫৫৫ বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন তখন পূর্বে পৃথক জন্মের সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি একে একে সমস্ত ঘটনাগুলি তাঁহার শিষ্টাঙ্গের নিকট বলিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই সমস্ত ঘটনা যে পুস্তকে স্থান পাইল তাহাকে জাতক বলা হইত। জাতকের অনেক গল্পই বিহার প্রদেশের অর্থাৎ বৈশালী ও রাক্ষুণ্ডের বিহার হইতে সংগৃহীত। বরাবরের শিকাকেস্ক সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যয়ন বিশেষ কিছু বলেন নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বরাবরে অশোকের সময় শিকাকেস্ক স্থাপিত হয়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালবাল বসোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার দুই একটা গুহা অশোক দ্বারা নির্মিত। বিবিসিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদ রাইচার পথে বরাবর পাহাড়ের শিকাকেস্ক গিয়াছিলেন, এখানে বলা আবশ্যিক যে, আমি পাতবঙ্গের আবার পাহাড়ে গিয়াছিলাম এবং সেখানে রাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সেখানে একটা শিকাকেস্ক ছিল। সেখানকার গুহা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, শিল্পকলা প্রাচীন মন্দির, বাস-ভবন প্রভৃতি মনপ্রাণহারী ও চিত্তবিনোদক, অশোকের পর হইতেই—

### নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়

আজ্ঞে আজ্ঞে উন্নতির শিবরে উঠিতে থাকে এবং হু ও বাদ্যাদার বৌদ্ধধর্ম বৃপতিগণের সমন্বিত উন্নতির

চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। সাধারণের দান ও ইহার নিম্ন আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহা তৎকালে পৃথিবীর স্রোত ও বৃত্তান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার প্রফেসর (অধ্যাপক) ছিল এবং দশ হাজার ছাত্র একত্র বাস, অধ্যাপনা এবং অধ্যয়ন করিত। এক সময় ছয় শত অধ্যাপক এক টাকা বেতনের বিক্রমপুর হইতেই আসিয়াছে এবং বিক্রমপুরের বজ্রোদ্ভিদী নামের অধিবাসী শিল্পক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট চীন পরিভ্রমক হুয়েনসাং পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নানা পুস্তকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে এখানকার ছাত্রাবাস দৈর্ঘ্যে ১২ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাত, কিন্তু নিশ্চয় সিদ্ধা দেখিয়াছি, দুই কদম বাসুপুত্রই দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাতের অধিক। বর্তমানে যে খোলাই হইয়াছে এবং হইতেছে এবং যে সমস্ত বস্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিলে কি যে মনে হয়, তাহা যিনি দেখেন তিনিই মার অশ্চর্য করিতে পারেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বাস্তবী বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে একটা বৃহৎ লাইব্রেরী ছিল, তাহাতে বহু সহস্র উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল। মুসলমান সেনাপতি বক্তায়ার বিলিঙ্গি উহার মূল্য বৃদ্ধিতে না পারিয়া উহা গোড়াইয়া দেন। নালান্দার ধ্বংসের সন্নিহিত—

### বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

নামে আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। বর্তমান যেখানে ভাগলপুর সহর, তাহার অনতিদূরে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল। শিক্ষা পদ্ধতি অধিক নালান্দার মত ছিল। নালান্দাতে যেমন মাত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয় একটা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল; এখানে তেমন ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান আরো অনেকগুলি বিভাগ ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একশতের অধিক প্রফেসর বা অধ্যাপক ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা শ্রেণি হইতে ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিত। বাঙ্গালার পাল রাজাদের রাজত্বকালে ইহার চরম উন্নতি ঘটয়াছিল। কিন্তু বিরূপ যে এই বিশ্ববিদ্যালয় দাস

প্রাপ্ত হইল তাহাই ভাবিবার বিষয়। এখানে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত।

কেবল যে বড় বড় শিকাকেস্কই বিহার প্রদেশকে গৌরবশালী করিয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে, বরাবর শিকাকেস্ক, নালান্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আরও অনেক ছোট ছোট শিকাকেস্ক সমস্ত বিহারেই ছিল। টোল গুরু মহাশয়ের পাঠশালা প্রভৃতি হইতেও অনেক বড় বড় পণ্ডিত বাহির হইত।

### হরিহর চক্রবর্তী

বিহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া হরিহরচন্দ্রের মেলাকে বাদ দিলে একদিক অসম্পূর্ণ রহিয়া যাবে। হরিহরচন্দ্রের মেলায় কথা ভারতের প্রায় সকল লোকেই জানে। কনিয়ার মেলায় কথা বাদ দিলে ইহাও পৃথিবীর বৃহত্তম মেলা। এই মেলা শুধু বিহারের নয়, সমস্ত ভারতের। পাটনা সহরের ট্রিক অফ তীরে গঙ্গা ও গওকর সমন্বিত হলে এই মেলা বসে। এই স্থানকে শোনিপুর বলে এবং ইহা বি, এন, ভাবল, আরএর শোনিপুর স্টেশনের অতি নিকটে। ভারতের সমস্ত রেলওয়ের সহিত ইহার সংযোগ আছে। প্রতি বৎসর কাঠিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলা আরম্ভ হয়। প্রায় একপঞ্চাশ এই মেলা চলিতে থাকে। কোন আদমিহালে এই মেলায় প্রথম আরম্ভ হয় এবং সেই হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে; ইহাও বিশ্বব্রহ্মের বিষয়। এই যে এত বড় একটা মেলা প্রতিবৎসর আগনি আরম্ভ হয়, আবার আদমিহালে যেহে—ইহার জ্ঞাত বিজ্ঞান দিতে হয় না, টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া দোকানদার আনাড়ির দ্বারা—ইহাও আশ্চর্যের বিষয়।

এই মেলায় একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা পশুর মেলা। যদিও ইহা পশুর মেলা তথাপি এখানে অজ্ঞাত বস্তুর পাওয়া যায়। প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যাবেলায় বহু বহু হইতেছে—কত পশু বিদেশে চালান হইতেছে, কত পশু মারা যাইতেছে তথাপি আমরা এই দরিদ্র ভারতের পশুদান এখানে হইতে অস্বাভাবিক করিতে পারি ইহা পশুদানের মেলা (A fair of animal wealth) হাজার হাজার হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, উট প্রভৃতি

বাস্তবী জন্তু এখানে আমদানী হয়। ভারতের নানা দেশের লোক তাহাদের ইচ্ছামত জন্তু ক্রয় করে।

কিন্তু এত বড় একটা মেলায় স্রষ্টা হইল, এমন সেই সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। প্রাচীনকালে অশ ও হাতী ছিল যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। যে রাজার যুদ্ধ অধিক হাতী থাকিলে সে তত বলশালী রাজা। এই জন্তু প্রত্যেক রাজাই যথেষ্ট হাতী ও অশ সংগ্রহ করিত। কিন্তু তখনকার দিনে সমস্ত ভারত হাতীরা হাতী ঘোড়া সংগ্রহ করা কম কষ্টের কথা ছিল না। এই কষ্ট মূর পরিবার জন্ত এবং বাহাতে সকল সহজে হাতী ঘোড়া ক্রীতে পারে তাহার বন্দোবস্ত হইল। ভারতের প্রধান প্রধান রাজারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী ধর্মভীরু। এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধর্মভীরু ভারতবাসীর জন্ত অনেক তর্জিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার নানা স্থান নানা ভাষায় হাতী গরু অনেক স্থানেই তর্জিফ হইয়া উঠে। হরিহরচন্দ্রও এই সকল তর্জিফের একটা। লোকজন এখানে তর্জি করিতে আসিত, বৈশালীর রাজারা ও অজ্ঞাত স্থানের রাজারা মিলিয়া এই স্থানেই মেলা বাসাইল। "লোকে রথও দেখিত কল্যাণও বেচিত" এই ভাবে এই মেলায় প্রথম আরম্ভ হয় এবং আজও নিয়মিতরূপে তাহা যক্ষির কাঁটার মত চলিয়া আসিতেছে।

### বুদ্ধজন্ম

গয়া যেমন হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বৃদ্ধগয়াও তেমন বৌদ্ধগণের এবং হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। ইহা বৌদ্ধদিগের নিমিত্ত বর্ণ। ইহা বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান হইলেও হিন্দুগণ এখানে পিতৃপুরুষগণের মূর্তি কামনা করিয়া পিতৃদান করিয়া থাকে। এই গয়ায় ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাহার প্রস্তাবে এক সময় ভারতের অধিকাংশ লোক তাহার ধর্মগ্রন্থ করিয়াছিল। বর্তমান বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুগণের পুরুষপুরুষগণ বৌদ্ধ ছিলেন সে কথা বলাই বাজল। বৃদ্ধগয়ায় স্রষ্টা অশোক নির্মিত অনেক প্রাচীরের অংশ এবং স্তূপ দেখা যায়। তখনকার দিনে ভারতীয় শিক্ষক যে শিবস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এই সমস্ত কাককাঁড়া হইতেই বুঝা যায়। বৃদ্ধগয়া চীন,



জাপান, কোরিয়া, ভায়, লন্ডা, নেপাল প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধগণ এখানে তীর্থ করিতে আসিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বিহার প্রদেশের বৌদ্ধগণ হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল, আজ সেই বিহারে বা বৌদ্ধগণের হৃদয়ের একজন শিষ্ঠও দেখিতে পাওয়া যায় না।

### বুদ্ধের আশ্রম

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহল বা লন্ডা হান্সিন্ধাত্তের তামিলপুত্রারা অধিকৃত হওয়ায় সিংহলবাসীগণ আশ্রমে আশ্রমে বৌদ্ধধর্ম তুলিতে থাকে এবং অজায় পথে চলিতে থাকে। তখন বুদ্ধ যোগ নামক একজন ভারতীয় ভিক্ষু সিংহলে গমন করিয়া সিংহলবাসীগণকে পুনরায় ভায় পথে কিরাইরা আনেন। এই সময়গী গয়ার নিকটবর্তী এক গ্রামে অল্পগ্রন্থে করিয়াছিলেন তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি তখনকার ভারতীয় সকল ভাষাই শিখা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের ও লন্ডার নানা স্থান ঘুরিয়া অনেক বৌদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

### বিদ্বানশক্তি

বাসাদী আজ বিভাগতির কাব্যকে কত আদর করে।

## সুদূরের আহ্বান

### ক্রীমতী মেহময়ী বজ্রজায়া

আজ মন বসেনা ঘরের কোণে,

বাহির পাশে ছুটিতে চাই!

আজ উত্তল বাবুর আবারে

বঁধন বড় টুটিতে চাই।

মুক্তি আনায় পেগো তোরার,

যাধা যে মোর বন্ধ জোরার,

আজ ঘুরে চান আশুল মনে

পথের দূলা লুটিতে চাই!

দিন কাটিছে বুধাই শুধু

তাহার কাব্য বাসাদা ভাবার একটা অমূল্য সম্পদ। মহাকবি রবীন্দ্র নাথ বিভাগতিরই শিষ্ঠ। কিন্তু এই বিভাগতি বিহারের লোক।

### শিল্পকলা

অজায় বিহারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মূর্তির ভিতর যে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ পাইত তাহা মৌঘ্যশিল্পীদের হান। বৌদ্ধগণ, নালন্দা, বরাবর পাহাড়ের ওহা ও অজায় মূর্তি বিহারের শিল্পকলার অলঙ্কার।

আমরা এখন আর ছই একটা কথা বলিয়াই বিহার লইব। বিহারের লোক চিরকালই সাম্যবাদী ছিল, তাহার সমুদ্রে যাহা নুতন হইয়া আসিয়াছে, সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। আপনাদের হৃদে স্থান দিয়াছে এবং মুসলমান শাসনকাল পর্যন্ত সে তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যৎ নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিহারীই সাম্যবাদী ও পরিচালক ছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিহারের আর সেদিন নাই—সকলেরই মূলমন্ত্র টিকি।

অলস বেলা ঘনিঘে আসে;

সবার মাঝে ঠাই হ'লনা।

কিচ্ছি একা কাহার আশে।

দুয়ের নেশা মাতাল করে,

কেমনে হায় রইলো ঘরে,

আজ টান পেয়েছে প্রাণ বঁধনে

অচিন দলে ছুটিতে চাই!

আজ মন বসেনা ঘরের কোণে

বাহির পাশে ছুটিতে চাই।



কৃষ্ণনগরের কনকারেস দক্ষ যজ্ঞে পরিণত হইয়াছে; হইবারই কথা কারণ ইহার মধ্যে ৪৫টি দলের প্রাধিকার লাভ করা উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম ইতিপেক্ষেই দলের একজন মাধ্যমী ব্যক্তি বাহাতে উক্ত দলের পগার বাড়ি এবং তাঁহার কোন আত্মীয় মন্ত্রীস্বের গদি পান সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা করিতে হইলে হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট নাকচ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; কাজেই প্যাক্টের বিরুদ্ধে এই দল আগাগোড়াই লাপিয়া আছে। প্যাক্ট ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া এখন লাভ নাই—তবে হিন্দু মুসলমানকে বন্ধন একই দেশে পাশাপাশি থাকিতে হইবে তখন দিনরাত স্বগড়া বিবাদ চলিবে কোন কাজের সুবিধা হইবে না, এটা ঠিক কথা। স্বতরাং উভয় দলের মধ্যে আপোষে একটা বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। আপোষ করিতে হইলে একদলকে একটুই স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, নতুবা আপোষ হয় না—তাই দেশবন্ধু হিন্দুদের একটু স্বার্থ ত্যাগ করাইয়া এই প্যাক্ট করিয়াছিলেন তিনি আজ জীবিত থাকিলে এ প্যাক্ট বদলাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভারতের দুর্ভাগ্য তিনি আজ নাই এবং তাঁহার মত আর কোন ব্যক্তিও দেশের নেতা হইবার মত নাই তাই মুসলমানগণ আজ তাঁর আবদারের প্রয়োজনীয় হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে আরও কতকগুলি অসম্ভব বকম দাবী করিতেছেন। ফলস্বরূপ তাঁহারাও আর প্যাক্ট চান না; মুসলমান সমাজে সার আবদারের যেকোন প্রভাব হিন্দু সমাজে কোন বাসালী নেতার সেরূপ প্রভাব নাই। মুসলমানেরা কাক হাঙ্গল করিবার জন্য স্বরাষ্ট্রাঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু—অন্তরে তাঁহারা যে স্বরাষ্ট্রাঙ্গল হিন্দুদের আহার অনেক প্রমাণ এই দাবীরা পাওয়া গিয়াছে তাঁহারা চানেন মুসলমানদের চাকরী বাকরী প্রভৃতি আর্থিক উন্নতি, এবং পদমর্যাদা। দেশের স্বত্ব তাঁহারা যে কিছু চানেন না

দেশ যে তাঁহাদের কিছু নহে ধর্মই তাঁহাদের যে সব, তাহাও গত দাবীরা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে—স্বতরাং বর্তমান অবস্থায় সাবেক প্যাক্ট আর চলিবে না—চলিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার উপযোগী একটা বোঝাপড়া কৃষ্ণনগরে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই স্বতরাং কৃষ্ণনগর কনকারেসে যে সর্বতোভাবে বার্ষ হইয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্যাক্ট নাকচ করা অতি সহজ কিন্তু শান্তি স্থাপনের প্রথা নির্দেশ করা অতি কঠিন।

কনকারেসের আর এক কীট সভাপতি ব্রীজকৃষ্ণ শাসনল মহাশয়ের প্রতি অনায়াস, যেক্ষত তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ যে তিনি বিদ্রোহ বাদীরে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন—সে, কার্যটা যে খুব গুরুতর অপরাধ তাহা আমরা মনে করি না এবং সেজন্য সভাপতির প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন যে কনকারেসের উচিত হইয়াছে তাহা মনে করি না। আমাদের মনে হয় ইহার ভিতরে স্বত্ব কোন গৃহ রাজনৈতিক চাল আছে কারণ স্বরাষ্ট্রাঙ্গলের বর্তমান কঠোর শাসনল মহাশয়ের প্রতি কিছু বিদ্রোহ বলিয়াই মনে হয়।

ফাঁকের ঘরে মজারো মিঃ জে চৌধুরী ভাষা সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় যে সভাপতি হিহাবে স্বযোগ্য ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—তবে স্বরাষ্ট্র বা ইতিপেক্ষেই কোন দলই ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না। মজারোটা এটা অবশ্য তাঁহাদের দলের অগ্রচিহ্ন বলিয়া বর্ণন বাস্তব হইবে কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না।

পাটনাতে হিন্দু-মুসলমান মিলন উদ্দেশ্যে এক সভা



স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম অস্থম্যান হোফাজত ইসলাম এই সভার প্রস্তাবগুলি আমাদের মন বলিয়া বোধ হইল না। সভাপতি ঐ বাহাদুর ইসমাইল বলেন মূলমান-বিধের গো-হত্যা করিবার অধিকার আছে। মূলমানের নিরিবিলিতে গো-হত্যা করিলে তাহাতে যদি হিন্দুরা বৈশেষণ করেন, তাহা হইলে হিন্দুই প্রথম আক্রমণকারী হইবেন। মূলমানবিধেরও ইহা ভোগা উচিত নয় যে, গণ হিন্দুসিগের উপাঙ্গ। মসজিদ উপাঙ্গনার সময় ছাড়া অন্য সময় যদি হিন্দুরা বিবাহ বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা মসজিদের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া লইয়া যান, তখন সেই বাজনা বন্ধ করিতে বলিবার অধিকার মূলমানবিধের নাই।

সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের উপাসনার একটি সম্ভবপর সময়ও নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, নতুবা সময় লইয়া আবার পরে গোল বাধিতে পারে। এই সভায় মালবাড়ীও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বাংলায় কি এভাবে চেষ্টা করা চলে না। এই সভা আশানুক্রিয় করিবার জন্য আমরা স্তায় আলী ইমামকে সর্বান্তঃকরণে দৃষ্টবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নেতার অভাবেই আজ দেশবন্ধুর সাধের স্বরাষ্ট্রালয় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তাহা অনেকেরই বুঝিয়াছেন। তনাই যাহেজে প্রসিদ্ধ স্বরাষ্ট্রী শ্রীকৃষ্ণ অনিলবণ রায় নাকি নেতাদের বাহির হইয়াছেন। পতিচারী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অরবিন্দ যোবকে স্বরাষ্ট্রাধিকার নারক পদে ব্রতী করিয়া চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের মনে হয় উহাতে বিশেষ ফল হইবে না কারণ বর্তমানে শ্রীমদ্রবিন্দ অন্য পদের পবিত্র হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নতুবা দেশবন্ধুর তিরোধানের পর বাঙ্গলার রাজনৈতিক গগনে ঐহাকে বেশিতে পাইতাম।

চৌরঙ্গীর দিকে ও ভবানীপুর এবং বিদ্যাপুর অঞ্চলে মোটার গাড়ীর উপযুক্ত স্থান রাখা আছে—উত্তর কলিকাতার অধিবাসীদের অল্পটুকু বোঝে উত্তরাংশে ঐকণ হুম্বর কোন রাখাই নাই। কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ দুই

দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হইবে দক্ষিণ অংশটা যেন রূপ কবীর রাস্তার ‘সুহোয়া রাণী’ আর উত্তর অংশটা ‘ছোয়ারাণী’—স্বরাষ্ট্রী কল্যাণী কর্ণারেশন দলক করিবার সময় উত্তরাংশের অধিবাসীদের হাতে চালা দিগে বলিয়াছিলেন সেই আশার চাঁদ এখন কার হইয়া তাহারের গলায় বসিয়াছে—অবস্থার বিমুদ্রাও ব্যতিক্রম হয় নাই যথা পূর্বত তথা পরাই আছে। বোলাসেন তাগো দিকে ছোয়ার মত সেণ্ট্রাল এভিনিউ নামক নতুন রাস্তাটির কতকগুলি উত্তর কলিকাতায় পড়িয়াছে—ধনীরা এখানেই একটু মোটরে বেড়াইয়া হাঁক ছাড়িয়া থাকেন কিন্তু এই রাস্তাটির অবস্থা কখনই ভাল দেখা যায় না—প্রায়ই ইহা মেঝেটী অস্বাভাব্য থাকে ইহাই দেখা যায় এবং রাস্তার মধ্য স্থানের দুই পার্শ্বে পাথরের ইট বাহির করা থাকে ইহাতে মোটার গাড়ীর বাতায়তে যে খুঁই অস্থিবিধা হয় তাহা বলা বাহুল্য। এ ছাড়া এ রাস্তায় ট্রাক্স পুলিশের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় দৈবদুর্ঘটনার সংখ্যা খুব বেশী হয়। একত্রে মোটার অধিকারীদিগকে যথেষ্ট অস্থিবিধা ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। গত সপ্তাহে চোর-বাগানের মোড় হইতে বিভ্রান্টীর মধ্যে দুইটা ঘণ্টানা ঘটনা—ইহার একবার কার পুলিশের অস্থপস্থিতি।

ট্রাক্স পুলিশ যদি এই রাস্তার পবিত্র ও গাড়ী প্রভৃতির গতি-সংঘত না করে তবে এই দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেই বাড়িয়া যাইবে। আমরা এ বিষয়ে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—এবং এইদিকে ট্রাক্স পুলিশের ব্যবস্থা করিতে অস্থ-বোধ করিতেছি। কারণ শাখার কনস্টেবলগণ প্রায়ই ব্যবস্থানে উপস্থিত থাকে না—হয় পানের দোকানে বসিয়া আড্ডা দেয় আর নহয় কোন বাড়ীর ঘোষাকে পড়িয়া নিম্নস্তরের আরাধনা করে ইহা প্রায়ই দেখা যায়। ঘণ্টানা ঘটিলে গোলমাল হইবার অনেক পরে ঘটনাস্থলে আসেন তখন অপরাধী গাড়ীখানি প্রায়ই পলাইয়া যায় এবং নির্দোষী বাহত গাড়ী ও তাহার অধিকারীকে লইয়া অনর্থক হর্যাস করে। এ শ্রেণীর ঘটনার মামলা উঠিলে হাকিমগণ সাধারণতঃ কনস্টেবলের উক্তিই গ্রাহ্য করেন—ফলে দোষীর দণ্ড হয় না ও নির্দোষীদের অনর্থক দণ্ড

ভোগ করিতে হয় ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। হয় না। এই শ্রেণীর পত্রিকা পাঠে যদি সর্বাধিকারীগণ এ সম্বন্ধে উপরওলাদেবের একটু দৃষ্টি না পড়িলে সাধা-রণের অস্থবিধা কিছুতেই দূর হইবে না।

ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধার-মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র মালিক পত্র। সম্পাদক—মিঃ কে বানানজি। ছাপার কারী, অক্ষর ও যন্ত্রাদির এজেন্ট হিসাবে মিঃ বানানজি মুদ্রণশিল্প জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল এই পত্রিকার লিপিবদ্ধ হওয়াতে ছাপাখানার মালিক ও কণ্ঠচারী উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ উপকার হইবে। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পত্রিকাখানি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ। এদেশের অধিকাংশ ছাপাখানার মালিকই লাভজনক ব্যব-সায় হিসাবে ঐ কার্যে নামেন কিন্তু উহাশে শিল্প হিসাবে উন্নত করা বা ঐ সম্বন্ধে কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন করার দিকে কেহই মনোযোগী হন না। কাজের ভার প্রায়ই অদ্বিতীয় বেতনভোগী কণ্ঠচারীর উপর হস্ত থাকে। বিনিয়োগ লাভ দেখাইয়া নিজের ছ’পয়সা লাভের জন্য তাহার ব্যত থাকে—ফলে মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি সাধিত

## সাহিত্যে চূরি\*

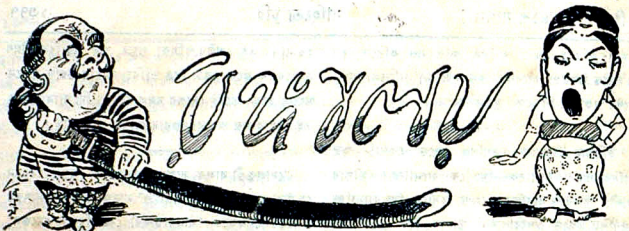
শ্রীকৃষ্ণকোশের দাস বি-এল

কিছু আগে পড়েছিলাম মনে আছে বেশ, ‘সাহিত্যেতে চূরি’ বলি জিনিস মনে। বড়ই কষ্টের কাজ তাব চূরি করা, ‘চূরি বিজ্ঞা বড় বিজ্ঞা’ না পড়িলে ধরা। ভাব চূরি ভাব চূরি আর চূরি ছন্দ, যত পার তত কর নহে কিছু মন্দ। তবে কিনা চাই তাতে খুব কেবাবতি, মাথাটি খেলাদানে আর করা হেঁকাতি। তাই আক্লিকালিকার বহু মনে হলো, অপরের বাড়ী ভাঙে বাড়াইছে হলো। নবমুখ হেরি নব নব ব্যতিচার,

নিজ বলি অপরের বামাল সাবাহ। বাণীর কমলবনে একি এলো রোগ, মধুপান তাজি কেন সিঁদ কাটা ঝোক। নবীনের বলে দেখি কিছু বাড়াবাড়ি, ‘হরিণ বাড়ী’তে লোভ হরিণাকী ছাড়ি। কিছুনি চলে যদি এই বহু নেশা, বাড়িলে বাড়িতে পারে বোজ্জবার পেশা। হায় হায় নাহি বেশি হায়া এক রতি, যুগপতি নোবে শুধু ঘটায় বিপত্তি। এই বেলো না সামালে বেড়ে থাকে বুক, এ রোগের মহৌষধ লাঠা ও চাবুক।

\* গত সংখ্যায় নবমুখের ‘স্বাংপণ্ডি না বিপত্তি’ প। পাঠে লিখিত।





## ভালবাসার অভিনয়

কীবেনে নর ও নারী একবার মাত্রই ভালবাসে—সে ভালবাসা আসে বস্ত্রাঘাত, সমস্ত বাধা-বন্ধন তাহার প্রাণে ভাসিয়া যায়—সে উঠে ভূতধ্বংস অগ্নিশিখার মত সব বন্ধ করিয়া ভেদে পরিণত করে—সে ভালবাসার তুলনা নাই—তাঁহা আসিবার পূর্বে জানাইয়া আসে না যাইবার সময় বলিয়া যায় না—সে ধর্ম বা সমাজের মুখ চাহে না বন্ধু বা আত্মীয়ের পরামর্শ গ্রহণ করেনা—সে ভালবাসা বেগান যায় না—বুঝান যায় না—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কেবল অহতবাকী করা যায়—সে ভালবাসায় জগৎ চলে না। সাধারণতঃ সংসারে বাস করিতে হইলে মাহুঘরের মধ্যে ঘেঁটু ফুঁ ভালবাসা দেখা যায় তাহার সীমা আছে, তাহা বিধিনিষেধে মানিয়া চলে এবং সাধারণতঃ ভালবাসা বলিলে তাহাই বুঝায়। তাহার মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে অব্যাহুসারে তাহার আবার হাস্য বুদ্ধি হয় অর্থাৎ সে নদীতে অমাবস্তা পূর্ণিমার প্রভাব আছে, তাহাতে জোয়ার ভাঁটা বধে। স্বামী যদি আকসে বোনাস্ পাইয়া সেই টাকায় অর্দ্ধাঙ্গিনীর জুতা এক জোড়া ব্রেসলেট গড়াইয়া দেন, তবে তাঁহার বাহুল্যতা ছুটি সেদিন নিকটেই পরম আগ্রহ তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিবে অর্থাৎ জোয়ার আগিরে। আবার বড়ির জ্বাঘের ছেলের ভাতে নিমন্ত্রণ যাইতে স্বামী নিষেধ করিলে দুখটা অশ্রুমাংস মেখে ঢাকা পড়ে অর্থাৎ প্রেম নদীতে ভাঁটা লাগে। বলা বাহুল্য এ শ্রেণীর ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা বলিয়া জগতে চলিতেছে—ইহা নিয়ে অভিনয়

করিবার সময় ইহাকেই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রায় অধিকাংশ নাটকই মানব চরিত্রের এই বৃত্তিটার উপর রচিত হয় স্বতরাং প্রায় সমস্ত নাটকের অভিনয়েই ভালবাসা অভিনয় করিতে হয়—এবং এই ভালবাসার অভিনয় বা 'লভিন্স গেম্' করা অধিকাংশ অভিনেতার সাধ—বিশেষ করিয়া নৃতন অভিনেতাশ্রেণে। হিরো বা নায়কের জুতাই এ সৌভাগ্য ব্যবস্থিত থাকে বলিয়া তাবৎ অভিনেতা 'হিরো' সাজিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন, সেই জন্ত নৌদীনি সস্ত্রাঘের মধ্যে কে 'হিরো' সাজিবে ইহা লইয়াই প্রায় গণভোগোল বাধে—অনেক সময় তাহা লইয়া মনস্তত্ত্ব বাঁধে ও সম্প্রদায় ভাঙিয়া যায়। স্বতরাং ভালবাসার অভিনয়ও যে একটা গুরুতর ব্যাপার তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই তবে এ রসের স্ব-অভিনেতা অতি কম—এ দেশে তো বটেই এমন কি ইংলণ্ডে 'লভিন্স গেম্' করিবার ক্ষমতা বর্তনানে খুব কম অভিনেতার আছে বলিয়া শুনা যায়। Sydney W. Carroll বলেন "How many players have we today capable of showing the grand passion? How many Actress in the Green Room Book of next year show genuine power and conviction in a love scene? ••• We have seen recently upon our stage an example of what was called a Great Lover but the love on that occasion had reached a degeneration and

enfeebled period, Cupid had assumed Crutches. He was in his old-age. One pictured him taking an occasional aphrodisiac to maintain his dying rages."

ভালবাসার অভিনয় করিতে অনেকগুলি গুণ থাকা আবশ্যিক; চুড়ান্তগোরে মধ্যে অন্তর্গত গুণের সমাবেশ এই-রকম অভিনেতার মধ্যে পাওয়া কঠিন সম্ভব হয় তাই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে ভালবাসা অভিনয় ভালভাবে করিতে সক্ষম এমন অভিনেতার সংখ্যা অতি অল্প। প্রেমিক সাজিতে হইলে প্রেমিকের মত বয়স, আকৃতি, কণ্ঠস্বর, আবৃত্তি কৌশল, ভাবাভিযাত্রার ক্ষমতা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে সংযম চাই। অসংযমী অভিনেতা ভালবাসার অভিনয় করিতে যাইলে অনেক সময় শীলতার গীমা অতিক্রম করিয়া ভালবাসাকে বীভৎসরূপে রূপান্তরিত করিয়া হাস্য-শব্দ হয়েন।

সংসারে বাস করিতে হইলে মাহুঘর ভালবাসা বৃত্তির যথেষ্ট পরিচালনা করিতে হয় স্বতরাং মাহুঘ মাহুঘেই ভালবাসার সহিত অস্বাভাবিক পরিচিত। তথাপি অভিনয় করিতে গেলে তৎকাল ১৯১১ লোক ভালবাসার অভিনয় করিতে পারেন না—ইহার কারণ কি? কারণ ইহা বাহির হইতে যেমন সহজ দেখা হয় স্বতঃই ইহা তত সোজা নহে—ভালবাসার অভিনয়ে আবশ্যকটা চিন্তা ও বিচার শরিক আবশ্যিক হয়। ঘরে মাহুঘ যাচা করে, তাহা শোভন হউক বা শোভন হউক সাধারণের তাহাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু শত শত দর্শকের সম্মুখে যখন ভালবাসার অভিনয় করিতে হইবে তখন অভিনেতাকে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। একমাত্র এই-রকম অভিনয়ে অভিনেতাকে সর্বদাই স্বরূপ রাখিতে হয় যে আদি অভিনয় করিতেছি—অর্থাৎ কাল্পনিক ভাবের প্রবাহে গা চলিয়া দিবার স্বাধীনতা অভিনেতার থাকে না। বিগত-দৌর্ব্যক অভিনেতা, কত মাথিয়া যুবক সাজিতে পারেন এবং শরীর ও কায়েদে তাহা হয়ত বরাদ্দও করিতে পারেন কিন্তু যৌবনের প্রাণ, যাহাতে আশা হিরোলিত হইয়া উঠে—চান্দনী, যাহাতে ধরা ধরনের রসে রসীন হইয়া উঠে তাহা কোথায় পাইবেন—যৌবনের

আগ্রহ—আকুলতা—মর্যাদা—বৃক্‌ভাঙ্গা শীর্ণনিবাস—অভিনয়ে এর পার্থক্য দূর। পড়িবেই কারণ সব দর্শক সব রসের বিচার করিতে না পারিলেও ভালবাসা। জিনিষটার সহিত সকলেই পরিচিত স্বতরাং ভালবাসার অভিনয়ে কোথাও ক্রটি থাকিলে তাহা সকলেই ধরিতে পারে। 'সদৌর্গঠিতা' পরস্মীকাতর ব্যক্তি ভালবাসার অভিনয়কে কদম্বা করিয়া ফেলেন—মাতাল হুশরিজ বা লম্পট অভিনেতা ভালবাসার পরিভ্রাতা নষ্ট করিয়া তাহাকে কদম্বা ও বীভৎস করিয়া ফেলিবেন কারণ অভিনয় কালীন নিম্নের স্বভাব অনেকটা অভিনয়ে প্রতিফলিত হয় বিশেষ করিয়া ভালবাসার অভিনয়ে। তার উপর অভিনয় কালীন মনের অবস্থার উপরও অভিনয় বিশেষ করিয়া নির্ভব করে, বিষম, অপ্রসন্নচিত্ত, উৎকণ্ঠিত, ভীত, শোকার্ত বা মুঢ় ভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রেমের অভিনয় করিতে যাইলে অস্বতর্কীয় হইবেন তাহা স্থির নিশ্চয়। দেশকাল পাড়ে ভেদে প্রেমের অভিনয়ের পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যিক—রাজার প্রেম অভিনয় প্রথা প্রজাকে সাজিবে না—আবার ভূতাতের প্রেম-অভিনয় প্রভুর মত হইলে চলিবে না—তবে এ সম্বন্ধে অভিনেতাকে বিশেষ সাহায্য করিবে নাটকীয় ভাষা—কারণ পাঞ্জ-পাঞ্জিয়ার 'অবস্থার' তারতম্য অঙ্গসারে তাহাদের বক্তব্যাম্বলের ভাষা ও পরি-বর্তিত হওয়া আবশ্যিক—এই ভাষা আবার এমন হওয়া চাই যাহা সাধারণের সম্মুখে বলিতে অভিনেতার লক্ষ্য-বোধ হইবে না অথচ মনের ভাব তাহাতে বেশ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। সেক্সপিয়ারের নাটকের ভাষাও প্রেমের অভিনয়ের পক্ষে সুবিধা অনেক নহে—অনেক অনেক প্রসিদ্ধ অভিনেতারের মুখে শুনা গিয়াছে। একথা প্রস্তুতকার এই বিষয়ে যোগ্যতা দেখাইতে না পারায় অভিনেতৃষ্ণের অভিনয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন ঘটনা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে সংঘাত না থাকিলে ভালবাসার অভিনয় উত্তমরূপে স্বায়ংপ্রাণী হয় না—তবে অভিনেতা বা অভিনেত্রী দক্ষ হইলে ইহাতে বড় আসিয়া যায় না—বাগলা রঙ্গমঞ্চে এক প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও এক স্ব-প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিঙ্গ থাক। সঙ্গেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালীন তাঁহার প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা বাহিনেতে দেখিয়াছি।



গ্রেমের অভিনয়ে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের যথেষ্ট সন্মান ছিল এবং তিনি গ্রেমের বিভিন্ন রূপকে অতি সুন্দর ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত করিতেন। স্রবর (কুম্ব-কাস্তের উইল) নাটকে তিনি গোবিন্দলালের ভূমিকায় আকর্ষণীয় হয়েছিলেন। রানীবাবুর শ্রেণীর ভূমিকায় অভিনয় আমাদের ভাল লাগে না, অবশ্য অজ্ঞাত রসের কথা গদাধরচন্দ্র (সদা) নিশাকর (স্রবর) তুলারচাঁদ (বলিদান) ঔরংজেব (সাজাহান) চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত) সিরাক (সিরাজকোলা) প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই চলে। ইরানীয় শিশিরবার গ্রেমের অভিনয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তবে তাঁহার অভিনয়েও অনেকগুলি মাত্রা অতিক্রান্ত হইয়া যায়; ইহা অভিনেতার দোষ কি বর্তমান কালের দোষ তাহা বলা যায় না কারণ ইংলণ্ডেও গ্রেমের অভিনয়ে সংশয় থাকে না। Sydney Carroll বলেন "The modern stage concerns itself greatly with 'love in its meanest and ugliest aspects'" যে কারণেই ইহা ঘটুক না কেন, ইহা বাস্তব নহে এবং রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচায়ক নহে এই মাত্র বলিতে পারি।

ভালবাসার অভিনয় সত্য সত্যই অতীব দুঃস্থ, কারণ ইহার সব কথাটুকু বাক্য করা যায় না—সতকটা চোখের ভাষায় ব্যক্ত হয়, সতকটা নীরব চাহনী বলিয়া দেয়—দুঃ দুঃ হিয়ার ভাষা বা অভিব্যক্তি দর্শক স্মৃতিতে পারে না।

আবার অনেক এমন আকার ইঙ্গিত আছে—যাহা রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা চলে না। এর চেয়ে যুগ্ম বা কোষের অভিনয় অনেক সহজ কারণ এ শ্রেণীর অভিনয়ে স্বাভাবিক মাত্রাটিকা ঘটিলে অভিনয় নিশ্চিন্দ হয় না। সারা বার্ষিক, এলেন টেরী প্রভৃতির গ্রেমের অভিনয় স্বয়ং করিয়াও বিলাতের দর্শকগণ এখনও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন—তাঁহার কারণ আজকাল এই শ্রেণীর অভিনয় একান্ত দুর্লভ হইয়াছে। সত্য সত্যই প্রেম সর্বত্রই মহান তাহা যথেষ্ট কি বাহিরেই কি। এমন কি রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অভিনয়ও সুন্দর এবং মধুর লাগে—তাছাড়া এই রঙ্গের অভিনয়ের সফলতার উপরেই প্রায় সকল নাটকের জন্ম না জন্ম নির্ভর করে কারণ গ্রেমের অভিনয় কদম্ব হইলেই সমস্ত অভিনয়টাই যেন কয়েক দাগ নীচে নামিয়া যায়।

ইংলণ্ডে গ্রেমের অভিনয়ে পূর্ণরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন লুইস ওয়েলার—ইহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট এবং গষ্ঠীর ছিল সেইজন্য রঙ্গমঞ্চে গ্রেমের অভিনয় ইহার একচেটিয়া ছিল বলিলেই চলে, তাছাড়া জর্জ এলেনগার ইনি পিনুরো ও হুটোর নাটকে প্রেমিকের ভূমিকায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। এডওয়ার্ড কম্পটন, ফ্রেডটেরী, চার্লস উইংহাম প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা প্রেমোভিনয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। লুইস ওয়েলারের পক্ষপাতিনী দর্শিকার সংখ্যা যুব বৃদ্ধ ছিল এবং তাঁহাদের

একটা ছোটখাট সমিতিও ছিল এই সমিতির ব্যাঞ্জে বা চিত্রে লেখা থাকিত K. O. W. ইহার অর্থ Keen on Waler অর্থাৎ ওয়েলারের পক্ষপাতিনী।

ওয়েলারের পর প্রেমোভিনয়ে ঐক্লপ প্রতিপত্তি পাইয়াছেন জিয়ার্ড ডুমরিয়ার ইংলণ্ডে নাট্যোমোহী মহিলাগণের মতে ইহার গ্রেমের অভিনয় নাকি অতীব মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। অবশ্য পুরুষ দর্শক বা সমালোচকদের মধ্যে অনেকেরই এই মত সমর্থন করেন না, সেটা ঈর্ষ্যা বশতঃও হইতে পারে কারণ গ্রেমের ব্যাপারে কি ন্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের মনে স্বতঃই ঈর্ষ্যা জাগিয়া থাকে। 'টাইমস্' পত্রিকার নাট্য সমালোচক মিঃ এ, বি ওয়াক্সলে একবার লিখিয়া ছিলেন "আমাদের দেশে জিয়ার্ড ডুমরিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক অভিনেতা" কথাটা সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা পড়িয়া মরিয়ার বলিয়াছিলেন যে তিনি যদি সত্যই স্বাভাবিক অভিনয় করিতেন তাহা হইলে কেহই পরশ দিয়া তাঁহার অভিনয় দেখিতে যাইত না। মরিয়ার নিজেই স্বীকার করেন যে একই ভূমিকা তিনি বরাবর একভাবে অভিনয় করেন

না। লুইয়েন গয়ট্রী (Lucien Guitrey) তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক হইতে বলিলেও তিনি তথ্য পারেন নাই প্রতি রাজ্যেই অভিনয়ে কিছু কিছু রদবদল করিয়াই থাকেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল স্বভাবের লোক; আর বদলাইবার লোভ সংগর করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকাণ্ড অসম্ভাব।

Leon Quartermaine ও Miss Fay Compton



(এডওয়ার্ড কম্পটনের কন্ঠা) গ্রেমের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মিস্ ফে কম্পটনের গ্রেমের অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকের ক্ষয় আহত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। কোয়ারটার মেন "Mercutio"র ভূমিকায় যেরূপ নাম কিনিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই মিস্ কম্পটনের সহিত রোমিও জুলিয়েটেরূপে দেখা দিবেন। Phillip Merivale-এর গ্রেমের অভিনয় যুব প্রাপবন্ত হইত কিন্তু ওয়েন নেয়ারস (Owen Nares) মরিয়ারের পরই আসন পাইবার যোগ্য।

অনেকে আবার Godfrey Tearle-র গ্রেমের অভিনয়ের বিশেষ সুখ্যাতি করেন। গভর্নি টারল ভালবাসার সর্বোচ্চ অবস্থা ও তাবের

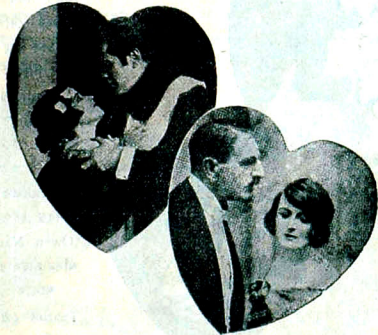




অভিব্যক্তি প্রদর্শনে সর্বশেষ নট্র এ বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যাসন  
ল্যাং ও রবার্ট লোরমের চেয়ে বড় কম যান না।



প্রেমের সম্বন্ধে অভিব্যক্তি করিতে রবার্টলোরম  
সিদ্ধান্ত—তাহার মধুর ভরাট আঙাঙ্ক ও সহাত মুখে  
প্রেমের বিদ্যা চমকাইয়া দেয় Cyrano de Ber-  
geracএর ভূমিকায় ইহার মত সাফল্য খুব কম ইংরাজ  
অভিনেতাই লাভ করিয়াছেন।



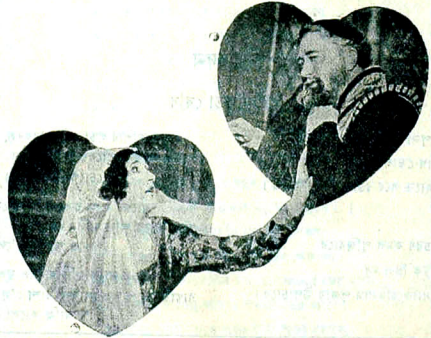
Passionate Lover (উত্তেজিত প্রেমিকের ভূমিকায়)  
হিসাবে Matheson Lang (ম্যাথিসন ল্যাং) এর  
ঝোড়া নাই এবং বয়স্ক প্রেমিকের ভূমিকায় মিঃ অরে  
স্মিথ (Aubrey Smith) অতি চমৎকার অভিনয়  
করেন।

প্রেমের অভিনয়ে মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই অভি-  
নেতাকে অনেক সময় দর্শক বৃন্দের নিকট উপহাস্যাস্পদ  
হইতে হয়—আমাদের দেশে তো ইহা ঠিক প্রত্যক্ষ  
করা গিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ আমরা এদেশীয় দর্শকবৃন্দকে  
'অসভ্য' বলিয়াই ব্যাপারটা শেষ করিয়াছি কিন্তু ইংলণ্ডেও  
ইহার ব্যতিক্রম হয় না—হুবিখ্যাত অভিনেতা Seymour  
Hicks (সেমর হিক্স) বলেন "There is always some  
humorist in the gallery ready to put a finger  
in his mouth during a love scene and make  
a noise like champagne cork popping." গ্যালা-  
রিতে প্রায়ই এক আধ জন এমন রসিক পুরুষ থাকেন  
যিনি প্রেমের অভিনয়ের সময় মুখে আতুল দিয়া মদের  
বোতল খোলার আঙাঙ্কের মত আঙাঙ্ক করিয়া  
থাকেন।) প্রেমের অভিনয়ে হিক্স নিজে একজন খুব



উৎকৃষ্ট অভিনেতা কিন্তু তিনি গাভীর্ধ্য রক্ষা করিতে  
পারেন না—এবং প্রায়ই একটু একটু 'সং'য়ের চং আনিয়া  
ফেলেন। নতুবা তাহার মতন প্রেমের অভিনেতা আর  
কেহ হইতে পারিত কিনা সম্ভেহ। তিনি ভালবাসার

বতায় প্রেমিককে ও সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দকে খেঁচ ভাসাইয়া  
লইয়া যান। ফ্রেড্ টেরী ও মিস জুলিয়া নীলসনের মত  
ভাবপ্রবণ প্রেমিক হিসাবে আশ্চর্য অতুলনীয়।





ভালমাহু্য নিরীহ অর্থাৎ গো-বেচারার প্রেমিকের  
ভূমিকায় মিঃ বরলিস এভির যথেষ্ট সুনাম আছে।

দি লেডী অব দি রোজ নামক নাটকে মিঃ হ্যারি  
ওয়েলস্‌ম্যান ও মিস্‌ জেনা ভেমারএর প্রণয়-কলহপূর্ণ  
প্রেম অভিনয় নাট্য জগতে চিরস্মরণীয় রহিবে।



জর্জ-টুলে একটু ডাকবাকো গোছের বেহায়া প্রেমি-  
মিকের ভূমিকায় যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়াছেন।

ও প্রেমের অভিনয় সখন্দে দর্শক ও দর্শিকাদের যথেষ্ট মত



ভেল থাকে স্বতরাং ঐ মতের জন্ত অনেক সময় অভিনয়  
সমালোচনার ফলে বিভিন্ন হয় অর্থাৎ কোন একখানি  
নাটক দর্শিকাদের হৃদয় খুব ভাল লাগিল কিম্বা সেটা  
দর্শকবৃন্দকে সেরূপ তৃপ্তি দিতে পারিল না।

মোটের উপর প্রেমের অভিনয় সখন্দে এসে এখনও  
বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে স্বতরাং এ সখন্দে আরও  
আলোচনা হওয়া আবশ্যিক।

## নিবেদন

শ্রীউমালতা ঘোষ

তোমার পূজা-ক'রবো ব'লে আজি,  
বেরিয়ে ছিলাম বিশ্ব-ভোলা প্রাণে  
হাতে লয়ে রত্নী ফুলের সাজি।

তোমার চরণ কমল পুজিবারে  
প্রাণে আমার যে টুক ছিল মধু  
সাজিয়েছিলাম পূজার উপাচারে।

আশায় গড়া নবীন বিবদল,  
বৃকের আগুন ভেমের শিখা হ'তো  
চোখে ছিল ব্যথার গলাজল।

স্বপ্নের তলে কপলা ছুয়ার মোর  
অযোগ্যারে অতি মলিন বোলে  
পূজার আশায় হ'লো আমার ভোর।

পড়ল সাজি ছড়িয়ে গেল তুল,  
ব্যথার তাগে অশ্রু আমার বাশ হ'ল শুধু  
বিশ্ব আজি কালো যেমন তুল।



দ্বিতীয় বর্ষ]

২২শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩, ইং ৫ই জুন ১৯২৬

[ ৪২শ সংখ্যা

## নিদায়ে সিন্ধুতীরে

শ্রীকালিদাস রায়

সন্ধ্যাবেলায় সিন্ধুবেলায় বালুকা খুঁড়িয়া আজি,  
হেলায় খেপায় কাল কেটে যায় গম্বিয়া লহরীসাজি।

কোটি কোটি খনি প্রোজ্ঞান কবকবিরাজ-গণ-সম  
চলতব্দ আছাড়িয়া পড়ে হরিয়া তটের তমঃ।

হ-জ-হ-জ হাওয়া,—শরীর মনের বদন তাহাতে উড়ে,  
বাসন-বাসনা দূষিত ভাবনা যায় সব তায় দূরে।

হেথা আসে বায় বহে নিয়ে আয় অমৃতের দেশ থেকে  
শাসনশ্রমের কুহরে কুহরে জমা করে' যায় রেখে।

ছিঁড়ি রাখকেতু করে প্রতিহত নিদামের অভিমান,  
পথন বাণে যে বার্ষ তাহার প্রবল অগ্নিবাণ।

তুনি তরঙ্গ—গজতরঙ্গ ত্রোহা বৃন্দন নাহ  
দূর হতে ভরে নিশায় পলায় মনে গণি পরমাধ।

গন্ধবহত নহে হেথা বায়,—নাগনে তজ্জীবহ,  
অসীম পোকের সম্মুখে আনে জিহ্বা স্বপ্নসহ।

সন্ধ্যার উপনিবেশে হেথায় বন্ধুর পারমুদে,  
সবে বাধাতার ইহ সংসার প্রহরার তরে কুলে।

নাগর নাগরী জুটে, পরিহারি নগরের উপন,  
উন্মি-মোলায় চলে চলে কুলে কেনকুল অক্ষর।

কোটি কোটি সিত ফেনিল চামরে বাজনের স্নেহ দানে,  
বিজরে আরাম সিন্ধু তাহার শরণাগতের প্রাণে।

কলকল্লোল তালে তালে তার সারা অস্তর দোলে,  
ঐরাবতের আরোহীর যেন 'স্বর্গদ্বার'-খোলে।



## হাসির মূল্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

হাসি আনন্দের একটি প্রকৃষ্ট রূপ বা সৌন্দর্য্য বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থা। হাসি যে মুখের সৌন্দর্য্য বাড়ায়, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। প্রাণের উজ্জ্বলিত পুংক যখন একটি উজ্জ্বল নিয়ে মুখমণ্ডলে প্রকটিত হয়, তখন আহার্য্য বলে থাকি, আ! কি মধুর হাসি! বাঙালার একজন প্রবীণ মনীষি লেখক বলেছেন,—সত্যাই “হস্তির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নরনারীর প্রমুখ মুখ।”

হাসি যে কেবলই সৌন্দর্য্য বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থা এমন নয়। পরক হাসিতে প্রাণের পীড়া, বেদনার জ্বালা উভয়েই প্রশমন লাভ্য ঘটে। এজন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে হাসি পীড়া প্রশমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মাহুদী। তিনি যিনি ছুঁবার প্রাণ গুলে হাসতে পারেন, তাঁর দেহমন স্বস্থ ও নীরোগ থাকে। কিন্তু মেয়েলী শাস্ত্র মতে,—“যত হাসি তত কাল্য বলে গেছে যাব শূন্য।” এ যেন জড়-বিজ্ঞানের Action re-action—ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। সেকালের রামশর্মা লোকটা যে খুব চতুর ছিলেন সে বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। কেন না পাশ্চাত্য বাধ্য এমন সহজে মেয়েলী ঢঙে চালিয়ে না নিলে সত্যনাতন ধর্ম্মের দেউলিয়ে হবার সন্তাবনা ছিল—আর্য্যবোরে আনা। এবং শাস্ত্রে বসুন্ধি আর কিছই নয়—সর্ব্বদ্বয়ের হাড্ডা হাসির কোয়ারায় মুখে প্রবীণদের গাভীরাঁয়ের পাখবচাপা দেওয়া মাত্র।

এসব শাস্ত্রোপদেশের প্রতি আমার প্রজ্ঞা কোন কালেই মিলে না। কোন জরুরী কাজ কেউ হোক বেবের হিন্দু করহে—যেই দরজার গোড়ায় গা দিয়েছে অমনি শব্দ হোস—টিক্‌টিক্‌। তার তখনকার চেহারা—দেখলে মনে হোত বেচারার মাথায় বোঁধ হয় বাজ গড় গড় হয়ে বেঁচে গেছে—তার এমনই একটা শোচনীয় অবস্থা। তত্পর আর কথা বার্তা নেই, তার সমস্ত

বুদ্ধি বিবেচনা, উৎসাহ যেন পার্থোমিটারের নীচে জিরো ভিত্তিতে তলিয়ে পড়লো! জ্যোতিষী এসে বলে,—পিংলেন ঘোলে টিক্‌টিক্‌র ডাক শুভ, কাজেই সামনে মাথার উপর ডাকের ফল হলো শুভ। এইভাবে ঈশানে, নৈঋতে, বামে, দক্ষিণে এই ফলের রকমারি ব্যবস্থা। ফল রাজ ঘোটক কিংবা অষ্টরক্তা যাই হোক, মানসিক উত্তেজনা আর অশান্তি ভোগ হয় গ্রন্থ। তারপর রানি নক্ষত্রের ফলাফলের সঙ্গে হাট, টিক্‌টিক্‌র ডাকের এমন ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে যে সেই গ্রহ কুটির নামতা টিক্‌ করা, সাধারণ গণিতজ্ঞের কাজ নয়। টিক্‌টিক্‌ যে রানি নক্ষত্র গুলে ডাকতে বসেন, আর হাটিক গুলে পল দেখে বেরোয়নি—একথা হয়তো টিক্‌। আর তারি ফলে যেনে পাড়া কোথায় উটে পড়বে, কে মোটা চাপা পড়বে, কে সাইকেল থেকে ছিটকে গিয়ে ধানায় ভুবে মরবে—ভগবান বেচারী অহরহঃ এই সব কথা কলশালী নিয়েই ব্যস্ত—একথা যেনে নেবার কোনই কারণ নেই।

এখন কথা হলো, হাসি জিনিষটা কেন? সাধারণতঃ আমাদের দেখতে পাই, শরীরের কোন কোন পেশীর সাময়িক ক্রমণ ও বিক্ষারণের ফলে হাসি উৎপন্ন হয়। চক্ষুর প্রান্তভাগ ক্রীতক ও মুখের চার পাশের পেশী সমূহের টানে আমাদের দম্ব বিকশিত ঘটে। সেই সময় নিঃশ্বাস-বহের অস্বচ্ছন্দের ফলে বল গল অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হয় বা অট্টহাসি শব্দে। উচ্চ হাসির সময় শরীরে অজ্ঞাত পেশী ও হস্ত মুগ্ধ আত্মাভিলাষ। এমন কি হাসির ধমকে লোক মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়; অধিক হাসিতে কান্নার কান্নার পেটে ঝিল ধরে বা বেদনা করে। অত্যধিক হাসির ফলে কোন কোন লোকের দৃষ্টিও ঘটেছে। হাস্যব্যব সময় অনেক হাততালিও দেন, তবে

দ্বিতীয় বর্ষ ৪২শ সংখ্যা]

হাসির মূল্য

১৩৮৭

সেটা হাসির অঙ্গ নয়। যেমন বক্তৃতার সময় টেবিল গাম্‌পাডানো কিংবা হাতের মুঠি শক্ত করা অনেকের অভ্যাস। হাসি স্বাভাবিক, এবং স্বতঃই তাহা উদ্ভূত হয়। রোগ করে হাসতে গেলে তাহা মুখের অস্বাভাবিক বিকৃতি আনমন করে। অনেক হাসি চেপে রাখতে শক্তও; ভিতরে হাসির ক্রিয়া উৎপন্ন হলেও বাইরে তা মুঠি বের হয় না।

হাসি দুই প্রকারে,—সম্পূর্ণ ও নিঃশব্দ। সম্পূর্ণ হাসি বহিঃবিঃ—১ খোলা হাসি, ২ অট্টহাসি, ৩ খিলখিল, ৪ তাড়প হাসি, ৫ পালভরা হাসি; আরো বহিঃবিঃ নিঃশব্দ হাসি সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার। ১ মুচকি হাসি, ২ মোঁচী হাসি, ৩ সাদানন্দ হাসি, ৪ দেতো হাসি ৫ মিজি হাসি। এ ছাড়া আর চের রকমের হাসি আছে। যেমন চাপা হাসি, হুটীল হাসি, বেকুং হাসি ইত্যাদি। অনেক সময় হাসির অবস্থা কেবলমাত্র চেপে ধাক্কা দিতে হইতে দেখা যায়। মুচকি হাসি কেবলমাত্র দম্ব ও ঠোঁটখুলেই বিকশিত হয়। অপরের নীচে ঠেং হাসির রেখার নাম মোঁচী হাসি। দেতো হাসিতে কেবলমাত্র মুখবিবরের বিক্ষারণ ঘটে সে জন্ত গ্রন্থ দন্ত বিকশিত হয়। মিজি হাসি সাধারণতঃ অপরিণত বয়স্ক শিশুর মুখে দেখা যায়। সাদানন্দ হাসিতে মুখে অট্ট গ্রন্থর হাসি লেগেই থাকে। পরের অঙ্গরূপে যে হাসি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বেকুং হাসি—অর্থাৎ না বৃষ্টিয়া হাসা। বৃষ্টিতে মুখে সাধারণতঃ পালভরা হাসি দেখা যায়; পালের দম্ব শিখা উপশিখার হাসি যেন ছাড়াই যেন পের আর খোলা হাসি ও অট্ট হাসি প্রাণের ভিতরের অধিক উৎসাহের সময় নির্গত হয়। খোলা হাসিতে মুখের যে খুর তার থাকে, অট্ট হাসিতে তাহা বিলুপ্ত হয়। অট্ট হাসির হাস্যাবস্থার সময় হইলে তাহা তুণ্ডে হাসিতে পরিণত হয়। তাড়প হাসিতে লোক ক্রোধে গড়াগড়ি দিয়া থাকে। কোন হাসি বা আনন্দের কারণ ঘটিলে শিশুরা খিল খিল করিয়া হাসে। আমাদের হাসি, পেটুকের হাসি, মোঁচী হাসি কিংবা উজ্জ্বল হাসি অট্ট হাসি হইতে বহিঃবিঃ। কোন দুঃখভিষিকি সম্পন্ন কিংবা তাহার মাদল্যের সন্ধানমাত্র হুটীলের মুখে সে হাসি প্রকটিত হয়, তাহাতে

সৌন্দর্য্যের কোন ছাপই থাকে না। মাহুষের ভিতর-কার একটা হিংস্র ভাব যেন তার মুখে চোখে মুঠি বের হয়। যে হাসিতে অন্তের মনে সন্তোষ আনন্দ করে না, তাহা প্রায়ই ক্রুদ্ধিম, কষ্টকল্পিত বা কাষ্ঠ হাসি নামে পরিচিত। সে হাসিতে মাহুষের মনে হাতীখিকা বা আতঙ্ক লগে, তাহা হাসি নয়, হাসির বিকৃতি বা মাহুষের পশুভাবের আত্মবিকার। হাসি সাধারণতঃ কোন আনন্দময়্যার বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়। এই হাসি জিনিষটাকে আমাদের পূর্ষ পুরুষদের অজ্ঞিত সম্পত্তি বলা যেতে পারে। কেননা এখনও এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা মোটেই হাসিতে জানে না। সিংহলের ‘ডেভা’ শ্রেণীর লোকবিগকে কখনো হাসতে দেখা যায় না। দেখা গিয়াছে হাসির দরুণ মুখের যে সকল পেশীর আত্মকল্প ও বিক্ষারণ ঘটে, তাহা তাদের দেহ। স্বভাবঃ হাসিশূন্য জীবনের দৃষ্ট অপরিসীম। মানসিক অবস্থার উপর এই হাসির পরিমাণ নির্ভর করে। কোন কোন লোকের মুখে কাটাচি হাসি হুঁতে দেখা যায়। আমি এমন একজন বিশিষ্ট লোকের কথা জানি, যাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বাছাবোরা কখনো তাহাকে হাসতে দেখে নাই। অল্প তাহার স্বভাবের স্বভাবের লেশ মাত্র নাই। রস-সাহিত্যে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাতে হাস্যরস গ্রন্থর পরিমাণেই ছিল, কিন্তু তাহার মুখে হাস্যরোমা কখনো বিক্ষারিত হয় না। ছেলেবেলা হইতেই তাহার স্বভাবের এই বিশেষত্ব। তিনি কখনো হাসিতে জানেন না। এমন লোকও দেখা যায়, সামান্য ঘটনায়ও যাহারা হাসিয়া আতুল হয় তাহা সর্ব্বদাই হাসিতে হাবুডুব খেয়ে থাকেন। তাহাদের প্রাণের ভিতরটা অন্ধ হাসিতে যেন ভতপূর হয়ে আছে, একটুতেই সে হাসি উজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। এমন লোকও দেখা গিয়াছে, যারা সংসারের সকল ব্যাপারে হাসেন। এমন কি কঠোর দৃষ্ট বেনদারও তাহাদের হাসি বিলুপ্ত হয় না। কিছুমাত্র আনন্দের কিংবা কৌতু-কের বিষয় উপস্থিত হইলেই তাহাদের হাসি উল্লসিত পড়তে থাকে। এইরূপ সাদানন্দ হাসি প্রাণের গভীর তুল্লি ও গ্রন্থর মানসিক শক্তির পরিচায়ক। তাহাদের সমস্ত দৃষ্ট কইই যেন এই হাসির নিকট পরাভ হয়।



আবার ইহার ঠিক উল্টা শ্রেণীর লোকও দেখা যায়, হাঙ্গি যাহাদের মুখে কখনো কোটে না। সমসারের সমস্ত কিছুই তাহাদের নিকট নিরেট ছন্দময়। চটুলতা হাত কৌতুক সম্ভবে তাহাদের নিকট নিভাছই নির্বাক। একদম মকট বৈরাগ্যের কিংবা দার্শনিকতার মিথ্যা অজ্ঞাহতে যারা অহরহ বিবর্ত থাকেন, তাহাদের মানসিক অবস্থা সভাই শোচনীয়।

উৎকর্ষ ভোজন ভ্রমের সমাগমে কিংবা প্রাণির সম্ভাবনায় পৌঁছকের মনে যে আনন্দ জন্মে, তাহাও হাঙ্গিতে প্রকটিত হয়। আবার ভালবাসায়, কোন কার্যে বিজয় লাভে বা কোন আত্মতৃপ্তির ফলে প্রাণে যে আনন্দ জন্মে হাঙ্গিতে তাহাও পরিষ্কার হয়। হস্তরাং হাঙ্গির প্রকৃত শব্দ বৃষ্টিতে হইলে তাহার বিশেষ অবস্থাতলি বৃষ্টিটানি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

হাঙ্গির বাহ্যবিকাশ ভিতরের আনন্দ ছাড়াও শরীরের বিশেষ স্থানের চাকলা দ্বারা উপস্থিত হয়। যেমন বগলের নীচে, পলার পক্ষাভাগে কিংবা পায়ের উল্লয় স্বচ্ছভূতি দিলে লোক হাসে। এই স্বচ্ছভূতির সহিত প্রাণের জিজ্ঞাসা করণ উৎসাহ হয় তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর তবে শরীর যত্নের কতকগুলি যান, ঠিক অঙ্গাঙ্গীরে চািরি দ্বারা। আনান্ডী লোকেও যেমন চািরি টিপিয়া সাধারণ শব্দ বাহির করিতে পারে তেমনি কারণ ব্যতিরেকেও স্বচ্ছভূতি দিলে হাঙ্গি উৎসাহ হয়, আনন্দ বা মানসিক অবস্থায় কোন অপেক্ষা রাখে না। যে চাকল্যের ফলে হাতের উজ্জেক হয়, তাহা অধিকাংশ সময় লোকের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে অনেক অনিচ্ছাকৃত লোককেও এই প্রক্রিয়ার ফলে হাঙ্গি যায়। তবে সকল সময়েই যে স্বচ্ছভূতি হাঙ্গি উৎসাহ হয় একথাও ঠিক নয়।

একজনকে হাঙ্গিতে দেখিলে অপরেরও হাঙ্গি পায়, অথচ সে জানে না কি জ্ঞান হাঙ্গিতেছে। হাঙ্গি এখানে সংক্রামক। একজন হাঙ্গিলে সেই হাঙ্গি পার্শ্ববর্তী সমস্ত লোককে একে একে আক্রমণ করে। ক্রান্তির একজনকে হাঙ্গিতে দেখিলে সমস্ত হাঙ্গির ভিতর সে হাঙ্গি ভাঙা-তাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। সময় সময় সেই হাঙ্গির বেগ এত প্রবল হইয়া পড়ায় যে তাহা থামানো এক কষ্টকর ব্যাপার

হয়ে পড়ায়। হাঙ্গির কোন বীজাণু আছে কি না চিকিৎসকরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অনেক সময় অতি সামান্য কারণে এমন প্রবল হাঙ্গি জন্মে যে, কিছুতেই, এমন কি বিশেষ চেষ্টা দ্বারাও সেই হাঙ্গির গতি রোধ করা যায় না। আমারও কয়েকবার এই রকম হইয়াছে। হাঙ্গিতে পেটে ঝিল ঝিল, পলাও যন্ত্রের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এমন কি শব্দ শব্দ হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু হাঙ্গি আর থামে না। এই হাঙ্গির ব্যাপারটা আমি সামান্য যে অল্প সময় তাহা ঘটিলে আনন্দে হাসতাম কি না সন্দেহ। সেই জন্তই মনে হয়, মনের আনন্দ উৎসাহাদী শক্তির কতগুলি অবস্থার উপর হাঙ্গির জিজ্ঞাসা নির্ভর করে। এই অবস্থার কলেই কখনো অতি সহজেই প্রবল হাঙ্গির রক্তা উপস্থিত হয়। অল্প সময় তদপেক্ষা অনেক গুরুতর কারণ ঘটিলেও হাঙ্গি উৎসাহ হয় না।

হাঙ্গির অপর দিক সম্পূর্ণ সামাজিক কেননা একলা লোকে কদাচিত হাঙ্গি। অন্তরে সাফাতে যে ব্যাপারের লোক হেসে গড়াগড়ি ধরে, নির্জন অবস্থায় সেই ব্যাপারের হয় তাগার মুখে সামান্য হাঙ্গির চিহ্নও দেখা যায় না।

অনেক সময় দেখা যায়, জানী লোকে একলা থাকিলেও খুব উচ্চ হাঙ্গি হান। শ্রীমৎ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ নির্জন বসে বসিয়া উচ্চ হাঙ্গিতে। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের সাধারণ নাম ক্যাং-টা। তারা সকল সময়েই হাসে। কেবল ঘুমিয়ে পড়লে তাদের হাঙ্গি ক্ষান্ত হয়। এক রকম হাঙ্গি আছে—হি হি করে হাসা; তাতে হাঙ্গির ভাব কিছুই প্রস্ফুট হয় না। তা' কেবল মাল লোক দেখানো হাঙ্গি; তাকে সয়তানী হাঙ্গিও বলা যায়। সেই হাঙ্গিতে নাসিকা বিবরের প্রাস্তভাগ বেশী ক্ষীণ হয় এবং চক্ষুর প্রান্তভাগ অধিক কৃষ্ণিত হয়।

আলকাল আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ চালা হাঙ্গি ও কাঠ হাঙ্গি। এটা মাছেরে বাতাবিক হাঙ্গি নয়। অনেক চেষ্টার ফলে শৈশবমূহুরে উপর এই ক্ষমতা লাভ করে যায়। শক্ত সমাগে এই কৃত্রিমতার মুখোবদে আবৃত্তক হয়। অজ্ঞকে সমস্ত করিবার জ্ঞান কাঠ হাঙ্গি হাঙ্গি প্রয়োজন। যথা, আঙ্গিরের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা

করিতে এই কাঠ হাঙ্গি অত্যাবশ্যক, কেন না, I am your most obedient Servant—আপনার দয়ায় ভারি খুশী। যদি কাল বাবুর পুটে সাহেবের বেজ্ঞ আপন হয়ে উঠেছিল। তবু সাহেবের দয়াও প্রশংসার নিশান উঠু করে ধরতেই হবে। আবার সহকর্মীকে সমস্ত কর-বার জ্ঞান একটু কাঠ হাঙ্গির প্রয়োজন। পোকানো পনারে সর্বজ্ঞই এই কাঠ হাঙ্গির ছড়াছড়ি। “মহারাজ, এদিকে ‘হাঙ্গন’—একটু কাঠ হাঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানিয়ে বোকাবী চার আনার কপি আপনাকে আট আনার ঠিকের বেবিয়ে। বিশ টাকার আলোয়ান গ্রিণ টাকায় বিক্রি করবার মত-লবে বোকাবী পুরেই একটু কাঠ হাঙ্গি ছড়িয়ে আপনার মনটিকে একটুখানি ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। রূপকবিনীদেও এই কাঠ হাঙ্গির পশরা খুলে বসতে হয়, কেননা তাহাদের হাঙ্গি হাঙ্গি হারার দায় বসতে হয়। অথচ জানিয়া শুনিয়াও কত লোকে এই হাঙ্গির জ্ঞান লাঘবিত হয়।

হাঙ্গির আদম উৎপত্তির কারণ বৃষ্টিতে গেলে দেখা যায় যে অশ-ভণ্ডা দ্বারা সময়েশ্রীর প্রাণীর প্রতি আনন্দ ও সহানুভূতি জ্ঞান নিয়ন্তরের প্রাণী জগতের মধ্যে এখনো বিস্তারন আছে। মাছেরে মত হাঙ্গি, এবং দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যে শব্দ উৎসাহ করে তাহা কতকটা মাছেরে হাঙ্গির শব্দেরই অল্পরূপ। হাঙ্গির সময় তাহাদের মুখ বিকৃত হয় ফলে দৃষ্টবিশাশ ঘটে, এবং নিশাঙ্গ যন্ত্রের সঙ্কটনের ফলে অল্পট শব্দ নির্গত হয়। পুণালের হস্তা-হস্তা হু-উ শব্দও কতকটা এই নিশাঙ্গস্বর সঙ্কটনের ফলেই ঘটিয়া থাকে। ময়ূরের কেকারের সমজাতীয় প্রাণীর প্রতি আনন্দ জ্ঞানের বই আর কিছুই নয়। শিশাটীকেও ঠিক মাছেরে মত দৃষ্টবিশাশ করে হাঙ্গিতে দেখেছি। সেই হাঙ্গির শব্দ দৃষ্টবিশাশ হি হি শব্দের অনেকটা অল্পরূপ। শিশাটীর বগলে স্বচ্ছভূতি দিলে ইহার মাছেরে মতই হাঙ্গি। এমন কি হাঙ্গির চোটে মাটিতে গড়াগড়ি যায়। বনমাছের ছাড়াও কতকগুলি ছোট জাতীয় বানর হাঙ্গিতে জানে, তবে সেই হাঙ্গিতে অধিক শব্দ হয় না। কুহুর যে হাঙ্গিতে জানে, সে কথা অনেকেরই জানেন। হায়েদার হাঙ্গি খুব উচ্চ, বহু দূর হইতে তাহা শোনা যায়। অত্যা-

দিক আনন্দে বহু লোকের হাঙ্গি কিংবা বালকের উচ্চ হাঙ্গি ঠিক হাঙ্গির হাঙ্গির অল্পরূপ। হাঙ্গির নিকটে আঙ্গিলে শিশু যেমন আনন্দে লাফায় ও হাসে, কুহুর আর হাঙ্গির অবস্থাও ঠিক তদধরূপ। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য, খেতে আরম্ভ করলে সে হাঙ্গি আর মোটেই থাকে না। তাহাদের পর উদর তৃপ্তির জন্তও আর হাঙ্গি নির্গত হয় না।

হাঙ্গির সময় মাছেরে যেমন ছুই পাশের গুলে সরে যাওয়া দৃষ্টবিশাশ বের হয়ে পড়ে, কুহুরেরও কতকটা সেই রকমের হয়। কোন কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়, একে অন্তরে শরীরে দাঁত বসিয়ে আনন্দ, প্রীতি ও ভালবাসা জ্ঞান করে। এই সে প্রীতির আলিঙ্গন বা পাত বসান, মাছ এখন উভয় হস্ত দ্বারা তাহা সম্পন্ন করে। আনন্দ-মুগ্ধ হাঙ্গি হাঙ্গি হইতে শব্দ হয় পক্ষীর মাছেরে পাতের ব্যবহারও কয়ে ঘটে।

হরয়ের প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞানের বিশিষ্টতা একমাত্র হাঙ্গিতেই ফুটে। আমি তোমার কার্যে কিরূপ প্রীতি হয়েছি মুখে বলতে গেলে তাতে কৃত্রিমতা থাকতে পারে, কিন্তু হাঙ্গিতে প্রাণের উৎস ছড়িয়ে দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দিলাম—আমি বাস্তবিক প্রীত হয়েছি। সেই হাঙ্গিতে কতটা সৌন্দর্য্য, দৃষ্টিতে প্রেমের বিশ্বস্ততা ও ভক্তি-তে অপূর্ণ মমুরতা ছড়িয়ে পড়ে।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় অনেক সময় কোন আক-বিকাল কিংবা মৃত্যুর চাকলেও লোকের হাঙ্গি হাঙ্গি ফুটে। এমনও দেখা গিয়াছে, ভূকম্পে সব ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, কিংবা আকস্মিক কোন রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই সময় লোক হেসে উঠেছে। আকস্মিক বিপদে তাদের মানসিক যন্ত্রের এমন বিকৃত অবস্থায় ঘটে যে মৃত্যুর প্রাকালেও তাদের মুখে হাঙ্গি ফুটে বের হয়।

ফরাসী দেশে কোন কয়লার মজুরকে কোন অপর্যবে কিছু কাল নীচে আবদ্ধ রাখা হয়। যখন তাকে উপরে এনে মুক্ত করে দিল, তখন সে এমন আট হাঙ্গি হেসেছিল যে অনেকেরই তাহাতে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। মান-সিক যন্ত্র বিকল হওয়ায় উদ্ভাবিত যে তাহা হাঙ্গি, তা' জনসল অনেকেরই মনে আতঙ্ক জন্মে।



হামীর জলন্ত চিত্তার পার্শ্বে শুয়ে সাক্ষীর মুখে যে প্রশ্নর হাতেরোথা প্রস্ফুটিত হইত তাহা অনেকেই ভুলিয়াছেন। মৃত্যুর পর সে যে হামীর সহিত মিলিত হবে, এই চিন্তায় সতীর মনে আনন্দ উপস্থিত হইত। ফরাসী বীরাদ্ধনা জোরানকে সকলে যখন আগুনে পুড়িয়ে মারলে তখনও তাহার বদনমণ্ডলে প্রোজ্জ্বল হস্ত রেখা ছুটিয়া উঠিয়াছিল; কেন না তিনি জানিতেন শীঘ্রই তাঁহার সকল যাতনার অবসান হইবে।

অস্বাভাবিক কিংবা বিজ্ঞপাত্তক কিছু দেখে, কোছুক-প্রশ্ন কোন হস্ত বা অভিনয়ে সে হাসি উৎপন্ন হয়, তার কারণ নির্ণয় করা দুঃসহ। উপহাস ও ঘৃণা মিশ্রিত হাসি কেন যে উৎপন্ন হয়, তাহা বলা আরো কঠিন। বিদ্যুৎ-কের নানা রূপ অঙ্গ-ভঙ্গী ও বিকল্প কথা বার্তায় লোকের মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক কিংবা বিজ্ঞপাত্তক অস্বকরণ বা অভিনয়ে সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর লোকই হান্তরসে আশুত হয়। মাজিকের সময় যখন কোন লোক সংক্ষেপে বেবুর বনিয়া যায়, তখন আমাদের হাসি পায়। যখন কোন লোক কাণে কলম গুঁজে কলমের নকশনে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে, তখনো আমরা হেসে ফেলি। বর্ষাকালে যখন কোন মোটা থলুথলে লোক কাদায় “পা শিছলে আনুর দর” হবার যোগাড় হয়—, তখন আমরা হেসে উঠি। কলিকাতার বাস্তব ঘ্রীষের বিনে আমার খোলায় পা শিছলে পথিক যখন হমজি

থেকে পড়ে তখন পার্শ্বের লোকজন হেসে উঠে। বিপদটা কিছু নয়, কিংবা তাহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তখনিহাঙ্গি নির্গত হয়।

যদি কেউ কোন ভ্রমতা বা শিষ্টাচার বিকল্প কাজ অনভ্যন্তরতার দর্শন করে ফেলে, তখনো আমরা হেসে ফেলি। যে কোন জিনিষ আমাদের চোখে অস্বস্তি তৈরী করে তাহাই আমাদের মনে আনন্দ আনয়ন করে। যে জিনিষটা সত্যই করতে গেলে আমরা ক্রুদ্ধ হই বা মনে বেধনা পাই, যখন সেই জিনিষটার নকল প্রতিমূর্তি দেখি, তখনও আমাদের হাসি পায়। ক্রুদ্ধ হ’লে মুখের যেমন বিকৃতি ঘটে, তেমন ভাব যদি আর কেউ হবহ নকল করে দেখায়, তখন আমাদের হাসি পায়—ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের হাসি, প্রশংসা ও বিজয় লাভের হাসি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা যায় যে যেমন আত্ম-পরিপূর্ণ হইলে আনন্দে অপরের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের ভাব জন্মে, তেমনি চাটুকারের গুণ বা দশকীর্তনে অতিশুকৃত হবার ফলে স্বীয় আত্মপ্রদানের প্রাবল্যে আনন্দ উপস্থিত হয়।

বিষেব বা হিসা পরবশ হয়ে লোকে যে রক্ত প্রশ্রবন করে, তাহা হাসি নয়, ক্রোধের চিহ্ন মাত্র। ছোট ছোট ছেলেরা খেলায় পরাজিত হলে কিংবা জয় হলে তেমনি মুখ বিকৃতি করে। পাঠকেরা নিজেরাই এই হাসির মূল্য দিয়ে প্রবেশের মূল্য যাচাই করে নিবেন।

## স্মরণে

### শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

সে এক শাঁক্কের এক নিমেষের হাসি  
চকিত মিলাল প্রাণে বাজাইয়া বাঁশী।  
ধরা সে বিল না আর; রহিল গোপনে,  
এমনো হৃদি, আস্তে বাজিছে স্বরণে।



## সোণার কাঠি

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়

### এক

বিবাহের রাতেই স্বরমার হৃদয় মুখখানি দেখিয়া বিজয় আপনাকে ধজ মনে করিয়াছিল। মূলশখার রাতে যখন সে স্বরমাকে তাহার নির্জন কক্ষে লাভ করিল, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। যথের মধ্যে আলো জলিতেছিল; তাহারই আলোকে, ইয়ং যেমটা-ঢাকা, পাতার আড়ালে আঁধা কোটা গোলাপফুলের মত, স্বরমার লক্ষ্যরক্ত মুখখানি বিজয়ের ঢক্ষে স্বর্ণের সৌন্দর্য্য স্বজন করিল। রক্ত ধারের বাহিরে কতকগুলি উৎসুক প্রাণী যে, অকারণে নিস্ত্রাশ্রয় বিসর্জন দিয়া এই নব দম্পতীর নব প্রেমলাপে ভুলিবার ভ্রত অসামর্থ্যসংকারে নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল, এ ব্যাপার পূর্ন হইতে জানা থাকিলেও, বিজয়, এই মধু-যামিনীতে স্বরমাকে দেখিয়া সে কথা একবারে ভুলিয়া গেল। সে স্বরমার দিকে অগ্রসর হইয়া শান্ত সিদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল “স্বরমা!” ভাবান্তরিত্যে তাহার স্বর কাণিয়া উঠিল। স্বরমার কাণে সে স্বর প্রবেশ করিল। সে কোনও উত্তর দিল না। বিজয় আবার তাহারকে আবেগভরা কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—তোমার মুখ আমার দেখতে দেবে না স্বরমা? ... আমার কাছে আবার যেমটা কেন হ’ল?”

স্বরমার সাগর অঙ্গে লক্ষ্যর বাণ ডাকিয়া তাহাকে সজ্জিত করিয়া তুলিল। আনন্দে, লক্ষ্যর আর ভয়ে তাহার সর্গ অধঃকরণ কাণিয়া উঠিল। কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল! লক্ষ্যাহৃদয় মুখখানি তুলিয়া, বিজয়ের দিকে একবার চাহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু মাথায়, কে যেন তাহার বিশ ঘণ বোকা চাপাইয়া দিল। তাহার মুখখানি আরও অবনত হইয়া পড়িল।

বিজয় একটি স্বর হইল। সে আশা করিয়াছিল একটি কথা, অতি মিষ্ট কথা তাহার কাণে আসিয়া বাজিবে। একবারে তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পনিয়া তাহার প্রাণকে ব্যাকুল করিবে। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। স্বরমার সন্কেত লক্ষ্য করিয়া সে যখন বৃষ্টি দাক্ষণ লক্ষ্যর সে কথা কহিতে অক্ষম, তখন বিজয় স্বরমার হাত ধরিয়া তাহার কক্ষমান শরীরকে তাহার কাছে টানিয়া লইল। পরম আবেগে, একহাতে স্বরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপর হাত দিয়া, তাহার মুখের উপর হইতে যেমটাটা খুলিয়া দিল। লক্ষ্য ও আনন্দে স্বরমার তন্ত্রাঙ্গ চক্ষু হুইতি বড় মনোরম দেখাইল। মুখে প্রসূর আনন্দের আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বিজয় আবেগভরা কাতর কণ্ঠে বলিল—“আমি তোমায় দেখে অবধি পাগল হ’ল!”



হবে; তোমার আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি হুমা ... তুমি আমার একটু ভালবাসবে না হু? ” বলিয়া উভয়ের আশায় সে তাহার উৎসুক দৃষ্টি হুমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিল।

স্বামীর অঙ্গ আদর পাওয়া যে কতখানি আনন্দ ও গর্বের কথা সমবয়সী সখীদের কাছে হুমা তাহা অনেক-বার চিন্তা করিয়াছিল। তাহার প্রাণে আনন্দের বজা ছুটিয়া গেল। মুখে একটু মুহু স্থিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মুহু তুলিতেই স্বামীর স্বাভাবিক দৃষ্টিপথে তাহার দৃষ্টি নিমিলিল। মুখে কি বলিতে গেল কিছু কথা বাহির হইল না; সে ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল তাহাকে সে ভাল-বাসিবে।

বিয়েয়ের প্রাণে পুলকভিত্তি খেলিয়া গেল। সে হাসিয়া হুমার মুখখানি ধরিয়া আদর মাথা কর্তে বলিল—“না, ও খাড়া নাড়লে চাবে না হুমা, আমার একটি কথাও উত্তর তুমি দাও নি; একটি কথা বল—বল ভাল বাসবে।

হুমার প্রাণ আনন্দে তরিয়া উঠিল। লজ্জা-কম্পিত কর্তে সে যখন বলিল “বাসবো” তখন বিজয় আত্মপ্রাণে হইয়া, তাহার মুখ তুলিয়া তাহাতে প্রণয়ের বিজয় নিশান উড়াইয়া দিল।

### ছাই

দুটি প্রাণে প্রণয়ের দ্বন্দ্ব ভায়ে জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহারই সিঁধ আলোকে, সংসারের অভাব অসুবিধার ঘন অন্ধকার দূর করিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গেল। কন্যার গজা সোণার স্বপ্ন দেখিয়া, মায়াপুত্রীর মধ্যে বাস করিয়া যখন তাহাদের দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল সেই সময়ে হঠাৎ একদিন বাতাব সন্ধ্যাতের কঠোরতা রুম দৃষ্টি লইয়া তাহাদের সমুদ্রে উপস্থিত হইল। হুমে দুঃখে একমাত্র সংসারের বন্ধন, আর পরম আশ্রয় স্থল, বিজয়ের পিতা যেহীন ইহুসংসারের মাথা কাটাঁইয়া পর-লোকের আনন্দলাভের আশায় চলিয়া গেলেন, সেদিন বিজয়ের চক্ষে, এই আলোক ভরা পৃথিবী যেন অন্ধকারের অতল গলবে ছুবিয়া গেল। ছেলে বেলায় তাহার মা

তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এই পিতার কোড়াই ছিল, তাহার একমাত্র আশা ভরসার স্থল। সংসারের দুঃখ-দৈন্যের তাপ কখনও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। একদিনের অল্পবে, পিতার এই অক্ষাণে মৃত্যুতে সে শোকে মূগ্ধমান হইয়া পড়িল। হুমারও তাহার এই শোকের ছায়ায় মগ্ন হইয়া পড়িল। স্বামীকে কি করিয়া এই শোকের সময় সাহায্য দিবে তাহা সে কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

দুঃখের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া, বিজয় হুমা পাড়াইয়া বলিল, কিন্তু তখন সংসারের নিত্য নতুন শত শত সমসার বিভীষিকা আসিয়া তাহাকে বিরত করিয়া তুলিল। একটি সপ্তাহব্যাপী আফিসে সামান্য বেতন পাইয়াই এতদিন তাহার বেশ স্বখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গিয়াছে; সংসারের কোনও অভাবই তাহাকে স্পষ্ট করিতে হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর, সেই সামান্য টাকার সংসার চলা একরূপ অচল হইয়া উঠিল। পিতাও একমাত্র বলত বাড়ীখানি ভিন্ন মগ্ন কিছুই রাখিয়া যান নাই। হুমা এই অবস্থায় যথেষ্ট সাহসে বুক বাধিয়া স্বামীকে সাহায্য দিয়া বলিল “কি হবে মিছামিছি ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে? ভগবান যা দিবেছেন, তাতেই বেশ চলে যাবে।” রাগুণীর আর দরকার নেই, আমি নিজেই সব করতে পারব। কিছু ভাবতে হবে না।”

হুমার রান্নার কাজ করিবে, ইহা বিজয়ের প্রাণে দুঃসহ হইল। সে অনেক আপত্তি তুলিল কিন্তু হুমার কথাতেই শেষে তাহাকে সন্মতি দিতে হইল। পটু হুগুণীর মত নিপুণ হতে হুমা সংসারের কাজকর্ম করিয়া, স্বামীর বিরস মুখে আনন্দ ফুটাইবার জগ প্রাণপাত করিতে লাগিল।

সংসারের নিত্যকর্ম, অভাব গীড়নের তাপে, দুটি প্রাণীর প্রেম শতরত্ন, ধীরে ধীরে শুকাইয়া মগ্ন হইয়া পড়িল। অকারণ হাসি, অনাবিল গল্পবোত, উভয়ের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ কমিয়া যে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া আসিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বৎসর খানেক পরে হুমা যখন একটি পুত্র প্রসব করিল, তখন উভয়েই

প্রাণে প্রাণে বুকিল, তাহার সংসারেরই একজন। বিজয় একবার বিবাহের পরের দিনগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল; কি আনন্দেই না তাহার সেগুলি উপভোগ করিয়াছে! চবিঘা জীবনের কি স্বচ্ছন্দই তাহার না মনে মনে ঠাকিয়াছিল। তাহাদেরই প্রতীক হইয়া যে সব ছোট ছোট মেয়েরা তাহাদের কলহাঙ্গে ঘরখানিতে নন্দনের আনন্দ মাগিয়া তুলিবে তাহাদের কি সাধারণ আদর করিবে, তাহাও নিজেদের মত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কল্পনাকে সত্য করিয়া, শিশুর হাসি যখন তাহাদের ঘরে আলোক জ্বালিল, তখন তাহাকে সমাদর করিবার মত শক্তি আর বিজয়ের ছিল না। নিবিড় প্রেমের সময়, তাহার ভবিষ্যৎ আগমনকে শাস্তির উৎস বলিয়া ভাবিয়া ঠিক করিয়াছিল, তাহাই আদর ভনে শক্তি বলিয়া তাহার মনে হইল। তাই সেদিন হুমা যখন শিশুকে কোলে করিয়া একখানি ছোট কাঁধায় বসান হুতা দিয়া স্থল তুলিতেছিল, তখন বিজয় আক্ষেপ করিয়া বলিল “আর যত বাহার করে ওসব তৈরী করছ কেন হু? আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ে আসা ত আর আমাদের নয়! ভাল করে খেতে যে পাবে না, তার বিজ্ঞানা, যেমন ভেতন হইলেই চলে যাবে। আমি ভাবছি কি হু ও আমাদের এখানে পাবে! অথচ এমন অনেক বাড়ী আছে, যেখানে ও জম্বালে বাড়িতে আনন্দ আর রত না।”

হুমার আনন্দমগ্ন মুখখানি স্বামীর কথায় মান হইয়া গেল। শিশুকে বুকে তুলিয়া, একটি আদর হুমা দিয়া সে দৃষ্টি করে বলিল “কি যে বল তার ঠিক নেই; কেন কিসের অভাব ওর? আমাদের যদি এক মুঠো ভোটে, ওর আর পাওয়া জুটবে না? ভগবান দিবেছেন

হুমে ওর খাবার ব্যবস্থা করেই পাঠিয়েছেন।” বিজয় একটু মান হারিয়া বলিল “তা ত ব্যবস্থা বসেছেন, না হলে পথের ডিবাখীর ছেলে মেয়েরা বাঁচে কেনে করে? একটা ছেলে, তাকে ভাল করে খাওয়াই রাখতে পারব না, এক কি অপূর্ণায়েক কথা? অথচ আমরা আগে কি করে ছেলে মেয়েকে মাহুদ করব, মত ঠিক করে চলিযু, তা মনে আছে ত? ... ...”

“সে সব কথা ভুলে যাও, কেন আর ভেবে মন খারাপ করছ ... ... লোকের কি আর ছেলে মেয়ে হয় না, না, কেউ মাহুদ করে না? ও যেমন বরাত করে এসেছে, ও ভেতনি পাবে; আমরা ত জাবলে অম্বদ করতে পারি না।” অত ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, ভেবে ভেবে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। দেখ দেখি তোমার কথা শুনে খোশাও হাসছে—” বলিয়া শিশুর হাসিমাখা মুখখানি হুমা তরিয়া দিল।

### ভিন

বিজয় যে শিশুর আগমনে ভাবনার অস্তর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকেই ছুই মাসের মধ্যে এত ভালবাসিয়া ফেলিল যে, আফিসের কয়েক ঘণ্টা সময়, শিশুর অভাবে বড়ই কষ্টে কাটিতে লাগিল। হুমারও ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইল। সংসারের কাজকর্মে তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত; শিশুকে দেখিবার মত সময়ের প্রাচুর্য ছিল না; বিবাহারি পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত কষ্টের সংসারটি সচল রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। বিজয়ের মনও সংসারের চিন্তাভারে সর্বদা অগ্রসর থাকিত। তাহার উপর তাহার প্রাণে যেটুকু বৈধব্য-বন্দনা ছিল, সেটুকু সমস্তই তাহার ছোট শিশুটি দ্বারা পরিণত হইয়াছিল। কাজেই, অভাবের সংসারে টাকা পরস্যা লইয়া যে কথাবাড়ী, উড়াতে, তাহাতে আর বাহাই থাক, সম্ভ্রান্তির যে গম্ভীর ছিল না তাহা না বলিলেও চলে। হুমা অগত্যা ঝিকে ছাড়াইয়া দিয়া, নিজের ভ্রমের মাজা বাড়াইয়া তুলিল। বিজয় হুমার কষ্ট লক্ষ্য করিল, কিন্তু লক্ষ্যই মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না।

দুঃখের সংসারে কোনও ভাবে দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু মাস কয়েক পরে হুমা যখন অল্পে পড়িল, তখন নিত্য চলা দিনগুলি হঠাৎ যেন অচল হইয়া উঠিল। মানসিক চিন্তা আর শরীরের উপর অত্যধিক ভ্রমের অত্যাচারে হুমার মাথা জাড়া পড়িয়াছিল। অল্পের প্রথম অবস্থায়, দুঃখের সংসারে মাথা সচরাচর হয়, তাহাই হইল। কিন্তু যখন অল্পের অস্থখ না সাধিয়া, ক্রমে বাড়িয়া হুমাকে লম্বা লইতে বাধ্য



করিল তখন বিজয় বিশেষ ভাবে বিরত হইয়া পড়িল। সংসারের ভার ত সমস্তই তাহার মাথায় পড়িল, উপরন্তু স্বরমার অশ্বথের চিহ্ন। ভাক্তার আনিয়া স্বরমাকে দেখান হইল কিন্তু তিনি যে সমস্ত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বিজয়ের মনের অগ্রসরতার স্বাক্ষর আরও ঘন হইয়া উঠিল। দুই মাস কাল বিশ্রাম না পাইলে স্বরমার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, বিজয় শিশুর ভার স্বরমার হস্তে দিয়া, কার্যক্ষেপে দিন চালাইবার জন্য উজ্জাগী হইল।

ভাক্তারের নিষেধ অমান্য করিয়াও স্বরমা থাণসাধ্য গৃহবানীর কাছে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিত। শিশু বড় হইয়াছিল; রোগ-পাণ্ডুর শীর্ণ দেহে তাহাকে দেখা-চেনা করাই তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জাত সে নিজের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া বামীকে তৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। দারুণ অর্ধাভাবের জন্য তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল তাহারই দুই একবানি সামান্য গহনাদ, বিনিময়। বামীর মনের অবস্থা, এই অভাব ও সংসারের পরিশ্রমে অববর্নীর হইয়া উঠিয়াছিল। যতই নিজেকে কষ্ট ভোগ করিতে হইত, বিজয় ততই স্বরমার প্রতি বিরক্তি অস্বত্ব করিতে লাগিল। আশ্রিত হইতে কিরিবার সময় একদিন ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, বিজয় কক্ষকর্তে স্বরমাকে কনাইয়া বলিত—“ছেলেটা কেঁদে মরছে, গুটাকেও একটু দেখতে পার না? আমার কথা ছেড়েই দাও, ... মরণও ত হয় না। ...”

স্বরমা মাথার যন্ত্রণার তখন অবির হইয়াছিল। বামীর কথা শুনে নিজের যন্ত্রণার উপেক্ষা করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া ছেলেকে সাবান দিবার জন্য অগ্রসর হইল। বিজয় ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেলের স্থরে বলিল “খাঙ্ক তের হয়েছো,—এমন তের খাঙ্ক” ভাক্তারকে পয়দা-গুলো দেওয়া হচ্ছে,—আর রোগ বাড়িয়ে তুলে কাঙ্ক নেই ...”

স্বরমার দুই চক্ষু গলে ভরিয়া উঠিল। একবার সে বলিবার চেষ্টা করিল, ‘ভাক্তার আর দেখাইতে হইবে না, ... কিন্তু’ অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া

আসিল। বামীর স্বভাব যে অভাবের গীড়নে দিন দিন কঠোর হইয়া আসিতেছিল, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে। নিজেকে সখ্যত করিয়া সে বিজয়ের কোল হইতে শিশুকে লইয়া বলিল “দাঁও তুমি তাকে আমার কাছে, আমি দেখছি” বলিয়া সেইখানেই শিশুকে লইয়া বসিয়া পড়িল।

দুই মাস কাটিয়া গেল কিন্তু স্বরমার শাশুরের কোনও উন্নতিই দেখা গেল না। লোক অভাবে পোকার অর্থ হইতে লাগিল। একদিন জল ঘাটিয়া পোকার যখন গা গরম হইল, তখন বিজয় কিঞ্চ হইয়া উঠিল। বিরক্তির সমস্ত বিষ স্বরমার অঙ্গে ঢালিয়া সে বলিল ছেলেকা জল যেটে অস্থির পড়ল, গুটোও কি একটু দেখতে নেই? একা আমি কত দিক দেখব? নিজে ত বিছানা নিচ্ছে গুটোর আর নাম নেই ... ছেলেকা হয়েছে এখন আপন বলাই ... আমাকে ত খাঙ্ক, গুটাকেও না খেলে চলবে না?”

স্বরমার চোখ বিয়া আবেশের দ্বারা ছুটিল। কপিত কিয় কণ্ঠে সে বলিল “একটু তোমার বাতাল না মুখে, এ কথা বলতে? আমিই ত এখন আপন বলাই ... ও বেচারী কি করলে? সতি, যব আমাকে তুলে আছে দেখছি? আমার জন্য তোমার এই দুর্দশা ... আমার গলায় দড়ীও জোটে ... হা ভগবান ...”

“দাঁও আর কাঁদতে হবে না, ... ও পানপ্যানিনি আর ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে, কোথাও চলে যাই ...”

“কি করব বল, আমার ব্যাত, নইলে বাপ, মা ও কেউ নেই যে ছুঁনি তোমার চোখের আড়াল হয়ে থাকবে। দেখি কোনও চুলোয় যদি যেতে এবার পারি,— তাহলে আর তোমাকে জ্বালাতন কর না ...”

“সে যখন যেতে হয় যেও, এখন ছেলেকাকে একটু দেখো, আমি আবার যাই—ভাক্তারকে ত খবর দিতে হবে।” বলিয়া বিজয় ঘরের বাহির হইয়া গেল। স্বরমা ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া, চোখের জলে বৃষ্টি ভাসাইতে লাগিল আর মনে মনে নিজের মৃত্যুর জন্য ভগবানের কাছে আত্ম প্রার্থনা জানাইল।

ভাক্তার

স্বরমা ভগবানের কাছে বৃত্ত কামনা করিল বটে,

কিন্তু ভগবান তাহার সে প্রার্থনার কর্পণত করিলেন না। আরও মাস নানেক রোগ ভোগের পর সে ধীরে ধীরে স্বস্থের হাত হইতে মুক্তি পাইল। পাণ্ডুর মুখে আবার ধীরে ধীরে পূর্ণের প্রভুত্বা ফিরিয়া আসিল। বিজয়েরও সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের রূপান্তর ঘূর্ণ হইতে লাগিল। সামান্য গৃহস্থ ঘরের স্থ-স্থানে অভ্যস্ত হইয়া যখন তাহার। অপভ্রের পীড়নকে সম্বনীয় করিয়া তুলিল, তখন ছদ্মনেই তাহারের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় পাইল। তাহার। যে কত ঘূর্ণ, পূর্ণের নিবিড় বন্ধন হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহা স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিল। এই ছুটি ছিন্ন হৃদয়ের বন্ধন-রাজ শিশু-পুত্রের দিকে তখন তাহার। উভয়েই কুঁকিয়া পড়িল। এই শিশুকে লইয়া যখন তাহাদের প্রাণের গুণপ্রায় প্রেমতরুকে তাহার। সজীব করিয়া লইতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়ে, বিজয় একদিন আশ্রিত হইতে আসিয়া, আনন্দ কপিত কণ্ঠে স্বরমাকে ডাকিয়া বলিল “একটা অসম্ভব সুখের আছে হু”—শোনালে কি দেবে বল?”

বামীর মুখে এ আবেশের ভাব সে অনেক দিন শুনিতে প্রায় নাই। এই আনন্দে তাহার প্রাণ হৃদয়ে ভরিয়া উঠিল। বামীর মুখ এরূপ প্রফুল্লও আনন্দিত সে দুই বৎসর দেখে নাই। হস্তোদ্ধল উৎসব দৃষ্টি বামীর মূলের উত্তর রাবিয়া সে বলিল “কি, মাইনে বেড়েছে বুঝি? ... মাঝেই তাহলে হারির লুট ঘেব ...”

“না, না, মাইনে নর স্বরমা,—পচিশ হাজার টাকা। আর আমি পেয়েছি ...”

“বাও,—যত সব বাজে কথা,—আমি ভাবলুম কি খবর না জানি ... কুটনো কুটতে কুটতে আমি ছুটে এলুম,—না ... যত সব ঠাট্টা করতে এলেন কাঙ্কের সময় ...”

“ঠাট্টা নয় স্বরমা, সত্যি আত্ম আমি পচিশ হাজার টাকার মালিক ... বিশ্বাস না হয় জাখ ...”

“কি ঘোড়াকে দেখে বুঝি? অত টাকা! সত্যি বলাই তুমি?”

“আরে সত্যি নয়ক কি মধ্যে গাগণী?”

“আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না ...”

“আমিই পারছি না, তা, তুমি! এ একবারে অসম্ভব

ভাবে পাওয়া। আমার এক কাঁকা ছিলেন পেশোয়ারে, দেখিনিও তাঁকে কখনও; শুনেছিলাম আমি যখন এক বছরের তখন তিনি ক্রীড়ান হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে মেয়ে হয় নি; মারা যাবার সময় তিনি ঐ টাকা আমার নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। ...”

স্বরমা শুনিতেই মত বিজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বাসের আভিস্রোতা তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। বিজয় আরও বলিল “আজ ছায়া হল তিনি মারা গেছেন—তার এটনী আত্ম খোঁজ করে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। লাখ খানেক টাকা তিনি বেখে গিয়েছেন। আমাদের এই বিয়েছেন আর বাকী সব সামান্যের ভাল কাজের জন্য দিয়েছেন ... ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন; ... বড় দুঃখ এমন কাঁকাকে দেখতেও পেলুম না ... তাঁর আত্মার শান্তিলাভ হোক এই প্রার্থনা করি।”

বিপুল আনন্দে স্বরমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে অভীষ্ট দেবতার নিকট পূজা মানিতে লাগিল।

অবসার বাঙ্কুলে আবার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। বিজয় একখানা চেয়ারে বসিয়া স্বরমাকে, যখন একদিন আবার কথিতছিল, সেই সময়ে স্বরমা হাসিয়া বলিল “আজ্ঞা, সত্যি তুমি এত ভালবাস,—অন্যত মধ্যে এমন হয়ে গিয়েছিল কেন বল দেখি? আমার খেতে খেতে খেতে ... কেবল খোঁকাই আমার করতে” বলিয়া কোলের শিশুকে চুষন করিল।

বিজয়ের মুখ বিষম হইয়া পড়িল। সে মিনতিভরা বলিল “তুমি তোমায় কবে কম বেসেছি হু? তবে তোমার অস্থিরের সময় বা বলেছি, তা মনে রেখে আর কষ্ট দিও না। নিশ্চয় তখন আমার মাথা ব্যথাপ হয়েছিল ...”

বামীর প্রাণে এই কথায় আঘাত লাগিয়াছে জানিয়া স্বরমার প্রাণ ব্যথায় কাতর হইয়া উঠিল। সে বলিল “তুমি কষ্ট প্রাণ কানলে আমি এ কথা তুলতুম না ... সে কথা কখনও আর তুলবো না ... তোমার কাছে থাকতে পেয়েই আমার সব।”



বিজয় হরমাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল "সে সব একেবারে ভুলে যাও। মনে কর একটা ছুগ্রহ এসেছিল ... সেটা একটা ছুগ্রহ ... মনে থেকে সেটা একে-বারে মুছে দাও পারবে না?"

"তোমার ভালবাসা পেয়েছি যখন, তখন আর পারব

না কেন?" বলিয়া হরমা বিজয়ের বুক মুখ শুষ্কিল। বিজয় তাহার মুখ তুলিয়া, তাহাতে একটি সাদর চুম্বন দিয়া শিশুকে ও একটি চুম্বো দিল। স্বর্গের আনন্দ করিয়া পড়িল।

## কিশোর দিনের কথা

শ্রীশশীলকুমার রায়

আজকে মনে পড়ে আমার কিশোর দিনের কথা,  
বিজয় দীর্ঘ পথের পানে,  
গোখলির সেই অন্ধকারে,  
অকারণে চেয়ে থাকার করুণ নীরব ব্যথা।  
সেই কিশোর দিনের কথা।

দিনের শেষে, ঘরের পানে চলতে একা একা,  
বহুল-স্বা পথের বাঁকে,  
পেখের ভরা কলসী কাঁখে,  
পল্লীবাগার কান্দল চোখের, চকিত চমক দেখা।  
চলতে পথে একা।

প্রাণীপ জাতি কুটীরধারে, তরুণ ভালবাসা,  
নাম-না-জানা কারো লাগি  
সন্ধ্যারান্তে রইত আশি,  
একটুখানি সন্ধ্যা হাসি, আঁখির গোপন ভাষা।  
তরুণ ভালবাসা।

সেই ত ভালবাসার সনে প্রথম জানা-জানি।

কান্দল আঁখির নীরব কথা,  
কিশোর হিয়ার গোপন বাণ,

সেই মুহুর্তেই ক'রে-পড়া, শেষ-না-করা বাণী।  
সেদিন প্রথম জানা-জানি।

কুড়ির বুকের ফুলের মত অচুট ছিল আশা।  
না-আগা কোন দরিন বায়ে,  
কান্দল মেঘের সন্ধ্যা ছায়ে,  
কবে প্রথম ফুটবে প্রাণের গোপন ভালবাসা।  
সেদিন অচুট ছিল আশা।

দিনের শেষে, কেউ কি একা আমার প্রাণের প্রাণে  
আসবে হাতে প্রাণীপ ধরি,  
আঁচল তলে আঁচল করি,  
যেমন করে সন্ধ্যা জালে, তুলসী তলার অঙ্গণে।  
আমার প্রাণের প্রাণে।

ছায়ায় ভরা শরৎ রাতের মৌন-মধুর অঙ্গণে,  
নাম-না-জানা আমার প্রিয়,  
আসবে কবে মুহুর্তি  
জাগাতে মোর ভালবাসার, একটা গোপন চুম্বনে।  
শরৎ রাতের অঙ্গণে।



মহানগরী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকা  
সারি সঞ্চালন

## সত্যের পরীক্ষা

জীবন যাত্রার আরম্ভ

দাদা আমার বড় ভরসা করিতেন। ঐশ্বর্য্য, নাম ও ব্যক্তির কামনা তাঁহার প্রাণে খুবই প্রবল ছিল। তাঁহার জন্ম উদার ছিল বলিয়া তিনি কাহারো দোষ দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সেজষ্ঠ ও তাঁহার সাদাসিধে স্বভাবের জ্ঞান তিনি অনেক বড় লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র সাহায়ে মামলা যোগাড় করিয়া দিয়া আমার পসার করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি আশা করিয়া-ছিলেন যে আমার পসার শীঘ্রই খুব বাড়িয়া যাইবে সেই-জ্ঞান সাময়িক ব্যয় প্রকৃতি অনেক বাড়াইয়া ফেলিয়া-ছিলেন। আমার যাহাতে শীঘ্র পসার বাড়ি সেজষ্ঠ যত্ন বা চেষ্টা করিতে কোন জটা তিনি রাখেন নাই।

বিলাত যাত্রার জ্ঞান আমার জাতি লইয়া আন্দোলন তখনও ধামে নাই। আমাদের জাতিটার মধ্যে দুইটা দল হইয়াছিল। একদল আপোনে আমার গ্রহণ করিলেন কিন্তু অপর দল আমাকে 'জাতে' লইতে রাজী হইলেন না। প্রথম দলটিকে বৃশী করিবার জ্ঞান আমার দাদা আমাকে রাজকোট লইয়া যাইবার পূর্বে নানিকট লইয়া গিয়া পবিত্র সলিলা নদীতে স্নান করাইলেন ও বৃজাতীর্থ-লিপকে একটি প্রীতি-ভোজ দিলেন। আমি নিজে অবশ্য এসব ব্যবস্থা পছন্দ করিতাম না কিন্তু আমার দাদার আমার উপর অপরিণীয় ব্রহ্ম ছিল ও তাঁহার প্রতি আমার অন্তরে অপ্রমথ আঁকা দিল সে জ্ঞান আমি যত-চালিতের দ্বারা তাঁহার অভিজ্ঞতাহৃদয়ের কাঁচা করিলাম

কারণ তাঁহার ইচ্ছাই ছিল আমার পক্ষে আদেশ। এইরূপে জাতে উঠিবার বাধা এক প্রকার অপসারিত হইল।

বাহারা আমাকে জাতে লইতে অস্বীকার করিয়া-ছিলেন আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে স্বীকৃত হই নাই তবে ঐ দলের মোড়লদের বিরুদ্ধে আমার মনে কোনরূপ রাগ বা আকোশ জন্মে নাই। এঁদের মধ্যে অনেকেই আমার পছন্দ করিতেন না কিন্তু আমি তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্নান স্পর্শ করিবার চেষ্টা কখনও করি নাই। একঘরে করা সপক্ষে সামাজিক নিয়মকে আপনি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইয়াছিলাম। এই সব নিষেধ অহুযায়ী আমার পুত্র, বাউটা, ভরী বা ভরীপতি কেহই আমার লইয়া বাইতে পারিতেন না; সে জ্ঞান আমিও তাঁহাদের বাড়ী যাইলে কখনও জলস্পর্শ পৃথক করি নাই। তাঁহারা অবশ্য গোপনে আমার বাধ্যহীতে উৎসাহ ছিলেন কিন্তু যে কাজ প্রকৃষ্ণে করা যায় না তাহা গোপন করিতে আমি কিছুতেই স্বীকার পাইতাম না।

নিজে সাধন হইয়া চলিতাম বলিয়া জাতি লইয়া কখনও আমার বিতর্কনা ভোগ করিতে হয় নাই। এমন কি আজও তাঁহারা আমার একঘরে মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের নিকট হইতে আমি যেহ ও গুণ্য ছাড়া অত কিছুই পাই নাই। তাঁহারা আমার জাতির উপকারার্থে আমার কোন সাহায্য না পাইয়া আমার জাতির জ্ঞান আমাকে খণ্ডে সাহায্য করিয়াছেন আমার মনে হয়



সমাজের বিরুদ্ধে আমার বিশোহিতাচরণ না করার জন্তই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কারণ জাতে উত্তরাব্রজ ব্রজ ইহা আমোদান করিতাম—দল ভাঙাভাঙ্গি করিতাম বা সমাজপন্থিরের চটাইতাম তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করিতেন সুতরাং ইংলও হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি একটা আমোদানের স্মরণে পড়িয়া বাবুদু খাইতাম।

আমার পড়ার সহিত আমার সম্পর্কটা তখনও বেশ সহজ হইয়া আসে নাই। ইংলও এতদিন বাস করিয়াও আমি বিখ্যা সন্দেহ করা স্বভাবটা ছাড়িতে পারি নাই। তখনও আমি খুঁটিনাটির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি করিয়া নিছের সর্দীভা ও সন্দিক্ততার পরিচয় দিতেছিলাম ফলে আমার প্রাণের কারণ সমস্তই অপূর্ণ রহিয়া গেল। আমি মনে করিয়াছিলাম যে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইব এবং সে সব বিষয়ে আমি নিজে তাহাকে সাহায্য করিব কিন্তু আমার লালসা আশিয়া তাহাতে বাধা দিল এবং আমার নির্মুক্ততার ফলে তাহাকে অথবা কষ্ট পাইতে হইল। এমন কি একবার তাহাকে আমি পিছালায়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং যথেষ্ট মর্ম্মলীড়া দিবার পর তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে সীকৃত হই। আজ বৃদ্ধিতে পারিতোহি যে এগুলি প্রেম-আধারমকি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

শিশুশিক্ষার শিকা সম্বন্ধে একটু সংস্কার করার মতলব আমার ছিল। আমার ভাতার ছেলে ছিল, আমার ছেলেরা, যাহাকে আমি শিশু দেখিয়া বিলাত গিয়াছিলাম তাহার বয়স একশে চার বৎসর; আমার ইচ্ছা ছিল যে এই শিশুগণকে ব্যায়াম শিকা দিয়া শ্রম সহিষ্ণু ও কর্ম্ম করিব ও নিজে এ সমস্ত তত্ত্বাবধান করিব। এ বিষয়ে আমার ভাতার কাছে যথেষ্ট সাহায্য আমি পাইয়াছিলাম এবং কতকংশে কৃতকাব্য লাভ করিয়াছিলাম। আমি ছেলেদের সঙ্গ বড়ই পছন্দ করিতাম এবং তাহাদের সঙ্গে বেলা দুখা ও আয়োধ্যপ্রদান করার অভ্যাস আমার আগ্রহ বজায় আছিল। তাহাদের থেকে আমি ভাবনাম যে ছেলেদের শিক্ষক হিসাবেই আমার যোগ্যতা আছে।

বাঙালির প্রথা সম্বন্ধে পরিবর্তন আদানআপনাই

হইয়াছিল। চা ও কফী বাড়ীতে চলিত হইয়াছিল। পাণ্ডি বিলাত হইতে ফিরিলে বাহাতে অস্থবিধা না পড়িলেও আমার দাদা বাড়ীর আবহাওয়া আসে থাকতেই একটু ইংরাজী গোছের করে ফেলছিলেন—যে সব চিনা মাটির বাসন কালেভদ্রে ব্যবহার হইত তাহা এখন নিত্য ব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আমার প্রবর্তিত সংস্কার এই সংস্কার কিয়ার চরম হইল। আমি চা ও কফীর পরিবর্তে কোকা ও ওটমীল পরিষ্কার ব্যবস্থা করিলাম কিন্তু ফলে, চা ও কফি রহিয়া গেল এবং কোকা পরিজ দুইটা উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইল। বুট ও হু জুতার রেওয়াজ ইতিপূর্বেই হইয়াছিল, আমি আসার পর পোষাকটা সাহেবী করিয়া ফেলিলাম।

এইরূপে ঘরচ বাড়িয়া গেল—নিত্য নূতন উপসর্গ জুটিতে লাগিল—দরজায় হাতীতো রাখা হইল কিন্তু হাতীর ধোঁরাক জোপায় কে? রাহকোটে ব্যারিটীর আরম্ভ করিলে লোকে ঠাট্টা করিবে একজন উকীলের মত কাজ করিবার বিভাবৃদ্ধি আমার ছিল না অথচ তাহার দশগুণ কী আমার লইতে হইবে। আর লইলেই বা এমন বোকা কে আছে যে ধিবে। এবং যদিও কেহ দেয় তবে তাহা লইলেও নিষ্ঠুরতার সহিত ভগানীও আত্মজ্ঞাতা যোগ করিয়া পৃথিবীর কাছে কি আমার স্বপ্নতার বাঙালি উচিত।

বন্ধুরা বোখাই যাইতে পরামর্শ দিলেন। সেখানে যাইয়া ভারতীয় আইন পড়া ও হাইকোর্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহা কিছু মামলা জোটে তাহা চলিয়াও যাইবে। এই পরামর্শ মত আমি বায়েতে আসিলাম।

এখানে এক পাচক লইয়া সংসার পাতিলাম—তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ তবে কাজ কর্ণে আমারই মত একান্ত অপটু। আমি অবশ্য তাহাকে ভূতোর চক্রে না দেখিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তির মতই দেখিতাম। তিনি মাথায় জল ঢালিতেন কিন্তু অঙ্গকণনও পরিষ্কার করিতেন না—পরিষে বারশ ময়লা কেনবীজীও তাই এবং শাওজান বিবদ্ধিত। এর চেয়ে ভাল রাগুনী পাইতামই বা কোথায়!

তার নাম ছিল রবিশঙ্কর। আমি তাহাকে বলিতাম “দেখ রবিশঙ্কর, তুমি না হয় রাখতেই জান না, কিন্তু সত্যাত্মিকের মত জান তো” সে বলিত “সত্যাকি হুজুর! আমার সত্যাকি হুজুর—আমি সত্যাকি হল কোদাল—আমি এই রকমের ব্রাহ্মণ। আপনি রাখেন ভালই আর তান্না হলে আমার আবার চাষ বাস কর্তে যেতে হবে। কালেই রবিশঙ্করকে শেখাবার তার আমার নিজেই নিতে হল। আমার অবশ্য গুরু সম্বন্ধ ছিল। অর্ধেক রাত্তি আমি নিজেই করিতাম এবং ইংরেজী কাহদার নিরামিষ রান্না করিতাম। একটা ঠোঁড় কিনিয়াছিলাম এবং রবিশঙ্করের সাহায্যে রান্নাবান্না করিতাম। পাওয়া নাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ বাহবিচার ছিল না—

রবিশঙ্করও একপ্র দাঁড়াইয়া গিয়াছিল সুতরাং আমাদের বেশ ‘পোথি’ হইয়াছিল। কিন্তু দুইটা বিষয়ে রবিশঙ্করকে আমি পারিয়া উঠি নাই অর্থাৎ, ময়লা কাপড় পরা ও খাওয়া অপরিস্কার রাখা এই দুই বিষয়ে রবিশঙ্কর অচল ও অটল ছিল।

বায়েতে ৪৫ মাসের বেশী থাকা হইল না কারণ ষষ্ঠ মাসেই বাড়িয়া যাইতেছিল এবং আর এককালেও ছিল না।

এই ভাবে জীবন যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিলাম যে ব্যারিটীর পেশা বড় স্বহিয়ার নয়—ব্যহিরে কেবল ভড়ৎ কিন্তু ভিতরে সব কীকা। এ দিকে দারীশ্বের গুরু ভাব আমি চারিচির দিয়া অহুভব করিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ)

## বাসনার নির্বাণ

### শ্রীবেদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

“তা’হলে তোমার মত নেই, কি বল বৌদি?”

বৌদির সুনোকা বীরকল উত্তর দিলেন—“ভুল বুঝো

না! ঠাকুরপো; ঠিক ধরতে গেলে.....”

“আমি উপযুক্ত নই, কেমন? কিন্তু কিসে অহুপযুক্ত হনুশ, বুঝিয়ে দিতে পার? এম-এ পাশ করা ছেলেকে জ্ঞানাই করতে তোমার বাপ-মা আপত্তি করে যাননি নিন্দন?”

“আপত্তি না করলেও মতও বিশেষ দেননি। পাশের কবর যে চাকরী,—তার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ? আমি চাই ঠাকুরপো, লক্ষী সরস্বতীর বরপুত্র; যার হাতে পড়ে, আমার শোণার বোনটী মজ্জা বা অর্থ কোনটীরই কষ্ট পাবে না।”

অতীন্দ্রনাথ অতর্কিতে আহত সর্পের দ্বায় একবার চমকিয়া উঠিল; পরমুহুর্তেই আবার ক্রিয়ময় হাঙ্গিতে যুগ্ধ। রাড়াইয়া তুলিয়া বলিল—“এ যুদ্ধির কাছে আমার হার মানতে হলো; কিন্তু, আগে শুনেছিলুম,—মাগ্নয়েই পয়সা

তৈরী করে, এখন বুঝলুম, পয়সাই মাগ্নয়কে সব চেয়ে বড় করে তোলে।”

হেনোকা কহিলেন—“একটু তলিয়ে দেখলে সাম্যাত্মিক হিসাবে ওইটাই সবচেয়ে বড় ঠাকুরপো। ও কি, উঠছ যে! স্বহি চা করুতে গেছে, নিয়ে আসুক।”

“না, বিশেষ একটা কাজ আছে।”

“অভিমান হেলা বুঝি?”

অতীন্দ্র শুধু হাসি হাসিয়া বলিল—“মান-অভিমান বড়লোকেরই সাজে বৌদি; গরীবের ওসব রোগ না আসতে দেওয়াই ভাল।”

সে চলিয়া গেল। কথাগুলো বোচার মত হুনেহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু পিতৃমাতৃহীন ভগ্নীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল অপেক্ষা এ অসৌভাগ্যতার অপর্যাপ্তকৈ তিনি কিছুতেই বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

স্বহি, ওরফে স্বহিমা পয়সা চায়েই কাপ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, কথাগুলো শুনিতে শুনিতে অজমনক্ হাতাত্তি ফোকা তুলিয়া বলিল।



ছাই

দুঃসম্পর্কীয় দেবের হইলেও বাল্যকাল হইতে চেনা পরিচয়ের লজ্জা হইল। অতীতকে সত্য সত্যই ভালবাসিতেন;—দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটীবারও তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। অতীতের অবস্থা নিতান্ত হীন না। হইলে তিনি যে এ স্বপ্ন-স্বযোগ কিছু-তেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু, কোন বিরোধ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা প্রত্যক্ষ বর্তমানকে হেলায় চেলিয়া রাখিতে পারে?

মিন তিনেক অতীতের দেবা সাক্ষ্য না পাইয়া হইল। মনে মনে যখন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার স্বামী প্রিয়মাধববাবু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—“আরে শুনেছ, হোঁড়ার কাণ্ডটা?”

চমক-ভাঙা বৃক্ক হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—“ক'র কাণ্ড?”

“ওই অতীতের, আবার কার। লেখা-পড়া শিখে কৃত হয়েছেন; সংসার আর ভাল লাগল না, তাই বাবু বোধ হয় সম্যাস উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছেন।”

হুনেজা অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ক'র?”

“কাল রাতে। আহা পিসীমা বড়ি ত কেঁদেই অস্থির। দেখলুম, একখানা চিঠি লিখে গেছেন,—‘মাছেরে পরিচয় যাতে, তার অভাব নিয়ে মজ্জা সমাজে না থাকাই মল।’ চললুম। আমায় যেন কেউ খোঁজ না করে, কল্‌কো পাবে না!’ ও কি, চোখ দিয়ে যেন জল গড়িয়ে পড়ল!”

“হাও, তুমি কি ...” বলিয়াই তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

হুম্মা সেখানে পাড়াইয়া পাড়াইয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল। প্রিয়মাধববাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“দেখেন তোমার দিদির ব্যাপার! আহা, ভাল ও সত্যই বাস্তু বটে। কি বল?”

হুম্মা কথা কহিল না; মাথা নাড়িয়া জানাইল—“হ্যাঁ!”

তিন

কিছুদিনের মধ্যেই হুনেজা নিজের মস্ত বড় গলদ

দেখিতে পাইয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় যে তিনি নিজ হাতেই নিমূল করিয়া ফেলিয়াছেন! তাঁহার অন্তরটা এক অসমলোকে কেন্দ্রীয় হাধাকার করিয়া উঠিল! এত সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালেও পুণ্যধরা কখন যে হুম্মা ও অতীতের অন্তরে প্রেমের উৎস প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিনি আঁধার ঘরিতে পারেন নাই; যখন পারিলেন,—তখন ছুটী জীবনই বার্থতাপ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের উত্তোষ আয়োজন দেখিয়া হুম্মা স্পষ্টই তাহার দিককে বলিল—“ও সব আমি সহ করতে পারব না! এতদিন আশ্রয় দিচ্ছে, শেষের দিনকটা আর তোমাদের সম্বন্ধাড়া করো না!”

“দূর পাগলী! শেষ কি বলছিস? মেয়েদের ওর বাড়া পৌরষের আর যে কিছুই নেই বোনা!”

“তোমার ‘ওটীকে অগৌরবের ত বলছি না দিদি। তবে, আমার শুধু ওটা থেকে’ নিষ্কৃতি দিলেই বেঁচে যাই!”

হুনেজা আর কথা বলিতে পারিলেন না; শুধু অপরাধীর মত এক তরফা ভিগ্নীর চক্ষুটাই মাথা পাতিয়া লইলেন।

চার

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কালের কোলো চলিয়া পড়িয়াছে। কালম সন্ধ্যা। বাতাসে এ কি অপূর্ণ-মাদকতা! পলক-পুষ্পে এ কি নবীন-সজীবতা! বসন্ত-দুহৃত তাহার আগমনী-গানে আকাশ বাতাস প্রভিষ্টান্বিত করিয়া তুলিতেছিল। বিমানো পূর্ণিমার চাঁদ আপন-ভোলা হাসি হাসিয়া স্বপ্ন মাভাইয়া তুলিতেছিল। বিরহীর মনে অতীতের কোনও স্বপ্নময়ী স্মৃতি স্বপ্নের দ্বায় জাগিয়া উঠিতেছিল কিনা, কে বলিতে পারে।

সন্ধ্যা শিবানন্দ মঠ প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেছিলেন। পঞ্চাং হইতে মুহুর্তে কে ডাকিলেন—“ঠাকুরপো!” শিবানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। কালের গলবে লুপ্তাভিত সুপ্রাণী মাথার তাকে কে আবার আখাও ধরে? সন্ধ্যাঙ্গী সন্ধ্যাপীর স্বরবে আবার স্মৃতির বেদনা কেন! তিনি

কোন উত্তর না দিয়া জত মঠের ভিতর ফিরিতে উদ্ভত হইলেন।

আবার নারীকণ্ঠ শব্দ উঠিল—“ঠাকুরপো! শুনেতে পারছ না, চিন্তে পারছ না আমাকে?”

সন্ধ্যা সী অগত্যা করিয়া পাড়াইলেন। দীরে দীরে নবম তুলিয়া তিনি আগন্তুক দিকে একবার চাহিলেন; তারপর কহিলেন—“বৌদি?”

“হ্যাঁ ভাই! আমরা শব্দমহলায় বাড়ী ভাড়া করে আছি। তোমার দাদা চিন্তেতে পারেন নি; আমি কিন্তু, আজ সকালে একবার বেবেই তোমায় ধরে ফেলছি; তাই দেখা করতে এলুম।”

“ভাল।”

“তুমি আমায় কমা কর ঠাকুরপো।” হুম্মি ...

জন্তে তোমার দাদা শিবানন্দ স্বামী বলিলেন—“আমি সন্ধ্যাসী, আমার কাছে ওসব পরিচয় মিথ্যা, ভুল, সত্য।”

হুনেজা একবার সেই তেজোদীপ্ত সৌম্য-সুপ্রতির দিকে চাহিলেন; তারপর হাসিয়া বলিলেন—“এখনও চিত্ত তোমার আশঙ্কিত-শুভ হয়নি দেখছি।”

“কেন?”

“ভয় তারাই পাথ, যাদের অন্তরে কোন আত্মবর্ণ থাকে, নাকি?”

“হতে পারে; তা'হলে তা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য। চললুম।”

“হাও! কিন্তু, একটা কথা,—দূরে থাকার চেয়েও কাছে থাকার মতই যে কম নয় বরং বেশী, তারাজি মনকেই ভালমুগ প্রণাম হয়ে গিয়েছে। যাক, ওসব তর্কের সময় এখন নয়। হুম্মা মরণপন্ন!—যন্ত্রাঙ্গোকে বেচারী বখাশোয়!—পার ত এতদূর দেখা করে!”

সন্ধ্যা সী নিজের বুকের উপর হাত ছুটী চাপিয়া থম্বিয়া নত-মজলক দীরে দীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। হুনেজা একবার অনন্ত শব্দের পানে চাহিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তারপর কয়েকটি মস্তিষ্কের দেহতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পাঁচ

তখন সন্ধ্যাক্ষরে ভোরের আলো আকাশের কোণ হইতে উকি মারিতেছিল, হুম্মা ডাকিয়া উঠিল—“দিদি!”

“কি বোনা” বলিয়া হুনেজা দীরে দীরে তাহার গায়ে, মাথা হাত ব্লাইতে লাগিলেন।

হুম্মা কহিল—“ভারি একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম।”

“কি স্বপ্ন ভাই?”

“যেন আমার বিয়ে হচ্ছে! হাসছ বউ? সত্যি দিদি, তোমরা সবাই মহাব্যভ, আমারও কম আশঙ্ক নয়! তিনিও মত্ত ধনী হয়ে ফিরে এসেছেন; তোমারও আর আশপ্তি নেই!.....এ কি ছল পড়ল হাতে কোথা থেকে! কাঁছ নাকি? বারে, আমার এ আনন্দের খবর শুনেও তোমার দুঃখ? না, আর তোমায় নিয়ে পারলুম না দেখছি! ও ছায়ের কালাকালি কি আর শেষ হবে না দিদি?”

হুনেজা অশ্রুচক্ষুরে ডাকিলেন—“হুম্মি!”

“না, না, তোমার দোষ কি?—আমার ভালর মজই ত তুমি ও কথা বলেছিলে, আমি কি আর তোমায় চিনি না দিদি! সত্যি, এই তোমার গা ছুঁতে বড়ি;—একটুও রাগ করিনি তোমার ওপর। আবার কাঁছ! এ মজই বা কি? জান হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের পেয়ে-চিন্তু, যাবার সময় দেখে তোমার!”

“খাম, আর বাজ্জে বক্সি নি!”

“না, না, এখনও বলা শেষ হয় নি যে! হ্যাঁ, কি বলছিলাম, হঠাৎ যেন সব ঝাঁক হয়ে গেল। দেখলুম,—কে যেন এসে আমার টানাটানি করছে; যাব না, কিন্তু, কিছুতেই ছাড়তে না আমায়! কি বিপদ বল ত?”

কে বীরকণ্ঠে বলিলেন—“টিকুই দেখছে। স্বপ্নতে যা চিরকাল সত্য ও নিত্য, সেই তোমায় ডাক দিয়েছে। ডাক পেও না, আশীর্বাদ করি,—তপন্যার পথের পথজ্ঞা হউন!”

হুম্মা শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। সত্য-মিথ্যা, আলো-আঁধার সব



একাকার হইয়া গেল। হুনেজা বলিলেন—“এসেছ ঠাকুরপো। জানি আমি, তুমি আসবেই। না এলে, হুসির সাধনা যে নিশ্চয় হয়ে যাবে।”

সমাসী ধীরে ধীরে রুমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তারপর অতি সন্তপণে তাহার শীর্ণ কদালগার হস্তখানি তিনি নিজের হাতের উপর উঠাইয়া লইলেন। হুসনা একবার স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল, পর-ক্ষণেই সিন্ধিলাতের পরমতৃষ্ণি অন্তরে লইয়া চিরসখাধির কোলে আশ্রয়দর্শন করিল।

শিবানন্দ উঠিয়া ঠাড়াইয়া আশ্রয়গতই বলিয়া উঠিলেন—“বাক্, ব্যথিতার আত্মা শাস্তির রাজ্যে চলে গিয়েছে।” তারপর হুনেজার উদ্দেশে কহিলেন—“আমি লোক গাঠিয়ে দিচ্ছি—তাঁদের ঘাটা ওর শেষ কাঁচ করিয়ে দেবেন।”

তদীয় বৃকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হুনেজা কুলিয়া কানিতে লাগিল।

সমাসী চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি যন্ত্রণা-মগ্ন মিনতির শব্দে কহিলেন—“তোমাকেও যেতে হবে ঠাকুরপো। আশা করি,—তার চরম বাসনা তুমি অপরূপ রাখবে না।”

নবর দেহের ক্ষণাবশেষে স্মৃতিচক্রে বহিষ্ট লইয়া হুনেজা যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহার বৃকের উপর কে যেন সজোরে হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিতেছিল এবং সমস্ত পথ সেই শব্দ তার জ্বলয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। হুসনার স্মৃতির কারণ যে তিনিই,

এ কথা আশ্চর্য্য কিছুতে কোনমতেই ভুলিতে পারিতে-ছিলেন না। হঠাৎ অতীতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, তাহার সারা দেহ যেন যেন শিহরিয়া উঠিলেন,—সামান্য কুলের অন্তিম কি ভয়ানক নিষ্ঠুর। দুইটা জীবনের কি হৃদয়ের পরিণতি। যন্ত্রী-রূপে ঠাড়াইয়া সমস্ত বৃকের শূন্যতাটুকু উপভোগ করা কি তীর মধুর। ভগবান। মুখে কাণ্ড দিয়া তিনি গুমরিয়া কানিতে লাগিলেন।

প্রিয়মাধব বাবু কহিলেন—“উত্তলা হযো না। অমন যন্ত্রণা পাওয়ার চেয়ে হুসনার বাগুই ভাল হয়েছে। আর কেন কেনে বেচারীর আত্মাকে মারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখ।”

হুনেজা পাচকর্মে কহিলেন—“তার জন্তে আমার বত বঠে না হচ্ছে, আমার নিজের জন্ত তার চেয়ে ঢের বেশী ... ..” বলিতে বলিতে হুসনা অতীতের হাতটা খণ্ড করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—“আর সহ করতে পারছি না ঠাকুরপো। স্থবি আমার বড় সাঝা দিয়ে গেছে, তুমি আর দিও না। বাড়ী চল; সংসারী হয়ে আমার একটু শান্তি পেতে দাও।”

সমাসী হাসিলেন। তাঁহার শান্ত মধুর পবিত্র বদন ক্ষণেকের জন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তারপর স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—“আর আমার অহরোধ করবেন না। মনের ওই আঁধার-ঠায়া স্বপ্ন-হৃদয়ের মোহ-বশত ভেঙে গেছে। বুঝিছে, ও সব ভালোয়ার আলো। যিনি সত্য, যিনি শাস্ত, যিনি চির-আনন্দময়, তাঁর সন্ধান পেতে চলছি। এ থেকে আর ফিরতে পারুব না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আমার ও সাধনা নিশ্চল না হয়।”

## চায়ের অভিব্যোগ\*

### শ্রীপাঁচালার ঘোষ

সমবেত ভয় সত্য ও সত্যতর মহোদয়বর্গ—

বর্তমান কালের সুপিত্ত সাহসক সন্দিলনের এল্লাসে বহুকাল পূর্বে একবার শ্রীশ্রীমৎসুন্দার শ্রীমৎসুন্দার পোছা মহাশয় এক অভিব্যোগ নামের করিয়াছিলেন।

সেই নজিরে আমি শ্রীমতী শ্রীশ্রীমৎসুন্দার ওরফে চা দেবী আপনাদের সমীপে আমার অভিব্যোগ উপস্থাপিত করিতে সাহসিনী হইয়াছি। আমার গভীর আশা আছে আপনাদের নিকট সুবিচার পাইব। কেন না আমার বিশ্বাস

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা]



খুব ভাল নয় কিন্তু ইহাতে চাপাখারদের শক্তি হইবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। চায়ের পাতায় ট্যানিক এসিড আত্মীয় আছে এবং যাহা আছে তাহার সামান্য অংশই গরম জলের সাহায্যে ৩০ মিনিটে বাহির হইতে পারে। ইঞ্জানিকরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম চায়ের পাতা পর্যন্ত জলে ফেলিবার পরে ৪ মিনিট পর্যন্ত সেই কাকিন নামক বস্তুটাই পাতা হইতে বাহির হইতে থাকে; তারপর এক একটু করিয়া ট্যানিক এসিড বাহির হইতে আসতে হয়। সমস্ত ট্যানিক এসিড বাহির করিতে হইলে চায়ের পাতাগুলিতে অন্ততঃ আধঘণ্টা দৃষ্ট জলে বেশিয়া রাখার প্রয়োজন। কিন্তু চা-গুলিকে আধঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া চা প্রস্তুত করেন এমন আনাড়ি চা-খোর যাদের হয় সমস্ত ভগতে দুর্ভাগ্য। অতএব পাকা হাতে প্রস্তুত চা পানো যাহারা ভাড়াট ট্যানিক এসিডের জল না করিয়া তঁহাদিগকে আনন্দে চা পান করিবার পরামর্শ করিতে পারা যায়.....চায়ের অপর উপাদান... কাকিনের ভায় পরম উপকারী উত্তমবস্ত্ত দুর্ভাগ্য। দেহস্থ ইহা হইয়া আশু-কলাকে উত্তেজিত করে কিন্তু অপর উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করিলে উত্তেজন্যর পদ্ধত্রে যে এক একটা অবসার উপস্থিত হয় ইহাতে তাহার চিরুমাঝ দেখা যায় না।...চায়ের ট্যানিক এসিড চায়ের পাতা চারি মিনিটে উর্দ্ধকাল পরমজলে না রাখিলে নির্গত হয় না। যদিবা কিছু বাহির হয় চায়ের কাথে ছপ মিশাইলে এসিডের অনিষ্টকারিতা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় ও আধুনিক ইঞ্জানিক অভিযন্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আপনাদ্বারা আপনাদের সাহিত্যের শব্দ সম্ভারের দিকে নজর নিক্ষেপ করেন তবে দেখিতে পাবেন আমার প্রভাব কত বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত। কলিকাতার দুর্ভিক্ষের সৌভাগ্য সম্বন্ধ হইলেও সম্বন্ধের প্রভাব বাহ্যিক মনসিক স্বতন্ত্রা সাহিত্যের শব্দ সম্ভারে আমার স্বাধীপ্রভাব যে আমার বৃদ্ধবান্য পরিচায়ক তাহা আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য।

ধেবু—আমি 'চা'র যুগে' পুরোভাগে বস্তুমান। চাপানো আসিলে হয়ে যদি 'কাগজ' ও 'চালপে' খর তবু সে আমার রূপ 'চাতুর্য'প্রমে 'চাতুর্য' আমার 'চাতুর্য' শাস্ত্রানুভব করিলে, আমি শুধু 'চা' পাটি' বা 'চা-পাটি'তে আছি তা'নয়, 'চাটমে'ও আছি; 'চাটমে'ই শুধু আমার

আদর নয়—'চাপকানে'ও আমার অধিষ্ঠান। আমি আগে আগে না থাকিলে 'চাকরী' 'চাকরিক' থাকিত না—'চাকর' 'অধঃগতি' ঘটিত। 'চাকর' যে শুধু আমার ভক্ত তাহা নয় 'চাকর'ও আমার ভক্ত ছিলেন। 'চাপক' আমারই সেবা করিয়া ভারতের মেকিয়াভেলী হইতে পারিয়াছিলেন। মাকুতে আমার প্রভাব না থাকিলেও 'চাকু'তে 'চাকু' আমার 'চাহিদা' বস্তুমান। 'চামচে' 'চামচে' বসিন্ততা না থাকিলেও আমার খাতির উত্তরে কাছে। 'চাটু'র 'চমে' 'চাটু' যে আমার বেশী ভক্ত তাহা 'চাশাক' লোক আমার রূপায় অনার্যে বস্তুমান। 'চামু'র 'চাক' না থাকিলে পারে কি আমি দুইয়ের পুরোভাগে অবস্থিত। 'চামে' আমি শুধু সবার সবার স্থানান্তিত কিন্তু 'চা'বাগিচা' আমি সবার অন্তরে সমান স্থানান্তিত। কলিযুগে আশুপ্রশংসা পাপ না হইলেও সর্বমস্তান্ত গহিতম্—নহিলে বলিতাম আমি কোথাও নাই? ...আমি 'চাকলে' আছি 'চাকুরী'তে আছি; আমি চালে আছি, চালতায় আছি—চালকের চালকালে আছি; আমি কাপড়ে নাই কিন্তু 'চাপড়ে' আছি; আমি খাঁচায় আছি মাগায় আছি, আচাখে আছি; আমার 'বাগলে'ও আছি—আমি 'আচারে' 'বিচারে' 'স্বভাচারে' আছি 'বাড়িচারে'ও থাকি—আমি হানায় নাই বটে কিন্তু চান্দা আছি—আমি চাটুয়ের সবার থাকি। দেউড়া ছাড়া গেলেই তিনি হন চট্টোপাধ্যায় কিন্তু ভট্টাচার্যির আদরে আদরে আমি অচলা। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় আমি মূর্খনিবরি না। মহাত্মা গরমজল পানের মাথা একেবারে পরিভ্যাগ করিতে না পারায় আমি মোহনচাঁদ করমচাঁদ গাধার অন্তরে সাহসানিকত্বের বাস করতছি। অত কথা কি আমার প্রধান বিরুদ্ধাবাদী ডাক্তার কামিচাঁদ আমার আশুপ্রশংসার বিরুদ্ধে বিরোধী হইয়া চান্দে দুর্ভাগ্যই চন্দ্র করিলেও তাহার সম্পাদিত স্বাস্থ্যসমাচারে আমার প্রভাব প্রস্তুতিত বহিরাগত।

আমার বক্তব্য শেষ হইল। শাস্ত্র-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সলল দিক হইতে আমার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অলীক নিন্দা প্রচারিত হইতেছে আপনাদ্বারা তাহার প্রতীকারের বাধ্য। করিয়া সত্যের সম্মান রক্ষার স্বত্বমান হইয়া আমার আশীর্বাদ লাভ করুন।



## ছমছাড়ি

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী দাঁদ

পৌষের সকাল।...

ঘরের দাওয়ায় বসে ছিদাম তার হেঁচা জালটাতে তালি দিচ্ছিল। সে যে দ্বাখাটাতে বসেছিল, সেখানে এক বলক সোপানী রোগ এসে পড়েছে। ভাড়া ঝুঁটের দোর দিয়েও কতকটা রোদ মেঝেতে ঢুকে লুটোজিল।...

উঠানের শেষ সীমা নদীর উপরে গিয়ে পড়েছে। নদীর ছোট ছোট টেঙুলোর উপর স্বর্ধা-কিরণ পড়ে বিক্মিকি খেলছিল। তারি হৃদয় দেখাচ্ছিল সে দুশুটা; কিন্তু ছিদামের সেবিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না। সে এক মনে তার কাজ করে যাচ্ছিল।...

উঠানের উপর কতগুলো পায়রা ঘুরে ফিরে আনন্দে বেড়তে। হঠাৎ সেগুলো সশব্দে উড়ে যেতে ছিদাম একবার সেবিকে তাকিয়েই বস্লে, শিউলি যে, এত সকালে আজ জল আনতে যাচ্ছিল কেন?

"হ্যাঁ, সময় তোমার মত বসে থাকে কি না যে সকাল এখনো রয়েছে। তা যাচ্ছিনু পাশ দিয়ে, একটু দেখে পেলুম—তুমি কি করছ? কালু তো বোধ হয় বাওয়া বাওয়া হয়নি কিছুই, আছো বোধ হয় তেমন ইচ্ছে নেই—কেনম? আমি ভেবে পাইনে যে মাছ কি করে এরকম ভকিয়ে থাকতে পারে।"

শিউলীর কথা ছিদামের কাছে গেল কিনা সেই জানে তবে তার ভাব-স্বভাব তেমন কিছুই একটা বড় বোঝা গেল না। সে যেমন জালে তালি দিচ্ছিল, তেমনিই তালি দিতে লাগলো।

"বা রে, কথাটি পর্যাণ নেই। থাক না—কার পরজ পড়েছে বার বাঘুটিয়ে জিজ্ঞাস করবার।" বলে শিউলী কলসী কাঁধে করে ঘাটের দিকে চলে গেল।... ছিদাম একবার মাঝ তার দিকে একটু তাকালে।...

শিউলী জেলের মধ্যে। সে কিশোরী। গাছের রং তার কুচুচে কালো, চুলগুলো তার রক্ত এলোমেলো, জাতিতে তারা হীন—তবু সে কিশোরী।...

ছিদামের বয়স বোধ হয় বাইশ তেইশ হয়ে থাকবে। দেখতে একটু বেটে—কিন্তু সেও যুবক, এ সংসারেরই একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। এতবড় পৃথিবীর মধ্যেও তার আপনায় বলতে কেউ নেই।—আছে কেবল তার বাপের হাতের বুনা জালটি। তা'ছাড়া এই বড় পাতায় ছাওয়া শত ছিন্নময় ঝুঁড়োখানি, কয়েকটা হাড়িভুঁড়ি আর মাছ ধরবার যন্ত্র—এসবও তার বাপের আমলের।

শিউলী জল নিয়ে ফিরে এসেও দেখলে, ছিদাম সেই জালটা নিয়েই বসে আছে। সে এবার আর কিছু না বলে জলের কলগীটা দাওয়ার কোণে রেখে টান দেরে দিলো। ছিদামের কাছ থেকে নিয়ে উঠানে ফেলে জালটা।...

"মু—ঘরে বসে খুঁটাছাট করলেই কি পাওয়া মিলবে? আমি তো পারিনে বাপু এনব দেখতে। আর এমন সন্সারের লোক থাকে; কোথায় হাড়ি, কোথায় চাল, কোথায় কি—তার ঠিক নেই যে ঘুটো দেখে করে দিয়ে যাব।"

ছিদাম একটু হেসে বস্লে, "তা শিউলি, তুই-ই বল দেখি, ওনব ঝুঁড়াই কি আমাদের পোষার? তা বাপু, তিরদিন না খেয়ে থেকেও খীকার, তবু রেখে বেড়ে পাওয়া আমার হয়ে উঠবে না। তা তোর দয়ার শরীত, ঘুটো দিবি—"

"তোমার মাথা। তা বক বক করো এখন শেষে সারানি। চাল কোথায় বের করে রেখ, আমি হাড়িটো ধুয়ে নিয়ে আসছি।"



শিউলী হাড়ি হাতে করে ফিরে আসতেই ছিদাম একটু হেসে বললে—“শিউলি, আজ খাওয়া হবে না।”

শিউলী মুখ ভদ্র করে বললে—“নাও, চাং রেখে দাওখন। চাল কোথায় এনে দাও। আমি আর বেশী দেরী করতে পারবো না—না বন্ধুবে। দেখি, এর মধ্যে ভাত ছুটো তাজাতাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে খেতে পারি কি না।”

ছিদাম বললে—“চাল পাবি কোথায়? কাল মাছ ধরতে পারিনি, পরমা আসবে কোথেকে? চাল পাত কিইহুই একটা।”

শিউলী রাগে গরু গরু করতে করতে হাতের হাঁড়িটা সেখানেই ফেলে রেখে কলসী কাঁখে নিয়ে যেতে যেতে বললে—“তা আগে থাকতে বললই ত হোত—যত সব বিশ্বট্টে কাও।”

একদিন দুপুর বেলা ছিদামের সমুখে ভাত দিয়ে শিউলী বললে—“ছিদাম-দা, কবে থেকে বলছি, একটা বিয়ে কর। এরকম করে না থেয়ে বেয়ে কদিন আর ষষ্ঠ ভোগ করবে।”

খেতে খেতে ছিদাম বললে, “বিয়ে করতে বলছিস আমাকে শিউলি—না? হ্যাঁ, করবো। না বললে দেখছি আর চলছেই না। একদিন করবো হ্যাঁ—ঠিক করে ফেলছি।”

“হ্যাঁ—ওর চেয়ে আর বেশী এগোবে না। ঐ ঠিক করা পর্যাভো। চিরদিনই দেবদুঃস্বাপ্ন—এক দাঁচ। সত্যি ছিদাম-দা, বিয়েটা করে ফেল না।”

একটু হেসে ছিদাম বললে, “তা আমার কি অমিছে। তা বল না কাকে করবো?”

“বা রে, তা আমি জানি ব্রি? ত তুমি ঠিক করে নিলেই পারো। ওকি?—হয়ে গেল ব্রি? খাওয়া আর ছুটি—”

“না, হয়ে গেছে—”

...সন্ধ্যাবেলা শিউলী একবার জল নিতে আসবে একখাটা ছিদামের জানাই ছিল। তাই নদীর ঘাটে গিয়ে—

সে একটি মাতীর তুপের উপর বসে তার জন্ত অপেক্ষা করছিল।...আজ ছিদামের মন মোটেই ভাল নয়।

অনেকক্ষণ পরে শিউলী এল। ছিদামকে এরকম একাকী বসে থাকতে দেখে, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “সন্ধ্যাবেলা একলা এখানে বসে আছো যে ছিদাম-দা?”

ছিদাম সে কথাই কোনো উত্তর না দিয়ে শিউলীর মুখের দিকে চেয়ে বীরে বীরে বললে, “শিউলি, তোর বিয়ের কথা নাকি ঠিক হয়ে গেছে ওপারের মেনার সাথে?”

শিউলী মাথা নত করে উত্তর দিলে—“হ্যাঁ ছিদামদা।”

ক’দিন পরে হবে রে বিয়ে?

আরো পাঁচ দিন মাঝে আছে।

...খাতার পাখীর মতো একটা কুক হাফাকার ছিদামের বুক ফেটে বেরোতে চাইছিল। সে তা জোর করে বুকের ভেতরই ঢেঁলে দিলে। হায়, সে যে সন্ধ্যার বেতের একটি ছন্নছাড়া জীব। পৃথিবীর বৃক অভিশাপের মতো সে এসেছে—ব্যথা পেয়ে আর ব্যথা দিয়েই তার জীবন। জগতের কাছ থেকে এ ছাড়া আর কি কি সে আশা করতে পারে?...

...শিউলী চলে গেল।...ছিদাম তার ভাড়া বুকটা নিয়ে সেখানে বসে বসে নিজস্ব আশার জাল বুনতে লাগলো। জানে সে, তার সব আশাই আকাঙ্ক্ষা হুঁচকি হুঁচকি আঁচলি—সব আকাঙ্ক্ষাই ছুঁচকি পরে ছুঁচকি যাবে; কিন্তু তবু আজ বসে বসে এই স্বপ্নজাল বুনতে তার ভালো লাগছে।...যা পাবে না কোনদিন সে, সেটা মিথ্যা করে পেতেও মেনে তার কত আনন্দ!...

...সেদিন ছিল একটা বাল্ল স্বরা দিন। আকাশের কাণায় কাণায় মেঘের হুতুণী নিকব কালো কেশরাশির মতো এলিয়ে পড়েছে।...ছিদাম তার হুতুর পানার ঘোরে বসে বসে তাই দেখছিল একমনে। তার চোখ দুটো ছাপিয়ে যে বাইরের বায়ু-দ্বারার মতো জল করে সমস্ত বুঝনা ভিচ্ছিলে—একথা সে নিজের জানতে পারেনি।...মেঘের মায়া-লোকের ভেতর মাছ-

বের মন যে এমন করে হারিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে, সে কথাটা সেদিনই প্রথমে তার কাছে ধরা পড়েছিল। কি একটা অভাবের বেদনায় তার তরুণ বুকটা মেনে ভরে ছিল। অতীতের সহস্র স্মৃতি তাকে হাতছানি দিয়ে যেন তাদের স্বরূপ তার চোখের সামনে তুলে ধরছিল।...

...এতবড় পৃথিবী। বৃক তার অগম্য পথ পড়ে রয়েছে। তার গুণের দিয়ে তাকে একাকী চমুতে হবে।—একখাটা ভাতভেঙে যেন তার স্বরূপটা বিস্তারী হয়ে উঠলো। সবারই আপনায় বলে টেনে সেবার লোক আছে—তবু তারই নেই কেন? সে জানতো, ভগবান আছেন। তার কাছে সে রোজ রোজ কৈশে কৈশে নালিশ জানাতো।...

তুমি এখানে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে ছিদামদা? দেখছো না কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আসছে। নদীর পাতের ঘর—এ কিছুতেই টিকবে না। তাজাতাড়ি আমাদের বাড়ীতে চলে।—

এই বলে শিউলী ছিদামের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতেই তার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

ছিদাম চেয়ে দেখলে, বাইরে ব্যতিত বিরহীর চাপা কান্নার মতো হু হু করে স্বপ্ন-বৃষ্টি যেন আকাশ ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্তে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। ইচ্ছামতী লগ্নে ডেইয়ের হাতভালি দিয়ে চকলা বালিকার মতো রাগে মেতে উঠেছে।...

...ছিদামের মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। সে একবার মুখ তুলে শিউলীর দিকে চাহিলে, এ সত্যি শিউলী কি না—সে সংক্ষেপে তার মেনে একটু গোল ছিল।...এই সন্ধ্যার ঝাঁপা, ঝাঁপো—মাসার স্বপ্ন বৃষ্টির গুন্ডামের মধ্যে তারই ঝুঁড়ের মায়ে আজ শিউলী দাঁড়িয়ে। এ কথা সে কি করে বিশ্বাস করে।...

কাল যে শিউলীর বিয়ে হবে মেনেয়ার পক্ষ।...তার পক্ষের মাঝ বিয়ে যেন একটা তরল আগুনের হলুদ ছুটে গেল।...

সে বীরে বীরে ভাকলে শিউলি।

শিউলী বিরক্ত হয়ে বললে,—আঃ ওঠো না গো। স্বপ্ন যে এলো বলে।

ছিদাম কতকল চূপ করে বসেই রইলো।...বাইরের মস্ত হাওয়ায় তাওব নবুনের মতো তার বৃকের ভেতরও একটা মাতান উঠলো। সে শিউলীর একটা হাত তার হাতের মূঠার মধ্যে চেপে ধরে, তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসলো, “শিউলি, তুই বিয়ে করতে বলছিলি না একদিন আমার?—আমি বিয়ে করবো।”

তা করে’দা। সে তো খুব ভালো কথা। শীগগির ওঠো না এখন, স্বপ্ন যে বেড়ে উঠলো। শেষে আর এখান থেকে বেরোনো যাবে না যে।

শিউলীর মুখে চোখে একটা ভয় নিশ্চিত ব্যাকুলতার আভাস ছুটে উঠল।

ছিদাম জাফা ছেড়ে নড়ার নামটিও না করে বললে, “সেদিন জানতে চেয়েছিলি, কাকে বিয়ে করবো। আজ সত্যি শিউলি?”

ওগো, না—এখন কিছু সন্তুতে চাইনে। বাঁচতে চাও তো চল আমার সাথে। দেখচো না ইচ্ছামতীতে বাগ ভেঙেছে। চলে, শীগগির চলে, নইলে এমুনি সব ভুবিয়ে নিয়ে যাবে।

ছিদাম অর্থীন উদাস-দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে, ইচ্ছামতীর বুকটা তুলে উঠে চারিদিকে কলহোল তুলে পারের দিকে ঢেউগলো ছুটে আসছে।

আমি চলুম। কে মরবে বাপু তোমার সাথে এখানে থেকে। প্রাণ বাঁচাতে চাও তো আমার সঙ্গে চলে এসো।

শিউলী বাইরের দিকে পা বাড়াতেই ছিদাম ছুটে এসে হু হাতে তাকে সজোরে বুকের ভেতর চেপে ধরে বললে, “যেতে আমি দেবো না শিউলি, কিছুতেই নয়। আমি বিয়ে করবো যে শিউলি।”

শিউলী প্রথমতঃ একটা বিরাট বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলো। তারপরে একটা অস্বাভাবিক হাওয়া মতো ছিদামের বাঁহাশ পক্ষে নিজেই মুক করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।...

...একটু পরেই মেঘ বৃষ্টিপাতের আঁচল উড়িয়ে ঘুর-



পাক খেলা আরম্ভ করলে। বাতাস তার সঙ্গে খোপ দিয়ে এক প্রলয় উৎসবের সৃষ্টি করলে। পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি ব্যথার টান পড়েছে—এই আকাশ ছোড়া হাংকায়ে, গাছ-পালার করুণ মর্মরে, বৃকের দীর্ঘশ্বাসে তারি বেদনার আভাস উঠেছে। ... ইচ্ছামতীর সমস্ত জল উপচে উঠে ছুঁল ভাসিয়ে নিয়ে চললো। ... এই স্বর্ভের ক্ষুদ্র ছন্দুর ভেতর দিয়ে যেন কোন্ দৈত্য-কর্তার অতি-সার থাড়া আরম্ভ হয়েছে। ...

... পরদিন উষার আলো ধর্মীর বৃকে নেমে না আসতেই চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। এ যেন এক নৃতন পৃথিবীতে সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে। নদী-তীরের দিকে চেয়ে তারা চিন্তেই পারলে না। চারিদিকে গভীর রাত্রির ধ্বংস-লীলার ভয়-ভূপের সারি, মাঝে মাঝে পশু-পাখীর স্তব্দদেহ। ...

## আশা কি ?

শ্রীহর লাল গুপ্ত

শ্রীমন্তি রাস্তা হ'য়ে পড়েছে ভূবে গতিমে,  
আকাশধানি শায়ায় কালোয় থেরা;  
নৃত্ত তপন দীপ্ত করে ক্ষয়-আকাশ রক্তিম,  
পরান ছোটে উল্লাস পাগল পারা।  
কোন্ দিবসের গুপ্ত প্রেমের মধুর রক্তীন স্বপ্নটী  
নৃত্তির নিশান হাওয়ায় উড়ে' দেয়।  
কোন্ শালোকে আঁধারে কে আলোয় প্রদীপ ফুৎকারে।  
কোন্ হাসিটি ক্ষয়ধানি ছায়।  
কোন্ পরশে বেজে ওঠে ছিন্নবীণার তন্ত্রী  
ধাকি ধাকি তারার পানে ধায়।

পথ-ঘাট গাছ-পালায় আটকা পড়েছে; তবু তারই  
ভেতর দিয়ে মাছুষ চলছে ক্ষুদ্রী বহুধরার এই বিধবা  
মৃত্তিকে দেখতে। ...

আজ শিউলীর বিয়ে। ...  
... শিউলী অনেক কণ্ঠে গাছ-পালা সরিয়ে ছিদ্রমের  
স্টীলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। স্টীলের চিহ্নটি পর্যন্ত  
নদী তীর থেকে মুছে গিয়েছিল,—অসংখ্য বৃক্ষাদি এসে  
প্রাক্কণের উপর পড়ে' ছিল। ...

শিউলী ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিক চাইলে—প্রত্যেকটি  
কাণ্ডায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলে; কিন্তু কোথাও একটু  
কৌবনের সাড়া পেলে না। ... তবু সে আশায় বৃক বেঁধে  
ভাকুলে—ছিদ্রামলা, গুণো ছিদ্রাম-না। ...  
প্রভাতের এক ঝাপটা ফুৎফুৎ হাওয়া লুপ্তিত পারদ-  
রাশির পরে পরে মৃত্যু-মর্মর তুলে চলে গেল। ...

ছিন্নমূল কাহার ছলে মঞ্জলা বনবীথি,  
লুপ্ত আঁখি মুছে তুলি' চায়।  
ডুকেইর কাঁধ সে কোন্ পাখীর মধুর-শীতল-কণ্ঠটী  
কাননভূমি মাভায় হরের তানে।  
কোন্ রমণীর নিশা শেষে মিলন-ভাঙা-আঁকিটি  
লুজ করে অদূর-মিলন-গগনে।  
কোন্ চাহনি ভাঙে পড়ে ক্ষয়-পুরের সৃষ্টিটি  
সাজায় বেলী চাপার মালা গাথি'।  
কোন্ ক্ষুধী কণের কাছে ডুবায় ব্যথা যন যনে  
পথধারা কে, আঁখি রে তার-সাবী।



## ছন্দ:

শ্রীহরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

নৃতন ধরণের একটি বাঙ্গালী কবিতা হাতে লইয়া  
কৌতূহলী শিশু গুরুর নিকট প্রশ্ন করিতেছে “আজ  
কবিতাটার এক লাইনে মোল অক্ষর, এক লাইনে সতের,  
অপর লাইনে আঠার,—এ কেমন-ধারা কবিতা হ'ল ?  
অথচ বড়লোকের লেখা ?”

গুরুদেব বর্ধমান বাঙ্গালী সাহিত্যের খবর রাখেন, তাই  
সহজেই উত্তর করিলেন “ও সব যোল, সতের, আঠারো—  
অক্ষরের মিল নিয়ে কি হবে ? কাণে যা ভাল শোনায় তাই  
ছন্দ:। তাতেই কবিতা। কবিতা-রচনা বিস্তৃত হ'ল কিনা  
—এর বিচারপতি একজোড়া কাণ।”

সংস্কৃতভাষার কবিতা-রচনাতেও এক সময় ঐরূপই  
একটি কথা প্রচলিত ছিল

“এবং বধা যথোৎপন্নঃ স্থমিধ্যং নোপস্ফায়েত।

তথা তথা মধুরতা নিমিত্তং বহিঃসিদ্ধান্তে।”

যাহাতে স্বশীলোভার—বিত্তেক পাঠকের—উৎপেগ বা  
বিরক্তি না জন্মে ঐরূপ উপলব্ধি যেন যতি বিজ্ঞাস করিলে  
কবিতা স্ততিমধুর হয়। যতি কি ? “যতি ভিক্ষেই ভিক্ষা-  
স্বানং কবিরিচ্যতে।” ভিক্ষা যেখানে স্বভাবত: ভিক্ষা-  
লাভ করিতে চায় সেই স্থানটাই যতি, ইহা কবিগণ বলিয়া  
যানেন।

যতি সঞ্চক্ষে ঐ উক্তি; কবিতা রচনা এবং অক্ষরের  
সমতা সঞ্চক্ষেও সংস্কৃতভাষায় ঐরূপ স্বাধীনতা দেওয়া  
আছে। অর্ধসমস্ত, বিষমস্ত ও অর্ধা প্রভৃতি ছন্দে  
প্রত্যেক চরণের অক্ষরের মিল নাই। (বর্ষের লঘু-গুরু  
ও হ্রাস প্রভৃতির সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে) কিন্তু এক  
ছন্দের সঙ্গে অপর ছন্দের মেশামেশি ইহাও সংস্কৃতভাষায়  
প্রচলিত আছে। যথা উপজাতি ছন্দ: (১) ইন্দ্রবজ্র ও

উপেন্দ্রবজ্র নামক বিভিন্ন দুই ছন্দের মিলনে উপজাতি;  
ইন্দ্রবজ্র ও বংশবধিল ছন্দের মিলনেও উপজাতি।

মোটকথা, সংস্কৃতভাষায় উত্তিবিধিতরূপ বিধান থাকিলেও  
আদর্শে কিন্তু নিয়মপ্রণালী বুঝি কড়া, শিথিলতা মোটেই  
নাই। বাঙ্গালীতেও এক সময় তেমন তেমন ভাঙা-জি ছিল।  
বর্ধমানে অনেকটা শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা শুভ-  
লগ্ন সম্ভব নাই। বাঙ্গালীভাষা যে কীভাবে ইহাই তাহাতে  
প্রতিপন্ন হইতেছে। সর্গভাষার গভীতে আবদ্ধ না থাকিয়া  
ভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চ ও গুণ, ছন্দ: ও যতি—যাহাতে  
বিস্তৃতি লাভ করে, যাহাতে নব নবোন্মেষধারালী প্রতি-  
ভার প্রসার পায় তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন  
—অন্তত: সহায়ত্ব। ঐরূপ উদার লক্ষ্য আছে বহিঃ  
যাই আজ বাঙ্গালীর কবিতা রাস্তা সুশান্তর উপস্থিত,  
নিত্য নিত্য নানারকমের নব নব ছন্দের আবিষ্কার।

উপরে লিখিত ছন্দ: শব্দটির সঙ্গে একটি বিপর্য  
সংযুক্ত দেখিয়া কেহই যেন উৎসাহে গুণ কাঠবৎ কঠোর  
সংস্কৃতভাষার একটি উপসর্গ বা উপস্বব মনে না করেন।  
সংস্কৃতে দুইটি ছন্দ শব্দ আছে একটি সকারান্ত, একটি  
অকারান্ত বাঙ্গালীতেও দুইটিই ব্যবহার দেখা যায়।  
যথা—ছন্দোবাক্যপদ, (সকারান্ত ছন্দ শব্দ) ছন্দাহবগিতা  
(অকারান্ত)। অকারান্ত ছন্দ শব্দের অর্থ অভিক্রায়।

উত্তপ্ত সৌহৃদ্যের দুই পাশে দুই কর্ণধার বসিয়া যখন  
ঘন ঘন সবলে হাতুরি পিটিতে থাকে—তখন ঐ সঘন  
হাতুরি পিটুনিতে একটি ছন্দের অস্বভাব্য, এটা সকারান্ত।  
অগ্রহাণ যামের প্রথমভাগে বহলক্ষীর অগ্রগ্রহে বাতীতে  
চিড়া তৈয়ার করা হইবে; ছই যুবতী জা কোমল অঁচল

ইংৎ কিলান্ধাশি মিস্ত্রিভার

বদন্তি জাতিবিধমব নামঃ

ছন্দোমঞ্জরী, ২৪৩

(১) অনন্তরোহিতরিত লক্ষ ভাঙ্কো-

পাদো বদীরা বৃক্ষজাতদ্রবস্তা:



‘আগিমা, অর্ধ আবির্ভব খোমটায় শালীনতা বধিষা মাষিমা  
মনেন আনন্দে চিঠা কুটে, তালে তালে একটা ছন্দ মাষিমা  
উঠে; ঊষাং যদি ছন্দোভঙ্গ হয় তবে হস্ত বা পদভঙ্গের  
পূর্ণ আশঙ্ক। রায়দের বাড়ীতে দোতারা দালানের ছাশ  
পিটানো হইতেছে; একদল মজুর ছন্দে ছন্দে গান ধরিয়াছে,  
হাতের পিটনীতে তাল রাখিতেছে, টের বেটের হইলে  
ছন্দোভঙ্গকারীর উত্তক পুঠি বিমুক্ত কথাতঃ—সগাং  
সগাং। ছন্দঃভঙ্গ করাটা বৃষ্টি পূর্বই অস্বাভাবিক। সম্বন্ধে  
একটা বচন আছে—“বরং মাংসং মনঃস্বার্থ্যং, ছন্দোভঙ্গং ন  
কারয়েৎ ॥” মাস শব্দ স্থানে ভূমি বরং মনঃশব্দের ব্যবহার  
করিলে, ভবু সাধনান যেন ছন্দোভঙ্গ না হয়।

বন্দুকহাতে সৈন্তদল মাঠ করিতে চলিয়াছে ‘লেক্ট  
রাইট, লেক্ট, রাইট’; কি স্বন্দর ছন্দ: টাট্ট, খোড়া  
টপাটপ টপাটপ কদম ঢলে, ধোবা হিন্ হিন্ কাণ্ড কাচে;  
কাটুরিয়া গাছ কাটে ঠাঃ ঠাঃ, কোকিল ঘন ঘন ডাকে সুহ  
সুহ, বালক ভেড়াগর টুহ টুহ, সর্দারজি ছন্দ আছে বিয়াম  
আছে দিতি আছে। রেলগাড়ীর হুঃ হাঃ, ধোয়ান-ঝড়ের  
টিক-টিক, শ্রাবণ ধারার ‘অম্ব বসু—ভন্দ: নাই কোয়ার’  
আমরা অহুসন শ্রাবণধারের ব্যাপারে নিমুক্ত আছি, ঠৈ  
কেহইত ভাবিনা যে উদ্বাহতও একটা গভীর ছন্দের গন্ধ  
আছে। ১৬+১৮+২৮ অথবা ১৬+১৮+৩২=১১২  
—এইরূপ একটি অঙ্কের ব্যাপারও নাকি শাস্ত্রপ্রাণের  
ছন্দের ভিতরে রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ ছন্দটাকে বাগাইতে  
পারে সেই নাকি ছান্দল, মহাপুরুষ, মহাবী। তার আত্ম  
অনুরক্তাল, ছন্দকে রেঙুলেই করা বসে সহজ ব্যাপার নয়;  
যার তার কাজ নয়, কে-সে পারে না।

এক বিচক্ষণ কবি কি স্বন্দর একটা সমস্তাপূর্ণ করিয়া-  
ছিলেন জানেন ত ?

রামাভিষেক বদ বিদ্যালয়াঃ

কস্যাচ্যুতো হেমখট গুরুণাঃ।

সোপাননাসাঙ চকার শব্দং

“১১১ ১১১১ ১১১১ ১১১১ঃ”

ভট্টকবাবের রসনীর রচনার ভিতরেও একদিন রসবতী  
পোপাঙ্গনামগণের আশ্রয়স্থলনিগদ তাল হই মধুময় নৃত্য  
ভগবান রামচন্দ্রের চিত্তে ছন্দের লহরী কাগাইয়া তুলিয়া-

ছিল। প্রবাদ আছে যে ভট্টকবাবের রচনিতা ভট্টরবির  
ভট্ট জাতিতে ছিলেন নাকি উদ্ভবায়। তাঁত বিনোদ  
কালে তানুহাতে মাছু চালান আর শোকের অশ্রু বর্ষা  
করেন “অকুরেপো, বা-হাতে মাছু চালান, রচনা করে  
“বিবুদলং”; এই প্রকারে ভট্টকবাবের প্রথম শ্লোক রচি-  
ত হয় :—

“অভুদপো, বিবুদলং, পরন্তং;

অভাতিতো, দশপদ ই, তুয়াহুতঃ।

গুণৈর্দর্শনং, ভুবনহিত, ছলেন যং

সনাতনঃ পিতরমুণা, গমংস্বয়ং ॥”

ইংরেজ কবি “গ্রে’র ইলিজি গভিয়ার কালে কোন

স্বন্দর ছন্দ: গুটীধরে নৃত্য করে—

“The cur few tells the knell of part ing day,

The lowing herd winds slowly o’er the lea,”

এই প্রকার কবি টেনিসনসন :—

Man may come and man may go

but I go on forever”

প্রকৃতি স্থললিত ছন্দে অস্তরের ভিতরে বসন্তই আননের  
সৃষ্টি করে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিতরে বিবিধ  
স্থললিত ছন্দেই উদাহরণের অবধি নাই। বর্তমান বাঙ্গলা  
সাহিত্যেও দিন দিন ছন্দের গতি ইতস্ততঃ ক্ষত চলিতেছে।

“দাদাপতি গতি কর কর তনু”

প্রাণপতি ভব যথার অরুণ।”

প্রাচীন ভূবক ছন্দের উদাহরণ যথা :—

রাজাণ্ড, লও তও বিফুলি ছুটিছে।

হলস্থল কুল কুল ত্রস্তিভি ছুটিছে

( ভাববচন, অন্নদা মঙ্গল )

মল্লিকামালা বা একাবলী :—

এ ভব ভবন কুম্ববন

কুম্ববন বরুণ মহগুণ।

সম্ভাব শতক।

বাঙ্গলা ভাষায় ছন্দ: ও কবিতার প্রচলন যে কবে  
কোথা হইতে কি ভাবে আসিল তাহার খাটি উক্তর নিতে  
পেলে সম্ভবত ভাষার আশ্রয় লইতে হয়, বৈবিক যুগের  
অতিপ্রাচীন গায়ত্রী, উষিক, অহুটপ, বৃহতী, পঙ্কতি,

রিগ্‌ও জগতী প্রকৃতি প্রধান সপ্ত ছন্দের অবতারণা  
করিতে হয়। বৈবিক ভাষার পর শৌকিক ভাষাতে  
দাক্ষিণ্য বান্ধিকির “মা নিবাদ প্রতিক্রিয়াং তং” ইত্যাদি  
“শোকাবুত” “শ্লোকই” আদি কবিতা কিনা তৎ সম্বন্ধে  
বহুসন্ধান করিতে হয়। সম্ভবত ভাষার অহুতরপেই যে  
লভ্যতার কবিতার সৃষ্টি তাহাও স্বীকার করিতে হয়।

সম্ভবত “মালিনী” নামে একটি শ্রুতিমধুর বিখ্যাত ছন্দ:  
হয়ে। প্রত্যেক পাশ্বে পনের অক্ষর। প্রথম ছয় অক্ষর  
লু, সপ্তম অষ্টম ও নবম গুরু, দশম লঘু, একাদশ ও দ্বাদশ  
ক, ত্রয়োদশ লঘু, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুরু। উদাহরণ  
যেন—

যদি নিপততি বরী বক্ষিগাঙ্গে নরাণং

বন্ধন ধন বিয়োগো লাভদা বাম ভাশে ইত্যাদি।

ঐ ছন্দের কত শত কত লক্ষ শ্লোক যে সম্ভবত সাহিত্যে  
রহিয়াছে তাহার প্রকৃত সংখ্যা কে দিবে? বাঙ্গলাতেও  
যদি ঐ মালিনী ছন্দের উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া  
যাত তবে যেনে আনন্দ আসে নাকি ?

(১) সকল বিষয় বেত্তা বাহুববের যত্নে  
হইল যদি অবাধে শাস্ত নারায়ণপ্রাণ।  
নিরবি সমর মধ্য স্রোতপুঞ্জে উপানী  
কুম্ববল মিল ভদ্র জ্ঞে সমুদ্র চিত্তে।

(২) অমনি সকল বন্দী মাতিল ক্ষেম গানে  
জয় হরণপতি শ্রীপতি-শ্রীতি পাত্র।

(৩) ঘন ঘন জয় শব্দে পুরিলা যুদ্ধ শব্দ  
বিদিত করিল ভূপে ধারণেশে মুরারি॥

সম্ভবত সমস্ত তিলক ছন্দ চতুর্দশ অক্ষর বিশিষ্ট।

দীাহরণ যথা :—

কুম্ববন তিলকঃ তিলকঃ বনাভাঃ

লীলাপংগ পিককুলং কলমঙ্গ রোতি।

ইত্যাদি

বাঙ্গালী বসন্ততিলকের আকৃতি দেখুন—

(১) সম্ভবত কৌরবজা হইতে সর্পে

নিশেখ সিংহম বাহিরিলে ব্রজেন্দ্র।

দুর্ধোধান প্রকৃতি বীর সভাবসানে  
কোলাহলে উঠিল উক্ত কুম্বচিহ্নে।

(২) একপূর্ণ সপ্তময়ের অপরূপবার্ণা

শীতপ্রবের বদনে ভনি রাজবর্ণ।

সম্প্রোথিতের সম চিত্তিত মৌনভাবে  
আশ্চর্য পূর্ণ নয়নে বিভজে বিলোকে।

(৩) পাঞ্চাল আদি যত ভূপতি একবাতে  
অদ্যাপি প্রতিবর্ণী অবধারি পার্বে।  
নানা প্রকার করি তার বশঃ প্রশংসা  
ব স্ব ধ্বজাঙ্গ শিবিরে চলিলা তদানী।

(৪) স্বপ্নের তুল্য ভগবান পররশ্মিমালী  
আকাশ মার্গ অবলম্বি হলে অদৃশ  
নিষ্কাশ দীপ পুংগব বহসনে চিত্ত  
চিন্তাবসে হইল ময় তমিস্রযোরে।

সম্ভবত ইন্দ্রবজ্র ও উপেন্দ্রবজ্র। ছন্দ একাদশ অক্ষরে। উদ-  
হের নিম্নাংশিতে উপজাত ছন্দ:। উদাহরণ যথা—

কো বেতি গুপ্তস্ত বদন্ত ভাওনং

ঘনগমে কিং করোতি ময়ঃ ?

সাধাঃ স্রিয়ঃ কুত তনুভারজি ?

“দীপলিকা নৃত্যতি বিহঙ্গুঃ ॥”

বাঙ্গলাতে উহার নমুনা দেখুন—

(১) ইতস্ততঃ কৌরব ভানি পার্বে

জমে শিবা শোণিত মাংস লোভে।

উল্কে উড়ে বাহু পুংগব কতু

চীংচীং শব্দে করি কর্ণ নীর্ণ।

(২) বিপদপক্ষে স্তত চিত্ত রূপে

বামে ডমে খান শূণাল সংঘ।

রথধ্বজে চাতক নীলকণ্ঠ

নিঃশব্দচিত্তে বসিছে অব্যবাহার।

(৩) বৈরাহ্যস্থলে বলহীন শক্ত

বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈবে।

পৈশবে হবে নিশ্চিন্ত স্বতপুত্র

তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়ত্রী।

ইন্দ্রবজ্রায় সম্ভবত উদাহরণ—

(১) শিশুর বিকৃত বিধবা ললোটে।



(২) মাঘে প্রারম্ভে যদি কল্পবাসী ইত্যাদি দ্বিতীয় উপাধরণটি অম্বহার্য বিদগ্ধ বিহীন—হুহুহ বাহালাহার মত। তবু খাঁটি বাহালাহার একটি উপাধরণ দেখিয়া হইতেছে, পাঠকগণ হাসিনেন না।

ঢাকা সুমিলা বরিশালে গেলে

ঢালে তরালে কতলোক খেলে।

ছেলে গিয়ে কষ্ট করে কবৌ

গদাটতে বাস করে তপসী ॥

ছন্দকে আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমতঃ যেন তেন প্রকারেণ যেমন তেমন শব্দধারা লঘু গুরু ব্যবস্থা করিতে হয়, পদের মিল রাখিতে হয়, বাছা বাছা শব্দ মধুর রাখিতে হয়। বাহালা ভাষাতে কবিতা রচনার মক্শ করিতে হয় পয়ার ছন্দঃ সংস্কৃত অষ্টপু ছন্দঃ। পয়ারের সাধারণ উপাধরণ—

মহাভারতের কথা অমৃত সুমান।

কাশীনাথ রাগে কহে শুনে পুণ্যবান ॥

চতুর্দশ অক্ষরে পয়ার ছন্দঃ, প্রথম আট অক্ষরের পয়ে বতি। অল্পপেগে পয়ার হয়—প্রথম ছয় অক্ষরের বতি। চারিপাশে অষ্টপু ছন্দঃ, প্রত্যেক প্যানে আট অক্ষর \* প্রত্যেক পায়ের পঞ্চমবর্ণ লঘু ও ষষ্ঠবর্ণ গুরু হইবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে সপ্তম বর্ণ লঘু হইবে, অপরাপর অক্ষর সম্বন্ধে ধরাবাধা কিছুই নিয়ম নাই। উপাধরণ—

বাগবানি বসন্তকৌ বাগবর্ণ প্রতিপত্তে ॥

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্শ্বাভী পরমেশ্বরী ॥

শাঁতার শিখিতে হইলে জলে হারডুহু বাইতে হয়, হাটিতে শিখিতে হইলে পুনঃ পুনঃ লাছাড় খাইতে হয়, শানদায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বিবিধ বিয়ের হাত ডকাইতে হয়, ছন্দ অভ্যাস কালেও তেমনই নানা রকমের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হয়। লঘু, গুরু, মাত্রা, যতি, অক্ষর সংখ্যা প্রতিমধুর শব্দ চয়ন, সংযুক্ত ও অসংযুক্ত বর্ণের বিচার—কত কি। হাতে বড়ির কালে যেমন তেমন

ভাবে অভ্যাস করিলেই চলে। বাহালা ভাষাতে সংস্কৃত অষ্টপু ছন্দের মক্শ দেখুন—

(১) বাজারে সকলে গেলে বাড়ী রক্ষাং করোতি কং।

তরকারী ত দুশ্রাণা টাকা নাতি গৃহে মম ॥

(২) মুরিয়া যোব সাংসারে কত কষ্ট পদে পদে।

দেখিয়া দেখনা তাহা মতোহাসি পাশ সাগরে ॥

ইত্যাদি

নিম্ন খোচকি সংস্কৃতভাষায় কিংবা বাহালা ভাষায় তাহা ধরা যায় না। যথা—

জলে স্থলে যনে বনে গৃহউপবনে।

নবীন-সুখনা শুলে সুস্থমে পবনে ॥

জননী-চরণ-পূজা সাধিতে বাসনা

অচেতনে কেন নাহি জ্বরে যারণা ?

বস্তুতঃ পক্ষে উহা সংস্কৃত রচনা। অম্বহার্য বিদগ্ধের উপগুণ নাই। এই প্রকারের 'ভাষা-চোরা' কবিতা অনেক রচনা করা যায়; অম্বা পাকা হাতের প্রয়োজন।

সংস্কৃত শাব্দিক বিকীর্ণিত ছন্দ ঘন প্রচলিত। লঘা ছন্দঃ, উনিশ অক্ষরে এক চরণ। বাহালা ভাষায় তাহার একটু নমন্য দেওন হইতেছে—

‘ঐবাদু ভাগবতী কথা যদি ভবেং কেবা শুনে সে কথা ?’

তোটকি ছন্দের সংস্কৃত উপাধরণ—

যমুনা তট মচাত ফেলিকলা—

লসদগ্নি সেরোকষ সদকতিম্ব। ইত্যাদি

বাহালাতে আধুনিক তোকি ছন্দঃ :—যথা—

মন-কুঞ্জবনে মধু গুণরগে

কত তন্ত্রী সান মুহু মজুরগে। ইত্যাদি।

সংস্কৃতে ‘ভূজ্ঞ প্রমাত’ ছন্দঃ দ্বাশ অক্ষরে, কিন্তু বাহালাতে অল্পরপ। যথা—

গগনময় মেঘের ভিড়, জগৎ আজ চমৎকার,

বসন্ত বসু কীপায় বোয়াম উভয়র হৃদহার। ইত্যাদি

আরবি ভাষায় ‘রমল’ ছন্দে বাহালা কবিতা যথা—

বিখসংসার চলছে ছন্দে

শুষ্টি ভরপুর ছন্দঃশপ্পে

স্বধীন্দু যুগ্মসিদ্ধ

ধায় আনন্দে ছন্দঃবাহকে।

সংস্কৃত ‘তামরস’ ছন্দের উপাধরণ যথা—

‘ফুট স্বহৃদা মক্শর মনোজঃ

ব্রজ ললনা নয়নালি নিপীতম।

তব মুখ তামরসঃ সুবশকো।

জয় তড়াগ বিকাশি মন্যজ ॥

বাহালা ভাষায় উক্ত তামরস ছন্দের অম্বকরণ—অক্ষর হিসাবে না হইয়া মাত্রা হিসাবে হইয়াছে, যথা—

নেমেছেরে আজ ভুমে নন্দিত মন্দন

খোলা বৃকে তাই যুগি তোর করি বন্দন ॥

ইত্যাদি।

স্বকবি শ্রীমুক্ত বতীজ প্রদান ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ছন্দকে বাহালা ভাষায় আসরে নামাইয়া এবং ‘চোখ গেল’ যুগ্ম-ভাক’ প্রভৃতি নবীন ছন্দ আবিষ্কার করিয়া ইতিমধ্যে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। \* বিশ্ব-কবি শ্রীমুক্ত ববীজনাথ, নাট্যকার খিজের ও গিরিশ বাহালা সাহিত্যে বিবিধ নব নব ছন্দের সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া বাহালা সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা সকলের শক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া এই স্থানেই নিবৃত্ত হইতেছি।

(দীপিকা হইতে উদ্ধৃত)

## শ্রীশ্রী৭রাজরাজেশ্বরী মাতার শোভাযাত্রা

ঊন সত্তর বৎসর ধর্ম্মা প্রচলিত এই নিরঞ্জন যাত্রার বিয় উপাদান করিয়া বাহালায় পুলিশ যে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার বিশদ বিবরণ দিবার আর আবশ্যক নাই। পুলিশের আচরণ সাম্প্রদায়িক প্রভাব-মুগ্ধ বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। শোভাযাত্রার অম্বহতি পক্ষে যে সব পথ নির্দিষ্ট ছিল—তাহা অকস্মাৎ খোলা মত পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা পুলিশের আছে কিনা তাহাই আমরা জানিতে চাই—যদি থাকে তবে ইহা কি বাংলায় লার্টসাহেবের মত লইয়া করা হইয়াছে—যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমরা জানিতে চাই যে তিনি সমগ্র হিন্দুধর্ম্মভিত্তি ধ্বংসকিতে এরূপ রূঢ় আখ্যাত করিতে দিলেন কোন আইনে—কি বিচারে। পুলিশের এই অসঙ্গত আদেশের ফলে পরমাধার্ম্মা জগন্নাথের প্রতিমা প্রকাশ রাত্ৰার ১১ ঘটকা পড়িয়াছিল—পরে গত বৃষার অপরাহ্নে প্রতিমা অপসারিত করিয়া পূজা মণ্ডপে রাখা হইয়াছে। এদিকে প্রতিমাবাহনকারী লরী

চালক ঘরকে রাষ্ট্র আটক করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে অথচ মঙ্গলবার অসংখ্য মুসলমান যে প্রকাশ্য রাজ পথে বলিয়া ৩৯ ঘটকা ধরিয়া যে নেমাঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া শুনা মাইতেছে—সে কার্যের অম্ব-মোদন পুলিশ কোন আইনে করিল, তাহা আমরা জানিতে চাই এবং ঐ সব লোককে অবৈধ জনতা ও রাজপথ অবরোধের অভিযোগে কেন অভিযুক্ত করিল না। হিন্দু-দের যে এই ব্যাপারে অকারণে অবমানিত করা হইয়াছে তাহার কারণ হিন্দুরা নিরীহ ও ধর্ম্মভীক বলিয়া কিন্তু পুলিশ যদি এই ব্যবহার মুসলমানদিগের প্রতি করিত তবে যে কি কাণ্ড ঘটত তাহা বলা যায় না। পুলিশ যদি মুসলমানদিগের ভয়ে এই কাজ করিয়া থাকেন তবে তাহা উদ্দেশ্যের প্রচণ্ড অক্ষমতার পরিচয়। ইহাতে কি প্রকারান্তরে হিন্দুদের উত্তোজিত করা হইতেছে না! অল্প বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হরতাল হইবে ও অপরাহ্নে টাউনহলে বিরাট প্রতিভাযাত্রা শতাধিক বৈধো যাত্রী সমস্ত ভারতের হিন্দু কি তাহাৎ এই অপমানের প্রভুত্বের দেখ।

\* পঞ্চম লঘু সর্বজন সপ্তমঃ বিচতুর্থগোঃ।

এক ষষ্ঠক জানাযে, শেষে নিয়মো মতঃ ॥





বেশ নৃতন দেখান হইয়াছে—তবে উহার ঐতিহাসিক মূল্য কতটা তাহা ঐতিহাসিক নির্ধারণ করিবেন।

প্রাধান্য ও অঙ্গসজ্জা মাঠের উপর খুব ভালই হইয়াছে কেবল অর্থখামা ও অর্জনের সজ্জা আমাদের ভাল লাগিল না—অর্জনের মুণ্ডিত গুণ্ড হইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না—সজ্জা চরিত্রের মত অর্জনের গুণ্ড থাকিলে সৌন্দর্য্য বজায় থাকিত আর অর্জনের গারব্ব অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের অহরূপ হওয়াই উচিত ছিল। অর্থখামা চরিত্রের অভিনেতা চাণ্ডি চাপলিন গুণ্ডের আমদানী করিলেন কেন। সজ্জা অভিনেতা হইতে নিজেদের একটু বিশিষ্টতা দেখাইবার জ্ঞান কি? ভীষ্মের কৃমিকায় দানীবাযুকে বেশ হৃদয় মানাইয়াছিল। মহর্ষি নারদকে ইহার আদ্যের দলের নারদের মত একরূপ পাকা দাড়ি না পরাইয়া কুমারবেশী করিয়া বেশ ভালই করিয়াছেন।

ভীষ্মের কৃমিকায় দানীবাযুর অভিনয় অতি হৃদয় হইয়াছিল—তবে ভীষ্ম চরিত্রের বক্তব্যমাণে তেমন বিশেষ কিছু না থাকায় কৃমিকাটিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিতে তিনি পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের কৃমিকায় অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণ তিনকড়ি চক্রবর্তী মহাশয় অপূর্ণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মধুর গষ্ঠীর তরবারিত কর্তব্যের সাহায্যে গীতোক নীরস সত্যগুলি মধুর হ্রস্বে আবৃত্তি করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করা বড় সহজ ক্ষমতার স্বর্ণ নয়। তবে বাহ্যিকতার নিক্তি তিনি আরও একটু মনোযোগ করিলে উহার অভিনয় আরও হৃদয় হইবে বলিয়া মনে হয়। নাট্যকৌশল চরিত্রকে প্রাণ দিতে তিনি যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা বলা যায়। কর্ণের অভিনয় অপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের অভিনয় দুঃস্থ হইলেও এ অভিনয়ে উহার পূর্ণলব্ধ বশ বঞ্চিত হইবে।

দুর্ঘোষানের কৃমিকায় অশীষ্রাব্যুর অভিনয়ও বেশ হৃদয় হইয়াছে তবে স্থানে স্থানে তাহার স্বীয় ব্যক্তিগত চুটিয়া উঠিয়া চরিত্র স্বষ্টির সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। অর্জুনের মুণ্ডিত দানের দৃষ্টান্তে অভিনয় যে অসাধারণ ও অপূর্ণ কলাজ্ঞানের পরিচায়ক হইয়াছিল তাগাতে আর সন্দেহ নাই। উহার রূপসজ্জাও অতি নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল।

বহুদেবের কৃমিকায় শ্রীকৃষ্ণ দুর্গাপ্রসন্নাব্যুর অভিনয় যেমন মনোজ্ঞ ও তেমনি স্বাভাবিক হইয়াছিল—এই সাফল্যের স্রষ্টা আমরা দুর্গাবাবুকে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

স্রোণাচাধ্যায়ের কৃমিকায় অভিনেতাও বেশ চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন—এই অভিনেতাকে পূর্বে স্বস্ত স্বস্ত কৃমিকার অভিনয় করিতে দেখিমা আমরা তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম—আজ আমাদের সে আশা সার্থক হইয়াছে দেখিমা আমরা বড় আনন্দিত হইয়াছি।

শিশুপালের কৃমিকায় একটা দৃষ্টেই রাধিকানন্দাব্যুর দর্শকবৃন্দকে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি দিয়াছিলেন—কল্পনোচ্চিৎ উদ্ভূত তাহার অভিনয়ে ফুটিয়াছিল ভাল।

অর্জুনের কৃমিকায় দুর্গাব্যুর অভিনয় অতি হৃদয় হইয়াছিল—তবে তাহার বেশভূষার ক্ষতি যেন অভিনয় সৌন্দর্য্যকে অথবা ব্যাহত করিয়া দিতেছিল।

অর্থখামার অভিনয় আমাদের ভাল লাগে নাই—অভিনয়ে প্রাপ্তের কোন পরিচয় পাইলাম না—যজ্ঞালিত পুতলিকার মত কথা বলিয়া বাইলে তাহাকে অভিনয় বলা চলে না। কেশ, জ্ঞানসম্মত, ব্যাসদেব, বলরাম, নারদ প্রভৃতি কৃমিকার অভিনয় চলনসই বলা চলে।

দ্রৌ কৃমিকার মধ্যে প্রাপ্তি ও অবির অভিনয় খুবই

বিপুল—রঙ্গালয়ের ভিতর ও বাহির, উভয় দিকেই সংস্কার সাধিত হইয়াছে এবং সে সংস্কারের মধ্যে উন্নত কচির ও প্রচুর অর্থব্যয়ের চিত্র স্থাপিত হইয়া উঠিয়াছে। রঙ্গমঞ্চেরও প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহাতে যে কেবল সৌন্দর্য্য বাড়াইবারই প্রয়াস আছে এমন মনে উপরন্তু এই সব পরিবর্তনের উপযোগিতা অভিনয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

বেশ ভূষা সহই নৃতন ও নৃতন ধরণের করা হইয়াছে—দৃশ্য পটের অধিকাংশই নৃতন, শিল্পী চারুক্সের তুলিকা প্রস্তুত। তবে তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব বৃদ্ধিতে পারিলাম না—সীতার দৃশ্য পটে চারু বাবু যাহা দেখাইয়াছেন এ তাহার অপর এক দিক মাত্র। অবশ্য এগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর ভিত্তি কি না সে বিচার প্রত্যত্যাত্মিক করিবেন তবে ইহাতে আমরা চারু বাবুর নিজস্ব কতকগুলি অপর কৌশলের পুনরাবৃত্তি দেখিয়াছি যাত্রা—আমরা চারু বাবুর নিকট ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক মনোজ্ঞ দৃশ্যপট আশা করিয়াছিলাম।

কৌশল দৃশ্য বা Trick scene আধুনিক যুগের উপযোগী নহে শিক্ষিত দর্শক বৃন্দ উহাতে আনন্দ পান না—তবে অশিক্ষিত দর্শককে উহাতে মজা উপভোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিনয়ে কয়েকটা এইরূপ দৃশ্য আছে এবং তাহা নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলের চেয়ে স্রোতিভর্ষির স্ববর্ণন চক্রদীপী আমাদের ভাল লাগিল। চরিত্রোপযোগী আত্মবর্ণন ও শিরদ্বাগগুলির পরিকল্পনা

দাগার গরম কাটিয়া বাইলেও গ্রীষ্মের গরম খুব জোরে দেখা দিয়াছে—গরমের চোটে লোকে জাহি মধুস্থান করিতেছে কাছেই অভিনয় দেখিতে বাইতে মনে কেমন একটা আতঙ্ক জন্মে কিন্তু বহুদিন রঙ্গমঞ্চের কোন সংবাদ মিতে না পারায়, গত রবিবার ঠারে শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে গিয়াছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ টিক নাটক নয়—গ্রন্থকার ইহাকে দৃশ্যবাক্য বলিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কয়েকটা ঘটনা পরের পর সাজান আছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলৌকিক ঘটনার পরিপূর্ণ হস্তরাজ নাটক জন্মবার মত অদ্ভুত দৃশ্য বা চিত্রোদ্ভবক ঘটনা সংযোগের জ্ঞান গ্রন্থকারকে বেশ কষ্ট রক্তনা করিতে হয় নাই। কংসের বহীষীকরণ প্রাপ্তি ও বশিষ্ঠ নামক জ্ঞানসম্পন্ন হুইটী কস্তার চরিত্র গ্রন্থকার মনের মত করিয়া গড়িয়াছেন; এই দুইটী বিভিন্ন চরিত্রের একত্র সমাবেশ বেশ হৃদয়-শাল সম্পন্ন করিয়াছেন। একটা প্রতিহিংসার ছবি ও অপরটা ক্রমা ও ভক্তির প্রতিমূর্তি।

ঘটনাবলি বলিয়া পুস্তকখানি আকারে কিছু দীর্ঘ হইয়াছে—আজকালের দর্শক এত বেশী পরিমাণে নাট্যরস উপভোগ করিবার সামর্থ্য রাখেন কিনা সন্দেহ—বিশেষতঃ এই দার্শনিক গ্রীষ্মে। আমাদের মনে হয় অভিনয়ের সময় আরও একটু কম হইলে ভাল হয়।

ঠারের কর্তৃপক্ষ অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন



ভাল হইয়াছিল। অভিনয়ে এই ছুইটি চরিত্রই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রান্তির ভূমিকায় শ্রীমতী স্বামীনীর অভিনয়ে প্রতিহিংসা যেন কৌতুক হইয়া উঠিয়াছিল—কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি, প্রবেশ এবং নির্গমন সকল বিষয়েই ইহার অভিনয়ে কোন ত্রুটি ছিল না। আকৃতির সঙ্গে ভাবাভিযাক্তির একত্ব অপূর্ণ সমাবেশ আধুনিক অভিনেত্রীগণের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

স্বস্তির ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারকে বেশ মানাইয়াছিল। তাহার বিধব মুখচ্ছবি মধ্যোক্তির সিদ্ধ আলোক শিখা জুটিয়া তাহাকে একটা অপূর্ণ মান সৌন্দর্য্য দান করিয়াছিল। গানগুলি করণ ও তক্তির সিদ্ধ হ্রস্ব ভরিয়া উঠিয়াছিল। আকৃতির মধ্যোক্ত বিবাহের হরতী বান্ধিয়া উঠিয়া দর্শকবৃন্দের মর্ম্পর্শ করিয়াছিল।

দ্রৌপদী চরিত্রে শ্রীমতী রাণীস্বামী রাক্ষসীমোচিত চালচলনে চরিত্রের মধ্যোক্ত রক্ষা করিয়াছেন।

দ্রৌপদীর সহচরীগণের নৃত্যগীতও বেশ মনোরম হইয়াছে, নৃত্যের ভঙ্গীতে একটু বেশ নৃত্যরূপ দেখা গেল—বেশ সুস্বাদু ও বিশিষ্টতা ছিল। ঠায়ের সখীসম্মেলন যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায়।

ঐক্য পুস্তক সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আগামী মঙ্গলবার স্থানিক শ্রীমতী স্বামীনীর

সাধারণ রজনী উপলক্ষে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রাণাপ্রতাপ ও মিশরসুন্দারীর অভিনয় হইবে। কোলিকল্পী স্বাসিনীর কলকণ্ঠের অমৃত পান না করিয়াছেন এমন নাট্যরসিক কেহ আছেন কি না জানি না—যদি কেহ থাকেন তবে ঐদিন মিনার্ভায় বাইঘা তাহার পাণের প্রাণচিহ্ন করিয়া আসা আবশ্যক। ছদ্মানাটকেই শ্রীমতী স্বামীনীর গান শুনিতে পাইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আশা করি বঙ্গের এই অমিতীয়া গায়িকাকে অভিনন্দিত করিতে দর্শকবৃন্দ মিনার্ভা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন ও আনন্দপূর্ণ হৃদয় লইয়া ঘরে ফিরিবেন।

ভবানীপুরের পূর্ণবিহেটার জামিয়াছে বেশ ভাল। ভাল ছবি দেখাইবার যে ব্যবস্থা তাহার। করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় দক্ষিণ কলিকাতার দর্শকবৃন্দ তাহারের প্রতি আহুকূল্য প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না—এই শনিবার তাহার। Kindred of the Dust নামক একখানি হৃদয় ভিন্ন প্রদর্শন করিবেন, ইহার প্রধান অভিনেত্রী হইতেছেন মিরিয়াম কুপার। আমাদের মনে হয় যে মিরিয়াম কুপারের এই অপূর্ণ অভিনয় দেখিবার সুবিধা দর্শকবৃন্দ ত্যাগ করিবেন না।

ভাঙ্কড়া মহাশয়ের কোন সাক্ষাৎশ্রম পাওয়া বাইতেছে না—বৈশাখে তাহার সম্ভারয়ের অভিনয় আরম্ভ করিবার কথা ছিল কিন্তু এখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই তখন একটা বাহা কিছু হউক গোছের সংবাদ দিলে ভাল হইত কারণ তাহার ভক্ত দর্শকবৃন্দ কয়েক মনে হতাশা হইয়া গড়িতেছেন। তবে কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চের বাটখানি রং হইলেই দেবিয়া অনেকের প্রাণে এখনও আশার দীপ টিকিট করিয়া জলিতেছে।



বিত্তীয় বর্ষ]

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩০, ইং ১২ই জুন ১৯২৬

[ ৪শ সংখ্যা

## বিগত-যৌবন

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

গুপো মোর বিগত যৌবন,  
দার্শনিক সমস্তার জটিলতা মাঝে  
কখন নিরাশা আসি যিয়েছিলে সাড়া,  
কয়েছিলে মধুময় বসন্তের সঁকে  
তোমোর বরিয়া নিতে অন্তর আসনে,  
সঁপে দিতে তোমাতেই মন।

তখন চিনিনি সখি,  
এসেছিলে রূপময়ী রমণীর বেশে  
দর্শনের কুটুর্কে জুবে ধাক্কা মনে  
নিষে যেতে কোন সেই স্বপনের দেশে  
তোমার রূপের জালে নয়ন আবার,  
যুগায় কিরাহু আঁখি।

আবার আসিলে তুমি  
বনোয়ার গোলোপের মনোহর সাজে  
নীল অস্তর মোর করিতে আহ্লাদ;

আগুন ভুলিয়ে রাপি মীমাংসার মাঝে  
সদর্পে স্বপ্ন মোর লইছ কিরায়ে;  
সলাজে লুটালে তুমি।

আজ সবি পড়ে মনে,  
কয়েছিলে কতবার প্রভাতে সন্ধ্যায়—  
শুধু কি কাটাবে কাল পৃথিবী মাঝারে  
আমি যে মিশিতে চাই তব প্রেমচাঁদ,  
আঁখি কি গোঁয়ে কিরাইতে, চাহিবে না  
কোন শুভক্ষণে?

তখন পাতিনি কাণ,  
আজি মোর অন্ধ আঁখি, বিগত যৌবন,  
দ্রব সব ইন্দ্రిয়ের গতি, কপিত অন্তর  
জাগাইয়া দেয় শুধু বিবৃত বর্ণন—  
তোমার সকল বাধা, করণ আহ্বান  
কীদায় কটনি প্রাণ।



## মরণের পর

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়

১

মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অন্তরাল সমগ্রটুকু যদি আমাদের পরিজ্ঞাত থাকিত তাহা হইলে মৃত্যু আমাদের নিকট এত ভীতিকর হইত না। কবি গাইয়াছেন—

“জীবনটাত’ রেখা গেল, তবুই কেবল কোলাহল।  
(এখন) মরণটাকে দেখি যদি, সাহস থাকে ত এগিয়ে চল।

কিন্তু মৃত্যুর পারাবাহ্য অনিশ্চয়তার আশ্রয়ে আবৃত থাকায় মৃত্যু আমাদের সম্মুখীন হইলে আমরা সাহস পূর্বক অগ্রসর হইতে পারি না। তদবাস্তব অতল গম্বীর মধ্যে লক্ষ প্রদান করিতে সাহসী বীরপুরুষের স্বয়ংও কম্পিত হয়—কিন্তু, গম্বীরের গভীরতা মাত্র ২,৩ হস্ত এবং তলদেশে সকামল আশ্রয়ে আবৃত—পূর্বাভে জানা থাকিলে, ভীকৃ পাপুক্ষণও হাসিতে হাসিতে লক্ষ প্রদান করিতে পারে।

যাহা হউক, মৃত্যু আমাদের নিকট ভীতিকর হইলেও মৃত্যুর ভায় বিনিশ্চিত পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। এবং একটি কথা ভাব্যাকি প্রাণপ্রাণকে মৃত্যু-গলিলে বিসর্জন দেন নাই এইরূপ মানবও বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কারণেই অবশ্যজ্ঞানী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্কেই মানবের অস্তিত্বতা সম্পূর্ণ লোপ পায় কিংবা রূপান্তরিত প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর মৃত প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভবপর কিনা জানিবার জ্ঞাত একটা উৎসাহ্যতা বর্তাই আমাদের মনের মধ্যে উদ্ভিত হইয়া থাকে। প্রাক্কালেও, মৃত্যুর পর অস্তিত্বতা সম্বন্ধে মানব-গম্বীর সন্ধিত, কঠোরগম্বীরে নটিকততা উপাধ্যানে আমরা দেখিতে পাই। নটিকততা পিতৃ-মাতার যত্ন-ভবনে গমন করিয়া ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

“ইহা গম্বীরে বিবক্ষিত লোক  
অন্তীতকো নায়মন্তীত চক্রে।”

কোনটা সত্য? কেহ কেহ বলেন এই পৃথিবী হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সমগ্রই লোপ পায় আবার কেহ কেহ বলেন তা’ নয়—মৃত্যুতে পার্থিব দেহের ধ্বংস হয় সত্য, কিন্তু আসল অস্তিত্বের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রস্থান্তরে ধর্মরাজ নটিকততার সন্দেহ নিরসন করিয়াছিলেন। গীতায় অর্জুনের সন্দেহ দূর করিবার জন্তও ভগবান বলিয়াছেন—

“নৈনং হিন্তব্রি শ্রদ্ধাশ্রী নৈনং দহতি পাবকঃ।

নটেনং রেদ্বদ্যাপো ন শোষয়তি মাক্ততঃ।”

নরকর উষ্মক চিত্ত, স্বর্গের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারে রূপকর সাহায্যে বিবৃত হইলেও, সকল ধর্মশাস্ত্রকারগণই স্বীকার করেন মৃত্যুর পরই মানবের অস্তিত্ব লোপ পায় না। অতীত বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা বিজ্ঞানবিদের বাক্যের উপর সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানবিদেরা পত্রীকা দ্বারা স্থির করিয়াছেন—“Matter is indestructible”—কোন পর্যায়েই একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। একেবল অবস্থান্তরিত প্রাপ্ত হয় মাত্র। স্বতরাং প্রাকৃতিক স্রষ্টাই যদি ধ্বংস না হয় তবে আমাদের ধ্বংস কিরূপে হইতে পারে? এক্ষণে, আমাদের অনিশ্চয়তা স্বীকার করিয়া লইলে, মৃত্যুর পর পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া তাহার কিরূপ অবস্থান্তরিত ঘটে এবং তদ্বিষয়ের সত্যাসত্য নিশ্চিত করিবার কোন উপায় আছে কিনা ইহাই বিবেচ্য। বিলাতে বহু ভারতবাসী বসবাস করিতেছে। আমরা দুইটা উপায়ে এই বিলাত কিরূপ এবং ভারতবাসীরা এতদায় কি ভাবে বাস করে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি। ভারতীয়রা বিলাত-প্রবাসী কোন ভারতবাসী বি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তৎকালকাল বিষয় আমাদের নিকট গল্প করে। অপর উপায় আমাদের মধ্যে যদি

কেহ বিলাত বেড়াইয়া আসিয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করে। কিন্তু মহাকবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন—“The undiscovered country from whose bourne no traveller returns.” সেই অজ্ঞাত দেশে যে পথিক একবার গিয়াছে সে আর প্রত্যাবর্তন করে না।

বাসাদী কবির উক্তিও প্রায় এই স্বরে বাধা—

“মরে যদি গিরে আসি মনে যদি রয়।

তবেত’ বলিতে পারি, মরিলে কি হয়।”

কিন্তু কবিদিগের মনে এই সম্বন্ধেহেতু হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাকাল হইতে প্রায় সর্বদেশেই প্রেতলোকবাসীদিগের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ও অনেক আলৌকিক রহস্য সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প প্রচলিত আছে। অবশ্য পূর্বেই এই সব গল্প সম্পূর্ণ অলৌকিক বলিয়া অনেক বিদ্বান কবিতেন। কিন্তু অতীত Sir William Crookes এবং Sir Oliver Lodge প্রমুখ বিজ্ঞানবিদগণ, Review of Reviews পত্রিকার সম্পাদক Mr. Stead, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ণ প্রশ্নন মন্ত্রী Mr. Balfour এবং চিকিৎসক ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Sir A. Conan Doyle প্রভৃতি মনীষিগণ প্রেতাত্মান পূর্বক প্রেতের নিকট হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, প্রেতের আবির্ভাব সম্বন্ধে সন্দেহ সহজেই উদ্ভব হয়। অবশ্য এই প্রেতাত্মান সভায় অনেক জাল ছাড়াচুরী ইহা থাকে—এবং তাহা ধরাও পড়িয়াছে; কিন্তু Sir Oliver Lodge প্রমুখ বিদ্বান ও মনীষিগণের বাক্য অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত।

বিলাত এবং তৎদেশবাসী ভারতবাসীদিগের বিষয় জানিবার দুইটা পথের কথা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। সেইরূপ, প্রথম পথ অতদ্বারা করিয়া Sir Oliver Lodge প্রভৃতি পরলোকে যাত্র উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। Theosophists (খিষ্টপন্থিগণ) দ্বিতীয় পথ অবলম্বন পূর্বক মরণের পরাবস্থা বিষয় ভাবে বর্ণনা করিয়া বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমাদের ইঙ্গিত হুগ ও পুঙ্খ উভয় শক্তি সম্পন্ন। সাধারণ মানব ইঙ্গিতের হুগ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে—কিন্তু স্বপ্ন শক্তির বিষয়

জ্ঞাত না থাকায় তাহা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে না। নিয়মাত্মক অতদ্বারা করিলে মানবজাতি এই স্বপ্ন-শক্তি ব্যবহার করিতে পারে। পূর্বে আমাদের মনীষিগণ এই শক্তি ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। Clairvoyance বা স্বপ্ন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট স্বপ্নরূপভেদে ক্রিয়াকলাপ হুগ অতন্তে জ্ঞায় পরিদৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়।

হিন্দু শাস্ত্রাঙ্গসারে পঞ্চম শরীর আত্মার ব্যক্তিত্ব। এই পঞ্চ শরীরের নাম বস্তুকেনে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চ শরীরের মৃত্যু অর্থাৎ ধ্বংস হইলে আত্মার স্তিক্তি হয় এবং পরমরূপে লীন হয়। Theosophistগণ এই পঞ্চ শরীরের নাম দিয়াছেন Physical body, Astral body, Mental body, Budhic body ও Atmic body। এই Mental body বা মনোময় কোষ দুই তরে বিভক্ত। আত্মা, বুদ্ধি ও মন (উচ্চতর, হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে “অরূপ” বলে) এই তিনটা লইয়া আমাদের কারণ শরীর বা Causal body। সাধারণ মানবের Physical (অন্নময়), Astral (প্রাণময়) ও Mental (মনোময়—নিরন্তর, হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে “রূপ” বলে) এই তিনটির পর পর মৃত্যু অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তি হয়। তৎপরে রূপ কারণ শরীরে কিছুকাল অবস্থান পূর্বক পুনরায় মনোময় (রূপ), প্রাণময় এবং অন্নময় কোষ গ্রহণপূর্বক পৃথিবীতে প্রত্যাপগমন করেন।

২

আমাদের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ আমরা অন্নময় কোষ (Physical body) ত্যাগ করিলে, আমাদের অকস্মাৎ বিশেষ কিছু যে পরিবর্তন সম্ভটিত হয়, তাহা নয়। বস্তুত আত্মা আত্মাশিপক যন্ত্রাজের দরবারে বারিধাও লইয়া যায় না—বর্গদ্বিত ও দেহবাজের সভায় দেবকভাগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্ত আত্মাশিপকে আমন্ত্রণ করে না। মৃত্যুর পূর্বে আমাদের বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি যেমন ছিল মৃত্যুর পরও ঠিক সেইরূপই থাকে। মৃতেরা এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া কোন দূর দূরান্তরে ভিন্নরূপে চলিয়া যায়



না। তাহারা আমাদের নিকটেই থাকে—কেবল জ্ঞানের বৈষম্যভাষ্যে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। আমরা যদি আমাদের জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারি, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানশক্তি আমাদের প্রাণময় কোষে (astral body) অধিষ্করণ (focus) করিতে পারি তাহা হইলে যুগপৎ সহিত জীবিতবিশেষ মতন দেখা শুনা ও কথাবার্তা করিতে পারি। আমরা জ্ঞাত অস্বাভেই আমাদের জ্ঞানশক্তি প্রাণময় কোষে (astral body) অধিষ্করণ (focus) করিতে পারি এবং যোগেশ্বর তাহা করিয়া থাকেন কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে উহা বহু ব্যাসদেশ্য। নিম্নিত অস্বাভে কিন্তু সকল মানবই কমবেশি প্রাণময় কোষ (astral body) ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সেই জন্তই আমরা প্রত্যহ আমাদের মৃত প্রিয়জনের সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকি। কখন কখন নিম্নাভেদে শাস্ত্রের কথা আমাদের মরণ পথে উদিত হয় এবং আমরা অমূলক স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম গল্প করিয়া থাকি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে জাগ্রতাবস্থায় আমাদের নিম্নিতাবস্থার কথা স্বপ্ন করিতে পারি না—সেই জন্ত প্রিয়জনের মৃতদের সহিত সাক্ষাৎলাভ হইলেও জাগ্রত-বস্থায় আমরা তথিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি। ইহা ক্রম সত্য যে মৃতপ্রিয়জনের সহিত যেরূপ, ভক্তি ও ভালবাসার বীধন কিছুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত হয় না এবং আমরা নিম্নিতাবস্থায় অন্নয় কোষ (Physical body) ত্যাগ করিলেই আমরা আমাদের মৃত প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠি এবং সাক্ষাৎলাভ করিয়াও থাকি। সাধারণতঃ আমাদের জ্ঞান স্থলের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় astral plane বা প্রাণময় জগতের বিষয় জাগ্রতাবস্থায় Physical plane বা পার্থিব জগতে স্বপ্ন করিতে পারি না।

সত্তা: মৃত বসন অন্নয় কোষ (Physical body) ত্যাগ করিয়া প্রাণময় কোষে (astral body) অবস্থান করে, তখন সে প্রথমে বিশেষ কিছু পরিবর্তন অস্তিত্ব করিতে পারে না। পার্থিব জগতে যেমন কঠিন (solid), ততল (Liquid) এবং বায়বীয় (Gaseous) পদার্থ আছে, প্রাণময় জগতেও (astral plane) এই

সেইরূপ ত্রিবিধ পদার্থ আছে। এবং প্রাণময় জগতের ও পার্থিব জগতের সমসাম্যার্থের পরস্পরের মধ্যে সৌসাদৃশ্য বর্তমান থাকায় সত্তা: মৃত ব্যক্তির নিকট ঘরবাড়ী আসবাব গজ সমুদ্র স্বর্গজীবিতাবস্থার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সত্তা: মৃত তাহার চতুর্পার্শ্বে তাহার চিরপরিচিত ঘরবাড়ী, আত্মীয়পরিজনকে (অবশ্য তাহাদের প্রাণময় astral body) দেখিতে পায় এবং তাহাদের নিকট হইতে সে যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা প্রথমে হৃদয়শয়ন করিতে পারে না। তৎপরে যখন সে তাহার আত্মীয়পরিজনদের সহিত কথাবার্তা করিতে চেষ্টা করে এবং দেখিতে পায় তাহারা তাহার কথা শুনিতে পাইতেছে না এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও তাহারা তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিতেছে না, তখনই মৃতের মনে পার্থক্যতা জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু সাধারণ অল্প সময় (যখন আত্মীয়গণ নিম্নিত থাকে) স্বল্পমে তাহাদের সহিত কথাবার্তা করিতে থাকে তখন প্রথমে প্রথমে তাহার মনে হয় বোধ হয় সে স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্রমশঃ যখন প্রকৃত অবস্থা হৃদয়শয়ন করিতে পারে তখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সে ভীত হইয়া উঠে। ভীত হইবার কারণ মরণের পরাবস্থা সত্তা: জীবিত অবস্থায় সে যে ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল তাহার সহিত কিছুই সাদৃশ্যতা দেখিতে পায় না। তাহাদের মনে হয়—এই যদি সর্ব সত্য তাহা হইলে পৃথিবী হইতে বিশেষ কিছু পার্থক্যতা নাই—আমরা এই বিদ্যি নরক হয় তাহা হইলে বাহা ধারণা ছিল তদপেক্ষা ইহা বহল পরিমাণে উত্তম স্থান।

৩

এই প্রাণময় জগৎ বা astral plane দ্বন্দ্বাশ্রয়ে নরক নামে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু “সাত নকলে” যেমন “আলম ভেঁটা” সেইরূপ দ্বন্দ্বাশ্রয়কারণ বর্ণনায় আত্মদিক রূপক ব্যবহার করায় আলম সত্য লোপ পাইয়া কতকগুলি মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। সেণ্ট্রাল শেলের দ্বার সেখানে নরকও নামে ব্রহ্মহং কাগ্যার নাই।—ওয়ার্ডার (Warder) বা মমূত সেখানে পাল্লিগিরের মতকৈ তাড়শ প্রচার করে না;—এবং পাল্লিগিরের শাবি বিধান

করিবার জন্ত যম নামধেয় কোন ব্যক্তিবিশেষ বিচারপতি নাই। সত্তা: মৃত ব্যক্তি ক্রমশঃ পূর্ণমৃত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সত্য তত্ত্ব অবগত হয় এবং ভীত হইবার যে কোন কারণ নাই এবং Physical বা পার্থিব জীবনের ভাষে astral বা প্রাণময় জগৎও যে সত্তা ভাবে যাপন করিতে হইবে তাহা নিম্নই বুঝিতে পারে।

নরকও বলিয়া নির্দিষ্ট কারাগার না থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তি বিবিধ ভাবে এই astral বা প্রাণময় জীবন যাপন করে। সাধারণতঃ পৃথিবীর—মানবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী—হত্যাকারী, আত্মঘাতী ও পরযাগহারী প্রভৃতি যাহারা অত্যাধি রিপূর নরী। দ্বিতীয় শ্রেণী—মদ্যপানী, লম্পট প্রভৃতি যাহারা লালসার উত্তেজিত। তৃতীয় শ্রেণী—যাহারা সং ও নয় অন্ম ও নয়; চাহুরী কিম্বা ব্যবসায় অর্থোপাধিকনের দ্বারা লসার প্রতিপালনের চেষ্টা করিয়া, ভাল, দান প্রভৃতি বলিয়া, কিম্বা অসার গল্পগল্পে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করে। চতুর্থ শ্রেণী—বিজ্ঞান চর্চা কিম্বা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিচার অহমলন যাহারা করে। পঞ্চম শ্রেণী—দাতা, যোগেশ্বরী, ভগবন্ত প্রভৃতি যাহারা সৎপ্রবৃত্তির অহরী। এই সকলই শ্রেণীভুক্ত মানব astral বা প্রাণময় জগতে কিরূপভাবে জীবন যাপন করে তাহা বুঝিবার পূর্বে পাঠকগণের একটা বিষয় জানিয়া রাখার প্রয়োজন। মৃত্যুর পর মানবের ইচ্ছা, চিন্তা ও প্রবৃত্তি সমভাষেই বর্তমান থাকে—অধিকন্তু অন্নয় কোষ বা স্থল আবরণ বিনষ্ট হইয়া, বিশেষ প্রাবল্যভাব ধারণ করে এবং astral বা প্রাণময় জগতে প্রত্যেক চিন্তা সূক্ষ্মময়ী হইয়া দেখা দেয়। পার্থিব শরীর বর্তমানেও আমরা চিন্তার দ্বারা সৃষ্টি স্বপ্নন করি, কিন্তু স্থল ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। মৃত্যুতে অন্নয় বা Physical কোষের ধ্বংস হইয়া মৃতেরা প্রাণময় বা astral দৃষ্টশক্তি দ্বারা স্ব স্ব চিন্তা প্রকৃত ছায়া সূক্ষ্মলব্ধ দেখিতে পায়। যে সকল জীব পূর্বোক্তপ্রতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—অত্যাধি রিপূর ব্যবহারী হইয়া পার্থিব জীবনযাপন করিয়াছে—তাহারা astral জগতে প্রথমে সত্য সত্যই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। য য চিন্তাছায়ারী তাহারা ভাঙ্কন-দর্শন

ছায়াময় সূক্ষ্মলব্ধ স্বপ্নন করিতে থাকে এবং তদ্বারা বোঁতে হইয়া তাহারা কখন সেই সকল সূক্ষ্মিক তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে—কখনও ভীতচিত্তে পলাইয়া তাহাদের নিকট হইতে নিম্নিত পাইবার জন্ত উদ্রুণ হয়। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না—সেই সূক্ষ্মলব্ধ তাহারা নিম্নে—রাই প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করিতেছে এবং যতদূর পর্যন্ত তাহাদের সূচিচার ক্ষমতা হয় ততদূর তাহাদের উদ্ধার তাহা। দ্বন্দ্বাশ্রয়ে বর্ণিত নরকযন্ত্রণা মনের মধ্যে প্রকট হইই তাহারা ভোগ করিতে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণ—মদ্যপানী, লম্পট প্রভৃতি প্রথম শ্রেণী ভুক্ত জীবগণের অপেক্ষা যন্ত্রণা কিছু কম ভোগ করিলেও তাহাদের যন্ত্রণাও বর্ণনাতীত। অন্নয় কোষের বা Physical bodyর ধ্বংসপ্রাপ্তি হেতু ক্রিয়াজনিত বিনষ্ট হওয়ার, মৃতেরা বাসায় পরিচরিত করিবার উপায় বিহীন হয়। চিন্তার সাধনোপায় তাহারা মজাভাও, স্বপ্নরীতি প্রভৃতি স্বপ্নন করে—তাহাদের সমুদ্রে সেই সব ভোগ্য ভাসিয়া বেড়ায়—কখন নিকটে কখন দূরে অপরূপ হইয়া মদ্যপানীর জালানময়ী তৃপ্ত শতগুণে বর্ধিত করে এবং অতৃপ্ত তালনা লইয়া লম্পটেরা লালসারিত হইতে দৃঢ় হইতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর astral বা প্রাণময় জগতে বিশেষ কোন স্থান কিছু দৃঢ় ভোগনা করিলেও তাহাদের সময় যেন আর কাটিতে চায় না। সেখানে অর্থোপাধিকনের প্রয়োজনতা নাই—সামান্যও প্রতিপালন করিতে হয় না। কিন্তু astral জগৎবাসীরা এতি জন্ত পয়সাপয়ন করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়—এবং তৃতীয় শ্রেণীর জীবগণ অতিক্রম হইলে স্ব স্ব স্থানে নানাবিধ দৃঢ় পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর জীবগণ বিজ্ঞানবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্থখে astral বা প্রাণময় জগতে বাস করে। পৃথিবীতে পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত অর্থোপাধিকনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া তাহারা বাস্তবিকরূপে জ্ঞানের অহমলন করিতে হয় জন্ত ইচ্ছাকৃত সময়ক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু astral জগতে অর্থের কিম্বা অন্নয়ের প্রয়োজনতা না থাকায়, তাহারা তাহাদের সমস্ত সময় অভিনিমিত্ত জ্ঞান-চর্চায় প্রয়োগ করিতে পারে। অধিকন্তু তাহাদের সমুদ্রে পৃথিবীর সমস্ত লাইব্রেরীর (পুস্তকাগারের) ও গ্রন্থাবলীর



টরীর (হমানাধার) ঘর উল্কাটিত হইয়া যায় এবং তুলনায় স্বচ্ছ জ্ঞানের সহিত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বিজ্ঞানের অনেক গুণ তত্ত্ব তাহার সহজে অবগত হইতে সক্ষম হয়। বহুসঙ্গে কাণ্ড ও কাণ্ডের একত্র প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় বিজ্ঞানের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহার আনন্দ লাভ করে। সঞ্জীভজ্ঞা এখানে তাহাদের স্বচ্ছ-অবশণক্তি সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত গীতবাক্ত মানুষেরা গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত লাভ করে। astral বা প্রাণময় শরীরে Physical বা অন্নময় শরীরের ভ্রায় স্রাস্তি না থাকায় চতুর্দশ শ্রেণীভুক্ত জীবগণ সর্বজন আত্মকটিকের জ্ঞানের অধুনিম্ন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু astral জগতে সর্লোপেক্ষা স্থখে বাস করে পক্ষম শ্রেণীভুক্ত জীবগণ। এই শ্রেণীর অস্বভূত পরোপকারী, দৈবদ্বারাগীণ সন্নিভাশক্তি সাহায্যে সর্লোপেক্ষা হিতকর কিংবা স্ব স্ব প্রিয়জনের কাণ্ডগোল কার্যের উন্নতি সাধন করিয়া পরমানন্দে কাল-যাপন করে। Astral জগৎবাসী সাধুপুণ্ডরগণ ভগবন্ত-পূর্ণকে সাধনার অগম পথ নির্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। সেই জন্ত এই সব জীব ভগবন্তদ্বারা পরম শান্তিতে astral বা প্রাণময় জগতে কালান্তাপিত করে।

Astral বা প্রাণময় জগতে বিভিন্ন প্রকৃতির বসন্তী জীবের বিভিন্ন প্রকারে স্ব স্ব ভোগের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা সহজেই “এই পৃথিবীই স্বর্গ আর এই পৃথিবীই নরক” এই বাক্যের সত্যতা অস্বত্ব করিতে পারি। আমরা পার্থিব জীবন বৈরাগ্য ভাবে যাপন করি astral জগতে আমাদের স্ব স্ব ভোগের তারতম্যতা বৈরাগ্য হয়। পূর্বেদ্বিভিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হত্যাকারী, মধ্যপাণী প্রভৃতি জীবগণ অন্নময় কোষ ত্যাগ-করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ যন্ত্রণাভূত করিতে থাকে সত্য—কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি ক্রমশঃ ক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া অল্প কালের ভ্রাতৃ তাহাদের দেহ হইতে বসিয়া পড়ে। তত্ত্ব পার্থিব জীবনে, যে যে পরিমাণে বাসনার বশীভূত হইয়াছে, astral জীবনে তন্মুখিত যন্ত্রণার তীব্রতা ও স্থায়িত্ব তাহার সেইজন্য পরিমাণে হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি ইহাশ্রোণা ব্যবসায় আর কিছুই হইতে পারে না কারণ astral

জগতে যদি বাসনা বিশেষের ক্ষয় না হইত—পুনরায় জীব যখন পৃথিবীতে প্রত্যাপগমন করিত তখন পূর্ণ জীবনের প্রকৃতি তাহার মধ্যে সমভাবে থাকিয়া যাইত এবং অজ্ঞ নৃতন প্রকৃতির সহযোগে তাহার পার্থিব ও ভগবৎকর্তী astral জীবন ক্রমশঃ ভয়াবহ হইয়া উঠিত। সুকি পাইবার আশা ও তাহার স্বপ্ন পরাহত হইত।

এক্ষণে এই পার্থিব দেহত্যাগ করিলে আমরা আমাদের মৃত পরিজনের সহিত মিলিত হইতে পারিব কিনা এবং যদি মিলিত হই আমরা তাহারিগকে ও তাহার আত্মগিকে চিনিতে পারিব কিনা এই প্রশ্ন বহুই আমাদের মনে উদ্ভিত হইতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের astral body বা প্রাণময় শরীর সম্পূর্ণভাবে Physical বা অন্নময় শরীরের অস্বভূত। সত্যায় মৃত্যুর পর পূর্ণস্বত্বগণকে চিনিতে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট পাহাতে হইবে না। এবং বহু পূর্বে যদি সেই প্রিয়-জনের মৃত্যু না হইয়া থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই আমরা পুনরায় মিলিত হই। Astral জীবনের স্থায়িত্ব পার্থিব জীবনের বাসনা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যাহারা মৃত বেশী প্রকৃতির দাস হইয়া পার্থিব জীবন অস্বিত্যভিত করিয়াছে astral জীবনে সেই প্রকৃতির ক্ষয়ের জন্ত ততদিন তাহারিগকে থাকিতে হইবে। সেইজন্য বহু পূর্বে মৃত প্রিয়জনের মধ্যে কেহ হয় ত’ astral জগৎ ত্যাগ করিয়া mental বা মনোময় জগতে চলিয়া গিয়াছে স্বতরাং মৃত্যুর পরই তাহাদের সহিত সাশাং লাভ সম্ভবপর হইবে না কিন্তু mental জগতে তাহাদের সহিত আমরা যে মিলিত হইব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অনেক সময় আমাদের মৃত প্রিয়জন আমাদের মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইয়া অবস্থান করে—মৃত্যুর সময় আমাদের তুল্য ইন্দ্রিয় শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত ও ভয়াবহ ইন্দ্রিয় শক্তি (astral sight) প্রবলতা লাভ করার ফলে তৎক্ষণে অনেক মৃত্যুর পূর্ণকণে “এমুক আসিয়াছে—এ আমার ভাঙ্কিত” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

যেহ, ভক্তি, ভালবাসার বন্ধন মৃত্যু ছিন্ন করিতে পারে না—সেইজন্য পার্থিব দেহত্যাগ করিলে আমরা পুনরায়

যেহ, ভক্তি, ভালবাসার আকর্ষণে পূর্ণমুখ প্রিয়জনের সহিত একত্রিত হইয়া astral জীবন যাপন করি। বিষয়, ধর্ম, পাণ্ডা কিংবা ব্রাহ্মদিগের সেখানে কোন প্রয়োজনতা না থাকায় যেহ, ভক্তি, ভালবাসা এখানকার মত সেখানে রাগ, ঘেহ বিদ্বেষাদির সম্মিশ্রণে দূষিত হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হত্যাকারী, আত্মঘাতী প্রভৃতি উগ্র বিশ্ব দাসগণ ব্যতীত অজ্ঞাত সকল জীবই সমভাবে পার্থিব জীবনাপেক্ষা বহল পরিমাণে স্থখে astral জীবন যাপন করে। বিশেষতঃ পার্থিব দেহের ভ্রায় astral দেহ বোগাগিরি যন্ত্রণাশ্রাণা না হওয়ায় মৃত্যু জীবগণের মুক্তিপ্রাপ্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একটি কথা পঠকরণের স্বরণ করিয়া রাখা প্রয়োজন। আমরা মৃতের উদ্দেশে যে শোক প্রকাশ করিয়া থাকি তাহা তাহার অস্বভব করিতে পারে—এবং তাহাদের যন্ত্রণা বৃদ্ধির সহায়তা করে। বিশেষতঃ তাহাদের সন্নিভাশ্রাণ আমাদের বাসনা তাহারিগকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত করিতে থাকায় তাহাদের astral জগতের উত্তরে গমনের প্রতিবন্ধকতা সাধন করিতে থাকে। কিন্তু আমরা যদি তাহাদের স্ব-শান্তির জন্ত মনে মনে ইন্দেরের নিকট প্রার্থনা করি—আমাদের ভাবনা মৃদুভূত হইয়া তাহাদের নিকট পৌছায় এবং তাহাদের বাসনাক্ষয় ভনিত যন্ত্রণার তীব্রতা বহু পরিমাণে হ্রাস করিবার সাহায্য করে।

৪

আত্মা, ভোগের, জন্ত যখন কারণ শরীর লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তিনি বহিমুখী; এবং মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই তিনি অন্তর্মুখী হইয়া পুনরায় কারণ শরীরে প্রত্যাপগমনাভিলাষী হন। মরণের মধ্যে যখন চাই আত্ম তরিত্তে দিব্যভাগ সর্লোপেক্ষা দীর্ঘ এবং চাই আত্ম হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে চাই গোঁষ সর্লোপেক্ষা দিব্যভাগের পরিমাণ কম হইয়া যাক—সেইজন্য আমাদের আত্মা পার্থিব জীবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত বহিমুখী হইয়া ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হন এবং আপনাকে বাহ হইতে প্রত্যাগার করিতে থাকেন। সেইজন্য হিমুদ্বন্দ্ব

শায়ে “পক্ষাশোকে বনং ব্রজং” অর্থাৎ বানস্ব অঙ্গলগন পূর্ণক ভগবন্তিত্তা করিবার জন্ত বাসনা আছে। মৃত্যুর পর আত্মা অন্তর্মুখী ভাবাপন্ন থাকায় প্রত্যেক জীবই astral বা প্রাণময় জগতে প্রতিনিয়ত নির হইতে উঠে—স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর তরে উন্মিত হইতে থাকে এবং astral বা প্রাণময় জগতের শেষ প্রান্তে উপনীত হইলে তাহাদের দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয় অর্থাৎ astral body বা প্রাণময় শরীর ত্যাগ করে এবং Mental body বা মনোময় কোষে অবস্থান পূর্ণক মনোময় জগতে বাস করে। এই মনোময় জগৎ দুই স্তরে বিভক্ত—Lower plane বা “রূপ” ও upper plane বা “অরূপ”। এই Lower plane বা রূপ স্তরই বিভিন্ন ধর্মপ্রাণের স্বর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবই astral plane বা প্রাণময় জগতে বাস করিবার পর এই Mental plane বা স্বর্ণে বাস করিবার অবিত্য হয়। এই স্বর্ণের স্ব-শান্তির সহিত astral বা প্রাণময় জগতের স্ব-শান্তির তুলনা করিলে স্বর্গাশ্রমের নিমিত্ত মুন্না প্রাণীর ভিত্তি আলোকের ভ্রায় প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন ধর্মপ্রাণতারগণ এই স্বর্ণের বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কেহই যে প্রকৃত প্রকৃতিত্ব অন্ধন করিতে সক্ষম হন নাই তাহার এককাল কারণ এই স্বর্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই স্বর্ণও astral জগতের ভ্রায় কোন স্থান বিশেষের মধ্যে অবস্থিত নয়। ইহাও আমাদের জ্ঞানের অবস্থানস্বরূপ। astral জগতের ভ্রায় Mental জগৎও আমাদের পরিকট্টেই

সংস্থিত কিন্তু যখন আমরা আমাদের জ্ঞানসময়কে আধিশ্রয়ণ (focus) করিতে গরি—তখনই আনর্য স্বর্ণ জগতে বাস করি। যৌগীণ Physical বা অন্নময় কোষ বর্তমানই এইরূপ করিতে পারেন—কিন্তু সাধারণ মানব মৃত্যুর পর astral জগতে স্ব স্ব বাসনার ক্ষত্রপ্রাণের পর astral বা প্রাণময় দেহত্যাগ করিয়া এই মনোময় কোষে জ্ঞানশক্তি আধিশ্রয়ণ (focus) করিতে সক্ষম হয়।

কল্প ককের মধ্য হইতে যদি কেহ ককের উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব কিংবা পশ্চিম পার্শ্ব পবাকের ভিত্তির দিক। বিহর্ষণ



সম্বর্ধন করে তাহা। হইলে সে যেমন বহির্জগতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকস্থ কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পায় আমরাও সেইরূপ আশ্চর্য্যভিত্তির তারতম্যভার অহুয়ারী বর্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যের এক কিংবা ততোধিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সক্ষম হই।

প্রত্যেক মানব পার্শ্বিক জীবনে সং ও অসং উভয়বিধ চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য কাহারও সং প্রবৃত্তি অপেক্ষা অসং প্রবৃত্তির এবং কাহারও অসং প্রবৃত্তি অপেক্ষা সং প্রবৃত্তির পরিমাণ অবিক—কিন্তু কেহই একেবারে অসং কিংবা একেবারে সং নয়। সুতরাং astral জগতে অসন্তাপ সমূহ বিনষ্ট হওয়ার মনোময় কোষে সন্তাপ সমূহই কেবল রহিয়া যায়। এই মনোময় জগৎ বা বর্ণ-রাষ্ট্রে ঐশ্বরিক মনের পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা ভাব্যরাজ্য বিশেষ। দেব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উন্নত জীবগণ এই জগতে বাস করেন। বর্ণের বৈচিত্র্যে—স্বরূপের মাধুর্য্যে—এই বর্ণজগৎ অতুল সম্পদের আধারস্থান। এই রাষ্ট্রে বাস করিবার কালীন জীব-গণের স্ব স্ব সন্তাপসমূহ তারতম্যতা অহুসারে পুষ্টিলাভ

করিয়া থাকে। Astral জগতের দ্বায় Mental জগতে জীবগণের বাসের স্বাভাবিকতা তাহাদের পার্শ্বিক জীবন-যাপনের গন্ধত্বের উপর নির্ভর করে। যে যেসকল ও যে পরিমাণ সন্তাপবাপন ছিল সে সেইরূপ ও সেই পরিমাণ সন্তাপের পরিপূর্ততা লাভ করা পর্য্যন্ত এই স্বর্ণরাষ্ট্রে বাস করে। স্ব স্ব নীমাহুয়ারী পরিপূর্ততা লাভ করিলে জীব-গণের পুনরায় অর্থাৎ তৃতীয়ার দ্বিতীয় হয় এবং মনোময় কোষ ভাগ্য করে। মনোময় কোষ ভাগ্য করিলে জীবগণ “অরূপ” গুণে অবস্থান করে এবং তাহাদের সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ বীজরূপে স্ব স্ব কারণ শরীরে সংগৃহীত হইতে থাকে। তৎপরে আত্মা পুনরায় বহিঃস্থকী হইয়া কারণ শরীর লইয়া অবতরণ করিতে থাকেন এবং পূর্ব জন্মের কৃত কার্য্যের ফলাহুয়ারী এবং বাসনাশীলের তার-তম্যতাহুসারে মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় জগৎ হইতে রূঢ় কিংবা সূক্ষ্ম পরমাণু আকর্ষণ পূর্ব্বক স্ব স্ব মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও অন্নময় কোষ নির্মাণ করিয়া লইয়া পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

## জয়-যাত্রা

শ্রীমতী বীণাপর্ণি রায়

জন্ম আমার যারগো ভেসে

সেই অসীমের পানে,

লাগল দীর্ঘে পরশ,—আমার

মুসিমে-পড়া প্রাণে।

জীবন-ঝোড়া কাশের মাঝে

তোমারি পায়ের ধ্বনি বাজে

চক্ষুকে পরাগ ওঠে নাকে

বাশির মোহন তানে।

মেলিয়ে ডানা চায় যে যেতে

মুক্ত আকাশ তলে,

বেধায় তোমার রক্তন দিটি

তারার মাঝে জলে,

যাখা আমার ভাসুল-বায়ের

পড়বে যখন তোমার পায়ের

যাত্রা তখন তোমার নায়ে

কণ্ঠ অবসানে।



বেইমান

শ্রীকৈদারলাল রায়

নিমক হারান, বেইমান! বেরো আমার বাড়ী থেকে, বেরো!

প্রভুর এই তিক্ত সাথোপনে কিন্তু ভৃত্যকে এতটুকুও মর্জিত দেখা গেল না। সে মাথা নীচু করিয়া বলিতে লাগিল “আজ হজুর, আমি যদি—”

“আবার যদি। বোটা, ভুইও ‘যদি’, তবে কি ভৃত্য এগেছিল বাড়ীতে! উল্লু, পাঞ্জী—”

“আজ্ঞে—খরচ—”

“খরচ করে ফেলছি। হতভাগা, পাচ মিনিট আগে রেখে গেছি—এক থানা দশ টাকার নোট! পাঞ্জী—”

“আজ্ঞে!”

“আবার!” ভৃত্য চুপ করিয়া গেল। শ্রামাচরণ বাবু ক্রমে বসিয়া বিরক্তভাবে আপন মনে ধূম পান করিতে লাগিলেন। এই সদাকে তিনি পুজের দ্বায় পানন করিয়া আসিয়াছেন। কাজে, অকাজে, এমন কি গালি খাইতেও ঐ সদা ছাড়া কেহই তাহার ছিল না।

তাঁহার মনটা ছিল কিছু বিরক্ত, তাহার উপর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে যে নোটটা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা না পাইয়া এমনই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ

সদারই আবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ‘সদা’র বেইমান বলিয়া একটা কুখ্যাতি আছে, এবং ছু এক টাকা দরকার মত সরাইয়া লইতেও পারিত কিন্তু সেহময় বুদ্ধ প্রভুর নিকট তাহার সকল অপরার্থই মার্জ্জনীয় ছিল—সুতরাং প্রভুর তরফ হইতে যে তাহাকে এসব বিষয়ে একেবারে লাইসেন্স দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল—একথা বলিলে বিশেষ অজ্ঞানি হয় না।

শ্রামাচরণ বাবু ধানিকন্ধ চুপ করিয়া থাকিয়া, সহসা এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মুখ ফিরাইতেই সদাকে টিক। পূর্বারেবারে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন “জ্যা, এখনও যাবি!”

“আজ্ঞে, কোথায় যাব?”

“চলো, বোটা বেইমান কোথাকার?” সদা মধুর পথে বাহির হইয়া গেল। শ্রামাচরণ বাবু ধানিকন্ডা সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন “দেখলে, বেইমান ওকে সাধে বলে! দুখ কলা দিয়ে কাল পান পুষেছিলাম, আজ্ঞা, বা, বা,।” তারপর চাঁৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন “ও চুপী, ও স—আ, শুনিছিস ও চুপী!” ভিতর হইতে কড়া শেকানী উত্তর করিল “চুপী বাজারে গিয়াছে, বাবা! সদাকে ভেঁকে দেব?”



“না—না, পোনা!” শেকালী চোখ মুছিতে মুছিতে আশিয়া বলিল “কি বন্ধ, বাবা?”

“চোখে কি হল?”

“খোঁষা—দুখ জ্বাল মিছলাম।”

শ্রামাচরণ বাবু গভীর হইয়া বলিলেন “হঁ!” বানিক ধামিয়া বলিয়া উঠিলেন “হ্যা, বলছিলাম কি দুখ জ্বাল হয়ে গিয়েছে?”

“হ্যা, নিয়ে আসব?”

শ্রামাচরণ বাবু বাধা দিয়া তাড়াহাড়ি বলিলেন “না, না! থাক। বলছিলাম, সদা চলে গেল?”

“ওমা, সদা আবার কোথায় যাবে? সে ত এখানেই ছিল। ও সখা, সখা!” জাকিতে জাকিতে শেকালী ছুটিয়া চলিয়া গেল। শ্রামাচরণ বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “বেটা গেলে বাঁচি।” পরক্ষণেই শেকালী ফিরিয়া আশিয়া বলিল “সখা নেই, বাবা! অনেক ফুঁজলুম।”

“বেইমান, বেটা বেইমান। আচ্ছা,—যা—সহসা খড়র দিকে চোখ পড়িতেই দেখিলেন এয়ারটা বাঁধিয়া গিয়াছে। তিনি তাড়াহাড়ি চীৎকারের মধ্যে কোন রকমে পা ছুটী টুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। শেকালী পবিত্রের বলিল “দুখ খেয়ে গেলেনা, বাবা?”

“এলে বাবুখন।”

একটুখুপের অস্বস্তি বোধেই বয়সের স্ত্রীধর প্রব্রব হইয়া উঠিয়াছিলেন, সম্বন্ধের গাছপালা শূন্য ঠাণ্ডা মাঠটা ক’ ক’ করিতেছিল। শ্রামাচরণ বাবু কোন রকমে আঁখ পোয়াটাক রাস্তা হাঁটাইয়া রাস্তা হইয়া পড়িলেন, এবং কপালের বেধবিন্দু হাত দিয়া মুছিয়া লইয়া বলিলেন “না, মরণ হলেই বাঁচি। জমীদারের কাজ আবার মাছকে করে।” এমন সময় সখা কোথা হইতে ছুটিয়া আশিয়া বলিল “বাবু,—ও বাবু!”

“কিরে ব্যাটা, এখানেও জ্বালাতে এসেছিস?”

“আজ্ঞে, ছাড়াটা?”

শ্রামাচরণ বাবু কোন কথা না বলিয়া ছাড়াটা লইয়াই হুঁ হুঁ করিয়া চলিতে লাগিলেন। সদা আবার বলিল “আজ্ঞে, চান্দরখান?”

“বা, যা ব্যাটা, চান্দর আমার শ্রাচ্ছে দিস!” সদা কোন কথা না বলিয়া চান্দরটা হাতে করিয়াই পিছন পিছন চলিল।

২

“সদা! পড়ি বা! হোক, এর মধ্যেই গড়িয়েছিস?” শ্রামাচরণ বাবু সন্নিহনে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন। সদা কলিকাহ্নে দিতে দিতে বলিল “আজ্ঞে, বিদিনি নিয়ে গেলেন!”

“আমি আবার কি নিয়ে গেলাম রে?” শেকালী জিজ্ঞাস্য এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সদা বোধ হয় বিদিনিগির হঠাৎ আগমের আশা করে নাই, সে তৎক্ষণাৎ বিধা শূন্য কর্তে বলিয়া উঠিল “শ্রাচ্ছে ছুঁধের বাটা!”

“ও তাই বল!”

“তাই বল কি; ওরই পাশে ত এক টাকা লাগে ন’ আনা ছিল!”

“ঠেক ছিল না ত।” শেকালী পিতার দিকে চাহিয়া বলিল “কিছুই ত ছিল না।”

“তবে উড়ে গিয়েছে। টাকা আর নোটগুলোর আঁক-পাখা বেকসুদ্ধ কিনা।” শ্রামাচরণ বাবু বিরক্ত ভাবে হঠাৎ অমনমনে আলুবোলায় একটা টান বিয়াই বিয়া উঠিলেন “ওরে, ব্যাটা, কল্কে দিসনি বুঝি। না! —”

সদা অপ্রস্তুত ভাবে কল্কেটা রাখিয়া দিল। শেকালী বিলু বিলু করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল “সদা, কল্কে দশটাকার মনিঅর্ডার করে এগেছে, বাবা!”

“হ্যা, বলিস কি? দশ টাকা—”

“দশ টাকাইত’ আমার কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে এল।”

“তবে যে বলি বেটা, নিসিনি?” শ্রামাচরণ বাবু গর্জন করিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে পিছন ফিরিয়া দেখিলেন সখা কোন ক্রমে গড়িয়া পড়িয়াছে। বিস্মিত ভাবে শেকালীর দিকে চাহিয়া বলিলেন “দেখলে।” শেকালী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। শ্রামাচরণ বাবু বানিক ধামিয়া আবার বলিলেন “আচ্ছা, কোথায় পাঠাল?”

“ওর এক মালী আছে, তার নাকি আবার হুঁহাজার টাকা জমান আছে—”

“ছাই আছে, বেটাকে অগ্নি করেই ফাকি দিচ্ছে আর কি! সে থাকলে ওর মা ওকে কোলে করে বেটে বেতে আসতো! ব্যাটা আহাম্ধক, নির্লক্ষ্য পাখা।”

৩

শেকালীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পূজ় কড়া পর পর ছুটী হারাওয়া এবং পত্নীকেও অকালে বিসর্জন দিয়া শ্রামাচরণ বাবুর মোজাজটা কিছু কষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তবে এই শেকালী আর সদার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কোন রকমে সন্সারে টিকিয়া আছেন। এইবার শেকালীর বিবাহে অত্যধিক কণগ্রহ হওয়ায় তাঁহার মোজাজটা আর এক পর্দার চড়িয়া গেল।

সেদিন বৈকালে বারান্দার উপর মাছুর বিছাইয়া শ্রামাচরণ বাবু জমীদার গৃহ হইতে আনীত একখানা বৈদিক খুঁটিয়া বলিলেন। ধুমকেতুর সহিত কল্পিত সম্ভবণাশ্রম স্বধী সমাজ তখন খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কাগজে তাহাই পড়িতেছিলেন কিন্তু মহাশয় তখনকার সচিত্র সম্ভবণাই তাহাকে বেশী ভীত ও অস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কাগজের উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে আশ্রম মনেই বলিয়া উঠিলেন “আঃ বাকা লেগে যদি পুথিবীটা একবারে চুরমার হয়ে যেত তাহা হইলে এই ভাবনা থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।” এমন সময় হঠাৎ দাদাশিব কোথা হইতে আসিয়া ডাক দিল “বাবু, ও বাবু!”

শ্রামাচরণ বাবু চোখ খুঁ খুঁ তেড়াইয়া বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন “বাবু, ও বাবু!” বাবুকে চিবিয়ে ধাবি নাকি? থা, থা, তাই থা।” সদার পক্ষে ইহা নূতন নহে, হতভাগ্য সে কিছু মাত্র না দমিয়া বলিতে লাগিল “বাবু ও গাধার।”

শ্রামাচরণ বাবু স্কেপে কাগজটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন “আবার! ফের যদি ‘বাবু’ বলেছিস, সদা—”

“আজ্ঞে!”

এবার সোজা উঠিয়া চাঁৎকার করিয়া বলিলেন “বেটা, গাধা উল্লু কথোথাকার! একটা গিয়েছে, আর তুই বেটা—বেটো আমার সামনে থেকে। বেইমান,—সব বেইমান, সর্বস্বার্থ করে তুই। সেও চুরী করে গেছে—আমার সর্বস্ব শান্তিটুকু,—তুইও না, যা!”

সদা কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে নির্লক্ষ্য ভাবে চাহিয়া রহিল, তারপর দীরে দীরে বাহির হইয়া গেল। তাহার জীবনে সর্বস্বার্থ বুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত আশ্রম এই নূতন, কিন্তু সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় একদম নিশ্চক্রে, অস্বস্তিতে চলিয়া গেল।

তারপর একটা একটা করিয়া আটটা মাস কাটিয়া গিয়াছে। সদা সেই যে বাটা হইতে বাহির হইয়াছিল আর ফেরে নাই। শ্রামাচরণ বাবু সন্নিহনে অস্বস্ত্য ভাবে খুঁজিয়া সে যে স্থান করিয়া ফেলিলেন,—তাঁহার চুরবস্থা বুঝিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, থাকিবে কেন, যথের পাখী। তাঁহার অন্ত আশ্রয়ের শেকালী—তাহাকেও কি তিনি রাখিতে পারিয়াছিলেন? বেইমান!

এত শোক—সম্বাতের পর বিবাহটা যে কতখানি দুঃখ অপমান তাঁহার জ্ঞাত সজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিমাত্র আভাষ পাইয়াছিলেন তিনি সেই—দিন,—যেদিন নবীন রায়ের নিকট শুনিলেন যে হুগু শুভ বসে দেহ হাজার টাকা এক মাসের মধ্যে না দিলে সে দিক্জিয়ারী করিতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ততার মোহাই দিয়া এমন কতকগুলি গালিও দিয়া গেল যাহা যে কোন ভক্তলোকই শুনিবারা পূর্বে অমান ভাবে বক্তার পায়ের নিকট নিম্নের মাথাটা রাখিয়া দিতে পারে।

একদম অবস্থার বাহা হইবার ঠিক তাহাই হইয়াছিল। এক মাসের মধ্যে আটশান দশ টাকার জ্ঞাত অস্বস্ত্য চেষ্টা করিয়া শেষে তিনি মরিধার মর্ত্ত্য নবীন রায়ের মূখের উপর বলিয়া আসিলেন, “টাকা তিনি দিতে পারিবেন না, তাহাতে সর্বস্ব যায় বাড়ুক, বড়ি গুয়াবের বাহির হয়—হোক।” মোট কথা টাকার জ্ঞাত ভাবিবার বা চেষ্টা করিবার সম্ভাভা আর তাঁহার ছিল না।

কিবাশয় শেষ হইবার ঠিক পূর্বে মিনের কথা।

শ্রামাচরণ বাবু তখন আপন মনে কাশি অথবা কাণাবাসের



কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। গতবৎসর ঠিক এই দিনেই শেকলীর বিবাহ হয়ছিল, ঠিক এই দিনেই এই নবীন রাইই একটা সম্বেশ মুখে পুথিয়া বলিয়াছিল, "টাকা সে বন্ধুভাবেই দিল। তিনি একটু সামলাইয়া শোধ করিলেই হইবে," কিন্তু সামাত্র একটা মনোমালিন্যের জন্ম যে এমন শত্রুতাও সে করিবে তাহা তিনি স্বপ্নও ভাবিতে পারেন নাই। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ভগবান, আর কর্তনিন!" সহসা ক্ষুভার শব্দ তাহার মনক ভাষিয়া গেল, তিনি মুগ্ধ ভুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—স্বয়ং সদাশিব। তাহার চেহারা কিছু রূপ হইয়া গিয়াছে কিন্তু টৌরী, সাজগোজের এবং জুতার বাহারে প্রভুকে অনেক দূর ছাড়িয়াই গিয়াছে। তাহার মনটা মুহূর্তের জন্ম একটু ব্যালুপ হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই মুকটা একটা বিরাত বিবর্তিত করিয়া উঠিল, তিনি তিক্ত স্বরে বলিলেন "আবার এসেছিস্, সদা?"

"আজে!" জুতো ছোঁড়াটা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে একমুখ হাসিয়া সদা বলিল "আজে, হ্যা, অনেক দিনের পর। মাসী বুড়ী কি আর মর্শ্বে চায়!" তাহার পর তাহার পায়ের নিকট তাহারই কপের হলিল রাখিয়া

বলিল "আজে, আপনার সব খবর রাখতাম।" স্তাম্যচরণ বাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেন ছিলেন না, বিশ্বস্ত হৃদভক্তের জায় একবার দলিলের দিকে, আর একবার সদার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সদা তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল "আজে, মাসী বুড়ী কি বহুমান্য ভাত মাকে দিচ্ছে জানেন। সন্ধ্যার সময় কি সে অভ্যাশ গেল, বদমায়েদী করে মর্শ্বে দেয়ী কর্তে লাগল, না মর্শ্বেও টাকা পাইনে। কি করি হুজু! তার কপের বাখাটা বাড়লেই কিনা একটা গুণ্ড খেতে চেষ্টা সেদিন হয়েছে কি, তেমনি বুকের বাখা, বলে "গুণ্ড দাও, গুণ্ড দাও! হুঁ ছুঁ আমি—"

স্তাম্যচরণ বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন "আর তুই বড়ি টাকার জন্মে নিলে!" সদা একপাল হাসিয়া বলিল "আজ!" স্তাম্যচরণ বাবু গম্ভীরা উঠিলেন "হ্যা! শহভান কোথাকার! বেরো, বেরো আমার বাড়ী থেকে। বেইমান!"

বেইমান সদা সবিস্ময়ে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিল,— "আজে!"

## ব্যথার দান

শ্রীকৈদারলাল রায়

স্বপ্ন মোর টুটে গেছে, টুটে গেছে ওরে  
রজনীর প্রাণদেশে জীবনের ভোরে।  
মরিয়া বা' ছিল প্রাণ জেগেছে আবার,  
আঁখারের খুম মোরে আচ্ছাদিত তার।  
আলস্ত মিথ্যা গেছে, সত্য জগতের  
বেদনার স্বপ্নভ্রাতা এসেছে নূতন;  
স্বপনের মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা মোহ মোর,

বিশ্বাসের রাত্রি আজ হয়ে গেছে ভোর।  
নয়নের অশ্রুজলে শিশিরের মত  
প্রতিভাত সত্য মোর দেবতা রহিত।  
যে বেদনা দেবতার সিংহাসনখানি  
জ্বলয়ের শূন্য কক্ষে আনিরাছে টানি,  
আপনার স্বপ্ন জানে করিয়াছে ভোর  
সে বেদনা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক মোর।



## পীরসাহেব

প্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, বি-এস-সি

পূর্ণিমা রাত্রি। প্রাচীর বেষ্টিত একটা পুরাতন মসজিদ। মসজিদ সমুখস্থ স্ববৃহৎ চাতালের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি উচ্চ আসনের উপর বসিয়া একটি বৃদ্ধ ফকির মালা জপ করিতেছেন। তাঁর নেত্র ত্রিমিত, ওষ্ঠ কক্কৃ স্পন্দিত। জ্যোৎস্নারাগী—তার সমস্ত রূপ স্ফার লইয়া বৃষ্টি এই মসজিদে ভক্ত ফকিরের নিকট আদার নাম বনিতো নাথিয়া আসিয়াছেন। মুহূর্ত বাতাস মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পবৃক্ষকে দোলাইয়া সৌগন্ধ মাথিয়া জ্যোৎস্নার চক্ষের উপর থিয়া নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে, কখনও বৃদ্ধ ফকিরের তল স্ফুটরাঙ্কি দোলাইয়া আনন্দ অত্বভ করিতেছে। প্রকৃতি মনমুগ্ধ, মসজিদ শুদ্ধ, ভক্ত খান মগ্ন।

মালাজপ শেষ হইল, ফকির চক্ষু উন্মুক্ত করিলেন, দেখিলেন মসজিদ ঘায়ে দণ্ডায়মান এক যুবক। মালা গলদেশে ধারণ করিয়া হার সন্নিহিত অঙ্গরস হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি প্রয়োজন বাবা ভিতরে এস।" যুবক উত্তর করিলেন—"আমি হিন্দু।"

ফকির মুহূর্ত হাসিয়া বলিল—"সেত তোমায় দেখেই বৃহতে পারছি বাবা, তুমি হিন্দু। মসজিদ মন্দির যে সকলকার সম্পত্তি—এতে যে সকলকারই স্থান দাবী। সন্ধ্যার দাবানলে দগ্ধ মানবজীবের এ যে চরম শাস্তির স্থান বাবা। আল্লাহ কাছে যে সব এক। তবে তোমার দিক কিহু....."

যুবক লজ্জিত হইল, বলিল—"না না—আমার কোন....."

ফকির যুবকের হাত ধরিয়া সেই উচ্চ আসনের উপর লইয়া গেলেন, যুবককে বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিলেন।

"পীরসাহেব বড় ব্যথা পেয়ে আজ আপনার কাছে

এসেছি। আপনি প্রাচীন, মুসলমান সমাজের নেতা, দৈব প্রেরিত, আশা করি হরিচার পাৰ।"

"বল হিন্দু তোমার বাখা কোথা, আরাম করবার চেষ্টা করব তবে আল্লাহ মর্শ্বে।"

"পুরাতন চকে যে মসজিদ আছে, তারই উত্তরে আমাদের দ্বিতল বাড়ী, এক প্রাচীরে বসেও জ্যোতিষ্ক হয় না। সেই বাড়ীতে আজ আমরা প্রায় তিন পুরুষ বাস করছি। আমাদের বাড়ীর চতুর্দিকে কোন হিন্দুর বাস নেই। প্রতিবাদী সবই মুসলমান। আমাদের পরম্পরের ভিতর কোন বিদ্বেষ যুগ ধাক্কা দ্বয়ের কথা সহ্যহুত্বিই বিরাজ করিত। আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বলে কোন প্রভেদ ছিল না। আমরা এক-সঙ্গে খেলতাম, একসঙ্গে পড়তাম, একসঙ্গে হুজি করতাম। বাইরের লোক জানত না কে হিন্দু কে মুসলমান। বত পূর্ণিমা রজনী ঐ মসজিদের চাতালের উপর শেকালি গাছের তলায় পরম্পরের হাতে মাখা দিয়ে বিনিময়ভাবে অভিষিক্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবে শেকালি ফুল পড়ে আমাদের এ মিলন গাঢ় করে তুলত। আমরা বেন এক মাঘের ছুটি ছেলে—যেন আমাদের এক উদ্ভক্ত, এক গতি, এক কথা। সে কি হুখের দিন গিয়েছে পীরসাহেব, সে প্রীতির বান্দন মিলনের স্বর আজ হিড়ে গেছে—তার পরিবর্তে বিদ্বেষ বহি তার সংলগ্ন শিখা নিয়ে জলে উঠেছে আমাদের উৎসাহ বাতাস পেয়ে। আমরা সে সব কৈশোর বন্ধুদের মধ্যে আজ অনেকেরই অকালে কররের মধ্যে বিদ্যানে পেড়েছে, আর যারা জীবিত তারাও আজ বিদেশে অস্বস্তি তাড়নায়। তারা থাকলেও আজ হয় ত একটা মীমাংসা হতে পারত। যাক্ আসল কথা আমাদের এখনও বলা হয় নাই, আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না। আজ



প্রায় ১৫ দিন হ'ল একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে শম্ভুস্বামী হই তখনই মসজিদের মোজা সাহেব আজান দিচ্ছিলেন। আজান শেষে আমরা ডেকে বসলাম। বেতুন রমেশবাবু বাড়ীতে মেয়েদের নিষেধ করে দেবেন তাঁরা যেন আমাদের ধর্মে বাধা না দেন।' আমি বললাম 'মিলে আপনাদের ধর্মে বাধা দিলেন?' তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন 'আজান দিবার সময় তাঁরা শ'খ বাজান, ওর বিকট শব্দ আমাদের মন চঞ্চল করে দেয়। আজান নাম নিতে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। আজানের পর বাজাতে বন্ধবৈশ্য যেন থাকে যেন?' আমি শুভিত হলাম। মোজা সাহেব মসজিদে প্রবেশ করলেন। আপনিন জানেন বাধা হয় কত যুগ যুগান্তর ধরে হিন্দুর সন্ধ্যাবেলায় আমাদের কাছে আসছে—কাজীরাই পরিচয় বর্ণন করে, খুশ দুনার গছ দিয়ে, প্রাণীপ জ্বলে, শম্ভুস্বামী করে। বাড়ী গিয়ে মেয়েদের বললাম। তোমরা আর শ'খ বাজিও না, যদি বাজাও মসজিদে আজান দেবার পর বাজিও, তাঁদের আরাধনায় ব্যাঘাত হয়।' মেয়েরা বল 'এতে যে আমাদেরও ধর্মে হাত দেওয়া হয়।' আমি এর যথোচিত উত্তর দিতে পারি নি পীরসাহেব।

বাক্য তার পর মেয়েরা অতি সন্তর্পণে শ'খ বাজাত আজান দেবার পর, তার শব্দ বাড়ী ভেদ করে আসবার সাহস রাখত না। আশ সন্ধ্যায় আমাদেরই এক তরফে সন্ধান হয়, বাড়ীর মেয়েরা আনন্দের আতিশয্যে মুহুঁহু শম্ভুস্বামী করে, তখন মোজা সাহেব আজান দিচ্ছিলেন। তিনি মনে করলেন আমরা ইচ্ছা করে তাঁর কাণ্ডার অমাত্র করেছি। তিনি কোথেকে অন্ধ হয়ে আরও কয়েকটি মুসলমানকে ডেকে আমাদের বিচার করতে বলেন— 'আমার ভাক হ'ল। তিনি তাঁর ঘরে বসেন। 'পোড়া মুসলমানদের ধর্মে হাত পড়লে, তারা ক্ষিপ্ত হয়, তাদের হিতাহিত জান থাকে না, এর প্রতিফল পাবে।' দেখতে দেখতে তাঁর জমে উঠল, কেউ বলে 'মার শালা কাকেরকণ্ঠ কেউ বলে 'ধাও শালায় ভাত খেয়ে।' আমি চিকিৎকার করে বারান—'বোলা গায়েব।' আপনিন বিচক্ষণ, ধর্মতীক সাধু, আপনিন বিচার করুন, বিচার

করে যা শান্তি দেবেন, আমি তা মাথা পেতে ল'ব। তিনি বলেন 'আজা কালা সকালে সমস্ত মুসলমান ভাইদের কাছে তোমার বিচার হবে, তবে সে বিচারে বোধ হয় তোমাদের এখান থেকে উঠে যেতে হবে, মসজিদের পাশে কাকেরকণ্ঠ স্থান হবে না।' আমি বাড়ী না ফিরে আপনাদের নিকট এসেছি। আপনাদের পায়ে ধরি, এ বিচারে আপনাদের উপস্থিতি হতে হবে। আপনিন হিন্দু মুসলমানের অতীত পুঙ্খ আপনাদের কাছে হুবিচার হবে। যদি না যান বানুন আজই আত্মীয় স্বজনদের হাত ধরে এই নিশ্চয় রাতে তিন পুরুষের বাড়ী ছেড়ে চলে যাই। আজকালকার পারিপার্শ্বিক ঘটনা দেখে বড় ভয় করে পীরসাহেব—হিন্দু আমার সময় প্রয়াসী নয় শান্তি আভিষাণী।

পীরসাহেব সমাধিহ। তাঁহার মন বিশ্বের বাহিরে কাহাকে অবধাণ করিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত অবধাণ ছিন্ন করিয়া। তিনি যেন কিছুই ভাবেন নাই, এমনি তাঁহার অবস্থা। যুবক ধামিলে পর পীরসাহেব চাঁচকার কঠোর উগ্রলেন—'দীন দুনিয়ার মালিক একি তনালে। হিন্দু তুমি আমার ধর্মে ব্যাঘাত দিলে, এর বিচার আজই করতে হবে, তা নইলে আজ্ঞার নাম নিতে পারব না, কোরাণ পাঠ করবার মুরসৎ মিলবে না। চল পুরাতন চকের মসজিদে।'

২  
ব্রাহ্মি ধর্ম খটকা।

পুরাতন চকের মসজিদ ও তার সমুখস্থ প্রাণ প্রাণ জনপূর্ণ। কতিপয় হিন্দু ব্যাতীত সকলেই মুসলমান। পীরসাহেব এক উচ্চ স্বাদের উপর দলদলেন, তাঁর পাজামা ও আলখোলা বসন্ত হিলোলে চলিতেছে। চন্দ্র-বিশ্রম তাঁর জ্যোতীর্ঘ্য মৃতিধানিকে স্বর্গীয় ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। যাহার মর্শন ও স্পর্শনের আশার কত হিন্দু মুসলমান নরনারী ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়া আসে তিনিই আজ সাধারণের মধ্যে। প্রাণকণ্ড জনবর পুত্র।

ক্রমে তাঁহার স্বর শ্রবণ পথে আসিল—'এ দুনিয়ার

মালিক এক। মুসলমানের আত্মা, হিন্দুর কৃষ্ণ, ইংরাজের বীজ, এ তিনে জুলাই এক, একেরই তিন মৃষ্টি। তিন মনে তিনি ইচ্ছা করলে অসংখ্য মৃষ্টি এগণ করতে পারেন। বিভিন্ন ধর্ম হচ্ছে বিভিন্ন পথ, যখন যে সম্ভ্রমারে বিশৃঙ্খল ঘটে তখন তিনি সেই সম্ভ্রমারের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন সমযোপযোগী ধর্মপ্রচার করতে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট জীবকে মস্তির পথ দেখাতে। একথা নতুন নয়। মুসলমানের কোরাণে হিন্দুর পীতাত ইংরাজের বাইবেলে, একথা স্বর্ণাকরে লেখা আছে। সামান্ত দুলি কথা হ'লে বৃহদাকার পুরুষ আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-তারার মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব বর্ণনাম। তিনি ছাড়া কিছু নাই, কিছু ছাড়া তিনি নন, এক কথায় বলতে গেলে তিনিই সব বসাই তিনি। মুসলমানের সাধনা সিদ্ধ হবে না ততদিন, যতদিন সে হিন্দুকে কি অপর কাউকে পীড়ন করছে। একথা সকল সম্ভ্রমারের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত্য কারণ সর্বকৃতে পরমাধ্যায় আজ্ঞার অংশ বিরাজমান। ভাইকে হত্যা করে মাকে পুত্রা করিলেও যেমন মা সন্তুষ্ট হইবে না, বৃদ্ধের শাখা কর্তন করে তার কাণ্ডে জল সেচন করলে যেমন তার জীতি উৎপাদন করা যায় না তেমনি হিন্দুকে পীড়ন করবেও মুসলমান কখনও আজ্ঞার কৃপা লাভ করতে পারবে না। একথা কোরাণে লেখার মত সত্য! আজ্ঞার নামের মত পরিজ্ঞ! মহ-স্বরের মত পণ্ডি!!! সকলে দেখিল পীরসাহেবের চন্দ্রাঘ হইতে প্রোক্ষণ গড়াইয়া গড়িতেছে। বাহুজান শূন্য হইয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—'আজ্ঞাকালকার কয়েকটি ঘটনা আমরা বড় ব্যথা দিচ্ছে, হিন্দুর শোভাযাত্রার বাজনা মসজিদের পথ দিয়ে বেজে গেলে মধ্যে মধ্যে মুসলমান

ভায়েরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ওপরে তোমারা বলতে পার, কেন তোমাদের মধ্যে, এ সময় ভাব ভেগে উঠে তোমাদের প্রতিবাদী হিন্দু ভাইয়ের উপর? আজকের এ ঘটনার বিপক্ষে তোমারা কি বলতে ইচ্ছা কর বল? বল স্পষ্ট করে বল? চূপ করে থেকো না। আমি তোমাদের কাছে এর কৈফিয়ৎ চাই, নিরপেক্ষ বিচার চাই। মনে থাকে যেন যে আজা তোমাদের বাক্যে সেই আজাই হিন্দুর বক্ষ্যবাক্যে বাস্তবিকমান। হয় ত তোমারা বলবে আমরা মসজিদ চাই তার চতুর্দিক কলরব শব্দ, কারণ এতে তোমাদের প্রার্থনায় বিশ্ব হতে পারে এই ত? সংসারের মধ্যে তোমারা ত্যক্ত পাবেন না ভাই, তা যদি পেতে চাও তবে নিজে যাও তোমাদের মসজিদকে তুলে কোকালের বাইরে, যেখানে মানব সমাগম নেই—গর্জননো। আর একটা কথা তোমাদের বলিতে চাই, তোমারা কর্তে অবশেষে পথে অশ্রুপিত প্রবেশ করিয়ে কেন আজান নাও জান? তার এক কারণ হচ্ছে অবশেষে পথ বন্ধ করে চিত্ত স্থির করে তাঁকে একমনে ডাকতে হবে। যেদিন বাইরের শব্দ আর কাণে প্রবেশ করবার পথ পাবেন না, সেইদিনই তোমাদের ভাক তাঁর কাছে পৌছাবে, তার পূর্বে নয়। বাহিরীজের দ্বারে যেদিন অর্গল পড়বে অন্তরীক্সের দ্বার সেদিন উন্মুক্ত হবে। বল হিন্দু আমরা ভাই, হিন্দু আমরা অর্ধেক ....।'

পীর সাহেব অনশ্রুত হইয়া ছিন্ন তরুর ভ্রায় ভুতলে পতিত হইলেন।

জনতা মধ্য হইতে গগন ভেদী রব উখিত হইল "হিন্দু আমরা ভাই, হিন্দু আমরা অর্ধেক।"

## নারী

### প্রীণাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

জীবনের স্বাধীনতা এক সর্বমুখের মুহুর্তে উৎসব ভবন ছেড়ে বেরিয়ে এলুম এই পথে—নারী-প্রাণ যেখানে বিলাসের প্রবাহে নিত্য জলে' যাচ্ছে নারী-স্বয়ংয়ের শ্রেষ্ঠ

সামগ্রী যেখানে অর্থের দ্বারে সর্বকিঞ্চি তিখারী সেজে দাঁড়িয়ে আছে।...

... করে, কেমন করে এ পথে এসে দাঁড়ানাম, সে



কথা ভাবব না, মাথার সমস্ত আবৃত্তীগুলো তা'তে কেপে যায়। ... এসেচি, এ পথে এসেচি, এই আমার এ জগতের গুচ সত্য, সব চেয়ে বড় ভূখণ্ড। ... এর পাশে এই প্লেয়ার পথটাকে কত মধুর, কত বিভিন্ন উৎসবে ভরা ভেবেছিলাম। সে বগ্ন-হবি আচ্ছ মুছে গেছে; পুষ্পবীথি হ'তে বার হেঁটে যেন অশ্রুধারা মকশ্রান্ত এসে ঝড়িয়েছে। সারা জীবনের চোখের জলেও ত এ তপ্ত বালু-পথ সিক্ত হ'বে না। ... থাক সে সব।—

পরাগ রায় পেনিন যখন তার ব্যথিত চোখ ছুঁচী মুখের পর রেখে জিজ্ঞাস করলে, কত লোকই ত তোমাদের বিলাসের হেউলে নিত্য পূজা দিতে আসে ... ফিরে যায়, তাদের কারো পায়ে একটু ছাপ কি পড়ে না কথা সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে? ... তখন তাঁর এই একান্ত সহায়-ভূতির কথায় শুভ্র চেয়ে বেয়ে জল পড়ছিল, উত্তর দিতে পারিনি কিছু। ...

... চোখের পাতায় সারা রাত ঘুম এসে না। অস্ত্র ঘরগুলোয় তখন উঠছিল বীতংগ লীলার হাসিরস্বর—সব ভিত্তি হ'য়ে উঠল। ... অস্ত্রের নারী হাফাঙ্কার করে উঠল, ওয়ে অচাগি, হাবুজি বলি দিয়ে তুই করেচি কি! বিদ্রোহের তড়িৎশক্তিতে তুলে একি বজ্র-জালা বরণ করে নিয়েচি। তুই যে নারী—নারী—

দল থেকে জমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তাদের—স্বরে স্বর বিলাতে পারি না—তাদের সঙ্গে এক তালে পা কেলে চলতে পারি না—গল্পনা বাড়তেই লাগল।—

একদিন বর্ষা মাথায় করে—পরাগ আবার এল। ঘরে লোক আসা বন্ধ করে দিয়েছিলুম, পরাগকে ঢুকতে দেখে সবাই কাপাকাপি করলো এ আমার ছাদিনের খেলায় তা' তা'রা বহু পুঙ্খানুপুঙ্খ করেছিল। ...

পরাগ বললে, কাল আমার ছেলের ভাত, তোমায় নিমন্ত্রণ কর্তে এলাম।

অভিমনে অমীর হ'য়ে বললাম, অপমান করতে নয় ত? না, তুমি আমার ছেলের মা, তাঁর মায়ের ভাত। আমার মদ্র মূখে এখন ভাত তুলে দিতে হ'বে তোমাকেই। ... জীবনটাকে একটা নিমিত্ত মাত্র নয় বন্ধ,

এ যে অনন্ত। নিমিষের তুলের এত বড় শাস্তি কখনও হয়?

বাইরে বৃষ্টি অথচ অশ্রিভ্রান্ত ধারা-পাত, যেন আমার অন্তর ব্যথার অশ্রু-সঙ্গল প্রকাশ। ...

ভেবে উঠতে পারলুম না এ বর না শাস্তি? ... কৃষ্ণ দুয়ার কি সত্যিই আবার খুলে। ...

আজ যাবো। কাল আবার আসব—তোমার ইচ্ছে হ'লে সঙ্গে নিয়ে যাব।—বলে পরাগ উঠে গেল।

বড় ইচ্ছা হ'ল—অনেকদিনের পর আর একবার বৃষ্ণ হামিদীষ্ট একঝনি মঙ্গলগুহ দেখতে—দীর্ঘ নির্দীপনের পর। ...

কালো বউটী—কালো তাঁর কালো ছোট্ট ছেলে। সেই কালো মুখের মিষ্ট হাসিতে আমার আঁধার মন আলো পড়ে উঠল।

কমলা গলায় আঁচল ভড়িয়ে প্রণাম করলে—চোখের জল দিয়ে আমি তার মঙ্গলকামনা করলুম। তা'কে অস্ত্র কিছু দিয়ে—আশীর্বাদ করার অধিকারী হয় ত আমি নই।

মুগালের মুখে ভাত তুলে দিলুম—আর দিলুম আমার বৃষ্ণ নারী হিয়ার সজ্জিত ব্রেহ। আমি তাঁর মধ্যে আমার পাশে বসিত আরও একটা শিশুকে দেখতে পেলাম। ছুঁচী মায়ের ব্রেহ-কামনা নিয়ে সে তিরজীবী হ'ক, অদর হ'ক—এর চেয়ে বড় কামনা বুঁজে পেলাম। ...

ছেলের মুখে ভাত তুলে দেবার অপার আনন্দ পেনিন অহভব করেছি, সত্যিকারের নারীকে বুঁজে পেয়েছি আমি আপনার মধ্যে। আমার উচ্চ বুক তা'তেই ফলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বুকেছি না হওয়ার বেয়ে বড় কামনা মেয়ে মানুষের আর নেই।

জীবনের অতি প্রভাব থেকে এই কামনা দেহের সঙ্গে মিশে যায়, শত অবস্থা বিপদাঘের মধ্যে তার ক্ষয় হয় না, আঘাতে এ কামনা টলে না, স্তম্ভ-বহুস্তর মতই এই 'মা-হওয়ার কামনা' অপার রহস্তে ঢাকা!



নবমুখ

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চালন

## সত্যের পরীক্ষা

প্রথম মামলা

বোম্বায়ে থাকিবার সময় আমি একদিকে যেমন ভারতীয় আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম অপর দিকে তেমনি গান্ধি সহচর অহিংস নৈতিক করিতে লাগিলাম। এ বিষয়ে বীরচন্দ্র গান্ধী নামক জনৈক বৃদ্ধ আমার সহিত সংযোগিত করিতেছিলেন; আর আমার দালা আমার জ্ঞাত 'বীক' বোগোড় করিবার জন্ত প্রাণপণ করিতেছিলেন।

ভারতীয় আইন অধ্যয়ন ব্যাপারটা একান্তই নীরস ছিল। দেওয়ানী কার্যাবিধি আইন আমি কিছুতেই পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না, তবে সাক্ষ্য বিবয়ক আইন অবস্ত ততটা নীরস বোধ হইত না। বীরচন্দ্র গান্ধী সলিসিটার হইবার জন্ত পড়িতেছিলেন এবং উকীল ব্যারিষ্টারদের সখ্যে অনেক গল্প আমায় বলিতেন। তিনি বলিতেন "দার ফিরোজ সার পাসারের প্রধান কারণ হাজু তাঁর প্রভাও আইন জান—সাক্ষ্য বিবয়ক আইন তো তার কঠোর আছেই, এমন কি ৩২ সেক্সনের উপর যত মামলা লিপিবদ্ধ আছে তা সবই তাঁর মূখ্য। বরকন্দীনে তারেবদীর অজুত তর্ক করিবার শক্তি দেখিয়া বিচারকেরাই ভড়কিয়া যান।"

হোমরাও চোমরাওদের সখ্যে এই সব কথা শুনিয়া আমার মনে ভাব হইত।

তিনি আরও বলিতেন যে প্রায় সকল ব্যারিষ্টারকেই প্রথম ৭৭ বছর রোজগা ভেঙ্গে বেড়াতে হয়, সেই জন্মই তিনি সলিসিটার হবার চেষ্টা করছেন। বছর তিনেকের

মধ্যেও যদি তিনি নিজের খরচ চালাবার মত কাজ পাও তা'হলে জানবে যে তুমি মহা ভাগ্যবান।"

প্রতি মাসেই খরচ বাড়িয়া যাইতেছিল—বাইরে ব্যারিষ্টারের ভড়ৎ বজায় রাখিয়া ভিতরে ব্যারিষ্টার হইতে শিবিবার এই ছোট্টা আমার মনের সঙ্গে মোটেই বাপ খাইতেছিল না। এই জন্মই আমি পড়াশুনার পূর্ব মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলাম না। সাক্ষ্য বিবয়ক আইন গ্রন্থ পাঠে আমার বেশ ঐশ্বর্য্য জন্মিয়ছিল এবং মনের হিন্দু আইনও খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে ছিলাম কিন্তু কোন একটা মামলা চালাইবার মত ভরসা তখনও জন্মে নাই। পিলাসয় হইতে বস্ত্রালয়ে সঙ্গাসতা বৃষ্ণরাজ্য আমি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতাম আমার নৈরাজ্যের আর সীমা ছিল না।

এই সময়ে মামী-বাইদের একটা মোকদ্দমা আমি পাইলাম, এটা ছোট্ট আদালতের মামলা। শুনিলাম মামলার দালালকে আবার কিছু বক্ষিগা দিতে হইবে—আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অশীকৃত হইলাম।

পরে শুনিলাম যে সব বড় বড় ব্যবহারাজীবী মাসে ৫০ হাজার টাকা রোজগার করেন, উঁহারাও দালালদের কমিশন দিয়া থাকেন—আমি ভাবিলাম উঁহাদের অহু-করণে আমার কাজ নাই। আমি মাসে ৩০০ টাকা পাইলেই চের—বাণাও তো তিন শতের অধিক উপার্জন করিতেন না।



দাখা বলিলেন যে সে সব দিন আর নাই—বোখাইয়ে থাকার খরচ খুব বেশী রকম বেড়ে গেছে, তেমনকে এখন পুরানবস্ত্র ব্যবসাদার হতে হবে। কিন্তু আমি কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না, তবুও 'কেস' আমি পাইলাম। যেসটা খুবই সোজা ছিল এবং এক দিনের বেশী লাগিবে না বলিয়া বোঝা হইল। এই মামলার জ্ঞান আমি ৩০ টাকা কাঁ চাহিলাম।

এইরূপে আমার জীবন নাটকের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হইল ছোট আদারিতে। আমি প্রতিবাদীর তরফে ছিলাম, হুতরাং বারী সাক্ষীগণকে আমার জেরা করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরাধাড়াইতেই আমার হাত পা বেন পেটের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে লাগিল মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল যে সমস্ত আশাভরতাটাই বেন ঘুরিতেছে। জ্ঞান সাহেব মনে মনে হয় তো হাসিয়াছিলেন এবং অজ্ঞাত উকীলেরা আমার এই অবস্থায় খুব কৌতুক উপভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু আমার তখন সে সব বিবেকে দৃষ্টি হিবার মত অবস্থা ছিল না। আমি বসিয়া পড়িলাম ও সেই মামলার তথ্যিকারীকে পাটেল সাহেবকে নিযুক্ত করিতে বলিলাম এবং পুঠীত কি কেবল দিলাম। পাটেল সাহেব ৫১ টাকা কাঁ লইলেন—এ রকম মামলা তাঁহার কাছে এক রকম ছেলে খেলা বলিলেই চলে।

আমি কোর্ট হইতে তাড়াতাড়ি বাতী ফিরিলাম। আমার সন্তান মামলায় জিতিল কি হারিল সে সম্বন্ধে কোন খবরও লইলাম না। মনে মনে আমার ভয়ানক লজ্জা হইতেছিল এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে মামলা চালাইবার মত সাহস অর্জন না করা পর্যন্ত আমি আর কোন মামলা গ্রহণ করিব না। সত্য সত্যই ইহার পর দক্ষিণ আফ্রিকা না বাওয়া পর্যন্ত আমি আর কোর্টে যাই নাই। অবশ্য এরূপ করার মধ্যে আমার কোন মনোযোগ ছিল না, কারণ আমি দ্বায়ে পড়িয়াই এতদূর করিয়াছিলাম। এ ঘটনার পর এমন কে বোকা আছে যে নিশ্চিত হারিবার জ্ঞান আমার হাতে মামলার ভার নিয়ে।

বোখাইয়ে এর পর আর একটা কাজ আমি করিয়া

ছিলাম সেটা হচ্ছে একখানি আবেদন পত্রের বন্দা করা। পোরবন্দরে এক গরীব মুসলমান প্রজার জমী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল; সে আমাকে পিতৃভা উপযুক্ত পুত্র মনে করিয়া আমাকে পাকড়াও করিয়া বসিল। তাহার মামলার কোন জোর ছিল না তথাপি আমি তাহার কাজ করিতে রাজী হইলাম। খিহ হইল যে মাত্র ছাপাইবার খরচ সে দিবে। আমি একটা বন্দা করিয়া বন্ধ-বান্ধবগণকে পড়িয়া অনাইলাম সকলেই সেখানি বেশ পছন্দ করিলেন তাহাতে আমার নিজের উপর একটু বিশ্বাস জন্মাইল এবং মনে ভাবিলাম যে অন্ততঃ মেমোরিয়াল লিখিবার শক্তি আমার ভরিয়াছে—এবং ইহা সত্য সত্যই জন্মিয়াছিল।

যদি পথমা না লইয়া মেমোরিয়াল লেখার ব্যবসা করিতাম, হুত আমার পদার খুব বাড়িত কিন্তু তাহাতে পেট তো ভরিবে না, তাই আমি শিক্ষকতা কার্য লইবার মন করিলাম। ইংরাজী আমি ভাল করিয়াই পড়িলাম হুতরাং ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্রদিগের ভাল ভাবে ইংরাজী পড়াইতে পারিব বলিয়া আমার মনে বিশ্বাস ছিল। আর এরূপ করিলে আমার খরচের কতকটা অংশ নিজে বহন করিতে পারিব বলিয়া মনে করিলাম।

সংবাদ পত্রে একদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলাম, তাহাতে লেখাছিল, "কর্ণধালি—একজন ইংরাজী শিক্ষক চাই—প্রত্যহ এক খটা পড়াইতে হইবে বেতন ৭৫ টাকা" বিজ্ঞাপনটা একটা বিখ্যাত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে দেওয়া হইয়াছিল। আমি দরখাস্ত করিলাম, এবং আমার ডাকও পড়িল। অনেক আশা ও আনন্দ লইয়া আমি তো দেখা করিতে গেলাম কিন্তু সেখানকার কর্তা যেমন শুনিলেন যে আমি গ্র্যাডুয়েট নহি অমনি দুঃখের সহিত আমার প্রস্তাবখান্য করিলেন। আমি বলিলাম "দেখুন আমি লওনের ম্যাট্রিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং এ পরীক্ষায় আমি লাভিলেও পান করিয়াছি," কর্তা বলিলেন "ঠিক কথা। কিন্তু আমরা গ্র্যাডুয়েট চাই" কাজেই আমি নিরুপায় হইয়া ফিরিলাম নৈরাশ্র ও ক্ষোভে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছিল।

আমার দাখাও কতকটা বিরক্ত হইলেন। তারপর আমরা ঠিক করিলাম যে বোখাইয়ে আর থাকিয়া কোন লাভ নাই অতঃপর আমার রাজকোটে থাকাই সাব্যস্ত হইল। আমার ভাই সেখানকার একজন ছোট বাট উকীল ছিলেন, তাঁহার কাছে থাকিয়া দরখাস্ত লেখা, আবেদনের সুবিধা করা প্রভৃতি কার্য করিব। আর সেখানে একটা সংসার পাড়া ছিল হুতরাং সেখানে থাকিলে বায় বাহুলা ঘটবে না উপরন্তু বোখাইয়ের বাসা উঠাইয়া দিলে খরচ অনেক কম হইবে। এইরূপে ছয়-মাস বোখাইয়ে থাকার পর আমরা সেখানকার বাসা তুলিয়া দিতে হইলাম।

বোখাইয়ে থাকিবার সময় আমি রোজই হাইকোর্টে যাইতাম কিন্তু আমি একথা বলিতে পারি না যে তাহাতে আমি কিছু কাজ করি শ্রমিথিতে পারিয়াছিলাম। শিপিং-বার মত জ্ঞানই আমার ছিল না—কোর্টে মামলা শুনিবার সময় আমি উত্তর অস্বরণ করিতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়া ক্লিষ্ট হইতাম। আমার মত আরও অনেক অধ্যক্ষ্য সঙ্গী ছুটিয়া যাইত এবং আমরা সকলে একত্রিত হইয়া কোর্ট

মণ্ডল করিতাম—ইহাতে লজ্জার ভার অনেকটা লাঘব হইত মাত্র। কিছুদিন পরে এই লজ্জাবোধকরা অনেকটা কমিয়া গেল এবং তখন আমি ভাবিতাম যে কোর্টে বসিয়া নিমানটা একটা ক্যান্সন।

এখনও আপেকার মত অনেক মামলাই ন উকীল আছেন তাঁহাদিগকে একটা স্বপ্নামর্শ আমি বিতে চাই। যদিও আমি গিরগাঁওয়ে থাকিতাম তথাপি কোর্টে আমি হাটখাই যাইতাম গাড়ী তো নাই এমন কি ট্রামেও উঠিতাম না। আমার বাইতে ৪৫ মিনিট লাগিত এবং ফিরিয়া আসিবার সময়ও তাহাই লাগিত। এইরূপে দুর্য্যে উত্তাপ সহ্য করিতে আমি অত্যন্ত হইয়াছিলাম। তা'ছাড়া ইহাতে আমার অনেক পরগা বিচিয়া যাইত এবং এজ্ঞত আমি কখনও পীড়িত হই নাই বরং আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হইতেন। এমন কি আমি অর্থোপার্জনে সক্ষম হইলেও বাতায়াত হাটখাই করিতাম এবং এই হাটার হুকল আশ্রিও আমি ভোগ করিতেছি।

( ক্রমশঃ )

## কথিকা

### শ্রীনিখলচন্দ্র লাহিড়ী

সে ছিল ভিখারী; রান্নাঘাট সহরের আশে পাশে পল্লীপথে মাঠে-মাঠে কাননে-কান্সারে কতদিনের একটা ধূলি-মলিন বেহালা নিয়ে সে গান গেয়ে বেড়াত।

ভিক্ষা সে করত, কিন্তু একটু পয়সার বেশী সে কোন-দিন কাক কাছ থেকে নেয়নি—এইট ছিল তার চিরদিন-কার স্বভাব। দানের অবমাননা করে বেলে' খোয়ালী ভিক্ষুককে কত পথিক কতদিন চোখ রাভিয়ে ভয় দেখিয়ে চলে যায়, কিন্তু এতেও তার চেতনা হয় না, সে তার বস্তাবটীকে ঠিক বজায় রেখে চলে।

ভানোগামতে সগায়ের তার কেউ ছিল কিনা সে কথা বড় একটা কেহ জানত না—কিন্তু অনেকে বলাবলি করত—বেড়ারী কি আর সাথে পাগল? ওর কর্তের অমন গানই তো ওকে পাগল করেছে!

নদীর ধারে বন-পথের পাশ দিয়ে চলতে চলতে পথের মাশ্বকানে বেহালাটি নিয়ে সে বন গাইতে বসত তখন পথিকের আর পথ চলা হ'ত না—শিকার বুজতে এসে নিষাদের হাতের তুল লক্ষ্য-হারা হয়ে বসে পড়ত—বনের মধ্যে মথুরে, ভটতীরী জল কলোলে সেই ভিখারী-কর্তের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি স্বভাব দিয়ে বেজে উঠত।

এমন কতদিন কত সন্ধ্যা সাঁঝে, কত বাবল-বিনের বরষাবানি বৃষ্টি-ধারার তালে তালে, কত কাণ্ড-বিনের আবীর-রাভা রক্ত-উষার, কত জোছনা-উজল চিঠি-বাতের উগাল কাক হাওয়ায়, তার গানের স্বর বহন ভেসে আসত তখন লোক ভাবত এ গান সেই ভিখারী-কর্তের, সেই সগার-বিরাগী আশ্রুভোনা পাগল পথিকের ব্যথিত হিয়ার চির-নন্দন গান। তার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়েছিল অমৃত



গান, সেই গানের ভাষা যেদিন তার কণ্ঠে বেজে উঠল সেদিন সে তার বেহালাটিতে অতি সম্বন্ধে স্থর বেঁধে নিল।

ফাগুনের বসন্ত দিনের পাগল হাওয়া এসে যখন বাংলার দুয়ারে প্রথম হানা দেয়, তখন তার আনন্দের সীমা আর ধরে না। বেহালাটি হাতে নিয়ে নিশিভোরে বেরিয়ে যায় কোথায় কোন্ অজানা পথটা ধরে—তাকে কেউ আর দেখতে পায় না। সারাদিন বনে-বনে ঘুরে ক্রিরে কত কি সে গেয়ে বেড়ায়—তার নৃত্য-চোড়ল গানের ছন্দে বনে বেজে ওঠে ঝড়ুরাজ বসন্তের আগমনী স্থর—নির্দীর্ঘ নিশ্চল হ'য়ে কাননের পত-পাখী তরু-লতা যেন অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে এই ভিখারীটির পানে।

বনের রাত্রি আসে, ঘরের আতপন বিহীন জামল ছায়ায় বসে' সে একমনে নীরকণ করে বনানীর অপকল্প মাধুরী—উণয়ে বিগলিত প্রসারিত নীলাকাশ, আর সে নীলিমার কি উজ্জল প্রসঙ্গ! বসন্তের স্থরভি-শিখর মল্লর বাতাস এসে যৌবনে প্রথম প্রেমের মত যখন আমের মঞ্জরীকে ছুঁ দিয়ে, ফুল ফুলে গরম দিয়ে, কানন-আনন কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যায়—বেশ বিদেশ থেকে স্বাক্ষর করে উড়ে-আসা নানা রং-বস্ত্রের পাখীর দল যখন নদীর তীরে মেলা ধারায় আবার বেলা-শেষে মেলা ভেঙ্গে কোন্ দাগর-পারে উড়ে' চলে যায়—এ সব দেখতে ভিখারীর বড় ভাল লাগে সে একদৃষ্টে তাদের পানে চেয়ে মনে মনে কত কি ভাবে। বিব-প্রকৃতির নিভৃত অন্তরালে প্রাণের এই উৎসবময় সঙ্গীতময় খেলা দেখে ভিখারীর প্রাণ কি এক অনীর্জনীয় পুলকে ভরে ওঠে—সে ভাবে সেও যেন ওদেরই মত মুক্ত, ওদেরই মত প্রকৃতির কোলে জন্ম নিয়েছে; বাহিরে বৃষ্টি তাই ওকে অমন ক'রে ভাকে। ওদের প্রাণের পূর্ণ পোতে, ওদের কাছে আপনাকে হারিয়ে দিতে, বলিয়ে দিতে, তাই বৃষ্টি তার এত আনন্দ প্রকাশের বেদনায় জ্বর যখন চকল হ'য়ে ওঠে তখন সে বেহালাটি নিয়ে গাইতে বসে—

“মম যৌবন নিরুত্তে গায়ে পাখী

স্বপ্ন জাগা, জাগো,—”

সাঁজের বেলা গাজীর দল নিয়ে রাখালেরা যখন ঘরে ফিরে আসে তখন দেখতে পায় অদূরে অশ্বখ-তলার ছায়ায় বসে' কে এক ভিখারী অস্ত্রচালের পানে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছে। তারপর, দেবদারু গাছের আড়াল দিয়ে দিনান্তের রক্ত-স্থূষা যখন বিধায় নিয়ে চলে যায়—ভিখারী কণ্ঠে বেজে ওঠে বিধয়ের এক কল্যাভরা ছায়াশব্দে রক্ত-স্থূষা—ভিখারী আপন মনে গায়—

“ধূরে কোথায় ধূরে ধূরে  
মন বেড়ায় গো ধূরে ধূরে  
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে  
সেই বাঁশিটির স্থরে স্থরে।”

ফাগুন-সাঁজের উত্তল বাতাস সে গানের প্রতিধ্বনি দিয়ে কঁপে চলে যায়, ভিখারীর তাত্তেও মন ভরে না—সে আবার গায়—

“যে পথ সকল দেশ পারায়ে  
উদাস হ'য়ে যাই হারায়ে  
সে পথ বেয়ে পাগল পরাণ

যেতে চায় কোন অচিন পুর।”

তারপর, দীর্ঘ রাত্রে নিবিড় আঁধারে সমস্ত গমন ছেয়ে যায়—সন্ধ্যারাগী কখন এসে বৃকের আঁচল দিয়ে ভিখারীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে কোয়ে তুলে নেয়—আকাশের হু'একটি তারা ভিন্ন তা' আর কেউ দেখতে পায় না।

এমন ক'রে ভিখারীর দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যায়।

আবার বসন্ত ফিরে এসেছে; কাননের ফুলে ফুলে ততিনীর ফুলে ফুলে আকাশে পাতলে আবার সেই সঙ্গীতময় উৎসব যেন উজ্জ্বলিত হ'য়ে বিশ ছড়িয়ে পড়েছে।

দেহিন দান্ডন সন্ধ্যা, অপোহা বহুল বোলন—চাপার বনে বনে নব বসন্তের আগমনী স্থর বাজিয়ে অলস চরণে রাগাঘাট ঠেপনে একটু বিরামের আশায় ভিখারী এসে বসল। আজ তিন দিন তার কিছু খাওয়া হয়নি সে আজ ক্ষুধিত তৃষিত শ্রান্ত হ'য়ে ঠেপনের এক পার্শ্বে এসে শুয়ে পড়ল। তবুও আজ তার ভিঁকা কবুতে আর ইচ্ছা ছা'লে না—যুবকের মতো বসে' কে যেন আজ

তাকে বললে—“এমন হীন উপজীবিকা—এ কি মাছবের? ওরে, এ তো মাছবের নয়।”

জন্মের মাঝে প্রতিধ্বনিত এই বাণী তার কাছে বিধাতার আদেশ-বাণী বলে মনে হ'ল। আজ থেকে তার পণ, সে আর কোন দিন কাক কাক থেকে দান গ্রহণ করে' বিধাতার আদেশ অমান্য করবে না। তার পণ সে ধীরে ধীরে মুখিয়ে পড়ল।

ভিখারী ধূমের দিগন্তে আজ স্বপ্ন দেখলে—  
ফুল ফুলে পরিশোধিত সেই জামল বনরাজি, সেই মন্ড-মুখরা কলম্বরা প্রোতধ্বনি—তারার যেন সব তাকে কেঁদে বলছে “ওরে আয় নিতি নিতি কত আশাধিক-স্বপ্নার সাধিয়ে নিয়ে আবার যে তোরাই প্রতীক্ষার বসে' আছি।”

অকস্মাৎ তার মূখ ভেঙ্গে গেল আয়ের-মানের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের শব্দে; মাজিলির মেল কল্‌কাতা থেকে ছেড়ে রানঘাট ঠেপনে এসে' যখন খামেলা, আকাশের নিশা-হারা দু'চরণে তোহের তারার নিবু নিবু করে' তখনও নিভতে পারছিল না। গাজীতে আজ বড় ডিঙি, গাজীঘানি এসে ঠাঁতেই যাত্রীরা সব ভীষণ কোলাহল করে' কেউ উঠতে লাগল কেউ নামতে লাগল।

সেইক-ও-রাস কামরার সমুদ্রে একজন প্রিয়দর্শন বিলাসী যুবক একদিন ছড়ি হাতে পাড়িয়েছিল; গায়ে ছিল তার অতি মিহি গরদের একটা পাল্লাবী—হাস্যনাতন গল্প মেখে গিলি-শেয়ের হুতুলবায়ে সেটা যেন কেঁপে পোনে উড়ছিল। ঐশ্বর্য্যের অহমিকা এসে' দার চিত্তে আসে পেতেছে, নিত্য নব নব কামনার ফুল্লার গৌণে এনে বিলাস প্রভি মুহুর্ন্তেই তার গলায় পরিয়ে দিয়ে যায়—ভিখারীর আবেদন তার কাছ থেকে বার্থ উৎসাহিত হ'য়ে ফিরে আসবে একথা ভিখারী জানত কিন্তু তবুও কি জানি আজ তার কোন কৌতুহল হচ্ছে ঐ যুবকের কাছ থেকে একটা পরশা সে চায়।

ভিখারী উঠে ঠাঁড়াল, তারপর ধীরে ধীরে যুবকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে “আমায় একটা পরশা দাওনা বাবা।” হঠাৎ ছড়িটা ফুলে হ'য়ে বজ্রগজীর হয়ে যুবক উত্তর করে—“আবার যদি বিরক্ত কর্বি, তবে দেখছি—এ ছড়ি—”

এ অপমান ভিখারীর অন্তরে গিয়ে আজ তীরের মত বিধল। সে তৎক্ষণাৎ বেহালাটি তুলে' নিয়ে আপন মনে গান ধরিল।

সেই স্থম্বর কণ্ঠের চারিদিক মূখর করে' তুলল—  
বেধতে দেখতে কত দুয়ের মাছব কাছে ছুটে এল—  
বেলগাজী শূন্য করে' যাত্রীরা সব ছুটে এসে ভিখারীকে ঘিরে' ঠাঁড়াল। অশ্রু-নিহিত ব্যথিত বুকের অন্তরালে যে দেবতা এতদিন লুকিয়ে বসে' ছিল, মাছবের কাছে ধরা দেয়নি সে আজ মুক্তি নিয়ে ভেসে উঠল—  
তাই সঙ্গীতের তানে লয়ে হরের প্রতি মুহূর্তে ভেসে বেড়িয়েছিল লাগল কি এক কল্যাভরাত্তর উজ্জ্বল-করা তার যেন নব-বসন্তের এই তরুণ উদায় কোন তরুণ ভাষা আজ আপনায় সবুহু বিশ্বের পাতা আচ্ছাদি দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করুতে চলেছে।

ঠা ১ং ১ং করে' গাজীর বেল বাজলো কিন্তু যাত্রীদের কাণে তা পৌঁছিল না। ভিখারীর সেই গান আজ থেকে থেকে কত মাছবের মনে জমায়েত কত অশ্রু মুক্তির শীত পরশ বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল বিশ্বয়ের বিপুল-যাতে ছুইয়ে-পড়া মাছবের মন স্পষ্ট করে' তাকে ধরতে পারুলে না।

চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টির মত রাশি রাশি পরশা এসে ভিখারীর সমুখে স্থাপকার হ'য়ে পড়তে লাগল—  
সৌন্দর্য্য তার দৃষ্টি সেই, সে আজ গানের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছে। নিশি-ভোরের উত্তল-হাওয়া নিরীকণ মাছবের অহঙ্কারকে খিঁচুর দিয়ে বসে' লেন—“কত যুগ যুগোত্তর তপস্বিত্তেও মাছব যে চম্ভ-ভদ্রন লাভ করতে পারেন না, পারিব জগতের অনন্ত কোটা ঐশ্বর্য্যের তার কাছে কি দুষা।”

গান-পাওয়া শেষ হ'য়ে ভিখারী চেয়ে দেখলে, সমুদ্রে রাশি রাশি পরশা ছড়ানো রয়েছে। ভিখারী সেগুলি হুঁরিয়ে নিয়ে, ঠেপনের এক পার্শ্বে একটি অর্ধ ঘণ্টা ছিল তার হাতে গিয়ে তুলে' রিংল। এই মহিমময় দৃশ্য যাত্রীরা সব বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে দেখতে কোন্ স্থম্বর পথে চলে গেল।

পূর্ত রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে পড়ে' ভিখারীর সমস্ত জ্বর আজ গরের শোণায় যেতে উঠল—নদী-গিরি পরিবেষ্টিত জামল বনরাজির শান্ত-শিখর কোরে—যেখানে বিশ্বমাছের মেহসিকিত গীর্ঘ্যমালা প্রতি নির্যত শতবারে উৎসারিত হয়—সেই পথ ধরে' সে আজ চলল।

সেইদিন থেকে ও অকলে ভিখারীকে আর কেহ দেখতে পেলেন না।





পূর্বর্তের মুখিক প্রসবের মত বহু আড়ম্বর করিয়া লর্ড লিটন মঙ্গলদেবের সমুদ্র যাত্রা সমস্তার যে অকিঞ্চিৎকর সমাধান করিয়াছেন—তাঁহাতে নূতন কিছুই নাই। অরাজ একজন লাউসাংহেবক তাঁহার অমূল্য মতিভেদের এক কথাও অপব্যয় করিতে হয় নাই অথচ এই বিষয় সমস্তার নাকি উত্তম সমাধান হইয়া গিয়াছে। ছিল “থোডবডি বাড়া” হইল “বাড়া বডি থোড”—বাস্! আর কি চাও তোমরা? কেবল লাভের মধ্যে নাথোরা মঙ্গলদেবের কপাল কিরিল, তাঁর সামনে আর কাহারো “রা কাড়িয়ার” ঘো রহিল না। আর বাকী ভার রহিল কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের আর মঞ্চস্থলে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর—অর্থাৎ লাউসাংহেব কোন খুঁকী বাড়ি রাখিলেন না। অতঃপর পুলিশকমিশনার বাহাদুরের ইচ্ছাশূন্যের হিন্দুদের পূজা নিরঞ্জন ও শোভাযাত্রাদি করিতে হইবে। আমরা বলি আমাদেবের পলিকাপানা তাঁহাধারা approved করাইয়া লইলেই সব চেয়ে ভাল হয় কারণ তাহা হইলে নবমী পূজার পর দশমীতে বিসর্জন না হইয়া পুলিশ কমিশনারী মতে উহা মৎস্যমারি পর স্ববিধামত করা চলিবে। সম্প্রতি রাজ্যরাজেশ্বরী প্রতিমার নিরঞ্জন তাই ইবের পূর্বে হইবে না তাহা পুলিশ একরূপ বলিয়াই দিয়াছেন। পুলিশের হাতে ধর্মস্বত্বীয় ব্যাপারের নিরঞ্জন ক্ষমতা রাখা কোন প্রকারেই যে বাহনীর নহে তাহা কি বাঙালার লাট জানেন না!

রাজ্যরাজেশ্বরী বিসর্জন লইয়া যে ব্যাপার ঘটিল ইংরাজ রাজত্বের বেড়ে শত বৎসরের মধ্যে এরূপ ব্যাপার ঘটিলোকে বলিয়া তো মনে পড়ে না। ইহা হইলে সমগ্রবীর বিশেষের উপর পক্ষপাতীয় যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া গিয়াছে তাহা অনেকেই মনে করিতেছে। মারবাড়ীপ

ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহারা আজ একান্ত অক্ষম। অর্থের উপাসনা করিয়া আজ তাহাদের আর সে ধর্মপ্রাপ্ততা নাই—বাকিলে ২৫খ উপায়েই তাহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেন। বিলাতী ভ্রম্য আনয়ন বন্ধ করিতে পারিলেও বিলাতী ব্যাঘের সহিত কাজ বন্ধ করিলে এক মাসের মধ্যে এই অপমানের চূড়ান্ত প্রত্যাহার দেওয়া যাইত কিন্তু মারবাড়ী আজ অর্থের উপাসনার ময় তাহাদের ধর্মবিশ্বাস আর নিশ্চয়—হুতরাং তাহাদের দ্বারা এ ব্যাপারের প্রতিবিধান অসম্ভব। বিলাতী কাপড় ও মিশ্রিত যুত বেচিয়া যখন মোটা পয়সা রোজগার হয় তখন ধর্মার্থ সব চাপা পড়িয়া যায়। তবে অকারণ সভা করিয়া, হরতাল, করিয়া ঢালাটলি। না করিলেই ভাল হইত। কতকগুলি বোকাবানদের অথবা ক্ষতি করা ছাড়া এ হরতালে কোন লাভ হয় নাই।

১০ই জুন লর্ড লিটন ছুটি লইয়া দেশের হাওয়া যাইতে গিয়াছেন তত্পলকে গত ৩ঠা জুন সন্তোষের রাজা ময়মনাথ রায় চৌধুরী একটা প্লীতি-ভোজের অহুতান করিয়া ছিলেন। এটাকি মন্ত্রী দানের প্রতিদান?

মিঃ এস এন মলিক ভারতে থাকিয়া পোড়া ভারতবাসীর উপরতবে প্রাণ ভরিয়া ভারতসেবা করিতে পান নাই; তাই তিনি কোতে বিলাত চলিয়া গেলেন—এবার সেখানে গিয়া কেমন করিয়া দেশ সেবা করিতে হয় তাহা ভারতবাসীকে দেখাইয়া দিবেন। আমরা তাঁহার সেবার নমুনা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি।

স্বরাষ্ট্র্যবল এক গ্যারি লইয়া বড় গণগোল বাধিয়াছে

প্যাট্রিক দেশবন্ধুর দান বলিয়া একরল মাধ্যম করিয়া রাখিতে চাহেন অপর দল তাহাতে একেবারে নারাজ—কল্যাক আগামী ১০ই জুন নির্ধারিত হইবে এবং তাহার উপর আগামী কাউন্সিল নির্বাচন নির্ভর করিবে। অস্ত্রান্ত দলের লোকেরা প্যাট্রিক নাকচ করিবার অহিলাহ স্বরাজ্য হলে ভেদ প্রবর্তনের চেষ্টা করিবেন তাহার দল বড়ই গারাম হইবে বলিয়াই মনে হয় কারণ হিন্দুদের এই আশঙ্ক্যবলেই যোগ্য লইয়া মুসলমান দল প্রবল হইয়া উঠিবে—ফলে প্যাট্রিক তো যাইবেই উপরন্তু হিন্দুদের সাম্প্রতিক প্রভাব কমিয়া যাইবে এখন কর্তব্য হইতেছে সকল দল একমত হইয়া প্রবল শক্তিতে মুসলমান প্রাধান্ত দমন করা—নতুবা নাজ পথঃ!

ট্রান কোম্পানী ভাড়া কমাইয়াছেন—অবশ্য সর্বত্র নহে কেবল সেমের পথে বাসের সহিত প্রতিযোগিতা ছিল সেই পথগুলির ভাড়া কমিয়াছে, আর কমিয়াছে Transfer বা পরিবর্তন টিকিটের ভাড়া। বাসগোলারাও একদিনের জন্ম ভাড়া কমাইয়াছিলেন কিন্তু পরদিনই আবার বাস এসোসিয়েশনের পরামর্শমুখায়া ভাড়া বাড়াইয়া পূর্ববৎ করিয়াছেন। ইহার ফলে বাসের যাত্রীসংখ্যা বেশ কমিয়া গিয়াছে। বাসগোলারা দেশীয় বলিয়া বেশী ভাড়া দিয়া তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে যে সকল ইচ্ছা নহে তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে। বাসের এসোসিয়েশন হইয়াছে ভনিত্তে কি এ এসোসিয়েশনের কাজ কি কেবল কমান-ভাড়া বাড়ান পর্য্যন্তই? বাসের অধিকারীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখাই যদি এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হয় তবে সাধারণের তাহাতে কিছু বলিবার নাই তবে যদি বাসগুলিকে দেশবাসীর সহায়কূতির সাহায্যে ট্রান কোম্পানীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার লম্বনী হইয়া মরলাত করিতে হয় তবে সাধারণের বাতায়নের স্ববিধামত ব্যবস্থা করা এই এসোসিয়েশনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। সকল বাস যখন এই একই এসোসিয়েশনের অধীন তখন এককালেই বাস হইতে অপর লাইনে, বাসে পরিবর্তন টিকিটের প্রবর্তন করা অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্বির প্রত্যেক বাতায়

আংশিক ভাড়া Stage fare প্রবর্তন করা আবশ্যক; যেমন শ্রামবাজার হইতে ডালহৌসীকোয়ার ৭ পয়সা ভাড়া হইলে শ্রামবাজার হইতে কলেজবোয়ার ৫ পয়সা করিলে বা হেডুয়া হইতে ডালহৌসী ছয় পয়সা করিলে যাত্রীদের অসুবিধা হয় অথচ বাসেরও কোন ক্ষতি হয় না। ট্রানের পরিবর্তন টিকিট ক্রিয়া যোগ্যতঃ অনেকে ইচ্ছাসম্পন্নও বাসে যাইতে পারেন না—কারা প্রতি ক্ষেপে ১০ আনা পয়সা ক্ষতি সহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহাড়া শ্রামবাজার হইতে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া শেখালপা ঠেগনে ও হাওড়া ঠেগনে এই দুই পথে বাস-চলিলে যাত্রীদের অনেক অসুবিধা ও সাজ্য হয় তাই বাস এসোসিয়েশনের প্রকৌটারী মহাপুরুষ আমরা এই সব বিষয় মনোযোগে হইতে বলিতেছি নতুবা কেবলমাত্র আদেশিকতার ঘোষাই দিয়া অধিক ভাড়া চাওয়া বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে অক্ষমতার পরিচয় দেওয়াই বই আর কিছুই নহে।

হাওড়া মিউনিসিপালিটার ভাইস চেয়ারম্যান নিত্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। নিত্যবাসু সাধারণ অথবা ইহঁতে স্বীয় চেষ্টার ফলে অসামান্য উন্নতি করিয়াছিলেন। হাওড়ার অধিবাসীদের উপর তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত না হইলেও তাঁহার মত কৃতান্ত ও কৌশলী ব্যক্তির মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত আমরা তাঁহার শোকান্ত আত্মীয় স্বজনগণকে সমবেদনা জানাইতেছি ও তাঁহার পারলৌকিক শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

নিত্যধন বাবুর মৃত্যুতে যে কমিশনারের পদটা খালি হইল ঐ পদে হাওড়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীকৃষ্ণ বাবু বসুনা-প্রসন্ন পাইনকে নির্বাচিত করািবার জন্ম হাওড়ার কংগ্রেস-মিউনিসিপালদল চেষ্টা করিতেছেন—এই চেষ্টা সফল হইলে মিউনিসিপালিটিতে কংগ্রেসীয়দের সখ্যাবিকাশ ঘটবে। বরদাবাসু যে এই পদের সম্পূর্ণ সুযোগে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এমন কি হয় ত তিনি পরে ভাইস চেয়ারম্যানও হইতে পারেন তবে কথা এই যে, পদের



আবার একটা মহিমা আছে সেই মহিমার প্রলোভন হইতে নিজেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিয়া দেশসেবা করা বড় কঠিন কাজ। তাহাতে কচিং ছু' একঘনকে কৃতকার্য হইতে দেখা যায় সেইজন্যই আমাদের বা ভয় আর বোধ হয় এই কারণেই লড়া গমন করিলে রাবণ হইবার সম্ভাবনা-সুচক প্রাবলী ৭৪ হইয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়া পাই না, সত্যই ইংরাজ রাজ্যে বাস করিতেছি অথবা পাঁচ সাত শত বৎসর পূর্বেরকার কোন রাজার রাজ্যের প্রভা হইয়া গিয়াছে? বাস পুলিশহুগে চুকিয়া, বন্দুক দেখাইয়া মীনা পেশোয়ারী অধিকার করিয়াছিল, কোটা কোটা মুস্তা যারে যে পুলিশ সহরের শাস্তি ও শৃঙ্খলার কার্যে নিযুক্ত, বাহায়া একটা বোমা তৈয়ার হয় এমন কারখানাও সন্ধান করিয়া ধরিয়া ফেলেন, বাহাদের অসাধ্য কৰ্ম নাই বলিয়া তাহারা গর্ব করে, তাহারা আজ পর্যন্ত মীনা পেশোয়ারীকে ধরা ত ঘরের কথা, সন্ধানও করিয়া উঠিতে পারিল না? সত্যই কি পুনী এত অকৰ্মণ্য? না, ইহা ঐশ্বর্যীজ? এবং সে ঐশ্বর্যীজের কোন কারণ আছে?

মিটার সহিব হুয়াবদী স্বয়ং আছে ত? গত মঙ্গলবার রাতে ধর্মতলার টীপু হলতান মসজিদেবের সম্মুখে হিন্দু-মুসলমানের পকেট সংগ্রাম যুদ্ধে তিনি যে ভাবে হিন্দু-দিগের প্রতি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয় প্রকৃতির প্রভাব তাহার অবস্থা কান্না করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন—“dirty Idolators—অশুভ গৌতলিকগণ!” ইহা শুনিয়া তাহারই আত্মীয় ডাক্তার আবদুল্লাহ হুয়াবদী প্রতিবাদ করিয়া বলেন—“ডেপুটী মেয়রের মুখ হইতে এমন কথা বাহির হওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু বহিদ কামাতা এই ঐক্যতা প্রকাশ করিয়াও বিশেষ লজ্জিত অথবা হুগুতিত হইয়া নাই। তবে একটা

ঠেলামারা গোছের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অতপর সহরবাসী যদি ডেপুটী মেয়র পদের অযোগ্য বলিয়া এই সাম্প্রতিক ধূস্রাঙ্কন যুক্তির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে, তবে কি মুসলমানগণ টাউনহলে আর একটা সভা আহ্বান করিয়া “dirty Idolators”এর বসাকে অভিনন্দন করিবেন?

নবাবুগ ক্লাব (৪৫নং সুদীপাট রোড, বরাহনগর) কর্তৃক নিরীক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ লেখককে ২টা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। বিষয়—(১)—ছোট গল্প, (২)—ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (৩)—ভ্রমণ, (৪)—শিক্ষা। ১৮ই আগস্ট ১৩৩৩ এর মধ্যে প্রেরিতব্য। ক্লাবের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। রচনাগুলি নবাবুগ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।

বাজারে একটা গুজব রটিতেছে যে উই-লিস ওভার-ল্যাও মোটর কোম্পানী তাহাদের ১১নং মডেল ওভারল্যাও গাড়ীখানি তুলিয়া দিবেন। উক্ত কোম্পানীর কলিকাতার এজেন্ট মেসার্স ‘লি ম্যাককিঞ্জি এন্ড কো’ (১৯১৯) লি: আমাদের জানাইয়াছেন যে উক্ত গুজব একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং কোম্পানী উক্ত জনপ্রিয় মডেলের গাড়ী আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছেন। ২০০০ টাকা দামে বর্তমান গাড়ী পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১১নং ওভার-ল্যাও গাড়ীর একই অধিক অবশিষ্ট সম্পদ বলিয়া দিনরাত ব্যবহারের পক্ষে এই মডেলটি বড়ই সুবিধাজনক। উহার বিক্রয়াদিক দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা ব্যক্তিগণ এই মিথ্যা গুজব রটাইয়া কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মোটর কমেডিক্স ব্যক্তিগণ বাহাতে এই জেগার বোঁকায়া না তুলিয়া যান তন্মত এই প্রতিবাদ করা হইল।



শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### ভৌকিশ্রম

সেদিন সাধা খানাপ্রাপ্ত অপর্যাপ্ত প্রবেশদের বাড়ীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া কি যেন জানিবার প্রবল আগ্রহে বার্ষ-মনোহর হইয়া সমীর যখন তার ক্ষুর পর্বতটরখানির মধ্যে কিরিয়া আসিত তখন সম্মুখা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘোঁষার ভিত্তরক্ত আলোকধারা, তরুণর দুর্গের মধ্য দিয়া অন্ধকার বনকুমি প্রাপ্তে বায়ু সফালিত হইয়া ঢকল শিশুর মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধমান সমীর যেন মত্ত বৃদ্ধির খেয়া হারাইয়া চিত্তাভারাবশত মত্তকে তার হঠাৎবের পাওয়ার উপর বসিয়া কতপ্রকার সম্ভব অসম্ভব চিয়ার পশ্চাতে উল্লাসের মত ছুটিয়া চলিতেছিল।

বৃদ্ধ সমীর আজ নিজে যেন কোন মতেই নিজেকে মত্ত করিতে পারিতেছিল না। সারাদিন সে অনাহারে কাটাইয়াছে। তাহাতে তাহার তত দুঃখ হইয়াছিল না, কিন্তু মনুষ্য তাহার অনাহারের কথা সম্পূর্ণ অস্বপ্ন হইয়াও যে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল, এ দুঃখ যে তার মাথিবার স্থান নাই! যে মনুষ্য দাঁড় একটুখানি আসিতে বিলম্ব হইলে উদারাদিনীর মত ঘর বাহির করিত, যখন সমীর ফিরাই আসিত তখন দাঁড়র মুখের দিকে চাহিয়া তিরস্কার করিতে গিয়া অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিত,

দাঁড়কে না পাওয়াইয়া যে সারাদিন অনাহারে দাঁড়র অশ্রুমান প্রতীকার উৎকর্ষ হইয়া গিয়া থাকিত; সেই মনুষ্য কিনা আজ একবারও সেই দাঁড়র কথা মনে করিল না! এগার বৎসরের অপতা যেহেতু ভোর আজ কি যাদু-মন্ত্রে সে মূহুর্তের ভিতর এমন নিশ্চয়ভাবে ছিন্ন করিয়া ফেলিল? বেদে সমীরের এ কথা ভাবিতে দুই চক্ষু অশ্রুভারে টল টল করিতে লাগিল। তাহার কঠিন হৃদয় বিনোদী করিয়া রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাহার মন দিয়া বাহিরে আসিতে প্রয়াস পাইল। সমীরের বড় বড় গোলা চক্ষু ছুটি আরক্ত হইয়া উঠিল।

টিক সেই সময় বায়ু-তাক্তিত হইয়া একরাস শুক পজ অদূরে উড়িল। সমীরের চিত্তার স্রোত সেই শব্দে ভাঙিয়া গেল। কি ভাবিয়া সমীর উঠিয়া পাড়াইল। অনেকক্ষণ জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দিক চাহিয়া কি যেন অস্বপ্নমান করিতে লাগিল। বেধে হইল বাহার সন্ধান করিতেছিল, তাহাকে বেধিতে পাইল না। সে নিবিড় ভাবে দৃষ্টির দ্বারা তাহার অংগ চাপিয়া ধরিল। এতখানি নিমকহারামী যে মাহুবে করিতে পারে, তাহা তখনও সমীর অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সহসা সমীরের মনটা যেন কেমন কোমল হইয়া পড়িল। সে তখন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া



উদ্ভাসের মত চাঁৎকার করিয়া ডাকিল “মহুয়া, মহুয়া ফিরে আর বোনা। আমি রাগ করব বলে, বুঝি লুকিয়ে আছিস! না, না, আমি আর তোকে কেনা কথা বলব না দিবি। তুই ছুটে আয় আমার উত্তর বন্ধের উপর। বুঝ দাওকে কি তোরা এত কষ্ট দিতে হয়? আমার বড় ক্রিকে পেয়েছে যে মহুয়া! আমাকে খেতে দে। তুই না দিলে যে আমার পাগড়া হয় না, তা ত তুই জানিস বোন?” বলিয়া সমীর পাগড়ার উপর হইতে নীচে নীচিয়া পড়িল। কতটা পথ অগ্রসর হইয়া আবার কিরিয়া আসিয়া পাগড়ার উপর মাথা হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ দৃষ্টি নিম্নেপন করিয়া বলিয়া উঠিল “এতবড় পক্ষা! আজও তুই সমীরকে চিনিসনি? তোরা সলল আশা ভঙ্গা হুল এক মুহুর্তে যে আমি চূর্ণ করে দিতে পারি তাহা তুই সব ভুলে গিয়েছিস? প্রবেশের জীবন সংসার দেখে আমার উপর অভিমান, রাগ হয়েছে। মনে করিস আমি স্বয়ংতে পারি না? কার মকলের জ্ঞান আমি তাকে বিশ্ব প্রয়োগ করেছি? তা, তুই যদি একবার ভেবে দেখতিস, তা’ হ’লে বুঝতিস তোরা দাছ তোকে কতখানি সেধ করে! তুলেও সে তোরা অমঙ্গল কামনা করে না। এ ব্যাড়া যদি প্রবেশ কোন মতে বাচে, তা’হ’লে মহুয়া নিচ্চ—তোদের দুঃখনার জীবন আমি একদিন নেবো। কে কাকে রক্ষা করে দেখা যাবে।”

সমীরের মনে হইল যেন দূরে কার পায়ের শব্দ শ্রুত হইল। তার প্রাণে বেনে একটা অপূর্ণ আনন্দের অনাবিল তরঙ্গ উদ্ভিত হইল। সে কাণ পাতিয়া অত্যন্ত আগ্রহ ভরে শুনিল দূরে সত্যই যেন কার পায়ের ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সমীর কেমন উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তারপর মনে মনে বলিল “মহুয়া কি এতখানি বেইমানে হ’তে পারে? তাকে তারা জোর করে ধরে রেখেছিল, তাই সে এতক্ষণ আসতে পারে নাই। সে এসে তাকে নিশা কাটাই সকালে এ গ্রাম ভাগা করে চলে যাব। কিন্তু সে যদি বসে এ গ্রাম ছেড়ে গেলে সে বাচবে না। সমীর আপনা আপনি বলিয়া উঠিল “এঁা বাচবে না? সে না বাচলে যে আমি বাঁচব না? তখন কি উপায় হবে? আমি

গিয়ে যদি প্রবেশের পিতা-মাতার হাতে পায় ধরে অশ্রুসাধ করি?” মহুয়া হয় ত ততখানি অশ্বপানমত কয়েতে পারবে না?”

“সে যদি আপত্তি করে বলে দাছ তুই কি করছিস—অমন করলে আমি আশ্রয়তা করব।” সমীরের বৃষ্টি কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আশঙ্কায় ছুই হুখে নিজ চতুষ্পদ চাপিয়া ধরিল। মনে হইল সত্যই ত মহুয়া কি এত তুচ্ছ! এত অনায়াস লজ্জা। এত অবহেলার সামর্থ্য। সে যে বড় লোকের মেয়ে, সে যে সম্রাট ঘরের মেয়ে একথা মহুয়া না জানলেও আমি ত জানি। তা’হ’লে প্রবেশেরা কোন রিক দিয়ে মহুয়া অপেক্ষা বড়? না, না, তা কিছুতেই হ’তে পারে না। যদি তারা মহুয়াকে সম্রাটের সহিত গ্রহণ করিতে রাজি না হই তা’হ’লে আমি কিছুতেই মহুয়াকে তাদের ঘেরের উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারব না। তারপর সমীর নিজেই বলিল, “মহুয়াকে তারা নিশ্চয়ই আটকে রেখেছিল। ছেড়ে দেয় নাই, সে জ্ঞান সে আসতে পারে নাই। তার কোন দোষ নাই। সে প্রবেশকে ভালবাসে সত্য, কিন্তু অজ্ঞার ভাবে সে কিছুতেই তার প্রস্রাব দিতে পারে না, তা আমি জানি। আজ্ঞা আমার বিশ্ব কি বার্থ হ’লো? মায়াবিন ত আমি তাদের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরেছি প্রাণে প্রকার অমঙ্গলের সন্ধান ত পাই নাই। তবে কি মহুয়া প্রবেশকে বেঁধেছে! সে ভিন্ন এখন হইবে নাই, যে প্রবেশের প্রাণ কোন উপায়ে রক্ষা করিতে পারে। সত্যই মহুয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। যদি তাহাই করিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহাযের কি মহুয়ার প্রতি কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা নাই? আমার জীবনের শেষ ত হইয়া আশিয়াছে। মহুয়াকে বন্ধাতি ও স্বপথের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিলে আমার কর্তব্যের শেষ হয়।”

এই সময় উমেশ ও অবনী সেখানে আশিয়া উপবিষ্ট হইল। দূর হইতে তাহাদের অবলোকন করিয়া সমীর জিজ্ঞাসা করিল, “কেও? মহুয়া আসিছ?”

উমেশ সমীরের প্রশ্নের উত্তরে বলিল “আমি উমেশ। আপনার বাবার নিয়ে এসেছি।”

সমীর অত্যন্ত আশ্চর্যাব্বিত হইয়া বলিল “কি বললেন? আমার জন্মে বাবার নিয়ে এসেছেন। আমাকে কে বাবার পাঠিয়েছে? আমাকে বাবার পাঠাবার ত এ দুনিয়া কেউ নেই!”

“আপনার নাভনী মহুয়া পাঠিয়েছে।” অবশ্র উমেশ জানিত বাবার মহুয়া পাঠায় নাই। বাবার পাঠিয়েছিল কল্পমায়া। কিন্তু কল্পমাযীর নাম করিলে পাছে সমীর গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে একজন উমেশ মহুয়ার নাম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একথা উমেশকে অবশ্র কেউ বিশ্বাসই দেয় নাই। সে আপনাই বলিয়াছিল।

মহুয়া যে মনে করিয়া তার দাছর জন্ত বাবার পাঠিয়েছে তাহা শুনিয়া সমীর অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অত্যন্ত আগ্রহ ভরে সে বাবারের পাঠ উমেশের হস্ত হইতে গ্রহণ করিল। তারপর বাবারের পাঠ ঘরের মধ্যে রাখিয়া আশিয়া বলিল “মহুয়া বাসন দিয়া আসিবে এখন।”

উমেশ তাহার কথা রাখা দিয়া বলিল “সেজ্ঞ কি হয়েছে; ওর জ্ঞান হার হবার দরকার নাই। আপনার নাভনী আমাদের যে উপেক্ষা করেছে, তার শব্দ জীবন দিয়েও পরিশোধ করা যায় না। অমন গুণবতী মেয়ে আজকাল দেখা যায় না।”

সমীর প্রথম খুবই গভীর হইল। তারপর নিজেকে মালমালিয়া লইয়া বলিল “সে আপনাদের এমন কি উপকার করেছে যে প্রাণ দিয়া সে শব্দ পরিশোধ করা যায় না। সত্য বলিতে কি মহুয়া যে এতবড় একটা কাজ করতে পেরেছে সেজ্ঞ আমি নিজেকে ধন মনে করছি।”

অবনী বলিল “সে প্রবেশ বাবুর প্রাণ রক্ষা করেছে। যা এখানকার কোন ডাক্তার করিয়াও পারেন নাই।”

সমীর যুহু হাসির ভাণ করিয়া অবনীর মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল “বটে বটে। ব্যাপারটা কি মূলে বসুন ত?”

আজ সকাল হ’তে প্রবেশের ছুইবার বনি হয়—তারপর হ’তে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হায়াতে থাকে। প্রবেশের বাবা একজন কলকাতার মুচিবিক্সক তিনি বহু চেষ্টা করে এখন হতভা হ’য়ে পড়লেন, তখন আমরা মহুয়াকে

ডেকে নিয়ে যাই। সে গিয়ে তাকে আরাম করেছে। জানেন ত প্রবেশ তার বাপ-মার একমাত্র সন্তান।”

সমীর বলিল “এ কথা শুনে খুবই খুশী হলাম। এখন বোধ হয় রাগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হ’য়েছে। মহুয়া এল না কেন?”

উমেশ বলিল “অনেকটা হুহু হয়েছে সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। মহুয়া বলছে আঁর কোন আশঙ্কায় কারণ নাই। একবারে হুহু হ’লে সে আসবে।”

সমীর মনে ভাবিত তা’হ’লে প্রবেশ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। মহুয়ার পথের কটক আমি নির্মূল করিতে গেলাম আর মহুয়া কি না তাহাতে জল সিঞ্জন করিয়া তাহাকে বাঁচাইল। এখন বেধিতেছি কেহ কাহারও ভাল করিতে পারে না।

সকলই আপন আপন ভূমি নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। অহংকারী মাছব কেবল নিজ অহংজ্ঞানে পক্ষিত হইয়া সে গতির প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হয় মাত্র। বাহাতে মহুয়া দ্রবেরে দুর্লভতার নিকট আশ্রয়-সম্পন্ন করিয়া অবশেষে অহুতস্ত না হয় সেজ্ঞ আমি তার ভুল সমাধান করিতে যত্নবান হইলে কি হয়? অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কোন দিন ত পতকে তাহার মধ্যে কাঁপাইয়া পড়িয়া মরিবার জ্ঞান আশ্রয় করে না, বরং তাহার উত্তাপ দূর হইতে ব্রূহাইয়া যায় তার দাহিকা শক্তিরই কথা। তথাপি লাভ পতক সেই অগ্নির মধ্যেই আশ্রয়-সম্পন্ন করিয়া পুড়িয়া মরিবে সেও ভাল তবু নিশ্চয় মানিবে না।

তারপর উমেশের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তা হ’লে উপস্থিত আর কোন আশঙ্কায় কারণ নাই কেন?”

উমেশ উত্তর করিল, “নাই সত্য, কিন্তু সে কেবল আপনার নাভনী মহুয়ার গুণে।”

সমীর এবার একটু যেন আনন্দিত হইল। বলিল, “দেখছি মহুয়া ভেতরে ভেতরে তা’হ’লে অনেক গুণ শিখেছে। আজ আর সে আসতে পারবে না কেন?”

“প্রবেশ একবারে হুহু হ’লে তা তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—কেনম করে ছেড়ে দেবে বসুন?”

সমীর উত্তর করিল “সে কথা সত্য।”



তা কি পারে! সব জানি উদ্দেশ্য বাবু! তবে কথা হচ্ছে কি জানেন আমরা হলাম ছোট ভাত—বেদে। আমাদের মত ঘরের “মেয়ে-সন্তান” যদি বড় লোকের ঘরে রাত কাটায়ে তাতে বড় লোকের কিছু এসে যায় না। গরীবের ভাত কুল ইচ্ছা বাচানো আপনাদের মত ভক্ত-লোকের নিকট বড় কঠিন সমস্যা হয়ে পড়ে না কি? গরীব লোকের অনেক ক্যান্সার বাহু।”

অবনী উত্তর দিয়ে কষ্টে উত্তর করিল “ও সব কি কথা বলছেন? মহাশয় সম্বন্ধ একটা যে কেউ স্বপ্নেও মনে করতে পারে, তা আমি ভাবতে পারি না। অমন মেয়ে কেউ কখনও দেখেছে কি না সম্বন্ধ?”

সমীর হো হো শব্দে হাসিয়া নিতরুণ রজনীর গুহতা ভঙ্গ করিল। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর করিল “উদ্দেশ্য বাবু, আপনাদের চেয়ে আমাদের সঙ্গে আপনার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অভিজ্ঞতাও এ বিষয় যথেষ্ট লাভ করেছে। যদিও আমি তুচ্ছ নগ্নত বেদে। গৃহস্থান, আশ্রয় হীন, ভবঘুরে। তথাপি পৃথিবীর লোকের, দেশের, জাতির সহিত আমার দীর্ঘদিনের জানা শোনা। তাদের নিকট হাতে যা পেয়েছি, যা দেখেছি, তাতে করে অমন কথা না বলে যে অজ্ঞ উপায় নাই। আপনাদের মত কু-চারজন শিক্ষিত ভক্ত সন্তান না ভাবতে পারেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হবেন না, আপনার পানের বাড়ীর লোকেরা হয় ত বহুতরু মনে করা সম্ভবপর হলেও হাতে পাতে, তার চেয়ে ডের বেশী ভেবে থাকেন। আর সে ভাবনাতা গরীবের জন্মই বেশী করে।”

অবনী বলিল, “হাতে পারে আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী কিন্তু মহাশয় সম্বন্ধে সে কথা বাটে না। এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।”

এবার সমীর অবনীর দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি ছেলে মাহুষ। মহাশয় সম্বন্ধে আপনি যে কথা বলছেন, সে বিষয় আপনার বা আমার আপত্তি করবার কোন সরকার নাই। কিন্তু আপনাকে বা আমাকে নিয়ে ত সমাজের মতামত চলবে না।”

অবনী বলিল “আমরা আমাদের কথা অবিশ্বাস করবে, তাদের কথা যে আমাদের মানব, বা বিশ্বাস করব এবং

কোন দৃঢ় মুক্তি নাই। মাহুষের মনের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবার কাহারও অধিকার নাই।”

সমীর বলিল, “আপনার কথা খুবই সত্য কিন্তু কাহো পরিণতি বাল্য, আত্মতত্ত্ব কঠিন। আপনি আশ্রয় যে কথা বলছেন, প্রয়োজনের সময় হয় ত আপনাই নানা অছিলা পেয়েছি যে পরবেন না তার কোন প্রমাণ নাই। আমার কথা ছোট মুখে বড় হয়ে পড়ছে, রাগ করবেন না—সত্য কথা একটু কর্কশ ভাউ জানেন।”

এবার উদ্দেশ্য বলিল, “সমীর যা বলছে, তা বেদের মূখের কথা মনে করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অবনী বলিল, “উড়িয়ে দেওয়া না দেওয়া দিয়ে আমার তর্ক নয়। আমি বলতে চাই, সব লোক কিছু সমান নয়।”

সমীর বলিল, “সে কথা সত্য কিন্তু তার সংখ্যা অতি সামান্য। হাজার করা একটা। যাক আপনারদের সঙ্গে তর্ক করা আমার মত অশিক্ষিত লোকের কর্তব্য নয় তা আমি ভালরূপ জানি। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, এত কথা বলার উদ্দেশ্য কি? স্পষ্টত উদ্দেশ্য আছে। এতদিন ধরে হয়ে ছাচ্ছে যাকে পালন করে এসেছি, যার মান সম্বন রক্ষা করার ভার বিখ্যাত কৌশলে আমার বার্ষিক্য-নত স্বত্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, সে ভারের মর্যাদা রক্ষা করা কি আমার কর্তব্য ও ধর্ম নয়? অশিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্যজান ও ধর্ম যে থাকতে পারে, এ কথা হয় ত ভুল সমাজ মানতে না পারেন। কিন্তু আমরা মানেতে বাধ্য।” এই বলিয়া প্রসঙ্গটা যেন অগ্নি দিকে ঝিরাইবার জ্বল সমীর জিজ্ঞাসা করিল “আপনারা কষ্ট করে আমার জ্ঞত খাবার বয়ে নিয়ে এলেন কেন? মহাশয় আপনাদের কষ্ট না দিয়ে একটা চাকর পাঠিয়ে দিলে আপনি নিজে গিরে খেয়ে আসতাম।”

অবনী বলিল, “এই দেখুন ত, আমরা খাবার নিয়ে এসেছি বলে আপনার ভাল লাগছে না। এটা এমন একটা কাল নয় যে চাকর দিয়েই করাতে হবে? আমরা যদি এদিয়ে আসি, অমনি আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে উঠেন কেন বলুন ত! আপনারা নিজে দূরে সরে গিরে আমাদের উপর অবিশ্বাস করবেন না।”

সমীর বলিল, “আপনার মত লোক সবাই নয় একথা কুদলে চলবে না। আচ্ছা ধরুন, কাল যদি মহাশয়ের সম্বন্ধে বড় লোকেরা একটা মিথ্যা কলম রটনা করে। ছদ্মনি পুরে আপনারা চলে যাবেন। তখন মহাশয় মত মনের জীবনটা কি একটা অভিশপ্ত জীবন হয়ে পড়বে না। কোন নারী তার সত্যিকার প্রমাণ করবার জ্ঞত নীতার মত ঘিরি পরীক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া শ্রেয়ঃ এ কথা মনে করিতে পারেন না কি! একদমের জীবন রক্ষা করার মধ্যে নিজের জীবন দান করার যে প্রয়োজন কেমন করে, কেন হয় তা বোধ হয় বৃকতে পারছেন? মহাশয় যে এতটুকু কলম এ বৃদ্ধ মিথ্যা হলেও সহ্য করতে পারবেন না। তার অপমান নিপীড়িত মত মূখের কাভর দৃষ্টির দিকে চাইবার পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত আলো! আমরা স্ট্রীর নিকট চির বিদায় নেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”

অবনী উত্তর করিল, “আর যদি তারা আপনার মহাশয়কে সন্মানের সঙ্গে সমাধির করে গ্রহণ করে?”

উদ্দেশ্য জ্যোৎস্নালোকে বেগিল সমীরের চক্ষু আনন্দে হীরাবের মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বল জ্বল করিতেছে। সে নির্মলা হইয়া এক দৃষ্টিতে অবনীর মূখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর মিল না। একটা অজানা অসহ্য-ভূতপূর্ণ আনন্দের আঘাত যেন তাহার রসনার নিকট আনিয়াও আসিতেছে না। সে যেন তাহাকে প্রাণপন শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া জীবনের অনাধারিত খাঁ মিটাইয়া লইতে চাহে। ভগবান কি তার সে বাসনা পূর্ণ করিবেন না?

উদ্দেশ্য সমীরকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তা’হলে কি মহাশয়কে আজি রাত্রিতে এখানে রেখে যাব?”

সমীর বলিল “না, না। আর আমার কোন কথা বলবার নাই। প্রবেশ্য বাবু বেশ স্থর হলে তাকে পাঠিয়ে দেবেন। তার ভাণ্ডে যা আছে তাই হবে, অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছে। আপনারা আহ্নন। পাহাড়ে বেশ, জঙ্গল জানোয়ারের ভয় আছে। চলুন, আপনাদের একটু উদ্দেশ্য দিয়ে আসি।” বলিয়া সমীর একপাখি

বড় লাঠি হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি বলিল, “জ্যোৎস্না রাাত্রি। আমরা ছুঁজন আছি। কোন ভয় নাই। আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না।”

সমীর সে কথায় কর্পাত না করিয়া তাহারের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেপন পর্যন্ত আসিল। পথে আসিতে আসিতে সে বলিল, “এই বাবুটির কথায় বড় আনন্দ পেয়েছি। আপনারা আর কতদিন এখানে থাকবেন? তারপর উদ্দেশ্য বাবুর মূখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ বাবুটি বোধ হয় সম্প্রতি এসেছেন?”

উদ্দেশ্য বলিল, “হ্যাঁ।”

ষ্টেপন হইতে তাহার সমীরকে বিদায় মিল।

সমীর নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে হুটীরে ফিরিল।

হুটীরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অবনীর কথাগুলি আলোচনা করিতে সমীরের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। বেশ ছেলে। খুব উন্নত মন। কথাগুলি কি মিট! এ কষ্টবহের সঙ্গে যেন মহাশয় কষ্টবহের অনেকটা মিল আছে। ছেলেটির কথাবার্তা শুনে কেমন আপনারা হইতে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। এদের কথায় উপর বিশ্বাস করিলে বোধ হয় প্রতারণিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এরা কি সত্যই আমার মহাশয়কে সন্মানের সহিত গ্রহণ করিতে পারিবে! না। পারিবার ত কোন কারণ নাই। মহাশয় তা আর ছোট ঘরের মেয়ে নয়—তারা পূর্ণ মহাশয়কে সন্মান দেয়। আমিও তখন সকলের সমুখে মহাশয় সন্মান পাবার দাবীকে প্রমাণ-স্ব গ্রহণ করিব। সে দেখিল মহাশয় যেন রাজস্রাণীর মত সন্মানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার বেদে জীবন দুইটা পুছিয়া গিয়াছে। সমীর যেন ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া মহাশয়কে বকে টানিয়া লইতে আনন্দে অগ্রসর হইতেছে; অমনি কে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল তোমার বেদে-জীবন লইয়া ওখানে যেয়ো না। সমীর চমকিয়া উঠিল। যমকিয়া ঠাড়াইল। এবার তাহার মনের মধ্যে কেমন কত শত শিক্তি সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছে। সে জীবনে কত শত শিক্তি ভক্তলোকের জঘন্য আচরণ দেখিয়াছে। কত শত



সতীরমণীর সতীত্ব অমান্য করিলে চিরদিনের জন্ত নিজ ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নষ্ট করিয়াছে। তাহাঙ্গিকে প্রতারণা প্রবন্ধনার ভুলাইয়া শেষে জীর্ণ পত্নের মত পথের মাঝে অনাধীনে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরীক্ষকে বিশ্বাস করা যত সহজ ভুললোকে বিশ্বাস করা তত সহজ নয়। এরা যদি মহুয়ার সঙ্গে সেইরূপ প্রতারণা করে! তার আর বিভিন্ন কি? তার মনের মধ্যে একটা দারুণ যুগ্ম জাগিয়া উঠিল। সে প্রেরিত আধারা দ্রব্য স্পর্শ করিল না। দেখানকার বাধার যেমন ভাবে ছিল ত্রিক সেইরূপ ভাবে সেখানে পড়িয়া রহিল। তার মনে সন্দেহ হইল এরা যদি আমাকে কিছু না বলিয়া মহুয়াকে ভুলাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। সে জন্ত হয় ত

তাগরা এই আধারের সহিত বিষ প্রয়োগ করিতে দিয়া বোধ করে নাই। সে তার নিজের ব্যবহার অরণ করিয়া চমকিয়া উঠিল। সমীর সে রাক্ষসে আহার ত করিল না বরং সাধা রাতি অনিদ্রায় ঘাপন করিল। মহুয়ার জন্ত তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রক্ত আর নিজেকে সম্মত রাখিতে পারিল না। তখনই মহুয়াকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। প্রবোধের বাড়ী পঞ্চাশ গিয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাপ পাতিয়া পাড়াইয়া রহিল। কাহারও সাড়া না পাইয়া সে অবশেষে প্রার্থের আগ্রহে ডাকিল “মহুয়া।”

দৈশ নিতক অন্ধকারের মধ্যে সে আহুল আস্থান কোথায় ডুবিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

## কালাপাহাড়ী

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

মন্দির ভেঙ্গে যায় গড়াগড়ি  
মসজিদ পুড়ে ছাই,  
দৈত্য দানব নাচে তত্ত্বগরি  
কোথায় দেবতা!—নাই?

নিভেছে প্রাণী দরুণা বেউলে  
জগেনা'ক আলো আর,  
ভায়ে ভায়ে করে, বেহ প্রীতি ভুলে—  
শযতানী ব্যবহার!

শত্রু হাসিছে, পাড়ায়ে অদূরে  
দেখে সবে, বলে আর—  
‘স্বরাজ’ আসিল ভারতের দ্বারে—  
শেষ হ'ল ভাবনার!

অভাগ্য ভারত সন্তান তোর।  
হিন্দু ও মুসলিম;  
আপশাষ আজ, বৃদ্ধি দেবি মোরা  
একি ভুল করলেম;

ওই,—আসে মধুমাণ আসিছে ইন্দু  
ভায়ে ভায়ে হোক মিল,  
ভুলিও না পুনঃ গগো বৃহদ  
(সে) ভালবাসা অনাবিল।

পাড়াও হিন্দু মুসলম ফিরে,—  
সাম্য পতাকা মূলে।  
এক মার ছেলে এক হ'য়ে যারে—  
বিবাহ বিভেদ ভুলে।

(তোরা) ভাঙ্গা মন্দিরে দেবতা আনিয়া  
করু পূজা পুনরায়।  
পোড়া মসজিদে নামাজ পড়িয়া  
ডাক কেঁদে আলায়।

যা হবার হ'ল, লয়ে শুধু তাই  
আর কেন মিছে গোল।  
(তোরা) ‘রাম’ ও ‘রহিম’ এক থেয়ে ভাই  
একবার আঁখি খোল।



ষ্টারে শ্রীকৃষ্ণ



শিশুপাল—শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসানন্দ মুখোপাধ্যায়।



অতি—শ্রীমতী নীহারবালা।





## জলপাইগুড়ীতে নাট্যমন্দির

ভাড়াই সম্প্রদায় গত ২৫ তারিখ হইতে এখানে অভিনয় করিতেছেন। সীতা, চন্দ্রগুপ্ত, আলমগীর, চাটুর্ঘ্যে বাজুঘে ও বসন্তলীলা প্রভৃতি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় হিসাবে টাকা বোজগার আশাতীত হইয়াছে। প্রত্যহই বহুদর্শক রত্নমণ্ড পরিপূর্ণ থাকিত। ভূমিতেছি এখানে নাকি নাট্যমন্দিরের একটা শাখা (Branch) বোলা হইবে। উদ্দেশ্য সাধু!

কলিকাতা হইতে কোন লোক মকঃখলে আসিলেই নিজেই কেবন একটু বেশী 'চালাক' বলিয়া মনে করে উক্ত সম্প্রদায়েরও তাহাই হইয়াছে। তাহারা এটা সত্যনিষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন যে 'বাঙ্গাল' আর্টের কি বৃত্তিবে।—আমরা তো তাহাই কাটিব।

রংমের ভূমিকা জলপাইগুড়ী আশাহুস্তপ উপভোগ করে নাই। বায়ীকি বতকটা। ত্রিশবৎসরারিক লব কুশের ভূমিকা দুইটা অনেকটা মিলিতারী জির হিসাবে আঁট বটে। বাকী সবই অখাভ। চাপকোর ভূমিকার শিশির বাবু নৃতনত্ব বড় কেহ উপভোগ করিতে পারে নাই কেবল আরোয়ীকে কভারপে পাওয়ার দৃষ্টটা ব্যতীত। বোধ হয় অ্যালানফ্রড রত্নমণ্ডের চাপক হইয়া অপেক্ষা উন্নত ছিল। প্রথমে 'বুদ্ধি' চাপকোর 'স্বন্দরী বীভৎসতে'—পরে যে বুদ্ধির নগ্ন নৃত্তি দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ

করিল—চাপকোর এইরূপ চরিত্র অরনের সার্থকতা সমাক ব্যর্থ হইয়াছে। চাপক্য বুদ্ধির উপাসক—তাহা অভিনেতা মাখাটা দুই হাতে ধরিয়া বুকাইলেন সত্য কিন্তু পূর্বাঙ্গের সে কল্পনার ছবি টিক করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কভারমের ভূমিকায় নরেশ বাবুর অভিনয় খাপছাড়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে যেন বেশ একটু 'হাতার' ও 'শহুনীর' গন্ধ পাওয়া গেল। চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় রবি বাবু ও সেনুসের ভূমিকায় অমিতাভ বাবু চরিত্র দুইটাকে 'হত্যা' করিয়াছেন। বাকী সবই 'ছেঁড়া কাগ-জের টুকরীতে' ফেলবার যোগ্য।

মনোমোহন নাট্যমন্দিরের আলমগীর হইতে জলপাইগুড়ীর আলমগীর অনেক কম জোড়ী—বোধ হয় ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির জন্ত। উদিপুরী—শ্রীমতী প্রভা। তাহারা নাট্য-জগতের কোহিসবের উদীপুরীর অভিনয় দেখিয়াছেন তাহাদের মতে জলপাইগুড়ীর উদিপুরীর অভিনয় 'ব্যঙ্গাভিনয়' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মোটের উপর প্রত্যহ তিন টাকা খরচ করিয়া একপ আঁট খোরার চেয়ে সেই টাকার আম, সন্দেশ যেকৌ Artistic হইত তাহাতে বিদ্যুন্মাদ সন্দেহ নাই।

ইতি—  
বাঙ্গাল দর্শক।



দ্বিতীয় বর্ষ ]

৪ঠা আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩, ইং ১৯শে জুন ১৯২৬

[ ৪৪শ সংখ্যা ]

অপরোধী

শ্রীলীলাদেবী

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার পেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আকাশ আমারে অপরাধী বলে দিতেছে যৌন তাড়া  
বাতাস আমারে অপরাধী বলে দেয় না কথার সাড়া !  
মলর অনিল পরশ করে না পাছে সে পতিত হয়  
অপরাধী চোখে হয়নি এবার নব বসন্তোহার !  
বরক নম্র, কিশলয় রাগ লুকাল বিটপী গায়  
নব মধুরী, কবিকা মরি ! লুকাল পারশ ছায়।

পশাশ পাঙ্কল পিগাল বিধুর নবহুসকক আর  
গোলাপ কামিনী করবী মধুর জোগায় না উপহার !  
তুলে গেছে তারা হৃদয় সাধনে তুলিতে আমার মন  
তুলে গেছে তারা মালার বীধনে সাদর সম্ভাষণ !  
তোলা নয় ওগো অপরাধী বলে রাগ ক'রে হ'ল তুল  
মন আঁচলার আবারে আনন অশোক ডালিম ফুল !

আমি মুহুর, আমরুল ফুল না করে ইয়ারা মোরে  
ফুলত নিম্ন বাতাসে উকি দেয়না সোণার ভোরে  
চন্দ্র মল্লি, বহুল বকী, ডাকে না ধোলায়ে হাত,

মুখ টিপে আর হাসে না মাধবী—মন্দির জ্যোছনা রাত !  
শব্দী হৃদয়িনী মুখছিয়া থাকে ত্রাসল সবুজ বনে  
অপরাধী বলে একটিও কথা কখনা আমার সনে !

জাক রাগী মেঘ ভয়ে ভয়ে যেন পান শকেটে ভেসে যায়  
তরুণ হৃদয়, চাপা হৃদয়, মুখ তুলে নাহি চায়  
হুসতি আঁকুল বনগুণ্ড ছোট তুল ফুল সেও  
আড়চোখে চেয়ে ঘুরায় আনন রাতা রাধা চুড়ান্তেও  
কোফিল ফুলন ভরে অহুহন নীরব তিরস্কারে  
গুচ্ছ অভিযোগ জানায় বৃষ্টি বা বিশ্ব রান্ধার ঘারে !

গজনা দেয় শোনায় না গান চন্দনা শারী শুক  
খজনা দিতে তুলে গেছে তাল, তামা হয়ে গেছে নুক !  
ছড়ায় না শীঘ্র ধোয়েল পাণিয়া, গুজরে নাক অলি  
মুখ ভার ক'রে চেয়ে আছে মুগে মূখর বনফুলী !  
নিশীথিনী এসে অভিমানে কভে কভে সনা দিয়ে যায়  
অপরোধ কেউ করে নাক কমা, ধরি কত তবু পাখ !





## ভাব সপ্তক

শ্রীঅশেষচন্দ্র বহু বি, এ

১ অবসর

শরতের নির্দল প্রান্তে একটা তরুর সমুখে উপবিষ্ট ছিলাম। সমীরণের একটা হিলোল আসিল; অমনি কতকগুলি পত্র বৃষ্ণভূত হইয়া বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে মাটিতে আসিয়া পড়িল। তরু আর তাহাদের স্থান ছিল না, তরুর ছায়াও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মায়ীরা লইল। প্রকৃতির আনন্দময় প্রভাষ পুরাতনের স্থান কোথায়? নিরুপস্থিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তার নিত্য প্রাণধন। প্রাচীন হটনই তাহার অবসর এবং তাহার স্থানে নৃতনের প্রতিষ্ঠা। তাই দেখিলাম পুরাতন পাতাগুলি কত মায়া মমতায় সহিত বীরে বীরে তরুলে, নামিয়া আসিল। বনের মাঝে বসন্তের আনন্দময় শব্দগুলি শুনিবার পূর্বেই তরুর সহিত যেন তাহাদের চিরদিনের মেঘবন্ধন ছিন্ন হইল। তরুর সহিত গুহের যে আচ্ছন্ন বন্ধন তাহার আবার ছেদন কি? প্রাচীনতার স্থান নৃতনের প্রতিষ্ঠান হইবে বলিয়া। বিটপের স্তম্ভস্থান আবার মরকতময় হইয়া উঠিবে। কত নবীন অঙ্গুর নীবারবিন্দুতে যান করিয়া আয়োকের অঙ্কে শৈশবের অঁখি দেখিয়া চাহিবে। আবার শাবীর নবযৌবন আসিবে। কত বিহগ তার ঘনচ্ছায়ায় বসিয়া উৎসব গীতি গাহিবে। গায়ে পুনরায় হেমন্তের সেই নিরাকরুণ শর্শ। সে শর্শে পাদপ শিহরিবে, আর তার নকল সৌন্দর্য্য আবার মাটিকে করিয়া পড়িবে। প্রকৃতির চিরস্থান নিয়মে পুরাতনের পর নৃতন এবং নৃতনের প্রান্তে পুরাতন। প্রাচীনতার মৃত্যু এবং নবীনতার জন্মস্থান যেন সর্বত্রই পুরস্কার সমিতি।

২ পুত্রশ্রোণ

কিছুদিন পূর্বে হেলেন অগ্নি করিতে করিতে দেখিলাম

বনের মাঝে একখানি হুটীর আগুন লাগিয়াছে। তখন রজনীর প্রথম যাম। ঘন তমিষায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন। সেই ভীষণ আঁধারেব মাঝে দেখিলাম একটা হুটীর ঘীরে ঘীরে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বহু বহু সোকের কত চোঁ সবেও আগনের তেজ কমিল না। ভিতর হইতে যেন শত জালাময়ী শিখা আসিয়া সকলের প্রাণ লুপ্ত করিয়া দিল। আর সে দিন আমারই গৃহের পার্শ্বে আর একটা গৃহহাং দেখিলাম। দেখিলাম একটা নবযুগী তাহার জগতের মাণিকটাকে হারায়া ফেলিয়াছে। তার শোক-বহি এত প্রবল, তার দুঃখের জ্বালা এত তীব্র, যে সে উচ্চক্রন্দন তুলিয়া গিয়াছিল। নয়নের কোণে তার একবিন্দুও অশ্রু ছিল না। বৃকের মাঝে তপস্বী সাহায্য উচ্চবায়ুর মত তার জ্বরটিকে দহন করিতেছিল। হরনে সব ভগ্নশাং হইয়া গেলে ভিতরের আগুন যেনে গুহরিয়া পুড়ে, তার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। যেন বিঘাতার শাপে তার যথের নিঃকুলিয়া প্রায়ই পও ছুইয়া গেল। যে গৃহে তার সোণার বাছাটিকে সে অশ্বথের সম্য ভক্ষণ করিয়াছিল সেই গৃহে সেই শয্যার উপর শুইয়া সে অন্তর নিঃস্রাওয়া করিতে লাগিল। কত সোকের কত সাধনা তার শোককে প্রশমিত করিত পারিল না। সে যেন সর্বকথাই লাবণ্যে ধুয়ায়মান কোন বনশরীর মত প্রতীয়মানা হইতে লাগিল। তরু তার মূলস্ফোনের নৃতিটিকে বক্ষে ধরিয়া জগতের শোণিতে তাহার তর্পণ করিতে লাগিল। অদৃশ্যপাতের পর আশে-গিরির যে অবস্থা হয় যুবতারও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। প্রান্তরে যিনি যেমন একান্ত বৈরাগ্যবান তার শোকের অবস্থাও সেইরূপ। তার বর্ষার যেন কাটিয়া গিয়া আর যে কখনও আনন্দের আলোককে আসিতে পারে এরূপ যেন বোধ হইল না।

বিতীয় বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা]

ভাব সপ্তক

১৪৫১

৩ বার্ককা

একবার গঙ্গার তীরে চড়ার উপর কতকগুলি নৌকা দেখিয়াছিলাম। সেগুলি ভগ্ন বলিয়া সৈকতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কেহ তাহাদের সংস্কার সাধনে ইচ্ছাবান হই নাই। জল বায়ু ও বোরের গুণে তরীগুলি জীর্ণবাস্য প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে পাইয়াছেছিল। আর সেদিন এক বৃষ্ণক দেখিলাম। জীবনসংস্রোতে সেও জীর্ণ-ধ্বংসগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া বৃষ্ণ নিরল্য ভাবে প্রতিক্ষেপে যেন হুয়ার প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহার নমন দুটা অঙ্গ; ভ্রূবর্ণের দ্বার রক্ত; দন্ত বিগলিত; বেশ পলিত। অস্তরের আশা, মনের উত্তম, জগতের ভগ্না, বায়ুর তেজ, বাহ্যর বল আর নাই। দেহ শক্তিহীন; চিত্ত ক্ষতিহীন। কত বিবাহ চিত্তা কালবৈশাখীর কাল যথের মত তার মনটিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। মলিন গৃহে তার বাস, মলিন তার মন। পেরের কল্পণার উপর তার নির্যাসের ছায়া। কি ভীষণ অবস্থা! সে যেন মসিগর্ভে দ্বিষ্ট নির্যাসের পটে একখানি নৈরাশের প্রতিকৃতি। তাহাকে দেখিতে দেখিতে ভাবিলাম যেন তার মন তার যথের সহিত কাঁচের তৈজস পদের মত ভাঙিয়া চূর্ণ চির্ণ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ কবি কাউপারের (Cowper) দৃষ্টি অ্যাগোয়ে (Cast away) নামক কবিতাটা তাহারে ভাসিয়া উঠিল। সেখানে দ্বৈতের বীণায় হঠাৎ সুর যেন হীরাপেকাও ফুটতর হইয়া ঝঙ্কার তুলে নাই। কি কল্পাতোক্ত ভাব! আবার শৈশবের প্রত্যাবর্তন ও বৃদ্ধির ক্রমিক প্রতিরোধ। সামর্থ্য-হীনতার পরম্ব্যাপেক্ষ রূপ কিশল ভয়াবহ দারিদ্ৰ্য। অন্ধরে আচ্ছন্নপ্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া এই শেচোনীয় নির্ভর-শীলতা। দিন থাকিতে আপনাকে চিনিলে তার এত কষ্ট লাগিত না। মনোবৃত্তি অস্বস্তী করিতে চেষ্টা করে নাই; তাহা বহির্বিধী থাকিয়া এবং দুর্য্যাক ভ্রূবর্ণের মত যথেষ্ট গমন করিয়া আজ তাহাকে সন্মুখের করিয়াছে। নিজের ভিতরে যে অন্তর্গত তাহাকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণশক্তির অপচয়ে সে আজ চিরবৈরাগীর মত দুর্দল।

সেই শ্রামায়মান রজনীমুখে, আঁধার আকাশের তলে, বনের আঁধারে, মনের আঁধারে, রিক্তরসে, শূন্যপ্রাণে, আকুলপথে, নিরাশভাবে জীবনসংস্রায়ে প্রান্তে বসিয়া সে যেন মৃত্যু মেঘনার একটা তরঙ্গের অপেক্ষা করিতেছিল।

৪ চেতনা

প্রান্তের বলাকি ক্রমে গারাবত সবল আকাশে উড়িতেছিল। শরতের নির্দল-গগনপটে, বরির তরুণ আলোকে তাহাখিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেত বিন্দুর মত দেখাইতেছিল। যেন অনন্ত নীলাবুধির বক্ষে সুন্দ-সুখমের শ্রেণী। কি অভিনব সৌন্দর্য! দেখিতে দেখিতে অভিনব প্রাণশক্তি চিত্তা চিত্তকে অধিকার করিল। আবার প্রায় সর্বত্রই দেহাঙ্ক বুদ্ধিতে জড় জগতের ব্যাপারে নিবিষ্ট থাকি। স্থূল ছাড়িয়া যথেষ্ট বা ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে গমন করিতে পারি না। আমরা বিতমসবন্ধ বিহণের মত। রিপূর দাশ হইয়া দেহ-মনের সংযোগে আমরা সর্বত্রই ব্যস্ত। দেহ যন ছাড়িয়া আশ্চর্য্য পবিত্র রাজ্যে,—সে পুণ্য ভাবালোকে, গমনের চিন্তা করি না। অজ্ঞ যে আশ্রয়-নিধির হৃদয় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমরা যে ইচ্ছার সেবা করিতে আশ্রয় অমূল্য সম্পদ হারাইতেছি সে কথাও ভাবি না। কিন্তু সময়ে সময়ে সাধারণ জগতকে ব্যাপারে, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে, এমন এক একটা ঘটনার সংঘটন হয়, যে তাহার স্বল্প অধ্যয়ন বা নিমিত্তের লক্ষ্যই আমাদের চিত্তে ভাব্যবস্ত উপস্থিত করে। আমাদের মোহের স্বপ্নি ভাবিয়া যাও চিত্ত পরিত্যক্ত হইতে থাকে। তখন আমরা বুদ্ধি যে আমরা ব্রহ্মের জড় নয়। মাতীর দেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমরা সুখের পুতুলি নয়। আমরা অজর অমর চিরম আত্মা; আমরা নিত্য সত্য বৃদ্ধ মুক্ত ভাবের ব্রহ্মাণ্ডে। মাতীর পায়ে যে অগ্নি সেই অগ্নিই আমরা। সেই অগ্নিতেই আকার প্রাপ্ত হইয়া সারাব অনল ধারণে সক্ষম হইয়াছে। আমরা শুণু জড়ের নিমিত্তেই অস্বস্তি। আমাদের মধ্যে অসীম শক্তি, অপরি-মিত্ত বল; কিন্তু আমরা পানবন্ধ কল্পেপীর মত। আমরা মায়াবদ্ধ। মায়ার নিমগ্ন ছেদনে অক্ষম, ইত্যাদি স্বরূপ







তবে মুখে হাসি আসে।" উন্মাদের কথায় আমি নীরব হইয়া পেশাম। ভাবিলাম মেদিনী যাহাদের নিকট মন্তব্য অবনত করিয়াছিল বীরপুরুষ সেই আমোদকজাগার, নীহার, গীটার, ফেডারিক, নেপোলিয়ন প্রভৃতিরা কি কখনও মনের মত প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারিয়াছিলেন! পৃথিবীতে যাহাদের আমরা যত বড় বলিয়া মনে করি

তাহারা ততই হুঃখরূপ 'পোছারের' নিকট হুঃখকর্ক করিতে গিয়া হাসিকে উচ্ছ্বাসের কুসীল রূপে প্রাপ্তপন্ন করিয়া থাকে। সেই অবনি পাগলকে কত বুদ্ধিবিদ্ধি তাহার হাসি দেখিতে পাই নাই; আমিও কতবার হাসিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কখনও সেরূপ হাসিতে পারি নাই।

## জাতীয় উন্নতি

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

কিছুদিন হইতে ভারতের প্রায় সকল স্থানে সকল ক্ষেত্রে যেন মনোমালিন্ত অতিরিজ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কি রাজনৈতিক কি সাম্প্রদায়িক কি সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই সঙ্কামক ব্যাধির ভায় উক্ত মনোমালিন্ত প্রসার লাভ করিতেছে, অথচ ইহার প্রতীকার করে চেষ্টা খুব কম স্থানেই সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এদেশে জাতীয় উন্নতির পক্ষে ইহাই আজ প্রধান প্রসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদ পত্র পাঠে দেশের অবস্থা যতটা জানা যায়, তাহাতে মনে হয় শিক্ত উন্নত শ্রেণীর লোকের অসহিষ্ণুতা স্বাধীনতা এবং আলততা নিবন্ধন দেশ লক্ষ্য পক্ষে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অবশ্য সকল শিক্ত লোকের উপর উক্ত দোষ আরোপ করা যায় না।

এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় লোক বাস করে, এবং তাহার মধ্যে অশিক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক একথা সকলেই জানেন; সেই সব অশিক্ত লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করা এই মনোমালিন্ত দূর করিবার একমাত্র উপায়, কিন্তু একেবারে অতগুলি লোককে শিক্ষা দেওয়া খুব সহজ কাজ নয় এবং তাহা ছাঁচার দিনে হইবার কাজ নয়। তবে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত কতদিনে যে অসীম দিক হইতে পারে এবং শক্তি

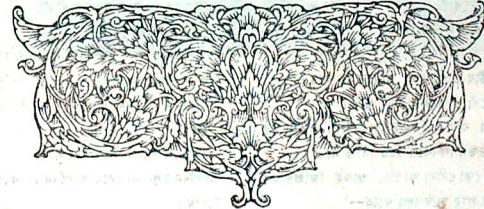
যাহাদের আছে তাহাদের পরিতালিত করিবার—যাহারা শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক পূর্বেই লাভ করিয়াছেন, তাহারা যদি নিয়মিত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে উত্তেজনার প্রসার লাভ করিতে না দিয়া তাহাদের সংযত করিবার চেষ্টা করেন এবং দেশের উন্নতিকামী পেশনায়কগণকে মাত্র করিয়া চলিতে শিক্ষা দেন তাহা হইলে অনেক বিষয়েই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার তাহাদের সহিত সম্ভবসম্ভব কার্য করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আজকাল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যাহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ এত প্রবল যে, দেশের উন্নতি অপেক্ষা নীত্য নুতন দল গঠন করিতে তাহারা বেশী কার্যতৎপরতা প্রকাশ করেন, এবং অনেক হুঃত আবার নিজের মতও হুঃ অঙ্গলিন অন্তর পরিবর্তন করিতে ভালবাসেন। যে অপরিণীম ত্যাগ ও অটল কর্তব্য জ্ঞানের দ্বারা জনসাধারণের মনে নেতৃত্বের প্রভাব বিকশিত করা যায়, সেদুঃ আদর্শও আজকাল খুব কম নেতার মধ্যে দেখা যায়।

স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মনোমালিন্ত বুদ্ধি হওয়ার দরুন দেশে ক্রমশঃ যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। আজ যদি সকল নেতারা মিলিত হইয়া একটী মেল দল গঠন করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দেশের

স্বাধীনতার জন্ত বন্ধপরিকর হইয়া অগ্রসর হইলে, তাহা হইলে কাল তাহারা নিশ্চয় অসীম শক্তিশালী বুরাজেন্দ্রী উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে পারেন। এবং সেই সঙ্গে, মহাশক্তির রাজনীতিক্ষেত্রে হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার কারণও বোধ হয় অপসারিত হইয়া যাইতে পারে।

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল যদি সেই একমাত্র দল হয় তাহা হইলে, সেই অপূর্ণ ব্যক্তিবংশের মহান দেশ-নাযকের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করার জন্ত সকল নেতৃবর্গই অচিরে জনসাধারণের অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া এখনও দেশের এই দারুণ দুর্দিনেও যদি সকলেই আপন আপন স্বার্থও মত দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সাধারণের নিকট তাহাদের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিবে। কারণ যাহারা দেশের জাতীয় তরঙ্গীর কর্ণধার তাহারা যদি একেবারে পরিবর্তে বিরোধ সৃষ্টি করেন এবং দেশের অপেক্ষা আপনাদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখেন, আর নিয়মিত ব্যক্তিরের বড় বড় কথাই বলেন, 'সকলে মিলিত হও, সম্ভবসম্ভব হওয়া ব্যতীত দেশের উন্নতি নাই ইত্যাদি' তাহা হইলে সেদুঃ উপদেশে কোনো উপকার হওয়া সম্ভব নয়; কোনো মা যদি কলহপ্রিয় ও হিসাব পরায়ণ হইয়া, নিজের ছেলেকে শিক্ষা দিবার সময় বলে, 'বাবা কাহারও সহিত বিবাহ করিতে নাই হিংসা করা বড় দোষ', তাহলে সে-মাঘের শিক্ষাও তেমন কলহপ্রিয় হয় না। উপরন্তু ছেলেরও জ্ঞানোদয়ের

সঙ্গে সঙ্গে মাঘের আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কমিয়া আসে। সুাধনা ব্যতীত কোনো কার্যেই দ্বিধি লাভ হয় না। এতাবৎ 'কাল যাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কর্ণধার রূপে কার্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই মহান ত্যাগের স্ফূর্ত্ত ভিত্তির উপর আপনাদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই জন্ত আজও তাহারা সাধারণের দ্বন্দ্বের জ্বিতের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। ভারতের নৌজাগ্যক্রমে আজও যাহারা নেতৃত্ব করিতেছেন তাহাদের মধ্যেও কয়েক জন দেশ নাযক আছেন, এবং এখনও তাহারা পূর্বেই মত মিলন প্রয়াসী, কিন্তু সকল নেতৃত্বের সহিত তাহারা সম্মিলিত হইতে না পারায়, অনর্থক বলস্বয় হইতেছে এবং দেশের বিশেষ উন্নতি সকলের নিকট পরিলক্ষিত হইতেছে না। এ সকল কথা অবশ্য সকল নেতৃত্ববর্গই আমার অপেক্ষা ভাল জানেন, এবং হয় ত তাহাদের সকলের মিলিত হইবার পথে এমন কোনো অন্তরায় আছে যাহা অতিক্রম করা সহজে সম্ভব নয়। কিন্তু একথা কেহ অস্বীকার করেন না বোধ হয় যে, যাহারা দেশের উন্নতির জন্ত ও পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত কঠোর কর্তব্য পথে সাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাহাদের সময়েই শ্রদ্ধালাভ লাভ করিয়া আপন গরিমার দূতত্বের সহিত নানা হুঃ বরণ করিয়া গীর্ণস্তেজে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের পক্ষে সে পথের কোনো বিষ বাধাই দূরভি গম্য হওয়া সম্ভব নহে। সকল নেতৃত্ববর্গের প্রতি এই সন্তক নিবেদন আমার।







## উপরি পাওনা

শ্রীকৃষ্ণ

"হ্যাঁ তাই বোদি। অল্প বিয়ের কি হল?"  
 "ঠিকঠাক তেমন কিছু হয়নি। তবে একটা সমস্যা এসেছে বটে।"  
 "কোথেকে?"  
 "বৌয়ের বাপের বাড়ী থেকে।"  
 "কি রকম?"  
 "তবে সব কথা ভেঙ্গে বলি শোন।—বৌয়ের এক মামাত বোন আছে। নাম—নিরুপমা। বয়স ১৩ কি ১৪ হবে। পরমা হুম্মরী। লেখাপড়াও কিছু কিছু জানে, গান গাইতে জানে, চরকা কাটতে পারে, আবার সেমিফটা কামিজটা প্রভৃতি সেলাই কর্তেও জানে।—"  
 "মেয়েটাকে নিজের চক্ষে দেখেছ?"  
 "না।"  
 "তবে মেয়েটির গুণের কথা জানলে কি করে?"  
 "আমাদের বৌ বলে কিনা তাই শুনি।"  
 "সত্যি কথা বলতে কি তাই—যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখছি, ততক্ষণ বিশ্বাস কর্তে পাচ্ছি না।"  
 "আজ্ঞা শুই তো বৌমা আসছে, ওকেই জিজ্ঞেস কর না কেন? ওত আর আমাদের কাছে—"

"না-না—তাকি আর আমি বলছি।"  
 বৌবাজার ষ্ট্রটের কোন একটা সাধা বাড়ীতে দুইটা বিখবা জীলোকের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। এমন সময় একটা বোড়শী হুম্মরী যুবতী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পাড়াইল।  
 "বৌমা—তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞেস কর। তোমায় তার উত্তর দিতে হবে কিছু।"  
 বোড়শী আনতমুখে বলিল—"বলুন।"  
 "অল্পর জন্ত যে পাড়ীয়ার কথা বলছে সে তোমার কেউ হয় না কি?"  
 "হ্যাঁ। আমার মামাত বোন হয়।"  
 "বয়স কত? কালো না হুম্মরী?"  
 "বয়স ১৩। আর খুব হুম্মরী।"  
 "তোমার চেয়েও?"  
 বোড়শীর মুখ-কমল রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল।  
 "কি কি কাজ জানে?"  
 "রাখতে জানে, বুনতে জানে, সেলাই কর্তে জানে। চরকা—"  
 "থাক থাক আর বলতে হবে না।"  
 "একদিন চলুন না দেখে আসবেন।" কবে যাবেন?"  
 "দেখি।"

দ্বিতীয় বর্ষ]

নবযুগ

[ ৪৪শ সংখ্যা



"মনো বেদনা"





যোড়শী চলিয়া গেল। একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় যুন্দর  
যাযাবান যুবক হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত  
হইল।

“এই যে অল্প এসেছিল? তোরই কথা হচ্ছিল।  
মত বিবিত? না সেদিনকার মত বৈকে বসবি?”

“কি বলছ পিসিমা? তোমার কথার একবর্ণও আমি  
বুঝতে পারছি না।”

“হা—হা—ভাকামি করিস না। একেবারে ‘কিছু  
হানি না’ বলে অল্প লোকের কাছে পার পেতে পারি,  
কিছু আমার কাছে পারি না। কথায় বলে—

‘যার বিয়ে তার হ’ল নেই।’

পাড়া পড়শীর ঘুর নেই।”

ও—এই কথা—সে, হেবে’খন। এখন পিসিমা যে  
কথা বলতে এসেছি সেই কথা শোন। অনেকদিন  
তোমার হাতের ছোঁলার ভাল দিয়ে কুয়েড়ো শাক দিয়ে  
খাইনি। আজ আমার দত্ত তোমায় রাখতে হবে।”

“সে আমি রেঁখে রাখব’খন। তার দত্তে কিছু  
মাতকাবে না। আমি যা বললাম তার উত্তর দে। ভেবে-  
ছিল যে একথা লেখা বলে আমার কথাটা চাপা দিয়ে  
দিবি, না? কিন্তু তা হতে দিচ্ছি না। আমরা হ’লাম  
‘বাহু’। আমার কথার আগে উত্তর দে তবে তোর  
কত রেঁখে রাখব।”

“তা—পিসীমা—পছন্দ হলোই করা বাবে’খন।” বলিয়া  
যুবক সেখান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

২

সে অনেকদিনের কথা।

কলকাতায় রমেশচন্দ্র রায় নামে একজন গৃহস্থ বাস  
করিতেন। সামান্য পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় তিনি কলি-  
কাতার কোন এক সওদাগরী আফিসে চাকরী করিতেন।  
কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তাহার সংসারে কোন  
জিনিসের অভাব ছিল না। কারণ তখন এখনকার মত  
কোন জিনিসেই দাম এত অধিক ছিল না। তাহা ছাড়া  
তাহার শেখও কিছু ভদ্রমহা ছিল। সুতরাং একপ্রকার  
যেই তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল। ঘরে তাহার

দুইজন পুত্রপুত্রী ছিল। পিতৃভক্ত যুন্দর যাযাবান  
দুইটা পুত্র মাণিকের ভ্রাতৃ তাহার বরখানি আলোকিত  
করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে যুব তাহার ভাগ্যে  
বেশদিন সইল না। নির্দিষ্ট ভগবান তাহার সে যুব  
কাড়িয়া লইলেন। সেবারে দেশময় বসন্তের মহামারী  
ছাইয়া পড়িল। কতলোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত  
হইল। রমেশচন্দ্র সেইরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার  
স্ত্রী বিশেষরী প্রমাদ গণিলেন। মায়াবের বিপদ বধন  
হয় তখন চারদিক দিয়া তাহা আসে। রমেশের কদ  
অবস্থাতেই তাহার ভরী সরোজবালা গুলবর পরিধান  
করিয়া সিঁদুর বিহীন মস্তকে এবং শাখাহীন হস্তে  
তাহার বাজীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার  
সেই অবস্থা দেখিয়া রমেশচন্দ্র—“সরো! তোর শেষে  
এই মশা হ’ল রে।” বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।  
তাহার পর তাহার আর জ্ঞান হয় নাই। পরদিন প্রাতে  
তোর চারটার সময় তিনি ‘হার্টফেল’ হইয়া মৃত্যুমুখে  
পতিত হন।

বিশেষরী ও সরোজবালা অল্প পাথরে ভাসিলেন।  
কি করিবেন? কোনদিকে বাইবেন? কেমন করিয়া  
মাণিকজোড়কে (সমরেন ও অল্পপদের) বাহুব করিয়া  
ভুলিবেন এই চিন্তা তাহাদের মনে উদয় হইতে  
লাগিল।

পেঁখে বোধ হয় ভগবান তাহাদের প্রতি মৃৎ ভুলিয়া  
চাহিলেন। রমেশের এক মাতুল—নাম ভগবীশ—কাপ-  
পুরে ওকালতী করিতেন। রমেশের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া  
তিনি কলকাতায় তাহার ভনীতল্লা লইয়া আসেন  
এবং—“আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন পাথার মত  
তোদের জানা দিয়ে ঢেকে রাখব”—বলিয়া তাহাদের  
সহিত যৌবাক্ষার ষ্ট্রীটে একটা বাসা ভাড়া করিয়া অব-  
স্থান করিতে লাগিলেন। রমেশের ভ্রাতৃ পুত্র সমরেনের  
বয়স ৮ বৎসর, পুত্র আর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ অল্পপদের  
বয়স মাত্র এক বৎসর।

সমরেন কলিকাতার হোয়ার স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিল  
এবং আট বৎসর পর্যন্ত মনোযোগের সহিত অধ্যয়নের  
পর সমরেনের সহিত সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।



তাহার নয় ক্রমে ক্রমে সে আই-এ, বি-এ, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইল। তাহার ঠাকুরদাদা তাহাকে আর ঐ সাধারণ লাইনে অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি সময়েক একালতী পড়িতে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য সে ওকালতী পরীক্ষায়ও সম্মানে উত্তীর্ণ হইল। এখন সে হাইকোর্টের একজন প্রথমস্ত্র উকিল। যথাসময়ে ঠাকুরদাদা একটা স্বন্দরী রূপবতী বালিকাকে তাহার সান্নিধ্য করিয়া দিলেন। সান্নিধ্যের নাম—লক্ষী। গুণেও লক্ষী। রূপেও লক্ষী।

অনেকদিন অতীত হইয়াছে অল্পম এখন পূর্ণ বয়স যুবক। একদিন সন্ধ্যা বেলা অল্পম একটা 'অর্পেনো' বাজাইয়া গাহিতেছিল—

“শরতের আজ কোন অতিথি  
এল প্রণের ঘরে।

আনন্দ গান গা রে হৃদয়  
আনন্দ গান গা রে।”

এইটুকু গাহিয়াই সে চুপ করিল এবং গানটীর শেষ কর লাইন মনে না থাকতে সে অল্প গান বরিল,—

আমার পাগল বাবা

পাগলী আমার মা।

আমি তাদের পাগলী মেয়ে,

আমার মাবের নাম স্ত্রীমা।

বাবা বর বনু বলে—

এমন সময় লক্ষী কনফাঙে গৃহবাণী মূর্তিত করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিল—

“ঠাকুরপো! হঠাৎ তোমার এখানে পরিবর্তন হ'ল কেন ভাই?”

অল্পম মুখ কিরাইয়া দেখিল যে তাহার বৌদি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। সে ভিজ্জায়া করিল—  
“কি বলছেন বৌদি?”

“বলছি যে তোমার এখানে পরিবর্তন হ'ল কেন?”  
“কি পরিবর্তন দেখছেন?”

“অতিথির অভ্যর্থনা। থেকে একেবারে পাগলের অভ্যর্থনা? এ গভিক ত ভাল নয়।”

“তাতে কি? মাঝে মাঝে গুরুত্ব হয়ে থাকে।”

“আচ্ছা। ওকথা যেতে যাক। আমি ভিজ্জেস কছি যে অতিথি না আসতেই অতিথির অভ্যর্থনা-গান। অতিথি আসলে তখন কি করবে!”

“শাঙ্ককাল অতিথির ভ্রত অভ্যর্থনা-গান না গাইলে অতিথি যে আসে না বৌদি!”

“আগেকার যুগে এরকম ছিল না ভাই। অতিথি ঘরে আসলে তার অভ্যর্থনা করা হ'ত। কলিকালে সব উটে গেছে—না?”

“বেশ বৌদি! কথা বলতে গেলে অনেক কথা বাড়ে। তোমাকে কি ধা—”

“চোপরাও ছুঁ!”—এমন সময় বাহিরে মলের “কমর!” কমর! স্ব!!—“আওরাক ছুঁকনের কর্ণে প্রবেশ করিল।

অল্পম একটু অমনমন হইল। তাহার বৌদি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—“একি ভাই ঠাকুরপো! এরই মধ্যে এরকম হয়ে গেলে? তবে মাত্র—”

“বৌমা! বৌমা!!”

“হাই পিসিয়া” বলিয়া সে অল্পমের দিকে ফিরিয়া বলিল—“ঠাকুরপো! অতিথি বোধ হয় আসছে। আয়োজন করে রাখা। হ্যাঁ—পরন্তু তোমার স্বর্গদেব সকলে তোমার অনেক রকম ভিনিস উপহার দেন, তাছাড়া আবার তোমার একটা আলাদা ভিনিস উপহার হবে। সেটা তুমি তোমার উপরি পাওনা বলে মনে ক'রো। যদি ভাই আমি কান্ধের ভুলে দিতে ভুলেই তাহলে চেয়ে নিতে ভুলো না। লক্ষ্য ক'রো না, ক'রেই ঠকবে। তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।” বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

‘অর্পেনো’টা সরাইয়া রাখিয়া অল্পম টেবিলের ডায়ার হইতে একখানি ‘মাসিকপত্র’ বাহির করিয়া ‘মত পরিবর্তন’ নামক একটা গল্প পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়া শেষ হইলে সে বইখানির এক কোণে লিখিয়া রাখিল—“এই গল্পটা পড়িয়া আমি অত্যন্ত কৃত্ত হইয়াছি লেখিকা নারক নারিকার চিত্র অতি স্বন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

এর দ্বন্দ্বের গল্প আমি মাত্র আর একটা পড়িয়াছি।  
নয়—“পুজার কাগড়।”—

৪

একটা স্থপঞ্জিত কণ।

একটা মন্ত বড় আয়নার সম্মুখে লক্ষী তাহার দীর্ঘ নরপক্ষস ক্রক কেশভার চিকণী ঘারা আঁচড়াইতেছিল। এমন সময় ঘরপ্রান্তে উকিলের বেশে পরিহিত একজন লোক আসিয়া অভিনয়ের স্থরে বলিল—“রহিয়াছে ভৃত্য র বাঘে ধাঁড়াইয়া।

যে দেবি! কৃপা করি দেহ অজ্ঞা

এ অধীনে গৃহে প্রবেশিতে। যেমতি  
রাগা দিয়াছিল আজা সীতারে!”

লক্ষীও অভিনয়ের স্থরে বলিল—“দিহু আজা গৃহে প্রবেশিতে” বলা বাহুল্য শোকটী সমরেন্দ্র। ধড়া-চুড়া হাট্টিয়া, মুখ, হাত, পা, দুইয়া সমরেন্দ্র আদরের স্থরে দিল—“পেছু। আজ আমি তোমার চুল বেঁধে দেব।”

লক্ষী এই দোহাধাপূর্ণ কথা লক্ষীর যুগ্মদানী কেন সাভহাত হইয়া দুইদা উঠিল। সে শোষণ গদগদ-স্থরে কহিল—  
“গাও না। আমি কি তোমায় মানা করছি। আমার গর তোমার মালেকান খব আছে।” লক্ষীর চুল বাঁধিয়া দিয়ার পর সময় কহিল—“লক্ষী! গা ধুয়ে এস।” লক্ষী গা দুইয়া আসিল। সময় তাহার কাপড় গড়ের ভিতর হইতে একখানি মূল্যবান শান্তিপুরী শাড়ী বাহির করিয়া হাফকে দিয়া বলিল—“এখানি পর।” লক্ষী সেখানি পরান করিল। সময় তাহার জামার ভিতর হইতে হ'গাছি ব্রেসলেট বাহির করিয়া লক্ষীর হৃকোমল হস্তে পরাইয়া দিল। তাহার পর বলিল—“লক্ষী! আমার দিকে সেলন ফিরে ষাড়াও।” লক্ষী এবার প্রতিবাদ করিল। সে বলিল—“আমাকে কি ক'নবো সাজাচ্ছ? মা, পিসীমা দেখলে কি বলবেন।” “যে বা বলে বলুক। আমার সাধ হ'য়েছে তাই তোমায় পরাচ্ছি।” এই বলিয়া সে লক্ষীর ‘খোপা’র একটা সোণার চিকণী পরাইয়া

দিল।  
“মাতৃধার” সমরেন্দ্র “ঘট্টা” এবং এক পাশে “হরী” ও আর এক পাশে “হও” লিখিত আছে। তারপর

বলিল—“লক্ষী আমার দিকে একবার ভাল ক'রে চাও।” লক্ষী চাহিতে পারিল না। সময়ের এই ‘দৃশটী’ খুব ভাল লাগিল। সে লক্ষীকে ধোর করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া আনিয়া তাহার গণ্ডে একটা প্রেম-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

৫

আজ অল্পমের জন্মদিন।

রায়েদের বাড়ীতে আল মদা কোলাহল। চারিদিকে হুটগোল। ভিয়েনের বায়ুনরা মদা উৎসবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বড়-বেরঙের কাপড় চোপড় পরিয়া বাড়ীর সামনে বেড়াইতেছে। কেহ বা খেলা করিতেছে। কিশোরীরা সহচরীদের সহিত গল্প করিতেছে। কেহবা তাহার স্বামীর স্নেহপাত্রের নিমিত্ত মদা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। কেহ বা তাহার খাদী তাহাকে কি রকম ভালবাসে তাহা অপর কিশোরীকে কহিতেছে। কেহ বা তাহার খাদী তাহাকে কি কি গহনা দিয়াছে তাহা বলিতেছিল। কিন্তু যার জন্ম এত ঘটনা সে বাড়ী নাই। পাখা-নাওয়া করিয়া সে বন্ধুদের সহিত মিউজিয়মে গিয়াছে। বাড়ীতে বসিয়া গিয়াছে যে সে ব্যাকোপ দেখিয়া বাড়ী ফিরিবে। কারণ আজ নাকি একটা খুব ভাল ফিল্ম আছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সূর্য্যদের তাহার প্রেমসী পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রসেব তাহার সিঁদু কিরণজাল বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আমাদের অল্পমরাজ এক রাতা দিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন। গৃহে আসিয়াই সে তাহার বৌদির সন্ধান করিতে লাগিল। মাতৃ রাতায় সে বৌদিকে দেখিতে পাইল। বৌদি তাহাকে দেখিয়াই কহিল—“এই যে ভাই! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?”

অল্পম কহিল—“আগে আমার উপরি পাওনাটা

দাও। তবে বলব কোথায় ছিলাম।”

“তার জন্ম আর ভাবনা” বলিয়া বৌদি অল্পমকে

তাহার হাত ধরিয়া একটা ঘরে লইয়া গেল।



সে দেখিতে পাইল যে তাহার ঠাকুরদাদা (৩৭মেষের মান) একটি নিকম্প হৃদয়ীর হাত ধরিয়া ধাইয়াছে। বলা বাহুল্য প্রকৃতি লক্ষীর মামাত বোন। যাহার সহিত অশ্বমেধের বিবাহের কথা হইতেছিল। ঠাকুরদাদা অশ্বমেধকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া

আনিয়া তাহার হাতের ভিতর নিকম্পমার হাত দিয়া কহিলেন—“নে বাটা! তোমার উপরি পাওনা। দেখিল যেন পেয়েই আশ্চর্য হইলেন।” লক্ষ্য কিশোর কিশোরী দুইটির মূখ রক্তজবাব মত লাল হইয়া উঠিল।

## কুড়োনো ডায়রী

শ্রীঅশোক রায়

ঘরে বসে ভাবছি—কেবল ভাবছি—চারদিকে নিভৃৎ মৌন অন্ধকারের রাজত্ব ঘনুগ করছে বাইরেটা।—প্রাণটি একটু হাল্কা লাগছে। ম্যানেজার কাল দেখা করতে বলেছেন। কাজের আশাও দিয়েছেন। হয়ত হয়েও যেতে পারে, ১৬ই সেপ্টেম্বর—

কাজ পেয়েছি—তিন আনা মজুরীতে এখন কিছুদিন কাজ করতে হবে। তারপর কাজ দেখে—

২রা নভেম্বর—মন লাগছে না। সারাদিনটা কাছে যেতে থাকি; আর কিছুই মনে আসে না। সন্ধ্যা যখন পা এলিরে দিই তখন রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ঢোকে।—প্রাণে বৌবনের যে ফুলটি ফুটেছিল, তার রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে প্রাণ উত্তলা করে।—কারখানার উত্তাপে আশ-কোটা ধাক্কাতে ঐ বসলে গেছে। মাঝে মাঝে মাথা নাকচা দিয়ে উঠতে যার সেই উদার বৌবন—চেপে রানি—জানি গুতো আর পেট ভরবে না—

৩রা ফেব্রুয়ারী—আমার কাছে অনেক উন্নতি করে কেলেছি। আজ কাল দৈনিক একটাকা করে পাই।—হায়, আমার জীবনের বসন্ত কি সত্যিই এমনিভাবে কেটে যাবে?—কমটি অন্ধকারের মধ্যে ভক্তভারতী মনে আসার কী রমি আগিরে তুলছে—“হয় ত সারা-জীবনটা এমনিভাবে কাটবে না—

ক্লান্ত আমার সহকর্মীদের মনের নেশার হালা করতে

তনুতে পাচ্ছি—বাস্তবিক—ওদের ওপর মাঝে মাঝে দুশা হয়—আবার ভাবি—ওদের দেখাই বা কি!—সারাদিন—কার লোহার কঠিন নিশেপণ হতে ছাড়া পেয়ে ওদের ওই জিনিষটা হরকার বই কি—নইলে বাচবে কেমন করে?

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—এখানে ‘মিলন’ই আমার একমাত্র বন্ধু; দুজনে সেই লালপুলোয় ঢাকা গল্লরের মধ্যে সারাদিন এক সঙ্গে কাজ করি।—বাফা, খুলাও বটে! লোহার—‘ওর’ (ore) গুলো অনবরত পড়ছে আর তার খুলা চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে—ছ’হাত ঘূরের জিনিষও দেখা যায় না—নাকে তিনপালা কাপড় বেঁধেও নিস্তার নাই।

‘মিলন’রা খুশান। কাল তা’র প্রণয়িনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তাই আজ সে ভারি খুশী। তার খুশী-ভরা মুখ দেখে আমার মত বাগে-ঝেদোনা ছেলেরও মনে একটু খুশী দেখা দিয়েছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—বিয়ের হয়ে গেছে, বৌদ্বির সঙ্গে আলাপ করে বাস্তবিকই খুশী হয়েছি। বেশ মেয়েটি—পাশে, বাজনার, রূপে, গুণে আদর্শ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বৃক্ষেটে বেরতে চাচ্ছে, কার কথা মনে পড়ে গেল; বৌদ্বির চেহারার সঙ্গে তার অনেক মিল পেয়েছি।—যাক, সে সব অতীত হয়ে গেছে—তার কথা ভেবে আর কেন কষ্ট পাই?

১লা মার্চ—কাল বৌদ্বির ওখানে গিছলাম। উনি বলেন, “ঠাকুর-পো, তোমার শরীর দিন দিন ব্যাধি হয়ে যাচ্ছে। তুমি আর মেসে খেও না, এখানে চলে এসো।” বাস্তবিক মাইনে বেড়েছে সত্যি, শরীরটা কিন্তু দিন দিন জন্মের পথে এগুচ্ছে। তবে, সেটা মেসের খাওয়ার অবশ্যে নয়, কারখানার খুলা, ঘোঁষার গুণে।—

৩শে এপ্রিল—আজগার দেড়মাস হাঁসপাতালে পড়ে আছি। খুলায় রাজ্য থেকে ফুসফুসে যথেষ্ট খুলা জমে গিয়েছিল।—তিন পাল্লা কাপড় ভেদ করেও—। নাক, মূখ দিয়ে রক্ত পড়ত—অবস্থা এখানে একই।—হাতেও একটা পয়সা নেই। এক পুরোণ বন্ধুর কাছে কয়েকটা টাকা শেতায়; সেকটা পাঠাবার ক্ষেত্রে তার কাছে লিখেও ছিলাম দিন ১০ হ’ল—সে চিঠির উত্তর পথায়

পাই নি। মিলন এখানে নেই—কোথায় আছে তাও জানি না।

৩রা আগস্ট—ডাক্তার জবাব দিয়েছে। মরতে ইচ্ছে করছে না।—এখনই মরব?—জীবনটা কি তা জানতে না জানতেই?

৪ঠা আগস্ট—না: মাল্ল বা চায় তা’ত কখনই পায় না—বাঁচবার ইচ্ছা করছে—তবুত মরতে চলেছি।—আর জোর বঁটা তিনেক—লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে।—গুণো লোহালকড়, গুণো কারখানা বিদায় লাও; তোমাদের ভালোবাসতে পারলাম না বলে রোষ নিও না।—গুণো ডায়রী খাতা এই আমার শেষ আঁচড়-কাটা তোমার বুক—বিদায়!—

## দুজ্জৈয়

শ্রীসরস্বতীলা বহু

হে আমার মন—

হে আমার আপনার অঙ্গের দন, আমারি বন্ধের তলে আছো বঁধি বাসা তবু নাহি বৃষ্টি তব রহস্তের ভাষা; কত মাস, কত বর্ষ আছি এক সাথে, এতো কাছে—তবু হূরে তোমাতে আমাতে। এতো আপনার—তবু কেন এতো পর, এ রহস্ত কী জটিল! কি অবাস্তব।

হে আমার বহুতপ! হে মোর অনন্ত, হে দুজ্জৈয়—ইচ্ছাময় নাহি বৃষ্টি অস্ত—তব রহস্তের—ওগো কও কথা কও, সত্যই কি তুমি তব মোর নিজ নও? তব্রি এ জীবন পাছ নানা আহারে, কত স্বপ্ন, কত দুঃখ কত আয়োজনে—

বিরহের ধারা আর মিলনের হাসি;

করণ পূরবী রাগ প্রভাতের বান্ধি—

সব স্বপ্ন, সব গান, সব অশ্রু জল

রহিছে তোমারি অর্ঘ্য—যা কিছু সম্বল—

দিয়েছি চরণে তব—তুণ্য নহ তবু—

কি যে চাও হে অন্তঃস্থ নাহি বৃষ্টি কত।

নিশ্চেষ্টে ইচ্ছাও করে হৃদয় পান,

রসপুত্র হয়ে শেখ অগ্নি মুখে প্রাণ—

যোগায় আহতি।—

মোর এ জীবন ভরি,

যা কিছু রসের ধারা উঠেছে সঞ্চার,

সব নিভাড়া তুমি করেছ গ্রহণ,

কিছু নাই, বাকী—শুধু এবার দহন।





মহাত্মা গান্ধী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চলন

## সত্যের পরীক্ষা

প্রথম ধাক্কা

বিবল মনোরণ হইয়া বোম্বাই হইতে রাজকোটে চলিয়া আসিলাম—এখানে আসিয়া নিজে আকিষ শুলিলাম। এখানে উপার্জন মন্দ হইত না, আর্জি লেখা ইত্যাদি কার্যে গড়ে প্রায় ৩০০ শত টাকা উপার্জন করিতাম। ইহাতে আমার রুতিবের চেয়ে আমার ভাতার অস্বীকারের প্রভাবই বেশী ছিল—তাঁহার বেশ ভাল পসার ছিল। তিনি বড় লোক মকলের দরখাস্ত প্রকৃতি বড় বড় ব্যারিষ্টারের নিকট পাঠাইতেন আমাকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মকলের কাজ করিতে দিতেন।

বোম্বাইয়ে থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম কাহাকেও কোন কমিশন দিব না কিন্তু এখানে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই। ছই জায়গার মধ্যে পার্শ্ব্য এইটু বোম্বায়ে দালালকে কমিশন দিতে হইত, এখানে যে উকিল (কেন) কাজ বেন তাঁহাকে কমিশন দিতে হইত। আমার অগ্রহ এই যুক্তি দেখাইলেন—দেখ, আমি অল্প এক উকিলের অস্বীকার। তোমার দ্বারা যে সব কাজ চালান সম্ভব, সেগুলি আমি তোমাকেই দেওয়াইব ভূমি এবং আমি একজুে থাকি হুতরাং তোমার উপার্জনের বেশ আমি পাই একজুে তাঁহাকে কমিশন না দিলে তাঁহাকে কীকি দেওয়া হয় কারণ তিনি অল্প ব্যারিষ্টারের হাতে 'কেন' দিলে তিনি নিশ্চয়ই কমিশন পাইতেন।" আমি যুক্তিতে তুলিলাম—মনে হইল ঠিক

ব্যারিষ্টারী করিয়া পয়সা ও খ্যাতি লাভ করিতে হয় তবে কমিশন দেওয়া ছাড়া গতি নাই।

এই সময়েই আমি জীবনে প্রথম ধাক্কা পাই—বৃটিশ অফিসার যে কি চীজ তাহা অনেক বার শুনিয়াছিলাম কিন্তু এপর্যন্ত সে সম্বন্ধে আমার কোন সাক্ষ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না।

আমার অগ্রহ, পোরবন্দরের রাণাসাহেবের তাঁহার গরী আরোহণের পূর্বাবস্থার সেক্রেটারী ও মন্ত্রী ছিলেন এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কুম্ভাঘাট দেওয়ার অভিযোগ আনিয়া বলা হইয়া—ব্যাপারটা, যে 'পলিটিক্যাল এজেন্ট'র হাতে দেওয়া হয় তিনি আমার অগ্রহকে বিশেষ মনোবরে দেখিতেন না। উক্ত অফিসারের সঙ্গে বিলাতে আমার আলাপ হয়। আমার ভাতা ভাবিলেন যে এই আলাপসম্বন্ধে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমার অগ্রহের পক্ষে ছ' একটা কথা বলিয়া আসি। একাজটা মোটেই আমার মনোপুত হইল না—আমার ইচ্ছা ছিল নিয়মমত দরখাস্ত করিয়া ফল কি হয় দেখা—কিন্তু এ উপদেশ আমার ভাতার ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন "তুমি কাথিয়ারডকে চেন না এখানে প্রভাবেরই প্রকৃষ্ণ। বিশেষ ভূমি যখন অফিসারকে জান, তখন তাঁহাদের জন্ত একটু চেষ্টা করা তোমার উচিত নয় কি?"

আমি তাঁহার কথা অমাত্র করিতে পারিলাম না হুতরাং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে বাইতে হইল—

আমি মনে জানিতাম এক্ষণ করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা এবং আশ্বাসদানহানিকর। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম এবং পূর্ষ পরিচয়ের কথা শ্রবণ করাইয়া দিলাম—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে নিজের ভুল বৃত্তিতে পারিলাম—দেখিলাম অফিসার অবসরকালো এবং বর্ত্তব্যক্ষেত্রে এক হইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এপর্যন্ত বৃত্তিমাণ আমি আমার ভাতার কথা পাড়িলাম—সাহেব অর্থেই হইয়া পড়িলেন, বলিলেন আপনাদের ভাতা যজ্ঞস্বাকারী তাঁহার স্বপক্ষে আমি কোন কথা শুনিতে চাই না। যদি তাঁহার কিছু বলিবার থাকে তবে তিনি নিয়মমত দরখাস্ত করুন—এই উত্তরই যথেষ্ট; কিন্তু স্বার্থ চিরদিনই অন্ধ—আমি পুনরাবস্থারোপ করিলাম, সাহেব উত্তীর্ণ পড়িয়া বলিলেন—"আপনি এখন অস্থান—"

"কিন্তু আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শুধুন—ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার আরদালীকে ডাক দিলেন—সে যখন ঘরে প্রবেশ করিল তখনও আমি অহরোধ করিতেছিলাম সে আসিয়া আমার গলা ধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

আমি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কিরিলাম বলিয়াই এই মর্মে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলাম।

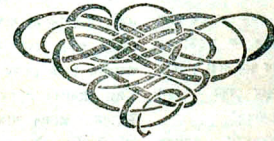
"আপনি আমার অবস্থাননা করিয়াছেন—এবং অর্দ্ধদলী দ্বারা অপমানিত করিয়াছেন ইহার যদি কোন প্রতিবিধান না করেন তবে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব।"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসিল—"আপনি আমার সহিত অজ্ঞাত আচরণ করিয়াছিলেন—আমি যাইতে বলায়

আপনি যান নাই হুতরাং বাহা করিয়াছি তাহা ছাড়া অল্প উপায় ছিল না এখন আপনি বাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন।"

এই জবাবী পত্রটি পকেটে লইয়া বাড়ী আসিলাম সমস্ত ব্যাপারটা অগ্রহকে বলিলাম—তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন—এবং কি ভাবে সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যায় সে বিষয়ে উকিল বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—এই সময়ে সার ফিরোজশাহ মেহতা রান্ধ-কোটে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে উকিল আনাইয়াছিলেন তাঁহাকে দিয়া আমার 'কেসের' বিবরণ পাঠাইয়া তাঁহার পরামর্শ চাই—তিনি বলিয়াছিলেন "পাদ্রীকে বলিবেন—একটি ঘটনা প্রায় প্রত্যেক উকিল ব্যারিষ্টারের ভাগ্যে ঘটয়া থাকে—তিনি সচ-বিলাত-প্রত্যাগত এবং তাঁহার রক্ত এখন গরম—বিশেষ বৃটিশ অফিসার কি চীজ তাহা এখনও চিনেন নাই—যদি তিনি উপার্জনের আশা করেন এবং বৃত্তিতে থাকিতে চান তবে তাঁহাকে এই পত্রটা নষ্ট করিয়া অপমানটুকু হ্রাস করিয়া ফেলিতে বলিলেন—কারণ এ ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সাহেবের কিছুই হইবে না বরং নিজের ক্ষতিই বেশী হইবে।"

এ উপদেশ বিষয়বৎ বোধ হইলেও আমাকে মানিতে হইয়াছিল—অপমানটুকু গায়ে মাখিয়া নিলাম—শিক্ষাও ইহাতে বেশ হইল; প্রতিজ্ঞা করিলাম—"আর কখনও এক্ষণ করিয়া বন্ধুদের অপব্যবহার করিব না"—এপর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা বজায় আছে।—এই প্রথম ধাক্কাতেই আমার জীবন যোতের পতি করিয়া গেল।







শ্রীকবিরচন চট্টোপাধ্যায়

পর্নাক্রান্ত

"হ্যাঁ পিসিমা, আজ ব্যাপার কি? বাড়ী-ভাড়া লোক সবাই ব্যস্ত? বাবা-বাবার যে খুব ধূম পড়ে গেছে দেখছি।" বলিয়া প্রবেশ। তার পিসিমার পার্শ্বে ছোট ছেলের মত বসিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন, "তোমার কথা শুনে আর না হেসে থাকতে পারি না বাপু। এর মধ্যে তুমি ধূম ধাম এমন কি দেখিল বলা? তুমি এত বড় কাঁড়াকাটাটিয়ে উঠিল কি না, সেই জন্ত দশজন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। গুরুর প্রবেশ, অশ্বের সমগ্র তোর মার শুকনো মুখ দেখে আমার যে কি ভাবনা হয়েছিল সে কথা মনে করতেও এখন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বৌ কিনা, দুদিনের জন্ত এখানে একটু বেড়াতে এলো আর মা কালী রক্ষা করেছেন, নইলে কি হ'তো বল দেখি? আমার যে এক লক্ষ রাধার স্বান সারা পুণিবীর মধ্যেও থাকত হত না! হাসি মুখে যেমন এসেছিল তেমনি হাসি মুখে ফিরে যাবে এই না সাধ!"

প্রবেশ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে দেখছি, তোমাদের তুমিই ক্যান্সারে কেলেঙ্কির, বা'হোক পেট পুরে খেয়ে সে ছঃখ মিটিয়ে দেব।"

পিসিমা বলিলেন "তুমি যত পারিস বাস তাতে আমার আমোদ হবে সত্য কিন্তু—যতক্ষণ পর্যন্ত মহাশয়কে বৌ করে বরণ করে আনতে না পারিছি ততক্ষণ আমার সন্তা বলাত কি শান্তি হচ্ছে না।

প্রবেশ এক গাল হাসিয়া উত্তর করিল "তোমাদের পছন্দকে বাড়াছুরী দিতে হয়! আর বুদ্ধি পুণিবীতে বৌ করবার মত মেয়ে খুঁজে পেলো না। শেষে কিনা একটা বেদের মেয়েকে বৌ করা সত্য্য করলে। "তুমি বলিস কিরে প্রবেশ! অবাক করিল যে? ছি! ছি! অমন কথা মুখে আনিস নি! সে না থাকলে, তোকে কি আজ কিরে পেতাম বাছা! প্রাণ দিয়ে সে তোর প্রাণ রক্ষা করেছে! অমন মেয়ে লাভ করা একটা মেলে কি না সম্ভব। মার আমার যেমন রূপ, তেমন গুণ! যেন লাগাং লম্বা! তুমি কি না অনায়াসে তাকে বেদের মেয়ে বলে তুচ্ছ করলি?"

বলিয়া প্রবেশের পিসিমা অনেকখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। প্রবেশ আশ্চর্য পৃষ্ঠ্য তার পিসিমাকে এতখানি উত্তেজিত হইতে কোন দিন দেখে নাই। তাহার কথায় যে তার পিসিমার অন্তরে খেঁচ বাধা লাগিয়াছে সে কথা ভাবিয়া মনে মনে প্রবেশ আনন্ধিত হইল।

কারণ সে, পত্নীক্য করিয়া দেখিতেছিল, তাহার ঘননী ও পিসিমা মহাশয়কে কতখানি অন্তরের সহিত ভালবাসে, সত্যি কি তাহার মহাশয়কে তাহার পুত্রবধূর উপস্থিতি মনে করেন? না, কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্ত, স্বপ্ন পরি-শোধ করিবার জন্ত মহাশয়কে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্ত করিতে চাহিতেছেন! এমন করিয়া যদি তাহার মহাশয়কে গ্রহণ করিতে চান, তাহা হইত মহাশয় অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। মহাশয় যদি কোন প্রকারে কোন আবরণের মধ্য দিয়া জানিতে পারে এটা তার প্রতি আশাতীত অস্বপ্নই এতখানি সৌভাগ্য পাবার মোটেই সে যোগ্য নয়, তাহ'লে যে তার নারী জীবন, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। এতখানি হীনতা কেনই বা সে স্বীকার করিতে সম্মত হইবে। এই ঘরের পুত্রবধূর সমস্ত সন্মান ও অধিকার লইয়া সে যদি এ ঘরের পুত্রবধূ হইয়া আসিতে না পারে, তাহা হইলে আমি কিছুতে তার সেই কৃতজ্ঞতার জন্য মনকে গ্রহণ করিতে পারিব না! সে আসিবে তার নিজ ভাগ্য ও গৌরব নিয়ে। সে আসিবে না উপকারের প্রত্যাশার পেতে।

এই সময় পিসিমা বলিলেন, "হ্যারে তুমি যে চুপ করে রহিলি? মহাশয়কে কি তুমি পছন্দ করিস না? ওর চেয়ে ভাল মেয়ে কোথায় পাৰি বল? মহাশয় যে ঘরে যাবে, আমি জোর প্রদায় বলে রাখছি সে ঘরে লম্বীর দুটি ঊর্ধ্বে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! তোর মা প্রথম বেদিন তাকে দেখেছে, সেইদিনই আমাকে বলেছে এমন একটা মেয়ে পেলে আমি বৌ করি। এমন বৌ ঘরে এলে ঘর আলো করবে বুঝি?" বলিয়া মহাশয়কে প্রবেশ যে বেদের মেয়ে বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া অঙ্কলে নয়নাঙ্গ মুছিলেন।

পিসিমার চক্ষু জল দেখিয়া প্রবেশের বৃত্তিতে বাকি রহিল না, যে তিনি মহাশয়কে কতখানি অন্তরের সহিত স্নেহ করেন। প্রবেশ বলিল, "আমি ত পিসিমা এমন কোন কথা বলি নাই যাতে করে তুমি অভিমান করতে পার? সে যে বেদের মেয়ে সে কথা আমার চেয়ে তোমারাই

অধিক জান। বেদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবার মত সাধ কি তোমাদের সমাজের হ'বে?"

এই সময় সেখানে করুণাময়ী আসিয়া বলিলেন, "সে বেদের মেয়ে বা বাদীর মেয়ে হোক সে কথা আমি বুঝব। লোকে যাই বলুক, আমি তাকে বৌ করে ঘরে আনব! সে! কিছুতেই বেদের মেয়ে হইতে পারে না।"

পিসিমা করুণাময়ীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "আর তোমার ছেলে যদি বাকি না হয়?"

প্রবেশ লম্বায় মাথা হেঁট করিয়া মুক্তিকার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

করুণাময়ী বলিলেন, "আমি যা করব তাতে প্রবেশের না বলবার শক্তি কি? যে আমার ছেলে কিরিয়ে এনেছে, তাকে আমি বৌ করব, অবশ্য সে যদি আপত্তি করে তা হ'লে স্তব্ধ কথা।"

পিসিমা উত্তর করিলেন, "অবনী ত আমাকে বলছিল, মহাশয় যে তার হারান বোন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। অনেক বিষয় নাকি মিলে গিয়েছে।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তোমার ভাইও সেই কথা বলছিলেন। যে যাই বলুক মহাশয়কে আমরা বৌ করব। তাতে সমাজে যদি একধর করে রাখে তা থাকতেও রাজি আছি।"

এই সময় লতিকা এসে বলে, "মা অবনীলা বলছিলেন, যে তাঁর বোনকে তিনি নিজের সৎসারে কিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাতে তাকে যদি সমাজ ছাড়তে হয় তাও জেঁদে!"

এতক্ষণ পরে প্রবেশ বলিল "তোমাদের সব পরামর্শ করবার পূর্বে মহাশয় দাঙ্গ সমীকর এসব কথা জানান উচিত নয় কি?" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

করুণাময়ী বলিলেন, "লতিকা একবার অবনীকে এখানে ডেকে আনত?"

পিসিমা বলিলেন, "বৌ এ কাজে দেবী করিস নি। সব এখানে ঠিক করে তবে চলকাতা যাবি।"

করুণাময়ী বলিলেন "সে কথা আর বলতে বোন। আমার ইচ্ছা এখান থেকেই বিবাহ দিয়ে যাব। কাজিক



মাসের আর কটা দিন আছে মাজ। প্রবোধের  
বিষে হ'য়ে গেলে লতিকার বিয়ে আর না বিশেষ চলেবে  
না। তোমার ভাইএর ইচ্ছা। বিপিনের সঙ্গে লতিকার  
বিয়ে দেন, সে ভাক্তারী পড়ছে, এরপর সহরের কাছে  
খাকলে তার পসার হবার ভাবনা থাকবে না। তবে  
কি জানি মহুয়ার সঙ্গে প্রবোধের বিয়ে হ'লে, তারা  
পাড়ার্ষেই জমিদার মাছয় রাজি হ'লে হয়। উনি না  
কি সব খুলে তাকে পজ দিয়েছেন। এখনও উত্তর  
আসবার সময় হয় নাই।"

পিসিমা বলিলেন, খুব সম্ভব বেদের যেহেতু নাম  
শুনই চমকে বাবে এখন! রাজি হবে না। আমার  
বোন, সত্যি কথা বলতে কি, বিপিনের সঙ্গে লতিকার  
বিবাহ হয় একদুই ইচ্ছা মোটেই নেই। বিপিন মনে বড়  
দাঙ্কি বলে মনে হয়। লতিকার ভাব ভরী দেখে  
যতটা স্বৈচ্ছিক, ও বিপিনকে মোটেই পছন্দ করে না।  
উমেশ দিলি ছেলে। রূপে গুণে। হ'তে পারে ও হয়ত  
জমিদারের ছেলে নয়। টাকা নিয়ে ত আর খুঁজে থাকে  
না। লতিকার ভাগ্যে স্বপ্ন থাকে ত উমেশ হ'তেই  
হবে। উমেশ বেশী কথা বলে না। খুব ঠাণ্ডা ছেলে।  
তোমাদের প্রতিও নিজের বাপ মায়ের মত শ্রদ্ধা  
ভক্তি। ভ্রামই করতে হয় ত এমন ছেলেকে করাই  
বর্তব্য।

করুণাময়ী উত্তর করিলেন, "ও কিছুই কেউ বলতে  
পারে না। যা হবার তা হ'য়ে আছে। মাছয় শুধু  
উপলব্ধ্য মাত্র। আমারও ইচ্ছা উমেশের সঙ্গে বিবাহ  
হবে। উমেশকে সত্যিই এক মুহূর্তের জন্তও পর মনে  
করতে পারি না। ভাল কথা, আসল কাজই করা হয়  
নাই।"

"কি?"

"মহুয়ার দায়কে আজ নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। মহুযাকে  
আনতে পাঠাতে হবে এবং সন্নীরকে তোমার ভাই নিজে  
গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আনুক নইলে হয়ত সে আসবে না।  
সেদিন উমেশের মুখে শুনেছি আদ্যবা যে খাবার  
পাঠিয়েছিলাম, তা সে স্পর্শও করে নাই। তার মনে  
আদ্যবের উপর ভিতরে ভিত্তিও নিকট একটা সম্ভব

হয়েছে যে, আমরা তার নাতনীকে নিয়ে চলে  
যাব।"

লতিকার সহিত অবনী আসিয়া উপস্থিত হইল।  
অবনী জিজ্ঞাসা করিল "জ্যাঠাইমা আমাকে ডেকেছেন?"  
"হ্যাঁ বাবা, বলছিলাম আমবা মহুয়ার সঙ্গে প্রবোধের  
বিয়ে দেব স্থির করেছি। তোমার কি ভাত্তে কোন  
আশঙ্কি আছে! তুমি কি মহুযাকে এতদিন পরে  
সমাধের নির্দয় দৃষ্টির সম্মুখে সোধেদা বলে গ্রহণ করতে  
পারবে?"

"কেন পারব না জ্যাঠাইমা? তোমরা যদি তোমা-  
দের একমাত্র ছেলের সঙ্গে মহুয়ার বিবাহ দিতে সম্মত  
হতে পার—তাকে এতখানি সম্মান দিতে পার আর  
আমি তার এক মার পেটের ভাই আমি তাকে  
ফিরে নিতে সক্ষম হব? জ্যাঠাইমা! সত্যিই তোমরা  
মাছয়! বাবার বন্ধুদের প্রতি জ্যাঠাইমারই অশ্রু-  
শ্রদ্ধা ও ভক্তি তা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে পারলাম। এত-  
খানি ত্যাগ স্বীকার না করতে পারলে, কি মাছয় বলে  
পরিচয় দেবার যোগ্যতা পাওয়া যায়।"

লতিকা বলিল "মহুয়ার মত এমন বোন অনেক  
তপস্বী করলে তবে পাওয়া যায়।"

করুণাময়ী বলিলেন "বেশ অবনি, তোমার কথা শুনে  
খুব হুসী হলাম। আশীর্বাদ করি চিরজীবী হও।  
আমন বাপের ছেলে কেনই বা না হবে। তিনি এক-  
দিনের জন্ত আমাদের পর মনে করেন নাই। তার  
মমে আজ আমার প্রবোধের বৌ হবে একি আমার  
কম সৌভাগ্য! তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা  
হ'লে যে কি আনন্দ হ'তো তা বলে শেষ করা যায় না!  
এই মেয়ের জন্ত তিনি জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।  
নইলে তাঁর কি যাবার মতন বয়েস হয়েছিল!" বলিয়া

করুণাময়ী হাতের উট। পিঠি দিয়া চকের জল মুছিলেন।  
অবনীও পিতার কথা শুনিয়া দুই চক্ষু জলভরে  
টপটপ করিয়া উঠিল। তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে  
সে বলিল, "বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন—"

পিসিমা নিজ অকল দিয়া বেহেতরে অবনীকে চকের  
জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঈদিশনি অবনি, ঈদিশনি।

তিনি স্বর্ণ থেকে সব দেখছেন। তাঁর আশীর্বাদে  
আজ তোমার বোন নন্দিনীকে ফিরে পেয়েছে। তাঁর  
আশীর্বাদেই বৌ আজ তার একমাত্র সন্তান প্রবোধকে  
বুড়া পথ থেকে টেনে এনেছে।"

"লতিকা একবার উমেশকে এখানে ডেকে আন না  
মা!" বলিয়া করুণাময়ী অবনীকে সেখানে বসিতে  
বলিলেন।

লতিকা বলিল, "না উমেশ-দা যে বিপিন বাবুর  
সমস্ত জিনিষ পজ গুছিয়ে দিচ্ছেন?"

করুণাময়ী বলিলেন, "জিনিষ পজ হঠাৎ এখন গুছিয়ে  
দিচ্ছে মানে?"

লতিকা বলিল, "বা রে! বিপিন-দা যে আজ  
কলকাতা যাচ্ছেন। তার কলেজ খুলেছে। তিনি আর  
থাকতে পারবেন না। উমেশ-দা কত করে বোঝালেন।  
তিনি কিছুতে রাজি হলেন না। এবং বলিলেন, "তোমা-  
দের মত অনর্থক সময় কাটান আমার মোটেই  
পোষাবে না।"

করুণাময়ী বলিলেন, "আজ রশ্মন বাবে। আজ-  
কের দিনটা থেকে গেলে ভাল হ'ত। পাঁচ রকম হবে,  
সে থাকবে না মনটা কচ, কচ করবে। একটা দিনের  
জন্ত তার কি এসে যেতো।"

লতিকা বলিল, "মার এক কথা! সে, যদি না  
থাকতে চায়, কে তাকে ধরে রাখবে বল?"

"আজ্ঞা আমি একবার বলে দেবখবন। তুই  
উমেশকে একবার ডেকে আন। বিশেষ প্রয়োজন  
আছে।"

লতিকা উমেশকে ডাকিতে চলিয়া গেলে, করুণাময়ী  
অবনীকে সোধেদন করিয়া মুহূর্তের জিজ্ঞাসা করিলেন,  
তুই যে সেদিন বলছিলি লতিকার জন্ত খুব ভাল পাজ  
দেখে রেখেছিস।"

অবনী বলিল, "সব ঠিক। কেবল তোমরা মত  
দিলেই হয়। সে পাজ আমার হাতের ভিতর! ছেলে  
খুব ভাল। এবার বি, এ পরীক্ষা দেবে।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তুই তা হ'লে বাবা ভেতরে  
ভেতরে সেই ঠিক করে রাখ। প্রবোধের বিয়ের পরেই

লতির বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হ'তে পারব। তবে একটা  
কথা হচ্ছে, তাঁরা যদি শোনে, মেয়ের ভাইএর একটা  
বুড়ান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! সেটা আবার বেদের  
মেয়ে, তাহলে কি তাঁরা রাজি হ'বেন?"

অবনী একপাল হাসিয়া উত্তর করিল, "জ্যাঠাই-মা  
আমার বাবা যদি বেদে দেন, তাহলে অনেক সে বেদের  
মেয়েকে প্রবোধ বিয়ে করলে যে আপত্তি করবে না,  
একথা স্পষ্ট করে বলতে পারি। সে তার আমার।  
আপনি নিশ্চিত থাকুন।"

করুণাময়ী বলিলেন, "বেশ বাবা তোমার বোনের  
বে তুমি দেবে ভাত্তে আমার আর কি ভাবনা।"

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁহে অবনি, সে ছেলের  
বাপ মা আছে কি?"

অবনী বলিল "বাপ নাই মা আছে।" বলিয়া অবনী  
ভাত্তাভক্তি পিসিমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে  
অত্যন্ত মুহূর্তেই বলিল "পাজ আর কেউ নয়—আমাদের  
উমেশ। উমেশ আমাদের বাড়ীর পাশে থাকে তা'ত  
আপনি জানেন। উমেশের মা অত্যন্ত ভাল মাছয়,  
লতিকার সহিত উমেশের বিবাহের কথা আমি  
অনেকদিন তার নিকট পেতেছি এবং তিনিও রাজি  
আছেন।"

পিসিমা হাসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া  
বলিলেন, "এর চেয়ে আর সুপাছ কোথায় পাওয়া যাবে  
বল? বেশ বাবা, বেশ! আমিও মনে মনে ওই ছেলেই  
পছন্দ করে রেখেছি। এই অবকাশে উমেশ সেখানে  
আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া করুণাময়ী  
জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁহে, উমেশ, বিপিন না কি আজই  
চলে যাচ্ছে?"

"আজই বাবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছে। তার পড়ার  
কতি হচ্ছে। আর এ জায়গাটা তার মোটেই ভাল  
লাগছে না।"

করুণাময়ী বলিলেন, "সে কথা ঠিক। পড়ার কতি  
করে থাকতে আমি বলতে পারি না। তবে আশ্চর্য  
দিনটা থাকলে ভাল হ'তো। একটা দিন। আজ  
তোমার পিসে-মাই প্রবোধ ভাল হ'য়েছে বলে, এখন-



কার দশজনকে নেমস্তর করেছেন কি না। তা কি আমি একবার তাকে বলে দেখব ?”

উদ্দেশ্য সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে চূপ করিয়া রহিল। অবনী-বলিল, “প্রাথমে তাকে অনেক করে বলিবে। সে কিছুতেই থাকবে না। তার মনটা বেখানায় খুব ভাব-ভার। সে শুনেছে জ্যাঠাই-মা মহাবার সঙ্গে প্রাণেশের বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন। এ প্রস্তাব সে কোন দিক দিয়াই সমর্থন করিতে পারে না।” আমি বলিলাম “সে যদি আমার বোন প্রমাণ হয় তা হ’লেও কি তোমার ওই মত বাহাল থাকবে ?”

পিসিমা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বটে বটে, পেটে পেটে অনেক বুদ্ধি দেখছি। শেষে কি বললে ?”

“বললে হাজার মার পেটের বোন হোক, সে, যখন এগার বছর ঘরের বাহিরে আছে তখন, হাজার প্রমাণ থাকিলেও তাকে কিছুতেই সমাজের ভেতর গ্রহণ করতে কোন দিক দিয়ে পারা যায় না। পিসিমা, সত্যি কথা বলতে কি একথা শুনে, আমার ভারি রাগ হ’লো। যে বোনের জন্ত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে বাবা মারা গেলেন। তাকে পেয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সমাজের এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের মত কেমন ?”

আমার কথা শুনে, বিপিন বাবু বলিলেন “সমাজ ত আর কালর বেহেব, ভালবাসার, আশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলবে না ? আমি বলিলাম, “না চলে উত্তম। তা’ বলে পশত মত অকারণ অন্তর ভাবে নিজের বোনকে রাস্তার বের করে দিতে কিছুতেই পারব না।”

উদ্দেশ্য এতক্ষণ কোন উত্তর দেয় নাই। সে বলিল, “অন্তের মতের উপর তর্ক করে, কোন লাভ নাই। যারা বুঝবে না, তাদের বোঝাতে কিছুতেই পারব না।”

কর্ণপাণ্ডবী বলিলেন, “উদ্দেশ্য ঠিক বলেছে। যারা না বুঝবে তাদের বোঝাবার চেষ্টা থা।”

এই সময় রেলের থালাসী এক রাশ বড় বড় মাছ আনিয়া সেখানে ঢালিয়া দিল। কিরণশঙ্কর বাবু মাছ পাঠিয়েছেন। মাছ দেখিয়া লতিকার খুব আনন্দ হইল। সে মাছ সুটবে বলিয়া মহা সরগোষা বাধাইয়া দিল। এমন সময় নীহারবালা আসিয়া বলিল, “আজ বৃষ্টি ভাই পাক্সা বেধা ? ভাইএর বিয়েতে মাছ কোটার ভার এক চেটিয়া তোমার না কি ?” বলিয়া নীহারবালা মাছ সুটিতে বলিয়া গেল। একটা মহা আনন্দ পড়িয়া গেল।

কর্ণপাণ্ডবী নীহারবালার মুখ চুহন করিয়া বলিলেন, “মা তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। আজ যেন প্রাণেশের পালা দেবাই হয়। তারপর উদ্দেশ্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন “উদ্দেশ্য ভূমি বাবা একবার মহাবার দাছকে নেমস্তর করে এস। মহাবাকে তার সঙ্গে আসতে বলবে। আর মহাবকে বলবে সে যেন তার দাছকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।”

উদ্দেশ্য বলিল, “তা’ হ’লে এখনি যাই। জানি না বড় আমার কথার প্রভাব করে আসবে কি না ?” বাহির বাড়ী হইতে হরেন্দ্রাবু ডাকিলেন, “উদ্দেশ্য কি বাড়ীর ভেতর ? একবার এগিয়ে এসো।”

হরেন্দ্রাবু উদ্দেশ্যকে ডাকিয়াই নিজে ‘অমরমহলে’ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উদ্দেশ্যকে দেখিয়া বলিলেন, “তোমাকে একবার সমীরের বাড়ী যেতে হবে। এই মাত্র আমি সেখান থেকে আসছি। লোকটির সঙ্গে পরিচয় করে খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি তাকে এখানে থাবার জন্ত নেমস্তর করে এসেছি। ভূমি একবান গন্ধর গাড়া করে মহাবাকে নিয়ে এসো। সে হেঁটে আসতে চাইলেও হাটিয়ে আনবে না বুঝলে !”

উদ্দেশ্য তখন মহাবাকে আনিতো চলিয়া গেল।

(ক্ৰমশঃ)

## রেশ

শ্রী অশোক কুমার সেন

শোন শোন পেভি! বোনটি আমার! ওই! ওই যে ডাকছে আমার! দেখ, দেখ, এই যে, এই-থানটায় হাত দে! কিছু বুঝতে পারছিস ? কিছু না ? একটুও না ? ও না না তুই বুঝতে পারবি না। আর বুঝতেও যেন না হয় বোন! ভগবান কখন যেন বোঝাবার আগেই তুই মরে যাস! আহা বড় জানা! বড় তেজী! একটু জল দিবি বোন? না না কোথায় পাবি তুই! সে জ্বালার শক্তি, সে তেজীর জল যে শুকিয়ে গেছে। সে যে নেই আর। ওগো, নেই নেই নেই! উঃ মা-গো কি দারুণ প্রতিপন্ন! তবু ওই যে ডাকছে! ভনুতে পাচ্ছল না ? ওই যে! হাই রে যাই!

পেভিরে! বড় বেদনা—যে বেদনা তোরের মতন যারা—তারা বুঝবে না চেষ্টা করেও বুঝতে পারবে না! সেই জীবন জোড়া অঙ্গ বেদনায় যখন দুছোভ ভারি হয়ে বুঝে এসেছিল—যে বেদনায় অশ্রু আমার চোখ থেকে গড়িয়ে শুকাতো পারেনি, যে বেদনা বৃকের আজীবন সঞ্চিত গোপন হৃৎপৃষ্ঠীর দ্বারে এসে আছড়ে পড়েছে—তবু বাধার গুণর বাধা পেয়ে কৈদে দ্বিরে গেছে—যে বেদনায় হৃৎয়ের প্রতি তব্বী হাতাকার করে উঠেছে, নির্ধম বিধাতার কাণে যা এক মুহূর্তের জন্তও পৌঁছায় নি বলিও বা পৌঁছে থাকে, অলুথার দেহতা যে বেদনাকে তাঁর উপহাসের অষ্টরাসি দিয়ে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলেছেন—বড় বলব বোন সে বেদনা কি—তবু শোন, কাছে আস! আরো একটু কাছে—বুকে হাত দে—শোন বোন, শোন, যে বেদনায় কৈদে কৈদে ক্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল—সেই বাধার ঘুম থেকে—একদিন চোখ মেলে দেখলাম—কি দেখলাম তখন? আমার কোলের কাছে বৃকের মাঝে একটি শুভ্র স্বন্দর বেলফুল। পাগড়ী খুলে, পবিজ মাধুরী মেখে, মিটি মিটি হেসে আমার স্বপ্নর পানে চেয়ে আছে—হাতটি বাড়িয়ে আছে

যেন কি চায়! জানি না কি সে চেয়েছিল হয় ত নিতে পারিনি তাই কি সে অভিমান করে চলে গেল। না, সে পাগড়ী খুলে তার কোটা শেষ করে এসেছিল বলে চলে গেল! না না বোন, তা নয়! তমনি পাগড়ী ছালি যে এক ফোটা চোখের জল দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না! কি বলছিল! চোখের জলে ফুল বাঁচে না ? হ্যাঁ রে হ্যাঁ! পাগড়ীর বুকে যে ফুল ফোটে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চোখের জলই পারে। আজ্ঞা, তোরাও ত বাধা প্রায়ে মা হয়েছিল—বলতে পারিস্ সে কি এই বাধ্য?

সেই ডাকটুই! কেমন করে বোঝাব তোমাদের—সে ডাকে কত হৃদা কত মধু! কেমন করে বোঝাব যে আমার ডেকেছিল সে আমার কে—সে আমার কি! ভগবানের সঙ্গে বিরোধে করেছিল সে! কত রকমে ফেরাতে চেষ্টা করেছিল। কথা শোনেন নি—বাধা মানে নি! আমার বৃকের দ্বার ভেঙ্গে গিয়ে—ওগো, জানি কি তোমারা?—আমার অন্তরের শূভ স্থানটি পুরোপুরি অধিকার করে বসেছিল। শূভ ত থাকতে দেখিনি সে। আমার কামনা ত অন্তর রাখেনি সে। তবে কেন চলে গেল সে!

প্রস্তর লেখা কপালের গুণর অগ্নিবিপির দিকে চেয়ে বড় ভয় করত। তাই তার সে প্রাণ জুড়ানো, বুক ভরাণো, হৃদয় মাতানো, স্বস্তির প্রতি অগুণরমাণের অসুখী আনন্দে পুলাকে নেচে ওঠা—বহিষ্ঠার সর্বশক্তি যাতনার অশ্রুত প্রলেপ, সেই ডাকটুই—সেই ডাকটুইতে সাড়া দিতাম না—দরা দিতাম না! অন্তরাত্মা জানেন কি বিপুল বাধা সহ করে—ভরা বৃকের ভরা পিপাসা নিয়ে স্বচ্ছ ভট্টিনীর ফুল বনে তবু ডেউ ওপড়ে—চেয়েই থেকেছি পিপাসা মেটাতে পারব হয়নি! বুঝতে পারতুম কত কষ্ট পেত সে এতে! অভ্যাসে ফুল ফুলে কাঁত। সে অভিমান আমি প্রাণ ভরে উত্তোষে করতাম!



ওগো! অভিমান করতে যে কেউ আসেনি এ কোলে! কেউ যে আমার অন্তরে গোপনে সঞ্চিত—বিনে দিনে বেড়ে ওঠা—উপচে পড়া শেখের সামনে এমন করে মূরুর কণ্ঠ ভিগারী হয়ে এসে ঠাড়াইনি! কেউ যে আমার বিগিয়ে বেওয়া আমারের একটু—এতটুকু অব-হেলায় এমন করে টোট ফেলারিনি! ওগো! আমার ওপর এমন রাবী নিয়ে যে কেউ আসেনি! উঃ! তেঁটা! তেঁটা! বড় তেঁটা!

দেখ দেখ, কোলে মাথা রেখে যুচ্ছে! কেমন হুন্দর! লগা লগা চুল—বড় বড় চোখ—কচি মুখখানি! আহ! কোথায়—কোথায় গেলি রে! কে সে? যে আমার চোরে আদর করে আমার আদরের কাভালকে কোলে টেনে নিলে!

সরিয়ে দিই চুলগুলো! মুখের ওপর এসে পড়েছে! আশ্বে আছে দিই! নইলে জেগে উঠবে! বড় কাঁচা ঘুম তার! ওকি! পেতি, ছুই—ছুই কাঁদছিল! তবে—তবে—উঃ মাগো! না না তুই ভারি ছেলেকাছয়—একটুতেই বড় কাঁদিস! দেখনা ভাই, এত করে বলি চুলগুলো কেটে ফেল, তা হজি ছেলে কিছুতে ভনবে না!

চোখ ছাট! বৃদ্ধ আছে—পাতা নড়ছে না—বির! যুচ্ছে কিনা! কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে চকল চোখ ছাট তার—তেমন চকল হয়ে তার মাকে খুঁজছে! দেখ বোন—ছেলে বেলা থেকেই ওর চোখটা ব্যাথাপ! আমারও ব্যাথাপ কিনা ভাই! সেদিন আমার ধরলে—‘আমি কালো চশমা নোবে!’—ওই যে আঁজকাল নতুন বেরিয়েছে না? ওকে গিয়ে বলুন—উনি ত রেগেই অধির বরেন—‘নিভানতুন সব তোমার ছেলের!’ আমি বলুন—কেন গা, আমার দশটা নয় পাঁচটা নয়—একটা ছেলে—একটা সামান্য আশাব তার—না দাও আমি নোবে! এই বলে আমি ভাই, ঠাকুরপোকে দিয়ে দোকান নম্বর পাঠিয়ে চশমা করিয়ে আনলাম! অত যে ভাসিত ত ভাই কি রকম আখারে ছেলে! আত যে জরের খোব, তবু মাকে মাকে—মাগো, আমার চশমা এলো না! আচ্ছা পেতি, তোর কি ভাল লাগে তল্ল চশমা পরা মুখ, না চশমা খোলা মুখ? আমার

কিন্তু—না তোরা যে সবাই কাঁদছিল! কেন! কেন! তবে কি, ওরে না রে না! যা না ভাই, তাকের ওপর রেখেছি চশমাটা—এনে দে না ভাই, ঘুম থেকে উঠলে দেবো!

কচি মুখখানি! কে বলে কোটা চুল! এ যে আমার আখ কোটা হুহু—না তাও না—বুড় কুঁড়ি! দেখ দেখি টোট ছাট!—বেথেছিল পেতি, ধনন ছুটী নী করে টোট টিপে টিপে হাসত কেমন একটা মিষ্টি ভাব তার মুখে ছুটে উঠত! সে হ্যা আকর্ষ পান করেও আশা মিটত না! ছুই ছুই ভারি ছুই! সব সময় ছুটী নী তার! সেদিন অত জরে, মাথার ব্যাথা ছুইয়ে পড়েছে আমি আদর করতে করতে বলছি—‘ঘুমিয়ে পড় মানিক, সেয়ে যাবে!’ অমনি ছুটী নী করে মুখটা আমার ধরে বরেন—‘কেনন করে ঘুমাবো মা, যদি কোল মুখের ওপর ছুই খাও!’ বস্তু ত ছুটী নী নয়? চুপ খেলে বৃষ্টি ঘনোয় যাবে না! আ: কি রকম থেমেছে—মুখটা মুছিয়ে দিই—যা ছেলে—এখনি মা বলে জেগে উঠবে! দেখ রে, মুখটাও যেন তার কত মিষ্টি! ওরে শোণা! ওঠ রে! আর কত ঘুমবি—বেলা যে পড়ে এলো! আমার কি কাজ করি নই!

ওকি! এমন কচ্ছিল কেন তোরা? কি হয়েছে? হা হা পেতি মিছি মিছি কাঁদছিল কেন বল ত? আহা! বড় ভালবাসি! কিনা ওকে—ভাই একটু অর হয়েছে তাই কেনেই অধির! ভাবিসনে বোন—ও সেয়ে যাবে—হ্যা সেয়ে যাবে! যা কাটা কিত্তেগুলো সব নিয়ে আয়—চুলাটা বেঁধে দিই! দেখ বেবি কি রকম রুদ্র হয়ে রয়েছিল! এখন আর তুলব না রোগা ছেলেকে! আর একটু পরে উঠলে ওখটটা থাইয়ে নোবে! ভাতার বাবু ওবেলা এলে বলব—ওজুটা বদলে দিতে! বলে, বড় ততোতা মা, খেতে পারিনে! দেবনা, পোড়ার মুখো ভাতার ওগুলো সব পরগার জোঁক, ইচ্ছে করলেই শীপগিরি শীপগিরি সারিয়ে দিতে পারে—কিছ গমহার লোভে এমন ওজু দেবে যাতে সারতে বেরী হা! ঝাঁটা মার অমন ভাতারীর মুখে! আচ্ছা! আবি এত কথা কইছি—তোরা সবাই চুপ করে রয়েছিল! কি হয়েছে,

বাবি না? বল না বোন! আমি যে বুঝতে পাছি না! তবে কি—তবে কি—যুহু আমার! মানিক আমার! বাহু আমার! ওই তো! ওই তো! য—চলে যা তোরা সব এখান থেকে! যত নাছিলা ভাবনা তোদের! তবে কি করে ডাকছে? কি করে ভনতে পাছি! ওই বে! যাই বাবা যাই! কোথায় রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানিক! যেন কি পড়ে না আমার কথা? একবার! ওরে আর একবার আয় এ বুকে!

আমি আদান হয়ে গিয়েছিলুম? না—কই আমি ত টের পাইনি! উঃ তেঁটা! কি দারুণ তেঁটা! আর একটু জল দিবি বোন?

কে মা? কি বেথতে এলে মা? উৎসবের শেষে উৎসব আদর? এমন করে চেয়ে আছ কেন? বুঝতে পাছ না? আশ্চর্য হচ্ছে? বোঝা যে ‘দিছ’ বলে ছুটে আসতে আর সে আসতে না কেন? ওকি কাঁদছ কেন মা? ঘুরে যাবেখন—ভাল আছে ত একটু! তাইত বাইরে গেছে একটু বাইরে—হ্যা বাইরে! এখনি আসবে। ওই যে এলো! ওই যে ভনতে পাছ না? তোমরা কি সবাই কলা হয়েছ? ওই ত ডাকছে আমায়! রালি আমায়! দেখছ—খামছে না, কেবলই ডাকছে! ধামিসনা বাহু! ভাকু ভাকু আরো ডাক! বড় মিষ্টি লাগে!

ও কে ঘরে এলো? রান মুখ—চোখে জল! ঠাকুরপো? কি বলছ ভাই! কি বলতে চাও—বলতে পাছনা! হ্যা, কি বলে ডাকতে তোমায়? বড় আমার করে ডাকতে না? বড় আমারের জিনিষ ছিল তোমার! কোথায় গেল ঠাকুরপো! আমার বুক ধালি করে কোথায় গেল সে! বলে দাও! এনে দাও! কিরিয়ে এনে দাও তাকে! তার মুখের ওই ডাকটুকু ভূমি ত বুঝছিলে ভাই! কেউ যা মানেনি ভূমি ত মেনেছিল ভাই! তবে আজ তোমায় ছেড়ে কেমন করে চলে গেল সে!

কি-কি বলছ? বাইরে সকলে এসেছে? পাঁটা এসেছে? কেন? কি হবে? আমি বুঝতে পাছ না তোমাদের কথা! ধাঁট, লোক এসে কি হবে! নিয়ে যাবে কাকে? ওগো! আমায় বুঝিয়ে দাও! বুঝিয়ে দাও তোমরা এখন কি! আমার কি হয়েছে! আমার বি নিয়ে যাবে তোমরা! উঃ এত অন্ধকার কেন? নিশাশ বন্ধ হয়ে আসছে কেন? ওই! ওই! কে কাণে কাণে বলছে ‘যা হারিয়ে যায়—’ না না কিরিয়ে

দাও গো কিরিয়ে দাও! ওগো আর একবার দেখবে! শশননহীন কচি টোট ছাটের শেষ নীরব মা বলে ডাকটুকু একবার টোট দিয়ে মুছে নোবে! ওরে বাহু আমার! ছুখিনীয়া ধন! আমাককে ছেড়ে না থাকতে পারিস না তুই! তবে—তবে—কোথায় কুলে আছিস বাবা! ওরে আমাকেও নিয়ে যা সেখানে! ওকি! ওকি! হরিবোল দিলে কেন রে! কার বাছা কিরিয়ে না বলে চলে গেল! ওই যে ডাকছে মা বলে! যাই বাপ যাই!

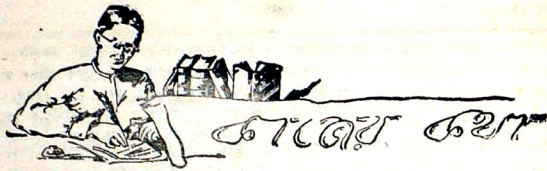
পেতি! বোন! কোথায় গেলরে সে? আমি আর উঠতে পাছি না! বরনা ভাই ডেকে—বোণা ছেলে গা নাড়া না দিয়ে বেড়ায়! না নেই সে যে আমার উঠবে না! আর নড়বে না! নই নেই নেই! তবু—তবু—ভনতে পাছি তার ডাক! উঃ মাগো আর যে পালা না!

চলে গেল গো—চলে গেল! এ চলে যাওয়ার কেঁসের সঙ্গে তুলনা নোবে! তরঙ্গ বন্ধে বৃন্দের সঙ্গে, না উদার আকাশে বিজলী বিকাশের সঙ্গে, না মরুভূমির বৃহৎ বৃষ্টিবিম্বের সঙ্গে! ওগো! উদার আকাশে বিজলী বিকাশ নয়—আকাশের বৃকে জলন্ত উজ্জ্বল—বেশান দিয়ে যায় পুড়িয়ে যায়—নিজে পুড়ে যেরে! মরু বৃষ্টি-বিম্ব নয়—তরঙ্গ বালুকা—পিরের পাণ পায় বেরনা জায়া! বেশ! বেশ মানিক! রইল তোলা একবার উত্তর! রইল তোলা আমার অভিমান! ঝরা ফুল! বৃহৎ ত এসেছিলি মায়ে! জলন্ত উজ্জ্বল! পাণ শিশু, সন্তা ভূমি তাই—জালিয়ে পুড়িয়ে থাক করে গেলে! সারা জীবনের জন্তে আঙন জেলে গেলে বৃকে! শুধু বালুকা! পায়ের নিচে ভুগি হল না—ভাই বৃষ্টি চোখে ঢুকে চির জীবনের অঙ্গর বাবস্থা করে গেলি রে! পাণাণ! পাণাণ! নিহুর! এই তোর মাকে ভালবাস!

সে আমার দূর সম্পর্কের ‘সেজদির’ ছেলে! আমার মা বলে ডাকতে! সেরদি নিজে হাতে আমায় উপহার দিয়েছিলেন তাকে! সে আমার ছেলে! হ্যা আমারই! সেজদির ছিল এক বুড়ে ছোট ছি! আমার ছিল এক হুগলে একটি কমল! অসত্যেন শুকিয়ে গেল!

ওই যে ডাকছে গো! হুরটি নিয়ে গেছে—বেশটি বেথে বেথে!





গত বৎসর ২২রা আশ্বিন তারিখে দেশবন্ধু ইহুদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন—উহার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে বাংলায় রাজনৈতিক অবস্থার যে শোচনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে উহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কি অসাধারণ ছিল—কি অপরিণীয় বৃদ্ধিমত্তা সহকারে তিনি এই আত্মসমর্পণ জাতিটিকে দীর্ঘ দীর্ঘ জাতীয় উন্নতির পথে পূর্বদলনা করিতেছিলেন। আজ উহার গর্বে বসিবার লোক শুধু বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতেও যে নাই তাহা অস্বীকার করা চলে না। আজ যে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহ রক্তক্ষয়ের দ্বারা ভারত জুড়িয়া ফেলিতেছে মনে হয় তিনি জীবিত থাকিলে মহেশ্বর আলী সৌকর আলীর এ অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিত কি না সন্দেহ—আর তার আবদার রহিমের এই মুসলমান প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইত কি না তাহাই সন্দেহের বিষয়। এক বৎসর পরে আমরা উহার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে উহার স্বদেশ প্রেমোদ্ভূত আত্মা এই কলহপ্রিয় ব্যাপারের বান্ধালী জাতিতে উন্নতির পথে নিরাক্রম করুক।

গত তরবারের বকায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি বতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত জয় লাভ করিয়াছেন। এই জয় লাভের দুলে কৌশল আছে বলিয়া অনেকে ইহার নিন্দা করিতেছেন—কিন্তু কৌশল ব্যতীত জয়লাভ হয় না—ইহা সন্দেহ, সমানভাবে সত্য। অপর পক্ষ জয় লাভ করিতে পারিলে তাহাও কৌশলেরই ফল হইত, তাহা না হওয়ায় বুঝা গেল যে বিরুদ্ধ পক্ষ হুকেশলী নহেন। হুকেশলী ভিন্ন অপরে দলপতির যুগ পাইবার যোগ্য হইতে পারেন না—আর বাংলার বর্তমান অবস্থায় বতীন্দ্রমোহন অপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি আর নাই—

বিরোধী পক্ষ জয়লাভ করিলে তাহাদের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া আবার গোল বাধিত আর দেশের কাজ এখন বাধা হইতেছে বিরোধী পক্ষ প্রবল হইলে তদনুশীল্যে বেশী কিছু হইত তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রসচিবের মধ্যে দুইটি দল হইল—কতগুলি প্রভাবশালী স্বরাষ্ট্রী ইংল্যান্ড বতীন্দ্রমোহনের দ্বিবিধ ক্ষমতা লাভে ইচ্ছাছিলেন, তাহারা এই-বার বিভীষণের দ্বারা প্রকট প্রহরবিচ্ছেদ অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ‘ফরওয়ার্ড’ নামক স্বরাষ্ট্রসচিবের মুখপত্রগুলির পরিচালক। কথায় বলে ‘কর্তব্য ইচ্ছায় বর্ধ উল্লেবে কর্তব্য’—এখন হইতে ফরওয়ার্ড কাগজ নামে ‘স্বরাষ্ট্রী’ হইলেও উহা স্বরাষ্ট্রসচিবপতি বতীন্দ্রমোহনকে সর্বোপায় মত আক্রমণ করিতে কুলিবে না। ফরওয়ার্ডের এই অদ্ভুত ভিগরাবী খাওয়ার ফলে উহার হুযোগ্য সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদস্বামী চক্রবর্তীকে সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। উহার অপরাধ তিনি বতীন্দ্রমোহনের কাণের সর্বমর্দন হুত্ব এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু উহা প্রকাশ করা ফরওয়ার্ডের কর্তাদের অনভিপ্রেত বলিয়া তাহারা উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। এতদ্বারা যে ফরওয়ার্ডের দল নীতির বিচ্ছেদ—তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই—এবং এই আচরণের ফলে পাঠক সমাজে ফরওয়ার্ডের প্রচার ও প্রভাব হ্রাস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই সব মদগর্জিত স্বরাষ্ট্র-নেতাগণ এইভাবে দেশবন্ধুর নীতিকো হত্যা করিয়া উহার দ্ব্যপিত পজিকার কঠ আত্মরক্ষণে বোধ করিয়া কি দেশসেবক বলিয়া বাহা পাইবার প্রত্যাশা করেন? যদি কখনও তবে তাহা হুশাণ ব্যতীত আর কিছু নয়।

হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট আপাততঃ ধামাচাপা রহিল। প্যাক্টের অবস্থা অনেকটা নিউমার্কেটের কবরস্থ পীরের মত হইল। উভয় সম্প্রদায়ের বর্তমানে খেয়ল মনোভাব দেখা বাইতেছে, তাহাতে কোন প্যাক্টরূপ রাখাণে আর ভালা মন ছোড়া লাগিবে না বলিয়াই বোধ হয়।

মসজিদের সমুদ্রে বাজনা লইয়া হাজী গজনভী সাহেবের সহিত মহারাজ বর্ধমানের একপ্রস্থ মনীয়ুক্ত হইয়া গেল। ইহাতে মহারাজ বর্ধমান খেয়ল নিরপেক্ষতা সন্ময়তা ও তেজবিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্ত-সাধারণ। মহারাজের জয় হোক।

স্বরাষ্ট্রী সাহেবের স্বজাতীয় কাউন্সিলারগণ একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা স্বত্বাধীন সর্বভোগ্য সাহায্য করাই কর্তব্য মনে করেন, সাধারণের নিকট যে তাহাদের একটা দায়ীত্ব আছে সে কথা একবারও ভাবিলে তাহারা তরুণ কার্য করিতেন না। গায়ের জোরে ছায়ে প্রতীতি হয় না—বা অস্ত্রায় ধারা অস্ত্রাঘাত সর্বমর্দন করিলে তাহা স্থায়ী হয় না এটা তাহাদের স্বরণ করা উচিত।

ট্রাম কোম্পানী এবার দেখিতেছি বছরে চালে কিত মাং করিবেন—২২শে জুন হইতে আবার একপ্রস্থ ভাড়া কুমাঁয়ার বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—ইহার মধ্যে ট্রাম কোম্পানীর মোটরবাস ওট্রামের মধ্যে অল্প ভাড়া পরিবর্তন টিকিটের ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের দেশী বাসগোঁড়ার এক এদেশিগণের গড়িয়া ‘ট্রাম’—না—বাস ২” বলিয়া এক বিজ্ঞাপন ছাড়াই লোকের স্বদেশ-প্রীতির দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন—কিন্তু ‘শিখরে শমন’ সে বিষয়ে তাহাদের যেটাই লক্ষ্য নাই। এ সম্বন্ধে আমরা তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বিশেষ ফল পাই নাই। প্রতিযোগিতার যুগে কেবল মাত্র স্বদেশ প্রীতির দোহাই দিয়া যে টেঁকা যায় না তাহা কি বাস এদেশিগণের সেকেন্ডারী মনোহা জনেন না?

করিতে চাই। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে বাসগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। বাসের মেসেঞ্জর নিয়মিত ফাঁট দেওয়া হয় না—খোঁয়া হয় বলিয়াও বোধ হয় না। সন্দেহাই জ্ঞাতর মহলা, বিড়ি সিগারেটের সন্ধ্যাবন্দ, পানের ছিঁড়তা শিক্তী ও খুঁড়তে বাসের মেসেঞ্জর ভরা থাকে। গুণালফোর্ডের বা ট্রাম কোম্পানীর বাসগুলি নিয়মিত খোয়া কাড়া ও পোঁছা হয়—ইহা দর্শকগণের নিকট একটা প্রবল আকর্ষণ। সত্য সমাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে যে একটা বিশেষ দৃষ্টি থাকে সে বিষয়ে উদারগণ হইলে চলিবে না।

মহেশ্বর আলী একদিন বড় গলায় বলিয়াছিলেন যে মুসলমানেরা কাকেরকোর মত মরিতে ভয় করে না এ কথাটা সত্য কি না তাহার এখনও কোন প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই; তবে তাহারা যে প্রকৃতভাবে লোককে আক্রমণ করিতে পারে ও ধরা পড়িতে ভয় করে সে সম্বন্ধে সন্দেহিত হইতে উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। ২২রা আশ্বিনের বহুমতীতে পড়িয়া ‘১৬ই জুন প্রাতে ১০টার সময় আশারাম মির্জামল কোম্পানীর রাজপুত দোহায়ান বখন হারিসন রোডের দিহা নিকটর মসজিদের সমুদ্রে দিয়া যাঁতেছিল, তখন মসজিদের ছাত হইতে তাহার বাম পায়ে একটি ইট মারা হইয়াছে। ফলে সে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।’ ‘১৪ই জুন বেলা ১১টার সময় পাটের দালালদিগের একখানি অক্ষি গাড়ীর হিন্দু কোচড্যানকে নাথোদা মসজিদের সমুদ্রে একজন মুসলমান যুগ ইট মারিয়াছিল। মুসলমানটি ইট মারিবার পরই মসজিদে গিয়া আশ্রয় লয়। সে সময় মসজিদে আরও অনেক লোক ছিল। কোচড্যান একজন ‘কনটেবল’ক এক সংবাদ দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর কি হইল তাহা আর জানা যায় নাই। ইহার উপর কোন মন্তব্যের আর প্রয়োজন নাই।’

স্বাভাব্য জীৱীসমুচ্চয়ে ও যুগাচার্য আচার্যসাহ জীবন বিবেকানন্দ মহারাজ বর্ধমান যুগের প্রথম ও প্রধান



সাধন জীবনোত্তরই অবলম্বন করা স্থির করিয়াছেন। প্রত্যেক মানবই নিজ নিজ বৃত্তি ও উপকীৰ্ত্তি দ্বারা এই ত্রৈত্যের পূর্ণ উদ্বেগ বজায় রাখিয়া গোণ উদ্বেগ সহাবে নিভাভাব মোচন করিতে পারেন, ইহাই যুগাবতার ও যুগাচাঞ্চল্যের সোবাধ। ঠিক এই উদ্বেগ প্রাণোদিত হইয়া বৃত্তি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণ অক্ষয়দ্বারের মিত্র, এম-বি, (হোমিও) ৩০২, বহুপাড়া লেনস্থ ভবনে "রামকৃষ্ণ-সেবার্থ" নামে এক আর্ট সোবাপ্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। আশা করি তাঁহার সাহায্যে

এই সেবার্থ দ্বারা স্থানীয় গম্ভীর অভাব কতকটা মোচন হইবে।

দোলকৃত্তী বালক সন্ধ্যের ফ্রেক্টোরা (হাট সিকুরাল, ফরিদপুর) জানাইয়াছেন যে ১০ই জুনের পরিবর্তে আগামী ১৭ই জুন পর্যন্ত তাঁহার প্রবন্ধ গ্রহণ করিবেন। আর তাঁহার। যে ৮০ আনার ডাক টিকিট চাহিয়াছেন তাহার উদ্বেগ মানবাহুদরীর সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ প্রত্যেক লেখকের নিকট প্রতিযোগিতার কলাকল জ্ঞাপন করা। আশা করি ছাত্রসমূহ এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সন্ধ্যের উৎসাহ বন্ধন করিবেন।

## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

কালিদাস-১৩৩৩-৪-মুন্সী-শৈলজা  
প্রেমেন্দ্র সম্পাদক-ত্রয় "কালি কলম" লইয়া মাসিক সাহিত্যের আসরে নামিলেন। The more, the merrier! "কালি, কলম, মন,—লেগে তিন জন।" এই প্রথম শাখায় কিন্তু তিনজনই সাহচর্যের পরিচয় পাইলাম না। শৈলজাবাবু, প্রেমেন্দ্রবাবু একাধিক খোঁষা লিখিয়াছেন। মুন্সীশিববাবু কি যবনিকার অন্তরালে বসিয়া কেবল "মুন্সী বাজাইতেছেন?" (Playing the piper?), এই নবজাত মাসিকস্থানি পাঠে আমাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে বর্তমান বর্ষ সাহিত্যেয় গতি কোন পথে এবং প্রকৃতি কিরূপ? বাস্তবিক কি বাস্তবায়ন এটা লম্বা সাহিত্যের যুগ? বাস্তবী পাঠক কি গুরু গম্ভীর বিষয়ের পরিবর্তে লম্বা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অগ্রহণ করিয়া পড়িয়াছেন, এবং সেই জন্তই রঙ্গ-চিত্র, রস-রচনা, অবৈধ মিলন-বসাক গল্প প্রকৃতি চটুল ও লম্বা বিষয়ের প্রতি এক শ্রেণীর পাঠকের অগ্রহণ ব্যতীয়া সম্পাদক আমাদের অগ্রহণ ব্যতী আশঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় এক দক্ষ "বিজ্ঞানী" পচা ভোরায নামিয়া পাক খাটিয়াছেন, আবার এই "কালি-কলমেও" তাঁহার সেই প্রিয় কার্যের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ

করিয়াছেন। তবে, যে পাকে কমলের জন্ম ইহা সে পাক নহে; ইহা সংয়ের বস্তির পুতিগন্ধময় নন্দমার আন্তরল পূর্ত্য—অতি কর্ণা। এ কার্যে প্রেমেন্দ্রবাবুর আনন্দ এবং সম্পাদকীয় সাধু উদ্বেগ সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু পাঠক সমাজে বিবমিষা ও নৈতিক পীড়া উপস্থাপন করিলে।

"লেখকবাজ সামন্ত" এই ছদ্মনামধারী লেখকটি কে তাহা আমরা জানি না। তিনি সম্পাদক-সন্ধ্যের অন্ততম হউন বা অল্প কেহ হউন, তাঁহার কচিত্ত প্রকাশ্য করিতে পারিলাম না। ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন অনেক সংঘে চক্ৰবর্তীর পরিচায়ক কেন না কৃষ্ণাধি করিয়া ধরা পড়িবার ভয় থাকে না। লেখক যিনিই হউন, তিনি কাণ্ডগোল, বিকৃত কৃতি এবং সং সাহিত্যের ঘোর শত্রু। এইরূপ অশ্লীল ও কুংসিত ইঙ্গিত পূর্ণ গল্প সম্পাদকজয় কি উদ্বেগে পত্রক করিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। সম্পাদকজয় পত্রের মুখপাত্রে সাহিত্য সম্রাট বসিমজের ছবি ছাপিয়াছেন। ইহা কি স্বর্গীয় সাহিত্যিককে উপহাস করিবার জন্ত? যিনি আজীবন সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সাহিত্য "মন্দিরের অগ্নি হইতে আত্মজ্ঞান দূর

করিবার জন্ত সমালোচনার শতযুগী হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁর সমালোচনার কথাতো বৈ-আপন লেখকগণকে উচিত শিক্ষা দিতেন, তাহার প্রতিষ্ঠাতিকে "কালি কলমেও" নির্দোষিত রচনাগুলি এবং তৎসঙ্গে সম্পাদকজয়ও যেন দস্ত কৃতি-বিশিষ্ট করিয়া উপহাস করিতেছে! এবং বুধাঙ্গী দেখাইয়া যেন বলিতেছে,— 'বুদ্ধ! এই দেব আমরা জন্মে জন্মে সাহিত্য সম্রাট বসিমা গিয়া তোমার শৃংখলাসনের চারিধারে তাবলীলা আরম্ভ করিয়াছি—আজ আমাদের অবশ্য স্বাধীনতা অধাব বিব্রপ্রেম, দুর্জয় শক্তি। আজ আমরা তোমার তোমারকা রাখি না।"

"বোহানের বিহা" অন্ততম সম্পাদক শৈলজাবাবু লেখা একটি গল্প বা চিত্র। ইহাও একই স্বরে বাঁধা একই রসে রঞ্জিত। শৈলজাবাবু পাণ্ডুর কল্যাবনীর তিমিরগর্ভ হইতে ইতঃপূর্বে দুই একখানি বাহী পাথর বাহির করিয়া তাহার পাঠকবর্গকে চমকিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল তাঁহার প্রায়শ কেবলমাত্র কল্যার কালি মাথাতেই পর্যাবসিত হইতেছে। আলোচ্য গল্প সম্বন্ধেও আমাদের ইহাই মন্তব্য।

শৈলজাবাবু আর একটি চিত্র—"মহাযুদ্ধের ইতিহাস" ইহার আরম্ভ বেশ ইয়াছে। এক্ষণে পরিণতির অপেক্ষায় বহিলা। কবিতায় দিক দিয়াও সম্পাদকগণ নুতন দেখাইবার প্রয়াসী। স্বয়ং (সিদ্ধ?) সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র ছুইটি কবিতা লিখিয়াছেন—তাহার "মগের মগের" সার্বক ইয়াছে কেননা বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্র এখন মগের মুক। লেখাটির কবিত্ব ছেলে-ভুলান-মাসিকের কবিতা বিশেষের পাঠে স্থান পাইবার যোগ্য। প্রেমেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় কবিতা "মাহুয়ের মানে চাই"। কবি মুকর্ষাছেন—

রক্ত, মাংস, হাড়, মেঘ, মজ্জা,

স্থখা তৃষ্ণা, লোভ কাম হিংসা সমেত

গোটা মাহুয়ের মানে চাই।

হায়! কবির এ আশ্বাস কে মিটাইবে; "কাম, কোপ, লোভ, হিংসা সমেত গোটা মাহুয়ের মানে" জানা বড় সহজ, যদি মানব আত্মদর্শন করিতে জানিত। লেখক কবিতা শেষে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

মাহুয়ের মানে চাই।

মাহু কি তার হস্তির মাংসে বিধাতার

নিজের জিজ্ঞাসা?

তাই কি মহাকালের পাতার তার অর্থ

কেবলি লেখা আর মোহা চলছে?"

কবি স্থখা-তৃষ্ণা-কাম-হিংসা সমেত গোটা মাহুয়ের মানে চাহিয়াছেন, পাঠক কিন্তু তৎপরিবর্তে এই কবিতার মানে জানিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। কবির যেমন সন্দেহ হয় যে মাহু বৃত্তি বিধাতার নিজের "জিজ্ঞাসা" আমাদেরও তেমন মনে হয় কবিতাটি বৃত্তি একটি জটিল হৈয়ালী অথবা একটি বৃহৎ জিজ্ঞাসার চিহ্ন(?)।

"নাগার্জুন" মোহিত লাল মজুমদারের একটি বৃহৎ কবিতা। মোহিত বাবু শব্দের মামলাও অজ্ঞরণের ইচ্ছা সহযোগে নাগার্জুনের রাসায়নিক কটাহে এক অশুভ তীক্ষ্ণ তৈয়ারী করিয়াছেন, ইহাতে, "কপালী মৃগ-মধু", "রতি-রাগ", "শ্রেয়সী", "হুতাশ চূচুক", মদিরাকী বসন্ত সেনা, ঋণ আলিঙ্গন, "শঙ্কিত সফেতম বৃকের বর্ষুল" প্রকৃতি যুগলনের লোভনীয় সামগ্রীর অভাব নাই। পাদটীকায় দেখিলাম কোন মার্কিন কবির কবিতা অবলম্বনে লিখিত। "সম্মান মার্কি" স্বত্তেও আমরা এ কবিতার কটির সন্ধান করিতে পারিলাম না।

আজকাল মানিকের পাঠক অনেক বৃদ্ধি ইয়াছে। বাস্তবীরা শুদ্ধাঙ্গ হুবিহার সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিয়া অবসরে কাল যাপন করেন।

'কালি-কলমে' মত পত্রিকাকে নিঃসঙ্কেতে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার দেওয়া যায় কিনা এবং ইহা স্থল কলমেজের কিশোরা ও যুবকগণের পাঠযোগ্য কি না তাহা বিবেচ্য।





## বৌ-দিদি

শ্রী অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক

যেতামুখ না হইলেও রাম লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃসহ  
একালে একেবারেই বিরল নয়। অনিল ও সুনীলের  
মধ্যে সম্বন্ধটা এতই গভীর ছিল যে, একজন যেমন  
অপরকে বেহে-প্রীতির দ্বন্দ্ব দ্বারা নিরুৎসাহ করিয়া রাখিত,  
অপরও তেমনি ভক্তি ও প্রাণস্বার্থ ইহার পায়ে নত হইয়া  
থাকিত। অনিল ছিল ভালবাসার মূর্ত্ত বৈবাহিক—সেহের  
অজ্ঞেয় আরম্ভে আত্মীয় আত্মীয়্য সকলকেই রাখিয়া  
রাখিয়াছিল। তাহারই শান্ত স্বভাবের তলে সুনীলের  
শত আব্দার—সংসর্গ প্রার্থনা অস্বহুল ভাবেই বহিয়া  
চলিয়াছিল।

পিতৃহীন হইয়া অনিল কলেজ ছাড়িয়া নিজের বেশে  
সিউরিতে একটা কাৰ্য্য লইল এবং মাতার যোগাৎ তলে  
নিজঘরে থাকিয়া ছোট ভাই সুনীলের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা  
করিল। সুনীল সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম  
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আই, এস, সি পড়াবার  
ইচ্ছা করিল। অনিলও তাহার ইচ্ছায় ব্যাঘাত না  
দিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল।

জীবনে এই প্রথম মা ও ভাইকে ছাড়িয়া আসিয়া  
সুনীল কয়েকদিন মনস্থির করিতে পারিল না। হোষ্টেলের  
নিৰ্জন গৃহে একাকী ভইয়া থাকিয়া সে ভাবিতে লাগিল  
—তাহাদের ঘরের কথা। জনবহুল কলিকাতা সহরের  
সমস্তটা আনন্দ করিয়া তাহার শান্ত গৃহস্থানি ভাসিয়া  
উঠিল—মায়ের আদর—ভায়ের সহে এতদিন তাহার  
নিজের অন্তরকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ  
কালের মনে পড়িল একদিন তাহাদের পায়ে টিপাণাখটি  
পিজুরের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং মুক্ত  
আকাশেরে বাহু-স্রোতের মাঝখানে পড়িয়া অস্থির হইয়া  
চিন্তার করিতেছিল; অবশেষে যখন সুনীল তাহাকে  
পুনরায় পিজুরের মধ্যে রাখিল, তখন যে শান্ত হইল। সে

ভাবিতে লাগিল সেই পাখীটার কথা,—তাহারও আজ  
সেইরূপ অবস্থা। তাহার এক একবার মনে হইতে লাগিল,  
সব ছাড়িয়া পুনরায় দেশে ফিরাইয়া যায় কিন্তু আশ্বাসের  
উচ্চমুষ্টি তাহাকে প্রতিমুহুর্ত্তে সাবধান করিয়া দিত।

সুনীল যে ঘরটিতে থাকিত, তাহাতে অল্প কোন  
ছাত্র থাকিত না। সে ইচ্ছামত ঘরখানি সাজাইয়া  
রাখিয়াছিল। তাহার ভাল ভাল ছবি কিনিবার ঠোঁক  
ছিল। সে নিকে একটু একটু ছবি আঁকিতে পারিত  
এবং বাগলা সাহিত্যেও তাহার বেশ অধিকার ছিল।  
ঘরখানি সে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মহান ব্যক্তির চিত্রে  
ভরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ঘরের ঠিক দক্ষিণদিকে  
একটা জানালা ছিল; জানালার পাশেই ঠিক এক হাত  
দূরে একটা বাড়ী ছিল এবং এই জানালার সম্মুখেই  
সেই বাড়ীটার একটা জানালা ছিল। সে জানালাটি  
সর্বদা বন্ধ থাকিত,—কাজেই সুনীল সে বাড়ীর কাহাকেও  
দেখেন নাই।

দেখিতে দেখিতে কয়েকমাস কাটিয়া গেল সমুদ্রে  
বাৎসরিক পরীক্ষা আসিল, পরীক্ষার পরেই গ্রীষ্মের  
ছুটি হইবে। সুনীল গ্রীষ্মাবকাশের জন্ত উৎসুক  
হইয়া বহিল,—ছুটি হইলেই বাড়ী যাইবে—আবার মা  
ও দাদার সহে উপভোগ করবে। কতদিন পরে ভাল  
করিয়া তাহার অতীত জীবনকে আবার ফিরাইয়া পাইবে।  
দাদীঘরের কটন পর্দা তাহার জীবন শুক হইয়া উঠিয়াছে  
—এ রিষ্ট জীবন একবার নিশ্চিন্তে এলাইয়া দিয়া সে  
আবার নবজীবন ভোগ করিবে।

একদিন সকালে সে তাহার মায়ের একখানি চিঠি  
পাইল। মাতা অনিলের বিবাহ সংবার দিয়া তাহাকে  
আনিবার জন্ত লিখিয়াছেন। এ চিঠি পাইয়া সুনীলের  
মন উৎসুক হইয়া উঠিল। দাদার বিবাহ!—এ আনন্দ যে

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা]

বৌদিদি

১৪৭৭

ছই

সে কল্পনাও আনিতো পারিল না, তাহাদের মেহের গ্রহি  
হৃদয় করিতে একজন বেহেম্বরী নারীর আশ্রয়। তাহার  
নিজের ভগিনী নাই—ভগিনী সমা বৌ-দিদিকে পাইয়া  
সে ভগিনীর অভাব ভুলিতে পারিবে। তাহার বেহেম্বরী  
বৌ-দিগির নিকটে নিৰ্ভর্যাবে আশ্রয় করিয়া ইঙ্গিত  
ভিনিষ আদায় করিয়া লইবে—ওঃ কি আনন্দ—সে  
ভক্তির কবে আসিবে। ভক্তি নির্খালা সেই অপরচিত্তা  
নারীর পায়ে আনন্দে উৎসর্গ করিয়া সে তাহার মেহের  
কাশাল হইয়া পাড়াইবে—তাহাকে সে ছবি আঁকিতে,  
কবিতা লিখিতে শিখাইবে—ছইজনে বাগলা সাহিত্য  
আলাচনা করিবে—তাহার লেখার একজন সঙ্গী পাইয়া  
নবোৎসাহে সে সাহিত্য সেবা করিবে।

কিন্তু মাঘ যাহা ইচ্ছা করে, তাহা যদি সকল সময়  
সব হইত, তাহা হইলে দেবতা মাঘে কোন প্রত্যঙ্গ  
থাকিত না। যেদিন সুনীলের দাদার বিবাহ হইবার  
কথা, ঠিক সেই দিন হইতে তাহার বাৎসরিক পরীক্ষা  
দাখ হইল। সুনীল একেবারে ভয়ানক হইয়া পড়িল।  
সে এতদিন ধরিয়া যে আনন্দকে মুষ্টি দিয়া গড়িয়া  
ভূমিয়াছিল—মাঘের শান্ত, পবিত্র আলোকের তলে থাকিয়া  
সে স্বপ্ন অশ্রুব করিতেছিল—তাহা আজ একেবারে  
মট হইয়া। প্রতিদিন তিল তিল করিয়া স্বপ্নের আবেগ  
বাড়িয়া উঠিতেছিল,—আজ কোন অদ্ভুত অশ্রু লগ্নে  
তাহা এক নিমেষে বিলীন হইয়া গেল। একদিকে  
দাদার বিবাহের স্বপ্নময় চিত্র, অপর দিকে বাৎসরিক  
পরীক্ষার মহাদায়ী,—কোন দিক সে আজ ধরিয়া  
রাখিবে। ছই বিপরীত চিন্তার মাঝখানে পড়িয়া সে  
অস্থির হইয়া পড়িল।

দীরে দীরে সে শেষ পরীক্ষা দিয়া হোষ্টেলে ফিরায়া  
আসিয়া ভইয়া পড়িল। সাতদিন পূর্বে তাহার দাদার  
বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নব পরিণীতা বৌদিদি এতদিন  
বাগের বাড়ী চলিয়া গেছে—সে বাড়ী গিয়া আর তাহাকে  
দেখিতে পারিবে না—তাহার সকল সম্বন্ধ ভিজিহীন হইয়া  
গেল। একদিন এই সব চিন্তার জন্ত ভালরূপ পরীক্ষা  
পড়া দিতে পারে নাই। যে উৎসাহ তাহার ভাসিয়া  
গিয়েছে এ জীবনেও বৃষ্টি তেমনি উৎসাহ আর সে ফিরায়া  
গাইবে না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর সুনীল পুনরায় কলিকাতায়  
আসিয়াছে। সেদিন কিসের ছুটি ছিল, সুনীল দ্রুপবেলা  
তাহার বিদ্যানায়ক ভইয়া একটা কলিত কবিতার ভাষা  
বুঝিতেছিল। হঠাৎ দেখিল পাশের বাড়ীর জানালাটি  
খুলিয়া গেল এবং তাহার নিকটে একটা মারীমুষ্টি দণ্ডায়-  
মান। জীলোকটা ভাড়াইয়া তাহার কবিতা  
দেখিতেছিল। সুনীল ভাড়াভাড়া উঠিয়া নিজের ঘরের  
জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সে এতদিনের মধ্যে এই প্রথম ঐ বাড়ীর দোককে  
দেখিতে পাইল। বরাবর ঐ জানালাটি বন্ধই থাকিত,  
আজ হঠাৎ তাহা খুলিয়া গেল কেন?—আর ঐ কিলোরাই  
বা কে!—ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন তাহার মনে আসিতে  
লাগিল। সে লক্ষ্য করিয়াছিল জীলোকটার লম্বাটে অঙ্কল  
সিন্দুর বিন্দু ছিল। এই বিবাহিতা নারী কেন তাহাকে  
দেখিতেছিল? সে একবার ভাবিল হয়ত কোন অসং-  
শ্লিষ্টপ্রায় তাহার মনে ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সরল  
মন বলিয়া দিল বোধ হয় সে কেবল উৎসুক্যবশতই  
তাহার কবিতা দেখা দেখিতেছিল। সেদিন আর তাহার  
কবিতা লেখা হইল না। নানারূপ চিন্তা তাহার অলস  
মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কয়েকদিন আর পায়ের বাড়ীর জানালা খোলা হয়  
নাই। কাজেই সুনীল তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া  
রাখিয়াছিল; কারণ ঐ জানালা বন্ধ করিলে ঘরে ভালরূপ  
আলো আসে না। একদিন সুনীল বাহির হইতে ফিরায়া  
দেখিল কতকগুলি আলুর কচুরী তাহার বিদ্যানায়ক  
পড়িয়া রহিয়াছে। সে আলুর কচুরী খাইতে ভালবাসে  
এবং বাড়ীতে তাহার মাতা তাহার জন্ত প্রায়ই প্রস্তুত  
করেন। কিন্তু এখানে ভালরূপ গৃহে তাহার ইঙ্গিত  
থাক করণে আসিল? সে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া  
খাইতে বসিল। সমস্তই তাহার যেন রহস্যময় বলিয়া  
মনে হইল। হোষ্টেলের নিৰ্জন গৃহে সে আজ তাহার  
প্রিয় আলুর কচুরী খাইতেছে!—তাহার হাদি পাইল।

সেই সময়ে পাশের বাড়ীর জানালা খুলিয়া সেই  
তরুণী জিজ্ঞাসা করিল—“কেনম হইতেছে?”



বিস্তৃত হনীরেল মুখ কথা ফুটিল না। সে নির্বাক হইয়া রহিল।

তরুণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—‘কেমন হয়েছে?’

হুনীল ধীরে ধীরে বলিল,—‘আপনি দিয়েছেন? তা’ বেশ হয়েছে; কিন্তু এ দেবার কি উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না! আপনি কেন এ দিলেন?’

তরুণী একটু হাসিয়া বলিল,—‘কেন দিতে কিছু দোষ আছে নাকি?’

হুনীল বলিল—‘দোষের কথা নয়, তবে আপনার বাড়ীর লোক শুনে কি বলবেন? তা ছাড়া আমি একজন অপরিচিত বিদেশী লোক, আমার এ দিলেন কেন?’

তরুণী পুনরায় হাসিয়া বলিল,—‘বাড়ীর কেউ কিছু আমার বলবেন না—ভীরা কিছু জানেন না। আপনিও কিছু প্রকাশ করবেন না।’

তাহার অসমাপ্ত বাক্যে বাধা দিয়া হুনীল বলিল,—‘সুকিরে উঠিয়েছেন? আর কখনও যাবেন না?’ এই বলিয়া টিগেয়া জানানো বন্ধ করিল।

কচুরীগুলি একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সে ভাবিতে লাগিল, কে এই তরুণী—কি তাহার উদ্দেশ্য। আজ তাহাকে অতি প্রিয়জনের মত তাহার প্রিয় ধারার ধাওয়াইচ্ছে—তাহার সহিত অতি আত্মীয়ের মত কথা কহিল—এ কে!

আর একদিন সে দেখিল তাহার ঘরে ছুইখানি হৃদয় কমল পড়িয়া রহিয়াছে। একখানির উপর বেশী দৃষ্টি লেগা আছে—‘স্নেহোপহার’; অপর-খানিতে ‘প্রথম-স্বত’। হুনীল কমল দেখিয়া রাগিয়া উঠিল। কমল দু’খানি এক পাশে দৃঢ়ভাবে কেলিয়া ভাবিল,—যেমন করিয়া হ’ক এই কমল কিয়তাই দিতে হইবে। যে নারী গোপনে এই সঞ্চল করিতেছে, তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে বিবাহিতা রমণী স্বামীর অপোচরে কোন কিছু করিলে পারলিখা হবে। তাহাকে এই অবনতির পথ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। আর সে কেনই বা তাহাকে এইরূপ দিতেছে! সে একজন ছাত্র বাক্য। তাহার রূপ নাই, গুণ নাই—গরীব

ছাত্র পড়া শুনা করিতেছে—এই কি তাহার অসমাপ্ত? সে নিজেকে সহস্র প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে। তাহার মা আছে ভাই আছে—বৌদিদি আছে—তাহাদের কেহের মধ্যদ্বারা রাখিবে—সে নিজেকে কিছুতেই এই পথে চালিত করিবে না। তাহার সমুদয়ে যে মহান আদর্শ আছে—সেই আদর্শকে শত প্রকারে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। যদি এমন কিছু দেখে, যে ঘর পরিবর্তন করিয়া লইবে। নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও বাঁচাইবে।

### ভিন

সপ্তাহখানেক পরে একদিন চাকর আসিয়া হুনীলকে ধরার দিল নীচে একজন ভল্লোলক তাহাকে ডাকিতেছেন। হুনীল নাগিয়া গেল এবং দেখিল একটা প্রবীণ বৃদ্ধ পাড়াইয়া রহিয়াছেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার নামই কি হুনীল বাবা?’ হুনীল বিম্বিত হইয়া বলিল—‘হ্যাঁ।’

তিনি বলিলেন,—‘আজ তোমাকে আমাদের বাড়ীতে খেতে হবে বাবা,—সন্ধ্যার পরই যোগে। আজ বাড়ীতে কি ব্রত আছে, একজন রান্ধণ খাওয়াতে হবে—তা’ কাকে বলা যায় ভাবছিলুম; আমার মেয়ের বসলে এই মেসে হুনীল বলে একটা ছাত্র থাকে, সে ভাজিতে রান্ধণ তাকেই বল সে তোমার নাম কি করে জানলে, তা আমি না বাবা, কিন্তু তুমি যোগে।’

হুনীল একবার ভাবিয়া লইল বাওয়া উচিত কি না। সেই রমণী ছল করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে—সে যাইলে পুনরায় তাহার সহিত দেখা হইবে। সে ভাবিল বাওয়াই উচিত। গিয়া কমল দু’খানি কেমন দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে আর যেন কখনও এরূপ না করে। সে যাইলে তাহার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিতে আসিবে; আসিলেই সে বলিয়া দিবে।

নতমন্তকে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ ভল্লোলকীয় কথাবার্তায়া সে বেশ আনন্দিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা হুনীল এখন পানের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ বাইতে গেল, তখন বাড়ীর কড়া বাড়ীতে ছিলেন না—চাকর তাহাকে বলিতে বলিল—‘সে কপিত বকে একটা চেয়ারে বসিল।’

প্রায় দশ মিনিট পরে সেই তরুণী সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই হুনীল তাড়াতাড়ি কমল দু’খানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেল। তরুণী তাহার হাত ধরিয়া বসাইল। হুনীল যত্নসচিত্র পুতুলের মত বসিয়া পড়িয়া বলিল,—‘আপনি আমার বুঝতে পারছেন না, আমি—’

তাহাকে বাধা দিয়া তরুণী বলিল—‘বুঝ বুঝতে পেরেছি, আপনি হুনীল যুগোপাধ্যায়,—সিউরিতে আপনার বাড়ী।’

অভিজুত হুনীল নীরবে চাহিয়া রহিল। তরুণী বলিল—‘আপনার কবিতার খাতাখানি আমার একবার দেখেন? আমার কবিতা পড়বার বড় যৌক।’

হুনীল বলিল—‘আপনি জানান না, আমি কি বসন লোক। আমি আসে! ইচ্ছা করি না যে আপনি এই রকম করে আমার সঙ্গে কথা বন্দ।’

তরুণী হাসিয়া বলিল,—‘কেন তাতে কি দোষ আছে?’

হুনীল বলিল,—‘দোষ কি গুণ সে বিচার আমি করতে চাই না; তবে আমাদের সঞ্চদে আমার মনে যে ধারণা বহুমূল আছে,—তা ভেঙ্গে দেবেন না। আপ-না মায়ের জ্ঞাত, আপনার সঞ্চদে যেন কোন অংশ ধারণা কখনও আমার মনে স্থান না পায়—এই প্রার্থনা। আমার অহংসের আমার এরকম করে আর অস্থির করবেন না—আমি চলে যাই।’

তরুণী বলিল—‘না,—না থেয়ে যেতে পাবেন না। খাচ্চা ভালবাসাটা কি এতই ধারণা জিনিস?’

হুনীল পূজীরভাবে বলিল,—‘ভালবাসা ধারণা নয়—কিন্তু তারও মধ্যদ্বারা আছে—আপনার দেখছি বিয়ে হয়েছে—কেন আমাকে এমনি করে—’

বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া তরুণী বলিল,—‘কি করছি! আমাকে? আপনি যদি আমার ভাই হতেন, তাহ’লে কি কমল দেওয়াটা এতই ধারণা হত?’

শ্রদ্ধা হুনীলের দৃষ্টির ভরিয়া উঠিল। সে ছুই হাত বাড়ি করিয়া বলিল,—‘আমি তুল বুঝছি, আমার কমা ফকন।’

তরুণী বলিল,—‘তুমি সত্যই আমার ভাই হও। তুমি ধানো না কিন্তু একদিন জানতে পাবো। না বুকে আমাকে যে এত কথা শুনিতে দিলে, তখন বুঝতে পারবে, কি দোষ আর তুল করছে!’

হুনীল বিম্বিত হইয়া বলিল,—‘আপনি কে বলুন আমার!’

তরুণী বলিল,—‘এখন বলুন না। তবে আর আমাকে তুল বুঝো না—এস খাও এস।’

হুনীল বাইতে বসিল; পাশে সেই তরুণী বসিয়া থাকিয়া অতি বদলের সহিত তাহাকে আহ্বান করাইল। হুনীল বার বার তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু প্রতিবারেই সেই এক উত্তর পাইল—‘পরে জানতে পারবে ভাই।’

তারপর হইতে হুনীল প্রতিদিন তাহাদের বাড়ীতে যাইত,—তাহার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। তরুণীও হুনীলের বাড়ীর—মায়ের—দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিত।

### চাকর

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল।

হুনীল বাড়ী গিয়া শুনিল, শীঘ্রই তাহার বৌদিদি আসিবে। কত আশার সে সেই শুভ মুহুর্তের অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম পরিচয়ে কেমন করিয়া দুইজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইতে পারে—সে তাহাকে স্নেহ করিতে পারিবে কি না—এই সমস্ত চিন্তা তাহার মনের মধ্যে আসিতে লাগিল। পূজার ছুটিটা বেশ আমোদে কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া উৎসুক হইয়া রহিল।

হুনীল নবমুখ উদ্ভিলাকে লইয়া সিউরিতে আসিল। অতি বিশ্বাসে হুনীল দেখিল, কলিকাতার সেই তরুণী।

তাড়াতাড়িতে সে প্রথম পর্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেল।

উদ্ভিলা প্রথমই হাসিতে হাসিতে তরুণীকে বলিল,—‘আমায় একটা প্রণাম পর্যন্তও কি করতে নেই ভাই?’

হুনীল প্রণাম করিতে যাইতেছিল, উদ্ভিলা তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—‘খাও ভাই আর প্রণাম করতে হবে না।’

হুনীলের মা বলিলেন,—‘তোরা বৌদি কেমন হয়েছে দেখিল হুনীল,—মা আমার বড় ভাল মেয়ে।’

হুনীল উদ্ভিলার দিকে একবার তাকাইল তারপর হাসিয়া মাকে বলিল,—‘মা, আজ বৌদিকে আমার সঙ্গে আলুর কচুরী করতে বসো ত,—কেমন পাবেন দেখব।’

অনিল সরিয়া গেল।

কন্যামিত্র ধরিয়া হুনীল আর উদ্ভিলার গল্প ফুটাইল না।

হুনীল বুঝিতে পারিল তাহার দাদাই এই চকাতের মূল।

...উদ্ভিলার বিবাহ হইয়াছিল তাহাদের গ্রামের বাটীতে। বিবাহের পর তাহার পুনরায় কলিকাতায় গিয়াছিল এবং অনিলের পরামর্শে এ বন্ধ করিয়াছিল।





## গ্রন্থ-সমালোচনা

দেশবন্ধু-স্মৃতি—ব্রহ্মসিংহ দেশসেবক ত্রিযুক্ত  
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের রচিত এই পুণ্য কাহিনী  
পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ ক্রীতলাভ করিয়াছি। গত  
বৎসর ১৬ই জুন তারিখেই দেশবন্ধু দাঙ্গিলিংগে দেহত্যাগ  
করিয়াছিলেন। একবৎসর যাইতে না যাইতেই দেশবন্ধুর  
মহিমাময় জীবনের বহু অজ্ঞাত কথা দেশবন্ধুরই  
একজন প্রধান ভক্ত লিপিবদ্ধ করিয়া দেশবাসীকে যে  
উপহার দিতে পারিয়াছেন সেজন্য তিনি সাধারণের  
কৃতজ্ঞতার পাত্র। দেশবন্ধুর ঘটনাবলী জীবনের বহু  
অব্যাহত এই বিরাট গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। রাজ-  
নীতি-বিশারদ, সত্যগ্রহ, স্বরাজ্য দলপতি, বৈয়াক,  
সাহিত্যিক প্রভৃতি আদ্যগুলি এমন স্বল্পর ভাবে বিবৃত  
হইয়াছে যে পড়িয়া মনে হয় এগুলি যেন গল্প, তবে ঈশ্বর  
দুর্ভাগ্য যার এই বা দুঃখ। শেষ অধ্যায়ে দাঙ্গিলিংগ-এর  
মহা প্রত্যনের বর্ণনা পড়িয়া কাহারও চক্ষুস্থল স্তব্ধ  
করিবার সাধ্য নাই। হেমেন্দ্র বাবু নবযুগের অতীতম  
লেখক ও সংস্কারোপম, বন্ধু রচিত দেশনায়েকের কীষ্টি-  
কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা দম্ব হইলাম, গ্রন্থপানি ছয় শত  
পৃষ্ঠাখণ্ড। মূল্য ৩/- টাকা। গ্রন্থে দেশবন্ধুর শৈশব  
হইতে শেষ পর্যন্ত বহু অবস্থার অনেকগুলি ছোট্টোনি চিত্র  
আছে। রসায়োভ, ভবানীপুর অমৃত ঔষধালয়ে প্রাপ্ত্য।

পুত্রের প্রতি উপদেশ—শ্রীশ্রীপ্রসন্ন ভট্টা-  
চার্য্য প্রণীত ১০১ পৃঃ মূল্য ১/-। গ্রন্থকার তাঁহার প্রবাসী  
পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনার্থ এই পুস্তক উপদেশাবলী  
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।  
তাঁহার পুত্র ত্রিযুক্ত শ্রীমাদাস ভট্টাচার্য্য বর্তমানে  
হাইকোর্টের উকীল হইয়াছেন। পুস্তকপানি পাঠে মনে  
হয় বর্তমান তরুণ বাঙ্গালীদের চরিত্র গঠনের উপযোগী

অনেকগুলি উপাধান ইহাতে আছে। প্রত্যেক বাঙ্গালী  
পিতার কর্তব্য পুত্রকে নীতি ও চরিত্রদান করিয়া গঠিত  
করা; আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে চরিত্র গঠনের বিশেষ  
স্থান নাই বলিয়া ছাত্র সমাজের মধ্যে উদ্ভ্রান্তের পরিচয়  
প্রায়ই পাওয়া যায়। শৈশব হইতে সন্তুদপদেশ দ্বারা চরিত্র  
গঠিত হইলে এই সকল দোষের হাত হইতে অব্যাহতি  
পাওয়া যায়। আশা করি বাঙ্গালী বাপ-মা বইখানি  
নিজেই পড়িবেন ও এই আদর্শে সন্তান-সন্ততিসমূহকে  
পড়িয়া তুলিবেন—তাহা হইলে প্রকান্তরূপে জাতিগঠনেরও  
বিশেষ সাহায্য করা হইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল  
প্রচার কামনা করি।

স্কোল আনন্স—শ্রীশ্রীলজানন্স মুখোপাধ্যায় প্রণীত  
ভবল জটিন ১০২ পৃষ্ঠা মূল্য ১৫/-। প্রকাশক বরদা  
এজেন্সী কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা। শৈলজাবাবু  
গতাহপতিক প্রথা ত্যাগ করিয়া উপভাসের মধ্যে একটা  
নুতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া যথেষ্ট স্থান অর্জন করিয়া-  
ছেন। বর্তমান পুস্তকখানিতেও যথেষ্ট নুতন আছে—  
মাননীয় জেলার অধিবাসী হরিপতিতটী একটা জীবন্ত  
চিত্র—বাহারী ও অঞ্চলে যাতায়াত করেন তাঁহাদের  
চোখে একরূপ পণ্ডিত সহজেই নজরে পড়ে। কজিগীর  
ছবিটিও চুটিয়াছে ভাল। তার উপর শৈলজাবাবুর ভাষা  
বেশ পরিষ্কার স্বরস্বরে, তাহার মধ্যে আধুনিক পেঁচ  
নাই—বাহার প্রভাবে ভাব দেশ ছাড়িয়া পালার, আর  
অর্থ বোধগম্য হয় না। বইখানির ছাপা কাগজ সবই  
বেশ ভাল; তবে দামটা কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়।  
আরও মনে হয় যে এই দাম বেশীটাই বরদা এজেন্সীর  
একটা বিশেষত্ব।



বিত্তীয় বর্ষ]

১১ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩, ইং ২৬শে জুন ১৯২৬

[ ৪৫শ সংখ্যা

## স্বপ্নের দেশ

শ্রীমূলাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজি	হেরিছ স্বপ্নে পরম রম্য দেশ,— বিরাজিত যেনা চির বসন্ত, বিকশিত কিবা শোভা অনন্ত, চাঞ্চ-চিত্রাক্ষিত হ'য়ে জীবন্ত	সবে	সৌম্য বদন; সে দেশ পূর্ণময়; পথগুলি ধূলি কবরহীন, চলে না পথিক শব্দা মলিন, কেহ নহে ত জীর্ণ ঈর্ষ ও দীন;
যেন	হাসিছে দ্বিধা তুবনমোহন বেশ।	নাহি	বোণ, শোক, তাপ, যাতনা, ভাবনা, ভয়।
ভাসে	সদা সেথা নিশি উজ্জল পূর্ণ চাঁদ, দুখ সকলি নয়নানন্দ, সদার সম সূহৃদ গন্ধ বহে মুখ হৃদয় সন্মীর মন্দ,	সেথা	'কবি কল্পনা'—অকালে কালের নৃত্য; বুঝেছ মানব মানবে মিত্র, চিত্র সবার অতি পবিত্র, বুঝি বিশ্বক্রেমের সে এক তাঁর।
উঠে	জলদ মধ্যে মধুর শশ্যনাদ।	যেন	সকলেই জাতি কেহ নহে প্রভু ভূতা।

সেথা  
গৃহে গৃহে উঠে বিজ্ঞ বন্দনা গান,  
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার  
উড়িছে পতাকা, ধর্মই সার,  
সদা বসনা লিঙ্গ সত্যে সবার,  
পুনঃ  
হেরিতে সে দেশ হেথেকে অধীর প্রাণ।





## ভারতে ইসলাম

### শ্রীপঙ্কজ বিদ্যা বি-এল

এসিয়াটিক সোসাইটি নামক বিশ্ব জনসভার বিলাতের (Royal Asiatic Society of Great Britain) গৃহীত মূলনীতি (motto) হইতেছে *ex oriente lux* অর্থাৎ আলোক প্রাপ্তি হইতে আইসে। কথাটা সকল দিক দিয়াই সত্য। প্রাচী-মূল প্রত্যহ অকণোদয় আশ্রয় প্রত্যহ করিতেছি। অজ্ঞ জগতে যেমন, অধ্যাত্ম জগতেও সেইরূপ। জ্ঞান ও ধর্মের অরূপ জ্যোতি সর্বপ্রথম এই প্রাচীর আকাশেই দেখা দেয়; তারপর পরজাহার বিমল বিভা ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জগতে ছড়াইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য বহন অজ্ঞানতার ঘনচ্ছকারে, প্রাচ্য তখন জ্ঞান-পরিমায় সমুদ্ভাসিত। তাহার পর প্রাচ্যের জ্ঞানের আলোক পশ্চিমের অজ্ঞান অন্ধকার রাসিক দূর করে। ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলির জন্মস্থান এই প্রাচী। বিশ্বের সর্বলোকের আধুনিকতম ধর্ম হইতেছে ইসলাম ধর্ম, ইহারও জন্মস্থান আরবের মরু প্রান্তরে। ইহুদীয় ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম একই বৃক্ষের তিন শাখা।—সেমেটিক জাতীয় ধর্মের তিন বিভাগের মধ্যে ইহুদীয় ধর্ম সর্বলোকের প্রাচীন; ইহার পর খৃষ্ট ধর্মের জন্মস্থান; সর্বলোকের মুসলমান ধর্ম। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শত সত্তর বৎসর পরে, হর্ষবর্ধন যখন ভারতের সম্রাট তখন এই নব ধর্মের জন্মস্থান হইল। নীরস, জ্ঞানহীনতার স্পর্শগ্রস্ত দুসর বাহিনী মরু প্রদেশ; দিবসের প্রথম মার্গধর্মের অগ্নিবর্ষণ, রাতে অগ্নিভেদী প্রচণ্ড শীত,—যেমন কঠোর দেশ, ততোধিক কঠোর দেশবাসী। দেশের বায়ুওল যেমন শুষ্ক,—লোকগুলার হৃদয়েও তেমনি অগ্নিভার লেশ মাত্র নাই। এক মুষ্টি ধর্মের ডিরাইয়া অথ পৃষ্ঠে বা উই পৃষ্ঠে দিন যাপন; কারণ বা অকারণে নরহত্যা, লুণ্ঠন, নারী-হনন—তাহাদের জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার। নাগরিকেরাও পাপ পঙ্কিল বিশালায় ধরমোতে জালিয়া

চলিয়াছে। আরবের ধর্ম, আরবের আচার ব্যবহার বীতীতীত সমস্তই বীতংস। জ্যোতি পুরের প্রকাশ ভাবে বিমাতাকে পত্নীতে গ্রহণ অপরায় নহে,—পরভী লুণ্ঠন বীর্যের পরিচায়ক; অতি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাংসে মাংসে বংশে বংশে বিধেবানল জলিয়া উঠিত,—এং রক্ত স্রোতে সে অমল কণিক ভাবে নিভিলেও, হিসানল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইতে অধিক বিলম্ব হইত না। ধর্মের নামে অর্থ, শাসনের নামে অত্যাচার, বীর্যের নামে দুর্বল পীড়ন ও পরস্পরপর আরবের পত্নীতে পত্নীতে দানিত হইত। জাতিটা যেন সর্বদাই যুদ্ধং, সমরনায়ে সজ্জিত; ধর্মনীতি সমাজনীতি যেন তপ্ত বাসুকার প্রোথিত হইয়াছে,—শক্তি বাহার জগৎ তাহার; বীর ভোগ্য নারী; ইহাই ছিল যেন আরব জাতির মূলমন্ত্র, সর্ব দেশে সর্বকালে জাতীয় জীবনের দুর্দিনে, জাতির যোগ অধঃপতনের অবস্থাতে এক শক্তির মহাপুরুষ আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার অমাহুরী শক্তি ও প্রতিদানলে জাতিটিকে টানিয়া তুলে। আরবের এই কলম্বাস যখন ঘটিল ও তাহাই। চলি বৎসর অল্পমাত্র পরে মদ্যে ইশবরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ঐশী শক্তি বলে বলীয়ান হইয়া, গৃহবিবাদে বিচ্ছিন্ন দুর্বল আরব জাতির জুড়ীতি ও বদাচার ধমন, তাহাদের মধ্যে একা স্থাপন ও তাহারিগকে এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিতে বন্ধপরিকর হইলেন। প্রায়শ্চৈতন্যে তিনি বিশ্বের বাধাবিধি প্রাপ্ত হইলেন; অক্ষর নির্ধারিত হইতে প্রায় বাঁচাইবার জন্য তাহাকে এক সময়ে মদিনায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শক্তিম্যান পুরুষ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া একটা দুর্বল জাতিকে স্বীয় মতামতবী করতঃ এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, যাহার প্রভাবে একদিন সিদ্দ-

নীর্তীর হইতে স্পেনের উপকূল পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত মোসলেমের জাতীয় পতাকা ইসলামের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। মোহম্মদ একাধারে কুট রাজনীতিবিদ্যার ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। আরব জাতির চরিত্রের দুর্বলতা কোথায় এবং তাহার বিশেষত্বই বা কি তাহা তাঁহার অমাহুরী প্রতিভার নিমিত্ত স্থলভূতাবে ধরা পড়িয়াছিল এবং কিরূপে বন্ধন আবদ্ধ করিলে, এই বিচ্ছিন্ন জাতি সম্ভবতঃ ও সহজে হইবে, তাহা তিনি ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার কলেই কোরাণ শরিকের বিধান—কঠোর। এ বিধান সকল হজরতের আদেশ নহে বরং ইশবরের আদেশ; হজরত তাহার বাহক মাত্র। ইসলাম শব্দের অর্থ ‘আত্মসমর্পণ’ submission to God. ‘আত্মসমর্পণ’ কথাটা বৈষ্ণব-ধর্মের দাঁষ্ট ভাবকে বহন করাইয়া দেয়। ইসলামধর্ম অর্থাৎ ‘বেগম ভাবে আচারিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ হয় যে হজরত মোহম্মদ ইসলাম শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না? ইসলাম শব্দের অর্থ ‘ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ’ ইহার পরিবর্তে কোরাণ শরিকে প্রবর্তিত ‘ধর্মে আত্মসমর্পণ’ এইরূপ অর্থই যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার অগ্রহণ বলিয়া মনে হয়। মুসলমানের সহিত ভারতের সখ্য কত দিনের,— ভারতের জাতীয় ভাবে মুসলমানের প্রভাব কতদূর এবং কিরূপ, তাহাই এই প্রবন্ধের মূখ্যভাবে আলোচনার বিষয়। মহম্মদ বিনু কাশিম হইতে আরম্ভ করিয়া মহম্মদ যোহী হইতে যে সমস্ত মুসলমান ভারতভূমে পদার্পণ করিয়াছিলেন; তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি; কেননা তাহাদের মধ্যে কেহ লুণ্ঠন ও অপরহণ ভিন্ন অত কোন স্বাধী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায় লইয়া ভারতে আসেন নাই। সাময়িক ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত কতিপয় অস্ত্র যৈ বিশেষ কিছু এই সকল বৈদেশিক মুসলমানের আগমনে বা আক্রমণে ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তবে লাভ কতি মিলাইয়া দেবিবার দিন সেই দিন হইতে আরম্ভ যে দিন মুসলমান বিলম্বভাগ ভারতে আসিয়া স্বাধী ভাবে রাজত্ব ও বসবাস আভ্যন্তরিত করিলেন। অসি সম্রাট, বর সম্রাট, সাধিবীর সম্রাট,

প্রভৃতি বহু সম্রাটের মধ্যে আজলাক হিন্দু-মুসলমান সম্রাটরা যেন বেশী করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সম্রাটের বিশ্বম চাপে চিরপরিচিত অস্বাভ সম্রাটগুলি যেন ক্রীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান আজ সাত শত বৎসর ধরিয়া একই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। এক কালে মুসলমান শাসক ছিল; হিন্দু শাসিত ছিল। কালকালের আবর্তনের স্রব্দ স্রব্দ এখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই শাসিত। পলাশীর যুদ্ধের পরচাঞ্চা দুখিয়া গিয়াছে—ইংরাজ এখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর শাসক। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেবিবার আছে, তাহা এই যে ইতিপূর্বে এই স্বাধী আশ্রিত পক্ষাণ বৎসরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান প্রাঙ্গণ আধিপত্যকে কখনো কখনো ‘সম্রাট’ হইতে দেখা যায় নাই—প্রথম দেখা দিয়াছে যখন হয় সেই দিন যেন Indian National Congress নামক একটা মূলতঃ জাতিমিত্র এ দেশের জাতীয় জীবনে গড়িয়া উঠিল। আর এই সম্রাট দেখাইয়া দিল, চিনাইয়া দিল কে? উত্তর—আমাদের শাসক সম্প্রদায়—ইংরাজ সভ্যমণ্ডল। পরিচয়ের কাগজ সে দিন হইতে সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে সম্রাট উভয় সম্প্রদায় এমন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে যে উভয় সম্প্রদায়ের স্বিরবৃত্তি হিতৈশীপ পরস্পরের মূখপানে চাহিয়া বিশেষ অবকাশ। ধর্ম-মতের বিভিন্নতা কদিনকালে কোন দেশে জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত ঘটায় নাই—ধর্মের নামে স্বার্থী-মনা, গোঁড়া, ধর্মকল্লীর মধ্যে অত্যাচারের প্রবল স্রোত উইয়াগে যেমন ঘটিয়াছিল এমন বোধ ভারতের মধ্যে অজ কোন দেশের ইতিহাসে ঘটে নাই। রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বিরোধ, Spanish Inquisition প্রভৃতি—ইংলও ও উইয়াগের অস্বাভ দেশে জাতিগঠনে বাধা জন্মায় নাই। ভারতবর্ষেও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের ব্যবহারিক অংশের পার্থক্য থাকিলেও, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইয়া আসিতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ আজ যেন মিলনের অর্ধপথে উভয়ে গতিরোধ করিয়া পাড়াইয়াছেন। হিন্দু মুসলমানে মিলনের বীজ বহুদিন হইতে এদেশে



উপর আছে এবং তাহা অকৃত্রিম ও পবিত্র হইয়া ফলোদ্ভূত হইয়াছিল। যে দিন মুসলমান প্রথম এ দেশে জিজীয়া প্রণোদিত হইয়া পরগণা করেন, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের রীতিমত রাজত্বকাল পর্যন্ত সর্ব সময়ে হিন্দুদের কষ্টা বিবাহ করিয়া হিন্দুদিগের সহিত আশ্রয়তা বন্ধন আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহার মূল, অবশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তবে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রচার কর্তারতা বশতঃ অজ্ঞান দেশে যে সংখ্যায় ভয় ঘরের কষ্টা বিবাহ করিয়াছিল, এখানে তাহা পারে নাই। ভারতবর্ষে অনেক নিম্ন ঘরের কষ্টা হইয়া মুসলমান অস্ত্রপুর্বে বধুগ্ৰহণ প্রবেশ করিয়াছিল। এখানকার তিন চতুর্থাংশ মুসলমান জৈব্রণ ভাবে জাত। বাকী এক চতুর্থাংশও একেবারে সৈন্য রক্ত সঞ্চার শূন্য নহে। ককত মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত আর্ধ্য সন্তান আর কতক হিন্দু নারী গর্ভসমুত, মুসলমান ওরসন্তান। এইরূপ সাক্ষ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী বয় পরস্পরায় চলিয়া আসিতেছে—তাহাতে হিন্দুর সহিত ভারতীয় মুসলমানের বতবুর সাদৃশ্য ভারতের ব্যতিরেক কোন মুসলমানের সহিত তত্ত্ববুর নহে। পাঞ্জাব —( যেখানে মুসলমানের প্রথম আগমন )—হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত সকল প্রদেশের মুসলমান সংখ্যে এই উক্তি প্রযোজ্য। ১২২১ সালের আমান স্থানীর রিপোর্টে প্রকাশ—“While the Mahomedans of the eastern tracts and of the Madras were almost entirely descendants of converts from Hinduism, by no means a large proportion even of the Mahomedans of the Punjab are really of foreign blood, the estimate of the Punjab Superintendent being about 15 per cent.” পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব শাসন কর্তা—জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সহিত যাহার নাম চিত্রকাল সমুদ্র থাকিবে—স্রার মাইকেল ওজারের সম্প্রতি বিলাতে রওয়াল মোসাইলী অভ আর্দ্র সভায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনেক আভিজাত্য বংশীয় মুসলমান রাজপুত্রক সন্তত।”

ভারতীয় মুসলমানের অবিস্মরণীয় হিন্দু Origin—হিন্দু হইতে উৎপন্ন একথা বলিয়া অনেক ভ্রমলোক মধ্যযুগের কোন সহরে আহৃত এক সভায় কোন মুসলমান সভ্য কর্তৃক অপর্যায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সাহসী মুসলমান পণ্ডিত এই সভ্য কথাটির যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। যাহা হউক, সভ্য ভিন্নকালই সভ্য—সভ্যকে কখন ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখা যায় না।

ভারতীয় মুসলমানেরা অনেক স্থলে হিন্দুদিগের আচারও গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক মুসলমানের হিন্দুনাম। মনীষি ৮৩৬ব মুখোপাধ্যায় তাহার “সামাজিক প্রবন্ধের” এক স্থলে লিখিয়াছেন, “এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অবিস্মরণীয় মুসলমান, জ্যোতিষির প্রথম আর স্বাধীন পণ্ডিতের কিছু স্থান এবং সমাদর না করেন—যেখানে গো-বধ করিবে এবং গো-মাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সম্বৃত্তি হন,—যেখানে হিন্দুদিগের পরোঁষসবে আঘাত প্রযোজ্য না করেন—যেখানে আগনিদগিরের বিবাহ কার্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙ্গালা এবং দাক্ষিণাত্যের ভোে কথাই নাই। কারণ ঐ সকল প্রদেশবাসী অতি উচ্চ বংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিমি ব্রাহ্মণের দ্বারা আগনিদগিরের নামে সমস্ত করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মতোবন্দ করাইয়া থাকেন। আবার অনেক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আগনিদগিরের অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণ-সম্মানের অতিবিসংকার করেন।”

হিন্দু-মুসলমান যে যথার্থই এক মায়ের দুই সন্তান তাহার স্বন্দর চিত্র আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। চারিযত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কিরূপ সৌম্য ছিল তাহার পরিচয় আমরা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থে পাই। “মহাভৈরবের সমুখে বাজা বাজান” লইয়া আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের গোঁড়াগণ যে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন, এ আপত্তি বাঙ্গালার মুসলমান শাসন কর্তার বা তাহার প্রতিনিমিরা কখন যে করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাই না, পলাস্তের তাহারা যে এ বিষয়ে বাধা

দেন নাই, তাহারই প্রমাণ পাই। হজরৎ মহম্মদের জীবনীতে দেখিতে পাই—“পঞ্চম হিজরীতে চন্দ্রগ্রহণ হয়, চন্দ্রগ্রহণকালে ইহুদীগণ সপ্তী ও বাঙ্গালি বাঙ্গাইতে লাগিল, কিন্তু হজরৎ শিখগণ সহ খৃস্টের (চন্দ্রগ্রহণ কালীন) নামাজ পড়িলেন।” (আবদুর রহিম লিখিত হজরৎ মহম্মদের জীবনী ৩৬ পৃঃ)। হজরত মহম্মদ বা তাহার শিখগণ হজরতের নামাজে সম্মেও ইহুদীগণের সপ্তীতে ও বাঙ্গালি বাঙ্গাইতে বাধা দিলেন না, বড়ই আশ্চর্য। আর আজ হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মিলনজোতক প্রতিভাশালিত সত্যপীরের পূজার সময় হিন্দুর অস্ত্রপুর্নের লখ ঘণ্টার ধনিও মুসলমান প্রতিবেশীর আগন্তিকজনক !!

উপরোক্ত প্রকার তাহার এরূপ ৩৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত ছেন: “হজরৎ মহম্মদ নিম্নাই পর্যন্তের নিমিত্তী সেন্ট ক্যাথারীন্স গির্জার জীয়ার ধর্মযাজকের সহিত এরূপ সন্ধিত্বয়ে আত্মক হইয়াছিলেন যে যাহা জগতের ইতিহাসে—**প্রশংসা বিষয়ে আশ্রিত প্রাচীন প্রাচীন একটা অস্বাভাবিকীভূত** রূপে বিজ্ঞান রহিয়াছে।...সেই সন্ধিত্বয়ে লিখিত ছিল যে, কোন মুসলমান যদি এই সন্ধি পত্রের কোন সন্ত ৩৩ ভগ্ন করে, তাহা হইলে যথোক্তার আদেশ লক্ষ্যনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে।” আর এই যুগে হজরৎ মহম্মদের ধর্মাবলম্বীরা অস্ত্রের ধর্ম বিষয়ে বারীমতায় হস্তক্ষেপ করিয়া আর এক কীর্ত্তিগুণ বাড়া করিতেছেন।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীতির ভাব নষ্ট করিবার জন্ত কখন কখন স্বার্থ প্রণোদিত চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে। সে বিরোধ কর্তৃক; তাহার মূল কারণ কালনিরূপিত সে জন্ত বিরোধও সার্বজনীন ও সর্বদেশে ব্যাপী হইতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক বিরোধের উল্লেখ করা হইতে পারে। মুসলমান শাসন আমলে “দুয়ো রাণী” ও “দুয়ো রাণী”র কৌতুককর উপমা এখনও আমরা বিস্মৃত হই না। সে বিরোধের তলে স্বার্থ ও রাজনৈতিক “চাল” ছিল। বর্তমান বিরোধেও অনেক অলক্ষিত হস্ত এবং গুপ্ত মস্তকের সন্ধান পাইয়াছিলাম। রাজনৈতিক দল বিশেষের প্রভুত্ব বর্ধক করিবার এবং

সেই সঙ্গে একটা সাম্প্রদায়িক নুতন দল গঠন উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল স্বার্থাঙ্ক অসুদূরদর্শী তথা-কথিত রাজনীতিজ্ঞ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম-মতের পোহাই লইয়া বিবেচন-বহিঃ আলাইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে সে অনলে শুষ্ক যে অনেক নিরীহ জনের ধনপ্রাণ ধ্বংস হইল তদুহা নহে, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অনল বাহারা আলাইয়াছিলেন এবং বাহারা তাহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছিলেন, তাহাদেরও কতলা-শু পুড়িয়াছে। শিশুর অগ্নি লইয়া বেলা আর অশিক্ষিত গুণ্ডাদের পাশবিক প্রবৃত্তি সহায়তায় স্বার্থা শাসনের চেষ্টা এই উভয় বিধ কার্যের ফল একই।

Divide and rule এই মূলনীতি সহায়তায় রোম, অধিকৃত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিল। রোমান রাজনীতি ও রোমান আইন অনেককালে গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট সম্প্রদায় অধ্যুষিত বিশাল জনপদকে শাসনে রাখিবার পক্ষে এমন হস্তক-নীতি আর নাই। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এই divide and rule policy প্রয়োগে ভারত শাসন করিতেছেন। রাজপুত্রসেবা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কখন হিন্দুকে কখন মুসলমানকে আহুত্ব্য দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে ব্যাহত স্বার্থ-প্রত-বিষয়ের ভাবের স্রষ্টা করিতেছেন, ইহা এবং সভ্য। যদিও রাজপুত্রসেবা স্বেযোগ ও স্ববিধামত ও কথা অস্বীকার করিতে এবং তাহাদের চক্ষু যে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্দেশিয়ে সকল প্রজাই সমান একথা বার বার প্রচার করিতে তাহারা অলস নহেন। জাতীয় স্বার্থ অনেকটা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বাহারা বড় মনে করিয়া বরণ করিয়া লয়, তাহার প্রত্ন-অস্বহস্ত সারমসেয়ের দ্বারা প্রভুর সদয় ঠিকিতে লাগু লক্ষ্যানে আশ্রয় প্রকাশ করে এবং কটীর টুকরার লোভে প্রভুর চতুর্দিকে নৃত্য করিতে থাকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে দৃষ্টি বিকাশ করিয়া ধাবমান হয়।

হিন্দু-মুসলমান সমস্তা ভিন্নবিনের সমস্তা নহে বা একটা বোরতর জাতীয় সমস্তা নহে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেই ফারসী-নবিশ গোঁড়া হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের নিমিত্ত স্থান পাইতেন এবং সমস্ত গোঁড়া মুসলমান ফকীরও গোঁড়া হিন্দুর নিকট লক্ষ্য পাইতেন। কিন্তু আজ ‘তে হি মো দিবসো গতা’!





## ভুলভাঙা

### শ্রীজয়ন্তী দেবী

“আমার কবিতা আর তার হ’লে ভাল লাগেনা বল?”  
পূরবী বিভাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—ইহি  
চেয়ারের হাতলের উপর সিগারেটের ছাই ভাঙতে ভাঙতে  
বিভাস বলে উঠল “আমার ভাল লাগাটাইতে তোমার  
পক্ষে খেটে নহ”—পূরবী একটু চুপ করে থেকে বললে  
“এই কবিতাও ছিল আমাদের সত্যকার বাঁধন” বিভাস  
উত্তর দিল না, এক বৎসর আগে যেদিন বাসরে ছুটি  
কিছুক্ষরের মিলন হয়েছিল সে দিনের কথা তার মনে  
পড়ল। “শেকস্পীতে” পূরবীর “একটা কবিতা পড়ে  
বিভাস মুগ্ধ হয়েছিল; সে নিজে ছিল মর্যবী কবি,  
পূরবীর সমস্ত কবিতার মধ্যে গভীর বার্ষতার একটা  
বেদনা দেখে যে সমবেদনায় একটি কবিতা লিখে  
“শেকস্পী”তে প্রকাশ করেছিল—সেই ভাসের প্রথম  
পরিচয়, তারপর উভয় পক্ষের বন্ধুবাৎসবের আগ্রহাতিশয্যে  
বিভাস পূরবীকে বিয়ে করলে।

পূরবীর পিতা ছিলেন দরিদ্র, পূরবীও নিজে স্বন্দরী  
ছিল না। বিভাস রূপানন্দ সন্ততিসম্পন্ন। বিবাহ সভায়  
রান্না আনিয়ে ছিন্ন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বিভাস পূরবীর  
ঘামে মগ হয়ে কল্পনা করলে যেন সে ইন্ডালসের গোলাপ  
কাননে বসে আছে—হায়রে কবির বাস! জ্যোৎস্নার  
আকাশ ভেসে গেলেও দরিদ্র গৃহে কেউ গান গাইলে না  
বাঁশী বাজল না—বসিঘরী বুঝা বুঝানো ছ’একটা  
রসিকতা করে চলে গেলেন। শূন্য বাসরে পূরবীর পাশে  
বসে বিভাসের কবিতা হাংকা করে উঠলো।

এ ক্ষোভ চিরদিনের নহ—ক্লমখ্যার রাস্তে পূরবীর  
পাশে বসে বিভাস সব ব্যথা ভুলে গেল, সেদিনও তাঁদের  
আলোর চারিদিক হাসছে, পূরবীর গলার বাল্য দুলছিল  
—সে নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করলে—

“জ্যোৎস্না রাস্তে শ্রিয়ে, ঘুমায়োনা ঘুমায়োনা।”

বিভাস আবেগ পীড়িত কণ্ঠে ডাকলে “পূরবী”,  
পূরবী আপনার সন্ধ্যা হারিয়ে বিভাসের পায়ের উপর  
মাথা রেখে পড়ে রইল। বাইরে তখন চাঁদের আলো  
পড়ে গাছের পাতাগুলো ঝিকমিক করছিল।

বিভাস পূরবীর কবিতা কয়েকখানা মাসিকে প্রকাশ  
করিতে লাগলো যদিও পূরবীর কবিতায় কবিত্ত্বের ভাষা  
ভাব ও ছন্দের সম্পূর্ণ প্রভাব ছিল তা’হলেও তার নিজস্ব  
জীবনের বার্ষতায় স্বরূপটিকে সর্বদা আত্মকরণ করে—

বিভাস মনে মনে ভাবলে পূরবী তাকে পেয়ে স্বহী  
হয়নি—সে একদিন বললে “পূরবী” তুমি আমার পেয়ে  
স্বহী হওনি না?” পূরবী আশ্চর্য হয়ে বললে “একথা  
কেন?” “তোমার লেখার আভ্যন্তরীণ সেই বিফলতার  
প্রতীক স্বরূপে বাজছে” পূরবী হেসে বললে “ওটা আমার  
কবিতার বিশেষত্ব, ওর সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ  
নেই।”

বিভাস নিউরে উঠলো—কবির জীবনে এতবড়  
মিথ্যার আয়বর কেনম করে সম্বন্ধে—লক্ষ্যই হচ্ছে  
যে পূরবীকে কিছু বললে না।

এমন করে তাদের মধ্যে আড়ালের সৃষ্টি হল।  
এদিকে পূরবীর কবিতার স্রাব্যতাতে সাহিত্য জগৎ  
মুগ্ধিত হয়ে উঠলো, বিভাস একটু চঞ্চল হয়ে পড়লো—  
সেদিন “স্বপ্নশর্ন” কাগজখানায় স্পষ্টভাবেই একজন  
সমালোচক লিখেছিলেন “পূরবী দেবীর কবিতা আর  
কালকার উদীয়মান কবিদের এমন কি বিভাস বাবুর  
কবিতার চেয়ে সরল ও মধুর।” পূরবী “স্বপ্নশর্ন” থানা  
পড়ছিল এমন সময় বিভাস একখানা ফটোগ্রাফের মতো  
হাতে করে বরে ঢুকলো, পূরবী একটা, কি কালে  
উঠে যেতেই বিভাস “স্বপ্নশর্ন” থানা নিয়ে খোঁসা পাতাটা  
পড়তে লাগলো—হু’লাইন পড়ে রাগে সে আত্মহারা

হয়ে গেল, তারপর তার মনে হ’ল পূরবী ইচ্ছা করেই  
পাতাটা ফুলে রেখে গেছে; বিভাসের চোখ দিয়ে জল  
পড়তে লাগলো, সে দুদিন পূরবীর সঙ্গে কথা কইলো না।

তার পরের সপ্তাহে “শেকস্পী”তে একটা প্রতিবাদ  
বেরোল, পূরবী দেবীর কবিতার সমালোচনাও, সমালোচক  
বলেন “পূরবী দেবীর সমস্ত লেখা কবিত্ত্বের বিফল  
অনুসরণ এমন কি কোথাও ছ’এক লাইন অবিকল না  
বলে নেওয়া হয়েছে—পূরবী দেবী যেন অতঃপর কবিতা  
লেখবার গুণজন্য না করেন” লেখকের নাম ছিল না,  
পূরবী সারাদিন যেন জরের যন্ত্রণা ভোগ করলে,  
বিভাসকে কোন কথা লিখাশাস করাবার সাহস হল না।  
হঠাৎ তার মনে পড়ল “শেকস্পীর” সম্পাদকের জী রেখা  
তার সঙ্গে ফুলে পড়ছে; একটা চিঠি লিখে চাকরের  
হাতে পূরবী রেখার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে—এক খণ্ডটা  
পরে উত্তর নিয়ে চাকর ফিরে এলো, পূরবী ফুলে পড়লে—  
“ভাই পূরবী”

তুমি যে লেখাটার কথা জিজ্ঞেস করেছ, সেটা  
মুদ্রাঙ্কিত কবি ও সাহিত্যিক বিভাসচন্দ্র বসুর লেখা—

চিঠির বাবী আশ্চর্যই আর পূরবী পড়তে পারলে  
না, চিঠিখানা হুচি হুচি করে ছিড়ে কেলে বাসিনে  
মুখ রেখে কাঁপতে লাগলো—বিভাস এসে হাতের ছড়িটা  
ঘরের কোণে রাখলে। পূরবী উদ্ভ্রান্ত হয়ে বলে উঠলো  
“তোমার হাতে পড়ার চেয়ে যারা ভাল ছিল” বিভাস  
সিগারেটটা দাড়ে চেপে উত্তর দিলে “তোমার বড়  
জামাইবাবুর হাতে পড়া বোধ করি তার চেয়ে ভাল  
হত।” এই বড় জামাই বাবুর একটু ইতিহাস আছে,  
তার বয়স তখন পঞ্চাশ তখন পূরবীর বড় দিদির সপ্তম  
বর্ষে তার বিয়ে হয়। যদিও তখন তাঁর আর এক দ্বী বসুমান  
ওর পূরবীর দরিদ্র পিতা তাঁকে কল্যাণ মন্ত্রনায় করেছিলেন—  
—তার পর থেকে দিদির ভাগ্যে স্বামী প্রচণ্ড প্রহার  
ও নপতীর লাহানাই সার হয়েছিল।

বিভাসের কথার সহিত খোঁচাটা এতই সত্য যে  
তার প্রতিবাদ করা চলে না, তাই হাতে বিভাস যদি  
যেক্ষণে কড়া বিয়ে না করতো তাহলে তার ভাগ্যে  
বড় জামাইবাবু অপেক্ষা স্থাপ্য জোটা সম্ভব হতনা।

পূরবী চুপ করে শুয়ে রইলো মাঝে মাঝে ছুঁমিয়ে কাঁদার  
শব্দ বিভাসের কাণে আসছিল।

বিভাস এক মনে ভাবছিল সে পূরবীকে বিয়ে  
করেছিল কেন—পূরবীত স্বন্দরী নয়, দরিদ্র পিতা  
মাতার সন্তা, সামাজিক আদর্শ কায়াদায়ও বিশেষ দ্রবণ  
নয় শুধু একমাত্র পূরবীর কবিতাকে ভালবেসেই সে  
পূরবীকে বিয়ে করেছিল। একথা তখন তার মনে  
হয়নি যে পূরবীর কবিতা তার চিরকাল ভাল নাও লাগতে  
পারে, মাল্গয়ের ক্ষতি বলাতেও বেশী সম্বল লাগে না।  
আজ তার বার বার মনে চল কবি হিসাবে পূরবীর  
সঙ্গে তার intellectual আদান প্রদান সম্ভব হতে পারে  
কিছু জীবনের একমাত্র সন্ধিনীর কাছে শুধু মাত্র কথক  
কবিতাও লোকে আশা করে না—যথার্থ জীত তিনিই  
যিনি গৃহিণী সঙ্গীত-সখা ও ললিতকলার প্রিয়শিষ্ঠা—  
ললিতকলার পূরবী পারমর্শিনী হতে পারবে যদিও  
বিভাসের শিষ্টা সে নয়, গৃহিণীর কোন কাল পূরবী  
করে না হয় ত সে যোগ্যতাও তার নেই, সে সচিবও নয়  
সখাও নয় বিভাসের প্রিয়তমাও নয়, সে শুধু কবি।

নিম্নলিখ অভিমানে পূরবী যেন পাগল হয়ে গেল,  
বিভাসকে শান্তি দেবার কোন উপায়ই সে খুঁজে পেলেনা  
তার দীর্ঘ হাঙ্গামে ও সিগারেটের খোঁসা যেন প্রতিদিন  
পূরবীকে উপদ্রাব করতে লাগলো—

ছাত্তের উপর পূরবী পানিলে পাঁচিলে হেলান দিয়ে  
আপনামার কথা ভাবছিল, আদার বাড়ী দিয়ে ছাত্তের  
পাঁচিলে গলা বাড়িয়ে একটা ১৮১২ বছরের বট তাকে  
বললে, “কি করছেন দিদি?”

এর সঙ্গে পূরবীর আগে সামান্য আলাপ ছিল, পূরবী  
উত্তর দিলে “এমনি দাঁড়িয়ে আছি” পূরবী একটু চুপ  
করে আবার বললে “তুমি কিছু লেখনা, কিছু পড়না?”

মেয়েটি তার বড় বড় চোখ খোঁচি বার করে বললে,  
“লিখতো কি আর ভাই, বাজারের হিসেব লিখি, বাপের  
বাড়ী গেলো এঁকে চিঠি লিখি, পড়া—তা মাঝে মাঝে  
নভেল ছ’এক থানা পড়ি।”

পূরবী সমবেদনায় প্রায় কেঁদে ফেললে,—শুধু  
বাজারের হিসেব লেখে, পড়ে শুধু নভেল।



সে কিছু বলবার আগেই মেয়েটির বস্ত্রের গলা শোনা গেল, মেয়েটা নীরবে নেমে খেল পাশের জানালা দিয়ে। পূর্ববী বেধেতে পেলে মেয়েটি পাখা গমছা জল ইত্যাদি নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। পূর্ববীর মনে হল পড়াশুনা সম্বন্ধে এই মেয়েটি মতই রূপার পাত্রী হোক, তার একটা দিক পূর্ববীর পক্ষে হুমত নয়।

সেদিন ফান্টনের পূর্ণিমা—চাঁদের আলোয় ছাতের উপর বসে বিভাস কি ভাবছিল, এক বাস্ক সিগারেট তার শেষ হয়ে এসেছে, পূর্ববী তার বাসন্তী রঙের কাপড়খানা পরে বিভাসের পাশে এসে বসলে—বিভাস আশ্চর্য হয়ে গেল, একটু ব্যস্ত করে বললে “অভ্যন্তর পরে অস্বাস্থ্যকর!” পূর্ববী কথা কইলে না, তার ঠোঁট ছুটি বার বার কঁপে উঠলো—বিভাস ডাকলে “পূর্ববী—পূর্ববী তার পায়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো, বিভাসের হাতখানা আপনা থেকেই পূর্ববীর মাথার উপর পড়লো, বিভাস আর হাত তুললো না।

পূর্ববীর কাণের কাছে মুখ নিয়ে বতাপ চুপি চুপি বললে “পূর্ববী চল শুইগে”—আজকের ব্যাকুল আত্মনা পূর্ববী উপেক্ষা করতে পারলো না।

ঘরের সামনে এসে পূর্ববী বললে “ভূমি শোও, আমি আসছি”—বিভাস চুপ করে ঠাড়িয়ে রইলো। পাশের ঘরে একটা ড্রয়ার হাতে পূর্ববী একরাশ কাগজ পত্র বার করলে, তারপর সোজা নেমে গিয়ে রান্নাঘরে নিজে আসা উত্তনের মধ্যে সে গুলোকে ঝেলে দিলে—তার হাত একটা কাঁপল, ততক্ষণ তার দশ বৎসর ধরে লেখা কবিতার রান্নি জলে উঠলো—পূর্ববী উঠে এসে বিভাসের পাশে শুয়ে পড়লো।

পূর্ববী বিভাসের বকের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল, মাঝে মাঝে একটা কাগজ পোড়া গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল, কিন্তু পূর্ববী—সে তখন মর্ত্যালোকে ছিল না।

## গান

### শ্রীবাণীপাণি রায়

বাগেশ্রী—একতাল।

অশ্রু জ্বলেব মালটি গাঁথিয়া  
পর্যন্ত তোমার গলে,  
হৃদয়-শোণিত-চন্দন মাখা  
ফুল দিব পদতলে।

প্রহর প্রহরে নিশি ব'য়ে যায়  
পর্যন্ত আমার করে হায়—হায়  
তব সুখ তুমি এলেনা দেখায়

ভাসি শুধু অশি জ্বলে।

ওই কুহুম ফুটিছে গাছে  
মম হিয়া যে তোমার বাজে

আজিকে কাণ্ডনে বিরহী এ হিয়া  
তোমারি লাগিয়া গুঠে ব্যাধিলিয়া  
ফেলিব হৃদয়খানি উপাধিয়া

যাক তব পাশে চ'লে।



## সংস্কারক

### শ্রীবল্লভচন্দ্র কুমার

অক্ষয়বাবু পাড়াগাঁয়ের জমীদার—বড়দিনে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—বিপিনচন্দ্র নব্য যুবক, শিক্ষিত কিন্তু বেকার। আগে রাজনৈতিক ছিল, কিছুদিন পূর্বে বড়বাজারে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া ‘স্বরাজ আন্দোলন’ অভিযোগে হন এবং সেই হইতেই সমাজ সংস্কারক হইয়াছেন। কাজের মধ্যে—বিধবা বিবাহ প্রচাৰিত্রী সভার সম্পাদকতা আর বীমা কোম্পানীর ক্যানভাস করা। সংসারে স্ত্রী, বিধবা শাশী আর দুটা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। মোটের উপর বিপিনচন্দ্র ‘ধর বাবু’ ছুইই বজায় রাখিয়াছিল।

যাক সে কথা, চৌরঙ্গী, অঞ্চলের ছাঁতিনটা সাহেব ইন্সপেক্টর করিবে বলায় বিপিন ক’দিন আজ তাহাদের পিছু লইয়াছিল। ঐরূপ আরও একটা ‘হব’ মক্কেলের সহিত দেখা করিবার কথা থাকায় সে ইডেনগার্ডেনের মধ্যে একখানা বৈকে বসিয়া তাহার আশ্রয়ন প্রার্থীকায় অপেক্ষা করিতেছিল—অক্ষয়বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া সেই বৈকে আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। বিপিন অক্ষয়বাবুর চাল চলনে তাহাকে বেশ ভ্রমের সন্ধান বসিয়াই মনে করিল এবং এক শিকারের কাকে যদি আরও

কিছু উপরি লাভ হয় এই উদ্দেশ্যে বলিল—“অত ধার খেঁসে বসলেন কেন সরে আসুন আরও।”

অক্ষয়বাবু বলিলেন—“না, না—এই যে বেশ বসিছি—বেশ বসিছি—”

“আহা, জায়গা যখন রয়েছে তখন অত ধারে বসবার আবশ্যক কি? মশায়ের থাকা হয় কোথায়?”

“এখানে আমার বাড়ী নেই। তবে মেছোবাজারে আমার এক আত্মীয় আছে, আপাততঃ সেইখানেই কিছুদিনের জন্য আছি—বুঝেছেন?”

“ও! বড়দিন উপলক্ষে বেড়াতে এসেছেন?”

“আজ্ঞে, হাঁ। সারা বছরই পাড়া গাঁয়ে থাকা, তাই এই সব দোলা দুর্গোচ্চবে...বুঝেছেন?”

“বুঝি বৈকি, তা কি করা হয় ন’শায়ের?”

“কিছু জমী-জমা আছে—তাই দেখা শুনা...ক’রে কোন রকমে চলে যায়...বুঝেছেন?”

“নিশ্চয় বুঝি! ভাল কথা, আপনার ‘লাইফ ইন্সপেক্টর’ করা আছে কি? ‘লাইফ ইন্সপেক্টর’ অর্থাৎ জীবন বীমা—?”

“করা আছে বলে ত বোধ হচ্ছে না, তা বাবাজী বীমা টীমা করা ভাল কি?”

“Certainly! ভাল বৈকি, এ একটা business,



ব্যবসা— A pure and simple business। খুব লাভ জনক—

“বটে বটে, বীমাটা তা’হলে ব্যবসা? আমি ভেবে-ছিলুম—খাক, কি প্রকমটা ভনি, আমি না হয় কিছু টাকা—”

“Invest করবেন? ভাল, ভাল, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভারী লাভজনক ব্যবসেই? ভারী লাভ জনক।

বিপিন লাভজনক ব্যবসাটা: অক্ষয়বাবুকে বুঝাইয়া দিল। অক্ষয়বাবু মুখ কাঁচু মাচু করিয়া বলিলেন—“কিন্তু, ভারী গোলা বাথালে যে, মরে গেলে তবে টাকা? ... সে যে ভারী বিস্তী কথা—”

“বিপিন বলিল—শুধু মরলে পরই কেন? আপনি জীবিত অবস্থাতেও পেতে পারেন। আপনি ten years endowment করুন না কেন, তা’হলে পঞ্চাশ পেরোতে না পেরোতেই—”

“উর্হ—হু, সে আব কটা দিন বাবাভী—গিলিত বুড়াই বলতেন, কিন্তু বেড়ে বছর হল তিনি—আহা, সতীশদ্বী, সতীশদ্বী—”

“গম্ভে কি ভাতো। তবে ভাবনা নেই—বয়েস আমার টিক করে নেব’খন। দেবি ধাতগুলাে আপনার?”

অক্ষয়বাবু ধাত দেখাইলেন, বিপিন কহিল—“বেড়ে আছে, বেড়ে আছে হয়ে যাবে’খন। কোন ভাবনা নেই।

বিপিন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ইলিওরের কয়ম ইত্যাদি বাহির করিতে গেল। বিধবা বিবাহ প্রচারণী সভার কাগজ পত্র এই সঙ্গে—ছিল—তাড়াতাড়িতে তার দু’একখানাও পড়িয়া গেল। অক্ষয়বাবু তাহা বুড়াইয়া একটা চোখ অর্ধেক বুজিয়া ও একটা চোখ সম্পূর্ণ খুলিয়া পড়িতে শুরু করিলেন। বিপিন কাগজ পত্র বাহির করিয়া অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিল, অক্ষয়বাবু বলিলেন—“এদর কি বাবাভী?”

“ও কিছু নয়, কাল একজন বক্তা বক্তৃতা দেবেন এ তারই বিজ্ঞাপন।”

“কিন্তু এবে দেখছি বিধবার বিয়ে দেবার সভা, ছি: ছি: কি অর্থ! কি পাপ!”

বিপিন দেখিল—মকেল হাতছাড়া হয়, বাই বলিল—“রেখে দিন, ও নিয়ে আর মাথা খামো’খন না যত সব অহিন্দুর ব্যাপার—মহাপাপ, মহাপাতক।”

“ভাই না বলি, তোমাকে দেখলেই যে মনে হয়—এই ‘বেয়াত’ ‘টোরাষ্ট’ নয় আর কি।”

“তবে সেই একটা করে ফেলুন না, লাভজনক ব্যুত্রেই ত পারছেন, সেই একটা—”

“জা হাও সেই একটা কবে দিই। কিন্তু বাপু—ক্লোজুর নয় ত? না না, সে তুমি হবে না, দেখেই ত বুঝতে পারা যায় কে কেমন লোক।”

অক্ষয়বাবু আবেগন পড়ে সেই করিয়া বিপিনের হাতে দিলেন। বিপিন ব্যাকটা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উঠি করিয়া লইল। তারপর হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—“দু’চার দিনের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে মেছোবান্নারে যাচ্ছি তা’হলে। আচ্ছা নমস্কার, এখনি এক বোটা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে, চললুম।”

বিপিন চাটয়া গেল—অক্ষয়বাবুও উঠিলেন।

২

বিধবা বিবাহ প্রচারণী সভার আজ একজন বক্তা বক্তৃতা দিলেন। বেলা ষ্টো ৪৫ মিনিটে সভার অধিবেশন। থাা সময়ে সভাও অসভ্য আদর্শ ঘর ভটি করিতেছিল। উঠার মধ্যে জী-পুরুষ দুইই স্বত্বমান। সম্পাদক বিপিনচন্দ্র স্কলকে সমাদরে আহ্বান করিতে করিতে এদিক ওদিক করিতেছিল। সভায় বিধবা অপেক্ষা সখ্যার সংখ্যাই অধিক। অকস্মাৎ অক্ষয়বাবু দরজাধর্ম দিলেন। বিপিন এক দলকের ভজ দি ভাবিল, তারপর বলিল—“আহ্ন, আহ্ন—নমস্কার। কই কাল ত এখানে আসবার কথা শুনলুম না?”

“না, আজই ভাবলুম—তামাসাটা দেখা যাক গিয়ে।

আস ত এই জন্তেই, কি বল বাবাভী?”

“সেত বটেই—আহ্ন, বগবেন আহ্ন—”

“ভাই ত বাপু? এই মেসেজ সভায়? ছি: ছি: যত সব অহিন্দুর ব্যাপার—পিড়পুরুষের নাম লোপ

হল।...চল, তামাসাটা দেখাই যাকু—” বলিয়া অক্ষয়বাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সভা আরম্ভ হইল। একজন মোটা মোটা লোক, ঢোক গিলিয়া, গলা ফুলাইয়া বক্তার পঠিত বসিয়া কহিলেন—“এ’র নাম অবজ সকলেরই শোনো আছে, আজ আমরা এ’র বক্তৃতা শুনে দত্ত হইব। ইনি সম্প্রতি গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে নাগো প্রদেশের বিধবাদের মনোভাব বোনে এসেছেন স্বতরাং এ’র বক্তৃতা শুনে অনেক জানাবার বিষয় থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।” গৌরচন্দ্রিকা শেষ করিয়া কুমড়ার মত লোকটা বসিয়া পড়িলেন। বক্তা উঠিয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন। ভণিতা দাঙ্গ হইলে, বক্তা বলিতে লাগিলেন—বিধবারাই যে কেবল মাত্র ধন (বোধ হয় এটা তাঁর মূহুরোধ) এখানে সমবেত হয়েছেন, তা’ন, সখ্যারাই আছে। স্বতরাং আমরা এ-বাণী ধরুন শুধু বিধবাদের কাছে নয় সখ্যাদের কাছেও, কারণ তাঁরাও একদিন ধরুন বিধবা হতে পারেন...।”

সভায় জী-কর্ত্তর একটা কলবর উঠিল, বক্তা বলিতে লাগিলেন—বিধবারা ধরুন কেন এ ছুর্জহ জীবন যাপন করবে? বৈধবা যদি ভগবাতের স্পষ্ট হ’ত—তা’হলে ধরুন বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত নারীই নারী’র বজ্জিত এবং ‘অক্ষল’ হ’ত। তাত হয় না। তা’হলে ধরুন কি বুঝতে হবে?—এই বোঝায় না কি—যে আমরা পুরুষেরা মেয়েদের আত্মাকে ধরুন আবহমান কাল ধরে অবমাননা করে চলেছি? তাদের শতঃমুঠিকে খাবড়ে থামিয়ে রেখে দিয়েছি? মেয়েরা কি মাছ নয়? ধরুন তারা কি কাঠ খড়ের তৈরী, ধরুন—

অক্ষয়বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—“বত যব অহিন্দুর ব্যাপার, যত সব রেজ্ঞ কাও কার-গনা, যত সব—”

“ক মশাই চুপ করুন, চুপ করুন।”

“Silent. Silent...”

“আ: কি অমভ্য লোক, murder করে দিলে lecture টাকে—”

বিপিন ছুটিয়া আসিল এবং অক্ষয়বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—“করেন কি, করেন কি, চুপ করুন।”

“হ্যাঁহে বাপু, চুপ করুন বললেই কি চুপ করা যায়! যত সব অশাস্ত্রীয়—অস্তায় কথা বার।”

“আ:, চুপ করুন না।”

“কিন্তু এ সব কি? এতে মাছের চুপ করতে পারে?”

“বিপিন অনেক কষ্টে অক্ষয়বাবুকে বাহিরে লইয়া গেল। বক্তা আবার শুরু করিলেন—বিধবাদের মনোভাব ধরুন যদি জানাবার উপায় থাকত—ধরুন—”

অক্ষয়বাবু বিপিনের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ভীতবশে চাঁৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—তা’হলে তোমাদের ল্যাজ বেজ্ঞত, রেজ্ঞ অপোগণ্ড কোথাকার—”

বিপিন অক্ষয়বাবুকে একটু জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া একান্তে চুপি চুপি কি বলিল। অক্ষয়বাবু চোখ মুখ সিকটাইয়া স্বর নাহাইয়া বলিলেন—“সত্যি নাকি? এই দেখ দিকিন স্যাদার, এ সব আগে বললে না কেন? আ:, কলকাতা যর কি ক্লোজর? দেখ দিকিন কাউটা একবার। বিবাহ করে সব বিলুপ, এখন বলছ কি না পুলিশে ধরিয়ে যোব—এত ভারী বিস্তী কথা।” অক্ষয়বাবু আশ্চর্য ভাবে আরও কি সব বলিতে বলিতে সভা ত্যাগ করিলেন। বিপিনচন্দ্র পুরাধমে সভার কাছে লাগিয়া গেল।

৩

বিপিনের অন্তঃপুর। বিপিন ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাড়া চুখিয়া জীকে অধেষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল “ভদ্র ভগো, গেলে কোথায়? কি আঁচ্ছা ভগো—” বিপিনের জী ক্ষমা কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল—তাড়া-তাড়ি তাহা সারিয়া বলিল—“কি বলছ?”

“বুড়ী কোথায়?”

“এই ছিল এখানে—কি জানি কোথায় গেল...”

“দেখ আমি সম্পাদক, আমার ঘরে বিয়ে না দিয়ে—কুসস্ত্রাকরে গ্রন্থর দেওয়াটা ভাল ধরোয় না। লোকে নিশ্চয় করবে, করবে কেন, করছে। কি বল?”

“এতো হাছনি শুনিছ—”

“একটা পাতা জোঁটান গেছে। আজকের সভায় আসাপ হল। বয়স ২৫২৬। বেশ বড়লোক, ৩ মাস হল বেড়া মারা ছেড়ে—”



“মুখে আঙন তার।”

“দেখ অবুধ হযো না। বুড়ীর মত করিয়ে ফেল দিবিদি। আমাদেরও তাকে স্বার্থ আছে বুঝ ত?”

কমা কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া গেল।

বিপিন ঘরের মধ্যে ছুটার পাক পাচচারী করিল, তারপর বুড়ীর খোঁজে বাহির হইল। বুড়ী অস্ত্র ধরে কি করিতেছিল, বিপিন গিয়া বলিল—“এই যে বুড়ী, তোমাকে বুঝিছিলুম না।”

বুড়ী সম্পর্কে বিপিনের শালী, বেশ ঈর্ষা-সাঁট গড়ন। বয়স আঠার উনিশের মধ্যে—সুতরাং স্বন্দরী। উত্তর করিল—“কেন বলুন তো?”

“তোমার বিয়ে দিতে চাই।”

“আগে দিদির বিয়ে দি।”

কমা ভিন্ন বুড়ীর আর দিদি ছিল না, কাজেই বিপিন বলিল—“এই দেখ, ঠাট্টা বন্ধ করে দিলে। ঠাট্টা নয়, সত্যি তোমার বিয়ে হবে।”

“আরই কি মিথ্যা বলছি রায় মশায়? আগে দিদির বিয়ে দি।”

“দিদি যে তোমার সম্ভাব্য, তা নইলে—”

“বিয়ে দিতেন। বেশত, বিবহার যখন বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তখন সম্ভাব্যই বা বিয়ে দিতে দোষ কি?”

“জানো মুখ, বিধবা মানে বে-ওয়াশিল, সম্ভাব্য যে একটা ওয়াশিলান আছে।”

“বলি, বিচ্ছেদাঙ্গীশ মশায়, একটার জায়গায় দুটোই না হয় হইল; ‘বেশী থাকা দোষের নয়’ এত আপনাদেরই শাস্ত্র-বচন। না রায় মশায়, দিদির একটা গতি করে যান, যাতে আপনার অবস্থামানে ...”

এই সময় কমা হঠাৎ ঘরে ঢুকিল এবং বলিল—“কি বলছিল বুড়ী?” বুড়ী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—“তোমার একটা গতি করে দিচ্ছিলুম দিদি, যাতে ...”

“পোড়ার মুগো মিলের ভীমবতি ধরেছে। বিবহার বিয়ে দিয়ে উনি সগো যাবেন। তাই দাও বাবু বাইরে দাপেৎ—বহরার দিকে নম্বর কেন? আমার একটা বোন বইত নয়—তার আবার বিয়ে দেওয়া! পোড়া কপালে যদি স্থাই থাকবে ... তা’হলে এমনই বা হবে কেন?”

“বলি, বিয়ে দেওয়াটা তোমার ভরীর মুখ-চোরে ত গো? যাতে স্বপ্নে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, মাছটা আঁসটা ...”

“কীটা মারো পোড়ার মুখে। ফের যদি তুমি ওকথা ছুলবে তা’হলে নেড়া, খেলীর (বিপিনের ছেলে ও মেয়ের) হাত ধরে যে দিকে ছুঁচ্ছ যার চলে যার।”

বিপিন প্রমাদ গণিল। সে পড়ীর তেজোগর্ভ বক্তৃতায় মুগে পাড়াইতে পারিল না—বাহিরে গিয়া হাঁক ছাড়িল।

৪

বিপিন হন হন করিয়া মেছোবাজারের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে বিধবা প্রচাঙ্গী সভার সভ্য এবং ইলিওর কোম্পানীর ডাক্তার শ্রীমান রমণীধর বাবু। উভয়েরই গতি দ্রুত অর্থাৎ শিকারে উভয়েরই সমান ঝোঁক। রমণীধর অ-পতীক অর্থাৎ ডাক্তারী পশার জমিলে অর্দ্ধেক রাজস্ব সহ রাজকন্ডার পানি-পীড়ন করিবেন ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বিপিনের সহিত হামেশাই যোগা সাক্ষাৎ হয়, এই সূত্রে বুড়ীর উপর এর একটু বিশেষ রকমের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বিপিনকে তুষ্ট করিবার জরুই হোক আর অস্ত্র যে কারণই থাকুক, রমণীধর তার এই বিধবা বিবাহ প্রচার রূপ মহৎ কর্মদ্বাষ্টানের অঙ্গ প্রাঙ্গণ্য করিতেন। রমণীধরন বলিলেন—“কিন্তু বিপিনবাবু যে যাই বলুক, আপনি না থাকলে এ সভা অফল, উঃ কি পরিশ্রমটাই যে করেন ...।”

“না না, এমন আর কি পরিশ্রম আমি করি—তবে হ্যাঁ, একটু অবশ ... তা যদি ধরেন তো করত হবে বৈকি, যখন ...”

“সেকোটারী। সে ত কথাই, আপনি উপযুক্ত বলই ত এ ধারীকে দেওয়া হয়েছে আপনাকে।”

“আমার সাধ্য কি রমণীধর? উদ্ভট মহৎ—আপনার দেয় ইচ্ছাপ্রসক্তিতে উপর থেকে প্রেরণা নেমে আসছে। আমার সাধ্য কি?”

“তা সত্যি। আজকাল অবশ্য লোকের তবু একটু আঁট খুঁৎ আপনার দেখতে পাচ্ছে, তা এ তাঁর প্রেরণায়

(চোপ ছুটা শিরনের হইল) বেশীদিন থাকছে না। বুঝতে পারছেন না বুধি কি আমি বলছি—আপনার শালীর কথা আর কি। এখনো বিয়ে দেন নিকি না তাই লোকে বলে ... বলুক যাক, তাদের কথা আমি একেবারেই কাণে তুলিনে—আমার বিবাহ বেশীদিন এদর কাণাধুয়া করবার সুযোগ তাদের থাকবে না, কেনম কি না?”

“বিপিন নিরুত্তর। রমণীধর বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আপনি সভার সম্পাদক, আপনি যে বিধবা শালীর বিয়ে দেবেন এত ধরা কথাই। অবুধ লোকের মুখ ত বন্ধ হবার নয়, তা নইলে—”

বিপিন ধরা-ধরা ধরে বলিল—অনেক চেষ্টা করছি রমণীধর কিন্তু বুড়ীর আর বুড়ীর দিদির কি যে কুসংস্কার—তা আর কিছুতেই গেল না।

বিষয় ভাবে রমণীধর বলিলেন—বটে? ...তবু চেষ্টা ছাড়বেন না। তাইত বড় ভাবনার কথা ত!”

বিপিন উত্তর না দিয়া ছ’পাশের বাড়ীর নদর ছুটা দেখিয়া বলিল—“আর একটু ওদিকে হবে। চলুন রমণীধর, ... হ্যাঁ, চেষ্টা করত হবে বৈকি।”

অন্ধকর্ণের মধ্যেই অক্ষয়বাবুর আত্মীয়ের বাড়ীতে সংসারকর্মের ক্ষুদ্রা ধূলা পড়িল—অক্ষয়বাবুকে সংবাদও পাঠান হইল।

অক্ষয়বাবু দর্শন দিলেন। বিপিন নমস্কার করিয়া বলিল—“নানা ঝগটে আগে থপর দিতে পারিনি, একবারে ডাক্তার নিয়ে এসেছি। ইনি আপনার health examine করে report দেবেন। লাভজনক বাবসা বুঝতেই ত পারছেন?”

অক্ষয়বাবু বলিলেন—“না বাবু, তোমাদের ও ঝোচ্চুরী কাণ্ডের মধ্যে আমি নেই। যত সব অহিন্দু ... যত সব ...”

রমণীধর পিছনে ছিলেন—আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—“নমস্কার মশায়। আমার ‘কীটা’ তা’হলে দেবার অজ্ঞে করুন। নই করবার মত সময় আমার একেবারেই নেই। বলি! হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাইলেন।

‘অক্ষয়বাবু বলিলেন—“এ আবার কোন ঝোচ্চুরী

বাবা? আঃ, কলকাতাটা কি ঝোচ্চুরী তরা? কি ঝুঝতে পারছেন না বুধি কি আমি বলছি—আপনার শালীর কথা আর কি। এখনো বিয়ে দেন নিকি না তাই লোকে বলে ... বলুক যাক, তাদের কথা আমি একেবারেই কাণে তুলিনে—আমার বিবাহ বেশীদিন এদর কাণাধুয়া করবার সুযোগ তাদের থাকবে না, কেনম কি না?”

“কেন বাবু তোমার ধরে রেখেছে, যাও নু কেন ছুঁমি।”

“দেখান না বিপিনবাবু কোম্পানীর আইনটা। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি, সে সময়ও আমার নেই। আপনি ইলিওর করুন না করুন তাও আমার দেখবার নয়—‘মিছি মিছি’ harass করবার penaltyটা আপনাকে দিতেই হবে—আমার ‘কী’ ৮০ টাকা আর ৪০ টাকা ট্যাক্স ভাড়া এই—১২০টা টাকা দিন চলে যাচ্ছি।”

“তোমার কি সবাই এক লাউয়ের বীজ বাবা? উনি ত একটা সই করিয়ে নিয়ে পুলিশের ভয় দেখানেন। তুমি—আপনি এসেই ১২০টা টাকার দাবী করছো। বলি, পেশাটা কি এই না আর কিছু? ডাক্তারী টাকারী ওলর কুয়া বুধি?”

বিপিন দেখিল—আর আপা নাই। তথাপি শেষ চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল—আমাদের আর কি? ধার বা তা আপনার। লাভজনক তা ত বুঝছেন?”

“না না, তুমি জেলেনই দাও গে, তোমাদের যন্ত্রের আর পড়ছিনে। বলিয়া অক্ষয় যেমন এবং যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে তেমনি ভাবেই অগ্রসর হইলেন। রমণীধর হাঁকিয়া বলিলেন—“মামার ‘কীটা’?”

বিপিন বলিল—“আর ট্যাক্স ভাড়াটা?”

কিন্তু কোনই উত্তর আসিল না।

৫

মাস তিনেক পরের কথা। বিপিনের আঙ্গ দিন পনের হইল জর হইয়াছে। জরটা নাকি টাইফয়েড। ডাক্তার রমণীধরন বাবু স্বেচ্ছায় বিপিনের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—একজ তিন ‘কী’র দাবী করেন নাই।

ইতিমধ্যে বুড়ীকে আরও ছ’ একবার বিবাহের কথা



বলা হইয়াছিল, কিন্তু বুড়ী হাসিত আর দিগির কিনারা করিয়া দিবার জন্ত অত্যন্ত কৌণ দেখাইত। পুরুষসিংহ রমণী বাবু, এতদেও কিছু নিরুৎসাহ হন নাই।

বিপিনের তত্ত্বাবধি করিবার জন্ত ক্ষমার বড় একটা সম্মত হইত না, বুড়ীর উপর সে ভাব ছিল। রমণীবাবু যিনিদের মধ্যে পাঁচ বার বিপিনকে অথবা বুড়ীকে কাহাকে দেখিতে আসিতেন তা খলা বড়ই শক্ত, তবে তিনি আসিতেন। কিন্তু বুড়ী যে মাঝে মাঝে ইহাতে বিরক্ত হইত, ডাক্তার চন্দা-দ্বারা চোখেও তাহা বৃথিতে পারিতেন।

তা, ডাক্তারের অসুস্থ একবারে অগ্রসর নম, বুড়ী উপেক্ষা করিলেনও ক্ষমা তাহার কতকটা মন যোগাইয়া চলিত। চেহারা, কথাবার্তা, আদবকায়না প্রভৃতিতে ডাক্তারও রমণীর মনোমত নান্দী পার্শ্ব করিয়া তুলিবার জন্ত উত্তীয়া পড়িয়া লাগিয়া ছিলেন। কে জানে, ক্ষমার অসুস্থ ইহারই ফল কি না! যাক সে কথা, রমণীবাবু যিনিদের ঘরের ঘরের সমুখে আসিয়া বুড়ীকে বেদনানার লাগলগায়ে নিংড়াইয়া রস বাহির করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার হাতে লাগেনি ত? বেদনানার পানার চাইতে আপনার আঙ্গুলগোলা নরমই হবে বোধ করি।

“জালানেন যে ডাক্তার বাবু, বেদনানার রস বের করতে আমার হাতে লাগে?”

“দবাবের না লাগতে পারে—”

“তবে আমার লাগবে কি করে বুঝলেন?”

“না না, তা নম, এই ধকন আমি কি কোমাল পাড়তে পারি? তেমনি হাত শক্ত নরম আছে ত? যাক, রোগীর ববর কি?”

“আমি তা ডাক্তার নই,—শেখুন না আপনি ...।”

ক্ষমা ঘরে ঢুকিল, ডাক্তারের দিকে এক পলকের জন্ত চাহিয়া, বুড়ীর দিকে নিরিখা বলিল—“ওর সঙ্গে অত স্বগড়া কিসের বড়ি? কি উপকারটা করছেন বল দেখি উনি?”

“কগড়া করছি কে তোমায় বললে দিবি? ওর ভালোবের কথা শুনে যে পা-হাতে জালা করে। বেদনানার

রস বের করতে হাতে লাগে কখনো? তুমিই বলো ...”

“তা উনি ডাক্তার, উনি জানেন বৈকি। ধরনা সবায়েরই কি লাগে, আমি এই যে পারি না, পোড়া হাত ছুঁতে ছেলোর মত নরম,—আমার লাগে, আমি কি করব বলতো?”

বিপিন বুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল,—বেশলেন ত? এ সব আমার experience অভিজ্ঞতা। ওর কাছেই শুনলেন তো?”

“আপনি শুধু” বলিয়া বুড়ী কক্ষ ত্যাগ করিল। ডাক্তার ক্ষমার সহিত বুড়ীর উদ্ভেদের সম্বন্ধে হুঁ এক কথা কহিয়া রোগী লইয়া পড়িলেন।

“কেমন আছেন আজ বিপিন বাবু?”

বিপিন বোধ হয় বিধবা বিবাহের স্বপ্ন দেখিতেছিল—প্রশ্নে সচকিত হইয়া বলিল—“কে, ডাক্তার? এ যাত্রা আর নম এ আমি নিশ্চয়ই বলছি।”

“না না, হতশ্র হবেন না, আরাম হয়ে যাবেন।”

“আরাম একবারেই হব ডাক্তার। কিন্তু আপশোষ রইল—যে মহৎ উদ্দেশ্য প্রচারের ভার ভগবান দিয়েছিলেন—ভার কিছু করে যেতে পারলেন না। আপশোষ ডাক্তার—বড় আপশোষ ...”

“কেন ভাবছেন, দেখি হাডটা—”

অবগতির হাত দেখিয়া, জিত দেখিয়া, পেট টিপিয়া, বকে ঠেংখিকোপ বসাইয়া পরীক্ষার পর রমণীবাবু বলিলেন—“অনর্থক ভাববেন না আপনি, ভাল হয়ে যাবেন, ভর নেই।”

“আর ভাল হয়ে যাব। ... না ডাক্তার মরতে আমার দুঃখ নেই—কিন্তু ভাবছি কি জানেন, আমিও মরছি। এখন বাড়ীতে একটা বিধবা এর পর ছুটী হবে। ... কোথা গেল বুড়ী, বুড়ীকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন, তা ডাক্তার যদি সে নাই—ই করে—আর একটা বিধবাত হচ্ছে, তাকেই বিয়ে করবেন। আমার স্বর্গীয় আত্মা তাকে ...”

“থাক বিপিন বাবু, বেশী বকবেন না। আপনি

সেরে উঠুন, আর যা বলছেন, সেয়ে উঠে, বুড়ীকে আমার দেখেন ...। আমি ...”

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় ডাক্তার ধামিয়া গেলেন। সে চোখে রাগ বা বির্যগ কি ছিল তা ক্ষমাই জানে, সে দৃষ্টি কিন্তু ডাক্তারকে ভীত করিল। ক্ষমা কড়াও নয় নরমও নয় এমন এক হয়ে বলিল—

“থাক থাক অত খোসামুদীর দরকার কি? বুড়ীকেই বা কেন, আমি ত তার দিদি, ওর মরণ কালেই ইচ্ছেটাকে অবশ্যই পালন করবো। না ডাক্তার বাবু, ওর আর খোসামুদী করবেন না।”

বিধবা বিবাহের উদ্ভোক্তাদের আওতাধ পড়িয়া ক্ষমারও হঠাৎ রুচি বিকার ঘটাইয়াছিল কি না কে জানে!

সে যা হোক, বিপিন বলিল—“আঃ আমি স্থখে মরতে পারব। কই ডাক্তার বাবু তোমার হাত কই—তোমার এ সংসাহসের পুরস্কার তুমি পাবেই। আর ক্ষমা, তোমার মত স্ত্রী বহু ভাগ্যে তবে মেলে। আমি দূর্গ থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করবো। আঃ, বড় তুচ্ছ, বোমোনার রস পাওনা একটু গা ...”

বুড়ী যে বেদনানার রসটা পায়ে রাখিয়া গিয়াছিল, ক্ষমা তাহা বিপিনকে পাওয়াইবার জন্ত অগ্রসর হইল। বুড়ী হঠাৎ বড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল—“থাক, এটা আর ছুঁয়োনা দিদি, তোমার ঐ ডাক্তার বাবুর অহংয়ের সম্মত নরম-হাতে-মেড়োনি বেদনানার রস খাইও। নাও রায় মশাই এটুকু খেয়ে নাও। ... যান না ডাক্তার বাবু, রোগী ত দেখা হয়ে গেছে কখনো, আর দাঁড়িয়ে কল কি? ... মরতেও ত এখনো ছুঁ চার দিন দেখী আছে। ... তোমার বলি রায় মশায়—মরনা ত ফুরিয়েই গেল, ভাবিত।

বেঁচে উঠলে কিন্তু কান্ধিতে পাঠিয়ে দিতে হবে তা বলে রাখছি।”

৬

বিপিন মরি মরি করিয়াও মরিবার ধারে গেল না, টালে বেটোলে বাঁচিয়া উঠিল। রমণী ডাক্তার নিঃশব্দে বুদ্ধিমাছিলেন—বুড়ীকে তিনি বাগ মানাইতে পারিবেন না। কাজেই any woman is better than no woman হিসাবে ক্ষমার দিকে এদনি একটু চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিপিন সাহায্য উঠিয়া সব মটী কড়িয়া দিল। চিকিৎসা শাস্ত্রে অবশ্য প্রাণাত্মক বিষয়ের অভাব ছিল না তবে তাহা প্রয়োগ করিয়া বিপিনের বিধবা-বিবাহ-প্রচার-প্রয়াসী আত্মাকে খাপছাড়া করাই-বার মত সংসাহস রমণী ডাক্তারের ছিল না।

সব দিকে বিফল মনোহর হইয়া ডাক্তার কোথাকার এক চা বাগানে চাকরী লইয়া চলিয়া গেলেন। শোনা যায়—যাইবার আগে বিধবা বিবাহ প্রচারিণী সত্যার যা কিছু কাগর পত্র সব অগ্নিগর্ভে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। আবার প্রকাশ চা বাগানে গিয়া তিনি একটা “সম্বা উদ্ধারিণী” স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কাজে কতদূর কি হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

বুড়ী কানী চলিয়া গেছে। নেড়া আর খেদী মানিমার খিয়ে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল, মাসীমার কানী যাইবার আগে ছুছেন একদিন আড়ালে মাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বিবাহ কবে হইবে এবং এখনো হইতেছে না কেন? বুড়ী কি উত্তর দিয়াছিল তাহা তাহাদের টিক মরণ নাই, তবে মাঝের দিকে চাহিয়া কি একটা প্রশ্ন করিয়ে কি করিয়ে না তাহা অনেক সময়ই ভাবিত।





## বাঁধন ব্যথা

শ্রীলোদেবী

অচ্ছেদ্য বন্ধন !  
বিস্তৃত প্রাক্ষায় ঘন নাগ বন্ধু লম্ব  
শিকড় গহন !  
করে তার মহরিত বস্ত্রী বিকাশ  
মালকের দখিণ পবন  
মুহু সঙ্গরণ !

সমাক্ষর গুতা-তত্ত্ব-জালে  
অসীম বিপ্লুতি  
ছুড়ে আছে জীবন আমার  
পরমায়ু ক্রিতি ।  
জড়াবেছে লক্ষ নাগপাশ  
স্বর্গীয় জীবন করি পরিহাস—  
—একি অস্ট্রহাস !

কোন শুভকল—  
ছিন্ন করি এর প্রচণ্ড উল্লাস  
মিলে যাবে মুক্তির প্রাণ  
প্রেমের নিঃশ্বাসে পাব নবীন জীবন  
চির সন্মিলন ?

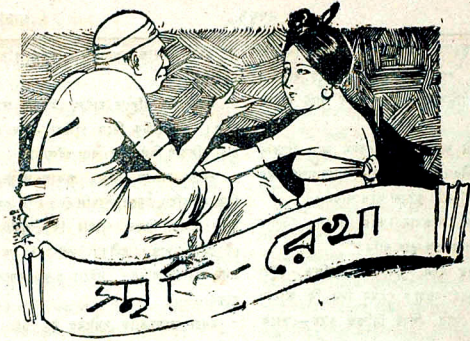
অশুভ প্রাচীর !  
ব্যাপিয়া জীবন সারা চতুঃসীমায়  
বেড়িয়াছে আমার অসীর  
এগো এই নীলাধর দিক্-মেখলায়  
অটুট শৃঙ্খলে ঘেন ঘিরেছে আমার  
সপ্ন মহা সিদ্ধ রচে দুর্গ পরিধার—  
নিরত্নশ এ জীবন ভূমি  
উন্নত তরঙ্গদল বিধগয় হুমি  
পালাবার কোথা পথ ?  
নাহি বিন্দু অবসর যার মাঝে পাবে  
নামিবারে সত্যুর রথ !

হৃদগুণ্য গিরি অবিচল  
কাঞ্চন মলয় শৈল বিদ্যা আরাবলী  
সৌম্য নীলাচল !  
যেরিঘাছে শুভে শুভে বিপুল বিরাত  
ভারতের হৃদয় ললাট !

তরু হৃৎকীরী !  
নভ চক্ৰবাল রেখা দিগন্ত বিবীনি  
সমুদ্রত গিরিবর শির  
উল্কে করে বলমল মৃগ-মণ্ডল  
কিরীট আয়ুধধারী বীর্য সমুজ্জল  
কেমনে ভেদিয়া তারে যাব অস্ত্র লোকে  
আনন্দ সঙ্গীত ঘন উচ্ছল আলোকে ?

শিখর ! গগন ! ধরা ! ওজঃ ! পারাবার !  
কিতি, অপ, বায়ু, ব্যোম, বেজ, ভূনিবার !  
কেন বলে বাধিয়াছে জীবন আমার  
অনন্ত বন্ধনে ?  
বিরহ ক্রন্দনে  
কবে দেবে মুক্তি ? ছেড়ে কবে দেবে যোরে ?  
কোন বধু গোপনিলিতে ? কোন বর্ষা ভোরে ?  
কোন নীপবনে নব আবরণের যোরে ?

মাধবী মণ্ডপে ? না সে বেতস কাননে ?  
তরু বীথিকায় ? না সে নন্দ্য রথিত—  
—ঐ তরু ছায়াপথে, নিশীথ গগনে ?  
আনি রিবে সূতা স্থলপন ?  
চির আকাজিক ছবি—সোণার স্বপ্ন  
চির-সন্মিলন ?



শ্রীকবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছত্রিশ

ক্রোরের দিকে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ।  
এসময় প্রায় বৃষ্টি হয় না । স্মৃতাং সকলেই অন্তরিন  
অপেক্ষা ঠাণ্ডা অহুতব করিতেছিল । সমীর একথানা  
ঘোটা ঝাপড় গায়ে জড়াইয়া বাহিরে দাওয়ার উপর  
বসিয়া অব্যাহত পাহাড়ের বৃষ্টিহাত বৃষ্টিদির দিকে  
এক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল । বেশ ভাল  
করিয়া তাহার মনের প্রতি চাহিয়া দেখিলে মনে হয়  
যেন তাহার চিন্তার স্রোতে স্রোতার ভাটা খেলিতেছে ।  
কখন কোন আনন্দের অহুতব অন্তরের মধ্যে যে তরঙ্গ  
তুলিতেছিল তাহা স্রোতারের মতই মুখ, চোখ উল্লাসে  
উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল আবার তখন হয় ত কি  
কারণে ভাঁটার টানে নদীতটের অবস্থার মত নিরানন্দ  
তাহার মুখের উপর এমন একটা বেদনাকাতর বৈদ্যের  
স্বাভাবিক অন্ধিত করিয়া দিতেছিল, বাহার দিকে  
চাহিবারাম চমকিত ও স্তম্ভিত হইতে হয় ।

কর্তব্য নির্ধারণে অনন্তোপায় সমীর যেন আকাশ  
পাতাল ভাবিয়া একটা কিছু স্থির করিয়া উঠিতে, পদে  
পদে সন্দেহের শব্দ আরম্ভ হইয়া ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া

পড়িতেছিল । কোন দিক দিয়া সে, তার মনকে বুঝাইয়া  
উঠিতে পারিতেছিল না । সমীর মনে মনে অনেক তর্ক  
বিতর্কের পর স্থির করিল, না পারিবার কারণ কি ? মনে  
হইল সকল মাছুষকে সমান ভাবে অবিশ্বাস করা ।  
তারপর মনে মনে বলিল, মহুয়ার অদৃষ্টে যাহা আছে,  
তাহা হইবেই । তাহার গতিরোধ করিবার আমি কে ?  
মহুয়ার প্রতি আমার প্রগাঢ় ঘেহ, অন্ধ ভালবাসা, তাহার  
মঙ্গলের পথে ক্রমাগত অবিশ্বাসের কটকট যোগপ  
করিয়া চলিয়াছে । সমীর শেষে আপনা আগনি বলিল,  
“ভাবি না” একথা সবাই বলিয়া থাকে । কিন্তু না ভাবিয়া  
কেই পায় পায় না । সকল পিতা মাতা, আত্মীয়  
স্বজন কন্ডার ভবিষ্যত স্বপ্ন লক্ষ্য করিয়া বিবাহ দিয়া  
থাকে । তাহার্য্য সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন  
ভবিষ্যতের উপর কাহারও হাত নাই । সেখানে কোন  
আদেশ বা আশ্বাস কোন রিনই কিছু করিতে পারে  
নাই । সমীর কাহার উদ্দেশ্যে ছুই হস্ত ঝোড় করিয়া  
অনেকদণ্ড পর্যন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল । তাহার  
গণ্ডখল বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । সে  
চক্ষু মুছিয়া ডাকিল “মহুয়া, এদিকে আয় ?”

\*মহুয়া তখন কি কাজ করিতেছিল । হাতের



কাজ কেলিয়া দাড়র ভাকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল। “একি! দাছ তুই এখেনা হাটে বাসনি! আমি মনে করিয়াছিলাম এতকণে তুই হাটে পৌছে গিয়েছিলি।”

“এই দেখ হাটে ঘাবার কথা একদম ভুলে গিয়েছি রে?” বলিয়া সমীর বেহুড়কের মহুয়ার অশ্রুবাণপূর্ণ-দৃষ্টির নিকট থায়া গিয়া বানিকটা আনন্দ লাভ করিল।

মহুয়া অত্যন্ত অভিমান ভরে বলিল, “এবার দেখছি কতক আশ্রয় পুণ্ড্র ভুলে যাবি?”

সমীর একবার যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, “তা কি হবে মহুয়া? এমন দিন কি আমার হবে? যেদিন, তোরা বিষয় নিশ্চিন্ত হইবে—তোকে ফুল যেতে পারব? কি করলে তেমন দিন আসে, আমার বল মহুয়া? আমি তাই করতে রাগি আছি।”  
তোকে সঙ্গারের হাটে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারলে, তুই দেখে নিস মহুয়া, তোরা দাড়র আর একটা দিনের জন্য কিছু ভুল হবে না। হাটে যাওয়া-ত সামান্য কাজ। সঙ্গল কাজের বাহিরে গিয়া প্রাণ খুলে হুঁহাত তুলে তোরের নিভা আশীর্বাদ করব। এর বেশী তোর দাছ চুনিয়ার কাছে আর কিছুই প্রত্যাশা করে না।”  
মহুয়া ছুটিয়া গিয়া সমীরের ছুটি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল “দাছ তুই কি বলছিস? আমাকে তুই ভাসিয়ে দিতে চাও? আমি কি পোষ করেছি বল? আমাকে তুই বা বলবি আমি তাই করব? ওকি! তুই কাঁদছিস দাছ! আমি তোরা হাত ছাড়ব না। আমাকে কেলে দিসনি দাছ।”

বুড় সমীর এবার অত্যন্ত করুণভরে মহুয়াকে নিজ বেহুড়কের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল “দিলি, বুড়ের দুর্বল হাত আর ক’দিন ধরে রাখবে বল? দিন দিন যে এ হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে! ইচ্ছা করলেও যে আমি আর ধরে রাখতে পারব না। তাই তোরা পরহাত হুঁপানি এমন হাতের উপর তুলে দোব, যে হাত ধরে সঙ্গারের ভীল পথ সর্পাঙ্গ স্বপ্ন হবে!”

মহুয়া অশ্রুস্রব কণ্ঠে ডাকিল, “দাছ?”

সমীর অত্যন্ত স্নেহস্রবরে উত্তর করিল, “কেন রে মহুয়া?”

মহুয়া কি বলিতে বাইল, লজ্জা তাহার করুণ হইল। সে মাটির দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। যাথা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল না।

সমীর অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “মহুয়া পামলি যে? কি বলতে যাচ্ছনি বল? কোন দিনত আমার কিছু পামলি? আমি যে তোরা দাছ! সমীর! তুই তো আজ আমাকে এমন করে ফেলছিস? নইলে এরূপ বয়সে কার জন্য পদেব?.....”

মহুয়া ভাড়াভাড়া সমীরের মূখ ছুই হস্ত চাপিয়া ধরিল এবং কাঁদিয়া ফেলিল। সমীর একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মহুয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, “দাছ বড় লজ্জা করে! তাই বলতে পারছি না। আমার কোন অপরাধ নিও না।”

সমীর বলিল, “লজ্জা করবার সখ্য যে তোরা সঙ্গে আমার নেই। তুই যে আমার কে, তা বলে বোঝান যায় না। আমি যে তোরা মা, বাপ, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন সব সখ্য মনন করে শিব যেমন হলহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে আছেন, আমিও তোরা সব হয়ে তেমননি ভাবে বুড়া মেয়ে বসে আছি। তা কি তুই এত দিনেও বুঝতে পারিসনি?”

“কেন পারব না দাছ? বুঝতে পারি বলেই ত লজ্জা করে।”

সমীর বলিল, “লজ্জা করলে আর চলবে না। কি বলছিলি বল ত?”

মহুয়া লজ্জা-জড়িত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার দুর্বল হাতের চেয়ে সবল হাত কোথায় পাবে? তোমার মনের মত মানুষ কে আছে যে আমাদের মত লোকের জন্য শক্তিমান তার হাত এগিয়ে দেবে দাছ?”

সমীর এবার কোর করিয়া বলিল, “তুই যদি সুমারী থাকার কথাটা মন থেকে মুছে ফেলিস, তুলে দাছ, তা হলে, তেমন হাত আছে—আছে। সে হাতের

এগিয়ে আসার চিত্র চারিদিকে মঙ্গল চিত্রের মত আমার চক্ষুর সামনে ছুটে উঠছে।”

“তা যদি দেখতে পেয়ে থাক? তা হলে.....”

“তা হ’লে আর কি? বলিয়া সমীর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তারপর সে বলিল, “ওরে মহুয়া আমার বড় কিসে পেয়েছে। আমার কিছু খেতে দে।”

মহুয়া বলিল, “এমন সময়ে ত তোমার কোন দিন কিদে পায় না দাছ?”

“এতদিন সে পথ পায়নি, আজ পথ পেয়েছে আর কি চুপ করে বসে থাকতে পারে?”

মহুয়া ভাড়াভাড়া এক কানি মুচী, গোটা চার লম্বা ও বানিকটে ভেলে গুড় আনিয়া দিল।

সমীর ছোট ছেলের মত প্রাণ খুলিয়া বাইতে লাগিল। বাইতে বাইতে বলিল, “অনেক দিন এমন করে বাইনি রে। মহুয়া তুই এখানে একটু বস। তোকে আজ গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করব।”

মহুয়া ছোট মেয়েটির মত সমীরের নিকট উপবেশন করিল। সমীর জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা মহুয়া তুইত যখন তখন প্রবেশাব্যবসার মার হুখ্যাতি করিস। প্রবেশ ব্যবসার বাবা কেমন মানুষ? তিনি তোকে কেমন দেখেন?”

“তোমার ত বলেছি দাছ, তারা আমাকে নিজের মেয়ের চেয়ে ভালবাসেন।”

“প্রবেশ ব্যবসার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করছি?”

তিনি যেন আজ কালকার মানুষ নন। তাঁকে দেবতা বলে মনে হয়। তুই যদি একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করিস, তা হলে বুঝতে পারবি।

“বেশ! বেশ! ভরসাকত এই রকম হবে। তাইত হওয়া চাই! আচ্ছা অনন্য কেমন লোক তোরা মনে হয়? লজ্জা করছিস না।”

“দাছ, সত্যি কথা বলতে কি তাকে দেখে পথ্যন্ত, খালি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। সে মুখে এমন একটা ভাব আছে, এমন একটা কি যেন পূজন আছে, সেটা জানবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় ও যেন আমার ভাই ছিল। তার দিক থেকে

যেন চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সেও আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে কি যেন খোঁজ করে। তার সঙ্গে আমার কথা কইতে বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু তিনি কি জানি কেন আমার কাছে থেকে ইচ্ছা ক’রে সরে সরে থাকেন। দাছ তুই আমাকে বুঝিয়ে দে-কেন এমন হয়।”

সমীর অনেকগুলি নীরব থাকিয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিল।

কথার বিনির মধ্যে হীরে লুকিয়ে থাকে সংলব চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু জুহুর চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পারে না। দেখবামাত্র উভয়ের পরিচয় হতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হয় না। কেন এমন হয়, তার কি উত্তর তোরা মহুয়া? মহাভারত সংস্কার মাছবুত পাড়াবিক। তারা গতি বোধ হয় কেহ বোধ পায়নি। আজ্ঞা অন্ধ স্পর্শ মায়েই যেমন তার আনন্দ দুলালকে মুহূর্তে চিনতে পারে, অধঃস্বামণি লৌহকে যেমন সবলে টানিয়া লয়, এ যে তোরা সেই সখ্য নয় কে তা বলতে পারে?

মহুয়া উত্তর করিল, “অনেক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, অনেকে উত্তরজনার বশীভূত হয়ে, অনেকে ফুল করেও অনেক সময় এমন কাজ করে বসে যে, পরে সে জন্য অহুতাপ কর্তৃত্ব হয়। বর্তমানের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, স্বপ্নের কল্পিত চিত্র মনে মনে দেখেও তা দাছ অনেকে তুল করে থাকে।”

“যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, যারা বড় লোক বলে পরিচিত, যাদের দেখে লোকে অহুতাপ করে, তারাই যে এমন ভানক রকমের তুল করে, পরে অবশ্য সন্দেহান করবার তখন সহজ পথ বুঝে পায় না। তখন তারা মাটির পুতুলের মত পথের দূলা তেমন অনায়াস-লব্ধ জনকে কেলে দিতে মোটেই ইত্তস্তত্ব করে না। লাভের অন্ধ চিরদিন ধর্মীর জন্য, অত্যাচারীর নিমিত্ত। সোকাশান গরীবকে বহন কর্তৃত্ব হয়। এটাই বোধ হয় বর্তমান যুগের নীতি ও ধর্ম।”

সমীর মহুয়ার কথা শুনিয়া তার মুখের প্রতি বিষম বিষম ব্যাকুল দৃষ্টিতে অনেকগুলি পথ্যন্ত চাটিয়া রহিল।



তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “মহুয়া তুই এসব কি বলছিস? মহুয়া কিছু মার খাশ না করিয়া উত্তর করিল, “আমার মনের সত্য কথা! আমার মনে হয় দাউ, উপকারের প্রত্যাশার কবুতে গিয়ে আমার অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে এখন সব মারাত্মক ভুল করে বসি যা সাধা জীবনের অসহ্যাপ দিয়ে মুছে ফেলা সম্ভবপর হয় না।”

“তুই ঠিক বলেছিল মহুয়া! এই আতঙ্কিত আমাকে ঘোর অবিশ্বাসী করে তুলেছে। নইলে আমি বেদে, আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় কেন? বুকেছি মহুয়া বুকেছি। দীর্ঘদিনের অপর্ণনের পর মিলন প্রেমিক পথে অসত্য আনন্দের হলেও তার সখর্না হাসি দিয়ে হয় না। অন্তরের পরিষ্কৃত অজ্ঞাধারা দিয়ে করতে হয়।”

“আজ তোর সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা বেদে, আমরা বড় কথার ধার খাচ্ছি। তোর নিষ্ঠুর বিশ্বাস হয়েছে আমি ক’দিন বড় লোকের ঘরে ছিলাম—সেদুস্ত তোর মনে অনেক কথা উঠতে পারে? কিঞ্চি, এটা তুই নিষ্ঠুর জানিস দাউ, মহুয়া যে ঘরের ঘরে সে কথা সে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে রাজি নয়। দাউয়ের বিপদের সময় উপকার করার মধ্যে বেদে জ্ঞাতি কোন দিন প্রত্যাশার চায় না। এত তোর শিখান কথাই বলছি।”

“মহুয়া, তোর কথা শুনে, আমার আনন্দ রাখবার যারগা নাই রে। এতখানি বুদ্ধি তোর না থাকলে হয়ত আমার এতখানি চিন্তার কারণ নাও থাকতে পারত। আচ্ছা মহুয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই যে এতবড় একটা কাজ করে এলি, এবার তারা তোকে টাকা দিচ্ছে চাইলে না?”

“না দাউ, টাকার কথা তার মুখে আসে নাই। আমাকে যেহেতু মত প্রবোধ বাবুর মা নিজ হাতে দাঁড়িয়ে দিলেন। সে কি দ্বন্দ্ব! তা মুখে বলা যায় না। এমন ভাল লোক আর কোথাও দেখিনি।”

“সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। তারা তা’হলে তোকে আপনার লোক মনে করতে সক্ষম হন নাই, কেনন?”

“আমি ত তাদের ব্যবহারের মধ্যে তা দেখতে পাইনি।”

“আচ্ছা আমার কথা হচ্ছে কি জানিস।

এই সময় প্রবোধের পিতা হরেন্দ্রাবুর সেখানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরেন্দ্রাবুর মহুয়াকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আমি ত ঠিক চিনে আসতে পেরেছি! এটা কিন্তু আমাদের বাপা থেকে অনেকটা পণ। ইনি বুদ্ধি তোমার দাউ, মহুয়া?”

মহুয়া মাথা নাড়িয়া হরেন্দ্রাবুর কথায় সাধ দিল। তারপর মহুয়া তার দাউকে কাশে কাশে বলিল, “ইনি বড় ডাক্তার প্রবোধ বাবুর বাবা।”

সমীর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হরেন্দ্রাবুরকে সখর্না করিবার নিমিত্ত ধাঁড়াইয়া উঠিল। বুঝ যে কি করিবে, কি করিলে উৎকৃষ্ট সমান করা হয় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে বুদ্ধিমত্তী মহুয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানি মৃগ-চর্ম আনিয়া দাউয়ার উপর পাতিয়া দিল। সমীর খেন ধাপ ছাড়িয়া বাচিল।

সমীর হুইয়াত কোড় করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিল, “আমরা অসত্য বেদে, আপনাকে অভ্যর্থনা করবার উপযুক্ত নই। দয়া করে যখন, আমাদের কুঁড়তে এসেছেন, তখন একটু বসে জিরিয়ে নিন।”

হরেন্দ্রাবুর জুতা খুঁটিয়া মৃগ-চর্মের উপর উপবেশন করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম সমীর?”

সমীর উত্তর করিল “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“বেদে বলে নিজেকে অত তুচ্ছ মনে করবার কোন কারণ দেখতে পাই না। তোমাদের বাবা সমাজ অনেক বিষয় উপরুত। তোমার কথা শুনে আমি খুব খুসী হয়েছি।”

“সেটা, আপনারা বড় লোক যা খুসী বলতে পারেন। কিন্তু আপনার মত লোককে খুসী করবার মত আমাদের কোন আদ্যবাই নাই। নিজগুণে দরিদ্রের প্রতি আপনারদের কৃপা দৃষ্টি আছে ব’লেই অজিও আমাদের মত হতভাগ্য বেদে জ্ঞাতি পৃথিবীর বুকে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারছে।

“না হে সমীর—তা ঠিক নয়। তোমাদের মত উদার অন্তঃকরণের লোক আজও সমাজ আছে বলেই, অনেক ডলোক তাদের পুত্র কন্যার জীবন বিধে পায়! তাদের প্রাণ মরুভূমি না হয়ে উল্লাসের উৎস পারায় ভরে উঠে, সে কথা কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যতদিন বেঁচে থাকব। মহুয়া মা, এদিকে আয়—তোকে একবার ভালকরে দেখি। আমার অশ্বরের স্তোত্রজ্ঞাতা তোর দাউর কাছে জানতে এসেছি মা। তুই আমাদের জীবন দান করেছিস।”

সমীর বলিল, “আমরা বেদে, ভববুর আমাদের সমাজ বা সমীর নাই। আমরা দাউয়ের অবধার নিয়ে গল্পাংগে আমরা একরূপ পশুর জীবনযাপন করি। সত্যতাং বাহুয়ের গৌরব বা কর্তব্যের স্পর্শা নিয়ে কোন কথা বলতে মহুয়া আমাদের পক্ষে পুষ্টতা ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু দাউয়ের বিপদের সময় দাউ যদি সাহায্য না করে তবে কি বনের জন্তু এসে করবে? এত দাউয়ের দাউয়েই কর্তব্য। এতো বেশী কিছু করা বলে আমার মনে হয় না।”

“সমীর তুমি নিষ্ঠুর জান না, বর্ধমান সমাজ কি ভাবে চলছে? তারা নিজ নিজ স্বার্থ, অহংকার নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। কর্তব্যজ্ঞান অনেকখানি তুলে গেছে। পরের জন্ত কেউ ভাবতে পারে এমন কথাটা মনে করতে তাদের চক্ষে বিক্রণের ভীত হাসি ফুটে ওঠে। আমি ডাক্তারী করি। অনেক বড় বড় পরিবারের মধ্যে আমার যাতায়াত আছে। ছেলে বাপকে দেখে না। বাপ ছেলেকে দেখে না, এমন নির্মম দৃষ্টি প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে রেখেছি। তোমরা বেদে বলে নিজেরের যতই ছোট করে জানাতে চাও, কিন্তু তোমাদের মত সরল দেশেরের মোক সমাজে শত করা দশ জন থাকিলেও দেশের জাতির খেতে উপকার হ’তো। তোমার সঙ্গে আলাপ করে, আমার বড়ই আনন্দ হ’লো। তোমাকে দেখবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল।”

সমীর বলিল, “আমি অতি সামান্ত লোক।”  
হরেন্দ্রাবুর একবার উঠিয়া সমীরের হুই হাত নিষেধ

হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া উত্তেজিত কর্তে বলিল, “এমনি সামান্ত লোকের বন্ধুত্ব কি আমি পেতে পারি না? মহৎ লোকে আমার প্রয়োজন নাই।”

সমীর হরেন্দ্রাবুর অস্তুত আচরণে নির্দোষ হইয়া কেবল তাহার মূগের প্রতি চাহিয়া রহিল। “এদেশে এসে যে বন্ধু লাভ করিলাম তার মূল্য অমূল্য। তোমার নাতনীর নিকট আমার সমস্ত পরিবার স্তোত্রজন, শ্রী থাকিবে।”

সমীরের ছই নয়ন বহিয়া আনন্দ-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

হরেন্দ্রাবুর বলিলেন, “সমীর তুমি আমাকে বন্ধ বলে গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের মত স্বার্থপর লোককে বন্ধু বলা যায় না জানি, কিন্তু.....”  
সমীর হরেন্দ্রাবুর কথায় বাধা দিয়া বলিল, “আপনি অমন করে বলবেন না। আপনার কথায় আমার নুতন চক্ষু খুলে গেছে।

আজ তুমি আমাদের বাসায় এক সঙ্গে থাকবে। আসতে চাও—নইলে বড় দুঃখ হবে। যদি বড় লোক মনে কর তা’হলে এখানে কাজ নাই, যদি আমাকে তোমার বন্ধু মনে কর তা’হলে নিষ্ঠুরই আসতে চাও। তারপর মহুয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি গিয়ে অবনী বা উমেশপাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমিও আসবে মা। কিন্তু এত পথ হেঁটে যেও না—গরুর গাড়ী করে যাবে।”

“আমাদের হেঁটে যেতে কোন কষ্ট হয় না। বরং গরুর গাড়ী করে যেতে বড় লজ্জা করে।” বলিয়া মহুয়া মাঠের দিকে চাহিল।

“তোমাদের কষ্ট না হ’লে আমার বড় কষ্ট হয় যে মহুয়া! আমাকে কষ্ট দেওয়া অবশ্য তোমার ইচ্ছা নয়।”

তারপর হরেন্দ্রাবুর সমীরকে বলিলেন, “একটু সকাল সকাল আসবে। এখন আসি।”

সমীর অনেকখানি পথ পথ্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন তার মনের মধ্যে একটা বিরাট ঋণ চলিতেছিল।

(জগন্নাথ)



## নিবোধ

### ত্রিগিরিজাকুমার বহু

তুমি সেদিন বোলেছিলে আমার জন্তে লপ বারো।  
মিনতি তুমি অপেক্ষা করিতে পারো, এমন সময়ও তোমার  
নেই। তুমি ঠিকই বোলেছিলে।

তোমার এমন কোনো কাজ নেই বা থাকতে পারে  
না? বার জন্তে দ্রুবেলা আশ ঘণ্টার অবসর তুমি পাও না,  
আমার কাছে আসবার। যার ভালোবাসা থাকে, যার  
প্রিয়তমকে দেখবার জন্তে মনে ব্যাকুলতা জাগে, যে তার  
প্রেমাম্বলকে সত্যিই চায় স্বান দিয়েছে—সে কাজের  
চাপে গিয়ে গেলেও, সময় কোরে নেয় দয়িতের কাছে  
আসবার জন্তে, যার সে সব কিছুই নেই সেই, চম্পক  
ঘণ্টা বিরাম তার থাকলেও, মিথ্যা কাজের গন্ধের দেখায়।

আমি জানি তুমি আমার দেখতে চাও না আর তা  
জানি বোলেই তোমার পর হোয়ে যাবার উৎসবে যেদিন  
তুমি আনন্দোৎসব করবে, হাদিসুখে পাড়িয়েছিলে—  
সেদিন আমি আসিনি। আমি দূরে ছিলাম বর্ষা, কিন্তু  
সহজেই আসতে পারুকুম। তবু আসিনি এই জন্তে যে  
তোমার আনন্দের দিনে তুমি যাকে দেখতে চাও না  
তার তকণা থাকাই ভালো মনে করেছিলাম। আজ-  
কাল তোমার গভীর বেথি, কথা কইতে চাও না নজর  
কোরেছি, দেখা দিতে ইচ্ছে তোমার হয় না, অস্বস্ত  
কোরেছি।

তুমি যে কদিন গুরুত্ব থাকতে বাধ্য হয়েছিলে, সে  
কদিন আমার শরীর কি চাকল্যে ও মনে কি যত্নগার  
কেটেছে তা কি তুমি জানো? আমি তোমার খবর  
নিতো চাইলে, তোমার গুরুজনেরা এমন কঠিন মুখে  
থাকার এমন রকম ভাষার তার জবাব দিয়েছিলেন যাতে  
শান্তিই বা হোয়েছিল আমি যেন কেউ নই, তোমার  
খবর নেবার কোনো অধিকার যেন আমার নেই, তোমার  
কাছে যাবার হুকুম যেন আমার অপ্রাপ্য। তাই সাত  
আট দিন আর আমি গুণ্ধো হইনি, তোমার কোনো  
খবর নিইনি। নিটনি বলা ঠিক নয়, এমন ভাবে, এমন  
লোকের কাছে, এমন গোপনে নিযেছি যা তোমাদের  
বাড়ীর বড়লোক বাবুদের অগোচর ছিল।

কেন তুমি আমার দেখতে চাওনি, কেন তোমার  
লোকেরা আমার ডেকে নিয়ে যাননি, কেন আমি তোমার  
অস্বস্ততার তোমার কাছে যেতে পাইনি? আমার চেয়ে  
কে তোমার বেশী ভালোবাসে, আমার চেয়ে কে তোমার  
বেশী সেবা করবার ক্ষমতা রাখে, তুমি শয্যালুপ্তি হোলে  
আমার চেয়ে কে বেশী কষ্ট পায়? কেউ নয়—মা, বাপ,  
বোন, ভাই, আত্মীয়-স্বজন, খামি, শত্রু কেউ নয়।  
তারা কি তুমি অস্বস্ত হলে আহার নিস্তা ত্যাগ কোরে-  
ছিলেন? না; আমি একা তা কোরেছিলুম। আজ  
তুমি যে তুমি, সে কার জন্তে? আমার। সেবারে  
কেউ যখন হালে পানি পায়নি, কে পরামর্শ দিয়ে  
সাহায্য কোরে সব দিক রক্ষা কোরেছিল?—আমি।

আজ তুমি কঠিন, তোমার লোকেরা রক্ত চক্ষু,  
তোমাদের আচরণ নীরস। ভগবান্ কি মারা গেছেন  
বোলে তোমরা ভেবেছ, প্রেম কি শক্তিশীন হোয়েছে  
বোলে মনে কোরেছ, এর কোনো উপায় নেই বোলে  
কি তোমাদের ধারণা হোয়েছে? দেখা যাক।

আর একটি দিন তোমার সঙ্গে আমি দেখা কোরো,  
তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্তে। সে প্রার্থনার  
কারণ সেই মিলন ও বিদায়ের নিমাই জামাযো। তুমি  
হুখে থেকো, আমি তোমার কোনো বাধ্য বিষ ঘটাবোনা,  
আমার এত বড় প্রেমের বিনিময়ে কিছু দাবী কোরোবো  
না কেন না তুমি সে দাবী বার বার বাধ্য কোরেছ।

একটা কথা আমার বোলবে কি? আমার প্রতি  
মনের ভিতর এত বিষ চেপে রেখে, মুখে যে স্থগার  
সাগর বইয়ে দাও, তোমার বিবেক কি তার জন্তে  
তোমার বুকে হুশাস্তুরও বিদ্ধ করে না? সেদিন যে  
কোরে ক্ষত পদক্ষেপে আমার আসে আগে গিয়ে অশ্র  
মহলে চুকে পড়লে তা! আমার প্রাণে গাথা আছে আর  
থাকবে।

একদিন তোমার তার কতিপূরণ কোরতেই হবে।  
সে দিনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

## অশ্র

### শ্রীমদ্রামোহন বাগচী

মানব, তুমি কি কাঁদিতে জান? জীবনে কখনও কি  
তেমন করিয়া কাঁদিয়াছ, যেমন করিয়া বিরহবিধুরা তাপস  
বালিকা শূন্যতা অপোবনে বসিয়া দুঃখ চিত্রায় আপ-  
নাকে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিয়াছিল? যেমন করিয়া সত্যের  
অবতার রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তমা সীতার বিরহে আশ্র-  
হারা হইয়া অশোকগুচ্ছ দর্শনে হৃৎ-দ্বন্দ্ব-বনচর্য ভাই  
লক্ষণকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্র বস্ত্রায় সহস্র তীর প্রাবিত  
করিয়াছিলেন; যেমন করিয়া প্রেমের গুরু শ্রীচৈতন্যদেব  
প্রেমের সাধনায় পাগল হইয়া জগৎবাসীকে পাগল করিয়া  
কাঁদিয়াছিলেন?

জীবনে এমন সৌভাগ্য কি তোমার আসিয়াছে যে  
তোমার অশ্র বস্ত্রায় পৃথিবীর বুক ভাসিয়াছে? যদি  
আদিয়া থাকে তাহা হইল বৃষ্টি যে একটি মুহূর্তের  
জন্তেও প্রেমের পূজায় ভালবাসার অর্জুনা তোমার দ্বয়ে  
প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্তেও প্রেমাম্বলের  
চিত্রায় তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। আর তুমিও  
বৃষ্টিবে তোমার জীবন ধৃত হইয়াছে; তোমার প্রতি  
অশ্র বিন্দু তোমারই দেবতার গলায় মুক্তার হার হইয়া  
ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বলি, মানব, কাঁদ। তেমন  
ব্যাকুল হইয়া, পাগল হইয়া কাঁদ। অশ্রকারের অন্তরালে  
তোমার প্রাণের বাধ্য গলিয়া অশ্ররূপে শতধারার ধূনি-  
ব্রী বক্ষে করিত হউক। ভোগবতী ভাগীরথীর পূত

ধারা যেমন পৃথিবীকে পরিষ করিয়াছিল তেমন তোমার  
অশ্রধারায় তোমাকে পূত পরিষ করুক। তোমার  
জীবনের বত অশ্রকার যত স্থূহতা সব বিরহীত হইয়া  
যাক। দেখিতে পাইবে, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে  
সর্বদানেই বিশ্বপ্রকৃতি তোমারই মত প্রতি পলে প্রেমের  
অশ্র বিসর্জন করিতেছে—আর সেই অশ্র পথে, পুষ্পে,  
তারার মত ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমার স্বয়ংবীপার  
তারগুলি যে করণ হুয়ে বারিষা উঠিয়াছিল তার প্রতি  
মুছনা এখনও বিশ্বের মর্মবীপায় তেমনি করিয়া বহুত  
হইতেছে। তুমি দেখিবে তোমার ব্যথার মাঝে বিশ্ব-  
মানবের হৃদ্যস্তের বেদনা সমতালে বাজিতেছে; গ্রহ-  
নগর জ্যোতির্মণ্ডলী যে হুয়ে গাথিয়া চলিয়াছে তোমার  
কায়ারও সেই হুয়ে বাজিতেছে। কৌণ্ডল্যপতিকে নিহার  
করুক শরবিদ্ধ হইতে দেখিবা। কবিগুরু বাম্বিকীও একদিন  
এমনি করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাই বিশ্ব-মানব এখনও  
‘মা নিহার প্রতিষ্ঠা—’ বলিয়া এখনও সেই কায়ার  
প্রতিধ্বনি করিতেছে। তাই আমার বলি যে মানব,  
কাঁদ—প্রাণ ভরিয়া কাঁদ—তোমার অশ্র ধারায় পৃথিবীর  
বুক ভাগাইয়া দাও। তোমার ব্যাকুল অশ্র সাগরে  
অন্তরের অন্তরতম বস্ত্র শতদলের মত ফুটিয়া উঠুক। সেই  
শতদলের পাণ্ডুর ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সব  
ফুলিয়া নিঃসর আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

## আচ্ছা জদ

### শ্রীঅশোক রায়

একশো এগারো নব্বের গাড়ীতে উঠেছি। ইচ্ছে  
বড়ী বাব। ভীষণ ভিড়। তার মধ্যেই টেলেরূলে  
কোন রকমে একটি ভাষণ করে নিযেছি। উঠেই লক্ষ্য  
পড়ল এক ডব্ললোকের উপর। মোটা মোটা, নাহুলু  
মিনে আদিতর পাঠাবী গায়। পায়ে লপেটা, মাথায়



ইয়া তেঁড়ী। দেবলাম নবাব উপরই তিনি খুব মাতঙ্গরী ফলাচ্ছেন। এত ভিড় অথচ তাঁর হৃদয়ে তাঁর তিন হাতের মধ্যে কেউ বসতে পারবে না—পাছে তাঁর কামা নষ্ট হয়। একে বাড়ী, একে নাম জিজ্ঞেস করছেন, আবার খোদা মত কাউকে সরিয়ে দিয়ে জানান। দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। সবাই যেন তাঁর ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে।

দুইয়ে গাড়ী ধাম্। একটা পচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক আমাদের কামরায় উঠল। ইয়া লখা, ইয়া চণ্ডা শরীর। উঠেই উক্ত ভক্তলোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ধূপ করে তাঁর পাশে বসে পড়ল। এই ব্যাপারে সবাই যেন আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মাতঙ্গর ভক্তলোক যুবকের ব্যবহারে ভয়ানক চটে গেলেন। কিন্তু ছেলটির শরীর দেখে তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না। অত লোকের উপর কিন্তু মাতঙ্গরী তাঁর ধাম্। না এবং চাল যেখান আরও ফেড়েই গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে যুবক তাঁর উপর সন্ত্রস্ত হ'তে পারছেন না। হঠাৎ ভক্ত লোকটি যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, “মশায়ের নাম।” যুবক দীর্ঘভাবে বলল, “নিলিনী হুমার গুপ্ত।” “নিবাস।” “চাঁটগাঁ।” ভক্তলোক বিস্মিত হ'বার ভাব করে বললেন, “চাঁটগাঁ? চাঁটগাঁ কোথায় মশায়? যুবক বিজ্ঞপ্ত করে

বললে, “চাঁটগাঁ চেনেন না? কখনো জুগালে পড়েন নি বোধ হয়?”

ভক্তলোক কথায় কথায় না দিয়ে বললেন “কোথায়? পূর্ববঙ্গে?” যুবক স্বেচ্ছাপূর্বক বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। চিনতে পারলেন?” ভক্তলোক তেমনি ভাবেই বললেন, “তাই বলুন। পূর্ববঙ্গ বলুন, ঢাকা বলুন, বরিশাল বলুন, যার নাম শুনেছি তার কথা বলুন। তান্না আপনি চাঁটগাঁ, ‘চাঁটগাঁ’ করছেন। চাঁটগাঁর নাম শুনি নি কখনো।” এই বলে খুব একটোই চাল হ'ল মনে করে ভক্তলোক ‘একবার গলিতভাবে চারিদিকে চাইলেন। যুবক মুচকি হেসে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে ভক্তলোককে জিজ্ঞাসা করল, “মশায়ের নাম?” “ব্রজেন্দ্র লাল সাহা।” “বাপের নাম?” একটু বিরক্তিতে ভক্তলোক বললেন, “ব্রজেন্দ্রলাল সাহা।” যুবক বিশ্বাসের ভাব করে বলল, “ব্রজেন্দ্রলাল? ব্রজেন্দ্রলাল কে মশায়? ব্রজেন্দ্রলাল বলতে কাউকে জানি না। রাজসিংহ বলুন, জগৎসিংহ বলুন, যাদের নাম জানি, যাদের কথা পড়েছি, তাদের নাম বলুন। তান্না আপনি বলছেন, ‘ব্রজেন্দ্রলাল যার নাম শাত জন্মেও শুনি নি।’ সবাইই হো হো করে হেসে উঠল। মাতঙ্গর ভক্তলোক তখন জব্ব হ'য়ে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

## প্রতীক্ষায়

### শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী

আজকে আমার ভাড়া দেউল,

ভরিয়ে দিয়ে মুগের বাসে

আলিয়ে দিয়ে প্রকল্পদীপ

ধাক্কা বধু, তোমার আসনে।

আজ যে তোমার চরণ ছোঁয়া

হলো দ্রব্দ সোপান সম

চলে যাওয়ার অ'চল তোমার

ছুয়ে গেল পরাণ সম,

সেই যাওয়ারই রেখা ধরে

অ'খি মম রাখণো ফেলে

ভাঙ্গুন ধরা মনের আমার

সব আগাছা দিয়ে ঢেলে।



মহাশয়

ইয়ং ইন্ডিয়া

পরিষ্কার  
সার সঞ্চলন

## সত্যের পরীক্ষা

দক্ষিণ আফ্রিকা বাত্রার সূচনা

সেই অফিসারের কাছে যাওয়াই যে আমার একান্ত নির্দোষের চায় কার্য ইয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমার তুলের হিসাবে তাঁর অস্বীয়তা ও কোথ প্রকাশের পরিমাণটা কিছু বেশীই ইয়াছিল। আমি এমন কিছু অস্ত্রায় করি নাই যে ভক্ত আমি বিতাড়িত হইতে পারি। বোধ হয় তাঁর সময়ের পাচটা মিনিটের বেশী আমি নষ্ট করি নাই। কিন্তু তিনি ঐ সখস্ব আমার কথা কওরাটাই পছন্দ করেন নাই। তিনি ভক্ত ভাবে আমার বিদায় দিলেই পারিতেন কিন্তু ক্ষমতা হাতে থাইয়া তিনি অতীত অগনিত্যু ইয়াই পড়িয়াছিলেন। পরে আমি জানিয়াছিলাম যে এই অফিসারটির “বৈধা” নামক গুণটির একান্তই অভাব ছিল। দর্শনপ্রবীণদের সহিত অভক্ত বাঁহবার করাটাই তাঁহার স্বভাবের অস্বীকৃত ছিল। মনের মত নহে এখন একটু কিছু ব্যাপার ঘটিলেই তিনি আশঙ্কায় ইয়াই পড়িতেন।

এদিকে আমার অধিকাংশ কাজই তাঁহার আশ্রিতে পড়িত। তাহাকে সন্ত্রস্ত করিবার মত ক্ষমতা বা তাঁহার অগ্রহই ভিকা করিবার মত প্রবৃত্তি আমার ছিল না। বাস্তবিকই একবার তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা রুখ করিব বলিয়া পরে চুপ করিয়া থাকাটাই আমি পছন্দ করি নাই।

পোধানকার রাজনৈতিক কূটচক্রের রহস্যও ক্রমশঃ

বৃদ্ধিতে পারিলাম। কাথিয়াবাড় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের সমন্বয় ছিল বলিয়া উহা রাজনৈতিক চালবাজীর লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলেই হয়। ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং ঐ সকল রাজ্যের অফিসারদের মধ্যে আয়ত অধিক ক্ষমতা পাইবার জন্য চক্রান্ত—এই সমস্তই সে সময়ের ধারা ছিল। রাজ্যের এই সমস্ত লোকের অগ্রগ্রহ ভিয়ারী ছিলেন এবং গ্রায়েই তোষামোদকারী ও নিম্নরূপণের কথায় আস্থা স্থাপন করিতেন। এমন কি সাহেবের আরদালীর মন রাখিবারও চেষ্টা করিতেন—আর সেসেতাদার। তাঁহার দাপট তো বোধ সাহেবের চেয়েও বেশী ছিল কারণ তিনিই ছিলেন সাহেবের চক্ষু এবং কর্ণ। সমস্ত ঘটনাই ইচ্ছামত যাই তা' করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার ইচ্ছাই একরকম আইন ছিল এবং তাঁহার আর সাহেবের চেয়েও বেশী ছিল বলিয়া শুনা যাইত। এমন ব্যাপার অন্তরীক্ষিত হইতে পারে তবে তিনি তাঁহার বেতনের উপযুক্ত চালের চেয়েও যে উঁচু চালে চলিতেন তাহা একপ্রকার ঠিক ছিল।

এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমার নিকট বিষয়ব বোধ হইত এবং কি করিয়া এই সকলের প্রভাব হইতে নিজেদের নিম্নস্ত রাখিব অথোরহ তাহাই ভাবিতাম।

সব দেখিয়া শুনিয়া আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার ভাতাও তাহা লক্ষ্য করিলেন।







দৈনন্দিনের ববর অধিগত করিয়া রাখে। ছুপুরে পুষ্করোচা চলিয়া গেলে বিড়ালের perambulation—পল্লী পথচলি বা পাড়া বেড়ান আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথম সন্ধ্যার মত তার অবধিগতি। বিশেষতঃ রাত্রারের পাটবাঁধী রাঁদুনির সহিত তার “চোখের বালী” পাতান থাকে। খাটের নিচে ঢাকা খোকাবাবুর দ্বন্দ্ব বাইয়া যুবতীর গালি, রাত্রারের হাড়ি ভাঙিয়া মাছ বাইয়া গিঁদুর লাগি, তাকের উপর উঠিয়া খাবার বাইয়া ছেলেরের প্রচার প্রভৃতি লাভ করিয়া বিড়ালের দিবসের পালা শেষ হয়। কখনও কখনও অফিসেনসেবীর মত এমন নির্যাসের অবলম্বন করে যে মুখিক দর্শনেও কণ্ঠশক্তি প্রকাশ পায় না। তখন চৌর-পাহার ওয়ালা বৃত্তান্ত মনে পড়ে। বিড়ালকে দেখিয়া আমার অকস্মিক লোকবের কথা মনে হয়। তাহারও একের প্রায় নির্যাতন, পাড়ার ভৎসনা, বন্ধু-বান্ধবের পরিহাস সহ করিয়া হাট বাজারে ঘুরির দোকানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে। নিতান্ত ক্ষুণ্ণিভিত না হইলে পুন্সরীর ভাণ্ডার আশীর্বাদ লাভ করিতে প্রত্যাগমন করে না। মাংসাদি মন্থর মত বাহাই হউক, বা পুণ্যপঙ্কর বাহাই বলুন আমার বোধ হয় পতীকে প্রহারের কলে বিড়াল যেনো লাভ করিতে হয়—আর প্রমথার লাগি-গালি-বিজ্ঞপ জুটুকিতে সে পাণ্ডের মোচন হইয়া থাকে। মহৎসংহিতায় বিড়ালের স্বভাব সম্বন্ধে পাওয়া যায়। সেখানে বিড়াল-হস্তা শ্রেণীর তুল্য এবং অজান বশতঃ বিড়াল বর্গ করিলে তিন বিধ ক্রীড়ান বা পায়রক্ক, অসামান এবং জ্ঞানকৃত বিড়াল বধে ঘাঘন রাজ কঙ্কত্ৰতাষ্টান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যায়ন কালে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া বিড়াল গমন করিলে সেই দিবস অনন্যায়ের আদেশও মহ লিখিয়া গিয়াছেন। বিড়ালের উজ্জিষ্ট ভোজন করিলে ব্রহ্মবহলা নামক কাঞ্চল পান করিতে বলিয়াছেন। ইহাতেই বিড়ালের দ্বারা Diphtheria আক্রমণের সম্ভাবনার বিষয় মনে পড়ে। পানিনিও এই বিড়ালকে বিবৃত হইতে পারেন নাই। মার্কার্জার মুখিকের নিত্য বিরোধিতা জানাইয়া তিনি সমাপনস্থলে “মার্কার্জার মুখিক” পদ বিভ্রাঙ্গ করিয়াছেন।

মার্কার্জারোহণে বাক্স সৈন্তের অভিযানের কথাও রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। আয়র্সেন-কারোও বিড়ালকে জুলিতে পারেন নাই। আয়র্সেনে বিশেষ আছে যে বিড়াল বিষ্টার ধূপ কন্দলীর লিখিত উপদ্রবক। প্রাচীনকালে বায়ুমান যন্ত্র প্রভৃতি না থাকিলেও প্রাচীনরা এই বিড়ালের সাহায্যে আবহাওয়ায় fore-cast দিতে চেষ্টা করিতেন। বৃহৎসংহিতায় দেখা আছে যে অন্যতুষ্টি কালে যদি বিড়ালকে মাটি খুঁড়িতে দেখা যায় তাহা হইলে অতিবায় বৃষ্টির সম্ভাবনা জানিতে হইবে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও গানে বিড়ালের উপমা প্রয়োগ করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন যে পুরস্কৃত বিড়াল ইন্দুর প্রভৃতি শিকার করিতে জানিত না ও সম্পূর্ণ বজ্র অবস্থায় ছিল। এই জন্তই রোমানরা মুখাফিদি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত গৃহে পালিত নকুল রক্ষা করিতেন। জুলিয়াস সীজার যখন ব্রিটেন অধিকার করিয়া লন তখন খেতবীপের গুরুকার-মেসপ-বীচ-পাইন ব্রহ্মভিত্তি অবস্থা সকল বজ্র বিড়ালে পরিপূর্ণ থাকিলেও তাহাদের একটীও মুখিক শিকার করিতে জানিত না। এবং তাহার সমস্ত বসন্ত পরেও তথায় গৃহ পালিত অবস্থায় বিড়ালকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে শস্ত সংরক্ষণে পোতক বাজ প্রভৃতির সহিত ইহাদের Economics hygienic value পরিস্রূ পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজের বিজ্ঞত বংশাবলীর মধ্যে angora (persian) maltese manx এবং siamese (Royal) জাতীয় বিড়ালই প্রসিদ্ধ। মিশরে ইহাদের বহু সমান ছিল। তথায় দেবতা রূপে (Aelurus) বিড়াল পূজা পাইয়াছে। মিশরীরা ইহাদের মৃত দেহ ত্র্যকিত করিয়া রাখিত এবং সেই বিড়াল বধ করিলে তাহার প্রাণ ধৃত হইত। সম্রাট বৌদীহানানের কবর হইতে বহু বিড়ালের মণী পাওয়া গিয়াছে। এই মিশর হইতেই ফিনিশীয়েরা বিড়ালকে Etruria লইয়া যায় এবং তথা হইতেই ইটালী প্রভৃতি দেশে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। প্রাচীন wastes দেশেও বিড়ালের বখেট আদর ছিল। সেখানে বিড়াল বধ করিলে তাহার পরিষেবিত শস্ত প্রধান করিতে হইত।

এই বিড়ালকে দেখিয়া আবার অনেক বীরপুত্রবেরা ভয় পাইতেন। Lord Roberts Henry III Duke of Schoenberg প্রভৃতিরা ইহার দর্শনে মুগ্ধ হইতেন।

প্রসিদ্ধ কোষকার (lexicographer) Dr. Johnson, কবি Thomas Gray, সাহিত্যিক Horace Walpole প্রভৃতিদের বিড়ালের নেশা ছিল। Johnson-এর বিড়ালের নাম ছিল Nodge. Grayর বিড়াল সেলিমা (Selima) লাল মাছের টবে ভুজিয়া মরাতে কবি রূপ ছন্দে তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধু Horace Walpoleর বিড়াল মরিয়া গেলে তাহার স্মৃতিতে উদ্দেশ করিয়া একটি গাথা (Ode) রচনা করিয়াছিলেন। এদেশের বিদুষ্টাণ্ডা ও প্রাচীন গ্রীসের ইস্পৃ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেরই কবিতায় ব্যাপশেনে পান শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

বিড়াল বন্দ্যার মনের শাস্তি। নারীর পুত্র-হীনতার দুঃখ মার্কার্জার দ্বারা অতিক্রান্ত হয়। তাহাদের সম্মান সেহ বিড়ালেই আরোপিত হইয়া থাকে। বিড়াল আটকুদার দস্তক সম্ভায়; যুতবস্ত্রার পোতপুরে বাসল্য-সম-বিক্রিত অপরূপের গৃহে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দী নাই। নিয়ানন্দ গৃহের কাকলী শব্দ কক্ষের বিবাদময় শব্দায় যুবতীর অঙ্গে থাকিয়া বিড়াল স্বপ্ন উত্তোলা করে। আবারো চান্দে উপর নিম্নিত, বালিসের মত কোমল ও দেশী পুঙ্ক ফুসাতের মত স্তম্ভ বহুল বিড়ালকে যখন লক্ষ্য করি—তখন মনে হয় কীমারী ভিতর লোভ ব্যতীত সকল রিগুই সম্ভব। নোভেক বনম করিতে পারিলেই বিড়াল বৈষ্ণব লাভ করিবে। বশের Bancroft টার-রক্ষকের বহুতা মশায়, বাশালীকে বিড়ালের সহিত তুলিত করিয়াছেন। কারণ উভয়েই মৎস্তভোজী ও ছদ্মপায়ী, স্বভাবে প্রায় একরূপ।

—ভীক ও নিলঙ্ক। পাকশালার বিড়াল মেয়েলী পুষ্কর মত; রাঁদুনীকে আগলাইতে এমন আর নাই। পাঁটাওয়া রক্ষণ শালার দ্বায়ে বসিয়া বিড়াল আশ্রয় কান্তের আশ্রয় অভিনয় লক্ষ্য করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ ব্রহ্মানন্দের রন্ধন গৃহে রোহিণীর রন্ধনের সময়

পাওয়া গিয়াছে। তখন মাছের গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া বাঘের মাসি অর্ধ-বিরাধা ভল্লীমতী রোহিণীর মুখপানে চাহিয়া কত জাকিয়াছিল। আবার মৃগালীতেও এই বিড়ালের active part দেখিতে পাই। সেখানে মনোরমা একটী কৃষ্ণবর্ণ মার্কার্জার গলায় মালা পরাইতে হয়। হৃৎস্পন্দে অধর দমন করিয়া মনোরমা যতবার বিড়ালের গলায় মালা পরাইয়া দিতে ছিলেন বিড়াল ততবার মাথার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল। শেষে পত্নপতির চপেটাঘাতে বহনিকা পতন হইয়া গেল।

এই বিড়ালই আবার ভাগ্যবশে বারবনিত্যার বিনিময় রজনীর দোশর হয়। সেখানে তার ভাক নাম পুটী, থাকি, থিরি, থিত, থি, আতুরি, সোহাগী, আল্লালী ইয়ারি। সেখানে মিনির সোহাগের অশ্লীলার পাড়ের শিকল বাঁধা শুক। তারপর পুটী কত ব্যাগপ্রিয় পাড়ার আগুখাটী ও ময়স্করীর কবে কোথায় কতই বাধিয়াছিল সে সেই স্বগড়ার রিহারজাল (Rehearsal) পাঠ্যনার ছাদে ও আঁতাইতে দেখাইয়া থাকে। তখন হামিতে হামিতে গিঁদুর পেট কাটিয়া যায়। এ যেন পত্নী ময়রাণী, ভবিতলেসেনী, পাচি সেকুয়ানী, খেদি ছুতোয়ী আর যতনী বামনীর স্বগড়ার মত। বিবাহ-বিভার্টের বিলা-সিনী কারুকুমার মত উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলার নিকট বিড়াল ল্যাপ ভগের সমান। মা বস্তীর বাহন বাশালী পরিবারের মধ্যে গাভী, তুলসীদ্বন্দ্ব, শালগ্রাম, গন্ধোদক প্রভৃতির মতই গ্রাহ ও অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে ছাড়িলে চলিলে না। মেয়েলীপুত্র বিধি, মেথুয়া চাকর, আরও উচ্ছিন্ন বাঘের মত পুনিও আমাদের পরিজনভূক্ত এবং প্রায় বিড়ালের অদর্শনে পুখিরী উৎকর্ষ ও বালকবালিকার অশুভক্ষিত্য। এত গুণ আছে বলিয়াই বিড়াল বাশালীর ঘরে স্থান পাইয়াছে এবং কুকুর ইংরেজের ঘরে ও কুকুট উভয়েই মৎস্তভোজী ও ছদ্মপায়ী, স্বভাবে প্রায় একরূপ।

— ২। কোকিল

কোকিল নীড় বাঁধে না কেন? দার পুত্র লইয়া সে সত্যার করিতে বিমুগ্ন কিংবদন্তী? শুধু বাড়িলে



মত পান গাছিয়া গাছিয়া দেশ বিশেষে সে কেন ভ্রমণ করে? তার বাবার ভাবের উদ্ভাস্ত প্রকৃতির তাৎপৰ্য্য আছে। আমার বোধ হয় কোকিল সংসারে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ। সংসারের সবটুকু রসের সম্যক আশাদ গ্রহণ করিয়া সে যথা সুখিয়াছে তাহাই জীবনে উপলব্ধি করিয়া চলিয়াছে। সামাজিক ভাবে বিবাহ করিতে হয় তাই যেন তার বিবাহ করা;—মনের আশানুপ্রাণন কই? সংসারে সকল সময়ে দ্বার সহযোগ, সহায়ত্ব, সাহচর্য্য পাওয়া যায় কই? তাই বোধ হয় কোকিল বিষাদী। পরিবারের মনোস্তম্ভিত জ্ঞাত লোক সুখিয়া মরে কিন্তু তাহারা কিরিয়াও চায় না। সে তাদের জ্ঞত বসন্ত। ভাবে তারা হয় ত তার জ্ঞত তার একাংশও ভাবে না। সংসারে সবই যেন ব্যবসাদারী। সর্বত্রই একটা মত দোকানদারীর ভাব। যেহে, মমতা, প্রেম ভালবাসা সবার ভিতরই ঠক জুহুচুরী। প্রাণদের মত আশান নাই, মানের ব্যোগ্য প্রতিদান নাই, যুগের তুল্য বসন্ত নাই, সর্বত্রই বার্ষিকের গন্ধ, যেন আকাশজ্ঞার বিরাট অশ্বমেধ। লাভের আশায় অনেক ফুলেই হতভাগ্য হইতে হয়। এই সার বুদ্ধিযাই কোকিলের বৈরাগ্য। সংসার কালীদেবের আবেষ্টে শুই বিপাক কমলে কামিনী বড় একটা মিলে না। তাই কোকিলের প্রেমের প্রত্যাশন ও স্নেহ গাছিয়া বৈরাগীর মত পর্যটন। পত্নী অহুগামিনী হয় ত ভালই নচেৎ প্রত্যাশার তার কোনও বাধা নাই। কোকিলের ভাব লইয়া যদি এ শোক হুহু নৈরাগ কোলাহল পূর্ণ সংসারে যথা মমতাকে পায়ে দলিয়া ফাকা প্রাণে শূন্য মনে গাছিয়া ঘুরিতে পারা যায় তবেই সংসার হুহু নারায়ণের চরণস্পর্শে আপদরূপ কালী দমন সম্ভবপর হইতে পারে। এই শিক্ষা দিবার জন্তই কোকিল মধুমাধে মধুরস্বরে প্রাণে মধুর ভাব বিঞ্চন করিয়া বেয়।

### ৩। ময়ূর

একবার ময়ূর সিংহ দেখিয়াছিলাম। ময়ূরীকে নারীভাববল্লভ রীতিতে ঘরের এককোণে কি এক কার্য্যে নিরত দেখিলাম। ময়ূর ধাতুকাচমুগটে সংগ্রহ করিতে করিতে কল্যাণ বিস্তার করিল। ময়ূর যেমন অহসৌন্দর্য্য, বেশভেজিত, রূপাধুষণ প্রকৃতিতে পরীয়াই তেমনই তাহাকে ভাবগ্রহণ বসিয়া বোধ হইল। তাহার অক-ভকী পদবিক্ষেপ যেন রোমক সম্রাট বা দিল্লীর বাদশাহ অপেক্ষাও গরীবীভ ও স্পর্ধাহতক। বোধ হইল ময়ূর যেন পূর্ণকালের ফ্যারিসিদের মত আড়ম্বর প্রিয়। পুঙ্খ কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে ময়ূর নৃত্য করিতে লাগিল। মনে হইল গুরুগুরুপূরে গুরুগুরু চিত্তরথ কিম্বদীকে নৃত্যকাশা শিখাইবার জ্ঞাত নাচিতেছে। ময়ূর কত ঘুরিল, কত ফিরিল, পাখা কতবার হেলাইল হেলাইল ফিরাইল কিন্তু ময়ূরী কিরিয়াও চাহিল না। ময়ূর যে দিকে যায় ময়ূর সেই দিকে ফিরে কিন্তু প্রিয়ার সন্তোষের নিমিত্ত তার এত আয়োজন এত আড়ম্বর যেন গুণ হইয়া গেল। এত করিয়াও তাহাকে তৃপ্তান গেল না। এ কোতুক দেখিয়া আমার মনে হইল যে বাহার্য্য হৃদয়, ভাবুক, প্রেমিক, কবি, তাহাদের কীবন সন্ধিনীরা বোধ হয় তাহাদের মনের উজ্জ্বল সমুদ্রের অথবা তাহাদের কল্পনা ময়ূরীর সম্যক আশাদ অন্বেষ করিতে পারে না। সেই জন্তই দয়িতার সহযোগে তাহারো ভাষণ স্বপ্নাঙ্কি লাভে বঞ্চিত থাকেন। ভাবের সৌন্দর্য্য বা সৌন্দর্য্যের ময়ূরী দেখাইয়া দিলেও পত্নী কল্পনামারিত্য, ভাববৈজ্ঞান্য বা চিত্তা শক্তির বর্জ্বতা বশত: পত্নির সহগামিনী বা সহবন্ধিনী হইতে পারেন না। দাম্পত্যজীবনে যেন অনেক সময়েই একটা মানসিক বিয়ক্তি থাকিয়া যায়।



কলিকাতায় 'ভেজিটেবল-বী' নামক রাসায়নিক

কৃষি যুগতির খুব চলন হইয়াছে—কারণ ইহা স্থলভ ও ইহাতে জাস্তব চর্চা নাই। বিশুদ্ধ ঘুতের সহিত ইহা ভেজাল দেওয়া হইতেছে—কলে ঘুত-বিক্রেতগণ ইহার সাহায্যে গ্রহুর লাভ করিতেছেন। ময়ূরার লোকনেও ইহার ব্যবহার হইতেছে কিন্তু কথটা হইতেছে এই যে বিশুদ্ধ ঘুত মানবের শরীর গঠনে, স্বাস্থ্যের উতিকরণে ও আয়ুর্ধর্মে যে সাহায্য করিয়া থাকে ভেজিটেবল-বী তাহা করে কি না তাহাই জানা দরকার। যদি ইহা বাহ্য ব্যবহারিক কোন উপকার না হয় তবে অর্থব্যয় করিয়া এই পদার্থ ক্রয় করা নির্ভুক্ততার পরিচয় মাত্র। বাংলা দেশে অনেক রাসায়নিক পণ্ডিত আছেন—ঐহারা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত করিলে ভাল হয়।

খাটী ঘুতের মূল্য খবন বাড়িয়াছিল তখন ঘুতপক ব্যবসায় দাম বাড়িয়াছিল—এখন এই স্থলভ ভেজিটেবল-ঘুত-পক ব্যবহার সেই চড়া দামে বিক্রীত হইতেছে—এ সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের যথেষ্ট কর্তব্য আছে বলিয়া মনে হয়। যে সমস্ত লোকনে ভেজিটেবল ঘুত ব্যবহার হয় তাহাদিগকে উহা স্পষ্ট ও প্রকাজভাবে বিজ্ঞাপিত করিতে ও খাবারের মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য করা কর্পোরেশনের কর্তব্য। কর্পোরেশনের দ্বারা বিভাগের জ্ঞাত সাধারণের প্রদত্ত অর্থের অনেকটা ব্যয়িত হইয়া থাকে উজ্জ্ব জনসাধারণ ঐ বিভাগের নিকট হইতে এটুকুও আশা করিতে পারেন না কি? খাবারওয়ালারা সবজি যে এই মোটা লাভের পরা ছাড়িয়া দিবে তাহা মনে হয় না—তবে সাধারণ যদি সম্মত হইয়া তাহাদিগকে দাম কমাতে

বাধ্য করেন তবেই তাহারা দাম কমায়ে নতুবা ব্যবসায়ের এই অজ্ঞার লুপ্ত কার্য্য সমতাসেই চলিবে।

বকরী পূর্ণ উপলক্ষে যে সমস্ত গোলমালের আশঙ্কা ছিল ও গুজব শুনা গিয়াছিল তাহা একেবারে হুবহু না ঘটিলেও সামান্য কিছু গোলমাল ঘটয়াছিল। তবে পুলিশের তৎপরতায় উহা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। গোলমালের উৎপত্তি স্থান সেই গৈয়দ সানী লেনে—সেখানে শিখেরের গুরুদ্বারের পার্শ্ব এক মসজিদে একটা গোহত্যা করা হয়, ইহাতে শিখগণ চকল হইয়া উঠে। ইহা মুসলমানগণ শিখদের উপর আক্রোশ বশত: করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় কারণ তদা গেল ইন্সপেক্টর ঐ মসজিদে কখনও গো-কোলাহল হয় নাই। এই উপলক্ষে বড়বাজার অঞ্চলে একটা মুসলমান এক শিখের নিকট লাঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে।

হারিসন রোডে দিহবিহার মসজিদের সমুখস্থ রাস্তায় বসিয়া মুসলমানগণ আবার নামাজ পড়িয়াছিলেন, ফলে যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ থাকে, পথিকগণকেও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পুলিশ ব্যবস্থার এরূপ ঘটতে দিতেছেন কেন? পূর্বেও কলিকাতায় বকরী হইত কিন্তু রাস্তায় বসিয়া নামাজ পড়ার ফায়ান তখন ছিল না। সমস্ত সহরবাসীর অসুবিধা ঘটু করিয়া এক সম্প্রদায়ের এরূপ অজ্ঞায় আনবারকে প্ররোচন দিয়া পুলিশ যে তাহাদের মধ্যে কি উজ্জ্বল সৃষ্টি করিতেছেন তাহা ঐহারা জানেন কি? ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক বিবেধ যে বাড়িয়াই যাইবে তাহা তাহারা আচরণের আশা নিরোখ। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার সরকার বাহাদুরের মতামত



আমরা জানিতে চাই—হয় তাঁহারা স্পষ্ট বলুন যে মুসলমানদিগের সর্বপ্রকার আবহাওয়ার তাহার সঙ্ঘ করিবেন আর না হয় তো ইহার প্রতীকার করুন।

বান্দলার গণিতে লর্ড লিটনের পরিবর্তে শার হিউ ট্রেন্সন বসিয়াছেন—কল কিন্তু একই হইয়াছে। লীটনের মুসলমান-প্রীতির প্রভাব এক্ষণে নার হিউয়ের স্বন্ধে চাপিয়াছে। ইহার মূল কারণ কি, মুসলমান মন্ত্রী স্পষ্ট করিয়া মুসলমানদের কোনো সাহায্যে রক্ষণ-পত্ৰপদেট চালান? যদি তাই হয় তো সে কথা জানাইয়া দিলে আর আমরা বুটিন গভর্ণমেণ্টের বিচার শক্তির অপব্যবহার সঙ্ঘে অহুযোগ করিব না। বুটিন ইহাই “বিধির বিধান”।

Motor Vehicles Tax Bill বা মোটর যানের উপর ধার্য কর সম্বন্ধীয় আইনের উপর কলিকাতার চেম্বার অফ কমার্শ যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা আছে। ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট যে এখনও অত্যন্ত কৰ্দ্দব অবস্থায় আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অথচ ভারতে বিশেষতঃ কলিকাতায় মোটর গাড়ী ব্যবহার আদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ বড় সাধারণ নহে; অথচ ঐ টাকটা রাস্তার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত না হইয়া নানা রকমে ব্যয় করা হয় ইহা একান্ত অশ্রাব্য। কলিকাতার বাহিরের রাস্তা তো মোটরের পক্ষে বিতীক্সা সম বলিলেই চলে অথচ বাহিরের মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতি মোটর ব্যবহার খেতে কর পান। চেম্বার অফ কমার্শ বলেন অতঃপর মোটর ব্যবহার আদায়ী টাকটা যেন কেবলমাত্র রাস্তার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়।

মোটরের যাত্রারিতে রাস্তা তত খারাপ হয় না, বত-

হয় গরব-গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর যাত্রাবাহতে, অথচ মোটরের ট্যাক্সের হার সর্বাপেক্ষা বেশী। মোটরের অধিকারীরা ধনী বলিয়া বোধ হয় এই ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতেও ক্ষতি ছিল না যদি তাঁহারা ভাল রাস্তা ব্যবহার করিতে পাইতেন। রাস্তাঘাটের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় উভয় দিক দিয়াই তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে। আবহাওয়ার কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে রাস্তার অবস্থার যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে স্বরাষ্ট্রী কর্পোরেশন ও বর্ধনবিষয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন। আবহাওয়ার কাউন্সিলার নির্বাচনের সময় আসিতেছে বলিয়াই এ কথাগুলি বলিয়া রাখিলাম।

স্বরাষ্ট্রমণ্ডলে গৃহবিচ্ছেদ বৃদ্ধ হইয়াছে—ফরওয়ার্ডের কর্তারা এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। লোহ মাহারই হটক ফল কিন্তু স্বরাষ্ট্রমণ্ডলের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে— শুধু স্বরাষ্ট্রমণ্ডল কেন বান্দলার সমগ্র হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহা ভীষণ ক্ষতিকর হইবে। এটা আত্মবিচ্ছেদের যে সময় নয়—নেতৃবৃন্দ তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ মতের প্রাধান্য লইয়া বিবাদ করিতেছেন, এদিকে রহিম-পাঞ্জানভী কোং বান্দলার সমস্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানদের সম্বন্ধ করিয়া বান্দলার মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রাণপণ করিতেছেন। হিন্দুগণ এখনও যদি একমত হইয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা না করেন তবে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু জাতির আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা থাকিবে না। এই দরুত সময়ে স্বার্থভ্যাগ করিয়া সকল সম্প্রদায়কে আবহাওয়ার একমত হইতে অহুযোগ করিতেছি। প্যাক্টের দোহাই দিলেও কিছু হইবে না, আর প্যাক্টকে অস্বীকার করিলেও কোন ফল হইবে না, ইহা অতি সত্য কথা— হস্তান্তর প্যাক্ট রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া এখন আন্তরকার চেষ্টা করা বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।



[ দ্বিতীয় বর্ষ ]

১৮ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩, ইং ৩রা জুলাই ১৯২৬

[ ৪৬শ সংখ্যা ]

বাদলে

শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী

আষাঢ় রাতের কাজল মেঘে মেঘে

নিভিয়ে দেখে শুভ চাঁদের আলো,

আকাশ পানে চেয়ে মনে পড়ে

তোমার স্মৃতি নুহা চাঁদা।

পাগড়ি-খাড়া স্বরা-ফুলের রাশে

ছেয়ে গেছে সিক্ত বনতল,

আকাশ চিত্রে স্বরভে স্বর স্বর

কোন বিরহীর আকুল অশ্রুজলে।

শীতল-মাথা বারল-বাতাসেরি

কাগজ-ভরা উত্তল হা-হা-হা

চমকে উঠে শব্দ ধরে চাই—

আজকে ভূমি নৈকেই মগ্ন পাশে!

মরম-বীণার তারে তারে বাজে

ব্যথাহত নীরব বঙ্গ গীতি,

বিগড়-ভেজা কেশ্যার গন্ধ সাথে

মনে পড়ে মিলন-দিনের স্মৃতি।

এমনিভাবে বাদল-স্বরা রাতে

আশেক-বোঝা নিশিগড়া সম

শুভ তোমার মুখটা কমনীয়

এলিয়ে দিতে বৃকের পর মগ্ন।

আজকে রাতে ব্যথার ঘন মেঘ

উঠছে কিগো তোমার বৃকে ঘেলে?

বিরহেরি যাবি বিভাবরী

জাগ্রি আমি স্মৃতি-প্রদীপ জেলে।









পদ্মের সহিত হারিসনবোডের আকস্মিক বিপদের সূত্রবৎ আলোচনায় আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি। পদ্মাতীরে যাইতে হইলে কলিকাতা-নগরীর দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণের পক্ষে হারিসন বোড এবং উত্তরাঞ্চল-বাসিগণের পক্ষে আইরিটোলাই যে সহজগম্য পথ একথা জাতিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করি না। “যে থা মাং প্রপচ্ছন্তে ষাণ্ডেথৈ বজ্রাম্যহং” এই মহাবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবার কষ্ট না করিয়া খোলকরতল সহযোগে ঈশ্বরের মাধ্যমা দ্বারা করার ভ্রম “কাকের” নামে এবং স্ব-উক্ত কষ্ট নিবারণ উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরকে আহ্বান করার ভ্রম “বনম” নামে পরম্পরকে অভিহিত করিয়া গোঁড়াচার্যের পরিচয় দিয়া থাকি।

গোঁড়াচার্য আমাদের পক্ষে এতদূর অক্ষ করিয়া ফেলিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক আধিপত্য-প্রথা বিভিন্ন হইলেও আরাধ্য ঈশ্বর অভিন্ন—“একমেব”—একথা স্বীকার করিতে অনেক সন্মত নহেন। হিন্দুদিগের মহেশ্বর, মুসলমানগণের খোশা কিবা জীতানদিগের গজ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কেবল এই কথা বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না। তাঁহাদের মধ্যে—বিহারী জীতান, তাঁহাদের মতে যীশুকে পরিচায়-কর্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে অস্ত্র ধর্মবাহিনীদিগের পরিচয়ের আর উপায় নাই,—বিহারী মুসলমান, তাঁহাদের মতে মুসলমানধর্মের ধর্মগণ কাকের—তাহাদিগকে হত্যা করিলে পাপাত্ম স্পর্শ করেই না বরং পুণ্যের সম্বল হয়—আর বিহারী হিন্দু, তাঁহাদের মতে যখন অনেক স্পর্শ করিলে শুচিতা বিনষ্ট হয় এবং সেই শুচিতাকে কিরাইয়া আনিবার ভ্রম পদ্মাতীরের প্রয়োজন। সকল ধর্মশাস্ত্রেই ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন কিন্তু এই গোঁড়া ধর্মাবলম্বিগণের মত বরি বসিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে ঈশ্বরের শক্তি সঙ্গী নাই। স্বীকার করিতে হইবে—কারণ, এক রাজ্যের রাজা যেমন অপর রাজ্যের প্রজার স্ববাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, জীতানদিগের গজও সেইরূপ অসমাইটী ফাদার (Almighty Father) হইবারও হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির পরিচায়ের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম। মুসলমানগণের খোশাও বোধ হয় অপর ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবগণকে স্বীয়

ক্ষমতাসীল করিতে অশক্ষ্য হওয়ায় হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। আর হিন্দুগণও এরূপ দুর্বল পরমাত্মার অংশ সম্বৃত যে তাঁহাদের শুচিতা বিশ্বদীর্ঘ স্পর্শ করিলেই কর্পূরে ভ্রায় অন্তর্ধান হয়।

গোঁড়া ধর্মিকগণ স্ব স্ব ধর্মপ্রবর্তকের সহিত অপর অপর ধর্মপ্রবর্তকের দোষভণের ভারতম্যতা প্রদর্শন করাইয়া, বিজ্ঞ বাধ্য প্রয়োগে বিশ্বধর্মালম্ব প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলেন; কিন্তু তাঁহারা ইতিহাসের হুঁএক পাতা উন্মোচিলেই জানিতেন পার্থিবম—মানবই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে, ধর্মের আদায় সৃষ্টির বহু পরে। ভাষা প্রচলিত হইবার পরই ব্যাকরণের প্রয়োজনতা হইয়া থাকে। ধর্মপ্রবর্তকগণের মধ্যে কেহই প্রায় সমামান্যিক ছিলেন না এবং তাঁহারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রাব্যর্থ স্ব স্ব ঈশ্বরের অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু ঈশ্বরগণ তাঁহাদের পুত্র কিবা পথগণের দ্বারা অথবা স্বয়ং অবতার রূপে স্ব স্ব মাধ্যমা অগ্রপন্থা প্রচারিত করার তাঁহাদের আনবিক সঘেষ্ট সম্মিহান হইতে হয়। আধুনিক প্রচলিত কোন ধর্মই যে সৃষ্টির প্রাকালে ছিল না—ইতিহাসে পাঠে তাহা আমরা অবগত হই। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যাক্যের সত্যতা স্বীকার করিতে বরি জীমরা অসম্মত হই, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে বলিতেই হইবে খোদা, গজ কিবা মজের স্ব স্ব সৃষ্টি জীবগণের ভ্রম পৃথক পৃথক পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্যাদি স্বীয় নাম না করিয়া অবিদ্যুৎকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। ঈশ্বরগণ আপোষে একটা একটা পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্যাদি স্বজন করিয়া যৌথ কারবার মূলিয়া যদি না বসিতেন—মানচিত্রে বহুগুণ ভিন্ন ভিন্ন জাতির রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন বনঃ দ্বারা চিত্রিত হইয়া থাকে, সেইরূপ লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি পৃথক পৃথক রঙের রঞ্জিত হইয়া, ত্রিকোণ কিবা চতুর্ভুজাকৃতি করিয়া পৃথক পৃথক পৃথিবী সূর্য্যাদি স্ব স্ব সৃষ্টি জীবগণের ভ্রম স্বজন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনপুণ্যের ও কৃত্তিদের পার্বত্যতা রক্ষিত হইত এবং গোঁড়া ধর্মিকগণেরও বেদের যজ্ঞ, কোরাণের বয়দে কিবা বাইবেলের ভাস উদ্ধৃত করিয়া স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রাব্যর্থের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার সমর্থ গলম্বুধ হইতে হইত না।



## দুগ্ধ

### প্রাচৈতন্যিকর ঘোষ

“দুগ্ধং সূর্যমুখং বিদ্যং বাতপিত্তহরং সারম্।

সত্যং ভক্তকরং শীতং সান্ন্যং সর্বশরীরিণাম্।

জীবনং বৃংধণং বল্যং মেধ্যং বাজীকং পরম্।

বয়ঃশাপনায়ুজ্ঞং সন্ধিকারি রসায়ণং।

বিরেক-কাস্তি বতীণাং তুল্যমোজোবিশ্বধাম্।”

“দুগ্ধ—মধুর, মিষ্টি, বাতপিত্তহর, সারক, সত্যভুক্তকর,

শীতল, সকল প্রাণীরই সান্ন্য, জীবন, বৃংধণ, বলকারক, মেধ্যাবদ্ধক, শ্রেষ্ঠবাজীকরণ, বয়ঃশাপক, আয়ুজ্ঞ, যোজনকারী, রসায়ণ, বয়ন-বিরেচন বতিজ্জিয়ার উপযোগী ও প্রয়োজ্যক।”

দুগ্ধ প্রকৃতিতত্ত্ব আদর্শ খাদ্য ও শিশুদিগের পূর্ণ খাদ্য। বাড়ার সমস্ত গুণ ইহাতে বর্তমান আছে বলিয়া ইহাকে পূর্ণ খাদ্য বলা হয়। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত খাদ্য নহে, সর্বব্যবহার ইহা রোগীর পথ্য। দুগ্ধে এই ত্রয়গুলি আছে—(১) যক্ষার বাস্পাত্মক দ্রব্য; (২) মেঘময় পদার্থ, (৩) শর্করা; (৪) লবণ ও জল; (৫) ‘ভাইটামিন’।

যক্ষার বাস্পাত্মক দ্রব্য (Nitrogenous substance)

—হুই প্রকার, যথা,—Caseinogen and Lact albumin, ‘কেসিনোজেন’ একপ্রকার ‘বেসোপ্রোটিন’ (Phosphoprotein)। অস্ত্র শ্বেতসার পদার্থ হইতে এই ত্রয়কে যে উদ্ভাগে ইহা জন্মে না। ভিথের শ্বেতসার পদার্থকে উত্তাপ দিলে জমাট বোধিয়া যায়। পাকস্থলীতে পাকরস দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে। এই পাকরস হইতেছে Rennin (‘রেসিন’)। প্রথমে দুগ্ধ জেরির মত একটা পদার্থে পরিণত হয়, পরে ছানা কাটে। খানিকটা হুল্লে রঙের জল বাহিয হয়—ইহাই ছানার জল। ছানায় থাকে ‘কেসিন’ ও মেঘময়পদার্থ। ছানার জলে থাকে শর্করা, শ্বেতসারপদার্থ ও লবণকাতীপদার্থ।

যে লোক বহুকালের রোগভোগের পর মুক্তিনাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে ছানার জল উপকারী। পাতীর দুগ্ধের ছানা শক্ত হয় কিন্তু তনুদুগ্ধ বা গাখার দুগ্ধের ছানা খুব নরম ও ছোট ছোট হয়, সেই ভ্রম শিশুর পক্ষে ইহা ভাল। দুগ্ধের মধ্যে যে সকল পদার্থ আছে, তন্মধ্যে ছানাই পরিপাক করা শক্ত। অজ্ঞাত পদার্থগুলি অতি সহজেই পরিপাক হইয়া যায়। শিশুর পক্ষে তাহার মাতার স্তন্যদুগ্ধই উপকারী; যদি অত্র প্রকার প্রাণীর দুগ্ধ খাওয়াইতে হয় তাহা হইলে সেই প্রাণীর দুগ্ধে যাহাতে তাহার মাতার দুগ্ধের অনুরূপ হয় তাহা করিতে হইবে। কোন দুগ্ধে কি পরিমাণ কোন পদার্থ আছে তাহা দেখা যায়।

Kinds of milk. Protein. Fat. Carbo- Salts. hydrate.

ময়ূক্ত দুগ্ধ (স্তন্যদুগ্ধ)	২২.৭	২.২০	৪.৮৭	০.১৬
গাভী দুগ্ধ	৪.২০	৩.৭৭	৪.৮৮	০.১৭
পদ্মভী দুগ্ধ	১.৭৯	১.০২	৪.৫০	০.১৪
ছাগী দুগ্ধ	৩.৬২	৪.২০	৪.০০	০.১৪.

বাকী অংশ জল।

গাভীর দুগ্ধে ছানা বেশী আছে, তাহাতে জল, বালি অথবা চুপের জল দিশাইয়া শিশুদিগকে খাওয়ান উচিত। জল বিশালাই চিনির ভাগ আরও কম হইয়া যায়, স্বতন্ত্রাৎ একটু চিনি দিতে হইবে। অনেকেরই ভাভারের কাছে পরামর্শ নইতে আসেন, ‘খোকার পেটে গাই দুধ থাকছে না, খেলের ছানার মত কেটে তুলে ফেলে।’ এই ফলে দুগ্ধে চুপের জল অথবা Citrate of Soda দেওয়া হয়। শিশুর পক্ষে সব চেয়ে ভাল হইতেছে স্তন্যদুগ্ধ। একবারের মাতার স্তন থেকে গায় বলিয়া তাহাতে বাহিরের উত্তাপ বা হাওয়া লাগে না, সমানভাবে একটু একটু করিয়া খাটিতে পার ও ইহাতে কোনরূপ ভেজাল থাকে না বলিয়া



ইহা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। মাতার স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ না হইলে শিশুর পক্ষে হিতকর হয় না। সুপথ্য ভোজন, অনিহিত বা অতিমাত্রায় ভোজন, অত্যধিক লবণ, অন্ন, ঝাল বা স্নায়ু স্নেহন, মানসিক দুঃখ শরীরের সন্তাপ দলমুগ্ধের বেগধারণ ব্রাহ্মিজাগরণ ইত্যাদি স্তনদুগ্ধকে দূষিত করে। মাতার দুগ্ধরোগাণা ব্যাধি, দুর্বলতা, দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ বাৎসর্যের মধ্যে পুনরায় অন্তঃসত্তা হইলে শিশুর প্রাণ অপর প্রাণীর দুগ্ধের উপর নির্ভর করে। উপরের তালিকাটী ভুলনা করিয়া দেখিলে মনে হয় প্রথমে পাথর দুগ্ধ, পরে জল বেশান গাভী দুগ্ধ, তারপর ছাগী দুগ্ধ পান করাইলে শিশু সর্বল ও পুষ্ট হইবে।

“সবায় দুগ্ধঃ বিশেষণে মধুরং রসপাকয়োঃ।

শীতলং শুভ্রকং বাতপিত্তপ্রনাশনম্ ॥

দোষধাতুমলশ্রোতঃ কিঞ্চিংক্রেদ করং গুরু।

জরা সমস্ত রোগাণাং শাস্তিক্তং দেবিশা পদা ॥

গাভীর দুগ্ধ—মধু, স্নিগ্ধ, শুভ্রকারক ও বায়ু পিত্ত কফ নাশক। ইহা দোষ, গাভু, মল, ও শ্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিং স্নিগ্ধতা করে। ইহা জরা ও সমস্ত রোগের শাস্তি-কারক।

“বাসবাতন্ত্রং সান্নং লবণং কৃতীশীঘ্রিক্তং।

কফ-কাশহরং বায়োগগরং গদ্যতীপন্নং ॥

গদ্যতী দুগ্ধ—ইহা বাস, বায়ু, কফ, কাস ও বালকের সর্বরোগ নাশক। ইহা অন্নলবণরস, কৃতিজনক ও সুধাবর্ধক।

মেঘময় পদার্থ (Fat)—দুগ্ধ যদি বানিককণ রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে রাগা উপরে জমিয়া উঠে তাহাই ‘ক্রীম’। দুগ্ধ মখন করিলে যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাই এই পদার্থ।

শর্করা (Lactose or Milk sugar)—যে চিনি

আমরা খাই, তাহার চেয়ে ইহা কম মিষ্ট। ছানা কাটার পর যে ছানার জল পড়িয়া থাকে তাহাতে ইহা থাকে। যদি দুগ্ধকে খোলা বাতালে রাখা যায়, তাহা হইলে এই শর্করা Lactic acid এ পরিণত হয়, দুগ্ধে ছানা কাটে ও তাহা অন্ন হইয়া উঠে।

লবণজাতীয় পদার্থ (mineral matters)—দুগ্ধে Calcium and Magnesium Phosphates, Sodium and Potassium Chlorides ও Iron আছে। এই সব লবণজাতীয় পদার্থ শিশুর মাংসপেশী, অস্থি ইত্যাদির গঠনে সাহায্য করে।

জল—দুগ্ধে যে জল আছে তাহা শিশুর দেহের পক্ষে যথেষ্ট।

‘ভাইটামিন’ (Vitamine)—দুগ্ধে আর একটা জিনিষ আছে তাহা ঠিক কি জানা যায় নাই, তবে তাহার নাম-করণ হইয়াছে ‘ভাইটামিন’। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই জিনিষটা যদি আমাদের খাদ্য না থাকে, তাহা হইলে শরীরের বৃদ্ধি হয় না ও নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, যেমন—Scurvy, Beri-beri, Ricket, দুগ্ধে ভিন্ন প্রকার ‘ভাইটামিন’ আছে—

(১) Antineuritic or the water soluble B.

(২) Antirachitic or the fat soluble A.

(৩) Antiscorbutic or the water soluble C.

দুগ্ধ গরম করিয়া পান করা উচিত, গরম করিলে রোগের বীজ্য নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু এই সূত্রে এই সারবান পদার্থও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ‘ভাইটামিন’ পাইতে হইলে ‘কিচা’ দুগ্ধ খাওয়া উচিত; গাভী দোহন করিবার পরই ইমদুগ্ধ দুগ্ধ খাইতে হইবে।\*

\* যে বৈজ্ঞানিক হইতে আনি সাহায্য লইয়াছি তাহা পরে উল্লেখ করিব।



## অবসান

### শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বেবা কিঙ্ক স্বামীর এই সম্মেৎ প্রদানের কোন উত্তর দিতে পারিল না, মুখখানি একটু নত করিয়া বহিল।

উমাগদ্য বাবুর সংসারের মধ্যে জী মাখবী দেবী, পুত্র অশীম ও তের বৎসর বয়সী কন্যা বেবা। উমাগদ্য বাবুর বয়সে অষ্টালিকা কেবল বেবা দিবারাজি মাতাইয়া রাখিত, কিন্তু হঠাৎ তাহাকে তাহার মা, বাবা ও তাহার বৈহময় দাদা অশীমকে ছাড়িয়া, এক অচেনা অজানা সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিত হইল।

স্বস্তবতী মধুপুর, কিঙ্ক সকলে কলিকাতায় থাকেন, কারণ বেবার স্বস্তর নরেশ বাবু ‘হাইকোর্টে’ ওকালতি করেন এবং পুত্র তরুণভূমার বি, এ, পড়িতেছে।

বেবা আজ চার পাঁচ দিন হইল এখানে আসিয়াছে। সঙ্গে কি দামিনী ও চাকর হরিয়া আসিয়াছিল, আজ চলিয়া গিয়াছে।

দুপুরবেলা বেবা বারান্দায় একথানা সোফার উপর অর্ধপাতিত অবস্থায় বসিয়া আছে, এমন সময় তরুণ আসিয়া সোফার একপাশে বসিয়া পড়িল। বেবার ডান হাতটা হাতের-মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“আজ তোমার আন দেখাচ্ছে কেন বেবা!”

কেন কার্যবশতঃ মাসখানেকের জন্ম তরুণকে মেদিনীপুর যাইতে হইবে। বাহিরে গাভী পাড়াইয়া আছে। তরুণ পিতা মাতা ও বৌদিবিকে প্রণাম করিয়া বৌদিবির নির্দেশানুসারে পাশের ঘরে গেল।

একটা টীপদের উপর হাত রাখিয়া বেবা পাড়াইয়া-ছিল। তরুণ বেবার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া বসিল,—“মাসখানেকের জন্মে আমার যে বেতে হ’চ্ছে বেবা, কিঙ্ক তোমায় ছেড়ে কি ক’রে থাকব রাণী!”

বেবা তরুণের বৃকে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না।

তরুণ ধীরে ধীরে বেবার মুক্ত গোলাপের মত মুখ-খানি তুলিয়া ধরিয়া একটা ক্রীতচূষন ঝাঁকিয়া দিল। তরুণ আরও কি বলিতে যাইতেছিল,—এমন সময় তাহার ছোট বোন ইভা ছুটিয়া আসিয়া বসিল,—“মেজদা বাবা বল্লেন, টেপ পাবে না শীগগির এস।”

তরুণকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া বাহির হইতে ‘ড্রাইভার’ ডাক দিল।



৪

“বৌদি তোমার চিঠি আছে।”

রেবার ছোট দেবের অমিয়কুমার একখানি গোলাপী রঙের খাম তাহার হাতে দিয়া চলিয়া গেল।

রেবা খুলিয়া দেখিল, তরুণ দিয়াছে। কি বিরহের ব্যথা, মিলনের আকাঙ্ক্ষাভরা সে চিঠি... রেবা পড়িতে পারিল না... নিজেই বিছানায় গিয়ে শুইয়া পড়িল।

৫

তরুণের চিঠির উত্তর কাল দিয়াছে। বৈকালবেলায় রেবা সাবান ও তোয়ালে হাতে করিয়া “বাথরুমে” প্রবেশ করিতেছে, কৌরি কি একখানি চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল—তাহার মা দিয়াছেন। লিখিয়াছেন—“...দেখানকে পত্র দিয়াছিলাম। তোমাকে পাঠাইতে তাহার অমত নাই। কাল অসীম তোমাকে আনিতে যাইবে।” অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী যাইবার কথায় রেবার বুকটা আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

৬

সকালবেলায় রেবা মুখ ধুইতেছে, অমিয় আসিয়া বলিল,—“বৌদি, তোমার নিতে লোক এসেছে।” রেবা চাহিয়া দেখিল, দামিনী ও রামলীন মিষ্টার প্রকৃত লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। দটীখানেক পরে অসীম ও তরুণের বন্ধ উপস্থিত হইল।

রেবার চুল বাঁধিয়া দিয়া তাহার জা' লাংঘা জলখাবার গুছাইতে গিয়াছিল, আসিয়া বলিল,—“শাদা কাপড় পরলে কেন রেবা? সেই গোলাপীখানা পর না...সেইটা পরলে তোমার বেশ দেখায়।”

রেবা কোন উত্তর করিল না, অন্ন হাসিল মাত্র। সে হাসির অর্থ, কাপড় ত পরিব কিন্তু দেখিবে কে?

৭

রেবা মাসখানেক হইল আসিয়াছে। রোজই ভাবে আজকের পরে তরুণের আসিবার সংবাদ পাইবে, কিন্তু রোজই সেই এককথা ‘কাজ শেষ হইলসেই যাইব, করে

যাইব’ জানাইতেছি পরে রেবা ভাবে—কি এমন কাজ, যাহা এখনও শেষ হইল না...একমাস বলিয়া গিয়াছে কিন্তু হুই মাস হইল এখনও দেখা নাই...পুঙ্খমহুগন্ধের মন কি দিয়া তৈয়ারী হয় রেবা তাহাই চিন্তা করে।

যাহা হউক অসীমের সহিত হুড়োহুড়ি করিয়া দিন মন্দা যাইতেছিল না, হঠাৎ নরেশ বাবুর পত্র আসিল, রেবাকে লইয়া যাইবার দিন স্থির করিয়া।

৮

রেবা বাপের বাড়ী যতদিন ছিল, প্রত্যহ তরুণের একখানি করিয়া পত্র পাইত, কিন্তু এখানে প্রায় দুইমাস আসিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানির বেশী পত্র পায় নাই। পত্র দিয়া রেবা হায়রান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তবুও পত্র দেখা ছাড়ে নাই।

বৈকাল বেলা রেবা রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, রেবার জা লাংঘা আসিয়া একখানি ইল্লি চেয়ারের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, “রেবা, ঠাকুরপো ‘টেলিগ্রাফ’ ক’রেছে আজ পাঁচটার ট্রেনে আসবে...”

রেবা আরক্তমুখে বলিল,—“তা আহুক না দিবিমনি, আমায় কি বলছেন।”

লাংঘা মুহু হাসিয়া “আজ্ঞা...দেখব’ বলিয়া রেবার গালছ’টি একটু টিপিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

৯

রেবা বিছানার উপর বসিয়া আছে, তরুণ ঘরে প্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ করিয়া রেবার সজিৎ একটা কথাও না বলিয়া, শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে পাশ ফিরিয়া দেখিল—রেবা সেই একই ভাবে বসিয়া আছে।

“শোওনা রেবা, আর কতক্ষণ ব’সে থাকবে?”

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রেবা ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

১০

তরুণ আজকাল বাড়ীতে তেমন থাকে না। কোন দিন আসে, কোন দিন আসে না, রায়ে প্রায়ই আসে না। কলঙ্ক যাওয়াও একরূপ বন্ধ করিয়াছে।

রেবার একটি মেয়ে হইয়াছে, নাম রাধিরাছে ‘রেবা’। অনেক অল্পবয়সে করিলেন; কিন্তু তরুণ যাইতে রাজি হইল না।

১২

রেবার শরীর খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে, সংজ্ঞা চেনা যায় না। সংবাদ পাইয়া উমাপদ বাবু নিজে আসিয়া রেবাকে লইয়া গেলেন।

ডাক্তার দেখান হইল, ডাক্তার বলিল,—“কোথাও ‘চেপে’ নিযে যান।”

টিক হইল,—রেবাকে লইয়া পুরী যাওয়া হইবে। উমাপদ বাবু তরুণকে পত্র দিলেন,—আসিবার জ্ঞাত। তরুণ বলিয়াছে, কাল আসিবে।

১১

বৈকালবেলায় রেবা দাঁড়াইয়া আছে, দোরের গোড়ায় ‘হর্প’ বসিয়া উঠিল। রেবা রেলিঙের কাছে গিয়া দেখিল, গাড়ী হইতে নামিল তরুণ।...আনন্দে রেবা শিহরিয়া উঠিল....

তরুণ নামিয়াই উমাপদ বাবু যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে চলিয়া গেল।

তরুণকে দেখিয়াই উমাপদ বাবু বলিলেন,—“এই যে তরুণ...এস বাবা বস...তারপর...সব ভালত।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।” বলিয়া তরুণ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উমাপদ বাবু বলিলেন,—“খুশী হওয়ার পর রেবার শরীরটা ভাল নেই, ...ডাক্তার বাবু বললেন—চেজ নিয়ে যেতে, তাই পুরী নিয়ে যাব মনে করোছি...তা...তুমি চল বাবা, তুমি গেলে আমরা সকলেই শান্তি পাব।”

তরুণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল,—“কিছুদিন পরে যেতে পারি, কিন্তু এখন আমার হাতে অনেক কাজ আছে...এখন যাওয়া হবে পার না।”

তাহার পর উমাপদ বাবু, অসীম ও তাহার মা সকলেই

অনেক অল্পবয়সে করিলেন; কিন্তু তরুণ যাইতে রাজি হইল না।

আজ নয় দিন হইল রেবাকে লইয়া উমাপদ বাবু, অসীম ও তাহার মা পুরী আসিয়াছেন। সমুদ্রের জল হাওয়ায় রেবার শরীর একটু ভালোর দিকে যাইতেছে।

এখানে আসিয়া রেবা তরুণকে তিন চারি খানি পত্র দিয়াছে, কিন্তু একখানিরও উত্তর পায় নাই।

হঠাৎ একদিন রেবার জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে কশীশও আছে। “একদিন ছ’দিন করিয়া ক্রমে একশ দিন হইল। ডাক্তারে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই হইল, নানারূপ খারাপ লক্ষণের সহিত ‘ভবল নিউমোনিয়া’ দেখা দিল। উমাপদ বাবু কটক হইতে ডাক্তার আনাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—বাঁচিবার আশা নাই, মিথ্যা কেন ভাঁহাকে আনা হইয়াছে....

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রেবাকে শোকের ব্যভার ভাসাইয়া তাহার আশ্রয়ী কস্তা রেবা চলিয়া গেল।

মাথবা দেবী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, রেবা মৃচ্ছিত হইয়া রেবার বৃকে লুটাইয়া পড়িল।

১৩

অসীম সমুদ্রের বৃকে রেবাকে চিরবিদায় দিয়া, উমাপদ বাবু সংগ্রহাব্যয়ে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

রেবারা আসিবার কিছুদিন পরেই, নরেশ বাবু বলিলেন,—“আপনার অহমতি গেলে আমি একবার বৌমাঝে নিয়ে যাই—বাড়ীতেও সব বলছে....আর এ সমস্যা তরুণের কাছে থাকলে বৌমাও অনেকটা শান্তি পাবে।... উমাপদ বাবুও তাহাই মনে করিলেন, এবং রেবাও যাইতে রাজি হইল। নরেশ বাবু নিজে রেবাকে লইয়া গেলেন।

১৪

পাঁচদিন রেবা আসিয়াছে, কিন্তু যাহার জ্ঞাত আসা—সেই তরুণের দেখা সে একদিনও পাইল না।



তরুণ আত্মকাল মতপায়া ও বেসাসজ হইয়া পড়িয়াছে।  
সিবারাত্রি কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই।

হায় তরুণ! একদিন তোমাকে দেখিয়াই, উমাপদ  
বাবু তাঁহার শেখপুল্লী রোবাকে এই ঘরে দিয়া নিশ্চিন্ত  
হইয়াছিলেন। রেবার ভাগ্যে এমন ঘটনা! মতপায়া  
চরিত্রহীন স্বামী! যাহাকে সে ইহুপরাধের দেবতা  
ভাবিয়া, যাহাকে সে প্রাণমগ্ন সমর্পণ করিয়া, একান্ত নির্ভ-  
রতার সহিত যাহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই স্বামী  
তাহাকে চোখে দেখিতেছে না...এই অশাস্তির মাঝে  
যাহাওঁ বৃকে করিয়া, রেবা একটু শান্তি পাইতে, সেই  
রোখাওঁ তারাকে ছাড়িয়া স্বপ্নের পথে যাত্রা করিল।

১০

ছুপুর বেলা রেবা ঘরে বসিয়া আছে, টলিতে টলিতে,  
তরুণ ঘরে প্রবেশ করিল। রেবা উঠিয়া প্রণাম  
করিল।

তরুণ একটা কথাও না বলিয়া যেমন আসিয়াছিল,  
তেমনই চলিয়া গেল।

বৃষ্টির পর ফুলের পাণ্ডিত যেমন জলে ভরিয়া থাকে,  
নাড়া দিলেই স্বর স্বর করিয়া ঝড়িয়া পড়ে, রেবার চোখের  
জল তেমনই করিয়া বরিয়া পড়িল...রেবা বিছানার উপর  
সুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—“ঠাহুর! এ জীবনের অবসান  
কবে হবে প্রভু! আর যে এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ করতে পারি  
না! রেবা, বা আমার! তোরা অভাগিনী মাকে কাছে  
ঠেনে নে মদি! ভূই ত তোরা মাকে ভুলতে পারবি

## মালা

### ত্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী

আমার এই মালা গীতা

তোমার তরে বসু আমার

গলে ভূমি নাই বা নিলে

চাইলে ঘোচে বাখা আমার।

মালাটি—পরিঘে সিতে তোমার গলে

পিছলে ঘষি, সখি আমার

পড়ে তোমার পায়ের পরে

তায় সে ভেনো পূজা করি।

না...তবে কেন এ অশাস্তির মধ্যে ফেলে রেখেছি  
মা!”

১৬

রেবার শরীর খুব ধারাপ। ডাক্তার বলিয়াছেন—  
শরীরের মধ্যে কিছুই নাই, হঠাৎ ‘হাটফেল’ হইতে পারে।  
সংহার পাইয়া, সজীক নরেশ বাবু আসিলেন। বলিলেন,  
—“বোমাকে নিয়ে মধুপুং যাই চলুন...স্বপ্নে সব জেনে  
চিঠি দিয়েছে...ওখানে বেশ বড় ডাক্তারও আছে।”

উমাপদ বাবু তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং  
রোবাকে লইয়া সকলে মধুপুর যাত্রা করিলেন...তরুণকেও  
কোনরকমে সঙ্গে লইলেন।

যখা সময়ে নরেশ বাবুর ভাই স্বপ্নেশ বাবু সকলকে  
নামাইয়া লইয়া গেলেন।

তারপর দিন ‘সিভিলসার্জন’ এল, সি, ব্যানার্জিকে  
ডাকা হইল। তিনি দেখিয়া অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেলেন।

অজ্ঞানার ডাক আসিল। মা, বাবা, অসীম, শতর,  
শ্যামুদী, আত্মীয় স্বজনকে কাদাইয়া, স্বামীর পায়ের ধূলা  
মাখায় লইয়া, সাধী পতিব্রতা রেবা অনন্তের পথে যাত্রা  
করিল।

আজ তাহার সকল দুঃখ; সকল অশান্তি সব মান  
অভিমানের অবসান হইল,—আজ শুক্লকর্ণের সব অবসান  
হইল...তবু নিইয় বৃকের ভিতর জলিয়া উঠিল রেবার  
নিখিল শ্রুতিটুকু, আর তাহার সহিত তীব্র অহতাপের  
অসহ জালা।

## ত্রীঅশেষচন্দ্র বহু বি-এ

### ১। ফুলের গাছ

একবার প্রাচীরের গায়ে ইষ্টকের মধ্যে একটা ফুলের  
গাছ দেখিয়াছিলাম। বেঙনী বর্ণের কত ফুল সে গাছে  
ফুটিয়াছিল। যেদিন প্রথম পাৰ্শ্বের মধ্যে এইরূপ  
মাথুয়া দেখিলাম সেদিন ভাবিলাম কেমন করিয়া যুক্তিকা-  
মাত্রাবন্ধিত? রসলে-বিহীন, স্বর্ধ্যান্দি সম্পর্ক রহিত  
হানে ফুলের গাছ হইল। সে স্থানে কেহ বীজ রোপণ  
করিতে পারেনা এবং বীজ উপ হইলেও অত্যাবশ্যকীয়  
ব্রহ্ম সকলের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। নীরস হানে,  
ইট, চুপ, হরকি ও বালির মধ্যে কি কোমল বৃক্ষ তরুণ  
পোষণ হইতে পারে? কিন্তু দিনের পর দিন সে গাছে  
কত ফুল ফুটিয়া বিশ্বমন্ডলের অভিনবমনে লাজবর্ণের মত  
ভূমিতে ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল—এ যেন পরমেশ্বরের  
উদ্দেশে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মত। প্রতিফুল  
অবস্থার মধ্যে এই অসুত ব্যাবারের সংঘটন লক্ষ্য করার  
আমার মনে হইল সংসারেও এইরূপ বাটী ঘটনার সংঘটন  
হয়। যোরা তামসিক বা রাসমিক প্রকৃতি সম্পন্ন পরি-  
বারের মধ্যেও পরম সাত্বিক প্রকৃতির আবির্ভাব হয়,  
যে সংসারে কোমলবৃত্তি সমূহের পোষণ হয় না, দয়া-  
দাম্পিত্য যে স্থানে বন্ধিত, ব্রত আচায়াদি নিষিদ্ধ,  
আধ্যাত্মিকতার নয়নরঞ্জন আলোক যে স্থানে প্রবেশ  
করিতে পারে না এবং নাতিকতার স্থলবার বাহার আমূল  
পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, হঠাৎ সে সংসারে ধ্রুব, প্রজ্ঞাধারের  
নটিকতার মত মহাশক্তির আবির্ভাব হয় এবং তাহার  
প্রভাবে সমস্ত আহারিক প্রকৃতি, হিরণ্যকশিপুণর সকল  
ভাব যেন বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যেমের জায়ায় এ  
ইন্দ্রধ্ব অতীব বিরল।

### ২। নারী

পথে একটা মুনানী মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। রূপ  
লাবণ্যে সে যেন একটা নীহার শোভিত প্রফুল্ল পক্জিনী।  
তার অঙ্গশোভার সখ্যক বিভূষণ। তার তুহার শুভ  
দৃষ্টিবর্তী যেন কটকবিহীন মৃগালের মত শোভা পাইতে-

ছিল। নিত্যের শোভার নীমা ভিল না। সে সম্পদে  
যেন গাভীও পরাজিত। তীলাঙ্গনযনে মদনকিনাস।  
চূর্ণকুস্থল যেন বদনচক্রকে ঈষৎ চাকিয়া সৌন্দর্যের  
পুষ্টিসাধন করিতেছিল। স্বরধীনমনার রূপে যেন মদনের  
মুখ্য। আইসে তার অন্তরের কুসুম এবং অন্তরের হিল্ল  
যেন মন প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু এত  
মনোমগ্ন হইয়াও তার চরণে দোষ ছিল। বিধাতা তাহাকে  
মহালগামিনী করেন নাই। একটা চরম তার খণ্ড।  
সেই কটুর নিমিত্ত সে অতি কষ্টে চলিতেছিল। তার  
পতি দেখিয়া আমি ক্রোধ অতৃপ্ত করিলাম। ভাবিলাম  
যে বিধি ইন্দুতে কলঙ্ক দিয়াছেন, মৃগালকে কটকিত  
করিয়াছেন এবং কুহ্মে কীটের বাস নির্দেশ করিয়াছেন  
সেই বিধিই এই সৌন্দর্যে রানি রাখিয়াছেন। তারপর  
সে যখন একখানি রত্নীপ মেয়ের মত আমার নয়নস্তরাল-  
বন্ধিনী হইয়া গেল তখন বুলিলাম এ যেন নারীবৃত্তির  
গতিশক্তি মত। নারীর সৌন্দর্য আছে কিন্তু বুদ্ধি-  
বৃত্তির স্থগতি বা প্রবর্তনা নাই। তাহার চিত্তাশক্তির  
প্রসারতা নাই গভীরতায় তাহা ক্ষুদ্র পবনের মত।  
মনোবৃত্তিতে সে যেন খণ্ড। পুরুষের ত্রয়োমুখ্যত্ব  
দীর্ঘকালের নিকট তাহা যেন ক্ষুদ্র বয়সীর মত আশ্রিত।

### ৩। দাম্পত্য প্রেম

পরিণয়ের পর প্রথম মিলনে দাম্পত্য প্রেম ইন্দুরসের  
মত। পরে পুত্র কলজ হইলে সে প্রেম অস্বপ্না তাপের  
জালে গুড়ে পরিণত হয়। আবার সময়ের গুণে ক্রৌর  
যহসে সে গুড়ে ভালবাসার শর্করা অন্মায়। শেষে বারুকো  
ভালবাসায় দানা বাঁধিয়া প্রেম নিষিদ্ধ মত হইয়া উঠে।  
আবার প্রতিফুল অবস্থার অনলমোহিত, অপরিশুদ্ধ প্রেম  
গিপবীত ভাব অবলম্বন করে। তথায় উহা প্রথমই  
ধ্বংস রসের মত। কিন্তু কয়েক দশকের পরই সে রস  
পদ্যুসিত হইয়া মত্ততা মায়কতা ও অবিলতা আনন্দ  
করে। সে রসের পাক হয় না এবং তাহার স্বাধ গন্ধের  
লেশও থাকে না।



## ৪। রজক

আমরা যোবাকে পাটে কাপড় আছড়াইতে দেখি। আমিও পূর্বে অনেকবার যোবার কাপড় আছড়ান দেখিয়াছি। কিন্তু তখন চিন্তার গভীরতা বা ভাবের স্বভঙ্গ্যবাহিনী 'অবশ্য' ঘটে নাই। তখনও কল্পনার স্বভিদ্ধাগারে প্রবেশ লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু সেদিন দেখিলাম যোবা আছড়াইয়া আছড়াইয়া আমাদের গায়ের দশা বহু হইতে দূর করিয়া দিতেছে। আমাদের মনে যে যোবার কণ্ঠস্বর অতি হীন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে যোবাপুত্র নিকট আমাদের অনেক বিষয় শিখিবার আছে। সলল জাতির অঙ্গমল সে নিকরিকারে পরিষ্কার করিয়া দেয়। আমাদের পক্ষে পবিত্র বসন পরাইয়া দেবার যে আমাদের ভিতরে বাহিরে কত প্রভেদ। বাহিরে সান্নিধ্য হইল না। ভিতরে সাজা আবশ্যক। মনের ময়লা দূর করা উচিত। সে মনের ময়লা, অন্তরের মল, চিন্তার কালি, বস্তির মসি কে ছড়াইবে? তার সাবান কোথায় পাওয়া যায়? কোন্ কারে কি ভাবে আছড়াইলে ভিতরের ময়লা দূর হইয়া যায়? নমকে পরিষ্কার করিয়া কে তাহাকে পাটে পাটে ইঞ্জি করিয়া দিবে? তখন কবিরঞ্জন রায় প্রসাদের গান মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছেন 'বাসনাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া সেই কারে দুইলে মন পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে।' তখন যোবা যেন আমার কাছে অব্যতের মত বোধ হইল।

## ৫। সম্ভাদ্যাদীপ

শান্ত মুর নীরব সন্ধ্যায় একটা বালিকাকে গোপালির কোলে লীপ জালিতে দেখিলাম। সমীরণের হিল্লোলে নীপশিখা কাঁপিতেছিল। পাছে প্রাণীপ নিভিয়া যায় এই ভয়ে কত ব্যাঘ্রলভ্য সহিত নতমুখী হইয়া সে করপুটে শিখাকে ঢাকিয়া রাখিল। গুটী সমীর যেন প্রগল্ভভার সহিত তাহার শত চোটা বার্ষ্য করিতে লাগিল। সুখিকার মত মধুর, শোকালিকার মত ব্রীড়াময়ী, গোলাপের মত মনোহর, ফুলয়ের মত কোমল কিশোরী শেষে অনিলের প্রভাস বিকশি করিয়া দিল। সম্ভাদ্যাদীপ মণিকরার মত উজ্জল শিখায় তার কণ্ঠা বালিকাক

করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে মনে হইল ঐ কুম্ব কোমল বালিকার মত অমন ভাবে অল্পরসের শিখাকে রক্ষা না করিলে কি তাহা কখনও স্থায়ী হয়। সাধারণ ভাবের বিলোপে এবং উচ্চ স্বল্প ভাবের বিকাশে আমাদের প্রাণে যে পুণ্য গোপালির উদয় হয়, তাহার অপেক্ষায় থাকিয়া প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে আত্মিক দিতে হইলে অল্পরসের পক্ষপ্রাণী এই ভাবেই জালিতে হয় এবং সে শিখাকে বাহিরের কামনা বাসনার প্রবল পবন হইতে রক্ষা করিতে হইলে এইভাবে বালিকার মত করপুটে রক্ষা করিতে হয়। সহিষ্ণুতা শুধু তাহা শেষে নিরাশ নিরুপ হইয়া উঠে।

## ৬। নর্তকী

ছবিতে দেখিলাম নর্তকী প্রাঙ্গণতলে নৃত্য করিতেছে। বৈদ্যুধ্যম তন্তুর পার্শ্বে স্বনীল চম্পকপতলে নৃত্যকলা-পটীয়া যেন উল্লসিত মত শোভমান। স্থবিন্দু কুম্ব কবরীতে কুম্বের দাম, হৃচ্চিন কঠ পুষ্পমালা, চম্পকপদে নানা রত্ন আবরণ। অথরে অমরত গীত মনে তখনও অবশ্যে স্থা বর্ষণ করিতেছিল। 'আনন্দনের মাঝে যেন স্বপ্নের শরীরগীতি'। কিন্তু পরেই 'বুল্লিগাম এ কুম্ব এ আনন্দ যেন আঁধারের মাঝে বিভ্রাৎ-স্ববর্ণের মত, সুগন্ধ-গন্ধী হইলেও এ আনন্দের সৌরভ যেন স্থায়ী নয়। ভগবদর্শনের নিমিত্ত ভাবলু হইয়া পরাণ বধন পাগল হয় এবং সর্বগুণ ভাবলু প্রাণনাথের সন্দর্শনের নিমিত্ত তীব্র উৎকর্ষার সহিত নৃত্য করিতে থাকে তখনই নর্তনের সার্থকতা আইসে। জন্মার্থের প্রীতি সন্দর্শনের নিমিত্ত যখন পুণ্যকরণ গাণ নাচিতে থাকে, তাঁহার সমাগম প্রত্যাশায় যখন হিয়ার প্রতি তন্দ্রা, প্রতি শুভ কাঁপিয়া উঠে, অর প্রত্যাশের কিছা বিলুপ্ত হইয়া সমগ্র দেহখানি বিচারে করিয়া নাচাইয়া দেয়—তখন যে নর্তনের আনন্দ অমৃতত্ব করা যায় তাহাতেই জীবনের সার্থকতা আইসে, জীবনের সলল ভ্রত যেন সে নর্তনের মাঝে উদ্ভাসিত হইয়া যায়। দামিনী দর্শনে শিবীর মত গরাণ তখন আনন্দে কোকরব করিয়া উঠে।

## ‘পাগল’

## ঐকিত্তিতোষ মজুমদার

লোকে আমাকে পাগল বলে—তা বনু। আমার অভিশপ্ত জীবনে সবই অসম্ভব। ভগবানের এক বড় সাম্রাজ্যে আপনার বলিতে বাহার কেহ নাই তাহাকে যে লোকে পাগল বলিতে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! পিতৃ-মাতৃ বেধ কি তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই, কেহ বুঝাইয়াও বেধ নাই কাজেই সে দিক দিয়া ভাল মন্দ তেমন কিছু বুঝিতে পারি নাই। ছায়া—মাক—লোকে আমাকে কেন পাগল বলে তাই আজ তেমাধিকগে বলিব।

তখন আত্মীয় কেহ ছিল না কাজেই পূরের বাড়ী থাকিয়া মাছ হইয়াছি। বাজার করা, ছেলে ধরা, চাকর অভাবে চাকরের বাবতীর কাল আমাকেই করিতে হইত। কারণ আমি পূরের ছেলে তাহার উপর অল্পগ্রহ প্রাপ্ত। কাজেই লেখা পড়াও পূরের বাড়ীর মতই হইয়াছিল। সদাগরি আসিলে ৫০ টাকা মাহিনার কেরাগীসিরি ছাড়া আমার আর বেশী কিছু জুটিল না। জ্যোতিষী আমার হাত গণিয়া বলিয়াছিল আমি নাকি দুই অর্ধপানীও স্থায়ী হইব। কিন্তু যে দিন ৫০ টাকা মাহিনার কেরাগীসিরিতে চুকিলাম এবং যে চাহুরীর বেড় ৮০ টাকা পর্য্যন্ত সেই দিনই বুল্লিগাম জ্যোতিষীর গণনা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে কলিয়াছে। ওহো—না—না—জ্যোতিষী ঠিকই গণনা করিয়াছিল। আমার অপেক্ষা স্থায়ী তো কেউ ছিল না! কিন্তু কই সে তো আর নাই। যে আমার অভিশপ্ত জীবনটা সব দিক দিয়া সয়ন করিয়া তুলিয়াছিল সে তো আর নাই। আর অমৃতবর্ষী কথাতে আমার সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া যাইত সে তো আর নাই। যার খুঁ দেখিয়া শত দুঃখ হাসি মুখে সজ করিতে পারিতাম; যার বীণা-নিমিত্ত বর আমার গত জীবনের শোকতাপ দূর করিয়া দিয়াছিল সে তো আর নাই। যার ভক্তি, ভালবাসা, বেধ একসঙ্গে মিশিয়া স্বর্ণের নন্দন-কানন গড়িয়া তুলিয়া-

ছিল সে তো আর নাই। যার 'গোলাপের মত মুখানা আমার শত কালের মধ্যেও চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিয়া উৎসাহ দান করিত সে তো আর নাই। না—না—আমি কি বলিতেছি সে আমার কাছে—আছে—আছে—আছে। কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না নির্ধম লোকের সমুখে আগিতে সে ভয় পায়। সে বহু দূরে, বহু দূরে, বহু দূরে। যখন আমি আমার ঐ কুম্ব কুটারে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকি, তখন সে আসে আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে আসে আর তেমনি করিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরে। তেমনি করিয়া আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সে আছে—আছে—আছে।

চাহুরী নেওয়ার একবৎসর পরে বিবাহ করিলাম। সামান্য মাহিনা হইলেও আমাদের দিন বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছিল। ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিয়া আকিস করিতাম। কাজেই গাড়ী-ভাড়া ছাড়া অল্প বাজে ব্যয় কিছু ছিল না। একবৎসরে বাহা সামান্য কিছু জমাইয়াছিলাম তাহা দিয়া নিজের পৈতৃক বাড়ী মেয়ামত করিয়াছিলাম এবং সামান্য কিছু গহনা আমার লস্কীকে দিয়াছিলাম। ভগবান আমার লস্কীকে এমন নিবৃত্ত করিয়া তৈয়ার করিয়াছিলেন যে তার সৌন্দর্য্য বাজানর স্বল্প অল্প কোন কিছুই মরকার হইত না, কাজেই আমার এই সামান্য মাহিনার চাহুরীতে বেশ স্বখেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু আমার স্বপ্নের দিনগুলো যে ক্রমেই গুণতির ভিতর আনিয়া পড়িতেছিল ছুদিন আগেও তাহা বুঝিতে পারি নাই। উঃ—সে দিনের কথা মনে হইলে আজও আমার বুকের ভিতর কে যেন হুচ্চার মাছিয়া উঠে—আমার ঘরের ভিতর বাহিরে থাকিতে পারি না—ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ি। তাই শেষে আমাকে পাগল বলে—তা



বসুক। এই ভাবে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাওয়া দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই।

আমাদের গ্রামখানি একটা ছোটখাট সহর বলিলেও চলে। থানা, দুক, ইত্যাদি সবই ছিল। কাজেই নিতানুতন সরকারী আমলার মুখ প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। আমরা গ্রামের লোক, অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় হইত। তবে সরকারী লোক বন্দিয়া নিজে ততটা মেলা মেলা করিতাম না কেন কি জ্ঞান যেন বিধানের সহিত মেলা মেলা আমাদের তখন ভাল লাগিত না। তবে তাহাদের সহিত পূর্বের কখন কোন আশঙ্ক্যও ছিল না। যাক এমন করিয়া স্থখে ঘুঞ্জে দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে পুরাতন দারোগা বহলি হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্যতন কর্মচারীও কতক কতক বহলি হইয়া গেল। তারপর বিশাল কুড়ি দুকু নুতন দারোগাবাবুও তাহার দলবল আসিয়া জুটিল। ২৪ দিন পরেই নুতন দারোগার সহিত আলাপ পরিচয় হইল। প্রথম আলাপেই বৃত্তিতে পারিলাম লোকটা মোটেই ভাল না। পর-পীড়ন ব্রতে দীক্ষা লইয়া এই দারোগাগিরিতে প্রবেশ করিয়াছে। যাক—আঙন কখন ছাই চাপা থাকে না। কিছুদিন পরেই দারোগার স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল; যদি বৃত্তিতে পারিতাম লোকটা শুষ্ক অর্ধ পাইলেই সন্তুষ্ট তাহা হইলেও অনেক নিরাপদ ছিল কিন্তু তার ঐ অতবড় দেহের ভিতর হিংস্র পশু প্রকৃতিগুলি পরের সর্বনাশ করিবার জন্ত সর্বস্ব উৎসর্গ হইয়া থাকিত। আহা! কত সত্যি মা'দের দেহ এই লোকটার কামানলে ভস্মীভূত হইয়াছে তাহা ভগবানই জানেন। ৪৬ মাস কাটিবার পর এই দারোগা বাবুটা আমাদের গ্রামের ও থানার এলাকাবিনে অনেক গ্রামেরই একটা ভয়ানক উপদ্রব বিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের রামকমল চক্রবর্তী ইহার প্রধান সহায়। অর্ধশাবী লোক বলিয়া গ্রামের অনেকেই তাহাকে ভয় করিত ইহার উপর দারোগা তাহার সহায় লোক মুখ বৃদ্ধিয়া অত্যাচার সহ্য করিত। দারোগা বাবুর কামানলে আহাতি বিহার রসদ রামকমল নিতানুতন খোঁসাইত।

ফলে গ্রামের ভিতর যোল কামা উঠিল। জীলোকদিগের একাকী ঘাটে পথে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। হায় পরের হইয়া কেন সেদিন দারোগার সহিত বিবাদ করিতে থিরাছিলাম তাহা না হইলে তো আমরা এ সর্বনাশ হইত না!

একদিন রামকমল আসিয়া বলিল, “দেখ রমেশবাবু দারোগার সঙ্গে বিবাদ করে কেন নিজের সর্বনাশ থেকে আনছ, তার চেয়ে চুপ চাপ থাকাই ভাল।” সে দিন বড় দর্পে বলিয়াছিলাম, “দশের ভাল করতে গিয়ে যি নিজের সর্বনাশ হয় তা হোক। ইংরেজ রাজত্ব এর প্রতীকার আছে।” ওহো—আগে যি জানিতাম এমনি করিয়া আমার সর্বনাশ হইবে।

রামকমল চটয়া গেলেন লম্বী আমাকে বলিল “দেখ আমার বড় ভাব করে। দারোগার সঙ্গে বিবাদ করে আমরা কিছুতেই এখানে থাকতে পারবো না। চল আমরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। চাকুরী করেই যখন আমাদের দিন চালাতে হবে তখন এই সর্বস্বেনে গ্রামে থেকে এমন করে ভেবে ভেবে আর কত দিন কাটবে। আমার কব্বি মন থেকে কখন বাকী বড়ই থারাপ লাগছে, না জানি কি সর্বনাশটা হয়ে বসে।” আহা তখনও যদি তার কথা ভনিতাম তাহা হইলে বৃষ্টি আজ এমন করিয়া পথে পথে বৃষ্টিয়া বেড়াইতাম না। না—না আমি পাগল। পাগলের আর প্রয় বাড়ী কি? পাগলের আবার স্বপ্ন হুংখর।

আগেই বলিয়াছি আমি ডেলি প্যাসেম্বারী করি। বেলা ৯০ টার বাড়ী হইতে বাহির হইতাম আর সন্ধ্যা ৩০ টার কোন কোন দিন ৮টার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতাম। এই সময় পর্যন্ত লম্বী আমার একলাই বাড়ীতে থাকিত। কোন কোন দিন পাড়ার বিদুর মাঝে বাড়ীতে গল্প করিয়া সময় কাটাইত। লম্বী হইতে বই আনিতাম অধিকংশ সময় সে বই পড়িয়াই কাটাইয়া দিত। এখন ক্ষমতা ছিল না যে সহরে লইয়া বাসা ভাড়া করিয়া থাকিব। কাজেই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বাড়ীতে রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

যে কোন কারখেনই হোক মাস খানেক দারোগা বাবু বেশ মাছ ভাবেই থাকিল। মনে করিলাম দারোগার কাম পিপাসা বোধ হয় মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আগে যদি জানিতাম এই এক মাসের নীচতার ভিতর তাহার গুণ প্রবৃত্তি খিগড় ভাবে ফেনাইতেছিল তাহা হইলে হয় তো সাবধান হইতে পারিতাম। কিন্তু তাহার জীবনই আগা গোড়া একটা অভিশাপ তাহার আর সাবধান আশাধান কি? লম্বী প্রায়ই বলিত “দেখ ভূমি যাই বল দারোগার ও চুপ করে থাকা কিছুই না—ওটা সাময়িক অবসাদ মাত্র। ও যেদিন আবার জেগে উঠবে আর কিছুই থাকবে না।” রাতে আসে পাশে কোন কিছু শব্দ হইলে লম্বী ভয়ে কাঠ হইয়া যাইত, আমার কালের ভিতর মুখ রাখিয়া কাঁথিয়া উঠিত। একভাবে গলা জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাষ্টয়া বিত। কত বুঝাইতাম কিন্তু কিছুতেই তাহার ভয় দূর করিতে পারিতাম না। ওহো! তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া যদি সাবধান হইতাম!

সেদিন সোমবার সকালে উঠিয়াই লম্বী বলিল, “আজ তোমার আশিস গিয়ে কাছ নেই। আমার যেন কেন মনে হচ্ছে আর তোমাকে দেখতে পার না।” আমি বলিলাম, “ও কিছু না ওটা তোমার মানসিক দুর্বলতা। চার দিকের এই সব বিস্তীর্ণ কাও-কারখানা দেখে তোমার মন দুর্বল হয়েছে তাই, তোমার ঐ রকম মনে হচ্ছে। সাবধান হয়ে থেকো কোন ভয় নাই।” লম্বী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম “সন্ধ্যা বেলাই তো ফিরে আসবো তখন আর ভয় কিসের।” সকাল সকাল মন আহার করিয়া ঘরে কাপড় চোপড় পরিতৈছি, লম্বী আসিয়া আমার কোল বেসিয়া ঝাঁড়াইয়া বলিল, “আজ নাই বা গেলে! শরীর থারাপ হয়েছে বলে আকসি একখানা চিঠি লিখে দেও না কেন? আমি মনকে কিছুতে বোঝাতে পারছি না। সব সময় ঐ একই কথা মনে হচ্ছে।” আমি তাহাকে আদর করিয়া কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলাম “ভয় কি লম্বী! ভূমি ওরকম কথা বললে যে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ি।” লম্বী কোন উত্তর দিল না নীরবে

চোখের জলে আমার কাঁধ ভাসিয়ে দিল। সোমবার মাংসকাবার দিতে হইবে আকসি না গেলেই নয় কোন রকমে তাহাকে সাধনা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ওহো আগে যদি জানিতাম লম্বী তাহার বিপদ দিল চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল তাহা হইলে কি এমন করিয়া তাহাকে ভোলাইয়া ‘আমি’? তাহা হইলে কি আজ এমনি করিয়া পথে পথে ভাসিয়া বেড়াই।

আশিগের কাজ শেষ করিতে দেবী হইল শৈশনে আসিয়া দেখি ৮০ টার গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। লম্বী কি তবে ঠিক কথাই বলিয়াছিল। না—না—তাহা কখনই হইতে পারে না। যে কোন মতে ২ ঘণ্টা শৈশনে কাটাওয়া দিয়া ১১টার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কেবলই যেন মনটার ভিতর অন্ধকার ঢেকেিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল লম্বীকে বৃষ্টি বেজিতে পাইব না। ১২টার গাড়ী হইতে নামিয়া বাজীর দিকে ছুটলাম। তারপর থিয়া যাহা দেখিলাম—ওগো—না—না—তোমরা! আমার বলতে দাও। আমি পাগল—আবার কথা তোমরা দয়া করে শোন—ওগো লোকে আমাকে পাগল বলে—তোমরাও কি আমাকে পাগল বলে আমার কথা ভনবে না। ওগো—না—না—আমি পাগল না—তোমরা শোন—আর বুঝি জীবনে কাউকে বলিতে পারবো না। এবার সত্যি বৃষ্টি পাগল হয়ে যাব। ওগো—তোমরা শোন—শোন—শোন।

বাড়ী ঢুকিয়াই দেখি লোকে লোকারণ্য একটা কি মনে থিরিয়া সকলে বলিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই অনেক কাঁথিয়া ফেলিল—ভিড় চৈলিয়া গিয়া দেখিলাম—না—না—আর তো বলতে পারি না—বুক যে ফেটে যায়। উঃ ভগবান একি আমায় করলে। ভগবান একি আমার করলে। লম্বী, লম্বী দেখ দেখ এই যে আমি এসেছি। লম্বী আমার রক্তের উপর ভাসছে পাশে রক্ত মাখা ছুঁবি। ভগবান আর একটু সময় দাও। আর একটু সময় দাও। এখনও আমি পাগল হই নাই। আমার কথা আশ্রয় পেয়ে লম্বী আমার দিকে তাকাল। যুগ্ম এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ইসারা করে কি



যেন বল্লে—আমি তার মুখের উপর কুঁকে পড়লাম। উঃ সে মুখ আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। যেন আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটছে ভিজাশা করলাম “একি করলে লক্ষী” ভগবান বৃষ্টি তার শেখ আঁশা মিটাইলেন। আমার মুখের দিকে তাকাইয়া অশ্রুভাষে বলিল “শিশাচের হাত থেকে এইভাবে তোমার জিনিষ রক্ষা করেছি।” তারপর সব শেখ।

ওগো তোমরা শোন—লক্ষী কি বলছে। না—না—তোমরা পাগলের কথা বিশ্বাস করবে না। আমি পাগল কেউ বিশ্বাস করবে না। ভগবান! না—না—লক্ষী

## নবযুগ

### শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখী পূর্ণিমা। রমণীহুল ইহলোকের দেবতাহুলকে পূজ-কন্ডার ভার দিয়া, আবার কেহ কেহ বা নিজের আপে-পাশে, কোলে-কাঁধে লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল প্রয়াসকণ্ঠের আশায়। কিন্তু অনেক দিকে যতটা বঁকা ছিল তাহার বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল, পরশুর স্বপ্ন-দুঃখের আলোচনায়।

হঠাৎ সকলের দৃষ্টি পড়িল একটা অর্ধরক্ত রমণীর প্রতি। আর যায় কোথায়। একজন গালে হাত দিয়া বলিল—

“ওমা, এ কি সর্বশাস, এমন করে পুড়ল কিসে বাজা।”

অত একজনের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে কহিল, “আহা, কি অদৃষ্ট। বেঁচে গেছে, এই চের। কোথায় এ বিপদ হইছিল।?”

রমণী গীরকণ্ঠে উত্তর দিল—“দ্বাশানে।”

কৌতূহলের মাত্রা ক্রমে পরশা ছাড়াইয়া উঠিল। বাতীতী নদয়ের নিম্না উপাংশে তুলিয়া নবীনার হল উৎকর্ষ হইয়া দাঁড়াইল। রত্ন লক্ষ্মীহীনতার পরিত্যক্ত মহা-ভারত প্রথম পরীক্ষিত সমাপ্ত করিয়া প্রৌঢ়ার দল উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিল। পরলোকের পাত্রেয় সকলে যত্নসীল-প্রবীণারা মালাটা মাথায় ঠেকাইয়া সরিয়া আসিল।

আমার আছে। এই তাকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই যে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ধাক্কা দিয়ে আছে। তোমরা তাকে দেখতে পাবে না। লোকের কাছে আসতে যে বড় ভয় পায়। তোমরা তাকে কেউ দেখতে পাবে না। সময় দেখে তার সঙ্গে কত গল্প করি। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে আমার গল্প শোনে। ও তাই বৃষ্টি তোমরা আমাকে পাগল বল। লক্ষী আমার—সত্যি আমার।

না—না—কি বলছি—আমি পাগল—আমি পাগল—আমি পাগল।

রমণী একবার হাসিল তারপর কহিল—“আমার এই বাইরের দশা দেখে তাহার কারণ জানাবার জন্ত তোমাদের এত আগ্রহ, কিন্তু ভেতরটা জানলে নিশ্চয়ই সে আগ্রহ থাকবে না। তবু শুনেও বন্ধন চাইছে তখন বলতেই হবে আমার।” বলিয়া সে কিংবাকাল নীরব বহিল তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল :—

“সেদিন দ্বাশানে-ঘাটে বসে ভাবছিলাম, সৈনিকের এই পোড়া জীবনের কথা। রূপণের গছিতে রত্নের মত অনেক যত্নে লুকানো-বিনের স্বর্ভগুণে। কেবলই মনে হচ্ছিল,—খামার অপরিণীম ভালবালা। বন্ধুর মূখর বেহে। পরী দ্বিগীর্ণের প্রাণঢালা মমতা!...

প্রথম যেদিন বৃ-শেষে এসে নৃতন সংসারের ছায়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম, সেদিন অশোর মাখে জানা-শোনার এমনই একটা মাতামাতি পড়ে গিয়েছিল যে, আজও তা ভারলে হাসি পায়। অবশেষে খানিকটা দুঃখও যে বুকের মাঝে গুমেও গঠে না, তাই বা বলি কেমন কর’ল।”

তিনি বললেন—“মুছা, এই যে ভাড়া কুঁড়েখানি দেখছ, এই তোমার জীবন-মরণের আশ্রয়, আর আমার...”

আমি ভাড়াভাড়া বাধা দিয়ে বললাম—“বাণ, জুঁমি যে কি বলছ?”

এতদূর ভোরের ঝঁঝার সময় দেখতুম, সারারাত অনর্থক গল্পওজবের শেষে তিনি অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। কি স্বপ্ন, কি প্রাণত, কি পরিভ্রমে মৃষ্টি! আশ্চর্য্য হ’য়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতুম। দেখে বৃষ্টি আর সাধ মিতত না। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে, তাঁর পারের ধূলা মাথায় নিয়ে ভাড়াভাড়া রাতামুখে ঘর থেকে পালিয়ে আসতুম।

দুঃখ ছিল না, চিন্তারও অবকাশ ঘটে ওঠেনি, শুধু অনন্দের স্রোতে গা’ ভাসান দিয়ে ভেসে চলেছিলাম, হায়! তখন কে জানত এই ভাসাই আমার অদৃষ্ট। ভাগ্যবৈষম্যের চোখে কিন্তু আমার এ হৃৎ সইলো না। একদিন স্বামী এসে বললেন ‘বিশেষে যেতে হবে’ চমকে উঠে বললাম—‘বিশেষে কেন?’ তিনি হেসে বললেন,—‘নাইলে তোমার ভাকবার মত একটা হানও যে রাখতে পারব না। বাবার অস্থব্ধে যে বেনা করেছিলাম, আজও যে তার কিছুই শোধ করতে পারিনি, মুছা?’

আমার আলোর মত এই উল্লস সন্তোর বিকশে কি বদল ভেবে পেলাম না। মাথা নীচু করে বিহব হ’য়ে গাড়িয়ে হইলাম। মনে হ’ল,—পাণ্ডবসারের নিদ্রার কথা-গুলো! অন্তরের শত সহস্র নিষেধ যুগুটে নীরব হয়ে গেল; বুককাটা চোখের জল প্রাণপণে গোপনের চেষ্টা করিতে লাগলাম।

তবু আশা ছিল বা ঘিরি বারণ করেন, কিন্তু সেখানেও কোন আশা দেখলাম না। নিরন্তর মত কঠোর বিচার মুকুট দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হলো। মনে করে-ছিলাম হাসির মাখা দিয়ে তাঁর কাছে প্রাণের বাণা লুকাবো; কিন্তু, কাটাটা সেখানে বড় হয়ে সব বার্ষ করে দিলো। তিনি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে যানলেন—‘জি, উত্তল হও কেন। এক বছরের জন্ত বই ত নয়, তারপর.....’

হায় যে পুরুষের মন। কেমন করে জানবে এই এক বৎসরের ব্যাবধানী বিরহিলীর প্রাণের ছায়ে কত স্নেহের আঘাত করে।

তিনি বললেন—‘চিঠি লিখো, প্রত্যেক ডাকেই যেন উত্তর দিতে জুলা না।’

বান্ধককণ্ঠে স্বর বেরোল না। মাথা নেড়ে জানা-নুমা—আজ্ঞা।

তারপর আমার ছুসহ বিরহের ঠাক দিয়ে কোন রকমে দিন কাটতে লাগল। প্রত্যেক ডাকেই তাঁর হাতের লেখা চিঠি আমার বুকুতে প্রাণের খোরাক স্রোতেতে তুলত না; আমিও তেমনিই সেই ডাকের সমঘটীর অপেক্ষা করতুম;—ঠিক বিকারগ্রহ রোগীহই মত।

সেদিন প্রথম একটা উৎসবের মাড়া পড়ে গেল। আনন্দের আবেগে স্থির থাকতে না পেরে ভাড়াভাড়া ঘরে থিল দিয়ে খানিকটা কেঁদে নিলাম। মাঠাফুরাঝী পুজো পাঠাতে ছুটলেন। তিনি লিখেছেন, আর মা-খানেকের মধ্যেই বাড়া ক্রিয়বেন। সেখান থেকে তাঁর সাহেব-সাজা একখানা ফটা পাটিয়ে লিখেছেন। আসবার সময় কি কি আনবেন, তারও একটা ফর্দ পাঠাতে বার পড়েনি।

রাখে তাঁর সেই ছবিখানির দিকে চেয়ে দেখলাম; বেশ মোটা হয়েছেন, শ্রী ত ভাল ছিলই তার ওপর আরও নৌখণ্ড ফুটে উঠেছে। ফটাখানা বুকের মাঝে চেপে ধরলাম—এতদিন কাটলেও আর যে ২৪ঘা বৃত্তে পারি না।

হঠাৎ বাইরে অনেক লোকের পারের শব্দ শুনে শিউরে উঠলাম;—কেও গা!.....দেখতে দেখতে মশা-লের আশোয় উঠানটা আশাশ্রিত হইয়া উঠল; সঙ্গে সঙ্গে আমার ধারণা এসে কে যেন বিশ্রী গলায় বলে—‘মোর খোল, নইলে ভেঙে ফেলব।’

ভয়ে থব থব করে কাঁপতে লাগলাম। বাঙালীর মেয়ে আমি, এর বাড়া আর কি সামর্থ্য আছে আমার। ধোর ভেঙে গেল। সান্বেই রীটখানা পড়েছিল, তুলে নিলাম, কিন্তু মৃত্যু পারলাম না। কে এসে হাত চেপে ধরলো;—‘ফিরে দেখলাম—সত্যি! আমাদেরই গাঁয়ের একটা ছেলে।

মা-গো বলেই সেখানে লুটিয়ে পড়লাম। যখন জান হলো বুকুলাম—বিশের আনন্দে আমার দেহের সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু মনের মন্দির?...সে বিচার



কে করবে? ব্যার পাশ্চালায় দিন বাপনের পায়ে  
যে আঁজ হারিয়ে বলে আঁজ!

কাঁচা পেলে না, উঠে বসলুম। মাঠের ধারে কেউ  
নেই। আকাশে চাঁদ আর জ্যোৎস্নার খেলা চলেছে।  
একদিন লাভ লাগত 'বটে' এই ছবি, আঁজ কিন্তু অসহ  
বোকাইল। ভাড়াভাড়ি সে দিক থেকে মুখ কিরিয়ে  
নিলুম। জগবানু, না, না, ও নাম নিফল! আলোহার  
পেছনে ছুটে লাভ কি?

মনে হ'ল মাস দুয়েক আগের—কথা, আমারই মত  
আজ এক ধবিতা নারী কেনন করে 'হামীর ভিত্তির মায়া'  
ভাগ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। তার অবতর অবমাননার  
পরও লাহরার অস্ত ছিল না। যে স্বামী স্ত্রীকে বিপদে  
কোলাপানিয়েছিলেন, তিনিই সবার আগে 'দূর দূর করে'  
নির্ধ্যাতিকাকে তাকিয়ে বসিলেন—কারণ সে অসত্য। হায়  
রে ছুনিয়ার বাহো! হায় রে তাদের বিচার!

আজকে শিউরে উঠলুম—নিরের অজান্তে কখন বাড়ীর  
দিক পা বাড়িয়ে গিয়েছিলুম জানি না, কিরে গাড়ালুম।  
তিনিও যদি এমনই করেন? হয় ত তাঁদের কোন ক্ষতিই  
হবে না, কিন্তু আমার এতদিনের সমস্ত অন্তর-পূজা যে  
বিলম্ব হয়ে যাবে! বাড়ীর উপর যে অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস  
নিরে জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়ে এসেছি, তা গেলে  
আর বেঁচে থাকব কি নিয়ে?

কোন মুক্ত আশ্রয় আশ্রয়টুকু তিতার জলে-জলে  
আকাশ পড়ে লাদিমার সঙ্গি করেছিল! মন্ত্রমুগে হস্তিগীর  
মত সেই দিকে এগিয়ে চললুম। তবে লাভ কি এ  
বাঁচার? মরই ত মলম। বাইরের লস্করতার ব্যতাসে  
যে আমার নিশাধ রক্ত শুধে আসছে।

আচিরন্তন মেঘের দামামা বেজে উঠল, বিভ্রান্ত থেকে  
থেকে জালা প্রকাশ করতে লাগল। শব্দাহকারীরা দুর্ভাগ্যে  
বেরে সূর্য্যোদয়েই সরে পড়ছিল। আশাতে আশতে তিতার  
সামনে এসে পড়ালুম। ব্যতাসের ভাঙনার আঙুরের  
নিশাগুলো আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মনে  
হল—এ অপরিহার্য দেহটিকে শুভ করতেই যেন সে এতটুকু  
উৎসুক। জান সূতা হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

পক্ষমুগ কে যেন আমার কাণের কাছে এসে বলে  
"কি কলি হুতাঙ্গী! কি কলি! কালের অস্ত ছিল  
না যে তোর। এই সব স্বপ্নানুভূতি ব্যথিতাদের

সাহায্য, সমাজের নিষ্ঠুর বিচারের অভিন্ন থেকে  
আপনারে সম্মম রক্ষা করবার চেষ্টা করলি না কেন?  
অনেক দীর্ঘ-নিশ্বাসের সমাধি হতো যে তাতে!"

ভাই'শ! ভাড়াভাড়ি মরণের আলিঙ্গন থেকে  
নিজেকে মুক্ত করে নিলুম।

নারীকে যে আঁজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে গাড়তে  
পুরুষের পত্নত্বের হাত থেকে নিজেকে অস্তিত্বটাকে  
সচেতন রাখতে হবে, নইলে.....

অনেকে আমায় পাগল ঠাওরালে,—তা' তাদের  
উপহাসের ভাষাতেই বেশ বৃহতে পারলুম। আমার  
জীবনী শুনে সগাছকৃতি দেহাবার লোকেরও আঁহ  
বেধলুম না। তবুও আমার অন্তর-বাসনা অসার্থক  
হয়নি। কতকগুলি দেশের হু-সন্ধান, এই পৈশাচিক  
অত্যাচারের প্রাবনের স্রোত হ্রদ করবার ক্ষমতা পাবন  
রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ও  
কয়েকজন পতিতার অর্থে 'শান্তিচুটির' স্থাপন করা  
হয়েছে। তোমারা হয় ত জিজ্ঞাসা করতে পার, শান্তি  
পেয়েছি কি?—পেয়েছি, অন্তর: নির্ভয়ে বুকের জালা  
বিস্ময় মরবার তৃষ্ণা থেকে বঞ্চিত হইনি। আর  
একদিন বিশেষ উপহার হয়েছে এখন বৃহতে শিবেছি যে  
পুরুষের খেলার পুতুল হওয়া ছাড়া নারীর আরও অনেক  
পথ আছে? বা তাদের সমস্ত সম্মান বাচিয়ে যথার্থ  
নারীকে পৌঁছে দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

হুতাগ্যের মধ্যেও দৌড়াগের মুখ দেখা আমার  
অদৃষ্টে ঘটেছে?—একটা মত বড় ভুল ভেঙে গেছে।  
আমার মত 'হামী' অনেক চেষ্টায় আমায় খুঁজে পেয়ে  
পায়ে স্থান দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এজীবনের অবশিষ্ট  
দিনগুলো তাঁর কাছে ছুটি চেয়ে নিয়েছি। না নিয়ে  
আর করি কি বল? উজ্জ্বলিত আর দেবতার ভোগে  
দেওয়া যায় না। বাইরের এ পোড়ো দেহটী নিয়ে  
ভেতরটা তার উপরকু করতে চাইছি গারব কি না  
কে জানে।

অনেক বুঝা আমার হস্তিনায়ে মন দিল। প্রৌঢ়ারা  
ধর্মহানির ভয়ে পতিত পাবনীর অনেক পবিত্র হইতে  
অগ্রদূর হইল। নবীনারা এ গুর মুখ 'চাওয়া চাওনি'  
করিতে করিতে ওকনের অঙ্গুরণ করিল।  
রমণী হাসিয়া উঠিল—হায় রে সংসার!



মুখ্য সম্পাদক

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সম্পাদক

## সত্যের পরীক্ষা

নেতালে আগমন

ইংলণ্ডে যাইবার সময় আত্মীয় স্বজনের সহিত বিচ্ছেদ  
জন্ম যে যগণ অছত্বব করিয়াছিলাম নেতালে যাইবার  
সময় সেপক কিছু টের পাই নাই। আমার মাত জন  
কীভাবে ছিলেন না। এত দিন সাংসারিক অনেক জ্ঞান  
আমি লাভ করিয়াছিলাম বিশেষে ভ্রমণ করিয়াও অনেক  
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলাম, এমন কি রাষ্ট্র-কোট  
হইতে বোম্বাই গিয়া অবধিতিও একেবারে বার্ষ হয়  
নাই।

এবার কেবল পত্নী-বিরহের কষ্ট অছত্বব করিয়া-  
ছিলাম। ইংলণ্ডে হইতে আসিবার পর আমার আর  
একটা সম্মান হইয়াছিল। আমাদের প্রেম এখনও সুস্পৃ-  
ণ্ড আদিতছিল। ইয়ুরোপ হইতে ফিরিবার পর আমি  
পত্নীর সহিত সব সময়ই একত্রে বাস করিতেছিলাম  
তাহার উপর আমি এক্ষণে তাহার শিক্ষক হইলাম সে  
সময়ে অনেক উন্নতি ও সংস্কার করিতেছিলাম সেই জন্ম  
আমাদের একজন অবস্থান আত্মকীয় ছিল কিন্তু দক্ষিণ  
আফ্রিকায় প্রসাধন তাহার পক্ষে অন্তরায় হইয়া  
গড়াইল। আবার এক বৎসর পরে উভয়ে একত্রে হইয়া  
এই আশা মিমা আমি পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া রাজ-  
কোট হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলাম।

গায়া আবছরা কোর এক্ষণের উপর আমার যাইবার  
ব্যবসার তার প্রেরণা ছিল। কিন্তু যেতে কোন রকম

"বার্ষ" গালি ছিল না; আবার তখন যাইতে না  
পারিলে বোম্বাইয়ে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এক্ষণে  
আমি বসিলেন "প্রথম শ্রেণীতে যান পাইবার জন্ম  
আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারি নাই—  
আপনি ভেঙে যাইতে সম্মত হইলে যাইবার ব্যবস্থা  
করিতে পারি। তবে আপনার যাইবার ব্যয়টা সেখানে  
করিতে পারি।" তখন আমি প্রথম শ্রেণীতেই ভ্রমণ করি-  
তাম—তাহার উপর একজন ব্যারিষ্টার হইয়া আমি কেনন  
করিয়া তাকে যাইব। স্বতরাং, আমি উহারে স্বীকৃত  
হইলাম না কারণ আমি ঐ এক্ষণের সত্যাবিস্তার উপর  
গম্ভীর হইয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীতে যে স্থানান্তর  
হইতে পারে ইহা কেনন আমার বিশ্বাস হইতেছিল না।  
এক্কেটকে রাজী করিয়া আমি নিজেই 'প্যাসেজ' যোগা-  
করিতে চলিলাম। আমি জাহাজে যাইয়া প্রথম অবস্থানের  
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সব বলিলাম উত্তরে তিনি বলিলেন  
"সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীতে এমন স্থানান্তর হয় না তবে  
এই জাহাজে যোগাধিকার রাজ প্রতিনিধি যাইতেছেন  
বহিমা সমস্ত বার্ষই রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে।" আমি  
বলিলাম "কোন রকমে আমায় একটু জায়গা করে দিতে  
পারেন না কি?" তিনি একবার আমার আপাদ মস্তক  
দেখিয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "একটা উপায়  
আছে—আমার নিজের কেবিনে একটা 'বার্ষ' আছে উহা  
যাত্রীরা সাধারণতঃ পাইতে পারেন না, তবে তোমায়



আমি ঐ বার্থটা দিতে পারি।" আমি তাঁহাকে দ্বন্দ্ববাদ জানাইলাম ও ফিরিয়া আসিয়া জেক্টকে প্যাসেজ করিতে বলিলাম। ১৮৩৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে আশা ও আকাজ্যের পূর্ণপূর্ণ স্বয়ং লইয়া আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলাম।

স্ত্রে দিন পরে আমরা প্রথম "লামু" নামক বন্দরে উপনীত হইলাম। এই সময়ের মধ্যে কাপ্তেনের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তিনি দাবাবের খেলিতে ভালবাসিতেন; কিন্তু নুতন খেলোয়াড় বলিয়া তাঁহার নিজের চেয়েও কাঁচা একজন যেসুতী তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল—সেজন্য তিনি আমার খেলিতে আহ্বান করিতেন। আমি এ খেলা কখন খেলি নাই তবে এই বেলার সমস্ত অনেক রকম কথা শুনিয়াছিলাম। তাহা যাহা ইহা খেলিতেন তাঁহারা বলিতেন যে এই বেলার বুদ্ধির খুব পরিচালনা হয়। যাহাই হউক, কাপ্তেন সাহেব আমাকে এই খেলা শিরাইয়া লইবেন; বলিলেন—আমাকে তিনি স্থযোগ্য ছাত্র পাইয়াছিলেন, আরণ আমার বৈধ্য ছিল প্রচুর। আমি বতই হারিয়া যাইতাম ততই তিনি আমার বয় করিয়া শিরাইতেন। আমি এ খেলা পছন্দ করিতাম বটে তবে তাহার সময়ের সীমা ছিল। এই জাহাজে যাত্রার সময় আরও গভীরত্ব ছিল কেবল ঘুটগুলি নাড়া চাড়া করা পর্য্যন্ত এবং বেশী শক্তি খেলায় আমি নিয়োগ করি নাই। লামু বন্দরে জাহাজটা ভাঙ ঘটা লম্বা হইয়াছিল। আমি বন্দর দেখিতে গাইলাম। কাপ্তেনও তাঁর নামিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমার সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন "বন্দরটা বড় সাধারণিক—সময় থাকিতে থাকিতে ক্রিান্তে কুলিবে না।" স্থানটা অতি ক্ষুদ্র—আমি পোষ্টালিসে বাইলাম ও তথায় কয়েকজন ভারতীয় কেরানী কাজ করিতেছেন দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। আমি তাঁহাদের সহিত বানিক কথাবার্তা করিলাম। আফ্রিকা বাসীদেরও দেখিলাম এবং তাহাদের জীবন যাত্রার ধারাগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম—তাহাতে আমার আনন্দ ও উৎসাহ দুইই বোধ হইয়াছিল। ইহাতেই বর্তমান সময় কাটিয়া গেল। কয়েকজন ডাক-প্যাসেজার

বের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল; তাঁরে আমিরা দেবিলাম তাঁহারা খাওয়ার রন্ধনের উদ্ভোগ করিতেছেন এবং নিয়ালার ভোজন করিয়া লটবেন ইহাই বোধ হয় তাহাদের অভিশ্রয় ছিল। কয়েক তাহাদের ফিরিতে দেখিয়া আমিও ফিরিলাম আমরা এক বোটেই ফিরিলাম। বন্দরে তখন প্রবল জ্বরের আশিয়াছিল এবং আমাদের বোটখানিও আরোহীতে ভরা ছিল; আর এত টান ছিল যে ঈমারের সিঁড়ির সূঁচে বোটখানিকে লাগাইয়া রাখা কঠিন হইয়াছিল। সিঁড়িখানি একবার বোটে ঠেসিতেছিল, আবার তাঁনের চোটে সুরিয়া যাইলে অনেকটা কাক হইয়া যাইতেছিল। যাত্রা করিবার প্রথম বীশী বাড়িয়া যাওয়ায় আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাপ্তেন উঠির হইতে আমাদের দুর্দশ। দেখিয়া ঈমারখানি আবরও পাচ মিটার বাহিরে বসিলেন। আমার এক বড় লাল টাকা দিয়া আমার জন্ম একখানি বোট ভাড়া করিয়াছিলেন। উহা আসিয়া আমাকে সেই ভর্তি বোট হইতে উদ্ধার করিল। সিঁড়ি তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল; কাজেই আমি একটা বড়ি ধরিয়া কুলিয়া উপরে উঠিলাম। সন্ধ্যা বাতীয়া পড়িয়া বহিলা। আমি কাপ্তেনের সতর্ক বাণীর মূল্য তখন বুঝিতে পারিলাম।

লামুর পরে দ্বিতীয় বন্দর ছিল মোখালা। তারপর জাকিয়ার। সেখানে ১১০ দিন থাকিয়া পরে আমরা বোট বদল করিয়া অত্র বোটে যাত্রা করিলাম। কাপ্তেন আমার খেতেই ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার গতি এমন খুরিয়া দাঁড়াইল যে তাহা মোটেই প্রীতিকর নহে। তাঁহার সঙ্গে আমোর-বাজার (outing) আমাকে ও তাঁহার এক ইংরাজবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা দুই-জনেই তাঁহার বোটে তাঁরে পেলাম। আমি কিন্তু "আউট" বলিলে কি বুঝায় তাহা জানিতাম না; আর এসব ব্যাপারে আমি যে একবারেই যে-অসুখ কাপ্তেন বোধে হয় তাহা জানিতেন না। এক হালাল আসিয়া আমাদের এক নিম্নো জীলোকের বাড়ীতে লইয়া গেল। আমাদের প্রত্যেককেই এক একটা ঘর দেখাইয়া দেওয়া হইল। আমি লম্বায় নির্ভীক হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম—সেই দেহ-পগাফড়ি নারী আমাকে যে কি ভাবিয়াছিল জানি না।

—কাপ্তেন জাকিলে আমি ঘরের বাহিরে আসিলাম। কাপ্তেন বুঝিলেন যে, আমি যে অবস্থায় গিয়াছিলাম সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি; সুতরাং নিশাপ। প্রথম আমার খুব লম্বা বোধ হইতেছিল। কিন্তু সেই নারীকে আমি ভয়-মিশ্রিত স্থণার ব্যতীত অত্র চক্রে দেখিতে পারি নাই; কাজেই লম্বা কাটিয়া গেল। আমি ভগবানকে এই জন্ম ধন্যবাদ দিলাম যে ঐ জীলোকটিকে দেখিয়া আমার মনে অত্র ভাব জাগে নাই। আমার নিজের দুর্ভাগ্যতার জন্ম নিজের উপর বড় বিরক্ত হইলাম এবং ঐ ঘরে যাইতে অস্বীকার করিবার মত সংসাহস যে আমার ছিল না তজ্জন্ম মনে মনে বড় দুঃখিত হইলাম। ইহাই আমার জীবনে এই শ্রেণীর তৃতীয় পরীক্ষা। অনেক যুবক লম্বায় বাহিরে এইরূপে পাপের ঘুর্যবর্তে পড়িয়া যায়—আমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ইহাতে আমার বাহাদুরী কিছু ছিল না। যদি আমি ঐ ঘরে প্রবেশ

করিত অস্বীকার করিতাম তাহা হইলেও আমার কিছু কৃত্তিম থাকিত। আমি ইহার জন্ম সম্পূর্ণরূপে পরম কারুণিক জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলাম; কারণ তিনিই আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার আমার ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস বাড়িয়া গেল এবং আহতুকা লম্বায় যাত্রাও কমিয়া গেল। এই বোটে এক সপ্তাহ থাকিতে হইবে বলিয়া আমি একটা কামরা ভাড়া করিলাম এবং আশে পাশে বেড়াইয়া যতদূর পারিলাম সহর দেখিয়া লইলাম। জাকিয়ারের পাছপালার সতেজ ও সুশ্রুত আকৃতি দেখিয়া মালাবারের কথা মনে পড়িল। এখানকার গাছপালার চেহারা ও বৃক্ষ আকার দেখিয়া আমি বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার ইহার পর মোজাবিক যাইতে হইয়াছিল এবং যে মাসের শেষে আমি নেতালে গিয়া পৌছিলাম।

## দেবতার আগমন

### শ্রীকৃষ্ণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাত্মক

তুমি এমনি করেই আস!

উঁচু মাথা ধার, তায়ে নত করে,

নামাইয়া তায়ে পুলিশ উপরে,

পদতলে বেধা গড়ে থাকে তায়ে

মাথায় করিয়া হাস!

তুমি এমনি করেই আস।

চির অবিশ্রামী হয় শ্রমবান,

বধির যে জন ফিরে পায় কাণ,

হুক করে কথা, অক্ষ চক্ষুমান

ধ্বনি দেবতা, আস!

তুমি এতই ভালবাস!

নিরুপে কাঁপায় অহতাপ নাও,

যে কাদে সন্তত তাহারে হাসাও,

প্রেমের সাগরে সবারে ভাসাও,

সবল অভাব নাশ!

তুমি এমনি করেই আস!



প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩:—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকখানি ‘প্রবাসীতে’ বাহির হইতেছে। এই সমস্ত পত্র ‘প্রবাসী’র নূতন আকর্ষণের বিষয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট ভূমিকার স্বাক্ষর পত্রগুলির পরিচয় (Introduction) করিয়া দিয়াছেন। ভারতের অধিত্য কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার সহিত ভারতের অধিত্য বৈজ্ঞানিক জগদীশব্রহ্মের জগৎবীর্যের কতখানি যোগ তাহার পরিচয় এই পত্রগুলির দ্বারা পাওয়া যায়। একখানি বিশদ উল্লেখ অব্যবহৃত যে, জগদীশচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানের উপাসক নহেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকও বটে। এই জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিকের প্রকৃত সাধনা, প্রাকৃত সাহিত্যাদ্যরূপ, অকল্পিত সৌন্দর্য প্রভৃতি সদৃশ্যের পরিচয়ও এই পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে ব্যঙ্গ বিস্তারও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসের সহিত এই চিঠিগুলি খনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞিত। আমাদের মনে হয় ইউরোপের বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের লিখিত প্রজাবলীর দ্বারা আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই পত্রগুলিও বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান পাইবে।

‘কিছু আনন্দ’ বিখ্যাত বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও ধর্ম নিক পণ্ডিত মহেন্দ্রসিং ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে গোতম বুদ্ধের প্রিয় অচর ‘আনন্দ’ের পরিচয় আছে। প্রবন্ধ-পাঠে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার বিষয়ক নূতন তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সে হিসাবে প্রবন্ধটি মূল্যবান।

‘সেরপুত্রে প্রাচীন মূর্তি’ শ্রীহরগোপাল দাস কুহু রচিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখক সেরপুত্রে সংগঠিত প্রাণ শিবমূর্তি ও মৎস্তাস্তার মূর্তি সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন।

‘গারোবের কথা’—শ্রীহরিপদ রায় বি-এ-সি লিখিত। নূতনত্বের পরিচয় নাই।

চাক বন্দোপাধ্যায়ের ‘উর্লুঙ্গী’ এই সংখ্যার শেষ হইল। প্রবন্ধটি পাঠ্যতুর্ণ এবং চিত্রাঙ্গুলতার পরিচয়ক

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার ‘উর্লুঙ্গী’র ব্যাখ্যা চাক বাবু মৌলিক চিত্রার পরিচয় দিয়াছেন। বৈদেশিক সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের ‘উর্লুঙ্গী’র সম্ভারে অব-প্রাণিত কবিতাগুলি পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধে বাস্তব্যে যেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে প্রবন্ধটি আরও উপভোগ্য হইয়াছে। আমরা চাক বাবুর প্রবেশ ও অধ্যয়নমুহুরের প্রশংসা করি। তাহার লিখিত শিবঠাকুরের জন্ম কথা, গণেশের কল্মষ প্রভৃতি প্রবন্ধের দ্বারা আলোচ্য প্রবন্ধও আনন্দ হইবে।

শ্রীধর্মেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় তাহার রচিত ‘অন্যনাসিক ও সমুদ্র বর্ণ প্রবন্ধ’ প্রাতিপদ্য করিতেছেন যে, প্রাকৃত ও প্রাদেশিক আর্ঘ্য ভাষায় ‘হদি কোন সমুদ্র বর্ণের পুঙ্কর অংশটি লুপ্ত হয় তবে তাহার স্থানে অস্থায়ী আসে এবং এই অস্থায়ী কখন কখন চক্রবিন্দু আকারে অথবা পরে কোন স্পর্শ থাকিলে তদনুসারে বর্ণের পঞ্চম বর্ণ রূপে অবস্থান করে। যথা সংস্কৃত অক্ষি—প্রাকৃত অক্ষি—বাংলা আঁখি—হিন্দি আঁখি ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া প্রবন্ধটির মূল্য অবশ্য দীর্ঘাধা—এ মাসের প্রকাশিত ছোট গল্প একটি—‘সাধনার বিড়ম্বনা’, লেখক—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। গল্পটিতে লক্ষ্য করিবার বিষয়—লেখকের ভাষা—মার্জিত, সম্যক এবং হৃদয়বদ্ধ। বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের যিনি রাজা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন তাঁহার ভাষাটিকে আত্মস্বাং করিয়াছেন। গল্পাংশে কিছু নূতনত্ব না থাকিলেও ‘সাধনার বিড়ম্বনা’ অপূর্ণ হইয়াছে।

‘জন্মোৎসবের দিনে’ রবীন্দ্রনাথের কবিতা অতি স্বন্দর, অতি মর্মস্পর্শী। জন্মোৎসবের দিনে কবির মনে সেই কন্দের কথা জাগিয়া উঠিতেছে—

বালী যখন আসবে ঘরে,  
নীতবে লীপের শিখা,  
এই জনমের লীলার পরে  
পড়বে যবনিকা,  
সে দিন যেন কবির তব  
ভিড় না জমে সভার ঘরে

হয় না যেন উক্ত শব্দে  
শোকের সমাবেশ।  
তবে কি কবির জন্ম কোন দৃতি সভা হইবে না?  
হইবে নই কি—কবি বলিতেছেন,—  
আমি জানি, মনে মনে,  
সে উত্তি যুবী জবা,  
আনবে ডেকে কখন কখন  
কবির দৃতি সভা।  
বর্ষা শরৎ ও বসন্তের প্রাঙ্গণে, কবির দৃতিসভা  
বসিবে; কাণ্ডের হাওয়ায় শ্রাবণের ধারায়, কল্পন সন্ধ্যা  
মেঘে, অক্ষ আলোকে আমার কবির বার্তা, কবির দৃতি,  
বিজিত থাকিবে।  
কবি আমার বলিতেছেন—  
আমার দৃতি থাকনা গাঁথা

## পত্র

‘নবযুগ’ সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,  
ঠাট্টা সংখ্যার মাসিক বহুমতীতে ‘মহিলার কবি’  
শীর্ষক যে কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমার রচিত  
নহে।

শ্রীশীলা দেবী নামে যে লেখিকা লিখিয়াছেন, আমার কাগজের সাহায্যে আমি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় ও টিকানা জানিবার উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিতেছি। কারণ ভবিষ্যতে বাহাতে উভয়ের একই নাম হওয়ার ক্ষয় রূপ গোলাযোগ্য না হয় সেজন্য তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আমি ইচ্ছুক।

লেখিকার ‘কবি’ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া আশ্রয়  
হইতে হয়, ‘মহিলার কবি’ কে? কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

আমার গীতি মাঝে  
যেখানে ঐ স্বাক্ষরের পাতা  
মধুরিয়া বাজে  
যেখানে ঐ শিল্পিত তলে  
কণ হাসির শিশির জলে,  
ছায়া কোথায় ঘুমে ঢেলে  
কিরণ-কণা-মালী।  
ফুলের সৌন্দর্য যেমন অশ্রুজ্বলিত বিষয়—পার্শ্বিত  
ছবিবাক্য দ্বারা ব্যাখ্যাত করিয়া দেখাইবার নহে, এ কবি-  
তার সৌন্দর্যও তেমন অস্তর দিয়া অল্পভব করিবার;  
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার নহে। জীবন-সম্ভার্য মান  
আলোয় খেঁচাঘাটে বসিয়া কবি আত্মকাল পুরবীর শাস্ত  
হবে বালী বাজাইতেছেন।

বিশ পুঞ্জিত, বিশ বসিত, বিশ্ববরণ্য, বিব কবি,  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি শুধু মহিলাই কবি? রবীন্দ্র  
সাহিত্য সম্বন্ধে লেখিকা কি জানেন? সমাক জানেন  
একাত্ম অভাব। বর্তমান রূপে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রজাব  
কিরণ তাহা কি লেখিকা অবগত আছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে লেখিকা যদি নবযুগ বা মাসিক  
বহুমতীতে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় না দেন তাহা হইলে  
বুদ্ধিবিহীন আমার নামের নকল করিয়া পাঠকবির উপর  
অত্যাচার করিতেছেন।

শ্রীশীলা দেবী  
C/o. রংগেশ্বরনাথ ঠাকুর  
৬ নং আলিপুর পাক রোড ইষ্ট, কলিকাতা।





## চোলের চোরা

দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিরঞ্জন আর নাই। তিনটি সন্তান রাখিয়া বিধবা মাতা ও পত্নীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গত শনিবার রাতে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। এই দুঃসংবারও দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে মত অশ্রুত্যান্বিত; তিনটি সন্তান বিখান করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পতিশোকের উপর এই একমাত্র পুত্রবিয়োগের শোক বৈধী বাসন্তীর কদম্বের দারুণ আঘাত করিবে জানি তথাপি ধর্ম্মীর মত তাঁহার সহিষ্ণুতা আছে বলিয়া আমাদের ভরসা হয় তিনি ইহাও সহ করিতে পারিবেন। এ পোকে সহ্য ভারতবর্ষে তাঁহাকে সমর্থননা জ্ঞান করিবে সন্দেহ নাই। ভগবান চিরঞ্জনের আত্মাকে শান্তি দান করুন।

পাটনার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইজ্যান্সেলোর হইবেন বলিয়া যে গুরু উদ্বিগ্ন ছিল, তাহা সত্যে পরিণত হইল। ইউনিভার্সিটীর তরফ হইতে তাঁহার নিয়োগবন্ধ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু ফলে কিছু হয় নাই। স্ত্রার আন্তর্য্যাত্মিকতার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণস বাহির করিতে ইনি বহুপরিচর হইয়াছিলেন আজ তাঁহার আসনে বসিয়া অধ্যাপক যদুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কি বৈধী সন্তোর করিতে পারিবেন তাহা দেখিবার জন্ত আমরা সত্যই আগ্রহান্বিত রহিলাম। যদি তাঁহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যই কিছু উন্নতি হয় তবে আমরা পরম আনন্দিত হইব।

জেনেতার জাতি-সম্ম প্রার্থনী হইতে সম্পাদক রামানন্দ বাবুর নিমন্ত্রণ হওয়ায় আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। রামানন্দ বাবু স্বীয় নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার বলে কেবল ভারতেই যে ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকের

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে বাঙালী জাতি আজ সম্মানিত। তিনি শীঘ্রই জেনেতা যাত্রা করিবেন। আমরা তাঁহার যাত্রার জয় কামনা করি।

জায়েশের পুরের টাটা ষ্টীল ওয়ার্কসের কোক-ওভেনসের স্থপাটিংওয়েট মি: ডি, সি, গুপ্ত, বিহার ও উড়িষ্যায় 'ভাইব্রেস্টার অব ইণ্ডিয়া' পদে নিযুক্ত হইলেন। মি: গুপ্ত আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ। বিহারে এই পদে ভারতীয়ের ইহাও সর্বপ্রথম নিয়োগ। আমরা মি: গুপ্তকে এই উৎকণ্ঠ লভের জন্ত সম্বর্ধিত করিতেছি।

টাটার লৌহ-শিল্পকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গর্ভস্থে বহু পরিচায় অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু ফলে বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। টাটার লৌহ সংরক্ষিত বলিয়া আমেরিকানরা উগ্রা ধরিল করিবেন না বলিতে-ছেন অসম্ভব বেশ যদি আমেরিকার অস্থাবরন করেন তবে টাটার লৌহের রপ্তানির আশা আর থাকিবে না। যদি বিদেশে রপ্তানি না হয় তবে মাত্র ভারতে উৎক্ষেপ সলল করিবার জন্ত সাধারণ অর্থের অল্পা বায় কোন রূপেই অসম্ভবান করা চলে না।

এবার রথযাত্রায় কি হইবে? পুলিশের এখন কোন আদেশ বাহির হয় নাই বটে তবে যার হইবে যেরথযাত্রাতেও হয় বাত্মননি বন্ধ করা হইবে আর নত যাত্রার পথ নির্মাণে মজলিম-হীন পথ বাড়িয়া দেওয়া হইবে। নতুবা রাজপথে ন্যায়ক পদ্ধিয়ার আয়োজন হইতে পারে—হাস্যসাধেই কি বদেন?

কুঠিয়াতে কয়েকজন মুসলমান এগার জন ধর্ম্মের রমণীর উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বে এ শ্রেণীর অত্যাচার একাকিনী রমণীর উপর হইত কিন্তু পুলিশের অক্ষমতার ফলে, বহু স্থলে আশ্রয়ী গৃহ বা দণ্ডিত না হওয়ায় দুর্বৃত্তদের বুক বাড়িয়া গিয়াছে; এখন তাহার দলে দলে একদল পাশাধিক অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে। পূর্বে একদল ঘটনা কোথাও ঘটিলে যে দেশ অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইত ইংরাজরাজ্যে একদল ঘটনা যে সম্ভব, পূর্বে তাহা বিশ্বাস না হইলেও আর আর অবিবাস করা চলে না। কুঠিয়ার বাহাদুর পুলিশ ও দোদীও প্রতাপ ম্যাজিস্ট্রেট কতদূর কি করিয়া উঠেন দেখা যাক।

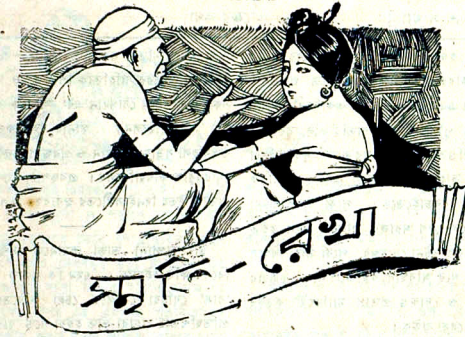
ডা: কিচলু বক্তৃতাপ্রদানে বলিয়াছেন "Helots have no religion" অর্থাৎ দাসের কোন ধর্ম্ম নাই; এটা সম্ভবতঃ তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেই বলিয়া থাকিবেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই আর পরাধীন, আবার উভয় জাতিই বিদেশীর গোলামী করিয়া জীবন-যাপন করেন। অনেকে বলেন যে হিন্দুর মধ্যে গোলামের সংখ্যা বেশী ক্রমশঃ এক ভাবে সত্য অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অধিক হইয়া সত্য সিক্ত খানদামা, বাবুতী, 'বহু', ছাত্রামিজী, রাজমিজী, কাহারের লম্বার প্রভৃতি কাঙ্ক্ষ মুসলমান চাকুরের সংখ্যা বেশী হয়তঃ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাসত্বের পঞ্জীর সংখ্যা বেশী তাহা সঠিক বলা কঠিন। যাহা হউক ভাঙার কিন্তন মন্তব্যের উত্তর স্বরূপ 'আগামী কাউন্সিলে মালদার শ্যৈল এমদহাল হকসাহেব শতকরা ৬-৮টি সরকারী চাকরী মুসলমানবিধায়-জজ দারী করিবেন। হকসাহেবের যে দায়ার শরীর তাহা ঐ শতকরা ২-৮টি চাকরী অ-মুসলমানবিধায় জজ ছাড়াই দেওয়াতেই বুঝা যাইতেছে অধিকাংশ সরকারী কার্বেই উক্ত শিকা ও তীক্ষ্ণ দ্বিধার আবৃত্তক—মুসলমানদের মধ্যে এতগুলি যোগ্য পর-প্রার্থী পাওয়া হইবে কি?

গত ২২শে ও ২৩শে চৈত্র শাশ্বতপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শাশ্বতপুর সাহিত্য সম্মেলনীর নবম অধিবেশন স্থাপ্যোগে আয়োজনের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন—শ্রীমুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শাশ্বতপুর সাহিত্যিক শিক্তি ও গম্যতা-ব্যক্তি সকলেই সম্মিলনে যোগদান এবং অনেক প্রবন্ধকবিতাদি পাঠ করিয়াছিলেন। স্বামী, অনেকগুলি শিক্তি উদ্বাহিলা সভায় যোগদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মিলনের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা ব্যতীত উভয় দিনই সঙ্গীতের ব্যবহার ছিল।

টাকশাস্ত্রী ভাড়া কমানতে দেশীয় 'বাস'গুলির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এমন কি অনেক বাস-স্বত্বিকারী 'বাস' বেতিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। সামান্য প্রতিনিধিত্ব যাহারা ভীত হইয়া পড়ে 'ব্যবসার' তাহাদের রক্ত নহে। যাহা হউক মাহ-বহা 'বাস'গুলিকে মাল-বহা গাড়ী করিলেও কাজ চলিতে পারে। আজকাল গরুর গাড়ীর ভাড়া যোড়ার গাড়ীর চেয়ে বেশী হইয়াছে। ইতরাং গরুর গাড়ীর পরিবর্তে ১০ন লরী চলিবার খুব ব্যবহার আছে। বিশেষতঃ হাওড়া ষ্টেশন, রঙ্গরাব ঘাট, আরমানী ঘাট, পোট-কমিশনারের জেট প্রভৃতি দাঁটে গাড়োয়ানদের অত্যাচার এত বাড়িয়াছে যে বাসদারী-দিগকে উদ্দেশ্যে ব্যবহারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। লরীতে মাল শীঘ্র আনিবে, ভাড়াভায়ে আনিবে ইতরাং একটু বেশী ভাড়া দিয়াও লোকে গরুর গাড়ীর পরিবর্তে ছোট লরী ভাড়া করিবে। গরুর গাড়ীর পরি-বর্তে ছোট লরী চলিলে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা হইবে যথা (১) বাসপথলি গরুর গাড়ীর যাত্রায়েতে শীঘ্র বিরক্ত হয়—লরীর যাত্রায়েতে স্তত শীঘ্র নষ্ট হইবে না। (২) নিউনিয় গাড়ীর যাত্রা যোয়াত-বর্ত অস্বাভাবিক কমিয়া যাবে। (৩) যথার্থগতি গরুর গাড়ীগুলি যথেষ্ট দুই পার সর্বদাই জুড়িয়া গাড়িয়া থাকে, কিন্তুগতি লরী চলিলে যাত্রা-যাত্রার অনেক সুবিধা হইবে যাত্রা 'জান' হইয়া যাত্রাদারী অনেক কমিয়া যাবে। (৪) হিন্দু-মুসলমানের মাঝাই বলুন আর গুণ্ডার অত্যাচারই বলুন—পনের আনা গুণ্ডাই গাড়োয়ান প্রত্যাভুক্ত-লরী চলিলে এই শ্রেণীর মাটী কমিয়া যাবে। তাছাড়া যথায় সন্দেশ, পুষ্টিভার, পরি-জ্ঞাতা ও যথেষ্ট যন্ত্রণা হইতে দিয়াও গরুর গাড়ীর পরিবর্তে কলিকাতায় ছোট লরী চলান স্বাধীনতার কোন 'বাস'ওলা এদিকে একটু মাথা ঘামান না?





শ্রীকবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### সাইক্লিস্ট

সমীর সারা পথ নানা প্রকার ভাল মন্দ চিন্তা করিতে করিতে কুটীবাভিষুপে ফিরিতেছিল। সে, মনে মনে ভাবিল, মাহুকে বিশ্বাস করা অপেক্ষা অবিশ্বাস করা খুব সোজা কাজ। এই বিশ্বাস না করার মূল্য সকল অর্থ আত্মগোপন করিয়া অশান্তির বীজ বপন করিয়া থাকে। বিশ্বাস করিতে না পারার মত দুর্ভাগ্য বোধ হয় মাহুদের আর বেশী কিছু হইতে পারে না? মহাযাকে তাহার সত্য সত্যই হয় ত অন্তর প্রেম করেন। কিন্তু, আমাদের মনের মধ্যে এই হৃদয় পাভাবিক আচরণটি সন্দেহের মুখোশ আঁটিয়া এমন একটা 'কিছুত-কিম্বাদ' বিন্দী ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে, যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সধন পদ পিছাইয়া পড়ি। সেহেত, ভাল-বাসার পাকের উপর মাহুদের এমন সন্দেহ যে আবহমান-কাল হইতে নিঃসন্দেহে চলিয়া আসিতেছে, মনে করিয়া সমীর যেন নিজের মনের নিকট একটা কৈকিয়ল উপস্থিত করিয়া শক্তির নিশ্বাস ফেলিল।

সেদিন, হরেন্দ্রাব্যুর কথাবার্তা শুনিয়া সমীরের মনের সন্দেহ অনেকখানি দূর হইয়াছিল। ইতিপূর্বে যে দুইদিন হরেন্দ্রাব্যুর বাড়ী হইতে তাহার জ্ঞাণার পাঠাইয়া দিয়াছিল, সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাহা সে

কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে নাই। একজন মহাযার নিকট সে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ না করিলেও তারি লক্ষিত হইয়া আছে। সমীরের মনে হইল, বিশ্বাস অবিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতেছে নিজ নিজ অস্বস্তিত আচরণের স্ভার-অভায়ের উপর। তারপর সন্ধ্যা তার মনে হইল, প্রবোধের পিতা মাতা আমাদের সহিত এমন কোন ব্যবহার করে নাই, যাহার নিমিত্ত ভুলেও তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের উপর কোন মিক নিয়া সন্দেহের ছায়া পড়িবার কারণ হইতে পারে। এবার সমীর স্থির করিল সকল আতঙ্ক ও সন্দেহ হইতেছে, তাহার নিজের মনের দুর্বলতা। সে জোর করিয়া মন হইতে এই সব চিন্তা দূর করিয়া দিল। আত্মিকার নিমন্ত্রণ সে যে কিছুতেই অবহেলা করিতে পারে না এই নিশ্চয় উপনীত হইল। হরেন্দ্রাব্যুর ব্যবহারের উপর তার একটা অস্বস্তিত স্রষ্টা মনের মধ্যে দেখা দিল। হরেন্দ্রাব্যুর কথাবার্তার ভিতর কিছুমান্য দোকানদারী নাই। এমন বিশ্বাসও তাহার হইল।

সমীর যখন ফিরিয়া আসিল তখন মহাযা হাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিল। মহাযাকে তববাহ্য দেখিয়া সমীর জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে মহাযা, চুপ করে বসে কি ভাবছিল?'

"ভাবছি তুই নেমস্তরে খাবি কি না? যদি না যাস ত রাগা চড়াই" বলিয়া মহাযা নিজ কাজে যাবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি যেতে মানা করিস?"

"এই দেখ না, তোরা কথা, তোকে তারা নেমস্তর করলে, আমি তোকে যেতে মানা করব কেন? তোরা মনের কথা কি, তাতে জানি না? যদি না যাস, তা' যাবার কি হ'লে রাখতে হবে তাই বলছি।"

সমীর মুখ হালিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এরই মধ্যে না কারণ দেখলি বল?"

মহাযা বেশ একটু অভিমান সূচক মধুর কণ্ঠে উত্তর করিল, "তোরা যদি সব কাজের কারণ থাকত, তা হ'লে অস্বস্তি জিজ্ঞাসা করতে পারতিস। অনেক সময় তোরা কাজের কারণ আমি খুঁজে পাই; না যে তাই বুঝে উত্তর দেবো।"

বৃদ্ধ সমীর এবার তার নাতনীর মুখের প্রতি স্নেহ-ভরা বড় চোখ সংস্থাপিত করিয়া বলিল, "বুঝেছি, তুই-বোলে যাচ্ছিল। 'আচ্ছা' মহাযা আমার কাজের সত্য কারণ তুই খুঁজে পাস না, বেশ কথা, কিন্তু, যা তুই পাস না, তা কি সবাই পায় না? কারণ না হ'লে কি কোন কাজ হ'তে পারে? অনেক সময় কাজের পাকতে কারণ লুকিয়ে থাকে। সকলের নজরে পড়ে না। পড়তে পারে যে কারণ থাকে না, একথা কোন যুক্তি দিয়ে সত্য্য বল কথা যায় না। এই তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—আমি নেমস্তরে খাব কি, যাব না একথা ভাববার পাকতে কি কারণ নাই? একথা বলতে পারিস?"

মহাযা বলিল, "সে কথা কে অস্বীকার করছে? সে-দিন, তোকে বড় করে খাবার পাঠিয়ে দিলে, তুই কি না, আমাদের, তা ফেলে দিলি?"

সমীর বলিল, "দেখেছিলাম ত, এটাই হ'লো কারণ।

সেদিন, যদি যেতাম, তা'হলে আজ তোরা নেমস্তরে খাব কি খাব না, জিজ্ঞাসা করবার পথ থাকত না। সেদিন, যে কেন খাইনি তা জানিস? নিজেকে অবিশ্বাস করেছিলাম বলে, কাউকে বিশ্বাস করতে পারি নি।"

"এখন কি করি বল?"

"খাব। না গেলে হরেন্দ্রাব্যুর ঘুমিত হবেন। আমি না গেলে, তোরা যে যাওয়া হবে না।"

অকস্মাৎ সমীরের ভিতর যে যুগ্মপ্রায় অতি দীর্ঘ দুর্বল অতীতশ্রুতি লুক্কায়িত ছিল, আজ হরেন্দ্রাব্যুর প্রীতিসন্তান্যমের ভিতর কখন যে, সে সাজা দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, বৃদ্ধ সমীর এতক্ষণ তাহা ধরিতে পারে নাই। তার দীর্ঘ বেদেরজীবনকে উৎখলিত করিয়া তার সত্যিকার বাঙ্গালীজীবন, বাঙ্গালীর ঐকান্তিক জগুর আশ্রমের মধ্যে ধরা দিবার জন্ত ব্যাঘ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শত বৎসরের তরু কাঠুরিয়া যেমন এক মুহূর্তে কাটিয়া ভূমিসংগ করিয়া ফেলে, আজ তেমনি সমীরের হৃদয় দিনের বেদে জীবনকে ঘুরে গেলিয়া ফেলিয়া তার জন্মগত বাঙ্গালী-জীবন, জ্ঞানিত ও সংস্কার আত্মপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত সর্বদিক হইতে বিস্তারী হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার তার মনে হইতেছিল—জীবনভরা প্রতারণ-মুখোশ ঘুরে নিষ্কণ্ড করিয়া, অভিশপ্ত-জীবনের প্রাশস্তিত করিবে মহাযার বিনিময়ে। আবার তখনই তার মনের দুয়ারের কপাটে দাঁড়া মাহায়া সধন বেদের ভীষণ চাঁচকারে প্রতিহত হইলেও, তাহাদের রক্তচক্ষু সমীরের নয়ন সুরবে বধ খুঁকিয়া জলিয়া উঠিল। সে যেন ভনিতো পাইল "সাধবাসা সমীর! সাধবাসা!"

সে কথা উত্তরের প্রতিবাদ করিয়া সমীর বলিয়া উঠিল, "আমি মরবে সেও খাবার তবু মহাযাকে কোন মতে বেধে করতে পারব না। তোরা জোর করে আমাকে বেধে করেছিল বলে, আমার অন্তর হ'তে, আমার রক্ত মাংস অস্তিত্ব হ'তে আমার জন্মগত অধিকার বিদূষ করতে পারিসনি—সে শক্তি তোদের কই? আমি বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর সর্বদিক করব না!"

মহাযা দেখিল তার দাঁড় কি একটা সতর্ক চিন্তার মধ্যে পড়িয়াছে। সমীর উঠিয়া দাঁড়াইল। কত কি ভাবিল। তারপর মহাযাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখনও বসে আছিস যে?"

"কি করব বল? তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস। আচ্ছা দাও, আমরা যদি নেমস্তরে না খাই, তাতে কার কি এসে যাবে?"



একবার সমীর অত্যন্ত বিশ্বাস প্রকাশ করে উত্তর করিল, “কি বলিল মহাশয় যদি না ঘাই। স্বাক্ষর কি এসে থাকবে। অনেকেই অনেক এসে যাবে। তোর কাছে, আমার কাছে, তাদের কাছে। না, না, তা হইতে পারে না। আমি যাব, নিশ্চয় যাব, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কেন যাব না? আমি ত আর বেড়ে নই, যে যেকোন মনে তেবে সচ্ছিত হইবে থাকবে।” তারপর সে কি মনে ভাবিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর আপন আপন বলিয়া উঠিল, “বহুদিনের সংসারহীন, কষ্ট-প্রত্যনোন্মত্ত বাড়ী হইলেও, সে যে তার নিজের বাড়ী তার স্বামী মাথা ওঁড়ে থাকার অধিকার হইতে নিজেকে কেঁচু বঞ্চিত করতে প্রস্তুত নয়।” সমীরের মুখের উপর একটা পবিত্র আনন্দের বিবল স্রোতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মহাশয় সমীরের অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ও ভীত হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত রুদ্ধপন্থে থাকিল, “নাহ? হুই বললি, হুই বেড়ে ন’। এ সব কি কথা বলিলি?”

“মহাশয়, আমার কাছে আর বিলি। আমি আজ আমার মনের নান্দা কখাই বলিছে। তোর বেহে স্বাক্ষর আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে নিলেছে রে।” সমীর আতঙ্কিত হইয়া প্রতীতি, আমার বিস্ময়। এমনকি কই গাড়ী এলো না? মহাশয় বলিল, “না, নাহু তোর কথা ঠিক নয়। আমার মনে হচ্ছে, আজ আমার বিস্ময়। তোর প্রতীতি। গাড়ী নাহি এলো। আমার হেঁটেই যাব এখন।” সমীর চিন্তিত হইয়া গিয়া। “মহাশয়, মহাশয় দিদি আজ আমার বন্ধ বহনে, বহুদিনের অনেক আকাঙ্ক্ষা প্রবল আনন্দ বয়ে এনেছে রে। আজ তোর অস্বস্তি বয়ে যাবা চতুর্দিক দিয়ে বেয়ে জীবনের গলা টিপে মেয়ে কেলছে। সত্যিকার সন্ধান, সত্যিকার পথ, সত্যিকার মাথেরে ধরবারে সমাবেশ কর আমাদের মুক্তি যোবার জড়-উদ্যম হইবে, অপেক্ষা করছে। দেবী করলে চলবে না। নিয়ে আয় আজ।

আমার সমস্ত সাজ সজ্জা। নিয়ে আয় আবালোর বেদের সমস্ত সম্পত্তি। নিয়ে আয় আমার সুখী। কিসের বিচার হবে। বিচার হবে। চুই করে নেওয়া শান্তি, সমীর আজ মাথা পেতে নিতে কিছুকিছু আপত্তি করবে না বা বিচলিত হবে না।”

মহাশয় ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “নাহু তুই ও সব কি কথা বলিলি? কিসের বিচার হবে নাহ? তোর কথা শুনে আমার যে ভয় করছে। চল আমরা এখন থেকে গালিয়ে যাই।”

সমীর এবার হো! হো! করিয়া একটা বিকট হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, “কিসের ভয়? বিচার হবে রে, বিচার হবে। তার সূচনা হয়েছে। বেড়ে বাড়তি স্বার্থপরতার, নিকৃষ্টতার বিচার হবে। বিচার না হয়ে কি যেতে পারে? ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যস্থতিক দীর্ঘরাস, সারা বিশ্বের বাতাস জুড়ে অস্বস্তি অভিযোগের মত এতদিন শান্তির প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার কি কোন প্রতিকার নাই। তার বিচার হবার দিন যুগিয়ে এসেছে—হবে না! অনবীর সংঘবন্ধ খণ্ডিত করে যদি কেহ তার মননের আলো ছিনিয়ে নেয়, তার নিকৃষ্ট স্বার্থের কাতর বোদন কি তার শাস্তি না নিয়ে নিবৃত্ত হতে পারে? সেই বিচারের দিন এতদিন পরে এগিয়ে এসেছে। কোথায় গালিয়ে পরিভ্রমণ গার রল। বিশ্বের মধ্যে এমন স্থান এখনই নাই, যেখানে ব্যক্তিগত বৈদ্যনা অশ্রু বজার মতো ছুটিতে পারে না। চল মহাশয় আজ আমার বিচার দেখব চমক। দেবী করিলি না। বলিয়া সমীর উদ্যম দাঁড়াইল।

মহাশয় নিকট সমীরের আচরণ একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতেছিল। সে তার কথায় যেন আর কোন আপত্তি করিতে সাহস পাইল না। মহাশয় দীর্ঘায় উঠিয়া হুটীরে ভিতর হইতে সমীরের বজাি আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিল।

সমীর নিজেই অনেকদিন পরে বেদের ভূষণে ভূষিত করিল। তারপর বলিল “মহাশয় আমার তীর ধখ কৈ?”

মহাশয় ধর্ম্মপা আনিয়া দিল—সমীর দৃঢ়তারে তাহা

যথাস্থানে সরিবেশ করিল। পরে মুষ্টিটি বৃদ্ধবেশে খুলাইয়া লইল। বৃদ্ধবেশেও তাহাকে অত্যন্ত স্বন্দর দেখাইতেছিল। তারপর মহারথ শ্বের দিকে চাহিয়া একটা গভীর চাপা হাসি হাসিয়া বলিল,—“অনেকদিন এমন করে শাস্তি রে—আজ বড় আনন্দের দিন। আজ কি যে করব তাত্তিক করতে পারছি না। তুই শীগগির কাপড় ছেড়ে আয়—আজ সমীর তার ধন-দৌলত নিজে সঙ্গে করে দরবারে যাবে।”

মহাশয় জিজ্ঞাসা করিল “দাত্ত তোর মনের কথা কি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে খুলে বল?”

“বল মহাশয় বল! ভগবান যখন বলবার জন্য বৃদ্ধকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে বলব বৈকি। সে তোর কাছে নয়; বিশ্বগতের সভ্যতার সম্মুখে। যেখানে হুবিচার অপেক্ষা করছে।

এই সময় অবনী গরুর গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাশয় তার দাড়কে গাড়ীতে উঠিবার জন্য অনেক-বার অস্বরোধ করিল। সমীর কিছুতেই গাড়ীতে উঠিল না। সে ও অবনী গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কেহ কাহারও সহিত অনেক দূর পর্যন্ত কোনরূপ কথা বার্তা বলিল না। সমীর মাঝে মাঝে অবনীকে দৃষ্টির অঙ্কিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল আর মনে মনে বোধ হয় কিসের সহিত মিলাইয়া আশ্চর্য হইয়া পড়িতেছিল। সমীরের মনের মধ্যে বেদের বৈশিষ্ট্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মতো তখন পর্যন্ত করিতেছিল। সে দেখিল, অবনী রোজের উত্তাপে অত্যন্ত ঘামিয়া উঠিয়াছে, এবং ক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম কি অবনী বাবু?”

সমীরের প্রশ্নে অবনী চমকিয়া উঠিল এবং বলিল, “আমাকে বাবু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমারই নাম অবনী।”

সমীর বলিল, “আপনি বড় ঘামিয়া গিয়াছেন। বড় কড়া যোব। আপনাদের রোমে ঢালা অভ্যাস নাই কি না? একটা কাঁধ কখন—আপনি গাড়ীর ভিতরে যান। অশ্রুণ কষ্ট পাবার প্রয়োজন কি?” বলিয়া সমীর অবনীকে মুখের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

“ধাক। আমরা ত এসে পড়ছি।”

“আপনি দেখিছ মহাশয় নিমিত্ত সন্ধ্যা বোধ করছেন। মহাশয় আপনার বোন ছাড়া আর কিছু নয়? পাখাড়ে দেশের রোধ লগ্নে অস্থির করতে পারে। এতে কিছু মনে করবার নাই।”

এই সময় মহাশয় গাড়ীর ভিতর হইতে বলিল “অবনী বাবু গাড়ীর মধ্যে আইন। আমার কোন কষ্ট হবে না।” বলিয়া মহাশয় পাড়োয়ানকে গাড়ী ধামাইতে বলিল।

অবনী অপর্যাপ্ত গাড়ীর মধ্যে গিয়া বলিল। মহাশয় বলিল, “অত সচ্ছিত হইছেন কেন অবনী বাবু?—বোনের কাছে ভায়ে এতখানি সন্ধ্যা কোনদিক দিয়ে শোভা পায় না।

মহারথ কথা শুনিয়া অবনীকে বুকের ভিতর একটা অশ্রু আনন্দের রসগন্ধা প্রবাহিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা হরেন্দ্রাবারু বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। হরেন্দ্রাবারু ঘরের নিকট তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)





# রঙ্গালয়

## ষ্টারে শ্রীকৃষ্ণ

(অভিনয় চিত্র)



দ্রোণ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার।



ভূধ্যোদন—শ্রীমহোদ্রা চৌধুরী।

নাট্যমন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস রদমণ্টটিকে হৃৎপঙ্ক্ত করিয়া—রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর ভাগ স্বরঞ্জিত করিয়া—নাট্যমন্দির তাহার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছে, দর্শকবৃন্দের আরাগমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া। প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশদ্বারগুলি বহুবর্ণে বিচিত্রিত পরায় শোভিত করা হইয়াছে। আসনশ্রেণীর মধ্যবর্তী ব্যবধান পথ বিস্তৃত রাখিয়া দর্শকবৃন্দের যাতায়াতের পথ বেশ হৃদয় করা হইয়াছে।

ভাড়াটী মহাশয়ের অভিনীত বিসর্জন কেবল রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নহে উপরন্তু ইহার সহিত 'রাজবির' আখ্যান ভাগের কিছু সংমিশ্রণ করিয়া নাটকখানিকে গাধারণের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং মনে হয় সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

বিসর্জনে মাত্র দুইখানি দৃষ্টপট—একখানি মন্দির অপরখানি রাজপ্রাসাদের কক্ষ। অনাড়ম্বর হইলেও পট দুইখানি হৃৎকরুণে অঙ্কিত এবং আলোক নিষ্কপের কৌশলে নমনক তৃপ্তি দিতে সক্ষম—তবে ঝাংঝা 'সিনারী' দৈবিত্তে উৎসুক তাঁহার কতদূর খুসী হইবেন তাহা বলা বড় কঠিন। মন্দিরসোপানে শোণিত রেখায় অস্তিত্ব তুলিকা সাহায্যে সম্পন্ন না করিয়া আলোক নিষ্কপ কৌশলে প্রদর্শিত হওয়ায় উহা অতীব মনোজ হইয়াছিল। শেষ দৃষ্টে জল ঝড়ে ও বিদ্যুত বিকাশের সঙ্গে বজ্রাঘাতের স্তব্ধ স্তনাইলে আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হয়।

রম্যপতির ভূমিকায় ভাড়াটী মহাশয়ের অভিনয় ভাল হইলেও তাঁহাকে ভাল মানায় নাই—রক্তাধরধারী, কারপ-পায়ী শক্তের অশুশুণ্ধহীন মুখমণ্ডলে তাহার কঠোরতা ভাল ফুটে নাই—আমাদের মনে হয় দাড়ি গোঁফের সাহায্য লইলে ভাড়াটী মহাশয়কে মানাইত ভাল। তাঁহার শেষ দৃষ্টের অভিনয় সত্যই স্বরভেদী হইয়াছিল।

অভিনয় প্রশংসার্হ। অন্য ইহার শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়া উত্তর কালে যে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ইহাই আমাদের মনে হইয়াছিল। ভাড়াটী মহাশয়ের শিক। কৌশলে আজ তিনি বেশ শক্তি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাঁহা আশা ও আনন্দপ্রদ। জয়সিংহ ও রাজপুত্র—তাঁহার গুণে ইচ্ছা ও গুণবৈখ্য বিকাশ হইলে রূপসজ্জা সম্বত হইত বলিয়া মনে হয়।

নগরায়, নয়নরায়, চাঁদপাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলির অভিনয়ও বেশ কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। জনতার মধ্যে গোপাললাস বাবুর হাতেরসের অভিনয়ে বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও উহা উপভোগ্য হইয়াছিল। মনোরঞ্জন বাবুর গোবিন্দ মাণিক্য আমাদের তেমন ভাল লাগে নাই।

শ্রীমতী চারুশীলাকে রাণীর মত না দেখাইলেও অভিনয়ে তিনি রাজ্ঞী জনোচিত মৃদা রাখিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার কয়েকটা ভাষাবিভ্যক্তি বেশ মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।

অপর্ণার অভিনয় তত হৃদি জনক বা আশাগ্রহ বলিয়া মনে হইল না। গানগুলির স্বর ভাল হইলেও অভিনয়ে তাহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পায়েন নাই বলিয়া বোধ হইল।

অম্ব গায়ক রুকমন্দের দ্বিতীয় গানখানি বেশ ভাল লাগিল। জয়সিংহের যত্নায় অব্যবহিত পরের গানখানি না থাকিলে বোধ হয় ক্ষতি হইত না। শিশু-ক্রমের কণ্ঠে সজ্জ হইলে একখানি গান দিলে বোধ হয় অভিনয় আরও উজ্জল হইয়া উঠিত। ভাড়াটী সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত অভিনয়ে শিশির বাবুর নিজের অভিনয়ের সহিত অজ্ঞাত অভিনেতৃ বর্ণের অভিনয়ের যে বিষম একটা পার্থক্য লক্ষিত হয় বর্তমান নাটকে তাহা বোধ হয় নাই।





হইবে। ভীষ্ম ও দ্রাক্ষণের ভূমিকায় পূজারী শিশির  
স্বামীর দেখা দিবেন—বৃহল্লাকে সাজিবেন!

মিঃ থিয়েটারেও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকের  
অভিনয় হইবে। নির্মলেন্দুনাথ 'বৃহল্লা'র ভূমিকায় দেখা  
দিবেন। দ্বৈপায়ক ও হস্তুরসিক শ্রীযুক্ত কালীচরণ  
বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ সপ্তদ্বারের যোগদান করিয়াছেন 'জয়ন্তী'  
ও 'ঈদ্র' অভিনীত হইবে বলিয়া মনে হয়।

মিত্রাভী সপ্তদ্বার বসরাজ অমৃতলালের 'ব্যাপিকা'—

## সনেট

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস বি-এল

চতুর্দশ পাণ্ডুর এক ফোঁটা ফুল  
পুতির আশ্রয় গছে; বাসে তুহুতর  
আতরের বিদ্যুৎ বেন; রসে ভরপুর  
নিটোল আঁধার বলি' ক'হু হয় তুল!  
স্বপ্ন ঝিলকের মাঝে মুক্তা টুল টুল,  
একটু হুপু ভরা সৌরভে প্রচুর;  
হুটাক গোপার টিপ বালিকা বধূ;

দুল দুল হুশোভন রতিকর্ণ দুল!  
হে সনেট, হে মোহিনী চতুর্দশী বালা,  
কোহিনুর তুমি কাব্যসুন্দরীর ফুল!  
অনিম্য তোমার রূপে নাহি ত্রীজা আলা,  
বিশোয়ার সিং প্রেম—সাধা মন তুলে।  
বধ ভারতীর ভাল করি' আছ আলা  
—মোহন সিন্দুর-রাগ সিত সিঁথি মূলে!



বিতীয় বর্ষ ]

২৫শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩০, ইং ১০ই জুলাই ১৯২৬

[ ৪৭শ সংখ্যা ]

## অনাহুত

বন্দে আলী মিয়া

তোমায় যেদিন হৃদ্ধিতে পেলাম অন্ধকারের বৃকে  
সদ্বীর্ঘনের দুখে।  
সেই ফাগুনের বারি-পাতে যৌবনের গহন রাতে  
নীর হারানো ক্ষুদ্র ব্যথার ধরা দিলেম তোমার হাতে।  
তরুণ হিয়ার নয়ম ভীতি এই জীবনের সোহাগে স্রীতি  
যার তরে হায় ক্ষুণ্ণিগামায় বাথলে প্রিয়া লুকে;  
দেখেছিলাম সেদিন তোমার জালিম হুঁড়ির বৃকে।  
চুলের তোমার নয় এ কাঁটা কমলাকাঁটা মনের  
শাখক দাহনের।

এই কাঁটারি আঘাত লেগে যে বেদনা উঠল জেগে  
আজ তাহারে বকে চাপি কাঁটাই নিশীথ তোমায় মেগে;  
চুলের রঙে সিল্ক উরাস ফাগুনের এ দিক-ভোলা বাস  
হুমার জীবন স্বপ্ন হতে একলা ঘরে ডাক্কে ফেস্।  
বৃকে আমার বিধলো এসে তোমায় কাঁটা মনের।  
এই অনাহুত আজকে এলো—এলো তোমার ধোরে  
আপসা উদাস ভোরে।

চোতের ডাকে শুকনো পাতা বিদায় নিলে হুইয়ে মাথা  
সবুজপরি হাওয়ায় নাচে বাজায় প্রাণের গাথা।  
বসন্তের এ হিম্ম শশিরি ঘোমটা ভুলে রঙিন শাড়ী  
নিশীথ জেগে এলাম হেথায় তপ্ত নয়ম লোরে—  
অনাহুত এলাম আমি তোমার ঘরের দোরে।



## নব কথামালা

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ

### ১। দীপ ও ছায়া

ঘরের মধ্যে দীপ জলিতেছিল। তাহার তলে পুঞ্জীভূত ছায়া বেধিয়া প্রাণী বলিল "আমি ঘরের আধার ঘুচাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে গেলাম আর আধার আসিয়া আমার তলে আশ্রয় হইল।" তখন ছায়া উত্তরে বলিল, "দেখ আমাদের উভয়ের সখ্যত্ব স্বয়ং হৃদয়ের মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যামিনীর আধার আছে বলিয়াই দিনমণির এত আধার। আমাকে ত্যাগিয়া করিও না। আমি না থাকিলে তোমার গৌরব থাকিবে না।

### ২। গিনি ও পরদা

গিনি রাজ্যে থাকিয়া পরদাকে ভৎসনা করিয়া বলিল "প্রাতি তুলনায় তুমি অতি হীন। জগতে তোমার প্রতিষ্ঠা নাই। বর্ণাদিতে তোমার তাদৃশ গৌরব নাই।" ইহাতে পরদা উত্তর করিল "ওহে স্ববর্ণখণ্ড! সত্য বটে তোমার তুলনায় আমার ব্যাতি প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু যে পরদায়! আমার সমষ্টি না হইলে তোমার মুখ কেই দৈগ্ধিতে পায় না। তোমাকে পাইবার জন্য লোকে প্রথমে আমাকেই সমস্ত রক্ষা করে।

### ৩। কাক ও পিক

আম্রশাখার কাক ও পিক বসিয়াছিল। পিককে দেখিয়া কাক বলিল, "দেখ তোমার বর্ণ ও আকৃতি আমার মত। বাল্যে আমাদের গোষ্ঠীভূত ছিল। এমন পৃথক হইলে কেন? পিক মুহূর্ত ভোজন করিতেছিল। কোনও উত্তর না দিয়া কুক্কর করিয়া উঠিল। লজ্জায় বাহন বিটপ ত্যাগ করিয়া দূরে শাখোট বৃক্ষে আশ্রয় লইল।

### ৪। ভিক্ষু ও ব্যবহারাজীব

এক চিকিৎসকের এক ব্যবহারাজীব বন্ধু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহুবিধ পথে ব্যবহারাজীব চিকিৎসকের বাটতে উপস্থিত হন ও বন্ধুর অহুরোধে তথায় কিছুকাল বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে সেই স্থানে মহামারীর ভীষণ প্রাচুর্য্য হওয়ায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইতে লাগিল। এই আধৈবিক ঘটনার চিকিৎসককে নিরপেক্ষ দেখিয়া ব্যবহারাজীব কহিলেন "ভাই তুমি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষরূপে ব্যাংগম তুমি কেন গীড়াশাস্ত্রের নিমিত্ত সচেষ্ট হও না?" তাহাতে চিকিৎসক উত্তর করিল, "ভাই তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য এবং ভ্রাতৃমুখোদিত বটে কিন্তু সে কারণে তুমি প্রতিবেশীর কলহ নিবারণে পরাধীন হই কার্যেই আমিও এ পক্ষে নিরপেক্ষ।"

### ৫। চাতক ও চকোয়

চন্দ্রের নিকট চকোয়কে উদ্ভিষ্ট দেখিয়া চাতক বলিল, "ভাই তুমিই আমাদের মধ্যে যথার্থ স্থানী। তোমার বাস চন্দ্রমণ্ডলে তুমি জ্যোৎস্না পান কর, স্থগীত চন্দ্রকিরণে তোমার নিত্যস্থান হয়। জুয়ের পৃথিবীতে তুমি কখনও পদার্পণ কর না। এতদ্ব্যতিরিক্ত তোমার কর্ণে পৌছিতে পারে না। আমি যদিও মেঘের কোলে থাকি কিন্তু রজনীতে সেই মাছের স্বতীরের নিম্নে আশ্রয় লইতে হয়। আমি নিত্য আকাশে মেঘ থাকে না। আর আমার স্থা তৃষ্ণাও কখন মিটে না। ইহাতে চকোয় উত্তর করিল "ভাই চাতক তুমি যাহা বলিলে তাহা কতক পরিমাণে সত্য বটে। আমার ঐশ্বর্য্য কবি কল্পনায় ধরে না। কিন্তু গগনে নিত্য চন্দ্রোদয় কোথা? আধারের রাতে আমার যে কত কষ্ট, কত দুঃখ তাহা কে জানিবে?"

লোকে শুধু আমার ২১ দিনের জ্বরের কথা লইয়াই বর্ণনা করে। তোমা অপেক্ষা আমাকে অধিক দিন উপবাসী থাকিতে হয়। ভাই লোকে যাগাদের স্থণী বলিয়া ইড়া করে তাহারা কি যথার্থই স্থণী?"

### ৬। কুটীর ও অট্টালিকা

একটি স্বরূপ গৌরবের নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। সন্মতি সম্পন্ন প্রতিবেশীর নিকট দরিত্র সহ্যই হীনভাবে অবস্থান করে। কুটীরও সেইভাবে থাকিত। একদিন দীপালোকে উদ্ভাসিত, আনন্দে মুগ্ধবর্ত, অট্টালিকা আধারে মগ্ন কুটীরকে সন্ধান করিয়া বলিল, "দেখ কুটীর! আমার নিকটে থাকা আর তোমার শোভা পায় না। তুমি আমার পার্শ্বে আছ বলিয়া আমার বড় লজ্জা হয়। আর যে সকল সম্রাট লোক আমার নিকট আইসে তাহারাও তোমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। স্বতরাং তোমার স্থানান্তরে গমন করা কর্তব্য।" ইহাতে কুটীর বিনীত ভাবে উত্তর করিল "ওহে গৌরব—

বিত অট্টালিকা, এই সামান্য ক্ষুদ্র কুটীরে থাকিয়াই মাছ প্রথমে প্রাণধারণে যত্ন দেখে।"

৭। অশ্ব ও বলদ  
একটি সুসজ্জিত অশ্ব বায়বেগে এক ধনীর বিপুল শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। অশ্বের হৃদয় সাজসজ্জা ও মনোরম স্তম্ভগতি সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল। সেই শকটের পার্শ্বে দিয়া একখানি গোয়ান দীরে দীরে চলিতেছিল। অশ্বপথের দ্বিপ্রস্থের পশ্চাদ্ধিয়া গোয়ান-বাহী বলদ যেন লজ্জিত হইল। সেখান শকট খামিয়া গেলে অশ্বকে বলদ লজ্জার সহিত বলিল, "ভাই তোমার অবস্থা আমাপেক্ষা অনেক পরিমাণে ভাল। তুমি প্রশস্ত রাজপথে কেমন হৃদয় শকট টানিয়া থাক, আর আমাকে মাঠের মধ্যে ধূলা কাবার ভিতর এই শ্রীহীন গাড়ী টানিতে হয়। তবন অশ্ব বলদের অপ্রতিভতা দেখিয়া বলিল, "ভাই তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ। আমাদের দুইজনের অবস্থাই সমান। ত্রুটি হইলে দুইজনেরই পৃষ্ঠে কশাঘাত আসিয়া পড়ে।"

## আধার

শ্রীমূণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(স্ব—আহা কি মধুর নিশি ইত্যাদি)

আহা কি আধার নিশি  
(যেন) কালশশী দাঁতে মিশি দিয়ে হাসে যায়।  
আকাশে তেজি বাপ  
কে যেন কালীর ছাপ দিয়েছে কাকের গায়।  
পাতাল এনেছে আর সাধের ভরস্ব  
চোলে দেখে ভুয়ো মাথা অধ  
পবন বাজবে কুলো, গুণ্ডায় পথের ধূলা, পাছে ভুলে কাণা হয়ে যায়  
(যেন) কালশশী দাঁতে মিশি দিয়ে হাসে যায়।  
এস যে কোথা কে দেখে হে চেয়ে হে নহিলে সময় বয়ে যায়  
দেখ হে ডাবুক কবি  
চক্রের আঁক ছবি  
ফটোগ্রাফারেতে সবি গায়ে কায়োমার।





## নিয়তির লেখা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

১

পাঞ্জাব মেল ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই। সাড়ে আটটা বাজিতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। যাত্রীপূর্ণ ট্রেন সপক্ষে বুক ফুলাইয়া নিজের অসীম বীরত্বের পরিচয় সকলকে প্রদান করিতেছে, এমন সময় নির্ধল খুব ক্ষতবেগে আসিয়া একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইয়া উঠিল। তাহার ট্রাকট লইয়া গিছেন একটা কুলিও আসিয়া পৌছিল, সেই কুলির মাথা হইতে ট্রাকট লইয়া, তাহার বাহা পাওনা, তাহা মিটাইয়া দিয়া হাঙ্ক ছাড়িয়া বাটিল।

ট্রেনের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিতে আর তিন মিনিট সময় আছে, সকলেই ব্যস্ততার সহিত ট্রেন ধরিবার জন্ত উৎসাহী ভাবে ছুটিয়াছে। এমন সময় ট্রেনের ঘণ্টা বাজাইবার কুলি তাহার ঘণ্টা ধিবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া ঢং ঢং করিয়া সে ঘণ্টা বাজাইয়া মনিবের কার্য বজায় করিয়া গেল। যাত্রীপূর্ণ অনেকই মূগ্ধ বাজাইয়া ইন্ধনের দিকে চাহিয়া আছে, গার্ড সাহেব ঘড়ি দেখিয়া বৃষ্টির সময় টিক হইয়াছে। তখন সে তাহার কক্ষেচিকি ছিটী হাতে লইয়া নাড়িতে লাগিল ও বাঁশী বাজাইয়া ড্রাই-ভারকে সতর্ক করিয়া দিল।

গাড়ী স্টার্টকর্ম ছাড়াইয়া হু হু শব্দ করিতে করিতে

চলিয়া গেল। নির্ধল কামরার ভিতরে তাহার জামাটা ঘুমায়া রাখিয়া, একটা ববরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল। সেই কামরার আর একটা ভল্লোক ও দুইটা জীলোক ছিল, তাহারা পূর্বে হইতে মিট রিকার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল। নির্ধল কান্ধীর টিকিট লইয়াছে। যথা সময়ে ট্রেন বর্ধমান আসিয়া পৌছিল, নির্ধল জানালা হইতে মুগ্ধ বাজাইয়া দেখিল, এটা বর্ধমান ট্রেন, তখন তাহার কিছু মিহিদানা কিনিতে ইচ্ছা হইল। গাড়ী সেখানে প্রায় আশ ঘণ্টা দাঁড়ায়, নির্ধল তাহার জামাটা গায়ে দিয়া নামিবার সময় পূর্বোক্ত ভল্লোকটির প্রতি চাহিয়া বলিল, যদি কিছু মনে না করেন.....আমার ট্রাকট অল্পগ্রহ ক'রে.....এক কথা, বলিয়া পূর্বোক্ত ভল্লোকটি নির্ধলকে বলিল, 'আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে বেতে পারেন।

নির্ধল ভরসা পাইয়া মিহিদানার দোকান হইতে কিছু মিহিদানা ও সীতাভোগ কিনিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল। ট্রেন ছাড়িতে তখনও প্রায় দশ মিনিট বাকি, নির্ধল আসিয়া পূর্বোক্ত ভল্লোকটিকে ব্যাবারীতে ধস্তাবাদ জানাইল।

পূর্বোক্ত ভল্লোকটি নির্ধলকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কতদূর যাবেন?

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা]

নিয়তির লেখা

১৫৪৯

নির্ধল তখন পানিপাড়ের আসার অগ্রমনস্ক ছিল!

গু:.....আমায় ব'লছেন?

হ্যাঁ আপনি কতদূর?

আজ্ঞে আমি আপাততঃ কান্ধী যাব, তারপর ভগবান কি করেন, ব'লতে পারি না।

বেশ, বেশ, ভালই হয়েছে, আপনিও দেখছি আমা-  
দের সঙ্গী হ'য়ে পড়েছেন, তা মহাশয়ের নামটা কি?

আজ্ঞে আমার নাম, শ্রীনিধলকুমার বসু।

আপনার?—

আমার নাম, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে, গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইল, ট্রেন বর্ধমান ট্রেন অভিক্রম করিয়া হু হু শব্দে যুব যুব ভাগে যাবিৎ হইল। কথাবার্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাড়িয়া গিয়াছিল। হরেন্দ্র তাহার মাতাকে ও স্ত্রীকে একটু ভইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল, ও নিজেও একটু ক্লান্ত-ভাব অহতব করিতেছিল।

তিনি নির্ধলকে বলিলেন, "আপনি শোবেন নাকি?"

নির্ধল বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ,—"আমারও বড় ঘুম পাচ্ছে একটু শোব মনে ক'ছি।"

এই বলিয়া নির্ধল উপরের গাটাতনের উপর গিয়া উঠিল, নিজের শয্যা বিছাইল, চক্ষু মুদ্রিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না, মনে শঙ্কর চিন্তা, তাহার উপর আবার পার্শ্বের কামরাতে একটা হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী, পঞ্চমে ছর চড়াইয়া গান ধরিয়াছে—

এ পিয়া পিয়া মেরি রানগো তেরী ছনমান,

তেরা আঁখিয়া রে মেরি জানু দেখোতা হ' পরিতান।

২

রাজিতি কোন প্রকারে নির্ধল কাটাওয়া দিল, ভোরে যখন মেঘোদ্রাশ্রীল করিল, তখন বজ্রার ট্রেনে গাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছে। বজ্রার ছাড়াইলে সে বাঙ্গালী বিহারের সীমা ছাড়াইবে। বজ্রার পরই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ আরম্ভ, বজ্রারে নির্ধল হাত মুখ ধুইয়া লইল, একটু চা'ও টেশনে খাইল, গাড়ী বিনা ট্রেনে ছাড়াইল,

বজ্রার হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত যে কয়টা ট্রেন দেখা দিল, নরুন্ডে যেন ওয়েসিং।

ক্রমে ছর হইতে মোগলসরাই ট্রেনের প্যাটকর্ম দেখা দিল, যথাক্রমে গাড়ী মোগলসরাই প্যাটকর্মে আসিয়া পৌছিল। যাহারা কান্ধী যাইবে, তাহাদের এইখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে, নির্ধল তাহার বিজ্ঞান-পত্র সমস্ত বাঁধিয়া টিক করিয়া রাখিয়াছিল, নির্ধল দেখিল, ট্রেনে মহা উত্তেজনা, কুলিয়া ঘু-ঘু করিয়া গাড়ী হইতে মাল বাহির করিয়া অপর গাড়ীতে তুলিতেছে, সাহেব-মেয়েরা যুগল-যুগিতে গাড়ী হইতে নামিয়া প্রান্তরায় করিবার জন্ত কেন্দ্রনায়ের হোটেল ছুটিয়াছেন, কাহারও সহিত কাহারও কথাবার্তা নাই।

ট্রেনের টিকিটখরে যুব জনতা, কেহ হাঁকিতেছে, বাব এক টিকাস হামরা "মিজ্জাপুর" কেহ বলিতেছে, সে, টিকাস মেয়া বাবু ইলাহাবাদ, আর ট্রেনের হালুই-কর হাতে রেল-কোম্পানীর প্রদত্ত টিনের টিকিট মারিয়া ডাকিতেছে, পুরী জিলাপী বারু.....মুসলমান ফিরিওয়াল "কচী কাবার" চাহিয়ে সাব.....বহুত বাড়িয়া হার, ট্রেনে কেবল গোলমাল, কেবল হুজাড়াহী।

নির্ধল তাহার সেই ট্রাকট নামাইয়া একটা কুলির মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল, "এই কান্ধী নাকো কোন ট্রেন হায়?"

কুলী বলিল "খোড়া দেবী হায় বাবু, আব বইট্রিয়ে, হাম সব টিক করু দেগা।" যাইবার সময় নির্ধল হরেন্দ্র বাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, "জাচ্ছা, তা'লে এখন আসি, কিছু ম'নে ক'রবেন না, নমস্কার।"

হ্যাঁ আপনারা কোথায় থাকবেন, মনস্ক'রেছেন?  
হরেন্দ্র বাবু বলিল, "আমরা এখন আপাততঃ দশাশমেঘ ঘাটের কাছেই থাকবো।"

আপনি?

আমি এখন আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠবো মনে ক'রেছি।

আচ্ছা, মনস্কার, বলিয়া নির্ধল তাহার কুলিকে লইয়া কান্ধীর গাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

এইখানে ট্রেনের গার্ড ও ড্রাইভার সমস্ত বদলাইয়া



গেল। যথা সময়ে গার্ড সাহেব তাহার সুবক্তবর্ণের নিশানটী হাতে করিয়া ডাইভারকে ইঙ্গিত করিল, ডাইভার গাড়ী ছাড়িয়া দিল, নির্খল জানানো হইতে মুখ বাহির করিয়া ট্রেনের গতিবিধি দেখিতেছিল, ও মনে মনে ক্রি যেন একটা ভাবিতেছিল। যখন গাড়ী বীর-গতিতে ডকরিন দীক্ষের উপর পৌছিল, তখন প্রভাত-সূর্য স্বৰ্ণবর্ণরমণিত অর্জুজ কানীর সৌন্দর্য দেখিয়া নির্খল মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে উদ্দেশ করিয়া একটি প্রণাম করিল।

গাড়ীর মধ্য হইতে কেহ কেহ “হুয় বাবা বিশ্বনাথের জয় বলিয়া উঠিল।” অর্জুজরমণের বক বায়ানসী, আহা! সৌমণ্ডিত সে স্বন্দর শোভায় মনঃপ্রাণ ভুলিয়া যায়। নন্দিনের পার্শ্বে নন্দিন, সৌধের পার্শ্বে সৌধ, বিপনীর পার্শ্বে বিপনী, ছত্দের পর ছত, ঘাট-শ্রেণী অতুলিত তীরদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের পাশাপাশি ক্রমশঃ জাহ্নবী সঙ্গিলে নিমজ্জিত করিয়াছে। সিদ্ধিয়াঘাট, পাড়ুঘাট, দশাশমেঘ ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, পাগুঘোচন ঘাট, কত ঘাটেরই বা নাম করিব।

৩

গাড়ী ক্রমশঃ কাশী টেনসে আসিয়া পৌছিল। নির্খল জিনিষপত্রগুলি নামাইবার জন্ত একজন কুলিকে ডাকিতে লাগিল, এই কুলি,.....এই কুলি..... যথা সময়ে একটা কুলি আসিয়া তাহার জিনিষপত্রগুলি গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “স্বাৰ কাঁহা যাগেগা বাবু?”

নির্খল বলিল, “এই গোখুরী খোড়ে যাব বাবা, কত নিবি।”

কুলি বলিল, “হুয়, আনা লেগা বাবু।” নির্খল তখন কুলির সাথার ঠাক ও বিছানাদাী ভুলিয়া বিয়া গেই হইতে রাতায় বাহিরাই হইল।

তখন সবেমাত্র দশটা বাজিয়াছে, যতীন দ্বান করিয়া গামছাটা মাথায় দিয়া বাড়ীর দিকে ক্রিরিতেছিল, হঠাৎ নির্খলকে রাতায় কুলি সমেত দেখিয়া, চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কিরে নির্খল ভুই বখন এলি?

এই, এইমাত্র এলুম ভাই তোমারই বাড়ী যাব বলে যাচ্ছিলুম, যাক, ভালই হ’য়েছে, কেমন আছ সব, ভাল আছতো? মা ভাল আছে?

হ্যাঁ, মা ভাল আছে।

তোমা কেমন আছিস, ভাল আছিস তো? নির্খল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।” কলক থেকে বিনকতক ছুটি নিয়ে মনে কল্পম মাই, যতীনদার গুণানে দিনকতক বেড়িছে-আসি।

বেশ, বেশ, ভালই হ’য়েছে। দুজনে মিলিয়া যথা সময়ে বাটা আসিয়া পৌছিল। যতীনের স্ত্রী স্বহাস তখন সবেমাত্র ভাত নামাইয়া মাছের ঝোল চপাইয়েতেছিল। যতীন আসিয়া কচা নাড়িতেই, স্বহাস তাড়াতাড়ি কচা-খানা নামাইয়া রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিতে ছুটিল, দরজা খুলিয়া দিয়া স্বহাস ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

যতীন ও নির্খল, বাটার ভিতর প্রবেশ করিল, যতীন নির্খলকে বৈঠকখানায় বসাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নির্খল বৈঠকখানায় তাহার ঠাকটী ও বিছানাদাী রাখিয়া জামাটা খুলিয়া ফেলিল, ও একখানি পাখা লইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল।

স্বহাস এতদূর দরজার ঠাক হইতে নির্খলকে দেখিতেছিল, যতীন ভিতর হইতে কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া নির্খলকে বলিল, “কিরে ভাবছিল কি?”

“কই, না,” বলিয়া নির্খল বলিল, “একটু তেল দরদা যতীন মা?”

যতীন কিন্তু বৃষ্টিতে পারিয়াছিল, যে নির্খল যেন একটা কি ভাবিতেছিল, সে নির্খলকে জোর করিয়া ধরিয়া বলিল ও বলিল, “কি ভাবছিলিবে, ব’লাবিনি আবার?”

নির্খলের চক্ষু দিয়া তখন টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল, নির্খল কোঁচার খুঁটে মুখটা চাপিয়া ছেলের মত কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কানিতে লাগিল, স্বহাস কপাটের আড়াল হইতে এইমত দেখিতেছিল, সে তখন স্থির থাকিতে না পারিয়া আড়ার খর হইতে শাওড়ীকে ডাকিয়া আনিত চলিয়া গেল।

গিন্নী নিস্তারিণী যতীনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ’য়েছে, যতীন, নির্খল আমাদের এমন করে কাঁদছে কেনে?” “কি জানি মা” বলিয়া যতীন নির্খলকে কল্যানে ভিতর লইয়া গিয়া তেল ও সাবান দেখাইয়া দিয়া বলিল, “—শীতপীঠ নিয়ে নে, তারপর কি হয়েছে অনুবোধন।”

নির্খল দ্বান সাহিয়া ভিতরে আসিয়া নিজের ঠাকটী খুলিয়া একখানি কাপড় পড়িল, ও একটা গেঞ্জি বাহির করিয়া পায় দিল, স্বহাস তাহারে দুজনেরই খাবার জায়গা করিয়া রাখিয়াছিল, যতীন ও নির্খল উভয়েই খাইতে বসিল খাইতে খাইতে যতীন নির্খলকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ’য়েছে, নির্খল, বাড়ীতে বৃষ্টি ঝগড়া করে চলে এসেছিল? নির্খল মুখ নীচু করিয়া খাইতে লাগিল।”

যতীন বার বার জিজ্ঞাসা করতে নির্খল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “হ্যাঁ।”

কায় সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, সন্ধ্যর সঙ্গে বৃষ্টি? ছিঃ—ছিঃ—পাগলা ভুই, তোর মাথা খাণাং হয়ে গেছে এই বৃষ্টি তোর বৃষ্টি

নির্খল লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিল না, সে মুখটা নীচু করিয়া সেই রকম ভাবেই খাইতে লাগিল।

যতীনের মা ছুঁইবাটা দুখ গরম করিয়া লইয়া আসিয়া নির্খলের পাতের কাছে এক বাটা দুখ রাখিয়া নির্খলকে বলিল, “এইকাটা দুখ দিয়ে খেয়ে নাও বাবা,” নির্খল তখন উঠিয়া পড়িয়াব চেঁচা করিতেছিল, যতীন তাহার হাত ধরিয়া বলিল “সে বাসু পেয়ে দে।” স্বহাস নির্খলকে সে অহরোধ রকম করিতে হইল, সে কোন প্রকারে চারিটা ভাত দুখ দিয়া খাইয়া উঠিয়া পড়িল, যতীনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দুজনে মিলিয়া হাতমুখ ধুইয়া বৈঠকখানায় চলিয়া আসিল।

৪

দুজনে মিলিয়া বেলা তিনটা পর্যন্ত খুব খুঁমাইল, বৈকালে ঈদন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন নির্খলের চিত্তের মনে একটু স্বচ্ছন্দতা জন্মিল। কিন্তু সেটা শারিরীক স্বচ্ছন্দ, মানসিক নহে।

ইহার পর আর মাসখানেক কাটয়া গিয়াছে, যতীনের মা নির্খলকে আপনার ছেলের মতনই ভালবাসে। নির্খলও যতীনের মাকে নিজের মায়ের মতনই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। যতীনের স্ত্রী স্বহাস নির্খলকে ঠাট্টা করিয়া এক একদিন সাপায়, ঠাকুরপোর বৃষ্টি বই পড়ে এই বৃষ্টি হ’য়েছে? নির্খল মাথা নীচু করিয়া জড়জড় হইয়া বসানে নির্খল লজ্জায় মাথা তুলিতে পারে না।

একদিন যতীন নির্খলকে বৈকালেবেলা বেড়াইতে যাইবার কথা বলিল, নির্খল বলিল, “কোথায়—দশাশমেঘ ঘাটে? চল যাই”—দুজনে মিলিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইল। যতীন নির্খলের কাঁধে হাত রাখিয়া আপন মনে গুণ গুণ শব্দে গান করিতে করিতে চলিয়াছে, আর নির্খল যেন একটা কি চিন্তায় বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি মত হইয়া চলিয়াছে।

খন তাহার ঘাটের নিকট আসিল, তখন ঘাটের এক পার্শ্বে দেখিল যে, খুব জনতা, যতীন ও নির্খল সেই ভীষণ জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোক মুচ্ছাবস্থায় পড়িয়া আছে, ও একটা ডললোক তাহার মাথাটা নিজের কোলে রাখিয়া অনবরত পাখার বাতাস করিতেছে। লোকটাকে দেখিয়া নির্খল চিন্তিতে পারিয়াছে, লোকটা নির্খলের পূর্ণপরিচিতি ট্রেনের সঙ্গী হইয়াবাবু।

নির্খল তাড়াতাড়ি ডিড চৈলিয়া নিকটে যাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, কি হ’য়েছে হইয়াবাবু, ব্যাপার কি? হইয়াবাবু বিস্তৃত বস্ত্রে নির্খলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। যতীন ও নির্খল দুজনে মিলিয়া জনতাকে সরাইয়া মুক্ত বাতাস হাওয়াতে আসে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিল।

কয়ে কয়ে হইয়াবাবুর স্ত্রীর খনন জানা হইল, তখন সমুখে জনতা ও নির্খল বাগকে দেখিয়া বসন্ত সন্সুত করিয়া বিস্তৃতের মত তাহারের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বহাসের তখন সবেমাত্র সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গোপালীর পাটে বসিয়াছেন।

নির্খল একখানি গাড়ী ডাকিয়া লইয়া আসিলে, যতীন ও নির্খল ধরাধরি করিয়া গাড়ীর ভিতরে তাংকয়ে বসাইয়া



দিল, ও হরেনবাণ্ডকে ভিতরে যাইয়া পাথার বাতাস করিতে বলিল, যাইবার সময় হরেনবাবু নির্ধল ও যতীনকে কাল তাঁর বাড়ীতে যাইবার জন্ত যথেষ্ট অহরোধ করিয়া গেলেন।

সেদিন যতীন ও নির্ধল বাড়ীতে বসন আসিল, তখন রাজি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে কড়া নাড়িতেই হুৎস দরজা খুলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল, যতীন ও নির্ধল বাড়ীতে ঢুকিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত বেয়া হ’ল কেনরে?”

যতীন সমস্ত ঘটনা মাকে বলিল, ও বলিল কে জান মা, ওই যে বাগবাাজারের দস্তদের বাড়ীর হরেনবাবুর জ্বা।।.....

ও.....বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি...তা রাম-নগরে বাবার কি দরকার ছেলো বাপু!

পরদিন সকালে যতীন ও নির্ধল দুজনে মিলিয়া হরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। হরেনবাবু তখন গবে মাত্র বাজার হইতে ফিরা আসিয়াছেন। তাহাদের কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া হরেনবাবু বৈঠকখানার ঘরে দুজনকে বসাইল।

কিঞ্চিৎ পরে হরেনবাবু বতীনকে বলিল, “তোমার ঘেন চেনা চেনা বোধ হ’চ্ছে, “আজ্ঞা তুমি কি ভাম-বাজারের উকীল মাখনবাবুর জামাই হও না? তোমার বিয়েতে আমার সব নিমন্ত্রণ গেলেন, মনে হ’চ্ছে।”

যতীন মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

হরেনবাবু নির্ধলকে প্রতি চাহিয়া বলিল, “গাপনি কাল আমার মা উপকার করেছেন, ভগবান আপনাকে দীর্ঘায়ী বকন।”

নির্ধল লজ্জিত হইয়া বলিল, “কই কিছু তো করিনি?”

হরেনবাবু যতীনকে জিজ্ঞাসা করিল, এটা বুঝি তোমার বন্ধু? “আজ্ঞে হ্যা—আমরা এক ক্লাবেই পড়তুম, আর এক সঙ্গেই এন্ট্রান্স পাশ করি।”

বেশ, বেশ, ভালই হয়েছে, তা তোমরা দুজনে মিলে আজ আমার এখানে থাকে যেমন?

যতীন ও নির্ধল দুজনেই মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। হরেনবাবু বাড়ীর ভিতর যাইয়া খাওয়া দাওয়ার

ব্যবস্থা করিয়া আবার ফিরা আসিলেন। সেই সময় জাক্কার বাবু আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, ও সামনেই হরেনবাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকাল রাতে কেনম ছিল?” হরেন বাবু বলিলেন, “জবটা একটু কম ছিলো, আজ্ঞা আবার জবটা সকাল থেকে ঘেন একটু বেড়েছে মনে হ’চ্ছে।”

“চলুন দেখি” বলিয়া, জাক্কার বাবু ও হরেন বাবু ভিতরে প্রবেশ করিল।

হরেনবাবুর মাতাভ্রাতৃগণ তখন একবাটা দুখ গরম করিয়া মনোরমাকে খাওয়াইতেছিল। যথাসময়ে জাক্কার-বাবু ও হরেনবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, জাক্কারবাবু খড়ি বাহির করিয়া নাকী দেখিতে লাগিলেন, প্রায় তিন মিনিট পরে, জাক্কারবাবু হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, জর এখন বেশ আছে, আজকেও যা ওখু আছে চলুক, কাল কেমন থাকে খবর ধরেন।

এই বলিয়া জাক্কারবাবু চলিয়া গেলেন। হরেনবাবুর বুঝা মাতা জাক্কারবাবুর পিছনে পিছনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বোমার আমার কিছু ভয়ে বসে নেইত বাবা?” জাক্কার বুঝাকে সাহায্য দিয়া পাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

হরেনবাবু মনোরমার মাথার একখানি ছাকড়ার পটা করিয়া ওড়কল্য় দিতেছিলেন, মনোরমা একটু জল খাইতে চাহিল। হরেনবাবু তাড়াতাড়ি পটটা বগাইয়া দিয়া, সামনেই সোজার জল ছিল, কিঞ্চিৎ খাওয়াইয়া দিলেন। মনোরমা অক্ষুণ্ণবরে খানীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাইয়ের ঘরে কাল এয়েছে?”

হরেনবাবু বলিল, “সেই কালকের দুটা ছেলে।”

ও—নির্ধল বাবু বুঝি?

হ্যা নির্ধল, আর সেই যতীন, বুঝেছ? যার বিয়েতে তুমি মেসত্ব গেলেন।

যথাসময়ে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। “হরেনবাবু

নির্ধল ও যতীনকে খান করিতে বলিল, নির্ধল ও যতীন দুজনেই খান করিল এবং বাড়ীর ভিতর যাইয়া এক-

সঙ্গেই খাইতে বসিল। হরেনবাবু যতীনকে ও নির্ধলকে বলিল, “খা, দরকার, চেয়ে চিন্তে নিও, এখানে লজ্জা করেনা, সবই আপনাব মতন।”

আহারাদি শেষ করিয়া, যতীন ও নির্ধল হরেনবাবুকে বলিল, “এখন তা’হলে আমি। এসে খুব বিরক্ত করে গেলাম কিছু মনে করবেন না,” এই বলিয়া দুজনে বাড়ী চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে যতীনের বাড়ীতে একখানি পত্র আসিল, পত্রখানি পড়িয়া যতীন দেখিল যে, সে তাহাই শিরোনাম লেখা রহিয়াছে, যতীন পত্রখানি খুলিয়া পড়িল,—পত্র লেখা ছিল,—

মেয়ের যতীন, আজ দুইদিন হইল, আমার স্ত্রী মারা গিয়াছে, আমার মা প্রায় পাগলের মত হইয়াছেন। তোমরা কবে কলিকাতায় ফিরিবে জানাইও। তাহা হইলে মাকেও তোমাদের সহিত একসঙ্গে লইয়া যাইব। ইতি—

ভ্রাতৃগণ।

তোমার পরিচিত হরেনবাবু।

যতীন পত্র পড়িয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং বাড়ীর ভিতরে যাইয়া মাকে এই সংবাদ দিল।

গিন্নি আলা—হা—মেয়েটা শেষে কি না এইখানে জীবনটা দিলে গা—বলিয়া দুখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যতীন তখনই সেই পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল, ও মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তা’লে কলিকাতায় যাবার কথা কবে লিখবো মা?”

যতীনের মা বলিল, আমার স্ত্রী মনটা বড় ব্যাপ হ’য়ে গিয়া বাপু—আহা...হা... তুমি কালই লিখে দাও।

যতীন বৈঠকখানায় যাইয়া এইরূপ পত্র লিখিল :—

মাননীয় হরেনবাবু—

আমরা কালই এখানে হইতে কলিকাতা রওনা হইব। আপনি আপনাব মাতাকে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিবেন। বেলা তিনটার সময় আসিবেন, নচেৎ গাড়ী পাইব না। ইতি—

বিনিম—

যতীন।

১৮ নং বাসানীটোলা।

৬  
তাহার পরদিন সকলে মিলিয়া সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লইয়া বিভিন্ন পত্র গুছাইতেছিল, এমন সময় বাড়ীর দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া দেখিল যে, হরেনবাবু ও তাহার মাতাভ্রাতৃগণ। যতীন তাহাদের বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

যতীনের মা হরেনবাবুর মাতাকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। হরেনবাবুর মাতা সেই আসনখানি টানিয়া লইয়া এক পাশে বসিলেন, ও যতীনের মাতাকে বলিলেন, কেমন ভাল আ’হেতো, তোমার কবে এসেছিলে?

যতীনের মা বলিলেন, “আমরা প্রায় চারমাস হ’লো এয়েছি—হ্যা—বলি বোমার কি রকম হ’লো? আর মা,—নিজাভিত্তি লেখা—তুমি আমি তার কি করবো।”

বাহিরে গাড়োয়ান ভাড়ার জন্ত চেঁচাইতেছিল। যতীন বাহিরে যাইয়া গাড়োয়ানকে বলিল, “তোমার কত ভাড়া হ’য়েছে বাপু?”—গাড়োয়ান বলিল, “দুখ আনা বাবু,” যতীন তাহার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া বলিল, “তুমি বেলা তিনটার সময় হৈসেন পৌছে দেবে?”

গাড়োয়ান বলিল, “ক’হে নেই দেগা বাবু, হাম লোক’কাতে এহি কাম হায়—”

যতীন বলিল—কত ভাড়া নেবে? গাড়োয়ান বলিল,—

দশ আনা লেগো বাবু।

যতীন ন’আনার ঠিক করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিল, কারণ তিনটা বাজিতে তখন মোটে আশুপটী সময় আছে। যথাসময়ে জিনিষদ্বয় সমস্ত গুছাইয়া যতীন সকলকে লইয়া পাড়ীতে উঠাইয়া দিল। হরেনবাবু পাড়ীর উপরে যাইয়া উঠিলেন, পাড়ী টেগনের দিকে চলিল।

তাহারা হৈসেন যখন পৌছিল, তখনও গাড়ী আসিতে প্রায় দশমিনিট বাকি, যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। যতীন সমস্ত টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীরই লইয়াছিল, সেই জন্ত তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

গাড়ী আসিতে লেট হইয়াছিল। গার্ড-সাহেব মোটে তিন মিনিট দাঁড়াইয়া বাসী বাজাইয়া দিল। গাড়ী প্রায়তনয় হইতে হু হু শব্দ করিতে করিতে ছাড়িয়া দিল।



বিল, ও হরেনবাবুকে ভিতরে যাইয়া পাথার বাতাস করিতে বলিল, যাইবার সময় হরেনবাবু নির্ধল ও বতীকে কাল ভাঙার বাড়ীতে যাইবার জন্ত যথেষ্ট অশ্রুসাধ করিয়া গেলেন।

সেরিন বতীন ও নির্ধল বাড়ীতে বসন আসিল, তখন রাহি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে কড়া লাভিতেই স্বাস দরজা খুলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল, বতীন ও নির্ধল বাড়ীতে ঢুকিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত বেলাই কেনের?”

যতীন সমস্ত ঘটনা মাকে বলিল, ও বলিল কে জান মা, ওই যে বাগবাড়ারের দস্তদের বাড়ীর হরেনবাবুর জী।……

“……বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি……তা রাম-নগরে যাবার কি দরকার ছেলো বাপু।

পরদিন সকালে যতীন ও নির্ধল দুজনে মিলিয়া হরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। হরেনবাবু তখন সবে বাজার হইতে কিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের কড়া বাজার শব্দ শুনিয়া বুলিয়া দিয়া হরেনবাবু বৈঠকখানার ঘরে দুজনকে বসাইল।

কিঞ্চিৎ পরে হরেনবাবু যতীনের বলিল, “তোমার ঘনে ঢেনা ঢেনা দেখে হচ্ছে, “আচ্ছা তুমি কি শ্রাম-বাজারের উকীল মাখনবাবুর জামাই হও না? তোমার বিরুদ্ধে আমরা সব নিমন্ত্রণ পেছলুম, মনে হচ্ছে।”

বতী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। হরেনবাবু নির্ধলের প্রতি চাহিয়া বলিল, “আপনি কাল আমার যা উপকার করছেন, তগরান আপনাকে দাঁড়ীকী করুন।”

নির্ধল লজ্জিত হইয়া বলিল, “কই কিছু তো করিনি?” হরেনবাবু যতীনের কথাকে জিজ্ঞাসা করিল, এটা বুঝি তোমার বন্ধু? “আজ্ঞে হ্যাঁ—আমরা এক রাশেই প’ড়তুম, আর এক সঙ্গেই এটো পুশ করি।”

বেশ, বেশ, ভালই হয়েছে, তা তোমরা দুজনে মিলে আজ আমার এখানে বাবে কেনন?

যতীন ও নির্ধল দুজনেই মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। হরেনবাবু বাড়ীর ভিতর যাইয়া পাথরা দাওয়ার

ব্যস্থা করিয়া আবার কিরিয়া আসিলেন। সেই সময় জাক্কাব বাবু আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, ও সামনেই হরেনবাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল রাতে কেমন ছিল?” হরেন বাবু বলিলেন, “জবটী একটু কম ছিলো, আচ্ছা আবার জটটা সকাল থেকে যেন একটু বেড়েছে মনে হচ্ছে।”

‘চলুন হেরি’ বলিয়া, ডাকার বাবু ও হরেন বাবু ভিতরে প্রবেশ করিল।

হরেনবাবুর মাতাঠাকুরাণী তখন একবাটা দুধ গরম করিয়া মনোরমাকে খাওয়াইতেছিল। যখনসময় ডাকার-বাবুও হরেনবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ডাকারবাবু ঘড়ি বাহির করিয়া নড়ী দেখিতে লাগিলেন, প্রায় তিন মিনিট পরে, ডাকারবাবু হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, জর এখন বেশ আছে, আঙ্গুরক ও ঝাণ্ডা আছে চলুক, কাল কেমন থাকে খবর দেবেন।

এই বলিয়া ডাকারবাবু চলিয়া গেলেন। হরেনবাবুর বুড়া মাতা ডাকারবাবুর পিছনে পিছনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বোমার আমার কিছু ভয়ের কারণ নেইত বাবা?” ডাকার বুড়াকে সাধনা দিয়া পাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

হরেনবাবু মনোরমার মাথায় একখানি ক্রাকড়ার পটা করিয়া ওড়লুম দিয়েছিলেন, মনোরমা একটু জল খাইতে চাহিল। হরেনবাবু তাড়াতাড়ি পটাটা বসাইয়া দিয়া, সামনেই সোডার জল ছিল, কিঞ্চিৎ খাওয়াইয়া দিলেন। মনোরমা অমৃতবুর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাইয়ের ঘরে কায়া এয়েছে?”

হরেনবাবু বলিল, “সেই কালকের ছুটি ছেলে।”

ও—নির্ধল বাবু বুঝি?

হ্যাঁ নির্ধল, আর সেই যতীন, বুঝে? যার বিরুদ্ধে তুমি মেমসত্ব খেললে।

যখনসময় আহারাদির বন্দোবস্ত হইল। “হরেনবাবু নির্ধল ও বতীকে ঘান করিতে বলিল, নির্ধল ও যতীন দুজনেই প্রান করিল এবং বাড়ীর ভিতর যাইয়া এক-

সঙ্গেই বাইতে বসিল। হরেনবাবু যতীনের ও নির্ধলকে বলিল, “খা, দরকার, চেয়ে চিন্তে নিও, এখানে লক্ষ্য করোনা, সবই আপনার মতন।”

আহারাদি শেষ করিয়া, যতীন ও নির্ধল হরেনবাবুকে বলিল, “এখন তা’হলে আসি। এসে খুব বিরক্ত করে গেলাম কিছু মনে করবেন না,” এই বলিয়া দুজনে বাড়ী চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে যতীনের বাড়ীতে একখানি পত্র আসিল, পত্রখানি পড়িয়া যতীন দেখিল যে, সে তাহারই শিরোনামা লেখা রহিয়াছে, যতীন পত্রখানি খুলিয়া পড়িল,—পত্র লেখা ছিল,—

পেখের যতীন, আজ দুইদিন হইল, আমার স্ত্রী মাঝা গিয়াছে, আমার মা প্রায় পাগলের মত হইয়াছেন। তোমরা কবে কলিকাতায় কিরিয়ে জানাইও। তাহা হইলে মাকেও তোমাধার সহিত একসঙ্গে লইয়া যাইব। ইতি—

ভতাবী—

তোমার পরিচিত হরেনবাবু।

যতীন পত্র পড়িয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং বাড়ীর ভিতরে যাইয়া মাকে এই সংবাদ দিল।

গিরা আতা—হা—সেয়েটা দেখে কি না এইখানে জীবনটা দিলে গা—বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যতীন তখনই সেই পত্রের উত্তর লিখিতে বলিল, ও মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তা’লে ক’লকাতায় যাবার কথা কবে লিখো মা?”

যতীনের বা বলিল, আমার স্তনে মনটা বড় খারাপ হ’য়ে গেল বাপু—আহা … হা … তুমি কালই লিখে দাও।

যতীন বৈঠকখানায় যাইয়া এইরূপ পত্র লিখিল :—

মাননীয হরেনবাবু—

আমরা কালই এখানে হইতে কলিকাতা রওনা হইব। আপনি আপনার মাতাকে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিবেন। বেলা তিনটার সময় আসিবেন, নচেৎ গাড়ী পাইব না। ইতি—

বিনিত—

যতীন।

১৮ নং বাসালীটোলা।

৬

তাহার পরদিন সকলে মিলিয়া সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লইয়া জিনিষ পত্র গুছাইতেছিল, এমন সময় বাড়ীর দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া দেখিল যে, হরেনবাবু ও তাহার মাতাঠাকুরাণী। যতীন তাহাদের বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

যতীনের মা হরেনবাবুর মাতাকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। হরেনবাবুর মাতা সেই আসনখানি টানিয়া লইয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, ও যতীনের মাতাকে বলিলেন, কেমন ভাল আছ’তো, তোমরা ক’বে এসে ছিলে?

যতীনের মা বলিলেন, “আমরা প্রায় চারমাস হ’লে এয়েছি—হ্যাঁ—বলি বোমার কি রকম হ’লো? আর মা,—নিজাভিত্তি লেখা—তুমি আমি তার কি করবো?”

বাহিরে গাড়োয়ান ডাকার জন্ত চেঁচাইতেছিল। যতীন বাহিরে যাইয়া গাড়োয়ানকে বলিল, “তোমার কত ভাড়া হ’য়েছে বাপু?”—গাড়োয়ান বলিল, “ছয় আনা বাবু,” যতীন তাহার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া বলিল, “তুমি বেলা তিনটার সময় টেনে পৌঁছে দেবে?” গাড়োয়ান বলিল, “কানে নেই দেণা বাবু, হাম লোক’কতো এহি কাম হায়—”

যতীন বলিল—কত ভাড়া নেরে? গাড়োয়ান বলিল,—দশ আনা লেগা বাবু।

যতীন ন’আমার ঠিক করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বসিল, কারণ তিনটা বাজিতে তখন মোটে আশ্বষটী সময় আছে। যথাসময়ে জিনিষপত্র সমস্ত গুছাইয়া যতীন সকলকে লইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। হরেনবাবু বাড়ীর উপরে যাইয়া উঠিলেন, গাড়ী টেনেবের দিকে চলিল।

তাহার টেনে যখন পৌঁছিল, তখনও গাড়ী আসিতে প্রায় দশমিনিট বাকি, যখনসময় গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। যতীন সমস্ত টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীরই লইয়াছিল, সেই জন্ত তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

গাড়ী আসিতে লেট হইয়াছিল। গার্ড-সাহেব মোটে তিন মিনিট দাঁড়াইয়া বাধী বাজাইয়া দিল। গাড়ী প্রায়তক্ষণ হইতে হু হু শব্দ করিতে করিতে ছাড়িয়া দিল।





## দেশী ব্যাঙ্ক

ভারতবর্ষে দেশী ব্যাঙ্কের অবস্থার কথা বলিতে গিয়া রায় বাহাদুর লাল ধনঞ্জয় রায় পাঠ্যব্রাহ্মণ লাল ব্যাঙ্কের বাবিক দক্ষিণীতে এক বক্তৃতা করেন। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থের পক্ষে ব্যাঙ্ক চলাইতে গেলে অনেক অসুবিধা আছে তাহার মধ্যে কতকগুলির কথা তিনি উত্থাপন করেন (১) ভারত সরকার যদিও বিলম্ব জ্ঞানেন দেশী ব্যাঙ্ক দেশের কত উপকার করিতেছে তবুও তাহাদের সাহায্যের জন্ত এতদূর কিছুই করেন নাই। সরকারের সমস্ত টাকাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জমা রাখা হয়। কেন কিছু কিছু টাকাও কি ভাল দেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখা যায় না? (২) ইউরোপীয় ব্যবসাদাররা হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কিংবা অজ্ঞাত বিদেশী ব্যাঙ্ক টাকা রাখেন আমাদের দেশী লোকেরা কিন্তু আমাদের দেশী ব্যাঙ্ক টাকা রাখা দরকার বিবেচনা করেন না। ইহা যে বিশেষ দরকার তাহা সকলের জানা থাকা উচিত। অর্থনৈতিক দাশত মোদন করিতে না পারিলে স্বরাষ্ট্র লাভ করা বড়ই দুঃখ। কামাঙ্গ এই প্রসঙ্গে বলেন যে আমরা অনেক সময়েই তুলিয়া যাই যে বিবাসী এই সব কাজের প্রধান অঙ্গ এবং এই বিবাসী লোকের মনে জাগাইবার জন্ত বিলাতী ব্যাঙ্কগুলার কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাশ্রম ও চরিত্র বলের পরিচয় দিয়াছেন।

কমরার এই কথা কতক সত্য হইলেও সম্যক সত্য নহে। ইউরোপীয়দিগের যে গুণের কথা কমার্শ বলিতেছেন তাহা সরকারের prestige-এর সাহায্য পদে পদে না পাইলে কখনই এই ভাবে কার্যকারী হইত না। ব্যবসা সমাজে প্রায়শত। কিংবা চরিত্রবলের কথা যাহা বলিতেছেন তাহা দেশী ব্যবসায়ের মধ্যে যে বিরল তাহা নহে, কিন্তু অভাব আছে কেবল তাহাদের রাজস্ব জাভে বন্দ। লোকের মনের এ ধারণাও যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা নহে যে রাজস্ব জাতীয়ের দুরবস্থার স-

কারের সাহায্য মিলিবে। আর এ সাহায্যের দাম যে কি দেশবাসীরা তা খুঁই জানেন।

(১) দেশী ব্যাঙ্কের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত অনেক স্থলেই প্রতিযোগিতা করিতে হয় কিন্তু তাহাতে তাহাদের অসুবিধার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি ইহার কলে দেশী ব্যাঙ্কদের কারবার করাও সময়ে সময়ে অসম্ভব হইতে পারে।

একদিকে সরকার পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট বাহির করিয়া শতকরা ৬ টাকা হুদে টাকা লইতেছেন অত্রদিকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার টাকার সুবিধার কারণ কম হুদে টাকা ধার দিতে পারেন। দেশী ব্যাঙ্কের হাতে দুইখাতেই বিপদ। কম হুদে টাকা পাইবেও না আবার বেশী হুদে না দিলে টাকা খাটাইতেও পারিবে না। ভারত সরকারের প্রায় ২০ কোটি টাকা বিনা হুদে প্রায় সর্ব সময়েই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা আছে। এবং বাহিরের লোকেরও অনেকের অনেক টাকা ঐ জুড়েই বিনা হুদে থকানে থাকে। সরকারের টাকা খেদানে থাকিতে পারে সেখানে আবার ভয় কি? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ঐ জুড় আবার মজা। বিনা হুদে টাকা আসিল আর যখন কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই তখন অনেক টাকাও ধার দিতে পার। অজ ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে ২০ এবং গচ্ছিত টাকার উপর ৪০ টাকা হুদে দিয়া কি করিয়া ধার দিবার সময়ে কম হুদে ধার দিবে?

রায় বাহাদুর বলেন যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যদি সাধারণের ব্যাঙ্ক না হইয়া ব্যাঙ্কদের ব্যাঙ্ক হয় তাহা হইলে কতকটা এই বিপদের নিশ্চিন্তির সম্ভাবনা আছে। ইহাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেরও সুবিধার কারণ আছে। এবং আমাদের দেশী ব্যাঙ্কদের তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না।

## আশ্রয়

### শ্রীহরিপদ গুহ

প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া নিমিলেশ কলিকাতায় আই-এস-সি পড়িতে আসিয়াছিল। বাড়ী বর্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে। পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সামান্যিক অবস্থা তত সুবিধার নহে; কয়েক বিঘা জমি আছে, তাহারই কমলে কায়েদশে কোন রকমে চলিয়া যায় কিন্তু পড়ার খরচ চলে না। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মাতা কমলমণির ঘে ক'খনো গহনা ছিল, একে একে বন্ধক দিয়া পুত্রকে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়াইয়াছেন।

পরীক্ষার ফল শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ঘির করিলেন, পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবেন। কিন্তু টাকা কোথায়? গরীবের বাসনা কি সহজে পূর্ণ হয়? পুত্রকে পড়াইবার ভাবনায় তিনি আহার-নিদ্রা তুলিয়া গেলেন।

সংসা তাহার মনে পড়িল—দূর-লক্ষ্যবর্তী রোন্ নরনতারার কথা। সে কলিকাতায় থাকে। পরদ্রব্য তিনি অনেক ভাবিয়া তাহার নিকট বিশেষ অশ্রুধোষ করিয়া এক পত্র দিলেন।

নয়নতারার অবস্থা খুঁই বজল; দুই পুত্র, দুইটীরই বেশ পশার। একজন উকীল, আর একজন পি-ডব্লিউ-ডির কন্ট্রোলার।

কোমল-স্বপ্না নয়নতারার ভরির অশ্রুধোষ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; অতি সহজেই স্বীকৃত হইয়া পত্র দিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া কমলমণির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তখনই পুত্রকে ডাকিয়া এই শুভ-সংবাদটা দিয়া দিলেন। এক নবীন উত্তমে নিমিলেশের প্রাণ নাচিয়া উঠিল; সে ভবিষ্যতের রঙিন আশায় কত আকাশ কুহুম ভাবিতে লাগিল।

### ছই

মায়ের স্মৃতিত্ব কুহুম চূর্ণ করিয়া, তাহার চক্ষের জলে বেহ অভিব্যক্তি করিয়া এবং সর্বোপরি তাহার দেহা-রাধাধানব জিউর প্রাণ লইয়া নিমিলেশে তাহার অশ্রুধোষ

অবশ্য ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিমিলেশের জন্ত যে গৃহটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ঠিক তাহারই সমুখে এক পাড়াগায়ে জমীদারের বাড়ী। তিনি দেশে থাকিয়া জমিদারী দেখেন এবং মাঝে মাঝে বন্ধ-বান্ধব-সহ কলিকাতায় আসিয়া দুই চারিদিন থাকিয়া যান। কাজেই নিমিলেশের বেশ সুবিধাই ছিল, কোন গোল-মাল ছিল না। নিদ্রান স্থানটীতে সে বেশ নিরুদগ্রবেই শোয়াপড়া করিয়া যাইত।

আজ পড়িবার সময় সংসা সে বেগিল,—পাশের বাড়ীর জানালা ছুঁটা খোলা রহিয়াছে; এবং তাহারই একটীর সমুখে নত মস্তকে এক তরুণী গড়াইয়া আছে। প্রাতঃস্বর্ধ্যাক্ষর তাহার হৃদয় মুগ্ধানিকে আরও হৃদয় করিয়া তুলিয়াছে।

নিমিলেশের চোখের সহিত তাহার চক্ষুর মিলন হইয়া গেল। নিমিলেশ লক্ষ্যায় দৃষ্টি নামাইয়া পুনরায় পাঠে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু, তাহাকে দেখিবার লোভটুকুও ছাড়িতে পারিল না। সুবিধা পাইলেই তাহার চপল নয়ন আপন কার্য করিয়া যাইতে লাগিল।

সারারাত্রি বিবেকের সহিত যুদ্ধ করিয়াও নিমিলেশ এ ভদ্র-মহিলাটার প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত সঙ্গত কি না তাহা সুস্থিয়া উঠিতে পারিল না।

### তিন

সেই দিন রবিবার। কি একটা মহাবোগে সকলে সন্ধ্যা বেলা কালীঘাট গিয়াছিল, যার নাই শুভাগেশে গেল। সে আপন ছোট ঘরটীতে বসিয়া তাহার ভবিষ্যত অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিল।

ঠিক এমনই সময় পাশের বাড়ীর জানালাটা খুলিয়া যাইতে সে শিহরিয়া উঠিল। এই কি সেই তরুণী! সে রূপ নাই, সে বেশ নাই, সে হাসি নাই, মুখ-চোখে স্নেহ কোন কালিমা মাখাইয়া রাখিলে। আজ তরুণী



জন্মে ভায় দাঁড়াইয়া বহিল না; দীরে দীরে রেলিঙের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আড়ট-কণ্ঠে সে কহিল,—

“তুই ছেন? আজ ক’দিন বন্দু বন্দু করেও জানাতে পারিনি। আমি বড় বিপদা, আপনি দয়া না করলে, আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই।”

অবাক-বিস্ময়ে নিখিলেশ একবার তরুণীর মুখের নিকে চাহিল, তারপর ব্যাকুল-বাখিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—

“কেন, আপনার কি হয়েছে?”

তরুণী কহিল,—“গ্রামের জমীদার আমায় জোর করে ঘরে এনেছে; যদি আমার উদ্ধার না করেন, আজ দল বদল নিয়ে এসে সে আমার.....”

নিখিলেশের প্রাণ গলিয়া গেল। সে তরুণীর মঞ্চ-বেশনা সমস্তটা ভুলিলও না, “ভয় নেই, আমি আসছি” বলিয়া তখনই সহপাঠী অক্ষকুলের নিকট ছুটিল, তারপর অশ্রুচোরা রমণীই সে কিরিয়া আসিল। তখন সে একাকী নহে, ভোজপুরী দরওয়ান-সহ অক্ষকুল ও অজ্ঞাত ছাত্র-জন সঙ্গীসহ অব্যাহা বুঝিয়া ঘর রক্ষী চম্পট দিল; অর্থাৎ, বাবুকে সংসার দিবার সংসাহসে ক্রুত অগ্রসর হইল।

নিখিলেশ তরুণীকে বলিল,—“আপনার আর কোন ভয় নেই, আপনি এর সঙ্গে যান, আমি একটু পরে ঘা’বন।”

ঘটনাক্রমে পরে হস্তবদ্ধ হইয়া জমীদার বাবু ঘটনাক্রমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু, দেখেন, পাখী উড়িয়া মিথ্যাছে। পুলিশের সাহায্য নিবেন ভাবিলেন,—কিন্তু কাজে কোন সুবিধা হইল না,—কাজ কি কৈদার?

অব্যাহা দেখিয়া নিখিলেশ ঘরে বসিয়া হাসিয়া লুপ্তপুষ্টি বাইতে লাগিল।

চার

সেদিন নিখিলেশ অসময়ে দেশে ফিরিতেছিল। সঙ্গে ছিল তার সেই আশ্রিতা তরুণী। অক্ষকুলের বাসীতে তাহার স্থান হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক নহে। কথা ছিল, বিপদের ভাই বতরিন না স্থান দেয়, ততদিন সে ওখানেই থাকিবে

সমাজ রাক্ষসীর শাসনে অনাথা স্থান পাইল না। সেহের দাবীটুকু বোধ হয় নীরব অশ্রু জলেই ডুবায়া রাখিয়া ভ্রাতা উত্তর দিল—“আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব।”

তবে উপায়? নারীর অবলম্বন স্বামী, তাঁহাকে ত সে বহুদিন হইল মরণের কোলে তুলিয়া দিয়া বিশ্বের ঘরে নিঃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিলেশের স্বপ্নটো হাহাকার করিয়া উঠিল।

বাড়ী আসিয়া নিখিলেশ হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিল—“আজ এক নতুন জিনিষ ঘরে এনেছি মা, দেখা যাবে তোমার খেঁচা?”

মাতা উৎসুক হইয়া বলিলেন—“কি বাবা?”

একটা মেয়ে মা। চিরকাল মেয়ে হয়নি বলে ছাপ করেছ, আজ দেবতার আশীর্বাদে.....

মাতা কণ্ঠে যথাসাধ্য ঔংস্কর্য্যের রেশ টানিয়া বলিলেন, “বিয়ে করেছিস বাবা? কৈ? বৌমা কৈ? কোথায় তাকে রেখে এলি পাগল?”

“ও কথা বল না মা, আমার বোনু ছিল না, তাই আজ নতুন করে সেই স্থানটা পূর্ণ করে নিয়েছি।”

মা কি বুঝিলেন জানি না, তবে অগ্রসর হইয়া দেখিতে চলিলেন। পথে সংক্ষেপে নিখিলেশ ঘটনার সার অংশটা মাতার কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়া হঠাৎ পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—

“এখন তুমি ‘আশ্রয়’ না দিলে অভাগী চিরদিনের জুত ভেঙ্গে যায় মা, বুকে-বুকে উত্তর দিও!”

মাতা পানিক শুভিত ভাবে থাকিয়া হঠাৎ মুহু হাসিয়া বলিলেন—“কি করিস? পাগল! পা ছাড়। আশ্রয়? হ্যাঁ, তবে নারীর সত্যিকার আশ্রয় তোর কাছ থেকে যদি পায়, তবেই, নইলে অভাগীর কল দেবতা এলেও মোছাতে পারবে না।”

“মা!.....”

ষ্টিকই বলেছি বাবা, তোদের ছুতনের মিলন একান্ত দরকার হয়ে উঠেছে। একটা শুভদিনে চারহাত এক করে আমাকেই দিতে হবে নিখিলেশ!”

পুত্র অবাক হইয়া বসে মহিমাধারী শান্ত-উজ্জল মুখের নিকে চাহিয়া রহিল।



মহাকাব্য

ইমং ইন্দ্রিয়া

পরিচালক  
সার সঞ্চালন

সত্যের পরীক্ষা

নেতালের কথা!

নেতালের বন্ধরের নাম ভার্সান, তাহা পোট নেতাল নামে পরিচিত। সেখানে আবছুরা শেঠ আমাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জাহাজ ঘাটে লাগিলে দেখিলাম যে, যাকীমের বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জুট ঘাটে আসিতে লাগিলেন। ভারতীয়-দিগকে কেহ বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল না। বাহারা আবছুরা শেঠকে চিনিতে, তাহারা তাহার সহিত যুগ্ম-বাক্যভাষ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন—ঐ ব্যাপার দেখিয়া আমি ব্যথিত হইলাম। আবছুরা শেঠ ঐ ব্যাপারে অত্যন্ত হইয়া মিথ্যাছিলেন। আমাকে দেখিয়া লোকের অস্বাভাবিক হইয়া দেখিতে লাগিল। আমার পোষাক অস্বাভাবিক ভারতীয়দিগের মত ছিল না। আমার একটি কোট ও বাঙ্গালী ধরণের পাগড়ী ছিল।

আমাকে কোম্পানীর বাসায় লইয়া গিয়া একটি ঘর দেওয়া হইল। ঐ ঘরটি আবছুরা শেঠের ঘরের পাশেই ছিল সে আমাকে বৃত্তিতে পারিত না, আমিও তাহাকে বৃত্তিতে পারি নাই। তাহার ভাই আমার হাতে তাহার জুত যে সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছিল, সেগুলি সে পাঠ করিল— তাহাতে সে অধিক কিস্কর্ভবাবিহু হইয়া গেল। সে মনে করিল, তাহার ভাই তাহার জুত এক খেতখুটী প্রেরণ করিয়াছে। আমার পোষাক প্রকৃতি তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইল—কারণ আমি যুরোপীয়দিগের দ্বারা পোষাক পরিতাম। সে

সময়ে আমার কোন বিশেষ কাজ ছিল না। টালভালে তাহাদের মামলা হইতেছিল। তখনই আমাকে তথায় প্রেরণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে আমার কার্যদক্ষতা ও সন্তোষ অধিক বিশ্বাস করিতে পারিত না। সে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করিবার জুট প্রিন্টো-রিয়ার যাইয়া থাকিতে পারিবে না। প্রতিবাদীরা প্রিন্টো-রিয়ার আছেন—তাহারা আমাকে টাকার লোভ দেখাইয়া নিজেদের দলে টানিয়া লইতে পারে। আর যদি মামলার কাজেই আমাকে বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে আমাকে আর কি কাজই বা দেওয়া যাইবে। অজ্ঞাত সকল কাজ তাহার কেহাণীয়া আমার অপেক্ষা ভাল করিতে পারিত। আমারও ত ভুল হইতে পারে। কাজেই মামলা সম্পর্কিত কাজ না দিয়া আমাকে আর কি কাজে নিযুক্ত করিবে?

আবছুরা শেঠ মাঠেই লিপাঘড়া জাতিত না। কিন্তু তাহার বিরাট অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছিল এবং সে নিজের বুদ্ধির বিষয় অবগত ছিল। অভ্যাসের দ্বারা সে কথা কহিবার মত কতকগুলি ইংরাজী কথা শিবিয়াছিল, তাহাতেই তাহার সকল কাজ চলিয়া যাইত। সে ত্রাক ম্যানেজার ও যুরোপীয় বণিকদিগকে নিজের কথা বুঝাইয়া দিত এবং ব্যারিষ্টারকে মামলা বুঝাইতে পারিত। ভারতীয়গণ তাহাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিত। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের



মধ্যে সে সকলের অপেক্ষা বড় ছিল। এই সকল সুবিধা থাকায় সত্ত্বেও তাহার একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল—সে সকলকে সম্বাহন করিত।

সে ইসলামধর্ম লইয়া গুরু করিত ও ইসলামধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ভালবাসিত। সে আরবী না জানিলেও কোরাণ ও ইসলামীয় সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথাই জানিত। সে সকল সময়ে প্রয়োজন হইলে অনেক উদাহরণ উপস্থিত করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে থাকিয়া আমারও এতদূর হইতে অনেক জ্ঞান হইয়াছিল। যখন আমার ছুইজনে নিকটস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইত।

আমার আশমনের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে সে আমাকে সম্বন্ধে লইয়া ডার্বানের আদালত দেখাইতে গিয়াছিল। তথায় সে আমাকে অনেক লোকের নিকট পরিচিত করিয়া দিল ও তাহার ঐষ্টীর পাশে বসাইয়া দিল। ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে একটুতে তাকাইয়া রহিল ও কিছুক্ষণ পরে আমাকে পাগড়ী খুলিয়া ফেলিতে বলিল। আমি তাহাতে অসম্মত হইয়া আদালত গৃহ ত্যাগ করিলাম।

এইখানে আমার সঙ্গামের আরম্ভ হইল। আবদুল্লা শেঠ আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কোন কোন ভারতীয়কে পাগড়ী খুলিয়া ফেলিতে বলা হয়। যাহারা মুসলমানী পোষাক পরে, তাহারা পাগড়ী পরিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য সকলকে আদালতে প্রবেশ করিবার সময়ই পাগড়ী খুলিতে হয়।

এই ব্যাপারটা বুঝাইতে হইলে আমাকে এ বিষয়ে বিবৃত ভাবে সকল কথা বলিতে হইবে। ২৩ দিনেই আমি দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয়রা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একদল মুসলমান ব্যবসায়ী নিজেদের 'আরব' বলিয়া পরিচয় দিত। আর এক দল হিন্দু ও পার্শী কেরাণী। হিন্দু কেরাণীরা কোন দলে ছিল না, পরে 'আরব'দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল। পার্শী কেরাণীরা নিজেদের 'পারশিয়ান' বলিয়া পরিচয় দিত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ ছিল। তামিল, তেলেগু ও হিন্দুস্থানী শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা বড় দল গঠন করিয়া-

ছিল। শ্রমিকরা ৫ বৎসর কাজ করিবার সপক্ষে নেতৃত্বে যাইত। তাহারা 'এগ্রিমেন্ট' করিত বলিয়া তাহাদিগকে সাধারণ ভাষায় 'গিরমিডিয়া' বলা হইত। অত্র ৩ দলের সহিত ইহাদের ব্যবসার সম্বন্ধ ছিল। ইংরাছরা তাহাদিগকে 'কুলী' বলিত। অদিকাংশ ভারতীয়ই কুলীর কাজ করিত বলিয়া যেতাদারা সকল ভারতীয়কে 'কুলী' বলিত। মাস্ত্রাণীদের নামের শেষে খানী উপাধি থাকিত বলিয়া কেহ কেহ সকল কুলীকেই খানী বলিত। খানীর প্রকৃত অর্থ প্রভু। সেই জন্ত 'খানী' বলিয়া ডাকিলে কোন কোন ভারতীয় যেতাদাদিগকে তাহাদের তুল বুঝাইয়া দিত। কোন কোন যেতাদ এই কথাই চটিয়া গিয়া ভারতীয়দিগকে প্রহার করিত।

সেই জন্ত আমাকে সকলে 'কুলী ব্যারিষ্টার' বলিত। ব্যবসায়ীদিগকে সকলে 'কুলী ব্যবসায়ী' বলিত। কুলীর প্রকৃত অর্থ তুলিয়া গিয়া ভারতবাসী মাত্রকেই তখন 'কুলী' বলা হইত। মুসলমান ব্যবসায়ীরা তাহাতে চটিয়া গিয়া বলিত, "আমি কুলী নহি, আরব"। যেতাদগণ এই কথাই ভজ্ঞতার বাতিরে ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

এ অবস্থায় পাগড়ী পরা সমস্তার সমাধান করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। পাগড়ী খুলিলে নিজেকে অপমানিত করা হইবে। সে জন্ত আমি চিন্তা করিলাম যে, পাগড়ী খুলিয়া এবার ছাট পরিব। তাহা হইলে আর এ বিষয় লইয়া গড়গোল হইবে না।

কিন্তু আবদুল্লা শেঠ এ প্রত্যবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—যদি আপনি ঐরূপ কোন কাজ করেন, তাহার ফল খুব ব্যাপক হইবে। আপনি পাগড়ী পরা ব্যবসায়ী লইয়া যাগা হউক, একটা মিটমাট করুন। পাগড়ী পরিলে আপনাকে বেশ ভাল দেখায়। আপনি যদি ইংরাঞ্জী ছাট পরেন, তাহা হইলে আপনাকে চাকরের মত দেখাইবে।

এই পরামর্শে কার্য্যকরী জ্ঞান বেশ পরিষ্কৃত ছিল তাহার স্বদেশপ্রেম না থাকিলে তিনি পাগড়ী ব্যবহারের জন্ত জ্বির করিতেন না। চাকরের সহিত তুলনা ঘায়া অপমানের চেষ্টা করায় তাহার সর্ব্বাধিকার প্রকাশ পাইল। শ্রমিকদিগের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ছিল। যে

সকল শ্রমিক আফ্রিকায় যাইয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সম্মানসম্বন্ধিত খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেও তাহাদের সংখ্যা কম ছিল না। তাহারা ইংরাঞ্জী পোষাক পরিত এবং হোটেলের ভূতোর কাজ করিত। আবদুল্লা শেঠ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ছাটের নিম্মা করিয়াছিল। হোটেলের ভূতোর কাজ করা অপমানজনক বলিয়া বিরোধিতা হইত। এখনও অনেক তাহাই মনে করিয়া থাকেন। মোটের উপর আবদুল্লা শেঠের পরামর্শ আমার মন্দ লাগে নাই। আমি আদালতের ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আদালতে পাগড়ী পরা সম্বন্ধন করিয়াছিলাম। ঐ

ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন চলিয়াছিল এবং আমাকে মন্দ আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। ফলে, আমার আফ্রিকা গমনের পর, অল্পদিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সকলের নিকট আমি পরিচিত হইয়া গেলাম। কেহ বা আমাকে সম্বন্ধন করিল—কেহ বা তীর নিম্মা করিতে লাগিল।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যতদিন ছিলাম, ততদিন পাগড়ী ব্যবহার করিয়াছি। কোন সময় কি উপলক্ষে আমি মাথার পোষাক ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করিলাম, সে কথা পরে পাঠকগণকে জানাইব।

(ক্রমশঃ)

## অশ্রু-লেখা

### শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী

বিদায় বেলা সন্ধ্যা-মিলন ছায়া

ঘণিয়ে লই সখি তোমার মুখে

ব্যবাহত মোণ করণ গীতি

তাতে তারে বাজ্জ আমার বৃকে।

চাকতে গেলে ব্যথা হাসি দিয়ে,—

চোঁট ছ'খানি কোমল পাণ্ডু-পরা

উঠল কৈপে অঙ্গল শুধু চোখে

অশ্রুজলের মুক্ত বাধলধারা।

যে কথা হায় বলতে গেলে তুমি

ছুটিলো নাকে। তোমার মুখে প্রিয়ে,

সেই কথাটি লিখলে যাবার বেলা

অশ্রুধারার সজল আধার দিয়ে।





### শ্রীকবিরচন চট্টোপাধ্যায়

#### আত্মক্লিষ্ট

হরেন্দ্রবাবু যথোচিত সমাদর করিয়া সমীরকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, “অবনী কি গাড়ী নিয়ে এখানে বায় নাই?” সমীর বলিল, “বাকের মুখে পড়েছে, তাই দেখা যাচ্ছে না। এখন এসে পড়ল আর কি!”

এই সময় লতিকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে, মহুয়া আসিয়াছে কি না, দেখিতে আসিয়াছিল। মহুয়াকে না দেখিয়া তাহার আনন্দ উৎফুল্ল নদী হস্তমুখ মুখখানি সহসা বিগল ভাব ধারণ করিল। হরেন্দ্রবাবুর পার্শ্বে দিয়া সে দাঁড়াইল এবং সমীরের মূলের প্রতি সরল শাস্ত্র, বেহেপূর্ব জিজ্ঞাসা নয়ন সংস্থাপন করিয়া, অত্যন্ত পরিচিতার মতই সোধাদন করিল “দাছ, মহুয়া কেন এলোনা?”

এই অভ্যর্থনায় মধুর সোধাদন সমীর যেন চমকিয়া উঠিল। সমীরের বিশাল বক্ষ মধ্যে যে মেহের রমধারা বক্ষ নদীর মত অক্ষয়সলিলা রূপে নিত্য, একটা কোমল, একান্ত নির্ভর পরায়ণ, অনন্যোপায় দেবতার নির্মাল্যের মত পবিত্র বালিকার স্বর পরিয়েঠন করিয়া প্রাবাহিত, সেখানে তেমনিই মধুর, তেমনিই অপূর্ণ-বিক, তেমনিই

সতরুণ আহার্যন শুনিবামাত্র সে হৃষ বিহ্বল অন্তরে সমস্ত ব্যবধান, ময়ূষ্মের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া উত্তর দিল “দিদি, সে আসছে। তোমাদের কাছে সে কি না এসে পাবে? সে তোমাদের অগ্নীর স্নেহ বস্ত্রায় ভেসে গেছে।”

মহুয়া পশ্চাতে আসিবেছে শুনিয়া লতিকা দ্বারের নিকট গিয়া তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মহুয়া ও অবনী আসিয়া পৌঁছিল। লতিকা ছুটিয়া গিয়া মহুয়ার হাত ধরিয়া অত্যন্ত সমাদরে গাড়ী হইতে তাহাকে নামাইয়া লইল। লতিকার আশ্চর্যের আচরণে মহুয়া হাসিয়া ফেলিল ও বলিল, “লতিকা বোন, আজ এদে কি? আমাকে কি তোমরা পর মনে করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ?”

লতিকা মহুয়ার কথায় যেন অন্তরে বেদনা অস্বভব করিল। সে বলিল, “তুমি আজ একথা বলছ কেন? আমরা কি কোনদিন তোমাকে পর মনে করেছি মহুয়া?” তারপর কি ভাবিয়া লতিকা মুহু মুহু হাসিয়া উত্তর করিল “বেশ, দূরে সরিয়ে দিচ্ছি একথা বধন তোমার মনে হচ্ছে, তখন তোমাকে আর ছেড়ে দেবো না। কিন্তু বলে রাখছি দাছকে ক্ষেপে উঠলে দেখতে

পাবে কি করি। দাছ ত আর এখন তোমার একলার নয়? এতদিন তোমার একলার দাছ ছিল, এখন থেকে আমাদের ভাগ দিতে হবে? সত্যি মিথ্যা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার?”

এবার মহুয়া বলিল, “তাই না কি! তোমরা সবসেরা সাহস, সব পায়! আমরা বুনে বুড়া দাছটিকে এরই মধ্যে দখল সাব্যস্ত করে নিয়েছি। বেশ কথা! ভাগ দেওয়ায় আমার কোন আপত্তি নাই—তবে ভয় হয় তুমি কি ততখানি দূর থেকে অংশ নিতে পারবে বোন? আমরা জঙ্গলের সাহস কেমন করে ভালবাসতে হয় তা জানি না। আমরা গরীব, ভিক্ষুক, আমাদের কি এমন আছে যে তার ভাগ দেব লতিকা? ভগবান দেবার মত কোন সম্পত্তিই আমাদের দেন নাই, যা তোমাদের দিতে পারি!” বলিয়া ছল ছল চক্ষে লতিকার মূলের প্রতি উত্তরের প্রত্যাশায় চাহিল।

লতিকা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে মহুয়ার হাত ধুখানি নিজ হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উত্তর করিল, “মহুয়া তোমার যা আছে, তা যে ফুৎের ভাঙরেও নাই। তোমার যা আছে, তার মূল্য হয় না। তা অমূল্য, হুত্থাপ্য। টাকার বিনিময়ে তা যদি পাওয়া যেতো, তাহলে, অনেক রাজা রাজদার গৃহ মরুভূমিতে পরিণত হতো না। মহুয়া তোমার মুখ সত্যিকার প্রাণ আছে, মহুয়ই আছে। যা শত বাবদনতা দিয়েও লুকিয়ে রাখতে পার নাই। তার সমান আমরা পেয়েছি। আমাদের তুমি কি আর কথাই ফাঁকি দিতে পার?”

এবার মহুয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল “ছি লতিকা—অমন কথা বললে আমি রাগ করব—চলে যাব বলছি।” “ছেড়ে দিলে ত যাবে? বনের পাখী একবার কোন গরিতে ধরা দিলে তার আর ছাড়ান নাই। তাকে খাচার ভেতর থাকতে হবে?”

মহুয়া হাসিয়া বলিল “বটে! তার যদি ভাল না লাগে। সে যদি শিকল কাটে?”

লতিকা বলিল “তা আর পারতে হয় না। সোপার শিকল কাটা সহজ। কিন্তু, মহুয়া মেহের শিকল বড়

কঠিন—কাটা যায় না। সে অঙ্গ তোমার নাই। ধরা দিয়ে নিজেকে দান করবে যে তুমি স্বপ্নী। তুমি শিকল কাটবে কি দিয়ে তুমি?”

এই সময় নীহারবালা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং লতিকাকে সোধাদন করিয়া বলিল “ভালা মেয়ে, বেলা হয়ে গেল লোক জন যাবে কখন? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর জ্বরে দিচ্ছে। তারপর মহুয়ার দিকে চাহিয়া বলিল “এসো বোন এসো। তোমার দেহী দেখে, আমাদের ভাবনা হয়েছিল।”

মহুয়া অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিল “বিলম্ব হবার অপরাধ আমার নয়। সেটা হচ্ছে ঐ গরুর গাড়ীর। হেঁটে এলে কোন কালে এসে যেতাম।”

তখন সকলে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। মহুয়াকে দেখিয়া করুণাময়ী তাহার চিন্তা স্পর্শ করিয়া চুপন ও আশীর্বাদ করিলেন।

লতিকা আজ করুণাময়ীর প্রদত্ত রংকরা কাপড়খানি পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার সৌন্দর্য শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়া অভিনব দেখাইতেছিল।

এই সময় উমেশ ও প্রবোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রবোধ বলিল, “মা। এখানে অনেক অসুস্থগমন করিলাম, কোথাও কলাপাতা পাওয়া গেল না?”

করুণাময়ী বলিলেন “সে কা ত আগেই বলেছিলাম। এখন শালপাতা আনতে দাও।”

উমেশ শাল পাতার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। করুণাময়ী বলিলেন, “বেলা অনেক হয়ে গেছে। লতিকা মহুয়াকে একটু জল খেতে দে মা।

প্রবোধ বলিল “দেখ মা, মহুয়া আজ তোমার রংকরা কাপড় পরেছে!” এ কথায় মহুয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া মুক্তিকার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। একটা উত্তর তাহার জিজ্ঞাসায় আসিয়া কিরিয়া গেল।

যথা-রীতি আনন্দ উৎসবের ভিতর আহারাধি হইয়া গেল। লোক-বিরল নয়নপূর্ণ মধ্যাহ্নের আনন্দ-কোলা-হলে মগ্নিত হইয়া উঠিল।

জ্যোতিষী ঠাকুর এই আনন্দ-পরিবেশের প্রদান পাওয়া বলিলেও অস্বস্তিক হয় না। সকলের মুখেই একটা



প্রসন্নতা পবিত্র হাসি লীলায়িত হইতেছিল। সমীরের চিন্তা ভাষাকান্ত মনটা আত্ম সহসা একটা পুলক-বেগনায় বোম্বাঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল।

হরেন্দ্রাবাবু বলিলেন “সমীর! আজ তোমাকে বড় হৃদয় মানিয়েছে।”

সমীরের অপর প্রান্তে একটা লম্বা হাত-রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে উত্তর করিল “মৃত্যুর দিন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির যেমন মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত স্বপ্ন নিঃশেষে ভোগ করিতে—নির্দোষ উন্মুখ দীপ যেমন প্রবল উৎসাহে অগ্নি উঠে—এও বোধ হয় তাই। বেদে-কীর্তন বিস্ময়ের দিন এগিয়ে এসেছে, তাই আজ আমার এই সাধ, বাবু। সারা জীবনের অন্ধ অভ্যাস, অজ্ঞায় বিশ্বাস, মিথ্যা অভিনয় সত্যিকার স্নেহের দরবারে নিজে আত্ম করে এনেছি—শান্তি চাই, এর বৈধি কিছু পাবার আশা রাগি না। আমি আমার বিচার করুন। আমাকে শান্তি দিন। অপরাধী হও পাশ। এই আমার প্রার্থনা।”

হরেন্দ্রাবাবু বলিলেন, “সমীর, এ সব কথা কেন তোমার মনে আসছে। যদি কিছু অজ্ঞান হয়ে থাকে, মুখে বল। তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবন-ব্যাকার পথে যদি কোণা বাধা হয়ে থাকে স্পষ্ট করে বল সর্বদা বিনিময়ে তার প্রতিশোধ করব। তুমি কি আমাদের যাবতের পীড়িত? তুমি যে আমার বন্ধু! আমার আত্মীয়! আমার কাছে কিছু সুখও না।”

এই সময় করুণাময়ী সেখানে আসিয়া বলিলেন, “দেখুন আপনাবা বাতানী! আমাদের জীবন ধান কণ্ঠে—সেজন্য অস্বস্তির রক্তজ্ঞাত কানাবার অবিকার দিয়ে আমাদের সুখী করুন।”

সমীর একবার করুণাময়ীর দেহাঙ্গ নয়নের দিকে চাহিয়া তখন চক্ষু নত করিয়া বলিল “আমাকে কি কবুতে হবে বলুন?”

“যখন আপনার বিরাজেন, তখন অস্বস্তি দিন; আমার পুত্রের সহিত মহম্মার বিবাহ দি।”

সমীর বলিল “বেদের ঘেয়েকে বৌ করে চির-দিন সমাজের চক্ষুতে পতিত হয়ে থাকতে প্রস্তুত আছেন?”

হরেন্দ্রাবাবু ও করুণাময়ী উভয়ে বলিলেন, “আছি। সে জন্ত কোন চিন্তা নাই। সে ভার আমাদের।”

সমীর কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিল “আপনাদের দেখছি অসীম সাহস! এতটা সাহস শেষ পর্যন্ত কি থাকবে? বার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে প্রস্তুত হাচ্ছেন, তার জাত কুল কিছু নানা নাই, সে বেদের ঘেয়ে। এ কথা কি কুলে গেছেন?”

হরেন্দ্রাবাবু বলিলেন, “এ কথা কুলের কোন সমীর! এ কথা জেনেই ত অগ্রসর হয়েছি।”

“তা’ হলে মহম্মাকে একবার এখানে ডাকুন।”

মহম্মা তার দাহুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সমীর বলিল, “মহম্মা!” “কি দাছ।”

এতদিন ধরে যে গুরুভার আমার স্বপ্নের উপর ছিল, সে জন্ত সর্বদা সত্যক প্রবোধের মত এতদিন তোর পাহারা নিয়ে এসেছি; সে ভার আজ হরেন্দ্রাবাবু নিয়ে আমাকে নিষ্কৃত দিতে রাকি হয়েছেন।

মহম্মা বাপাঙ্ক-কণ্ঠে উত্তর করিল “দাছ তুই আমার ভার আত্ম নিশ্চিন্ত হয়ে নামিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে ছুটে এসেছিস, বৃকতে পারলাম। কিন্তু তোর ভার আমি যে নামাতে পারব না দাছ। সে শক্তি আমার নেই। তারপর আমি বেদের ঘেয়ে, সহস্র স্বপ্ন-ঐশ্বর্যের ভিতর ত আমার কেবলই স্বেচ্ছাচ ও কুঠা ভেঙ্গে থাকবে বেদের ঘেয়ের অভিমানে নিয়ে। তার উপর এদের নিকট হ’তে একটুখানি আশাও পেলে সে অপমান বরণ্যত করতে যে পারব না।”

সমীর বলিল “তার পথ পরিষ্কার করে, তোর নিজের পৌরবে প্রতিষ্ঠিত না করে কি সমীর যেতে পারে? তারপর করুণাময়ীর প্রতি চাহিয়া বলিল, “প্রবোধকে এখানে ডাকুন।”

প্রবোধ আসিল। সমীর অত্যন্ত আগ্রহভরে তার দুখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহে চাপিয়া ধরিয়া সজল নয়নে বলিল “দাছ ভাই, আজ আমার দুর্বল কপিত হস্ত হইতে তোমার সবল হাতে আমার সারা জীবনের আনন্দ তুলে দিতে চাই, তুমি কি সে ভার গ্রহণ করে বৃদ্ধ বেদকে মুক্তি দিতে পারবে না। আজ

মহম্মা বলিয়া সমীর মহম্মার হাত প্রবোধের হাতের উপর চাপিয়া, উর্ধ্বে ভগবানের আশীর্বাদ নব দম্পত্যীর জন্ত ভিক্ষা করিল।”

চিরাগতের জায় বিপিন এসব অতৃপ্ত দেরিভেছিল। সে দুয়ার বোধ হইল মুখ কিরাইয়া লইল।

করুণাময়ী বলিলেন “আপনি দেবতা। তারপর প্রবোধকে সন্ধান করিয়া বলিলেন “প্রণাম কর প্রবোধ।”

মহম্মা ও প্রবোধ উভয়ে নত জাহ হইয়া বৃদ্ধ সমীরের চরণপ্রান্তে প্রণাম করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সমীর তাহাদের হাত ধরিয়া জুগিয়া বলিল “দেখুন, হরেন্দ্রাবাবু এ শুক-বিবাহে আমারও কিছু যৌতুক দিবার আছে। রূপণের ধনের মত এতদিন ধরে তা সুকিয়ে রেখেছি। আজ এই দরবারে তা দিতে চাই।” বলিয়া সে তার জুলির ভিতর হইতে একটা ছাকড়ার ছোট পুটলী বাহির করিল। সেটা জুগিয়া বলিল, “মহম্মা নাগ, তোমার পিতার দত্ত আশীর্বাদ—তোমার আত্ম সম্মান রক্ষার অমোঘ অস্ত্র যার বিকক্ষে সমীরের কোন নিরুন্নতা এমন কি তোমার স্বামীর উদার অহুগ্রহও মাথা তুলে দাঁড়াতে কোন দিন সাহস পাবে না।” বলিয়া সমীর করুণাল নীরব হইল। তারপর বলিতে লাগিল “সে কথা, আজও আমার সেইনের কথা, বল মনে চাই। যেদিন রম্মা তোকে চুরি করে নিয়ে আসে, তখন তোর কি কাশা, ছোট্ট ছুট ছুটে মেয়ে। গলায় একগাছি সোণার বিছে হার, হাতে একখানি খামে মোড়া চিঠি। তোকে ফেলতে দিয়েছিল, তোদের বাড়ীর দুয়ারের নিকট ডাক মাঝে তোর বাবা।”

সমীরের কথায় সমাগত সকলে উৎকর্ণ ও বিশ্বাসঘাত হইয়া উঠিল। একটা অসম্বল শুকতায় যেন সে খানটা পরিপূর্ণ হয়ে—একটা আশঙ্ক-জড়িত আগ্রহ অবনী

মুখে প্রাণুটিত হইয়া উঠিল। হরেন্দ্রাবাবু যেন আর বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। তিনি সমীরের খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “বল সমীর বল, সে জায়গাটা কি এলাহাবাদ?”

সমীর দীর ও শাস্ত ভাবে উত্তর করিল, “উত্তেজিত হবেন না। বলব বলেই ত এসেছি। শুধু আমি, প্রণাম নিয়ে এসেছি। হ্যা এলাহাবাদ বটে। প্রণামের মেসার সময়।”

হরেন্দ্রাবাবু আনন্দে লাকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন “আর বলতে হবে না সমীর। মহেন্দ্রাবাবু তোমার অহুতপ্ত আশ্বাস নিয়েদন ভগবান শুনেছেন। তোমার বেয়ে নশ্বিনী কিরে এসেছে।”

সমীর পূজ ও হার মহম্মার হাতে প্রদান করিল। এতদিন পর্যন্ত সে পূজ সমীর খোলে নাই। মহম্মা তার পিতার প্রদত্ত পূজ ও হার মাথায় জুগিয়া লইল। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুধারা জায়ায়াইতেছিল।

অবনী ভাড়াভাড়ি মহম্মার হাত হইতে পূজখানি লইয়া উন্মোচন করিয়া ফেলিল। তারপর সে চাঁৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “এ যে বাবার নাম সেই মহম্মা বোন চক্ষু তেঁতু পিতৃ-পুত্র হয়ে ফিরে চল।” বলিয়া অবনী মহম্মাকে জড়াইয়া ধরিল।

অকস্মাৎ মহম্মার বাল্যের স্মৃতি-রেখা গুলি তার মানপটে দীর্ঘে দীর্ঘে কিরিয়া আসিতেছিল। সে যখন তার দাহুর দিকে কিরিয়া জাকিল “দাছ।” তখন সমীর সেখান হইতে অনেকখানি গৃহের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অশ্রু রক্ত-কণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দিল, “আর কেন বিদী?—ছেড়ে দে তোর দাছকে!” বলিয়া সমীর ক্ষত পদবিক্ষেপে অদূর অঞ্চলের ভিতর মিশিয়া গেল।

তখন মহম্মার কাতর আহ্বান আকাশে বাতাসে স্রুত হইতেছিল “দাছ কিরে আয়, কিরে আয়।”

সন্মাত্ত





## বঙ্গে কৃষি শিক্ষা

১২২৪—২৫ সনের বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কার্য বিবরণিতে কৃষি-শিক্ষা সম্বন্ধে বাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সারাংশ আমরা নিয়ে বিবৃত করিলাম।

আলোচ্য বর্ষে কৃষি-শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই মত স্থির করা হইয়াছে যে, ঢাকার কৃষি-বিভাগে যে প্রাণালী অবলম্বিত হইয়াছে স্থূলত তাহাই অগ্রকরণ করা হইবে। সর্ব্বত্র এগ্রিকালচার কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, উহার পরিবর্তে একটি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠা আবশ্যক বলিয়াই ঢাকা বিভাগের কল্পনা প্রথম করা হয়। কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিটার মিলিংগেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার এই উভয়ের মধ্যে কৃষি-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার পরে ঐ প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। ইহার সার কথা এই যে, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়। বাহারা নিম্নেরা ধামার করিতে ইচ্ছুক সেই সকল যুবককে নয় কৃষিবিজ্ঞানের মূল স্বত্বগুলি শিক্ষা দেওয়া হইবে স্থির হয়। কার্য পরিচালনের পক্ষে এখনও ঢাকার অভাব বহিয়াছে, তবে আশা করা যায় ১২২৬-২৭ সনের বাজেটে টাকা পাওয়া যাইবে। ঢাকার কৃষি বিভাগের হইতে এই বৃত্তা যাইতেছে যে, ব্যবহারিক কৃষিকার্য পরিচালনের জন্ত লোক শিক্ষা ততটা চাহে না, কিন্তু শিক্ষা সমাপনের পরে সরকারি চাকুরি পাওয়ার প্রত্যাশা থাকিলে লোক হইতে আকৃষ্ট হয়। আলোচ্য বর্ষে অনেক বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও মাত্র পাচটি উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া গিয়াছে, অথচ ১৫ জনের স্থান বালি ছিল এই কারণে এই-রূপ স্থির করা হইয়াছে যে, কৃষি বিভাগে যে সকল ভিমন-ট্রেটর আছে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইহাতে নিশ্চয়ই তাহাদের উপকার হইবে। যে সকল ভিমন-ট্রেটরদের চাকুরি গিয়াছে তাহাদিগকেও জানান হইয়াছে যে তাহারা বৃত্তি লইয়া ঢাকা স্থলে ছাত্ররূপে প্রবেশ হইতে পারে।

কৃষি শিক্ষা বাস্তবিকই বড় ব্যয়বান। কৃষিবিভাগের ডিস্ট্রিক্ট অফিসর বাহারা আছেন তাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করা আবশ্যিক, কারণ তাহা হইলেই তাহারা লোকের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রারম্ভন এবং অনভিজ্ঞ শিক্ষাবিহীন কর্মচারী প্রেরণ হেতুই লোকমত কৃষি-বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং অনেক কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিতে হইয়াছে। কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, জনসাধারণ এই বিষয়ে ঠিকরূপেই মত প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিয়ার জিলায় কৃষিবিষয়ক কার্যের উপায়করণ ব্যবস্থা বিহিত হইলে সমগ্র বঙ্গের ধনেন্দ্র্য বাড়িয়া যাইবে। ঢাকা এগ্রিকালচারাল স্কুল এবং প্রত্যন্ত ঢাকা এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য এই যে, কৃষিবিভাগের কর্মচারীদিগকে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া তোলা যেন জনসাধারণ তাহাদিগকে সমান করিতে পারে।

বঙ্গের স্থূল সন্থে যে সকল বিষয় অধ্যাপিত হয় কৃষিকে তাহার অস্তিত্ব করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচ্য বর্ষে আরও বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। বঙ্গীয় স্থূল সন্থে শুধু সাহিত্যাদি বিবিধ শিক্ষা দিবার জন্ত যে পাঠ্য বিষয় নির্দেশিত আছে আহার পরিবর্তন সাধন আবশ্যিক, বরষাশে অনেকই এই মতের পোষক, কিন্তু এই সকল স্থলে ব্যবস্থা শিক্ষার রূপ বোলা সম্বন্ধেও লোকমতে বিস্তার অনেক। স্থলে স্থলে ব্যবস্থা শিক্ষার রূপ বোলায় প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষার্থীদিগকে মানসিক শিক্ষা দান এবং তাহাদের অন্তরে এই বোধ জাগ্রত করা যে পরিষরের মর্যাদা আছে।

পঞ্চমে ৬০টি মিডল ভার্মিকুলার স্কুলে কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাথমিক বিভাগের ওসিকে বার দেওয়া হইয়াছে, এই কারণে যে এই সব

বিভাগেই সমগ্র মনোযোগ নিরক্ষরতা দূরীকরণের দিকেই দেওয়া আবশ্যিক। হাই স্কুল সম্বন্ধে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। প্রত্যেক স্থলেই ছই এক বিধা জমি আছে, কোন কোন স্থলে ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমিও আছে। ছোট ছোট জমিতে উত্তান কৃষির কাজ করা হয়, আর বড় বড় জমিতে ধামারের কাজ হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক স্থলেই গরবমেন্ট হইতে টাকা দিয়া সাহায্য করা হয়, পরে স্থলের জমির আয়ত্তে পরচ নির্বাহিত হওয়ার অবস্থা পাড়াইলে গরবমেন্ট ঐ টাকা অপর স্থলে প্রদান করেন।

১২২৪ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এক বৈঠক বসিয়াছিল; ইহাতে স্থিরীকৃত হয় যে পাণ্ডাবের প্রাণালী সম্বন্ধে অগ্রদৃষ্টি করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে দুই একটি কমিটি গঠিত হয়, ইহাতে এই সকল ব্যক্তি সভা থাকেন,—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল মিটার টেললটন, গরবমেন্ট তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ মিটার মাকলিন এবং রায় মহাধনাথ পাল বাহাদুর। ইহার পক্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিয়া ছেন, এবং বঙ্গ বিবৃত্যতয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা কি করা যায় তৎসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রস্তাব এখন গরবমেন্টের বিবেচনামানি রহিয়াছে।

বঙ্গ এখনও অনেক স্থলে স্থলের সঙ্গে কৃষি শিক্ষার রূপ সাংযুক্ত আছে, যথা, অমরপুর, বর্ধমান।

আনানসোলের মেম্বলিট এগিস্কেপেল মিসন স্থলে কৃষি রূপ আছে, ইহাতে গরবমেন্ট মানিক ৫০০ টাকা সাহায্য দিয়াছিলেন। মিটার মাকলিনের রিপোর্টে প্রকাশ, এখানে ভাল কাজ চলিতেছে।

চট্টগ্রাম জিলায় দুর্গাপুর স্থলে কৃষি বিভাগ হইতে বার্ষিক ৩০০০ দেওয়া হয়; এখানে কৃষি কাজ দেখাইবার জন্ত ১৬ বিঘা জমি আছে। এই স্থলে কার্য বড় সম্ভাবনাকর হইতেছে না। ছেলেরা রূপের লোপাড়ার কাজ নিয়াই প্রায়ই থাকে, মাঠের কাজ খুব কমই করা হয়। ইহাতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার পরিবর্তন আবশ্যিক।

নবীয়া বেলার চাপরা চার্ক মিশন স্থলের সংশ্লেবে নিকটবর্তী ২৬ বিঘা জমি আছে। এখানে স্থলের ছেলেরা কৃষিকার্য করে। নবীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল অফিসর সময় সময় এই স্থলে আসিয়া কৃষকশ্রেণীর নিকট সংল ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং ইহাতে মনে হয়, বাস্তবিক বেশ ভাল কাজ হইতেছে।

( শিক্ষা সমাচার হইতে অনুদিত )

## সৌন্দর্য

## স্বামী

শ্রীঅমলা বহু

নারীর সৌন্দর্য কিসে ? শুধু অলঙ্কারে, বলয়, অনন্ত, চূড়ি, আর চন্দ্রহাসে ?  
রাশা শাট পরিগাঢ়ী নীল বসনেতে ?  
তাহা নয় ! আছে রত্ন শ্রেষ্ঠ ইহা হইতে ।  
শব্দ সিন্দুরের শোভা বাড়ে যার কাছে ।  
শত তপস্কার ধন সেই নিমি আছে ;  
তাহা পাতিতর রত্ন সতীর অধীন ।  
যার কাছে পঞ্চগায় হর প্রভাবী ।

স্বামী সোহাগের ধন ; গুরু রমণীয় ;  
আচার্য বরোণ ; উপদেষ্টা সৌম স্থির ;  
হোতা প্রাণ যজ্ঞে ; বঁধু প্রাণ-রাসে ।  
শ্রেষ্ঠ সর্গকালে, প্রিয় সর্ব রসে ।  
দেবতা হৃদয়, মহান গরীয়ার ।  
জীবন সাধারণ, সম, বিষ্ণু উত্তান,  
বিনা প্রেম স্পর্শে, প্রিয় সমোপনে ।  
জীবন জীবনানী আবার বিনে ॥





## শ্রীরঙ্গ-পতন

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষে শ্রীরঙ্গ-পতন বা সেরিগাপাটমের বহু মূল্যবান হইলেও ইহার বর্তমান অর্থ-পতিত অবস্থা পর্যটক বা জনসাধারণকে মোটেই আকর্ষিত করে না। একদিন তাহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল—দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল আজ কালক্রমে আর—কর্তনে তাহা আজ একটা জীর্ণ পল্লী মাত্র। সেই দুর্ভেদ্য-দুর্গ-শ্রেণী ভর পূর্ণের সমষ্টি মাত্র—পরিখা শ্রেণী গুরু—মূল্য-বাহুস্বরের বাসভূমি—স্নেহ প্রকৃতি মহামারীর লীলাভূমি। প্রকৃতির যে ধ্বংস ও গঠন লীলা, যুগযুগান্ত হইতে চলিয়া আসিতেছে শ্রীরঙ্গ-পতনও সেই লীলাময়ী লীলা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

মহীশূরের অধিপতি হায়দার আলী ও তৎপুত্র টিপু-সুলতানের সময়ে ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ইহা ভারতের একটা প্রাচীনতম নগর—এককালে ইহা সুবিখ্যাত। বৈষ্ণব সান্ন্যাস প্রবর রামাচল ও তাঁহার অধুবর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল—তবে কবে যে কোন মহাপুরুষ এই নগর স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহা আজও অতীতের মদীয়ম গর্ভে নিহিত। রামাচল্লের সময়ে ইহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে এই নগরকে দেবরাজ বিষ্ণুর নগর বলিয়া থাকেন। ইহাই প্রাচীন মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ছিল। কাবেরী নদীর শাখা-সমূহের মধ্যস্থ একটা প্রকাণ্ড দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে এই নগর স্থাপিত; তাই বৈষ্ণব প্রায় তিন মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইলের কবন হইবে। সমুদ্র সমতল হইতে ২,৩৫০ ফুট উচ্চ এবং ইহার সমস্ত জমির পরিমাণ ২০০০ একর।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গ-পতনের দুর্গ অবরুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে মহীশূর-অধিপতি টিপুসুলতান নিহত হন ও এই নগর ইংরাজরাজের অধিকারে আসিলে, উল্লারার বংশের রাজবাগিনকে তাহার সিংহাসনে স্থাপন করেন—এই সময়ে শ্রীরঙ্গ-পতনের অধিবাসীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছিল কিন্তু রাজধানী এই নগর হইতে অপসারিত হইলে ক্রমশঃ ইহার শ্রীবৃদ্ধি রুদ্ধ হয় ও এই উন্নতিশীল, সমৃদ্ধ নগরী বিন

দিন অবনতি প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে ইহার বাহাড়া ভাল নহে কারণ প্রতিবৎসর মহামারীতে এই নগরের অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতৎ সত্ত্বেও ইহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নিকট প্রস্তুত শিক্ষা ও জ্ঞানের আধার বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রাচ্য দেশের ঐশ্বর্য, বিলাস প্রভৃতির কত হৃৎকম্প বিম্বিত্ত নৃতির কন্ডাল যে এই ভয় স্তূপাশির মধ্যে গুপ্ত ভাবে নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৯০ খৃঃ বিখ্যাত নামক ত্রাশ্ব এই নগরে এক মন্দির নির্মাণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ঐ মন্দির 'শ্রীমদ' নামে উৎসর্গীকৃত হয়। শ্রীরঙ্গ অর্থে আদিরঙ্গ বুঝায়। 'শিবসমুদ্র' (Shiva samudra falls) যথার বলা হয় ও বর্তমান দক্ষিণ-ভারতের একটা আধুনিক মন্দির, স্বত্বায়ক বলিয়া পরিচিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে বিখ্যাত নামক ত্রাশ্ব বৌদ্ধ ছিলেন ও তাঁহার গুরু ভগবান বুদ্ধদেব কর্তৃক এই দ্বীপে একটা ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। গুরু আবেশ মত তিনি যখন এই মন্দির নির্মাণ করিতে বাস্তু ছিলেন তখন নিকটস্থ এক পিপীলিকার বাসগৃহের মধ্যে জীবাশ্মের মুষ্টি প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি ঐ বিগ্রহ সম্বন্ধ মন্দির স্থাপনা করিয়া মন্দির তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন—ক্রমে মন্দিরের চতুর্পার্শ্ব হইতে সহর গড়িয়া উঠিয়া শ্রীরঙ্গ-পতন নামে অভিহিত হয়।

১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত এই নগর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকারস্থ ছিল এবং নানারূপ ধর্মোচিতক কার্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। পুরোহিতগণ এই নগর শাসন করিতেন। পুরোহিত-প্রাধিকারের যুগে এই নগরের চতুর্দিকে বড় বড় মন্দির, স্ব-উচ্চ স্তম্ভ-ভোজন ও ধর্মীয় পুণ্যভূমি স্থাপিত হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এই নগরের বিপুল ঐশ্বর্য সম্পন্ন হইয়া কৃষ্ণদেব রাই নগর অক্কেম করেন ও তৎপরে ইহা তাঁহার বংশীয়গণের অধিকারে ছিল। পরে উহা ক্রমশঃ বহু রাজার হস্তান্তরিত হয়। শেষ হিন্দু রাজার নাম ছিল 'নানুজা

আরুণা'। তিনি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধীনস্থ এক মুসলমান সেনানী কর্তৃক পটভূত হন—ইনিই বিখ্যাত হায়দার আলী।

শ্রীরঙ্গ-পতনের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও ইংরাজের কামান তাহা ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পের হিসাবেও এই দুর্গ প্রাচীনতম নহে—ইহা মন্ডর, দৃঢ় ও বিপুল গাঁথনী মাত্র—এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে—এই দুর্গ অধিকারের ক্ষয়কয়েকটা যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। দুর্গের চতুর্দিকে মাটির উচ্চ ও বিস্তৃত বাঁধ—বৈষ্ণব পুরোহিতের প্রস্তরগণ্ডে সমাচ্ছাদিত দুইটা বড় ফটক আছে ও ৪টি ক্ষুদ্র গুপ্ত পথ ছিল। পুরুষদিকের গেটটির নাম 'বাবাশোর' গেট, ইহা ঠিক দরিয়া দৌলত-বাগের দিকে এবং গাভান, টিপুর সৌদামিন্যান ও গুয়েল-সলীত্রজ ইহার পরেযায় অবস্থিত। দ্বিতীয় ফটকের নাম 'হুলতান' বা মহীশূর গেট—ইহা ১৭৩০ খৃঃ টিপুসুলতান কর্তৃক নির্মিত হয়। টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর হাতী ফটকের দিকের রাস্তাটা পরিবর্তিত করিবার ক্ষয় এই ফটকটি ইংরাজগণ কর্তৃক ভাঙিয়া নুতনভাবে গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কীর্ষি চিত্তের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আজও বিজ্ঞানমণ্ডলে আছে, তরায়ী সুলতান টিপুর রাজপ্রাসাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইহা আগাগোড়া প্রস্তর নির্মিত ও চতুর্দিকে ছিল বর্তমানে ইহা মহীশূর গভর্ণমেন্টের চন্দনকাঠের গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এবং যে স্থানে টিপু সুলতানকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানের উপর ভূতপূর্ব কুম্ভারাজা যে বিলাসবহুল স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিজ্ঞানমণ্ডলে আছে। এক্ষণে তাহার স্থান্য নগরীকায় লাক্ষমরী নৃত্যলীলার পরিবর্তে সৌভাগ্য ও বড় বড় গিরগিটার বজ্জম নীরব নৃত্যের লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে আর চতুর্দিকের নির্বিঘ্ন ঘন বনানী নীরবে নীরবায় ফেলিয়া অতীতের বিদ্যা ও ঐশ্বর্য স্বরূপ করিয়া দিতেছে।

দুর্গের মধ্যস্থলে টিপুসুলতান নির্মিত ক্ষুদ্র মসজিদ—ইহাও টিপুসুলতানের এক বিরাট কীর্তি, ইহা ছাড়া টিপুর

প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং শ্রীরঙ্গ নামক মন্দিরটা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র মসজিদ সম্বন্ধেও একটা প্রবাদ আজিও শুনিতে পাওয়া যায় এবং তথ্যের সুলতান টিপুর চরিত্রের একাংশ বেশ সুস্মৃতে পাওয়া যায়। এইরূপ কথিত আছে যে কান্দোরাও নামক এক হিন্দু মহী হস্তাশ্রমিকের মন্দিরস্থ একটা অদ্ভুতরূপে কক্ষে টিপুসুলতান ও হায়দার আলীর পরিবারস্থ মহিলাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। যুঝাঝুকে প্রাণে মারিবার সম্বন্ধেও তাহার ছিল। এইখানে কয়েকজন হিন্দু বালকের সহিত টিপু একদিন মার্শেল খেলিতেছিলেন—এমন সময় এক মুসলমান কবীর আসিয়া তাঁহাকে বলেন "বাবা! তুমি দোষাগ্রাণ—তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে যখন রাজা এইখানে তখন এই মন্দির ভূমিস্যাং করিয়া এখানে একটা মসজিদ স্থাপনা করিবে। এই মসজিদ তোমার জয় ও সৌভাগ্যের স্বাক্ষরীকৃত হইবে।" বালক টিপু হাসিয়া ফকিরকে ধমকায় দিল ও প্রতিশ্রুতি দান করিল। সিংহাসন লাভ করিয়া টিপু মুসলমানকীর মন্দির ভূমিস্যাং করিয়া সেই স্থানে ক্ষুদ্র মসজিদ নামক অতুলনীয় কাঙ্ক্ষার্থ্য শোভিত মসজিদ নির্মাণ করিল—ইহাই তাঁহার প্রিয় মসজিদ ছিল এবং এই মসজিদেই তাঁহার রাজত্বের গৌরব রসি অন্তর্মিত হইয়া যায়—এই স্থানেই শেষ রক্তপাত হইয়া যুদ্ধের অশ্রিগাধা নির্মাণিত হয়। সুলতান টিপু ১৭৯৯ খৃঃ ৪ঠা মে তারিখে এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। হিন্দুরা বলেন যে ইহা হস্তাশ্রমিকের প্রতিশোধ—তাঁহার মন্দির ধ্বংস না করিলে টিপু সুলতানের রাজ্য ও প্রাণ নষ্ট হইত না।

১৮০৮-১৮১০ খৃঃ মাজ্জের ইন্ডিয়ান 'কাপেন'দে হাজিলাস' এখানে একটা অদ্ভুত বিলান প্রস্তর করেন উহার প্রস্তর কৌশল অতীব অদ্ভুত ও অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। একালের স্থপতিগণ এইরূপ গাঁথনীর কাজ করিতে পারেন কিনা সম্ভব। দরিয়া-দৌলতবাগ বা সমুদ্রের ঐশ্বর্য নামক উজানটিও টিপুসুলতান কর্তৃক নির্মিত হয়—উহা অবশ্য অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ধ্বংসে পণ্ডিত হইতেছে।

মহীশূর গভর্ণমেন্ট ইহানী এই উজানটির রক্ষণাবেক্ষণ



সম্বন্ধে যত লইতেছেন প্রধান মহী কান্দোরাওয়ের নিম্নকৃত ব্যতিকরণের আক্রমণ হইতে তাঁহার পিতা হাথরা আলীর উদ্ধার পাওয়ায় আনন্দের দ্বিতীয়া ব্রত বলতান টিপু এই উজান রচনা করিয়াছিলেন। উজানটি অনেকগুলি পথে বিতক্ত, প্রত্যেক পথের মধ্যে চওড়া বাগা, বাগার ছই ধারে সাই-গ্রন পাছের ঝাড় আর কিনারাগুলি যেন বাসের সবুজ কিতা দিয়া মোড়া; পথ ভ্রমীগুলি রক্ত গোলাপ ও অস্ত্রাভ স্বগন্ধি ফুলের পাছে ভরা ফুলের পাছও যথেষ্ট প্রদর্শন—সমস্ত পথের মধ্যস্থ পথের উপর টিপুর বিলাসভবন—সে সৌন্দর্য ও কাব্যার্থের তুলনা নাই। বিলাসভবনের মধ্যে প্রচুর চিত্র সমাবেশ আছে। দক্ষিণাভিমুখের রাস্তা, নবাব প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিগণের শৈশবিক জীবনের চিত্র আছে, আর ১৮০

খৃঃ হায়দার আলী বর্জক কলীভরামে ইংরাজগণের পরাজয়ের চিত্র। শিল্পীর নিকট এই সকল চিত্রের কি মূল্য তাহা জানিনা কারণ তাহা চিত্র শিল্পের যুব উন্নত-বাহার স্বেচ্ছাকৃত বসিমা বোধ হয় না এই সকল চিত্রে ইংরাজ সৈনিকগণকে বাস্তবজ্ঞাতভাবে চিত্রিত করা আছে। টিপু বলতানের আদেশে কতকগুলি চিত্র তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল কিন্তু পথে বর্ষে উল্লসের আদেশে উহা পুনরুদ্ধৃত হয়। কর্ণেল উলসে এই প্রাসাদে ১৭৯৩ খৃঃ হইতে ১৮০১ খৃঃ পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃ অঙ্গে লর্ড ডালহৌসীর আদেশে সমস্ত প্রাসাদটী স্থগত হয় ও উহার কার্যকার্যগুলি (Mural decorations) উজ্জল অবস্থায় বর্ণে সুরঞ্জিত করা হয়।

( ক্রমশঃ )

## হাসি ও কান্না

লীজিভেন্সকুমার রায়

লোক হাসিতে চাহে, কাঁদিতে বড় কেহ চাহে না। সেইজন্য হাসির আবরণ, মলে পরিপুষ্ট হওয়ায় এবং প্রতিবাদের আশা না থাকায়, হাসির মূল্য অত্যধিক চড়া হয়েই নিরূপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু হাসির উৎপত্তির কারণ অস্বস্তিকান করিলে স্পষ্ট বৃত্তিতে পাঝা যায়, মহাকাব্য মিলটন "The brood of folly without father bred" নির্ভুলি প্রবর্তন—জ্ঞান-সন্তান বলিয়া কেন হাসিকে অভিহিত করিয়াছেন। অপরের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অসাবধানতা কিবা বুদ্ধিহীনতা প্রসূত বাস্তব ও কার্যকলাপ সাধারণতঃ আমাদের হাস্যোজ্জ্বল করাইয়া থাকে। স্বপ-জ্ঞানে জড়িত মূর্খ চারী যখন ক্রিয়ার করে—"দায়াচাঁদ"। শুভলা কোশপানি নাকি আইন করেছে অজ্ঞা হ'লে মহাজনেরা হ'ল আদার কর্তে পারবে না?" দায়াচাঁদ তখন চারীর অজ্ঞতা দর্শনে

হাসিতে হাসিতে রক্ত নিঃশ্বাসে উত্তর করেন—“বুঝ, তা'ও কি হয়? কোশপানি ওরূপ বে-আইনী আইন কর্তে পারে?” স্বপ-দানে অসমর্থ মূর্খ চারীর উৎকর্ষিত জন্মের বৈদনা বিজ্ঞ দায়াচাঁদের হাস্যোজ্জ্বল করাইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে রূপসায় কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যখন এক বস্তু অপর বস্তু কর্তে নিরুৎসাহ টপা শুনাইয়া দেয়—“বাগুর বেলায় কি কাঁ! জাপান হাসি হার মেনেছে, চামচিকে বলে আছি ভাল”—উজ্জ্বল হাসি আমাদের তখন উভয় বস্তু মধ্যমণ্ডল আরক্তাণ হইয়া উঠে। রূপসায় ব্যক্তি হাসির কারণ জানিতে পারিলে যখন যে আঘাত পাইতে পাবে, সে কথা বস্তুদ্বয় বিস্মৃত হইয়া যায়।

শিথিল পথে অসাবধানতা প্রযুক্ত পর-শ্রুতি হইয়া

## দ্বিতীয় বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা]

## হাসি ও কান্না

যখন কেহ বর্ধসে লুপ্তি হয়—তাঁহার দুর্দশা দর্শনে আমাদের হাসির উৎস উৎখালি উঠে; তাঁহার ব্যথা প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা আর মনে উদয় হয় না।

বস্তুদ্বয় হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন বলেন—“ওহে! কতদূর? হরি বাঁজুঘোষ জী কি একটা দোষ করেছিল বলে বাঁজুঘোষ তাকে বকেছিল,—কিছুক্ষণ পরে গির্মির মুখভার দেখে বাঁজুঘোষ যখন বুদ্ধি কর্তীর জন্তে বলে “রাগ করেছে?” গির্মি হাসিয়া কি উত্তর করেছে জানি?—“তুপুস্ত যজুপি হয় কুমাতা কাশপি নয়।” হাসিতে হাসিতে তখন পেটের নাড়ী ছিঁড়িবার উচ্চম হইবার পরে আমরা বস্তুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করি—“বলি কি? বাঁজুঘোষ গির্মি কি পাগল?” হাসির লয়ে তুলিয়া বস্তুদ্বয় উত্তর করেন—“পাগল হতে পারে কেন? ঐ রকম বোকা বুদ্ধি।” আমাদের ধমকে হাসিতে হাসিতে ধম আটকাইবার উপক্রম হয় কিন্তু ভাবি না হরি বাঁজুঘোষ উচ্চম বুদ্ধিহীন স্ত্রীলোক লইয়া সংসার-মাত্রা কি কহেই না অভিব্যাহিত করিতেছে। এই উচ্চ ইংরাজীতে যেন “To have a laugh at the expense of other” অপরের দুঃখ আমাদের হাসির কারণ হইয়া থাকে।

অল্প কয়েক প্রকার হাসি আছে যাগ কষ্টের সৌগ কাগন বলা যাইতে পারে। শিশুর মুখে মধুর হাসি—আমাদের চারি নির্মল হইতে পারে কিন্তু পিতৃমাতার মায়াপাশের বীণাতা দূতত্ব করিয়া দিয়া ভবিষ্যতে বহু কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গোলাপোষের তোষামুটি হাসি গোলামোদ প্রিয়ের মনে হর্ষস্বাকর করে সত্য কিন্তু সেই মধুর মধুর বুদ্ধিভাষণতাও আনয়ন করে। প্রেমিককে ক্রোধে ফেলিবার জন্তই প্রেমিকা মোহিনী-হাসি আচা বিস্তার করিয়া থাকে! অর্থাগম কিবা মাফলা জনিত আত্মপ্রদায় হাসি আমাদের অহংস্বাকর প্রসূত করে। আর চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে অনর্থক হাসি বিস্মৃত মথিগের লগন।

বিক্রম, অহংস্বাকর কিবা অশীলোচিকি দ্বারা যিনি অপরের হাস্যোজ্জ্বল করাইতে পারেন তিনি “আমুদে লোক”—লোককে বড় হাসাইতে পারেন। বলিয়া স্থাপতি

অর্থন করিয়া থাকেন। অপরের কোন বিষয়ের ন্যূনতা লইয়া যখন তাঁহারায় বাধ করেন তখন প্রাণ-খোলা হাসির শব্দে তাঁদের ও শ্রোতবর্গের বাস্তোয়ান্তিত হয় কিনা শরীর-বিপাকগুণই বলিতে পারেন কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মনোবৃত্তির উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই সাধিত হইয়া থাকে।

তাজিল-পাজের মনে স্ত্রীস্বাকর লৌহশলাকার স্বাকর বিদ্য করিয়া তাজিলের হাসি বাঁহারা হাসিয়া থাকেন কিবা অপরের বিপদ-দর্শনে অথবা প্রাণী-হত্যা করিয়া বাঁহারা হর্ষে দস্ত-বিকাশ পূর্বক পৈশাচিক জন্মের পরিচয় দেন—হাস্য-স্বাকরগণও তাঁহাদের সেই হাসির প্রশংসা না করিয়া নিন্দাই করিয়া থাকেন।

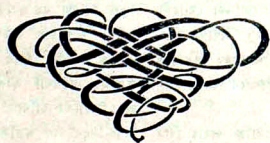
আমরা হাসিতে চাহি—কাঁদিতে চাহিনা সত্য! কিন্তু সর্বপ্রথম যখন পৃথিবী স্পর্শ করি তখন কান্নার রোলেই আমাদের স্তম্ভগমন বার্জা যৌবিত করিয়াছিলাম—পুনরায় যখন এই পৃথিবী তাগণ চিনিয়া যাইব, আমাদের আত্মীয় পরিজন কান্নার একতান বাদনেই আমাদের প্রস্থানের সংবাদ প্রচারিত করিবে। মানব-জীবনের দুইটা প্রধান ঘটনা—প্রবেশ ও নিষ্করণ—লবুপ্রকৃত হাতের পরিবর্তে সৌম, পুত কান্নারের দ্বারা ই জিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। হাসি ও কান্না শারীরিক কিবা বিশেষের পার্যকাতাই হাসির অসারব এবং কান্নার সারব সম্বন্ধে প্রমাণ করাঁহারা দেয়। হাস্তে মাস পেশীর ও শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের আত্মকরণ বিস্তারন মাত্র হইয়া থাকে কিন্তু কান্না জন্মের রক্ত নয়ন প্রস্রাব গলির (Gland) মধ্যে অক্ষরূপে পরিবর্তিত হইয়া ক্রান্ত হইতে থাকে।

হাসিয়া আমরা অনেক কথাই উড়াইয়া দিতে পারি কিন্তু কাঁদিয়া বহু পুরাতন প্রিয় স্মৃতিকে জাগরক করিয়া তুলি। রক্তোরাগ কর্তৃক হত্যা জনকীর পুণ্য-স্মৃতি রামচন্দ্র অশ্বিনীর বর্ষণের দ্বারা সজীবিত রাখিয়াছিলেন। কান্নারের মায়াঘোরে জুগিয়েও রোমিওর প্রেম-স্মৃতি স্বয়ং মধ্যে উজ্জীবিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। “কাতা-বিরহ-বিরহ” বক অতীত যথের কাহিনী অশ্ববিদ্য দ্বারা রচিত করিয়াই “মেঘদূতের” নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। হাস্য চাক্ষুস্যের স্রুতি করেন; কিন্তু কান্না যেন দৃষ্টি-



শাস্ত্র ভাব আনয়ন করে। যেহে, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সং মনোবৃত্তি সমূহ অশ্রুতগেই বাছে বিকশিত হয়। দহিতের অধর্শনে দহিতার প্রেম-স্থখা স্বয়ং-পাত্রে উচ্ছ্বাস উঠিলে অশ্রুতগে প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রবৃত্তির অপ্রয়োজনীয় গুণ-বৃত্তি যেসকল, নিশ্চেষ্টিত করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়, সন্তান-বিবেগে শোকাভূতা জননীর স্বয়ং-ভাবাংশিত অনাবৃত্তকীয় বেগ-মৃত সেইরূপ, নয়ন-প্রকাশী দিয়া স্বরিত হইতে থাকে। ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা হইলে ভক্তের নেত্র-প্রান্তে হোলোম্যান্ ভক্তি-বারি-বিন্দু শুভিগতভাবে বহু মুক্তার স্রাব শোভা বিকাশ করে। পরের দৃষ্টে দেব-স্বয়ং বিশিষ্ট মানবের নেত্রই অক্ষভারাক্রান্ত হয়। মনের গলিততা যথোচিত করিতে দান-তপ-যশ অপেক্ষা অহু-শোচনার অশ্রু-বারিই সমধিক লক্ষ্য।

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা আমবা হুবে হাসিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বয়ং কন্মনের দ্বারাই প্রকটিত হয়। শ্রির বিচ্ছেদের পর মিলন সংঘটনে অশ্রুতার পন্থিয়া গতিয়া সুখোৎপত্তি হৃদয়ের পতিতায় দিয়া থাকে। দহিতা দ্বিধার “নাড়ী-ছোঁড়ান” যখন প্রথম উপাধানের টাক্স জননীর পদতলে স্থাপন করিয়া প্রণাম করে, তখন পূজকে বুকে টানিয়া লইয়া, বিদ্যা অশ্রু বর্ষণে হৃদয়ের শুদ্ধ স্বয়ং-ভক্তকে মুগ্ধিত করিবার চেষ্টা করেন। সন্তানকে লইয়া “দে-মাছের টানাটানি” করিবার পর যখন “আর ভয় নাই” এই অভয়বাণী চিকিৎসকের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, স্বপ্নোন্মত্ত জনক-জননী তখন অশ্রুপূর্ণ সোচনেই ঈশ্বরকে তাহার স্বর্ণপার ভক্ত স্বত্বভা আপন করিয়া থাকেন।



অশ্রু দুর্লভতার চিহ্ন বলিয়া অনেক কামিতে লক্ষ্য বোধ করেন। কিন্তু আমাদের সকলেরই ছিল একদিন—  
—যে দিন—

“রোদনেই ছিল বল, শিবি নাই স্তোন চল,  
বিঠা-মুখ সমজান, ছিছ ঘুগারীনা।”

রোদনের বনেই আমাদের আঁধার্য স্থখার সময় আমাদের সমুখে উপস্থিত হইত। রোদনের বনেই শত প্রয়োজনীয় কার্য হেলায় রাখিয়া আমাদের পক্ষে অন্ধ ধারণ করা হইতে মাতৃদেবীকে বাধা করাইতাম। আর অবলার বল যে অশ্রু তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই অশ্রুতগে অত্যাগ প্রয়োগে অবলারা যে সব অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকেন শক্তিম্যান্ পুরুষেরা বল প্রয়োগেও তাহার শতাংশের একাংশও সম্পন্ন করিতে পারেন না।

অশ্রুর মধ্যে যে ডিনামাইটের (Dynamite) স্রাব প্রকট প্রকাশ-শক্তি নিহিত আছে—পুরাণ ও ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সত্যের অশ্রুজলে দহকের হস্ত পণ্ড এবং দহকে ছাপ-মুগ ধারণ করিতে হইয়াছিল। জানকীর নয়নজলে রাবণের হৃদয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত-সভায় লাঞ্চিত জগদ-তনয়ার অশ্রু-বিন্দু-পতনে কৌরব বংশে বাতি দিতেও কেহ অবশিষ্ট রহিল না। ব্রাহ্ম-হোল বা অশ্রুতগের মধ্যে ই-রাজ সৈনিকপুরুষগণকে যক্ষণায় অশ্রু-মোচন করিতে হইয়াছিল বলিয়াই ভারত মুসলমান-সাম্রাজ্যের স্বজনা হইয়াছে। বেঙ্গলিয়ান-বাসীদিগকে ‘চোপের জলে নাকের জলে’ করার ফলে দুর্ভাগ্য ভাঙিয়া আজ ইউরোপীয় মহাসমুদ্রে পরাজিত।



চোপের জলে

টাইনহলে উপরি উপরি দুইট সভা করিয়া হিন্দুগণ আনাইয়া মিলন যে তাহার আশ্রয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিনুশ্র হয়েন নাই। দুই সভায় দুইজন জারেলের আইনব্যবসায়ী সভাপতি হইয়া বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া মিলন যে মঙ্গলিদের সামিগে বাজনা ও রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসজ্জন বিষয়ে পুলিশের বিধান অত্যাগ ও অসঙ্গত হইয়াছে। তাহার অত্যাগ করে, তাহার যে সকল সময় অজ্ঞানতা বশভূত করে এমন নহে। এ দুই ব্যাপারে পুলিশ যাহা করিয়াছে, তাহা জানিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছে। স্বতরাং মুখের কথায় চিড়া ভিজিয়ে তাইয়া যদি ব্যারিষ্টার অথবা এ্যাটর্নি সভাপতি মহাশয়ম্ব নিশ্চিন্ত থাকেন তবে তাহারাজ্য ভুল করিবেন। পুলিশ আর তাহারাই হমকীতে ভয় পাক, নিরাহ, দুর্লভ, বিরোধ-বিকৃষ হিন্দুর হমকীকে যে ভয় করে না—তাহা সকলেই জানে। বক্তৃতার সিংহনামে পুলিশ তাহার হৃদয় বদলাইবে না।

সভাসমিতিতে গরম-গরম বক্তৃতা করিয়া ‘কার্য শেষ’ করিবার দিন গিয়াছে। শুধু গিয়াছে নহ—আমাদের জাতিটাকে ও দেশটাকে মারিয়া গিয়াছে। আমাদের যদি মুখের শক্তি ছাড়া এক কপর্দক অস্ত্র শক্তি থাকিত তাহা হইলে বিসজ্জনের জন্ত বাহির করা প্রতিমাকে আবার ঘবে ফিরাইয়া চাল-কলার নৈবেদ্য দিবার ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে করিতে হইত না। আজ তাহার সভা সমিতি করিয়া বহু গজ্জন করিয়া বাসায় বসিয়া নিশ্চিন্ত আয়ামে বাসণ ও সঙ্গার চালাইতেছেন, তাহারদিগকে আমরা এই চরম ও পরম সভ্যটি স্বরণ ও উপলব্ধি করিতে অস্বহণে করি।

হিন্দুরা যদি রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা পুনরায় পথে বাহির করিতে পারেন ও পূর্ণেশ্বার পথ দিয়া নির্মিয়ে মিছিল লইয়া ভাগিগরী বক্ষে বিসজ্জন দিবার ব্যবস্থা করেন তবেই বুঝা যাইবে যে ভাড়া-করা হিন্দু-সভাপতির উপর হিন্দুরা হিন্দু স্বরকার ভার অর্পণ করে নাই। শ্রীমুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ‘হিন্দুগণ’ কি হিন্দুজনাচিত কার্য করিতে পারিবেন?

সুদৃষ্টির নারী-ধর্মের ব্যাপারটাকে সরকার যতটা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে সেটা লক্ষ্য আদৌ নয়, বরং বিষয় গুরুতর। দুর্লভগণ যে তিনটি নারীকে অগহরণ করিয়াছিল এবং দুইটির উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল তাহা সুদৃষ্টির তদন্ত-কমিটির মুখে জানা গিয়াছে। অপরাধ উপরও অত্যাচার হইবার উপক্রম হইয়াছিল কেবল মধু সেন ও তাহার দলের লোক সময়মত আসিয়া পড়াতেই সেই হুজিগী দুর্লভদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। সুদৃষ্টি মহৎস্বার হাকিম স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে সাম্প্রদায়িক বিরোধই এই অনাচারের মূল কারণ। হাকিম এ কথা স্বীকার করিতে লঙ্ঘাহুত্ব করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না,—তবে ভারতে ই-রাজ-রাজকালে এমন অনাচার সম্ভটিত হয় ইহা যে বর্ণেও লঙ্ঘার কথা তাহা তিনি মুখে স্বীকার না করিলেও বিশেষ কিছু আশিয়া যায় না।

পাবনায় গুওরাজ পুসামস্তর রাজস্ব চালাইয়াছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই রাজস্ব প্রভারা সভা সর্বদাই আঁহি আঁহি ভাক ছাড়িতেছে। পাবনার সংবাদে প্রকাশ যে মুসলমানরাই আস্ততায়ী—

শ্রীমুক্ত সরকার ও বহু মহাশয়কে অগ্রগণ্যে রাখিয়া



হিন্দুদের উপর প্রধানতঃ অত্যাচার করিতেছে তাহারাই, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তারা জেলার শাস্তিপ্রিয় হিন্দু অধিবাসীগণকে নিরাপদে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। 'হানে হানে' হিন্দুর গৃহ, পোকান প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইতেছে, সম্রাট নিরীহ হিন্দু পথিক পথে লাহিত ও প্রহৃত হইতেছেন। এমন কি পুলিশ বাহা দিতে গেলে পুলিশকেও লাহিত হইতে হইয়াছে। "চাচা আপন পশপোটা চাঁচা" নীতি অবলম্বনে পুলিশ ঘুরুড়ত্বের উপর ভলি চালাইয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিয়াছে। সহরে ও মহকমায় সর্বত্র আতঙ্কের ভাব জাগিয়াছে। পুলিশের বড় কুঠা পাবনায় গিয়াছেন। কাধ্য কি করিয়াছেন তিনি ভাল জানেন; হিন্দু অধিবাসী আরও 'প্রাণটি হাতে করিয়া' পাবনায় বাস করিতেছেন।

কলিকাতার দাশর হুয় যখন সপ্তমে চড়িয়াছিল, গবর্নর লর্ড লিটন তখন দুর্ভাগ্যলিপোপরি বিবাক করিতেছিলেন। হুয় নামিলে সরকারী ইস্তাহার দ্বারা জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে লর্ড লিটন দাখিলিবে স্থানীয় ছিলেন বটে তবে তার-টেরিগ্রাফকে তিনি বেশ শাসন করিতেছিলেন। এই শাসনের বহর কেমন, তাহা আমাদের পাঠকগণের অবদিত নাই। সহরের পাঠকগণের যা এখনও শুভাইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। পাননা খন গুণ্ডারজগণ কর্তৃক অধিকৃত ও হুমাসিত হইতেছে, তখন বন্ধের বর্তমান গবর্নর তার হিউ প্রিন্সনর কলিকাতার লাট-ঘরনে সমাদীন আছেন। ভাগ্যক্রমে যদি গুণ্ডারজের দরায় পাবনায় শাস্তি কিরিয়া আসে তবে আশা আছে, সরকারী ইস্তাহার মারফৎ তাহা-বেতাহে শাসনের বহর বিজাপিত করিয়া তিনিও লাটগিরির পূরাপুরি পরিচয় দিতে পারিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে একশান বাস প্রদান করিয়াছেন। তত্ত্বালকে গত মঙ্গলবার হুয়ায় টাউনহলে এক বিবাহ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমতী নাইডু কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা ভাষার স্বভাবে সত্যই অশুদ্ধ। শ্রীমতী

সরোজিনী শক্তিশালিনী কবি, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। বর্তমানে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনোদ্যোগে বশেষে পরিমণ্ডন করিতেছেন। বাহারা পূর্ণাঙ্গার তাহার বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়াছেন তাহারা জ্ঞাত আছেন, শ্রীমতী মুসলমানদিগকে ভুল করিতে একটু বেশী মাত্রায় তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক সময়ে হিন্দুদের প্রতি অবিচারও না হইয়াছে এমন নয়। প্যাট্রী-পর্ষদের মত তাহার চেতনা যে সর্বতোভাবে বার্থ হইয়াছে তাহা সেদিনের টাউনহল সভায় বেশ সুখ্য গিয়াছে। সরোজিনী দেবীর পক্ষপাতিত্বের সম্পূর্ণ সন্ধান জ্ঞাত থাকিয়াও একটি মুসলমান সম্রাট সভায় যোগদান করেন নাই। তাহার বেশ ভালভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্যাট্রী দাও, 'প্রেম' দাও—তবী কুলিবার নয়।

বাঙাল্যদেশের স্বরাষ্ট্রাঙ্গলের টাইবের মধ্যে যে মনো-মালিন্দের ফল হইয়াছিল, হুয়ের বিষয় তাহার মিটমাট হইয়া গিয়াছে। তাহার কাটীতে মিলিয়া, এবার আর ছয় ইস্তাহার নয়—এক ইস্তাহার জাতির ক্রিয়াক্ষেত্রে যে "বাঙাল্য কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী" সফল আমাদের মধ্যে যে মনোমালিন্দ হইয়াছিল, আশা আশ্বাসের সহিত জানাইতেছি যে তাহা মিটমাট হইয়া গিয়াছে। আমরা মন খুলিয়া পরস্পরের মতামত আলোচনা করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি ও আমরা একমত হইয়াছি যে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হয় এমন কাছই আমাদের কাছে করিতে হইবে। দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত এখন আমাদেরই সন্ধিস্থ-ভাবে কাধ্য করিতে হইবে। আশা করি স্বরাষ্ট্রাঙ্গনে তাহা "United we stand, divided we fall." নীতি মানিয়া চলিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের গবর্নর লর্ড লিটন মহাশয় ছুটি লইয়া এ দেশের লোকের বখরবে 'হোমে' গিয়াছেন। চারমাস শ্রমের অমণ ও শৃঙ্খলে লর্ড লিটন আবার এ দেশবাসীর পূরুষায় বাস কিস্তি দিনের জন্ত বাঙাল্য কিরিয়া আসিবেন। মধ্যে গুজব উঠিয়াছিল যে তিনি এই ছুটিটিকেই হারী ছুটি বলিয়া গ্রহণ করিয়া, বঙ্গ-

দেশবাসীদিগকে অব্যাহতি দিবেন, এখন জানা গিয়াছে যে তাহার একশ কোন সঙ্গীতগ্রন্থ নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলিকাতা পুলিশকে মুসলমানদিগের প্রতি কঠোর ও হিন্দুদিগের প্রতি নরম ব্যবহার করিতে প্ররূত করা হইয়াছিল। শাসন পরিষদের স্বভাবতঃ উদ্বেগ ছিল যাহাতে পুলিশ বাহিনীতে আরও অধিক সংখ্যক মুসলমান লওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আরও সমান সমান ভাবে থাকিত, কিন্তু বর্তমানে হিন্দু-দিগের মত তাহাদিগকে অত সহজে পাওয়া যায় না। কেবল ইউরোপীয় পুলিশ রাখিতে গেলে অত্যন্ত ব্যয় পড়ে। এদিকে আবার চাচুরীকে ভাড়াইয়া দিগকে চাচুরী দেওয়া সফল বর্তমান নীতিটিও বিশেষ দরকারী। লর্ড লিটন বলিতেছেন যে, যে সকল লোকের সহিত তাহাকে ব্যবহার সম্পর্কে আসিতে লাগিছে, তাহার শাস্তিপ্রিয় স্বভাব সম্পন্ন এবং তিনিও সেখানি ভাড়া-বৎ দিনগুলি মহানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

"সরকারী শাসন-পরিষদ স্বভাবতঃ ইহাই অধিকতর ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই ব্যবসায়ীগণ তাহাদের রক্ষার জন্ত পূর্ণতবে পুলিশের উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু তাহাদের কাধ্য এই যে, হাঙ্গামা বাহিলে তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং তাহারা প্রহৃত হয়, কাজেকারিত হইল। ইহাতে অবস্থা এইরূপ ঝাঁড়াইল যে, প্রত্যেকে নিজেকে লইয়াই ব্যত হইয়া পড়িল; এবং শোচনীয় কলের অবতারণা হইল।"

## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩২ ৪—"শ্রীশঙ্কর-চাধ্যায়ে ও বিবর্তন" শ্রীমত্যাগাল রত্ন এম, এ মহাশয় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ—শারীরক ভাড়াকার শিবাবতার শঙ্করচাধ্যা প্রবর্তিত অষ্টকবাদের বিশ্লেষণ। দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে বক্তব্যকে জটিল না করিয়া লোক সহযোগিতা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও অশৈল্প উভয় মতাবাদের বিচার এবং শঙ্করচাধ্যার বিবর্তনবাদ মায়াবাদের সন্ধিস্থ পরিচয় দিয়াছেন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রবন্ধ লোক শ্রীশঙ্করেশ্বর গুপ্ত পরলোকের অতিথ

"অভিযোগ উত্তীর্ণ ছিল যে, কলিকাতার বিগত দাদ্যয় কলিকাতা পুলিশকে মুসলমানদিগের প্রতি কঠোর ও হিন্দুদিগের প্রতি নরম ব্যবহার করিতে প্ররূত করা হইয়াছিল। শাসন পরিষদের স্বভাবতঃ উদ্বেগ ছিল যাহাতে পুলিশ বাহিনীতে আরও অধিক সংখ্যক মুসলমান লওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আরও সমান সমান ভাবে থাকিত, কিন্তু বর্তমানে হিন্দু-দিগের মত তাহাদিগকে অত সহজে পাওয়া যায় না। কেবল ইউরোপীয় পুলিশ রাখিতে গেলে অত্যন্ত ব্যয় পড়ে। এদিকে আবার চাচুরীকে ভাড়াইয়া দিগকে চাচুরী দেওয়া সফল বর্তমান নীতিটিও বিশেষ দরকারী। লর্ড লিটন বলিতেছেন যে, যে সকল লোকের সহিত তাহাকে ব্যবহার সম্পর্কে আসিতে লাগিছে, তাহার শাস্তিপ্রিয় স্বভাব সম্পন্ন এবং তিনিও সেখানি ভাড়া-বৎ দিনগুলি মহানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

লর্ড বাহাদুর অনেক কথাই বলিয়াছেন, দয়া করিয়া কেবল মনে নাই যে তিনি যে সময়ে বিরহ-কাতর হইয়া দাখিলিবে স্বভাবের শোভা দীর্ঘকাল ও তাহা শাসনের গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিলাত বাইবার অব্যাহতি পূর্বে ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় দলের শ্রী-স্থানীয় কতকগুলি লোককে নিয়োগদান করিয়া গিয়াছেন। তাহার লর্ড লিটনের ভাষ্টি দূর করিতে ইচ্ছুক আছেন কি ?



না। 'চন্দননগরের সেবাধর্ম প্রতিষ্ঠান' প্রবন্ধ লেখক শ্রীহরিবর শেঠ। মহাশয়ের গবেষণা ও বদেশাহরণের পরিশ্রম দ্রষ্টব্য। চন্দননগরের প্রাচীন কাহিনী, সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সংক্ষেপে লেখক বঙ্গশ্রী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধই ভাল হইয়াছে।

ভাষার পরীক্ষাল সন্ধান মহাশয়ের 'শিশু মৃত্যু ও তাহার কারণ' সংক্ষিপ্ত হইলেও সারবান। লেখক মহাশয় 'শিশু মৃত্যু' সংক্ষেপে একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—‘আমি যখন খুলনার সিভিলসার্জন ছিলাম, তখন শিশু মৃত্যু সংক্ষেপে কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলাম। তৎকালে ইহা একরূপ নিশ্চিত ভাবে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে, জাওয়ার গরুগুলি প্রধানতঃ হুসারী বাঈয়া জীবন ধারণ করে, সে সব স্থানে শিশু মৃত্যুর হার খুব কম; এবং সে সব স্থানে জলোৎসর্গ পর্ব প্রদান থাকে, সে সব স্থানে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। এই কারণেই দেখা গিয়াছে যে, বর্ষাকালে (যে সময় জলোৎসর্গ পর্ব প্রদান থাকে) শিশু মৃত্যু অধিক হয়।’

‘বিবিস প্রসঙ্গে’ ভারতীয় স্থপতি বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে লেখক শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ বি-ই শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ে উপর এক হাত লইয়াছেন। বিভিন্ন সামগ্রিক পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় স্থাপত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে লেখক শান্তি বাবু ‘হুজুগ’ বলিয়া বর্ণনা করিতে চান। কলিকাতা সহর বাহ্যতে ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শের আদরে ও উক্ত আদর্শ অনুসারে গঠিত সৌখ্যমালায় সহরের শ্রীকৃষ্ণ হয় সেই উদ্দেশ্যে শ্রী বাবু কলিকাতা কর্পোরেশনে ভারতীয় স্থপতি-বিভাগ স্থাপনার প্রস্তাব করিয়াছেন। লেখক শান্তি কুমার বাবু এই উপলক্ষ করিয়া শুধু যে শ্রীবাবু তথা শ্রীবাবুর প্রস্তাবকে পরিহাস করিয়াছেন, তাহা নহে ভারতীয় স্থপতি বিজ্ঞান উপরও কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়াছেন—যেন বি, ই মহাশয় শিবপুরের পালেয় অধ্যাপকের নিকট স্থাপত্যের আদর্শ সংক্ষেপে বাহা শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় স্থাপত্য বিভাগটি কিছুই নহে। শান্তিকুমার বাবুর এই বিচারে বিজ্ঞান সৌভাগ্য কতদূর তাহা আমাদের জানা নাই। স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে কোন গবেষণার পণ্ডিতের পদার্থ পাই নাই বা এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ (expert) বলিয়া

তিনি নাই। আশোচর্য্য প্রবন্ধে তিনি যদি ব্যক্তিগত উদ্ভাও বিজ্ঞানের আশ্রয় না লইয়া যুক্তি ও বিচারের দ্বারা ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন, তবে আমাদের উৎসাহ বিজ্ঞান দৌড় বৃদ্ধিতে পারিতাম। লেখার ভাবে যুক্তিলাভ লেখক কলিকাতা কর্পোরেশনের বন্ধুত্বী এবং কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে।

‘হাজো’ আমাদের কোন পুরাণ-প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের পরিচয়। লেখক নলিনীকুমার ভট্ট প্রবন্ধটির ভিত্তি পরিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহা সার্থক হইয়াছে। রচনাসী স্থপাঠ্য হইয়াছে, ‘চরকা ও স্বকৃতা’ প্রবন্ধের লেখকের উপাধিগৌরব দেখিয়া উহা পড়িবার আগ্রহ হইল। কিন্তু পাঠ্যে হতাশ হইয়াছি।

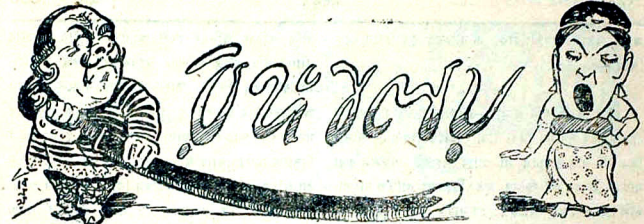
শ্রীতত্ত্বনাথ মিত্র মৃত্যুগী মহাশয়ের ‘বিশোর’ এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। প্রবন্ধটির উপাধান সংগ্রহের ভিত্তি লেখক বেশ পরিষ্কার করিয়াছেন, প্রবন্ধও তথ্য পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

স্বপ্নলেখক শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের ‘মোটরে কাম্বীর-যাত্রা’ যে অংশটুকু এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্থপাঠ্য। দৃষ্ট স্থান সমূহের প্রাচীন ইতিহাস, অতি মনোজ্ঞ ভাবে ও স্থূললিত ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় লেখা বিশেষ ভাবে উপভোগ্য হইয়াছে।

ছোট গল্পের মধ্যে, শ্রীফরুজ বহু বি-এস, সি মহাশয়ের লিখিত হেয়ালি গল্পে উজ্জ্বলের আদিক্য ও সংঘবের অভাবে সৌন্দর্য্য হানি ঘটাইয়াছে। শ্রীফরুজনাথ মিত্রের ‘বন্দীভাঙ্গা’ গল্প রোমাঞ্চিক বটে। গল্পটি পড়িতে পড়িতে পুরং বাবুর ‘পল্লীসমাজের’ রস ও রমণের প্রচ্ছন্ন প্রেম কাহিনীটা ব্যবসায়ের মনে পড়িতেছিল।

শ্রীরাধাগঙ্গী দত্তের ‘সাজের স্বপ্ন’ একটি সুখী গল্প। আট আনা সংস্করণের একখানি উপলব্ধ বসিলেই চলে, অপরূপ রূপে বিবাহিত। পড়িতে পড়িতে ঐধাচ্যুতি বটে। স্থানে স্থানে ভাষার ও বর্ণনার কারিগরি দক্ষিণেও ‘সাজের স্বপ্নের’ স্থাখ্যতি করিতে পারিলাম না।

কবিশ্রবণ কলিদাস রায়ের ‘নিদান’ (কুঁহু সংসার অনলনে লিখিত) এই সংখ্যায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থপাঠ্য কবিতা।



এ সপ্তাহের নাট্যজগতের সর্গপ্রধান সংবাদ, নাট্যচার্য্য শ্রীকৃষ্ণমতলাল বহু রচিত নূতন নাটক ‘ব্যাপিকা-বিদ্যায়’এর অভিনয়। অজ্ঞ শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হইবে। বহুকাল পরে প্রবীণ অমৃত লালের দ্বারা রঙ্গমঞ্চের নাটক লিপাইয়া অভিনয় করিয়া, মিনার্ভা নাট্যমোদীমাজেরই ধন্যবাদ ভাঙন হইয়াছে। অমৃতলাল রঙ্গালয়ের সম্পর্ক একরূপ তুলিয়াই দিয়াছিলেন, মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্থানে ফিরাইয়া আনিয়া নাট্যসাহিত্যের ও নাট্যমঞ্চের মঞ্চে উপহার করিলেন। অমৃতলালের ব্যাপিকা-বিদ্যায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণেন্দ্রনাথ মনোপাধ্যায়ের ‘নারী রাজ্যে’ নামক পৌরাণিক নাট্যলীলাও অভিনীত হইবে।

ঠার থিয়েটারে শ্রীকৃষ্ণ সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘লাবণ্যকা’ নামক নাট্যলীলা গত বুধবারে অভিনীত হইয়াছে। লেখক বলিতেছে, ‘চিরকুমার সভার’ পর ঠার থিয়েটারে কোন ভৌতিক-রমিতকা পূর্ণ নাটকে গত না মিলেই ভাল করিতেই।

মিত্র থিয়েটার ‘জনা’ খুলিয়াছেন। শ্রীমতী তারা-হৃদয়ী জনার অংশ অভিনয় করিতেছেন। মনোমোহনে অবস্থিত নাট্যমন্দিরে তিনি জনা অভিনয় করিয়াছিলেন। মিত্র থিয়েটারে জনার প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ হইতেছে প্রবীণ। শ্রীকৃষ্ণ নির্মলেন্দু সাহিত্যী এই অংশ অভিনয় করিতেছেন। ধোঁরা দানীবাণ, শিশি বাবু, অশীক্সাবাণ্ড প্রভৃতির প্রবীণ দেখিয়াছেন, তাহাদের

একবার নির্মলেন্দু বাবুর প্রবীণ দেখিবার ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র প্রবীণ দেখিবার জন্য লোকে আগ্রহান্বিত হইবে কি না বলা কঠিন।

মিত্র থিয়েটার প্রস্তুতের পর প্রাকার্ড মারিয়া জয়শ্রী বিখ্যোচিত করিতেছেন। প্রাকার্ড রাজকুহে ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এত বেশী ও এত রকমারী প্রাকার্ড আর কেহ মারিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার বোধ করি পূর্জনেরই পক্ষপাতী বর্ণনের নয়।

ঠার থিয়েটার কবি রবীন্দ্রনাথের ‘শোণ-বোণ’ ও ‘মুক্তির উপায়’ অভিনয় প্রস্তুত হইতেছে, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। কবির নাটক নাটিকা অভিনয় করিয়া ঠার থিয়েটার যে খন্দ অভিনয় করিয়াছেন, তাহা অস্বপ্ন থাকিবে আশা করা যায়।

মনোমোহন নাট্যভবনে মিত্রি খাটিতেছে। মনে হইতেছে শ্রীজী নাট্যভবনটি স্থানান্তরিত হইয়া উঠিবে। তখন এই বাড়ীতে কি আর একটি নাট্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে, না বাহারা মন-আশ্রয়ে মিনাতিপাত করিতেছেন, তাহাদেরই কেহ এখানে আসিয়া বসিনে? পাণ্ডে মহাশয় ব্যবসারী, কারবারী লোক। তুল্যকমে একবার বেলতলায় গিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া বার বার যে তুল্য করিবেন, এমন বোধ হয় না। স্বভাবা তিনি এবার পাটরি বল বুঝিয়া তবে বাড়ী হাডছাড়া করিবেন ইহা



জানা কথা। দেখা যাক, এ বাজারে কে হারে, কে জিনে।

ষ্টারে শ্রীকৃষ্ণ শনি ও রবি—বেশ চলিতেছে। এখনও যেতপ দর্শক সমাগম দেখা যায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ যে অনেক দিন শনি-রবি ছাড়িবে না তাহা সহজেই অস্বাভাবিক করা যায়। ষ্টারের কর্ণাঙ্কনের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও মহিলা-দর্শিকাদের স্নেহ আছে। যে নাটক দর্শিকাদের স্নেহলাভ করিয়া দ্রুত হয়—তাহার পরমায়ু স্বল্প নয়।

নাট্যমন্দির লিমিটেড সীতা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ও বিদ্রোহ স্বাক্ষরমে বৃষ্ণ, বৃহস্পতি ও শনিবারে অভিনয় করিতেছেন। স্নানা যাইতেছে যে তাহার আরও এক

রাতি করিয়া অভিনয় বেশী করিবেন। ষ্টার থিয়েটারে সপ্তাহে পাঁচ রাতি অভিনয় করেন বটে কিন্তু তাহাতে লাভবান হই কি না তাহারাই ভাল বলিতে পারেন। আমাদের মনে হয় সপ্তাহে পাঁচ রাতি অভিনয় দেখিবার মত দর্শক আশ্রয় বাঙ্গালা দেশে তৈয়ার হয়েন নাই। বিলাতে নিত্য সন্ধ্যায় অভিনয় হয়; অনেকগুলি থিয়েটারই প্রাত্যহিক অভিনয় করিয়া থাকেন কিন্তু সে দেশের অভিনয়ের দ্বারা ঠিক এদেশের মত নয়। সেখানে সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে বায়ে—একটা পর্য্যন্ত অভিনয় করিতে হয় না; নিউই-নব যোজ্ঞন করিতেও হয় না—সেখানকার দর্শকের মত ভিন্ন, কঠি ভিন্ন; আর্থিক অবস্থা ভিন্ন। সেখানে যারা চলে, এখানে তাহা যে চলিতে পারে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

## সাম্প্রদায়িক নিবেদন

আগামী সপ্তাহের নবযুগ, দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যা হইবে—উহার সহিত শেষ ছয় মাসের স্থলীপত্র দেওয়া হইবে। ষাধাদের স্থলীপত্রের আবশ্যিক তাহারাই উহা যেন এই সময়েই সংগ্রহ করিয়া লয়েন কারণ পরে ঐ এরূপও পত্রিকা সত্ত্বন্ত বিকস্র করিবার মত উৎসর্গ হইবে না।

গ্রন্থক মহোদয়গণ তাহাদের তৃতীয় বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা যেন অগ্রহণ পূর্বক মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দেন বা যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তাহা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞাপন করেন। কারণ ষাধাদের অগ্রিম মূল্য মণিঅর্ডারে না আসিবে, ষাধাদের নিষেধ পত্র না পাইব—তাঁহাদের সকলের নামেই তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠান হইবে—সে সময় ভিঃ পি কেবল দিয়া যেন আমাদের অস্বাভাবিকতা গ্রহণ না করেন—ইহাই একান্ত অস্বাভাবিক। তৃতীয় বর্ষের নবযুগের জন্ত বিশেষ আয়োজন হইতেছে আগামী সংখ্যায় উহা বিবৃত হইবে।



দ্বিতীয় বর্ষ]

৩১শে আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩০, ইং ১৬ই জুলাই ১৯২৬

[ ৪৮শ সংখ্যা ]

## রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র

### ঐরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ-ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নিজে যে সব মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটাই এখন আমার সম্মুখে নাই। তাহার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার সময়ও নাই। এইজন্য কোন কোনটির সম্বন্ধে আমার মাথা মনে হইতেছে তাহারই লিখিব।

রবীন্দ্রনাথের মাসিক পত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা "জ্ঞানপ্রকাশ" নামক মাসিক বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "স্বনমোহিনী প্রতীভা" একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুস্তকের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা "জ্ঞানপ্রকাশে" করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়া ছিল কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

আমার লেখাটা রবীন্দ্রনাথকে সার্টিফিকেট দেওয়ার মত হইয়াছে। লেখাটার অজ্ঞ কোন গুণ না থাকিলেও উহার এই ছাত্রকরতা উপভোগ্য হইবে।

তাঁহার "বালক" পত্রেরা আমার মনে হইয়াছিল, যে, উহা তিনি যে সব বালকদের জন্ত বাহির করিয়াছিলেন তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার্থে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক-কালের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার্থে ধারণা অনুসরণে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে উহা "ভারতীর" সহিত মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি "ভারতী", "ভাগ্য", "সাধনা" এবং "বঙ্গ-দর্শনের" ও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

বঙ্গিমজ্ঞ যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। স্মরণ্য উহা কিরণ কাগজ ছিল, সে বিষয়ে অপর অনেকের মত আমার জ্ঞান থাকিলেও, আমার নিজের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অল্প বঙ্গিমজ্ঞের বঙ্গদর্শন প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত কোন কোন বহি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে



টিক কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে সকল বাংলা মাসিক পত্র সম্বন্ধে আবার সাধারণ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের “সাদনা”কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজখানির উপরই তাহার ব্যক্তিত্বের ও লিখন-ভঙ্গির ছাপ অঙ্কুরিত হইত—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইত।

ইহার একটি কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজ খানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে ভূমিরি—এবং আশাকরি তাহা টিক ভূমিরিও টিক মনে আছে। তিনি হয় লেখকের লেখা খুব খুশি রাখিয়া দিতেন; তাহাতে হয় অনেক লেখা গুলি পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দুসেন জিহবী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সম্বৃত্ত হইয়া তবে “সাদনা”র বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বহির্মন বাবু ও রবি বাবুর একটি তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অজ্ঞাত কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন যে, বঙ্গবন্ধু সম্পাদকত্বের অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া ‘মাহুৎ’ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞাত-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজ-গুলির সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথ নির্দেশ ও কাব্যত্ব করিয়াছিলেন, আর কাগজের সংগ্রহেও বহু লেখকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃ প্রসূত হইয়া দীর্ঘকাল “প্রবাসী”র “সঙ্গদল” বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও চারিদিককে তাহার সার সংগ্রহ ও অঙ্কুরা করিত দিতেন। অল্পবয়সগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিয়া পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংকলন ত খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বা-দিকে খালি ভাষ্যগার লিখিয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মত

অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সঙ্গদল কার্যের জন্ত পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই, যে, কোনো কাজকেই জুজাবারী (Dudgery) বা গাধার বাটুনী বলিয়া বখস্জা করা উচিত নহে।

আমার এই লেখাটা “গবেষণা ও পাতিভাপূর্ণ” “উদ্বেগমোক্ষণ” “মৌলিক প্রবন্ধ” নহে; হতাশা ছদ্মবেশী বাক্য কথাও এখানে বলা চলিতে পারে। সঙ্গদল জন্ত রবীন্দ্রনাথের পাঠাইবার জন্ত আমি কিছু কিছু বিলাতী কাগজ কিনিতাম বটে, কিন্তু অনেক কাগজ পাইতাম আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রয়াগবিনায়ী রামনাথ বহু মহাশয়ের নিষ্ঠুর হইতে। পুরাতন খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র কিনিয়া তাহা হইতে সার সংগ্রহ করা আমার একটি কাজ ছিল। তিনি পাঠাইবদের দেশে থাকিতে একবার দশম পুরাতন খবরের কাগজ কিনিয়া তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ কাটিয়া খাতা বোঝাই করেন। এই কর্তৃত্ব প্রবন্ধগুলির ওজন হইয়াছিল আড়াই মণ। বন্দী হইবার সময় তিনি এই আড়াই মণে জিনিষও ভাড়া দিয়া আনিয়াছিলেন; এবং তৎসমুদয় তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ রচনার কাজে লাগিয়াছে। এলাহাবাদের চৌকের নিষ্ঠুরত্বী গুপ্তী বাবুকে সকল রকম পুরাতন জিনিষ পাওয়া যায়। সেখান হইতে বহু মহাশয় বিস্তর পুরাতন বই ও ইংরেজী মাসিক কাগজ কিনিতে। মাসিক কাগজগুলি বাস্তবিক হইয়া “প্রবাসী”র জন্ত আসিত। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গদল বিভাগের ভার ত্যাগ করেন। তাহার একটি কারণ, ইংরেজী ম্যাগাজিনগুলির ক্রমাগতগতি—তাহাতে আর আলাপকার কত হিতকর ও মনোহারী লেখা থাকিত না।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মাসিকপত্র সম্পাদককে অন্তরে রচনার প্রত্যাশায় থাকিত হয়। বাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিবা তাহাখিগের যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্তি করিয়া বাহির করিত হয়। সম্পাদকের নিজেই যদি নানা রকম প্রবন্ধ, গল্প কবিতা

সমালোচনা প্রভৃতি লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে উহাকে বিপর্য হইতে হয় না। গ্রন্থের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা আর সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি বহু সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনি যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিতে পারেন, অল্প কয়েক তাহা পারেন নাই। এই জন্ত, অন্তরে সাহায্য না পাইলে ও নিয়মিত রূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিভিন্ন রচনাপূর্ণ মাসিক পত্র বাহির করিবার সম্ভব একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। এরূপ সম্ভব তিনি কখনও করিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু করিলে তাহা বার্ষ বা বিন্দুমাত্রও অপোহিত হইত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি সম্বন্ধে বলিবারও অনেক কথাই আছে। এখন হাফা রকমের ছদ্মবেশী কথা বলি। যখন “সাদনা”র “সুবিভ-পাখাণের” গল্পটি পড়িয়াছিলাম, তখন সেই মায়াপুহীর সম্বন্ধে ও তাহার অবিবাসিনী হুমদীর সম্বন্ধে কি যে উৎসাহ ও কৌতুহল হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কবি হাহার মুখ দিয়া গল্পটি বলাইতেছিলেন, সেই লোকটি কৌতুহলকে চরম লীমায় উপনীত করিয়া হঠাৎ একটা তেলগেয়ে টেনে নানিয়া যাওয়ায় অনতিক্রান্তযৌবন পাঠকের মন কবির প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। গল্পটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম অনেক রকম। শেষে রায়ে যুগ হইয়া থাকিলে কখন হইয়াছিল মনে নাই। বিনি পয়সার ভোজ যখন রবীন্দ্রনাথের কাগজে পড়িত, তখন আমি অনেক হইয়াছি। তখন আমরা কয়েক পরিবার বেনিয়াটোলার সেনের একটি বাড়ীতে থাকিতাম। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা অভিমানের হাস্য-মোহনত্ব হওয়ায় ভিত্তির পরিচয়ের কক্ষাধিগের দ্বারা তৎসিত হইয়াছিলাম মনে পড়ে।

বর্ধমান সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আশোনা-সভা স্থাপন করেন। তাহার নাম ছিলিয়া গিয়াছিল। তখন উহার আয় ছিল ২০ নং কর্ণওয়ালিস ঙ্গাই ভবনে। এ আশিমে বহু সাহিত্যের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত

হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রয়োজন এখনও আছে।

নিজের মাসিকপত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া তিনি অল্প মত মাসিক-লেখা দিয়াছেন, তাহার সবগুলির নামও আমি জানি না। এ বিষয়ে তিনি খুব মূঢ়বৃত্ত। মাসিক পত্রের লেখক রূপে তাহার একটি গুণের সাক্ষ্য তুচ্ছভাষী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্বেই তাঁহার অজ্ঞতম অগ্রগত স্বপ্নীয় জ্যোতিষপ্রদীপা ঠাকুর মহাশয়ের আশঙ্ক্য নিয়ম নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতিষপ্রদীপ বহু ক্রমশঃ প্রবংশ লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাহার কোন কিত্তির জন্ত কখন অপেক্ষা করিতে বা তাগিত দিতে হয় নাই। বরাবর মাসের ১লা দিবা যরা তাঁহার লেখা থাকে আশিখা পৌঁছিত। স্বপ্নীয় বিশেষনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বার্ষিকের দুইলজতা সত্ত্বেও স্বতঃ প্রসূত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হৃৎলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিত্তির জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও টিক তাহার পরদিন একটি কিত্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ বৈধে, সংঘম ও নিয়ম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কবিতা বড় এলোপোহ ও গাথাযোয়ালী বলিয়া তাঁহারের একটি বহনাম আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি কিনা সে বিষয়ে কোন কোন বাঙালী ও অবাঙালী গভীর গবেষকের সম্মত থাকিলেও, মাসিক পত্রের খোঁজকো কোনো সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিশ্চয় করা চলিবে না। এ বিষয়ে তাঁহার সম্মতি নাই অনতিক্রান্ত। ইহা তাঁহার অকবিত্বের প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হইল।

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন-না-কোন মাসিকপত্রের আশঙ্ক্য থাকিতেন বা থাকিতেন, বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তম-রূপে নির্বাহিত হইত। তাহার আর একটি কারণ এই



যে, তিনি সাময়িক ঘটনা সংক্ষেপে সামান্য কিছু লিখিলেও তাহাতেও সাহিত্য-বস থাকে। যাঁহা হউক, ব্রহ্মের বিষয় সম্পাদকের কাজ তিনি স্বন্দ স্বন্দ করিয়া অশ্রের পক্ষে পথ প্রদর্শক হইয়াছেন কিন্তু উহাতে অনর্থক ব্যবহার

নিজের শক্তি ক্ষয় করেন নাই। কারণ সম্পাদকের কাজ প্রতিক্রিয়াশীল মনীষীদের কাজ নহে; শ্রমবটু সাধারণ বুদ্ধিবিহীন লোকদের ঘরাই উঠা চলিতে পারে। ৮ই বৈশাখ, ১৩০৬।

(পাশ্চিম নিকেতন হইতে উদ্ধৃত)

## প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত 'নবযুগ' সম্পাদক সর্বাঙ্গ—

পত্র সংখ্যা নবম্বে শ্রীমাদেবী লিখিত পত্র পাঠ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যাব্বিত হইলাম। মাসিক বহুমতীতে 'মহিলা'র কবি নামে যে লেখা বাহির হইয়াছে, নামের সাদৃশ্য থাকায় পত্র লেখিকার পরিচয় জিজ্ঞাসার অধিকার আছে এবং সে বিষয়ে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু পত্রলেখিকার দ্বারা বিদ্রূপী কবির এরূপ অজ্ঞতা বাংলা কাব্য সাহিত্যে বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি কি 'মহিলা' 'সবিতাভূষণ' 'হামির' প্রভৃতির লেখক স্বর্ণাঙ্গ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাপুত্রের নাম তখন নাই? কি করিয়া হঠাৎ যে বিষয়া লইলেন সে 'মহিলা'র কবি 'বিশ্বপুজিত বিশ্ববন্দিত, বিশ্ববরণ্য, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বাতীত আর কেহ হওয়া সম্ভবপর নয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এবং এরূপ মনে করিয়া মাসিক

বহুমতীর লেখিকাকে অনাবশ্যক জিজ্ঞাসা ও উপদেশ কি prejudiced মনের লক্ষণ?

মাসিক বহুমতীর ও নবযুগের লেখিকারা কেহই আমার পরিচিতা নন, সাধারণ পাঠক হিসাবে এই পত্র বিলাম এই জ্ঞে যে অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ গালাগাল দেওয়া উচিত নয়। আর পরে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কবি নাই—তাহারও প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি; বিশেষতঃ আলোচ্য কবিতাতে স্পষ্ট যোজ্য যাহা যে 'মহিলা'র কবি মৃত। ইতি—

প্রিয়প্রকাশচন্দ্র দত্ত।

৬৩নং বহুলবাগান রোড, ভবানীপুর।

২৪শে আশাঢ়, শুক্রবার।



## জগতের নিয়ম

ত্রিশশোক রায়

"কে যায়?" ও "তাইত, জৈলাবির মায়ে এসে পড়েছি যে, ধরা না গড়ি।" সাহসে মন বেঁধে উত্তর দিলাম—"রাখত, কোন গোলামাল হ'ল না, গমনার বাস্কাটা বি-বপনের তল্লায় চেপে, ডান হাতে ছুরিখানা শক্ত করে ধরে এগোলাম। বাসায় এসে ডাকলাম 'ময়না', ময়না দাওয়ায় কোণে চুপটি করে বসেছিল; ভাক তখন উঠে এসে তিক্তশ্বরে বললে, 'আবার বেরিয়েছিলি?' বলিনি ও সব অভ্যাস ছেড়ে দিতে? ওতে যে বোলা বোলা হন—তা' না'—এদিকে ধরে বললাম, 'এ না করলে পারি কি?' এদিকে ধরে চাল না থাকলেও গাল দিবি, আর এদিকে রোজগার করতে গেলেও গাল দিবি?' ময়না এবার কোন ভাবে বললে, 'খা, যা ক'রেছিলি—আর কিস' নে। আর, রাগ কিস'নে, হাত-পা ধো। তারপর সব বলছি। অনেক কথা আছে।' বাতবিকই চুরি করে মনটা বড় খাপস হয়েছিল। হাত-পা ধুয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলবি, বল। সে আমার পায়ের উপর পড়ে ছুঁয়ে কেনে উঠল, তারপর কিছু শাস্ত হয়ে বললে, তুই আর ও কাজ কিস' না। আমার বড় ভয় করে। আমি ছুঁমনি উপরোপরি স্বপ্ন দেখছি যে তোকে পুলিশে হাতকড়া দিয়ে কলের গুঁতো মাতে মাতে নিয়ে চলেছে। কলের ঘায়ে তোর মাথা কেটে রক্ত পড়ছে—ওঃ আমি মরে যাব, গলায় দড়ী দেব, তুই যদি ফের চুরি করত যাস। গতর ঘাটিয়ে সাধুভাবে ছুটি রোজগার কর, আমিও তোর সাহায্য করি। তাতে ছুঁবেন বেশ শান্তিতে থাকবি।' মনের মধ্যে সত্যি একটা কুখ দেখা দিল। তার উপর তার কামাটা প্রাণে বড় লেগেছিল। আমি বললাম, 'আচ্ছা, বেশ তোর কথাই 'সই'। আর ও কাজ করব না।' ময়না

বললে, 'তবে আমার গা ছুঁয়ে বল।' তার হাতখানা ধরে বললাম, 'মুখের কথায় বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা এই বললাম, হলো?'

সেই থেকে ছুরি ছেড়েছি.....

আজ তিনদিন পেটে ভাত নেই। হাতে কাজ ও নেই। খাঁর কাছে ছ'এক পয়সা পেলাম তার। হয়ত সাক্ষীকার করেছে নয় বলছি 'দিয়ে দিয়েছি।' মওল মহাপুত্রের ঘর সেয়ে দিয়েছিলুম, পয়সা দেননি তখন, বলেছিলেন, 'পরে পাবি।' পথে যেতে যেতে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। বললাম 'মওল শায়া, বড় অন্যতনে দিন যাচ্ছে, সেই পয়সা ক'টা এখন দিলে বড় স্ববিধে হ'ত।' মওল শায়া অবাক হয়ে বললেন, 'কোন পয়সা?' একে ক্ষিধে পেট চোঁ চোঁ করছিল, তার উপর এমনি কথা। তখন তারি রাগ হ'ল। তবু যথাসম্ভব মোলায়েম ভাবে বললাম, 'সেই যে মোসামকে আগে আপনার ঘরখানি ছেয়ে দিয়েছিলান, তার পয়সাটা'ত তখন দেননি, এখন যদি—'মওল শায়া আমার বাধা দিয়ে আরো বিস্তৃত ভাবে বললেন, 'কোন? সে পয়সাত তোমায় তবুনি দিয়ে দিয়েছি।' আর সন্তুষ্ট হ'ল না। ভজলোক হ'য়ে যে পরীকষে ঠকিয়ে ছ'পয়সা পাবার জন্মে এমনি মিথ্যা বলতে পারে তার প্রশংসা আপনৈ, এই প্রথম পেলাম। আমি রাগে আত্মহারা হ'য়ে তাকে আচ্ছা মত যা কয়েক উত্তম মধ্যম দিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

পরদিন সকালে পুলিশে আমার ঘরে নিতে এল। ময়না কেনে দাউয়ে পড়ল। হাথ অভাগিনীর আমি ভিত্ত যে কেউ নেই। চোখে জল এল। হঠাৎ মওলকে দিকে চাইতেই চোখের জল শুকিয়ে গেল। যেহেতুম



সে ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে হসেছে, আর মাঝে মাঝে মননার দিকে লোপাৎ নখন চাইছে। পুলিশ আশা'র ধরে নিয়ে গেল।... সেই জেনেই বঙ্গলায়,—তবে অপর্যাপ্তা ভিন্ন।

বিচারে বেশ হ'ল। 'হবে তা আগেই জানতাম। জগতের 'নিয়ম'ই এই যে। সত্যি কথাই বলেছিলাম... বিশেষ করলে কোথায়?.....

হ'মাস বেশ খেটে বাড়ী ফিরছি।—বাড়ীর দরজায় ঠাড়িয়ে ডাকলাম, 'মননা?' কোথায় মননা! একটা শব্দ নখন ঘরের চাল হ'তে উড়ে গেল।—বুট্টা ছাৎ করে উঠল। ভিতরে ঢুকে বেশি চারিদিক আগাছার ভরে পেছে ঢালে খড় নেই বসেও ঢলে। সাধের লাউ পাট্টা ভেঙে তকিয়ে গেছে। আবার ডাকলাম 'মননা!' কোন উত্তর পেলাম না। ঘরে ঢুকে বেশি কেউ নেই।... কোথায় গেল? তবে কি না খেয়ে মরেছে?—না, তা'হলে লানের চিহ্নও ত থাকত।—তবে কি মওল মশায়।—সেবার সন্ধ্যেটাই সত্যি হবার বেশী সম্ভাবনা।... পাগলের মত ছুটে চললাম মওলের বাড়ীর দিকে। সন্ধ্যে সত্যি হলে আজ তাকে খুন করব। পথে এক প্রান্তিকের সন্ধ্য দেখা। তাকে মননার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে বড় হুসিত ভাবে বললে, 'ভাই, আর কাম হ'ল পালাপালা চোখে নাহি হুম। 'দুর্গা' 'কালী' 'ভগবতী' বড়ই সেকেলে, 'তরঙ্গা' 'অবলাবালা' সবে অবহেল। 'চান্দনী' মালতী 'বেলা' 'হেলা' পুষ্পাতন, 'ম্যামোলিয়া' 'হাশু'হানা' নাহি ভরে মন।

সব লোকই তাঁর কথা'র ওঠে বসে, তাঁর কিস্করতে পারি আমি একা। কিন দিন পরে জননাম মননা আশুহত্যা করেছে।—আমার সন্ধ্যেও তবে মিথ্যা নয়। তবে যে, মওল আজ তোকে খুন করব তারপর, যা থাকে বরাতে। ঝড়ের মত ছুটে চললাম মওলের বাড়ীর দিকে। দরজার গোড়াতেই তাঁর সন্ধ্য দেখা। আমায় এরকম ভাবে ছুটে আসতে দেখেই তাঁর মুখপান তকিয়ে গেল। কোন কথা না বলে, হাতের লাঠিটা মাথার উপর তুলে বাড়ি হাঁকলাম। দুর্ভাগ্য বশত, 'বাড়ি'টা তাঁর মাথার না সোপে হুটির গায়ে লাগল। তারপর আর একটা বাড়ি হাঁকতে যাব, এমন সময় পেছন থেকে কে ধপ করে লাঠিটা হাত থেকে কেড়ে নিল। আমি ছেড়ে আমি হতভয়। মওলের পু'তনীতে দু'শী মারতে যাব এমন সময় কে যেন পেছন থেকে আমার লাঠি হিট্টে আমার মাথায় এক লা লাগল। সন্ধ্য সন্ধ্য অজান হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

আবার পুলিশ ঘরে নিয়ে চলেছে। এবার জনহি দশবছরের কম নয়। আমার কিস তাতে একটুও হুঃ নেই। আমার একমাত্র আপশোষ হ'ল এই যে মওলকে ঘেরে মননার উপর অভ্যাতারের প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। হায়, ভগবানের রাজ্যে কি এমন বিচার?.....

## নামরাধা

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস বি-এল

বার বার তিন বার তিন ছেলে হ'লে, পুষ্টি মানত করে 'কতা হ'ক' হ'লে। মা বর্গী কখনে ক'ণা এলো এক মেয়ে, ফুটফুটে ব'র্ষ তার কাঁচা সোনা ঢেয়ে। নাম রাখিবার তরে পড়ে গেল দুম, কাম হ'ল কালাপালা চোখে নাহি হুম। 'দুর্গা' 'কালী' 'ভগবতী' বড়ই সেকেলে, 'তরঙ্গা' 'অবলাবালা' সবে অবহেল। 'চান্দনী' মালতী 'বেলা' 'হেলা' পুষ্পাতন, 'ম্যামোলিয়া' 'হাশু'হানা' নাহি ভরে মন।

নিত্য নব নাম লাগি জ্বরিত তাগিদ, আনিবত তুল করি, তাঁর বাড়ি জির। হাজার হাজার নাম এল ভাল মন্দ, নামধূব, নামধূব, হল না পছন্দ! অকস্মাৎ একদিন বিবাদের শেষ,— পত্নী আশি করে হালি হাসিয়া সরল— 'কি হবে ক'ণালো নামে—মেয়ে একসত্তি, রিয়্যি নাম দিতে পারি, করি তিন সত্তি।' আশি বলি—'সেই ভাল, হাও মোরে ছুটি' এত বুঁকে শেষে নাম রাখা হ'ল 'পুটি'।



## রুক্মগতি

শ্রীশাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

শেষের কোলে গিয়ে দিন কাটাবার হুযোগ ও সৌভাগ্য দ্বিভুত আমার খুব কমই। হুযোগ মদিবা-অন্ন ঘটত ত' সে হুযোগকে কাজে বাটিয়ে সৌভাগ্যকে বরণ করে নে'বার অবসর আমার অদূরে হ'ত আরও অল্প। সেই অল্পই হঠাৎ অভাবিত রূপে প্রসঙ্গ হয়ে উঠল।—একদিন হৈসেনের মহামেলা টেলে দেশখাতী একটা থেরা গাড়ীতে চেপে বসলুম।...শেষ থেকে টেপখানা বেরতেই আলোর সমারোহে চোখ বসলে গেল—দূর দিশান্তরে রক্তস্বর্ধ্য বিবাদের পূর্বে তাঁর শেষ দৃষ্টিটুকু বলিয়ে নিম্নিল ঘন সবুজ বাসের গুণর—আর তাঁর রক্তিমপ্রাণ তরুণী ঘাটের পার থেবে খোপাদের বউ—তবুতে দেওয়া কাপড়গুলো তুলে সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ী ফেরবার উজোগ করছিল।

টেপখানা বেশীক্ষণ চলবার আগেই দেখলুম, গগন-প্রান্তের সেই আহত রক্ত বীরকে আচ্ছন্ন করে কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশলম্ব।...পাড়ীর দল তাঁদের বাসা বাধা নির্দিষ্ট গাছগুলির উদ্দেশে উড়ে চলতে।... টেপ চলতে লাগল।

হঠাৎ মাঠের ধারে একটা বাড়ীর গুণর চোখ ছুটে গেল। জীর্ণ মোতাল্লা বাড়ীটি। তাঁর আশে পাশে সারিবদ্ধ যে ফুলের গাছগুলি এক দিন বাড়ীর অধিকারী ও অধিকারিণীর প্রাণে আনন্দের সঞ্চিত করত, তারা অগ্ন্যে আজ মালীর কোলে লুটিয়েপড়বার জন্ম ব্যাধ হয়ে পড়েছে। ঘরগুলির দ্বার জানালা সব বন্ধ। বাড়ী ঢোকার পথে মাঠখান্নাটিতে মালীদের বসবার একটা ঘর।

চকিত দৃষ্টিতে এইটুকু দেখে নিম্নুম—টেপ তখন উর্দ্ধ-বাসে ছুটেছে। আর একটু পরেই আকাশ ভেঙে জল-ধারা নামলে—গাড়ীর জানালাগুলো এঁটে দেওয়া গেল।

কাচের গুণর জলের ছাট এসে তা'কে কাপসা করে তুললে। গাড়ীর বাইরে অশ্রুচোখে গাছপালা ছুটতে

লাগল। সেই বাগান থেরা বাড়ীখানার কথা মনে পড়ে গেল। কত উজ্জবে, কত আশায়, এক তরুণ তাকে পড়ে তুললে;...নব-বধূকে নিয়ে বাস করতে এল। এমনি যোগ্যক্রান্ত দিনে, আতুল উজ্জবে বধু বৃত্তি ঠাড়িয়ে থাকত প্রিয়ের আশাপথ চেয়ে। জলে ভিজতে ভিজতে তরুণ দিয়ে রক্ত চুলগুলোকে বিপর্য্যত করে তুলত।

জলে ঘাবি না ভিজতুম, তা'হ'লে এ' বড়টা পাওতা হ'ত না ত! এবার রোজ ভিক্রে আসব ওই লোতে!

রোজ জল পাবে কোথায় তুমি? তোমার আমার আনন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে ত পুণিবার কারখানা চলে না। এমনি দ্বারা কথা তাদের মধ্যে হ'ত হয় ত! বিবাহের পর প্রথম দিশগিল সে যে শেষ না করা স্বপ্ন!...

কাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলুম, এই দুঃস্থ জল-ধারা সন্ধ্যাও একটা কালো মেয়ে জলে পড়ে রয়েছে গামছাটা একটু দূরে ফেলে দিলে, তার পরই তেলে সেটিকে টেনে আনতে।

এমনি বর্ষার সন্ধ্যা সন্ধ্যা তারাও যে এমনি করত না কে বলবে! অবিশ্রান্ত বর্ষা—নিকটের জিনিষও দেখা যায় না। এমনি দিনে তারা হয়ত জলে গিয়ে নামত, দূর সরে গিয়ে ছ'জনকে ছজন করতে চোঁটা করত।

চোক বন্ধ করে জানালাটার মাথা ভেঙে ছবিটা ভাবতে লাগলুম—ভারি মিষ্টি-টেকল।

জমে বৃষ্টি ধরে এল। মাঠের ভিক্রে আলোর উপর দিয়ে ছাটী শাঁওতাল লম্বাটী হাত ধরাধরি করে চলতে...জমে সন্ধ্যার আঁধারে তারাও হারিয়ে গেল।

ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে, একখানি ঠাণ মেঘা গেল, বৃষ্-থকে রঙের হাটহিলার মত!...বুকে নখর ঝাঁটা, লীর্ণ



কদম্ভাভার সম্মিত খেঁদুর পাছগুলো ক্রমেই  
পেছিয়ে পড়তে লাগল।

জান্না ভুলে বিনুয়—জলভেজা ঘাসের উপর অগ্রকট  
চাঙ্গের আলো এসে লুটোঁজিল।

মনে হ'ল, এমনি বর্ণবন্ধিত প্রথম রাতে তারাও  
হয়ত তাদের বাগানের লাল কাকর চালা পথে পাশাপাশি  
বেড়াত পরশনের মুখের পানে চেয়ে। ভিলে গাছের  
পাতার উপর ছোঁয়া এসে পড়ত—অশ্রুভেজা চোখের  
কোণে মূহ হাসির মত। রাত্রির আসির মিলনের কথা  
ভেবে তাদের বুক আনন্দে ভরে উঠত।...

একটা মালগাভী মাটিতে মানানসই ভাবে পুতে  
ঠেসনুঘর তৈরি হয়েছে। এইখানেই নাবতে হ'ল।

## “বাপা”

—মুরারিমাহেন দাস—

চুমি স্বন্দর—চুমি স্বন্দর  
সখা—স্বন্দর ভূমি রে!  
মহা উমানার চুমি—উদাম চির  
চকল ভূমি রে!

আজি কোথা গেল ফুলবাণী?  
কুম্বর মুখে স্বন্দর হাসি—  
বরে পড়া অবিরল?  
গন্ধ পাগল আঁত মুহুর

শোভে না ত মুহুরে!  
তবু ত ভূমিতে পারিব না সাধা  
—“স্বন্দর ভূমি রে!”

আজি—নিভায়ে আলোক-সুখে,  
দলিত মাধবী কুঁড়ে,  
কিছু কিছু মাধবী কুঁড়ে,

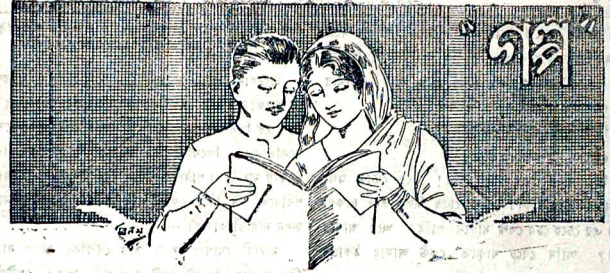
বিন সতের পরে মিরছিলাম।

সেই বাজীটাকে আবার দেখলুম। ভাবছিলুম...

তারপর হয়ত তাদের অবস্থা এল খারাপ হয়ে, এসব পরের  
হাতে ভুলে দিয়ে তারা হয়ত চলে গেল অত কোথাও  
হুটী ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো।

ভাবটি এমনি সময় পাশের বেঞ্চ থেকে একজন আর  
একজনকে বললেন—ওটা মণ্ডলপুরের আকিঞ্জি যোগেনের  
বাজী। কতখণ্ড থেকে এক প্রাঙ্গণের মধ্যে এক এখানে  
এখানে রেখেছিল। পরে সেই মেয়েটার প্রান্তাভেজা  
জানতে পারে, আকিঞ্জি এখন কোথায় আবার সেই  
মেয়েটা—

কলনার খোঁজা আমার কোন সাধানে এক সন্তান পার  
কেনে করবে? বাজালে! এই শেষ—আমি  
ভাবছিলুম—



## অপূর্ব-মিলন

প্রীতিকাপ্রসাদ দত্ত

একে একে যোগেছি স্থলের সবুজ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত  
সেবারে গ্রামে যখন মড়ক ভীষণরূপে দেখা দিল তখন  
কত লোকের যে কত সন্নিধান হ'ল তা আর বলা যায় না।  
কাকর বাপ, কাকর মা, কাকর বা স্বামী, কাকর বা সবে-  
ন নীলমণি, একটা মাত্র ছেলে মড়কের কবলে পতিত  
হ'ল, যোগেননাথের মা বাপও বায় যাহনি। রাকালী  
মৃত্যু তাদের হিনিয়ে নিলে। আর বহরের ছেলে যোগেন-  
নাথ তখন আতুল পাথরে ভাপল। কি কর্ণে, কোথায়  
যাবে কিছুই ঠিক কর্তে পাননা। কিন্তু যার কেউ নেই  
তার ভগবান আছে। যোগেনের অতি দূর সম্পর্কীয়  
এক পিসি তাকে নিষেধ বাড়াতে নিয়ে গেল। পিসির  
কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি অতি অল্প বয়সেই  
বিবাহ হয়েছিলেন স্বতরাং একরকম হয়েই কিশোর  
যোগেননাথের দিনগুলি কাটিতে লাগল।

ক্রমে যোগেন গ্রামা স্থলে ভর্তি হ'ল। তার অসামান্য  
প্রতিভার বলে সে শিশুকালের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। তার  
পিসি যখন লোকের মুখে তার প্রশংসার কথা শুনতো  
তখন আনন্দে গর্জে তার বুকবান দশদাত হয়ে ফুলে  
উঠত। আর নিমাইই সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত—  
‘ঠাসুর! যতর আমার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। সে  
যেন দেশে দেশের মধ্যে একজন হ'য়ে ওঠে।’

একে একে যোগেছি স্থলের সবুজ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত  
ক'রে প্রবেশিকার দ্বিত্য প্রস্তুত হ'ল। যাবার দিন হেডমাস্টার  
মহাশয় তার হাত ধরে বলেছিলেন—‘তুমিই আমাদের  
স্থলের আশা ভরসা বাবা। সদ্ব্যবহারে উত্তীর্ণ হয়ে স্থলের  
ও বংশের মুগ উজ্জল করো।’

তরপর যখন প্রবেশিকা পরীকার ফল বেকস তখন  
দেখা গেল যে যোগেন সপ্তমানে উত্তীর্ণ ত হয়েছেন  
উপরন্ত পনের টাকা ব্যক্তি পেয়েছেন। এখন আর এক  
সমস্তা উত্তীর্ণ হ'ল। যোগেন কলকাতায় গিয়ে কলেজে  
পড়বে না গ্রামের স্থলে একটা মাঠারী যোগাড় করে  
গ্রামের ছেলে গ্রামেই থাকবে?

পিসি বলে—আমার কথা তুমি শুন! তবে  
একটা কথা বলি।  
যোগেন বলে—কোনদিন আর তোমার কথা তুমি নি।  
পিসি বলে—আমার মতে তুমি কলকাতায় গিয়ে  
কলেজে পড়াশুনা করবে না। আমি এখান থেকে কিছু  
কিছু পাঠাব আর তুমি সেখানে মাঠারী করে কিছু টাকা  
টাকা বোজগার করি। তা ছাড়া জলপানির টাকাও  
আছে। এই ঝিনটে মিলিয়ে কি আর চলবে না?

যোগেন বলে—তা চলবে না কেন? তবে কিনা  
আমি বলছি যে গাঁয়ের জমিদার মহেশবাবু একটা মতুম



হুল হুলছেন তাতে ছোট ছোট ছেলে পড়াবার অঙ্কে একজন লোকের হরকার। ভাবছি আমি সেই কাজটা করছি। তা'হলে এামেও থাকা হ'বে আর তোমার জমিওলাইও তত্তাবধান করা হ'বে।

পিসি বললে—মাইনে কত ?

যৌসনে বল—পনের টাকা।

পিসি বল—মাস্তার পনের টাকা! ওরে তোর জলপানি যে পনের টাকা। তার চেয়ে কলকাতায় চাকরী করে এর চেয়ে ঢের বেশী মাইনে পাবি। আর আমার কন্নী? আমি বেঁচে থাকতে কেউ আমার ঠকাতে পারেনা!

তারপর একদিন শুভবিরে যোগেশনাথ পিসির পায়ের মূলা মাথায় নিয়ে কলকাতা ব্যাংক কর। হরিমতী (তাহার পিসিনা) অত্যন্ত চমকান্বিত হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—‘হায়! এই সময় যেদি দাদা ও বৌ বেঁচে থাকতেন!’

২

কলকাতায় এসে যোগেশ প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হ'ল। কিন্তু থাকত সে অনেক দূরে। শ্রামপুত্রের একটি মেসে। কিন্তু সে আজ ছ'বছর কলকাতায় রয়েছে একদিনও সে ট্রাম কোম্পানীকে অনর্থক একটি পরস্যাও করেনি। নিতাই সে শ্রামপুত্র থেকে হেঁটে কলেজে যেত। তার কারণ, সে—টো তার ভাগ্যের ষোর বলতে হবে—কলকাতাবাসী পাড়াগেয়ে ছেলেরের মত অতটা বায়ুমানী শেখেনি। বাহো, একরকম তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। আজকার মত আজও সে কলেজে গেছে। তবে পার্থক্য এই যে, আজকে ১০-টা ছুটি।

কলেজ থেকে এসে দেবল—টেবিলের ওপর তার নামে একখানা গুলম রয়েছে। জামা কাপড় ছেড়ে সে চিঠিখানা খুলে পড়তে বসল। এখানা তার পিসিনা লিখেছেন। লেখা আছে—‘বাবা বড়! এবারে একটি মাস্টারীর যোগাড় কর। এক সন অজন্মা হ'ওয়াতে অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেছে। একদম যে টাকা পাঠাব না—তা বদলি মা। তবে আগে যা পাঠানাম তার চেয়ে

কম পাঠব। জানি বাবা! তোর কষ্ট'হবে কিন্তু কি কর্ত? আমি নাচারা।’ ইত্যাদি—

চিঠিখানা পড়ে যোগেশ মনে মনে হাসল। কারণ সে কলকাতায় এসে একটা মাস্টারী যোগাড় করেছিল। কিন্তু এই পিসীমাই তাকে চিঠি লিখে মাস্টারী ছাড়তে বলেছিলেন। লিখেছিলেন—‘বখন আমি তোকে তোর হরকার মত ছাড়া পাঠাতে পারছি তখন মিহিমিহি নিচের শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই। বখন পার্সনা, তখন মাস্টারী করিস।’...

মাস্টারী যোগাড় কর্তে তার বেশীদিন শ্রমগল না। দিন সাতকের মধ্যেই একটি কাজ হুটে গেল। এরাটো এক উকিরের ছেলেকে পড়াতে হবে। মাইনে—পনের টাকা। মাত্র বিকলে দু-খটা পড়াতে হয়। ছেলেরা হেবার ফুলে খার্ড রাসে পড়েন। আবার মাঝে মাঝে তার চেয়ে এক বছরের বড় বোনটোও যোগেশের কাছে পড়া জিজ্ঞাসা কর্তে আসে। বখন—আমার বাবা। সে বেখুন কলেজে সেকও রাসে পড়ে। দেখতে সুন্দরী, পরমা লাংঘমায়ী। আমরা বিবেশ ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি—ছাত্রীটি বখন মাস্টার মশায়ের কাছে কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্তে আসে তখন মাস্টার মশায় সব কাজ ফেল দিয়ে আগে ছাত্রীর পড়া বলে দিতেন। আর ছাত্রীটি বখন অল্পসিক্ত মুখ ফিরিয়ে থাকত বা অপরূপ ভণীতে হেঁটে মুখে ঘরখানি ত্যাগ করে চলে যেত তখন তিনি বিশ্বয় বিক্ষিপ্ত চক্ষে এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকতেন। মনের মাঝে একটি কাণ আশা বিক মিক করে উঠত কি না কে জানে?

৩

যোগেশের মাস্টারী জীবন পরিপূর্ণ এক বছর হয়েছে। তারপর মধ্যে ষ্টিক ‘মাস্টার-ছাত্র’ সম্বন্ধ ছিল না সে অনেকটা আপনাব জনের মত হয়ে পড়েছিল। এমন দিনও গেছে যে যোগেশ তর্জু পড়াবার নাম কর গিয়ে—গল্প করে সময় কাটিয়ে এসেছে। বাড়ীর ভেতর তার অব্যাহতি ছিল। ললিতার (যোগেশের ছাত্রী) মাঝে সে মা বলেই ডাকত। কতদিন সে ললিতার বাড়ী নিমন্ত্রিত হয়ে গেয়ে গেছে।...

প্রতিদিনের মত সে আজকেও পড়াতে গেছে। তবে আজ একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য ‘হ’ব ‘হ’ব, এমন সময় যোগেশ ললিতাদের বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। অগ্রদ্বিন হ'লে সে সটান পড়াবার ঘরে চলে যেত। কিন্তু আজকে সে কিছুক্ষণ বাইরে ধাঁড়িয়ে রইল। যাব কি যাবনা—ভাবতে লাগল। কারণ সে দেখলে যে আজ ললিতাদের বাড়ীখানা ফুল দিয়ে শাভিচ্ছে। হতভাং বাড়ীর ভেতর যে একটি সমারোহ ব্যাপারের আয়োজন হয়েছে তা সহজেই অস্বপ্নে যে।

কে মনে উপরের বারান্দা থেকে হেসে উঠল। যোগেশ চেয়ে দেখে যে উপরের বারান্দার ললিতার ঠাঙ্কুধা ধাঁড়িয়ে হাসছেন। তিনি একজন হসিক লোক। বখন যাকে সামনে পেলেন তখন তাকে ডেকে এনে এমন কতগুলো কথা বলতেন—মাত্রে সে না হেসে থাকতে পারত না।

‘কে হে চোরের মত ধাঁড়িয়ে আছে?’—ঠাঙ্কুধা উপরে উপর থেকে বলেন।

‘আজ্ঞে আমি! চোর নই বাটপাড়’—যোগেশ উত্তর দিল।

‘পাড়াও শ্রীবের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি’—ঠাঙ্কুধা ওপর থেকে ঐ কথা বলে নীচে নেমে এলেন। তারপর যোগেশের হাত ধরে ওপরে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

ওপরে বৈঠকখানায় গিয়ে যোগেশ দেখতে পেল যে বরখানি উত্তমরূপে সজ্জিত।

সে ঠাঙ্কুধাধাককে জিজ্ঞাসা কর—ব্যাপারখানা কি?

ঠাঙ্কুধা তার মুখে বিষয়ের ভাব এনে বলেন—কি জানি ভাই! আমি ত এতদিন কলকাতায় ছিলাম না; এই ভূমি আসবার ষ্টিক তিন সেকণ্ড আগে আমি এসেছি।

ঘরে একটি হাসির বোল উঠল।

—না না ঠাঙ্কুধা! বলুন না।

—বাগ! তুমি যেন আর জান না!

—সত্যি বলছি জানি না।

—কেন? লতা (ললিতা) তোমায় বলেনি যে আজ

তার জন্মদিন।

—না!

—কিরে লতা! বলিসনি?

—না ঠাঙ্কুধা! বলতে ভুল গেছি।

—তা হোক সে। তুমি ত আমাদের বাড়ীর ছেলের মত। আমি লতার হয়ে তোমায় নৈমন্তিক কান্নাম। আজ রাতে তুমি আমাদের বাড়ী বাবে।

—যে আজ্ঞে।

—এবার লতা তোর মাস্টারকে একটা গান শুনিয়ে দে।

—ললিতা কি গাইতে পারে নাকি?

—বলে। একেবারে ‘ফাট কেলাস’।

ললিতা ধীরে ধীরে এসে অর্পণটার ধারে গাড়ল। আজ তাকে যেন আরও স্বন্দর দেখাচ্ছে। চুলগুলি সংবদ্ধ হ'য়ে বেশীর আকারে পুষ্টোপরি লম্বমান। শেখদিকটায় একটা সফ লাল রঙের শিখের ফিতের ওপর একটি হীরের সেপটিশিন। কাশে হীরের দুল। মাথার ছ'পাশে ছুটি ‘ক্রীপ’; তাতে মহাশ্রাব্য প্রতিভা। ছ'পাশে বেশ সুক ভাবে আলতা লাগান আছে। বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে একটি হীরার আঙী। ছ'হাতে ছ'পাছা করে নতুন হাল ফোনের সফ ছুটি। আর পরনে একখানি চওড়া লালদাড় বেগুনা ম্যুগান শাড়ী। রাউন্ড দামী শিখের; পাড়ে লাল শিখের বিস্তা বগান।

‘আর দেয়ী কেন? গান আরম্ভ কর না’—ঠাঙ্কুধা বলেন।

ললিতা গান আরম্ভ কর—

গুণাগুণ নবীন পথিক!

কেন হৃদে মম মিলে সাদা!

না বলি যদি যাও চলি!

আমি যে কবেই হবে সারা!

তাই বলি গুণাগুণে ঘোষনা

মনে মম বাবা বিওনা

নিদ্রা নিদ্রার হোষনা

তুমি হে পথিক বর!

আমাকে করিয়ে তব পথ সাধী।

আমার হৃদয় হর!



ললিতার গান শেষ হবার পর সকলে যোগেশকে গান করীর জন্তে পাঁড়াপাটী কর্তে লাগল। যোগেশ যে গান গাইতে ভাল না—তাহা নয়। তবে অনেকদিন অভ্যাস নেই—এই যা। তবুও ঠাণ্ডাচার অল্পবোলে তাকেও পাইতে হ'ল। সে মুক্ত কর্তে গান ধর—

‘আজ রজনী হাম ভাগ্যে পোহাবিহ

পেখর পির চুখ চন্দা—’

তারপর হানি ঠাট্টার মাঝে ভোজন ক্রিয়াটাও সমাপ্ত হ'ল।

এ সময়

আরও তিনবছর কেটে গেছে।

যোগেশ এখন—কলেজে ফিলসফীর প্রফেসর। কিন্তু এখনও সে বিবাহ করেনি। পিসীমা বোধ হয় তার বিয়ে দেবার জন্তে তার কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন— এই মধ্যে :—

‘বাবা যত! আমার বড় অশুভ; বাঁচব না বোধ

হয়। পিসিমার সঙ্গে যদি শেষ দেখা কর্তে চাও তবে পল্লপাঠী চলে এসো।’ ইত্যাদি—

চিঠি পড়ে যোগেশের ‘চক্ চক্‌গাছ’।

সে সেই দিনই সাতদিনের ভ্রম ছুটি নিয়ে গ্রামের দিকে রচনা হ'ল।

পরদিন যখন সে বিকেলবেলা গ্রামে পৌঁছিল তখন তার বৃষ্টি গুণ গুণ কর্তে লাগল। ‘পিসিমা’কে হৃৎ তার দেখতে পাব না—এতকাল বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে— এইরূপ নানা রকম কুচিন্তা তার মাথার আগতে লাগল। কিন্তু সে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখতে পেল— পিসিমা তুলসী তলায় প্রণাম করছে। সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পেল।

‘একি পিসিমা! তুমি যরনি?’

‘কেন? মর্তে বাব কেন? কি দুখেবের?’

‘তবে তুমি আমার অমনি করে চিঠি লিখলে কেন?’

‘পাছে তুমি না আসিস।’

— ‘কি বলছ? পাছে না আসি? তার আগে বেন আমি মরে যায়। তুমি যদি আমার না’ মাছর কর্তে—’

‘খাম! খাম! আর বক্তা দিতে হবে না। দ্বিবিধে

নিযে মুখ হাত-পা ধুয়ে কিছু খাবি চল।’—কিছুদিন পর পিসিমা একদিন যোগেশকে বল—

‘বাবা যত! একটা কথা ক’দিন বলি বলি করে বলা

হচ্ছে না। ‘ভয় হে—পাছে রাজী না হয়।’

‘কোন দিন রাজী হইনি বল।’

‘বাবা বিয়ে করে একটা ঘর আলো করা বউ আন।’

‘তা এই বলার জন্তে ‘অত কিস্ত’ হচ্ছিল? কার

মেয়ে? কত খেবে?’

‘আমার সইয়ের মেয়ে। দিতে বুতে কিছু পার্সে

না। আগে অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন খারাপ

হয়েছে। ‘তোমার যা মূলী তাই কর।’ যোগেশ কোন

দিন পরদিন হুধায় অমত করেনি। আজ তুমি।

তারপর একদিন শুচদিনে যোগেশের বিবাহ কার্য সম্পূর্ণ

হল।...

ফুলশয্যার।...

বধুর লক্ষ্য ভাগ্যবান জন্তে যোগেশ নব পরিমিতা

বধুর অবগুণ্ঠন সরাতেই চমকে উঠল। ‘একি? এ যেন

ললিতা। যাকে মেখে সে প্রথমেই মুদ্র হয়েছিল।

হাকে বিবাহ করা তার পক্ষে আকাশ কুহমের মত ছিল

—সেই আজ তার জীবন সারিনী! একি যত্ন নাকি?

একি অশুভ বিলম্ব! সে আবেগ ভরে ললিতার মৃদাল

বৃত্তের মত হাত ছুটি ধরে বল—

‘লতা! লতা! তোমার বিয়ে করার আশা যে

আমার পক্ষে আকাশ কুহমের মত ছিল।’

— ‘আজকে সেটা বাতবে পরিপূর্ণ হ’ল।’

‘বরণ নয়?’

‘না গো না। দেখনা আমি কে—একবার ভাল-

করে।’

তারপর?

তারপর যোগেশ ললিতার রক্তচাপে তাদের এই

‘অশুভ বিলম্ব’কে আরও দৃঢ় করীর জন্তে একটা প্রেমপূর্ণ

চুষন একে দিল। ক্রমে যোগেশের কাছে সব ঘটনা

প্রকাশ হয়ে পড়ল।



## শিশুদিগের খাভ

যে বাড়ীতে দুই বা তিনজন বালক বালিকা আছে, তাহার সর্বকনিষ্ঠকে অধিক বস্তু বালক বালিকাগণকে বাহা বাইতে দেওয়া হয় সেই সকল খাভের মধ্যে কোনটা খাভ খাইতে দেওয়া বা কোনটা নিষেধ করা খাইবে তাহা স্থির করা মুখিলের কথা। বালক-বালিকাগণকে ‘খাভ’প্রদায়ী কি খাভ দেওয়া খাইতে পারে তাহা ভাবিবার কথা। ইহাধের মধ্যে যাহার খাভ উত্তম সে তাহার সমুখে যে খাভ পাইবে তাহাই সেবন করিবে এবং এইরূপ শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবে। যে সকল বালক-বালিকা ভ্রম হইতে ক্রম ও দুর্বল এবং আহাৰ করিতে চাহে না তাহারিগণকে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান বস্তুব্য।

আমরা বাহা আহাৰ করি তাহা হজম হইতে ও তাহার অপপ্রয়োজনীয় পদার্থ শ্বাস প্রকাশ দ্বারা অজ্বারে পরিণত করিতে খাইয়া উত্তাপের উৎপত্তি হয়। এই উত্তাপ রক্ষা করা প্রয়োজন এবং তাহা রক্ষা করিতে আহাৰের প্রয়োজন। কোন খাভ সেবনে কতটা উত্তাপ হয় তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। একজন মাছবের কতটা খাভ, কতটা চর্বি, কতটা শ্বেতসার, কতটা অম্লদার, কতটা শর্করা জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন তাহাও বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা গিয়াছে। সেই ভ্রম প্রত্যেক মাছবের খাভের ভ্রম ব্যক্তিগত প্রয়োজন হিসাবে, তাহার দৈর্ঘ্য, বয়স এবং বৃদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়। চারি বৎসর বয়সের বালকের তাহার শরীরের ওজন হিসাবে প্রতিসের ওজনের ভ্রম প্রত্যেক ৮০ মাত্রা উত্তাপ উপপানকারী খাভ সেবন করা কৰ্তব্য। যদি তাহার বয়স অর্ধজন হয় বাহা এই বয়সের শিশুর সত্যতার ওজন হইয়া থাকে তাহা হইলে মোট ১০০ মাত্রা উত্তাপ প্রদায়ী খাভ তাহার সেবন করা কৰ্তব্য।

‘আমরা’ বাহা আহাৰ করি তাহার প্রত্যেকটি সেবনে যে উত্তাপ হয় তাহা মাখিবার ভ্রম এই উত্তাপের মাত্রা গণনার উৎপত্তি। চুইতে কাট বা কয়লা গোড়াইলে

যেমন উত্তাপের উৎপত্তি হয়। তেমনি আমাধিগণেরও আহাৰ করার ভ্রম ও তাহা হজম করিতে উত্তাপের উৎপত্তি হয়। তাহা ছাড়া যেমন বিভিন্ন রকম কাঠের ও বিভিন্ন রকম কয়লার উত্তাপ কম বা বেশী হয় তেমনি আমাধিগণের বিভিন্ন রকম খাভে বিভিন্ন মাত্রার উত্তাপ হয়। মাখন অতি ঘনীভূত খাভ সেইজন্য বিলাতী বেগুন সেবনে যে উত্তাপ হয় তাহাপেক্ষা মানব সেবনে অনেক বেশী উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কলা সেবনে ততমুদ্র অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপ হয়। কোন খাভ সেবনে কত মাত্রা উত্তাপ হয় তাহার তালিকা খাভ সম্বন্ধীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। খাভত্বা সেবনে যে উত্তাপ হয় তাহাকে ইংরাজীতে calory বলে।

পাঁচ হইতে আট বৎসরের শিশুর তাহার ওজন ও প্রকৃতি বা স্বভাব অল্পসারে ১৬০০ হইতে ১৮০০ মাত্রা উত্তাপের প্রয়োজন। কোন কোনও বালক-বালিকা সমতঞ্চক কিবা ও জীভাঙ্গিল থাকে এবং তাহারাজীভনী-শক্তিপূর্ণ, ইহারা তাহারিগণের পিতার ত্রায় সমপরিমাণ আহাৰ করিতে সক্ষম হয় কারণ তাহার সমস্ত দিন শ্রম করে। অপর বালক-বালিকগণ অতি আশ্রয় আশ্রয়ে বাড়ে, শাশ্বতবে থাকে এবং সেজন্য তাহারাজীভনী কম আহাৰ করে।

প্রাত্যহিক আহাৰের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী সকলের খাভ দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয়, যথা:—ছানাজাতীয় পদার্থ, শর্করাজাতীয় পদার্থ, মেঘদ্রব্যীয় পদার্থ, বনিঅম্লত্ব, খাভত্ব এবং জল। অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাগণের সর্বাপেক্ষা উত্তম ছানাজাতীয় পদার্থ হইল বাহা দুধের মধ্যে থাকে। ইহা শরীর গঠন করিতে ও ক্ষত্রপ্রাপ্ত বেশী পুর্নগঠন করিতে অধিতীয়, তাহার পর ভিষ, উদার, শ্বেত অংশ বিশেষ ছানাজাতীয় পদার্থ, তাহা ছাড়া টাটকা দুধ ও পনির একই জাতীয়। শর্করাজাতীয় পদার্থ শরীরে শক্তি প্রদান করে ও উষ্ণ উত্তপ রাখে। শিশুগণের



বাড়ে ইহা শতকরা ৫০ ভাগ থাকে। বালক-বালিকাগণ যে কল, শাকসব্জী, ভাত কটী ও মিঠাই বায় তাহাতেই প্রধানতঃ এই পদার্থ থাকে। অনেক বিভিন্ন বাড়ে চর্ষি পাওয়া যায়, যথা, দুধ, মাংস, ভিখ, শাকসব্জী, প্রাণী ও উদ্ভিদ হইতে তৈল, মাখন প্রভৃতি। চর্ষি সেবনে উচ্চ হয় এবং কোন কোন প্রকার চর্ষি সেবনে বিশেষতঃ মাখনে 'ক' শ্রেণীর বাত্ববীর্ঘ বা ভিটামিন পাওয়া যায়। চর্ষিগুণক উত্তম করার এক দুর্গমময় পদার্থে পরিণত হয় সেজন্য উহাতে ভাঙ্গা সকল খাদ্য সবসময়ই পক্ষে এবং বিশেষতঃ অল্প বয়স্কদের পক্ষে অনিষ্টকর কারণ উহা সহজে হضم হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত কয়েক বস্তুতে এই পোষণপাওয়া যায় না। অধিক পরিমাণ চর্ষি সহজে হضم হয় না সেইজন্য গুরুপাক মিঠা, কেক ও মশলা অল্পবয়স্কদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত হইবে।

মাছের শরীরের ভিত্তি যে সকল বনিজ দ্রব্য প্রয়োজন তাহার মধ্যে আটটি প্রধান বনিজ দ্রব্য আছে এবং আয়োদ্যের বাত্বের মধ্যে ইহা পাকা নিত্য প্রয়োজন। সর্বাশেষে প্রাণিক প্রয়োজনীয় তিনটা বনিজ দ্রব্য আছে এবং এই তিনটাই আয়োদ্যের নিরীক্ষাতি বাড়ে সাধারণতঃ থাকে না; এই তিনটা হইল চূণ, লৌহ ও ফস্ফরাস। চূণ ও ফস্ফরাস যে বাড়ে আছে তাহা সেবনে স্বচ্ছ ও দৃঢ় অস্থি গঠনের সাহায্য করে—ইহাতে উত্তম দন্ত গঠিত হয়। লৌহ যে বাড়ে আছে তাহা সেবনে রক্তের লাল কণিকাকে হেমোগ্লিন (haemoglobin) নামক পদার্থ সংযুক্ত হয়। রক্তের এই লাল কণিকা কোষদলক হেমোগ্লিন লৌহে পূর্ণ থাকায় ফুসফুস হইতে পেশীদলকে অক্সিজেন বহন করিয়া দেইয়া যায়।

মূল্যবান ও শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বনিজ দ্রব্য যে সকল বাত্ব দ্রব্য আছে তাহার তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। এই সকল দ্রব্য সেবনে বালক-বালিকাগণের শরীরে উহা প্রচুরপরিমাণে বর্তমান থাকিবে। চূণ নিম্নলিখিত বাড়ে বর্তমান—দুধ, ভিখের হাড়ি বা বর্ষের বসন্তে, পনীরা, নীমজাতীয় পরার্থে, পালং শাক, লেটুশ শাক, পেঁপা, মূল্য, গাঙ্গুর। ফস্ফরাস নিম্ন-

লিখিত বাত্বদলক বর্তমান—ভিখের হাড়ি বাত্ব অংশ, দুধ, পনির, নীমজাতীয় দ্রব্য, পেঁপা, মাংস, দাল, আণু, বালি, গম, কমলালেবু। লৌহ নিম্নলিখিত বাড়ে বর্তমান—ভিখের হাড়ি বাত্ব অংশ, নীমজাতীয় বাত্ব, পালং শাক, লেটুশ শাক, বাঁধা কপি, কিসমিস, সেনাবি শাক।

ভিটামিন বা বাত্ববীর্ঘ যে সকল বাড়ে বর্তমান তাহা সেবনে শরীরের বৃদ্ধি হয় এবং স্বচ্ছকণ্ঠি রোগ নিবারণ করে। তিনটা প্রধান শ্রেণীর ভিটামিন এখন পর্যন্ত জানা হইয়াছে এবং উহা সেবনে কি উপকার হয় ও কোন বাড়ে উহা বর্তমান থাকে তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া মিিয়াছে। এই তিন শ্রেণীর ভিটামিনের মধ্যে প্রথম 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন বা বাত্ববীর্ঘ, উহা চর্ষিতে অস্বীকৃত হয়, দ্বিতীয় 'গ' শ্রেণীর ভিটামিন জলে অস্বীকৃত হয়, তৃতীয় 'দ' শ্রেণীর ভিটামিনও জলে অস্বীকৃত হয়। জলে অস্বীকৃত 'ব' শ্রেণীর ভিটামিন প্রায় সকল বাড়েই এমন ভাবে আছে যে কোন বাড়ে ইহা কম পরিমাণে বর্তমান তাহা বাহির করা বস্তুি। 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন সচরাচর যথা সেবন করা যায় তাহাতে বর্তমান থাকে না। দুধ, মাখন, ভিখ অথবা প্রচুর পরিমাণ শাকসব্জী সেবনে উপযুক্ত পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়। উদ্ভিদ তৈল, মাখন, জলপাইর তৈলে এই ভিটামিন বর্তমান নাই।

'গ' শ্রেণীর ভিটামিন টাটকা ফলে, বিশেষতঃ কমলালেবুর, বঙ্গ বাসেবী গরুর দুধ এবং অনেক টাটকা শাকসব্জীতে বর্তমান। এই বাত্ববীর্ঘের প্রভাবে এক প্রকার চর্ষি রোগ হয়, তাহাকে scurvy বলে। 'ক' ও 'গ' শ্রেণীর ভিটামিন উত্তাপে যথা, সিঁচু করার নষ্ট হয় না কিন্তু 'দ' শ্রেণীর ভিটামিন উত্তাপে এবং বিশেষ বাত্বহার না করিয়া রাখিয়া দিলে নষ্ট হয়। সেজন্য যে সকল শিশুকে আল দেওয়া হয়, শুষ্ক দুধ, টিনে করা বা ঐক্লপ কোন প্রকার পেটেট করা বাত্বের বিক্রীত দুধ খাইতে দেওয়া হয় তবে তাহারাপক্ষে প্রত্যহ কমলালেবুর রস খাইতে দেওয়া প্রয়োজন।

যে সকল বাড়ে ভিটামিন আছে তাহার শ্রেণী অম্বাধী

তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন বা বাত্ববীর্ঘ; ইহা চর্ষিতে অস্বীকৃত হয়। দুধ, মাখন, দুধের সর, কত ঘসের তৈল, ভিখের হাড়ি বাত্ব অংশ, পালং শাক, বিলাতী বেগুন, মূল্য, লেটুশ শাক, ভালা। 'গ' শ্রেণীর বাত্ববীর্ঘ, যাহা জলে অস্বীকৃত হয়—দুধে বর্তমান, ভিখ এবং প্রায় সকল টাটকা শাকসব্জী এবং ফলের মধ্যে বর্তমান। 'দ' শ্রেণীর ভিটামিন, যাহা জলে অবনীয়—কমলালেবুর রস, বিলাতী বেগুন, (টাটকা এবং টিনে করা) লেবু, বাঁধা কপি, লেটুশ শাক, মূল্য, লুচা দুধ।

যে সকল শাকসব্জী অল্পসংযুক্ত নহে তাহা অধিকতর উত্তাপে রাখিলে উহার 'গ' শ্রেণীর ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু ঘি, পনের বা তুড়ি মিনটি পর্যন্ত উহাতে বাশ প্রয়োগ করা হয় তবে তাহার পরেও ঐ সকল শাকসব্জীতে স্বচ্ছকণ্ঠী ভিটামিন বর্তমান থাকে। 'দ' শ্রেণীর

শ্রেণীর ভিটামিনে, 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন যে সকল বাত্ব হইতে পাওয়া যায় সত্ত্বতঃ তাহার সকলগুলিই বর্তমান আছে। দুইবার আহারের মধ্যে সময় এবং বিশেষতঃ প্রাতঃরাশের পূর্বে মাথাতে বালক-বালিকাগণ জলপান করার অভ্যাস কম বয়সেই 'আরক্ত' করে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আহারের সময় জলপান করা অনিষ্টকর নহে কিন্তু ঘি এই জল আহাৰ্যদ্রব্য ভাল করিয়া না চিবাইয়া কেবল আহাৰ্য পলাংকরণের সুবিধার জন্য সেবন করা হয় তাহা হইলে উহা অনিষ্টকর। প্রাতঃকালে ও বৈকালে অনেক পরিমাণ জলপান করিলে বালক-বালিকাগণের উপকার হয়। সমগ্র শরীরের স্বাস্থ্য সকল স্থিতিস্থাপক করিতে প্রচুর পরিমাণ জলপান করা যে বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহা যে তন্মজ্ঞ কেবল অতি উপকারী বস্তু রাখা নহে পরস্তু ইহা রোগাক্রমণে বাধা দেয় এবং প্রধানতঃ অধিক জলপান করিলে সর্দিরোগ হয় না। (সমীক্ষা হইতে উদ্ধৃত)

## বৎসর শেষে

### শ্রী গোপেন্দ্রনাথ রায়

বছর হ'ল শেষ আনন্দে রহস্যময় সময় সাগর তলে।

বড়ই মোহা ভালবাসি হারানো ধন রাখতে গেঁথে মনে,

পত্নী সকল হৃদয়ের দিনই আগবে হলে আনন্দময় রোলে।

বছরটুকু যতই ভাবি মোহা, হাসি কাঁদা যতই ভেবে মরি।

গোপন প্রেম, অতীত আশা, ভয় ভাবনার তীব্র দমন রেখা,

সময় এতই অনন্ত যে সবই ভুলি স্বপ্ন বছর স্থির।

যখন কালের তরঙ্গমালা লয়ে যাবে অনন্ত সেই তীরে।

এ জীবনের স্থপতির হৃদয়ের মিন, মনে তখন আগবে স্বপ্নময়,

মহাফেজের পাতার মাঝে তবু, কল্প রাখতে চায়

এ জীবন বীরে



আজ বেদনা আমার জীবন পেয়ালা ভরে দিয়েছে। আজ এ মৌন সন্ধ্যায় আমি নিরালায় কাঁদতে বসেছি। তোমরা কেউ বাধা দিও না, আজ প্রাণের আবেগে কাঁদতে বসেছি। আমার এ বেদনা ভরা পুঞ্জীভূত কাহ্না এতদিন না ভয়েছিল, আজ প্রাণের ধারার মত কড়ে পড়েছে।

বেদনা, বেদনা, বেদনা! ওগো! আমার ছোট্ট জীবনটাই যে বেদনার একটা গান। যেন একটা গান। যেন এক অনাহত বাঁধার মুহূর্ত, বেদনা যার প্রাণ। আজ অতীত জীবনের পৃষ্ঠা খুলে বসেছি। অতীতের সেই আধ-আলো আধ-আঁধারে, আমার যৌবন নিকুঞ্জে একদিন যে সাহায্য করেছিল আজ তারই উদ্ভাস।

জীবনের এ করুণ বেলাগ শেখ হয়ে আসছে, আমি বেশ ব্যস্ততে পারছি। তাই মরবার আগে জীবনের গাভাখানি আমি পূর্ণ করে যেতে চাই। যে বেদনা একদিন আমায় ঘরছাড়া করেছিল, এ তারই মুহূর্ত, তারই-পরিণতি।

দশটা বছর আগে কাগজ সাঁঝে যেদিন আমার গোপাল প্রতিমাখানি নবীতীরের ঐ অশ্রুনাশিত বিপদে দিয়েছিল, তখন কি একবারও ভাবতে পারতাম যে প্রতিমা ছাড়া হয়ে পুজারী আমি দশ দশটা বছর বেঁচে থাকব। কিন্তু থাকতে হল। যে বেদনা সেদিন আমার জীবনে তার প্রথম বাঁধা বাজাইয়াছিল, আজও সেই বেদনা তার হৃদে হৃদে মুহূর্তায় মুহূর্তায় গুমে গুমে উঠেছে।

পক্ষিদের এক কলসে প্রফেশারী ক'রতাম। জীবনের শ্রেষ্ঠ গানটা বিখ্যাত যেদিন কেড়ে নিলেন, সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আজ এই হুসীধ কয়টা বছর, বেদনা তার সবটুকু দান করে ভরে দিয়েছে আমার এই জীবন পেয়ালা। ছুটে গেলাম হরিষার, এক জটালুট পৈরিকারী সম্মানী দেয়া পেলাম। সম্মানী তার স্বেচ্ছা বাহুতে আমার বঁধে নিলেন।

ধরা দিলাম। বৈরাগ্যের সে নিবিড় বন্ধন আমার

নোহাৎ মঞ্চ লাগল না। কিন্তু ঐ বেদনা আমার জীবন ভরে দিয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে এ করুণ ব্যথা থেকে থেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠত। শান্ত করতে পারতাম না, চিন্তি হরিষা না। সম্মানী উপদেশ রিভেন, দেবী তো তোমার সাথে সাথেই আছে, তাঁর আশা যে অমর। গীতা গড়িয়ে শুভাভেন 'অমর অমর শান্তোয়ম্ আশা'।

টিক এ কথাগুলি আমিও যে না জানতাম, তী নয়। আমিও ছিলাম দর্শন শায়েরই অধ্যাপক। বেলাস্তের মহীশী বাণী, আশার নিগূঢ় তত্ত্ব, কাট হেলেলে নব-যুগের নৃতন বাণী, সবই আমি জানতাম। কিন্তু আমার বেদনা তাতে ভনত না। একটু নিরাশা পেলেই কেঁদে কেঁদে উঠত। কোথায় ওগো আমার দেবী? আমার বেদনা রাণী?

চলে এলাম। সম্মানীকে বললাম, তুমি আমার এ ব্যথা বুঝবে না। এ ব্যথা বোঝবার মত দরদী মন তো তোমার নাই। বাংলা মাঘের কোমল বুকে আবার ফিরে এলাম। বাংলার আকাশে বাতাসে, আমি যেন আবার সেই রূপই নৃতন করে দেখতে পেলাম।

তারপর-তারপর, আজ মরণ-সন্ধ্যার তীরে ঠাড়িরে অন্তরবির পানে চেয়ে এ কাগজ সাঁঝে শ্রুতির আভ্রন আজ আবার নৃতন করে জলে উঠেছে। মেডিকেল কলেজের এ নিদ্রান কক্ষে শুয়ে শুয়ে যতই আমার এ পারের দিনগুলি গুচ্ছ, ততই পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

যৌবনের রঙ্গীণ মেলায় এক স্বন্দর মধুর সন্ধ্যায় ছুঁতেলায় যে চারি চকুর একবার মিলন হয়েছিল, তারই এক স্রোতা চকু, আজ কাগজের সাঁঝে কাকে বুকে বুকে যেন ক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

নিশা! ওগো আমার তরুণ যৌবনের রাণী ওগো আমার বেদনার বাণী, এ জীবনের নিশা শ্রেণে ওগারে, ঐ সবটুকু আঁধারে আবার খি তোমায় আমার দেবা হব।



মহারাণী

ইয়ং ইন্ডিয়া

পত্রিকার  
সার সঞ্চলন

সত্যের পরীক্ষা

প্রিটোরিয়ার পথে

দরবনে যে সমস্ত ভারতীয় ক্রিস্চান বাস করিতেন তাঁহাদের সহিত শীঘ্রই আমার আলাপ হইয়া গেল। কোর্টের দোভাষী মি: গল, রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত ও মি: হুভান গডফ্রেস সহিত পরিচিত হইলাম। গত বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকা ডেপুটিশনের মেম্বর রূপে যে মি: কেমস গডফ্রেস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, মি: হুভান গডফ্রেস তাঁহার পিতা ছিলেন। তিনি তখন প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনের অধীনে শিক্ষকতা করিতেন। এই সময়েই পরলোকগত পাশী প্রবর মি: রতুমজী ও পরলোকগত আদামজী মিকোবার সহিত আলাপ পরিচয় হয়। এই সমস্ত বঙ্গদূত বাহাদুর মধ্য পরশুরের সহিত তখনও পর্যাপ্ত ব্যবসায় সম্পর্ক ভিন্ন অল্পরূপ কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। পরে কেমস করিয়া ঘনিষ্ঠতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সে কথা পরে বলিব।

আমি যখন এইরূপে আলাপী ও পরিচিতের সংখ্যা বাড়াইতে সচেষ্ট ছিলাম তখন আমার নিয়োগকর্তাগণ তাঁহাদের উকীলের নিকট হইতে মামলার উল্লেখ আয়োজন করিবার জন্ত একটা তাগিদ পাইলেন। তাহাতে হয় আবদুল্লা শেঠ সাহেবকে, নয় তাঁহার কোন প্রতিনিধিকে প্রিটোরিয়াতে যাইবার জন্ত বলা হইয়াছিল। আবদুল্লা সাহেব আমার হাতে চিঠিখানি দিয়া উহা পাঠ করিতে বলিলেন ও আমি প্রিটোরিয়া যাইতে পারিব

কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম যে আপনাদের মামলা উত্তমরূপে বুঝিয়া না লওয়া পর্যন্ত আমি কোনরূপ সঠিক উত্তর দিতে পারি না কারণ বর্তমানে সেখানে যাইয়া আমি যে কি করিব তাহাই আমি বৃত্তিতে পারি নাই। আমার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার কেরাণীকে আবার সমস্ত মামলাটা বুঝাইয়া দিতে বলিলেন।

মামলাটা বৃত্তিতে চেষ্টা করিতে গিয়া বুলিলাম যে ব্যাপারটা গোড়া হইতে আমাকে জানিবা লইতে হইবে। জাতিবাদের যে কয়দিন আমি ছিলাম প্রায়ই আমি সেখানকার কোর্টে মামলা হেনিতে যাইতাম। একদিন কোর্টে দেবিলাম এক পাশী উকীল একজন সাক্ষীকে জমা খরচ সম্বন্ধে কুট প্রশ্ন করিতেছিল। জমা খরচের আমি কিছুই বৃত্তিতে না কারণ খুলে আমি হিসাব রক্ষা সম্বন্ধে কোন শিক্ষা পাই নাই ইংলণ্ডে গিয়াও তাহা শিখি নাই।

যে মামলা উপলক্ষে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া-ছিলাম তাহাও প্রধানতঃ এই হিসাবের টুটকালের উপর স্থাপিত। যিনি হিসাব ভাল বোঝেন তিনিই ইহা বৃত্তিতে বা বুঝাইতে পারিবেন। মামলা বুঝাইতে গিয়া আবদুল্লা সাহেবের কেরাণী যখন কথায় কথায় কেবল জমা ও খরচের কথা জুগিজে লাগিলেন তখন আমি ক্রমশঃ ভক্তভক্তি যাইতে লাগিলাম। P. Note কাহাকে বলে আমি তাহা জানিতাম না-অভ্যাসেও ওকখার



কোন উল্লেখ পাইলাম না। অগত্যা আমাকে সেই কেরাণীর কোন বিষয়ের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইল; তখন তিনি আমার বুঝাইয়া দিলেন যে P. Note মানে প্রমিগরি Note, আমি বুক বিনিঃ ( হিসাব রক্ষা ) শব্দে এক-খানা বই কিনিয়া পাঠ করিয়া তবে অনেকটা ভঙ্গা পাইলাম; মামলাটা তখন বেশ বৃদ্ধিতে পরিণাম। আমি লম্বা করিয়াছিলাম যে আবছুরা সাহেব যদিও হিসাব রক্ষার কায়াদক্ষ ভাল জানিতেন না তাপরি তাঁহার মাথা এখন সাক ছিল যে হিসাব সম্বন্ধে যে কোন গোল-মাল ব্যপিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা টিক করিয়া দিতে পারিতেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাই-লাম যে প্রিন্সেরিয়ায় হাইতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। তিনি আমার বিজ্ঞাসা করিলেন "সেখানে গিয়ে কোথায় থাকব?"

আমি উত্তরে বলিলাম "আপনি যেখানে থাকিতে বলিলেন সেইখানেই আমি থাকবো।"

"তাহলে আমি আমাঘের উকীলকে চিঠি লিখে দিই, তিনিই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার বকাতীয় বন্ধুদেরও আমি চিঠি দেবো তবে তাদের সঙ্গে তোমার খাটো টিক হবে না; কারণ প্রিন্সেরিয়ায় আমার বিপক্ষদের বেশ প্রভাব আছে—যদি তাদের কেউ আমাঘের চিঠিপত্র গোপনে পড়ে নিতে পারে তা'হলে আমাঘের বিশেষ ক্ষতি হবে। তাদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা যত কম হয় ততই আমাঘের পক্ষে মঙ্গল।"

"আমি আপনাদার উকীলের নির্দিষ্ট বাসাতেও থাকতে পারি বা নিজেও ভ্রম আলোচনা বাসা টিক করেও নিতে পারি—সে ভ্রম আপনাদার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। আমাঘের মধ্যে যা কিছু গোপনীয় তা যুগ্মস্বরেও কেউ জানতে পারবে না। তবে আমি অপর পক্ষের সহিত আলোচনা পরিচয় করবার ইচ্ছা করি এমনকি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনেও আমি অনিচ্ছুক। যদি সম্ভব হয় তবে আমাঘালাতের বাহিরে যাহাতে একটা মিটমাট হয় সে চেষ্টাও আমি করবো। হাজার হোক তায়েবশেঠ বাপ-দাদার একজন আত্মীয় বটে তা।"

শেষে তায়েব হাজি খাঁ, আবছুরা শেঠ মহাশয়ের একজন নিকট আত্মীয়ই ছিলেন। আমি দেখিলাম যে মিটমাটের কথা বলিতে শেষে আমি ঘেঁষে অনেকটা চমকিয়া উঠিলেন। আমি দরবারে ৭৭ দিন মাত্র এসেছিলাম কিন্তু আমারা পরস্পরকে চিনিয়া লইয়াছিলাম তিনি বলিলেন "হা সে কথা ট্রিগ-কোর্টের বাহিরে একটা মিটমাট হওয়ার চেয়ে আর ভাল কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা সরস্পর আত্মীয়তা হইবে বাক্য আমারা পরস্পরকে উত্তমরূপে চিনি। তায়েব শেষে সহজে মিটমাট করিবার লোক নহে। আমরা একই আশ্রয়স্থান হইলেই তিনি আমাঘের গুপ্ত কথা সমস্ত আদায় করিয়া লইবেন এবং শেষে এমন চাপ দিবেন যে আমারা পরাজিত হইব। সেইজন্য আমরা বেশ কিছু করবার আগে যত্ন ভাল করে ভেবে চিন্তে কাজ করব।" আমি বলিলাম "সেজন্য কিছু মাত্রও উদ্বিগ্ন হইবেন না তবে মিটমাটের কথা আমি তায়েব শেঠ বা তাঁহার কোন লোকের নিকট পাড়িব না। মামলা যেক্ষণে করে মিছামিছি পদসাও সমর নষ্ট করার চেয়ে একটা আশাষণ হওয়া বোধ হয় ভাল—এমন ভাবেই একটা আভাস দিব মা।"

দরবারে পৌঁছার ৮ দিন পরে আমি দেখান ত্যাগ করিলাম। আমার ভ্রত প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেনা হইয়াছিল। বিধানার আবশ্যক হইলে সেখানে ৫ শিলিং-মোট দিতে হবে। একটা বেড়িবুক করিবার ক্ষম শেঠ-সাহেব আমার বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন কিন্তু আমার একতরফি বা স্বাভাবিকতার ভ্রমই হোক বা বাবিশিঃ ঝাঁড়াইবার ভ্রমই হউক; আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইলাম। আবছুরা শেঠ আমারা সাধন, করিয়া বলিলেন, "দেখ এ ভারতবর্ষ নয়; আর ঈশ্বরের অঙ্গুষ্ঠের ছুঁপড়া বরত করিবার মতও আমাঘের অবস্থা আছে সুতরাং কোন বিষয়ে কার্পণ্য করে নিজে যেন কোন-রকম কষ্ট পোহো না।"

আমি তাহাকে বক্তব্য দিয়া বলিলাম যে আমারা ভ্রত তাঁহার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই।  
রাবিঃ টায় নেতাগণের রাজধানী মারিঞ্জবার্বে আসিলাম এই খানেই বিধানার ব্যবস্থা হয়। রেলওয়ের

একজন ভৃত্য আসিয়া আমার বিধানা চাই কি না বিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে আমি বলিলাম আমার নিজের বিধানা আছে। তারপর একজন প্যাসেঞ্জার আসিয়া আমার আপদমন্তক দেখিতে লাগিল—আমি যে একজন 'কলা আদমী', তাহা সে বুঝিল এবং সেটা যেন তার অঙ্গ হইয়া পড়িল। সে লোকটা বাহিরে চাষিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ দুইজন রেলকর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। তাহার চূপ করিয়া ঝাঁড়াইয়া রহিল, আর একজন কর্মচারী আসিয়া বলিল "উঠে এস, তোমায় 'ভান' কামরাই হাইতে হইবে।" আমি বলিলাম "আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে" "তাতে কি, আমি বলছি তোমায় ভান কামরায় যেতে হবে।"

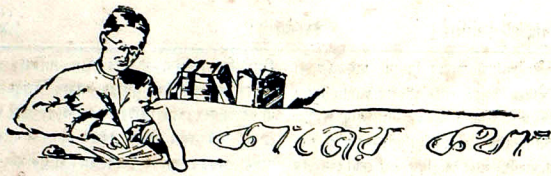
"আমি বাবার এই কামরায় এসেছি এবং এই কাম-রায় আমি যাইব" না তা পাবে না তোমায় এ কামরা ত্যাগ করিতেই হইবে—নহে—না যাও আমি কনষ্টেবল ডাকিয়া তোমায় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিব" "বেশ তবে তাই হোক—আমি বেছায়া এ কামরা ত্যাগ করিব না। কনষ্টেবল আসিল এবং আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিল, আমার লগেজও নামাইয়া লওয়া হইল। আমি ভ্রত কামরায় হাইতে অস্বীকৃত হইলাম; ঈশ ছাড়িয়া দিল। আমি হাতবাখাটা সঙ্গে লইয়া বিশাখাপুরে যাইয়া বলিলাম, লগেজ লে কোম্পানীর বিক্রয় রহিল।

শেষে শ্রীতকাল—শ্রীতকালে আফরিকায় এই অংশে শ্রীতের প্রকাশ ছিল অতি ভীত। আমার গুডারকাট্টা আমার লগেজের মধ্যে ছিল। আমি আমার স্টো চাওয়া লইতে ভরসা পাই নাই; কারণ পাঁছে আমার অবমানিত হই, মনে মনে সে ভয়টুকুও বেশ সম্ভাব্য ছিল। কাজেই সেই দারুণ শীতে বসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতেছিলাম। ঘরটিতে একটা আলো প্রদীপ্ত ছিল না। রাত্রি দ্বিগুণেই আর একটা খালী আসিলেন এবং তাৎক্ষণিক বুলিলাম আমার সহিত আলো করিতে তিনি ইঙ্গুর কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা তখন কথাবাক্য করিবার মত ছিল না। আমি তখন আমার কি কা উচিত তাহাই ভাবিতেছিলাম—আমার প্রাণ দাবী লইয়া লড়িব কি ভারতে ফিরিয়া যাইব—না সমস্ত অপমান পকেটস্থ করিয়া

শ্রীটোরিয়া যাইয়া মাংসার কাজ সাধিয়া তাপার ভারতে ফিরিয়া যাইব? কারণ আমার কর্তব্য সমাপ্ত না করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। আমাকে যে যাতনা অসহন করিতে হইবে তাহা বাস্তবিক মাত্র—বর্ণা-বিধি ভাঙ ব্যাধির একটা উপসর্গ বলিলেই চলে। আমি ভাবিলাম যে এই ব্যাধির যাহাতে প্রতিকার হয় তাহা করাই আমার উচিত তৎক্ষণ কষ্টপাইতে বা ক্ষেপিত শঙ্ক করিতে হোক না কেন শঙ্ক করা উচিত। ভ্রমের প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য—অবশ্য এই বর্ণ বিধির বিদূর করিতে যতটুকু আবশ্যক আমি ততটুকু প্রতিকারই চাই।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি পূর্বের গাড়ীতে প্রিন্সেরিয়া যাইব স্থির করিলাম। পরদিন প্রাতে আমি রেলওয়ের স্টেশনে আসিয়া যানোজারকে একটা দীর্ঘ টেলিগ্রাম করিলাম ও আবছুরা শেঠকে সমস্ত জ্ঞাপন করিলাম। তিনি স্টেশনের যানোজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন স্টেশনের যানোজার রেলকর্মচারীরা কাঁধা স্বর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে আমি যাহাতে গন্তব্য স্থানে নিরাপদে পৌঁছাই উজ্জ্বল তিনি স্টেশন মাষ্টারকে বলিয়া দিাহেন। আবছুরা শেঠ মারিঞ্জবার্বেগামী ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার ভ্রত ব্যবস্থা করিতে তার করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্টেশনে আসিয়া মারিঞ্জবার্বে সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একজন ঘটনা যে এসেছে খুদেই স্বাভাবিক এবং নিম্নেরা এই শ্রেণীর যে সমস্ত দুর্ভোগ ভুগিয়াছিলেন সেই সব কথাই বলিলেন। ভারতবাদীগণ রেল প্রথম বা ষষ্ঠীয় শ্রেণীতে ভ্রম-কালীন যে রেল কর্মচারীও শ্রেষ্ঠতম যাত্রীসংগের নিকট এইরূপ লান্ধা ভোগ করিয়া থাকেন সেকথাও বলিলেন। সমস্ত মিটমাট এইরূপ নিগ্রহের গল্প চুনিতে চুনিতে কাটিয়া-গেল—সন্ধ্যাবেলা ট্রেন আসিয়া বেরগেন পৌঁছিল আমারা ভ্রত তাহাতে একখানি টিকিট ক্রয় করা গেল। এবার মারিঞ্জবার্বে আমি বিধানার টিকিট কিনিলাম, যাঁহা দরমানে প্রথমে আমি কিনিতে সক্ষম হই নাই। এ ট্রেনে আমি চাপদটাওনে পৌঁছিয়াছি।





## চোলের চোলা

নবযুগের দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইল। বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া যাইতে হইলেও পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা পদাশ্রিত হই নাই। তবে মুঙ্গেরের ব্যাপারে যথেষ্ট কষ্ট ছিল—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারি নাই; ভরসা করি তৃতীয় বর্ষে এ শ্রেণীর কষ্ট কমিয়া যাইবে কারণ এ ব্যাপারে আমরা অনেকটা মুসায়মের আশ্রিত। পাঠ্য বিষয়েও চিহ্ন সম্বন্ধে পূর্ববৎসর অপেক্ষা নবযুগ যে বহু পরিমাণে উন্নত হইয়াছে তাহা বৃষ্টিপত্রের সাক্ষ্যই প্রমাণিত হইবে। আগামী বর্ষে এ বিষয়ে আরও উন্নতিসাধনের ইচ্ছা রহিল।

যে সমস্ত পাঠক পত্রিকার কল্যাণে নবযুগের স্থায়িত্ব বর্ষ শেষে তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি কাগজ তাহাদের সাহায্য ব্যতীত আমাদের প্রাণপণ যত্ন কখনই সম্ভবতার এই স্তরে উন্নীত হইতে পারিত না। ভরসা করি তৃতীয় বর্ষেও তাহারা পূর্ববৎ অগ্রহণ প্রকাশে নবযুগের উন্নতি বিধান করিবেন এবং তাহাদের বন্ধু-বান্ধব পরিচিতির মধ্যে যাহাতে নবযুগের প্রচার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

যে সমস্ত সাহিত্যিক নিঃস্বার্থ ভাবে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে দিয়া নবযুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের ঋণ দস্তাবেজ দিয়া শোধ করিবার নহে উপরন্তু আগামী বর্ষে তাহাদের নিকট ঋণ বৃত্তির সম্ভাবনা খনন রহিয়াছে তখন এই অঙ্গুরিশোধ ঋণ শোধ করিবার কথা মুখে না আনিয়া তাহাদের নিকট স্বল্পের পরিপূর্ণ মৌন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করিতেছি। আশা করি নবযুগ তাহাদের স্বেচ্ছামতেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিত হইবে।

সমালোচনা প্রদর্শন সভা প্রকাশ করিতে যাইয়া রূঢ় সভা বলিয়া যদি কাহারও মনে বেদনা দিয়া থাকি, সে জ্ঞাত আমরা ক্ষমাপ্রার্থী কারণ কর্তব্য কঠোর হইলেও তাহা যথা সম্ভব কোমল ভাবে সম্পাদন করা আবশ্যক। অনেক নবীন লেখকের রচনা এই বৎসর নবযুগে স্থান পাইয়াছে তথাপি নবযুগ ক্ষুদ্র বলিয়া স্থানান্তরে হয়ত অনেক রচনা প্রকাশিত হয় নাই—সেজন্যই আমরা অনেক লেখকের নিকট লজ্জিত। যোগ্যতার অভাবে বাহাদের রচনা প্রকাশিত হয় নাই তাহাদের আমরা পুনরায় চেষ্টা করিতে বলি—একবারেই সকলে কৃতকাৰ্য্যতা লাভ করিতে পারে না, ইহা স্বরণ রাখা কর্তব্য।

সংসাহিত্যের প্রচার—পুরাতনের সংস্কার, নূতনের মধ্য হইতে গ্রন্থ রোপণ বা কিছু তাহা গ্রন্থ ও প্রচার ইহা এই নবযুগের নীতি। নবযুগ কেবল নূতনের লেশগুণ নির্দিষ্টারে প্রচার করে নাই, করিবেও না। সর্ববিষয়ে নিরপেক্ষ সভ্য প্রচার করিতে নবযুগ বাবরই চেষ্টা করিয়াছে—কৃতকাৰ্য্যতার পরিমাণ বিচার করিবে—উচিত।

আগামী সম্রাটে নবযুগের তৃতীয় বর্ষারম্ভ এই উপলক্ষে আমরা সকলের নিকট সৌহার্দ্য—প্রীতি ও আনন্দ কামনা করি। ভাষাভ্রমণের ও দেশপন্থী ভাই-ভগ্নীর সর্বতোভাবে সেবা করিয়া নবযুগ যেন জয় যুক্ত হয়। শ্রুতি! শ্রুতি!! শ্রুতি!!!

বাড়ীভাড়া আইনের অন্তিমকাল নিকটবর্তী বলিয়া চিন্তা যাইতেছে। গতরমেট ও প্রজাবৃন্দে প্রতিনিধি কাউন্সিলারগণ কেহই উদ্যোগ আর বাঁচাইয়া রাখিতে চান না—অথচ গতরমেটের সকল আইনের মধ্যে এই আইনটা দরিদ্র প্রজার যথেষ্ট পরিমাণ প্রকট উপকার করিয়াছে। এই আইনটিকে হত্যা করিয়া ক্ষীণতরকার ধনিকগণের উন্নতি করিবার সরকার বাহাদুরের অহরহের হেতু যে কি আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্বরাজ্যস্থলের টাইমসের মধ্যে অনেক স্থানিক আছেন হুতরাং দলের লোকের মুখ চাওয়া তাহারা যদি এই আইনটা তুলিয়া দিতে সাহায্য করেন বা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকেন তবে বৃত্তিতে হইবে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইবার তাহারা অযোগ্য। নির্দোষ সময়ে যখন ভোটের আশায় তাহারা এই দরিদ্র জনসাধারণের ঘরস্থ হইবেন, তখন ভোট দাতাগণ যেন এ কথাটা তুলিয়া না যান।

সাংপ্রদায়িক হাঙ্গামা প্রদর্শন লর্ড অনিভিয়ার টাইমস পত্র লিখিয়াছেন "No one with any close acquaintance with Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British officialdom in favour of the Moslem community, partly on the ground of closer sympathy but more largely as a make weight against Hindu Nationalism." (ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলীর সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত, তাহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত বৃদ্ধি পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন গণের সম্বন্ধে-সহায়ত্বের কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না—ইহা সত্যকথা। পারস্পরিক সহায়ত্বের জন্ত ও বিশেষ করিয়া হিন্দুদের জাতীয়তা ভাব বৃদ্ধি-প্রদর্শন করিবার জন্ত ঘটনাচ্ছে।) লর্ড অনিভিয়ারকে এই স্পষ্ট সভ্যত্বের জন্ত আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু চৌরস্বামী টেটসম্যানের পক্ষে এই সভ্যত্ব একান্ত অসম্ভব হইয়াছে তাই তিনি গীত মঙ্গলবারে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে নানা

প্রকারে উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উহারই মধ্যে একজারগায় কবুল করিয়া বলিয়াছেন যে বাঙ্গলার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় কোন গভর্ণমেণ্টই মুসলমানদের সঙ্গে সহায়ত্ব দিতে না দেখাইয়া পারেন না। হুতরাং শাপকবর্ণের এই মনোভাব যদি শিক্ষিত হিন্দু-বিশেষী মুসলমানগণ কর্তৃক মফঃস্বলের অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হয় তবে ব্রিটিশ, পাকিস্তান, বাপু, চাচা প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটায় তেজ্জ্বল তাহারিগণকে দোষ দিলে কি হইবে? সরকারী মনোভাব না জানিয়া কি রহিম-গজনভীর দল আজ মসজিদের সামনে বাজের সমগ্যা তুলিতে সাহস করিতেন—কখনই না।

রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত এই সব ছোট খাট ব্যাপার মিশিতে দিয়া গতরমেট বড় ভুল করিয়াছেন। গজনভী রহিম বই ইউনে—রিফর্ম চলান, দিতে তাহারা আপত্তি করি না তবে সাধারণ হিন্দু নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া মুসলমানগণকে প্রদর্শন দিলে রাজ্যের শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব হইবে; অনেক ধর্মনিষ্ঠ, রাজতন্ত্র হিন্দু প্রজার মন অকারণে রাজতন্ত্রের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিবে। সেটা গতরমেটের পক্ষে কিছুদূরই কল্যাণকর হইবে না।

পঞ্জীসংস্কার ভাণ্ডার সম্বন্ধে বহুদিন হইতে বহুবিধ কুৎসা ও মানিকর জনরব শুনিয়া আসিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে এই সব অশ্লবোধ কিত্তিহীন কিন্তু ভাণ্ডারের অধ্যক্ষদের এবাং কোনরূপ পত্রিকার হিসাব দাখিল করিতে না দেখিয়া মনে হয় তবে কি এই সবের মধ্যে কোন সত্য-নিহিত আছে? অনেকে বলেন যে সংগৃহীত ভাণ্ডার অধিকাংশ রাধাধরচ বাবদ ধরত করা হইয়া গিয়াছে। মোটর ভাড়া যে পরিমাণ ধরত আছে তাহাতে নাকি বহু সংখ্যক মোটর কিনিয়া ফেলা চলিত—আমাদের মনে হয় এ সম্বন্ধে একটা সাক্ষ্য হিসাব দাখিল করিয়া কর্তৃপক্ষ জনরবের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন—নতুবা সামনের নির্দোষ তাহাদের নির্দোষিত হইবার আশা বড়ই অল্প। সাধারণের অর্থ লইয়া বাঁচায়া হিসাব দিতে ইতস্ততঃ করে তাহাদেরকে বিচার্য্য করিতে পারি।



## মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

বঙ্গবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ ৪—“মিলাদর” শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের রচনা।—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দের উপর লিখিত প্রবন্ধ। কাব্য ও ছন্দ সংক্ষেপে কিছু বলিবার কবিরই অধিকার। কালিদাসবাবু তাঁহার বক্তব্য বিশদভাবে এবং কাব্যের ভাষাতেই বলিয়াছেন। কালিদাসবাবুর বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই :—“মিলই বাঙ্গালা কবিতার তান-মান লয়, যতি রতি সবই নির্মিত করে—পঙ্খকে গড়াঙ্খকতা হইতে রক্ষা করে, কবির লেখনীকে বিরাম দেয় ও সংযত করে, আবৃত্তি কালে পাঠকের কণ্ঠ-স্বরকে উত্থান-পতনের সাহায্য করে, রচনার গতি-ক্রিষ্টতা বরণ করিয়া স্বরকে বারবার নবীকৃত করিয়া দেয়, অনিচ্ছাত কর্ণের ক্রান্তি বিনোদ করে। ব্যবহারিক জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ফল সিমল সাহস্রপ্রেসে ছন্দোবদ্ধ বচনে প্রণীত; এগুলি আমাদের সঙ্গার ব্যাক্যের পথ নির্দেশ করে, যথা, প্রবাস বচন, থনা ও ভাকের কথা। শিশুগণও সমিল ছড়া আবৃত্তি করিয়া আনন্দাচ্ছত্ত্ব করে। কালিদাসবাবুর লেখায় অত্যধিক “punning” ও মধ্যমক প্রীতি লক্ষ্য হয় যেমন বীরবলী ভাষায় :—যেমন, ‘ইহা বাঙ্গালা কবিতার অসীমত্ব ও জীবনের সসীমত্ব’, ‘অতি বিনোদন করে বলিয়াই উহা দৃষ্টি-বিনোদন করে’, ‘মিল শু শার গড়ে নাই—শব্দও গড়িয়াছে—’, এইরূপ বহু স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। বীরব্রজনাথের “ছেলে তুলান ছড়া” প্রবন্ধে বিষয়টির যেকোনো বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, কালিদাসবাবুর প্রবন্ধ অনেকটা সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

“ধ্বংস পৌড়ানি” শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ দাস রচিত সমরোপযোগী প্রবন্ধ। লেখক স্বন্দরভাবে বিষয়টির বিচার করিয়াছেন। আমরা লেখকের রচনাভঙ্গী ও বিচার নৈপুণ্য প্রীত হইয়াছি। প্রবন্ধ অনেক সাধারণ কথা আছে। জীবনীপন্থার রায় “হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ-ভাবনা” আত্মল হইয়াছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নৃতনত্বের অভাব, সৌন্দর্য বা সঙ্গতি জানেন

অভাব, গুণাগুণের মধ্যে কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষসাধনের ঔদাসীন্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের লেখক আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত-রস-সিকগণ দিলীপসুন্দারের অল্পযোগ প্রণিধান করিবেন।

“গন্ধ-কবিতা”—দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস; লেখকের নাম নাই। কবিতাই বটে; কেননা অর্থ মোটেই বোঝা যায় না।

“ধ্বং—শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের” নিবন্ধ, বর্তমান সময়ের ধর্মসংঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়া নিপুণ হস্তে লেখক শ্রেণ ও বিজ্ঞপ-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

“পুরাণ প্রসঙ্গ” স্তলিখিত প্রবন্ধ। লেখক শ্রীনিলিনী-মোহন সান্নাঙ্গ, পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা; প্রাচীনতা বা আধুনিকতা, বেদের সহিত পুরাণ-বর্ণিত বিষয়ের সম্বন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের রচনা-কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন—পণ্ডিত প্রবর উইলসনের পঞ্চাবল-ধনে এই প্রবন্ধ রচিত মনে হয়।

এ মাসের বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বঙ্গবাণীর কবিতা নির্মাচন প্রশংসনীয়।

স্বাভাঙ্গণ, ভাসাভাঙ্গ, ১৩৩৩ ৫—ইহা একখানি নব-আবিষ্কৃত মাসিক পত্রিকা। আমরা ছুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিলাম, কয়েকজন সাহিত্য-রস-পিশাখ তরুণের সাহিত্যিক আগ্রহে স্বরূপার স্রষ্টা। পত্রিকা সুন্দর হইলেও, স্বল্প-পাঠ্য। প্রবন্ধগুলি দুর্বল-চিত্ত। কবিশেষের কালিদাস, উজানীর কবি কুমুদরঞ্জন, উদীয়মান কবি অরীক্ষাজী, হলেখিকা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী প্রভৃতি লেখক লেখিকা এই নব উদ্ভূত স্বরূপার চারি পার্শ্বে সমবেত হইয়াছেন। আমরা এই নূন মাসিক বারনি সাপ্তা কাদনা করি। আশা করি স্বরূপা বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে বয়সভা ও শ্রাব্যমাত্রার বুদ্ধিকর সাহায্য করিবে।



মিঃ খিচেরী স্ত ১লা শ্রাবণ অর্থাৎ এই শনিবারেই “জয়ন্তী” মুদ্রিতহে। “জয়ন্তী” শ্রীযুক্ত কীরোরপ্রদাস বিজ্ঞানবিনোদ প্রণীত একখানি গীতি নাটক। গীতি নাটক রচনায় কীরোরবাবু অধীতীয়। তাঁহার আলিবালা, প্রমোদরঞ্জন, কিশরী প্রভৃতি গীতিনাট্যগুলি “অনন্তকাল” ধরিয়া চলিতেছে। তাঁহার গানগুলির রচনা অতি মধুর, তাহাতে স্বরজ কণ্ঠক স্বর সংযোজিত হইলে তাহা অতীত উপাদেয় হইয়া উঠে। মিঃ খিচেরীর স্বরের রাজা বৈষ্ণবকণ্ঠবাবু আছেন, গীতি নাটকের গান জন্মিবেই। তার উপর নৃপেন্দ্রচন্দ্রও মিঃ খিচেরীর বিরাজ করিতেছেন, গীতি নাটকের নৃত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। মিঃ খিচেরীর জয়ন্তী তাঁহাদের জয়ন্তী হৌক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গত শনিবারে মিনার্ভা খিচেরীর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বর মহাশয়ের “ব্যাপিকা-বিবাহ” অভিনীত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও অভিনয় দেখিয়া উত্তীর্ণ হই নাই; কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। অমৃত-বাবুর প্রদর্শন, ভাল হইবারই ত কথা।

ওৎসঙ্গে কুপেন্দ্রবাবুর “নারী-রাজ্যেও” অভিনীত হইয়াছে। আমরা সমগ্ররূপে এই দুই নাটকের পরিচয় প্রদান করিব।

নাট্যমন্দির “সদ্যবর একাদশী” বিবোধিত করিয়াছেন। নাট্যমন্দির “সদ্যবর একাদশী” বিবোধিত করিয়াছেন।

করিবেন। আমাদের অসহান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নাট্যমোদী মাঝেই থুদী হইবেন। কারণ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকেই শিশিরবাণকে দেখিতে কেমন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে। শিশিরবাবুর মত প্রথম শ্রেণীর নট যত বিভিন্ন চরিত্রাভিনয় করিবেন, দর্শক ততই উৎকণ্ঠ হইতে পারিবেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক নাটকে আঙ্গ পঙ্খ শিশিরবাবু নামের নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। সামাজিক নাটকে তাঁহার প্রতিভা বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা দেখিবার ভক্ত বঙ্গদেশের নাট্যমোদী মাঝেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এতদিনে “মনসাধ পুরিবে সদ্যবর”।

‘সদ্যবর একাদশী’তে নিম্নে দত্ত একটি বিখ্যাত অংশ। কি সাহিত্যসম্পদে, কি নাটকীয় ঐশ্বর্যে এরূপ চরিত্র অতি অল্পই আছে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এই অংশে অনন্তসাধারণ ব্যাখ্যা অর্জন করিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য অমৃতলাল প্রভৃতি বহু জীবিত ও মৃত নট এই অংশে অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আজকালকার কোন নট এই চরিত্র অভিনয় করেন নাই; করিতে সাহস করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও বলিতে পারি না। একালের শ্রেষ্ঠ নট শিশিরবাবু, তাঁহার পক্ষে এ কাণ্ড যোগ্যই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ম্যাডান কোং মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রচুর নাটকের চলচ্চিত্র তুলিয়াছেন। আগামী শনিবার হইতে ‘বাঙালীর বো’ প্রচুর ফাউন সিনেমাথ প্রদর্শিত হইবে বিজ্ঞান



বাহির হইয়াছে। নীল রঙে ছাপা একখানি হাতবিল আমাদের হাতে পড়িল। পড়িয়া তাহার ভাবাবিভাস দেখিয়া আমরা চক্কল হইয়া পড়িয়াছি। পাঠককে একটুখানি উপহার দিই—

“বাঙ্গালী অন্তরের চিরস্তনী,—বিশহিয়া আলোড়নী... সেই কুলহারাণো মোতারিনী (?) “প্রফুল্ল” আশ চলচ্চিত্রে।”

আমরা জানি বাঙ্গালীমাত্রেই উক্ত প্রফুল্ল নাটকের সহিত সুপরিচিত। রসমঞ্চে ইহার অভিনয় না দেখিয়াছেন ও নাটক পাঠ না করিয়াছেন, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বলনাও আমরা করিতে অক্ষম। কিন্তু পাঠক “কুলহারাণো মোতারিনী” কি, আপনারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন কি? আরও শুধুন—

“আজ বহু আশ্রমে ও বহু অর্থনাশে চিত্রের চিত্তহারা হারে প্রবিত্ত।”

পাঠক মহোদয় দেখিতেছেন আমাদের সঙ্গে অর্থনাশ মিল করিতে গিয়া, অহুপ্রাস ঢালিতে গিয়া ভাষার কি সৌষ্ঠব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন কথা হইতেছে “অর্থনাশ” করিয়া বাঙ্গালীর প্রফুল্লের “প্রাণনাশ” করা হয় নাই ত? ম্যডানে ফ্র্যাং অনেকগুলি বাঙ্গালীর সমাজের ও সংসারের চলচ্চিত্র তুলিয়াছেন, সেগুলির সাধ্যমত “প্রাণনাশ”ই উৎসাহ করিয়াছেন। তবে সেগুলি উৎসাহের নিম্নের ছাপল, যা খুবী তাই করিতে পারেন। “প্রফুল্লনাশ” করিবার কোন অধিকার তাঁহাদের বা আর কাহার নাই; কারণ প্রফুল্ল কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, একটা জাতির, একটা দেশের, একটা সাহিত্যের সম্পত্তি। আমরা আশা করি ‘হাতবিলের’ মত প্রফুল্লের দুর্দশা উৎসাহ করেন নাই।

আমাদের বেশে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের বড় দুর্দশা। বাঙ্গালী এ ব্যবসারে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না; সকলতা লাভ করিতেও পারিল না। তাইমহল সামান্ত কিছুদিনের ভত্ত অল্প অল্প করিয়া তিমিরাবরণে দুষ্কৃত হইল। অস্বাভাবিক নাম গন্ধও ভুলিতে পাওয়া যায় না।

কোচোমে সিডিকেট শৈশবে পঞ্চ প্রাপ্ত। ইতিয়ান মেথাস লি: তাঁহাদের লাইট অফ এমিয়াতে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের খোঁজও বের করে না। এই ত অবস্থা। পূর্ণ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ বায়সোপ ব্যবসায়ে নামিয়াছেন, আসল কাছ করিবেন কি? এদেশে ছবি তুলিবার চেষ্টা না করিলে যে আর নিস্তার নাই। পালীর দৌরাত্ম্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব যে থাইতে বসিয়াছে।

সত্যিকার হাঙ্গ-রসায়ক নাটক-নাটিকার অভাব অনেকদিন হইতেই বাঙ্গলা দেশের রসমঞ্চে অহুত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে যে দুই একখানি রসায়ক নাটক পাওয়া গিয়াছে বা অভিনয় দেখা গিয়াছে, মোহ-গুণ আলোচনা করিলে তাহার মধ্যে কথ্যানির যে নামোন্মেষ করিতে পারা যায় তাহা বলা দায়। এই অভাব-জনিত অবসার যখন মীমাংসে অতিক্রম করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনই কবিবর রবীন্দ্রনাথের চির-নুতন চিরস্থায় সভা ঠার থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এমন সু-লিখিত, সুঠ, সুমিষ্ট হাঙ্গরপূর্ণ নাটক বাঙ্গলা দেশে বেশী নাই। চিরস্থায় সভার রসের চেউ এখনও বাঙ্গলাদেশে পুরাতাত্ত্বিক প্রবাহিত, এ সময়ে ঠার থিয়েটার লাঞ্চারকার অভিনয় করিতে গিয়া কতখানি হাসাইতে পারিয়াছেন বলা যায় না; তবে তাহারা যে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সকল রসে সকলের অধিকার থাকে না। হাঙ্গরগু এমনই একটা বস্তু—তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইতে অল্প লেখকই পারেন। শরৎ বাবুর মত ঔপন্যাসিক হাঙ্গ-রস বিতরণ করিতে পারেন নাই; অন্ত্রে পরে কা কথা! মিনার্ভা থিয়েটার স্ববুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সেইসকলই রিটার্ড—অবসর প্রাপ্ত অমৃতলালের অবসর নাকচ করিয়া তাহাকেই ক্ষেত্রে নামাইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে হইতে অনাভাবে, বস্তুভাবে, বাস্তবতার সত্ত্বে সৰ্ব রসের অভাবও প্রকট হইতেছে। দেখ আমাদের ভাগ্যের।